প্রবাসী

৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য ঃ—

ভারত ও পাকিস্তানে সডাক বার্ষিক মূল্য ১২৲, ঐ ষাণ্মাসিক ৬৲, ঐ প্রতি সংখ্যা ১৲ টাকা। বিদেশী সডাক বার্ষিক মূল্য ১৮৲ টাকা, ঐ ষাণ্মাষিক ১০৲ টাকা, ঐ প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা ঃ অগ্রিম দেয়। বৎসর বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। তবে গ্রাহকের সুবিধামত অন্য যে-কোন মাস হইতেও করা যায়। টাকা মণিঅর্ডারে অগ্রিম পাঠানোই ভাল। প্রবাসী বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। যথাসময়ে প্রবাসী না পৌছিলে ১৫ তারিখের ভিতর স্থানীয় ডাকঘরের রিপোর্ট ও নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক নম্বরসহ পত্র লিখিতে হইবে। পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ তাঁহাদের চাঁদা যে সংখ্যার সহিত নিঃশেষ হইবে, সেই সংখ্যা পাইবার পর ২০ দিনের ভিতর পুনর্ব্বার চাঁদা বা প্রবাসী লইতে অনিচ্ছাজ্ঞাপক পত্র না পাঠাইলে, তাঁহারা পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃতে লইয়া চাঁদা দিতে ইচ্ছুক এই বিশ্বাসে ভিঃ পিঃ প্রেরণ করা হয়। চিঠিপত্র বা টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বর-উল্লেখ না করিলে অসুবিধা অবশ্যম্ভাবী।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ—১ পৃঃ	১০০৲ টাকা
„ ½ বা ১ কলম	৬০৲ „
„ ¼ পৃঃ বা ½ কলম	৩৫৲ „
„ ⅛ „	২০৲ „
সূচীর পরে ১ পৃঃ	১২৫৲ „
„ নীচে ½ „	৭৫৲ „
„ „ ¼ „	৪৫৲ „
„ „ ২/৮ „	৩০৲ „

বিশেষ পৃষ্ঠা

বিজ্ঞাপনের প্রথম পৃঃ	১৫০৲ টাকা
„ শেষ „	১৪০৲ „

অন্যান্য বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার জানিতে হইলে—পত্র লিখুন।

রিডিং ম্যাটারের মধ্যে

১ পৃঃ	১৮০ টাকা
½ „	৯৫৲ „
¼ „	৫০৲ „
¼ কলম	৩০৲ „

(পত্রিকার শেষের দুই ফর্ম্মার মধ্যে যায়)

কভার পেজের বিজ্ঞাপন-হার

১ম কভার (নীচে) (১″×৬″)		১০০৲ টাকা
২য় „		২০০৲ „
৩য় „		১৭৫৲ „
৪র্থ „	এক রঙে	২২৫৲ „
„ „	দুই রঙে	২৭৫৲ „
„ „	তিন রঙে	৩৫০৲ „

সাপ্লিমেণ্ট

(বিজ্ঞাপনদাতা কর্ত্তৃক সরবরাহ করিতে হইবে)

৮ পৃঃ (৪ স্লিপ)	৪০০৲ টাকা
৪ „ (২ „)	২৫০৲ „
২ „ (১ „)	১৫০৲ „

এজেন্সি এবং চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের রেটের জন্য এবং অন্যান্য বিষয় ও বিশদ ভাবে বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কিছু জানিতে হইলে দয়া করিয়া পত্র লিখুন।

সূচীপত্র—কার্ত্তিক, ১৩৭১

সূচীপত্র—কার্ত্তিক, ১৩৭১

সূচীপত্র—কার্ত্তিক, ১৩৭১

সূচীপত্র—কার্ত্তিক, ১৩৭১

—রঙীন চিত্র—

অসুর তৃণাবর্ত্ত দমন

(প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি)

— প্রচ্ছদ —

— চাষীর ঘর —

শিল্পী শ্রীইন্দু রক্ষিত

(প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮)

= প্রবাসী =

৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য :—

ভারত ও পাকিস্তানে সডাক বার্ষিক মূল্য ১২৲, ঐ যাণ্মাসিক ৬৲, ঐ প্রতি সংখ্যা ১৲ টাকা। বিদেশী সডাক বার্ষিক মূল্য ১৮৲ টাকা, ঐ যাণ্মাষিক ১০৲ টাকা, ঐ প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা : অগ্রিম দেয়। বৎসর বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। তবে গ্রাহকের সুবিধামত অন্য যে-কোন মাস হইতেও করা যায়। টাকা মণিঅর্ডারে অগ্রিম পাঠানোই ভাল। প্রবাসী বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। যথাসময়ে প্রবাসী না পৌঁছিলে ১৫ তারিখের ভিতর স্থানীয় ডাকঘরের রিপোর্ট ও নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক নম্বরসহ পত্র লিখিতে হইবে। পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ তাহাদের চাঁদা যে সংখ্যার সহিত নিঃশেষ হইবে, সেই সংখ্যা পাইবার পর ২০ দিনের ভিতর পুনর্ব্বার চাঁদা বা প্রবাসী লইতে অনিচ্ছাজ্ঞাপক পত্র না পাঠাইলে, তাঁহারা পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃতে লইয়া চাঁদা দিতে ইচ্ছুক এই বিশ্বাসে ভিঃ পিঃ প্রেরণ করা হয়। চিঠিপত্র বা টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বর-উল্লেখ না করিলে অসুবিধা অবশ্যম্ভাবী।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ	
সাধারণ—১ পৃঃ	১০০৲ টাকা
„ ½ বা ১ কলম	৬০৲ „
„ ¼ পৃঃ বা ½ কলম	৩৫৲ „
„ ⅛ „	২০৲ „
সূচীর পরে ১ পৃঃ	১২৫৲ „
„ নীচে ½ „	৭৫৲ „
„ „ ¼ „	৪৫৲ „
„ „ ⅛ „	৩০৲ „

বিশেষ পৃষ্ঠা

বিজ্ঞাপনের প্রথম পৃঃ	১৫০৲ টাকা
„ শেষ „	১৪০৲ „

অন্যান্য বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার জানিতে হইলে—পত্র লিখুন।

রিডিং ম্যাটারের মধ্যে

১ পৃঃ	১৯০ টাকা
½ „	৯৫৲ „
¼ „	৫০৲ „
½ কলম	৩০৲ „

(পত্রিকার শেষের দুই ফর্ম্মার মধ্যে যায়)

কভার পেজের বিজ্ঞাপন-হার

১ম কভার (নীচে) (১″×৬″)		১০০৲ টাকা
২য় „		২০০৲ „
৩য় „		১২৫৲ „
৪র্থ „	এক রঙে	২২৫৲ „
„ „	দুই রঙে	২৭৫৲ „
„ „	তিন রঙে	৩৫০৲ „

সাপ্লিমেণ্ট

(বিজ্ঞাপনদাতা কর্ত্তৃক সরবরাহ করিতে হইবে)

৮ পৃঃ (৪ স্লিপ)	৪০০৲ টাকা
৪ „ (২ „)	২৫০৲ „
২ „ (১ „)	১৫০৲ „

এজেন্সি এবং চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের রেটের জন্য এবং অন্যান্য বিষয় ও বিশদ ভাবে বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কিছু জানিতে হইলে দয়া করিয়া পত্র লিখুন।

সূচীপত্র—অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

সূচীপত্র—অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

সূচীপত্র—অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

—রঙীন চিত্র—

হাটের পথে

শিল্পী : শ্রীরক বসু

(১৩৪৪, জ্যৈষ্ঠ হইতে পুনর্মুদ্রিত)

৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য ঃ—

ভারত ও পাকিস্তানে সডাক বার্ষিক মূল্য ১২৲, ঐ ষাণ্মাসিক ৬৲, ঐ প্রতি সংখ্যা ১৲ টাকা। বিদেশী সডাক বার্ষিক মূল্য ১৮৲ টাকা, ঐ ষাণ্মাষিক ১০৲ টাকা, ঐ প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা ঃ অগ্রিম দেয়। বৎসর বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। তবে গ্রাহকের সুবিধামত অন্য যে-কোন মাস হইতেও করা যায়। টাকা মণিঅর্ডারে অগ্রিম পাঠানোই ভাল। প্রবাসী বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। যথাসময়ে প্রবাসী না পৌঁছিলে ১৫ তারিখের ভিতর স্থানীয় ডাকঘরের রিপোর্ট ও নির্দিষ্ট গ্রাহক নম্বরসহ পত্র লিখিতে হইবে। পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ তাঁহাদের চাঁদা যে সংখ্যার সহিত নিঃশেষ হইবে, সেই সংখ্যা পাইবার পর ২০ দিনের ভিতর পুনর্ব্বার চাঁদা বা প্রবাসী লইতে অনিচ্ছাজ্ঞাপক পত্র না পাঠাইলে, তাঁহারা পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃতে লইয়া চাঁদা দিতে ইচ্ছুক এই বিশ্বাসে ভিঃ পিঃ প্রেরণ করা হয়। **চিঠিপত্র বা টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে অসুবিধা অবশ্যম্ভাবী।**

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ—১ পৃঃ	২০০৲ টাকা
" ½ বা ১ কলম	৬০৲ "
" ¼ পৃঃ বা ½ কলম	৩৫৲ "
" ⅛ "	২০৲ "
সূচীর পরে ১ পৃঃ	১২৫৲ "
" নীচে ½ "	৭৫৲ "
" " ¼ "	৪৫৲ "
" ⅛ "	৩০৲ "

বিশেষ পৃষ্ঠা

বিজ্ঞাপনের প্রথম পৃঃ	১৫০৲ টাকা
" শেষ "	১৪০৲ "

অন্যান্য বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার জানিতে হইলে—পত্র লিখুন।

রিডিং ম্যাটারের মধ্যে

১ পৃঃ	১৭০ টাকা
½ "	৯৫৲ "
¼ "	৫০৲ "
½ কলম	৩০৲ "

(পত্রিকার শেষের দুই ফর্ম্মার মধ্যে যায়)

কভার পেজের বিজ্ঞাপন-হার

১ম কভার (নীচে ১"×৬")		১০০৲ টাকা
২য় "		২০০৲ "
৩য় "		১৭৫৲ "
৪র্থ "	এক রঙে	২২৫৲ "
" "	দুই রঙে	২৭৫৲ "
" "	তিন রঙে	৩৫০৲ "

সাপ্লিমেণ্ট

(বিজ্ঞাপনদাতা কর্ত্তৃক সরবরাহ করিতে হইবে)

৮ পৃঃ (৭ স্লিপ)	৪০০৲ টাকা
৪ " (২ ")	২৫০৲ "
২ " (১ ")	১৫০৲ "

এজেন্সি এবং চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের রেটের জন্য এবং অন্যান্য বিষয় ও বিশদ ভাবে বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কিছু জানিতে হইলে দয়া করিয়া পত্র লিখুন।

সূচীপত্র—পৌষ, ১৩৭১

সূচীপত্র—পৌষ, ১৩৭১

সূচীপত্র—পৌষ, ১৩৭১

—রঙীন চিত্র—

কালীদীঘির পাড়ে ইন্দিরা

শিল্পী: শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু

—সদ্যপ্রকাশিত তিনখানি উপন্যাস—

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
পতনে উত্থানে ৫৲

প্রফুল্ল রায়
সীমারেখার বাইরে ১০৲

পঞ্চানন ঘোষাল
একটি নির্মম হত্যা ২.৫০

—আরও কয়েকখানি নামকরা বই…

শক্তিপদ রাজগুরু

জীবন-কাহিনী	৪.৫০
কুমারী মন	৩.৫০
মণি বেগম	৬.২৫
কেউ ফেরে নাই	৭.৫০
গৌড়জন বধূ	৫.৫০
কাজল গাঁয়ের কাহিনী	৫

পঞ্চানন ঘোষাল

অধস্তন পৃথিবী	৫৲
একটি অদ্ভুত মামলা	৫৲
অন্ধকারের দেশে	৫৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নীলকণ্ঠ	৩.৫০

প্রফুল্ল রায়

নোনা জল মিঠে মাটি	৮.৫০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্নমঞ্জরী	৩৲

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এক জীবন অনেক জন্ম	৬.৫০
নীলকণ্ঠী	৫৲

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় নয়ন	৪.৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গৌড়মল্লার	৪.৫০
কালের মন্দিরা	৫.৫০
কানু কহে রাই	২.৫০
ছায়াপথিক	৩৲
কালকূট	৩৲
কাঁচামিঠে	৩৲
শাদা পৃথিবী	৩৲
আদিম রিপু	৩৲
দুর্গরহস্য	৩.৫০
চুয়াচন্দন	১.২৫

সমরেশ বসু

ছিন্নবাধা	৭.৫০

মায়া বসু

অগ্নিবলয়	১.৭৫

প্রবোধকুমার সান্যাল

প্রিয় বান্ধবী	৪৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সুধা হালদার ও সম্প্রদায়	৩.৭৫

পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য

কারটুন	২.৫০
বিবস্ত্র মানব	৫.৫০
দেহ ও দেহাতীত	৪৲
পতঙ্গ ১ম	২.৫০
পতঙ্গ ২য়	২.৫০
শ্রেষ্ঠ গল্প	৪৲

অমরেন্দ্র ঘোষ

পদ্মদীঘির বেদেনী	৩৲

—কিশোরদের জন্য—

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

মজার মজার খেলা

বিজ্ঞানের নানারকম কল-কৌশলের সাহায্যে মজাদার খেলা দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করবার মত বই। শিক্ষা ও খেলার কাজ একই সঙ্গে চলবে। সচিত্র।

দাম—৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

সূচীপত্র—মাঘ, ১৩৭১

সূচীপত্র—মাঘ, ১৩৭১

সমঝদার লোকে জানেন
যে নতুন সাজে সিজার্সের স্বাদও নতুন
ইদানীং আপনি যদি
সিজার্স না খেয়ে থাকেন, একবার
ধরালেই বুঝবেন সিজার্সের তৃপ্তি এখন
অপূর্ব—টেনে সত্যিই আরাম।
W.D.&H.O. WILLS
SCISSORS
Diamond Jubilee
MADE IN INDIA
সিজার্স নতুন সাজে, নতুন স্বাদে
JWTS 1999-A

সূচীপত্র—মাঘ, ১৩৭১

—রঙীন চিত্র—

ত্রয়ী

শ্রীচিন্তামণি কর

জিজ্ঞাসা
করবেন না
"কত
কিলোতে এক মণ হয়
তা জানতে চাইবেন না।"
সের ও মণ
এখন আর বৈধ ওজন নয়
কিলো ও
কুইন্টালে কিনুন।
DA 64 302 Beng.

প্রবাসী

৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য :—

ভারত ও পাকিস্তানে সডাক বার্ষিক মূল্য ১২৲, ঐ যাণ্মাসিক ৬৲, ঐ প্রতি সংখ্যা ১৲ টাকা। বিদেশী সডাক বার্ষিক মূল্য ১৮৲ টাকা, ঐ যাণ্মাষিক ১০৲ টাকা, ঐ প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা : অগ্রিম দেয়। বৎসর বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। তবে গ্রাহকের সুবিধামত অন্য যে-কোন মাস হইতেও করা যায়। টাকা মণিঅর্ডারে অগ্রিম পাঠানোই ভাল। প্রবাসী বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। যথাসময়ে প্রবাসী না পৌঁছিলে ১৫ তারিখের ভিতর স্থানীয় ডাকঘরের রিপোর্ট ও নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক নম্বরসহ পত্র লিখিতে হইবে। পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ তাঁহাদের চাঁদা যে সংখ্যার সহিত নিঃশেষ হইবে, সেই সংখ্যা পাইবার পর ২০ দিনের ভিতর পুনর্ব্বার চাঁদা বা প্রবাসী লইতে অনিচ্ছাজ্ঞাপক পত্র না পাঠাইলে, তাঁহারা পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃতে লইয়া চাঁদা দিতে ইচ্ছুক এই বিশ্বাসে ভিঃ পিঃ প্রেরণ করা হয়। চিঠিপত্র বা টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে অসুবিধা অবশ্যম্ভাবী।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ—১ পৃঃ		১০০৲ টাকা
„	½ বা ১ কলম	৬০৲ „
„	¼ পৃঃ বা ½ কলম	৩৫৲ „
„	⅛ „	২০৲ „
সূচীর পরে ১ পৃঃ		১২৫৲ „
„	নীচে ½ „	৭৫৲ „
„	„ ¼ „	৪৫৲ „
„	„ ⅛ „	৩০৲ „

বিশেষ পৃষ্ঠা

বিজ্ঞাপনের প্রথম পৃঃ	১৫০৲ টাকা
„ শেষ „	১৪০৲ „

অন্যান্য বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার জানিতে হইলে—পত্র লিখুন।

রিডিং ম্যাটারের মধ্যে

১ পৃঃ	১৭০ টাকা
½ „	৯৫৲ „
¼ „	৫০৲ „
¼ কলম	৩০৲ „

(পত্রিকার শেষের দুই ফর্ম্মার মধ্যে যায়)

কভার পেজের বিজ্ঞাপন-হার

১ম কভার (নীচে) (১″×৬″)		১০০৲ টাকা
২য় „		২০০৲ „
৩য় „		১৭৫৲ „
৪র্থ „	এক রঙে	২২৫৲ „
„ „	দুই রঙে	২৭৫৲ „
„ „	তিন রঙে	৩৫০৲ „

সাপ্লিমেণ্ট

(বিজ্ঞাপনদাতা কর্ত্তৃক সরবরাহ করিতে হইবে)

৮ পৃঃ (৪ স্লিপ)	৪০০৲ টাকা
৪ „ (২ „)	২৫০৲ „
২ „ (১ „)	১৫০৲ „

এজেন্সি এবং চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের রেটের জন্য এবং অন্যান্য বিষয় ও বিশদ ভাবে বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কিছু জানিতে হইলে দয়া করিয়া পত্র লিখুন।

সূচীপত্র—ফাল্গুন, ১৩৭১

সূচীপত্র—ফাল্গুন, ১৩৭১

সূচীপত্র—ফাল্গুন, ১৩৭১

—রঙীন চিত্র—

—মা—

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গের হস্তচালিত তাঁতের রকমারি শিল্পসম্ভার পাবেন নীচেকার যে কোন বিক্রয় কেন্দ্রে

গবর্ণমেণ্ট সেলস্ এম্পোরিয়াম ঃ

৭।১, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১২৮।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৫৯।১।৩, রাসবিহারী এ্যাভেনিউ, কলিকাতা

প্রবাসী

৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য ঃ—

ভারত ও পাকিস্তানে সডাক বার্ষিক মূল্য ১২৲, ঐ ষাণ্মাসিক ৬৲, ঐ প্রতি সংখ্যা ১৲ টাকা। বিদেশে সডাক বার্ষিক মূল্য ১৮৲ টাকা, ঐ ষাণ্মাসিক ১০৲ টাকা, ঐ প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা ঃ অগ্রিম দেয়। বৎসর বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। তবে গ্রাহকের সুবিধামত অন্য যে-কোন মাস হইতেও করা যায়। টাকা মণিঅর্ডারে অগ্রিম পাঠানোই ভাল। প্রবাসী বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। যথাসময়ে প্রবাসী না পৌঁছিলে ১৫ তারিখের ভিতর স্থানীয় ডাকঘরের রিপোর্ট ও নির্দিষ্ট গ্রাহক নম্বরসহ পত্র লিখিতে হইবে। পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ তাঁহাদের চাঁদা যে সংখ্যার সহিত নিঃশেষ হইবে, সেই সংখ্যা পাইবার পর ১০ দিনের ভিতর পুনর্ব্বার চাঁদা বা প্রবাসী লইতে অনিচ্ছাজ্ঞাপক পত্র না পাঠাইলে, তাঁহারা পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃতে লইয়া চাঁদা দিতে ইচ্ছুক এই বিশ্বাসে ভিঃ পিঃ প্রেরণ করা হয়। চিঠিপত্র বা টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে অসুবিধা অবশ্যম্ভাবী।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ—১ পৃঃ	১০০৲ টাকা	
,,	½ বা ১ কলম	[illegible] ,,
,,	¼ পৃঃ বা ½ কলম	৩৫৲ ,,
,,	⅛ ,,	২০৲ ,,
পূচার পরে ১ পৃঃ		১২৫৲ ,,
,, নীচে ½ ,,		৭৫৲ ,,
,, ,, ¼ ,,		৪৫৲ ,,
,, ,, ⅛ ,,		৩০৲ ,,

রিডিং ম্যাটারের মধ্যে

১ পৃঃ	১৮০ টাকা
½ ,,	৯৫৲ ,,
¼ ,,	৫০৲ ,,
½ কলম	৩০৲ ,,

(পত্রিকার শেষের দুই ফর্ম্মার মধ্যে যায়)

কভার পেজের বিজ্ঞাপন-হার

১ম কভার (নীচে) (১"×৬")		১০০৲ টাকা
,, ,,		[illegible] ,,
৩য় ,,		১৭৫৲ ,,
৪র্থ ,,	এক রঙ্গে	২২৫৲ ,,
,,	দুই রঙ্গে	২৭৫৲ ,,
,, ,,	তিন রঙ্গে	৩৫০৲ ,,

বিশেষ পৃষ্ঠা

বিজ্ঞাপনের প্রথম পৃঃ	১৫০৲ টাকা
,, শেষ ,,	১৪০৲ ,,

অন্যান্য বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার জানিতে হইলে—পত্র লিখুন।

সাপ্লিমেণ্ট

(বিজ্ঞাপনদাতা কর্ত্তৃক সরবরাহ করিতে হইবে)

৮ পৃঃ (৪ স্লিপ)	৪০০৲ টাকা
৪ ,, (২ ,,)	২৫০৲ ,,
২ ,, (১ ,,)	১৫০৲ ,,

এজেন্সি এবং চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের রেটের জন্য এবং
অন্যান্য বিষয় ও বিশদ ভাবে বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কিছু জানিতে হইলে দয়া করিয়া পত্র লিখুন

THE MODERN REVIEW

—Advertisement Rates—

ORDINARY POSITION

	Rs. P.
Full Page	150.00
Half-page or one column	80.00
Quarter page or half-column	50.00
One-eighth page	30.00
One-eighth column	20.00
Page next to and or opposite contents	180.00
Ditto half-page	100.00
Ditto quarter-page	60.00
Ditto one-eighth page	40.00
Ditto one-eighth cloumn	30.00

SPECIAL POSITIONS

Full Page facing second page of the cover	200.00
„ Page facing third page of the cover	190.00
„ Page facing last page of the reading matter	195.00
„ Page facing back of the Frontispiece	210.00
Ditto half-page	110.00

POSITION WITHIN READING MATTER

Full Page	220.00
Half-page	120.00
Quarter page	70.00
„ col.	50.00

Space within reading matter available only at the end pages of the Magazine

COVER PAGES

Second page of the cover	220.00
Third page of the cover	200.00
Fourth page of the (*One-colour*)	250.00
(*Bi-colour*)	300.00
(*Tri-colour*)	350.00

SUPPLEMENT size 8½" × 6" (to be printed and supplied by the advertiser)

8 pages (or 4 slips) .	450.00
4 pages (or 2 slips) ..	300.00
2 pages (or 1 slip) ..	225.00

MECHANICAL DETAILS, Etc.

Type area of a full page	8" × 6"
.. half page	4" × 5"
Number of columns to a page	2
Length of a column	8"
Breadth of a column	3"
Type area of half-column	4" × 3"
„ „ .. quarter-column	2" × 3"

Only Mounted Stereos & coarse screen blocks (65 screen) are accepted.

Subscription Rates 1 year Rs. 15.00. Half yearly Rs. 8.00

Single copy Rs. 1.25P. including postage.

Prabasi Press Private Limited

77/2/1 DHARAMTALA STREET,
CALCUTTA-13.

সূচীপত্র—চৈত্র, ১৩৭১

সুচীপত্র—চৈত্র, ১৩৭১

সূচীপত্র—চৈত্র, ১৩৭১

অসুর তৃণাবর্ত্ত দমন

প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রধানমন্ত্রী—ঘরের বাইরে ও ঘরে ফিরে

কাইরোতে জোট-নিরপেক্ষ জাতিবর্গের ৪৭টি জাতির সদস্য ও রাষ্ট্রপ্রধানদিগের সম্মেলন শেষ হইবার পর প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই সম্মেলনে ৫৮টি আফ্রিকীয় এশিয়াবাসী ইউরোপীয় ও আমেরিকা মহাদেশস্থ জাতি সম্মিলিত ভাবে বিশ্বজগতের রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক অবস্থার পর্যালোচনা করিয়া নিজ নিজ ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ভবিষ্যৎদিনের কর্তব্য ও কার্য্যপন্থা নিৰ্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতের দিক্ হইতে দুইজন প্রধান, যথাক্রমে আমাদের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং আলোচনা-ভাষণ ইত্যাদি দ্বারা সক্রিয়ভাবে সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। একমাত্র কঙ্গো সাধারণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী চম্বেকে এই সম্মেলনে যোগ দিতে দেওয়া হয় নাই, নহিলে অন্য সকল শক্তিজোট বহির্ভূত জাতিকেই আমন্ত্রণ দেওয়া হইয়াছিল এবং প্রত্যেকের প্রতিনিধিই কার্য্যক্রমে ইচ্ছামত অংশগ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে আরব যুক্তরাষ্ট্রের (মিশর) প্রেসিডেণ্ট নাসের, যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান মার্শাল টিটো, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ, ঘানার রাষ্ট্রপ্রধান আংক্রুমা, সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক, ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসী, কাম্বোদিয়ার রাজপুত্র নোরোদম্ সিহানুক প্রমুখ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ভূমিকাগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সম্মেলনে ফলাফল কি হইল এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীই বা কোন্ কাজে সাফল্যলাভ করিয়া আসিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন দেশের মুখপাত্রগণ বিভিন্ন ভাবে দিয়াছেন—অধিকারী-স্বার্থ হিসাবে এবং শক্তিজোটদ্বয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বা নিরপেক্ষতার পরিমাণ-ভেদ হিসাবে। আমাদের দেশের প্রধান সংবাদপত্রগুলিতে যে-সকল "নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত" সংবাদ ও মন্তব্য ছাপা হইয়াছে তাহাতে প্রধানতঃ দেখা যায় দুইটি বস্তু। প্রথমতঃ, ঐ সকল সংবাদদাতার দৃষ্টিকোণের বিরাট পার্থক্য এবং দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের সকলেরই এই জাতীয় সম্মেলনের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণে ও ফলাফল সম্পর্কে সময়সাপেক্ষতার বিচারে অক্ষমতা।

বস্তুতঃ এ জাতীয় সম্মেলনের ফলাফল বুঝা যায় অনেক পরে এবং তাহাও কখনও সকল সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে একপ্রকার হয় না। লীগ অব নেশন্স বা বর্তমান কালের জাতিসঙ্ঘের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, আজ যেখানে সম্পূর্ণ সাফল্য, কালের গতিতে ও কূটনীতির পাকে-চক্রে সেখানে বিপরীত ব্যাপারই ঘটিয়াছে। সুতরাং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ঐ সম্মেলন "সন্তোষজনক" মনে করা কিছু অসমীচীন নয়।

দেশে ফিরিবার পথে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী করাচীতে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর সহিত সাক্ষাৎকার ও ৯০ মিনিটকাল আলোচনা করিয়াছেন। এই সাক্ষাৎকারের একমাত্র ফল হিসাবে বলা হইয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীদ্বয়ের সাক্ষাৎ আলোচনার সময়

অনেকটা আগাইয়া আসিয়াছে। তবে সেই আলোচনার ফলে কি লাভ-লোকসান হইতে পারে সে-সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই।

প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জ্জাতিক বিষয়ে, বিশেষতঃ জগতের সকল বিরোধ-বিপত্তির প্রধান আকরগুলি সম্পর্কে যে প্রকার দ্বিধাহীন ভাষায় সুস্পষ্ট ভাষণ দিয়াছেন তাহা বিদেশী নিন্দুকদেরও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। আণবিক বিস্ফোরণ-শক্তির ব্যবহার বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য, জগতে শান্তি ও মৈত্রী সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁহার পঞ্চনীতির প্রস্তাবনা, এ সকলই ঐ সম্মেলনের আবহাওয়াকে সংযত ও শুদ্ধ করে।

এখন তাঁহার সকল বুদ্ধি-বিচার নিয়োগ করা প্রয়োজন দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংশোধনে। সমস্ত দেশ ও সর্ব্বস্তরের সাধারণ জন এক শঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে আসিয়া পৌছিয়াছে দেশের ব্যবসায়ী ও ব্যাপারিদিগের শতকরা ৯৯ জনের সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপের ফলে। ইহাদের পিছনে রহিয়াছে একদল চোরাই টাকার মালিক, যাহারা সকল ন্যায়নীতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া উদ্দাম অর্থলালসা তৃপ্তির জন্য সমাজবিরোধী কার্য্যপন্থা চালাইয়া সারা দেশকে বিপন্ন করিয়াছে। ইহাদের কঠোর হস্তে দমন ভিন্ন দেশকে রক্ষা করার অন্য উপায় নাই। আমরা চাই দেশে ফিরিয়া প্রধানমন্ত্রী সর্ব্বপ্রথমে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করুন ইহাদের উচ্ছেদ-সাধনের অভিযান। একদিকে জগৎকে জানানো হইবে যে, ভারত নিজে কল্যাণরাষ্ট্র ও সেই কারণে সে চায় বিশ্বমানবের কল্যাণ, অন্যদিকে সমস্ত দেশের জনগণকে এই ঘৃণ্য, হিংস্র নারকীয় ফেরুপালের সম্মুখে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া দেওয়া হইবে, ইহা কি প্রকার রাষ্ট্রনীতি?

দেশ সমাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র বা "গণতন্ত্র", যে আদর্শেই পরিচালিত হউক, দেশের শাসনতন্ত্র যদি সাধারণজনের নিরাপত্তা ও তাহার জীবনপথ বিপদমুক্ত না করিতে পারে তবে সে-দেশের শাসনতন্ত্রের উচ্চতম অধিকারী অক্ষমতা ও অযোগ্যতার দোষে দোষী হইতে বাধ্য। শাস্ত্রীজি বিশ্বমানবের পরিত্রাণে পঞ্চনীতি উচ্চারণ করিয়াছেন, এখন দেশের জনমনুষ্যের পরিত্রাণ-নীতি ঘোষণা করুন।

কৃষি ও শিক্ষায় গলদ

এদেশে শস্যের ফলন ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল-- কয়েক বৎসর আগে পর্য্যন্ত। কারণ অনুসন্ধান অনেক দিন পূর্ব্বেই আরম্ভ হয় এবং সেই সব গবেষণামূলক খোঁজ-খবরের ফলাফলও দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারী পুঁথিপত্রে সঞ্চিত হইয়া চাপা পড়িয়া আছে। নানারূপ তথ্য—যার মধ্যে অনেক কিছুই অবান্তর বা পরস্পরবিরোধী যুক্তি, উপপত্তি বা 'সত্যান্বেষক' মনে হয়—নানা শস্য সম্বন্ধে আহরিত হইয়া পড়িয়া আছে। বিভিন্ন প্রদেশে বহু লোক সরকারী চাকুরিয়া বা সরকারী ক্ষেত-খামার ইত্যাদির কর্ম্মী হিসাবে, এই কাজের জন্য ও অনুরূপ কাজের জন্য, সরকারী কৃষিবিভাগে নিযুক্ত হইয়া, দিনগত পাপক্ষয় মাত্র করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন। সরকারী কৃষি বিভাগের কার্য্যক্রমের মধ্যে লাভের বা সুফল-প্রাপ্তির খাতে এই কর্ম্মচারী ও কর্ম্মীদের যে অর্থাগম হইয়াছে তাহা এবং যে দুই-চার দশ জন অবস্থাপন্ন ও উদ্যমশীল কৃষকর্ম্মে উৎসাহী সজ্জন এই সকল গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লইয়া ও সেই সকলের মধ্যে অসঙ্গতি নিরূপণ করিয়া, তাহার সারমর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদের কয়জনের কৃষিকর্ম্মের উন্নতি, এইমাত্র ধরা যাইতে পারে।

অন্যদিকে, অর্থাৎ লোকসানের দিকে, অনেক কিছুই ছিল এতদিন। এবং সম্প্রতি দেশের অবস্থা অত্যন্ত উৎকণ্ঠাজনক হওয়ার কারণে সরকারী উচ্চ অধিকারিবর্গ সজাগ হওয়ার দরুন বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ কিছুমাত্রায় কর্ম্মতৎপর হওয়ায় দেশের কৃষির এরূপ নৈরাশ্যজনক অবস্থার মূল কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা এতদিনের পর যথাযথ ভাবে করা হইতেছে। এবং দেখা যাইতেছে যে, কৃষির দুরবস্থার মূল কারণ দেশের জমি নয় ও আবহাওয়াও ততটা নয়, যতটা দেশের চাষী-সাধারণের অবস্থা। সার-সেচ ইত্যাদিতে জমি উর্ব্বর হয় ও শস্যের ফলন বাড়ে, একথা জানে না এরূপ মহামূর্খ চাষী এদেশে থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। কিন্তু যথাসময়ে সার ও সেচ পাওয়া এবং রোগশূন্য বীজশস্যের যোগাড়, ইহার কোনটাই এদেশের চাষীসাধারণের মধ্যে, হাজার-করা দুই-তিন জন ছাড়া, কাহারও নিজ আয়ত্তাধীন নয়। সরকারী "ব্যবস্থা"ও এতদিন যে ভাবে চলিয়াছে, বর্ত্তমান তদারকের ফলে দেখা যাইতেছে যে, তাহাকে "অব্যবস্থা" বলাই শ্রেয়। অথচ কৃষি এদেশের জনসাধারণের অন্যতম প্রাণবস্তু-বিশেষ।

সরকারী মুখপাত্রের বক্তৃতায় শোনা যায় এবং সরকার পোষিত পরিসংখ্যান বিভাগের খতিয়ানে দেখা যায় যে,

শস্যের মোট ফলন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে শস্য উৎপাদন অনুপাতে সন্তান উৎপাদন আরও অধিকতর হওয়ায় এই খাদ্যশস্যের ঘাটতি চলিতেছে। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, দুই তথ্যই ঠিক এবং তাহা ঠিক হইলেও দুইটির কোনটিই—শস্য উৎপাদন বা সন্তানের জন্মদান—তৎসংক্রান্ত সরকারী বিভাগদ্বয়ের পক্ষে আত্মতুষ্টি বা সন্তোষজনক নয়। বরঞ্চ সমীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, কৃষিবিভাগে কর্ম্মতৎপর লোক যথাযথ ভাবে উৎসাহ পায় নাই এবং কাজে ফাঁকি বা নামে-মাত্র কাজ করিয়া বিভাগীয় অধিকারীবর্গের তোষামোদ ও তাঁহাদের স্বজন-পোষণে সহায়তা যাহারা করিয়াছে তাহাদেরই দ্রুততর পদোন্নতি হইয়াছে। ফলে বিভাগের কাজ গতানুগতিক ধারা ও খাপছাড়া ভাবেই চলিয়াছে। যেটুকু ফলন বাড়িয়াছে তাহা কাগজে-কলমে, সরকারী বিবরণ প্রস্তাবে যতটা পাওয়া যায় তাহার অনুরূপ মোটেই নয়—অন্ততঃ পক্ষে যে-অনুপাতে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। অবশ্য পরিবার-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল হইলে দেশের খাদ্যসমস্যার কতকটা সমাধান হয়ত হইত। সে বিভাগেও উৎসাহী ও সক্ষম কর্ম্মীর অভাব খুবই অধিক। বিশেষতঃ আত্মনিবেদনকারী ভদ্র মহিলা ও পুরুষের নিতান্তই অভাব জনসংযোগ ও প্রচার বিভাগে।

এই জনসংযোগের অভাবই সকল সরকারী ব্যবস্থার ব্যর্থতার মূল কারণ। চাষীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন না করিলে অভাব বা অক্ষমতা কোথায়, সে কথা বুঝা অসম্ভব, একথা এতদিনে প্রধানমন্ত্রী অতি স্পষ্ট ভাষায় বলার পর কেন্দ্রীয় কৃষিদপ্তরে ক্ষণিকের চাঞ্চল্য মাত্র দেখা দিয়াছিল শোনা যায়। তার পর ধীরে ধীরে সেই পূর্ব্বেকার মত তাচ্ছিল্য, অবহেলা ও কাজে ফাঁকি পুনর্ব্বার চলিবে বোধ হয়। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী ত খাদ্যবস্তুতে মুনাফাবাজী ও মজুতদারীর সমস্যাপূরণে হিমসিম খাইতেছেন, নিজের দপ্তরে—বিশেষ করিয়া কৃষিবিভাগে যে সকল "কাঠের ঘোড়া" ঘর জুড়িয়া বিরাজ করিতেছেন তাঁহাদের সচল করিবার জন্য চাবুক চালাইবার সুযোগ-সুবিধা বা অবসর তাঁহার কোথায়?

তার পর ফাঁকি দেওয়ার আরও সুবিধা হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে অপরূপ "ফাইল চালনা"র ব্যবস্থায়। যদি কেন্দ্রীয় দপ্তরের মন্ত্রী লোকমতের ঠেলায় বিব্রত হইয়া বিভাগীয় অধিকর্তার উপর চাপ দিয়া বসেন কোন কাজে অবহিত হইয়া তাহা দ্রুতভাবে চালিত করার জন্য তবে আরম্ভ হয় বিভাগের এক ঘর হইতে অন্য ঘরে "ফাইল চালন"। এবং তাহা দ্রুত হইলে—অর্থাৎ ফাইল এক ঘর হইতে "দুই পা ফেলিয়া" অন্য ঘরে যাইতে যদি ২৭ দিনের বদলে ১৮ দিন মাত্র লাগে—যদি সমস্ত বিভাগ বিব্রত ও বেচাল হইয়া পড়ে, তবে কোনও এক ছুতা ধরিয়া সেই অনর্থকারী ফাইলে কোনও রাজ্য সরকারের সম্পর্কিত কিছু জুড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা হয়। সে চেষ্টা সফল হইলে কেন্দ্রীয় বিভাগ নিশ্চিন্ত—অন্ততঃ ছয় মাসের মত। এই ত অবস্থা কৃষি বিভাগের!

জলের মত টাকার স্রোত বহিয়া গিয়াছে বাঁধ নির্ম্মাণে ও খাল খননে, কিন্তু অতি সৌভাগ্যবান ভিন্ন চাষী-সাধারণের ক্ষেতে সময়মত জলসেচ হয় না, আবার অনেক ক্ষেত্রে—অর্থাৎ বহু লক্ষ একরে আদৌ জলসেচের ব্যবস্থাই হয় নাই। রাসায়নিক সার প্রস্তুত করিবার জন্য বিরাট অঙ্কের টাকা খরচ হইয়াছে ও সার প্রস্তুত হইতেছেও বেশ কিছু এবং সে জন্য প্রতি বৎসর বিভিন্ন অধিকারী, সময়ে-অসময়ে, বক্তৃতা করিয়া ও পরস্পরে পৃষ্ঠ কণ্ডুয়ন করিয়া আত্মতুষ্টি জাহির করেন। শুধুমাত্র চাষীর পোড়াকপালের গুণে ও অকর্ম্মণ্য ও অলস—এবং কিছু দুর্নীতিপরায়ণ—বিভাগীয় কর্ম্মচারীর গাফিলতির কারণে বহুক্ষেত্রেই সার পৌঁছায় সার দেওয়ার সময় উত্তীর্ণ হইবার পরে!

যাহা হউক এতদিনে কর্তৃপক্ষের টনক নড়িয়াছে কেন্দ্রস্থলে, এবং আমাদের আশা আছে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্য রাজ্য সরকারেরও চেতনা সংক্রামিত হইবে যথাসময়ে—অর্থাৎ দুই-চারি বৎসরের মধ্যে!

এতক্ষণ বলিলাম কৃষকের দগ্ধ অদৃষ্টের কথা। এখন বলি শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর অদৃষ্ট বিড়ম্বনার কথা। অবশ্য আমরা এখানে বলিব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকের কথা। এই ভাবে একই সূত্রে কৃষি ও শিক্ষার প্রসঙ্গ তুলিবার প্রথম কারণ এই যে, আধুনিক জগতে কৃষি ও শিক্ষার মধ্যে গভীর ও প্রগাঢ় সম্পর্ক। দ্বিতীয় কারণ, কৃষকের মত শিক্ষকেরাও চাষী, তবে তাঁহাদের কৃষিক্ষেত্র ছাত্রছাত্রীদের মানসস্থলে। এবং তৃতীয় কারণ, এই দুই শ্রেণীর কর্ষকের ভাগ্য এতদিন দৈবের ও দেবতার কৃপার উপর নির্ভরশীল ছিল—সরকারের উচ্চতম অধিকারীবর্গের বিভ্রান্তির ফলে। এবং এখন আশার সঞ্চার হইতেছে যে, চাষীর মত শিক্ষকেরও কপাল ফিরিয়াছে।

অন্যদিকে আমাদের একথাও বলা প্রয়োজন যে, চাষী ও শিক্ষককে একই প্রসঙ্গে আনিয়া আমরা কাহারও মানহানি করিতে চাহি নাই। অন্য প্রদেশে একথা বলা প্রয়োজন হইত না, কেননা অন্ততঃ দুইটি প্রদেশে আমরা দেখিয়াছি অতি উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান মনের আনন্দে লাঙ্গল চালাইয়া নিজের চাষকে ফলবতী করিতেছেন। এবং আমরা জানি না বাংলার বাহিরে জমি চাষের কাজকে হেয়জ্ঞান আর কোথাও করে কি না। অন্য বহু প্রদেশের লোকে করে না, ইহা আমরা শুনিয়াছি। শুধু বাঙালীর অন্য অনেক কুসংস্কার এবং চিত্তবিভ্রান্তির মত এই চাষকে ও চাষীকে হেয়জ্ঞান তাহার ভবিষ্যতকে আচ্ছন্ন ও নৈরাশ্য-পূর্ণ করিয়াছে। অবশ্য শিক্ষার ক্ষেত্র শুধু সুদূরপ্রসারিত নয়, উহা মানব-সমাজের প্রত্যেক স্তরের উন্নতি ও প্রগতির আকর বলিয়া সভ্য জগতে শিক্ষা ও বিদ্যার্জনকে উচ্চতর স্থান সর্বত্রই দেওয়া হয়। এবং তাহা দেওয়া সমীচীন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

জগতের প্রত্যেকটি সভ্য ও প্রগতিশীল দেশে শিক্ষক ও অধ্যাপকের স্থান সমাজের উচ্চতম স্তরে রক্ষিত আছে দেখা যায়। শিক্ষাগুরুর প্রতি সম্মানদান সকল সভ্য দেশেই অবশ্যকর্তব্য বলিয়া স্বীকৃত। আমাদের দেশের ও জাতির সভ্য জগতে আসন দাবির মূলে যে-সকল যুক্তি আছে তাহাও ঐ শিক্ষাগুরু ও আচার্যদিগের অবদানের উপর নির্ভর করে। বাংলা দেশ এককালে সারা ভারতের গুণী সমাজের শীর্ষে স্থান পাইয়াছিল যাহাদের চেষ্টায় তাঁহাদেরও সকল কীর্তির সকল গরিমার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল সেদিনের শিক্ষকের হস্ত-প্রসাদে। তখনকার দিনেও শিক্ষক ধনী ছিলেন না, যদিও তাঁহার মান ছিল সকল ধনী ও আঢ্যের বহু উর্দ্ধে। এবং ভদ্রজন-মধ্যে তাঁহার আসন ছিল পুরোভাগে।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইবার অল্প কিছুদিন পরে তাঁহার কৈশোর কালের এক শিক্ষক শুনিতে পান যে, তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে 'বিচিত্রা' ভবনের বৈঠকে আলাপ-আলোচনা করেন। শিক্ষকমহাশয় তখন বৃদ্ধ ও অবসরপ্রাপ্ত। এই জগদ্বিখ্যাত কীর্তিমান ছাত্রকে দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় একদিন তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে করিয়া তিনি বিচিত্রার বৈঠকে যান। সেখানে ভীড়ের মধ্যে এক পাশে ও অনেক পিছনে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও নিজের স্থান করিয়া বসেন এবং রবীন্দ্রনাথের আলাপ-আলোচনা শুনিতে থাকেন। সম্মুখের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পংক্তিতে ঠেলিয়া বসার বা রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎভাবে কথা বলার চেষ্টা শিক্ষক মহাশয় করেন নাই এবং উহা যে সম্ভব হইতে পারে ইহা তিনি ভাবিতেও পারেন নাই, কেননা দীর্ঘদিন শিক্ষাদান করিয়া থাকিলেও তিনি সাধারণ শিক্ষক মাত্র এবং রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে উচ্চতম স্থানে প্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রনাথ যখন আলাপ-আলোচনার মধ্যে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন তখন শিক্ষক মহাশয় একটি প্রশ্নের উত্তরের আরও বিশদ ব্যাখ্যা শুনিতে চাহেন এবং কেন চাহেন তাহাও অল্প কথায় বলেন। সভার লোকে আশ্চর্য হইয়া দেখিল যে, রবীন্দ্রনাথ ঘাড় ফিরাইয়া যে-দিক্ হইতে প্রশ্ন আসিতেছিল সেদিকে তাকাইয়া বলিলেন, "গলার স্বর ত চেনা মনে হচ্ছে—কে প্রশ্ন করছেন?"

শিক্ষক মহাশয় কুণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া নিজের নাম বলিবামাত্রই রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে চিনিলেন এবং "মাষ্টার মহাশয়! আপনি অত পিছনে কেন? সামনে এসে বসুন" বলিলেন। সভার লোকে সসম্ভ্রমে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষককে সম্মুখে বসিবার স্থান করিয়া দেয়। সেই ভ্রাতুষ্পুত্র আজও জীবিত এবং তাঁহার কাছে শুনিয়াছি যে, শিক্ষক মহাশয় সভা হইতে ফিরিবার সময় তাঁহাকে প্রথম কথাতেই বলেন, "দেখ্, এত বড়, এ রকম উঁচু মন বলেই আজ বিশ্বজগৎ ওর গুণে মুগ্ধ"—

এ ত সুদূর অতীতের কথা নয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা মাত্র। তারও পরের দিনের কথা, পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা ও দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যায়, যদিও এ দেশের সমাজের ও সংস্কৃতি জ্ঞানের বিকার আরম্ভ হয় প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পরেই। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেই বিকার প্রবল রূপ ধারণ করিয়াছে এই দেশে। বিশেষে বাংলা দেশে এই বিকার বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন করিয়াছে এবং ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষকের দৈন্য ও দারিদ্র্যের চরম অবস্থা, যাহার ফলে শিক্ষকের মানসিক বিভ্রান্তি চরমে উঠিতেছে এবং শিক্ষার মান সারা ভারতে পড়িয়া গিয়াছে

সেই মানসিক বিভ্রান্তির সুযোগ অবশ্য নানা স্থানের

নানা রাষ্ট্রনৈতিক দল লইতেছে। কিন্তু সেই বিভ্রান্তির মূলে যে কঠোর নির্মম সত্য তাহা কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। এবং সেই সত্য হইল দারিদ্র্য, অভাব ও অনটনের জ্বালা, যাহার দহনে সমস্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছারখার হইতেছে—বিশেষতঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ যাহাদের পক্ষে আজিকার দিনে, এই বণিক ও ব্যবসায়ীদিগের নির্দয় ও নির্লজ্জ লুণ্ঠন ও শোষণের মধ্যে, নিজেদের ও নিজের সন্তান-সন্ততির জীবনের মান রক্ষা নিতান্তই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতপক্ষে ভাবে, নিজেকে বঞ্চিত করিয়াও যেখানে ভদ্রস্থ রাখা সম্ভব হয় না, সন্তান-সন্ততিকে শত চেষ্টা সত্ত্বেও যেখানে শিক্ষাদান, ভরণ-পোষণ সম্ভব হয় না, সেই নৈরাশ্যময় পরিস্থিতিতে বিভ্রান্ত হওয়া আশ্চর্য কি অথবা অপরাধই বা কোথায় এবং পবিত্র শিক্ষাব্রতে তাঁহাদের আদর্শচ্যুত হওয়াই বা বিস্ময়কর কেন ?

অথচ এই বিভ্রান্তি, এই আদর্শচ্যুতির বিষময় ফল ভোগ করিতেছে সমগ্র জাতির সন্তানগণ। এবং যদি ইহার মূলে যে অনর্থকারী অপশক্তিযুক্ত কারণগুলি রহিয়াছে তাহা দূর না করিলে সমস্ত দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। কেননা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞানতা এই দুই মহাপাতক হইতে উদ্ধার না হইলে ভারতের কোনও স্থায়ী উন্নতি প্রগতি সম্ভব নয়—যত টাকাই যতগুলি পরিকল্পনায় ঢালা হউক না কেন। এই সহজ কথাটা আমাদের পরিকল্পনা কমিশনের ও মন্ত্রিসভার বিদগ্ধচূড়ামণিগণ বুঝেন না কেন এটা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

রুশ জাতির পুনর্গঠন তখনই সম্ভব হয়, যখন সোভিয়েটের পরিকল্পনাকারিগণ বুঝিলেন জাতিগঠনের প্রথম সূত্র হইল নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও জাতির সমস্ত শিশু ও কিশোরদের শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা। জারদিগের রাজত্বকালে ইউরোপীয় রুশদেশে নিরক্ষরতা আমাদের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনায় ছিল। অন্যদিকে সেখানে নূতন পন্থা আরম্ভ হইবার মুখে, ১৯৩০ সালে, রবীন্দ্রনাথ যাহা দেখেন তাহার বিবরণে (রাশিয়ার চিঠি) বুঝা যায় যে, এই শিশু ও কিশোরদের শিক্ষার উপর সোভিয়েট কতটা গুরুত্ব আরোপ প্রথম হইতেই করিয়াছিল। এবং সেই শিক্ষার উন্নতি এখন জগতের যে-কোন জাতির সমান।

কামাল আতাতুর্ক তুর্কী সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়াইয়া যখন ঐরূপ বীর, ধৈর্য্যশীল ও কঠোর নিয়মানুগ জাতির এইভাবে পতনের কারণ সম্পর্কে চিন্তা করিয়া জাতির পুনর্গঠনের দুইটি সূত্র স্থির করেন, তখন তুর্কী জাতির নিরক্ষরতা ছিল সমকালীন ভারত অপেক্ষাও অধিক এবং জাতি তখন মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বদেশপ্রেম ও দেশের মাটির টান সম্পূর্ণ ভুলিয়াছে। তিনি বুঝিয়াছিলেন জাতি উৎখাত হওয়ার বা করার শ্রেষ্ঠ উপায় তাহাকে স্বদেশপ্রেম ও দেশের মাটির টান হইতে বিচ্যুত করা—যে-কথা বুঝিয়াছিল মস্কোএর স্টালিন এবং বুঝে পিকিং-এর মাও-সে-তুং ও চু-এন-লাই, এবং সেই কারণে ভারতীয় জাতিকে উৎখাত করার জন্য তাহাদের পঞ্চমবাহিনী ঐ উদ্দেশ্যেই কাজ করিয়াছিল ও এখনও করিতেছে। কামাল আতাতুর্ক ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে-দেশের নিরক্ষরতা দূর না হইলে কোনরূপ প্রগতি অসম্ভব। সেই কারণে প্রথম সূত্র অনুযায়ী তিনি জাতির কেন্দ্র ইস্তাম্বুল হইতে সরাইয়া আঙ্কারায় লইয়া তাহার শিকড় মাতৃভূমিতে প্রোথিত করেন এবং তাঁহার আত্মনিবেদিত বীর সেনার যুবজনকে দ্রুত শিক্ষণ কাজে অভ্যস্ত করিয়া সারা দেশে ছড়াইয়া দিয়া যুদ্ধযাত্রার পরিকল্পনায় নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তাঁহাকে আতাতুর্ক বা তুর্কজাতির পিতা বলা হয় এই কারণেই এবং ঐ নাম সার্থক হয় ঐ দুই সূত্রের আবিষ্কারে।

চীনের নবজাগরণের মুখে সুন্-ইয়াট-সেনও ঐ শিক্ষার উপর ঝোঁক সমানেই দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে পন্থার বদল হইলেও শিক্ষার উপর ঝোঁক উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়াছে।

আমাদের জাতির পিতা তাঁহার সময়ে জাতির তৎকালীন সাধ্য অনুযায়ী দ্রুত ও ব্যাপক শিক্ষার পথ খুঁজিয়াছিলেন এবং বুনিয়াদি শিক্ষার আরম্ভ হয় সে কারণে। এখন জাতির সাধ্য-ক্ষমতা অনেক অধিক কিন্তু কাজ চলিয়াছে পুরাণো পথে, ঢিমে তেতালায়, এবং এখন যতটা উন্নতি হইয়াছে তাহাও নষ্ট হইতে চলিয়াছে কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও কার্য্যক্রমে দোষত্রুটির কারণে।

দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষণ-ব্যবস্থার সমস্ত কাঠামোয় ঘুণ ধরিয়া যাইবে যদি ঐ স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে বিভ্রম ও চিত্তবিকার ব্যাপকভাবে ছড়ায়। শিক্ষাব্রতীগণ ব্রতভ্রষ্ট হইলে ছাত্র-ছাত্রীদের কি হয় তাহা ত সারা ভারতে দেখা যাইতেছে। অথচ এই

বিষয়ে দেশের কর্ণধারগণের কোনও চেতনার উন্মেষ আমরা দেখি না এখনও। অন্যদিকে এদেশে যাঁহারা অন্তর্বিচ্ছেদ ও শ্রেণী কলহের পথে জাতিকে পথভ্রষ্ট ও আদর্শচ্যুত করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা মরশুম অনুকূল বুঝিয়া বিভ্রান্তির বীজ সঘনে ছড়াইতেছেন এই অভাগাদের মধ্যে!

কলিকাতায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ত্রিশজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী সপ্তাহব্যাপী অনশন করেন, তাহাতে দেশের লোক ব্যথিত ও দুঃখিত হইয়াছে। এই "অনশন সত্যাগ্রহে"র পিছনে রাষ্ট্রনৈতিক কূটচাল থাকিতে পারে কিন্তু মূল কারণ যাহা, সে-সম্বন্ধে কোনও বিচার বা তর্কের অবকাশ নাই। এবং এ-বিষয়ে—অর্থাৎ ঐ কারণ বা সমস্যার বিষয়ে—সরকারী পক্ষ বা কংগ্রেসী মহল যে কোনও চিন্তা বা যুক্তি-পরামর্শ করিতেছেন বা করিয়াছেন তাহার কোনও নির্দেশ আমরা পাই নাই। অনশন আরম্ভ হইবার পর সংবাদপত্রে দুই-একটি চিত্র ও অল্প সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাড়া যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নীচে উদ্ধৃত হইল।

যুগান্তর দিয়াছিলেন—

কলিকাতা, ৫ঠা অক্টোবর—মাধ্যমিক শিক্ষকদের অনশনের পাঁচ দিন নির্বিঘ্নে শেষ হইয়াছে।

নিঃ বঃ শিক্ষক সমিতির পক্ষে জানান হইয়াছে। নিখিল ভারত মধ্যশিক্ষক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাম-প্রকাশ গুপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও পরিকল্পনা কমিশনের সহিত সংযোগ স্থাপনের পর এ বি টি এ-কে জানাইয়াছেন যে, রাজ্য সরকার অনুরোধ জানাইলে বর্দ্ধিত মহার্ঘ্য ভাতার জন্য পরিকল্পনা লক্ষ্যের উর্দ্ধে যে অর্থ লাগিবে তাহার অর্দ্ধেক বহন করিবেন। কাশীতে ফেডারেশনের একটি জরুরী সভা ডাকা হইয়াছে। ৬ই অক্টোবর রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ দিন রাজ্যের মধ্য-শিক্ষায়তনের কর্ম্মচারীরা একদিনের অনশন উদ্‌যাপন করিবেন।

৪ঠা অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অর্দ্ধেক ভার কেন্দ্রীয় সরকার বহনে প্রস্তুত।

গতকাল সংসদ সদস্যা শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী শিক্ষামন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষকদের বক্তব্য শিক্ষা-মন্ত্রীর নিকট পেশ করেন। প্রায় ৩০ জন মাধ্যমিক শিক্ষক বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে গত ৪ দিন ধরিয়া অনশন করিতেছেন। শ্রীচাগলা সহানুভূতির সহিত পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবিগুলি শোনেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতিবিধান করিতে যে অর্থ ব্যয় হইবে কেন্দ্রীয় সরকার তাহার অর্দ্ধেক ভার বহন করিবেন, শ্রীচাগলা এই মর্ম্মে শ্রীমতী চক্রবর্ত্তীকে আশ্বাস দিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

আগামী ৯ই অক্টোবর হইতে ১২ই অক্টোবর পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের যে বৈঠক হইবে তাহাতে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং চোদ্দ ও তদূর্দ্ধ বয়সের যে-সকল ছাত্রছাত্রী সাধারণ শিক্ষার অনুপযুক্ত হইবে তাহাদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হইবে। উপদেষ্টা বোর্ড সরকারী ও সরকারী অর্থ-সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পর্কেও আলোচনা করিবেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা দিয়াছিলেন:

মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে মাধ্যমিক শিক্ষকদের অনশনের প্রসঙ্গে মঙ্গলবার রাজ্য বিধান পরিষদে অভূতপূর্ব উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। উভয় পক্ষের কয়েকটি উক্তিকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থা চরমে উঠে। জনৈক বিরোধী সদস্য প্রচণ্ড ক্রোধে দুই হাতের আস্তিন গুটাইয়া ট্রেজারী বেঞ্চের দিকে ধাইয়া যান।

দুই পক্ষের কয়েকজন প্রবীণ সদস্যের চেষ্টায় তাঁহাকে নিরস্ত করা সম্ভব হয়। কিন্তু ইহার পরও সভাকক্ষে উত্তেজনার ভাব না কমিলে ডেপুটি চেয়ারম্যান আধঘণ্টার জন্য সভা মুলতুবী রাখেন।

সভার কাজ আবার সুরু হইলে বিরোধী পক্ষের শিক্ষক সদস্যগণ,—শিক্ষকদের দেয় অতিরিক্ত মহার্ঘ্য ভাতা বিদ্যালয়ের কর্ণিক ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের মধ্যে সমহারে বণ্টন করা হইবে, শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এইরূপ নীতিগত প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য বারবার পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ বলেন, নিঃ বঃ শিক্ষক সমিতির নিকট হইতে অনুরূপ দাবি লিখিত-ভাবে পেশ করা হইলে তিনি উহা 'বিবেচনা করিতে পারেন।' ইহার বেশী একটি কথাও তিনি ঐ দিন বলিতে পারিবেন না। শিক্ষামন্ত্রীর এইরূপ মনোভাব 'সরকারের

হৃদয়হীনতার পরিচয়' এই অভিযোগ করিয়া উহার প্রতিবাদে উপস্থিত সকল বিরোধী সদস্যই ঐ দিনের মত সভাকক্ষ ত্যাগ করিয়া যান।

অবশ্য সভাকক্ষ ত্যাগের ঘটনার আগেই সংশ্লিষ্ট বিরোধী সদস্য এবং সরকার পক্ষে পরিষদের নেতা শিক্ষামন্ত্রী উহার পূর্ব্বে দুইপক্ষ হইতে উচ্চারিত কটূক্তির জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেন। বিরোধী সদস্য তাঁহার উক্তি প্রত্যাহার করিয়া লন।

গোলমালের সূত্রপাত এইভাবে: বিরোধী সদস্য শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য্য (সি) মাধ্যমিক শিক্ষকদের বর্ত্তমান অনশন সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন—'বিভিন্ন বিদ্যালয়ে করণিক ও অন্যান্য কর্ম্মীদের সমহারে মাসিক ৫ টাকা হারে মহার্ঘ্যভাতা দিতে হইলে সরকারের মাত্র সাড়ে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। সরকার কি এতই দেউলিয়া হইয়া গিয়াছেন যে, এই সামান্য টাকাও দিতে পারেন না? শ্রী ভট্টাচার্য্য উত্তেজিত ভাবে শিক্ষামন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি কটু বিশেষণ নিক্ষেপ করেন।

মঙ্গলবার বিকালে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ত্রিশজন শিক্ষক-শিক্ষিকা সাত দিনের অনশন ভঙ্গ করেন। পরে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রীসত্যপ্রিয় রায়ের পৌরোহিত্যে সেখানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও ছাত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কয়েকজন বক্তা শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে বক্তৃতা করেন। দাবি—শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মচারীদের অন্তর্বর্ত্তী ব্যবস্থা হিসাবে সমহারে মহার্ঘ্যভাতা প্রদান—আপাতত দশ টাকা।

শিক্ষক ও ছাত্রদের তরফে অনশন-ব্রতীদের অভিনন্দনও জানান হয়।

প্রথম রিপোর্টে দেখা যাইবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সমস্যাটি রাজ্য সরকারের এলাকায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া খানিকটা দায়মুক্ত হইয়াছেন। রাজ্য সরকার যাহা রাজ্য বিধান পরিষদে বলিয়াছেন তাহাতে ত জল আরও ঘোলাই হইয়াছে। এই ভাবেই চলিতেছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা!

দেশের ও জাতির দেহমনের প্রাণবস্তু কৃষি ও শিক্ষা। এবং এই দুই বিষয়েই চলিতেছে যত ত্রুটি-বিচ্যুতি, যত হাতুড়ের কারবার। দোষ আমাদেরই, নহিলে দেশের কর্ণধার এইরূপ আলগা ও খাপছাড়া ভাবে কাজ চালাইতে পারিতেন কি?

কলিকাতা মহানগর ধ্বংসের পরিকল্পনা

মহানগর বলিতে বুঝায় প্রধানতঃ কর্ম্মকেন্দ্র এবং মনুষ্য-সমাজের প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানী-রপ্তানী ও সরবরাহ ব্যবস্থার স্নায়ুকেন্দ্র। কোন কোনও মহানগর সেই সঙ্গে শিল্পকেন্দ্রও হইয়া থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে ঐরূপ মহানগর শাসনতন্ত্রের কেন্দ্র বা উপকেন্দ্রও হয়। এই প্রত্যেক ধরনের কেন্দ্র প্রাণবন্ত, সবল ও সমৃদ্ধ হয়, যদি সেই সকল কেন্দ্র চালিত করিবার জন্য কর্ম্মীদের খাদ্য বস্ত্র, বাসস্থল এবং যানবাহন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও যথাযথ হয়। উপরন্তু যদি সেই মহানগর শিল্পকেন্দ্র বা বিরাট শিল্পাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ কেন্দ্র হয় তবে সেই শিল্প-সামগ্রীর উপাদান এবং উৎপাদিত শিল্প-সামগ্রীর সরবরাহ আমদানী-রপ্তানী ব্যবস্থাও নিখুঁত হওয়া—অর্থাৎ পরিবহন ব্যবস্থা সহজ ও যথেষ্ট সামর্থ্যযুক্ত হওয়া—নিতান্তই প্রয়োজন। যদি কর্ম্মীদের বাসস্থল কর্ম্মকেন্দ্র হইতে দূরে হয়, তবে কর্ম্মীদের যাতায়াতের যানবাহন ব্যবস্থা এবং কাজে-প্রয়োজনে নগরের এক প্রান্ত হইতে যাতায়াত ব্যবস্থাও পর্য্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। এক কথায় দেহে রক্ত চলাচল ব্যবস্থার মত মহানগরের যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা এবং শিল্প-বাণিজ্য সামগ্রীর পরিবহন ব্যবস্থা বাধামুক্ত ও পূর্ণরূপে সক্রিয় হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। রক্ত চলাচলের বাধ-বিঘ্ন দ্রুত উপশম না হইলে মানুষ যেমন মরে, মহানগরের পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থা অচল বা অক্ষম হইলে মহানগরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যদি-না প্রতিকার দ্রুত এবং যথাযথ হয়।

কলিকাতা মহানগর একাধারে বিরাট কর্ম্মকেন্দ্র, শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র ও ভারতের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র এবং প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্র। কলিকাতা বন্দর হইতে আজও বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জনের জন্য বৃহত্তম পরিমাণে ভারতীয় পণ্য রপ্তানী হয়। উপরন্তু উত্তর প্রদেশ, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের এক অংশ বহু বিষয়ে কলিকাতা হইতে বিরাট পরিমাণে প্রেরিত অতি-প্রয়োজনীয় বস্তুর উপরে একান্তই নির্ভরশীল। আবার ঐ সকল অঞ্চলের পণ্যবস্তুর বহির্জগতে নিষ্ক্রমণের একমাত্র পথ এই কলিকাতা।

অথচ এই কলিকাতা মহানগরকে ধ্বংস করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেন বদ্ধপরিকর। কলিকাতাবাসীদের—বিশেষে কলিকাতাবাসী বাঙালীদের লুণ্ঠনে ও প্রতারণে যেমন অবাঙালী ব্যবসায়ী ও তাহাদের ঘৃণ্য অনুচর-স্থানীয়

বাঙালী-পুঙ্গবদের উৎসাহ, তেমনি কলিকাতা বন্দর ও কলিকাতার পরিবহন ব্যবস্থা ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া কলিকাতা মহানগরকে মহাশ্মশানে পরিণত করার আগ্রহ আমরা দেখি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-উপমন্ত্রী ও তাঁহাদের "নোকরশাহী" অধিকারী-বর্গের। আমরা বাঙালীরা আজ নির্জীব ও নিষ্প্রাণ হইয়া গিয়াছি তাই এইরূপ প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন শত্রুতা এবং অপকার চেষ্টার প্রতিকারে কোনও সক্রিয় ও সক্ষম প্রতিকার চেষ্টা আমাদের দ্বারা হয় না। আমাদের—বিশেষ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী সমাজের সন্তানদের—এখন ছিন্নমস্তার অবস্থা!

কলিকাতা বন্দর এবং শিল্পাঞ্চল ও এই মহানগরের জল-সরবরাহ ব্যবস্থা দিনে দিনে দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে, একথা সারা জগত জানে. এমন কি নয়া দিল্লীর প্রভুরাও জানেন, এবং অচিরে ইহার প্রতিকার না করিলে কলিকাতা মহানগর ধ্বংস হইয়া যাইবে ইহাও সর্বজনবিদিত। প্রতিকারের শ্রেষ্ঠ উপায় যে ফরাক্কায় বাঁধ দিয়া গঙ্গার বিশাল প্রবাহের এক অংশ এদিকে ফিরাইয়া আনা, একথা নয়া দিল্লীকে জানানো হয় ১৯৪৯-৫০ সনে। তারপর প্রথমে বিদেশী বিশেষজ্ঞদিগের মত সংগ্রহ এবং তাঁহাদের মত ফরাক্কা বাধের অনুকূল হওয়ায় স্বদেশী অজ্ঞ-বিজ্ঞ, গণ্য-মান্য-জঘন্য ইত্যাদির নানা ওজর-আপত্তি চালাইয়া, নানা টালবাহানার শেষে নয়া দিল্লী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পকে মঞ্জুরী দিলেন, উহা প্রস্তাবিত হওয়ার বারো বৎসর পরে। তবে যে ভাবে দিলেন তাহাতে ১৯৭০ সনের পূর্বে উহা যাহাতে চালু না হয় তাহার ব্যবস্থাও করিলেন। ভাবিয়া দেখুন ২০ বৎসর লাগিবে একটা প্রকল্পে, যাহা ভাক্রা-নাঙ্গালের সঙ্গে তুলনীয়ই নয়, অথচ সে-সব প্রস্তাবিত, মঞ্জুরীপ্রাপ্তও সমাপ্ত হইয়া গেল ১০ বৎসরের মধ্যে। এবং এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, এখনও এখানে "না আঁচাইলে বিশ্বাস নাই"।

তারপর আসে কলিকাতার আভ্যন্তরীণ ও উপকণ্ঠের পরিবহন সমস্যার কথা। নানা বিদেশী বিশেষজ্ঞ আসিল-গেল এবং নানাপ্রকার গবেষণা, সমীক্ষণ ইত্যাদিও হইল। দেখা গেল সার্কুলার রেল বর্তমান কালের ও অবস্থার পক্ষে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। ডাক্তার রায় সক্রিয় ভাবে চেষ্টা করিয়া উহা নয়া দিল্লীর প্রভুদের বিবেচনার জন্য রাখিলেন, প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্বে। নিম্নস্থ সংবাদ পড়িলে পাঠক বুঝিবেন সেই প্রকল্পের অবস্থা। সংবাদ দিয়াছেন 'আনন্দবাজার'—

"রেলমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল মঙ্গলবার ৬ই অক্টোবর কলিকাতায় এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে জানান যে, কলিকাতার জন্য প্রস্তাবিত সার্কুলার রেল প্রকল্পটি তাঁহার মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন আছে।

কলিকাতা মহানগর পরিকল্পনা সংস্থা (সি এম পি ও) কলিকাতার যানবাহন সমস্যা এবং ব্যয়-অনুপাতে উপকারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পটি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তৈয়ার করিতেছেন। রিপোর্টটি পাওয়া গেলে বিষয়টির প্রতি আরও মনোযোগ দেওয়া হইবে বলিয়া শ্রীপাতিল জানান।

শ্রীপাতিল স্বীকার করেন যে, আগের দিন ভারত বণিক সভায় তিনি বলিয়াছিলেন: প্রকল্পটি সম্পর্কে উদ্যোগ ও দায়িত্ব কলিকাতা পৌর সংস্থা এবং রাজ্য সরকারের লওয়া উচিত। তবে এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, প্রকল্পটি রূপায়ণের ব্যাপারে রেল-মন্ত্রণালয় সহায়তা দিতে পারেন।

রাজ্য পরিবহণ মন্ত্রী শ্রীশৈল মুখোপাধ্যায় মঙ্গলবার রেল-মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি প্রকল্পটির খুঁটিনাটি বিষয়-গুলি সম্পর্কে শ্রীপাতিলকে অবহিত করেন এবং বলেন যে, এটি চতুর্থ যোজনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরী দরকার।

শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন যে, এ মাসের শেষ দিকে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে যোগ দিতে তিনি যখন দিল্লী যাইবেন তখন বিষয়টি লইয়া রেলমন্ত্রীর সঙ্গে আরও কথাবার্তা বলিবেন।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, গত ১৯শে সেপ্টেম্বর রাইটার্স বিল্ডিংস এ একটি বৈঠক ডাকা হইয়াছিল। উহাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রেল ও কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্স-এর প্রতিনিধিরা যোগ দেন। শেষোক্ত দুই সংস্থা প্রকল্পটি সম্পর্কে যেসব আপত্তি তুলিয়াছেন সেগুলি বিবেচনার জন্যই ঐ বৈঠক ডাকা হয়।

বৈঠকে ঠিক হয়, কারিগরি-বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রেলের পক্ষ হইতে প্রকল্পটির ইঞ্জিনীয়ারিং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং চিৎপুর ইয়ার্ড এড়াইয়া বিকল্প ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য রেল-মন্ত্রণালয়কে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিতে বলা হইবে।

প্রকল্পটি সম্পর্কে 'সি-এম-পি-ও'-কে একটি রিপোর্ট তৈয়ারী ও পেশের নির্দেশও ঐ সম্মেলনেই দেওয়া হয়।"

কলিকাতা মহানগরে অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ও কলিকাতায় আদায়ীকৃত শুল্ক-ট্যাক্স ইত্যাদিতে সারা ভারতের রুধির প্রবাহ বহিতেছে। অথচ এইরূপ কাজ করা উচিত "কলিকাতা পৌর সংস্থার ও রাজ্য সরকারের"। একদিকে অবিবেচনা ও অদূরদর্শিতা, অন্যদিকে প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ!

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকলা

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

নমস্য শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ও তাঁর অঙ্কিত ছবির সহিত একদিন ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই কারণে অনেক পুরাণো কথা মনে পড়ছে। পুরাণো হলেও তাদের আত্মসাৎ করার উপায় নেই, কারণ গোপন ভাণ্ডারে অনেক জাতীয় সম্পদের খবর আছে।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী আগের কথা, তখন গুরু অবনীন্দ্রনাথের যুগ, কৃষ্টি সাধনের নবচেতনায় মার্জিত মহলে ছবি বোঝার হুজুগ পড়ে গিয়েছে এবং না-বোঝার তাড়ায় ছবি কেনাও ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সুরু হয়েছে। সস্তায় বাবুগিরির মত ক্রেতার দল, প্রদর্শনীর তালিকায় কমদামী ছবির নম্বর খুঁজছেন, আমার মত আনাড়ির আঁকা ছবিও হুজুগের হট্টগোলে বিকিয়ে যাচ্ছে। বিকিকিনির বাজারে দৈবাৎ উদীয়মান শিল্পীর সহিত ক্রেতার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়ে গেলে, শিল্পীর পিঠে বেধড়ক চাপড় মেরে জানিয়ে দিচ্ছেন, 'আমার মত একজন ক্রেতা পেলে ; তোমার ভাগ্যি ভাল! আমার নামটা মনে রেখ, ভবিষ্যতে সার্টিফিকেট-দাতা হিসাবে কাজে আসবে।' এই জাতীয় কৃপা এখন আমরা ভোগ করছি। কৃপার বিনিময়ে কৃতজ্ঞতার বোঝা বহনেও অভ্যস্ত হ'তে হয়েছে, অন্যথায় ক্ষুধার তাড়না ডাষ্টবিনের দিকে ছোটায়। উচ্ছিষ্ট অন্নের ডাক, বুভুক্ষু কুকুর-বেড়াল ও মানুষকে এক পংক্তিতে বসিয়ে ছাড়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, পূতিগন্ধের মাঝেও রুচির আভিজাত্য সজাগ। পচাকে নিয়েই ভালমন্দের বিচার চলে।

শিল্পীর অদৃষ্ট মেনে নিয়েই আমার বক্তব্যে নামি। গুরু অবনীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বা তাঁর প্রভাবে যাঁরা আসল গুণগ্রাহীর কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন, তাঁদের নাম ও কাজের দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হ'লে গগনেন্দ্রনাথের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রভাবের কথা উল্লেখ করতে হ'ল কারণ মৌলিকতার লাঠিবাজি, intellectual দাঙ্গায় অধুনা এমনই ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, খাঁটি নকলও original ব'লে চ'লে যাচ্ছে। নির্বিচারে originalityর ওপর দাবি সঙ্গত ব'লে মনে করি না, কারণ পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর প্রতিক্রিয়া, অনুকরণশীল মানুষের চিন্তাধারা, রুচি, এমন কি ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের উপরও ছাপ দিয়ে যায়। অসাধারণ বা genius ব্যতীত এই প্রত্যাশার ব্যতিক্রম নেই। প্রভাবের প্রতিপত্তি কড়া পাহারায় নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও যাঁরা আপন বৈশিষ্ট্যের সত্ত্বাকে স্বীকৃতি দিতে পেরেছেন, মোহান্ধের মত অনুসরণ বা অনুকরণের আকর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা করেছেন, তাঁদের মধ্যে গগনেন্দ্রনাথ একজন বিশিষ্ট কর্ণধার। সংক্ষেপে গুরু অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কন-পদ্ধতি বা রূপ-কল্পনার আদর্শের সহিত গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ছবির কোন মিল ছিল না, যদিও দুই ভাই একই জায়গায় ব'সে ছবি আঁকতেন, এক সঙ্গে একই পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন। সুতরাং বিরাট শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের অবদানকে স্বতন্ত্র স্থান দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

গোড়ার দিকে গগনেন্দ্রনাথের আঁকা জল রংএর ছবিতে প্রাকৃতিক দৃশ্যই প্রাধান্য পেয়েছিল। পরে, Cubism তাঁকে পেয়ে বসল। তখনকার আবহাওয়ায় তিনি হলেন Modern। যে দেশ থেকে নতুন ধারার আমদানী, সেখানে এই জাতীয় ism মার্কা ছবির পরিকল্পনা ছিল জ্যামিতিক ফরমায় আবদ্ধ, যা abstraction-এর ছোঁয়া লাগায় আমার মত অনেকের কাছে আজও অবোধ্য হয়ে আছে।

গোলক-ধাঁধার প্যাঁচ জড়ান ছবির, শূন্যগামী উদ্দেশ্যকে, সুস্থ মনে বোঝা দুঃসাধ্য কর্ম বলেই প্রশ্ন ওঠে, ছবিতে শিল্পীর ভাব-অভিব্যক্তি যেখানে রূপহীন, সেখানে যা নেই তারই অস্তিত্ব ঘোষণা এবং শূন্যের জবরদস্তি গুণ ব্যাখ্যার জন্য কলমের ডগায় বন্দুকের সঙ্গীন চড়ালে মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ থাকে না কি? ছবিতে সুন্দরের আদর্শ সম্বন্ধে নানা মতবাদ থাকা স্বাভাবিক। মানুষ এগিয়ে চলেছে নূতনকে জানার জন্য, এই চলার প্রেরণা আসে ধীর চিন্তার বিধান থেকে, বিশেষ বক্তব্য ও উদ্দেশ্যকে সার্থক করার জন্য। কিন্তু Abstract-পন্থীর মতবাদে

ছবিকে উদ্দেশ্যের সর্তে বাঁধা নিয়ম নয়, ছবির রূপ ও বাস্তবের সহিত সাদৃশ্য খোঁজে না—বক্তব্যের নথিতেও যা থাকে তা নিজের কথা। নিজে শোনারই রেকর্ড। সুতরাং স্বীকার করতে হয় এই প্রথায় ছবি আঁকার চেষ্টায় রেখার জড়াজড়ি ও রং-এর তাল পাকিয়ে একটা হট্টগোল বাধাতে পারলেই শিল্পী আত্মতুষ্টির বিশেষ সুযোগ পায়। অবোধ্য তালগোল পাকানো রূপকেই originalityর বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। রেখার জড়াজড়িতে দৈবাৎ বাস্তবের সাদৃশ্য এসে গেলে, ছবির একটা নামকরণও হয়ে থাকে—কিন্তু নামের মালিক কোথায়, তা শিল্পী জানে না। রেখার দ্বারা ধর-পাকড়ের কারণ খুঁজলে শিল্পী পরম নির্লিপ্তের মত বলে—কারণ আবার কি? আমি ছবি আঁকি সেটা আমার ইচ্ছে, ছবিতে যা-খুসী তাই করাটাও আমার ইচ্ছে, দর্শকের দল না বুঝলে ক্ষতি তাদেরই। ছবিতে যা আছে তা আমি নিজেই বুঝি না। নিজের প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধা একমাত্র বাতুলের পক্ষেই সম্ভব। তার বাঁচার ধারায় সবকিছুই নিষ্কাম ও উদ্দেশ্যহীন। সে পথে পথে ঘোরে, কিন্তু চলার উদ্দেশ্য বা গন্তব্যস্থান জানে না, সে কথা বলে কিন্তু কাউকেও শোনাবার প্রয়োজন হয় না, নিজের কথা স্বকর্ণে শুনলেও অর্থকরণ তার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ কথার ধ্বনি কানের মধ্যে গেলেও মস্তিষ্কে পৌছবার উপায় নেই।

আধুনিক প্রগতিশীলতার সমর্থনে এই প্রথায় রূপ-সৃষ্টি যদি আর্টের চরম কাম্য হয়, দলভারীর দাপটে ভিন্ন মতের রুচি ও প্রকাশভঙ্গিকে সম্পূর্ণভাবে সংস্কারিক রীতির আদর্শ থেকে বিচ্যুত না করলে চলে না, তা হ'লে বুঝতে হয়, দলবদ্ধের প্রকোপে শাসনই বিচারের চরম বিধান হয়ে দাঁড়িয়েছে, নির্দোষেরও দণ্ড থেকে পরিত্রাণ নেই।

গগনেন্দ্রনাথের কথায় ফিরে আসি। তিনি প্যাঁচের ঘূর্ণীপাককেই সুন্দর ও সহজবোধ্য করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। ছবির রূপ পরিকল্পনায় বাস্তবের অভিজ্ঞতা যোগ দেওয়ায় রস নিবেদনে হৃদয়ের সাড়া পেতে লাগলাম। জটিলকে সায়েস্তা করার প্রথায় ঐন্দ্রজালিকের কৌশল ছিল। বিস্ময়মুগ্ধ দর্শক ছবির বাহ্যরূপকেই সহজ ব'লে মেনে নিল, কিন্তু যাঁরা ভিতরের খবর রাখেন তাঁরা স্বীকার করবেন যে, সুন্দরের রূপ ধরার কৌশল আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয়, কারণ ইংরাজী ভাষায় তথাকথিত simplicityর আড়ালে যা থাকে, তা আসলে difficult solution of intriguing problems। জটিল সমস্যা সমাধান করতে হ'লে অক্লান্ত পরিশ্রম, দৃঢ় সংকল্প এবং অটুট আত্মবিশ্বাস একান্ত প্রয়োজন। সব কয়টির প্রেরণা মিলিতভাবে শিল্পীর উচ্ছ্বাসকে রূপায়িত করার জন্য সহায় না হ'লে রূপ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থক হওয়া সম্ভব নয়। গগনেন্দ্রনাথ জটিলকে জেনেই দুর্গম পথ-চলার পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন এবং যাবতীয় বিঘ্ন এড়িয়ে চলার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করাতেই আজ তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেবার আয়োজন হয়েছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল, নিত্য নব-রুচির আমদানী, সংঘর্ষণের জয়পতাকা উড়িয়েও সত্যের ভিত্তি বা সুন্দরের স্থায়িত্বকে বিধ্বস্ত করতে পারে নি।

এই প্রসঙ্গে সুন্দর ও সত্যের আদর্শ সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, কারণ আদর্শের প্রতিষ্ঠা আসে ব্যক্তিগত বিচার অথবা সংস্কারবদ্ধ চলতি মতের অনুগমন থেকে। ব্যক্তিগত বিচার যতই স্বাধীন চিন্তার দাবি করুক তাতে বাইরের কিছুটা প্রভাব থেকে যায় কিন্তু এই জাতীয় প্রভাবকে সব সময় বশ্যতার অধীনে আত্মোৎসর্গ বলা চলে না, কারণ বাইরে থেকে আমদানী মতের সঙ্গে ব্যক্তিগত মতেরও যোগ থাকে, বাইরের প্রভাবকে যাচাই করেই শক্তিশালী ব্যক্তি নিজের সুবিধা অনুসারে গ্রহণ করে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন দলবৃদ্ধির প্রয়োজন যখন আপোষবিরোধী আদর্শকে উগ্ররূপী করে তোলে তখন ব্যক্তিগত মত অচল হয়ে যায়, সত্যের স্তম্ভকেও টলায়মান ক'রে ছাড়ে।

গগনেন্দ্রনাথ ছিলেন আত্মভোলা সাধক-শিল্পী, বাইরের আলোড়ন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, ভিড়ের মাঝেও সম্পূর্ণ একলা। সত্য ও সুন্দরের উপলব্ধি আসত অন্তর থেকে, রূপ-সৃষ্টির প্রেরণায় থাকত আনন্দের সন্ধান। আনন্দই ছিল তাঁর কাছে পরম সত্য। উৎসবের ভিড়ে দক্ষিণার অনুপাতে পুরোহিত মারফৎ পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন না। কারণ তিনি জানতেন, কেবল সাংস্কারিক অনুষ্ঠান মেনে নির্ভুল মন্ত্রপাঠ দ্বারা একের হয়ে অপরের ভক্তি নিবেদন করানো চলে না। ভক্তি আসে ব্যক্তি বিশেষের অন্তর থেকে, নিরালাতেই তার আদান-প্রদান। একান্তচিত্ততার জন্য যে পরিবেশের প্রায়োজন হয়, তা ভিড়ের হট্টগোলে যোগদান নয়।

এই প্রসঙ্গে উৎসবের ভিড়, দক্ষিণার অনুপাতে পুরোহিত মারফৎ পুণ্য সঞ্চয়ের উল্লেখ করতে হ'ল, কারণ সব কয়টির সহিত প্রদর্শনীর জটলা, ফ্যাসানমত্ত সমালোচক ও নতুন হুজুগের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ক্ষেত্রবিশেষে পুরোহিতের সাহায্য ব্যতীত যেমন পুণ্যের পুঁজি বাড়ে না, সেই রূপ স্বষ্টির সাধনায় ছাড়পত্র পেতে হ'লে সমালোচক-বন্দনা অপরিহার্য। শিল্পীর অস্তিত্ব, ওঠা-নামা সবই নির্ভর করে স্তুতির উপযুক্ত প্রয়োগের ওপর, অন্যথায় পুরোহিতের মুখস্থ-করা মন্ত্রপাঠের মতই বাঁধি বোলের ব্যবহারে সমালোচক বিরূপ হয়ে বসেন। ছাপার অক্ষরে ছবির বিবরণ প্রচার না হ'লে শিল্পীর ভাগ্যে ক্রেতা জোটে না।

মহাশিল্পী গগনেন্দ্রনাথের রূপ-স্বষ্টির আদর্শ এবং টেকনিক (Technique) অর্থাৎ প্রকাশভঙ্গির সূত্র-বিশ্লেষণ এই প্রসঙ্গে অবান্তর নয়, কিন্তু বিশ্লেষণ মানেই বিচার এবং নিরপেক্ষ বিচার। বিচারে বসতে হ'লে বিচারককে উর্দ্ধস্তরের মানুষ হ'তে হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে এইরূপ ধারণা পোষণ করাও আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, সুতরাং নমস্য শিল্পীকে পুনরায় নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য এখনকার মত শেষ করি।

রূপ ও গুণ

রূপের চেয়ে যে গুণ বড়, তাহা লোককে স্বীকার করান শক্ত নয়। কিন্তু রূপটা যদি নিতান্তই নগণ্য হইত, তাহা হইলে জগতে শোভা ও সৌন্দর্য্যের এত প্রাচুর্য্য কেন হইল? "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি জাতানি" সমুদয় স্বষ্টি আনন্দ হইতেই জন্মিয়াছে, তাই স্বষ্টি সুন্দর। বিধাতা সুন্দর; সৌন্দর্য্য তাঁহারই ঘনীভূত আনন্দ। রূপও দেখিতে জানিতে হয়। স্বাস্থ্য রূপ বাড়ায়, আত্মার সৌন্দর্য্য মুখের মধ্যে ফুটিয়া বাহির হয়। কে সুন্দর কে কুৎসিত সে বিষয়ে মানুষে মানুষে খুব মতভেদ দেখিয়াছি। যে নিজেকে কুৎসিত মনে করে এবং অনেকে যাহাকে রূপহীন মনে করে, সেও যে দেখিতে বেশ, এমন কথা একাধিক ব্যক্তির সম্বন্ধে শুনিয়াছি। রূপটা যদি শুধু শরীরের ও বাহিরের জিনিষ হইত, তাহা হইলে একই মানুষের যৌবনের রূপ প্রৌঢ়ত্ব ও বর্দ্ধক্যের রূপের অপেক্ষা অধিক হইত। কিন্তু যৌবনাপগমে রূপ বাড়িয়াছে, এমন প্রসিদ্ধ কোন কোন মানুষের নাম করা খুব সহজ। স্থূলদর্শীর কাছে রূপগুণের বিরোধ আছে, সূক্ষ্মদর্শীর চক্ষে বিরোধ নাই। রূপ দেখিতে হইলে দ্রষ্টার সাত্ত্বিকতা চাই। মহাকবি স্পেন্সর যে বলিয়াছেন, "Soul is form and doth the body make." "আত্মাই রূপ, আত্মা শরীরকে গঠন করে," ইহাতে গভীর সত্য আছে। আমরাই কি দেখি নাই, সুগঠিত মুখ পাপ ও দুষ্প্রবৃত্তির বশে কেমন শ্রীহীন হইয়া যায়, আবার সতত উচ্চচিন্তা ও সাধু-জীবনের প্রভাবে সৌষ্ঠববিহীন মুখেও কেমন অশরীরী সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে?

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১৩২১।

বিশ্বামিত্র

চাণক্য সেন

একটা গোলমেলে ব্যাপারে জড়িয়ে গিয়েছিলেন হরিশংকর ত্রিপাঠি। এ ব্যাপারে জড়িত ছিল একটি রূপসী মুসলমান যুবতী। ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত পৌঁচেছিল। অস্তাচল-গামী ইংরেজ শাসনের গোধূলি অধ্যায়েও বিলাসপুরে এমন একজন উচ্চপদস্থ মুসলমান রাজকর্মচারী ছিলেন, যাঁর হাত থেকে হরিশংকর ত্রিপাঠি রেহাই পান নি। অবশ্য তিনি জানতেন যে, আদালতে তাঁর দোষ বা অপরাধ প্রমাণিত হবে না। তথাপি আদালতে এসব ব্যাপার আসা মানে অসম্মান। রাজনৈতিক প্রতিপত্তির মূলে কুঠারাঘাত। ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন উৎসবের সপ্তাহ খানেক আগে হরিশংকর ত্রিপাঠি সংকল্প করলেন মন্ত্রীসভায় ঢুকতে হবে। ভারতের পরাধীনতার সঙ্গে তাঁর জীবনের কলঙ্কও তা হ'লে যাবে অতীতের অন্ধকারে। স্বাধীনতার অরুণোদয়ে নতুন জীবনে আলোকিত ভারতবর্ষে হরিশংকর ত্রিপাঠি মজদুর ভাইদের অগ্রগতি ও কল্যাণের মহান্ আদর্শে নব উদ্দীপনায়, পূর্ণ উদ্যমে, অপরাজেয় উৎসর্গে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন।

হরিশংকর ত্রিপাঠি জানতেন হাই কমাণ্ডের নির্দেশ মন্ত্রীসভায় যতদূর সম্ভব মজদুর, কৃষাণ ও তপশিলী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতাদের স্থান দিতে হবে। উদয়াচলের কংগ্রেসে মজদুর নেতাদের অগ্রণী হরিশংকর। তাঁকে মন্ত্রীসভায় স্থান দিতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে আগ্রহ দেখাবেন এ বিষয়ে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ।

সন্দেহের সত্যি কোনও কারণ ছিল না। দুর্গাভাই একবার নিস্তেজ আপত্তি করেছিলেন।

"হরিশংকর ত্রিপাঠি আসলে লেবর লীডর নন," বলেছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে। "তাঁর হাত পরিষ্কার নয়।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসেছিলেন: "ত্রিপাঠিজিকে আমি বিলক্ষণ জানি। আপনি যা বলছেন, সত্যি। তবু তাঁকে মন্ত্রীসভায় নিতে হবে।"

"কেন?"

"উদয়াচল কংগ্রেসে একমাত্র হরিশংকর ত্রিপাঠিই মজদুর নেতা ব'লে পরিচিত। তিনি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্যতম নেতা। আন্তর্জাতিক লেবর কনফারেন্সে একবার ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন।"

"তিনি কি মন্ত্রীত্ব চান?"

"হরিশংকর অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। মন্ত্রীত্বের প্রকাশ্য উমিদার তিনি নন। হালে তিনবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। মন্ত্রীসভা গঠন নিয়ে একটি প্রশ্নও করেন নি।"

"তা হ'লে বোধ হয় তিনি চান না।"

"ওটা তাঁর কর্মকৌশল, ষ্ট্র্যাটজি। তিনি নিমন্ত্রণের অপেক্ষায় রয়েছেন। জানেন, তাঁকে আমি ডাকবই।"

"ডাকতেই হবে?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দুর্গাভাইকে একখানি পত্র দেখালেন। দিন চারেক আগে দিল্লী থেকে এসেছে।

এই কথোপকথনের পরের দিন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সাদর আহ্বানে হরিশংকর ত্রিপাঠি তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হলেন।

আধ ঘণ্টা দু'জনে কথাবার্তা হ'ল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের প্রথম মন্ত্রীসভায় হরিশংকর ত্রিপাঠি নাম দিতে রাজী হলেন। দপ্তর নিয়ে প্রথম থেকেই মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেছিলেন, "আপনি উদয়াচলের প্রধান শ্রমিক নেতা। শ্রম-মন্ত্রীত্ব আপনাকে দেব।"

হরিশংকর ত্রিপাঠি বলেছিলেন, "তাতে আমার বিশেষ কিছু শ্রম হবে না। উদয়াচলে শিল্প বলতে যা আছে তা সামান্য। শ্রম-মন্ত্রীর করণীয় কিছু থাকবে না।"

"শিল্প বাড়বে। শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।"

"আপনি আমার কর্মক্ষমতা বেশ ভালই জানেন। আজ প্রায় পঁচিশ বছর আমি শিল্পের সঙ্গে জড়িত। আহমদাবাদে এমন কোনো কারখানা নেই যা আমি সম্যক্ জানি নে। উদয়াচলেও খনিজ শিল্পের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আপনার অজানা নয়। আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতা নিয়ে এ প্রদেশের বিরাট্ অব্যবহৃত খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে বেশ কিছু কাজকর্ম আমি করেছি। যদি আমাকে আপনি শিল্প ও খনিজ সম্পদের দায়িত্ব দেন, উদয়াচলের আর্থিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনে আমি সবটুকু শক্তি বিনিয়োগ করব।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "হরিশংকরের কর্মক্ষমতায় অথবা শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তাঁর

বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু ত্রিপাঠিজি, মন্ত্রীসভা গঠন, দেখতে পাচ্ছি, বড় এক ইমারত তৈরির চেয়ে অনেক কঠিন। ধরুন, আপনি একটি মহল তৈরি করছেন। আপনার লক্ষ্য দু'টি: ব্যবহারিক উপযোগিতা এবং চারুশিল্পের সৌন্দর্য। আপনি দুয়ের সুঠাম সামঞ্জস্য ঘটিয়ে প্ল্যান তৈরি করলেন; সে-প্ল্যান কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পেলে, আপনি তাতে ইঁট-সিমেণ্ট-লোহা-রংএর অবয়ব দিতে লেগে গেলেন। মন্ত্রীসভা নির্মাণে হাত লাগাবার আগে আমারও তেমনি বাসনা ছিল। ত্রিপাঠিজি, আপনি জানেন, আমার এক-আধটু সাহিত্য-প্রবণতা আছে। না, না, বড় কবি আমি নই, আমি তুলসীদাস নই, টাগোর নই, কালিদাস ত নই-ই; তবু, অবিনয় মাপ করবেন, আমার কিছুটা কবি-যশ আছে। মন্ত্রীসভা গঠনের কাজ আমি রাজনৈতিক মনের সঙ্গে খানিকটা শিল্পীমন নিয়েও শুরু করেছিলাম। ভেবেছিলাম, উদয়াচলের মত অনগ্রসর প্রদেশের ভাগ্য-নির্মাণ যখন বিধাতার রহস্যময় খেয়ালে আমার মত অযোগ্যের হাতে এসে পড়ল, তখন, আমার সবটুকু সুবুদ্ধি নিয়োগ ক'রে, আপনাদের মত সুদক্ষ নেতাদের সাহায্যে এমন এক মন্ত্রীসভা গঠন করব যা এ প্রদেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও অগ্রগতি সাধন করতে পারবে। ভেবেছিলাম দল-উপদল গোষ্ঠি-উপগোষ্ঠি মানব না, যেখানে যোগ্যতম ব্যক্তি আছেন, হাতে-পায়ে ধরে বেঁধে আনব; মন্ত্রীসভায় এমন কেউ থাকবেন না যিনি উদয়াচলে স্বক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত নন।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব'লে চললেন, "কিন্তু রাজনীতি এমন কঠিন ব্যাপার, ত্রিপাঠিজি, যে আমার স্বপ্ন বুঝি আর সার্থক হ'ল না। রামায়ণের একটি শ্লোক মনে পড়ছে, সেই কুম্ভকর্ণের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধের বর্ণনা। যে-সকল শরে রামচন্দ্র সপ্তশালভেদ এবং বালিবধ করেছিলেন, কুম্ভকর্ণ তা বেমালুম হজম ক'রে বসলেন। যুদ্ধের একসময় কুম্ভকর্ণ ছিন্নবাহু, ছিন্নপদ হয়ে রামচন্দ্রের দিকে বড়বার ন্যায় মুখব্যাদন ক'রে ধাবমান হলেন। বাল্মিকী তার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "রাহুর্যথা চন্দ্রমিয়ান্তরীক্ষে"—রাহু যেমন আকাশে চন্দ্রের দিকে ধাবিত হয় সেইরূপ। রাজনীতির রাহু আমার স্বপ্ন-চন্দ্রমাকেও তেমনি গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে—আমি ত শ্রীরামচন্দ্র নই, তাকে আটকাবার সাধ্য আমার নেই। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীসভা যা দাঁড়াবে তা অনেকখানি রাজনৈতিক বাস্তব, সামান্য স্বপ্ন। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। দর-কষাকষির যেন আর শেষ নেই। আপনাকে বলতে কি—আপনি ত আমাদের মত দলীয় নেতা-উপনেতা নন, শ্রমিক-আন্দোলনে আপনার নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত—একমাত্র দুর্গাভাই ছাড়া এমন একজন নেতাও উদয়াচলে নেই, যিনি মন্ত্রীসভায় বিনাসর্তে, বিনা দরাদরিতে যোগ দিতে এগিয়ে এসেছেন।"

হরিশংকর ত্রিপাঠি বললেন, "আপনি ভাববেন না আমি দরাদরি করছি।"

"ভাবলে আপনাকে এমন মন খুলে সব বলতাম না, ত্রিপাঠিজি। আমি জানি, আপনি উদয়াচলের কল্যাণ ও উন্নতি ছাড়া আর কিছু কামনা করেন না। শিল্প-দপ্তরের দায়িত্ব আপনাকে দেবার কথা, খোলাখুলি বলছি, আমি ভাবি নি। কিন্তু খনিজ সম্পদের ভার আপনাকে দেব, এ ইচ্ছে আমার ছিল, এখনও আছে। পেরে উঠব কি না জানি নে, খুব একটা ভরসাও রাখি নে এখন। তবু, এটুকু আমার তৃপ্তি যে, শ্রম দপ্তরের দায়িত্ব এমন হাতে দিতে পারব যা অজ্ঞানতা, অনভিজ্ঞতার ভারে পঙ্গু হয়ে থাকবে না। তা ছাড়া, ত্রিপাঠিজি, কংগ্রেসে আমাদের মত ভদ্রলোকদের স্থান আর কতদিন? দেশের অগণিত জনসাধারণ, যারা মেহনত করে মাঠে, কারখানায়, বন্দরে—তারা অদূর ভবিষ্যতে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, সে দায়িত্ব তাদের হয়ে বহন করবেন আপনাদের মত আসল জননেতারা।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কথায় সেদিন হরিশংকর ত্রিপাঠির মন ভিজে গিয়েছিল। এ লোকটির ক্ষমতাই শুধু নেই, বিনয় আছে, রসবোধ আছে, দূরদৃষ্টি আছে—তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দলীয়-উপদলীয় নেতাদের দর-কষাকষির এমন করুণ ছবি ইনি এঁকেছিলেন যে হরিশংকর দপ্তর-দাবিতে জোর দিতে পারেন নি। মন্ত্রীসভার তালিকা প্রচারিত হবার আগের দিন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল তাঁকে একটি সুন্দর পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাতে ছিল মন্ত্রীত্ব গ্রহণে সম্মতি দেবার জন্যে বিনীত ধন্যবাদ, হরিশংকরের নেতৃত্বে উদয়াচলের শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে গভীর আস্থা, এবং শ্রম-দপ্তরের অতিরিক্ত কোনও দায়িত্ব তাঁকে দিতে না পারার জন্যে দুঃখপ্রকাশ। সেই সঙ্গে আশ্বাস যে, ক্যাবিনেটের কয়েকটি সাব-কমিটি গঠন ক'রে বিভিন্ন সরকারী কাজকর্ম ঠিকভাবে পরিচালনার প্রকল্পে ত্রিপাঠিজির সর্বজনস্বীকৃত কর্মক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার পূর্ণ সুযোগ নিতে মুখ্যমন্ত্রী দ্বিধা করবেন না।

সে আজ অনেক বছর আগের কথা। মন্ত্রীসভার সদস্য হয়ে হরিশংকর ত্রিপাঠি বুঝতে পেরেছিলেন শ্রম-মন্ত্রীর করণীয় বড় কিছু নেই, বিশেষত উদয়াচলের মত শিল্পে অনগ্রসর প্রদেশে।

তথাপি শ্রমিকদের জন্যে কিছু কিছু কাজ তিনি করতে পেরেছিলেন। শ্রমিক-মালিকে বিবাদ তিনি বড় একটা ঘটতে দেন নি। শ্রমিকদের দেন নি এমন কিছু দাবি করতে যা মালিকরা মেটাতে পারবেন না, বা চাইবেন না। ছোট-খাট দাবি মালিকদের দিয়ে তিনি গ্রহণ করাতে পেরেছেন। শ্রমিকদের জন্যে রাজকীয় বীমা, কর্মের সময় বেঁধে দেওয়া, ওভার-টাইম—সবেতন ছুটি, চিকিৎসার প্রাথমিক ব্যবস্থা ইত্যাদি কিছু কিছু শ্রমিক-কল্যাণ তিনি সাধন করেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, উদয়াচলে সংঘবদ্ধ শ্রমিকসমাজে বামপন্থী দলগুলিকে তিনি আধিপত্য করতে দেন নি। য়ুনিয়নগুলি সবই জাতীয় ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের কর্তৃত্বাধীন রেখেছেন। বামপন্থী য়ুনিয়ন একটিও মালিকদের স্বীকৃতি পায় নি। শ্রমিক-য়ুনিয়ন থেকে বেছে বেছে একটি একান্ত ব্যক্তিগত অনুচর-দল হরিশংকর ত্রিপাঠি তৈরী করেছিলেন। দুষ্ট লোকেরা তাই তাঁকে উদয়াচলের গুণ্ডা-রাজ বলত। এ অনুচররা হরিশংকর ত্রিপাঠির জন্যে না করতে পারত এমন কিছু নেই। অন্য দলের মিটিং ভেঙ্গে দেওয়া, য়ুনিয়ন নির্বাচনের সময় ভোট সংগ্রহ, বিপক্ষ দলকে সব রকমে নাস্তানাবুদ ইত্যাদি শ্রমিক-সমাজ অন্তর্গত কাজই শুধু নয়, হরিশংকরের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক উচ্চাশার উপযোগী পথ তৈরী করায় যাবতীয় সাহায্যও।

দুর্গাভাই একাধিকবার কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে এ নিয়ে নালিশ জানিয়েছে।

"কোশলজি, আপনার শ্রম-মন্ত্রী কিন্তু বেশ একটি প্রাইভেট আর্মি তৈরি করে নিচ্ছেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেছেন, "তাই ত শুনছি।"

"এর বিপদটা ভেবে দেখেছেন ?"

"বর্তমানে কোনও বিপদ দেখছি না, তবে ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে।"

"আমি আপনার মত নিরুদ্বেগ নই। হরিশংকর যত রাজ্যের গুণ্ডাকে এনে কংগ্রেসের সভ্য বানাচ্ছেন।"

"গুণ্ডারা সভ্য হ'লে ত ভালই।"

"এটা পরিহাসের ব্যাপার নয়, কোশলজি। এতে একদিন কংগ্রেসের এমন বিপদ হবে, এমন বদনাম হবে যে, আপনি ভাবতেও পারছেন না।"

"দুর্গাভাইজি, কংগ্রেস সংবিধানে এমন কিছু নিয়ম-কানুন নেই যাতে আপনি যাদের গুণ্ডা বলছেন তাদের সভ্য হওয়া বন্ধ করা যায়। তা ছাড়া, এ ব্যাপারটা প্রাদেশিক কংগ্রেসের লক্ষণীয়, সরকারের নয়। হরিশংকরের অনুচররা কোনও বেআইনী কাজ করছে ব'লে আমার জানা নেই।"

"আজ করছে না। একদিন করবে।"

"সেদিন আমরাও ঘুমিয়ে থাকব না।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একেবারেই ঘুমিয়ে থাকেন নি। হরিশংকর ত্রিপাঠির যাবতীয় কাজকর্মের খবর তিনি রাখতেন। জানতেন, হরিশংকরের "প্রাইভেট আর্মি"তে প্রায় তিনশত সন্দেহজনক চরিত্র স্থান পেয়েছে। এরা যা করত তা ন্যায়-নীতির দিক্ থেকে আপত্তিজনক হ'লেও আইনের সীমানার বাইরে যেত না। হরিশংকর শ্রমিকদের মধ্যে বিপজ্জনক রাজনীতি বা ভাবধারা দুর্ভাবনীয় ধারায় প্রবেশ করতে দেন নি, তাতে উদয়াচলের মঙ্গলই সাধিত হয়েছে। মালিকরা সরকারের সঙ্গে প্রায় সব বিষয়ের সহযোগিতা ক'রে এসেছে; কোনও বড় হাঙ্গামায় উদয়াচলেও শিল্প-শান্তি ব্যাহত হয় নি। মোট কথা হরিশংকরের সঙ্গে বিবাদের কোনও কারণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেশ ক'বছর খুঁজে পান নি। যে-সব নৈতিক প্রশ্ন দুর্গাভাইএর কাছে বড় মনে হ'ত, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাদের খুব একটা দাম দিতেন না। দুর্গাভাই শ্রদ্ধেয়; কিন্তু তাঁর আদর্শবাদ বাস্তব-রাজনীতির বাজারে পুরাতন টাকার মত খাঁটি রূপা হ'লেও অচল।

মন্ত্রীসভার তৃতীয় বছরে এক দুর্ঘটনা ঘটল যার ফলে হরিশংকর ত্রিপাঠির সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের প্রথম রাজনৈতিক ক্ষমতার মুখোমুখি পরিমাপ হ'ল।

পাকিস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষের অনেক স্থানে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠল। উদয়াচলেও আগুন লাগল।

আগুন লাগল প্রথম কাপড়ের কলে শ্রমিক বস্তিতে। ছড়িয়ে পড়ল বেশ কয়েকটি শহরে। দেখা গেল, এ আগুনের পেছনে রয়েছে হরিশংকর ত্রিপাঠির 'প্রাইভেট আর্মি।' হরিশংকর কয়েকদিনের মধ্যে উদয়াচলের বিপন্ন হিন্দুদের সবচেয়ে সক্রিয় রক্ষকের গৌরবে অভিনন্দিত হলেন।

দুর্গাভাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে বললেন, "হরিশংকর ত্রিপাঠি গুণ্ডাদের দিয়ে মুসলমানদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। হঠাৎ তিনি হিন্দু-নেতা হয়ে উঠেছেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উষ্ণ হয়ে বললেন, "এসব দুষ্ট লোকের প্রচার। মুসলমান নেতারা দাঙ্গা বাধিয়েছে, প্রথম আক্রমণ হয়েছে হিন্দুদের ওপর। হিন্দুরা যদি নিজেদের রক্ষা করতে চায়, তাদের দোষ দিতে হবে ?"

"এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হরিশংকর ত্রিপাঠির ভূমিকা আপনি ভাল ক'রে জানেন ?"

"নিশ্চয় জানি। জানা আমার উচিত।"

"তা হ'লে আমার কিছু বলার নেই। আইন ও শৃঙ্খলা রাখবার দায়িত্ব আপনার।"

হরিশংকর ত্রিপাঠির ভূমিকা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভালই জানতেন।

তিনি শ্রম-মন্ত্রীকে পরামর্শের জন্যে আহ্বান করলেন।

"ত্রিপাঠিজি, আপনার কার্যের প্রশংসা আমি করতে পারি না, নিন্দা করতে চাই নে! এখন, আমাদের প্রধান কর্তব্য হ'ল সাম্প্রদায়িক আগুন নেবানো। যা ঘটেছে তা নিয়ে হৈ-চৈ করা বৃথা।"

"মজদুররা ক্ষেপে গিয়েছে। তারা রক্তের বদলে রক্ত চায়। প্রাণের বদলে প্রাণ।"

"আপনি তাদের শান্ত করুন।"

"আমার অন্যায় দাবি তারা মানবে কেন?"

"ত্রিপাঠিজি, এখন গোলগাল বাৎচিতের সময় নেই। অবস্থা গুরুতর। যদি দাঙ্গা দু'দিনে বন্ধ না হয়, আমাকে সৈন্যবাহিনীর সাহায্য চাইতে হবে। তাতে বিপদ অনেক। সৈন্যরা গুলী চালাবে, লোক মরবে। পুলিসের গুলীতে দশ জনের মৃত্যু হয়েছে, একশ' বারো জন আহত হয়েছে।"

"এতে আমি কি করতে পারি?"

"আপনি এ হাঙ্গামা বন্ধ করতে পারেন।"

"কি করে?"

"আপনার অনুচরদের দিয়ে।"

"তারা ভয়ংকর উত্তেজিত। আমরা সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে মুসলমানদের ভয়ানক প্রশ্রয় দিই। প্রশ্রয় দিয়েছি ব'লেই ভারত আজ দ্বিখণ্ডিত। পাকিস্থান ইচ্ছেমত আমাদের আভ্যন্তরীণ শান্তি ভেঙে দিতে পারে। এ দাঙ্গা কারা বাধিয়েছে আপনার জানা আছে। প্রায় সপ্তাহকাল আপনি তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত কঠোর ব্যবস্থা করেন নি। আর্মড পুলিসের হাতে শান্তিরক্ষার ভার দিতে এত সময় আপনার কেন লাগল আমার বুদ্ধির বাইরে। আপনি দুর্গাভাইজির পরামর্শে অহিংসা দিয়ে হিংসার আগুন নেবাতে চেয়েছিলেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব আপনার। উদয়াচলের লোকেরা আপনাকে 'লোহার মানুষ' ব'লে থাকে। অথচ এ সংকটে আপনি যে দুর্বলতা দেখিয়েছেন তাতে আমরা শুধু দুঃখ পাই নি, অবাক হয়েছি।"

"আপনি আর কে কে?"

"তাঁদের কথা তাঁরা বলবেন। আমি নিজের কথা বলছি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "ত্রিপাঠিজি, লোকে আমাকে শক্ত মানুষ বলে ঠিকই। তারা আমার কতটুকুই বা জানে। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, আপনিও। চোদ্দ পুরুষ আমরা অহিংস—অন্ততঃ মানুষের রক্ত আমরা পাত করি নি। আমি স্বীকার করছি, পুলিসকে গুলী চালাবার হুকুম দিতে আমার মন ওঠে না। এক কালে পুলিসের গুলী দেশের লোক বুক পেতে নিয়েছে, সে ক্ষত এখনও পুরো শুকোয় নি। মুখ্যমন্ত্রী হবার পর ক্ষমতা নামক বস্তুটিকে আমার বড় রহস্যময় মনে হ'ত। ভাবতাম, আমরা স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছি, অথচ দেশ স্বাধীন হবার পরে যে বিরাট্ দায়িত্ব আমাদের কাঁধে চাপবে তার জন্যে তৈরি হই নি। আজ আমার মত এক অতি সাধারণ মানুষের হাতে বিধাতা এ কি অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন? এ ক্ষমতা বহন করবার যোগ্যতা আমার কতটুকু? সৃষ্টি ও বিনাশের ক্ষমতা দিয়ে ঈশ্বর আমাকে এক ছোটখাট বিধাতা বানিয়েছেন! মনে পড়ছে, ত্রিপাঠিজি, প্রথম যেবার আই. জি. এসে প্রয়োজনমত গুলী চালাবার অনুমতি চাইলেন, সেদিনকার কথা। ধাঙড়দের নিয়ে একটা গোলমাল চলছিল। লালা মুনসীরামের ধাঙড় বস্তি—আপনার মনে পড়বে। বস্তি সাফ ক'রে মুনসীরাম ভাড়া দেবার জন্যে ফ্ল্যাট-বাড়ী তৈরি করবে, ধাঙড়রা বস্তি ছাড়বে না। গোলমাল শেষে দাঙ্গায় পরিণত হ'ল। আমাদের মন্ত্রীসভায় যিনি তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, তাঁকে ধাঙড়রা হাঁকিয়ে দিল। দুষ্ট লোকেরা হঠাৎ একদিন কিছু দোকানপাট লুট ক'রে বসল—কেউ কেউ আমায় বলল, তারা আপনারই লোক, যদিও আমি তাদের কথায় কান দিই নি। বিলাসপুরে সেদিন নতুন এক স্কুল উদ্বোধন ছিল, আমায় বক্তৃতা দিতে হ'ল। বেশ জোর দিয়েই বললাম, 'আমরা হিংসা, রক্তপাত, হত্যা চাই নে, আমাদের হাত গান্ধীজীর মন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু শাসনভার যখন জনগণ আমাদের এ হাতে ন্যস্ত করেছেন, শান্তি ও শৃঙ্খলা আমাকে রক্ষা করতেই হবে। দরকার হ'লে যে-হাতে আমরা চরকা কেটেছি, সে হাতে বন্দুক ধরব। যারা অশান্তি, হিংসা, বিদ্বেষ বাধিয়ে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত করতে বদ্ধপরিকর তাদের আমি সতর্ক করছি। দেশের স্বার্থের জন্যে রক্তপাত দরকার হ'লে, আমাদের হাত টলবে না।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মৃদু হেসে ব'লে চললেন, "বাইরের দৃষ্টিতে দেখলে ঘটনাটা কিঞ্চিৎ হাস্যকর। জীবনে আমি কোনওদিন বন্দুক ধরি নি। অথচ এক বিরাট্ বন্দুকধারী পুলিসবাহিনী আমার আজ্ঞাধীন। কোন্টা কোন্ জাতের রাইফেল আমি জানি নে। অথচ আমি 'সেনাপতি'। সেদিন সন্ধ্যাবেলা আই. জি. এসে বলল, স্যর, বন্দুক ছাড়া

অবস্থা আয়ত্তে আনা যাবে না। আপনি আজ যা বলেছেন তা অতি সত্যি কথা। আদেশ দিন, দরকার মত আমরা বন্দুক চালাব। আদেশ না দিয়ে উপায় ছিল না। দাঙ্গাকারীদের হাতে ডজন, কয়েক পুলিস জোর জখম হয়েছিল, একজন এস. আই. মাথা ফেটে হাসপাতালে। আদেশ দিতে হ'ল। কিন্তু সে কি ভীষণ অশান্তি! সারারাত ঘুম হ'ল না। পরের দিন আই. জি.-কে বললাম, গুলী না চালিয়ে পারলে হুকুম দেবেন না। প্রথম প্রথম ফাঁকা আওয়াজ করবেন। গুলী করলেও, দেখবেন, কেউ যেন প্রাণে না মরে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনায় তা হ'ল না। ধাঙড়রা পুলিসদের আক্রমণ করল, পুলিস গুলী চালাল, চারটে ধাঙড়ের মৃত্যু হ'ল। নেপথ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের অবস্থাটা লোকের অগোচরেই রয়ে গেল।"

হরিশংকর ত্রিপাঠি বললেন, "স্বাধীন ভারতে পুলিসের গুলী কম চলছে না, কোশলজি।"

"চলছে। চলবার দরকার হচ্ছে। কিন্তু আমি উদয়াচলে পুলিস ও সৈন্যের রাজত্ব একদিনের জন্যেও চালাতে চাই নে। ভারতবর্ষে উদয়াচলের মান-সম্মান তা হ'লে আর থাকবে না। আমাদের গর্ব করবার বিশেষ কিছু নেই। শিল্পে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে গর্ব করবার আমাদের কিছু নেই। আমাদের গর্ব শুধু শান্তি ও সম্প্রীতিতে। এ বছর দিল্লীতে রাজ্যপালদের বাৎসরিক সভায় উদয়াচলকে দেশে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ প্রদেশ ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্থানে ও ভারতে কতবার ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হ'ল, কিন্তু উদয়াচলে এর আগে এ-আগুন লাগে নি। ত্রিপাঠিজি যদি এ আগুনের পেছনে আপনার অনুচরদের উস্কানি থাকে, আপনি আমার বুকে বড় আঘাত করেছেন, আমার মাথা হেঁট ক'রে দিয়েছেন।"

"এ মিথ্যা প্রচার আপনি বিশ্বাস করেন?"

"না, করি না। তবে জানি, এ দাঙ্গা আপনি বন্ধ করতে পারেন। এবং সে অনুরোধই আপনাকে করছি।"

হরিশংকর ত্রিপাঠি দাঙ্গা বন্ধ করেছিলেন।

তিন মাস পরে মন্ত্রীসভার বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য শ্রীরাম চৌহানের মৃত্যু হ'ল। নতুন মন্ত্রী নিয়োগ ও দপ্তর পুনর্বণ্টনের সুযোগে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হরিশংকর ত্রিপাঠিকে শিল্প-মন্ত্রী করলেন।

দুর্গাভাইকে তিনি বোঝালেন, "শ্রমিকদের ওপর হরিশংকর ত্রিপাঠির প্রভাব কমাতে হবে। তাঁর 'প্রাইভেট আর্মি' ভেঙ্গে দেওয়া দরকার হ'য়ে পড়েছে।"

হরিশংকর যা চেয়েছিলেন, পেলেন। কিন্তু যে-ভাবে চেয়েছিলেন, সে-ভাবে পেলেন না।

ক্রমশঃ

কর্ত্তব্য ও আনন্দের মিলন

কর্ত্তব্যপরায়ণতা ভাল, আমোদের লালসা ভাল নয়। কিন্তু আমোদ ও আনন্দ এক জিনিষ নহে। আনন্দ ব্যতীত কোন কাজ সুন্দররূপে করা যায় না। যে কেবল নিয়মের অনুরোধে অনুশাসনের আনুগত্যে কর্ত্তব্য করে, সে বেশী দিন কর্ত্তব্যপরায়ণ থাকে না। কর্ত্তব্যের মধ্যে যে রস পাইয়াছে, সেই প্রকৃত রূপে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১৩২১

ডাক্তার নীলরতন সরকার

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১৮৬১ সন ভারতের একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, শিক্ষাব্রতী মদনমোহন মালব্য, সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ও দেশনায়ক মতিলাল নেহরু এবং শতায়ু ভারতরত্ন বিশ্বেশ্বরায়া জন্মগ্রহণ করায় বিশ্বসভায় ভারতবর্ষ একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে।

স্বনামধন্য ডাক্তার নীলরতন সরকারও এই বৎসর কলিকাতার দক্ষিণে ন্যাতরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামটি ডায়মণ্ডহারবারের নিকট, ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত। সরকার-বংশ সম্পদে ও সম্মানে একদিন বাংলা দেশে সুপরিচিত ছিল। কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এবং খুলনার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পরিবারবর্গের সহিত ইঁহাদের কৌলিক সম্বন্ধ ছিল।

১৮৬৪ সনে ভীষণ ঝটিকায় ন্যাতরা গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ইহার সঙ্গে বন্যায় কৃষিক্ষেত্রগুলি লবণ-জলে ডুবিয়া গিয়া চাষের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। গ্রাম হইতে প্রায় সকলকেই পলাইতে হয়। সরকার-পরিবারও তখন ন্যাতরায় কিছু উত্তরে নীলরতনের মাতুলালয় জয়নগরে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হন। ঝড় ও বন্যায় যে আর্থিক ক্ষতি হইল, সে ক্ষতি আর তাঁহারা পূরণ করিতে পারিলেন না। দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। শুনা যায় ছোটবেলায় নীলরতনদের গায়ে দেবার জামা ছিল না। একখানি মাত্র চাদর ছিল, প্রয়োজনমত তাঁহারা কয় ভাই সেই চাদরখানি গায়ে দিয়া বাড়ীর বাহির হইতেন।

নীলরতনের পিতা নন্দদুলাল সরকার মহাশয়ের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। তিনি আপনভোলা মানুষ ছিলেন। সংসারের আর্থিক কষ্ট নিবারণের সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। নীলরতনের মাতা থাকমণি বিশেষ বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি নিজেকে সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া অশেষ কৃচ্ছ্রসাধনে এই বৃহৎ পরিবার-পালনের সকল ভার মাথা পাতিয়া লইলেন। অভাব-অনটনের সকল জ্বালা সহ্য করিয়া অল্প দিনেই তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িল। কিছুদিন রোগ-ভোগ করিয়া ১৮৭৫ সনে প্রায় বিনা চিকিৎসায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। নীলরতনের বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর মাত্র। কোমলহৃদয়া মাতা নীলরতনকে প্রাণাধিক ভালবাসিতেন। এইরূপ অসহায় অবস্থায় ও বিনা চিকিৎসায় মায়ের অকাল-মৃত্যুতে তাঁহার কিশোর মনে নিদারুণ আঘাত লাগে। চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিয়া দেশের সেবা করিবার শুভ সংকল্প সেই সময়েই নীলরতনের মনে উদিত হয়।

বাল্যকাল হইতেই নীলরতনের যন্ত্রবিদ্যার প্রতি বিশেষ আসক্তি ছিল। ছোটখাট জিনিষ সামান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে তিনি বাড়ীতেই প্রস্তুত করিতেন। আত্মীয়-স্বজনেরা ভাবিত নীলরতন বড় হইয়া একজন দক্ষ "ইঞ্জিনীয়ার" হইবে। তাঁহার নিজেরও সেইরূপ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বিধাতার বিধি অন্যরূপ। চিকিৎসার অভাবে স্নেহময়ী মাতার অকালমৃত্যু তঁাহাকে অন্য পথে লইয়া গেল। মানুষের হাতে-গড়া কল-কারখানার ডাক্তার না হইয়া শ্রীভগবানের সৃষ্ট দেহ-যন্ত্রের চিকিৎসক হইলেন। যন্ত্রবিশারদ না হইয়া, হইলেন ভিষকরত্ন। কলকারখানার প্রতি আসক্তি তাঁহার কোন দিনই কিন্তু দূর হয় নাই। তিনি নানাবিধ শিল্প-প্রচেষ্টা আজীবন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়া অনেক ঠগ বহুবার নূতন শিল্প-প্রযোজনার অছিলায় তাঁহার নিকট হইতে প্রভূত অর্থ লইয়াছে। নীলরতন কিন্তু উহা ধর্তব্যের মধ্যেই আনিতেন না। তাঁহার টাকায় শিল্পোন্নতির পথ পরিষ্কার হইল এই ভাবিয়াই তিনি আনন্দ বোধ করিতেন।

জয়নগর হাই স্কুলেই তাঁহার লেখাপড়া প্রথম আরম্ভ হয়। তিনি যখন এই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে (Second class বর্ত্তমান Class IX) পড়েন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাইবার আশায় তখনই তাঁহাকে দিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ান হয়। ১৮৭৬ সনে সেই পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তাঁহাদের স্কুলও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। এই বৎসরেই তিনি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হন। বাড়ীর সকলেই তখন জয়নগর হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছেন। নিজের লেখাপড়ার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য এবং বৃহৎ পরিবার-পোষণের সাহায্যকল্পে

তাঁহাকে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে হইত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও পড়াশুনা ছাড়িয়া স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরি গ্রহণ করিতে হইল। জ্যেষ্ঠের এই মহত্ব তিনি কোনদিন ভুলেন নাই। উপার্জ্জনক্ষম হইবামাত্র তিনি দাদাকে সংসারের ভার হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি দেন।

১৮৭৯ সনে নীলরতন ডাক্তারী ডিপ্লোমা পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। পড়াশুনায় তাঁহার আকুল আগ্রহ ও পরীক্ষায় নিয়মিত ভাল ফল দেখিয়া মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ ডাঃ এস, সি, ম্যাকেঞ্জি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিতে ও উৎসাহ দিতে থাকেন।

নীলরতনের উচ্চাভিলাষের সীমা ছিল না এবং তাঁহার জ্ঞানস্পৃহাও ছিল অপরিমেয়। তদুপরি ডাঃ ম্যাকেঞ্জির উৎসাহ পাইয়া তিনি কেবল ডাক্তারী ডিপ্লোমা পাইয়া ও 'সাব্-এসিসট্যাণ্ট সার্জ্জেন"-এর পদ লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তখন তিনি এল.এ. বর্ত্তমান (I.A. বা I.Sc.) পড়িবার জন্য জেনারেল এসেম্ব্লি ইন্‌ষ্টিটিউশনে (বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ্চেস কলেজ) ভর্ত্তি হইলেন। এই সময় নরেন্দ্রনাথ, পরবর্ত্তীকালের বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। এল. এ. পাশ করিয়া তিনি মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশনে (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্ত্তি হইয়া বি.এ. পড়িতে আরম্ভ করেন। এইরূপ অসীম উন্নতি তাঁহার লাভের আকাজ্ক্ষা।

১৮৮৪ সনে তৎকালীন মেধাবী ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া এবং প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম-কর্ম্মে আস্থা হারাইয়া তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৮৪ সনে বি. এ. পাশ করিয়া কিছুদিন চাতরা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য্য করেন। পরে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর পিতা ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার গ্রে ষ্ট্রীটে একটি স্কুলে তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই বিদ্যালয়ে তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন।

কিছুকাল শিক্ষকতা করিবার পর ১৮৮৫ সনে নীলরতন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ডাক্তার এস. সি. ম্যাকেঞ্জি এ বিষয়েও তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দেন ও বিশেষ সাহায্য করেন। অসাধারণ মেধা, অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা ও অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে তিনি ১৮৮৮ সনে এম. বি. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র হিসাবে তিনি এই বৎসর 'গুডিভ্ বৃত্তি' লাভ করেন। এবং ধাত্রীবিদ্যা (Midwifery) ও চিকিৎসাবিষয়ক আইনে (Jurisprudence) "অনার্স" প্রাপ্ত হন। সুবিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী এই সময় তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। চাঁদনী ও মেয়ো হাসপাতালে তাঁহার চিকিৎসক-জীবন আরম্ভ হয়।

নীলরতনের জ্ঞানপিপাসার কোন দিনই নিবৃত্তি হয় নাই। ১৮৮৮ এবং ১৮৮৯ সনে তিনি যথাক্রমে এম.এ. ও এম.ডি. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। নীলরতনের উত্তুঙ্গ অভিলাষ ফলবান হইবার মূলে ছিল তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্রের স্নেহসিক্ত ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ কৃচ্ছ্রসাধনা। তিনি গ্রাম্য স্কুলের সামান্য একজন শিক্ষক ছিলেন। নিজে সকল প্রকার দুঃখ বরণ করিয়া নীলরতনের লেখাপড়ার ব্যয় নির্ব্বাহে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। নীলরতনও তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন। নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে মানুষ করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বরিশাল একটি সমৃদ্ধিশালী ও সংস্কৃতিপূর্ণ দেশ ছিল। সেখানে স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্ত, ঋষিপ্রতিম জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এখন উহা পূর্ব্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত। ১৮৮৯ সনে সেই স্থানের ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক পূত-চরিত্র গিরীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবীর সহিত নীলরতনের বিবাহ হয়।

শুধু চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। আজীবন নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, ব্যবসায়-বাণিজ্য বা অর্থনীতি—যে-কোন বিষয়ের পুস্তক তাঁহার হাতে পড়িত, তিনি তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িতেন। বৃত্তি হিসেবে চিকিৎসকের ব্যবসা গ্রহণ করিলেও ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি, খনিবিদ্যা, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্প সম্বন্ধে প্রয়োজন হইলে বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিতে পারিতেন। কোন কোন হাতের কাজেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ছুতারের কাজ ভালই জানিতেন। নানা জিনিষের সুন্দর সুন্দর নক্সা (designs) করিতে পারিতেন। রন্ধন-কার্য্যেও তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। রোগী-শুশ্রূষাতেও ছিলেন তিনি সুদক্ষ।

১৮৯০ সনে সরকারী চাকুরি ত্যাগ করিয়া তিনি স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রথম

হইতেই ইউরোপীয় চিকিৎসকদিগের ন্যায় তিনি ষোল টাকা দর্শনী দাবি করিতে থাকেন এবং তাহাই লইতে আরম্ভ করেন তখন সাহেব ডাক্তারদের একটু বেশী মর্য্যাদা ছিল এবং তাঁহারাই কেবল ষোল টাকা দর্শনী গ্রহণ করিতেন। এইরূপ উচ্চ হারে দর্শনী দাবি করার মধ্যে নীলরতনের কোনরূপ অহমিকা ছিল না। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন বিদেশী চিকিৎসকদিগের তুলনায় তিনি কোন অংশে নিকৃষ্ট নহেন। তিনি ভাবিতেন সাহেব ডাক্তারদের সমপর্য্যায় দর্শনী না লইলে নিজেকে ছোট করা হইবে, জাতিরও অপমান ঘটিবে। ঈদৃশ ছিল তাঁহার আত্মসম্মানজ্ঞান ও জাত্যাভিমান। এইরূপ উচ্চ দর্শনী লওয়াতে দেশী ও বিদেশী সমাজে কিছু কঠোর সমালোচনা আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু কাজের খাতিরে ও চিকিৎসার নিপুণতায় সকল গোলমাল অচিরেই মিটিয়া গেল।

তড়িৎ গতিতে নীলরতন বাঙ্গালী সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, স্বনামধন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার রাসবিহারী ঘোষ এবং স্যার তারকনাথ পালিত প্রভৃতি দেশবরেণ্যদিগের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সম্পর্ক বিশেষ ঘনিষ্ঠ ও মধুর হইয়া দাঁড়াইল। বাংলার বাহিরেও তাঁহার চিকিৎসার নৈপুণ্য স্বীকৃতি লাভ করিল। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতেই রোগী দেখিবার জন্য তাঁহার ডাক আসিতে লাগিল। চিকিৎসা ব্যবসায়ের বিপুল আয় হইতে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা তিনি সঞ্চয় করিতে পারিলেন। তাঁহার এই উন্নতির মূলে ছিল সততা, রোগীদিগের প্রতি সহানুভূতি ও সমপ্রাণতা, রোগী চিকিৎসাকালে খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, পথ্যাপথ্য নির্দ্ধারণ করা এবং প্রয়োজন হইলে রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে পথ্য প্রস্তুত করিতে শিখান এবং সে পথ্য ঠিক ভাবে খাওয়ান হইতেছে কি না সে বিষয়ে সংবাদ লওয়া। যে রোগীর চিকিৎসার ভার তিনি লইতেন, তাহার সেবা-শুশ্রূষা নিয়মিত হইতেছে কি না, সে বিষয়েও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। তদনুযায়ী তাহার আত্মীয়বন্ধুকে উপদেশ দিতেন। রোগীর কোনরূপ অযত্ন বা রোগীর প্রতি অল্প অবহেলাও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

অচিরকালে শিক্ষিত সমাজে তাঁহার এরূপ সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং দেশের শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার ঈদৃশ আগ্রহ দেখা যায় যে, ১৮৯৩ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (Fellow) নির্ব্বাচিত হন।

এদেশের চিকিৎসকদিগের যাহাতে সম্মান বৃদ্ধি হয়, তাঁহাদের বিদ্যাবত্তার আরও উন্নতি ঘটে এবং সংহত শক্তিতে তাঁহারা যাহাতে নিজ নিজ বৃত্তির উন্নতি সাধন ও তৎসঙ্গে দেশের কল্যাণ সম্পাদন করিতে পারেন সে বিষয়েও নীলরতনের প্রথম হইতেই প্রখর দৃষ্টি ছিল। সেই উদ্দেশ্যে ১৯০১ সনে ৬১ নং হ্যারিসন রোডে (বর্ত্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) নিজ বাড়ীতে "কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাব" তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ সকল চিকিৎসকই তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে আন্তরিক সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

১৯০৫ সনে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নির্দ্দেশে তদানীন্তন লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গলা দেশ দ্বিধা বিভক্ত করেন। সেই উপলক্ষ্যে বাঙ্গলা দেশে তথা সমগ্র ভারতে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, সেই স্বদেশী আন্দোলনেও নীলরতন নিবিড়ভাবে যোগ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষা। সেই শিক্ষা-সংস্কারের জন্য যখন "জাতীয় শিক্ষা পরিষদ" প্রতিষ্ঠিত হইল, নীলরতনই তাহার প্রথম কর্ম্মসচিব নিযুক্ত হইলেন। সেই জাতীয় পরিষদের প্রচেষ্টায় এ দেশের ছেলেমেয়েদের হাতের কাজ শিখাইবার জন্য যে "বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট" স্থাপিত হয়, তাহারও কর্ম্মসচিব নির্ব্বাচিত হন নীলরতন সরকার। দেশের লোক তাঁহার কর্ম্ম-নৈপুণ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিল। এই "বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট"ই ক্রমোন্নতির পথে উঠিয়া আজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। দেশসেবার সুযোগ উপস্থিত হইলে কোনদিনই তিনি সে সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেন নাই। ১৯১২ সনে নীলরতন বাঙ্গলার আইন সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং পূর্ণ পাঁচ বৎসর এই পদে থাকিয়া দেশের ও দশের প্রভূত কল্যাণসাধন করেন।

১৮৮৮ বা ১৮৮৯ সনে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র ছাত্রদিগকে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিবার ও বাংলা ভাষায় চিকিৎসা পুস্তক এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। তাহার ফলে এখন যেখানে মেছুয়াবাজার ট্রাম ডিপো, সেইখানে "ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল" নামে এমন একটি স্কুল স্থাপিত হয়, যেখানে বাংলা ভাষায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিখান আরম্ভ হইল। ইহার কিছুদিন পরেই যেখানে এখন "ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়" গৃহ, সেইখানে "কলেজ অফ্ ফিজিসিয়ানস্ এণ্ড সার্জ্জেনস অফ্ বেঙ্গল" নামে উহারই

একটি শাখা খোলা হয়। সেখানে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পড়ান চলিল। এই শাখা বিদ্যালয়ের অন্যতম উৎসাহী প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্যার নীলরতন সরকার।

মাতৃভাষায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণাপূর্ণ পুস্তকাদি বাংলা ভাষায় প্রণয়ন ও প্রকাশ করা যে নীলরতনের আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল তাহা তাঁহার নিজের লেখাতেই প্রমাণিত হয়। ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য্যের "ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা" নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নীলরতন যে মুখপত্র লিখিয়াছেন তাহাতে আছে—"আমার বিশেষ আশা এবং দৃঢ় বিশ্বাস যে, ছাত্র কিংবা শিক্ষক কিংবা ভিষক—চিকিৎসা-জগতের সকল পাঠকই গ্রন্থকারের এই অক্লান্ত পরিশ্রমের সুফল ভোগ করিবেন। আশা করি ভবিষ্যতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে আমাদের দেশীয় বহু কৃতী ও শ্রমশীল সুপণ্ডিত ভিষকগণের গবেষণা ও বিচারপূর্ণ গ্রন্থ আমাদের প্রিয় মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবে, এবং বিদেশীয় সুধীগণ অস্মদ্দেশীয় ব্যাধিগুলির সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানোপার্জ্জনের উপায়স্বরূপ ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।"

নীলরতন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন ভারতীয় ছাত্রেরা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় শিক্ষকদিগের নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারিলে বিশেষ উপকৃত হইবে এবং তাহাদের দাস মনোবৃত্তি (Inferior Complexity) ধীরে ধীরে অপনোদিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই ১৯১১ সনে তিনি "কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল" এবং "কলেজ অফ্ ফিজিসিয়ানস্ এণ্ড সার্জ্জেনস অফ্ বেঙ্গল" সম্মিলিত করার প্রয়াস পান। তাঁহার এই সাধু প্রচেষ্টায় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর যে অপূর্ব্ব ত্যাগ ও উদ্যম প্রদর্শন করেন তাহা এদেশে, বিশেষত এ যুগে অতীব বিরল।

১৯০৩ সনে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের "ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল" বেলগেছিয়ায় উঠিয়া আসে এবং "এলবার্ট ভিক্টর হসপিট্যাল" নামে একটি হাসপাতালও উহার সহিত সংলগ্ন হয়। তখন উহা "আর জি কর মেডিক্যাল স্কুল" নামে পরিচিতি লাভ করে। সুবিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী ও সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং আরও অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞ চিকিৎসক স্বেচ্ছায় এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার কার্য্য গ্রহণ করেন। স্যার নীলরতনের আন্তরিক চেষ্টায় এবং ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগে ১৯১৫-১৬ সনে এই সম্মিলিত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানটি তদানীন্তন বড়লাটের নামানুসারে "কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ ও হসপিট্যাল" নাম গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। এই অনুমোদন লাভের মূলেও ছিলেন স্যার নীলরতন। বেসরকারী মেডিক্যাল স্কুলের প্রথম স্থাপয়িতা, বাঙ্গলা ভাষায় পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দিবার এবং চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবার পুরোধা ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটির নূতন নামকরণ হইয়াছে—"আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ এণ্ড হসপিট্যাল।"

নিজের কর্ম্মকুশলতায় নীলরতন শুধু স্বদেশবাসীরই প্রিয় হন নাই, সরকারেরও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ১৯১৮ সনে যেমন তিনি 'নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলন'-এ সভাপতির আসনে বৃত হন, তেমনই ভারত সরকারের নিকট হইতে প্রভূত সম্মানসূচক "স্যার" উপাধি পাইয়াছিলেন।

শিক্ষা-বিস্তারকল্পেও স্যার নীলরতন আজীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। ১৯১৯ সন হইতে ১৯২১ সন পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য বা ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন। তাঁহারই কার্য্যকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক নূতন বিধি প্রণীত হয় এবং অনেক প্রাচীন পদ্ধতিরও সংস্কার সাধন করা হয়। এই সময় হইতেই সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি অ-বিজ্ঞান বিষয়সমূহ, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, শারীর ও জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিষয় সকল স্বতন্ত্রভাবে পড়ান হইতে থাকে এবং উহাদের পরীক্ষাও স্বতন্ত্রভাবে গৃহীত হয়।

সর্ তারকনাথ পালিতের সহিত চিকিৎসক হিসাবেই নীলরতনের প্রথম পরিচয় ঘটে। সেই পরিচয় ক্রমে এমনই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে যে, প্রধানত তাঁহার অনুরোধে এবং সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আপ্রাণ চেষ্টায় পালিত মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক লক্ষ টাকা দান করেন। সেই অর্থ এবং সর্ রাসবিহারী ঘোষের অনুরূপ অর্থ সাহায্যেই কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হয়।

১৯২০ সনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যে সম্মেলন সংঘটিত হয়, সর্ নীলরতন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ সেই সম্মেলনে যোগদান করেন। সেই বৎসরেই তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের "অনারারী ডি. সি. এল." এবং এডিনবারা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের "অনারারী এল. এল. ডি." উপাধিপ্রাপ্ত হন। ১৯২৪ হইতে ১৯২৭ সন পর্যন্ত তিন বৎসর কলা বিভাগের স্নাতকোত্তর উপদেশ সভা (Post Graduate Council of Arts) এবং ১৯২৪ হইতে ১৯৪২ সন পর্য্যন্ত আট বৎসর বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর উপদেশ সভা (Post Graduate Council of Science)-এর সভাপতির পদে থাকিয়া এবং ১৯৩৩ হইতে ১৯৩৯ পর্য্যন্ত কয় বৎসর "ডীন অব্ ফ্যাকালটি অব সায়েন্স"-এর কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেন।

সংগঠন কার্য্যে নীলরতন যে বিশেষ নিপুণ ছিলেন তাহা তাঁহার কর্ম্মজীবনে অনেকবারই প্রমাণিত হইয়াছে। ১৯২৮ সনে কলিকাতায় নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলন আহূত হইলে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং সেই সময় তাঁহারই আন্তরিক চেষ্টায় "ভারতীয় চিকিৎসক সভা" (Indian Medical Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩২ সনে ভারতীয় চিকিৎসক সভা যে নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলন আহ্বান করেন সর্ নীলরতন তাহার মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং সেই সম্মেলনে যে অভিভাষণ তিনি পাঠ করেন তাহা যেরূপ জ্ঞানগর্ভ, সেইরূপ শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। ভারতীয় চিকিৎসকদিগের বিদ্যা, বৃত্তি ও সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইবার আকুল আহ্বান ইতিপূর্ব্বে আর কেহই করেন নাই।

রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ মনীষীগণ ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তক। ইংরাজ সরকার প্রথমে এদেশে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার করিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন না। জনসাধারণের চাহিদা মিটাইতে তাঁহারা যে শিক্ষার প্রচলন করেন তাহাতে তাঁহাদের শাসনব্যবস্থার অনেক সুবিধা হইল বটে, কিন্তু সে শিক্ষার সহিত দেশের নাড়ীর কোন যোগ রহিল না। টবেসাজান গাছের মত কিছু শিক্ষিত লোক উৎপন্ন হইল, তাহাতে দেশের অভাব মিটিল না, সাধারণ দেশবাসীর সহিত শিক্ষিত সমাজের কোন সংযোগ স্থাপিত হইল না। এমন একটা খাপছাড়া শিক্ষিত সমাজ গড়িয়া উঠিল, যাহার সহিত দেশের সংস্কৃতি ও "ট্র্যাডিশনের" কোন সম্পর্কই রহিল না। অনেক বক্তৃতা ও প্রবন্ধের মাধ্যমে এবং শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করিয়া রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম এই দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সর্ নীলরতনেরও এদিকে প্রখর দৃষ্টি ছিল। শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে তিনি অনেক স্থলে অনেকবারই বলিয়াছেন। ১৯৩৯ সনে তিনি বিশ্বভারতীর প্রধান আচার্য্য পদে বৃত হন, এবং উহার একজন "ট্রাষ্টী"ও নিযুক্ত হন। এই সময়েই তিনি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত "বোস ইনষ্টিটিউট"-এর পরিচালক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪০-৪১ সনে সর্ নীলরতন ভারতীয় যাদুঘরের একজন 'ট্রাষ্টী' ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডীন অব ফ্যাকালটি অব মেডিসিন' নিযুক্ত হন। এই সকল পদ লাভ করিয়া তিনি তাঁহার চিরাভিলষিত জাতীয় ধারায় শিক্ষা সম্প্রসারণের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন এবং তাঁহার সে আন্তরিক চেষ্টা কিছু ফলবতী হয়। ১৯৩৯ সনে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে নীলরতন যে অভিভাষণ (Convocation address) প্রদান করেন তাহাতে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে উপদেশ দেন। ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার এইরূপই অন্তরের টান ছিল।

১৯৩৯ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি "অনারারী ডি.এস-সি" উপাধিপ্রাপ্ত হন। এই বৎসরই তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে, এবং তাঁহার স্বাস্থ্যও ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াই ১৯৪১ সনে তিনি রবীন্দ্রনাথের রোগশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সুকুমার দেহ এবং ততোধিক সুকুমার তাঁহার মনের সহিত নীলরতন এরূপ সুপরিচিত ছিলেন যে, যখনই রবীন্দ্রনাথের দেহে অস্ত্রোপচারের কথা উঠিল তখনই তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিলেন—"কবির দেহে তোমরা অস্ত্রোপচার করিতে যাইতেছ, একথা যেন তোমাদের মনে থাকে।" শরীরটাকে কাটা-ছেঁড়া করার ইচ্ছা কবিরও আদৌ ছিল না। তিনি প্রায়ই বলিতেন—"শ্রীভগবানের হাত থেকে শরীরটাকে যে অবস্থায় পাওয়া গেছে, ঠিক সেই অবস্থায়ই তাঁর হাতে ফিরিয়ে দেওয়া ভাল। সেটাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে লাভ কি?" কেহই ইঁহাদের কথা শুনিল না। সেই অস্ত্রোপচারই কাল হইল।

১৯৪৩ সনে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য নীলরতন গিরিডি যান। সে স্থান হইতে আর ফিরিয়া আসেন নাই। ঐ বৎসরেই ১৮ই মে ইহধাম ত্যাগ করিয়া তিনি অভীষ্ট লোকে চলিয়া যান। তাঁহার নশ্বর দেহ জ্যোৎস্নাধবলিত উশ্রী নদীর তীরে ভস্মীভূত হইল।

চিকিৎসক হিসাবে নীলরতনের তুলনা ছিল না। শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেই রোগী আশা করিত সে অচিরেই আরোগ্যলাভ করিবে। এমনই আন্তরিক সহানুভূতির স্বরে তিনি রোগীকে প্রশ্ন করিতেন। রোগের কারণ অনুসন্ধানে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশ্ন করিয়া রোগী ও তাহার আত্মীয়-বন্ধুদিগের নিকট হইতে সকল বিষয় জানিয়া লইতেন, সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত হইত। যতক্ষণ-না রোগ-নির্ণয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতেন ততক্ষণ তিনি রোগীর কাছে বসিয়া সাহস ও উৎসাহ দিতেন এবং রোগ নির্ণয় হইলে উহার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা এরূপ সুনিপুণ ভাবে করিয়া আসিতেন যে, রোগী নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার উপর নির্ভর করিত। সেই নির্ভরতায় রোগীর অর্দ্ধেক রোগ সারিয়া যাইত।

চিকিৎসা-ব্যাপারে তাঁহার কোন গোঁড়ামি ছিল না। আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি বা ইউনানী—কোন চিকিৎসা পদ্ধতিকেই তিনি অবজ্ঞা করিতেন না। তিনি সকল সময়েই বলিতেন—"যে-কোন পদ্ধতি অবলম্বনে চিকিৎসা করা হউক না কেন, চিকিৎসককে সকল অবস্থাতেই চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতে হইবে। শারীর-সংস্থান, দেহের যন্ত্রগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়াপ্রণালী এবং রোগের নিদান প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিও তাহাকে সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিতে হইবে।" মেডিক্যাল কলেজগুলিতে বিভিন্ন চিকিৎসা-প্রণালীতে অভিজ্ঞ ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া ছাত্রীদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত চিকিৎসা-পদ্ধতি শিখিতে সুযোগ দিবার ব্যবস্থা করিতেও তিনি চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা আজও কাজে পরিণত হয় নাই। অদূর ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনাও নাই। কারণ, সংস্কারমুক্ত চিকিৎসক অতি বিরল।

আকুল প্রার্থনায় যে দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মানুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে সে-বিষয়েও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলেই এ বিশ্বাস তাঁহার জন্মিয়াছিল। রোগ-নিরাময় ব্যাপারে প্রকৃতিদেবীর যে যথেষ্ট হাত আছে, সে-বিষয়েও তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"১৮৯২ সনে কলিকাতায় যখন কলেরার মহামারি উপস্থিত হয়, তখন মেয়ো হাসপাতালে এক রাত্রে যে-রোগীর বাঁচিবার কোন আশা নাই বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হইল, পরদিন সকালে সেই রোগীকে তাহার নির্দ্দিষ্ট শয্যায় না দেখিয়া সকলে ভাবিল, নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এবং মৃতদেহটি 'মর্গে' লইয়া যাওয়া হইয়াছে। কিন্তু বেলা হইলে সেই রোগীকে জলনিকাশের নর্দ্দমার ধারে সুস্থ শরীরে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। অনুসন্ধানে জানা গেল জল পিপাসায় কাতর হইয়া রাত্রে কোনরূপে নর্দ্দমার ধারে গিয়া, সেই নর্দ্দমার জলই আকণ্ঠ পান করিয়া সে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতি দেবীই তাহাকে রোগমুক্ত করিলেন।

চিকিৎসাকে বৃত্তিহিসাবে গ্রহণ করিলেও স্যর্ নীলরতন দেশের শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারে বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। দেশকে শিল্পপ্রধান করিয়া তোলা এবং সেই সকল শিল্পের সাহায্যে বেকার সমস্যার সমাধান করা ছিল তাঁহার জীবনের স্বপ্ন। চামড়া পরিষ্কার করা (Tanning), সাবান প্রস্তুত করা, রং-এর কাজ করা (Dyeing); মাটির খেলনা ও তৈজসপত্রাদি নির্ম্মাণ করা, কাপড় ধোলাই করা (Bleaching), রাসায়নিক শিল্পসামগ্রী প্রস্তুত করা (Industrial Chemistry), লোহার পাত প্রভৃতি প্রস্তুত করা, চায়ের আবাদ (Tea Planting)- কয়লাখনির কাজ প্রভৃতি নানা শিল্পকর্ম্মে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।

এ-সকল বিষয়ের কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াই তিনি শান্ত হন নাই, দেশের লোক যাহাতে শিল্পানুরাগী হয় এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে মডার্ন রিভিউ (Modern Review) পত্রিকায় নানাবিধ সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিতেন, এবং ঐ বিখ্যাত পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই সকল প্রবন্ধ সাদরে প্রকাশ করিয়া নীলরতনের দেশসেবায় যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। এই সকল কাজে নীলরতন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও সাহায্য পাইয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও নিজে সকল কাজ দেখাশুনা করার সময়ের অভাবে এবং শিল্পসংশ্লিষ্ট লোকদিগের অসৎ প্রবৃত্তির জন্য তাঁহাকে আর্থিক ক্ষতিও অনেক সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্ব-সঞ্চিত চল্লিশ লক্ষ টাকা এই সকল শিল্পপ্রসার প্রচেষ্টায় নষ্ট ত হইয়াই ছিল, অধিকন্তু ইহার জন্যই তিনি আকণ্ঠ ঋণে মগ্ন হইয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে আইনের সাহায্যে দেউলিয়া হইয়া তিনি এই বিপুল ঋণের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার সহজ ধর্ম্মবুদ্ধিই একাজে তাঁহাকে বাধা দিল। চোখে তাঁহার তখন ছানি পড়িতেছিল, কাজকর্ম্মেরও বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। বন্ধুবর কর্ণেল কিরওয়ানিকে দিয়া অসময়ে সেই ছানি কাটাইয়া তিনি নূতন উদ্যমে আবার

চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া ফেলিলেন। দরিদ্রের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, দারিদ্র্য বরণ করিয়াই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

সর্ নীলরতনের সংগঠনশক্তির মূল ছিল দেশবাসীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, দীনদুঃখীর প্রতি উদার সমবেদনা এবং নিজের নিঃস্বার্থ সেবার প্রবৃত্তি। যে প্রতিষ্ঠানই যখন তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন—তাঁহার মধ্যে ছিল না তাঁহার নাম-কিনিবার বাসনা, ছিল না নিজেকে জাহির করিবার প্রচেষ্টা, ছিল না সহজ নেতৃত্বের সখ, ছিল কেবল দেশপ্রেম ও লোকহিতৈষণা। দেশবাসীর কিসে কল্যাণ হয়, সমব্যবসায়ীদিগের কিসে মঙ্গল ঘটে, সকল সময় সেই দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল। রোগশয্যায় পড়িয়াও তিনি সকলের ভাবনা ভাবিয়া গিয়াছেন।

জড়বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনে ও দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রসারকল্পে নীলরতন যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেন বলিয়া তিনি জড়বাদী ছিলেন না। মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনার দিকেও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন, এবং জীবনের সকল কাজে ঈশ্বরানুভূতি ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইতেন। দর্শনশাস্ত্র তিনি উত্তমরূপেই পড়িয়াছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। কয়েকটি ধর্ম্মসভায় (Theistic Conferences) তিনি সভাপতির আসনে বসিয়া উদাত্ত সুরে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানেরই আজ আর কোন মূল্য নাই যদি সে অনুষ্ঠান দুর্গতদিগকে সাহায্য করিতে না পারে, পদদলিতকে সমাজে স্থান দিতে না চায়, মানুষের সেবায় আত্মবলি দিতে না শেখায়।" সর্ নীলরতন নিজ জীবনে এই আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় মানবদরদী জগতে বিরল। তাঁহার জীবনবর্ত্তিকা যে আলোক বিচ্ছুরিত করিয়া গিয়াছে, সেই আলোকে দেশ উদ্ভাসিত হউক, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে দেশের যুবকেরা মানুষ হইয়া উঠুক, তাহা হইলেই তাঁহার সম্যক্ স্মৃতিরক্ষা হইবে। দুই-একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার নাম জড়িত করিয়া রাখিলে এমন কি আর বেশী লাভ হইবে?

স্বার্থ ও পরার্থের বিরোধ

স্বার্থ ও পরার্থের বিরোধের কথা সর্ব্বজনবিদিত। নিজের শাশ্বত মঙ্গলও কি এই প্রচলিত অর্থে স্বার্থের অন্তর্গত? তাহা হইলে, যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল করিল না, নিজে ভাল হইল না, তাহা দ্বারা অপরের উপকার কেমন করিয়া সম্ভবে? আমোদ, অর্থ, যশ, সাংসারিক পদমর্য্যাদা, স্থলবিশেষে ও সময়বিশেষে মানুষ এই সকল স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু নিজের শ্রেয়-রূপ যে স্বার্থ, তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে মনুষ্যত্বলাভ কেমন করিয়া হইবে? এই দিক্ দিয়া দেখিলে স্বার্থে ও পরার্থে কোন বিরোধ নাই।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১৩২১।

পারিবারিক

শ্রীমিহির আচার্য

১

আমরা পাঁচ ভাইবোন। দাদা, আমি, নন্দিতা, স্বপ্না আর ছোট ভাই নীলু। নন্দিতার একদিন বিয়ে হয়ে গেল। সে আজ বছর দশেক হ'ল। ওর কোল আলো ক'রে এসেছে ফুটফুটে দু'টি মেয়ে। তনু আর শানু। ওর স্বামী ব্রজরাজ থাকে রায়গঞ্জে। ওদের সেখানে বিরাট্ স্টেশনারি আর ওষুধের দোকান আছে। দাদা চাকরি নিয়ে আছে জলপাইগুড়ি। গত বছর নবদ্বীপের মেয়ে এল বউ হয়ে। বউদিদিকে আমরা বেশিদিন পাই নি। দাদা বাড়ী পাওয়া মাত্র তিনি চালান হ'লেন জলপাইগুড়ি।

২

আমাদের বাবা-মা দু'জনেই ছিলেন। শুনেছি বাবার একটা ছোটখাটো জমিদারি ছিল বালুরঘাট অঞ্চলে। বাবা কোনদিন যান নি। একজন কর্মচারী ছিল, সে-ই মাঝে মাঝে টাকা পাঠাত। বাবা সৌখিন ওকালতি করতেন। এইসব আমার ছোটবেলার স্মৃতি। তার ধ্বংসাবশেষ ক্ষয় হ'তে হ'তে এখন আর কিছু নেই। এমন কি বাবা সাহেবের কাছ থেকে যে গ্রামোফোন কিনেছিলেন, সেটা অদৃশ্য হয়েছে। গ্রামোফোনের টেবিলটা এখনও আছে। যদিও আমার বোন স্বপ্না ওতে তার প্রসাধনের টুকিটাকি রাখে আমরা এখনও তাকে গ্রামোফোনের টেবিল ব'লে উল্লেখ করি। আর-একটা আছে আমাদের গর্ব করার মতন সুদৃশ্য দেয়ালে-টাঙানো জাপানী ঘড়ি।

৩

পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের পরই আমরা সাংঘাতিক রকমের গরিব হয়ে গেলাম। আমাদের জমানো টাকা ছিল না। বাবার পসার ছিল না। আমরা বাড়ীতে ব'সেই দেখেছি বাড়ীওলার তাগাদা, মুদি-গয়লার গালাগালি। এমন কি বাবার বিরুদ্ধ মক্কেলের কোর্টে জমা-দেওয়া টাকা খরচেরও অভিযোগ ছিল। আমরা আঘাত পেতাম, পিতৃত্বের গৌরবের প্রতি সন্তানের স্বাভাবিক গর্ববোধ আমাদের ছিল। অথচ, আশ্চর্য হয়ে দেখতাম সবকিছু বাবা হাঁসের পালকে জলের মতন গায়ে লাগতে দিতেন না। টাকার প্রতি বাবার লোভ ছিল না, কৃপণতা ত নয়ই। বাবার অন্তর ছিল ধনী, কোন ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা ছিল না তাঁর চরিত্রে। দারিদ্র্যকে স্বীকার করবার ঔদার্য ছিল বাবার। আমার মনে হ'ত, বাবা যেন একটা মহৎ আইডিয়া, যার বস্তুগত শরীর নেই। অনেকটা রোমান্টিক যুগের কবিদের মতন।

৪

মা'র সঙ্গে বাবার ঝগড়া হ'ত। আবার মিল হ'তেও দেরি হ'ত না। এই বয়সে বাবা-মা'র পারস্পরিক আসক্তি আমাদের কৌতুক জোগালেও ভাল লাগত। বাবা-মা'র এক ধরনের সুখের চেহারা ছিল। তাই বোধ করি এই বয়সেও ওঁদের কারুর স্বাস্থ্য ভাঙে নি। বলতে বাধা নেই—ওঁদের হৃদয়ে কোন বাৎসল্য ছিল না। এটা এক ধরনের ঔদাসীন্য কিন্তু উপেক্ষা হয় ত নয়। এই সংসারে বিচিত্র ধরনের মানুষ আছে, সকলের কাছে সবকিছু আশা করা যায় না। রক্তের সম্বন্ধে ওঁরা আমাদের জনক-জননী হ'লেও ওঁদের স্বভাবে বাবা-মা-বোধ কোনদিন জাগে নি। ফলে আমরা মাথার ওপরে কোন অভিভাবকত্বের চন্দ্রাতপের স্পর্শ পেতাম না। আমাদের আকাশটা ছিল খোলামেলা, আর অজস্র হাওয়ায় আমরা যথেচ্ছ নড়াচড়া করতে পেরেছি। আমরা ছেলেবেলা থেকেই আরও দশজন ছেলেমেয়েদের মতন স্বাভাবিক সরল হ'তে পারি নি। আমাদের মনের ওপরে চাপ ছিল। দারিদ্র্য আমাদের অপরিচ্ছন্ন এবং সন্দিগ্ধ ক'রে রাখত। ঐ বয়সেই আমরা অলৌকিক বিষয়ের কথা ভাবতাম, কিন্তু ঈশ্বরকে চিন্তা করতাম না। তার কারণ আমাদের প্রত্যহের বেঁচে-থাকা বিষয়টা ছিল অপ্রস্তুত প্রশ্নের সঙীনের মতন। সকালে উঠে খেতে

পাব কি না সেইটে যেন অনিশ্চিত, সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরে পেটে কিছু পড়বে কি না সেইটেও অনিশ্চিত। আবার, কোনদিন সন্ধ্যায় বাইরের কেউ এলে অবাক্ হয়ে যেতে পারত আমরা ময়রার দোকানের লুচি-তরকারি খাচ্ছি। ঐ ময়রার দোকানের ছেলেটা ছিল দাদার ক্লাস-ফ্রেণ্ড, মাঝে মাঝে বাকি রাখতে তার আপত্তি হ'ত না। দাদা এলে ঋণ পরিশোধ হ'ত। আমরা কতদিন শুধু জল খেয়ে ঘুমিয়েছি। বিরাট্ তক্তপোশ আর প্রকাণ্ড মশারির তলায় এক ঘরে আমরা ভাইবোন শুতাম। সে দিনগুলিতে আলো জ্বলত না। আমরা অন্ধকারে থাকতে ভালবাসতাম।

৫

অল্প বয়স থেকেই আমার সাহিত্যের রোগ ছিল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে অজস্র ভাব জমে উঠত, বুকের দরজায় আথালিপাথালি করত, আর যেন বলত—'আমায় মুক্ত করে দে, আমায় মুক্ত করে দে।' ভাঙা ভাষায় প্রকাণ্ড ভাবগুলিকে আমি বাঁধবার চেষ্টা করতাম, প্রথম ধুতি পরবার মতন সেগুলি আমাকে নাজেহাল করত।

বাবার ভাঙা ট্রাঙ্ক থেকে বাঁধানো খাতা আবিষ্কার করার কৃতিত্ব আমারই। বাবার অর্ধ-সমাপ্ত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ছিল তার ভেতরে। নন্দরাণী ব'লে একটি যৌবনকুণ্ঠিত মেয়ের দুঃখ।

৬

স্কুলের উঁচু ক্লাসে থাকতেই মফস্বল সহরে আমার সাহিত্যিক-খ্যাতি জুটেছিল। স্কুল ম্যাগাজিনে আমার প্রথম গল্প বেরুল। হাসির গল্প। আমাদের বাঙলা পড়াতেন সেকেণ্ড পণ্ডিত, তিনি আমাকে ক্লাস এইটে পরীক্ষায় একবার বাঙলায় ফেল করিয়ে দিয়েছিলেন। কলকাতার দু'-একটি কাগজেও আমার লেখা বেরুল। অবশ্য লেখা ফিরে এসেছে বিস্তর 'আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ' জানিয়ে। আমার যে কোন প্রতিভা ছিল, আমি বিশ্বাস করি নে। তবে বাবা আমাকে প্রশংসা করতেন। মা'র কাছে হেসে বলতে শুনেছি— 'ব্যাটা আমার গুণ পেয়েছে।'

৭

ভেবে দেখতে গেলে আমার সামনে সাহিত্য ছাড়া অন্য পথ খোলা ছিল না। কঠোর বাস্তবের হাত থেকে বাঁচবার এই একটু রাস্তা ছিল। আমি যেন নিজের একটি জগৎ গ'ড়ে তুলেছিলাম, অন্য-আকাশ, অন্য-রোদ, অন্য-পরিচয়। আমি সাহিত্যের বাস্তবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ ক'রে সরিয়ে এনেছিলাম। আমার ভেতরে একটা দূরত্ববোধ জাগছিল। এই মানসিক তৃষ্ণা ব্যবহারিক সংসারটা সম্বন্ধে আমাকে কৌতূহলহীন নিরাসক্ত ক'রে তুলছিল। কিংবা হয়ত সংসারটা এত অমানুষিক কঠিন ঠেকছিল যে, মনের বিলাসিতার রাজ্যে আমি পলাতক হ'তে চেয়েছিলাম। ক্ষুধা আমাকে আর তেমন যন্ত্রণা দিতে পারত না, কারণ আমার সৃষ্টিশালার যন্ত্রণা ছিল আরও তীব্র এবং আকর্ষণীয়। রাত্রে বাড়ী ফিরে যখন দেখেছি ভুতুড়ে অন্ধকার, নিশ্বাস ফেলে বুঝেছি সেদিন আহার নেই। চুপিসাড়ে ঘরে ঢুকে জামাকাপড় ছেড়ে জানলার ধারে ভাঙা টেবিলে ক্ষয়-পাওয়া মোম জ্বালিয়ে গল্প লিখে গেছি। আমাকে কেউ বাধা দেয় নি। ভাইবোনেরা জেগে থাকলেও কোন কথা বলে নি। ওরা আমাকে ঈর্ষা করেছে কি না জানি নে। তখন আমায় নিজেকে মনে হ'ত সম্রাট্।

৮

আমি একটা কথা বুঝেছিলাম, ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ বেদনার কথা কেউ মনে রাখে না এবং বৃহত্তর মানুষের কাছে তার কোন মূল্যও নেই। এটা একটা নিছক ঘটনা, ইতিহাস তাকে ধ'রে রাখে না। ইতিহাস শুধু কৃতিত্বকে ধ'রে রাখে। আমার সাহিত্য-সৃষ্টির পেছনে নিশ্চয়ই এই সামাজিক-মন কাজ করছিল। আমার সংসার আমাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে রাখতে পারত না। আমার মা বাবা ভাই বোন ক্রমশঃ আমার চোখে অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। আমি ঘষা কাঁচের ভেতর দিয়ে ওদের দেখতাম। হয়ত এটা এক ধরনের স্বার্থপরতা। আমি বিশ্বাস করতাম সৃষ্টির ধর্মই স্বার্থপরতা। জগৎ-স্রষ্টা ঈশ্বরও ত একেশ্বর!

৯

পুরণো ঘরবাড়ী, খোয়া বের-করা রাস্তা, রঙ-চটা বিবর্ণ মানুষ, সস্তা সিনেমা হল, এই মফস্বল শহরটা পরম প্রশান্তিতে আমার ভেতরে লীন হয়ে গিয়েছিল। মাছি-

মশা-কাইলেরিয়া-যক্ষ্মা-ঘেরা সহরকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম। আমার সঙ্গীসাথী ছিল না, কারণ বন্ধুত্ব পেতে হ'লে কিছু ছাড়তে হয়। আমি কিছুই ছাড়তে রাজি ছিলাম না। একা-একা ঘুরে বেড়াতাম মহানন্দার তীরে, বাঁধ রোড ধ'রে। আর একটা বিমূর্ত ভাব জড়িয়ে ধরত আমার কল্পনাকে। দিগন্তের আকাশের দিকে চেয়ে আমি আধ্যাত্মিক বেদনা বোধ করতাম।

১০

আমার বিনা চেষ্টাতে বি. এ. পাস করলাম। এম. এ. ক্লাশ থাকলে ভর্তি হয়ে যেতে বাধা থাকত না। কলকাতায় গিয়ে পড়া চলত, কিন্তু টাকা নেই। বাবাই একটা চাকরির খবর ঠোঁটে ক'রে নিয়ে এলেন। নিচু-তলার কেরানীর পদ। চাকরিটা নিলাম। না নিলে যে বাবা রাগ করতেন তা নয়। আমি রাজি হ'লে বাবা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন। একশো তিরিশ টাকায় সংসারের পরম উপকার করলাম, এ রকম ভাব আমার জন্মায় নি। প্রথম মাসের মাইনে বাবার হাতে তুলে দিতে গেলে বাবা বললেন, 'তোমার মাকে দাও।'

১১

বস্তুত সাহিত্যের জন্যে একটি কল্পিত তৃতীয় ভুবন আমি আকাঙ্ক্ষা করতাম না। সাহিত্যিকের বিশিষ্ট হয়ে বিশেষ সুবিধা ভোগ করবার অধিকার নেই। নাই কোন নির্দিষ্ট অবসর। আমি কখনও ক্লান্তি বোধ করতাম না। অনেক রাত্রে টেবিলে মোমের মৃদু আলোকে আমার সাহিত্য-চর্চা অব্যাহত চলত।

১২

ইতিমধ্যে আমার বোন স্বপ্না কখন যে বড় হয়ে গেছে আমার খেয়াল ছিল না। ঈষৎ দীর্ঘ ও রোগা শরীরে কখন যে বাইরের পবন ওর যৌবনের কৌতূহল বাসনা লজ্জা ভয় আকাঙ্ক্ষাকে আঙুল ছুঁইয়ে গেছে, এটা আমার অজানা থাকত। ভাঙা ঘরেও বসন্ত আসে।

১৩

সেদিন বাড়ীতে পা দিতে মা আমাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে স্বপ্না সম্বন্ধে গুরুতর সমস্যায় পীড়িত ক'রে তুললেন। আমি কিছু না-ব'লে ঘরে এসে ঢুকলাম। বিছানায় উপুড় হয়ে শোকের ঢেউ তুলে স্বপ্না ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। আমার পায়ের শব্দে সে যে জেগে আছে সেটাই আমাকে জানাল।

আমি ডাকলাম—'স্বপ্না!'

স্বপ্না একরাশ চুলের বোঝা থেকে ওর মুখ তুলে লাল চোখে বললে, 'জানি কি বলবে। জানতাম মা তোমাকে সব বলবে। মেজদা আর তোমাদের বোঝা হব না আমি চ'লে যাব।'

আমি চমকে উঠলাম। আমার সাহিত্যিক-অন্য-মনস্কতা যেন এক নিমিষে চিড় খেল। আমি বুঝতে পারলাম ওর প্রতিটি মুখের শব্দ আমি না চাইলেও আমার হৃদয়ে একটা কোলাহল তুলল।

'স্বপ্না তুই কি বলছিস?' নিজের ভেতরে একটা কাঁপুনি বোধ করলাম, যেমন একটা অপরাধ অনুভূতি। আমার মনে হ'ল আমরা ভাইবোনেরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করি নে। সন্দেহ-সংশয় আর অপরিচয়ের একটা বোবা পাথর আমাদের নিয়ত পিষে মারছে।

স্বপ্না নির্ভীক গলায় বললে, 'মা ত একটা চিঠি পেয়েছে। অশোকদার এক ডজন চিঠি আমার স্যুটকেসে জমা আছে।'

আমি বললাম—'তুই ভুল করছিস, আমি দারোগা নই, তোর অপরাধ কবুল করতে আসি নি।'

স্বপ্না বললে, 'আমি অশোকদার কাছে গান শিখি। অশোকদা আমাকে ভালবাসে, আমরা বিয়ে করব।'

আমি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে ওর দিকে চেয়ে রইলাম, ওকে যেন আমি চিনতে পারছি নে। রোগা অপুষ্ট চেহারার মেয়েটা সদ্য যৌবনের শক্তি লাভ ক'রে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ওর স্থূল বর্বর আবেগে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমার কাহিনীর নায়িকারা কেউ ওর মতন নয়, নির্বোধ আর অনভিজ্ঞ।

১৪

সে-রাত্রে আমার লেখা হ'ল না। আমি স্বপ্নার কথা ভাবছিলাম। স্বপ্না অনেক রাত্রে শান্ত হ'লে হেসে আমাকে বলছিল, 'দাদা, আমাকে নিয়ে গল্প লিখবে? আমার মতন সাধারণ মেয়ের গল্প, যারা স্বপ্ন দ্যাখে, স্বপ্নে হরিণ হয়...' ওর কথাগুলো নরম মলমের মতন আমাকে আরাম দিচ্ছিল, ও যেন সে-রাত্রে আর ছোট ছিল না।

আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। আমি লিখি ব'লেই বোধ হয় আমার কাছে ওর মনকে মুক্ত ক'রে দিতে সংকোচ ছিল না। সে ওর ভালবাসার ভীরু মিষ্টি ক্লান্ত অভিজ্ঞতা বলছিল। ওকে তখন অনেক বড় দেখাচ্ছিল, আমার কল্পনার ফ্রেমের ভেতরে সে আটকা থাকছিল না। আমি প্রাণপণে ওকে বুঝতে চাইছিলাম, ওর আবেগ ওর আনন্দ ওর উদ্বেগ। ওর চিন্তায় অনেক ফাঁক ছিল যা সে কিছুতেই ভরাতে না পেরে শীতের পলাতক রোদের মতন পাতায় পাতায় লাফিয়ে লাফিয়ে দ্রুত ছুটছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না ঐ ফাঁকগুলি সে পূর্ণ করবে কি করে!

১৫

স্বপ্না একদিন বাড়ী থেকে উধাও হয়ে গেল। লিখে গেল—'আমার খোঁজ ক'রো না।'

মা বললেন—'রাক্ষুসীকে পেটে ধরেছিলাম, এর চেয়ে ও মরল না কেন?'

বাবা গুম হয়ে রইলেন।

আমি ক্লান্ত হয়ে অন্ধকার থইথই ঘরে পা দিলাম। একটা কিছু করা উচিত, আমি ভাবছিলাম। কিন্তু আমার মনের পাত্র অনেক সময়ই ভাবনার অর্গল ভেঙে কর্মের প্রবাহে নেমে আসতে পারে না। স্থূল বাস্তবের আকৃতি কোনকালেই আমার সত্য ব'লে মনে হ'ত না। আমার কাছে বাস্তবতার সংজ্ঞা ভিন্ন রকম ছিল।

স্বপ্না সংসার নামক স্থূল সীমা থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমার দূরত্ববোধের মধ্যে ভাসতে লাগল। আর, সেখানে সে আমার শুধু বোন নয়, একটা চরিত্র। অস্থির, দুর্বল এবং স্বপ্নবিলাসী। আমি ওর বেদনাকে বোঝবার চেষ্টা করলাম। আর, বোধ হ'ল ও একটা অন্ধ যন্ত্র কোন মহৎ স্থষ্টির।

গানের মাস্টার অশোকের কথাও আমার মনে হ'ল। লম্বা চুল, কালো এবং খর্ব। গানের জলসায় ওর গানও শুনেছি ব'লে মনে হয়। সে আর্টিস্ট, অপার্থিব আনন্দলোকের অমৃতের আস্বাদ সে পায় নি। তার লোভ কামনা প্রবৃত্তি……। এই মুহূর্তে ওর কোন প্রতিভা রয়েছে আমি স্বীকার করিনে। সে হিসেবী, ঘরোয়া, সংসারী মানুষ। সংগীত সাধনার থেকে তার কাছে বড় হ'ল একটি সাধারণ মেয়ে। ও একজন সাধারণ কেরাণী হ'লে আমার কিছু বলবার ছিল না।

১৬

বাবা বললেন: 'কে যায়?'

বললাম: 'আমি।'

বাবা চুপ ক'রে গেলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'কিছু বলবেন?'

বাবা বললেন, 'না।'

অশোকের মা বললেন, 'ও ত নেই বাবা। কিছু কাজ ছিল?'

বললাম: 'কোথায় গেছে?'

'বললে ত কৃষ্ণনগরে যাচ্ছি। কবে আসবে কিছুই ব'লে যায় নি।'

১৭

আমি বিরক্ত হচ্ছিলাম নিজের 'পরে। আমি কিছু লিখতে পারছিলাম না। সংসারের সমস্ত মানুষ যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি কি করি দেখবে। আমার সাহিত্যিক-মানসিকতার সঙ্গে সংসারের একটা দ্বন্দ্ব বোধ করছিলাম এবং এক সময় আমার যেন নতুন জ্ঞানোদয় হ'ল প্রতিটি মানুষ সমাজের কাছে অঙ্গীকৃত এবং সমাজমনের কারুকার শিল্পীর অঙ্গীকার ত আরও বেশি। সামাজিক নৈতিকতার দায়িত্ব শিল্পীর ওপর সমধিক।

বস্তুত বাধা না থাকলে স্বাধীনতার অর্থই হাস্যকর। আমার শিল্পী-চৈতন্যের স্বাধীনতা উদ্ধার করতেই সামাজিক বাধাগুলি অপসারিত করার দরকার। আমার যদি কোন দায় না থাকে তা হলে মুক্তির আস্বাদ পাব কি করে!

আমার মা বাবা ভাইবোন এবং ক্লান্তিকর এই দারিদ্র্য না-থাকলে আমি লেখক হ'তে পারতাম না। ওদের মূক অস্তিত্বই আমাকে মুখর করেছে।

১৮

স্বপ্না তিনদিন পর ফিরে এল। একা নয়, অশোক সঙ্গে। স্বপ্নার সিঁথিভরতি সিঁদুর, হাতে বালা, কানে দুল। লাল বেনারসী গায়ে জড়ানো। ওরা দু'জনে বাবাকে প্রণাম করল। মা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমাকে যখন প্রণাম করতে এল আমি অস্ফুটে কি বললাম মনে নেই।

১৯

স্বপ্না বাড়ীতে রয়ে গেল। আমি যা ভেবেছিলাম কিছুই হ'ল না। মা-বাবা আশ্চর্য শান্ত হয়ে গেলেন। স্বপ্নাকে মা'র সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে রান্না করতে, কলতলায় কাপড় কাচতে-কাচতে গল্প করতে দেখলাম। বেশির ভাগ গল্প অশোককে কেন্দ্র করে। অশোক যে খুব সৎ ও উদার যুবক, আজকালকার ফাজিল ছেলেদের মতন নয়, মা অকারণেই আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। অশোক দু'বেলা বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতে সুরু করল। কোনদিন বাজার থেকে মাছ এনে, মিষ্টি এনে, সে ঘরের ছেলে হয়ে গেল। মা বললেন: 'সোনার টুকরো ছেলে।'

২০

অশোক কোনদিন বিনা প্রয়োজনে আমার সঙ্গে কথা বলেছে, মনে পড়ে না। অনেকদিন তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে দেখেছি অশোক আমার সাধনার টেবিলে পা তুলে দিয়ে স্বপ্নার সঙ্গে গল্প করছে। ও পা নামিয়েছে বটে, কিন্তু ওর বা আরও কারুর চেয়ার ছেড়ে দেবার প্রয়োজন বোধ হয় নি। এমন কি স্বপ্নাও যে তার দাদার প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেখাল, মনে হয় নি। আমি বিরক্ত হচ্ছিলাম, কিন্তু কিছু বলতে পারি নি। কারণ আমি দাদা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ, স্বপ্না যদি বলে, 'দাদা আমাদের সহ্য করতে পারে না'. এসব ভেবে আমি গুটিয়ে যাচ্ছিলাম।

২১

আমি বুঝতে পারছিলাম এ সংসারের কেউ নই। রাত্রে একটা তক্তপোশ ছাড়া আমার আর কিছু দরকার নেই। আমি কোনদিনই এ বাড়ীর কিছু ছিলাম না, আজও নেই। আমি কিছু করি নি যার জন্যে আমার ওপর ওদের সকৌতূহল মনোযোগ আকৃষ্ট হ'তে পারে।

স্বপ্না কিছু করেছে। আর, বাড়ীর ছেলের মতন অশোক ক্রমশ হাটবাজারের অধিকার নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। পেটের ছেলেও এমন করে না! সেদিন আমার ছোট ভাইকে জুতো কিনে দিল।

২২

বাবা অন্ধকার বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। আমি যে অন্ধকারে ব'সে আছি বাবা দেখেন নি।

বললেন: 'কে রে?'

বললাম: 'আমি।'

'ঘুম আসছে না?' বাবা অন্ধকারে আমার চুলে হাত রাখলেন, বাবার আঙুলগুলি কি কাঁপছিল? বাবা কথা বলতে পারছিলেন না। এই অন্ধকার আমাদের রক্ষা করছিল। বাবা অনেকক্ষণ পর চাপা গলায় বললেন: 'কলকাতায় যাবি? আমার এক বন্ধু আছে অ্যাডভোকেট, একটা কিছু ব্যবস্থা ক'রে দেবে।'

আশ্চর্য হয়ে বললাম: 'কলকাতায় কেন?'

বাবা আর কথা বললেন না।

বাবা চ'লে গেলে আমি অনেকক্ষণ অন্ধকার বারান্দায় বসে ছিলাম। সে-রাত্রে বাবাকে যেন নতুন ক'রে আবিষ্কার করলাম। বাবা কি করে আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তবে কি বাবার মনের গোপনে কোথাও এমন দুঃখ ছিল, ছিল বৈরাগীর উদাস-করা একতারা!

২৩

আমি মা'র কথাও কোনদিন ভাবতাম। শুনেছি মা'র মনের গড়ন খুব সৌখিন ধরনের। মা এককালে চুলে তেল দিতেন না, রোজ সাবান ঘষতেন। গায়ের রঙ ফরসা, আত্মীয় জনের মধ্যে তাঁর মেমসাহেব নাম প্রচলিত ছিল। মা সেই যুগে হাত-কাটা পেছনে-বোতাম জামা পরতেন। শীতকালে মোজা পরতেন। মা'র এই আদবকায়দা আমরা দেখি নি। শোনা কথার ওপর তর্ক চলে না। হয়ত এর অনেকটাই নিছক প্রচার।

কিন্তু আজকাল মাকে দেখে মনে হয় এই অস্বাভাবিক দারিদ্র্যের ভেতরেও তিনি তাঁর মনের স্বভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এককালে জমিদারি থেকে পাঠানো টাকায় তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখেছেন। এ টাকার পেছনে পরিশ্রম ছিল না, যেন এটা মা'র সুখভোগের জন্যেই উৎসর্গীকৃত। মা'র সুখ-সুবিধাগুলিই বড় কথা,

টাকা যেখান থেকেই আসুক না কেন। মা'র এই অগোছালো বেহিসেবী স্বার্থমগ্নতাই আমাদের পারিবারিক দুঃখের অন্যতম কারণ ব'লে সন্দেহ হয়।

ইদানীং অশোকের মারফৎ যে অনায়াস সুবিধাগুলি তিনি পাচ্ছেন, সেটা তাঁর দাবি ব'লেই মনে করেছেন। অশোকও যেন বিষয়টা বুঝেছে, মাকে জয় করবার জন্যে তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। অশোককে আমার ভাল না-লাগলেও ওর দিক্ থেকে ব্যাপারটা যে আমি বুঝতে চেষ্টা করি নি, তা নয়। ওর নিজের বাড়ী আছে, বিধবা মা আছে, সে-কর্তব্য কি সে সুচারুরূপে পালন করতে পারে? আমার মাকে সে চেনে না। মা'র চাওয়া আর ওর দেওয়া কোনদিন একবিন্দুতে মিলবে না।

২৪

স্বপ্না হাসতে হাসতে বললে, দ্যাখ ত এই ধুতি তোমার পছন্দ কি না।'

ধুতি পরখ করে বললাম: 'বেশ হয়েছে।'

'জানি তোমার পছন্দ হবে। এইটে তোমার জন্যেই কেনা হয়েছে।' স্বপ্না বললে।

'মানে?'

'সকলের জন্যেই কেনা হয়েছে। তোমার জন্যেও হয়েছে।'

'কে কিনেছে, অশোক?'

'হ্যাঁ। আর কে কিনবে?' স্বপ্না স্বামী-গৌরবের হাসি হাসল।

আমি মেজাজ রাখতে পারলাম না। বিশ্রী চিৎকার ক'রে বললাম: 'দ্যাখ্ স্বপ্না, ইয়ার্কির একটা সীমা আছে। অশোককে ব'লে দিস্, ভবিষ্যতে……'

স্বপ্না নাক ফুলিয়ে চোখ লাল ক'রে বললে, 'দাদা, তুমি ভীষণ ছোট হয়ে গেছ। কোনদিন ত হাত খুলে কাউকে কিছু দাও নি—'

আমি উঠে গিয়ে স্বপ্নার গালে চড় মারলাম। 'বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে।'

২৫

আপিস-ফেরত বাড়ীতে পা দিতেই দেখলাম মা'র ঘরে জরুরী সভা বসেছে। অশোক, স্বপ্না, মা। সম্ভবত মা-ই সভানেত্রী। বাবার অনুপস্থিতিতে বোঝা গেল তিনি খারিজ-সভ্য।

আমার পা শব্দে সভা নিস্তব্ধ হ'ল। আমি নিঃশব্দে পাশের ঘরে সেঁধোলাম। মাথা ব্যথা করছে, চোখ জ্বালা। আমার কি জ্বর হয়েছে? গা-জোড়া ক্লান্তি।

জানলার বাইরে পশ্চিম আকাশের সূর্যাস্ত-রঙিন ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। করুণ বিয়োগ-ব্যথার মতন। আমি যেন শৈশবকালের নিঃসঙ্গ দুঃখে পতিত হয়েছি।

একটু পরে মাকে আমার ঘরে পায়ে-পায়ে আসতে দেখলাম।

'সুমন—'

'মা।' আমি কতদিন মা'র মুখের দিকে চেয়ে দেখি নি। মা'র মুখ আমি ভুলে গেছি। মা'র মুখ অনেকদিন পরে দেখলাম। আশ্চর্য, মা'র মুখে এত ভাঙনের চিহ্নগুলি কবে ফুটে উঠল। মা'র সামনের দু-একটি চুলে রূপোলী ঝিলিক। মা'র কটা চোখের মণি কেমন ঘোলাটে হয়ে গেছে। আমি কি মাকে ভালবাসি। 'মা—'

'অশোক তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়। তুই কি…'

'না। মা।'

'আচ্ছা।' মা ধীরপায়ে চ'লে গেলেন।

মা চলে যেতে আমি দুঃখ পেলাম। আর, আমার পুনরায় মনে হ'ল মাকে আমি ভালবাসি। মাকে না-ভালবেসে পারা যায় না।

২৬

রাত্রি নামছিল। জানলার বাইরে ঝাঁকড়া গাছটা চিত্রার্পিত। আকাশে মেঘ ছিল। আমি মূঢ়ের মতন ব'সে ছিলাম। যেন যুগ যুগ ধ'রে আমি ওইভাবে ব'সে রয়েছি। আমার চেতনা প্রস্তরীভূত হয়ে আসছিল। আর একবার দুর্মর একাকিত্ব বোঝার মতন আমাকে আবৃত করে ফেলল।

দূরে থানার ঘড়ি থেকে রাত নটার আওয়াজ ভেসে এল। আমি কোনদিন থানায় যাই নি, মনে হ'ল।

আমি কিছু ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। ভাবনাগুলো মাথার ভেতরে ভারি পাথরের মতন নিরেট হয়ে রয়েছে।

দরজায় কার ছায়া পড়ল।

আমি চমকে উঠলাম। অতর্কিত আক্রমণে মানুষ যেমন চমকে ওঠে।

কুঁজো হয়ে বাবা ঘরে ঢুকলেন। বিষণ্ণ, উদ্‌ভ্রান্ত। আর, দীর্ণ।

বাবা বললেন, 'উঠে এস।'

আমি জামা গায়ে দিয়ে বাবার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

দরজার সামনে রিকশ দাঁড়িয়ে। বাবা আমাকে টেনে তুললেন। রাত্রির বাতাসে রিকশ নির্জন রাস্তায় উড়ে চলল।

ষ্টেশন।

আমরা প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ালাম।

ট্রেণ এল।

বাবা জামার পকেট থেকে ট্রেণের টিকিট আমার হাতে দিলেন। অন্য পকেট থেকে দশটাকার চারখানা নোট।

'এই চিঠিটা রাখ। সদাশিবকে দিও। সে নিশ্চয় তোমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবে।' বাবা বললেন।

আমি অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

বাবা আমাকে গাড়িতে তুলে দিলেন।

যতক্ষণ ট্রেণ দাঁড়িয়ে ছিল বাবা দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি দেখলাম বাবা জামার হাতায় একবার তাঁর চোখ মুছলেন।

রবীন্দ্রনাথের ভগ্নহৃদয় গ্রন্থ ও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পদাবলীর রসমাধুর্য রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে কিশোর বয়স থেকেই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বলরামদাস প্রভৃতি পদকর্তাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। ব্রজবুলির ভাব, ভাষা ও ছন্দ কবিকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। কবির বয়স যখন ১৬ বৎসর, তখন তিনি 'ভারতী'তে সাতটি পদ প্রকাশ করেন; পরে কয়েক বছরের মধ্যে তিনি আরও তেরটি পদ লেখেন। এইভাবে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীরচনা সম্পূর্ণ হয় কবির পঞ্চবিংশতি বয়ঃক্রমকালে।

রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব কবিতার প্রতি অনুরাগের আর একটি নিদর্শন হচ্ছে তাঁর সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী' নামে পদসঙ্কলন গ্রন্থ। পদরত্নাবলী প্রকাশিত হয় ১২৯২ সালে। এক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১২৯১ সালের ৮ই বৈশাখ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা সামান্য কয়েক বছরের বড় এই বধূটি দেবরকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতেন। কবিগুরুর জননী সারদাদেবীর মৃত্যুর পর কাদম্বরী দেবী একাধারে শিশুদের মাতৃস্থান ও বন্ধুস্থান পূরণ করে রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের বিকাশের সহায়তা যেমন এসেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ প্রেরণায়, তেমনি কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্রনাথের সুকুমার চিত্তবৃত্তির সূক্ষ্ম অনুভাবগুলি উদ্বোধিত করেছিলেন অফুরন্ত স্নেহ বিলিয়ে। ইনি ছিলেন তরুণ কবির সাহিত্যরসমাধুর্যের যেমন উপভোক্তা, তেমনই সমালোচক। নব নব প্রেরণায় ইনি কবিচিত্তকে নূতন ভাবরসে প্রাণবন্ত ক'রে তুলতেন। কাব্যসৃষ্টি প্রেরণার এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অকালমৃত্যুতে কবির চিত্তে আসে দারুণ আঘাত। শোকাচ্ছন্ন মনকে শান্তিরসে সিঞ্চিত করবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে পদাবলীরস-সমুদ্রে নিমজ্জিত রাখেন ব'লে মনে হয়। এ অনুমান সত্য হ'লে নিশ্চয়ই মনে করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ শুধু কাব্যরস-আস্বাদনের জন্যই পদাবলীরসসাগরে নিমগ্ন হন নি; পার্থিব বস্তুর বাইরে যে রহস্য আছে তাও অনুসন্ধানের জন্য পদাবলী-অধ্যয়নে নিরত হন। সেই সত্যদর্শনে তাঁর শোকক্লিষ্ট চিত্ত শান্তি লাভ করবে, এই ছিল কবির উদ্দেশ্য। পদাবলীর রসাস্বাদনকালে হয়ত তাঁর মনে হয়েছিল যে, বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ রত্নগুলি তিনি চয়ন করে একত্র করবেন এবং সেইগুলির দর্শন ও অনুভাবনে শোকতপ্ত মনকে শীতল করতে পারবেন। পদগুলি সংকলন করে কবিগুরু যথার্থ ই তাদের রত্নের কোঠায় ফেলেছিলেন ব'লে নাম দিয়েছেন 'পদরত্নাবলী।'

বৈষ্ণব কবিতা যে রবীন্দ্রনাথকে কতখানি মুগ্ধ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর লিখিত এক চিঠিতে। ১৩১৭ সালের ২০শে আষাঢ়ের এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'আমার বয়স যখন তের-চোদ্দ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেছি; তার ছন্দ, রস, ভাষা সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্পষ্ট অস্ফুট রকমের বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশলাভ করেছিলাম।' (দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রজীবনী, পৃষ্ঠা ৬১, পরিবর্ধিত সংস্করণ)। বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের সত্য দর্শন ক'রে নানা রচনার মধ্যে তিনি তা প্রকাশ করে গেছেন। 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের (রচনাকাল ১৩১৩) 'শুভক্ষণ' ও 'ত্যাগ' কবিতাদ্বয় এর অন্যতম নিদর্শন। 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের 'শুভক্ষণ' কবিতায় পাওয়া যায়—

ওগো মা,
রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে
রহিব বলো কি মতে।
বলে দে আমায় কি করিব সাজ,
কি ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে
কোন্ বরণের বাস।
মাগো কি হ'ল তোমার, অবাক নয়নে
মুখপানে কেন চাস।
আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়ন কোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে,
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ,
যাবে সে সুদূর পুরে,
শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন্ মাঠ হতে
বাজিবে ব্যাকুল সুরে।
তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখ পথে,

শুধু সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ
রহিব বলো কি মতে

উদ্ধৃত কবিতাটিতে বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। বহু সাধনার পর চির-আকাঙ্ক্ষিত দয়িত যখন গৃহসম্মুখে আসেন, তখন বস্তুজগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও দেবময় হয়ে সেই চির-সুন্দরকেই ত দেখতে হয়!

উক্ত কাব্যগ্রন্থের 'ত্যাগ' কবিতায় কবিগুরু আবার বলেছেন,—

ওগো মা,
রাজার দুলাল চলি গেল মোর
ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়ন থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে,
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধুলার পরে।
মাগো কি হ'ল তোমার, অবাক নয়নে
চাহিস কিসের তরে!
মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কি দিলেম কারে জানে না সে কেউ—
ধুলায় রহিল ঢাকা।
তবু রাজার দুলাল চলি গেল মোর
ঘরের সমুখপথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বলো কি মতে।

যে প্রেমরাজ্যের রাজপুত্রকে এতদিন ধরে কন্যা মানসপূজা ক'রে আসছিল, তারই আগমনে এবং তারই উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হৃদয়-মণিহার তুচ্ছ পার্থিব বস্তুমাত্র নয়। এর মধ্যে বিশিষ্ট প্রেমভক্তিদীপের প্রোজ্জ্বল শিখাই দেদীপ্যমান।

খেয়া কাব্যগ্রন্থের উক্ত কবিতাদ্বয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট পরকীয়া প্রেমের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার নিদর্শন রয়েছে কবির রচিত 'ভগ্নহৃদয়' নামে গীতিকাব্যে। ভগ্নহৃদয় প্রকাশিত হয় ১৮০৩ শকাব্দে (১৮৮১ খ্রীঃ)। তখন কবির বয়স ২০ বৎসর। এত অল্প বয়সেও পদাবলী-নিহিত মূল তত্ত্বকথার আভাস রয়েছে এই গ্রন্থটিতে। গ্রন্থে পাত্রপাত্রীর উল্লেখ আছে; কিন্তু নাটক বলা হয় নি। এর কারণস্বরূপ কবি ভূমিকায় বলেছেন, 'এই কাব্যটিকে কেউ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যে দৃষ্টান্ত স্বরূপেই ফুলের উল্লেখ করা হইল।' গীতি-কাব্যের প্রধান নায়ক কবি, আর নায়িকা কবির বাল্যসখী মুরলা। নলিনী এক চপল-স্বভাবা কুমারী সকলের হৃদয় নিয়ে খেলা করে; কবিও তার বিলাসবিভ্রমে চঞ্চল। মুরলা কবিকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে; কিন্তু কবি তা জানতে পারেন নি। ললিতা নামে সরলা বালিকাকে ভালবেসে গ্রহণ করেছে মুরলার ভাই অনিল; কিন্তু ললিতার প্রেম আবেগময় বা উচ্ছ্বাসপূর্ণ নয়। এই প্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত,অথচ সুগভীর এবং অব্যক্ত। অনিল এই বিশুদ্ধ প্রেমের নাগাল না পেয়ে দূরে স'রে যায় এবং নলিনীর চটকে ভোলে। শেষে মুরলা ও ললিতা উভয়েই অন্তর্দাহে মরণের পথে পা দেয়। মুরলাকে যখন কবি বুঝতে পারলেন তখন সে মৃত্যুপথযাত্রী; সেই যাত্রায় তাদের মালা বদল হ'ল, আর মৃতকল্প ললিতার কাছে এসে ধরা দিল অনিল।

ভগ্নহৃদয়-এ উল্লিখিত প্রেম বৈষ্ণবোক্ত পরকীয়া প্রেম থেকে স্বরূপতঃ ভিন্ন; কারণ উভয়তঃ এই প্রেম বরাবর অব্যক্ত। নারী তার দয়িতকে মনে-প্রাণে ভালবাসলেও সে এ ভালবাসা মুখে কখনও প্রকাশ করে নি। গীতিকাব্যের নারীচরিত্র মুরলা ও ললিতার মধ্যে তা সুপ্রকট। মুরলা অন্তর দিয়ে কবিকে ভালবাসে কিন্তু এ-ভালবাসা সে কারোর কাছে প্রকাশ করতে পারে না। নির্জনে আপনহারা হয়ে মুরলা ব'সে থাকে। যেথানে জনপ্রাণী নাই, যে স্থান অতি নির্জন সেখানে ছুটে যায় মুরলা। সখী চপলা মুরলাকে খুঁজে খুঁজে সারা হয়ে শেষে তাকে দেখতে পায় অন্ধকার বনানীতে। এই নির্জন স্থানে সখীকে একলা ব'সে থাকতে দেখে চপলা জিজ্ঞাসা করে—

সখি, তুই হলি কি আপনা-হারা?
এ ভীষণ বনে পশি একেলা আছিস বসি
খুঁজে খুঁজে হোয়েছি যে সারা!
এমন আঁধার ঠাঁই জনপ্রাণী কেহ নাই,
জটিল মস্তক বট চারিদিকে ঝুঁকি।
অন্ধকার, চারিদিক হতে, মুখপানে
এমন তাকায়ে রয় বুকে বড় লাগে ভয়,
কি সাহসে রয়েছিস বসিয়া এখানে?

রাধিকারও এই দশা দেখতে পাই পদাবলীতে। নব-অনুরাগিণী রাধা কৃষ্ণপ্রেমে আপনহারা হয়ে বিরলে ব'সে থাকেন; তিনি এমনই কৃষ্ণময় যে, কারোর কথা পর্যন্ত তাঁর

কানে পৌঁছায় না। আহার-বিহারে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। কৃষ্ণরূপ-দর্শনের আশায় তিনি মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকেন, কখনও বা ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠদেশ নিরীক্ষণ করছেন। কবি চণ্ডীদাসের পদে রাধিকার পূর্বরাগের এই চিত্রটি সমুজ্জ্বল—

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥

ভগ্নহৃদয়-এর নায়িকা মুরলাও সখীর প্রশ্নে অনুরূপ উত্তর দিয়েছে—

বুকের ভিতরে গিয়া কি যে উঠে উথলিয়া
বুঝায়ে বলিতে তাহা পারি না সজনি!
যা সখি, একটু মোরে রেখে দে একেলা।

রাধিকা ও মুরলা উভয়েরই দশা এক।

মুরলার এই অবস্থা দেখে সখী চপলার বড় কষ্ট হয়; সে সখীকে বনমাঝে একলা রেখে যেতে চায় না। সখীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, যদি সে পুরুষ হ'ত তবে—

সারাদিন তোরে রাখিতাম ধরে
বেঁধে রাখিতাম হিয়ে
একটুকু হাসি কিনিতাম তোর
শতেক চুম্বন দিয়ে।

শুধু সখীর মুখে হাসি ফুটিয়েই চপলা ক্ষান্ত হ'ত না; সে অমিয়া-মাখানো মুরলার মুখখানি বুকের মধ্যে রেখে অনিমেষ লোচনে চেয়ে থাকত সারাক্ষণ। এই ভাবে দুঃখ ক'রে শেষে চপলা সখীর হাত দু'টি ধ'রে জিজ্ঞাসা করল—

সখি, কার তুমি ভালবাসা-তরে
ভাবিছ অমন দিনরাত ধরে,
পায়ে পড়ি তব খুলে বল তাহা
কি হবে রাখিয়া ঢাকি?

সখীর এই প্রশ্নে মুরলা হৃদয়াবেগ আর ধারণ করতে না পেরে বলে ওঠে—

ক্ষমা কর মোরে সখী, শুধায়ো না আর
মরমে লুকানো থাক মরমের ভার।
যে গোপনকথা সখি সতত লুকায়ে রাখি
ইষ্টদেব মন্ত্রসম পূজি অনিবার
তাহা মানুষের কানে ঢালিতে যে লাগে প্রাণে
লুকানো থাক তা সখি, হৃদয়ে আমার!
ভালবাসি, শুধায়ো না কারে ভালবাসি!
সে নাম কেমনে সখি, কহিব প্রকাশি!
আমি তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছ সে নাম যে অতি উচ্চ
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার!
ক্ষুদ্র ঐ কুসুমটি পৃথিবী কাননে
আকাশের তারকারে পূজে মনে মনে
দিন দিন পূজা করি শুকায়ে পড়ে সে ঝরি
আজন্ম নীরব প্রেমে যায় প্রাণ তার
তেমতি পূজিয়া তারে এ প্রাণ যাইবে হারে
তবুও লুকানো রবে একথা আমার!

মুরলার এই কথায় সখীর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে অজানা আশঙ্কায়; সেই প্রণয়াস্পদের নামটি শুধু চপলা জানতে চায় সখীর মঙ্গলের জন্য; সেই নাম রসনার সাধের খেলনার মত। উলটে-পালটে সেই নাম নিয়ে রসনা কতই না খেলা করতে চায়। তাই চপলা সখীকে মিনতি করে বলে—

নাম যদি তার বলিস, তা হ'লে
তোরে আমি অবিরাম
শুনাব তাহারি নাম—
গানের মাঝারে সে নাম গাথিয়া
সদা গাব সেই গান!
রজনী হইলে সেই গান গেয়ে
ঘুম পাড়াইব তোরে,
প্রভাত হইলে সেই গান তুই
শুনিবি ঘুমের ঘোরে!
ফুলের মালায় কুসুম-আখরে
লিখি দিব সেই নাম
গলায় পরিবি, মাথায় পরিবি
তাহারি বলয় কাঁকন করিবি
হৃদয়-উপরে যতনে ধরিবি
নামের কুসুমদাম!

চপলার মুখনিঃসৃত এই নাম-মাহাত্ম্য বর্ণনা সম্পূর্ণ বৈষ্ণব-প্রভাব-জাত। পদকর্তা দ্বিজ চণ্ডীদাসের অনুরূপ একটি বিখ্যাত পদ রয়েছে এই নাম-মাহাত্ম্য বিষয়ে। রাধিকার কৃষ্ণদর্শন তখনও হয় নি, শুধু নাম শুনেছেন, তিনি এবং তাতেই তিনি উন্মাদিনী প্রায়। সখীকে উদ্দেশ করে রাধিকা বলেছেন—

সখি কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

'ভগ্নহৃদয়'-এ চপলার উক্তিতে যে নাম-মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে, তার উপর যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে দ্বিজ চণ্ডীদাসের এই পদটির।

মুরলা ও চপলার কথাবার্তার সময় হঠাৎ সেই বনে মুরলার প্রেমাস্পদ কবির আবির্ভাব হ'ল। তিনি ভাবনা-বিহ্বলা মুরলাকে দেখতে পেলেন বনদেবীর মত। কবি জানতে চাইলেন, মুরলা কি প্রকৃতির কাছে উদার ভাষা শিখছে বা তটিনীর কলধ্বনিতে কোন ছন্দের আভাস পেয়েছে! পরে কবি চপলাকে বললেন, সখি, মুরলাকে বনদেবীর মত সাজিয়ে দাও; তার এলোমেলো কেশপাশ সপুষ্প লতা দিয়ে বেঁধে দাও; তার বস্ত্রাঞ্চল গেঁথে দাও বন্য পুষ্প দিয়ে; হরিণ-শিশু নির্ভয়ে সখীর পদতল আশ্রয় ক'রে পরম নিশ্চিন্ত হোক, আর সবিস্ময়ে সুকুমার গ্রীবাটি বাঁকিয়ে অবাক্ নয়নে তার দিকে চেয়ে থাক; আর—

আমি হয়ে ভাবে ভোর   দেখিব মুখানি তোর
কল্পনার ঘুম ঘোর পশিবে পরাণে।
ভাবিব, সত্যই হবে   বনদেবী আসি তবে
অধিষ্ঠান হইলেন কবির নয়ানে।

কবি ও মুরলার পরস্পরের প্রতি এই অনুরাগ বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবধারা থেকে গৃহীত। পরকীয়া প্রেমের যে কি জ্বালা তা যেমন রাধিকায় প্রকাশ, তেমনি ভগ্নহৃদয়ের নায়িকা মুরলাও সে দহন বুঝতে পেরেছে কবিকে ভালবেসে। পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের পরস্পর ভালবাসা উভয়ের নিকট বিদিত কিন্তু ভগ্নহৃদয়-এ কবি ও মুরলার প্রেম সুগভীর হলেও পরস্পরের নিকট অব্যক্ত। সুতরাং এদের প্রেম অধিকতর জ্বালাময়। তাই কবি যখন জিজ্ঞাসা করলেন মুরলাকে—

প্রণয়বারির তরে তৃষায় আকুল
ম্রিয়মাণ হয়ে বুঝি পড়েছে সে ফুল?
পেয়েছ কি যুবা কোন মনের মতন?

নিজের প্রণয়াস্পদের মুখে এই কথা শুনে মুরলার হৃদয় হাহাকার ক'রে বলে—

বুঝিলে না বুঝিলে না কবি গো এখনো
বুঝিলে না এ প্রাণের কথা
দেবতা গো বল দাও এ হৃদয়ে বল দাও
পারি যেন লুকাতে এ ব্যথা।

কবি যে মুরলার প্রেম বুঝতে পারেন না, তার কারণস্বরূপ মুরলা মনে করে যে, কবি তাকে এতটুকুও ভালবাসে না। এই অভিমানে মুরলাও তার হৃদয় বেদনা প্রকাশ না ক'রে বলে—

তবে থাক, থাক সব, বুকে থাক গাঁথা
বুক যদি ফেটে যায়—ভেঙে যায়—চুরে যায়
তবু রবে লুকানো এ কথা।
দেবতা গো বল দাও—এ হৃদয়ে বল দাও
পারি যেন লুকাতে এ ব্যথা।

বৈষ্ণবোক্ত পরকীয়া প্রেম রবীন্দ্রনাথ দূর থেকে অবলোকন করেছেন; অথচ প্রেমের গভীরতা যে বাধার মধ্য দিয়েই সুপ্রকট তা তাঁর অগোচর নয়। তাই তিনি পরকীয়া প্রেমের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য সেই প্রেম নায়ক নায়িকার মধ্যে অব্যক্ত রেখেছেন। এতে প্রেমের বিশুদ্ধিতাও রক্ষিত হয়েছে, আবার তা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে পরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। পরস্পরের ভালবাসা জানতে পেরে কবি ও মুরলা যদি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হ'ত, তবে সে প্রেমের গাম্ভীর্য হ'ত লুপ্ত। বাধার মধ্যেই যে প্রকৃত সুখোদয় তা তাতে হ'ত না। কবি নলিনীকে ভালবাসেন—এ কথা কবির মুখ থেকে শুনেও কবির প্রতি মুরলার প্রেম বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। বরং মুরলা কবির উদ্দেশে বলেছে—

অন্তর্যামী দেবতা গো, শুন একবার,
যদি আমি ভালবাসি কবিরে আমার
কবি যেন সুখী হয়, নলিনী সে সুখে রয়—
সখারে আমার আমি ভালবাসি যত
নলিনীবালাও যেন ভালবাসে তত!
নলিনীবালার যত আছে দুখজ্বালা
সব যেন মোর হয়, সুখে থাক বালা!
তবে চলিলাম কবি, আমি চলিলাম—
মুরলা করিছে এই বিদায় প্রণাম!

মুরলার এই মনোবেদনার প্রায় অনুরূপ ভাব পাওয়া যায় মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবি কবিশেখরের 'গোপাল বিজয়ে।' কৃষ্ণবিরহখিন্না রাধিকা কৃষ্ণের উদ্দেশে বলছেন—

মোর নামে কভু জবে মেলে আর নারী।
তারে হেন নিঠুর না হইহ মুরারি।
লাখ দোষে কভু তারে না হইবে বাম।
সময়েতো সোঙরিবে হের পরিণাম॥
তাহার যতেক দুখ যত গ্লানিচয়।
সব যেন মোর হয় দূরে যায় ভয়॥

মুরলা প্রান্তর দিয়ে চলেছে সন্ন্যাসিনী বেশে। পূর্ব স্মৃতি তার ভেসে ওঠে মনে, আর মন অতিশয় ব্যাকুল হ'লে নিজেই মনকে সান্ত্বনা দেয় এই ব'লে—

যার কেহ নাই তার সব আছে,
সমস্ত জগৎ মুক্ত তার কাছে—
তারি তরে উঠে রবি শশী তারা
তারি তরে ফুটে কুসুম গাছে।
একটি যাহার নাইক আলয়
সমস্ত জগৎ তাহারি ঘর
একটি যাহার নাই সখা সখী
কেহই তাহার নহেক পর!

হৃদয়ের সর্বস্ব ধন অন্যকে দিয়ে মুরলা এখন রিক্ত অথচ মুক্ত। জনহীন প্রান্তর এখন তার কাছে নূতন ভাবে দেখা দিয়েছে। এখানে কেউ কাউকে আদর করে না, কেউ কারোর কাছে ভালবাসা পায় না; এখানে সুখ-দুঃখের বালাই নেই। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন চ'লে যাচ্ছে নীরব চরণে। পূর্বে যে-জগতে মুরলা বাস করত, সেখানে ছিল কারও দুঃখ, আবার কারোর বা সুখরাশি কিন্তু এখন যে জগতে সে আছে, সেখানে—

সকলেই চায় সকলের মুখে,
শুধায় না কেহো কথা—
নাইক আলয়, চলেছে সকলে
মন যার যায় যেথা।

মুরলার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে; মৃত্যুর ছায়া সে দেখতে পায় অদূরে। এমন সময় তার মনে পড়ে কবির কথা, সখী চপলার কথা; আবার হাহাকার করতে থাকে তার মন। কবি হয়ত এতক্ষণ এসেছেন; কিন্তু তাঁর জন্য বাতায়নে ত কেউ অপেক্ষা করছে না। তাঁর পদ-শব্দ শুনে কেউ ত দ্রুত দ্বার খুলে দিচ্ছে না! তাঁর জন্য কেউ ত মালা গাঁথছে না। হয়ত কবি ম্রিয়মাণ হয়ে ব'সে আছেন, কথা বলার কেউ নাই। হয়ত অভাগা মুরলার জন্য তাঁর হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠেছে। এই সব ভাবনা মুরলাকে আকুল ক'রে তোলে। সে নিজেকে ব'লে ওঠে—

'হা নিষ্ঠুর মুরলা রে, কেন ছেড়ে এলি তাঁরে
নিতান্ত একেলা ফেলি কবিরে আমার—
হয়ত রে তোর তরে প্রাণ কাঁদে তার!
বড় স্বার্থপর তুই, নয় দুঃখে তোর
কাঁদিয়া কাটিয়া হত এ জীবন ভোর!

কিন্তু হঠাৎ সন্ন্যাসিনী মুরলার সম্বিৎ ফিরে আসে। এ-সমস্ত চিন্তা তার কাছে আবার স্বপ্নময় মনে হয়। সে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে বলে—

কোথা কবি? কোন্ কবি? কে গো সে তোমার?
মাঝে মাঝে দেখিস রে একি স্বপ্ন মিছে!
স্বপনের অশ্রুজল ত্বরা ফেল মুছে!

মুরলা বুঝতে পারে তার জীবনের দিন ফুরিয়ে এসেছে; মৃত্যু তার ক্রোড়দেশ প্রসারিত ক'রে আছে মুরলার জন্য। মুরলা স্পষ্ট অনুভব করে—

এ সংসারে কেহ যদি তোরে ভালবাসে
সে কেবল ঐ মৃত্যু—ঐ রে আকাশে!
গুরুভার রক্তহীন হিমহস্তে তার
আলিঙ্গন করেছে সে হৃদয় তোমার!
হে মরণ! প্রিয়তম—স্বামী গো, জীবন মম
কবে আমাদের সেই সম্মিলন হবে?
জীবনের মৃত্যুশয্যা তেয়াগিব কবে?

ভাগ্য টেনে নিয়ে আসে কবিকে মুরলার কাছে জীবন-সায়াহ্নে। মৃত্যুপথযাত্রী মুরলাকে দেখে কবির মন হাহাকার ক'রে ওঠে; এই সময় কবি আর সহ্য করতে না পেরে উচ্ছসিত হয়ে বলেন—

কি করেছি এত তুই হলি যে কঠোর?
প্রাণ মোর, মন মোর, হৃদয়ের ধন মোর,
সমস্ত হৃদয় মোর, জগৎ আমার—
একবার বল্ বালা, বল্ একবার
ছাড়িয়ে যাবিনে মোরে ফেলি এ সংসার-ঘোরে
নিতান্ত এ হৃদয়েরে রাখি অসহায়।
আয় সখি, বুকে থাক্, এই হেথা মাথা রাখ,
হৃদয়ের রক্ত ফেটে বাহিরিতে চায়।
মুরলা, এ বুক তুই ত্যজিস না আর—
চিরদিন থাক্, সখি, হৃদয়ে আমার!

মুরলার মরু মন শীতল হয়ে যায় কবির প্রেমবারি-বর্ষণে। মুরলা বলে, সে অতি স্বার্থপর অতি নিষ্ঠুর, নইলে তার কবিকে সে ত্যাগ করে এসেছে! এমন স্নেহময় কবির হৃদয়কেও সে আঘাত করতে পারে! একবার ত সে কবির হৃদয়ের কথা ভাবে নি। সে কেবল নিজের ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। মুরলা আর থাকতে না পেরে কবিকে বলে—

মার্জনা করিও এই অপরাধ তার,
কবি মোর, শেষ ভিক্ষা এই মুরলার!
এমন দুর্বল হৃদি, এত নীচ, হীন,
এমন পাষাণে গড়া, এতই সে দীন,
এ যে চিরকাল ধরে ছিল তব কাছে
এ অপরাধের, কবি, মার্জনা কি আছে?
সখা, অপরাধ সারা অস্তিত্ব তাহার
মরণে করিবে আজি প্রায়শ্চিত্ত তার!......
ছি ছি সখা, কেঁদো নাকো মুরলার কথা রাখো
ও মুখে দেখিতে নারি অশ্রু-বারিধার।

কবিও তাঁর হৃদয় খুলে দিলেন। যে প্রেমবারি এতদিন সংগোপনে ছিল তা আজ সহস্রধারায় প্রবাহিত হ'ল; কবি বাষ্পারুদ্ধকণ্ঠে ব'লে উঠলেন—

এত দিন এত কাছে ছিনু এক ঠাঁই,
মিলনের অবসর মোরা পাই নাই।
কে জানিত ভাগ্যে, সখি, ঘটিবে এমন
মরণের উপকূলে হইবে মিলন!

কবির এই কথায় মুরলার সুখের পরিসীমা রইল না;

সে আর মরতে চায় না ; এই মরণের দিন যদি ফুরিয়ে না যায়, যদি মরতে মরতেও বেঁচে থাকা যায়, সেই প্রার্থনাই এখন মুরলার। প্রিয়তম কবিকে মুরলা বখন বলে যে সে এখন পরম সুখে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে ; কবি যেন তার মুখে একটু জল দেন। কবি বললেন, সখি, আজ সত্যই আমাদের বিবাহ—

দারুণ বিরহ ঐ আসিবার আগে, সই
অনন্ত মিলন হোক এই দুজনের !
আকাশেতে শত তারা চাহিয়া নিমেষহারা,
উহারা অনন্ত সাক্ষী রবে বিবাহের !
আজি এই দু'টি প্রাণ হইল অভেদ,
মরণে সে জীবনের হবে না বিচ্ছেদ
হোক তবে, হোক সখি, বিবাহ সুখের—
চিতায় বাসরশয্যা হোক আমাদের !

মুরলা ফুল তুলে আনতে বলল ; সেই ফুলরাশিতে চিতাশয্যা আকুল হয়ে উঠবে : বিশেষ ক'রে রজনীগন্ধার মালার প্রয়োজন জানিয়ে মুরলা বলল—

রজনীগন্ধার মালা গাথ গো ত্বরায়,
সে মালা বদল করি দিও এ গলায়—
সেই মালা পরে আমি তোমার সম্মুখে, স্বামি,
করিব শয়ন সুখে সুখের চিতায়
সেই মালা পরে যেন দগ্ধ হয় কায় !

মুরলার সুখের তুলনা নেই ; সে আশাও করে নি যে শেষ সময়ে কবিকে স্বামী ব'লে চিরবিদায় নিতে পারবে। শেষ দিনে বিধাতা যে তার কপালে এত সুখ লিখেছেন তা তার কাছে স্বপ্নাতীত। তাই মুরলা কবিকে বলল—

আরও কাছে এস কবি, আরও কাছে মোর—
রাখ হাত দু'খানি হাতের উপর।
কবি গো, স্বপ্নেও আমি ভাবি নাই কভু
শেষ দিনে এত সুখ হবে মোর প্রভু !
এখনো এল না ফুল ! সখা গো আমার,
বড় যে হতেছি শ্রান্ত, পারি নে যে আর !

মুরলার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে ; এমন সময় ফুল ও রজনীগন্ধার মালা পাওয়া গেলে মুরলা কবিকে বলল—

ঐ যে এসেছে মালা—কবি গো ত্বরায়
পরায়ে দাও গো তাহা এ মোর গলায়।
এই লও হাত মোর রাখ তব হাতে—
ছেলেবেলা হ'তে মোরে কত দয়া স্নেহ করে
রেখেছ এ হাত ধরি তব সাথে সাথে
আবার মোদের যবে হইবে মিলন
এ হাত আমার, কবি, করিও গ্রহণ—
যেথা যাবে সেথা রব, দুই জনে এক হব,
অনন্ত বাঁধনে রবে অনন্ত জীবন !

কবি মুরলার গলায় মালা পরিয়ে এবং তাকে ফুলসাজে সাজিয়ে বললেন—

বিবাহ মোদের আজ হ'ল এই তবে,
ফুল যেথা না শুকায় সদা ফুটে শোভা পায়
সেথায় আরেক দিন ফুলশয্যা হবে !

মৃত্যুর ঘোর কপাল ছায়া নেমে এল মুরলার চোখে ; কবিকে অতি নিবিড়ভাবে কাছে নিয়ে মুরলা শেষ প্রার্থনা জানাল—

আজ তবে বিদায়, বিদায় !
স্বামি, প্রভু, কবি, সখা, আবার হইবে দেখা
আজ তবে বিদায় বিদায় !

গীতিকাব্যের প্রধান নারীচরিত্র মুরলা ব্যতীত ললিতা নামে অন্যতম নারীচরিত্রের কথা পূর্বে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হয়েছে। ললিতার বিষয় একটু স্বতন্ত্র। সে অনিল নামে এক যুবককে বিবাহ করেছে কিন্তু ভালবাসা রেখেছে অব্যক্ত। এইখানে মুরলার সঙ্গে তার ঐক্য। মুরলা ও ললিতা উভয়েই তাদের দয়িতকে ভালবাসে কিন্তু কবি বা অনিল তা বুঝতে পারে নি। ফলে, গীতিকাব্যের নলিনী নামে অপর এক চঞ্চলা নারীর রূপমোহে প'ড়ে কবি ও অনিল উভয়েই বিভ্রান্ত। নলিনীর স্বভাব হ'ল অন্যের হৃদয় নিয়ে খেলা। শেষে তাকেও অনুতপ্ত হ'তে হয় ; অর্থাৎ যারা তাকে ভালবাসত, তারা ধীরে ধীরে দূরে স'রে যায়। শেষে নলিনী আক্ষেপ ক'রে বলেছে—

হা অদৃষ্ট ! কাল মোরে হেরিয়া যে জন
নলিনী নলিনী ব'লে হত অচেতন,
নিমেষ ভুলিত আঁখি, পুরিত না আশ—
আমার সৌন্দর্যরাশি করিত যে গ্রাস,
মোর রাঙ্গা চরণের ধূলি হইবার
হৃদয়ের একমাত্র সাধ ছিল যার,
ধূলিতে যে পদচিহ্ন করিত চুম্বন,
মুখ ফিরাইয়া আজ গেল সেই জন !

এই ভাবটি বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাসের নিম্নোক্ত পদে পাওয়া যায়—

একলা যাইতে যমুনাঘাটে
পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে
প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান,
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ।
লোকে দেখিলে কি বলিবে মোরে।
নাশা পরশিয়া রহিলুঁ দূরে ;

হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দদাস।

উপরি-উক্ত আলোচনায় দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' গীতিকাব্যখানির উপর বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব বিদ্যমান। বৈষ্ণব পদাবলীতে পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্তিত হ'লেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিকাব্যে পরকীয়া প্রেমের যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন, তা বৈষ্ণবোক্ত পরকীয়া প্রেমের অনুরূপ হ'লেও স্বতন্ত্রতাবিশিষ্ট। রাধাকৃষ্ণ উভয়ে উভয়কে ভালবাসে। এই ভালবাসার মধ্যে পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলন ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়; পক্ষান্তরে 'ভগ্নহৃদয়' এ এ-সমস্ত রস-পর্যায় থাকলেও প্রধান চরিত্র কবি ও মুরলার মধ্যে কার্যতঃ মিলন সংঘটিত হয় নি; কিন্তু অপ্রধান চরিত্র অনিল ও ললিতার পরিশেষে মিলন হয়েছে দীর্ঘ বিরহ-শেষে রাধাকৃষ্ণের মিলনের অনুরূপেই। রাধার প্রণয় লাভান্তে কৃষ্ণ মথুরায় চ'লে গিয়ে এবং অন্যাসক্ত হয়ে দীর্ঘকাল রাধাকে ভুলে থাকলে রাধা প্রাণ বিসর্জনে কৃতসংকল্পা হন; দূতী তার এই অবস্থার কথা মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণকে জানালেই কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ফিরে আসেন এবং রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন হয়। (দ্রষ্টব্য: বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'গোপাল বিজয়')। অনিল ও ললিতার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ললিতার অকৃত্রিম নীরব প্রেম বুঝতে না পেরে অনিল নলিনীর রূপমোহে পড়ে; কিন্তু শেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে ললিতারই পাশে এসে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ দুই জনের যে মিলন দেখিয়েছেন তার কারণ আছে। অনিল ও ললিতা বিবাহিত; মুহূর্তের ভ্রমবশতঃ তাদের মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ হয়েছিল; কিন্তু ভুল সংশোধনের পর তাদের মধ্যে মিলনের আর বাধা রইল না এবং সমাজনীতিও এখানে লঙ্ঘিত হয় নি। পক্ষান্তরে কবি ও মুরলার মিলন ঘটান নি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কারণবশতঃ। পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য অস্বীকার না করলেও রবীন্দ্রনাথ সমাজের রীতি ও আদর্শকে কখনও ত্যাগ করেন নি। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে বিশুদ্ধিতা থাকলেও সমাজনীতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তার প্রশ্রয় দেন নি, মনে হয়। সুতরাং সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে কবি ও মুরলার মিলন-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ চিন্তা করেছেন। অসংযম কামনা ও রূপে যে-মোহ আনে তা কল্যাণকে সৃষ্টি করে না। শকুন্তলার প্রতি দুর্বাশার অভিশাপ এবং কুমারসম্ভবের মদনভস্ম এই সত্যকে প্রমাণিত করে। তবে মৃত্যুশয্যায় যে কবি ও মুরলার মিলন দেখা যায়, তা নিতান্তই পারত্রিক; মরজগতে এ-ব্যবস্থার অবকাশ রবীন্দ্রনাথ রাখেন নি। এ-ক্ষেত্রে যেমন অকৃত্রিম বিশুদ্ধ প্রেম রক্ষিত হয়েছে, তেমনই সমাজনীতিও আদর্শচ্যুত হয় নি। এই কারণেই বলা হয়েছে, 'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থে যে-প্রেমের অভিব্যক্তি আছে, তা বিশিষ্ট পরকীয়া প্রেম। পদাবলীর উপজীব্য এই পরকীয়া প্রেমের মর্মকথা মুরলার সখী চপলার মুখেই উক্ত হয়েছে—'বাধা না পাইলে সখি সুখেতে কি সুখ আছে।' সমাজের কঠোর শাসন, মিলনের অনিশ্চয়তা, প্রাকৃতিক বিপদ ইত্যাদি সমস্ত তুচ্ছ বস্তুকে অগ্রাহ্য ক'রে যে প্রেমের জন্য আকৃতি, সেই পরকীয়া প্রেমের মহিমা যে কি গভীরতর, তা রবীন্দ্রনাথ উনিশ বৎসর বয়সেই বুঝতে পেরেছিলেন এবং তারই সাক্ষ্য বহন করছে 'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থটি।

হারানো ছবি

শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল

ছুটির দিনে নতুন ছোট ষ্টাণ্ডার্ড গাড়ীখানা নিয়ে সুজিত বেরিয়ে পড়েছে। পাশে স্ত্রী, নীলিমা। কালো মসৃণ পীচের রাস্তা অজগরের মত পড়ে আছে—কখনও সোজা, কখনও বাঁকা। রাস্তার দু'পাশে আমগাছের সারি। কলকাতা থেকে প্রায় বিশ মাইল তারা চ'লে এসেছে।

সবেমাত্র আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। পাখীরা গাছে ব'সেই গান সুরু করেছে। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ আহার-অন্বেষণে বেরিয়ে গিয়েছে। দূরে সবুজ ধানের ক্ষেতের উপর দিয়ে পূবদিকের আকাশটাকে রাঙিয়ে দিয়ে প্রভাত সূর্য উঁকি মারছে।

গাড়িটায় ব্রেক কষে সুজিত ডাকল নীলিমাকে, দেখ, খোলা মাঠে সূর্যোদয়ের কি অপূর্ব দৃশ্য! ব'লে সুজিত পিছনের 'সিট'-এর উপর খাবারের ঝুড়িটার দিকে এবং চায়ের ফ্লাস্কটার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। নীলিমা বুঝল। চা ঢেলে, বিস্কুটের টিন খুলতেই, সুজিত চীৎকার করে উঠল—ও কি! রাস্তার ধারে নালায় জল, তার মধ্যে একখানা মোটর সাইকেল উল্টে আছে। সুজিত ও নীলিমা ছুটে গেল।

আরোহী প'ড়ে আছে কাৎ হয়ে, খানিকটা জলে, খানিকটা কচুরি-পানার উপরে। মাথাটা পড়েছে এমন জায়গায়—যেখানে একটা প্রকাণ্ড আমগাছের শিকড় নেমে গিয়েছে। মাথায় রক্তের চাপ—হুঁস নেই।

কখন পড়েছে, কি ভাবে পড়েছে কেউ জানে না।

দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। একখানা বাসও এসে পড়ল। বাসখানা যাচ্ছিল কাঁচড়াপাড়ার দিকে। যাত্রীদের মধ্যে ছিল আমডাঙ্গা থানার একজন এ, এস, আই ও একজন সিপাই।

এ, এস, আই-এর জিম্মায় মোটর-সাইকেলখানা রেখে সুজিত আর নীলিমা মুমূর্ষু লোকটাকে নিয়ে সোজা আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছুটল! সেখানে ওর বড়দা আর-এম-ও।

লোকটাকে পিছনের সিটে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। জ্ঞান হয় নি—হবে কি না কে জানে! নীলিমা তার বুক-পকেট থেকে ছোট একটা ডায়রী বের করলে—তাতে নাম লেখা আছে সুনীল রায় এম. বি. বি. এস. ঠিকানা কল্যাণী। বয়েস মনে হয় তিরিশের ঘরে।

সুজিত এসেই তার বড়দাকে পেয়ে গেল। ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে নেওয়া হয়েছে। তাঁরা পরীক্ষা করে বললেন, ভয়ের কারণ নেই, মাথায় চোট্ লেগেছে, একটা এক্স-রে করা হবে।

এক্স-রে ক'রে ধরা পড়ল, বুকের দু'খানা পাঁজরা ভেঙ্গে গিয়েছে।

চিকিৎসা চলল। এক সপ্তাহ কেটে গেলে রুগী অনেকটা সুস্থও হ'ল। সুজিত আর নীলিমা রোজই আসে। সুনীল সবই শুনল। শুনে সুজিত আর নীলিমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মনে ভ'রে উঠল।

ডাক্তার বলেছে, সম্পূর্ণ সুস্থ হ'তে তিনমাস লাগবে। রুগী এখনও দুর্বল। সুজিতকে তার খুব ভাল লেগেছে —বিশেষ করে তার মুখের 'ভাই' সম্বোধনটি। সুনীল হাসে। বলে, ভাগ্যিস্ দুর্ঘটনাটা হ'ল, তাই ত নতুন দাদা-বৌদি পেলাম।

সেদিন বৌদির সঙ্গে এসেছে একটি নতুন মেয়ে। বৌদির মুখেই শুনল, তার নাম চিত্রলেখা—সুজিতের বোন। লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের হোষ্টেলে থাকে, তিন বছরের বি. এ. ডিগ্রী কোর্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী —দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়েছে।

কিন্তু মেয়েটি বড় গম্ভীর। দর্শনের ছাত্রী ব'লেই বোধহয় নির্লিপ্ত। সুনীল শুয়ে আছে অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখে। নীলিমা ডাকল, ঠাকুরপো!

হাসিমুখে উঠতে চেষ্টা করল সুনীল। বৌদি ধমকে উঠতে আবার শুয়ে পড়ল একটু হেসে।

কেবিনের দরজার পাশে দাদার কাছে দাঁড়িয়েছিল চিত্রলেখা। পশ্চিমের জানলা দিয়ে পড়ন্ত সূর্যের কিরণ এসে পড়েছে চিত্রলেখার মুখে। সুনীল তাকিয়ে আছে সেইদিকে। চোখের পলক আর পড়ে না। বৌদির চোখ পড়তে লজ্জা পেল সুনীল। বৌদি হেসে ডাকলেন, ছবি, শুনে যা।

—ছবি!

—হাঁ, ওকে আমরা ছবি ব'লেই ডাকি।

ছবি কাছে এল। সুনীল পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে চাইল। মেয়েটির চোখে চোখ পড়ল। চোখ বারে বারেই পড়ে,

আবার নামিয়ে নেয়। সুনীলও নামায়, ছবিও নামায়। কেন এমন হয়?

আমরা হাজার হাজার লোক দেখি, সুন্দর লোকও দেখি, কুৎসিত লোকও দেখি,—ভাল লোকও দেখি, মন্দ লোকও দেখি—কত লোকই ত দেখি। তবু কেন এমন হয়—হঠাৎ-দেখা একজনের চিত্র যেন লেখা হয়ে যায় মনে, সে সুন্দর হ'তে পারে, নাও পারে। আর চিত্রলেখা? চিত্রকরের হাতে-আঁকা চিত্র নয়; খুঁত বের করা যায় অনায়াসে। নাক তিলফুলের মত নয়, চোখ পটল-চেরা নয়, রং দুধে-আলতা নয়। তবু ওর শ্যামলা মুখে সুনীল যেন কি দেখল—যার জন্যে সুনীলের মনে চিত্রলেখা দাগ কাটল।

ওরা চ'লে গেল ৬টার ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে। রাত দশটা। হাসপাতালে তখন নিশীথ-রাত্রি।

বড় ঘড়িটার কাঁটা ঘুরছে—বারান্দায় আলো জ্বলছে—কেবিনের আলো নিবিয়ে দিলেও, খোলা দরজা দিয়ে খানিকটা আলো এসে পড়ছে বিছানার উপরে। পাখা ঘুরছে।

প্রথম দিকে দু-তিন দিন ঘুমের ওষুধ দিয়ে যেত নার্স। সুনীল ঘুমিয়ে পড়ত। আজ ক'দিন থেকে ঘুমের ওষুধের আর দরকার হয় না।

কিন্তু সেদিন যেন কেন সুনীলের চোখে ঘুম এল না। মনে জাগছে অজানা মেয়ের সলজ্জ হাসি, আর অমন সকৌতুকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া। আর মনে জাগছে চোখের নীচে সেই তিলটি। যেন ইচ্ছে ক'রে বসান হয়েছে—যেন ও নইলে তাকে মানায় না।

নার্স একবার দু'বার ক'রে কয়েকবার ঘুরে গেল। রাত তখন সাড়ে এগারটা। সুনীলকে ঘুমুতে না দেখে, নার্স একটা বড়ি খাইয়ে দিয়ে চ'লে গেল।

চোখ বুজে আসছে। সুনীলের চোখের পাতায় জড়িয়ে আছে—চিত্রলেখার আকাশী রঙের শাড়ী...... তার ঘন-কালো চুলের বেণী...... তার মুখ ...... তার হাসি...আর তার নাছোড়বান্দা চোখের নীচে সেই বড় তিলটি। তারপর কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরে নার্স ঢুকতেই জেগে ওঠে সুনীল। তাকাতেই ভেসে ওঠে আবার একজোড়া সলজ্জ চোখ আর চোখের নীচের তিলটি।

নার্স জিজ্ঞাসা করে, ঘুম হ'ল?

সুনীলের সংক্ষিপ্ত উত্তর, হ্যাঁ।

সুনীলের বাবা নেই। মা থাকেন জলপাইগুড়িতে তাঁর বড় ছেলে অনিলের কাছে। অনিল সেখানকার কলেজের অধ্যাপক। সুনীলের খবর তাঁদেরকে জানানো হয়েছে।

আর কিছুদিন পরের কথা। সুনীলকে নিয়ে এসেছে সুজিত তার নিজের বাড়ীতে। দোতলায় সুজিতদের চারখানা ঘর। দক্ষিণ-পূর্বের খোলা ঘরখানা দেওয়া হয়েছে সুনীলকে। তারই পাশের ঘরে থাকে সুজিত ও নীলিমা। একখানা বসবার ঘর। আর একখানা আছে চিত্রলেখার জন্যে যখন সে বাড়ী আসে।

সুনীলের চোখ এসে অবধি যেন কাকে খুঁজছে—মুখে কিছু বলতেও পারে না। সর্বদাই অন্যমনস্ক। চা খেতে অনেকটা সময় লাগে। টোষ্ট ও দুধের গ্লাস প'ড়ে আছে। বৌদি পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করল, কাকে খুঁজছ? খাবারে মাছি পড়বে যে? দেয়ালে ছবি নেই। তোমার দাদা ইঞ্জিনীয়ার—সাহেব মানুষ, ছবি রাখেন না।

শনিবারে ছবি হোষ্টেল থেকে এল। দেখা হ'ল, কিন্তু তেমনি নির্লিপ্তভাব।

ইতিমধ্যে সুনীলের মা ও দাদা এসে পড়েছেন। পুজোর ছুটির সঙ্গে আরও দু'সপ্তাহের ছুটি বাড়িয়ে নিয়েছে অনিল।

মা ছবিকে দেখে চমকে উঠলেন। বললেন, এটি কে?

সুনীল জানায়, সুজিতদা'র বোন।

ছবি এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে ঘরে ঢুকল।—মাসীমা, আপনার সরবৎ এনেছি। ব'লে, সুনীলের মাকে সে প্রণাম করল।

মাসীমা চিবুক ধ'রে তাকে আদর করলেন। বললেন, তোমার নাম কি মা?

—ছবি।

ছবি! মা'র চোখ ঝাপসা হয়ে এল। সতের বছর আগের আর-এক ছবিকে মনে পড়ল তাঁর। তার নামও ছিল ছবি। সুনীলের বয়স তখন এগার। তিন বছরের ছবি খেলতে বেরিয়ে গেল, আর ফিরল না। তার হাতে ছিল সোনার বালা, গলায় সরু হার। পরণে ছিল সবুজ ফ্রক। আজ সে বেঁচে থাকলে এই ছবির মতই হ'ত। মাও চেয়ে থাকেন ছবির দিকে—চোখ ফেরাতে পারেন না।

ছুটি শেষ হয়ে গেল। সুনীলের মা ও দাদা জলপাইগুড়ি ফিরে গেলেন। আর সুনীল কল্যাণী থেকে বদলী হয়ে এল বারাসতে নতুন সরকারী হাসপাতালে।

বারাসত কলকাতা থেকে বেশী দূরে নয়। নীলিমারা কয়েকবারই সুনীলের বাসায় এসেছে। দর্শনের ছাত্রীরও দর্শন পেয়েছে সুনীল, কিন্তু সেই নির্লিপ্ত--ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

কিন্তু ঘটনা ঘটনাকে তৈরী করে। মেয়েটির জীবনেও ঘটল এক প্রমাদ। সেদিন হাসপাতালের ডিউটি সেরে সুনীল বাড়ী আসবে, ফোন এল বৌদির কাছ থেকে—ছবি য়্যাকৃসিডেন্ট হয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

মেডিক্যাল কলেজের ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে ছবি। পথে বাস য়্যাকৃসিডেন্ট হয়ে মাথায় চোট লেগেছে—মাথা ফেটে ও হাতের একটি শিরা কেটে গিয়ে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। এখন রক্ত দেওয়ার প্রযোজন।

সুনীলকে বাঁচিয়েছে সুজিত। এ সময় তারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে। বললে, আমি রক্ত দেব।

সুনীলের রক্ত পরীক্ষা করে, ডা: চ্যাটার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, রোগী আপনার কে? Blood যে same group-এর।

যাই হোক, রক্ত দেওয়ার দু'সপ্তাহ পরে ডাক্তারের মুখে হাসি ফুটল। বললেন, She is now out of danger।

'আউট অফ্ ডেঞ্জার, আউট অফ্ ডেঞ্জার।' সুনীল যেন হাতে স্বর্গ পেল। ছবি কিন্তু আজ আর তার দিকে চেয়ে চোখ ফেরায় নি। বরং ঠোঁটে লেগে ছিল মিষ্টি একটা হাসি।

ছবি শুনেছে সুনীল তাকে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছে। সুনীলও জানে, আজকের ছবি—সম্পূর্ণ তারই।

সেদিন নীলিমা এসেও দু'জনের চোখের পরিবর্ত্তন দেখে গেল।

সুজিত শুনে বলে, ভালই ত—দু'টিতে মানাবে বেশ।

ছবি ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠছে। বসতে অবশ্য এখনও পারে নি। সুনীল আসে-যায়। এই আসা-যাওয়ার মধ্যের ফাঁকটুকুকে ছবি আজকাল আর সহ্য করতে পারছে না! মনে হয়, এটুকু না থাকলেই ভাল ছিল।

খবর পেয়ে মা চ'লে এলেন কলকাতায়। দিনকতক পরে ছবিকে ও মাকে নিয়ে সুনীল বারাসতে চ'লে এল। নীলিমা আসে মাঝে মাঝে। নীলিমার মুখে মাও শুনলেন ওদের দু'জনের মনের অবস্থা।

ছবি সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠেছে। মা ব'সে ব'সে ছবির চুলের জট ছাড়াচ্ছেন। সামনের চুল সরাতেই তিনি চীৎকার করে উঠলেন: ওরে, এই ত আমার হারানো ছবি! এই যে মাথার সেই কাটা দাগ! চোখের নীচে কালো তিল দেখে তখনই চিনেছিলাম।—এ কি ভুলবার! মা ছবিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

সুনীল পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। শুধু মনে পড়ছে ডাক্তারের সেই কথা—Blood যে same group-এর।

সুজিত স্বীকার করেছে—ছবিকে সে কুড়িয়ে পেয়েছিল।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

রাজা রামমোহন রায়

ভারত সরকার রামমোহনের কথা হঠাৎ মনে করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য একটি স্মারক ডাক টিকিট অবশেষে বাহির করিলেন। বলা বাহুল্য ইহার পূর্ব্বে বহু খ্যাত-অখ্যাত, এমন কি টম-ডিক-হ্যারির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ভারত সরকার ডাক টিকিট প্রকাশ করিয়াছেন। বিলম্ব হইলেও বাঙ্গালী রামমোহনের কথা যে ভারত সরকারের মনে পড়িয়াছে ইহার জন্য পশ্চিমবঙ্গ-নামক কলোনীর বাঙ্গালী-নামক প্রায়-অবলুপ্ত একটা জাতি একটু গৌরব বোধ করিতে চেষ্টা করিবে। ভারত সরকারকে ধন্যবাদ!

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা এখানে বলা যাইতে পারে। বোধ হয় ১৯৫১ সনে বিলাতে ব্রিষ্টল নামক শহরে রামমোহন মেমোরিয়ালে রামমোহনের একটি বৃহৎ তৈলচিত্র রক্ষিত আছে। মেমোরিয়ালের সম্পাদক ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে ঐ বিশেষ তৈল-চিত্রটি দিল্লীতে ভারতের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের চিত্র-গ্যালারিতে স্থান দিবার জন্য পত্রে অনুরোধ জানান। বারবার তাগিদ দেওয়ার পর বোধ হয় ১৯৫৮ সালে নেহরু পত্রলেখককে জবাব দেন যে দিল্লীর ঐ চিত্র-গ্যালারিতে একান্ত স্থানাভাব—কারণ রামমোহন অপেক্ষা বহুগুণে এবং সর্ব্ববিষয়ে মহত্তর ভারতীয় মহাজনদের চিত্রে গ্যালারী পূর্ণ—কাজেই রামমোহনের চিত্রের 'পুনর্ব্বাসন' এদেশে সম্ভব হয় নাই। মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক একদা বর্ণিত পিগ্‌মী (pigmy) রামমোহনের চিত্রটি বিদেশেই পড়িয়া রহিল!

কিন্তু রামমোহনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধায় যখন ডাক টিকিট প্রকাশিত হইবে ঠিক সেই সময় সংবাদে প্রকাশ যে—পশ্চিমবঙ্গে এই যুগমানবের অমর স্মৃতিগুলি সরকার এবং সেইসঙ্গে সর্ব্বসাধারণের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অবহেলিত অবস্থায় অবলুপ্তির পথে চলিয়াছে। এমন কি উনিশ শতকে বাঙ্গালীর জীবন-প্রভাতে বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী এবং পীঠস্থান আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের পবিত্র বাসভবনটিও মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে অবাঙ্গালীর নিকট হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর তথা ভারতীয় মাত্রেই তীর্থস্থান-স্বরূপ এই পবিত্র বাসভবনটি রক্ষা করিবার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা নাই—মাথাব্যথার কথা ত দূরের কথা। এই বিষয়ে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত "সুনন্দ"র জর্নালে যে মন্তব্য করা হইয়াছে তাহার কিছু অংশ উদ্ধৃত করিলাম। তাহার পূর্ব্বে একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। রাজ্য সরকার (ডাঃ বিধান রায়ের আমলে) লালগোলা, বেলেঘাটা, রাজাবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে স্থিত কতকগুলি রাজবাটি ক্রয় করিতে, অর্থাৎ ঐ সকল জমিদারীর মালিকদের আর্থিক সহায়তা দানের জন্য, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে কোন প্রকার কার্পণ্য এবং আলস্য দেখান নাই। কিন্তু রামমোহন (বিদ্যাসাগরও কিঞ্চিৎ পরিমাণে) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃপা-দৃষ্টি হইতে কেন বঞ্চিত হইলেন বলিতে পারি না। বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে অবস্থিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসভবনটিও আজ একজন (বোধ হয়) অবাঙ্গালীর দখলে।

এইবার দেখুন 'সুনন্দ' তাঁহার জর্নালে কি বলিয়াছেন:

"আমি অনুমান করি, বাঙালী মাত্রেই রামমোহন রায় নামে একটি ব্যক্তির কথা অবগত আছেন। এঁকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ভারত-পথিক'—বলেছেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রেরণাই হলেন রামমোহন। দেশ-বিদেশের মনীষী এবং পণ্ডিতবৃন্দ এই রামমোহন রায়কেই 'নব-ভারতের স্রষ্টা' ব'লে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইউরোপেও এক সময় তাঁর মনস্বিতা এবং কর্ম্মশক্তির প্রভূত খ্যাতি ছিল বলে জানা যায়।

"উত্তর কলকাতাকে যাঁরা কিঞ্চিৎ চেনেন, তাঁরা জানেন, উক্ত ভদ্র-সন্তানের নামাঙ্কিত দু'টি ভদ্রাসন

এখনও এই অঞ্চলে বিদ্যমান। একটি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে—সেখানে এখন আঞ্চলিক আরক্ষার একটি প্রধান ঘাঁটি। এক দিক থেকে তা ভালই, রামমোহনের স্মৃতি পুলিশের পাহারায় সংরক্ষিত রয়েছে—এর চেয়ে আনন্দ-সংবাদ আর কি হ'তে পারে? অথবা এই মহামানবের দ্বারা আরক্ষা-বাহিনী প্রতিদিন অনুপ্রাণিত হচ্ছেন, এমন অনুমানেও আমরা নিশ্চয়ই পুলকিত বোধ করব।

"কিন্তু আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বাড়ীটি সম্পর্কে।

"শেষ পর্য্যন্ত এই বাড়ীতেই রামমোহন রায় বসবাস করতেন, এইখানেই বারবার কলকাতার এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পদধূলি পড়েছে। এই বাড়ীতে থেকেই তিনি 'সতী বিল' পাশ করিয়েছিলেন—এখান থেকেই জীবনযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেবার জন্যে ইউরোপের পথে তাঁর অন্তিম যাত্রা। সন্দেহ নেই, যাঁরা আজও রামমোহন রায়কে শ্রদ্ধা করেন (মোট ক'জন করেন আমার সঠিক জানা নেই), তাঁদের পক্ষে বাড়ীটি জাতীয় জীবনের মহাতীর্থ।

"তবু যে দু'-একজন শ্রদ্ধান্বিতের খবর পাই, তাঁরা কেউ কেউ এই বাড়ীতে প্রবেশাধিকার চেয়েছিলেন কিছুক্ষণের জন্যে। অসৎ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়—মহামানবের কিছু স্মরণ চিহ্ন দেখে তাঁরা চরিতার্থ হবেন। কিন্তু যতদূর শুনেছি—নিষিদ্ধ দুর্গের মত এই বাড়ীতে প্রায় কাউকেই সে অনুমতি দেওয়া হয় নি। গৃহস্বামী সাক্ষাতে বিমুখ, কোন আলাপ-আলোচনায় বীতরাগ। এই বিশাল প্রাসাদ তার সুউচ্চ প্রাচীরগুলো নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যক্ষপুরীর মত অবরুদ্ধ, শ্মশানের মত নিঃশব্দ। শুধু দিনের পর দিন তার গায়ে কালের ছাপ পড়ছে।

"সম্প্রতি আর একটি সংবাদ এল, এক খবরের কাগজের নোটিশ মারফৎ। কিছু অ-বাঙ্গালী পুরুষ-মহিলা যৌথভাবে এই বাড়ীটি কিনে নিয়েছেন। রামমোহনের বংশধর, বর্ত্তমান প্রাচীন উত্তরাধিকারী যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন এই বাড়ীর দখল তাঁরা নেবেন না, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে ক্রেতারা সম্পূর্ণভাবে বাড়ীটির মালিক হবেন - তখন আর কারোরই এর ওপর কোন স্বত্ব-স্বামিত্ব থাকবে না।

"বলবার কিছুই নেই, আইনের জোরেই সম্পত্তি হস্তান্তরিত হবে; যে-ঘরে বসে রামমোহন রায়—ডেভিড হেয়ার-ডাফ-দ্বারকানাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন, সেই ঘরে ভাগ্যবান্ ব্যবসায়ী গদি বিছিয়ে লাভ-লোকসানের হিসেব করবেন; বাগানের যে বেদীতে বসে ধ্যানমগ্ন রামমোহন অন্তরে সত্যের জ্যোতি উপলব্ধি করেছেন, সেটি ভেঙে ফেলে সেখানে হয়ত বা লোহা-লক্কড়ের গুদাম তৈরি করা হবে।

"না—আইনত বলবার কিছুই নেই।

"আমার স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মশাইকে মনে পড়ছে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীকে নতুন অর্থবানদের গ্রাস থেকে রক্ষা করবার নেতৃত্ব তিনিই নিয়েছিলেন। কিন্তু আজ আর তিনি বেঁচে নেই। সুতরাং 'নব-ভারতের স্রষ্টা'র অসামান্য ঐতিহাসিক গৌরবজড়িত তীর্থপ্রতিম এই বাড়ীটি আইনঘটিত পরিণামই লাভ করবে। আর এই সময় বাঙ্গালী পুলকিত চিত্তে সাহিত্য সম্মেলন ডাকবে, সাংস্কৃতিক উৎসব পালন করবে, রবীন্দ্র জন্মোৎসবের জন্যে চাঁদা আদায় করবে, মনীষী-স্মরণের আয়োজন করবে, ট্রামে-বাসে যে-কোন বাংলা উপন্যাস পড়তে পড়তে তন্দ্রামগ্ন হবে এবং সংস্কৃতিপরায়ণতার আত্মস্তবে পরমোল্লাসে ময়ূরের মত পেখম মেলবে!

"অ্যাসেম্বলিতে দেশের নেতারা অগ্নিময় ভাষণ দিতে থাকবেন—তাতে কখনও কখনও রামমোহনের নজির তোলা হবে; অধ্যাপকেরা সাহিত্য ও সমাজ সাধনায় রামমোহনের অবদান নিয়ে মোটা মোটা বই লিখবেন—কেউ কেউ ডক্টরেটও লাভ করবেন। রবীন্দ্রপুরস্কার এবং অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের পক্ষপাতিত্ব আলোচনা করে বাঙ্গালী সাহিত্যিকেরা চিত্তবিকারে দগ্ধ হবেন। আর 'দারুভূতো মুরারি' পশ্চিমবঙ্গ সরকার দার্শনিক ঔদাসীন্যে অবলীন হয়ে বসে থাকবে; কারণ, আইনত সম্পত্তি হস্তান্তরিত হ'লে কারোই কিছু বলবার থাকে না।

"পৃথিবীর অন্য দেশ হ'লে কি হ'ত, সে প্রসঙ্গ অবান্তর। আমার শুধু মনে হচ্ছে, সংস্কৃতিসেবক বাঙ্গালী জাতির গঙ্গাযাত্রার আর বিলম্ব কত?"

সংবাদপত্র হইতে জানা গেল যে অতি সম্প্রতি এই ঐতিহাসিক বাড়ীটি হস্তান্তরিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এই বাড়ী শ্রীশচীন্দ্রমোহন রায়ের নিকট হইতে কয়েকজন অবাঙ্গালী ক্রয় করিয়াছেন এবং গত ১৭ই জুন দলিল রেজেষ্ট্রি হইয়াছে। সর্ত্ত অনুসারে শ্রীশচীন্দ্রমোহন রায়ের পিতা কুমার ধরণীমোহন রায় এই বাড়ীটিতে জীবনস্বত্বের অধিকারী হইয়া থাকিবেন। অর্থাৎ তিনি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন ততদিন তিনি ব্যক্তিগতভাবে বাড়ীটি ভোগদখল করিতে

পারিবেন। কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে এই ক্রেতারা রামমোহনের ঐতিহাসিক বাসভবনটির মালিক হইবেন।

রাজা রামমোহন ১৭৩৬ শকে অর্থাৎ ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস সুরু করেন। এ সম্পর্কে ১৭৮৭ শকের অগ্রহায়ণের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে জনৈক লেখক মন্তব্য করেন—"রামমোহন রায় যে-সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।"

রামমোহন কলিকাতায় প্রথম যে বাড়ীটিতে বাস করেন, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডের সেই বাড়ীটিতে আজ উত্তর কলিকাতার উপ-নগরপালের কার্য্যালয়। দেওয়ালে একটিমাত্র ট্যাবলেট ছাড়া এই বাড়ীটিকেও চিনিবার আজ আর কোন উপায় নাই।

এ-দেশ হইতে বিগতকালের প্রকৃত মহামানবদের, স্বর্গত সে-সব বাঙালী মহাপুরুষদের জন্য বাঙালী গৌরব বোধ করিতে পারে, সেই সকল মানুষদের স্মৃতি যত শীঘ্র দেশের লোক বিস্মৃত হইবে, বর্ত্তমান রাষ্ট্র এবং জননেতাদের পক্ষে ততই মঙ্গল। আদর্শ, নীতিভ্রষ্ট দেশে আদর্শ-মহামানবদের স্মৃতি অবশ্যই অপ্রয়োজনীয়!

ভারতপথিক রামমোহন

বাংলায় যে নবযুগের সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে, তাহার অগ্রনায়ক রাজা রামমোহন রায়। কিন্তু কেবলমাত্র বাঙলা দেশ এবং বাঙালী জাতিই নহে, সমগ্র ভারত এবং ভারতবাসী মাত্রেই রামমোহনের নিকট ঋণী। সমাজসংস্কার, শিক্ষা, লোককল্যাণ, হিন্দু-ধর্ম্মকে তাহার প্রকৃত স্থান পুনঃস্থাপন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই রামমোহনের দান তথা কীর্ত্তি—অনন্যসাধারণ, অতুলনীয়। দেশের সেই গভীর তমসাবৃত যুগে তিনি উদার এবং মুক্ত -বুদ্ধি ও যুক্তির প্রদীপ জ্বালাইয়া দেশ ও জাতিকে নূতন পথের সহিত নূতন জীবনের সন্ধান দান করেন। কিন্তু পরম আশ্চর্য্যের বিষয়ঃ

......"এই যে, দেশের পক্ষ হইতে সেই মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষার কোনও যোগ্য ব্যবস্থা আজও করা হয় নাই। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য অবশ্য স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা হইতেছে; কিন্তু, বলাই বাহুল্য, রামমোহনের স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে এই ধরনের একটা মামুলী ব্যবস্থা করিয়াই জাতির কর্ত্তব্য ফুরাইয়া যাইতে পারে না। রাজা রামমোহনের কীর্ত্তিই অবশ্য তাঁহার শ্রেষ্ঠ স্মারক; কিন্তু দেশ তাই বলিয়া নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবে কেন? খুবই শোভন হইত, সরকার যদি আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে রাজা রামমোহনের বাসভবনটিকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতেন। এই ভবনটি অতীত দিনের বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী; এটিকে কেন্দ্র করিয়া রামমোহনের জীবনসাধনা ও আদর্শ সম্পর্কে চর্চ্চা ও গবেষণার একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া কিছু কঠিন ছিল না। কিংবা, বাড়ীটিকে রক্ষা করিয়া, লোকহিতকর অন্য কোনও কাজেও এটিকে ব্যবহার করা চলিত। কিন্তু সেই ন্যূনতম কর্ত্তব্যেও গাফিলতি হইয়াছে, এবং বাড়ীটি ইতিমধ্যে হস্তান্তরিত হইয়াছে। দেশ জাতি ও সরকারের পক্ষে ইহা গভীর লজ্জার বিষয়। মনে হয়, সরকার যদি উদ্যোগী হন, তবে বাড়ীটিকে এখনও রক্ষা করা যাইতে পারে। সে-ব্যবস্থা অবিলম্বে করা দরকার। খানাকুলের রাধানগরে রাজা রামমোহনের পৈতৃক বাসস্থানে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার যে প্রস্তাব সরকারের তরফ হইতে করা হইয়াছিল, তাহাও নাকি ধামাচাপা পড়িয়া আছে। ইহার চাইতে গভীর পরিতাপের কথা আর কি হইতে পারে! জাতি যে আত্মবিস্মৃত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। নহিলে যাঁহাদের কাছে জাতির ঋণ অপরিশোধ্য, এবং দুই হাত দিয়া জাতি একদিন যে-সব মহাপুরুষের দান গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষা ব্যবস্থায় এত বড় ঔদাসীন্য কিছুতেই দেখা দিতে পারিত না।"

বলিতে পারি না আনন্দবাজার পত্রিকার উপরি-উক্ত আবেদনে দেশের এবং দেশ-নায়কদের চিত্তে কোন রেখাপাত করিবে কি না। আমাদের এ-বিষয় সন্দেহ গভীর। বিশেষ করিয়া যখন দেখি—অদ্যকার ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার যাঁহাদের হাতে, তাঁহারা মহাত্মা গান্ধী এবং জবাহরলাল নেহরু ছাড়া ভারতের অন্য কাহাকেও আজ আর দেখিতে পাইতেছেন না। বলা বাহুল্য আমরা মহাত্মাজী এবং নেহরুকে খাটো করিবার জন্য একথা বলিতেছি না—তাঁহাদের অবদান অতুলনীয়। কিন্তু এই দুই জনই ভারতের একমাত্র মূলধন এবং ইঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে পারিলে দেশ এবং জাতি সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির চরমে উঠিবে—এ-কথাও স্বীকার কিংবা বিশ্বাস করি না। ভারতের বিশেষ এক সন্ধিকালে গান্ধীর আবির্ভাব ঘটে এবং সেই কালের প্রয়োজনে তিনি তাঁহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিশ্বাসমত সাধন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে তাঁহার নির্দ্দেশিত দেশও জাতি-গঠন-মূলক সব পন্থাগুলি অনুসরণের সার্থকতা আছে কি না বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, গান্ধী ছিলেন বহু

বিষয়ে অতীব গোঁড়া এবং পুরাতন পন্থী ও যে-আদর্শ এবং নীতি নিজ জীবনে সার্থক করেন, তাহার সমগ্র দেশ এবং জাতির পক্ষে পালন করা অসম্ভব এবং তাহার সার্থকতাও আছে বলিয়া মনে করি না। বিশেষ করিয়া গান্ধীজীর অর্থনৈতিক মতবাদ এ-যুগে আদর্শ হিসাবে মূল্যবান্ হইলেও বাস্তবে কার্য্যকর হইতে পারে না। আর নেহরু ছিলেন রাজনৈতিক নেতা, কিন্তু বহু বিষয়ে গান্ধীজী অপেক্ষা উদার, বাস্তব এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং এই জন্যই তিনি গান্ধীর বহু নির্দ্দেশ-উপদেশ অশ্রদ্ধা না করিয়া, অগ্রাহ্য করেন এবং ভারতকে যুগের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার আধুনিক এবং যান্ত্রিক শিল্পে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। জাতি-গঠনে নেহরুর অবদান কি—সে বিচার যথাকালে হইবে। এইটুকু মাত্র বলিতে পারা যায়—জাতিকে যে-ভাবে গঠন করিতে তিনি চাহিয়াছিলেন, তাহা পারেন নাই। তাহার প্রমাণ স্বাধীনতা লাভের ১৮ বৎসর পরেও বর্ত্তমান ভারতের পরম দুর্দ্দশার চিত্র।

ভারতে 'জাতির-জনক' যদি কাহাকেও বলিতে হয়—তবে ইহা রাজা রামমোহন রায় ছাড়া আর কাহাকেও নহে। কিন্তু আত্মবিস্মৃত জাতিকে এ-কথা বলার কোন সার্থকতা নাই। যে-দেশে হিন্দী রাজভাষার সম্মান স্বীকৃতি পায়, সে-দেশে রাজা রামমোহন রায়ের মত মহাপুরুষের স্মৃতির অবলুপ্তি অতীব যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী কি এতই নীচে নামিয়াছে যে, অতল হইতে রামমোহনের মত যুগ-মানবের প্রতি দৃষ্টিদান করা তাহার পক্ষে অসাধ্য? আমাদের রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে, দেশের বর্ত্তমান নৈতিক দুর্দ্দশার দিনে তাঁহার বিশেষ কতকগুলি গুণের জন্য তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে শ্রদ্ধাও আমাদের কম নহে, তাই আশা করি তিনি অন্তত 'সঙ্গদোষ' সত্ত্বেও রামমোহনের প্রতি বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর যে সামান্য কর্ত্তব্য আছে, তাহা অবিলম্বে পালন করিবেন। ইহাতে রামমোহন অনুগৃহীত হইবেন না, হইব আমরা, বাঙ্গালী জাতি।

'সর্ব্বত্র নাই-রাজ্য'!

জলপাইগুড়ির 'জনমতে' প্রকাশ:

জলপাইগুড়ি বাজার হইতে সরিষার তৈল উধাও

"সরিষার তেলের দাম বাড়িতে বাড়িতে বাজার হইতে একদম উধাও। কিছু কিছু ব্যবসায়ী বলিয়াছেন—তাঁহারা ৪ টাকা মূল্যে সরিষার তেল বিক্রয় করিতে পারিবেন না। অধিকাংশ দোকানদার বলিতেছে ৪৲ টাকায় তাঁহারা বিক্রয় করিবেন। তেল নাই একথা ঠিক নয়, তেল আছে এবং প্রচুর আছে। বেশী দাম দিলে বেশী পাওয়া যাইবে। আমরা খবর পাইলাম বেলাকোবা এবং রায়গঞ্জ এলাকায় পাটের গুদাম-গুলিতে প্রচুর পরিমাণে চাউল ও সরিষার তেল মজুত রহিয়াছে। জেলা-সমাহর্ত্তা এবং আরক্ষা বিভাগের কাছে অনুরোধ, তাঁহারা সংবাদটি সত্য কি না একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখুন। বর্ত্তমানে সরকার এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে লড়াই সুরু হইয়াছে। কাজেই সরকারকে তৎপর হইতে হইবে। তাহা না হইলে আমরা সংবাদ পাইয়াছি কয়েকদিনের ভিতর জলপাইগুড়ির জনসাধারণ নিজেরাই ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন এবং তাহার জন্য যদি অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে সরকার দায়ী হইবেন।—"

বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই এই অবস্থা, কিন্তু রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের কেবল মৌখিক হুমকিতে কোন কাজ হইবে কি? কালোবাজারের কর্ত্তারা হুমকির দৌড় কতদূর তাহা ভাল করিয়াই জানে।

বারাসাতের বাজারের আরও অবনতি: চাল তেলের দাম আরও বাড়িল: মাছ নাই, ডিম প্রতিটি পঁচিশ পয়সা: শাক-সবজির দাম অবিশ্বাস্য!

'বারাসাত বার্ত্তা' বলেন:

গত পক্ষকালের মধ্যে বারাসাতের বাজারের আরও অবনতি ঘটিয়াছে। চাউলের দাম এক টাকা কিলো ছিল, উহা বাড়িয়া এক টাকা পঁচিশ পয়সা হইয়াছে। সরিষার তৈলের দাম চার টাকা ছিল, উহার দাম বাড়িয়া চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। মাছের বাজার প্রায় মরুভূমির মত ফাঁকা। সামান্য যেটুকু মাছ আসে উহার দাম চার হইতে ছয় টাকা কিলো। ডিমের দাম বাড়িয়া জোড় পঞ্চাশ পয়সায় উঠিয়াছে। শাক-সবজির দাম পূর্ব্বের তুলনায় বাড়িয়া গিয়াছে। চারিদিকে হতাশার গুঞ্জরন শোনা যাইতেছে। পেট ভর্ত্তি ভাত কাহারও অদৃষ্টে জুটিতেছে না। সমাজ জীবনে মানসিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতা হইতে বহু লোক প্রত্যহ বারাসাত হইতে চাউল ও বাজার সংগ্রহ করিতে আসেন। কলিকাতার ক্রেতাদের আগমনের কারণে বারাসাত বাজারের জিনিষপত্রের দাম বাড়িতেছে বলিয়া কোন কোন মহল অনুমান করেন।"

'দামোদর' বলিতেছেন :

'আর যে ঠাকুর সইতে নারি'

"হাঁ, এবার ষোল-কলা পূর্ণ হইয়াছে। বর্ধমান শহরে আর আটাও পাওয়া যাইতেছে না। ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলি হইতে সপ্তাহে প্রতি পরিবারের কার্ড-পিছু মাত্র দুই কেজি হিসাবে চালানী আটা দেওয়া হইয়াছিল, এ সপ্তাহের সংবাদ, তাহাও সব কার্ডধারী পান নাই। যাহা হউক এক দিক্ দিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বর্দ্ধমানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ খোলা ও কালোবাজারেও যখন আটা মিলিতেছে না, তখন, ছোট-বড় সকল আয়ের পরিবারকে এক লাইনে দাঁড় করিতে বাধ্য করিয়া কংগ্রেসী শাসকগণ দুধের সাধ ঘোলে মিটাইয়া লইলেন। ইহা কে বিশ্বাস করিবে? চাউল গেল, আলু গেল, আটাও যাইতে বসিয়াছে। বাঙ্গালীকে খাদ্যের অভ্যাস পালটাইতে হইবে, ইহাই প্রভুপাদ মুখ্যমন্ত্রীর শ্রীমুখ-নিসৃত বাণী। এবার বোধহয় বলা হইবে আহারের ঐ বদ অভ্যাসটাই ত্যাগ কর। হে চক্রধারী, সেদিন তোমার জন্মাষ্টমী পালন করিলাম—ইহাদের শিরে কি বজ্রাঘাত হইবে না? এখনও কি তুমি চক্র ধারণ করিবে না ঠাকুর?"

ছিঃ ছিঃ একথা ভাবাও পাপ!

সদাচার মহিমা !

বর্দ্ধমানের 'দৃষ্টি'তে কংগ্রেসের সদাচার যে-ভাবে পড়িয়াছে তাহা বহুজনের মনের কথা, 'দৃষ্টি'বলিতেছেন :

"কংগ্রেসে ভুয়া সদস্যের, বিশেষ করিয়া ভুয়া প্রাথমিক সদস্যের অভিযোগ সুপ্রাচীন। নেতৃবৃন্দ মধ্যে মধ্যে এই সমস্যা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সজাগ হইয়া প্রতিকার প্রয়াসী হইতেন। এইরূপ প্রচেষ্টায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস নেতৃবর্গের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। সম্মেলনে নেতাগণ স্ব স্ব প্রদেশের ভুয়া সদস্যের আনুমানিক সংখ্যা দিতেছিলেন। বাংলার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন পরলোকগত কিরণশঙ্কর রায়। বাংলার পক্ষ হইতে কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত তিনি বলেন, বাংলায় ভুয়া সদস্য নাই বলিলেই চলে। বিস্ফারিত নেত্রে বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রশ্ন করেন—'কিরণ, তুমি কি কথা বলিলে?'

"ভুয়া সদস্য বন্ধ করার প্রয়াস হয়। প্রাথমিক সদস্য থাকেন কেবল ভোট দেওয়ার মালিক, প্রার্থী হওয়ার ভোট লওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত হন তিনি। সৃষ্টি হয় সক্রিয় সদস্যপদের।

"ভুয়া সদস্য যায় নাই বরং ক্ষমতার ডাকে বাড়িয়াই গিয়াছে।

"কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য কংগ্রেসে কুলীন। তাঁহারাই কংগ্রেসের সর্ব্বপ্রকার নির্ব্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকারী। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সক্রিয় সদস্যকে ব্যক্তিগত জীবনে কয়েকটি আচরণ-বিধি পালন করিয়া চলিতে হয়, যথা : তিনি খাদি পরিধান করিবেন, পানদোষ-মুক্ত হইবেন, সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি থাকিবে না, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিবেন ইত্যাদি। কিন্তু কমিশন বসাইয়া কংগ্রেস নির্দ্ধারিত আচরণের মানদণ্ড দ্বারা সক্রিয় সদস্যগণের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা প্রণালী মাপিলেই দেখা যাইবে অধিকাংশ স্থলেই কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য ভ্রষ্টাচারদুষ্ট। তাঁহারাই কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে পদ অধিকার ও অলঙ্কৃত করিয়া বসিয়া আছেন।

"কংগ্রেসের যে নিজস্ব নির্ব্বাচন হয়, তাহার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। দপ্তর যাঁহার হাতে, নির্ব্বাচন হইবে তাঁহারই মনোমত; তিনি যে লোককে চাহেন না, তিনি জিতিয়াও দেখেন হারিয়া গিয়াছেন। আপীল আছে, ট্রাইবুন্যাল আছে, কিন্তু কর্ত্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার নাই।

"নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অতি সাম্প্রতিক দিল্লী অধিবেশনে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে পণ্ডিতজীকে মূর্ত্ত কংগ্রেস, মূর্ত্ত ভারত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; আবার এই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই দিল্লী অধিবেশনেই কামরাজ পরিকল্পনা আলোচনা প্রসঙ্গে এই বরেণ্য নেতার উদ্দেশ্যে কটু-কাটব্য (?) করিতেও সদস্যদের শালীনতাবোধে বাধে নাই।

"সদাচার আর কাহাকে বলে?

"কামরাজ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস মানিয়া লইয়াছেন দেশ ও প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করিতেই হইবে। শ্রীনন্দ স্বরাষ্ট্র দপ্তরে আসিলেন, শান্তনম্ কমিটি বসিল, সদাচার সমিতি গঠিত হইল। কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ জানাইয়া দিলেন সদাচার সমিতি কংগ্রেসেরও নয়, সরকারেরও নয়। সদাচারের জন্য সদাচার সমিতির যাঁহাদের নিকট মূল্য ছিল না, ছিল কংগ্রেসী ও সরকারী সংস্থা বলিয়া, তাঁহাদের নিকট ইহা হাস্কা-হইয়া গেল।

"সদাচার সমিতির কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ অগ্রণী হইয়া শ্রীনন্দ ও শ্রীঘোষের মধ্যে বুঝা-পড়ার ব্যবস্থা করিতেছেন।

কংগ্রেসে সবই সম্ভব।"

'দৃষ্টি'র মন্তব্যের পর আমাদের একমাত্র মন্তব্য—বর্তমান কংগ্রেস এবং শতকরা অন্তত ৯৮ জন কংগ্রেসীর পক্ষে অসম্ভব অকরণীয় কোন কার্য্যই নাই। সম্প্রতি কংগ্রেস-কম্বলের লোম বাছা খুব ঘটার সহিত প্রচার করা হইতেছে—কিন্তু ইহার প্রধান কারণ বোধ হয় কংগ্রেসী 'হ্যাভ্' এবং 'হ্যাভ-নট্স্'দের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, হিংসা এবং দাঁও মারিবার প্রয়াস। আমাদের এই উক্তি মিথ্যা হইলে আমরা সুখী হইব। হঠাৎ যে-ভাবে কংগ্রেসী মন্ত্রী এবং অন্যান্য উপরওয়ালাদের 'ময়লা-বস্ত্র' প্রকাশ্যে ধোওয়া সুরু হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বভারতীয় একটি নূতন 'ধাপা' সৃষ্টি হইতে পারে।

মৎস্যাভাব দূর করার সহজ পথ

তারকেশ্বরের 'পঞ্চায়েত'-এর মতে :

"বাংলায় মাছের অভাব লজ্জার কথা। আরও লজ্জার কথা, আমাদের শহরের "শিক্ষিত"রা অধিকাংশই বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ না হ'লেও উদাসীন বটেই। তাঁদের জারিজুরি কেতাবের সীমায় আবদ্ধ। প্রচারের বাহন খবরের কাগজের কর্ম্মকর্তারা বা সাংবাদিকরাও মূলতঃ শহুরে। তাই হৈচৈ যতই করুন, তাঁরা গোড়া ধরতে পারেন না। আর, সেই জন্যেই সহজ হইলেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। অর্থের অপচয় হচ্ছে, সমস্যা বেড়েই চলেছে।

"সরকার বড় জোর শহরের হৈ-হল্লাকে, তথা কাগজের হৈ-চৈকেই কিছুটা আমল দেন। অভিজ্ঞ গ্রামের লোকদের সরকার আমলই দেন না। তাঁরা অপদার্থ, দুর্নীতিপরায়ণ ও সেবাবোধহীন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের হাতের মুঠোয়—কর্ম্মচারীরা যেমন নাচান তেমনই নাচেন।

"কাজেই, সমাধান হবে কি করে! মাছেই কি শুধু! সব ক্ষেত্রেই ঐ একই কারণে ব্যর্থতা আর সমস্যা! তা আজ সারা দেশে দানবীয় আকার ধারণ করেছে।

"বাংলায় পুকুর, দীঘি, দহ, বিল, জলা আদির অভাব নেই। অসংখ্য পুকুর, দীঘি, দহ, বিল, জলা আদি হেজে-মজে গেছে। কংগ্রেসের হাতী-বন্ধু জমিদারদের বা তাঁদের কর্ম্মচারীদের জালিয়াতিতে সাধারণের ব্যবহার্য্য এবং সেচযোগ্য বহু বিল, দহ, জলা, পুকুর আদি বেআইনী বিলি করা হয়ে গেছে। সরকার তা বেআইনী জেনেও বন্ধুকীর্ত্তি ব'লে তা উপেক্ষা করে চলেছেন। সেগুলির অধিকাংশই এখন জমিতে পরিবর্ত্তিত। এই সংগুলির পরিমাপ কয়েক লক্ষ একর হবে।

"মাছ ধরার নামে সরকার গভীর জলে ডুবে ডুবে অনেক জলই খেয়েছেন। (গৌরী সেনের ?) টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ হয়েছে। সমস্যার একতিলও সমাধান হয় নি।

"আমরা ইতিপূর্ব্বে বলেছি, এখনও বলছি এই সব পুকুর, দীঘি, বিল, দহ, জলাগুলির পুনরুদ্ধার করলে মাছের সমস্যার বহুলাংশেই সমাধান হবে তদুপরি গ্রামের স্বাস্থ্য ও শ্রী ফিরবে এবং গ্রামের অর্থাগমের একটা বড় পথ খুলে যাবে। শুধু তাই নয়, কৃষি-বেকারী সমস্যারও উল্লেখযোগ্য সমাধান হবে।"

এই প্রকার গেঁও-প্রকল্পে সরকারী কর্ত্তারা কখনও রাজী হইতে পারেন না। ইহাতে না আছে ঢাকের বাদ্য, না-আছে করদাতাদের অর্থের প্রচণ্ড অপশ্রাদ্ধের অবকাশ! এ কাজ বে-ফায়দাও বটে।

পঞ্চায়েতে আর এক সংবাদে আনন্দ পাইলাম—

"তৈল মর্দ্দনের স্থানে" এবার মৎস্যদান"

"স্থান-বিশেষে তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থাই আবহমান কাল ধরে চলে আসছিল। খাঁটি সরষের তেলই চলত। এখন পরিবর্ত্তনের যুগে তেলের স্থান মাছ নিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। একে তেল দুষ্প্রাপ্য তার উপর ভেজাল। তাতে আর যা-ই হোক তৈল মর্দ্দন চলে না। শহরে মাছ দুর্লভ হয়েছে, তার দরটাও গলাকাটা। আর, যাঁদের তৈল মর্দ্দন করতে হয় তাঁরা অধিকাংশই শহরবাসী। তাই বিজ্ঞজনেরা তৈল মর্দ্দন ছেড়ে মৎস্যোপঢৌকনের পথ ধরেছেন। শোনা যাচ্ছে 'সাহেব' বা 'বড়বাবু'দের দেবার জন্য আজকাল মাছ যাচ্ছে খুবই গ্রাম থেকে। তার ফলে গ্রামের ৩৩০ টাকার মাছ উঠেছে ৪.৪৷৷০ টাকায়, স্থানে স্থানে তারও ওপরে। তেলের চেয়ে মাছে সুবিধেও হয়েছে। তেলটা কর্ত্তার পায়ে মর্দ্দন করতেই লাগত। তাতে ঝঞ্ঝাট কম ছিল না! মাছ অন্দরমহলে চালান করে দেওয়া যায় স্বচ্ছন্দে। তাতে গৃহিণী বা মেম-সায়েব থেকে ছেলে-বুড়ো সবাই খুসী হন। তবে একটা বিপদ্। মেম-সায়েবরা না তেল চেয়ে বসেন আবার।"

আমরা কলিকাতাবাসীরাও পরম সুখে আছি—তবে আমাদের একটা সুবিধা এই যে, এখানে মাছও নাই, তেলও নাই—যে-দরে ঐ বস্তু দু'টি পাওয়া যাইতেছে

তাহা আমাদের মত সর্ব্বভাবে নিষ্পেষিত গৃহস্থদের নাগালের বাহিরে।

সকল দুঃখের মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা এই যে—

কলিকাতা বেতারের পল্লীমঙ্গল আসরে বঙ্গবাসীদের প্রয়োজনীয় সব কিছুই সুলভ!! দেশে কোন প্রকার অভাব-অনটন নাই—এই আসরের পরম বিজ্ঞ মোড়লের মতে।

অন্ধকার দুঃখ-অভাবের জ্বালা যদি ভুলিতে চান—একটি লোকাল রেডিও সেট অবিলম্বে ক্রয় করিয়া প্রত্যহ পল্লীমঙ্গল আসরের পাঁচালি শ্রবণ করুন!

স্বাধীনতার আশীর্ব্বাদ

'বারাসত বার্ত্তা' বলিতেছেন :—

"প্রকৃতপক্ষে বাংলার গ্রাম-জীবন যে দুর্দ্দিনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে স্বাধীনতার সতের বৎসরের মধ্যে এত বড় দুর্দ্দিন আর দেখা যায় নাই। বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলের ছোট মাঝারি বড় শহরগুলি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে। শহর বাজারের নিত্য খাদ্যবস্তু সংগ্রহ প্রায় দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। চাউলের বাজার একরূপ অনিশ্চিত। কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল ব্যতীত সরকার গ্রামাঞ্চলে পূর্ণমাত্রায় রেশন ব্যবস্থা করেন নাই—আংশিক রেশন ব্যবস্থার মধ্যে শহরের অধিবাসীদের খোলা বাজারের উপর নির্ভর করিতে হয়। অথচ খোলা বাজারের চাউলের দাম এবং আমদানী দুই অনিশ্চিত। খোলা বাজারে মাছ পাওয়া যাইতেছে না, তরি-তরকারি আনাজের দাম বহু বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং দুই বেলার কেন এক বেলার আহার্য্য-সামগ্রী শহরবাসীদের পক্ষে সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

*　　*　　*　　*

"সর্ব্বত্র শোনা যাইতেছে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবং গত বৎসর হইতে কাপড় পোষাক পরিচ্ছদের দাম অনেক বাড়িবে এবং বাড়িয়া গিয়াছেও। এই সংবাদ সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের পক্ষে মারাত্মক কথা। যেখানে পেটের ভাত সংগ্রহ করা যাইতেছে না সেখানে যদি পরনের কাপড়ের দাম আরও বাড়িয়া যায় তবে কি করিয়া চলিবে।" সে ভাবনা আপনার আমার যাহাদের রেশনের থলি হাতে করিয়া—দাম দিয়া খাদ্য বস্তু কিনিবার জন্য ভিখারীর মত দোকানীর দ্বারে জোর করে দাঁড়াইতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

*　　*　　*　　*

"রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হইতে মহাত্মা গান্ধীজীর ভারত ছাড় আন্দোলন পর্য্যন্ত গ্রামাঞ্চলের শহরগুলির যে সামাজিক ও নৈতিক মান ছিল, উহা আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। (এই দুইটির বস্তুরই মূল্য কমিয়াছে—এই মূল্যবৃদ্ধি যুগে!) ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত শহরগুলির সামাজিক পরিবেশের মধ্যে আদর্শবাদ ছিল, জাতীয় জাগরণের প্রেরণা ছিল—উহা ধীরে ধীরে উড়িয়া যাইতেছে। সেদিন পরাধীন ভারতের অভাব-দারিদ্র্য সমাজকে মহান করিয়াছিল, স্বাধীন ভারতের অভাব দারিদ্র্য সমাজকে পতনের অতল গহ্বরে ঠেলিয়া নামাইতেছে। আজিকার এই যে সাধারণ মানুষের খাওয়া-পরার অভাব ইহাকে যেন কেবল এক অর্থনীতির দ্বারা বিচার করা না হয়, সমাজতত্ত্বের দিক হইতে এক কঠিন পরীক্ষা বিচারের পটভূমিকা এই অভাব-দারিদ্র্যের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই—"

কেবল বাঙ্গলার গ্রাম্য-জীবনই নহে—শহর-জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যে-চিত্র আমাদের চোখে পড়িবে, তাহাতে বাঙ্গলা দেশের এবং বাঙ্গালী জাতির পরমায়ু আর কতদিন সে-বিষয়ে সন্দেহ জাগে। বিশেষ করিয়া বালক-বালিকা এবং যুব-সমাজের যে ভীষণ চিত্র অহরহ দেখা যাইতেছে তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই আতঙ্কিত হইবেন। অথচ এই পরম আতঙ্কময় এবং আশাহীন চিত্রের জন্য যুব-সমাজকে নিন্দা বা গালি দিবার কোন অধিকার আমাদের আছে বলিয়া মনে হয় না। সমাজের এবং রাষ্ট্রের কর্ত্তা-ব্যক্তিদের আচার-ব্যবহার এবং নৈতিক চালচলন দেখিয়া তাহারাই অনুকরণ করিতেছে আজ এই বাঙ্গলার যুব-সমাজ।

শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক-যুবতীদের জীবনে আজ ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু নাই—সকল বিষয়ে তাহারা বিফল—বেকার। রাজ্যের কলকারখানা এবং অবাঙ্গালী শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোগে কয়জন বাঙ্গালী প্রবেশাধিকার পায় তাহা সকলেরই জানা আছে। রাষ্ট্রকর্ত্তারা কেবল বাক্যেই দায় সারিতেছেন—কিন্তু দেশের অনাচার বন্ধ করিতে যে কঠোরতা প্রয়োজন, তাহার একান্ত অভাব দেখা যাইতেছে।

কেবলমাত্র ক্রন্দন করিয়া কি হইবে?

নিজ বাসভূমে—দুর্গাপুর—

মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে একটি সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, দুর্গাপুর ইস্পাত নির্ম্মাণ কারখানায় গত ২৭সপ্তাহেক যাবৎ বিবিধ কৌশল ও অজুহাতে বাঙ্গালী অফিসার এবং কর্ম্মচারীদের বিতাড়ন করা হইতেছে। যে-ক্ষেত্রে বিতাড়ন করা সম্ভব হইতেছে না, সেক্ষেত্রে উহাদের অন্যত্র বদলী করা হইতেছে।

কারখানার প্ল্যান্ট ষ্টোরস্ বিভাগে ঐ মাৎস্যন্যায় আরও বেশী বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। সেখানে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাঙ্গালী অফিসারদের সরাইয়া দিয়া অনভিজ্ঞ গ্র্যাজুয়েট অবাঙ্গালী অ্যাপ্রেনটিসদের ঐ পদগুলিতে বসানো হইতেছে। ইহার প্রতিবাদে গত ৬ মাসের মধ্যে ৩ জন বাঙ্গালী অফিসার চাকুরি ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।

সম্প্রতি এই বিভাগের ২ জন বাঙ্গালী অফিসারকে তাঁহাদের প্রমোশন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাউরকেলা হইতে অবাঙ্গালী জুনিয়ার অফিসার আনাইয়া তাঁহাদের মাথার উপর বসানো হইতেছে। ডেপুটি কণ্ট্রোলার অব পারচেজ অ্যাণ্ড ষ্টোরস ঐভাবে কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসারকে ডিঙ্গাইয়া এই পদটি দখল করিয়াছেন। ইহা ছাড়া রোলিং মিলস্, হুইল অ্যাণ্ড অ্যাকসেল, প্ল্যান্ট অপারেটার গ্যারেজ প্রভৃতি বিভাগেও ঐ একইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে

কিছুকাল পূর্ব্বে দুর্গাপুরে বাঙ্গালীদের প্রতি এই অপরূপ পক্ষপাতিত্বের বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম। এখন দেখা যাইতেছে যে—এই বিষম পক্ষপাতিত্বের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধির মুখেই চলিয়াছে। বাঙ্গলার বাহিরে সরকারী কল-কারখানাগুলিতে, নেহাৎ ভাগ্যে থাকিলে, বাঙ্গালীর স্থান হয়, কিন্তু ঐ সব স্থানে স্থানীয় বা 'লোকাল' যোগ্য-অযোগ্য ব্যক্তিদের রুজিরোজগারের অবকাশ করিয়া দেওয়া হয় সর্ব্বপ্রথম—তাহার পর অন্য রাজ্যের লোকদের কথা। কিন্তু খাস বাঙ্গলা দেশেও কি বাঙ্গালী ক্রমে ক্রমে পরবাসীর মত বসবাস করিতে বাধ্য হইবে?

আমরা এমন কথনও বলি না—দাবি করা ত দূরের কথা যে, অযোগ্য হইলেও বাঙ্গালীকে কাজকর্ম্ম বা চাকরি দিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে হাজার হাজার যোগ্য শিক্ষিত এবং সামান্য-শিক্ষিত লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক থাকিতেও তাহাদের কর্ম্মে নিয়োগের অবকাশ সর্ব্বপ্রথম কেন দেওয়া হইবে না? পশ্চিম বাঙ্গলায় কল-কারখানা এবং ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অবাঙ্গালী মালিক-গুলি কি এখানে বসিয়া যাহাদের শিল-নোড়া তাহাদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিবার পূর্ণ স্বাধীনতা বিশেষ অধিকার-স্বরূপ লাভ করিয়াছেন?

কেবল অবাঙ্গালী মালিকদের নিন্দা করিয়া লাভ নাই। এ-রাজ্যে এমন কিছু বাঙ্গালী মালিকও আছেন, যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের যে শহর বা জেলা হইতে এখানে আসিয়া কারবার ফাঁদিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের সেই শহর এবং জেলার লোকদের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে অগ্রাধিকার দিয়াছেন এবং এখনও দিতেছেন। ইঁহারা এখন সর্ব্বতোভাবে পশ্চিমবঙ্গবাসী হইয়াছেন, কিন্তু মানসিক দিক হইতে সেই পূর্ব্ববঙ্গীয়ই রহিয়া গিয়াছেন। এই শ্রেণীর বিশেষ কয়েকজন এমন মালিকও আছেন যাঁহাদের কাজে-কারবারে পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙ্গালীর প্রবেশ কার্য্যতঃ প্রায় নিষিদ্ধ! ইতরজন-কথিত 'ঘটি ও বাঙ্গাল' ঐতিহ্য এই শ্রেণীর ওপার-আগত এক শ্রেণীর মালিক সযত্নে—কেবল রক্ষা নহে—লালন করিতেছেন। সে-কথা যাক—বর্ত্তমান অবস্থায় রাজ্য সরকারই বা কি করিতেছেন?

শুনিয়াছিলাম স্বর্গত ডঃ বিধান রায়, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী যুবকদের কর্ম্মসংস্থান উদ্দেশ্যেই দুর্গাপুর পরিকল্পনা কার্য্যকর করেন। তিনি আজ বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত এই শিল্পনগরীতে বাঙ্গালীর প্রতি সুবিচার হইত কিন্তু বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য—তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্যশাসন ভার এমন ব্যক্তিদের উপর বর্ত্তাইয়াছে, যাঁহাদের সাহস ও ব্যক্তিত্বের এমনই অভাব রহিয়াছে, যাহার কারণে তাঁহারা কেন্দ্রীয় কর্ত্তা কিংবা এ-রাজ্যের অবাঙ্গালী এবং ক্ষেত্র বিশেষে বাঙ্গালী মালিকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন না। এমন অবস্থায় কর্ত্তব্য কি—তাহা বাঙ্গালী বেকার যুবকদেরই স্থির করা ছাড়া পথ নাই। পশ্চিমবঙ্গে নেতৃত্ব বলিতে কিছু নাই—কি দক্ষিণ, কি বাম, সকল নেতাই বাক্য দ্বারাই বাধ মারিতে উৎসাহী এবং বেকার বাঙ্গালী যুবকদের প্রতি সকলেই বাম! সকলেই এই কথা বলিয়া দায় এড়াইতে চাহেন "বাঙ্গালী যুবক কর্ম্মবিমুখ।"—কর্ম্মের অবকাশ দিয়া, বেকারদের কর্ম্মসংস্থান করিয়া, তাহার পর যদি এই দায়-এড়ান কথা বলিতেন—মানাইত ভাল! সদাচারী শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় বাঙ্গালী যুবকদের ত একেবারে অকেজো বলিয়াই কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া—অন্য রাজ্যের গুরুতর সমস্যা মিটাইতে গুরুদেহ এবং হাল্কা মন নিয়োগ করিয়াছেন! এখন একমাত্র শ্রীপ্রফুল্ল সেন—ইচ্ছা করিলে

হয়ত বাঙালীর বেকারত্ব দূরীকরণে বাস্তব কিছু করিতে পারেন, বিশেষ করিয়া দুর্গাপুরের ব্যাপারে।

একটি আবেদন

সবিনয় নিবেদন,

আপনারা সকলে অবগত আছেন যে, আগামী ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে অর্থাৎ ১৩৭২ বঙ্গাব্দের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বিশ্ব-বিখ্যাত সাংবাদিক ও বাঁকুড়ার সুসন্তান ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম-শতবর্ষ পূর্ত্তি হইতেছে। এই ব্যাপারে বাঁকুড়াবাসীর বিশেষ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

সাংবাদিক শিরোমণি রামানন্দের জন্ম-শতবর্ষ যাহাতে এই জেলায় যথাযোগ্য ভাবে প্রতিপালিত হয় তাহার জন্য আপামর জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করিতেছি।

রামানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী সমিতি গঠনকল্পে আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার বৈকাল ৪ টায় বাঁকুড়া সহরের বঙ্গ বিদ্যালয়ের হলঘরে এক সভার আয়োজন করা হইয়াছে। আপনারা এই সভায় যোগদান করিয়া বাঁকুড়া জেলা রামানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী সমিতি গঠন করিতে সহায়তা করুন—এই প্রার্থনা করি।

নিবেদক—

১-৯-৬৪ ॥

শ্রীরামনলিনী চক্রবর্ত্তী
শ্রীকানাইলাল দে
শ্রীরাখহরি চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরবি দত্ত
আহ্বায়কবৃন্দ

কিছুকাল পূর্ব্বে বাঁকুড়ার 'মল্লভূম' পত্রিকায় উপরি-উক্ত আবেদনটি প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা অবশ্যই এই আশা পোষণ করি যে, বাঁকুড়াবাসী মাত্রেই এ আবেদনে সাড়া দিয়া এবং সাধ্যমত সর্ব্ব সহযোগিতা দান করিয়া বাঁকুড়া তথা সমগ্র ভারতের স্বর্গত সুসন্তানের প্রতি তাঁহাদের ন্যূনতম কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও তাহার প্রতিকার

এ বিষয়ে অন্যান্য কথার মধ্যে—জলপাইগুড়ির 'জনমত' বলিতেছেন:

"...সরকার যদি দেশের আর্থিক বাজারের উপরে কর্তৃত্ব করিতে না পারেন তবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। এর জন্য চাই দীর্ঘ-মেয়াদী ব্যবস্থা।

"প্রথমতঃ, আমাদের দেশের খণ্ড খণ্ড জমি চাষের প্রথাকে বিলোপ করিয়া সমষ্টিগতভাবে ঢালাও জমি চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতে উৎপাদনের খরচ কম পড়িবে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিয়া অধিক ফসল ফলানো যাইবে। একথা সমস্ত দেশের কৃষি-বিজ্ঞানীরাই স্বীকার করিয়াছেন। এছাড়া পথ নাই। দেশের জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করিতে হইবে। এবং কৃষক জমির মালিক হইবে বটে কিন্তু সেই জমি সমবায়ের মাধ্যমে চাষ হইবে এবং কৃষক প্রতিদিন পারিশ্রমিক পাইবে এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানে তার অংশ থাকিবে যেহেতু সে জমির মালিক। সরকার এই সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। এই সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি ধান ক্রয় করিবে এবং এই সমবায় প্রতিষ্ঠান মিল হইতে ধান ভাঙ্গাইয়া ক্রেতা সমবায়ের মাধ্যমে বিক্রয় করিবে। তবে সুষ্ঠু বণ্টন সম্ভব এবং এতে কালোবাজারী টাকার চলাচল বন্ধ করিয়া অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই ব্যাপারে সমবায়গুলিকে ব্যাঙ্ক হইতে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য দিতে হইবে। এবং লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহারা বিভিন্ন ভাবে এই সমবায়কে কর্ম্মের দ্বারা সাহায্য করছে তাহারা ছাড়া কেহ যাহাতে সমবায়ে অংশীদার হইতে না পারে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানার কালো ছায়া যাহাতে ইহাকে গ্রাস না করে। এই সমবায়ী মনোভাব গড়িয়া উঠিলে দেশপ্রেম জাগিবে। কলেকৃটিভ ফার্ম্মিং ছাড়া কোন পথ নেই। সরকার বর্ত্তমানে যে খাদ্য-শস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতেছেন তাহাতে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কারণ একই সঙ্গে একই বাজারে সরকারী ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত মালিকানায় খাদ্য শস্যের ব্যবসা চালু থাকিতে পারে না। বরং চালু থাকিলে সরকার বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবেন না।"

আজ সারা দেশে খাদ্য সঙ্কট ভয়াবহ হইয়াছে। আমাদের রাষ্ট্রপতি হইতে সকলেই শঙ্কিত। স্বাধীনতার সতের বৎসর পরেও দেশের মানুষ খাদ্য সংগ্রহের জন্য লাইন দিতেছে। বহুজন খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অর্দ্ধাহারে-অনাহারে রহিয়াছে। দ্রব্যমূল্য এত অসম্ভব বাড়িয়াছে যে, সরকার কোন ক্রমেই ইহা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণমাচারী এবং অন্যান্য কর্ত্তারা বলিতেছেন যে, খাদ্য সঙ্কটের মূল কারণ অতি-মুনাফার লোভে মজুতদারী ও কালোবাজারী টাকা'। কিন্তু বাঙলার শ্রীঅতুল্য ঘোষ ছাড়া আর সকলেই মজুতদারী কালোবাজারী টাকার বিরুদ্ধে বলিলেও ইহা রোধ

করিতে তাঁহারা অক্ষম! মজুতদারদের চ্যালেঞ্জে সরকার পরাস্ত! এই জন্যই কি সদাচার সমিতি নামক আদর্শ শিশুটিকে ভ্রূণেই নষ্ট করার ষড়যন্ত্র এত প্রকট? আমাদের ভয় হয়। জনসাধারণ এই ব্যবস্থা আর বেশী দিন সহ্য করিবে না। প্রমাণ?—বোম্বাই বন্ধ, গুজরাট বন্ধ, ইন্দোর বন্ধ, এলাহাবাদ-এ ধর্ম্মঘট। বর্ত্তমানে সারা ভারত একটা বিরাট্ বিপর্য্যয়ের মুখে।

সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে সদাচার সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং এই সমিতির সর্ব্বাধ্যক্ষ—সদাচারী শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়!

দেখা যাক—!

দুর্নীতির খতিয়ান

ভারতবর্ষে দুর্নীতির ময়না তদন্ত বারবার হইয়াছে। ১৯৪৯ সালে টেকচাঁদ কমিটি, ১৯৫৩ সালে আচার্য্য কৃপালনীর সভাপতিত্বে গঠিত রেলওয়ে দুর্নীতি অনুসন্ধান কমিটি, ভিভিয়ান বসু কমিশন, চাগলা কমিশন, দাশ কমিশন, সান্তনম্ কমিটি প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতির প্রসার, দুর্নীতি নিবারণের সমস্যা সম্পর্কে যেসব তথ্য রাখিয়া গিয়াছেন সেগুলি একত্র করিলে নূতন মহাভারত হইবে।

ধনবান ও ক্ষমতাবানের মধ্যে কিভাবে যোগসাজস গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহার ডালপালা কিভাবে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে তাহার বিবরণ এ-সব কমিটি-কমিশনের পাতায় পাতায় চিত্রিত হইয়াছে।

এইসব রিপোর্ট প্রমাণ করে যে, বিলম্ব, অকর্ম্মণ্যতা ও স্বেচ্ছাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা—এ তিনের সমন্বয় হইল দুর্নীতি প্রচলনের আদর্শ ঘাঁটি। প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যেখানেই অর্থ বিনিময়ের সংযোগ রহিয়াছে, যেখানেই টেণ্ডার, লাইসেন্স, কণ্ট্রাক্ট, গ্রাণ্ট, ট্যাক্স, সরবরাহ এবং কেনাবেচার খতিরে সাধারণের সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থার যোগাযোগের সুযোগ আছে; যেখানেই উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর স্বেচ্ছাধীন সিদ্ধান্তের দ্বারা স্বচ্ছন্দে বিশেষ ব্যক্তির আর্থিক স্বার্থকে কায়েম করিয়া দিবার সুযোগ থাকে সেখানেই দুর্নীতির জাল বিস্তৃত হয় এবং এ দুর্নীতি রূপ গ্রহণ করে কখনও সোজাসুজি আর্থিক বিনিময়ে, কখনও পরোক্ষভাবে নানা ধরনের উপহার আদান-প্রদানের মাধ্যমে। অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে সরবরাহ দপ্তর, খাদ্য দপ্তর, কারিগরি উন্নয়ন দপ্তর, কেন্দ্রীয় পূর্ত্ত বিভাগ, পুনর্ব্বাসন দপ্তর, আমদানী রপ্তানী বিভাগ, কর সংগ্রহ বিভাগ, শুল্ক বিভাগ, পুলিশ প্রভৃতি প্রশাসনিক শাখা-প্রশাখায় দুর্নীতির প্রভাব বেশী।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাঁচ বছরে (১৯৫৭-৬২) প্রায় চল্লিশ হাজারের বেশী সরকারী কর্ম্মচারী দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হইয়া নানা ভাবে শাস্তি পাইয়াছে। দুর্নীতির দায়ে চাকুরি গিয়াছে অথবা পদাবনতি হইয়াছে ১৫৪ জন উচ্চপদস্থ অফিসার এবং ৫৪৩১ জন নন-গেজেটেড সরকারী কর্ম্মচারীর।

শতকরা নব্বুইটি অভিযোগে দুর্নীতি ধরা পড়িয়াছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ৫ বছরে পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের তুলনায় দুর্নীতি তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুধু আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপারে দিল্লী পুলিশ এষ্টাব্লিশ-মেণ্টের অনুসন্ধানে দুর্নীতি ধরা পড়িয়াছে:

সাল	দুর্নীতির প্রভাবে মোট কত লাইসেন্স বাহির হইয়াছে	অভিযুক্ত লাইসেন্স কত টাকার	কতগুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এ অপরাধে সংশ্লিষ্ট
১৯৫৮	১৯৬	৭৬,৬৬,২৩৭৲	৯০
১৯৫৯	১৩৯	৪৯,৮৩,১২৮৲	১২৯
১৯৬০	৮২	৩৭,১৩,০৮২৲	৭৪
১৯৬১	১৩৭	৪৭,৯২,০৫৪৲	১৫৬
১৯৬২	১০৬	২৬,৬৯,৬৪১৲	৭১
	৬৬০	২,৩৮,২৪,১৪২৲	৪৫১

অর্থাৎ পাঁচ বছরে প্রায় আড়াই কোটি টাকার লাইসেন্স বে-আইনীভাবে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া দপ্তর হইতে আদায় করিয়াছে এবং ইহা জানা কথা যে, এই লাইসেন্সগুলির কেনাবেচা হইতে অন্ততঃ পাঁচ গুণ টাকা অর্থাৎ ১০।১১ কোটি টাকার লেনদেন হইয়াছে। ওয়ার্কস, হাউসিং এবং সরবরাহ দপ্তরে ধরা পড়িয়াছে অনুরূপ হিসাবে ১৯৩টি কেস্ যাহাতে প্রায় চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকা দুর্নীতির দক্ষিণা হিসাবে জড়িত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন ও কেনার খাতে ২৮০০ কোটি টাকা নিয়োজিত হইয়াছে এবং উপরোক্ত অঙ্ক হইতেই ধরা পড়ে যে, শতকরা ১০।১১ ভাগ টাকা উৎকোচের খাতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি লেনদেন করিয়াছে। শান্তনম্ কমিশন আন্দাজ করিয়াছেন যে, যদি শতকরা পাঁচ ভাগ টাকাও দুর্নীতির শুল্ক হিসাবে ধরা যায়, তবে অন্ততঃ ১৪০ কোটি টাকা দুর্নীতির খাতে অপব্যয়িত

হইয়াছে। আয়কর দপ্তরের ক্ষেত্রে এ পাঁচ বছরে অনুরূপ হিসাবে দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় অন্ততঃ ২৩০ কোটি টাকা আয়কর ফাঁকি দিয়াছেন।

ভ্রান্ত ধারণা

দুর্নীতির বাহক হিসাবে উচ্চপদস্থ (গেজেটেড্) প্রশাসনিক কর্মচারীরা কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করে তা বুঝা যাইবে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পরিসংখ্যান হইতে। ১৯৫৮ হইতে '৬২ সালের মধ্যে অনুসন্ধানের হিসাব অনেকটা দাঁড়ায়:

আণ্ডারসেক্রেটারী ও তদূর্দ্ধ কর্মচারী—২০	
কেন্দ্রীয় দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারীর অনূর্দ্ধ কর্মচারী—	১৬
এক্সিকিউটিভ্ ইঞ্জিনীয়ার ও তদূর্দ্ধতন	১২০
এক্সিকিউটিভ্ ইঞ্জিনীয়ারের নিম্নতন	২১৯
রেলওয়ে অফিসার	৪৭
মিলিটারী কমিশনড্ অফিসার	১০৬
ডিরেক্টর, ডেপুটি ডিরেক্টর, এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ইত্যাদি—	৩৯
ইম্পোর্ট, এক্সপোর্ট এবং ষ্টীল কণ্ট্রোলার	৩২
আয়কর বিভাগীয় অফিসার	৪১
এক্সসাইজ ও কাস্টমস্	৫১
কর্পোরেশন ও ষ্ট্যাটুটরি দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসার—	৪৭
ক্লাস ওয়ান অফিসার—	১৩০
ক্লাস টু	১৫৯

উপরোক্ত তালিকায় উদ্ধৃত কর্মচারীদের প্রত্যেকে স্বেচ্ছাধীন সিদ্ধান্ত দেবার অধিকারী এবং ব্যক্তিগতভাবে সরকারী বেতনভুক্ সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চে প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের সাধারণ কেন, উচ্চমধ্যবিত্ত নাগরিকের রোজগারী আয়ের তুলনায় ইঁহাদের আয়ের পরিমাণ কোন অংশে কম নয়। তাহা সত্ত্বেও উঁচুমহলের দুর্নীতি যেভাবে প্রসারিত তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, সরকারী কাজে কম বেতন দুর্নীতি সম্প্রসারিত হইবার অন্যতম কারণ—এ ধারণা অনেকাংশে ভ্রান্ত।

নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি দপ্তরের খতিয়ান হইতে আরও পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দুর্নীতির বীজ কি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত। শান্তনম্ কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, প্রমাণিত অপরাধের জন্য প্রায় চল্লিশ হাজার সরকারী কর্মচারী অভিযুক্ত হইয়াছে গত পাঁচ-ছয় বছরে। তাহার মধ্যে গেজেটেড্ এবং নন-গেজেটেড্ মিলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে:

শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থায়	১৩৫ জন
ডিফেন্স দপ্তর	৬৩৬ ,,
পররাষ্ট্র বিভাগ	৪৯ ,,
অর্থ দপ্তর (ফিনান্স)	১৬৯৭ ,,
খাদ্য ও কৃষি দপ্তর	৩২৪ ,, / ৬৪৪ ,,
স্বাস্থ্য দপ্তর	১৬১ ,,
স্বরাষ্ট্র দপ্তর	২৯৬ ,,
তথ্য ও বেতার দপ্তর	১৩৪ ,,
শ্রম ও নিয়োগ দপ্তর	১৭৯ ,,
রেল দপ্তর	৭৭২ ,,
বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি দপ্তর	২৫২ ,,
পরিবহন ও সংযোগ দপ্তর	৩৪৬৫ ,, / ২২৩ ,,
ডাক ও তার বিভাগ	৫৯০৯ ,,
পুনর্ব্বাসন বিভাগ	৩৯০ ,,
ওয়ার্কস্, হাউসিং ও সাপ্লাই	৪৩৭ ,,
ক্যাবিনেট্ সেক্রেটারিয়েট্	৯৮ ,,
ইউনিয়ন টেরিটরী	১০৪২ ,,
দিল্লী প্রশাসনিক সংস্থা	৯৪৫ ,,

৫০ হাজার নালিশ

কমিশনের তালিকা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলির দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে গেজেটেড্—৮৪১ এবং নন্-গেজেটেড্—১৬,৮৪৬ ইহা শুধু দুর্নীতির দরুণ শাস্তিপ্রাপ্ত কর্মীর সংখ্যা। অভিযোগ যাঁহারা এড়াইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা কি বিপুল হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। খবরদারী কমিশনের খাতায় এ পাঁচ বছরে ২৫৭৯৯টি অভিযোগ লিখিত হইয়াছে। পুলিস এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিতে ইহা ছাড়াও দুর্নীতির অভিযোগ আসিয়াছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার। সুতরাং কি ব্যাপকভাবে দুর্নীতি প্রতিটি দপ্তর, প্রতিটি বিভাগে অনুপ্রবেশ করিয়াছে এবং এ সংক্রামক ব্যাধি হইতে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বাঁচান যে কি দুরূহ এমন কি অসম্ভব কার্য্য তাহা সহজেই বোঝা যায়।

সদাচার

তবে এইবার হয়ত দেশ হইতে দুর্নীতি বিতাড়িত

হইবে—কারণ কংগ্রেস-কর্তারা বলিতেছেন, তাঁহাদের সকলকেই সদাচারী হইতে হইবে। কংগ্রেসী-মহলে তথা শাসকমহলে এবার অবশ্যই সদাচারের স্রোত বহাইতে হইবে—এবং যে-স্রোতের প্রবল বন্যায় সকল প্রকার অসদাচার ভাসিয়া যাইবে। কর্তামহলে হঠাৎ সদাচারে এত উৎসাহ দেখিয়া দুষ্টলোকে যেন মনে করিবেন না যে, কংগ্রেসী এবং শাসকমহলে দুর্নীতি ব্যাপক হইয়াছিল, কারণ স্বর্গত প্রধানমন্ত্রীর আমলে আমরা বারবার দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি যে, যখনই কোন মন্ত্রী, উপমন্ত্রী কিংবা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আসিত—তখনই স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী সর্ব্বপ্রথম তাহা বাতিল করিয়া দিবার প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস শেষ পর্য্যন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে টিকিতে পারে নাই। কাহারও নাম করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ 'পাবলিক মেমারি শর্ট' হইলেও, যতখানি 'শর্ট' মনে করা হয় ততখানি নয়। মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে যে মুখ্যমন্ত্রী এবং কোন কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে গদি ছাড়িতে হইয়াছে তাহার কথা জনসাধারণ হয়ত এখনই ভুলিয়া যায় নাই। এই সব দৃষ্টান্ত হইতে আমরা ইহাই মনে করিব যে, বাস্তবিক পক্ষে কর্তা তথা শাসকমহলে দুর্নীতি প্রায় নাই বলিলেই হয়, যে-দু'একটা ঘটনা হঠাৎ ঘটে, তাহাকে গুরুত্ব দিবার কোন অর্থ হয় না! তাহা ছাড়া ইংরেজিতে কথা আছে যে, 'একসেপ্‌সন্‌ প্রুভস্‌ দি রুল'—তাহা হইলেই প্রমাণিত হইল যে, সামান্য দু'-একটা দুর্নীতির দৃষ্টান্ত ইহাই বুঝাইতেছে যে, কংগ্রেসী তথা শাসকমহলে দুর্নীতি নাই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সদাচার

এ-রাজ্যেও সদাচার সমিতি শেষ পর্য্যন্ত সংগঠিত হইল। ইহা অতীব আনন্দের কথা। সদাচার ব্যাপারে শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় যখন নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আমরা ভরসা করিতে পারি যে, এ রাজ্যের সীমানার মধ্যে কোথাও আর দুর্নীতির বাসা থাকিবে না, বিশেষ করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশন নামক প্রতিষ্ঠানে। লোকে মনে করে এই প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি দুর্নীতির 'ব্রিডিং গ্রাউণ্ড'—কিন্তু এবার আর ভয় নাই। শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় সদাচার-ঝাঁটার দ্বারা সব কিছু সাফ করিয়া দিবার ব্রত লইয়াছেন।

এখনই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—সরকারী মহলে, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে, রেল ষ্টেশনে, ক্রীড়া-ক্ষেত্রে, এমন কি নটনটী মহলেও সদাচারের একটা বিষম ঢেউ উঠিয়াছে। এখন কেহ কোন কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টায় ঘুষ দিতে গেলে ঘুষি খাইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। সরকারী বহু আপিসে, থানায়, যেখানে ঘুষ ছাড়া কোন কাজই হইত না, এবার পূজার ছুটির পর দেখা যাইতেছে—বিনা ঘুষেই সরকারী কর্ম্মীরা সর্ব্বসাধারণের সকল কাজই হাসিমুখে করিয়া দিতেছে! কেহ ঘুষের প্রস্তাব করিলে তাহাকে পুলিসে দিবার ভয়ও দেখাইতেছে। সদাচারের প্রভাবে দেশে যেন সেই বহুকাল পূর্ব্বের সত্য-যুগের বিমল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে সদাচারের গুণেই এতদিনে দেখিতেছি 'রাম নাম সৎ হ্যায়' হইতেছে!

বাঙ্গলা ভাষা ও জাতীয় ঐক্য

গত ১১ই অক্টোবর নয়া দিল্লীতে নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠানে আমাদের উপরাষ্ট্রপতি সভাপতির ভাষণে বলেন যে:

চারিটি বৈশিষ্ট্য—ছাপাখানা, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র, পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ভাবধারার বিকাশ ও বৈপ্লবিক সমাজবাদ বাঙ্গলা সাহিত্যকে এক অপরূপ রূপ দিয়াছে। এই সকলের প্রভাবে বাঙ্গলা সাহিত্য ভাবধারার গভীরতায় সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যে বিস্ময়কর। ডঃ জাকির হোসেন বলেন যে, দেশের অন্যান্য অংশের অধিবাসীরা বাংলা সাহিত্য পড়িয়া উপকৃত হইবে এবং ইহাতে ভাব ও প্রকাশ ভঙ্গির বিনিময় ঘটিয়া সংস্কৃতির মান উন্নীত হইবে।

উপরাষ্ট্রপতির মতে বাংলা সাহিত্যে সুন্দরতম সংস্কৃতি পরিবেশিত হইয়াছে। ইহা ভারতের অন্যান্য অংশে নূতন নূতন ভাবধারা প্রচারের মাধ্যমে পরিণত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যই সর্ব্বপ্রথম জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়া দেশবাসীকে স্বাধীনতা লাভের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাস দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া উপরাষ্ট্রপতি বলেন যে, তিনি সাহিত্য জগতের এক বিরাট্ পুরুষ। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গলার সাহিত্যাকাশে তিনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত দীপ্যমান

ছিলেন। তিনি আর কয়েকটি আঞ্চলিক সাহিত্যের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

কিন্তু বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের হাজার গুণ এবং এত উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও দিল্লীর রাজমহল এবার সরকারী ভাষা হিসাবে ১৯৬৫র ২৬শে জানুয়ারী হইতে একমাত্র হিন্দীকেই রাজ-সিংহাসনে পাকাপাকি অধিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। আগামী ২৬শে জানুয়ারীর পর সকল প্রকার সরকারী ফর্ম্ম, প্রোফর্ম্ম এবং চিঠির কাগজপত্রে—হিন্দী ও ইংরেজী দুই ভাষাই থাকিবে, তবে হিন্দী ভাষা মুদ্রিত হইবে উপরে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান-বিষয়ক সমস্ত বিবরণ এক্ষণে ইংরেজীতে ছাপা হইলেও ইহার পর হইতে হিন্দীতেও প্রকাশ করা হইবে। কিছু কিছু ফর্ম ২৬শে জানুয়ারীর পূর্ব্বেই হিন্দীতে মুদ্রণ বাঞ্ছনীয় হইবে বলিয়া স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ইস্তাহারে বলা হয়।

২৬শে জানুয়ারীর পর হিন্দীর ব্যবহার ব্যপকতর করার জন্য কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করা চলিতে পারে, কেন্দ্রের বিভিন্ন দপ্তরের নিকট সেই সম্পর্কে বক্তব্য পেশের জন্যও স্বরাষ্ট্র দপ্তর অনুরোধ জানাইয়াছেন।

হিন্দীর জয়যাত্রা সুরু হইল এই ভাবে এবং আশা করা যায়, সহযাত্রী এই ইংরেজীকে হঠাৎ এক শুভমুহূর্ত্তে জমিচ্যুত করা এমন কিছু কঠিন কার্য্য হইবে না। সরকারী কর্ম্ম, চিঠিপত্র এবং অন্যান্য হিন্দীতে হউক, কিন্তু অহিন্দী ভাষী রাজ্যের গরীবদের কথাটা কি কর্ত্তারা একবার চিন্তা করাও প্রয়োজন মনে করিলেন না। সরকারী আদেশ-নির্দ্দেশ প্রভৃতি জানিতে এবং মানিতে হইবেই—অতএব হিন্দী না শিখিলে চলিবে না। ইহাকে সোজা কথায় জবরদস্তি ছাড়া আর কি বলিব? কর্ত্তাদের মতে হিন্দী না কি ভারতের লোকদের মধ্যে ঐক্যের বাঁধন স্থায়ী করিবে। অবশ্যই সত্য—যেমন, দক্ষিণ ভারতে হিন্দীর প্রতি প্রেম ঐ অঞ্চলের লোকদের মনে বিচিত্র এক প্রচণ্ড উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে!

ইহার পূর্ব্বে আমরা কর্ত্তাদের সতর্ক করিয়াছি যে গায়ের জোরে হিন্দীকে মানুষের ঘাড়ে চাপানোর ফল হইবে মারাত্মক—ভারতের ঐক্য ইহাতে দৃঢ় না হইয়া—ভাঙনের মুখে চলিবে। কিন্তু এক ভোটে জয়ী (তাও সভাপতির কাষ্টিং-ভোটে!) হিন্দীকে এবার রাজভাষার সকল মর্য্যাদা দান করা হইতেছে। অদূর কালে ইহা যে বিষম বিপর্য্যয় ঘটাইবে—কর্ত্তারা তাও যেন বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন না। এই ভাবে দেশে নয়া 'রাজতন্ত্র' স্থাপন প্রচেষ্টা কখনও সার্থক হইবে না! 'সংহতি' দিবসের শপথ গ্রহণও বিফল হইবে।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রবীণ সাহিত্যিক ও আইনবিদ্ ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গত ১৯শে সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮১ বৎসর হইয়াছিল।

নরেশচন্দ্র ১৮৮২ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সেকালের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ১৮৯৭ সনে এন্ট্রান্স পাস করিয়া কলিকাতায় থাকিয়া এম. এ পাস করেন। পরে আইনের ডক্টরেট পান। তাঁর কর্ম্মজীবনের অনেকখানি জুড়িয়া ছিল অধ্যাপনা। ঢাকা আইন কলেজ, রিপণ কলেজ, সিটি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। লেখা আরম্ভ করিয়াছিলেন নয়-দশ বৎসর বয়স হইতেই। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "দাসী" পত্রিকায় তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ বাহির হয়। তখন তাঁহার বয়স তেরো। তাহার পর বিবিধ পত্রিকায় তিনি লিখিতে সুরু করেন। যেমন, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী, মর্ম্মবাণী প্রভৃতি।

'বিচিত্রা'র বিচার-সভায় আধুনিকতার সপক্ষে নরেশচন্দ্রের সওয়াল ঐতিহাসিক মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। এ-কথা আজ অনস্বীকার্য্য যে, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং কল্লোল-কালের কথা-সাহিত্যের মধ্যে সেতু বন্ধন করিয়া গিয়াছেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। তিনি ছিলেন এক গৌরবময় যুগের জীবন্ত সাক্ষী। তাঁহার মৃত্যুতে সেই যুগের সহিত একালের একটি নিবিড় যোগ-সম্পর্ক যেন ছিন্ন হইয়া গেল।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

'মহাস্থবির জাতক' রচয়িতা প্রথিতযশা সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী গত ১৩ই অক্টোবর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে এক 'মহাস্থবির জাতক' লিখিয়াই তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। সকলের কাছেই তিনি 'বুড়োদা' বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

এক কঠোর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মিয়া প্রেমাঙ্কুরের শৈশব ও কৈশোরের কিছু সময় নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু কৈশোর শেষ হইবার আগেই তিনি সে বেড়াজাল ভাঙ্গিতে সুরু করিয়াছিলেন। এই দুরন্ত এ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় দীপ্যমান ব্যক্তিটির পরিচয় তাঁহার 'মহাস্থবির জাতক'-এর প্রতিটি পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়া আছে। ১৮৯০ সনের ১লা জানুয়ারী তাঁহার জন্ম হয়। পিতা মহেশচন্দ্র আতর্থী উনিশ শতকের বাংলা দেশে ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক ও দিক্‌পাল ছিলেন। তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল পূর্ব্ববঙ্গে। প্রেমাঙ্কুরের কর্ম্মবহুল জীবনের ইতিহাস বড় বিচিত্র। তাঁহার প্রথম চাকরি চৌরঙ্গীর একটি খেলার সরঞ্জামের দোকানে। তিনি ব্যবসায়ের দিকেও ঝুঁকিয়াছিলেন। অবশ্য বলাবাহুল্য, ব্যবসায়ে শুধু লোকসানই গিয়াছিল। সাহিত্য-প্রীতি তাঁহার বরাবরই ছিল। কাজের ফাঁকে যখনই সময় পাইয়াছেন তখনই লিখিয়াছেন। জীবিকার জন্য তাঁহাকে অনেক কাজ করিতে হইয়াছে। সিনেমায় যাওয়ার পর আর্থিক স্বাচ্ছল্য তাঁহার কিছুটা আসে। পরিচালকরূপে তাঁহার প্রথম আত্মপ্রকাশ 'দেনা পাওনা' চিত্রে। এবং নিউ থিয়েটার্সের ইহাই প্রথম সবাক্‌ চিত্র। নিউ থিয়েটার্সে থাকাকালীন তিনি অনেক ছবি তুলিয়াছিলেন। বহুদর্শী, বহুশ্রুত, সুরসিক আতর্থীর জীবনে বারে বারে কর্ম্মক্ষেত্রের পট-পরিবর্ত্তন হইলেও মনে-প্রাণে তিনি এক জায়গায় স্থির ছিলেন। তাহা হইল সাহিত্য-সেবা। সাহিত্যিকই তাঁর পরিচয়। একথা তিনি নিজেও বলিতেন। তিনি বহু বই লিখিয়া গিয়াছেন। ছেলেদের বইও তাঁহার কম নাই। তবে 'মহাস্থবির জাতক' তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া স্বীকৃত। ইহা ছাড়াও সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনায় ও সাংবাদিকতায় প্রেমাঙ্কুর তাঁহার মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আকাশবাণীর 'বেতার জগৎ' পত্রিকার তিনি ছিলেন প্রথম সম্পাদক। তাঁহার মৃত্যুতে নবীন ও প্রবীণের আর একটি যোগ-সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

অণিমা সেনগুপ্ত

আর একটি দুর্ঘটনার কথা আমাদের জানাইতে হইতেছে। গত ২রা অক্টোবর প্রচণ্ড তুষার-ধ্বসের কবলে পড়িয়া অণিমা সেনগুপ্ত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি নন্দকোট শিখরের মধ্যবর্ত্তী ট্রেইল্‌স্‌ গিরিবর্ত্ম অভিমুখী এক অভিযাত্রী দলে যোগ দিয়া হিমালয়ে গিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন কলিকাতার শশীমুখী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। পর্ব্বতারোহণে ছিল তাঁহার অদম্য উৎসাহ। ইতিপূর্ব্বে তিনি কৈলাস ও মানস সরোবর, অমরনাথ, পিণ্ডারী এবং রূপকুণ্ড হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছেন।

অণিমা সেনগুপ্তের আদি নিবাস ছিল বরিশাল জেলার গৈলায়। ব্রজমোহন কলেজ হইতে বি. এ. এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে এম. এ. পাস করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৪ বৎসর হইয়াছিল। তিনি অবিবাহিতা ছিলেন। তাঁহার পিতা-মাতা এখনও বর্ত্তমান, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়।

দূরের তারা

উমাদেবী

প্রথমে অনেক আলো—গান—হাসি—ব্যর্থ কোলাহল—
সময়ের রাজপথে ওরা মূঢ় মত্ত ও চঞ্চল,—
কান্ত তুমি তারই মধ্যে এনেছিলে নিশীথের তিমির প্রহর
আনন্দে গম্ভীর আর বেদনায় মন্থর—মন্থর।

প্রথমে তিমির শুধু—কিছু নাই আর
তারপর—হৃদয়ের তট ছুঁয়ে ধীরে ধীরে জেগে-ওঠা
সৌরভের অদৃশ্য জোয়ার—
কায়াহীন অনুভূতি
অলভ্যের সমস্ত আকূতি—
ক্রমে রূপ পরিগ্রহ করা এক সাকার পুষ্পের
নাসা—চোখ—ঠোঁট—মুখ—ঘন ভ্রূযুগের
রেখা-জেগে-ওঠা এক দেহের সন্নিধি—
একটি নির্জন দ্বীপ—পার হয়ে সময়ের অকূল জলধি।

তারো পরে বাসনার রক্তিম কীটের
বিষরস কেন জমে? কাটে প্রহরের
ক্লান্ত বেলা। সে নির্জন দ্বীপ হয় রাতের আকাশ
তোমার সৌরভটুকু মরে গিয়ে জন্ম নেয় অস্থির বাতাস—
আর সেই রেখাটুকু দূরে—দূরে চলে গিয়ে ক্রমে ক্রমে ধরে
দুর্লক্ষ্য তারার রূপ বিরহী প্রহরে।

আনন্দ

চিত্রভানু

মুষ্টিমেয় আয়ুর সন্তাপে মানুষ ক্ষুধায় দীন
কলঙ্কী দৈন্যের শোচনায়, একান্ত শ্রীহীন।
কিন্তু ওই নারিকেল তরু, সুন্দর সুঠাম সুকুমার,
সীমারে সহজে মেনে নিয়ে মেলে দিল আপনার।
সীমাহীন আশ্চর্য্য সুষমা, প্রাণের ঐশ্বর্য্যময়
রূপের সঙ্গীত মাঝে আপনার সত্য পরিচয়।
যা কিছু সঙ্কোচ তারে আনন্দে করিল উত্তরণ
গভীরের রসলোকে মুক্ত হ'ল স্থিতির বন্ধন।
মানুষ পারে নি যাহা পদে পদে আপন বিকারে
এই তরু সাধিল তা' অব্যাহত গ্রহণে স্বীকারে।
বন্ধন এবং মুক্তি এক সূত্রে হ'ল পরিণয়,
আনন্দ তাহার নাম, ক্ষয়হীন তার পরিচয়।

দেশের হিতসাধন

শত শত যুবক দেশের হিতসাধনের জন্য ব্যগ্র। দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে, জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। পথ কি, উপায় কি, তাঁহারা জানিতে চান।

পথ একটি নয়, উপায়ও একটি নয়। সোজা কথায় পরিষ্কার করিয়া পন্থা বুঝাইয়া দেওয়াও কঠিন।

একজন প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, there is no royal road to geometry, জ্যামিতি শিখিবার সোজা কোন পথ নাই। অন্যান্য বিদ্যা শিখিবারও সোজা পথ নাই, পরিশ্রম করিতে হয়, বুদ্ধি খাটাইতে হয়। তথাপি বীজগণিত প্রভৃতি শিখাইবার জন্য Algebra Made Easy প্রভৃতি বহি লেখা হইয়াছে। তাহাতে নানা প্রকারের প্রশ্ন সমাধানের কৌশল বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যতরকমের প্রশ্ন সমাধানের যতরকম ফিকিরই শিখাও না কেন, স্মরণশক্তির উপর যত বোঝাই চাপাও না কেন, বুদ্ধির উন্মেষে যে কাজ হয়, সে কাজটি শুধু স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া হইতে পারে না।

দেশকে শুদ্ধ, উন্নত, বড়, শক্তিশালী করিতে হইলে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে বটে, একজন সুপন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিলে, হাজার হাজার লোককে সেই পথে চলিতে হইবে বটে, কিন্তু না বুঝিয়া কোন একটি পথে চলা অপেক্ষা বুঝিয়া চলা অধিক ফলপ্রদ। অপরের নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে পারা অপেক্ষা উপায় আবিষ্কার করিবার শক্তির মূল্য ও প্রয়োজন অধিক।......

নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন আছে, কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করিতে পারিবার মত বুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। যাঁহারা দেশের মঙ্গল চান, তাঁহাদের হৃদয়ে দেশপ্রীতির প্রদীপ যেমন সর্ব্বদা জ্বলিতে থাকিবে, অবস্থানুযায়ী উপায় অবলম্বন করিবার জন্য বুদ্ধিও তেমনি সর্ব্বদা জাগরূক থাকিবে।

নেতার প্রয়োজন আছে; কিন্তু যদি নেতা না থাকেন, তাহা হইলে, এবং নেতা থাকিলেও, নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করিতে হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন বড় বড় বা ছোট ছোট দলের নায়ক আহত বা হত হন, তখন যে-সব সিপাহী দিশাহারা না হইয়া বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা।

ছোট ছোট বিষয়ে যেমন 'দেশের হিতসাধন আবশ্যক, পল্লী, গ্রাম, নগরাদি দেশের ছোট ছোট অংশের মঙ্গলসাধন যেমন আবশ্যক, সমগ্র দেশের মহত্তম হিতসাধনও তেমনি প্রয়োজনীয়। এরূপ হিতসাধনে সকল দেশবাসীর একযোগে কাজ করা চাই; অন্ততঃ খুব বেশী লোকের সহযোগিতা চাই। কিন্তু তার আগে চাই, আমাদের দেশ বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে, আমরা যে একটা জাতি, এই বোধ জন্মান।......

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৩

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

কুড়ি

তপ্তকটাহই বটে।

হরেকৃষ্ণ চশমার ফাঁক দিয়ে রামকিঙ্করকে দেখে নিয়ে যেন লাফিয়ে উঠল: এস, এস, রামবাবু এস। তোমার অভাবে দোকান অন্ধকার হয়ে ছিল। ভাল ছিলে ত?

রামকিঙ্কর ব্যঙ্গটা যেন বুঝতেই পারলে না এমনি ভাবে উত্তর দিলে: আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল আছি।

—পড়ার জন্যে বড্ড খেটেছ মনে হচ্ছে যেন। শরীরটা ত খুব ভাল বোধ হচ্ছে না। এখনি কাজে যোগ না দিয়ে দেওঘর কি পুরী কোথাও একটু হাওয়াবদল করে এলে পারতে।

রামকিঙ্কর একটু হাসলে।

হরেকৃষ্ণ বললে, এখানকার খাটুনি ত জান। আর খাওয়া-দাওয়াও, তোমার গিয়ে, বাবুদের বাড়ীর মতন ত নয়। কষ্ট হবে।

রামকিঙ্কর জবাব না দিয়ে তার বাক্স বিছানা নিয়ে ওপরে চলে গেল।

বসে বসে ভাবতে লাগল, হরেকৃষ্ণ এবারে তার ওপর কি নতুন নির্যাতনই না আরম্ভ করবে। প্রথম সম্ভাষণটা ত যুদ্ধ ঘোষণার মতই মনে হ'ল। আরও মনে হ'ল তার বুকে যেন বল বেড়েছে। গিন্নীমার কাছ থেকে কিছু কি ইঙ্গিত পেয়েছে? ওকি বুঝেছে যে, এবারে তার পিছনে গিন্নীমা নেই?

এমন সময় সুবল এল হাসতে হাসতে।

—কি খবর, সুবল? আছ কেমন?

—কেমন আছি দু'দিন পরেই বুঝতে পারবে।

—তার মানে?

—তার মানে, হরেকেষ্টর তেজ বেজায় বেড়েছে। সবাই ভয়ে তটস্থ।

রামকিঙ্কর ভয় পেয়ে গেল। বললে, তাই নাকি?

—হ্যাঁ। ও যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে। কি ব্যাপার তুমি কিছু জান?

অন্যমনস্কভাবে রামকিঙ্কর উত্তর দিলে, কিছুমাত্র না।

সুবল বললে, আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

—কেন?

—তোমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে দেখবার জন্যে।

রামকিঙ্কর হাসলে: কি রকম আর করবে! তোমাদের সঙ্গে যা করে, তার চতুর্গুণ করবে নিশ্চয়।

গম্ভীরভাবে সুবল বললে, তা পারবে না।

—কেন?

—তুমি গিন্নীমার পেয়ারের লোক। তোমাকে ঘাঁটাতে সাহস করবে না।

রামকিঙ্কর আবার হাসলে।

সুবল বললে, আর যদি করে, তোমার ত ভাবনা নেই।

—কেন? গিন্নীমার পেয়ারের লোক ব'লে?

—তা ত বটেই। তা ছাড়া, দু'দিন পরে তুমি গ্রাজুয়েট হবে। তখন তোমার নাগাল পায় কে? পরীক্ষা দিলে কেমন?

—হয়েছে একরকম।

—পাস করে যাবে ত?

—তা যেতে পারি।

সুবল গম্ভীর ভাবে বললে, আমার মনে হয়, হরেকেষ্টও চায় যে তুমি পাস করে যাও। তার কথা শুনে তাই মনে হয়।

গম্ভীর বিস্ময়ে রামকিঙ্কর বললে, বল কি!

সুবল বললে, ওর যত দুর্ভাবনা দোকানের ম্যানেজারি নিয়ে। পাছে তুমি ওর গদি দখল করে বস, সেই ওর ভয়। তোমার ওপরে ওর রাগের কারণও তাই।

রামকিঙ্কর বললে, আমি বি. এ. পাস করলে ওর কি সুবিধা হবে?

—ও ভাবে, আমরাও ভাবি, একটা ভাল চাকরি পেয়ে তুমি চলে যাবে।

রামকিঙ্কর হতাশভাবে মাথা নাড়লে: ভাল চাকরি কি এতই সহজ ভাব হে!

—তোমার পক্ষে কিছুই কঠিন হবে না। তোমার ভাগ্য ভাল।

রামকিঙ্কর হাসলে: তাই নাকি?

সুবল জোরের সঙ্গে বললে, নিশ্চয়। একদিন আমাদের মত অবস্থাতেই তুমি এই দোকানে ঢুকেছিলে। তারপরে

গ্রহের কি যোগাযোগ ঘটল, তুমি একটা একটা করে পাস করে যেতে লাগলে। গিন্নীমা নিজে তোমার সহায় হলেন। ভাগ্য আর কাকে বলে ?

এ কথা রামকিঙ্করের নিজেরও মাঝে মাঝে মনে হয়। বস্তুতঃ সে যেরকম করে ধাপে ধাপে উঠল, ভাগ্যের প্রসাদ ছাড়া তা সম্ভব নয়। সত্যই ত, এ দোকানে যেদিন সে ঢুকল, সেদিন ওতে আর সুবলে তফাৎ ছিল কোথায় ?

কিন্তু এবারে তার মনটা কি রকম দমে গেছে। মনে আর জোর পাচ্ছে না। তার বিশ্বাস, এই উত্থানই শেষ। সে যেন একটা জটিল জালে জড়িয়ে পড়ছে। নিজের ইচ্ছায় নয়, বোধ হয় ভাগ্যের চক্রান্তে। তার আশঙ্কা, গিন্নীমার অনুগ্রহ সে হারিয়েছে। যদি বা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাও ধীরে ধীরে গ্রহের চক্রান্তে হারাবে। অন্যমনস্ক-ভাবে সেই কথা ভাবতে লাগল।

এমন সময় একটি লোক এসে খবর দিলে, ম্যানেজার-বাবু ডাকছেন।

রামকিঙ্কর সুবলের দিকে চাইলে। সুবলও রাম-কিঙ্করের দিকে। এ সবের অর্থ কি, দু'জনেই জানে।

দু'জনেই নীচে এল।

হরেকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলে, তোমার হাত মুখ ধোয়া হয়েছে, রাম ?

রামকিঙ্কর বললে, না, এখনও হয় নি। এই ত এলাম। একটু বিশ্রাম করছি।

হরেকৃষ্ণ কুটিল হাস্যে বললে, হ্যাঁ, অনেক দূর থেকে এলে, একটু বিশ্রাম ত দরকারই। কিন্তু একটা জরুরী কাজ আছে। বকেয়া টাকা কিছু আদায় করতেই হবে। সন্ধ্যের পরে বাবু এসে নিয়ে যাবেন। এ কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না।

রামকিঙ্কর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বাবু ?

বিরক্ত কণ্ঠে হরেকৃষ্ণ বললে, হ্যাঁ হে, বাবু। আমাদের একজন বাবু আছেন জান না, এই দোকানের যিনি মালিক ?

রামকিঙ্কর জানে। কিন্তু সেই মালিক যে মাঝে মাঝে দোকান থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছেন এবং বাগানবাড়ীতে খরচ করছেন, তা জানে না। এটা নিশ্চয় সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে। এবং গিন্নীমাও জানেন কি না সন্দেহ।

তার চোখের সামনে বৌরাণীর ছবি। বাগান থেকে ফিরে এসে উন্মত্ত পশুটার অসহায়া স্ত্রীর ওপর বীরত্ব প্রকাশ। বৌরাণী আজকাল আর কাঁদেন না। তাঁর পিঠের ওপর চাবুকের পর চাবুক চলে, তিনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সহ্য করেন। এই দৃঢ়তার কারণ রামকিঙ্কর জানে না। অনুমানও করতে পারে না। শুধু তাঁর শেষ দিনের কথাটা তার মনে গাঁথা রয়ে গেছে: আমি আজ বৌরাণী, কাল গিন্নীমা হ'তে পারি।

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় কোথায় যেতে হবে ?

হরেকৃষ্ণ তার হাতে কতকগুলো বিল ভাউচার দিয়ে বললে, যেখানে গেলে নিশ্চয় দু'হাজার টাকা পাওয়া যায়, এমন কতকগুলো জায়গায়। ওর মধ্যে থেকে বেছে নাও, কোথায় কোথায় যাবে। কিন্তু মনে রেখ, বাবু সন্ধ্যে সাতটার সময় আসবেন যেখানেই যাও, তার আগে টাকা নিয়ে ফিরে আসতে হবে। স্নান ক'রে দুটো খেয়ে নিয়ে চটপট বেরিয়ে পড়।

বিশ্বনাথের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় নি। দু'জনেই পড়ায় ব্যস্ত ছিল। বিশ্বনাথ একদিন এসেছিল। কিন্তু অত বড় বাড়ী, দেউড়িতে তকমা-আঁটা বন্দুকধারী দারোয়ান, গলায় কার্তুজের মালা, এইসব দেখে-শুনে সে আর ভিতরে আসতে সাহস করে নি। রামকিঙ্কর একদিন ওর বাড়ী গিয়ে খবরটা শুনে খুব হেসেছিল।

বিশ্বনাথ কেমন পরীক্ষা দিলে খবরটা নেওয়া দরকার। দোকানের ছুটির পর একদিন সেখানে গেল। বিশ্বনাথ বাড়ী ছিল না। বসবার ঘরে সবিতা একটি ছোকরার কাছে পড়া করছিল। ওকে দেখে সে লাফিয়ে উঠল।

বললে, তুমি অনেকদিন পরে এলে, রামদা। পরীক্ষা কেমন হ'ল ?

—হ'ল একরকম। দাদা কোথায় ?

—দাদা বোধ হয় বাড়ী নেই। ভেতরে যাও, মা আছেন।

সুলোচনা রান্না করছিলেন রামকিঙ্কর গিয়ে প্রণাম করতে প্রথমে চমকে উঠলেন। তারপর উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বললেন, রাম! অনেকদিন পরে এলি। পড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলি বোধ হয়। কেমন পরীক্ষা দিলি ?

—হ'ল একরকম। রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, আপনাদের খবর সব ভাল ? বিশু কোথায় ?

সুলোচনা বললেন, ওঁর শরীরটা খুব ভাল যাচ্ছে না।

—কি হয়েছে ?

—বয়স হ'লে যা হয়। রোগ একটা ত নয়।

রামকিঙ্কর আবার জিজ্ঞাসা করলে, বিশু নেই ?

—সে কোথায় বেরুল। এখুনি ফিরবে। তুই ও-ঘরে বোস্। আমি হাতের রান্নাটা সেরেই যাচ্ছি। পালাস্ না যেন।

রামকিঙ্কর পাশের ঘরে গিয়ে বসল। তার পাশের ঘরে মাষ্টারমশাই সবিতাকে গ্রামার পড়াচ্ছিলেন।

সবিতাকে অনেকদিন পরে রামকিঙ্কর দেখলে। এই ক'দিনে সে যেন অনেকখানি বড় হয়ে গেছে। তার মুখেরও যেন খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। সে আর সেই ছেলেমানুষটি নেই।

পৃথিবী রোজ রোজ কেমন করে বদলাচ্ছে! এই ত সে নিজে তার গ্রামের পথে ঘাটে, গাছের ডালে ডালে খেলা করে বেড়াত। আর আজকে বি, এ পরীক্ষা দিলে। তার পরে আবার একদিন বুড়ো হবে। এবং হয়ত চন্দ্রনাথ বাবুর মত নানা রোগে ভুগবে। এ ত মানুষের কথা। এই পৃথিবীরই কি কম পরিবর্তন হচ্ছে! ছেলেবেলায় এর যে চেহারা দেখেছিল, সে চেহারা কি আজ আছে? কত বদলে গেছে। তার গ্রাম? ছোটবেলায় যেমন দেখেছিল, এখন তার থেকে কত বদলেছে। কলকাতা শহরেই ত নিত্য নতুন নতুন রাস্তা হচ্ছে, নতুন নতুন বাড়ী, নতুন নতুন ব্যবস্থা। অনেক জায়গা চিনতে পারা যায় না।

সবিতাও অনেক বদলেছে; রোজ দেখলে চোখে পড়ত না, অনেক দিন পরে দেখল বলেই চোখে পড়ল।

বই বগলে সবিতা এসে দাঁড়াল।

হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলে, মা'র সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—হয়েছে। তোমার পড়া হয়ে গেল?

সবিতা হেসে বললে, হাঁ, এবেলার মত। আবার রাত্রে আছে। সকালে স্কুল। দুপুরে আবার পড়া। কি একঘেয়ে বল ত?

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, তোমার বুঝি সকালে স্কুল?

—হাঁ। একটাই স্কুল। সকালে আমরা পড়ি, দুপুরে ছেলেরা। আমাদের ঐ মোড়ের মত অবস্থা! সকালে একটা তরকারিওয়ালা বসে, বিকেলে ফলওয়ালা।

সবিতা হাসতে লাগল।

রামকিঙ্কর অবাক্ হয়ে গেল। সবিতা চমৎকার কথা বলতে শিখেছে ত!

বললে, এখনকার দুনিয়াতে কারও দু'মিনিট বিশ্রামের ফুরসৎ নেই। তোমাদের স্কুলেরও না, ঐ মোড়টারও না।

সবিতা হেসে জিজ্ঞাসা করলে, এ কি ভাল?

রামকিঙ্করও হেসে জবাব দিলে, ভাল-মন্দর কথা নয়। এই এখনকার অবস্থা। অবকাশ ব'লে কোথাও আর কিছু থাকবে না—মানুষের জীবনেও না, মানুষের বাসভূমিতেও না। শহরের কথা ছেড়েই দাও, আমাদের গ্রামেও আগে দেখেছি, কত ফাঁকা জায়গা, এখন ক্রমেই কমে আসছে।

এমন সময় বিশ্বনাথ ফিরে এল: আরে, রামকিঙ্কর যে! কখন এলে? পরীক্ষা কেমন দিলে? কি আলোচনা হচ্ছিল তোমাদের?

সবিতার দিকে চেয়ে রামকিঙ্কর বললে, দেখলে ত? মানুষ নিজেও দম নেবে না, অন্যকেও দম নিতে দেবে না। তোমার দাদা এসেই কতগুলো প্রশ্ন করল, শুনলে ত?

অপ্রস্তুতভাবে বিশ্বনাথ বললে, কি হ'ল?

রামকিঙ্কর বললে, কিছুই নয়। কথা হচ্ছিল মানুষের জীবন নিয়ে এবং জীবনের চারিদিক ক্রমেই নীরেট হয়ে আসছে। একঘেয়ে। কোথাও অবকাশের চিহ্ন নেই।

বিশ্বনাথ বললে, সে ত পরের কথা হে। আমি ভাবছি পরীক্ষার ফলের কথা।

রামকিঙ্কর বললে, পরীক্ষা দিয়েই ফলের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছ? তোমার মত ছেলেও ভাবে? আমি ত ও কথা ভাবছিই না। যা হবার হবে।

বিশ্বনাথ চিন্তিতমুখে বললে, অনার্সের জন্য একটু ভয় হচ্ছে হে। তোমার কি রকম হ'ল?

রামকিঙ্কর সহাস্যে বললে, আমাদের আর হওয়া-হওয়াই কি? আমাদের অনার্সও নেই, আমরা ভাল ছেলেও নই। কোন রকমে পাসকোর্সে ফেলা। পাস করলাম ভাল, না করলাম আর একবার দেখা যাবে।

বলেই বললে, আর একবার দেখা যাবে কি ক'রে তাও জানি না। গিন্নীমা প্রসন্ন ছিলেন বলেই এতদূর সম্ভব হ'ল, তা তিনিও চ'টে গেছেন।

বিশ্বনাথ চমকে উঠল, বল কি! তিনি চ'টে গেলেন কেন?

রামকিঙ্কর কপালে হাত ঠেকিয়ে বললে, অদৃষ্ট।

ব'লে হাসতে লাগল।

বিশ্বনাথ কিন্তু হাসল না। বললে, এটা ভাল খবর নয় হে। যে কারণেই তিনি চ'টে থাকুন, তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা কর।

রামকিঙ্কর হাসলেও এ নিয়ে ভেতরে ভেতরে তার একটা দুশ্চিন্তা রয়েছে। গিন্নীমার প্রসন্নতা অর্জন করার ইচ্ছেও আছে। কিন্তু তার ধারণা ব্যাপারটা তার হাতে নয়। ঘটনাস্রোত বয়ে চলেছে। এখনও খুব জোরে বয়ে না চললেও, বউরাণীর কথায় সন্দেহ হয়, অচিরেই হয়ত খর বেগে বইতে সুরু করবে। তখন সেই স্রোতে সে যে কোন্ পথে গিয়ে পৌঁছবে তা সে নিজেও জানে না।

বিশ্বনাথের কথার উত্তরে বললে, গিন্নীমা গভীর জলের মাছ। তাঁর প্রসন্নতা অপ্রসন্নতা বাইরে থেকে টের পাওয়ার উপায় নেই। সুতরাং কি হবে জানি না। তবে বাঁচতে

গেলে তাঁর প্রসন্নতা হারালে আমার চলবে না, এ তুমি ঠিকই বলেছ। যাই হোক, বাবা এখন অফিস থেকে ফেরেন নি? তাঁর শরীর কেমন আছে?

বিশ্বনাথ বললে, বাবার শরীর কিছুদিন থেকেই ভাল যাচ্ছে না।

—কি হয়েছে?

—এ বয়েসে যা হয়, টুকিটাকি নানা রকম অসুখ। তার ওপর অফিসের খাটনি অত্যন্ত বেড়েছে। সাড়ে সাতটা-আটটার আগে কোন দিনই ফিরতে পারেন না। তুমি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাবে?

একটু চিন্তা করে রামকিঙ্কর বললে, অফিস থেকে খেটেখুটে ফিরবেন, এখন থাক। একটা ছুটির দিন সকালের দিকে বরং আসব। ইতিমধ্যে আমার চাকরির কথাটা একবার তাঁকে মনে করিয়ে দিও।

বিশ্বনাথ বললে, কেন, দোকানে কি তোমার সুবিধা হচ্ছে না?

—দোকানে একটা অসুবিধা ত বরাবর লেগেই আছে। গিন্নীমা খুসী ছিলেন ব'লে কোন রকমে কাজ করে যেতে পেরেছি। এখন ভয় হয়েছে। তাছাড়া কি জানো, দোকানে ভবিষ্যৎই বা কি? যদি কোন মতে বি.এ.-টা পাশ করতে পারি, বয়স থাকতে থাকতে একটা ভাল জায়গায় ঢুকে পড়া দরকার।

বিশ্বনাথ বললে, সে ত নিশ্চয়, বাবাকে আমি নিশ্চয় বলব। মাকেও একবার বলে রেখ।

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি এম.এ. পড়বে? না চাকার-বাকরির চেষ্টা করবে?

বিশ্বনাথ বললে, আমার ত এম.এ. পড়ার ইচ্ছে। কিন্তু বাবা-মা দু'জনেই সাহস পাচ্ছেন না। বাবার শরীরটা ভাল ন', তার ওপর তাঁর অবসর নেবার সময়ও ঘনিয়ে আসছে। তিনি বলছেন, তাঁর চাকরিটা থাকতে থাকতে আমাকে কোথাও একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতে পারলে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।

তা যদি হয়, রামকিঙ্কর মনে মনে বুঝলে, তা হ'লে তার চাকরি সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবু নিশ্চয় চেষ্টা করতে পারবেন না।

বিশ্বনাথ ব'লে চলল, তার ওপর সবিতাও বড় হচ্ছে। মায়ের ইচ্ছা, বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকায় ওর বিয়েটা তিনি নিজে দিয়ে গেলেই ভাল হয়।

উপসংহারে বিশ্বনাথ হেসে বললে, দুনিয়া বড় গোলমেলে জায়গা হে। বয়েস যত বাড়ছে, মন থেকে আনন্দ তত ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে।

রামকিঙ্কর বললে, মা ঠিকই বলেছেন, মেয়েদের বিয়েটা অল্প বয়সে দেওয়াই ভাল।

বিশ্বনাথ বললে, মা ত ঠিকই বলছেন, তুমিও ঠিকই বলছ। কিন্তু সবিতা ত বড় হচ্ছে। তার এখন বিয়েতে প্রবল আপত্তি।

—সবিতা কি বলছে?

—বলছে, বি. এ. পাস করার আগে আমার বিয়ে দেবার কেউ চেষ্টা করবে না।

—সবিতা নিজে বলছে?

—বলবে বৈকি ভাই। সেকালের ছোট মেয়ে ত নয়। ওর একটা ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকবে।

এ যুক্তি রামকিঙ্কর অস্বীকার করতে পারলে না। সে পাড়াগাঁয়ের ছেলে। বিয়ের কনে এ রকম কথা বলতে পারে তা তার কল্পনারও অতীত। সে-কথা ভাবতে ভাবতে সে দোকানে ফিরল।

দেশ থেকে কাকার একখানা চিঠি এসেছে। তাদের পাশের গ্রামে একটি মেয়ে আছে। মেয়েটি সুন্দরী এবং গৃহকর্মে নিপুণা, বয়সেও বেশ ডাগর। ওরা বলছে দশ-এগার বছরের সুতরাং বার ত নিশ্চয়ই হবে। বাপের একমাত্র সন্তান এবং বাপের অবস্থাও বেশ সম্পন্ন। জমি-জায়গা, গরু-বাছুর অনেকগুলি। সুতরাং পাত্রের অভাব নেই। কিন্তু মেয়ের বাপের ঝোঁক পড়েছে রামকিঙ্করের ওপর। কাকার ইচ্ছে রামকিঙ্করের বিবাহে সম্মত হওয়া।

বিয়ে ব্যাপারটা সাধারণতঃ খুব গোপনীয়। ভাঙচি দেবার লোকের অভাব নেই। সুতরাং শিবকিঙ্কর চিঠিখানি বুদ্ধি করে খামেই দিয়েছে। খামের পিছনে ৭৪॥ দেওয়া, পাছে কেউ দেখে এবং পড়ে।

রামকিঙ্কর চিঠিখানি প'ড়ে শার্টের বুক-পকেটে রেখে দিলে।

কি আশ্চর্য পার্থক্য!

সবিতার বয়স যোল-সতের হবে। বলছে, বি. এ. পাস না করে, অর্থাৎ কুড়ি-একুশের আগে বিয়ে করবে না। মায়ের বিয়ে দেবার যে ঝোঁক সেটা বয়সের জন্য নয়, কর্তা থাকতে থাকতে তার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকায় স্বচ্ছল ভাবে বিয়ে দেবার জন্য। কর্তার শরীর ভাল নয়। তাঁর অবর্তমানে বিশ্বনাথের পক্ষে একটি সুপাত্র দেখে বোনের বিয়ে দেওয়া সম্ভব নাও হ'তে পারে। নইলে সবিতার বয়স যোলই হোক আর ছাব্বিশই হোক কিছুই যায়-আসে না।

এই কলকাতার অবস্থা! আর গ্রামে দশ-এগার

বছরের মেয়ে ডাগর মেয়ে। বাপ-মা তার বিয়ের ভাবনায় আকুল।

রামকিঙ্কর হাসলে। সবিতার বিবাহে অনিচ্ছার জন্তও হাসলে, কাকার পত্রে বর্ণিত ডাগর মেয়েটির জন্তেও। গ্রাম থেকে সে স'রে এসেছে। কিন্তু শহরের হাওয়া এখনও ঠিক ধাতস্থ হয় নি। দুটোই তার বাড়াবাড়ি মনে হয়। সবিতা নিতান্ত কচি মেয়ে নয়। বিবাহে আপত্তি করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। পক্ষান্তরে গ্রামের মেয়েটি নিতান্ত কচি, তার এখন বিবাহ দেওয়ার কোন মানেই হয় না।

শুয়ে শুয়ে রামকিঙ্কর উসখুস করতে লাগল। কিছুতেই ঘুম আসে না।

সবিতার মুখখানা বারে বারে মুদ্রিত চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। ক'মাস পরে দেখলে তাকে? দু'-তিন মাসের বেশি হবে কি? কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তার দেহের এবং ব্যবহারে কি প্রকাণ্ড পরিবর্তন হয়েছে! মুখখানি বেশ ভরন্ত হয়েছে, ঘন পল্লব ভারাতুর চোখ কি শান্ত এবং সঙ্কোচ-মাখা!

এক সময় ঘুম ভাঙতে সুবল বুঝতে পারলে রামকিঙ্কর ঘুমোয় নি।

জিজ্ঞাসা করলে, কি হে, ঘুম আসছে না?

রামকিঙ্কর বললে, না ভাই।

—তাই আসে কখনও। ক'টা দিন কোথায় শুয়ে কাটিয়েছ। আর আজ দোকানের এই ছোট কুঠুরিতে শুয়ে তেলের গন্ধে ঘুম আসে কখনও? তা কি করবে বল, এইটাই আমাদের পাকা আস্তানা। এইখানেই শুতেও হবে, ঘুমুতেও হবে। প্রথম দু'-এক দিন একটু কষ্ট হবে, ঘুম আসতে চাইবে না, তারপরেই ঠিক ঘুম এসে যাবে।

ব'লে একটা বিড়ি ধরালে।

রামকিঙ্কর অপ্রস্তুত ভাবে হেসে বললে, তা নয় হে। এই ঘরেই ত এত বছর কাটল, দু'দিন বাইরে থেকে ফিরে ঘুম আসবে না কেন?

সুবল জিজ্ঞাসা করলে, তবে ঘুম আসছে না কেন?

—বাড়ী থেকে একটা চিঠি এসেছে।

—কার?

—কাকার।

—তাতে কিছু খারাপ খবর আছে?

রামকিঙ্কর বললে, খারাপও বলতে পার, খারাপ নয়ও বলতে পার।

—সেটা কি রকম?

—কাকা একটি বিয়ের সম্বন্ধ করে পাঠিয়েছে।

উৎসাহে সুবল লাফিয়ে উঠল, বল কি হে! এ ত জবর সুখবর! মেয়েটি কোথাকার?

রামকিঙ্কর কাকার চিঠির বিবরণ মোটামুটি বললে।

শুনে সুবল বললে, এ ত ভাল পাত্রী। লাগিয়ে দাও, আমরা দু'দিন আনন্দ করে আসি।

রামকিঙ্কর বললে, ভাবছি।

—ভাবছ? এতে ভাববার কি আছে? এর চেয়ে ভাল মেয়ে তুমি পাবে কোথায়?

রামকিঙ্কর মনে মনে হাসলে, অন্ধকারে সে হাসি সুবল দেখতে পেলে না। কলকাতার বন্ধু-সমাজের কল্যাণে মেয়েদের সম্বন্ধে তার রুচির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সে কথা সুবলকে বলা যায় না। সুবল কলকাতা সহরে থাকে বটে কিন্তু তার দিন-রাত্রি কাটে এই দোকান-ঘরে। তেলের পিপে গড়াচ্ছে আর তেল ঢালছে। সহরের সঙ্গে তার যথার্থ পরিচয় ঘটে নি।

সুবলের চোখে তখনও ঘুম ছিল। উপর্যুপরি ক'টা টানে বিড়িটা শেষ ক'রে বললে, আর ভেব না হে, লাগিয়ে দাও।

ব'লে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। [ক্রমশঃ
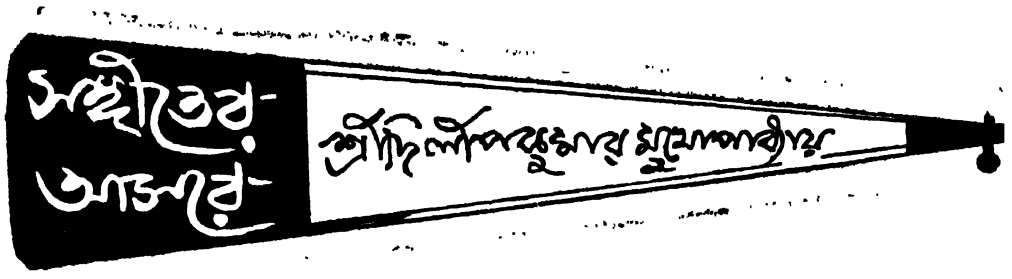
বিদ্যা আদায়

কবি শ্রীমধুসূদন তাঁর সঙ্গে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন এই বলে,—ইনি আমাদের লাইনের লোক।

মাইকেল তখন বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার, আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেছেন। দীনবন্ধু তাই নব-পরিচিতের সম্পর্কে মাইকেলকে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কি Lawyer?

মধুসূদন বললেন, না হে, না। ইনি নাট্যশাস্ত্রবিদ্। আমাদেরই লাইন ত!

'ইনি' এবং 'নাট্যশাস্ত্রবিদ্' ব'লে তিনি যাঁর পরিচয় করালেন দীনবন্ধুর সঙ্গে, তিনি কিন্তু কোন নাট্য-প্রবীণ ব্যক্তি নন। এমন গুণের মর্যাদা যাঁকে মাইকেল দিলেন, তিনি অতি তরুণ এবং মাত্র একটি ভূমিকা অভিনয় ক'রে কুশলী, সৌখীন অভিনেতা রূপে পরিচিত হয়েছেন। নাম—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তী কালের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য, কিন্তু তখন তাঁর খ্যাতির কারণ—মাইকেল মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র 'নায়িকা'র ভূমিকায় অভিনয়।

সুকান্ত, সুকণ্ঠ, প্রতিভাদীপ্ত কৃষ্ণধন পাদ-প্রদীপের সামনে প্রথম শর্মিষ্ঠা-রূপে দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করেছিলেন। আর সে দর্শকদের মধ্যে ছিলেন কারা? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মাইকেল মধুসূদন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গৌরদাস বসাক, প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি তৎকালীন কলকাতার মান্যগণ্য শিক্ষিত ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ। আর সে অভিনয় হয়েছিল কোথায়? সেকালের শ্রেষ্ঠ সৌখীন রঙ্গমঞ্চ বেলগাছিয়া থিয়েটারে। অভিনয়ে, গীতবাদ্যে, দৃশ্যপটে, সাজ-সজ্জায়, প্রয়োগ-নৈপুণ্যে যা বাংলার মঞ্চশিল্পে যুগান্তর এনেছিল; যার অধিকাংশ অভিনেতা ছিলেন ইংরেজী-শিক্ষিত, যাঁদের মধ্যমণি ছিলেন প্রতিভাধর কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। তা ছাড়া, আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আরও কত দিকে এই থিয়েটার স্মরণীয় অবদান রেখে যায়। এখানেই প্রথম ভারতীয় ঐকতান গঠন ক'রে শুনিয়েছিলেন আচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। সেই বাদকদের জন্যে এখানে প্রথম স্বরলিপিও রচনা করেছিলেন তিনি। (যা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল দশ বছর পরে, ১৮৬৮ খ্রীঃ 'ঐকতানিক স্বরলিপি' নামে)। এই থিয়েটারই নাট্যকার করেছিল কবি শ্রীমধুসূদনকে। এখানকার প্রথম নাটক ১৮৫৮ খ্রীঃ 'রত্নাবলী'র তিনি ইংরেজী অনুবাদ ক'রে দেন। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অনুরোধে, উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অভিনয় অনুসরণ করবার সুবিধার জন্যে। এই নাটক অনুবাদ-কর্মের ফলেই মাইকেলের নাটক রচনার ভাব ও ইচ্ছা মনে জাগে। তারপর রচনা করেন এখানে অভিনয়ের জন্যেই 'শর্মিষ্ঠা' নাটক (১৮৫৯ খ্রীঃ)।

সেই 'শর্মিষ্ঠা'-র নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র, ১৩।১৪ বছর বয়সী, সুকুমার-কান্তি, সুললিত কণ্ঠের অধিকারী। অভিনয় তাঁর কেমন হ'ল সেকথা স্বয়ং নাট্যকার তাঁর সুহৃদ রাজনারায়ণ বসুকে চিঠি লিখে জানালেন—When Sharmistha was acted at Belgatchia the impression it created was simply indescribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character Sharmistha and shed tears with her. As for my own feelings, they were "things to dream of, not to tell"...

অথচ সেই কিশোর কৃষ্ণধনের প্রথম অভিনয়। তার

আগে কোন থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর কোন সংস্রব ছিল না। দেশে থিয়েটারই বা ক'টি! কৃষ্ণধনের থিয়েটারের সখের কথা তার আগেও কখনও জানা যায় নি। ঘটনাচক্রে তিনি হয়ে ওঠেন এই নাটকের অভিনেতা।

সখ ছিল তাঁর কুস্তী লড়বার। তাঁর হোগলকুড়িয়ার (উত্তর কলকাতার ভীম ঘোষ লেন) বাড়ীর কাছে তখন মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটের বিখ্যাত গুহ পরিবারের কুস্তির আখড়া। গুহ বংশের সৌখীন পালোয়ান অম্বিকাচরণ (অম্বুবাবু) সেই আখড়ার পত্তন করেছিলেন তার কয়েক বছর আগে। সেখানে নিয়মিত কুস্তি লড়তে গিয়ে কৃষ্ণধনের সঙ্গে গুহ পরিবারের তারাচরণ বাবুর পরিচয় ঘটে। তারাচরণ গুহ যেমন কুস্তিগীর, তেমনি ছিলেন সঙ্গীতপ্রেমী, অভিনয়-কুশলী এবং মজলিসী ব্যক্তি। ওই বেলগাছিয়া থিয়েটারের তিনিও একজন অভিনেতা এবং প্রতাপচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বন্ধু। তিনি কুস্তির আখড়ায় বেলগাছিয়া থিয়েটারের মহলা, অভিনয়, যন্ত্রসঙ্গীত এই সব বিষয়ের নানা গল্প বলতেন কৃষ্ণধনের কাছে। তাঁর মুখে সে-সব কথা শুনতে শুনতে সেখানকার থিয়েটার দেখবার কৃষ্ণধনের প্রবল ইচ্ছা জাগে।

কিন্তু বেলগাছিয়া থিয়েটারের প্রবেশপত্র পাওয়া অতি কঠিন। বিশেষ খ্যাতিমান্ কিংবা অভিজাত ব্যক্তি ভিন্ন কারুর পক্ষে সে থিয়েটারে প্রবেশ করা সম্ভব হ'ত না। তাই দর্শকরূপে সেখানে উপস্থিত হ'তে অনেক বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন কৃষ্ণধন। কারণ তিনি ছিলেন দরিদ্রের সন্তান।

শেষ পর্যন্ত তিনি স্থির করেন, সেখানকার নাট্য দলে যোগ দেবেন, তা হ'লে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। কিন্তু সে সংকল্প কাজে পরিণত করাও প্রায় অসম্ভব। তবে তিনি হাল ছাড়লেন না এবং তারাচরণ বাবুর মধ্যস্থতায় তাঁর চেষ্টাও বন্ধ রইল না।

কিছুদিন পরে একটি সুযোগ এল। তখন দ্বিতীয় নাটক শর্মিষ্ঠা মঞ্চস্থ করবার ব্যবস্থা হচ্ছে বেলগাছিয়া থিয়েটারে। নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে একজন অল্প-বয়সী অভিনেতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। (বলা বাহুল্য, তখনকার সমস্ত সৌখীন রঙ্গালয়েই স্ত্রীভূমিকা অভিনয় করতেন অভিনেতারা। পেশাদার অভিনেত্রীরা প্রথম স্ত্রীভূমিকায় অবতীর্ণ হন বেঙ্গল থিয়েটারে, মাইকেল মধুসূদনেরই পরামর্শে—সে থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ, ধনকুবের রামদুলাল সরকারের দৌহিত্র)।

এবার কৃষ্ণধন বেলগাছিয়া থিয়েটারে প্রবেশ করতে সক্ষম হলেন নিজের প্রতিভায়, অভিনেতারূপে

কিন্তু এই বাহ্য। তাঁর অভিনেতার জীবন বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকালমৃত্যুতে (১৮৬১ খ্রীঃ) বেলগাছিয়া থিয়েটারেরও আয়ু ফুরিয়ে যায়। তার ক'বছর পরে কৃষ্ণধন আর একবার পাদ-প্রদীপের সামনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ীর থিয়েটারে। তখন তাঁর বয়স ১৯।২০ বছর। সেই শেষ অভিনয়: কারণ তাঁর প্রকৃত পরিচয় হ'ল তাঁর সঙ্গীত-জীবন, যার সূত্রপাতও হয়েছিল ওই বেলগাছিয়া থিয়েটারে। ওখানেই তিনি ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গে পরিচিত হন ও তাঁর কাছে প্রথম সঙ্গীত-শিক্ষা আরম্ভ করেন। গোস্বামী মহাশয়ের শিক্ষা কয়েক বছর পাবার পর তিনি অন্যান্য কলাবতের কাছেও শিখেছিলেন—যেমন পাথুরিয়াঘাটার ধ্রুপদী-বীণ্‌কার হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোয়ালিয়রের সেতারী আহম্মদ খাঁ প্রভৃতি। কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে সেতার, পিয়ানো ইত্যাদি যন্ত্রসঙ্গীতেরও তিনি চর্চা করেছিলেন। পিয়ানো শিক্ষা করেন জনৈক ইউরোপীয় শিক্ষকের কাছে। ইউরোপীয় সঙ্গীততত্ত্বে তাঁর অভিজ্ঞতার পরিচয় তাঁর গ্রন্থাবলীর রেখামাত্রার স্বরলিপি রচনায় বিধৃত আছে। তা ছাড়া, তাঁর সুনাম ছিল ভাল পিয়ানো-বাদক বলে।

ক্ষুরধার-বুদ্ধি কৃষ্ণধন তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন সঙ্গীতক্ষেত্রে। মাত্র ২১ বছর বয়সে নিজের লেখা স্বর-লিপির বই 'বঙ্গৈকতান' (১৮৬৭ খ্রীঃ) প্রকাশ করেন। শুধু বাংলায় নয়, ভারতবর্ষের মধ্যে এইটিই প্রথম প্রকাশিত স্বরলিপি পুস্তক। (ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ১৮৫৮ খ্রীঃ বেলগাছিয়া থিয়েটারে ঐকতান বাদনের বাদকদের জন্যে যে-সব স্বরলিপি রচনা করেছিলেন, তা তখন পুস্তকাকারে প্রকাশ হয় নি, হয়েছিল কৃষ্ণধনের 'বঙ্গৈকতান' প্রকাশের এক বছর পরে)।

শুধু প্রথম স্বরলিপি পুস্তক নয়, ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কৃষ্ণধন-রচিত এই স্বরলিপির পদ্ধতিও অভিনব। ইউরোপীয়-সঙ্গীতের রেখামাত্রার স্বরলিপি প্রণালী কৃষ্ণধন ভারতীয়

সঙ্গীতে প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন। রাগসঙ্গীতে প্রথম harmony রচনার কৃতিত্বও তাঁর।

কৃষ্ণধনের রেখামাত্রার স্বরলিপি প্রচলনের চেষ্টা এদেশে সফল হয় নি। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী যে অঙ্কমাত্রার স্বরলিপি প্রবর্তন করেন এবং শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর যার ব্যাপক প্রচার করেন সেই লিপি চলিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণধনের পক্ষে তাতে অগৌরবের কথা কিছু নেই। তাঁর নতুন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা, তাঁর স্বাধীন সঙ্গীত-চিন্তা।

দারিদ্র্য এবং বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম ক'রে কৃষ্ণধনকে সঙ্গীতশিক্ষায় অগ্রসর হ'তে হয়েছিল। প্রতিভাধর তিনি সেই অবস্থার মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় স্কলারশিপ লাভ ক'রে কলেজের শিক্ষা পান ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। তার পর সেকালের বাঙ্গালীর সেই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পরম আকাঙ্ক্ষিত পদ সঙ্গীতচর্চায় আত্মনিয়োগ করবার জন্যে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন—তাঁর সে-সব বিস্তৃত জীবনকথা এখানে বলবার অবকাশ নেই। সঙ্গীততত্ত্ব বিষয়ে রচিত তাঁর বহুমূল্য গ্রন্থ 'গীতসূত্রসার' এর নাম উল্লেখ ক'রে তার প্রথম জীবনের কথায় ফিরে আসা যাক। কারণ আলোচ্য ঘটনাটি তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার প্রথম যুগের কথা।

সঙ্গীত শিক্ষার প্রথম থেকেই কৃষ্ণধনের শিক্ষা করবার অদম্য আগ্রহ দেখা যায়। যেমন তাঁর অধ্যবসায়, তেমনি অপরিসীম গ্রহণ করবার ক্ষমতা। তীক্ষ্ণবুদ্ধি কৃষ্ণধন সহজাত সঙ্গীত-প্রতিভায় অতি ত্বরিৎ শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করে নিতেন। নচেৎ সঙ্গীত শিক্ষা একেবারেই সম্ভব হ'ত না তাঁর পক্ষে। কারণ গুরুর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রাণ-ঢালা শিক্ষা তিনি পান নি। তাঁর প্রথম সঙ্গীতগুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গে পরে স্বরলিপি-প্রণালী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কৃষ্ণধনের যে গুরুতর মতবিরোধ ও মনান্তর ঘটেছিল, হয়ত তার সূত্রপাত হয় তার অনেক পূর্বে, তাঁর কাছে সঙ্গীত-শিক্ষার সময় থেকেই। যে কোন কারণেই হোক, কৃষ্ণধন গুরুর তেমন প্রিয়পাত্র ছিলেন না। গোস্বামী মহাশয়ের অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। শৌরীন্দ্রমোহনের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বের সঙ্গে কুরুকুলের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের অর্জুনের প্রতি মনোভাবের হয়ত উপমা দেওয়া যায়। সে যা হোক, শৌরীন্দ্রমোহনকে ক্ষেত্রমোহন নিজের অর্জিত বিদ্যা অকাতরে দান করতেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শৌরীন্দ্রমোহনের তুল্য আর কেউ না হ'তে পারেন, এ ইচ্ছাও সম্ভবত ছিল গোস্বামী মহাশয়ের মনে।

সে জন্যে গুরু হয়ত কৃষ্ণধনকে শৌরীন্দ্রমোহনের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী মনে ক'রে প্রথম জনের ওপর ঈষৎ বিরূপতার ভাব পোষণ করতেন। তার ওপর, কৃষ্ণধনের শিখে নেবার, মনে রাখবার ও আত্মসাৎ করবার অসাধারণ ক্ষমতাও লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। অন্য কেউ শিক্ষা করবার সময়, কিংবা কেউ গাইবার বা বাজাবার সময় কৃষ্ণধন তা মনের পটে মুদ্রিত ক'রে নিতেন। তাই কোন কোন সময় ক্ষেত্রমোহন এড়াবার চেষ্টা করতেন তাঁকে। বিশেষ শৌরীন্দ্রমোহনকে শিক্ষা দেবার সময়ে। কৃষ্ণধন যেন সর্বদা বিদ্যা আদায় ক'রে নিতে না পারেন!

সেই সময়কার একদিনের ঘটনা। যখন শৌরীন্দ্রমোহন ও কৃষ্ণধন দুজনেই উদীয়মান সঙ্গীতপ্রতিভা এবং তাঁদের যুগপৎ গুরুরূপে বিরাজমান ক্ষেত্রমোহন।

স্থান—৬৫, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। শৌরীন্দ্রমোহনের পৈত্রিক প্রাসাদ, সঙ্গীতচর্চার এক স্মরণীয় পীঠস্থান। সেখানকার সঙ্গীতসভায় সমগ্র ভারতবর্ষের কত শ্রেষ্ঠ কলাবত তাঁদের গুণপনা দেখিয়ে ধন্য ক'রে গেছেন। ভারতবর্ষের প্রথম সর্বভারতীয় সঙ্গীত-সম্মেলন হয় যে ঐতিহাসিক ভবনে। শৌরীন্দ্রমোহনের সমগ্র সঙ্গীতজীবনের সাক্ষী এবং ভারতীয় সঙ্গীতের পুনরুদ্ধারে তাঁর চিরস্মরণীয় অবদানের সমস্ত কার্যাবলীর ঘটনাস্থল। সঙ্গীত-সরস্বতীর যে তীর্থস্থান এখন বণিকের তুলাদণ্ড মস্তকে ধারণ ক'রে কুশ্রী পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে—তার তখন সেই সমৃদ্ধ যুগ।

সেখানকার সদর মহলের দোতলার একটি কক্ষ। বাইরের কোন ওস্তাদের সে-সময় সেখানে আসর বসে নি। নিরিবিলি বিকালবেলা সঙ্গীতচর্চা করছিলেন শৌরীন্দ্রমোহন এবং গোস্বামী মহাশয়। প্রিয় শিষ্যকে তখন তিনি মূল্যবান্ কিছু শেখাচ্ছিলেন।

এমন সময় সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হলেন কৃষ্ণধন। গুরুভাই শৌরীন্দ্রমোহনের কাছে এমন তিনি মাঝে মাঝে আসতেন, সঙ্গীতের আলাপ-আলোচনা কিংবা চর্চা ক'রে

যেতেন। কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতে শৌরীন্দ্রমোহনকে শেখাতেন না ক্ষেত্রমোহন। কৃষ্ণধনও জেনেশুনে সে-সব সময় আসতেন না।

সেদিনও তিনি গুরুর শিক্ষাদানের কথা না জেনে উপস্থিত হয়ে পড়েন সেখানে। অবাঞ্ছিত অতিথি!

তাঁকে দেখবামাত্র ক্ষেত্রমোহন শৌরীন্দ্রমোহনকে ব'লে উঠলেন, সব বন্ধ কর। এখনই সব আদায় ক'রে নেবে!

গোস্বামী মহাশয় কথাটি যেভাবেই বলুন, কৃষ্ণধনের সঙ্গীত-বিদ্যা অর্জনের শক্তির এমন প্রশংসা আর কি হ'তে পারে?

এক দিনের, না এক মাসের, না এক বছরের ভৈরবী?

এই প্রশ্নটি করেছিলেন মহম্মদ খাঁ। গত শতকের বিখ্যাত সেতার-সুরবাহার গুণী মহম্মদ খাঁ। লক্ষ্ণৌ-এর গোলাম মহম্মদের ঘরের কৃতী শিষ্য তিনি, বাংলা দেশে অনেক বছর বাস ক'রে এখানকার সঙ্গীতসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। তাঁর নাম রাখবার মতন শিষ্যও ছিলেন বাঙ্গালী। এবং তাঁর মৃত্যুও হয় এখানে, বিশ শতকের গোড়ার দিকে।

যে ঘরের তালিম মহম্মদ খাঁ পেয়েছিলেন, ভারতবর্ষে সেতার-সুরবাহারের সেটি এক বড় ঘরানা ছিল। বহু শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত এই সঙ্গীত-পরিবার লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে প্রথম গঠিত হ'লেও শেষে বিস্তার লাভ করে বেশি বাংলা দেশে। পশ্চিমে তার একটি ধারা অবশ্য থেকে যায়। কিন্তু বাংলায় একাধিক ধারা বিস্তৃত হয় বিচিত্রভাবে এবং মহম্মদ খাঁর পরেও কয়েক পর্যায় ধরে তার অস্তিত্ব থাকে বিভিন্ন বাঙ্গালী গুণীর সাধনায়। এমন কি আজও বাংলা দেশে তার কোন কোন ধারা লুপ্ত হয় নি।

এই সঙ্গীত পরিবারের (ভাষান্তরে ঘরাণার) নানা সূত্র ধ'রে প্রথম প্রতিষ্ঠার যুগ অনুসন্ধান করতে গেলে উপস্থিত হ'তে হয় সওয়া শ' বছর আগে লক্ষ্ণৌ নগরে। পরিবারটির আদিতে তখন মহাগুণী বীণকার ওমরাও খাঁকে সেখানে দেখা যায়। সে হ'ল লক্ষ্ণৌর শেষ নবাব ওয়াজিদ আলী শা'র পিতা আমজাদ আলী শা'র আমল। ওমরাও খাঁ ছিলেন আমজাদ আলী শা'র দরবারের সম্মানিত বীণকার।

ওমরাও খাঁ তানসেনের কন্যা-বংশের বীণকারদের মধ্যে একজন প্রখ্যাত পুরুষ। তিনি সেই বংশীয় ছোট নৌবাৎ খাঁর পুত্র এবং স্বনামখ্যাত নির্মল শা'র ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা। নির্মল শা'র পুত্র না থাকায় তাঁর সমগ্র সঙ্গীত-সম্পদ্ ভ্রাতুষ্পুত্র জামাতা ওমরাও খাঁ লাভ করেছিলেন। তাঁর দুই সুযোগ্য পুত্র আমীর খাঁ (বাহাদুর সেনের সহযোগে রামপুর ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা) ও রহিম খাঁও ছিলেন কৃতী বীণকার। পিতার কাছেই তাঁরা বীণার শিক্ষা পেয়েছিলেন।

ওমরাও খাঁ কিন্তু সুরবাহার-সেতারে তালিম দেন অন্য দুই শিষ্যকে। ওমরাও খাঁর এই সুরবাহার সেতার শিক্ষাদান থেকেই আমাদের আলোচ্য পরিবারটির উৎপত্তি। সুরবাহার যন্ত্রে তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন গোলাম মহম্মদ। সুরবাহারের অস্তিত্ব না কি তার আগে ছিল না। সেতার-যন্ত্রের এই বৃহত্তর সংস্করণ তৈরি হয় ওমরাও খাঁর নির্দেশ, গোলাম মহম্মদের জন্যে। এই বৃহৎ আকারের সেতারের নামকরণ করা হয় সুরবাহার। এটি গৎ বাজাবার যন্ত্র নয়, শুধু আলাপচারির উপযুক্ত এবং ওমরাও খাঁ গোলাম মহম্মদকে সুরবাহারে আলাপ-পদ্ধতি শিক্ষা দেন।

গোলাম মহম্মদের আরও কথা জানাবার আগে ওমরাও খাঁর আর এক শিষ্যের কথা উল্লেখ করবার আছে। তাঁর নাম কুতুব-উদ্দৌল্লা। তানসেনের পুত্রবংশীয় গুণী প্যার খাঁ (ছজু খাঁর পুত্র এবং জাফর খাঁর দ্বিতীয় ভ্রাতা) ছিলেন কুতুব্‌উদ্দৌল্লার প্রধান ওস্তাদ। কিন্তু ওমরাও খাঁর শিক্ষাও কুতুব্ পেয়েছিলেন। তিনি অতি গুণী সেতারীরূপে সুপরিচিত হন এবং ওয়াজিদ আলী শা লক্ষ্ণৌতে নবাব থাকবার সময় তাঁর দরবারে নিযুক্ত থাকেন। নবাব ওয়াজিদ আলী তাঁর কাছে প্রথম জীবনে সেতার শিক্ষাও করেছিলেন এবং একজন সভাসদ্‌রূপে সম্মানিত করেন তাঁর এই সেতারের ওস্তাদকে। নবাব মেটিয়াবুরুজ নির্বাসিত জীবনযাপন করবার সময়ে কুতুব্‌উদ্দৌল্লার নাম আর বিশেষ পাওয়া যায় না। তিনি সম্ভবত পশ্চিমাঞ্চলেই থেকে যান, কলকাতায় আসেন নি।

তিনি যেমন সেতারে, ওমরাও খাঁর অন্য শিষ্য গোলাম মহম্মদ তেমনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন সুরবাহারে কুশলী কলাকাররূপে। গোলাম মহম্মদকে ওমরাও খাঁ তালিম

দেবার সময় যে সুরবাহার যন্ত্রের উৎপত্তি, পরে গোলাম মহম্মদের সুর-সাধনার ফলে তার প্রচলন হয়। তিনি সেতারও বিশেষ ভাল বাজাতেন (সে তালিমও তাঁর ওস্তাদ ওমরাও খাঁর কাছে পাওয়া), বীণাবাদনেও নিপুণ ছিলেন, কিন্তু সুরবাহারী বলেই তাঁর নাম ছিল সবচেয়ে বেশি।

লক্ষ্ণৌতে তিনি অনেক সময় বাস করলেও তাঁর বাড়ী ছিল বান্দায়। একনিষ্ঠ সঙ্গীত-চর্চার আগ্রহ আর গুরুকে একান্ত শ্রদ্ধা-ভক্তির জন্যে ওমরাও খাঁর তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। শোনা যায়, গোলাম মহম্মদের নাম আসলে গোলাম ছিল না. ওই শব্দটি তিনি নামের সঙ্গে যোগ ক'রে নেন ওস্তাদের কাছে নিজেকে 'দাস' বলে নিবেদিত করবার জন্যে। তিনি ওস্তাদ ওমরাও খাঁর 'গোলাম' ব'লে নিজেকে পরিচিত করতেন গুরুর কাছে—তাই গোলাম মহম্মদ নাম নেন।

তঁাদের সমসাময়িক একজন উর্দু লেখকের (লক্ষ্ণৌর হকিম মহম্মদ করম ইমাম—'মাদনুল মুসিকী' গ্রন্থপ্রণেতা) মতে, গোলাম মহম্মদ তাঁর বাজনায় যে ধরণের ঠোক' ব্যবহার করেন তা' তিনি (করম ইমাম) এক ওমরাও খাঁ ছাড়া আর কারুর বাজনায় শোনেন নি। ১৮৫৭-এর কিছু আগে গোলাম মহম্মদের মৃত্যু হয় বলরামপুরে।

তিনি কোনদিন বাংলা দেশে আসেন নি। কিন্তু তাঁর পুত্র ও শিষ্যধারার একাধিক ব্যক্তি বহু বছর বাংলায় বাস করেছিলেন এবং তাঁদের নিয়েই এই অধ্যায়। এই রকমের কয়েকটি শাখা-প্রশাখায় ওমরাও খাঁ তথা গোলাম মহম্মদের সঙ্গীতধারা বাংলা দেশে বিস্তার লাভ করে।

গোলাম মহম্মদের সঙ্গীত-সম্পদের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র—স্বনামধন্য সাজ্জাদ মহম্মদ। তিনি ছাড়া তাঁর পিতার (গোলাম মহম্মদের) আরও কয়েকজন শিষ্য ছিলেন—নবী বক্স, মহম্মদ খাঁর পিতা প্রভৃতি। মহম্মদ খাঁর পিতা (নাম জানা যায় নি) গোলাম মহম্মদের খিদমদগার থেকে পরে তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। তিনি সাজ্জাদ মহম্মদের প্রায় সমবয়সী। পুত্র মহম্মদ খাঁ তাঁর কাছে যেমন তালিম পেয়েছিলেন, তেমনি সাজ্জাদ মহম্মদের কাছেও অনেক লাভ করেন, বিশেষ সাজ্জাদ মহম্মদের শেষ বয়সে।

প্রথমে সাজ্জাদ মহম্মদের মাধ্যমে এই ধারা বাংলা দেশে এসে পৌঁছয়। তিনি পরিণত বয়সে বাংলায় বসবাস আরম্ভ করেন এবং শেষ ক'বছরের সঙ্গীত-জীবন অতিবাহিত করবার পর তাঁর মৃত্যুও হয় এখানে। বাংলার অন্য কয়েকটি সঙ্গীতাসরে তিনি মাঝে মাঝে যোগ দিলেও, একাদিক্রমে বহুদিন এবং জীবনের শেষ ক'বছর তিনি রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত-দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। শেষ জীবনে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোকে অন্ধ হয়ে যান সাজ্জাদ মহম্মদ। তারও আগে থেকে এবং মৃত্যু পর্যন্ত মহম্মদ খাঁ তাঁর সঙ্গে থাকেন, সেবাযত্ন করেন, তালিম নেন।

তা ছাড়া, বাংলা দেশে আরও একাধিক শিষ্য হয়েছিলেন সাজ্জাদ মহম্মদের। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রধানত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর ও পরে কিছুকাল দীপচাঁদ লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রের শিষ্য হ'লেও সাজ্জাদ মহম্মদের কাছে সেতার শিক্ষা করেছিলেন। সাজ্জাদ মহম্মদ তাঁর আশ্রয়েই বাস ক'রে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বৃত্তি ভোগ করেন।

সাজ্জাদ মহম্মদের আর একজন বাঙ্গালী শিষ্যের নাম করা উচিত। তিনি সে-যুগের বাংলার এক বিচিত্র সঙ্গীত-প্রতিভ—বামাচরণ ভট্টাচার্য। বিচিত্রতর তাঁর শিক্ষার প্রসঙ্গ। তিনি ধনীর সন্তান ছিলেন না, কিন্তু সেকালের ভারতবর্ষের এমন ক'জন শ্রেষ্ঠ কলাবতের কাছে সঙ্গীত-শিক্ষার সুযোগ ক'রে নেন, যাঁদের সামনে সাধারণ ঘরের কোন শিক্ষার্থীর উপস্থিত হওয়াই ছিল অসম্ভব ব্যাপার। যেমন, তানসেনের পুত্র-বংশীয় মহাগুণী বাসৎ খাঁ, বড়কু মিয়াঁ ও মহম্মদ আলী খাঁর পিতা এবং জাফর খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। প্রথম জীবনে বাসৎ খাঁ লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের দরবারে অবস্থান করবার পর নবাব ওয়াজেদ আলী শা'র মেটিয়াবুরুজ দরবারে সসম্মানে অধিষ্ঠিত থাকেন। নবাবের মৃত্যুর পরে ছিলেন রাণাঘাটের বিখ্যাত ধনী-পরিবার পাল-চৌধুরীদের সঙ্গীত-সভায়। তারপর টিকারির মহারাজার সম্মানিত অতিথিরূপে গয়ায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। সঙ্গীত-জগতের এমন একজন নায়কের কাছেও শিক্ষা করেছিলেন বামাচরণ, যা অন্য কোন বাঙ্গালীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। সাজ্জাদ মহম্মদের তালিমও পেয়েছিলেন তিনি এবং মহম্মদ খাঁরও। তা ছাড়াও আরও কয়েকজন গুণীর কাছে অল্প-বিস্তর শিখেছিলেন বামাচরণ সকলের নাম করা

বাহুল্য। তাঁর এই দুর্লভ সৌভাগ্যের কারণ, বাংলার কয়েকটি সঙ্গীতপ্রেমী ধনী পরিবারের সহযোগিতা। রাণাঘাটের পালচৌধুরী, গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায়, মুড়াগাছার আচার্য চৌধুরী প্রভৃতি জমিদার-ভবনের সঙ্গীতসভায় তাঁর অবাধ গতিবিধি ছিল পরিবারের কর্তাদের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায়। তাঁদের অনুমোদনে বামাচরণ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গুণীর কাছে শিক্ষার দুর্লভ সুযোগ পান ও নিজের প্রতিভায় তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। 'ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে' কিংবা ধনবান আনে গুণী 'সুধবানে' শোনে। সে যা হোক, বামাচরণ এই ভাবে যে অমূল্য সঙ্গীত-বিদ্যা আহরণ ও ধারণ করেন, তার ফলে বাংলা দেশে রাগ-সঙ্গীতের চর্চার কিছু পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বাসৎ খাঁ, সাজ্জাদ মহম্মদ প্রভৃতির সঙ্গীতধারা, আংশিক ভাবে হলেও, বামাচরণের পুত্র পৌত্রাদি (জিতেন্দ্রনাথ ও লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য) এবং তাঁদের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে দিয়ে বাংলার সঙ্গীতের আসরে সঞ্চারিত থাকে।

সাজ্জাদ মহম্মদের সেতার-সুরবাহার বাজনার জন্যে আর একজন এখানে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলেন। তিনি বাঙালী না হলেও বাংলা দেশে জীবনের প্রায় অর্ধাংশ অতিবাহিত করেন এবং তাঁর পুত্র আজীবন বাংলা নিবাসী। তিনি হলেন সেতারী এনায়েৎ খাঁর পিতা ইমদাদ খাঁ। সাজ্জাদ মহম্মদ পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-বাড়ীতে থাকবার সময় ইমদাদ খাঁ তাঁর কাছে যে যন্ত্রসঙ্গীত বিষয়ে ঋণী হয়েছিলেন, সে-প্রসঙ্গ ইমদাদ খাঁর একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে।

এমনি ভাবে ওমরাও খাঁ, গোলাম মহম্মদ, সাজ্জাদ মহম্মদ, মহম্মদ খাঁর ক্রম-পর্যায়ে গঠিত সঙ্গীত-পরিবারের ধারা আংশিক ভাবে কয়েকটি শাখা-প্রশাখায় বাংলা দেশে বিস্তৃত হয়। সাজ্জাদ মহম্মদের পরে এই সম্পদের প্রধান ধারক-বাহক মহম্মদ খাঁর সূত্রে এই ধারা আর এক দফায় বিস্তার লাভ করে বাংলায়। কারণ মহম্মদ খাঁও তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল এদেশে বাস করেন, বাংলার বহু সঙ্গীতাসরে যোগ দেন নানা সঙ্গীত-সভায় যুক্ত থাকেন এবং কয়েকজন বাঙালী শিক্ষার্থী তাঁর তালিম পান।

সাজ্জাদ মহম্মদের মূল্য অত বড় কলাবত না হলেও মহম্মদ খাঁ সেতার-সুরবাহার বাদকরূপে বিশেষ কম ছিলেন না। সাজ্জাদ মহম্মদের মৃত্যুর কিছু পরে তিনি নিযুক্ত হন গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় পরিবারের সঙ্গীতসভায়। মহম্মদ খাঁর কাছে বামাচরণ ভট্টাচার্যের কিছু শিক্ষার কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু খাঁ সাহেবের তালিম যিনি সবচেয়ে বেশিদিন এবং ভাল ভাবে পেয়েছিলেন, একান্ত ভাবে তাঁরই ধারায় সুর-সাধনা করেছিলেন, যাকে মহম্মদ খাঁর উত্তরাধিকারী বলা যায়, তিনি হলেন গোবরডাঙ্গার জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। মনুবাবু নামে সঙ্গীত-সমাজে সুপরিচিত এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের সৌখীন সঙ্গীতজ্ঞ যেমন একনিষ্ঠ সাধনায় সঙ্গীতশিক্ষা করেন, তেমনি বাংলার এক শ্রেষ্ঠ গুণীরূপে পরিগণিত হন। সুরবাহার-শিল্পী জ্ঞানদাপ্রসন্নের আর এক শখ ও সাধন ছিল শিকার। নিপুণ শিকারী হিসেবেও তাঁর খুব নামডাক ছিল। শিকারের তীব্র নেশাও কিন্তু তাঁর সঙ্গীত-চর্চার আকর্ষণ কিছুমাত্র শিথিল করতে পারে নি। শিকার যাত্রার সঙ্গেও তাঁর সঙ্গে যেতেন ওস্তাদ মহম্মদ খাঁ, অন্যান্য গায়ক-বাদকেরা এবং সঙ্গীতামোদী সুহৃদবর্গ। সঙ্গীতের নানা সরঞ্জাম ওস্তাদের সঙ্গে তাঁবুতে রেখে তিনি শিকারে যেতেন। রাত্রে তাবুতে ফিরে এসে চলত গান বাজনা। শিকার ও সঙ্গীতে তাঁর অন্তরঙ্গ সহযাত্রী ছিলেন মুড়াগাছার আচার্য চৌধুরী, রাণাঘাটের পালচৌধুরী, নলডাঙ্গার রায় প্রভৃতি জমিদার পরিবারের বন্ধুরা। রাণাঘাটের বিখ্যাত টপ্পাগায়ক নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সেতার সুরবাহার বাদক বামাচরণ ভট্টাচার্য প্রভৃতিও এই সব শিকার শিবিরের সঙ্গীতাসরে যোগ দিতেন। জ্ঞানদাপ্রসন্নের সুহৃদ জমিদারবর্গের অনেকের বাড়ীর আসর সেতার-সুরবাহার বাজিয়ে মাৎ করেছেন মহম্মদ খাঁ। কিন্তু জ্ঞানদাপ্রসন্ন ভিন্ন আর কেউ মহম্মদ খাঁর সঙ্গীত-বিদ্যা অনেকাংশে আয়ত্ত করতে পারেন নি।

মহম্মদ খাঁর আর একজন শিষ্য ছিলেন উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি বিক্রমপুরের বীজগাঁয়ের জমিদার এবং সঙ্গীত-শাস্ত্রবিদ্ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মাতুল। যে শিরোনামা দিয়ে এই অধ্যায়ের আরম্ভ, সেই কথাটি উমেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে মহম্মদ খাঁ বলেছিলেন—এখন সেই প্রসঙ্গ।

মহম্মদ খাঁ তখন উত্তর কলকাতার জ্ঞানদাপ্রসন্নের 'গোবরডাঙ্গা হাউস্'-এ (মানিকতলার মোড়ের কাছে, বিবেকানন্দ রোডে। সে ভবন এখন হস্তান্তরিত) থাকেন। উমেশচন্দ্র

বিক্রমপুর থেকে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন এবং অন্যান্য কাজের মধ্যে মহম্মদ খাঁ'র কাছে কিছু কিছু সেতারে তালিম নেন। সেবারেও এসে দেখা করেছেন মহম্মদ খাঁর সঙ্গে, গোবরডাঙ্গা হাউসের বৈঠকখানায়। সেখানে মন্মথবাবু ও আরও কয়েকজন ছিলেন মহম্মদ খাঁর কাছে, সঙ্গীত-চর্চা হচ্ছিল। উমেশচন্দ্রও এসেছেন খাঁ সাহেবের কাছে নতুন কিছু শিখতে।

মহম্মদ খাঁ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ কি দেব?'

অর্থাৎ কোন্ রাগ তিনি শিখতে চান খাঁ সাহেবের কাছে।

উমেশচন্দ্র বললেন, 'ভৈরবী'।

শুনে, মহম্মদ খাঁ একটু চুপ ক'রে থেকে রহস্য ভরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রকম ভৈরবী শেখবার ইচ্ছে? এক-দিনের ভৈরবী, না এক মাসের ভৈরবী, না এক বছরের ভৈরবী?'

ভারতীয় রাগ-বিদ্যার যেমন গভীরতা, তেমনি ব্যাপকতাও। যেমন অসংখ্য রাগ, তেমনি বৈচিত্রময় তাদের রূপায়ণের পদ্ধতি। অতল ভাবগাঢ়তা ভারতীয় সঙ্গীতে। এক-একটি রাগ তাই বিপুল বিস্তৃতিতে প্রস্ফুটিত ও বিকশিত হ'তে পারে। তার আবেদন, তার আকর্ষণী শক্তি যথার্থ শিল্পীর হাতে কখনও নিঃশেষ কিংবা পুরণো হয় না। নব নব সুর-দিগন্তের উন্মেষে তার রূপ কখনও ক্লান্তিকর লাগে না। কমল মুকুলের দল উন্মোচনের মতন তা চিরনতুন। কারণ তা কখনও বৈচিত্রহীন পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়, নতুন নতুন সৃজনের পথ তার মধ্যে উন্মুক্ত থাকে। নচেৎ এতকাল ধরে সুরসাধক তাঁদের প্রতিভা প্রকাশ করতে পারতেন না ভারতীয় সঙ্গীতে. এক-একজন সঙ্গীতসেবক কয়েকটি মাত্র রাগ নিয়ে আজীবন সাধনায় নিমগ্ন থাকতে অপারগ হ'তেন। আর রাগমালা তাদের প্রাণোচ্ছল সজীবতা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যেত বহুকাল আগেই। কিন্তু তা হয় নি, হবেও না কোন দিন, যদি সাধক-শিল্পীর অনটন না ঘটে।

মহম্মদ খাঁ-ও একজন সাধক শিল্পী ছিলেন। তাই রাগের গভীরতার মর্মজ্ঞও। এক ভৈরবী নিয়ে একজন শিক্ষার্থী এক বছর চর্চা করতে পারে এবং এমন পদ্ধতি প্রদর্শন করতেও তিনি সক্ষম। আবার সে ভৈরবীকে সংক্ষিপ্ত করে চপলমতি সঙ্গীতজ্ঞের একদিনের শিক্ষার উপযোগী করে দেওয়াও সম্ভব।

মহম্মদ খাঁ রাগবিস্তারের এই রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করেই প্রশ্ন করেছিলেন।

উমেশচন্দ্র তার তাৎপর্য বুঝিয়ে সবিনয়ে জানিয়েছিলেন, 'আমি অ্যামেচার লোক। মাসখানেক পরে পরে কলকাতায় আসি। একমাসে শিখতে পারি এমন ভৈরবীই দেবেন।'

মঙ্গুবাঈ-এর কণ্ঠে জয়দেবের পদাবলী

কোথায় বারো শতকের রাঢ়ভূমিতে অজয় নদীর তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রামের পদ-রচয়িতা জয়দেব, আর কোথায় বিশ শতকের প্রথম পাদে গোয়ালিয়রের ধ্রুপদ-গায়িকা মঙ্গুবাঈ! কত যুগ-যুগান্তের, কত দূরত্বের ব্যবধান! কিন্তু এই দুস্তর কালের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে, সঙ্গীত। জয়দেবের পদাবলী যে শুধু কাব্য রূপে নয়, সঙ্গীত স্বরূপেও তার আবেদন বিশ শতকে পর্যন্ত হারায় নি, তা মঙ্গুবাঈয়ের গানে আর একবার প্রমাণিত হ'ল।

আরও লক্ষণীয়, মঙ্গুবাঈ যে জয়দেবের পদাবলী গাইলেন, তার গীত-রীতি। বাংলা দেশে জয়দেবের কোমলকান্ত পদ সাধারণত কীর্তনগানের আঙ্গিকেই শোনা যায়। বৈষ্ণবভাবের চির-মাধুর্যময় এই পদাবলী কীর্তনাঙ্গে বাঙ্গালীর কাছে অতিশয় হৃদয়স্পর্শী। বৈষ্ণব গায়ন-সমাজ জয়দেবকে ভক্ত কবিরূপে গ্রহণ ক'রে তার লীলামধুর পদাবলী তাঁদের নিজস্ব-গীতি এই কীর্তন-রীতিতে আস্বাদ করেছেন এবং গৌড়জনদের মনে আবেগবিধুর রসমাধুরীর অনুভব ঘটিয়েছেন!

কিন্তু মঙ্গুবাঈ জয়দেবের পদ গাইলেন পূর্ণাঙ্গ ধ্রুপদ পদ্ধতিতে। আসরটিও ছিল শুধু ধ্রুপদ গানের এবং বাঙ্গালার কয়েকজন সুপরিচিত ধ্রুপদী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলা দেশের সেই এক বিশিষ্ট আসরে, গুণগ্রাহী বাঙ্গালী শ্রোতাদের সামনে গোয়ালিয়রের স্বনামধন্যা ধ্রুপদ-গায়িকা গেয়ে শোনালেন বাংলা তথা ভারতের এক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ্ কবির পদাবলী। বাংলার সঙ্গীতাসর বলেই পশ্চিম ভারতের এই গায়িকা বোধ হয় আগ্রহ ক'রে জয়দেবের পদ শোনালেন। কিন্তু কবির নিজের দেশে এমন ধ্রুপদাঙ্গে তাঁর

পদাবলী গান এক অভিনব বস্তু। এখানকার শ্রোতাদের এ এক অভাবিত অভিজ্ঞতা। উপস্থিত বাঙ্গালী ধ্রুপদীরাও চমৎকৃত হলেন।

সে আসরের বর্ণনা করবার আগে জয়দেবের পদাবলীর প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন।

গৌড়ের এবং ভারতবর্ষের শেষ স্বাধীন হিন্দু নৃপতি লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, গায়ক এবং সঙ্গীততাত্ত্বিক। গীতকার এবং সুরকাররূপে জয়দেবের অমর সৃষ্টি "গীতগোবিন্দম্" গীতিগুচ্ছ। গীতগোবিন্দের পদাবলী তিনি স্বয়ং মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের সভায় গেয়েছিলেন ব'লে কথিত আছে। তাঁর সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য করতেন তাঁর জীবনসঙ্গিনী পদ্মাবতী, যাঁর তিনি "চরণ চারণ চক্রবর্তী"—এমন জনশ্রুতিও পাওয়া যায়।

গীতগোবিন্দের যশ ক্রমে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা পার হয়ে, গৌড় রাজ্যের সীমানা অতিক্রম ক'রে ভারতবর্ষের দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। জয়দেব এবং তাঁর পদাবলীর তুল্য এমন খ্যাত ও আলোচিত হওয়ার দৃষ্টান্ত বেশি দেখা যায় না। সমগ্র ভারতে, প্রদেশে প্রদেশে তাঁর গীতগোবিন্দের ৪০ খানির অধিক ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়। গীতগোবিন্দের অনুকরণে অনেক কবি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন, যদিও তাঁদের সকলের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী ছিল না। রাম-সীতা বা হর-গৌরীর লীলাও অনেকে তাঁদের কাব্যের বিষয় করেছিলেন।

জয়দেবের কালে উড়িষ্যাও ছিল লক্ষ্মণ সেনের গৌড়-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং পুরীর মন্দিরে জয়দেব-পদ্মাবতীর সঙ্গীত পরিবেশনের কিংবদন্তী আছে। সেই সূত্রে আবার ইদানীং কালের উড়িষ্যার কোন কোন পণ্ডিতব্যক্তি জয়দেবকে দাবি করেন উড়িষ্যার সন্তান ব'লে। শিক্ষিত উড়িষ্যাবাসীদের কাছে জয়দেব কতখানি প্রিয়, তা এই থেকে বোঝা যায়। অবশ্য তাঁদের এই দাবির মূলে যে কোন সত্য নেই, তা প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতেরা।

আধুনিক কালে ইউরোপ ভূখণ্ড পর্যন্ত গীতগোবিন্দের জনপ্রিয়তা প্রসারিত হ'তে দেখা যায়। ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ কাব্যরূপে গীতগোবিন্দের প্রতি শুধু অনুরাগ প্রদর্শন করেন নি, তার রীতিমত অনুশীলন করেছেন, আপন আপন ভাষায় অনুবাদ পর্যন্ত করেছেন। গীতগোবিন্দের প্রথম মুদ্রণও হয়েছে ইউরোপে, জয়দেবের স্বদেশে নয়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর বন্ শহরে লাসেন সম্পাদিত সংস্করণই গীতগোবিন্দের আদিতম মুদ্রণ। ইউরোপীয়দের মধ্যে গীতগোবিন্দের প্রথম অনুবাদ করেন স্যার উইলিয়ম জোন্স্। তাঁর সেই ইংরেজী অনুবাদ ১৮০৭ খ্রীঃ তাঁর Collected Works-এর মধ্যে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। তারপর Edwin Arnoldও একটি স্বাধীন ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৮৭৫ খ্রীঃ The Indian Song of Songs নামে। এই দু'টি ইংরেজী অনুবাদের মধ্যবর্তী কালে গীতগোবিন্দের জার্মান ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন এফ. রিউকার্ট, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীস থেকে ফরাসী অনুবাদ করেন জি. কোর্টি লয়ে। এমনি ভাবে বর্তমান ইউরোপের পণ্ডিত সমাজেও গীতগোবিন্দ জয়যাত্রা করেছে।

নানা কারণে পাঠক ও শ্রোতাদের চিত্ত আকৃষ্ট ক'রে স্মরণীয় হয়ে আছে জয়দেবের এই পদাবলী। কোথাও ধর্ম-গ্রন্থ, কোথাও কাব্য, কোথাও সঙ্গীতরূপে। এমন প্রেমের আবেগে প্রতপ্ত পদগুলিকে বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেকে তাঁদের বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্ব ও রসশাস্ত্রের নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জয়দেব ধর্মীয় প্রেরণা থেকে গীত-গোবিন্দ রচনা করেছিলেন কি না তা গভীর সন্দেহের বিষয়। আর রূপ গোস্বামীর রসশাস্ত্র প্রণয়নের তিন শ' বছরেরও আগে তা রচিত হয়েছিল জয়দেবের পদাবলী।

মধ্যযুগের প্রিয় বিষয়বস্তু রূপে রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমকে তিনি বিষয়রূপে নিয়ে গীতগোবিন্দ রচনা করেন বটে, কিন্তু তাঁর পদাবলী সুগভীর হৃদয়াবেগে পূর্ণ হয়ে মানবিক আবেদনে মুখর হয়ে উঠেছে। এইখানেই তার বৈশিষ্ট্য এবং এইজন্যেই তার এত বেশি জনপ্রিয়তা। রাধা-কৃষ্ণের মিলন-প্রসঙ্গ মানবোচিত নিবিড় আন্তরিকতায় সকলের অন্তর স্পর্শ করে। রাধাকৃষ্ণ-ঘটিত বিষয় অবলম্বনে সমগ্র ভারতবর্ষে কাব্য রচনার কখনও অভাব হয় নি, কিন্তু গীতগোবিন্দ এক অনন্য স্থান অধিকার ক'রে আছে সংস্কৃত কাব্য-জগতে। বিষয়বস্তু পুরনো হ'লেও তা জয়দেবের নিজস্ব অনুভবের অভিনব, অনুপম সৃষ্টি।

পণ্ডিত ব্যক্তিরা গীতগোবিন্দ কাব্যের বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন যে, জয়দেব সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন পথ অভিযান করেছেন। তাঁর পদ-রচনার প্রণালী ও শৈলী গতানুগতিক সংস্কৃত কাব্যকৃতির ধারা অনুসরণ না ক'রে স্বকীয় সৃষ্টিতে উজ্জ্বল। তাঁর দৃষ্টিকোণ ও মানসিকতা অলৌকিকের সন্ধান না ক'রে লৌকিক বা মানবিক ভাব প্রকাশে বেশি উন্মুখ। আত্মিক মিলন-গাথার চেয়ে দেহযমুনার তটে কামনার তরঙ্গধ্বনি বেশি শোনা যায় তাঁর কাব্যে। তার গঠন অনেকাংশে নাটকোচিত হ'লেও, অন্তর্গূঢ় প্রেরণা হ'ল 'গীতিকবিতা!' কাব্য হিসাবেও গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ঐতিহ্য অনুকরণ না ক'রে অপভ্রংশের (বাংলা ভাষারূপের জননী) কারুকৃত ও প্রাণস্পন্দন ঝঙ্কৃত করেছে। ছন্দ-প্রকরণেও সংস্কৃতের চেয়ে বাংলার সগোত্র অপভ্রংশের রীতিনীতি, ভঙ্গি বেশি প্রকট। বাক্য-গঠনও সংস্কৃত ব্যাকরণের পদ্ধতির চেয়ে দেশীয় ভাষার ধারার অধিকতর অনুসারী।

তবে এ সবই গীতগোবিন্দের বহিরঙ্গের কথা। তার ভূমিকাংশ ও বর্ণনাত্মক শ্লোকগুলি প্রাচীন কাব্যরীতির ছন্দ বন্ধে গ্রথিত হ'লেও, সুরমাধুর্যে পূর্ণ পদাবলী সঙ্গীতরূপেই রচিত হয়েছিল এবং সেই সব অপূর্ব পদের জন্যেই গীত-গোবিন্দের সমাদর। সঙ্গীতরূপে গীতগোবিন্দ সমগ্র ভারতে গীত হয়েছে, তবে সর্বত্র একই পদ্ধতিতে নয়। যেমন আগেই বলা হয়েছে, বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্যের অনুগামী কীর্তনীয়াগণ এবং ভক্তবৃন্দ জয়দেবের পদাবলী কীর্তনাঙ্গে রূপান্তরিত করেছেন। কীর্তন পদ্ধতিতে মন্দিরে, আখড়ায়, আসরে গীতগোবিন্দ গেয়েছেন। তাঁদের অনুসরণে বাংলার যাত্রার পালায় এবং থিয়েটারের প্রথম যুগ থেকেও জয়দেবের পদাবলী কীর্তন গানরূপে বহুল প্রচারিত হয়েছে। সেজন্যে বাংলায় গীতগোবিন্দ কীর্তনরূপেই সকলের কাছে সুপরিচিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাবে জয়দেবের পদাবলীর গীতিরীতি বাংলা দেশে যেমন কীর্তনাঙ্গে পরিণত হয়েছে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কিন্তু এমন ঘটে নি।

কীর্তন পদ্ধতির জন্মের তিন শতাব্দীরও আগে রচিত ও গীত হয় জয়দেবের পদাবলী। তাঁর কালে গীতগোবিন্দের সঙ্গীত ছিল 'প্রবন্ধে'র পর্যায়ভুক্ত। জয়দেব নিজেও তাঁর পদাবলীকে প্রবন্ধ বলেছেন এবং গীতগুলির সঙ্গে গেয় রাগের ও তালের নাম উল্লেখ করেছেন।

প্রবন্ধ-সঙ্গীতের অন্তর্গত ধ্রুব নামক গীত থেকেই নাকি কালক্রমে ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ সঙ্গীত গঠিত ও রূপায়িত হ'য়েছে। গীতগোবিন্দের সেই সব প্রবন্ধ রচনা ও গঠিত করেন জয়দেব ধ্রুব প্রভৃতি গানের রীতিতে। সেজন্যে উত্তর কালে জয়দেবের এই পদাবলী ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ রূপে দেখা যায়। সেই ধ্রুপদ গানেরই একটি ধারা হয়ত এসে পৌঁছেছিল গোয়ালিয়রের মঞ্জুবাঈ পর্যন্ত, যার রূপ তিনি প্রদর্শন করে-ছিলেন সেবারকার কলকাতার একটি ধ্রুপদের আসরে। তার সেই আসরের কথার আগে জয়দেবের পদাবলীর প্রসঙ্গ আরও একটু আছে।

জয়দেবের মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গীতশৈলী ক্রমে লোপ পেয়ে যায়। প্রায় ২৫০ বছর পরে ১৫ শতকের মধ্যভাগে মেবারের মহারাণা কুম্ভ তিনি ছিলেন একাধারে মহাযোদ্ধা নৃপতি এবং সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ও বীণকার গীতগোবিন্দের নব-রূপায়ণ করেন। মহারাণা কুম্ভের সেই শৈলী তখনকার কালে প্রচলিত প্রবন্ধ সঙ্গীতের এক নিদর্শন।

তার আরও কয়েক শতক পরে ভারতের অন্য এক অঞ্চলে প্রচলিত গীতগোবিন্দের সঙ্গীতরূপের আর এক পরিচয় ক্ষেত্র-মোহন গোস্বামী প্রণীত "গীতগোবিন্দের স্বরলিপি' (১৮৭২ খ্রীঃ প্রকাশিত) থেকে পাওয়া যায়। ক্ষেত্রমোহন ছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রবর্তক রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের এক কৃতী শিষ্য এবং তিনি পুস্তকটির উপসংহারে বলেছেন যে, গীতগোবিন্দের গীতাবলী তিনি প্রথম জীবনে রামশঙ্করের শিক্ষাধীনে লাভ করেছিলেন। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য আঠারো শতকের চতুর্থপাদে (১৭৮২-৮৩ খ্রীঃ) বিষ্ণুপুরে আগত আগ্রা-বৃন্দাবন অঞ্চলের জনৈক বৈষ্ণব-সঙ্গীতাচার্যের শিক্ষায় সঙ্গীতচর্চা আরম্ভ করেন। ক্ষেত্রমোহনকে উনিশ শতকে তিনি যে গীতগোবিন্দ শিক্ষা দেন, তার গীতরূপ তিনি সম্ভবত লাভ করেছিলেন তাঁর পশ্চিমা, বৈষ্ণব সঙ্গীতা-চার্যের কাছে। ক্ষেত্রমোহন তাঁর উক্ত গ্রন্থে গীতগোবিন্দের যে ২৫টি গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেন, সেই ধরণের ধ্রুপদাঙ্গের গান তা হ'লে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে বৃন্দাবন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল—রামশঙ্করের সঙ্গীতগুরুর সঙ্গীতচর্চার দেশ-কালের নিরিখে একথা বোঝা যায়। তার

পর জয়দেবের পদাবলীর সেই গীতিরীতি প্রচলিত হয় বিষ্ণুপুর ঘরাণায়।

বৃন্দাবন অঞ্চলে গীতগোবিন্দ চর্চার এক শতাব্দ পরে ভারতের অন্য এক অঞ্চলের স্বনামধন্য সঙ্গীতকেন্দ্রে সেই পদাবলী গীতির আর এক রূপের প্রচলন ছিল জানা যায়, যার এক শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন মঙ্গুবাঈ। গোয়ালিয়রের ধ্রুপদ-গায়িকা এবং সেখানকার সুপ্রসিদ্ধ খেয়ালগুণী ভ্রাতৃদ্বয় হদ্দু হস্সু খাঁর শিষ্যা মঙ্গুবাঈ। তিনি কি তা হ'লে গীতগোবিন্দের ধ্রুপদ-রীতির গান হদ্দু হস্সু খাঁর ঘরে পেয়েছিলেন? সে-কথা সঠিক জানা না গেলেও গোয়ালিয়রের সঙ্গীত-সমাজে যে তা মঙ্গুবাঈয়ের আগে থেকে প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হদ্দু খাঁ ও হস্সু খাঁর সঙ্গীত-জীবন। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতজগতে তাঁদের অতি সম্মানের আসন ছিল গোয়ালিয়রী রীতির খেয়াল গানের জন্যে। সেই ভারি চালের খেয়াল ছিল ধ্রুপদ-ঘেঁষা এবং সেকালের অনেকের মতন তাঁরা খেয়াল অঙ্গে গাইলেও রীতিমত ধ্রুপদীও ছিলেন। সেজন্যে তাঁদের তালিমে মঙ্গুবাঈ হয়েছিলেন ধ্রুপদসাধিকা।

হদ্দু খাঁর সঙ্গে বাংলার সঙ্গীত-সমাজের এই সম্পর্ক ছিল যে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাগায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী গোয়ালিয়রে অবস্থান ক'রে তাঁর কাছে খেয়াল অঙ্গের শিক্ষা পান। বাংলা দেশে মহিষাদল রাজবাড়ীর আসরে হদ্দু খাঁ একবার সঙ্গীতানুষ্ঠান করেছিলেন, একথাও জানা যায়।

হদ্দু হস্সু খাঁর কাছে মঙ্গুবাঈয়ের শিক্ষা হয় গোয়ালিয়রে এবং তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভার প্রকাশও ঘটে প্রধানত গোয়ালিয়র রাজদরবারকে কেন্দ্র ক'রে। মঙ্গুবাঈ ছিলেন গোয়ালিয়র দরবারের বিশেষ সম্মানিত সভাগায়িকা। তিনি দরবারে তাঞ্জামে চ'ড়ে গান গাইতে যেতেন, এমন তাঁর সমাদর ছিল সেখানে।

এ হেন মঙ্গুবাঈ সেবার কলকাতায় একটি উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত-সম্মেলনে ধ্রুপদাঙ্গে গীতগোবিন্দ শুনিয়ে আসর মাৎ করলেন। সে হ'ল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের কথা এবং তিনি তখন অশীতিপর বৃদ্ধা। কিন্তু তাঁর গীতকণ্ঠ তখনও সতেজ, সাবলীল, স্বরসমৃদ্ধ। সুদীর্ঘকালের একনিষ্ঠ সাধনার ফলে তখনও তা শিল্পীর সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেমন দেখা গেছে, খেয়ালীদের তুলনায় ধ্রুপদীরা বেশি বয়স পর্যন্ত সঙ্গীত-সক্ষম থাকেন—মঙ্গুবাঈও তেমনি।

কলকাতায় তিনি সেবার যোগদান করতে আসেন লালচাঁদ উৎসবের আসরে। লালচাঁদ উৎসবের পরিচয় এখানে দেবার দরকার নেই, মুস্তারি বাঈয়ের প্রসঙ্গে তা পাওয়া যাবে।

উৎসবের প্রথম দিনের অধিবেশনে যে ধ্রুপদের আসর হ'ত, সেখানেই সেদিন গাইলেন মঙ্গুবাঈ। বাংলার কয়েকজন সুপরিচিত ধ্রুপদীও সে আসরে ছিলেন। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বাংলা দেশের আসর ব'লেই বোধ হয় মঙ্গুবাঈ গীতগোবিন্দ গাইবেন স্থির করেছিলেন। ভালই হয়েছিল তাঁর এই নির্বাচন। নচেৎ জয়দেবের পদাবলীর ধ্রুপদ রূপের অভিজ্ঞতা থেকে উপস্থিত বাঙালী ধ্রুপদী ও শ্রোতাদের বঞ্চিত হ'তে হ'ত। মঙ্গুবাঈ-এর এই গান শোনবার পর তাঁরা একবাক্যে বলেছিলেন যে, এ বাণীর ধ্রুপদ তাঁরা আগে শোনেন নি।

তাঁর গানের সঙ্গে সেদিন মৃদঙ্গে সঙ্গত করেন গোয়ালিয়রের গুণী মৃদঙ্গী পর্বত সিং।

মঙ্গুবাঈ সে আসরে এত বৃদ্ধ বয়সেও যে গুণপনা দেখালেন তাতে শ্রোতারা চমৎকৃত হয়ে যান। গীতগোবিন্দের পদাবলী সম্পূর্ণ ধ্রুপদাঙ্গে গানই যে শুধু অভিনব হয়েছিল, তা নয়। রাগের রূপায়ণ তাঁর যেমন অনিন্দ্য, তেমনি তাল-লয়ের কারুকর্মে আশ্চর্য মুন্সিয়ানা দেখান তিনি। সে যেন এক জাত-ধ্রুপদীর যোগ্য অনুষ্ঠান।

প্রথমে চৌতালে গাইলেন বেশ বিলম্বিত লয়ে। শেষে ধামার ধরলেন। কিন্তু দুর্লভ বিশেষত্ব এই দেখা গেল যে—চৌতালে গাইবার সময়ে যে বিলম্বিত লয়ে স্থিত হন সম বিসম অতীত অনাগত সমস্ত মোকাম ঘুরে এসে সেই লয়েই ধামার ধরেন। অর্থাৎ ধামার আরম্ভ করবার সময়ে লয় একেবারেই বাড়ালেন না। সাধারণত ধ্রুপদীরা কিন্তু তা করেন না—লয় বাড়িয়ে নেন ধামার ধরবার সঙ্গেই। মঙ্গুবাঈ এইভাবে যে লয়কারী দেখালেন, তা যেমন কঠিন তেমনি উপভোগ্য হ'ল বোদ্ধা শ্রোতাদের। এমন বড় একটা শোনা

যায় না। গানের বিষয়বস্তু এবং গানের রীতি দু'দিক্ থেকে আসরের মন অধিকার ক'রে নিলেন মঙ্গুবাঈ। এক দমে তিনি গেয়ে গেলেন।

তারপর যখন সেই অশীতিপর বৃদ্ধা গান বন্ধ করলেন, দেখা গেল, প্রায় দু' ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে তাঁর গানে।

'মেরি নাম জানকী বাঈ ছপ্পন ছুরি'

আগেকার আমলের রেকর্ডে শিল্পীদের নিজ কণ্ঠে নাম ঘোষণা করবার একটা রেওয়াজ ছিল। রেকর্ডের গান বা বাজনা শেষ হয়ে যাবার পর হঠাৎ শোনা যেত শিল্পীর নাম, তাঁরই নিজের গলায়। রেকর্ড-সঙ্গীতের প্রথম যুগে যখন রেকর্ড করা হ'ত চোঙার সাহায্যে, তখন এইভাবে প্রতি রেকর্ডে শিল্পীর নাম চিহ্নিত করবার নাকি দরকার হ'ত। রেকর্ডগুলির labelling-এর সময় যেন কোন গোলমাল বা নামের ওলট-পালট না হয়ে যায় সে-জন্যেই ছিল এই সাবধানতা। সেই সঙ্গে শিল্পীদের নিজের কণ্ঠ বা নামকে চিরস্মরণীয় রাখবার আকাঙ্ক্ষাও হয়ত থাকতে পারে। তবে পরবর্তী কালে রেকর্ডিং-এর যান্ত্রিক উন্নতি ভালভাবে হওয়ার পর থেকে ওইভাবে নিজের নাম ঘোষণা করার প্রথাটি ক্রমে লোপ পেয়ে যায়। এমন কি, যে-সব পুরণো রেকর্ডে নাম ঘোষণা ছিল, তাদের নতুন মুদ্রণের সময়ে নামের অংশ বর্জন করা হয়। আর সে সব শোনা যাবে না কোন দিন। (উত্তরকালের রেকর্ডে স্বকণ্ঠে নাম ঘোষণা যে একেবারে রহিত হয়ে যায়, তা নয়। তবে তখন তা কদাচিৎ ঘট্‌ত।)

কিন্তু আগেকার সেই রেওয়াজটি মন্দ ছিল না। যিনি যন্ত্রবাদক তাঁর কণ্ঠস্বরের একটি অবিকল নিদর্শন ভবিষ্যৎ কালের আগ্রহী শ্রোতাদের জন্যে থেকে যেত। যাঁরা গান গেয়েছেন তাঁদের স্বকণ্ঠে নিজেদের নাম উচ্চারণ শুনতে অনেক সময় ভালই লাগত। এই স্থায়ী স্মৃতির মূল্য খুবই বেশি। তা ছাড়া, সঙ্গীতের শেষে শিল্পীর নিজের গলায় নামটি শুনলে বেশ একটি অন্তরঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টি হ'ত। শ্রোতাদের তা উপরি পাওয়া লাভ।

সেতার-সুরবাহার-সাধক ইমদাদ খাঁর মিষ্টি হাতের বাজনার রেকর্ড আছে—দরবারী কানাড়া, সোহিনী, জৌনপুরী তোড়ি ও পুরিয়া। সেই সব বাজনার শেষে জোর গলায় শোনা যেত—'ইমদাদ খাঁ'। সেকালের একজন খ্যাতনাম্নী খেয়াল-ঠুংরি-গায়িকা, বীনকার বন্দে আলী খাঁর শিষ্যা, কিরাণা ঘরাণার জোহরা বাঈয়ের রেকর্ড গানের পরে মর্দানা ঢং-এর গলায় ধ্বনিত হ'ত—'মেরি নাম জোহ্‌রা বাঈ আগ্রাওয়ালী।' কলকাতার সুপরিচিতা বাঈজী গহর জান্ বাংলা গানের রেকর্ডেও ইংরেজীতে নাম ঘোষণা করতেন ('যদি নিমিষের দেখা পাই তোমারি' কিংবা 'হরি বল মন রসনা'র পরে)—'My name is Gahar Jan'। তাঁদের পরের যুগে এনায়েৎ খাঁর সেই সুরবাহারে মনোহারী বাগেশ্রী আলাপের পর শোনা যেত—'প্রোফেসর এনায়েৎ হোসেন খাঁ সেতারিয়ে।'...এমনি আরও কত সঙ্গীত-শিল্পীর নাম সেই অতীত যুগের স্মৃতির বার্তা এনে দিত।

আর শোনা যেত নারী-কণ্ঠে এক অদ্ভুত নাম—জানকী বাঈ ছপ্পন ছুরি। মল্লার রাগে একটি হিন্দুস্থানী গানের রেকর্ড, তাল সোওয়ারখানি (১৬ মাত্রার অর্ধ কাওয়ালীর অনুরূপ ত্রিতালী। এই রেকর্ডের শেষ দিকে গায়িকা এক অশ্রুতপূর্ব নাম ঘোষণা করেছেন—'মেরি নাম জানকী বাঈ ছপ্পন ছুরি।'

কে সেই জানকী বাঈ এবং কেনই বা তাঁর নামের সঙ্গে এই অদ্ভুত বিশেষণ?

পশ্চিমাঞ্চলের পেশাদার গায়িকা জানকী বাঈ পঞ্চাশ বছর আগে সঙ্গীতের আসরে এবং রেকর্ড-সঙ্গীতের জগতে সুপরিচিতা ছিলেন। কলকাতার কোন কোন ঘরোয়া সঙ্গীতসভায় কিংবা বাগান-বাড়ীর আসরেও মহ্‌ফিল করেছেন তিনি। ১৯১৮ সালে কালুরাম পোদ্দারের বন-হুগলীর বাগান-বাড়ীতে (এটি তার আগে ছিল মসজিদ-বাড়ী স্ট্রীটের বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রেমী গুহ পরিবারের) জানকী বাঈয়ের একটি বড় আসরের কথা জানা যায়। কালুরাম ছিলেন বিখ্যাত বণিক কেশোরাম পোদ্দারের (মেটিয়াবুরুজে যাঁর নামের কটন মিল এখন বিড়লা পরিবারের স্বত্বাধীন) ভ্রাতা। সেই সব সময়ে জানকী বাঈয়ের ওই নামের তাৎপর্য সঙ্গীতসমাজের কেউ কেউ জানতেন।

তারও কয়েক বছর আগে তিনি বাস করেন দ্বারবঙ্গ রাজ্যে। যুক্তপ্রদেশের কোন জায়গা থেকে এসে তিনি দ্বারবঙ্গ রাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহের নতুন বাজারের সেই প্রকাণ্ড একতলা ব্যারাক বাড়ীতে জোহ্‌রা বাঈ নামে আর একজন

গায়িকার সঙ্গে বছর দুয়েক ছিলেন। মহারাজা লক্ষ্মীশ্বরের আনুকূল্যে তখন তিনি ভালভাবে তালিমও পান সেখানে, ওস্তাদ মৌলা বখ্‌সের অধীনে। এই বখ্‌স বরোদার নন, যিনি কলকাতায় এসেছিলেন 'হিন্দুমেলা'র যুগে। এই মৌলা বখ্‌স্ দ্বারবঙ্গে অবস্থানের সময় জানকী বাঈয়ের সঙ্গে জোহ্‌রা বাঈকেও সঙ্গীত-শিক্ষা দেন।

সেখানে বাসের সময়ে জানকী বাঈয়ের তেমন নাম হয় নি গায়িকা হিসেবে। কিন্তু নতুন বাজারে সেই একতলা ব্যারাক বাড়ীতে থাকবার সময় তাঁর গান সেখানকার লোকেরা সহজেই শুনতে পেতেন এবং তাঁকে একজন উৎকৃষ্ট গায়িকা ব'লে সকলের ধারণা হয়। তিনি যে-ঘরে রেওয়াজ করতেন, সেটি ছিল বাড়ীর বাইরের দিকে। তা ছাড়া, বাড়ীটি একতলা এবং বাড়ীর সামনে মাঠ থাকায় যে-কেউ ইচ্ছা করলে বাড়ীর সামনে মাঠে ব'সে তাঁর গান শুনতে পেতেন। সন্ধ্যার পর তিনি প্রায় প্রতিদিন বাইরের ঘরে রেওয়াজ করতেন, মৌলা বখ্‌স্ তাঁকে শেখাতে আসতেনও সেই ঘরে।

ঘরের সামনে ফুটবল খেলার মাঠ, তার ধারে বসলে পরিষ্কার শোনা যেত জানকী বাঈ মিষ্টি গলায় গান ধরেছেন। ওস্তাদ শিখিয়ে গেছেন, সেইটিই হয়ত রেওয়াজ করছেন ব'সে। কোনদিন হয়ত সে ঘর থেকে ভেসে আসে বাগেশ্রীর করুণ, মায়াময় সুরের বিস্তার। তার প্রাণ-কাঁদানো, মর্ম-ছেঁড়া মোচড়গুলিও স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায় জানকী বাঈয়ের গলার খোলা আওয়াজে।

তাঁর নামের যে অংশটি নিয়ে তাঁর প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হয়েছে, তা তখনও তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অর্থাৎ দ্বারবঙ্গে আসবার আগেই ওই অনন্য নামটির জন্ম। এবং সেখানকার কোন কোন ব্যক্তি জানকী বাঈয়ের নাম-মাহাত্ম্য, আর তার খ্যাতি বা অখ্যাতির রহস্য জানতেন। যথা, ওস্তাদ আসঘর আলী খাঁর জামাতা স্বরদবাদক আবদুল আজিজ, যাঁদের কথা "খাম্বাজ থেকে ভৈরবী"তে বলা হয়েছে।

জানকী বাঈয়ের প্রথম জীবনের সেই ঘটনার কাহিনী এইভাবে জানান আবদুল আজিজ: রীতিমত সঙ্গীত-চর্চা আরম্ভ করবার আগে জানকী বাঈয়ের জীবনে এক সময় দু'জন প্রণয়ীর আবির্ভাব ঘটে। দু'জনের প্রতি সম-ব্যবহার বেশি দিন প্রদর্শন করতে পারে নি বাঈজী। এক-জনের ওপর পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ হয়ে যায়। তখন ব্যর্থ-প্রেমিক একদিন ভীষণ আক্রোশে ছুরি নিয়ে আক্রমণ করে—প্রতিদ্বন্দ্বীকে নয়—প্রণয়িনীকেই। তার ছুরির আঘাত নাকি ৫৬ বার জানকী বাঈয়ের শরীরে পড়ে। বাঈজী কোনরকমে প্রাণরক্ষা করে সেই পৌনঃপুনিক ছুরিকাঘাত থেকে। নাটকের পরিসমাপ্তি ওইখানেই ঘটে, তার জের আর চলে নি। কিন্তু তারপর থেকে তার নাম হয়ে যায়—জানকী বাঈ ছপ্পন ছুরি। অন্যেরা তার এই নাম প্রচার করে নি, সে নিজেই (সগৌরবে?) এই নামে নিজেকে চিহ্নিত করেছে। না হ'লে বাইরের লোকের একথা জানবার নয়।

ঘটনাটির সত্য-মিথ্যা জানবার উপায় নেই। ছাপ্পান্ন বার ছুরিকাহত হ'লে কোন মানুষ, বিশেষ নারী, কি প্রাণ রাখতে পারে? বারাঙ্গনার সহ্যশক্তি কি অমানুষিক? কে জানে! কিংবা হয়ত সেই ছুরি চালনা বাংলা সংবাদ-পত্রের পুলিসের মৃদু লাঠি চালনার মতন কিছু?

যাই হোক, সঙ্গীতজ্ঞ মহলে তিনি উত্তরজীবনে আত্ম-বিঘোষিত 'জানকী বাঈ ছপ্পন ছুরি' নামেই সুপরিচিত হয়েছিলেন। একাধিক জানকী বাঈ এই পেশার ক্ষেত্রে সেকালে থাকার জন্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হয়ত নীলকণ্ঠীর মতন এই বিশেষণটি নামাঙ্গে ধারণ করতে হয় তাঁকে!

তাই মল্লারে সেই মাধুর্যময় 'ঝুমে ঝুমে বরখে বাদরিয়া' গানখানির শেষে বায়ুমণ্ডলে কম্পন জাগায়—মেরি নাম জানকী বাঈ ছপ্পন ছুরি।

কামড়

শ্রীশৈবাল চক্রবর্ত্তী

ছেলেটা বড় দুরন্ত হয়েছে। স্বামীস্ত্রী দু'জনেই ওই এতটুকু ছেলের দুরন্তপনায় নাজেহাল হয়ে উঠেছে।

বাড়ীটা বড় হ'লে হয়ত এতটা বোঝা যেত না, খোলা জায়গায় মধ্যে খেলত, ছুটোছুটি করে বেড়াত, কিন্তু এই একফালি পায়রার খোপের মত ঘরের মধ্যে যেদিকেই ও যায় সেখানেই একটা অনর্থ ঘটে।

রাস্তার ধারের ঘর, চৌকাঠ পেরিয়ে দু' ধাপ সিঁড়ির পরে চওড়া পিচের রাস্তা। হু হু ক'রে সেখান দিয়ে এমন বড় বড় গাড়ি ছুটে যায় যে, দেখে অমলার বুক কাঁপে।

তার চেয়ে দরজা বন্ধ থাকুক, ঘরের মধ্যে যা ইচ্ছে করুক ও। কাঁচের বাসন পেয়ালা-পীরিচগুলো ওর নাগালের বাইরে রাখলেই চলবে। বিছানা-বালিশ একটু 'এদিক্-ওদিক্ হ'লে আর কি এসে-যাবে, কিন্তু দরজা খোলা পেয়ে ও যদি রাস্তায় নেমে যায় তা হলে জীবনভোর আপশোস করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

সাত নয়, পাঁচ নয় একটি মাত্তর ছেলে। যাকে বলে সবেধন নীলমণি।

সেকথা ঠিক, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা অনুনির মধ্যে এক-এক সময় খোকন এমন বিরক্ত করে তোলে যে, ভবেশ মাথা ঠিক রাখতে পারে না। দুম্ দুম্ ক'রে পিঠে কিল বসিয়ে দেয়, কি রান্নাঘরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বলে, কই,তোমার ছেলে নিয়ে যাও।

আর ওই মানুষটাকেও ঠিক দোষ দেওয়া যায় না। অফিসে উদয়াস্ত কলম পিষেও বরাদ্দ কাজ শেষ করতে পারে না, বকেয়া বোঝা বাড়ীতে বয়ে আনতে হয়। খাটের ওপর রাজ্যের ফাইল-পত্র, চালান, রসিদ ইত্যাদি ছড়িয়ে যোগ-বিয়োগ গুণভাগ করবার সময় খোকন যদি একটা কাগজ নিয়ে পালায়, কি ফরফর ক'রে ছিঁড়ে দেয় তা হ'লে রাগ না ক'রে মানুষ যায় কোথা?

অফিসের রবার-ষ্ট্যাম্প আর প্যাড্‌টার ওপর খোকনের একটু বিশেষ লোভ। ভবেশ যখন ওইগুলি দিয়ে কাগজের ওপর পটাপট ছাপ মারে তখন খোকন নিবিষ্টমনে ব'সে ব'সে তাই দেখে। অনেক দিন ধ'রেই সে ওই দু'টি জিনিষ হাতাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারে নি। ভবেশ অত্যন্ত সাবধানে সেগুলিকে ব্যবহার করে, কেননা সে জানে একবার ও দু'টি হাতে পেলে খোকন সর্বাঙ্গে কালি মেখে তার কাগজপত্রের শোচনীয় দশা করবে।

তা ছাড়া প্যাডের ওই কালি মুখে গেলে যে সর্বনাশ ঘটতে পারে তাও তার অজানা নয়। ওই দু'টি জিনিষ নিয়ে তাই তার সতর্কতার আর শেষ নেই।

উঁচু তাকটার ওপর ফাইল-বাঁধা কাগজ, ষ্ট্যাম্প ইত্যাদি রেখেও নিস্তার নেই, খোকনের দুষ্টুমি ওই তাকটাকেও ছাড়িয়ে যায়। চেয়ারটাকে টেনে-হিঁচড়ে তাকের কাছে এনে সে বাবার সম্পত্তি বেদখল করতে চায়। একদিন স্নান সেরে ঘরে ঢুকতে ভবেশের চোখে এই দৃশ্য পড়ল। খোকা তখন সবে প্যাডটা হাতে নিয়ে খুলে গভীর অভিনিবেশ সহকারে তার ভেতরে দৃষ্টিপাত করছে।

—ও কি খোকন!

ডাক শুনে সে থতমত খেয়ে গেছে, বাবার চোখে চোখ পড়তেই তার চোখ-মুখ ভয়ে কি রকম শুকিয়ে গেছে।

—তুমি ওতে হাত দিয়েছ! বেশ ভয়-মাখান গলায় অবাক্ হওয়ার ভঙ্গিতে ভবেশ বলেছে, ওতে হাত দিলে কি হয় জান না বুঝি?

এপাশে-ওপাশে মাথা নেড়েছে খোকন। জানে না সে। পৃথিবীর অধিকাংশ নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে সে এখনও অজ্ঞ।

—ওতে হাত দিলে কামড়ে দেবে। প্রতিটি কথা আস্তে উচ্চারণ করে বলেছে ভবেশ।

—কে বাবা? সরল সহজ প্রশ্ন শিশুর কণ্ঠে। এই সামান্য জিনিষটার মধ্যে যে এত জটিলতা তা সে জানত না।

—সে আছে একজন, তার নাম হ'ল বড় সাহেব।

—বড় সাহেব কে বাবা? যেন একটা গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়েছে পাঁচ বছরের বাচ্চাটা।

—বড়সাহেব হ'ল যার অফিসে আমি কাজ করি, সে; এইসব কাগজ-পত্তর, কালি-কলম সব তার। তার

জিনিষ নিয়ে যদি তুমি খেল, নোংরা কর তা হ'লে সে তোমায় কামড়ে দেবে।

—আমায় কামড়ে দেবে বাবা? বাবার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছে খোকন।

—দেবে না? চুল আঁচড়ে চিরুণীটা গামছায় মুছে রেখে দিল ভবেশ। অমলা ভাত বেড়ে ডাকছে।

বেশ কষ্ট ক'রে নিজে থেকেই চেয়ার থেকে নামে খোকন, তার পরে রান্নাঘরের পাশে যে ফালি জায়গাটুকুতে ব'সে তার বাবা ভাত খায় সেইখানে গিয়ে হাজির হয়।

—সত্যি বাবা, কামড়ে দেবে? ভবেশের হাঁটুতে কনুইয়ের ভর দিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে। কেমন ক'রে দেখবে যে আমিই জিনিষে হাত দিয়েছি?

—বড় সাহেবরা সব দেখতে পায়, ভবেশ বলে। ভয় পেয়ে যদি ছেলেটা তাকে আর না বিরক্ত করে তা হ'লেই এই গল্প ফাঁদা তার সার্থক হবে, ভাবে সে।

তাদের সব জায়গায় চোখ আছে, কে কখন কি দুষ্ট মি করল, সব তারা জানতে পারে।

—সত্যি?

—সত্যি না ত কি। মাকে জিজ্ঞেস করো।

খোকন সঙ্গে সঙ্গে মা'র মুখের দিকে তাকায়। নীরবে মাথা হেলিয়ে অমলা ভবেশের কথা সমর্থন করে।

ভবেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করে। একটা সামান্য কথায় যে ছেলেটাকে ও এই রকমভাবে ভোলাতে পারবে তা ও বিশ্বাস করতে পারছে না। ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে একবার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে নেয়, অমলার মুখে মৃদু কৌতুক। স্বামীর কাহিনী-রচনায় সে খুশী হয়েছে। এমনিতে ভবেশ বেশ রসিক-প্রকৃতির; বিয়ের প্রথম ক'বছরের কথা ভাবলে অমলা এখন উদাস হয়ে যায়। সেই মানুষটা আজকে সাত বছরে তিনটে অফিসের চাকরি বদলে এমনি গোমড়ামুখো হয়ে গেল কি করে! সঞ্চয় বলতে কাণাকড়িও নেই, সাধ-আহ্লাদ বলতে অমলা এখন ডাল-ভাত রাঁধা বোঝে। সারাটা দিন দিস্তে দিস্তে কাগজের সঙ্গে কলম নিয়ে লড়াই ক'রে সন্ধ্যেবেলা ভবেশ যখন বাড়ী ফেরে তখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে অমলার কান্না পায়।

ছেলেটার মনে বড় সাহেবের কামড়ে দেবার কথাটা বেশ চেপে বসেছে। সন্ধ্যেবেলায় অফিস থেকে ফিরে হাত-পা ধুয়ে ভবেশ কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে খেলা করে। আজ কিন্তু সে-খেলায় খোকনের উৎসাহ নেই। হাঁটু মুড়ে তার ওপর ছেলেকে শুইয়ে হাসতে হাসতে বাপ বলছে, 'বল্, সোনাকুঁড়ে পড়বি না এঁটোকুঁড়ে?'

দু'-একবার খুব হৈ হৈ ক'রে হাসি হ'ল। হঠাৎ তাবে-রাখা কাগজগুলোর ওপর চোখ পড়তে খোকন বললে, বাবা, সকালে যে তুমি বললে—

—কি বললাম?

—ওই যে বললে বড়সাহেব কামড়ে দেবে—সত্যি বাবা?

—সত্যি। ভবেশ চোখ-মুখ বেঁকিয়ে বললে। ভীষণ জোর কামড়ে দেবে, বকুনিও দেবে।

খোকন আর একবার কাগজগুলোর দিকে তাকাল। ওতে জাহাজের মাল খালাসের বিচিত্র হিসেব, কুলীদের মাইনের খতিয়ান, ঠিকাদারদের রসিদ তাড়া-বাঁধা রয়েছে।

—তোমাদের বড় সাহেবের বুঝি বড় বড় দাঁত বাবা?

হাত দু'টো ফাঁক ক'রে একটা মাপ দেখায় ভবেশ।

—এ্যাত্তো বড়! খোকনের মুখে কথা সরে না।

ওর ভয়ার্ত মুখটা দেখে ভবেশের মায়া হয়। কিন্তু একটু মজাও পায় সে।

—খুব মোটা?

—খুব।

—বড় বড় দাঁত আছে?

—বাঃ, তা নেই! তা না থাকলে আর কামড়াবে কি দিয়ে?

একটুখানি সময় চুপ ক'রে রইল খোকন, তার পর বলল, সে তোমাদের কি করে?

—সে আমাদের কাজ দেয়। আমরা তার কাজ করি। কাজে ভুল হলে ভীষণ রেগে সে তার মুলো-দাঁত নিয়ে তেড়ে আসে।

—তুমি তাকে রোজ দেখ বাবা?

—দেখি বই কি। রোজ আমরা অফিসে গিয়ে তাকে নমস্কার করি। যেদিন তার মেজাজ খুশী থাকে সেদিন সে একটু হাসে। যেদিন রাগ ক'রে থাকে সেদিন কষে বকুনি দেয়।

—কামড়ায় না?

—বকুনি দিলেই আমরা এত ভয় পেয়ে যাই যে, আর কামড়াতে হয় না।

খোকা বাবার মুখের দিকে তাকায়। আস্তে আস্তে বাবার হাঁটুর ওপর হাত তুলে দেয় সে। তার বাবা যে রোজ বড় সাহেবের কাছে গিয়ে অক্ষত শরীরে ফিরে

আসে এতে বাবার সম্বন্ধে তার ধারণা উঁচু হয়ে যায়। বাবাকে মস্ত এক বীরপুরুষ ব'লে মনে হয় তার।

—আচ্ছা বাবা, বড় সাহেব কি একটা রাক্ষস?

এবার ভবেশের হাসি পায়। কিন্তু হাসলে সমস্ত ব্যাপারটা হাল্কা হয়ে যাবে তাই হাসি চেপে সে বলে, হাঁা রাক্ষসই ত। তবে জামা-কাপড়পরা চুল-আঁচড়ানো রাক্ষস।

খোকার একটা ছবির রামায়ণ বই ছিল। সেটা সে পড়তে না পারুক উল্টে-পাল্টে দেখতে ভালবাসত। একছুটে বইটা এনে একটা পাতা খুলে আঙুল দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'এই রকম রাক্ষস বাবা?

—হুঁ, প্রায় ওই রকম···ভবেশ এখন ফাইল-পত্র পেড়েছে, আস্তে আস্তে মনটা ডুব দিচ্ছে তারই ভেতরে। বাইরের জ্ঞান তার লোপ পাচ্ছে। খোকা সেটা বুঝলে, বাবা বড় সাহেবের কাগজপত্র নিয়ে কাজ করছে এখন বাবার কাছে না বসাই ভাল।

গুটি গুটি সে মা'র কাছে চ'লে এল। অমলা তাকে এক হাতে ধ'রে পাশে বসিয়ে অন্য হাতে খুন্তি নাড়ে, কড়ায় জল ঢালে। মা'র সঙ্গেও তার যা কথা হয় তাও বেশীর ভাগ ওই বড় সাহেব নামক ভয়ংকরকে কেন্দ্র ক'রে। দুটো-চারটে কথার পরই মা'র কোলে মাথা ঢ'লে পড়ে ছেলের। 'এই, ওঠ ওঠ', অমলা ডাকে কিন্তু সাড়া পায় না। ঘুমে নিথর হয়ে পড়ে আছে ছেলেটা। সারাদিনের দাপাদাপনার পর মায়ের কোল পেয়ে এখন যে সে ঘুমবে এতে ত য় আশ্চর্য কি!

কিন্তু অমলা বিরক্ত হয় ছেলের ওপর। এই এক মুশকিল হ'ল, এখন ওর ঘুম ভাঙিয়ে ওকে দুধ খাওয়াতে তাকে বেশ ভুগতে হবে। জেগে থেকে সারাদিন তাকে জ্বালাবে এখন ঘুমিয়েও শান্তি নেই।

রাত্তিরে খেতে ব'সে একথা-সেকথার পর ঘুমন্ত খোকনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ভবেশের মনে প'ড়ে যায়, বলে, আচ্ছা ভূত চেপেছে ছোঁড়ার ঘাড়ে।

—কি, ওই বড় সাহেব ত? অমলা রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে প্রশ্ন করে।

—তা ছাড়া আবার কি। উঃ, প্রশ্ন ক'রে ক'রে আমার মাথা খারাপ করে দিল।

—থাক না বাপু, ওই ভয় নিয়ে যদি ও ওই কাগজগুলোয় হাত না দেয় আর তোমাকে নিশ্চিন্তে কাজ করতে দেয় তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই।

—একবার ভাব ত ওই ট্যালিশীট কি ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের কপি যদি ও ফর্দাফাঁই করে তা হ'লে কি অবস্থা হবে আমার! হাজার হাজার টাকার কন্ট্রাকটারের বিল আটকে থাকে ওই কাগজগুলোর জন্যে। কপালে ভুরু তুলে ভবেশ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝায়। তার চাকরিটা টাকার অঙ্কে কম হ'লেও মর্যাদায় যে বেশ ভারী তা-ও এই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়।

—যাক বাপু, ওই ভয় নিয়ে ও যদি একটু দূরে দূরে থাকে আর ওতে হাত না দেয় তা হ'লে অনেক ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচোয়া।

খেতে ব'সে কথাটা নিয়ে আর একবার ভাবে ও। আর তার পরের দিন অফিসে হঠাৎ গোবিন্দন নায়ারের দিকে তাকিয়ে ভাবে যে এই লোকটাকে নিয়ে তার বাড়ীতে এখন কত কথাই হচ্ছে। গোবিন্দন নায়ার অবশ্য খুব সুশ্রী নয়, গায়ের রং মাজা কালো, বড় বড় দাঁতের দুটো ত ধার থেকে সব সময় বেরিয়ে থাকে কিন্তু তাই ব'লে একটা বদরাগী-রাক্ষস ব'লে তাকে চালানো হয়ত ঠিক হচ্ছে না ভাবে ভবেশ।

এই ছোট অফিসটার সর্বেসর্বা ওই লোকটা। মালিক গোকুলদাসজী ন'মাসে-ছ'মাসে এখানে পায়ের ধুলো দেন। হঠাৎ যেদিন তাঁর মনে পড়ে যায় যে, তাঁর বহুবিস্তৃত কারবারের মধ্যে ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ও শিপিং একটি, সেদিন বিরাট হাম্বার গাড়িটা নিঃশব্দে এসে ব্রাবোর্ণ রোডের এই বাড়ীটার সামনে দাঁড়ায়। সারা অফিসটায় একটা হৈচৈ পড়ে যায় সেদিন। ম্যানেজারের ঘরের সামনে টাঙানো যার সহাস্যমুখ ছবি, সেই অন্নদাতা আজ মূর্তিমান এসে দাঁড়িয়েছেন। বেশীক্ষণ কিন্তু থাকেন না গোকুলদাস, এক্সপেন্স য়্যাকাউন্টে একবার চোখ বুলিয়ে দু'-একজন হোমরা-চোমরার সঙ্গে দেখা করে তাঁর গাড়িতে গিয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে গোটা পাঁচ-সাত ট্রাঙ্ককল এসেছে তাঁর দিল্লী বোম্বে আমেদাবাদ থেকে।

আর যতক্ষণ থাকেন গোকুলদাস, গোবিন্দন নায়ার তাঁর সঙ্গে ছায়ার মত লেগে থাকে। সে সময় সে কি ক্ষিপ্র, চটপটে ভাব তার! এই ও-ফাইলটা নিয়ে আসছে, এই অমুক ফিগারটা মুখে মুখে হিসেব ক'রে ব'লে দিল'। প্রফিট এণ্ড লস, সেলস্ ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স সব ফুলঝুরির মত ছড়িয়ে পড়ছে তার মুখ থেকে। এই কারবারের সব ইতিবৃত্ত তার নখদর্পণে, যা জানতে চান গোকুলদাস তার অতিরিক্ত তথ্য তাঁকে জানিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে তাঁর হৃদয় চুরি করে গোবিন্দন নায়ার।

তারপর অধস্তন কেরাণীকুলের কাছে এসে নিজের কৃতিত্ব বিবৃত করে এবং মালিক যে আরও ব্যয়সংক্ষেপ

ও অধিক উৎপাদনের কথা ব'লে গেছেন তাও জানিয়ে দেয়। ভবেশ, নবনী আর শুভস্ সেকসনের আরও দু'জনার মুখে একটা অস্বস্তিকর অন্ধকার ঘনিয়ে আসে গোবিন্দন নায়ার সেটা উপভোগ করে। ইনিয়ে-বিনিয়ে গোবিন্দন না ার এ-কথাও বলে যে, গোকুলদাসজীর এই ব্যবসায় একটা পয়সারও মুখ দেখতে পান নি। তবে তিনি এটা খাড়া করে রেখেছেন কেন? সেটা তাঁর মহানুভবতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আজ ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট দরজা বন্ধ করলে দু'শোটি মানুষ যে তাদের কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে আকাশের তলায় এসে দাঁড়াবে, তা তিনি জানেন।

গোবিন্দন নায়ার যতই বক্তৃতা মারুক, ভবেশ-নবনীরাও কম খবর রাখে না। তারা জানে গোকুল, দাসের পাট, চিনি, তৈলবীজ, কেমিক্যালস প্রভৃতি হাজারো ব্যবসায়ের লক্ষ লক্ষ টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দেবার এটি একটি ছিদ্রমাত্র। এতে হাজার লাভ হ'লেও হিসেবের কারচুপি ক'রে লোকসান দেখানো হয়। গোবিন্দন নায়ারের ব্যাপার অন্য, সে পারে না এমন কাজ নেই। করেসপণ্ডেন্স, কষ্টিং ম্যানেজমেণ্ট কণ্ট্রোল থেকে আরম্ভ করে মালিকের মনোরঞ্জন—সব বিদ্যায় সে পাকা ঘুঘু একটি। সে যে গোকুলদাসের শুধু এই অবহেলিত অফিসটুকুরই কর্ণধার তা নয়, আরও তিনটে অফিসের কাগজপত্র সে দেখাশুনা করে এবং তার জন্যে মাইনের ওপর ভাউচারে তাকে কিছু মোটা টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়। এ সবই জানে এরা; নবনী গোবিন্দন নায়ারের সঙ্গে আগে ইণ্ডিয়ান কপার কোম্পানীতে একসঙ্গে কাজ করেছে। কোন্ মন্ত্রে সে যে আকাশের এত কাছাকাছি উঠে এসেছে তা ওর জানা। গভর্ণমেন্টের দপ্তরে ওর প্রভাব অসীম। কোথায় কাকে ধরলে পারমিট আগে বেরিয়ে আসবে, বিনা ঝামেলায় লাইসেন্স পেতে হ'লে কার কাছে দরবার করা শ্রেয়ঃ এসব বলার জন্যে গোবিন্দন নায়ারকে এখন আর তার ছোট ডায়েরীটাও খুলতে হয় না।

ভবেশ অবশ্য তার অভিজ্ঞতার জোরেই চাকরিটা পেয়েছে কিন্তু তিন বছরের বেশী যে চাকরি টেঁকে নি তার দামই বা কত? তা ছাড়া চাকরিটাও ছিল নিতান্ত মামুলী ধাঁচের। এখন চাকুরিদাতারা বড় চাকরের অভিজ্ঞতার দাম দেয়। যেমন, গোবিন্দন নায়ারকে ন্যাশনাল শিপিং, ইণ্ডিয়ান কপার থেকে ভাঙিয়ে এনেছে তিনশো টাকা বেশী মাইনে দিয়ে; এ ছাড়া সে বাড়ী-ভাড়া বাবদ পৌনে চারশ ও এক'শ টাকা পাচ্ছে কার-এলাউন্স।

সে তুলনায় ভবেশ-নবনীদের কি হয়েছে? ভবেশ হিসেব করে দেখেছে যে, ষ্টীল কর্পোরেশনের মাইনের চেয়ে সাকুল্যে এখন সে এগার টাকা কয়েক আনা বেশী পাচ্ছে, তেমনি অফিসটা দূর হওয়ায় তার গাড়িভাড়া পড়ছে আগের চেয়ে বেশী।

সে শুনতে পায় এখনকার ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা নাকি ভাল নয়। লাভটা প্রায় ক্ষেত্রেই অনিশ্চিত থাকে, আর প্রতি পদেই নানারকম বেয়াড়া ঝুঁকি নিতে হয়। প্রথমতঃ, লগ্নী ক:তে হয় অনেকগুলো টাকা, তারপর অন্য কোম্পানীর সঙ্গে কাজ ক'রে হয় পিছু হটো আর নয় বিনা-লাভে ব্যবসা ক'রে ঘরের টাকা বেনাবনে ছড়াও। আর গভর্ণমেন্টের সঙ্গে কাজ-কারবারের ত সাত ঝামেলা। এই খুঁত, সেই খুঁত, দফায় দফায় ইন্‌স্‌পেকশন, তারপর কাজ সারা হলে বিল পাশ হয়ে হাতে টাকা আসতে আসতে বছর ঘুরে যায়।

এই সব কথা বলত গোবিন্দন নায়ার আর ওদের মনের জোর কতখানি তাই পরীক্ষা ক'রে দেখত বোধ হয়। এক এক সময় অবাক্ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে ভবেশ। সত্যি, এই একটা লোক এতবড় একটা অফিস চালাচ্ছে। অতি সাধারণ পরিচ্ছদ, কিন্তু কাজে-কর্মে লোকটার কি অসীম দক্ষতা! কাজের সময় সে সবারই মত একজন কর্মী; ভবেশের সীটের পাশে দাঁড়িয়ে তার পিঠে একটা চাপড় মেরে 'এই ক্যাল-কুলেশনটা দেখ ত ভায়া' ব'লে কাজটা সারা না-হওয়া পর্যন্ত ঠায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। ভবেশ অস্বস্তি বোধ করে। একটা জলজ্যান্ত আড়াই-হাজারী মানুষ—যার কলমের আঁচড়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে, সেই লোকটা তার সীটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর সে নিশ্চিন্তে ব'সে ব'সে কাজ করে কেমন ক'রে? 'রায় কুইক' এক তাড়া কাগজ ওর টেবিলে ফেলে দিয়ে মিস্ বাগচীর কাছ থেকে ব্যালান্স-সীটটা নিয়ে চৌধুরীকে কতকগুলো ড্রাফ্‌ট টাইপ করার জন্যে যখন ছুঁড়ে দিত তখন মনে হ'ত এ অফিসে বুঝি পিয়ন-বেয়ারা নেই।

নিজে যেমন কাজ করে তেমনি একসঙ্গে একশ'টা লোককে খাটাতেও পারে।

আবার আর একটা চেহারাও ছিল ওর। জাহাজে বুক-করা মাল কোন কারণে ড্যামেজ হয়ে গেলে যখন পার্টির কাছ থেকে চিঠি আসত তখন গোবিন্দন নায়ারের মুখে মেঘ জমত। সেই মুখ আরও ভয়ংকর হয়ে উঠত

কারও কাজে কোন গুরুতর ভুল পেলে। হাতের বুড়ো আঙুলটা তখন দাঁত দিয়ে কামড়াত খালি খালি। সবাই বুঝত, এটা বিস্ফোরণের পূর্বাভাস।

একবার নবনীর গাফিলতির জন্যে একটা জাহাজ একদিন পরে খালাস পায়। কোম্পানীকে সে জন্যে ক'হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। জাহাজী কোম্পানী থেকে ওই চিঠিটা গোকুলদাস কোম্পানীর চারতলায় এসে পৌঁছনোর পর অফিসের চেহারাটা দেখবার মত হ'ল।

ঠিক যেন ঝড় উঠবে এই রকম থমথমে ভাব সমস্ত ঘরগুলোয়। কোন গোলমাল নেই, ফিস্‌ফাস্ যে যার টেবিলে কাজ ক'রে যাচ্ছে! বাচাল এ্যাংলো মেয়ে মিস্ পিয়ারসনটা পর্যন্ত চুপ হয়ে গেছে। এরই মধ্যে একটা ঘণ্টির আওয়াজ হ'ল, এ্যাকাউন্টেণ্টকে সবাই গোবিন্দন নায়ারের ঘরে যেতে দেখল। হিসেব সে নিজেই ক'রে রেখেছিল, কাগজটা এগিয়ে দিয়ে আসছে মাস থেকে অর্ডারটা চালু করতে ব'লে দিল শুধু।

দু'বছরের জন্যে নবনীর বোনাস ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ হয়ে গেল আর মাসে মাসে ত্রিশ টাকা করে তার মাইনে থেকে কাটা হবে যতদিন না কোম্পানীর গুণোগার-দেওয়া ওই টাকাটা পুরো উশুল হয়ে যায়।

এই অর্ডারের ব্যাখ্যা শুনে অন্য সবার যে-রকম মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, নবনীর কিন্তু ঠিক ততটা হ'ল না; বছর তিনেকের মত তার চাকরিটা এখানে পাকা থাকছে এই রকম একটা আশ্বাস পেয়ে সে চাঙ্গা বোধ করল।

এই হ'ল তার দু'নম্বর চেহারা। কোন কটু কথা নয়, নেই তর্জন-গর্জনের লেশমাত্র। চেয়ারে একটু কাৎ হয়ে ব'সে পেন্সিলটা দাঁত দিয়ে কামড়াতে কামড়াতে সে দুনিয়ার নিষ্ঠুরতম আদেশটি দিতে পারে। মিষ্টি কথার ছুরি দিয়ে যখন সে কারও মাংস কাটে কচ্‌কচ্ ক'রে তখনও তার গালে সেই টোল-পড়া নিজস্ব হাসিটি ফুটে উঠতে ভুল হয় না।

এই অফিসের কাগজপত্র বাড়ীতে এনে ভবেশ যে ওই রকম সন্ত্রস্ত হয় তাতে অবাক্ হবার কি আছে! তার কাজ হ'ল কনট্রাকটরদের বিল পাশ করার আগে তাদের কাজের পরিমাণ যোগ-বিয়োগ ক'রে দেখা। জাহাজে কত বস্তা মাল উঠল-নামল এবং তাদের ওজন কত, প্রতি এক কুইণ্টাল মাল খালাসের রেট এক টাকা বার আনা হ'লে, সাড়ে সাত হাজার টন মালের খালাসী ও বোঝাইয়ের দাম কতয় গিয়ে দাঁড়াবে। অঙ্ক কষার কাজগুলো বাড়ীতে ব'সে করলে তাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কম।

প্রথম প্রথম অমলা এই নিয়ে আপত্তি করত কিন্তু এখন এ তার গা-সওয়া হয়ে গেছে, তা ছাড়া মনিবকে সন্তুষ্ট ক'রে চাকরিটা বজায় রাখা যে কত দরকার, ঠেকে ঠেকে তাও সে বুঝতে শিখেছে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা কাগজপত্তর মেলে ভবেশ সবে কাজ করতে বসেছে এমন সময় দেশলাইয়ের বাক্স জুড়ে রেলগাড়ি করতে করতে খোকন ডেকে উঠল, বাবা।

—বল, কৌটো থেকে সিগারেট বার করে তাতে অগ্নিসংযোগ করতে করতে ভবেশ বলল।

—আজকেও বড় সাহেবকে দেখেছ বাবা?

—হুঁ, রোজই ত দেখি—।

—বাবা, বড় সাহেব তোমায় মারে না?

ভবেশ হেসে ফেলে, বলে, আমি ভাল কাজ করি, আমায় কেন মারবে? ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি লক্ষ্মী হয়ে থাকলে আমি তোমায় বকি?

আজ অমলার রান্নার পাট দুপুরেই সারা, সে ঘরে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে ছিল। খোকন তার দিকে তাকিয়ে বলল, বকে মা?

—কোথায় বকে! তুমি লক্ষ্মী হয়ে থাকলে ত তোমায় কত জিনিস কিনে দেয়। সেদিন তুমি লাটাই চাইলে, এনে দিল।

মা'র কাছ থেকে বাবার প্রশংসাপত্র পেয়ে খোকন একবার বাবার মুখের দিকে তাকাল, তারপর আবার মা'র দিকে ফিরে বলল, 'বাবা ভাল, না মা?'

—সে তুমি দেখ বিচার করে। অমলা স্বামীর দিকে চোখ রেখে বলে, আমার ত খুব একটা ভাল ঠেকে না।

পরিতৃপ্ত ভবেশ হাসিমুখে তার কাজে মন দেয়। অমলা ছেলেকে বুকের ওপর চেপে আদর করতে থাকে। দমচাপা গুমোটের মধ্যে এক ঝলক ফুরফুরে হাওয়া এসে ঢোকে।

কিন্তু আশ্চর্য! ছেলেটার মনে বারবার ওই এক প্রশ্নের আনাগোনা। বড় সাহেব নামে জীবটি কামড়ায় কেন আর কেনই বা বাবা রোজ তার কাছে যায়? বোধ হয় এই রহস্যের উদ্ঘাটন করার জন্যেই সে সেদিন চেয়ারটা তাকের কাছে টেনে ফাইলের ভেতর থেকে একটা হলদে রংয়ের মস্ত বড় ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট টেনে বার করে। বেশ তন্ময় হয়ে সে দেখছিল কিন্তু ভবেশ ঘরে পা দিয়ে এই দৃশ্য দেখে হাঁ হাঁ করে উঠেছে, ও কি খোকন, আবার? তোমার ভয় নেই এতটুকু?

পাজি ছেলে, দাও, দাও শীগগির···। বাবার রুদ্রমূর্তি দেখে ভয়ে খোকনের প্রাণ উড়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে কাগজটা সে বাবার হাতে দিয়ে দিয়েছে।

কাগজটা যথাস্থানে রাখতে রাখতে হাঁফাতে হাঁফাতে ছেলের দিকে তাকিয়ে ভবেশ ভাবে বকুনিটা বোধহয় একটু বেশীই হয়ে গিয়েছে। রাগের মাথায় চড় তুলে মারতে গিয়েছিল সে। কাগজটা অক্ষত বাঁচাতে পেরে সে অনেক নিশ্চিন্ত বোধ করছে। দু'হাতে ওকে কোলে তুলে নিয়ে তার গালে নিজের মুখ ঠেকিয়ে বলল, তুমি ভুলে গেছ তোমায় কি বলেছিলাম?

—সেই বড় সাহেব কামড়ে দেবার কথা?

—হ্যাঁ, এই ত মনে আছে।

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে খোকন জিজ্ঞেস করল, সত্যি বাবা কামড়ে দেবে?

—দেবে না, বা!

—খুব লাগবে?

—খুব লাগবে; তুমি কাঁদবে।

সেদিন খোকন আর কোন কথা বলে নি। বলল পরের দিন।

পরের দিনটা কেমন গোলমেলে ঠেকল ভবেশের। সকাল হ'ল, পাখি ডাকল, সে বাজার চান-খাওয়া সব সারল, তবু যেন কেমন বেয়াড়া বেখাপ্পা লাগছিল। অফিসে পা দিয়েই ভবেশ বুঝল, আজ একটা কিছু হয়েছে।

কিন্তু তখনও পর্যন্ত কিছুই হয় নি। হ'ল পরে।

গুজ্‌গুজ্‌ ফুস্‌ফুস্‌ অনেকক্ষণ ধ'রেই চলছিল। অ্যাকাউন্টেন্ট ক্যাশিয়ার দু'জনেই ঘন ঘন ম্যানেজারের ঘরে ঢুকছিলেন আর বেরুচ্ছিলেন। হঠাৎ এক সময় নাল আলো-জ্বলা ঘরটার ভেতর ডাক পড়ল ভবেশের।

খুব আপ্যায়ন ক'রে তাকে বসিয়ে মুখে চুক্‌ চুক্‌ শব্দ করতে করতে গোবিন্দন নায়ার ব'লে উঠল, ভেরি সরি রায়···সত্যি আমি অ-ফুলি সরি। তোমার মত একজন এফিশিয়েন্ট ওয়ার্কারকে···কিন্তু উপায় নেই, কোম্পানী এ ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছে। সাদা টাইপ-করা কাগজটা ভবেশের হাতে তুলে দিতে দিতে গোবিন্দন নায়ার বলে, একমাসের মাইনে আমরা তোমায় দিয়ে দিচ্ছি, সেটা মালিকেরই হুকুম, আর একটা সার্টিফিকেট··· ভবিষ্যতে তোমার কাজে লাগবে।

ঘরটা ঠাণ্ডা; এত ঠাণ্ডা ভবেশ আগে কখনও বুঝতে পারে নি। তার বুকের ভেতরটাও সেই ঠাণ্ডায় হিম হয়ে এল।

হাতের কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখল ভবেশ, কি সুন্দর কাগজ! সচরাচর অফিসের সাধারণ কাজে এই কাগজ ব্যবহার করা হয় না। নিউ ইয়র্ক কি ম্যাঞ্চেষ্টারে চিঠি লেখবার সময় আলমারি খুলে এই কাগজ বার করা হয়।

চারজনে তারা বেরিয়ে এল। একটা শুকনো কাগজ আর কতকগুলো নিরর্থক নোট পকেটে পুরে। কি করবে তারা এই টাকাগুলো নিয়ে? যা ইচ্ছে তাই ফুর্তি করবে? তা দিয়ে যে-খুশী পাওয়া যাবে তা কি তাদের সামনের বেকার নিরন্ন দিনগুলিতে পারবে তাদের জীইয়ে রাখতে?

আজ অফিসে এসে এতটুকু না খেটে তাজা শরীর নিয়ে সে বাড়ী ফিরছে।

রোজ রোজ দেরি ক'রে ফিরলে অমলা রাগ করে। ঠাট্টা ক'রে বলে চটকলের চাকরি।

আজ তার খুশী হওয়ার কথা।

—কি হ'ল গো? শরীর খারাপ? খুশী নয়, বেশ উদ্বেগ নিয়েই প্রশ্ন করেছে অমলা, এত আগে ফিরলে যে?

—কাজ ফুরিয়ে গেল, তাই ফিরলাম। আশ্চর্য! ওরই মধ্যে মুখে হাসি টানল।

—তোমার কাজও ফুরোয়? একটু চোরা চাউনি হেনে বলল অমলা।

—ফুরোয় গো, ফুরোয়। নাও, এক কাপ চা খাওয়াও দিকি নি।

না, ওকে বলা যাবে না। অমলা চলে যেতে ভবেশ মন স্থির করে ফেলে। ওকে কাঁদতে দেখলে তার মন ভেঙ্গে যাবে। তার চেয়ে নিজে দুঃখ সওয়া ভাল।

তাতে মনটা সবল থাকবে। ভেতরটা শক্ত হয়ে আসবে। নইলে ডালহৌসীর বাড়ী বাড়ী ঘুরে নতুন কাজ খোঁজার উদ্যম আসবে কোত্থেকে?

হঠাৎ খোকা পাশ ফিরতে গিয়ে চোখ মেলে তাকে দেখতে পায়। বাবাকে এইসময় বাড়ীতে দেখে একটু অবাক্‌ হয় সে।

—এস, বাপি এস, ভবেশ তাকে কাছে টেনে নেয়।

—বাবা তুমি অফিস থেকে চলে এলে!

—হ্যাঁ, এই ত এক্ষুণি এলাম।

——বাবা, আমাকে বেড়ু করতে নিয়ে যাবে আজকে?

—হ্যাঁ যাব, চা খেয়ে নিই।

—বাবা, আজকে তোমার অফিসে বড় সাহেব এসেছিল?

—হ্যা বাবা।

খোকন বাবার হাঁটুতে মাথা এলিয়ে দেয়। এখনও তার চোখে ঘুম। হঠাৎ সে মাথা তোলে, তারপর বহুদর্শী প্রবীণের মত বাবার মুখখানা বেশ ক'রে দেখে আস্তে আস্তে বলে, বাবা—

—কি বাবা?

—আজ বড় সাহেব তোমায় কামড়ে দিয়েছে, না বাবা?

সত্য, মিথ্যা ও কল্পনা

সত্যবাদীর সত্য কথা এবং মিথ্যাবাদীর মিথ্যা কথার মধ্যে যে বৈপরীত্য, বাস্তব বিষয় এবং কবিকল্পনার মধ্যে সেরূপ বৈপরীত্য নাই। কারণ কবিকল্পনার মানসী-সত্তা আছে। বাস্তব পদার্থ ও বিষয় যেমন ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, কবিকল্পিত বস্তুও তেমনি ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে। কবি নিরঙ্কুশ বলিয়া তাঁহার কল্পিত বস্তু কখন কখন বাস্তব অপেক্ষা সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। অনেকে কবিকল্পিত নাটক উপন্যাসাদি মাত্রেরই পাঠের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু যদি প্রমাণ হইয়া যায় যে রাম বা ভীষ্ম বা যুধিষ্ঠির বলিয়া কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না, তাহা হইলে বাল্মীকি ও ব্যাসের মানসী সৃষ্টিগুলি কি তৎক্ষণাৎ মূল্যহীন হইয়া পড়িবে? ভগবান কবিকে নিজের সহকারী করিয়াছেন। সেইজন্য কবিকল্পনা প্রকল্পিত বস্তুকে মানস অস্তিত্ব দিতে পারে। মিথ্যাবাদীর মিথ্যা কথার মত কবিকল্পনা অলীক নহে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১৩২১।

ইতিহাস কথা কয়

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

(১)

আগ্রা দেখা এখানেই শেষ। সময় থাকলে আরও কিছুদিন ঘুরতাম। দেখা কি শেষ হয় এত অল্প দিনে? কত শতাব্দীর ইতিহাস বুকে নিয়ে আগ্রা নগরী পড়ে আছে। আজ যে-পথ দিয়ে আমাদের টাঙ্গা ছুটেছে, ঘোড়ার খুরের শব্দে ধ্বনিত হচ্ছে গতি, একদা সেই পথে কত অশ্বারোহী, পদাতিক, কত রথী-মহারথী ছুটে গিয়েছেন। তাদের কথা সব লেখা হয় নি। তাদের বেদনা-ব্যথা সবটুকু জানা যায় নি। ইতিহাসের সাধ্য নেই সব কথা বলতে পারে।

কাল রাত্রে আগ্রার হোটেলে শুয়ে অনেক কিছু ভেবেছি। শেষ ফেব্রুয়ারীর নরম-গরম রোদে পিঠ পেতে ঘুরে বেড়িয়ে এই কটা দিন কি তৃপ্তিই না পাচ্ছি। আমার মনে হয় হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে ঠিক বেড়ান যায় না। ভ্রমণের সময়টা অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করতে হয়। । পুজোর সময় আমার এক বন্ধু-দম্পতী পুরী গিয়েছিলেন। ফিরে আসতেই সাগ্রহে বললাম, কেমন দেখলে হে? নীল সমুদ্রের ঢেউ তোমাদের চোখে-মুখে দেখছি কই?

বন্ধুর মুখে বিরক্তি। ঢেউ কোথায়? মুখখানা যেন পচা পানার দামে-ভরা ছোট্ট এক ডোবা।

ভরসা পেতে বন্ধুপত্নীকে আশ্রয় করি। কিন্তু ভরসা দেবেন কে? বড় বড় চোখে সমুদ্রের ঢেউ নেই। আছে শান্ত স্থির নীর।

বুঝলাম একটু আগেই দু'জনের একচোট হয়ে গেছে।

বিরক্তি প্রকাশ করে বন্ধু বলল,—রাখ তোমার সমুদ্র। নীলার কথামত গিয়ে আমি শুধু সমুদ্রের নাকানি-চোবানি খেয়েছি।

নীলাদেবী মৃদু আপত্তি করলেন, বা রে, আমার কি দোষ? আচ্ছা, আপনিই বলুন—সর্বনাশ, স্বামী-স্ত্রীর বিবাদে মধ্যস্থতা। এমন বোকা অপবাদ আমার স্ত্রীও দিতে পারবেন না।

পুজোর সময় পুরী গিয়ে ভীষণ বিপদে পড়েছিল দু'জনে। কোন হোটেলে জায়গা নেই। ধর্মশালা, পান্থশালা সর্বত্রই ঠাঁই নেই ঠাই নেই'রব। অতি কষ্টে কাটিয়েছে তিনটে দিন। সমুদ্র দেখেছে।

পুরীর মন্দির-চত্বরে হেঁটে বেড়িয়েছে। সারা বিকেল আর সন্ধ্যে বীচে বসে থেকেছে।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ভীষণ ভীড়ে দু'জনের কারুরই ভাল লাগে নি। কলকাতায় ফিরে এসে দম ফেলে যেন বেঁচেছে।

বন্ধু বলল—কি ভীড় জানিস্? বীচ ত নয়, যেন মধ্য কলকাতার পার্ক রে।

আমাদের কিন্তু এতটুকু খারাপ লাগে নি। ট্রেণে এসেছি আরামে, অনায়াসে। সহযাত্রীরা সকলেই রীতিমত ভদ্র। মনটা সব সময়ই তাজা আর প্রফুল্ল। হঠাৎ যেন বড় হাল্কা হয়ে গেছি। সংসারের সেই জোয়ালটা আর কাঁধে নেই। মনটা কি লঘু সব ভাল লাগছে। সব কিছুতে আনন্দ পাচ্ছি। আনন্দটা কিসের? নিশ্চয়ই মুক্তির। মুক্তির আনন্দ বৈকি। এর একটা নতুন স্বাদ, যা এতদিন বুঝি নি, এতদিন অনুভব করি নি।

এই হোটেল ছেড়ে কালই চলে যাব। শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, হোটেল ছেড়ে নয়—আগ্রা ছেড়ে। কালই ছুটব দিল্লীর পথে। দিল্লী আর দূর নয়। মাত্র এক দিনের ব্যবধান।

শুয়ে শুয়ে হঠাৎ একটা লেখা চোখে পড়ল। দরজার এক কোণে। আশ্চর্য! এতদিন চোখে পড়ে নি। পরিষ্কার বাংলায় লেখা। সম্ভবত মেয়েলী হাতে। লেখা আছে দু'টি নাম। রমা সেন ও প্রলয় সেন। তার নীচে তারিখ ও সময়। পনেরই আগষ্ট, রাত দুটো।

আশ্চর্য! ১৫ই আগষ্ট রাত ছটোর সময় রমা সেন আর প্রলয় সেন এই ঘরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল কিংবা কথা বলেছিল এলোমেলো কখন খেয়ালবশে রমা সেন উঠে গিয়ে দরজার পাল্লার এককোণে নিজেদের নাম লিখেছে। সময় তারিখ সব উল্লেখ করে গেছে। লেখা দুটো আজও মোছে নি। তারপর ত কত রাত কেটে গেল। আরও কত স্বামী-স্ত্রী বন্ধুবান্ধবী এ ঘরে রাত কাটিয়েছে তার হিসেব হোটেলের খাতায় লেখা আছে।

কখন এক সময় আমাদেরও রাত শেষ হ'ল। অত খেয়াল করি নি। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন বাইরে প্রচুর রোদ। হোটেলের পিছনটায় নানা গাছপালা। দুরে-কাছে কোথাও ঘরবাড়ী নেই। একটু বেশী পয়সা লাগে বটে কিন্তু আমাদের এই হোটেলের ব্যবস্থা বা সার্ভিসে কোন ত্রুটি নেই। পরিবেশটাও বড় সুন্দর। সামনে থেকে তাজমহল দেখা যাবে। পিছনে উন্মুক্ত দিগন্ত।

সকালের দিকে সামান্য একটু ঘুরে এলাম। সেই টাঙ্গাওলা। এই ক'দিন ওর সঙ্গেই ঘুরছি। বুড়ো মানুষ। লোকটা ভাল।

বললাম,—আজ তুফানেই চলে যাচ্ছি। তুমি ষ্টেশনে পৌঁছে দিও।

গাড়ি চালাতে চালাতেই সে বলল—জরুর হুজুর।

আগ্রা শহরটায় আর একবার ঘুরে বেড়ালাম, এখানে-সেখানে। তাজমহল থেকে যে-পথটা যমুনার গা-ঘেঁষে চলে গেছে পন্টুন ব্রীজের দিকে, সে-পথ ধরে এগিয়ে গেলাম। বাঁ-দিকে আগ্রা কোর্ট সকালের ঈষৎ-উষ্ণ রোদে ঝিমোচ্ছে। এখনও যেন ঘুম ভাঙ্গে নি।

খাওয়া-দাওয়া সেরে সামান্য বিশ্রাম নিচ্ছি। দরজায় টোকা পড়ল। বুড়ো টাঙ্গাওলা ঠিক এসেছে। মালপত্তর চাপিয়ে হোটেল ছেড়ে চললাম। আগ্রা ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশনে যাব।

ছায়া-ছায়া পথ, নিমগাছের ডালে কাক ব'সে। হোটেলের সামনে মরশুমী ফুল ফুটেছে কত। টাঙ্গা চলছে। হোটেলের ম্যানেজার দুর থেকে নমস্কার জানাচ্ছেন। আমরাও হাত নাড়ছি। মনে মনে বলছি—বিদায়। গুড্ বাই।

ক্যান্টনমেণ্টের পথ সুন্দর। পীচ-ঢালা। বেশ প্রশস্ত। ফুল ফুটেছে পথের ধারে। সাজানো-গোছানো বাড়ী। এদিকটা ভাঙ্গাচোরা নয়। নতুন গ'ড়ে উঠেছে শহরটা, অবশেষে পৌঁছলাম আগ্রা ষ্টেশন। আগ্রা ক্যান্টনমেণ্ট। যে ষ্টেশনে নেমেছিলাম তার চেয়ে এটা অনেক বড়।

আমাদের সেই পুরাণো গাড়ি, তুফান এক্সপ্রেস। তবে এখন আর ভীড় নেই গাড়িতে। যেন শ্রান্ত ক্লান্ত গাড়িটা অনেক পথ দৌড়ে দৌড়ে এসে হাঁফাচ্ছে। গাড়ি ছাড়ল। গার্ডসাহেবের হুইসিল সজোরে বেজে উঠল। রেলকর্মচারীর হাতে সবুজ পতাকা দুলছে। আর নয়। এবার আগ্রা ছেড়ে চল।

চল দিল্লী। দিল্লীর পথে:—

রেলপথে দিল্লী বেশী দূর নয়। আগ্রা থেকে নব্বই মাইলের মত। ঘণ্টা তিন-চার লাগে। ছোট ছোট ষ্টেশন—রাজা কি মাণ্ডী, আরও কি যেন সব নাম। বহুদূরে সেকেন্দ্রার শুভ্র মার্বেল-নির্মিত গোলাকার গম্বুজগুলি আবার চোখে পড়ল।

পথের পাশে বড় একটা ষ্টেশন এল, মথুরা জংশন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা। কবে কতদিন আগে ওর ধুলি-ধুসরিত পথে শ্রীকৃষ্ণ হেঁটে গিয়েছেন। ভক্ত ও পুণ্যার্থীর দল আজও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাই স্মরণ করে।

মথুরা ছাড়িয়ে আরও পথ। দু'পাশে ক্ষেত। গমের কিংবা অড়হরের হ'তে পারে। উট নিয়ে চাষী চলেছে ঘরের দিকে। কোথাও উটের সাহায্যে জল উঠছে। বহুদূরে কি একটা জনপদ। শেষ বেলার সূর্যের হলদে হাসি ওর বুকে কি নয়নাভিরাম দৃশ্যের রচনা করেছে।

ফরিদাবাদ। নানা কলকারখানা। আমরা পাঞ্জাবে এসে গেছি। কামরার মধ্যে অনেক সর্দারজী উঠেছেন। দিল্লী আর এক ঘণ্টারও কম।

সন্ধ্যের আগেই নিউ দিল্লী ষ্টেশনে গাড়ি ঢুকল।

(৮)

দিল্লীতে এলে কালীবাড়ীতে উঠবেন।

বাঙ্গালীর কালীবাড়ী। কম খরচে সুবন্দোবস্ত এবং আরাম অনেকখানি। তেতলার ওপর একটা খোলামেলা ঘর। তার পাশেই প্রশস্ত ছাদ। নীচে

দোতলায় ক্যান্টিনে খাওয়া-দাওয়া করবেন। এত অল্প খরচে যে রাজধানীতে থাকা যায় কালীবাড়ীতে না এলে বুঝবেন না।

দিল্লী মহাভারতের দেশ। কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে যে ভীষণ সমর অনলে উঠেছিল, তা দিল্লী থেকে দূর নয়। একদা দিল্লীরই সন্নিকটে যমুনার তীরে মহারাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের রচনা সুরু করেন। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বৎসর আগে এবং আনুমানিক খ্রী: পূ: ১৪৫০ অব্দে ইন্দ্রপ্রস্থ বা ইন্দ্রপত্ রচিত হয়। মহাভারতের কথা সকলেরই জানা। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কাশীরাম দাসের কথা পুণ্যবান্ এখনও শোনে। রাজা দুষ্মন্তের পত্নী আশ্রম-পালিতা শকুন্তলার গর্ভে ভরতের জন্ম। রাজা ভরত সমগ্র হিন্দুস্থান জয় করে তার নাম দেন ভারতবর্ষ। ভরতের পুত্র হস্তিন হস্তিনাপুর জনপদের স্রষ্টা। হস্তিনের পুত্র কুরু। কুরুর পর শান্তনু। শান্তনুর পুত্র ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা সকলেই জানেন। শান্তনুর অন্যতমা পত্নী সত্যবতীর গর্ভে বিচিত্রবীর্যের জন্ম। কিন্তু ভাগ্যহীন বিচিত্রবীর্য। তার কোন পুত্র-সন্তান জন্মায় নি। হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে উত্তরাধিকারী নেই। তখন রাজমাতা ব্যাসদেবকে স্মরণ করলেন। অবিলম্বে ব্যাসদেব এলেন হস্তিনাপুরে। রাজবংশ লুপ্ত হ'তে চলেছে। হস্তিনাপুরের সিংহাসনে উত্তরাধিকারী নেই। কাজেই ব্যাসদেব ভরসা। বিচিত্রবীর্যের বিধবা পত্নীদের কারও পুত্রসন্তান না হ'লে হস্তিনাপুরের রাজবংশ আর প্রবাহিত থাকে না।

ব্যাসদেব সম্মত হলেন। রাজমাতার অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। কিন্তু ব্যাসদেবের চেহারা ছিল ভয়ংকর। বহুদিন তপস্যার ফলে দৃষ্টি কঠোর,.... মুখের রেখায় কাঠিন্যের স্পষ্ট ছাপ। অনেক রাতে প্রথমা রাণীর ঘরে যখন এলেন ব্যাসদেব, তখন রাণী ভয়ে চোখ বুজে রইলেন। দ্বিতীয়া রাণী তার মূর্তি দেখে আতংকে পাণ্ডুর হয়ে যান। যাই হোক, হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে ব্যাসদেবের তিনপুত্র জন্মগ্রহণ করল। প্রথমা রাণীর গর্ভে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, দ্বিতীয়া রাণীর সন্তান পাণ্ডু। আর এক দাসীর গর্ভে বিদুর জন্ম নিলেন। মহাভারত বলে যে, ভীষণ-দর্শন ব্যাসদেবকে এড়াতে রাণীরাই প্রথম রাত্রে এক দাসীকে নিজেদের ঘরে ফেলে রেখে পালিয়ে যান।

পাণ্ডু রাজার দুই পত্নী—কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তীর পুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন। মাদ্রীর গর্ভে জন্মালেন নকুল ও সহদেব। পাণ্ডুপুত্ররা পরিচিত হলেন পাণ্ডব নামে। অবশ্য পাণ্ডবদের জন্ম-রহস্যের কথা নতুন করে উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

পাণ্ডু মারা গেলেন। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র এলেন সিংহাসনে। রাজরাণী গান্ধারীর গর্ভে একশত পুত্র জন্ম নিল। তাদের মধ্যে দুর্যোধন ও দুঃশাসনই বড় ছিলেন। এদের নাম হ'ল কৌরব বা কুরুর উত্তর-সূরী। কৌরব আর পাণ্ডবদের বাদবিসম্বাদের অন্ত ছিল না। প্রতিদিন নিয়ত বিবাদ। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের পাঠালেন খাণ্ডবপ্রস্থে। সেখানে নতুন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করুক তারা। হস্তিনাপুরের ঝগড়া-বিরোধ প্রশমিত হোক।

যমুনার তীরে নতুন দেশে গেলেন যুধিষ্ঠির। সম্ভবত দিল্লীর খুব নিকটেই জনপদ প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন রাজধানীর নাম হ'ল ইন্দ্রপ্রস্থ। ঐশ্বর্যে বৈভবে দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গের রাজধানীর মতই ইন্দ্রপ্রস্থ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। হয়ত তাই নাম হ'ল ইন্দ্রপ্রস্থ। অন্যদের মতে রাজধানী ইন্দ্রের নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, রাজধানী গড়ে উঠেছিল এক সমভূমির ওপর। ইন্দ্রের সমভূমি বা 'ইন্দ্র-কা-খেরা'। তাই যুধিষ্ঠির নাম দিয়েছিলেন ইন্দ্রপ্রস্থ।

দীর্ঘ সাত শতাব্দী ধ'রে ইন্দ্রপ্রস্থ পাণ্ডব রাজাদের বংশধরদের কাছে রাজধানীর সম্মান পেয়েছে। জানা গিয়েছে যে, রাজা দাস্তানের সময় হস্তিনাপুর বন্যায় ভেসে যায় এবং নগরী জনশূন্য হয়ে পড়ে। নতুন রাজধানীর অন্বেষণে রাজা দাস্তান সুদূর দক্ষিণে গিয়ে হাজির হন। কিন্তু অবশেষে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থকে আবার রাজধানী করে তোলেন। পুরাণ-মতে রাজা যুধিষ্ঠিরের পরবর্তী ষষ্ঠ রাজা নিচক্র কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

প্রায় ত্রিশ পুরুষ ধরে পাণ্ডুবংশ রাজত্ব করে ইন্দ্রপ্রস্থে। যুধিষ্ঠির থেকে রাজা কাশীমক পর্যন্ত। কিন্তু তারপর আরও বহুদিন ইন্দ্রপ্রস্থ রাজধানীর

সম্মান লাভ করেছে। বিশরবংশ, গৌতমবংশ এবং ময়ূরবংশের কাছেও ইন্দ্রপ্রস্থই রাজধানীর সম্মান পেয়েছে। কালক্রমে ইন্দ্রপ্রস্থ কুমায়ুনের রাজা শুকৃয়াস্তর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বার বৎসর পরে শুকয়ান্ত উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থ তারও বহুদিন পূর্ব হ'তেই সমস্ত গৌরব ও বৈভব হারাতে সুরু করেছিল। সম্ভবত কুমায়ুন সীমানাভুক্ত হওয়ার আগেই ইন্দ্রপ্রস্থের আর কোন প্রসিদ্ধি ছিল না।

ইতিহাসে ইন্দ্রপ্রস্থের নাম বড়ই অস্পষ্ট। গ্রীক্ ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে ইন্দ্রপ্রস্থের তেমন উল্লেখ নেই। এ-বিষয়ে এরিয়ান, ফেবিয়ান সকলেই নীরব। অথচ মথুরার উল্লেখ রয়েছে। গ্রীক্ ঐতিহাসিকেরা মথুরাকে মথুরা নামেই অভিহিত করে গেছেন।

কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থ কোথায় গেল? দিল্লীর আশেপাশে কোন ভগ্নস্তূপকে দেখিয়েই গাইড আপনাকে ইন্দ্রপ্রস্থের নির্দেশ দেবে না। অথচ হুইলার সাহেব বিশ্বাস করতেন যে, ইন্দ্রপ্রস্থের ভগ্নস্তূপ হস্তিনাপুরের চেয়েও অনেক বেশীভাবে পরিস্ফুট এবং দর্শনযোগ্য। কুতুব যাওয়ার পথে বিরাট্ প্রান্তরে, উঁচুনীচু মাটির ওপর কিছু কিছু ধ্বংসস্তূপ আছে। ঢিপির মত স্থান। বহু রাজ্য, ঘরবাড়ী প্রাসাদ অট্টালিকা, একদা এ-পথের দু'পাশে গড়ে উঠেছিল। হয়ত বা এরই কোন-একটি খ্রীঃ পূঃ দেড় হাজার বছর আগেকার ইন্দ্রপ্রস্থ। অন্যদের মত ভিন্ন। জনৈক ভারতীয় পণ্ডিতের মতে, ইন্দ্রপ্রস্থ ওখলার কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। কারও মতে, নয়া দিল্লীরই একাংশে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের প্রতিষ্ঠা করেন।

কত বড় ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ? সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার সেই নগরী আয়তনে ও সম্পদে কেমন রূপ নিয়েছিল।......

ইন্দ্রপ্রস্থের সঠিক ইতিহাস নেই। কাহিনী আর উপকথায় সেই পরিচ্ছেদ ঢাকা পড়েছে।

লম্বায় ১০ মাইল ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ। প্রস্থে ২ মাইল। একটি বিরাট্ পরিখা বেষ্টন করে ছিল রাজধানীকে। এই নালাটি প্রায় বত্রিশ হাত গভীর ছিল। প্রায় সাড়ে পাঁচ শতটি উচ্চ গম্বুজ রাজধানীকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছিল। এবং চৌষট্টিটি গেট নগরীর শোভাবর্ধন করত।

ইন্দ্রপ্রস্থ আর হস্তিনাপুর 'কালের চাপে সম্পূর্ণ পিষ্ট হয়েছে। কোন চিহ্নই আর নেই। ভাঙ্গা বাড়ী, পরিত্যক্ত অট্টালিকা, সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার কোন স্মৃতি শত চেষ্টা করেও খুঁজে পাওয়া যায় না। ইন্দ্রপ্রস্থের অবস্থিতির কোন প্রামাণ্য দলিল নেই। অনেকটাই মনুষ্য-কল্পনামাত্র।

ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞ। হস্তিনাপুরে অশ্বমেধ। রাজ্য পরিচালনার আর ইচ্ছা ছিল না যুধিষ্ঠিরের। সশরীরে স্বর্গে আরোহণের আগে সাম্রাজ্য তিনি দু'ভাগে ভাগ করে দিয়ে যান। হস্তিনাপুর দিয়ে গেলেন পাণ্ডব-বংশধর পরীক্ষিৎকে। ইন্দ্রপ্রস্থ পেলেন কুরুবংশের সন্তান যুযুৎসু।

(৯)

দিল্লীর বহু পুরাতন ও অবশ্য-দ্রষ্টব্য বস্তুটির মধ্যে লৌহস্তম্ভ বা 'Loha-ki-lat' অন্যতম। হুইলার সাহেব এটিকে পাণ্ডবদের স্তম্ভ বলে অভিহিত করেছেন। সৈয়দ আমেদ খান অবশ্য আরও একটু আধুনিক। তার মতে খ্রীঃ পূঃ ৮৯৫ অব্দে পাণ্ডব-বংশধর রাজা মেধব (MEDHAVA) এটিকে নির্মাণ করান।

লৌহস্তম্ভটি কুতুবমিনারের কাছেই। প্রায় তেইশ ফুট উঁচু এই লৌহস্তম্ভটি ঢালাই লোহার দ্বারা নির্মিত। এটি আমেদ সাহেবের অভিমত। অন্যদের অনেকেরই মতে লৌহস্তম্ভটি কোন একটি বিশেষ ধাতুর নির্মিত নয়। অনেকগুলি ধাতুর মিশ্রণে এটি একটি এ্যালয় (alloy) জাতীয় বস্তু।

লৌহস্তম্ভটিকে কেন্দ্র করে বহু কিংবদন্তী ছড়িয়ে পড়েছে। গল্পের মত সুন্দর এই ছোট্ট ছোট্ট কিংবদন্তীগুলি এই স্তম্ভটির প্রসিদ্ধি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। কিংবদন্তী বলে, এই লৌহস্তম্ভটি রাজা অনঙ্গ পাল নির্মাণ করেন। রাজা অনঙ্গ পাল বা বেলান দেও Ton-war বংশের প্রতিষ্ঠাতা। একদা এক পুণ্যবান ব্রাহ্মণ-সন্তান তার কাছে এসে বলেন যে, এই লৌহস্তম্ভটি যদি নাগরাজ শেষ নাগের মস্তকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায় তবে অনঙ্গ পালের সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী ও অমর হবে। রাজার মনে

সন্দেহ ঢুকল। সত্যিই কি নাগরাজের মাথায় স্তম্ভটি স্পর্শ করতে পেরেছে? সন্দেহগ্রস্ত রাজা আদেশ দিলেন লৌহস্তম্ভটিকে তুলে আনা হোক। শ্রমিকের দল রাজ-আদেশ পালন করল। কিন্তু সভয়ে রাজা দেখলেন লৌহস্তম্ভটির এক প্রান্ত রক্তে রাঙা। সম্ভবত শেষ-নাগের মাথায় সেই প্রান্তটি বিদ্ধ হয়েছিল। আবার নতুন করে চেষ্টা হ'ল লৌহস্তম্ভটি আগের মতই প্রোথিত করতে। কিন্তু সব বৃথা। সর্পরাজ শেষনাগ তখন অন্যত্র চলে গিয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি সুন্দর শ্লোক রচিত হয়েছে—

—কিল্লি তো ঢিল্লি ভৈ

তোমর ভ্যয়া মৎ হিন—

অর্থাৎ, স্তম্ভটি আলগা হয়ে রয়েছে। তোমাদের ইচ্ছা আর পূর্ণ হবে না।

এই একই গল্প বিভিন্ন ভাবে রূপায়িত হয়েছে। কবি চান্দ তার 'কিল্লি ঢিল্লি কথা'য় এই উপাখ্যানকেই বিবৃত করেছেন। তবে তার মতে এটি ঘটেছিল দ্বিতীয় অনঙ্গ পালের সময়। সৈয়দ আমেদ খানের মতে এটি দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজা রায় পিথোরা (পৃথিরাজ) নির্মাণ করেন।

চান্দ বলেছেন যে, রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গ পাল তার পৌত্রের জন্মোৎসব পালন করবার সময় মুনি ব্যাসদেবকে স্মরণ করেন। মুনি বললেন, রাজা, সুসময় সমাগত। তোমার রাজবংশ পৃথিবীতে অক্ষয় ও অমর হয়ে থাকবে এবং লৌহকিলকটি শেষনাগের মস্তকদেশে বিদ্ধ হয়ে থাকবে। কিন্তু রাজা মুনির কথায় হেসে উঠলেন। অপমানে মুনি মনে পেলেন ব্যথা। একটি লৌহ-কিলককে সজোরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন মৃত্তিকার অভ্যন্তরে। তারপর লৌহকিলকটিকে বের করিয়ে এনে রাজাকে দেখালেন। কিলকটির গায়ে রক্ত। তারপর অনঙ্গ পালকে উদ্দেশ করে মুনি বললেন— 'কিলকটির মতই তোমর সাম্রাজ্যের ভিত্তি আলগা।' তোমরদের পরই চৌহান এবং তারপর তুর্করা আধিপত্য বিস্তার করল।

কিংবদন্তী আরও রয়েছে। আক্রমণকারী নাদির-শাহ চেয়েছিলেন এই লৌহস্তম্ভটিকে ভেঙে দিতে এবং তার আদেশে শ্রমিকের দল এ-কাজে রত হয়েছিল। কিন্তু নাগরাজ শেষনাগ তার মস্তক হেলনের ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয় এবং শ্রমিকের দল কার্য ত্যাগ করে পলায়ন করে। মারাঠারা চেয়েছিল কামানের গোলায় এটিকে উড়িয়ে দিতে। কিন্তু এর গায়ে গোলার দাগ সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু করতে সক্ষম হয় নি।

লৌহস্তম্ভটির গায়ে কয়েকটি শ্লোক খোদিত করা আছে। লিপির ভাষা পুরাতন নাগরী হরফে। এর পাঠোদ্ধার করার জন্য বহু চেষ্টা হয়েছে। ক্যাপ্টেন আর্চার, উইলিয়ম এলিয়ট এবং সর্বশেষে জেমস প্রিন্সেপ এর একটি ভাষ্য করতে সমর্থ হয়েছেন। আবার ডক্টর ভাউ দাজী প্রিন্সেপ সাহেবের ব্যাখ্যার মধ্যে কয়েকটি ভুল এবং অসঙ্গতি দেখিয়ে শ্লোকগুলির একটি নতুন অর্থ নির্ণয় করেছেন।

এই লিপি কোন্ সুদূর অতীতে লেখা হয়েছিল তাই নিয়েও নানা মুনির নানা মত। কারও মতে এগুলি গুপ্তযুগে লিখিত হয়েছিল, কারও মতে এগুলি মৌখরী-বংশের সময়ে লৌহগাত্রে উৎকীর্ণ হয়েছিল।

কিন্তু লিপির সময় উদ্ধার করা সন্ধানী ঐতিহাসিকের কাজ। কিংবা ইতিহাসের কোন গবেষকের বিষয়বস্তু। যাই হোক এরূপ কল্পনা করাও নিতান্ত অসম্ভব নয় যে, সুরুতে লৌহস্তম্ভটি এর বর্তমান স্থানে প্রোথিত ছিল না। সম্ভবত কোন বিষ্ণুমন্দিরের চত্বরে এটিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই বিষ্ণুমন্দির বা বিষ্ণু-পাদ-গিরি আজ মনুষ্য কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। কুতুবউদ্দিন আইবক যখন মিনারের কাজ সুরু করেন তখন লৌহস্তম্ভটিকে তিনি বিনষ্ট করতে চান নি। হয়ত আলাউদ্দিন খিলজীও সেটুকু সহিষ্ণুতা দেখিয়েছিলেন।

তবে কুতুবউদ্দিন আইবক বা আলাউদ্দিন খিলজীর মিনারের গল্প এখন নয়

সে কাহিনী বারান্তরে। (ক্রমশঃ)

রায়বাড়ী

গিরিবালা দেবী

মা ভোগশালায় কাজে আবদ্ধ। ঠাকুমা বিনুকে তেল মাখাইয়া স্নান করিতে লইয়া চলিলেন নদীর ঘাটে। ভরা বর্ষায় যখন নদীনালা এক হইয়া যায় তখন ভিন্ন দুর্গাসুন্দরী আর পুকুরে স্নান করেন না। চলতি জলে যে গঙ্গা যমুনা গোদাবরী মিশিয়া রহিয়াছে। এইখ নেই ডুব দিলে গঙ্গাস্নানের ফল পাওয়া যায়।

বিনু গোয়ালপাড়ার ভিতর দিয়া নদীতে যাইতে শুনিল যশোদা-বৌ পিত্র'লয়ে গিয়াছে।

বিনু ক্ষুণ্ণ হইল, যশোদা-বৌ তাহাকে বড় ভালবাসে, দেখা হইবে না। যশোদা-বৌএর শাশুড়ী ননদিনী বাহির হইয়া বিনুকে কুশল প্রশ্ন করিল। আরও কতজনা পথে আসিয়া কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বিনু যে গোটা গ্রামের স্নেহের দুলালী।

কতদিন পরে হীরাসাগর। জল নামিয়া গিয়াছে কাশের শ্রেণীর নিম্নে, উঁচু তটের কোলে বালি ঝক্ ঝক্ করিতেছে। পারে সেই হেলিয়া-পড়া প্রাচীন বটবৃক্ষ, যাহার শাখায় শাখায় অগণিত পাখীর বাসা। মাছ-রাঙ্গার আবাসস্থল। টিটি পক্ষী টিহি টিহি শব্দ করিয়া উড়িতেছে, সঙ্গে শঙ্খচিল।

বিনু তীরে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া রহিল নদীর তরঙ্গভঙ্গের দিকে। হীরাসাগর তাহার কাছে পুরাতন হয় না। যতবার চোখ মেলে বিনু ততবার নব নব রূপে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে।

ঠাকুমা বিনুর গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিতে লাগিলেন সাবানে নহে, সাজিমাটিতে।

ঘাটে একে একে দেখা দিতে লাগিলেন গৃহিণীর দল। তাহাদের সহিত স্নানে নামিল পণ্ডিত বাড়ীর আকাশি। আকাশি বিনু অপেক্ষা বছর-দুইয়ের বড়। তাহার সাদামাঠা সরল স্বভাবের জন্মে বিনুর সহিত বন্ধুত্ব আছে। প্রখর বুদ্ধিসম্পনা মেয়েদের সহিত বিনু তেমন মিশিতে পারে না, বাধ-বাধ লাগে। সেই কারণে গ্রামে তাহার বন্ধুর সংখ্যা বিরল।

বিনু গলা-জলে দাঁড়াইয়া একের পরে এক ডুব দিতেছিল। শীতের প্রারম্ভ হইলেও রৌদ্রকিরণে জলের শীতলতা নাই।

আকাশি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বিনুকে ডাকে, "বিনু, কশাড় বনের দিকে স'রে আয়, তোর সাথে আমার কথা আছে। তুই এসেছিস শুনে কাল সন্ধ্যাবেলা আমি তোর কাছে যেতে চেয়েছিলাম, মা যেতে দিলেন না।"

ঘাটের বর্ষিয়সী হাসলেন মুখ টিপিয়া। কেউ অনুচ্চস্বরে আর একজনাকে বলেন, "বিয়ে ঠিক হয়েছে, তাই আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলবে ওকে। তর সইচে না দুলির।"

"যেই না আমার বিয়ে তার আবার চিতরি বাজনা" বলিয়া আর এক বর্ষিয়সী জলে ডুব দিতে থাকেন।"

ঠাকুমার স্নানের পরে গলাজলে দাঁড়াইয়া সূর্য্য প্রণাম, পূর্ব্বপুরুষদের নামে নামে জলগণ্ডুষ প্রদান, জপ পূজা কম থাকে না, এই অবকাশে বিনু উপস্থিত হয় আকাশির কাছে।

কশাড় বনের গাছে তেঁতুলগাছের গুঁড়িতে উভয়ে উপবেশন করে—আকাশি বলিতে আরম্ভ করে, "দেখ বিনু এতদিনে তোদের দুলির বিয়ের ফুল ফুটল রে! বোনেদের বিয়ের বাধা ঘুচে গেল। আমি সকলের রাস্তা জুড়ে আপদ-বালাই হয়েছিলাম। দুটো মন্তর পড়ে ফুল ছিটিয়ে দিয়ে আমাকে উদ্ধার করবার লোক ঠিক হয়েছে।"

বিনু নিরুত্তরে ভেজা চোখে আকাশির মুখের পানে তাকাইয়া থাকে। ভাগ্যবিড়ম্বিতা আকাশি।

আকাশির বাবা যাদব পণ্ডিত বন্দরের হাইস্কুলের হেড পণ্ডিত। তাঁহার চার কন্যা এক পুত্র। মেয়েরা বড়। আকাশি তাঁহাদের প্রথম সন্তান। বিকলাঙ্গ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। তাহার ডান হাতখানা প্রায় বুকের সঙ্গে সংলগ্ন, শুষ্ক কাঠের মতন ডান পায়ের জোর কম হইলেও চলাফেরা করিতে অসুবিধা নাই। এই খুঁত ছাড়া আকাশির ন্যায় অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে সচরাচর কাহারও চোখে পড়ে না। আকাশির বিবাহ হয় না। যাহার দক্ষিণহস্ত অনড় তাহাকে কে বিবাহ করিবে? পরের বোনগুলি বিবাহের বয়সপ্রাপ্ত হইতেছে। শাস্ত্রানুযায়ী জ্যেষ্ঠার বিবাহ না হইলে সেগুলির গতি-মুক্তি করিতে কেহ অগ্রসর হইতে চাহে না। পণ্ডিতমশায় আকাশিকে লইয়া বিষম বিপাকে

পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিলেন। এমন সময় আকাশির ভাগ্যবিধাতা প্রসন্ন হইলেন।

আকাশির এত বড় সৌভাগ্যের খবরে বিনু চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া আকাশি ঈষৎ আহত হইয়া কহিল, "তুই চুপ করে রয়েছিস কেন রে? এই মাসের সাতাশে তারিখে আমার বিয়ে, গয়নাও গড়ানো হয়েছে। দেখতে আসিস একদিন গয়নাগাঁটি।

আকাশির যে কখনও বিবাহ হইতে পারে বিনু তাহা প্রত্যাশা করে নাই, তাই ক্ষণেকের জন্য বিমূঢ় হইয়াছিল সে। এখন সে উৎসাহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কার সাথে তোর বিয়ে রে? তার নাম কি? কোন গাঁয়ে থাকে? বিয়ে হলেই যে তোকে যেতে হ'বে শ্বশুর বাড়ীতে। একখানা হাত নিয়ে সেখানে তোর খুব কষ্ট হবে আকাশি।"

"না রে বিনু তারা কেন নুলো বউকে ধরে নিতে যাবে? আমি যেমন আছি তেমন থাকব। সাগরপুরের কুলীন বামুন, এখন ত নাম নিতে দোষ নেই, সাতপাক ঘুরি নি। বরের নাম দয়াময় ভাদুড়ী। মা আছে, বাপ নেই, বড় গরীব, বাড়ীতে একখানার বেশি ঘর নেই। ওর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, পয়লা মাঘ বিয়ে হবে। বৌএর জন্যে একখানা ঘরের দরকার। বাবা তাকে ঘর তুলতে একশ' টাকা দেবেন, তাই সে সাতপাক ঘুরে মন্ত্র পড়তে রাজি হয়েছে। বিয়ের পরের দিনই টাকা নিয়ে চ'লে যাবে। তারপরে বাতাসী উদাসীর বিয়ে। একঘরের দুই ভাইয়ের সাথে ঠিক হ'য়ে রয়েছে। বড়র না হ'লে ছোটদের হ'তে পারে না এই জন্যেই এতদিন দেরি হল। আমাদের বোনেরা সুন্দর ব'লে লোকে আদর ক'রে নিতে চায়।"

বিনু বলে, "তোর মতন কেউ অত সুন্দর নয় আকাশি। সকলে বলে তুই পরী। তোর হাতটার জন্যেই যত জ্বালা। হ্যাঁরে, তোর কি গয়না হয়েছে? ডান হাতে গয়না পরবি কি করে? সোজা হয় না?"

"নুলোরা যেমন গয়না পরতে পারে মা তেমনি গয়নাই গড়িয়েছেন। নারকেলফুল সুতোয় গাঁথা, মুরথী মালা, কাণবালা আংটি নথ, পায়ে গুজরী। মা নিজের গয়না ভেঙ্গে আমাদের তিন বোনের একসমান করে গয়না গড়িয়ে রেখেছেন। সুহাসী এখনও ছোট, ওর জন্যেও কাটা তাবিজ আর চিক রেখেছেন। মা'র সোনা ছিল তাই রক্ষে। এমনিইত কত জমি বাবার বিক্রি করতে হ'ল বিয়ের খরচের জন্যে।"

আকাশির সংসারীর কথা শুনতে বিনুর ভাল লাগছিল না। তাকে টানছিল হীরাসাগরের কল কল ছল ছল জলকল্লোল।

বিনু বলিল, "ঠাকুমার জপ-তপ হয়ে গেল বুঝি, এক্ষুনি তাড়া দেবেন। আমার একটুও সাঁতার কাটা হ'ল না।"

আকাশি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কাকে নিয়ে সাঁতার দিবি রে, পাড়ার মেয়েরা এখনও নাইতে আসে নি। এসেছে নাকটেপা বুড়োর দল। আর একটা কথা তোকে বলে দেই—সাবধান, আমার বিয়ের কথা কাউকে বলিস নে। লোক জানাজানি করলে ভাংচি দেবে।"

"ভাংচি?"

"হ্যাঁ, ভাংচি। আমার মতন নুলোর বিয়ে, বাবার দায়মুক্ত, এই হিংসায় বরের কাছে গাঁয়ের লোকের লাগানি-ভাঙ্গানির নাম ভাংচি দেওয়া। সেই ভয়ে মা এখন আমাকে কারোর বাড়ীতে যেতে দিতে চান না।"

"না, আমি কাউকে বলব না।" বলিয়া বিনু জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার পরে সুরু হইয়া গেল সাঁতার কাটা, জলের সহিত মাতন।

ক্ষণকাল পরে দুর্গাসুন্দরীর জপতপ শেষ হইলে তিনি হাঁক-ডাক আরম্ভ করিলেন, "এই বিনু, আর নয় খুব হয়েছে, এখন উঠে আয়। বেলা হয়েছে, আমার সৃষ্টি পড়ে রয়েছে।"

ঠাকুমার তাড়নায় বিনুকে অনিচ্ছার সহিত জল হইতে উঠিতে হইল। তখন আকাশি স্নানে নামিয়াছে। তাহার মাথাভরা কালো কুচকুচে চুল আলগা হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে চোখে-মুখে। বিনুর মনে হইল একটি প্রফুল্ল কমল যেমন প্রস্ফুটিত হইয়া ঘাট আলো করিতেছে।

দ্বিপ্রহরের আহারাদির পর বিনু বাবাকে চিঠি লিখিতে বসিল। ঠাকুমার হাতে পৈতার টেকো, মা'র হস্তে তুলা। ইঁহাদের দিবানিদ্রার অভ্যাস নাই। গোটা দুপুর কাটিয়া যায় শাশুড়ী-বধূর নানারূপ হালকা কাজে। দুর্গাসুন্দরীর মত পৈতা কাটিতে কেহ পারে না। হেমাঙ্গিনীর কাটা পৈতা অমন সমান সরু হয় না। বাড়ীতে অজস্র জটা কার্পাসের গাছ। হেমাঙ্গিনী সময় পাইলেই তুলা পিঁজিয়া বাঁশের চোঙ্গার ভিতরে 'সাজ' করিয়া রাখিয়া দেয়। দুর্গাসুন্দরী সুতা কাটেন কুরুরর কুরুরর শব্দ করিয়া। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে

বিশেষতঃ রাবণের গোষ্ঠীদের পৈতা অল্প লাগে না। দুর্গাসুন্দরীর হাতের মিহি পৈতার সমাদর সর্ব্বত্র। দেশ-দেশান্তরে পৈতা চালিত হয়। পালা-পার্ব্বণেও যজ্ঞসূত্রের প্রয়োজন হয়। ইহা ভিন্ন পশম ও ক্রুশকাঠি লইয়া অবকাশ সময় দুই শাশুড়ী-বধূ বসিয়া যান টুপি মোজা গলাবন্ধ বুনিতে। কখন বা ফুলপাতা নক্সার কাঁথা সেলাইতে অবকাশ অতিবাহিত হয়। আমের সময় সেলাই তোলা থাকে। আমসী হইতে আচার মোরব্বা আমদত্তে আমকাল কাটিয়া যায়। ইহার মধ্যে ঘরে ঘরে বিবাহের পিঁড়ি আলপনা আছে। কড়ি সংযোগে পাটের শিকা বোনা আছে। পুরাণ পাঠ আছে।

বিনুর বাবাকে চিঠি লেখা শেষ হইল। সে চিঠিখানা আগাইয়া দিল মায়ের দিকে।

ঠাকুমা টেকোয় সুতা জড়াইতে জড়াইতে নাত্‌নীর পানে চোখ তুলিয়া কহিলেন, "তোর বিয়ের সময় মেজ-বৌ যে বাণ্ডিল ধরে পশম দিয়েছিল তোর বাক্সে, সেগুলো দিয়ে কিছু বুনেছিস কি? তুই ত দিব্যি বুনতে শিখেছিলি বিনু?"

বিনু সহসা ঝাঁজিয়া ওঠে, "বুনব কখন? সময় পেলে ত? একবার খাতা লিখতে হবে, বই মুখস্ত করতে হবে, আবার নিয়মের ঘরে ঢুকতে হবে, পত্তর পাওয়া মাত্তর উত্তর দিতে হবে। এত সবের ভেতরে উল বোনা।"

ঠাকুমা কামিনীর মা'র নিকট হইতে বিনুর কর্ম্ম-তালিকা শুনিয়া লইয়াছিলেন। হাসিয়া কহিলেন, "যাদের কাজের অত লোকজন সেখানে একটু টুটুর-পুটুর করেই কি গলে যাবি বিনু? দেখ ত তোর মা দিনরাত কত কাজ করে? কাজকে ভয় পেলে কাজ বোঝা হয়। হালকা ভাবলে গায়ে লাগে না। ছোট দেওর ননদরা রয়েছে, শীতের সময় তাদের কিছু বুনে দিস, ফিরে গিয়ে। তারা কত খুসী হবে।"

"তাদের খুসী করতে আমার বয়ে গেছে।" বলিয়া বিনু ঘরের বাহির হইল।

বিনুর অপেক্ষায় কয়েকটা ডাঁসা পেয়ারা সংগ্রহ করিয়া পেমো বসিয়াছিল ঢেঁকিশালায় ঢেঁকির উপরে।

প্রভাতে পায়রাগুলিকে ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা হয় নাই। পায়রার ঝাঁক মাঠে গিয়াছিল খাদ্যানুসন্ধানে। খোপে ছিল ডিমে তা-দেওয়া-রত কপোতীরা আর শক্তিহীন শাবক।

ভরা দুপুর, বাহিরে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। পায়রার ঝাঁক মাঠ হইতে ফিরিয়া যে-যাহার খোপে বিশ্রাম করিতেছে। কোন কোনটা মৃদু মৃদু গুঞ্জন তুলিতেছে "বাক বাক কুঁ, বাক বাক কুঁ।"

বিনু খোপের সামনে উপনীত হইয়া ডাকিতে লাগিল "এই লোটন, ছোটন, তিলমণি, টগরফুলি, আয়, আয় আয়।"

পায়রা বিশ্রাম-সুখ অবহেলা করিয়া বিনুর সস্নেহ আহ্বানে সাড়া দিল না। বাহিরে আসিল না।

অভিমানে বিনুর চোখ জলে ভরিয়া গেল। কি অকৃতজ্ঞ জগৎ! দুই দিনের অদর্শনে সকলে সকলকে ভুলিয়া যায়। নহিলে যে লালমণি বিনুর পদধ্বনিতে চকিত হইয়া ছুটিয়া আসিত, সেই কি না তাহার বাছুরের কাছে বিনুকে দেখিয়া শিং বাঁকাইয়া তাড়িয়া আসিয়াছিল।

বিনু গিয়া পেমোর অদূরে ঢেঁকিতে উপবেশন করিল। পেমো সাগ্রহে অঞ্চল হইতে বাহির করিয়া দিল চারটা পেয়ারা—তাহার অন্বেষণের ফল।

বিনু সানন্দে প্রশ্ন করিল, "এখনও কি আমাদের গাছে পেয়ারা আছে? কোথায় পেলি রে?"

"সগল গাছ খুঁজিপাতি পাইচি ঠাকুজ্জি। আরও একটু একটু কসা রইচে পাতার মধ্যি।"

"সেগুলো বড় হ'তে হ'তে আমাকে ওরা নিয়ে যাবে। তুই মজা করে খাস পেমো।"

পেমো ক্ষুণ্ণ হইয়া চুপ করিয়া রহিল। বিনু দুইটা পেয়ারা পেমোকে দিয়া একটা পেয়ারা আঁচলে মুছিয়া কামড় দিতে লাগিল। পেয়ারা মুখে তুলিয়া মনে পড়িল তরুকে। সে কত দুর্ল্লভ জিনিস বিনুকে গোপনে খাইতে দিয়াছে। সে এখানে আসিবার সময় পথের পাশে দাঁড়াইয়া কেমন 'টু' দিয়াছিল। 'বইদি যাব' বলিয়া সুমস্ত কত কান্না কাঁদিয়াছিল। মানুষ মানুষকে যত ভালবাসিতে পারে তাহা কপোত-কপোতী, লালমণি গাভী কোথায় পাইবে? উহাদের অপেক্ষা হীরাসাগর নদী তাহাকে ভালবাসে। ঘন অরণ্যানী ভালবাসে। তাহারা কথা কহিতে না পারিলেও বিনু হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে পারে তাহাদের অব্যক্ত ভাষা। হীরা-সাগরের জলে ডুব দিলেই বিনু শুনিতে পায় ছল ছল ফিস ফিস করিয়া হীরাসাগর ডাকে, "বিনু আয়, আয়, আমার গভীরে আয়।" অরণ্যও সস্নেহে আহ্বান করে, "আয় আয়, আমার গহনে আয়।"

বিনুকে বিমনা দেখিয়া পেমো প্রস্তাব করে, "তোমাগো খেলনের ঘরডা ভাঙ্গিচুরি খান খান হইচে

ঠাকুজ্জি। আমি ঘরডা নেপিপুঁছি টলটলে করি থুইগা। চল তুমি রঁাধন-বাড়ন খ্যালা করিবা ?"

বিনু পেয়ারা চিবাইতে চিবাইতে পেমোকে ধমক দেয়, "ধ্যেৎ, এখন মাটির হাঁড়ি-কুড়ি নিয়ে খেলা করবে কে ? আমি যে বড় হয়ে গেছি।"

পেমো চোরা কটাক্ষ বারেক বিনুর প্রতি নিক্ষেপ করিয়া ভয়ে ভয়ে ফের বলে, "তা হলি তোমাগো পুতলা গুলান বার করি আন গা, কতদিন পুতলা খ্যালন কর না। ভরা দুকুরে করিবা কি ?"

"আমি কি তোর মত, আমার কি লেখাপড়া নেই ? পুতুল খেলার বয়েস উঠছে ? মূর্খ হয়ে থাকার চেয়ে দুঃখ আর জগতে নেই। লেখাপড়া শিখলে পৃথিবীর কত কি জানা যায়, কত আনন্দ পাওয়া যায়। এবার তোকেও আমি বই পড়তে শেখাব পেমো।"

বিনুর মুখে নূতন স্বর শুনিয়া পেমো আশ্চর্য্য হইল। সে জানিত না বিনু তাহার স্বামীর বাক্যের প্রতিধ্বনি করিতেছে। বিনু যাহাই করুক না কেন, পেমো খেলা হইবে না জানিয়া দুঃখিত হইল। হায়, এত শিগ্‌গীর মানুষের খেলার নেশা ভাঙ্গিয়া যায় ! বিনু বড় হইয়াছে, বড় হইলে দুমদাম শব্দ করিয়া হাঁটে কেন ? খিল্ খিল্ করিয়া হাসে কেন ? একবার গরুর গলা জড়াইয়া ধরে, পাখীর বাসা খুঁজিয়া বেড়ায়। পেমো দাসী-কন্যা, জমিদার-বৌ তাহার সহিত আর খেলাধুলা করিবে না, এই হইল আসল ব্যাপার। বড় না বড় ছাইয়ের বড় হইয়াছে।

পেমো নীরবে পেয়ারা খাইতে লাগিল।

বিনু একটা শেষ করিয়া আর একটা কামড় দিয়া বলিল, "তোকে লেখাপড়া শেখাব শুনে চুপ করে রইলি কেন ? আমার শেষ-করা প্রথম ভাগ রয়েছে। কাল থেকেই তোকে অ আ শেখাব।"

"চাঁড়ালের ম্যায়া ল্যাকাপড়া করিবে তা হ'লে বাসন মাজিবি কে ? ধান ভানিবে কে ?"

পেমোর কণ্ঠে হতাশের সুর। সেটা বিনুর হৃদয়ে স্পর্শ করিল। বিনু তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল, "চাঁড়াল কি মানুষ নয় ? কাজ করলে কি পড়াশোনা হয় না, আমিও না কত কাজ করে পড়াশোনা করছি। ওদিকে ওটা কি পাখী ডাকছে রে ? তোর সেই নন্দন পাখীটা ত আসে নি ? চল দেখি গে।"

"ও ত কানাকুয়া পক্ষী ডাকিতে নাগিছে ঠাকুজ্জি। বাগিচায় কলা না পাকিলে নন্দন আসিবে কিসের গন্ধে।" বলিয়া পেমো অগ্রসর হইল। বিনু তাহার পেছনে।

এ বাড়ীতে মণ্ডবের পশ্চাৎভাগে একটা ডোবা আছে। ডোবার চারিপাশ দিয়া বৃক্ষের পরে বৃক্ষের সারি। কতক পুরাতন ফলবান গাছ, কতক আগাছা। আম-জাম। পাকিলে বাড়ীর কেহ বিনা প্রয়োজনে এদিকটায় আসে না। সেই নিবিড় বনখণ্ডে শিকড় বাহির করা এক বৃদ্ধ তেঁতুলগাছের ছায়ায় বিনু বসিল।

দেবীর পদতলে বরপ্রার্থিণী সেবিকারূপে আসন লইল পেমো। সামনেই শৈবালে আচ্ছন্ন ডোবা। বর্ষায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এখন প্রায় জলশূন্য। সাদা বকের সারি ডোবায় বিচরণ করিতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছের আশায়। ডোবার গায়ে ঘন জঙ্গলে ফুটিয়াছে দুপুরে চণ্ডীর লাল লাল ফুল, ভাঁটি ফুল, ঘাসের ফুল। বিনু অনিমেষে তাকায় সেই ফুলের দিকে। তেঁতুল-গাছের সুউচ্চ শাখায় কোকিল ডাকিতেছে। বিলাসী কোকিল শীতের সময় চলিয়া যায় ভিন্ন দেশে আবার ফিরিয়া আসে বসন্ত সমাগমে। গোবরা-শালিক মাটি ঠোকরাইয়া গোবরে পোকা খাইতেছে।

গাছের পাতা দুই-একটা করিয়া ঝরিতেছে টুপটুপ। এখনও ঝরাপাতার বিলাপ-তানে বনস্থল ভরিয়া যায় নাই।

বিনু মুগ্ধ বিস্ময়ে দিকে দিকে নেত্রপাত করিয়া এই রূপ রস স্পর্শ গন্ধ যেন হৃদয়ের মধ্যে শুষিয়া লইতে চায়। বিনুর গৌরবের পরিবর্ত্তে ভয় হইতেছিল সে যেন বড় হইয়া যাইতেছে। তাই পুতুলের বাক্স বাহির করিতে ইচ্ছা হইল না। খেলাঘরে ঘরকন্না সাজাইতে মন চাহিল না। বড় হওয়া মন যদি প্রকৃতির এ অনবদ্য রূপসাগরে নিমগ্ন হইতে না চায়, তাহার আঁখিপল্লব হইতে যদি মায়াকজ্জল মুছিয়া যায় তাহা হইলে বিনু বড় হইতে চাহে না। দূর দিগন্ত হইতে আসিতেছে বাসন্তীশ্রীতে বিভূষিত হইয়া মনোহর মন্ত্রমুখর নব যৌবন। কে তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইবে, সে ভুলাইয়া দেয় বিনুর সোনার কিশোরের স্বপ্ন, তাহাকে দিয়া বিনুর প্রয়োজন নাই।

"হই ঠাকুজ্জি, ঠাকুজ্জি হ।"

পেমোর দাদা গরুর রাখাল শ্যামচরণ যেন হারানো গরু খুঁজিতে বাহির হইয়াছে।

বিনু চমকিত হইয়া সাড়া দেয়, "আমরা এখানে শ্যাম, কেন ডাকছিস ?"

শ্যাম কাছে আসিয়া তড়বড় করে, "তোমাগো সারা বাড়ী তাল্লাস করি হয়রাণি হইচি ঠাকুজ্জি। কলা বাগিচায় গেইচি, আম বাগিচায় গিইচি, লেচু—"

বিনু বাধা দেয়, "কত বাগানে খুঁজেছিস তা দিয়ে কি দরকার? কেন ডাকছিস আমাকে?"

"জগাই গাছির বৌ তোমাগো নাগি পাটারি গুড় নয়া বসি রইচে। গোয়ালপাড়ার বিন্দি দিতি আইছে খেতর চাঁছি। মাঠান ডাকিছে।"

"চল যাই, দুপুর বেলা সকলে হাজির হয়েছে।"

পেমো এতক্ষণে মৌনব্রত ভঙ্গ করে, "দুকুর কনে ঠাকুজ্জি, বেলা যে পড়ি আইছে। তুমি চায়ে চায়ে গাছ-গাছালি দেখিছিলা। আমি গাছের গায়ে মাথা রাখি এক ঘোম দিয়া লইছি।"

"বেশ করেছিস, বসলেই ঘুম, শুলেই ঘুম, খালি ঘুম।" বলিতে বলিতে বিনু অনিচ্ছার সহিত বনভূমি পরিত্যাগ করিল।

রায় বাড়ীতে যেমন উঠোন ঝাঁট দেওয়া, লেপিয়া দেওয়ার ও ধানের 'জাত' করিবার মালীবৌ, এ বাড়ীতেও তেমনি কাজ করে বিধবা মালী-মেয়ে টগর।

প্রভাতে টগর গোবর গুলিয়া গোটা বাড়ীতে ছড়া দিতেছিল। দুর্গাসুন্দরী টগরকে ডাকিয়া কহিলেন, শোন টগর, আজ আমাদের লালমণির গোরক্ষ ধার শোধ, তুই বিকেলে এসে গোবর দিয়ে ভাল করে উঠোনটা নিকিয়ে দিয়ে যাস।"

টগর হাসিমুখে বলে, "ওমা, ইয়ার মধ্যিই নালমণির একুশ দিন হইয়া গেল। আমি সাঁজ বেলার আগে-ভাগেই উইঠান নেপি দবদবে করি দিব মাঠান। আমাগো গোক্ষুর নাড়ু দিবা না?"

"দেব না কেন লো, তোদের জন্যেই ত আজকের ক্ষীরের নাড়ু। কাল নারায়ণের ভোগে নাড়ু দিয়ে তবে না বাড়ীর সকলে প্রসাদ পাবে।"

দুর্গাসুন্দরী আদেশ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। আজ তাঁহাদের অনেক কাজ। লালমণির সমস্ত দুধ দিয়া ক্ষীরের নাড়ু করিতে হইবে। মূলাষষ্ঠী আসিতেছে, তাহারও আয়োজন আছে।

কবীর জোলা আসিয়াছে লালমণির দুধ দুইতে। লালমণির কি সোজা বিক্রম! কবীর ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নাই তাহার বাঁটে হাত দেয়। কবীর লালমণিকে ডাকে 'লাল বিটি।' লাল বিটি যেন সাক্ষাৎ কপিলা। অফুরন্ত তাহার দুধের ভাণ্ডার লাল টুকটুকে মাটির দোনা (চ্যাপটা মাটির হাঁড়ি) আনা হইয়াছে লালমণির নবপ্রসূত বৎসের কল্যাণে।

কবীর বসিয়াছে দুধ-দোহনে, পাশে পিতলের বালতি লইয়া উপস্থিত রহিয়াছেন দুর্গাসুন্দরী। লালমণি যদি শান্ত হইয়া দুধ দেয়, তাহা হইলে দোনা ভরিয়া বালতিও ভরিয়া যায় তাহার দুগ্ধে।

হ্যাঁ, লালমণি আজ শান্ত হইয়াই দুধ দিয়াছে। গাভীরা যে দেবী ভগবতী অন্তর্যামিনী, গোক্ষুর ধারশোধে প্রচুর ক্ষীরের নাড়ু হইলে সকলে পরিতোষপূর্ব্বক ভক্ষণ করিবে বুঝিয়া লালমণি দুধ দিয়াছে দোনা ও বালতি ভরিয়া।

কবীর হাসিয়া বলে "মাঠান, দেখ বিটির কাণ্ড, টানি দোয়ালে আর এক বালতি তোমাগো ভরি যায়।"

গৃহিণী মাথা নাড়েন, "না শেখের ব্যাটা, আর দোয়াবেন না। খাক বাছুর মায়ের দুধ প্রাণ ভরে। এই দুধেই অনেক নাড়ু হবে। সন্ধেবেলা আপনি আসবেন ছেলেদের নিয়ে।"

কবীর সানন্দে মাথা হেলায়, "মাঠানের কওন লাগিবে ক্যানে, আমাগো বিটির পরব, আমি না আইলে কেডা করিবে গোক্ষুর ধারশোধ।"

কবীর শেখ সম্পন্ন গৃহস্থ, তাহার বড় ছেলে মৌলভী, আর দুই ছেলে বাপের তাঁতে-বোনা গামছা লুঙ্গি ধুতি ইত্যাদি লইয়া হাটে বেচাকেনা করে। জমির তদ্বির করে। মজুর খাটায়। কবীর লালমণিকে দোহন করে, অভাবে নয়, স্বভাবে। সে ইহার জন্য কর্ত্তার নিকটে পারিশ্রমিক লয় না। পূজায় সম্মানের ধুতি-চাদর পায়, শীতের কম্বল। পাল-পার্ব্বণে খায়-দায়, বাড়ীর লোকের মত আসা-যাওয়া করে। রোগে-ভোগে বিনামূল্যে ঔষধ খায় সমগ্র পরিবার।

বিনুর মা গতকাল মেয়েকে কথা দিয়াছিলেন তাহাকে লইয়া আজ নদীতে স্নান করিতে যাইবেন।

কথা রাখিতে মা অনবরত বিনুকে তাড়া দিতে লাগিলেন চুল খুলিয়া তেল মাখিতে। আজ ভোগ-শালায় রায়বাড়ীর পুনরাবৃত্তি হইবে। লালমণির সমস্ত দুধের নাড়ু তৈরি, একটুখানি কথা নয়। মেয়ে একবার জলে নামিলে সহজে উঠিতে চাহিবে না, কিন্তু মায়ের আজ বিলম্ব করিবার অবকাশ হইবে না।

বিনুর চুলে তেল মাখাইতে মাখাইতে মা মেয়েকে সাবধান করিতে লাগিলেন। বিনু গম্ভীর হইয়া মাকে আশ্বাস দিল, "আজ আমি নাইতে নেমে একটুও দেরি করব না মা, কাজ থাকলে কেউ কি দেরি করতে পারে?

আমি কি বুঝি না। এত সকালে কার দায় পড়েছে শীতকালে নাইতে আসার। ঘাটে লোক না থাকলে দেরি হবে কিসে? নেয়ে এসে আজ আমিও তোমাদের সঙ্গে ভোগের ঘরে কাজ করব। দেখ তুমি, কি সুন্দর করে আমি ক্ষীরের নাড়ু বানিয়ে দেব। আমি কত শিখেছি, এখন বড় হয়ে গেছি।"

আনন্দে মা'র চোখে জল আসিল। তাঁহার অশান্ত অবুঝ বিনুর সুবুদ্ধি হইতেছে, সে বড় হইতেছে।

সন্ধ্যাসমাগমে গোক্ষুরের ধারশোধের সূচনা হইল। লালমণিকে মঙ্গলা বাছুর সমেত বাঁধিয়া রাখা হইল আঙ্গিনার এককোণে। পাড়ার গরুর রাখাল-শ্রেণীর বালকরা উপস্থিত হইল। কবীর জোলা আসিল তাহার ছেলে রূপাকে লইয়া। লেপাপোঁছা উঠানে ধূপ দীপ জ্বালিয়া একখানা কলার মাইজ পাতা ধুইয়া পাতা হইল। পাতার উপরে মুড়ির মোয়ার আকৃতি রাখা হইল একটি ক্ষীরের প্রকাণ্ড নাড়ু। কাণা-উচু একখানা পিতলের কাঁসিবোঝাই করিয়া রাখা হইল নাড়ুর আকার বাকী নাড়ুগুলি।

লালমণির প্রকৃত রাখাল শ্যামচরণ। শ্যাম স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে শুষ্ক গামছা গায়ে জড়াইয়া বসিল সকলের মাঝখানে। গোক্ষুর ধারের মন্ত্র হইল গ্রাম্য-গান—মূল গাওক হইল কবীর, বাকী সকলে দোহার। কবীর মেঠো সুরে গান ধরিল—

"আপনার মা'র দুধে আপনি হইলাম চোর,
গলায় বান্ধিয়া দিল পাট-সোলার ডোর
হাঁচ্চো হাঁচ্চো হাঁচ্চো।
খাইতে দেয় না দুধ দোনা ভরি দোয়ায়
ক্ষিদের তাড়নে মোর প্যাটটা শুকায়,
হাঁচ্চো হাঁচ্চো হাঁচ্চো।

জয় বাবা, গোক্ষুরনাথ, গোপালক গোরক্ষক।" সমস্বরে জিগীর দিয়া সকলে ভূমিতে লুটাইয়া প্রণাম করিল।

শ্যাম চিৎ হইয়া ঘাড় বঁকাইয়া ক্ষীরের ঢেলাটা মুখে তুলিয়া লইল। হইয়া গেল গোক্ষুর ধার শোধ করা।

দুর্গাসুন্দরী বিনুর উপরে ভার দিলেন কলার পাতায় করিয়া সকলকে চারিটা করিয়া নাড়ু বিতরণের। গরুর রাখাল গোক্ষুর নাড়ুটা খাইলেও তাহাকে আরও চারিটা নাড়ু দিতে হইল।

টগর ঢেঁকিশালার আড়াল হইতে কহিল, "মাঠান, আমি আইচি গোক্ষুর বাবার পরসাদ নইতে।"

মাঠান এক থাবা নাড়ু কলার পাতায় মুড়িয়া তাহার আঁচলে ফেলিয়া দিলেন। আর এক থাবা দিলেন কবীরকে।

এদিনের নাড়ু বাড়ীর কেহ না খাইলেও দুর্গাসুন্দরী অন্য গরুর দুগ্ধে আরও নাড়ু করিয়া রাখিয়াছিলেন। যদি কম পড়িয়া যায় ওইগুলি দিয়া চালাইয়া দিবেন। তা ছাড়া দাস-দাসীরা আছে। কর্তার ছাত্রের সংখ্যাও কম নহে। সকলেই যে আশা করিয়া থাকে।

বৈষ্ণবপদাবলীতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব

শ্রীযোগীলাল হালদার

মহাভারতের মানবরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। কয়েকটি শ্লোক ছাড়া মহাপ্রভু কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি ; কিন্তু তাঁর জীবনই এক মহাকাব্য। তাঁর সেই জীবন কোটি কোটি গ্রন্থ হ'তে মূল্যবান্। সেই জীবনই পৃথিবীর মানবকে মহাপ্রেরণা দান করেছে! সেই প্রেরণার উৎসমুখ অনন্তকাল মানবজাতির প্রাণে রস সঞ্চার ক'রে চলেছে, তা শুকোবার নয় ব'লে কখনও শুকিয়ে যাবে না। মহাপ্রভুই ভারতের আবাল-বৃদ্ধ নরনারীর প্রাণে হরি-ভক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন। সুতরাং নগর-কীর্তন, নামকীর্তন, রাধাকৃষ্ণের লীলা কীর্তনের প্রারম্ভে যে তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তিত হবে এটি স্বাভাবিক। বৈষ্ণব মহাজনগণ এটিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে-ছিলেন। এর ফলে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলি রচিত হয়েছিল এবং কীর্তনের প্রারম্ভে কীর্তনীয়াগণ পালাগান আরম্ভে, সেই পালার রসদ্যোতক গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলি গান ক'রে সর্বপ্রথম ভক্তিরস সঞ্চারিত করেন এবং যুগপৎ হরিভক্তিদাতা শ্রীগৌরাঙ্গের পদে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। ইহাই গৌরচন্দ্রিকা। বৈষ্ণব সমাজের ধারণা গৌরচন্দ্রিকা না গাইলে, না শুনলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। আর রাধাকৃষ্ণলীলা গাইবার বা শোনবার অধিকারও জন্মে না। কোন কোন বৈষ্ণব-কবি তাঁর পদাবলীতে বহু 'ব্রজবুলি পদ' ব্যবহার করেছেন। 'ব্রজবুলি পদ' সম্বন্ধে নানাজনের নানামত আছে। অনেকের ধারণা, 'ব্রজবুলি পদ' ব্রজমণ্ডল বা বৃন্দাবনের ভাষা। তাঁদের ধারণা—রাধাকৃষ্ণ এই ব্রজবুলিতে কথাবার্তা বলতেন। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। 'ব্রজবুলির' সঙ্গে ব্রজভাষা অথবা মথুরা বৃন্দাবনের বর্তমান ভাষারও কোন সম্পর্ক নেই। একদা বৃহত্তর বঙ্গের দ্বারস্বরূপ ছিল দ্বারবঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলা। ঐ সময় মৈথিল ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিশ্রণ ঘটেছিল এই দ্বারবঙ্গে। এর ফলে বিদ্যাপতি মৈথিল ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিলন সাধন ক'রে অতি মধুর 'ব্রজবুলি'তে তাঁর পদাবলী লিখেছিলেন। বিদ্যাপতি পদাবলীতে 'ব্রজবুলি' পদ সমাবেশ ক'রে পদাবলীর সৌন্দর্য ও সম্পদ্ শতগুণে বর্দ্ধিত করেছেন।

পদাবলীতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব আলোচনার পূর্বে এখানে দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। প্রথম—পদাবলীতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে পদকর্তাদের পদগুলি তাঁদের পর্যায় বিভাগ উল্লেখ করে আলোচিত হবে ; দ্বিতীয়—মহাপ্রভুর জীবনই এক মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র অধ্যায় প্রয়োজন। তাই স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তা আলোচিত হবে। সেই আলোচনায় গৃহীত হবে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ এবং বৈষ্ণব সমাজ-স্বীকৃত বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত। ষড় গোস্বামী এবং গোস্বামী সম্প্রদায়ের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ-রাজির বিষয়সমূহ আলোচিত হবে না। যে-গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয় নি, তাহাও আলোচনায় বহির্ভূত থাকবে।

অতীন্দ্রিয় সাধনার পাঁচটি স্তর। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর আবার দুই পর্যায়ে বিভক্ত। স্বকীয়া ও পরকীয়া। পরকীয়া বা রাগানুগা (Spontaneous বা Dynamic) অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের চরমভাব। এই পরকীয়াতত্ত্বই যে জয়দেবের রাধাতত্ত্ব বা অতীন্দ্রিয়-তত্ত্ব, এ সত্য আমরা 'জয়দেব ও অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব' প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বৈষ্ণব-পদকর্তাদের উক্ত পঞ্চভাবাত্মক পদগুলি বাল্যলীলা, পূর্বরাগ, অভিসার, মান, আক্ষেপানুরাগ, আত্মসমর্পণ বা আত্ম-নিবেদন, মাথুর, ভাব সম্মেলন ও প্রার্থনা—এই পর্যায়ে বিভক্ত হয়েছে। এই পর্যায় বিভাগ অনুসারে আমরা উক্ত পঞ্চ স্তরের সাধনার আলোচনা করব।

বিবিধ কুসুম দিয়া সিংহাসন নিরমিয়া
কানাই বসিলা রাজাসনে।

রচিয়া ফুলের দাম ছত্র ধরে বলরাম
গদ গদ নেহারে বদনে ॥
অশোক-পল্লব-করে সুবল চামর করে
সুদামের করে শিখিপুচ্ছ।
ভদ্রসেন গাঁথি মালে পরায় কনাইয়ের গলে
শিরে দেয় গুঞ্জাফল-গুচ্ছ ॥
স্তোক কৃষ্ণ আনাগোনা ঠাঞি ঠাঞি বানায় থানা
আজ্ঞা বিনে আসিতে না পায়।
শ্রীদামাদি দূত হৈয়া কানাইয়ের দোহাই দিয়া
চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
করযুগ যুড়ি তথি অংশুমান্ করে স্তুতি
রাজ-আজ্ঞা-বচন চালায়।
বটু করে বেদধ্বনি পড়ে আশীর্বাদ-বাণী
দাম সুদাম নাচে গায় ॥
অতি মনোহর ঠাট নিরমিয়া রাজপাট
কতেক হইল রস কেলি।
এ দাস উদ্ধব কয় সখ্য-দাস্য-রসময়
সেবয়ে সকল সখা মেলি ॥

বৈষ্ণব-পদকর্তারা সকলেই ভক্তসাধক ছিলেন। আর এই সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের উপাসনাও প্রচলিত ছিল। এর ফলে পদকর্তারা যখন যে ভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়তেন সেই পর্যায়ের পদ তাঁদের লেখনী-মুখে নিঃসৃত হ'ত। বৈষ্ণব পদকর্তা ভক্তসাধক উদ্ধব দাস এখানে যুগপৎ দাস্য ও সখ্য ভাবে আবিষ্ট হয়ে পদ লিখেছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় উক্ত পদটিতে বৈষ্ণবভক্তের দাস্য ও সখ্যভাবের সাধনার পরিচয় আছে। অখিল বিশ্বের আদি কারণ বিরাট্ পুরুষ আজ লীলার ছলে সামান্য রাখাল বেশে গোষ্ঠবিহার করছেন। তাঁর ভক্তগণ তাঁর গোষ্ঠলীলার সহচর। ভক্তগণ তাঁর দাস এবং সখা। এই অপূর্ব ভাবে আজ তাঁর লীলা চলছে। পদকর্তা তাঁর হৃদি-বৃন্দাবনে বিরাট্ পুরুষকে এনেছেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনলীলা চলছে। এই অপূর্ব ভাবকল্পনাই অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব।

বৈষ্ণবভক্ত এখানে দাস ও সখা ভাবে ভাবিত হয়েছেন। তাঁর হৃদি-বৃন্দাবনে বিরাট্ পুরুষ আজ সৃষ্টি, স্থিতি লয়ের বিশ্বরূপ ধারণ করে উপস্থিত হননি। আজ তিনি ভক্ত হৃদয়ে রাখাল-রাজ বেশে উপস্থিত। ভক্ত-সাধক কবি নিজেও একজন রাখাল হয়ে তাঁর লীলা-সহচর। ভগবানকে ভক্ত আজ রাখাল-রাজ বেশ দিয়েছে। ফুলের সিংহাসনে তাঁকে বসিয়ে, তাঁর মাথায় রাজছত্র ধরে আছে, কেহ বা চামর-ব্যজনে ব্যস্ত। কেহ দূত হয়ে রাখাল রাজের শান্তির বাণী প্রচারে নিয়োজিত। কেহ যুক্ত-করে স্তোত্র পাঠে রত। কেহ রাজা বা রাজ্যের মঙ্গলের জন্য বেদ পাঠে নিযুক্ত। আবার কেহ কেহ নৃত্যগীতে সভায় আনন্দবর্ধনে ধন্য।

দধি-মন্থ-ধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতি হেরিমুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চাঁদ বয়ান ॥
কহে শুন যাদুমণি তোরে দেব ক্ষীরননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে ॥
রাণী দিল পূরি কর খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল তায়।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায় ॥
নন্দদুলাল নাচে ভালি।
ছাড়িল মন্থন-দণ্ড উথলিল মহানন্দ
সঘনে দেই করতালি ॥
দেখ দেখ রোহিণী গদ গদ কহে রাণী
যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর
ঘনরাম দাসে কয় রোহিনী আনন্দময়
দুহু ভেল প্রেমে বিভোর ॥

পদকর্তা ভক্তসাধক ঘনরাম দাস এখানে বাৎসল্য রসে আবিষ্ট হয়ে পদ লিখেছেন। তাই বাল্যলীলার এই পদটিতে বাৎসল্য ভাবের সাধনার পরিচয় আছে। পরমব্রহ্ম আজ নন্দদুলালের রূপে অবতীর্ণ। ভক্ত-সাধক এখানে মাতা যশোমতির রূপে উপস্থিত। ভক্তের মনোমন্দিরে যেভাবে পূজারতি চলছে, সেই ভাবটিতেই অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। ভক্তরূপে এখানে

মাতা যশোমতী এবং ভগবান্ এখানে নন্দদুলাল। উপাসনাছলে চলেছে এখানে গার্হস্থ্য ধর্মের খেলা। দধিমন্থনের শব্দ শুনে গোপাল এসেছে মায়ের কাছে। তাঁর চাঁদ মুখ দেখে অমনি মায়ের প্রাণ, প্রাবৃটের কৃষ্ণ-মেঘ দেখলে ময়ূরের প্রাণ যেমন আনন্দে নেচে ওঠে; ঠিক তেমনই নেচে উঠ্‌ল। মা তাঁর আদরের ছেলের চাঁদমুখে চুমু দিলেন আর ক্ষীর-ননীর প্রলোভন দেখালেন। কিন্তু নাচতে হবে এই চুক্তি। ছেলে তাতেই রাজি। নবনী খেতে খেতে আনন্দে ছেলেও নাচতে আরম্ভ করল। কাজভোলা মা আপন সখীদের নিয়ে আনন্দে করতালি দিতে দিতে প্রেমে বিভোর হয়ে পড়লেন।

এই রূপই ত হয়। ভগবানের খেলা দেখতে পেলে ভবের হাটের খেলা স্তব্ধ হয়ে যায়। আনন্দময়ের আনন্দের বিন্দুমাত্র হৃদয়ে সঞ্চারিত হ'লে যে অতীন্দ্রিয়ানুভূতি লাভ হয়, তার কাছে সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। বৈষ্ণবসাধকের এই সাধনার তুলনা হয় না।

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি
নিকটে রাখিও ধেনু পূরিও মোহন বেণু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি ॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বামভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে ॥
ক্ষুধা পেলে চাঞা খাইও পথ পানে চাহি যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলো বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥
থাকিহ তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও বাধা পানই হাতে থুইও
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায় ॥

এখানেও পদকর্তা যাদবেন্দ্র বাৎসল্য রসে আবিষ্ট হয়ে পদ লিখেছেন। বাল্যলীলার এই পদটিতে তাই বাৎসল্য ভাবের সাধনার পরিচয় আছে। সাধক-কবি ভগবানকে এখানে ব্রজের রাখাল বালকরূপে সাজিয়েছেন, আর নিজে সেজেছেন যেন মাতা যশোমতী। রাখাল বালকরূপী শ্রীভগবান্ তাঁর অবোধ শিশু। তাই এই অবোধ শিশুটিকে গোষ্ঠে পাঠাতে তাঁর কতই না ভাবনা। যিনি ত্রিজগতের ভাবনা ভাবতে বিচলিত হন না, আজ ভক্তরূপী 'মাতা যশোমতী' তাঁর চিন্তায় অতীব বিব্রত। কখনও তিনি পুত্রকে শপথ করতে বলেছেন, আবার তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে নিজের মাথায় পুত্রের হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করতে বলেছেন। অতীন্দ্রিয় সাধনার এই অপূর্ব ভাবটি লীলাকীর্তনের অথবা কৃষ্ণ-যাত্রার মাধ্যমে চমৎকাররূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অথবা বাংলা দেশের বৈরাগীর আখড়াতেও যে লোকায়াত ভাবটি আছে তার মধ্যেও এই অতীন্দ্রিয় সাধনার পরিচয় মিলে। সেখানেও গোপালের সেবার মধ্যে বৈরাগী সম্প্রদায়ের সাধক-সাধিকার মনোভাব মাতা যশোমতীর মনোভাবের সহিত তুলনীয়। ভগবান্ এখানে শিশুরূপে বর্ণিত হ'লেও ঐ শিশুর বাঁশীর সুরের সঙ্গে ভক্তরূপী 'মাতা'র সম্পূর্ণ পরিচয় আছে। কবি এখানে সে ভাবটিও প্রকাশ করতে ভোলেন নি। কারণ ভগবানের বাঁশীর সুর যে একবার শুনেছে, সে যে-ভাবে থাকুক না কেন, ঐ সুর সে ভুলতে পারে না। তাই কোন-না-কোন প্রকারে ঐ বাঁশীর সুরের কথা সে প্রকাশ করবেই। বাঁশীর ঐ সুর তাকে যে-কোন দিকে আকর্ষণ করে, সে সুরে আত্মহারা হয়। বাঁশীর আহ্বান-গীত তাঁর অন্তরে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। তাই বিশ্বকবি বলেছেন :—

যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান-গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন ;
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি ; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মত। (এবার ফিরাও
মোরে, চিত্রা)

ভক্তরূপী 'মাতা যশোমতী' এখানে ভগবানের এক অসহায় শিশু-মূর্তির কল্পনা করেছেন। আর তার জন্য (ভক্তের) চিন্তার অবধি নাই। মহাভারতের চক্রধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্যই

নাই। মহর্ষি ব্যাস-কল্পিত অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত পদকর্তাদের অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের বিরাট্ ব্যবধান। বৈষ্ণব-কবি এখানে অসীমকে সীমার মধ্যে এনে ছাড়েন নি, একেবারে অসহায় শিশু করে ফেলেছেন।

ভগবানের বিশ্বরূপ বর্ণনায় যেখানে অর্জুন বলেছেন :—

পশ্যামি দেবাং স্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতাবিশেষ সঙ্ঘান্।
ব্রহ্মানমীশং কমলাসনস্থম্
ঋষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যাম্ ॥ ১৫ ॥ ১১ শ সঃ
॥ গীতা

অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোহনন্ত রূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥ ঐ ॥ ঐ ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষং সমন্তাদ্—
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥ ঐ ॥ ঐ ॥

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শ্বাশত ধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥ ঐ ॥ ঐ ॥

—হে দেব, তোমার দেহে আমি সমস্ত দেবগণ, স্থাবর, জঙ্গমাত্মক বিবিধ প্রাণিবগ, সৃষ্টিকর্তা কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, নারদসনকাদি দিব্য ঋষিগণ এবং অনন্ত তক্ষকাদি সর্পগণকে দেখিতেছি। অসংখ্য বাহু, উদর, বদন ও নেত্র বিশিষ্ট অনন্তরূপ তোমাকে সকলদিকেই আমি দেখিতেছি। কিন্তু হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, আমি তোমার আদি, অন্ত্য, মধ্য, কোথাও কিছু দেখিতে পাইতেছি না। কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তি-শালী, তেজঃপুঞ্জ-স্বরূপ, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন দুর্নিরীক্ষ্য, অপরিচ্ছন্ন তোমার অদ্ভুত মূর্তি সর্বদিকে সর্বস্থানে আমি দেখিতেছি। তুমি অক্ষর পর-ব্রহ্ম, তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য তত্ব, তুমিই এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমিই সনাতন ধর্মের প্রতিপালক; তুমি অব্যয় সনাতন পুরুষ, ইহাতে আমার সংশয় নাই।

মহাভারতের যুগ থেকে বৈষ্ণব পদাবলীর যুগ পর্যন্ত যে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, তার মধ্যে বৈষ্ণব-সমাজের চিন্তাধারার মধ্যেও বিরাট্ পরিবর্তন এসেছিল। ঐ পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে ভারতীয় অতীন্দ্রিয়তত্ত্বেরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। সাধনার পরিবর্তনের ফলে চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবের বাল-গোপালের মূর্তি ধারণ করে বৈষ্ণবী. সাধনার নবরূপ দিয়েছেন। এই নবরূপায়ণের ফলেই ক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধনার রীতি প্রচলিত হয়েছিল বৈষ্ণব সমাজে।

ভারতীয় অতীন্দ্রিয় সাধনার চরম বিকাশ ঘটেছিল পরকীয়া বা রাগানুগা (Spontaneous or Dynamic) তত্ত্বের মধ্যে। আর এই পরকীয়াতত্ত্বই যে শ্রীজয়দেব-প্রবর্তিত রাধাতত্ত্ব, একথা আমরা বহুভাবে আলোচনা করেছি। এই রাধাভাবের সাধনার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বরাগ, অভিসার, মান, আক্ষেপানুরাগ, আত্মসমর্পণ বা আত্ম নিবেদন, মাথুর ও ভাব-সম্মেলন পর্যায়ভুক্ত পদগুলির মধ্যে। শান্ত-ভাবের সাধনার বিশেষ পরিচয় আছে প্রার্থনা পর্যায়ভুক্ত পদগুলির মধ্যে।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে
নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুলনাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥

সাধক-কবি চণ্ডীদাস এখানে পরকীয়া ভাবে আবিষ্ট হয়েছেন। পূর্বরাগের এই পদটি মধুর রসাশ্রিত। ভক্তকবি ভগবানকে এখানে গ্রহণ করেছেন প্রেমিক পুরুষরূপে। এই প্রেমিক পুরুষটি তাঁর প্রণয়ী। তিনি বৈধ পতি নন। কবি নিজে হয়েছেন তাঁর অর্থাৎ ঐ প্রেমিক পুরুষরূপী ভগবানের পরকীয়া পত্নী। অতি সঙ্গোপনে তাঁদের লীলা চলে। আড়ালে-আবডালে, লোকচক্ষুর অন্তরালে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এই যে লীলা এর তুলনা হয় না। ভগবানের বাঁশীর সুর ভক্তের কানের মধ্য দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে ভক্তকে আকুল করেছে। অতি অস্পষ্টভাবে ভক্তের মুখে তার নাম গীত হচ্ছে। দেহ-মন প্রাণ-অবশ হয়ে যাচ্ছে। ধৈর্যের বাঁধ আর থাকছে না। যেখানে তাঁকে পাওয়া যাবে—উত্তুঙ্গ পর্বত শিখরে, গহনবনে অথবা অতল সমুদ্রে, বিশাল মরুভূমিতে বা কুমারী মেরুতে—সেখানেই যাবার জন্য ভক্তের আকুলতা বেড়েই চলেছে। ভক্ত তাঁকে ভুলতে পারছে না—ক্ষণিকের জন্যেও। তাঁকে পেলে যে কি করবে, কোথায় রাখবে, কিভাবে তার সন্তুষ্টি সাধন করবে কিছুই যেন ভেবে পাচ্ছে না। কিন্তু! কিন্তু পরমুহূর্তেই এই অনিত্য সংসার মনোমুকুরে প্রতি-বিম্বিত হচ্ছে। নানা বাধা এই অনিত্য সংসারে। এখানে সংসার-বুদ্ধিরূপা জটিলা এবং আসক্তিরূপা কুটিলা প্রেমিক পুরুষরূপী ভগবানের কাছে যাবার পরম বাধা। প্রতিনিয়ত তাদের সজাগ দৃষ্টি পড়ে আছে ভক্তের ওপর। কোনমতেই তাদের চোখে ধুলি দিয়ে পালাবার পথ নেই ভক্তের। অথচ জড় সংসার-রূপ স্বামী আয়ান ঘোষ ভক্তকে চরম সুখ দিতে পারে না। তাই শ্যাম-সুন্দররূপ চিরসুন্দরকে লাভ করবার জন্য ভক্তের হৃদয়ে জাগে চরম আকুলতা। আর এই জন্য শুধু প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা। শুধু ফাঁক খোঁজা। আর ওদের ফাঁকি দিয়ে অবশ মন নিয়ে কোন রকমে সংসারে থাকা। মন-প্রাণ সংসার ছেড়ে যেতে চায় কিন্তু উপায় নেই। এই টানা-পোড়েনের মধ্যে ভক্তের অন্তরের ভাবটি ভক্তকবির লেখনীতে অতি সুন্দরভাবে এখানে ফুটে উঠেছে। অতীন্দ্রিয় ভাবের চরম বিকাশ ত এইখানেই।

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।
সদাই ধেয়ানে চাহে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী-পারা ॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দু'হাত তুলি ॥
এক দিঠ করি ময়ুর ময়ুরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে ॥

ভগবানের রূপ-বর্ণনায় বলা হয়েছে তিনি কৃষ্ণ, তিনি কালো, কালোবরণ। তাঁর রূপের বর্ণনায় বলা হয়েছে—

দিবি সূর্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা
যদি ভাঃসদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥
১২ ॥ ১১ সঃ ॥ গীতা

—যদি আকাশে যুগপৎ সহস্র সূর্যের প্রভা উত্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সহস্র সূর্য্যের প্রভা সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভার তুল্য হইতে পারে।

এখানে কিন্তু সাধক-কবি চণ্ডীদাস পরকীয়া ভাবে আবিষ্ট হয়ে মধুর রসাশ্রিত পূর্বরাগের এই পদটিতে ভগবানকে প্রেমিক পুরুষরূপে গ্রহণ করে তাকে অনন্ত রূপের পরিবর্তে সান্তরূপে নিয়ে অতীন্দ্রিয়বাদের চরম পরিণতি দিয়েছেন। অসীমকে সসীম, অনন্তকে সান্তে, Ideal-কে Real-এ এনে আনন্দরস আস্বাদন করেছেন। এইভাবে আনন্দরস আস্বাদনই বৈষ্ণব ভক্ত কবিদের বৈশিষ্ট্য। তাই মাধুর্য ভাবের পরকীয়াতত্ত্বে বৈষ্ণবী সাধনার অতীন্দ্রিয় ভাবের চরম বিকাশ লাভ করেছে। চণ্ডীদাসের এই কবিতায় ভক্তের ঘর-ছাড়া মনের পরিচয় মিলছে। ভক্তরূপী প্রেমিকা ভগবানরূপ প্রেমিক পুরুষের দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল। সংসার-বন্ধন ছিন্ন

হয় নি; অথচ সংসারের আকর্ষণ আদৌ নেই। ভগবদ্দর্শন না পাওয়ার জন্ত অন্তরে যে বেদনা ভোগ করছে তা প্রকাশ করে অন্তরের বেদনা লাঘব করবারও পথ পায় না। ভক্ত হৃদয়ের এই অবর্ণনীয় বেদনা এখানে অপরূপ রূপ লাভ করেছে। কোনদিকে মন নেই। আহারেও অনিচ্ছা। অন্তরে যে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়েছে তার বহিঃপ্রকাশ পেয়েছে তার বৈরাগীর পরিধেয়ে। কালোবরণকে দেখবার জন্ত যেদিকে কালো সেদিকেই তার দৃষ্টি। কখনও কালো চুল খুলে তার মধ্যে কালোবরণ কৃষ্ণকে দেখছে। আবার পরমুহূর্তে কালো মেঘের মধ্যে প্রাণ-কৃষ্ণকে দেখে হাসি-হাসি মুখে দু'হাত তুলে মৃদু গুঞ্জনে কি বলছে। পরক্ষণেই ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠে যে নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ আছে অনিমেষ নয়নে সেইদিকে চেয়ে দেখে। এমনি করেই যেখানে কালো সেখানে দৃষ্টি দিয়ে কালোবরণকে দেখবার আকুল প্রয়াস। বৈষ্ণব-ভক্ত কবির এই অতীন্দ্রিয় ভাবের সাধনার তুলনা হয় না।

বৈষ্ণব-ভক্ত কবির কৃষ্ণরূপের কল্পনা বড় সুন্দর, বড় মধুর। যা অনন্ত, যা অগাধ, যা কল্পনাতীত, যা অব্যাখ্যেয়, যা দুর্নিরীক্ষ্য তাই কৃষ্ণ। অগাধ বারিধি কৃষ্ণ, অনন্ত আকাশব্যাপী কালো মেঘ কৃষ্ণ, সীমাহীন অন্ধকার কৃষ্ণ। যা আমরা বুঝতে পারি না, ক্ষুদ্র দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পাই না অথচ সত্য—তাই কৃষ্ণ। এই বিরাট্ বিশ্বের* গাঢ় কৃষ্ণ-শ্যাম বর্ণকেই কৃষ্ণরূপে, শ্যাম-সুন্দররূপে গ্রহণ করেছেন ভারতীয় বৈষ্ণব-সাধকেরা। বৈষ্ণব কবির লেখনী-মুখে নিঃসৃত হয়েছে সে অমৃত নির্ঝর। কৃষ্ণের রূপ ও শিখীপুচ্ছ চূড়া প্রসঙ্গে আচার্য্য দীনেশচন্দ্র লিখেছেন:—

* The Vaisnavas have tried to interpret the dark blue in a metaphysical way, as is the *wont* of the Hindus, disregarding the obvious historical facts. This, they say, is the prevading colour of the universe, or the azure, or the sea and generally speaking of the landscape. As the main colour of the universe this has been, they say, made the symbol of the Diety. There is a crown of peacock feathers on the head of Krishna which indicates a combination of other colours, that decorate the main dark blue of the world. Others seem to maintain that the dark colour symbolises the mystory which enshrouds the unseen and the unknowable. Hence it is sacred with the Vaisnavas.

—Vanga Sahitya Parichaya Part I, Introduction P. 47.

—•—

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

মস্কো-পিকিং ও লণ্ডন

আমাদের বর্ত্তমান সংখ্যা প্রকাশ হবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহির্বিশ্বের বিশেষ সংবাদ জানা গেল। রাশিয়ান কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদকের পদ ও যুগপৎ সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে নিকিতা ক্রুশ্চেভের অবসর গ্রহণ (অপসারণ?) এবং তাঁর স্থলে ষ্টালিনিষ্ট দলের মুখপাত্র সুশ্লভের প্রস্তাবক্রমে কোসিগিনের ঐ পদে অধিরোহণ; বৃটেনে হ্যারল্ড উইলসনের নেতৃত্বে সাধারণ নির্ব্বাচনে লেবার পার্টির জয়লাভ ও রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ; এবং কমিউনিষ্ট চীনের দ্বারা প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণ।

রুশ রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব থেকে ক্রুশ্চেভের অপসারণ এবং পিকিং সরকার কর্তৃক একই সময়ে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ, এই দুইটি বিশ্ব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে কোন পারস্পরিক সংযোগ আছে কিনা তা নিয়ে সমগ্র দুনিয়ায় আজ আলোচনা চলেছে। ক্রুশ্চেভের অধিনায়কত্বে রুশ রাষ্ট্র আণবিক বিস্ফোরণ স্থগিত রাখবার আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সেই চুক্তি উপেক্ষা করে পিকিং সরকার এই বিস্ফোরণের আয়োজন চালিয়ে গেছেন। অন্য পক্ষে কিছুকাল ধরে পিকিং ও মস্কো সরকারের মধ্যে বিশ্ব কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রপুঞ্জের উপর নেতৃত্ব স্থাপনের যে প্রতিযোগিতা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল এবং যার ফলে স্পষ্টতঃই পিকিং-মস্কো বিরোধ ক্রমে গভীর হয়ে উঠছিল, ক্রুশ্চেভের অপসারণের ফলে তার মীমাংসা এবং মস্কো-পিকিং জোট পুনর্গঠিত হয়ে উঠবে কিনা, এই প্রশ্ন আজ গভীর আন্তর্জ্জাতিক তাৎপর্য্যমণ্ডিত। এ পর্য্যন্ত যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাতে সন্দেহ করবার কারণ রয়েছে যে, আবার মস্কো-পিকিং জোট বাঁধবার দিকে নজর দেওয়া হবে—নতুন রুশ রাষ্ট্রপতিদের কথাবার্ত্তায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আণবিক বিস্ফোরণটির পেছনে নিজ রাষ্ট্রের প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করবার প্রয়াসমাত্র ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল একথা এঁরা স্বীকার করেন না। তা ছাড়া এই ঘটনাটির ফলে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা ঘটতে পারে এমন আশঙ্কাও তাঁরা করেন না।

কমিউনিষ্ট জোটের বাহিরে অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহে এ নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট আশঙ্কা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণতঃ এই আশঙ্কা অনেক আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রনায়কদের মনে উদয় হয়েছে যে, এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার যুগপৎ উদ্ভবের পেছনে কমিউনিষ্ট জোটের আবার বিশ্বের উপর অধিকার প্রসারিত করবার প্রয়াসই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এ আশঙ্কা যদি সত্য হয় তবে বিশ্বশান্তি অব্যাহত রাখা সম্ভবতঃ কঠিন হয়ে উঠবে। নিকিতা ক্রুশ্চেভ তার রাজত্বকালে কমিউনিষ্ট (অবশ্য চীন এবং তাঁর মোসাহেব রাষ্ট্রগুলি বাদ দিয়ে) ও ডিমোক্রেটিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটা নূতন মৈত্রী এবং বেশ খানিকটা পরিমাণে পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরতার সম্বন্ধ গড়ে তুলছিলেন। ক্রুশ্চেভের সহাবস্থান নীতির প্রতি আনুগত্য এই সম্বন্ধটি গড়ে তুলতে সাহায্য করছিল। শুধু বিশ্বশান্তির কাঠামোটি এ পর্য্যন্ত নিতান্তই কাঁচা বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমান ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়ার ফলে এই বুনিয়াদটি ধ্বসে পড়তে পারে এমন আশঙ্কা অনেকেই করেন।

আমরা এদেশে বর্ত্তমান ঘটনার ফলে ক্রমবর্দ্ধমান ভারত-রুশ মৈত্রী ও সহযোগিতায় সম্বন্ধটি কি ভাবে প্রভাবিত হবে সেই চিন্তাটুকু নিয়েই বিশেষ ব্যস্ত। নূতন রুশ রাষ্ট্রনায়কেরা আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে ভারত-রুশ মৈত্রী ও সহযোগিতার কোন বদল বা বাধা তাদের তরফ থেকে উপস্থিত হবে না। ভরসার কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু মস্কো-পিকিং সম্বন্ধের যে নূতন স্বরূপ বর্ত্তমানে গড়ে উঠবার কথা শোনা যাচ্ছে তার প্রভাব ভারত রুশ সম্বন্ধকে প্রভাবিত করবে কি না এমন আশঙ্কা থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। সমস্তটাই অবশ্য নির্ভর করবে নূতন মস্কো-পিকিং পারস্পর্য্যের স্বরূপটির উপরে। এটি যদি সর্ব্বক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে পিকিং সরকারের স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করা

বিশ্ব নেতৃত্বের ক্ষেত্রে খুব বেশী করে দানা বেঁধে ওঠে তা হলে ভারত-রুশ সম্বন্ধ নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে রক্ষা করা বা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে কিনা সেটা গভীর চিন্তার বিষয়।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, বর্ত্তমান ভারত-চীন সম্বন্ধটি সরাসরি শত্রুতার পর্য্যায়ে এসে ঠেকে রয়েছে। এই শত্রুতা যে সহজে এবং ভারতের স্বাতন্ত্রের স্বীকৃতির ভিত্তিতে মিটতে পারে এমন কোন আভাস আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। চীন স্পষ্টতঃই তার সামরিক শক্তির ভমকি দেখিয়ে ভারতকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। এই ভমকী ইতিমধ্যেই ভারতের একটি বিস্তৃত সীমান্ত এলাকা চীনের অধিকারে সামরিক প্রয়োগের দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে। কূটনৈতিক আদান-প্রদান বা পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মধ্যস্থতা কোন কিছুতেই চীনকে এই অন্যায় অধিকার পরিত্যাগ করতে রাজী করাতে পারে নি। বর্ত্তমানে এই আণবিক বিস্ফোরণের ফলে চীনের প্রচণ্ড সামরিক শক্তি আরো জোরদার করে তোলা হয়েছে এটাই বিশ্বের সকলে আশঙ্কা করেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, এই নবতম শক্তির প্রকাশের দ্বারা চীন সমগ্র দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আশঙ্কার সৃষ্টি করে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস করছে। এরূপ আশঙ্কার কারণ যে রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এই পরিস্থিতিতে রুশী চীন জোট যদি আবার ঘনীভূত হয়ে ওঠে তার ফলে ভারত-রুশ মৈত্রী ও সহযোগিতা রুশ রাষ্ট্রের নূতন নায়কদের আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে কিনা সেটা গভীর অনুশীলনের বিষয়। এর ফলে ভারতের প্রতিবেশী প্রতিকূল রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্বন্ধের ভারকেন্দ্র কতটা পরিমাণে বিঘ্নহীন থাকবে সেটা চিন্তার বিষয়।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তি অবিলম্বে প্রভূত পরিমাণে ও প্রতিরক্ষা আয়োজনের সকল বিভাগেই সমান্তরালভাবে জোরদার করে তোলাই যে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আশা করা যায় যে আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা এ বিষয়ে অবিলম্বে অবহিত হবেন এবং উপযুক্ত আয়োজন গঠনে তৎপর হবেন। বিশ্বশান্তির কল্যাণে আন্তর্জ্জাতিক সামরিক আয়োজন সীমিত করে রাখতে পারাই যে সুবুদ্ধির কাজ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রবল শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেশের স্বাধীন স্বাতন্ত্র বিঘ্নহীন করবার জন্য যে অতিরিক্ত সামরিক শক্তি একান্ত প্রয়োজন হয়ে উঠেছে তার দাবী অস্বীকার করে চললে যে বিশ্বশান্তি রক্ষার কাজও এগুবে না, নিজেদের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়বে এটুকুও স্পষ্ট করে বুঝতে হবে। আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী আমরা রক্ষা করে চলব কিন্তু আত্মরক্ষার আয়োজনেও আমরা অবহেলা করব না,—এটি না হলে কোনদিনই রক্ষা পাবে না।

লণ্ডনে রক্ষণশীলকে দলকে পরাজিত করে যে লেবার পার্টি পুনরায় অনেকদিন পরে বৃটিশ রাষ্ট্রের শাসনভার অধিকার করতে পেরেছেন সেটা অনেক পরিমাণে আগে থেকেই আশা করতে পারা গিয়েছিল। আশানুরূপভাবেই লেবার পার্টির পার্লামেন্টে সংখ্যাধিক্য অতি সামান্যই হয়েছে। এই সংখ্যাধিক্যের ফলে লেবার পার্টি শাসনভার প্রাপ্ত হয়েছেন বটে তবে এই ক্ষীণ সংখ্যাধিক্য তাঁরা কতদিন বজায় রেখে চলতে পারবেন সেটাই প্রশ্ন। দুই চারিটি অন্তর্বর্ত্তী নির্বাচনের ফলেই এঁদের শাসনের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার আশঙ্কা নিতান্ত কাল্পনিক নয়। ফলে হ্যারল্ড উইলসনের কঠিন বিদ্রূপের পাত্র মুষ্টিমেয় সংখ্যক উদার-নৈতিক দলের সদস্যেরা যে বেশ একটা জোরের স্থান অধিকার করে থাকবে তাই মনে হয়। এ পর্য্যন্ত উদারনৈতিক দলের নেতা গ্রিমণ্ড যা বলেছেন তাতে মনে হয় যে নূতন শাসনকর্ত্তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার ব্যাপারে এরা এখনও অন্তিম সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন নি। তবে মনে হয় ভারপ্রাপ্ত দলই মোটামুটি এই সহযোগিতা পেতে থাকবে। তার কারণ মনে হয় দুটি। প্রথমতঃ এই দলটি বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারা সত্ত্বেও নিজেদের শক্তির উপরে নির্ভর করে এঁদের কোন কিছুই করবার ক্ষমতা নেই। অন্যপক্ষে রক্ষণশীল দলের সঙ্গে একজোট হয়েও আপাততঃ লেবার পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করবার আশা নেই। তা ছাড়া হ্যারল্ড উইলসনের বিদ্রূপবাণ সত্ত্বেও নীতির দিক দিয়ে উদার দল রক্ষণশীল দল থেকে অনেক বেশী তফাতে। সবার উপরে বৃটিশ জাতির চরিত্রে স্বভাবতঃই রাজনৈতিক স্থিরতার (stability) প্রতি আনুগত্য আন্তরিক। অতএব শাসনভারপ্রাপ্ত দলের সঙ্গে সহযোগিতা করে এই স্থিরতা রক্ষা করতে এঁরা [illegible]

সেটাই বেশী সম্ভব বলে মনে হয়। অবশ্য এ সমস্তই নির্ভর করবে নূতন মন্ত্রীদল দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন বিষয়ে যদি বিশেষ বৈপ্লবিক ধরণের রদবদল করবার চেষ্টা না করেন। ইংরেজ জাতি যে তার চিরাচরিত সমাজ-ব্যবস্থা বা জীবনধারার খুব একটা আলোড়ন পছন্দ করেন না তার অনেক প্রমাণ ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যাবে।

বৃটেনের নির্ব্বাচনের ফল ভারতে আমাদের উপরে কোন নূতন প্রতিক্রিয়া বা পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে কি না এ প্রশ্ন অবান্তর। রক্ষণশীল দলের শাসনেও ইঙ্গ-ভারত সম্বন্ধ মৈত্রীর ও পারস্পরিক সাহচর্য্যের দ্বারা বিধৃত ছিল, এখনও তাই থাকবে। কেবল একটিমাত্র ক্ষেত্রে পূর্ব্ব সম্বন্ধ খানিকটা পরিমাণে বদল হলেও হ'তে পারে। সেটি কমনওয়েলথের ক্ষেত্রে। বর্ত্তমানে কমনওয়েলথ সম্বন্ধটি নানা কারণে দানা বেঁধে উঠতে পারছে না। এর অনেকটাই ইংরেজের পুরণো সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক ভগ্নাবশিষ্টের প্রতি ঔপনিবেশিক ইংরেজদের আকর্ষণ। রক্ষণশীল ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ রকমে নিরপেক্ষ ও জাতি বিচারহীন কোনকালেই হতে পারেন নি। এঁদেরই প্রশ্রয়ের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া এবং কমনওয়েলথভুক্ত আফ্রিকা মহাদেশের অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে জাতি ও বর্ণবৈষম্য এখনও প্রবল হয়ে রয়েছে। বৃটেনের নীতি যদি এই প্রশ্রয়মুক্ত হতে পারে তাহলে হয়তো কালে এই বৈষম্য সম্পূর্ণ দূরীভূত হতে পাররে এবং তার ফলে কমনওয়েলথ জোটটি আরো গভীর পারম্পর্য্যের দ্বারা বিধৃত হয়ে উঠবে। এই দিক দিয়ে নূতন লেবার গবর্ণমেন্টের কাছে কমনওয়েলথ সম্ভবতঃ একটা বড় রকমের অগ্রগতি আশা করতে পারে। বার্ব্বারা ক্যাস্‌লকে ক্যাবিনেট ভুক্ত করাও এই রকম একটা সূচনারই আভাস পাওয়া যায় বলে মনে হয়। নির্ব্বাচনের পরাজয় সত্ত্বেও প্যাট্রিক গর্ডন ওয়াকারকে বৈদেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করায় এই আশা আরো জোরদার হয়েছে।

খাদ্য সমস্যা ও মূল্য বৃদ্ধি

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন রাজ্যের খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দিল্লী চলেছেন। এ রাজ্যে খাদ্যশস্য ব্যবসায়টি রাষ্ট্রীকরণ করা হবে না একথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রীর হিসাবে বর্ত্তমান বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ৫০ লক্ষ টন আমন ও ৫ লক্ষ টন আউস ফসলের চাউল উঠবে। এর মধ্যে মাত্র ১৫ লক্ষ টন চাউল বাজারে আসবার সম্ভাবনা। শহরাঞ্চলে পূর্ণ র‍্যাশন ও গ্রামাঞ্চলে মডিফায়েড র‍্যাশন ব্যবস্থা আগামী ১লা জানুয়ারী থেকে চালু করার সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করতে হলে সরকারী ভাণ্ডারে ১০ লক্ষ টনের উপরে চাউল সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন। সরকারী হিসাব মত রাজ্যের নিজের ফসল থেকে সংগ্রহের পরিমাণ ৬ লক্ষ টনের অধিক হবার সম্ভাবনা নেই। এই সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা চাউল মিলগুলির কাছ থেকে করা হবে, কোন ভিন্ন সরকারী সংগ্রাহক আয়োজনের হাত দিয়ে নয় এবং মিলগুলির পূর্ণ উৎপাদন সরকারী মজুদে সংগ্রহ করতে পারলে তবেই এই ৬ লক্ষ টন পরিমাণ চাউল পাওয়া যাবে। গত কয়েক বৎসর ধরে বেসরকারী আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গে উড়িষ্যা থেকে মোটামুটি বার্ষিক তিনলক্ষ টন চাউল আমদানী হয়েছে। গতমাসে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর কলিকাতায় সফরের সময় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কাছ থেকে কেন্দ্রীয় মজুদ থেকে ২ লক্ষ টন চাউল পশ্চিমবঙ্গকে দেবার জন্য আবেদন জানান কিন্তু এ অনুরোধ রক্ষা করতে তিনি অসামর্থ্য জানিয়েছেন। এখন শ্রীপ্রফুল্ল সেন অন্যান্য উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলিকে আবেদন জানিয়েছেন। তাঁরা যেন পশ্চিমবঙ্গের এই ঘাটাত মেটাতে সাহায্য করেন।

এই গেল মোটামুটি এই বিষয়ে সম্ভাব্য সরকারী আয়োজনের চিত্র। ইতিমধ্যে রাজ্যে খাদ্যের অবস্থার পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সঙ্গীন হয়ে এসেছে। পুলিশের ধরপাকড় কমে গিয়েছে বটে এবং ফলে সরবরাহ খানিকটা বেড়েছে কিন্তু বাজার মূল্যমান আরও অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেয়েছে। কলকাতা ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে সবচেয়ে মোটা ও নীরেস চালের এখন খুচরা দর কিলো প্রতি ১টা ২০ পঃ থেকে ১টা ২৫ পঃ। সরকারী নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী এর মূল্য কিলো প্রতি ৬৮ পয়সার বেশী হ'বার কথা নয়। এ ছাড়া ডালের মূল্য ১টা ৪০ পঃ, গুড় ১টা ৪০ পঃ, সরিষার তেল ৫টা ৬টা ৮০ পঃ পর্য্যন্ত; বনস্পতি ৪টা ৫০ পঃ, বাদাম তেল ৪টা। কাঁচা বাজারে মাছ এখন কিছুটা রোজই উঠছে কিন্তু দামের কোন স্থিরতা নেই, সাধারণতঃ ৪টা থেকে ৮টা পর্য্যন্ত দরে বিক্রী হচ্ছে। আলুর দর ১টা ১০ পঃ, অন্যান্য সব্জী কোনটাই ৭০ পয়সার কম নয়; বেগুন ১টা ৫০ পঃ, পটল ১টা ৫০ পঃ, সাধারণ শাক ৪০।৫০ পঃ। এবং প্রতিদিনই বাজার চড়েই চলেছে। সরকারী প্রয়োগের সাফল্যের দাবীর এর চেয়ে নিদারুণ ব্যর্থতা আর কি হতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই অবস্থার বিরুদ্ধে খরিদ্দার প্রতিরোধের (Consumer ressistance) কোন লক্ষণ দেখা যায়না। নেতৃবৃন্দ নীরব; সংবাদ পত্রের দল উদাসীন। কয়েক মাস পূর্ব্বে খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে যে চাঞ্চল্য ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তা এখন যেন সম্পূর্ণ থিতিয়ে গেছে। এ যেন ঝড়ের পূর্ব্বেকার ভয়াবহ নীশ্চলতার মতন, কোথাও কোন আন্দোলন, কোন চাঞ্চল্যের আভাস নেই। নূতন ফসলের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার কোন বদল হবে এমন আশা করাও যায় না। বরং পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের মুনাফাখোর গোষ্ঠির নিকট আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত হয়ে চলেছেন তার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সবই সম্ভব

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

পূর্বপাড়ায় কুলি রাস্তার চৌমাথায় একখানি দু'খোপা মাটির ঘর, সামনে চওড়া দাওয়া; খড়ের ছাউনি। উত্তরের খোপখানির দরজা ভিতরের দিকে, সেখানি গৃহস্থালি ঘর; দক্ষিণের খোপটির দরজা রাস্তার দিকে—দাওয়ার একপ্রান্তে, সেটা দোকান ঘর। পিছনে একফালি উঠান; তার এক-পাশে রান্নাঘর ও চাতাল, অপর প্রান্তে ছোট একখানি গোয়াল-ঘর: ছোট মানে খুবই ছোট, কায়ক্লেশে সবৎসা একটি গাভী সেখানে রৌদ্রে-জলে আশ্রয় নিতে পারে। এইটুকুই মহেন্দ্র প্রামাণিকের সামগ্রিক আস্তানা। আর সেই আস্তানার মূল উৎস ওই দোকান ঘরটি—কৃষক-পল্লীর মাঝখানে অতি ক্ষুদ্র একটি মুদিখানার দোকান, যার সমৃদ্ধি ও মূলধন কোন দিন একশো টাকা ছাড়িয়ে যায় নি।

মুদিখানা। সাইনবোর্ডের প্রয়োজন নেই, তাই ছিলও না কোন দিন। মুখে মুখে প্রচারিত নাম। প্রবীণ ও সমবয়সীরা বলে মহিন্দির দোকান, অল্পবয়স ও জেলে-মালো-কামালিরা বলে পরামাণিকের দোকান। পদবী প্রামাণিক, কিন্তু জাতে ওরা গন্ধবণিক। ঘন-শ্যামবর্ণ পেশিবহুল দীর্ঘ দেহ প্রামাণিকের, কিন্তু জীবন-যুদ্ধে শ্রান্ত সৈনিকের মত সে দেহ এখন শিথিল হয়ে এসেছে। কিন্তু মনটা আজও কুঁচকে যায় নি। সহজ সরল বলিষ্ঠ মনের মানুষ।

দোকান ছোট হ'লে কি হয়! কেনা-বেচার অন্ত নেই। সকাল থেকে বেলা তিন প্রহর পর্যন্ত একের পর এক খদ্দেরের অন্ত নেই। মালো পাড়া, তিওর পাড়া, বাগদি পাড়া ও ফরাজি পাড়ার ছোট-বড় ছেলেমেয়ে ও বর্ষীয়সীরা আসে সওদা করতে। কারও আঁচলে চারটি চাল, কারও হাতে একটা বা দুটো তামার পয়সা, ভাঙা একটা কাঁচের শিশি না-হয় মাটির কুপি।

একজনের কেনা শেষ হ'লে, আর-একজন এগিয়ে আসে দরজার সামনে।

নাকের ওপর নিকেলের ডাঁটভাঙা পুরাণো চশমাটা সুতো দিয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা। চশমাটা একটু তুলে নিয়ে, ভাঙা দাঁতের ফাঁকে একটুকরো হাসি টেনে এনে পরামাণিক বলে, 'কি গো, তোমার কি চাই?'

হাতের তামার পয়সা দু'টি টাটের দিকে এগিয়ে দিয়ে, বাগদিবৌ বলে, 'আধ পয়সার তেল, এক সিকির নুন, এক সিকির লঙ্কা আর আধ পয়সার সাজিমাটি।'

ভাঙা শিশিটা সামনে রেখে, আঁচল পাতে বাকী সওদা-গুলো কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নেবার জন্য। শিশিতে তেল নিয়ে, হাসিমুখে হাত পেতে একটা আধলা ফেরত নেয়।

এমনি ক'রে চলে দিন।

সংসার বলতে মহেন্দ্র প্রামাণিকের প্রৌঢ়া স্ত্রী, একটি বিধবা কন্যা ও তার অপোগণ্ড এক পুত্র। প্রাচুর্য নেই, তবুও এক বাটি গুড়-মুড়ি ও দু'বেলায় দু'মুঠো মোটা ভাতের সংস্থান কোনরকমে হয় ওই দোকান থেকে।

বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খদ্দেরের ভিড় তেমন থাকে না। দু'-চারজন আসে দু'-এক পয়সার কেরোসিন তেল, না-হয় তামাক কিনতে।

প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর দাওয়ায় বসে প্রতিবেশীদের মজলিস। ভিন্‌পাড়া থেকেও কেউ কেউ আসে। ও-পাড়ার দাদাঠাকুরও মাঝে মাঝে আসেন—'কি গো মহিন্দি, সব ভাল ত?'

'আজ্ঞে, আপনার আশীর্বাদে—'

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠে, দাদাঠাকুরের পায়ের ধুলো নেয়। চাটাইখানা ঠুকে, ধুলো ঝেড়ে একপাশে পেতে দেয় বসবার জন্য।

দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝুলানো থাকে দু'টি ডাবা হুঁকো—একটি কড়ি-বাঁধা, আর একটিতে বাঁধা সুপারি। কড়ি-বাঁধাটি বামনে হুঁকো, আর সুপারি-বাঁধাটি কায়স্থদের।

কড়ি-বাঁধা হুঁকোটি নামিয়ে, জল বদলে, মহেন্দ্র নিজেই তামাক সাজতে বসে দাদাঠাকুরের জন্য।

দাওয়ার একপাশে তুষ আর ঘুঁটে দিয়ে মাটির একটা মালসায় আগুন জাগানোই থাকে।

সন্ধ্যার পর প্রায়ই মোড়লদের সীতানাথ আসে রামায়ণ পড়তে। তেল-তামাক পরামাণিকের। পরামাণিক কেরো-সিনের ডিবেটা জ্বেলে, জলচৌকি ও রামায়ণখানা বের করে দেয়।

সীতানাথ সুরু ক'রে রামায়ণপাঠ আরম্ভ করে। পুণ্য-লোভাতুর শ্রোতারা এসে একে একে বসে দাওয়াটা জুড়ে। মহেন্দ্র প্রামাণিক গলবস্ত্র হয়ে ব'সে থাকে দোকানঘরের দরজাটার পাশে। একঘেয়ে জীবন সন্ধ্যার অবসরে ভরপুর হয়ে ওঠে আনন্দ ও বেদনার অশ্রুতে।

সেদিন সীতানাথ আসে নি। চাষীভূষিদের ভিড় প্রায় তেমনি জমেছিল পরামাণিকের দাওয়ায়। আপন আপন হুঁকো-কলকে তারা হাতে করেই আসে। আগুনের অভাব নেই। কেউ দু'এক পয়সার তামাক কিনে, এক চিলুম নিজের কলকেয় সেজে, মালসা থেকে আগুন তুলে নেয়। কেউ বা হুঁকোটা বাঁ-হাতে তুলে ধরে, ডান-হাতটা পরামাণিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'কি গো পরামাণিক মশায়, এক চিলুম হবে নাকি ?'

'হবে বৈ কি !'

পরামাণিক উঠে গিয়ে দোকানের টিন থেকে এক চিলুম তামাক এনে তার হাতে দেয়।

'তোমার একা নাতি একশো হোক, পরামাণিক।'

তামাকটুকু হাতে নিয়ে, প্রসন্ন মুখে সে এগিয়ে যায় আগুনের মালসার দিকে। দোকানের লাভ বলতে, যৎকিঞ্চিৎ হয় যারা চাল দিয়ে জিনিষ কেনে তাদের কাছ থেকে। আর বাকিটা হয় আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে চাষীদের কাছে চৈতী ও বিলাতী তামাক বিক্রি করে। কার্তিক মাস পর্যন্ত চলে এই লাভের জের। তাই প্রথম বর্ষায় যখন মোতিহার থেকে তামাকের নৌকা আসে, দোকানদারেরা মূলধনের অধিকাংশ টাকা দিয়েই কিনে রাখে তামাকের পাটা। কিন্তু নগদ পেলেই সাহানীরা অনেক টাকার মাল দিয়ে যায় ধারে। কার্তিক-অঘ্রাণ মাসে সেই টাকা তারা আদায় করে সুদে-আসলে।

মহেন্দ্র প্রামাণিকও প্রতি বৎসর তেমনি করে তামাক কেনে ওদের কাছে। সেই তামাকের পরিমাণ মত চিটে গুড়ও কিনে রাখে। এবারও তাই রেখেছে।

রামায়ণ-পাঠের মজলিস বসে নি ব'লে আসরটা জমে উঠেছিল খোসগল্পে। সেই খোসগল্পের মজলিসের ভেতর থেকে হঠাৎ এক ছোকরা তামাকে টান দিতে দিতে বলে উঠল—

'জান পরামাণিক, একটা তাজ্জব খবর !'

'কিসের তাজ্জব খবর হে ?' পরামাণিক হেসে জিজ্ঞেস করে।

ছোকরা উৎসাহিত হয়ে বললে, 'গিয়েছিলাম না দেশে—বাগড়ি অঞ্চলে। দেখে এলাম, একটা আমড়া গাছে এক-এক থোকায় এক পণের বেশী আমড়া ধরে আছে।'

'এক পণ ! কুড়ি গণ্ডা ! একটা থোকায় এক পণ আমড়া ! অসম্ভব, তা হ'তেই পারে না।' সমস্বরে সকলে বলে।

'হ'তে পারে না ? হয়েছে, নিজের চোখে দেখে এলাম।' ছোকরা জোরের সঙ্গে ব'লে উঠল।

দলের ভেতর থেকে ক্ষুদিরামের পুত্র নন্দগোপাল টিপ্পনী কেটে বললে, 'হুঁ ! তা হ'লে বোধ হয় বড় তামাকে টান দিয়ে মুড়িগাছের দিকে তাকিয়েছিলি। এক পণ কেন, পাঁচ পণ মুড়ি ধরে এক-এক থোকায়।'

কথাটা ব'লেই নন্দগোপাল হো হো শব্দে হেসে ওঠে। ওরাও যোগ দেয় সে-হাসিতে। ছোকরা যেন ক্ষেপে উঠল, 'আলবৎ আমড়া। আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'হ্যাঁ, আমড়া—ছোট ছোট চোকো চোকো ফল, বিষ খাট্টা; বাঘের মুখে দিলে, বাঘ ছুটে পালাবে বাপ বাপ ক'রে।' নন্দগোপাল বিদ্রূপের রেশ টেনে বলে।

বাঁ-হাতে হুঁকোটা ধরে, ডান-হাতে মুঠি বেঁধে ছোকরা বলে, 'বাজি !'

'হ্যাঁ, ধরলাম বাজি। যদি এক থোকায় এক পণ আমড়া দেখাতে পার, তা হ'লে আমার ওই দু'পাট্টা তামাক আর দশ টিন চিটেগুড় দেব তোমাকে খেতে।'—মহেন্দ্র প্রামাণিক দৃপ্তকণ্ঠে বাজি ঘোষণা করে।

'সবাই সাক্ষী !' ছোকরাটি লাফিয়ে উঠল উৎসাহে।

'ওহে, হ্যাঁ হ্যাঁ। সর্বেশ্বর পরামাণিকের ছেলে মহিন্দি ! মরা হাতীও লাখ টাকা।' আত্মপ্রসাদের সঙ্গে মহেন্দ্র একবার দোকান ঘরের ভেতর ঢুকে, প্রদীপটা উসে দিয়ে, বাইরে এসে দাঁড়াল।

ক্ষণকালের জন্য সকলেই নির্বাক্ হয়ে গেল। তারপর আবার সুরু হ'ল কথা-গল্প গুঞ্জন।

মজলিস ভাঙল। সাঁঝের গল্পকথা মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে—সুষুপ্তির কোলে।

আবার আসে দিনের আলো। সূর্যের রথচক্র উদয় দিগন্ত হ'তে ঘর্ঘর শব্দে এগিয়ে চলে পশ্চিম আকাশের পথে।

একে একে আবার দোকানের দরজায় এসে দাঁড়ায় পুঁটির মা, গোষ্ঠ বাগদির কন্যা, কাঙালীচরণের স্ত্রী। কারও আঁচলে এক মুঠো চাল, কারও হাতে দুটো তামার পয়সা।

সেই এক সিকির নুন, এক সিকির শুকনো লঙ্কা, আধ পয়সার তেল, না-হয় সাজিমাটি বা মাগা-তামাক !

দিন যায়, সন্ধ্যা আসে।

দোকানে ধূপ-প্রদীপ জেলে, টাটে গঙ্গাজল ছড়িয়ে, ঠাকুর প্রণাম ক'রে মহেন্দ্র বাইরে এসে দাঁড়ায়। একে একে যথারীতি এসে জমে পাড়া ও ভিন্‌পাড়ার লোক। সীতানাথ এসে উপস্থিত হয় হাত পা ধুয়ে, কাচা কাপড়খানি প'রে।

তাড়াতাড়ি চাটাইখানা পেতে, মহেন্দ্র জলচৌকি ও

রামায়ণটা এনে সীতানাথের সামনে রাখে: 'আজ কি পড়বে সীতানাথ ?'

'অরণ্য পর্ব—সীতাহরণ !'

'বেশ, তাই পড় ।'

রামায়ণপাঠ আরম্ভ হ'ল।

একে একে শ্রোতারা এসে ঘিরে বসল সীতানাথকে। ভক্তিসিক্ত মন, সীতানাথ সুর করে রামায়ণ পড়ে: শ্রোতাদের মন থেকে থেকে ভাবাবেশে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

হঠাৎ দাদাঠাকুর এসে উপস্থিত হলেন। রামায়ণ-পাঠের মাঝখানেও মহেন্দ্র যথাকর্তব্য বিস্মৃত হ'ল না। তাড়াতাড়ি কড়ি-বাঁধা হুঁকোটা নামিয়ে নিয়ে, দাদাঠাকুরের জন্য সে তামাক সাজতে বসল।

স্বর্ণমৃগ! রামচন্দ্র গেলেন সেই স্বর্ণমৃগের সন্ধানে। কুটীর দ্বারে লক্ষ্মণ প্রহরী। সীতা অধীর হয়ে উঠলেন। সীতার অনুজ্ঞায় লক্ষ্মণ গেলেন অগ্রজের সন্ধানে।

সীতা একাকিনী রইলেন কুটীরে, তাই যাবার বেলায় লক্ষ্মণ রক্ষা-বেষ্টনী এঁকে দিয়ে গেলেন কুটীরের সামনে—গণ্ডি—গণ্ডিরেখা।

ভিখারীর বেশে এল রাবণ, ছলে ও বলে অপহরণ করে নিয়ে গেল মা জানকীকে। হায়! হায়!

সকলের অন্তর আলোড়িত হয়ে উঠেছে। কেউ করছে দুষ্ট রাবণের মুণ্ডপাত, কেউ বা অশ্রু মোছে।

আচম্বিতে সন্ধ্যার অন্ধকারে যমদূতের মত হন্ হন্ করে এসে হাজির হ'ল সেই ছোকরা! মাথায় একটা ঝাঁকা!

ঝাঁকাটা দাওয়ার একপাশে নামিয়ে, ছোকরা ব'লে উঠল—'কই গো পরামাণিক! গুণে লাও।'

ছ্যাং ক'রে উঠল মহেন্দ্র পরামাণিকের বুকের ভেতরটা। পা থেকে মাথাপর্যন্ত নিমেষে ঝিম ঝিম করে উঠল—'একি সেই আমড়া?—বাজি!—এনেছে ছোঁড়া!'

'এই লাও। একটো একটো করে গুণে লাও।' —আমড়ার থোকাটা দাওয়ায় নামিয়ে দিয়ে, মাথার গামছাখানা খুলে ছোকরা দুলিয়ে দুলিয়ে বাতাস খেতে লাগল। মুচকি মুচকি হাসে আর আমড়াগুলোর দিকে তাকায়।

রামায়ণ বন্ধ হয়ে গেল। লণ্ঠন আর লম্ফ নিয়ে লোকগুলো হুমড়ি দিয়ে এসে পড়ল আমড়া থোকাটার ওপর। দাদাঠাকুরও।

'রাম, দুই, তিন, চার—'

অদ্ভুত চাঞ্চল্য! ওরা গুণে চলল আমড়া।

মহেন্দ্র প্রামাণিক পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে গেল। চোখে তার পলক পড়ে না। —'তাই হ'ল! সেই অঘটনই ঘটল!......এক পণ তিনটে আমড়া আছে থোকাটায়। সর্বেশ্বর পরামাণিকের ছেলে সে, বাক্ দিয়েছে। পিছিয়ে আসবে না। বংশের মান সে রাখবে। কিন্তু কারবারের মূলধন ওর মাত্র শ'খানেক টাকা!......দুপাট্টা তামাক—বাইশ বাইশ চুয়াল্লিশ, আর আঠার টিন চিটেগুড়......। বাকী যে মূলধন থাকবে, তা দিয়ে দু'বেলা কেন, একবেলার একমুঠো করে মোটা ভাতও জুটবে না।'

ওদের উৎসাহ তখন উথলে উঠেছে। উল্লাসে মাতামাতি করে সব।

'কই গো পরামাণিক, তামাকের পাট্টা আর চিটেগুড়? বার কর, বার কর এখুনি। আমরা সব সাক্ষী। —ওরে মরা হাতীও লাখটাকা।'

'তা-ই।'

টলতে টলতে ঘরের ভেতরে গিয়ে, মহেন্দ্র প্রামাণিক তামাকের পাট্টা দুটো ঠেলে নিয়ে এল দরজার কাছে। ওরা ঝুঁকে পড়ল।

গাড়ির চাকার মত বড় বড় পাট্টা দুটোকে গড়িয়ে নিয়ে এল দাওয়ায়। তারপর সুরু হ'ল ভাগাভাগি। ডালপালা সমেত তামাকের ঝাড়গুলোকে ওরা টেনে টেনে বের করে পাট্টার ভেতর থেকে। মহেন্দ্র প্রামাণিকের মনে হয়, ওর বুকের পাঁজরাগুলো ওরা ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছাড়িয়ে নিচ্ছে। কিন্তু সে নির্বাক। তারপর বাইরে নিয়ে এল গুড়ের টিনগুলো। মুখে মুখে হয়ে গেল ভাগাভাগি। এক-একজনের জিম্মায় রইল এক-একটা টিন। ওরা নিয়ে গেল। কোলাহল শুনে দোকানঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মহেন্দ্র পরামাণিকের স্ত্রী ও বিধবা কন্যা। অপোগণ্ড নাতিটা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্ষণকাল পরেই দোকানের দাওয়া আবার জনহীন হয়ে গেল। সব নীরব।

দিন যায়, দিন আসে।

মহেন্দ্র পরামাণিকের দাওয়ায় আর বসে না সন্ধ্যার মজলিস, রামায়ণ-পাঠের আসর। দিনে বাগদি-পাড়া ও ফরাজি পাড়ার দু'চারজন পুরাণো খদ্দের আসে—হয় আঁচলে চারটি চাল, না-হয় হাতে দুটো তামার পয়সা নিয়ে।

সেই কেনা-বেচা—এক সিকির নুন, এক সিকির শুকনো লঙ্কা, আধ পয়সার তেল, না-হয় সাজিমাটি।

কোনদিন একমুঠো মোটা ভাত জোটে, কোনদিন জোটে না। খৈল-বিচালি যোগাতে পারে নি ব'লে, গাভিন গরুটাকে ষোল টাকায় বিক্রি ক'রে সে টাকাও দোকানে লাগিয়েছে, তবুও দোকান চলে না। সাহানীর

সামান্য কয়েকটা টাকা আজও শোধ করে উঠতে পারে নি। সেও মাঝে মাঝে এসে তাগাদা দেয়

মেরামতের অভাবে দোকানের দাওয়াটা ভেঙ্গে পড়েছে। শুধু দোকানঘরের সামনেটুকু খাড়া হয়ে আছে বাঁশের খুঁটি ভর করে। সেইখানে দরজার পাশে ঠেস দিয়ে ব'সে থাকে মহেন্দ্র। বয়েস সত্তর ছাড়িয়ে গিয়েছে। চোখে আর ভাল নজর চলে না।

কাহিনীটা গাঁয়ের ছেলেমেয়ে কারও অজানা নয়। পাড়ার ছেলেগুলো সেই পথে যেতে যেতে হঠাৎ একবার করে থমকে দাঁড়ায়—'ও পরামাণিক!'

'বল, ভাই।' পরামাণিক কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দেয়।

ওরা বলে—'সহরে দেখে এলাম, একটা ছুঁচের ছিদ্দির দিয়ে একশ'টা হাতী ছুটে যাচ্ছে আর আসছে।'

পরামাণিক গলা ঝেড়ে বলে—'তা হবে। দুনিয়ায় সবই সম্ভব। কিছুই বিচিত্র নাই।'

'তাই ব'লে কি ছুঁচের ভেতর দিয়ে হাতী যেতে পারে?'

'তা পারে। অবিশ্বাস করবার নাই কিছু। সবই সম্ভব। আর সে দু'পাট্টা তামাকও নাই, আঠার টিন চিটেগুড়ও নাই।'

ওরা হাসে, কিন্তু পরামাণিকের মুখখানা নৈরাশ্যে ভরে ওঠে।

'শুনেছ, মহিন্দির দাদা?' —পথ চলতে চলতে আবার কেউ এসে দাঁড়ায়।

'কি?'

'কেনারামের পিসি তার নাত্‌-জামাইয়ের সঙ্গে বৃন্দাবন গিয়েছিল।'

'তা হবে।'

'ওগো, বৃন্দাবন নয়, মিছে কথা। হালিসহরে পালিয়েছিল। তারপর সেখান থেকে কলকাতায় গিয়ে কালীঘাটে বিয়ে করেছে। পাঁচুকাকা দেখে এসেছে, এখন তারা তেলেভাজার দোকান করেছে বেনেপুকুরের মোড়ে। নাত্‌-জামাইটা ছেলের কাঁথা কাচে, আর কেনারামের পিসি মাথায় সিঁদুর দিয়ে নরম নরম ঝাল বড়া ভাজে। দাঁত নাই ত তার।'

'তা হবে। দুনিয়ায় সবই সম্ভব। যে যুগ পড়েছে—'

'সেটা না হয় সম্ভব হ'ল। কিন্তু ওপাড়ার লোকেরা যে বলছে, হরিশ বাগদির ছাগলটা নাকি সেদিন কি-গাছের পাতা খেয়ে, রাতারাতি কলেজ-পাশ মেয়েছেলে হয়েছে। বাড়ী থেকে পালিয়েছে! এখন সে কোন্ আজব রাজ্যের মন্ত্রী!' রাতদিন উটে চড়ে গণ্ডার শিকার ক'রে বেড়াচ্ছে।

'সবই সম্ভব, ভাই! এ-যুগে সবই সম্ভব। বড় হ'লে আপনিই বুঝবে।......আর আমার সেই দু'পাট্টা তামাকও নাই, আঠারো টিন চিটেগুড়ও নাই। সম্ভব, সবই সম্ভব।

মহেন্দ্র পরামাণিকের মুখখানা লোহার মত শক্ত হয়ে গেল।......'সম্ভব, সবই সম্ভব।'

যতীন্দ্রবিমল স্মরণে

শ্রীহেমেন্দুবিকাশ নাগ

পর্বতকুন্তলা সরিৎমেখলা চট্টলার তথা ভারতের অন্যতম কৃতী সন্তান ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর মহাপ্রয়াণ মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং নির্ভীক কর্মসাধনায় উদ্ভাসিত একটি গৌরবময় জীবনের উপর যবনিকা টানিয়া দিল।

সংস্কৃত ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন—বিশেষতঃ সংস্কৃতের বহুল প্রচার এবং ব্যাপকতর পঠন-পাঠনের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টায় তিনি তাঁর দেহমন পরিপূর্ণ ভাবেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁর সুমহান আদর্শের ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিয়া তিনি দিবারাত্রি যেভাবে আহার-নিদ্রার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মহান্ যোগীর মত কর্মসাধনায় মগ্ন থাকিতেন তাহা নিতান্ত বিরল। তাঁর প্রশস্ত ললাট, প্রসন্ন আনন, আয়ত নয়ন, মস্তকে রজতশুভ্র দীর্ঘ কেশরাশি এবং সর্বোপরি তাঁর শান্ত সৌম্য মূর্তি দেখিলে তাঁকে ঋষি বলিয়াই মনে হইত।

সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের সহজাত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চট্টগ্রামের সুদূর পল্লীতে কধুরখীল গ্রামে এক বিত্তশালী পরিবারে যতীন্দ্রবিমলের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা একাধারে শিক্ষক ও ভূম্যাধিকারী ছিলেন। যতীন্দ্রবিমলের শুভজন্মলগ্নে উচ্চারিত মঙ্গলাচরণের পবিত্র সংস্কৃত মন্ত্র নবজাত শিশুর মনে যে ধ্বনি অনুরণিত করিয়াছিল তাহাই যেন পরবর্তী জীবনে—বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে ও প্রৌঢ় অবস্থায়—যতীন্দ্রবিমলের হৃদয়-বীণায় বিশিষ্ট সুরের লহরী জাগাইয়াছে। বাড়ীর প্রশস্ত উঠানের একপ্রান্তে চণ্ডীমণ্ডপ—বারোমাসের তের পার্বণের ঘনঘটা লাগিয়াই আছে। বাড়ীর অন্যান্য শিশুরা হৈচৈ নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু শিশু যতীন্দ্রবিমল পুরোহিতের নিকটে বসিয়া সুমধুর সংস্কৃতের মন্ত্রপাঠ শুনিতেছে মন্ত্রমুগ্ধের মত। যতীন্দ্র-বিমলের জ্যেষ্ঠ অগ্রজ যোগেন্দ্রনাথ পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়া হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় নেন, আর প্রত্যাবর্তন করেন নাই। অল্প বয়স থেকেই যোগেন্দ্রনাথ সুমধুর আপনভোলা সুরে ঈশ্বর উপাসনা করিতেন, আর তাঁহার সেই মধুর সংস্কৃত স্তোত্রপাঠ বালক যতীন্দ্রবিমল একাগ্র মনে শুনিতেন এবং কয়েকটি কলি নিজেই আবৃত্তি করিতেন। বিদ্যালয়ে পড়িবার সময় সংস্কৃতের প্রতি যতীন্দ্রবিমলের বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পড়িবার সময় তাঁহার আগ্রহে সংস্কৃত পড়াইবার জন্য একজন সংস্কৃত পণ্ডিত নিযুক্ত করা হয়। সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপত্তির দরুণ যতীন্দ্রবিমল বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রায় পূর্ণ নম্বর অর্জন করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নের সময় যতীন্দ্রবিমল সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কলেজ-ছুটির অবকাশে যখন তিনি চট্টগ্রামে নিজের বাড়ীতে যাইতেন তখন প্রায়ই তাঁহাকে সংস্কৃত উপাধি-ধারী পণ্ডিত মহাশয়দের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় মগ্ন দেখা যাইত। কোন কোন ক্ষেত্রে উক্ত পণ্ডিত মহাশয়দের সঙ্গে তাঁহার মতান্তর ঘটিলে তিনি বাধা-বিপত্তি দুর্যোগ উপেক্ষা করিয়া, কয়েক ক্রোশ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া তাঁহার স্বনামখ্যাত আদি শিক্ষাগুরুর (৺জগৎচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ) নিকট গিয়া আপন মতের সত্যতা যাচাই করিতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালীন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিনে সকাল বেলা হিন্দু হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁকে পাঠ্য-বহির্ভূত সংস্কৃত পুস্তক অধ্যয়নে অভিনিবিষ্ট দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে যতীন্দ্রবিমলের অপরি-সীম অনুরাগ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে।

তখনকার অন্যান্য অভিভাবকের মত যতীন্দ্রবিমলের পিতার ইচ্ছা ছিল তাঁর ছেলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইবেন। পিতার ইচ্ছানুযায়ী যতীন্দ্রবিমলকে তার জন্য প্রয়াসও করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যাঁর চিত্ত সংস্কৃত সাহিত্যে নিহিত, মধু আহরণ ও আকণ্ঠ পান করিবার জন্য নিত্য ব্যাকুল তাঁর কি অন্য কোন কাজ ভাল লাগে? বিলাতে যতীন্দ্রবিমল সংস্কৃত অধ্যয়ন ও গবেষণায় তনু মন ধন অর্পণ করিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হলেন। যতীন্দ্রবিমল কেবল ডক্টরেট উপাধি পাইলেন তাহা নহে, তিনি লণ্ডনে স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল ষ্টাডিজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। এই সময় লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর অধীনে যাবতীয় সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির বিশদ ও বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রণয়নে

যতীন্দ্রবিমল কঠোর পরিশ্রম করেন ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল আকৈশোর নারী-প্রগতির একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমিতে নারী-শিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও সমাজ-সেবামূলক কাজে মেয়েদের অংশ গ্রহণে উৎসাহদান ইত্যাদি ছাত্রাবস্থায়ই তিনি করিতেন। প্রাচীনযুগে নানা ক্ষেত্রে নারীদের গৌরবময় ভূমিকার বিষয় তিনি গর্বের সহিত আলোচনা করিতেন। পরবর্তী জীবনে তাঁহার প্রথম গবেষণা-গ্রন্থ "সংস্কৃতে নারী কবি" বা "সংস্কৃত সাহিত্যে নারীর দান" হইতেই প্রতীয়মান হয় যে-সমাজের অবহেলিত অর্দ্ধাংশ নারী যাহাতে পূর্ব গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশ ও সমাজকে সর্বক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে সেজন্য তাঁহার দরদী মন সজাগ ও সচেষ্ট ছিল। কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের দরদী মন নূতন রূপে প্রকাশ পায়। যিনি কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে ছিলেন 'দরদী' তিনি ক্রমশঃ হইলেন 'পূজারী'। ডক্টর যতীন্দ্রবিমল নারীদের মধ্যে মাতৃশক্তির প্রকাশ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। সীতা, যশোধরা, বিষ্ণুপ্রিয়া, রাধা ও সারদামণির পুণ্যজীবন বিশদভাবে পর্যালোচনা করিয়া তিনি মাতৃতত্ত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন। সর্বশক্তিময়ী করুণাময়ী বিশ্বজননীর আরাধনায় তিনি মাতিয়া উঠিলেন। 'মা' 'মা' ডাকে তিনি বিভোর হইয়া থাকিতেন সময় সময়। ক্রমশঃ তাঁহার নিকট পার্থিব জীবন ও দিব্য জীবনের ব্যবধান দ্রুত ঘুচিয়া আসিতেছিল।

ডক্টর চৌধুরীর দেশাত্মবোধ বরাবরই প্রখর ছিল। প্রথম জীবনে তিনি মাতৃভূমির মুক্তিসাধনে উৎসর্গীকৃত প্রাণ বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। যদিও তিনি রাজনৈতিক আবর্তের বাহিরে সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছিলেন, তথাপি সুযোগমত বিপ্লবীদের সহায়তাদানে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। স্বাধীনতালাভের পরবর্তীযুগে তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং প্রচার করিতেন যে সংস্কৃতের প্রচার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষাগত ভেদবৈষম্য দূর করিয়া জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা সাধন সম্পূর্ণ সম্ভব। তিনি উন্নততর স্বদেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তাঁর রচিত উদ্দীপনাময়ী সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যের আদর্শ-প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের চরিত্রের মধুরতম আকর্ষণীয় দিক ছিল তাঁর সরল, অকৃত্রিম এবং অমায়িক ব্যবহার। বাল্যে এবং কৈশোরে চট্টগ্রামের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রাচুর্য তাঁহার মনকে স্নিগ্ধ সরল ও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি একাকী কর্ণফুলির তীরে বসিয়া স্রোতস্বিনীর সুমধুর কলধ্বনি শুনিতেন। মধ্যে মধ্যে আবার চট্টগ্রামের উপকণ্ঠে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গরাশি তাঁর তরুণ মনে অনন্ত ও অসীমের সুর জাগাইয়া তুলিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি চট্টলা একদিকে যেমন তার এই প্রিয় সন্তানের মধ্যে কমনীয়তা মূর্ত করিয়া তুলিয়াছিল, অন্যদিকে চট্টগ্রামের সারি সারি পাহাড় তাঁর মনে দুর্জয় সঙ্কল্প এবং আদর্শনিষ্ঠা সঞ্চারিত করিয়াছিল।

যতীন্দ্রবিমল প্রথম জীবন হইতেই সঙ্গীত এবং কীর্তনপ্রিয় ছিলেন। কলেজ-ছুটির সময় গ্রামে ফিরিয়া তিনি তাঁর কীর্তনের দল গঠন করিয়া বিভিন্ন জায়গায় কীর্তনের আনন্দে মাতিয়া উঠতেন। চণ্ডীদাস পদাবলী কীর্তন তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। এই সময়ে ছোটখাট নাটক অভিনয়ে তাঁর বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইত। প্রথম জীবনে তাঁহার মধ্যে নাট্যপ্রতিভার যে স্ফুরণ হইয়াছিল তাহাই শেষ জীবনে বিশেষ ভাবে বিকশিত হইয়া তাঁহার সুললিত ভাষায় রচিত অর্দ্ধশতাধিক সংস্কৃত নাটকের রূপায়ণে ভারতের অগণিত নরনারীকে আনন্দদান করিয়াছে। তাঁহার মধ্যে নেতৃসুলভ অনেক গুণ কিশোর বয়স হইতেই দেখা যায় এবং উত্তরোত্তর এ সকল গুণরাশি তাঁর মধ্যে সম্যক্‌বিকাশ লাভ করে।

তিরোধানের কিছুকাল পূর্ব হইতেই ডক্টর যতীন্দ্র-বিমলের কর্মসাধনা দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সংস্কৃত ভাষাকে সহজ ও সরল করিয়া জনসাধারণের বোধগম্য করা এবং সংস্কৃত প্রচারের দুর্বার স্রোতে দেশের সঙ্কীর্ণ ভাষা-ভিত্তিক বিভেদ প্রচেষ্টাকে ভাসাইয়া দেওয়া তিনি অন্যতম ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই কর্মযোগীর নেতৃত্বের প্রয়োজন যখন দেশে সত্যই প্রয়োজন ছিল তখনই মহাকাল তাঁহাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল।

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের পুনর্বিন্যাস এবং পরিবর্দ্ধন ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের বিরাট্ কর্মশক্তির অমোঘ সাক্ষ্য। তিনি বাংলার তথা ভারতের প্রত্যেক সংস্কৃত-সেবী এবং সংস্কৃতজীবী পণ্ডিতকে পরম আত্মীয়জ্ঞানে সর্বপ্রকার সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেন। যতীন্দ্র-বিমলের তিরোধানে এই বিরাট্ পণ্ডিত সমাজ সত্য সত্যই আজ একজন অকৃত্রিম সুহৃদকে হারাইল।

ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের জীবন-কথা পর্যালোচনা করিতে গেলে তাঁহার পরমা বিদুষী সহধর্মিণীকে বাদ দেওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে ডক্টর রমা চৌধুরী তাঁহার স্বামীর সর্ববিধ কর্মপ্রচেষ্টায় প্রেরণার প্রধান উৎস ছিলেন। তিনি বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা বিদ্যায়তনের অধ্যক্ষার গুরুদায়িত্ব পালন করিয়াও নিরন্তর তাঁহার স্বামীর দৈনন্দিন কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করিয়াছেন। ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের সংস্কৃত নাট্যরচনায়ও তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। পরলোকগত নেতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই দম্পতির মিলনবাসরে মন্তব্য করিয়াছিলেন—This is a union between Sanskrit and Philosophy." সত্যসত্যই সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী এই দুইটি পণ্ডিতের মিলন সমাজকে বিশেষ অবদানে সমৃদ্ধ করিয়াছে। Dr. and Mrs. Rhys Davias, যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীরূপে এই সুধী দম্পতির যে উপমা কেহ কেহ দিয়াছেন তাতে কোন অত্যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। উভয়েই সরকারী সংস্থার প্রধান—আর দশজনের মত নির্ঝঞ্ঝাট আরামের জীবন যাপন করিয়া তাঁহারা সুখে থাকিতে পারিতেন। কিন্তু সেই পার্থিব সুখ উপেক্ষা করিয়া এই আদর্শ দম্পতি 'সর্বজন হিতায়' নিজেদের বিলাইয়া দিয়াছেন। ইহার জন্য ডক্টর রমা চৌধুরী অধিকতর কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁহার নিত্য সাহচর্য, প্রেরণা, গ্রন্থ-রচনায় পারস্পরিক অংশগ্রহণ ব্যতীত ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের পক্ষে স্বল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে এরূপ ব্যাপক কর্মসাধন সম্ভব হইত না। উভয়ের যুক্ত প্রচেষ্টায় প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে তাঁহাদের পরম আদরের গবেষণাগার 'প্রাচ্যবাণী' প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের সর্বত্র আজ প্রাচ্যবাণী সুপরিচিত। বিভিন্ন স্থানে প্রাচ্যবাণীর শাখা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রাচ্যবাণীর কর্মীবৃন্দ ও শিল্পীরা ডক্টর যতীন্দ্রবিমল বিরচিত বহু সংস্কৃত ও বাংলা গান তাঁদের সুমধুর কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার নিতান্ত সরল ও সুললিত ভাষায় রচিত অপূর্ব নাট্যগ্রন্থগুলি তাঁহাদের অনবদ্য অভিনয়ের মাধ্যমে সর্বত্র জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন। এই সমস্ত সঙ্গীত ও ও নাট্যানুষ্ঠানে প্রযোজনার গুরুদায়িত্বভার বরাবরই ডক্টর রমা চৌধুরী স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে সত্যসত্যই আক্ষরিক অর্থে মহান্ স্বামী যতীন্দ্রবিমলের সহধর্মিণী বলা যায়।

বাংলা দেশে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের সর্বাপেক্ষা প্রিয় লক্ষ্যগুলির অন্যতম ছিল। এই মহান্ লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য তিনি বহু বৎসর যাবৎ অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছেন। ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সংস্কৃত কমিশনের অন্যতম সদস্য হিসাবে তিনি একদিকে যেমন ভারতের অন্যান্য রাজ্যে সংস্কৃত শিক্ষাপ্রসারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই বাংলা দেশে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত করিবার জন্য সর্বতোভাবে নিরন্তর প্রয়াসী ছিলেন।

বাহিরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচণ্ড কাজের চাপ সত্ত্বেও ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের সৃজনীশক্তি মোটেই হ্রাস পায় নাই। সারাদিন দায়িত্বপূর্ণ এত কাজ করিবার পরও তিনি অধিক রাত্রি পর্যন্ত গ্রন্থ রচনার কাজে ব্যাপৃত থাকিতেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই মহান্ কর্মযোগী যদি তাঁহার দৈনন্দিন প্রচণ্ড খাটুনির বহর কমাইয়া চলিতেন, হয়ত এত শীঘ্র এই অমূল্যজীবন নিঃশেষ হইয়া যাইত না। যতীন্দ্রবিমলের তিরোধানে সংস্কৃত ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িল। তাঁহার এই অভাব পরিপূরণ করা অসম্ভব। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের পরম সাধের স্বপ্ন বাংলা দেশে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন যখন বাস্তব রূপ গ্রহণ করিতে চলিয়াছে তখনই এই উৎসর্গীকৃত প্রাণ মহান্ কর্মনায়ককে আমরা হারাইলাম।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের ইংরেজী অনুবাদের তালিকা

শ্রীসুধাময়ী মুখোপাধ্যায়

(১৯১৪) গীতিমাল্য—র র ১১

আমি হাল ছাড়লে তবে—Gitanjali 99—When I give up the helm (16)

* আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ—Gitanjali 41—This is my delight thus to wait (20)

* কোলাহল ত বারণ হল, এবার কথা—Gitanjali 89—No more noisy loud words (12)

* রাত্রি এসে যেথায় মেশে—Crossing 29—I have met thee where the night (275)

* আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি—Crossing 41—The gift of the earliest flower

ভাগ্যে আমি পথ হারালেম কাজের পথে—Lover's Gift 48—I travelled the old road every day (262)

এই যে এরা আঙিনাতে এসেছে জুটি—Fugitive III 4—In the evening after they had brought

আমি আমায় করব বড় এই তো—Gitanjali 71—That I should make much (33)

* এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার—Gitanjali 21—I must launch out my boat (11)

অনেক কালের যাত্রা আমার—Gitanjali 12—The time that my journey takes (7)

* যেদিন ফুটল কমল কিছুই—Gitanjali 20—On the day the lotus bloomed (10)

এখনো ঘোর ভাঙে না যে তোর—Gitanjali 55—Langour is upon your heart (28)

* তুমি একটু কেবল বসতে দিও কাছে—Gitanjali 5—I ask for a moment's indulgence (4)

* কেগো অন্তরতর সে—Gitanjali 72—He it is, the innermost one (34)

* আমারে তুমি অশেষ করেছো—Gitanjali 1—Thou hast made me endless (3)

* এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে—Gitanjali 94—At the time of my parting (44)

* হারমানা হার পরাব তোমার গলে—Gitanjali 98—I will deck thee with trophies (45)

* পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই—Gitanjali 93—I have got my leave (43)

তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া—Gitanjali 68—The sunbeam came upon this earth (32)

* সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি—Gitanjali 53—Beautiful is thy wristlet (26)

এই দুয়ারটি খোলা—Fugitive III 35—In the evening, when the dew glistened

কে নিবি গো কিনে আমায়—Crescent Moon—The Last Bargain (86)

* অসীম ধন তো আছে তোমার—Poems 52—Infinite is your wealth

* এ মণিহার আমায় নাহি সাজে—Fruit Gathering 11—It decks me only to mock me (180)

* জীবন যখন ছিল ফুলের মত—Fruit Gathering 2—My life, when young, was like a flower (177)

ভেলার মত বুকে টানি—Fruit Gathering 23—The poet's mind floats and dances ?

* জানি গো দিন যাবে—Fruit Gathering 51—I know that at the dimend (202)

Presidency Coll. Magazine Sept. 1919—'I know one day'—By K. C. Sen

Modern Review, Dec. 1929—'I know my days will end'— By Indira Debi

* নয় এ মধুর খেলা—Fruit Gathering 38—This is no mere dallying of love (195)

* তোমারি নাম বলব নানা ছলে—Fruit Gathering 82—I will utter your name (216)

* ভোরের বেলায় কখন এসে—Fruit Gathering 38- I did not know that I had thy touch

* প্রাণের খুশির তুফান উঠেছে Fruit Gathering 76—Timidly I cowered in the shadow (214)

* যদি প্রেম দিলে না প্রাণে—Crossing 30—If love be denied of me, then why (275)

* আমার সকল কাঁটা ধন্য করে - Poems 53- I know that the flower

Sheaves- Fulfilment—Filling all my thorns with gratitude

* লুকিয়ে আস আঁধার রাতে Sheaves—The Friend Secretly thou comest in the dark night

* আমার কণ্ঠ তারে ডাকে - Sheaves—Truants—When my voice calls him

* প্রভু তোমার বীণা যেমনি বাজে —Sheaves—New Worlds—Lord, as thy harp sounds

* তোমায় আমায় মিলন হবে বলে—Sheaves—The Bridegroom—Because you and I shall meet

* যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা—Presidency Coll. Magazine March 1925—'The Sanctuary of sorrow'

—By Saroj Kumar Das

* বেসুর বাজেরে—Sheaves—The Right Note—No where else but in thy own self

* রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি —Crossing 64—While I walk to my King's House

* এত আলো জ্বালিয়েছ --Fruit Gathering 70—When you hold your lamp (211)

* যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল—Crossing 21—"On that night, when the storm broke"

Presidency Coll. Magazine Sept. 1917—"The Night you came"

—By Profulla Kumar Das

* দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—Fruit Gathering 67—You always stand alone beyond

* জানি নাই গো সাধন—Fruit Gathering 16—They knew the way and went (183)

মিথ্যা আমি কী সন্ধানে—Sheaves—Needless Quest—Whom shall I ask

ওদের কথায় ধাঁধাঁ লাগে—Fruit Gathering 15—Your speech is simple, my master (182)

হাওয়া লাগে গানের পালে—Crossing 3—The wind is up, I set my sail

* বল তো এই বারের মত—Fruit Gathering 1—Bid me and I shall gather (177)

* তুমি যে সুরের আগুন—Poems 54—My heart is on fire

* ওদের সাথে মেলাও—Sheaves—The Message—Let me mingle with them

সকাল সাঁঝে ধায় যে ওরা—Sheaves—His Road—Morn and eve they hurry on

* আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে—Fruit Gathering 69—You were in the centre of my heart (211)

* তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে—Fruit Gathering 72—The joy ran from all the world (42)

* এই তো তোমার আলোক ধেনু—Sheaves—The Kine of Light—Here are thy kine of light

* এরে ভিখারী সাজায়ে কি রঙ্গ তুমি করিলে—Fruit Gathering—A smile of mirth spread over (189)

ঋষি লিও টলস্টয়ের প্রথম জীবন

শ্রীকমলা দাশগুপ্ত

ককেশাস

ককেশাস্ গিয়ে লিও টলষ্টয়ের জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সুরু হ'ল। ভাই নিকোলাস-এর সঙ্গে তিনি নানা স্থানে বেড়াতে যেতেন। এখানকার পর্ব্বতশ্রেণী তাঁকে মুগ্ধ করে। তাঁর "কসাক্" পুস্তকে এর চমৎকার বর্ণনা রয়েছে। তিনি আন্টি টাটিয়ানাকে এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা দিয়ে লিখেছিলেন, বিরাট্ পর্ব্বতমালা যেন একটার উপর আরেকটা উঠে গেছে, পাহাড়ের মাঝে মাঝে গরম জলের স্রোত নেমে আসছে, জল এত গরম যে ভাপ উঠে, তিন মিনিটেই ডিম সেদ্ধ হয়ে যায়। তাতার রমণীগণ অবিরাম আসে পা দিয়ে কাপড় কাচতে। তাদের দারিদ্র্য এবং বাচ্য পোশাক সত্ত্বেও তারা রমণীয়। পর্ব্বতের উপর থেকে দেখলে এই সৌন্দর্য্য আরও মুগ্ধকর। লিও টলষ্টয়ের পায়ে একটা ব্যথা ছিল। এখানকার লৌহকণাময় গরম জলে স্নান করার ফলে তাঁর ব্যথা একেবারে সেরে যায়। নিকোলাসের একটা কুকুর নাকি এই গরম জলে পড়ে গিয়ে ঝল্‌সে মারা যায়।

এই সময় টলষ্টয়ের মনোভাবে একটা পরিবর্ত্তন দেখা যায়। তাঁর প্রার্থনার কথা তিনি তাঁর ডায়েরীতে লেখেন ১১ই জুন, ১৮৫১। এটি অন্যদিনের মত সাধারণ প্রার্থনা ছিল না। সর্ব্বোত্তম এবং কল্যাণময় কিছু তিনি পেতে চেয়েছিলেন। বিশ্বসত্ত্বার মধ্যে তিনি বিলীন হ'তে চেয়েছিলেন। (I wished to merge into the Universal Being)-নিজের দোষের জন্য ক্ষমা চাইলেন, আবার তাঁর মনে হ'ল ঈশ্বর ত ক্ষমা করেই ব'সে আছেন। তিনি অনুভব করতে লাগলেন প্রার্থনা করবার মত কিছুই ত তাঁর নেই। তাঁর মনে হ'ল প্রার্থনা করতে তিনি জানেন না, পারেন না। ভয় কোথায় চ'লে গেল। বিশ্বাস, আশা এবং ভালবাসা সব এসে একত্র মিলে গেল, এ তিনের কোন পার্থক্য রইল না সেই মুহূর্ত্তে। এ-অনুভূতি ছিল তাঁর জগদীশ্বরের প্রতি পবিত্র নিষ্কলুষ প্রেম, যা-কিছু মন্দ তা দূর হয়ে গিয়েছিল, শুধু যা-কিছু ভাল তাই রয়ে গেল। পরমেশ্বর তাঁকে গ্রহণ করুন এই প্রার্থনাই শুধু তিনি করছিলেন।......আবার কিন্তু জগতের মন্দ চিন্তা তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিল। তিনি প্রাণপণে তা ছাড়াতে চেষ্টা করেছেন......তারপরে ঘুম এসে তাঁকে বিশ্রাম দেয়।

এখানে এসে তিনি 'শৈশব' পুস্তক পুনরায় লিখতে থাকেন—মস্কোতেই তিনি লেখা শুরু করেছিলেন। ওদিকে টিফ্লিস বেড়াতে গিয়ে সেনাবিভাগে চাকরীর জন্য পরীক্ষাও দিলেন।

১৮৫২ সালের জানুয়ারী মাসে আন্টি টাটিয়ানাকে তিনি লেখেন, আন্টির চিঠি পেলেই তিনি এমন কাঁদেন ঠিক যেন সেই শিশুকালের 'কাঁদুনে ছেলে লিও'ই রয়ে গেছেন। টাটিয়ানা লিখেছেন, তাঁর প্রিয়জনেরা যেখানে চ'লে গেছেন সেখানে যাবার পালা এবার টাটিয়ানার। সেখানে যেতেই তিনি প্রার্থনা করছেন, প্রার্থনা করছেন তাঁর জীবনের সীমারেখা টেনে দিতে, আর তিনি একা বইতে পারছেন না এ জীবনভার। টলষ্টয় আন্টির এই প্রার্থনা সহ্য করতে পারেন নি। তিনি উত্তরে লিখছেন, আন্টি একথা ব'লে ভগবানের কাছে এবং টলষ্টয়ের কাছে অপরাধ করছেন, কারণ তাঁরা তাঁকে ভালবাসেন। আন্টির মৃত্যু এবং নিকোলাসের মৃত্যু টলষ্টয়ের পক্ষে হবে চরম দুর্ভাগ্যের। টলষ্টয় লিখেছেন, তোমার মৃত্যু হ'লে আমার কি হবে? তখন আমি কাকে খুশী করবার জন্য ভাল হ'তে, ভাল গুণ অর্জ্জন করতে এবং যশস্বী হ'তে চেষ্টা করব? যখন আমি নিজে সুখী হবার কথা ভাবি, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তুমি সে সুখের অংশ গ্রহণ করছ সে-কথাও জড়িয়ে থাকে। যখন আমি কোন ভাল কাজ ক'রে তৃপ্তি পাই তক্ষুনি সে-সঙ্গে জানি তুমিও আমার সঙ্গে তৃপ্তি পাবে। আমি খারাপ কাজ করলে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি মনে

ক'রে ভয় পাই। তোমার ভালবাসাই আমার সব।— হয়ত তুমি ভাবছ, আমি বাড়িয়ে লিখছি, তবু আমি এ চিঠি লিখতে গিয়ে চোখের জলে ভাসছি।

টলষ্টয় সেনাবিভাগে যোগদান করেন। কয়েকটা ছোট ছোট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনি ১৮৫২ সালে। তিনি যে সিভিল সার্ভিস ছেড়ে দিয়েছেন সেই সার্টিফিকেট তিনি বাড়ী থেকে আনেন নি, কারণ সেনাবাহিনীতে যোগদানের পরিকল্পনা তখন তাঁর ছিলই না। কিন্তু এখন এই সার্টিফিকেট সঙ্গে না থাকায় যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশের জন্য তাঁর প্রাপ্য 'সেন্ট জর্জ্জ ক্রশ' পুরস্কারটি তিনি পেলেন না। ক্রশটি না পাওয়াতে খুব দুঃখ করে আণ্টি টাটিয়ানাকে একটি চিঠি লেখেন।

১৮৫২-৫৩ সালে আবার একটি ক্রশ পাবার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু বেশী রাত পর্য্যন্ত দাবা খেলার জন্য সকালে উঠতে দেরি হয়ে যায়। তাঁর বিভাগের সেনাপতি তাঁকে পরদিন প্রাতে অনুপস্থিত দেখে গ্রেপ্তারের আদেশ দেন এবং পুরস্কার পাবার যোগ্য লোকেদের তালিকা থেকে তাঁর নামটি কেটে দেন। গ্রেপ্তার অবস্থায় যখন তিনি পুরস্কার বিতরণের সময়কার ব্যাণ্ডের আওয়াজ শুনছিলেন তখন তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখ পেয়েছিলেন।

যুদ্ধযাত্রা না থাকলে টলষ্টয়কে সাধারণতঃ কসাকদের গ্রামে থাকতে হ'ত। তিনি 'কসাক' নামে যে বইখানি লিখেছেন তার মধ্যে এখানকার জীবনের অবিকল বর্ণনা দেওয়া আছে। রাশিয়ার জারদের অত্যাচার থেকে পালিয়ে অনেক রাশিয়ান এসে এখানকার টেরেক নদীর ধারে বসবাস করত মুসলমানদের মধ্যে। তারা রুশ ভাষা বলত, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার নিজেদের সঙ্গে মিশিয়ে গ্রহণ করেছিল। তারা স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল, অলস ছিল। তারা লুটপাট করত শিকার করত, এবং যুদ্ধবিগ্রহ করত। স্থানীয় আধা-অসভ্য অধিবাসীদের চেয়ে নিজেদের উঁচুদরের মনে করত। কাজকর্ম্ম মেয়েরা ক'রে দিত অথবা ভাড়া-করা তাতার লোকেরা ক'রে দিত। পুরুষের অপেক্ষা নারী বেশি স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের অধিকারী ছিল। মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল, বিশেষতঃ বিবাহের আগে।

এখানে এসে টলষ্টয়ের খুব ভাল লাগল। এদের সরল জীবন, সরল প্রকৃতি, শিকারের নিপুণতা, কৃত্রিমতা ও দুর্ব্বলতার প্রতি ঘৃণা, নৈতিক দ্বন্দ্বের থেকে মুক্তি সবই তাঁকে আকর্ষণ করত। একটি মেয়েকে তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু রাশিয়ার সেনাবাহিনীর এই বিশেষ লোকটিকে কসাক মেয়েটি কোন গ্রাহ্যই করল না, কারণ রাশিয়ান যুবকটি শিকারে এবং যুদ্ধে কসাক জাতির চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল। রাশিয়ান যুবকটি কসাক যুবকের মত গরু-ভেড়া চুরি করতে, মদ খেতে, গান গাইতে, খুন করতে তেমন সুদক্ষ ছিল না ব'লে রাশিয়ান টলষ্টয় এখানে এসে প্রেম নিবেদনে পরাজিত হলেন।

'কসাক' বইতে আছে, লুকাস্কা নামে একটি কসাক ছিল। সে বীর তাতারকে রাতে মেরে ফেলে। লোকেরা তাকে খুব বাহবা দিল, নিজেও নিজেকে বড় ব'লে ভাবল। তারপরই চিন্তা এসে ঘনিয়ে ধরল— কি অদ্ভুত চিন্তা! মানুষকে মানুষ খুন ক'রে এতখানি তৃপ্তি কি ক'রে পায়, যেন চমৎকার একটা কাজ করেছে! এতে যে আনন্দের কিছুই নেই সেকথা সে কেন বোঝে না? কেন সে বোঝে না, অন্যকে হত্যা করায় আনন্দ নেই, আনন্দ আছে আত্মত্যাগে।

১৮৫২ সালের জুলাই মাসে 'শৈশব' (Childhood) লিখে শেষ ক'রে তিনি ছাপতে দেন। বই প্রকাশিত হবার পর তিনি খ্যাতি পেতে লাগলেন। তাঁর নিজস্ব শৈলী এর মধ্যে ফুটে ওঠে। টলষ্টয় নানা পত্রিকাতে নিজের নামে ও বেনামে লেখা প্রকাশ করতে লাগলেন। লেখাগুলি এত সুন্দর হ'ত যে, বিখ্যাত লেখক টুর্গেনিভ, ডস্টভস্কি ও অন্যান্য সাহিত্যিকগণ টলষ্টয়ের প্রতিভার উন্মেষ দেখে প্রশংসা করতে থাকেন। সরলতা এবং নৈতিক স্পর্শ ছিল লেখার প্রধান আকর্ষণ।

তাঁর সৈন্য-বিভাগীয় জীবন তাঁকে তৃপ্তি দিচ্ছিল না। তিনি সেনাবিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করবার কথা ভাবতে লাগলেন।

আত্মা অবিনশ্বর কি না সে-সম্বন্ধে তাঁর মনে দ্বন্দ্ব চলছিল। রুশো-লিখিত 'এমিলি' বইখানি পড়ার পর

১৮৫২ সালের ২৯শে জুন তিনি ডায়েরীতে লেখেন, তিনি বিবেককে সর্ব্বপ্রধান স্থান দেন। যার জীবনের লক্ষ্য নিজের সুখ,সে খারাপ; যার লক্ষ্য অন্যের প্রশংসা পাওয়া সে দুর্ব্বল; যার লক্ষ্য অপরের সুখ, সে ধার্ম্মিক; যার জীবনের লক্ষ্য ভগবান, সে মহান···। অন্যের পক্ষে যা খারাপ তা আমার পক্ষেও খারাপ, যা অন্যের পক্ষে ভাল তাই আমারও ভাল। ১৮ই জুলাই ডায়েরীতে লিখেছেন, মন্দ কাজ করার প্রলোভন থেকে তাঁকে যেন ভগবান্ মুক্তি দেন, যেন ভাল কাজ তিনি করতে পারেন।

'দি রেইড' (The Raid) নাম দিয়ে যুদ্ধের একটি স্বেচ্ছাসেবকের গল্প ১৮৫৩ সালে তিনি প্রকাশ করেন। এক রাতে তাতারদের উপর আক্রমণের সময় ককেশাস এর চমৎকার প্রকৃতির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তিনি বলে যাচ্ছেন—প্রকৃতি সুন্দর, তেজোময়, শান্তিকামী। এমন সময় এই সুন্দর পৃথিবীতে অসংখ্য তারাভরা আকাশের তলায় মানুষের থাকবার স্থান নেই। এ কেমন ক'রে হয়? এমন মুগ্ধকরা প্রকৃতির মধ্যে মানুষের মনে শত্রুতা, প্রতিহিংসা, ধ্বংস-করার প্রবৃত্তি কেমন ক'রে জাগে? যে-প্রকৃতি সুন্দর এবং মঙ্গলময় তার সংস্পর্শে এসে মানুষের ভিতরের গ্লানি লুপ্ত হয়ে যাক।

১৮৫৩ সালে 'শামিল'-এর বিরুদ্ধে তাঁকে যুদ্ধের অভিযান করতে হয়। 'গ্রোজনী ফোর্ট'-এ তাঁর অতিরিক্ত অমিতাচার প্রকাশ পায়। তিনি লিখেছেন—'নিজেকে চিনতে পারছি না, তাস খেলছি, খেলব।' তাঁর মনে হ'ত সেনাবিভাগের কাজে এসে তিনি মঙ্গল-পথ থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছেন। মুক্তি পাবার জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। সেই বছরেরই শেষের দিকে সংযমের পথে তিনি শান্ত হলেন।

ভাইকে লিখলেন, সৈন্যবিভাগ থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি দরখাস্ত করেছেন এবং ছয় সপ্তাহের মধ্যেই হয়ত তিনি স্বাধীনভাবে বাড়ী ফিরবেন। কিন্তু হায়, সৈন্য বিভাগে ঢোকা যত কঠিন ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি কঠিন ছিল সেখান থেকে বেরিয়ে আসা। ছয় সপ্তাহ দূরের কথা, কয়েক বছর লেগেছিল তাঁর এখান থেকে মুক্ত পেতে।

একটা দুঃসাহসিক কাজ করতে গিয়ে তাঁর জীবন বিপন্ন হয়—কাহিনীটি নিয়ে গল্প লিখলেন 'ককেশাসে বন্দী।' যুদ্ধযাত্রার সময় দলচ্যুত হয়ে একা কোথাও যাওয়া নিষেধ ছিল। পদাতিক সৈন্য এত ধীরে অগ্রসর হ'ত যে, অশ্বারোহী সৈন্যরা অধৈর্য্য হয়ে উঠত—তাতার সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হবার বিপদও তারা অগ্রাহ্য করত। এইভাবে একদিন পাঁচজন অশ্বারোহী সৈন্য আইন ভঙ্গ করে বেরিয়ে পড়লেন। তার মধ্যে ছিলেন টলষ্টয় ও তাঁর বন্ধু সাডো। তাঁরা দুই বন্ধু পাহাড়ের উপরে উঠলেন শত্রু আসছে কি না দেখতে। বাকী তিনজন নীচে দিয়ে চলতে লাগলেন। পাহাড়ে উঠতে-না-উঠতেই তাঁরা দেখলেন, ত্রিশজন অশ্বারোহী তাতার ছুটে আসছে। আর সময় নেই দেখে নীচের বন্ধুদের চীৎকার করে সাবধান করে নিজেরা দু'জন পাহাড় বেয়ে গ্রোজনী ফোর্ট-এর দিকে ছুটলেন। নীচের বন্ধু তিনজন অতটা গ্রাহ্য না করাতে তাতার সৈন্যের কবলে পড়ে গেলেন এবং দু'জন গুরুতর ভাবে আহত হলেন। পরে অন্যরা টের পেয়ে এসে শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়ে তাঁদের রক্ষা করেন। টলষ্টয় এবং সাডোর পশ্চাতে সাতজন শত্রুসৈন্য তাড়া করে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। ইচ্ছা করলে টলষ্টয় তাঁর ভাল ঘোড়ায় আরও দ্রুত পালাতে পারতেন কিন্তু সাডোকে ফেলে তিনি দ্রুত গেলেন না। মনে হ'ল দু'জনেরই শেষ-মুহূর্ত্ত আসন্ন। অবশেষে গ্রোজনীর একজন সান্ত্রী তাঁদের অবস্থা দেখে তাঁদের রক্ষা করতে কয়েকজন কসাক সৈন্য পাঠিয়ে দেন। কসাকদের দেখে তাতাররা পালিয়ে যায়। টলষ্টয়রা দুই বন্ধু অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যান।

১৮৫৩ সালের জুলাই মাসে টলষ্টয় ভাইকে লিখলেন, টার্কির সঙ্গে যুদ্ধ লেগেছে, তাই তাঁর আশঙ্কা, তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হবে কি না। বাড়ী যাবার জন্য এবং শান্ত জীবন-যাপন করবার জন্য তিনি তখন উৎকণ্ঠিত।

বাড়ী যাওয়া তাঁর সত্যই হ'ল না? তাঁকে তখন সেনাবিভাগে থাকতেই হবে। তাই তিনি টার্কির

যুদ্ধেই যেতে চেয়ে দরখাস্ত করেন এবং বাড়ী থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চেয়ে পাঠান।

আড়াই বছরেরও বেশি সময় টলষ্টয় ককেশাস ছিলেন। শেষের বছরে লিখেছিলেন তিনি 'বাল্যকাল' (Boyhood) এবং 'বিলিয়ার্ড মেকারের স্মৃতি' (Reminiscences of a Billiard Maker), 'এক জমিদারের প্রভাত' (A Landlord's Morning), এবং 'কাঠ্‌ চিরা' (The Wood-felling) । তাঁর নিজের উপরের বিরক্তি ফুটে উঠেছিল বিশেষ করে তাঁর 'বিলিয়ার্ড মেকারের স্মৃতি' পুস্তকে।

সেনাবিভাগের জীবন তাঁর নৈতিক জীবনের পক্ষে ভাল ছিল না। সেজন্য তাঁর ডায়েরীর পৃষ্ঠাগুলিতে এখানে তাঁর পতন ও মুক্তি পাবার সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত দেখতে পাওয়া যায়। বাজিখেলা, ঋণ করা, মদ খাওয়া, নারীসম্ভোগ সবই তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিল। পরেই আবার প্রবল প্রচেষ্টায় তাকে তিনি ছাড়িয়ে উঠেছেন। মদ ও স্ত্রীলোক থেকে তিনি সংযত হ'তে চেষ্টা করতে লাগলেন। বার বারই তাঁর পতন হয়েছে বার বারই তিনি মর্ম্মবেদনায় ও অনুশোচনায় দগ্ধ হ আবার কাটিয়ে উঠেছেন।

১৮৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে অবশেষে তাঁর ব প্রতীক্ষিত সাময়িক ছুটির অনুমতি এল। যশনা ফিরে চললেন তিনি। রাস্তায় এল ভীষণ ঝড়। ত নিয়ে লিখেছিলেন 'বরফের ঝড়' (The Sno Storm)। যশনায়া পৌঁছে বড় ক্লান্ত ও অসুস্থ বো করেন তিনি। নিজেকে তার বেখাপ্পা, পুরাতন যুগে লোক এবং বয়স্ক ব'লে মনে হ'তে লাগল।

ঐ সালেরই ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি মিলিটা বিভাগে তাঁর প্রমোশনের সংবাদ পান। রুশো-টার্কি যুদ্ধ যখন পূর্ণ উদ্যমে সুরু হয় তখন টলষ্টয়ের পূর্ব্ব দরখা অনুযায়ী তাঁকে ডেনিউব-এর সেনাবাহিনীতে যোগদ করতে আদেশ দেওয়া হয়। তিনি সেখানে ফি গেলেন।

১

ভারতের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র

পলাশীর যুদ্ধের ঠিক সাত বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরীতে ভারতের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়। ইতিপূর্ব্বে মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও আর এদেশে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। James Augustins Hicky নামক এক ইংরেজ ইহা প্রকাশিত করেন।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ২৯শে তারিখে শনিবারে হিকি তাঁহার কাগজ বাহির করে। উহার নাম ছিল 'The Bengal Gazette', অথবা সম্পাদকের নামে জনসাধারণে প্রচলিত ছিল Hicky's Gazette বা Journal. কাগজের গোড়াতেই সম্পাদক স্বহস্তাক্ষরে ইহার উদ্দেশ্য ঘোষণা করিয়া লিখিয়াছিল, A weekly political and commercial paper open to all parties but influenced by none.

চশমার ইতিহাস

চশমা কবে, কি করিয়া আবিষ্কৃত হইল সে-সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্য হইতে সত্যকে বাছিয়া লওয়া, নিতান্ত সহজ ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। চীনেম্যানরাই সর্ব্বপ্রথমে চশমার ব্যবহার করিতে শিখে, এইরূপ বিশ্বাস লোকের মনে অনেকদিন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতেছিল। কিন্তু কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক লাথ সে বিশ্বাস একবারে ভাঙিয়া দিয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে চশমার সৃষ্টি সর্ব্বপ্রথমে রোম নগরে হইয়াছিল। তাঁহারা যে-যুক্তির বলে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, আমাদের কাছে তাহা খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ইতিহাস পাঠে জানা যায় বটে যে, কিছু দেখিতে হইলেই সম্রাট নীরো তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ একখানা পান্না পাথর ধারণ করিতেন। ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখিবার জন্যই নীরো এইরূপ পাথর ব্যবহার করিতেন। নীরো যে খাটো-দৃষ্টি (শর্ট সাইটেড্) ছিলেন ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি একজন দক্ষ রথী ছিলেন। যে, ব্যক্তি দূরের জিনিস ভাল দেখিতে পায় না, তাহার পক্ষে একজন যশস্বী রথী হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়। আমাদের মনে হয়, নীরো তীব্র আলোক সহ্য করিতে পারিতেন না, তীব্র আলোকে কিছু দেখিতে হইলে, তাঁহার চোখে জল দেখা দিত—সেই কারণেই সম্ভবতঃ তিনি সবুজ পাথর ব্যবহার করিতেন। নীরোর সময়ে লোকে যে চশমার ব্যবহার জানিত ইতিহাসে তাহার অন্য কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না।

অনেকে আবার রজার্ বেকন্‌কে চশমার আবিষ্কারক বলিয়া গৌরবান্বিত করিতে চেষ্টা করেন। রজার্ বেকন্ আলোক ও দৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে চশমারও আবিষ্কারক বলিতে হইবে, ইহার কি অর্থ আছে। Glass Sphere বা কাচের গোলক যে বর্দ্ধিতায়তন দেখাইবার (ম্যাগ্‌নিফাইং) শক্তি রাখে। রজার বেকনের পূর্ব্বেও লোকে তাহা না জানিত এমন নহে।

আমাদের মনে হয়, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে পৃথিবীর নানা দেশে একই সময়ে চশমার উদ্ভব হইয়া থাকিবে। এসময়ে ফ্লোরেন্স নগরে এক ব্যক্তির সমাধিস্তম্ভে নিম্নের কথা কয়টি লিখিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল—"এখানে Salvino Armeti নিদ্রা যাইতেছেন, ইনিই সর্ব্বপ্রথমে চশমার আবিষ্কার করেন। ঈশ্বর ইঁহার পাপ ত্রুটি প্রভৃতি মার্জ্জনা করুন। খৃঃ অব্দ ১৩১৭।"

গাঁজা নগরে ১২৯৯ খৃঃ অব্দে লিখিত একখণ্ড কাগজ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে লেখক বলিতেছেন, নূতন আবিষ্কৃত চশমা ব্যবহার করিয়া তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত শুধু 'চালশে' দোষ নিবারণ করিবার জন্যই চশমার ব্যবহার হইত। ন্যুব্জ কাচ (Concave glass), যাহার ব্যবহারে দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়—তখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। র‍্যাফেল্ দশম পোপ লিয়োর একখানি ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাহাতেই আমাদের সর্ব্বপ্রথমে ন্যুব্জপৃষ্ঠ কাচের সহিত পরিচয় হয়।

প্রথম প্রথম কাচের চশমাই ব্যবহৃত হইত, পাথরের চশমার বড় একটা প্রচলন ছিল না। ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত Murano নামক স্থানেই একমাত্র চশমার কারখানা থাকিতে দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কনিগস্‌বার্গ শহরে এম্বার নামক পদার্থ হইতে চশমা প্রস্তুত হইতে থাকে।

গাছের স্বকীয় আঘাত চিকিৎসা

জীব যত নিম্নস্তরের হয় তাহার ক্ষত আরোগ্য করিয়া তুলিবার শক্তি তত বেশী থাকে আতরল এমিবার গায়ের কাটা জলের উপর দাগ কাটার মতন যখনই তখনই জুড়িয়া যায়। কাঁকড়ার দাঁড়া ভাঙিয়া দিলে তাহার অসুবিধা হয় অল্পদিনের জন্য, কারণ শীঘ্রই সে আর এক জোড়া নূতন দাঁড়া গজাইয়া তোলে। কিন্তু মানুষের হাত কাটা পড়িলে সে জীবন-ভোর নুলোই থাকিয়া যায়।

গাছের আঘাত সারাইয়া তুলিবার অসাধারণ শক্তি আছে। এমন কি, অনেক সময় গাছের গায়ে ক্ষত হইলে তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টির ও সুপ্ত অঙ্গের স্ফূর্ত্তির সাহায্য হয়। গাছের মধ্যে কতকগুলি সুপ্ত মুকুল থাকে; গাছ সুস্থ অনাহত থাকিলে তাহারা কখনই জাগে না; কিন্তু গাছের একটি ডাল কাটিয়া তাহার একাঙ্গ বিকল করিয়া তাহার বৃদ্ধিতে বাধা দিলে সুপ্ত মুকুলগুলি অমনি জাগ্রত হইয়া নূতন কচি পাতা আর ফেকড়ি ডালের আকারে বাহির হইয়া পড়ে, এবং গাছ যে-অঙ্গ হারাইয়াছিল তাহার সেই ক্ষতি সম্পূর্ণ আপনাদের উৎসর্গ

করিয়া দেয়। গাছের গায়ের ক্ষত যদি আংশিক ও উপর-উপর হয় তবে কতকগুলি কোষ কঠিন কাঠ হইয়া ক্ষত সারাইয়া আনে। কোন বাহিরের বস্তু গাছের অঙ্গে বিদ্ধ হইয়া গেলে গাছ যদি তাহা ত্যাগ করিতে না পারে তবে তাহারই চারিদিকে ঢাকা গজাইয়া ক্ষতমুখ রুদ্ধ করিয়া দেয়। এইরূপে গাছের গায়ে গুলী কি পেরেক বিদ্ধ হইলে তাহা গাছের মধ্যেই থাকিয়া যায়, তাহাকে ঢাকিয়া গাছের কোষ ও ত্বক জন্মে এবং সে স্থানটা একটু উঁচু হইয়া থাকে, বহুকাল পরে গাছ কাটিলে ঐ সব জিনিস পাওয়া যায়। পাছে ক্ষতস্থান হইতে অধিক রক্তস্রাব হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে বা বিষাক্ত পদার্থ বা অপকারক কীটপতঙ্গ ক্ষতমধ্যে প্রবেশ করে এই ভয়ে গাছ চট্‌পট্ একরূপ আঠা দিয়া ক্ষতস্থান ঢাকিয়া দেয়, তারপর সেই ক্ষতমুখ বন্ধ করিতে থাকে— ইহা যেন ডাক্তারের এণ্টিসেপ্‌টিক ব্যাণ্ডেজ। এই আঠার নক্সারের জন্য ক্ষতস্থান প্রথমে হলদে ও পরে তামাটে রং ধরে। ক্ষত গভীর হইলে সেই ক্ষতস্থানে মরা আঁশ ও আবরক আঠা জমিয়া থাকে, তাহার উপরে কাঠ ও ছাল ঢাকা পড়ে, এজন্য সেই জায়গাটা আবের মতন উঁচু হইয়া থাকে ; ইহা কুদৃশ্য হইলেও ইহার দ্বারা গাছের প্রচুর জীবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়

অতিকায় ফল

একটা ফুল, একটা কুমড়া, এক ঝাড় আককে বাড়াইয়া তোলাতে চাষীর নিপুণতা প্রকাশ পায় সত্য, ইহা তাহার অব্যবসায়েরও নিদর্শন। কিন্তু দেশের ধন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইলে মিতব্যয়িতার দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অপরিমিত খরচ করিয়া সুবৃহৎ ফল-ফুল উৎপাদন দ্বারা লোকের বিস্ময়োৎপাদন করাকেও অমিতব্যয়িতা বলা যায়।

যে-গাছে ২০টা বেগুন ফলিতে পারে তাহাতে ২টি মাত্র মুকুল রাখিয়া বাকিগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলে দুইটি বড় বেগুন উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু এই দুইটা বেগুনের ওজন ২০টা বেগুনের ওজন অপেক্ষা নিশ্চয় কম। সুতরাং ২০টার স্থলে বহু আয়াসে ২টা বেগুন ফলাইয়া কি লাভ হইবে? লাভ যে একবারে নাই তাহা নহে। আর্থিক হিসাবে বর্ত্তমানে কোন লাভের আশা না থাকিলেও, বীজ সঞ্চয়ের জন্য বড় ফল উৎপাদন করায় ভবিষ্যতে লাভ আছে। ক্ষেতের মধ্যে তেজস্কর গাছটি বাছিয়া লইয়া তাহার মূল শাখাতে ২ বা ৩টা ফল উৎপাদন করিলে ফলগুলি স্বভাবতই বড় হইবে। ফল বড় করিতে হইলে পটাস-প্রধান সার প্রয়োগ করিয়া গাছটিকে বিশেষ তদ্বিরে রাখিতে হয়। এবম্প্রকার গাছের সুপক্ব ফল হইতে বীজ সংগ্রহ করিলে তাহা হইতে যে চারা হইবে তাহার ফল সাধারণতঃ বড় হইবে। এইরূপে কোন একজাতীয় ফলের উন্নতি বিধান করা সম্ভব। অতএব এস্থলে খরচের আতিশয্যে কুণ্ঠিত না হইয়া বীজের জন্য বৃহৎ ফলই উৎপাদন করাই কর্ত্তব্য।

কোন ক্ষেতে উচ্চ মাত্রায়, ভাল সারমাটি সংযোগ করিয়া, কয়েকটা কুমড়া গাছ জন্মান গেল। গাছটিতে ফুল ধরিতে আরম্ভ হইলে মূল ডগায় ফলোৎপাদনকারী একটা ফুল রাখিয়া বাকি মুকুলগুলি, এমন কি কতক-গুলি প্রশাখা ও কতকগুলি পাতা ছিঁড়িয়া দেওয়া গেল। ফলটা যখন মানুষের হাতের মুঠার মত বড় হইল, তখন কুমড়ার লতার দুইপাশে দুইটা মাটির টবে চিনির জল রাখিয়া নরম সূতার পলিতা পাকাইয়া এক মুখ চিনির জলে পূর্ণ পাত্রে স্থাপন করিতে হয়, অন্য মুখ কুমড়ার বোঁটার উপর ছিদ্র করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। এই উপায়ে কুমড়া পলিতার দ্বারা ক্রমশঃ জল টানিয়া লইবে ও বড় হইতে থাকিবে এবং এক সপ্তাহ মধ্যে উহা অতিকায় হইয়া উঠিবে।

চিনির রস সহজেই করিয়া লওয়া যায়। গরম জলে ক্রমশঃ চিনি মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ ঘন রস প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়। জল আগুনের তাপ হইতে নামাইয়া তবে তাহাতে চিনি সংযোগ করিতে হয়; আলে চিনির রস চাপান থাকিলে রস চিট্ হইয়া যাইবে। চিট্ রস সূতার পলিতা বহিয়া লতার শরীরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যেরূপ রস এখানে ব্যবহারযোগ্য তাহাকে চিনির রস না বলিয়া চিনির জল বলাই ভাল। শীতল অপেক্ষা গরম জলে চিনি শীঘ্র দ্রব হয়। চিনির জলে সর্ব্বদাই গামলা পূর্ণ রাখা কর্ত্তব্য। এ-প্রকারে লাউ কুমড়া তরমুজ শশা অতি-বড় করা যায়। বীজের জন্য ফল বড় করিতে হইলে কৃত্রিম অপেক্ষা স্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করাই ভাল।

কলার রস সর্প-বিষের প্রতিষেধক

সর্প-দংশনে প্রতি বৎসর অসংখ্য লোককে প্রাণ দিতে হয়। ম্যালেরিয়া, প্লেগ, কলেরা প্রভৃতির ন্যায় সর্পও মানবের এক প্রতিবাসী শত্রু। সর্পদষ্ট হইয়া যে-পরিমাণ লোকের মৃত্যু হয়, আরোগ্যলাভের সংখ্যা সে অনুপাতে অনেক কম। পূর্ব্বে এদেশে সর্পাঘাত হইলে তন্ত্র-মন্ত্রেরই ব্যবস্থা ছিল। ইদানীং যে কারণেই হউক, সেসব ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। এখন সর্পবিষ নষ্ট করিবার নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে —নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায়ও উদ্ভাবিত হইতেছে। তাহা অনেকস্থলে সফলও হয়, বিফলও হয়। কিন্তু সর্পের প্রধান ক্রীড়াভূমি পল্লী অঞ্চলে এ-সকলের প্রচলন না থাকায় এদেশে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না।

শ্রীযুক্ত ডড্‌লী নামক একজন ভদ্রলোক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, কলার রস সর্পদংশনের অব্যর্থ ও আশুফলদায়ী মহৌষধ। কয়েকজন ডাক্তারের সম্মুখে এই বিষয়ের পরীক্ষা দেখান হইয়াছিল: সদ্যধৃত এক বিষধর সাপের নিকট একটি বিলাতী কুকুর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কুকুরকে দেখিবামাত্র সাপটা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, কিন্তু তাহাকে কামড়াইতে পারিল না। কুকুর সাপটাকে আক্রমণ করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল। সেই সময় আর একটা দেশী কুকুরকে তথায় ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এইবার সাপটা এই কুকুরটাকে সজোরে বারংবার দংশন করিল। কুকুর যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল, এবং তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া গেল। তখন কুকুরটার মুখে সদ্য-সংগৃহীত কলার রস একটু একটু করিয়া ঢালিয়া দেওয়া হইল। এক পোয়া আন্দাজ রস কুকুরটার পেটে গেলে তাহার ক্রমশঃ চেতনা হইতে লাগিল এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে সে সবল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল। অতঃপর তাহার শরীরে যে বিষের ক্রিয়া বিদ্যমান ছিল সেরূপ কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

আর একবার একটা কাক ধরিয়া উক্ত ভদ্রলোক এই বিষয়ের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতেও এইরূপ আশ্চর্য্যজনক ফললাভ হইয়াছিল।

এই হিতকর আবিষ্কারটি মনুষ্য শরীরেও ফলদায়ী কি না সে বিষয়ের পরীক্ষা হওয়া উচিত।

ছেলেমেয়েরাও টাকার মূল্য বোঝে

সাধারণতন্ত্রী ফেডারেল জার্মানীতে ব্যক্তিগত হিসেবে ব্যাঙ্কগুলিতে যত টাকা জমা আছে তার মধ্যে শতকরা ২৮ ভাগের মালিক হ'ল শিশু ও

কিশোরগণ। ওরাও টাকার মূল্য বোঝে এবং পকেট খরচ বা অর্জিত অর্থ হিসেবে ছেলেমেয়েরা যা পায় তার একটা বড় অংশই সঞ্চয় করে।

১৯ বছর বয়স্ক পিটার, টেলিভিশন মেকানিক হিসেবে মাসিক ৫০০ মার্কেরও বেশী উপার্জন করে। সে তার উপার্জনের একটা অংশ মা-বাবাকে দিয়ে দেয় এবং নিজের বাড়ী তৈরী করার জন্য ব্যাঙ্কের সেভিংস হিসেবে ২০০ মার্ক ক'রে সঞ্চয় করে। নিজের একখানা বাড়ী থাকার যে কি আরাম পিটার তা ওর বাবা-মা'র কাছ থেকে শিখেছে। এর পর যা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে ও নিজের সখের জিনিস কেনে যেমন রেডিও, রেকর্ড-প্লেয়ার, ছোট-খাট একটি লাইব্রেরি ইত্যাদি। প্রত্যেক বছরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া চাই এবং সেই ব্যয় ও নিজেই বহন করে। পিটারের মেয়ে-বন্ধু ইঙ্গের বয়সও ওর সমান ও একটা বিভাগীয় বিপণীতে মাসিক ৩৫০ মার্ক বেতনে কাজ করে। এই বেতনের কিছু অংশ ও মা-বাবাকে দেয়। তবে ইঙ্গেও প্রতি মাসেই ভাবে যে কিছু সঞ্চয় করবে। কিন্তু ব্যাঙ্কে যাওয়ার পথে যখন দোকানগুলিতে অতি আধুনিক ডিজাইনের জুতো, সোয়েটার, জামা বা অন্য কিছু দেখে তখন লোভ সামলাতে না পেরে কিছু কিনে ফেলে এবং মধ্যে মধ্যে আবার ভাবে যে চুল কাটাতে হবে, কাজেই ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার কোন অর্থই হয় না। পরের মাসে আবার ভাবে যে, এই মাসে ব্যাঙ্কে কিছু টাকা রাখবেই কিন্তু সেই মাসেও কোন-না-কোন কারণে আর জমা রাখা হয় না।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অসংখ্য উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, ছেলে-মেয়েরা তাদের টাকা পয়সা অযথা নষ্ট করে না। এরা স্বাভাবিকভাবেই আধুনিক ধরণের জিনিষপত্র পছন্দ করে এবং নিজেদের পছন্দ-অনুযায়ী কিছু কেনার জন্য বাবা-মা'র কাছে টাকা চায় না। নিজেদের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য, স্কুলের খরচের জন্য এবং কোন কাজ শেখার জন্য ছেলেমেয়েরা যথাসাধ্য বাবা-মাকে সাহায্য করে।

৬ কোটি বছর পরেও বীজাণু জীবিত

পশ্চিম জার্মানীর নাওহেইম শহরের উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে ডাঃ ডমব্রাওস্কি কয়েক বছর পূর্বে এক ধরনের অতি প্রাচীন অণুবীজাণু পেয়েছেন। যে ধাতুস্তর এই উষ্ণ প্রস্রবণটির উৎস, সেই ধাতুর মধ্যে তিনি বহু লক্ষ বছরের প্রাচীন কতকগুলি বীজাণু পান, যেগুলি এখনও জীবিত। বর্তমানে এই জার্মান বৈজ্ঞানিক পার্বত্য নুনের একটা ঢেলার মধ্যে অতি প্রাচীন এক রকমের বীজাণু পেয়েছেন, সেগুলির বয়স ৬ কোটি বছরেরও বেশী। অন্য কোন বীজাণু বের করে দেওয়ার জন্য নুনের টুকরো-গুলিকে বীজাণুমুক্ত একটি গবেষণাগারে আগুনের মধ্যে রাখা হয় এবং পরে সেগুলি একটা পুষ্টিকর দ্রবণের মধ্যে দেওয়া হয়। তারপরে আবার যখন দ্রবণের মধ্যে রাখা হ'ল তখন আবার সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যায় বাড়তে সুরু করল. প্রাচীন সমুদ্রগুলি যখন শুকিয়ে যায় তখন এই বীজাণুগুলি নুনের মধ্যে ঢুকে যায়। নুনে স্বাভাবিক অবস্থাতেই প্রোটিনগুলি ছিল এবং এত বছরেও তার কোন পরিবর্তন হয় নি ব'লে মনে হয়। নুন থেকে বের করে বীজাণুগুলিকে যখন পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হ'ল তখন তাদের যুগ যুগ ব্যাপী ঘুম ভেঙে গেল। এই রকম বীজাণুর কিছু নমুনা গত পাঁচ বছর যাবৎ রেখে দেওয়া হয়েছে এবং সব গুলিই জীবিত রয়েছে. পুষ্টিকর কিছুর মধ্যে দিলেই সেগুলি আবার জেগে উঠে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। বীজাণু-বিশেষজ্ঞগণ বহু পূর্ব থেকেই জানেন যে, "হ্যালোফিলিক" (নুন-প্রেমিক) বীজাণু আছে, প্রোটিন. বিশেষজ্ঞরাও জানেন যে, নুন কয়েক রকমের প্রোটিনকে সেগুলির স্বাভাবিক অবস্থায় বহুদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারে। তবে এই পরীক্ষা যে ৬ কোটি বছর পরেও সফল হয় এইটেই সব চাইতে আশ্চর্য-জনক.

ভারতচন্দ্র ও চন্দননগর

শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অতীতের বিভিন্ন সাহিত্যিক বা গ্রন্থকারদের রচনা থেকে বিখ্যাত কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনী ও রচনার বিষয়ে সবিশেষ জানিতে পারা যায়। এই কবির জীবন যে বেশ ঘটনাবহুল এবং বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে জড়িত, এটা বেশ পরিষ্কার ভাবে জানা যায়। কবির নাতিদীর্ঘ জীবনে বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র বিষয়ে উল্লেখ করে এটা প্রমাণ করা খুবই সম্ভব যে, তাঁর প্রতিভা কিভাবে বিকাশলাভ করে এবং এদিক্ থেকে কোনও বিশেষ স্থানের দাবি গ্রহণযোগ্য কি না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কবির বিভিন্ন গ্রন্থ ও কবিতা রচনার সময় ও স্থানের সম্ভবমত উল্লেখ করে দেখান হবে, যে কবির প্রতিভার বিকাশ লাভের জন্য চন্দননগরের অবদান খুবই নগণ্য। যদিও বর্ত্তমানের মুষ্টিমেয় লেখকগোষ্ঠী দাবি করেন যে, এই চন্দননগর থেকেই কবির সকল প্রতিভা বিকাশলাভের সুযোগ পায়। কবির জীবনী ও তাঁর রচিত গ্রন্থ আলোচনা করলেই এই বিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না যে, উক্ত তথ্যের মূল্য খুবই সামান্য।

ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজবংশের শেষ রাজা নরেন্দ্র রায়-এর কনিষ্ঠ পুত্র ভারতচন্দ্র ১৭১২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার বাল্যকালেই বাসভূমি "পাঁড়ুয়াগড়" বর্দ্ধমানের মহারাণী কাঁত্তিচন্দ্রের জননী এক সীমানা-বিরোধের সুযোগে আক্রমণ করেন। এই সময়ে কবি তাঁহার মামার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এই নওপাড়া গ্রামে থাকিয়াই তিনি ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করেন। এইখানে থাকিতেই তিনি ১৪ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন, যার ফলে তাঁর অভিভাবকগণ তাঁকে খুব তিরস্কার করেন।

অভিমানে ক্ষুব্ধ বালক ভারতচন্দ্র এর পরই দেবানন্দপুরের রামচন্দ্র মুন্সির আশ্রয়ে থাকিয়া পার্শি ভাষা

শিখতে থাকেন। এখানে থাকতেই তিনি 'সত্যনারায়ণের ব্রতকথা' রচনা করেন। ২০ বৎসর বয়সে (১৭৩২ খৃঃ) তিনি বাড়ীতে ফিরে আসেন। এর কয়েক বছর পরে দ্বিতীয় "সত্যনারায়ণের ব্রতকথা" চৌপদিতে রচনা করেন। তাঁদের সমগ্র জমিদারী বর্দ্ধমানরাজ দখল করিলেও পরে কিছু ভূসম্পত্তি ইজারা হিসাবে তাঁরা ফেরৎ পান। বড় ভাইদের আদেশমত ভারতচন্দ্র ঐ ইজারার জমির খাজনা জমা প্রভৃতি বৈষয়িক বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত "মোক্তার" হিসাবে বর্দ্ধমান যাত্রা করেন।

মাত্র কয়েকমাস বর্দ্ধমানে থাকিতেই তাঁদের ইজারার জমি খাস করা হয়, ফলে তাঁদের মধ্যস্বত্ব লুপ্ত হয় এবং কুচক্রী কর্ম্মচারীদের শঠতায় তিনি বন্দী হন। কারাধ্যক্ষের করুণায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। এই সময় তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর। কারাধ্যক্ষের নির্দ্দেশমত সুবা বাংলার বাইরে উড়িষ্যার সুবেদারের নিকট তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। ২৫ বৎসর হইতে ২৯ বৎসর পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীর বেশে তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। ভক্ত বৈষ্ণবের মত পদব্রজে পুরী হইতে রওনা হইয়া খানাকুল ও কৃষ্ণনগরে আসেন। এই কৃষ্ণনগরেই তাঁহার শালিকাপতি তাঁহাকে সন্ন্যাস-জীবন ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন ও তাঁহার শ্বশুরের বাড়ীতে লইয়া আসেন। এইভাবে তাঁহার সুদীর্ঘ ১৪ বৎসরের সন্ন্যাস-জীবন সমাপ্ত হয়।

এর পরই তিনি চাকুরি লাভের আশায় ফরাসী চন্দননগরের ইজারাদার বা দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট আসেন। চৌধুরী মহাশয় ভারতচন্দ্রের সব কিছু পরিচয় নিয়ে তাঁকে কোন চাকুরি দিতে অসম্মত হন। কারণ ভারতচন্দ্রকে কোন চাকুরি দিলে কবির গুণের গৌরব গোপন থাকবে এই আশঙ্কাতেই চাকুরি দিতে রাজী হন নি। তবে কবিকে গুণগ্রাহক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে সমর্পণ করবেন ব'লে আশ্বাস দেন।

এই সময় কবি কিন্তু চৌধুরী মহাশয়দের নিকট আহার বা বাসস্থান কিছুই গ্রহণ করেন না। তার কারণ তখন চৌধুরীদের জাতিগত একটা অপবাদ ছিল। এই অপবাদ কি ধরণের তার কিছুটা সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই সময়ে ফরাসডাঙ্গার "সমাজপতি" ছিলেন গোন্দলপাড়ার হালদারগোষ্ঠীর প্রধান ছকড়ি হালদার। এই সময়ে অর্থাৎ ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজারাম উভয়েই সম্মান, প্রতিপত্তি ও বৈভবে শীর্ষস্থানীয় হওয়ায় গোন্দলপাড়ার হালদার পরিবার বিশেষ ঈর্ষ্যান্বিত হন। তাই যে-কোনও উপায়ে চৌধুরী-পরিবারকে অপদস্থ করার একটা ইচ্ছা তাঁদের মনে ছিল। ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় সামান্য কারণ থেকেই যে উপায় খুঁজে পাওয়া যায় তাও এই ঘটনা থেকে বেশ বোঝা যায়। কত সামান্য কারণে লোককে সমাজচ্যুত করা হ'ত তাও ২০০ বছর আগের এই কাহিনী থেকে জানা যায়। এদিক্ থেকে আজকের বাঙ্গালী সমাজের কাছে এই কাহিনী খুবই আনন্দদায়ক।

চৌধুরী-পরিবারের অপরাধ যে তাঁদের অজ্ঞাতসারে সৎ শূদ্রজাতীয় পরিচয়ে এক স্ত্রীলোক তাঁদের দেবালয়ে ও অতিথিশালায় পরিচারিকার কাজ করিতে থাকে। পরে প্রকাশ হয় ঐ স্ত্রীলোক চর্ম্মকার-জাতীয়। শুধু এই অপরাধে চৌধুরীদের সমাজচ্যুত বা একঘরে করা হয় এবং এরই ফলে চৌধুরীদের অপর "ব্রাহ্মণদের সহিত ভোজ্যান্নতা ছিল না।"

অনুমান করা মোটেই কঠিন হয় না যে, শুধু এই অপবাদের বিষয় জানতে পেরেই কবি ভারতচন্দ্র ইন্দ্রনারায়ণের বাড়ীতে আহার বা বাসস্থান গ্রহণ করেন নি। তিনি চন্দননগর থাকাকালীন বরাবরই গোন্দলপাড়া-নিবাসী চুঁচুড়ার ডাচ্ সরকারের দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়-এর বাড়ীতে বাস করেছেন। কবি প্রতিদিন সকালে ও বিকালে ইন্দ্রনারায়ণের নিকট "উমেদারী" করতে আসতেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, স্থানীয় পৌরসভা কর্ত্তৃক কবির নামে রাস্তাটি কবির প্রকৃত বাসস্থান অনুসন্ধানে অনেকের ভিতর বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে। কবির প্রকৃত বাসস্থান ছিল উক্ত মুখোপাধ্যায়
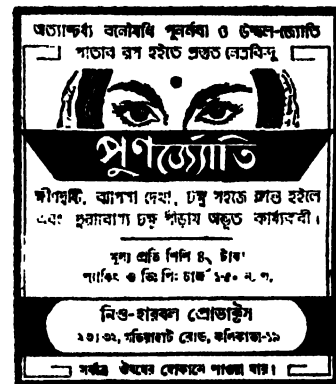
মহাশয়ের বাড়ী, যাকে "দেওয়ানবাড়ী" বলা হয় আর সে বাড়ীটি ঐ রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত। তবে কবি যে বর্ত্তমানে তাঁর নামাঙ্কিত রাস্তার কিছুটা অংশের উপর দিয়ে অতীতে যাতায়াত করেছেন সেটা নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করা যায়।

কবির চন্দননগরে অবস্থান চার হইতে ছয় মাস-এর বেশী নয়। কারণ তাঁর ৩৯ ও ৪০ বৎসর বয়সের সময় অর্থাৎ ১৭৫১ ও ১৭৫২ খৃঃ—এই সময়ের মধ্যে মাত্র দেড় বৎসরে তিনি খানকুল, কৃষ্ণনগর (হুগলী), সারদা, চন্দননগর ও কৃষ্ণনগর (নদীয়া) এই সব যায়গায় বাস করেছেন এবং কৃষ্ণনগরের মহারাজার "সভাকবি" হিসাবে "অন্নদামঙ্গল" রচনা শেষ করেছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের চন্দননগরের ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ না-হওয়া পর্য্যন্ত কবিকে চন্দননগরে বাস করতে হয়। এই সাক্ষাতের একমাস পরেই তিনি কৃষ্ণনগরে কবির চাকুরি গ্রহণ করেন। যে অল্প কয়েকমাস কবি চন্দননগরে বাস করেন তার মধ্যে তাঁর রচিত কোনও কবিতা ছিল এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

"অন্নদামঙ্গল" রচনার নির্দ্দেশ দেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং এই কাব্য-রচনায় সন্তুষ্ট হয়েই তিনি কবিকে "রায়গুণাকর" উপাধি দান করেন। এর পর কবিকে বাসস্থান-এর জন্য কৃষ্ণচন্দ্র মূলাজোড়ে জমি দান করেন। এই সময়ে কবি চন্দননগরের নিকটবর্ত্তী জায়গা প্রার্থনা করেন, কারণ তাঁর "কল্পতরু"—ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করার সুবিধা থাকে এই ইচ্ছা জানান। সেই সুবিধা দেখেই তাঁকে মূলাজোড়ে ভূমিদান করা হয়। কবির মূলাজোড়ে বাসস্থান নির্ম্মাণের মাত্র তিন বৎসর পরেই (১৭৫৬ খৃঃ) ইন্দ্রনারায়ণ মারা যান। এর পর কবির চন্দননগরের সঙ্গে যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ হয়ে পড়ে। কবির অপর সব রচনা কৃষ্ণনগরে বা মূলাজোড়ে রচিত, যার মধ্যে ১। বিদ্যাসুন্দর, ২। রসমঞ্জরী, ৩। নাগাষ্টক এই কয়টিই প্রধান।

চন্দননগর থাকাকালীন তিনি যে কোনও কবিতা বা গ্রন্থ রচনা করেন নি এটা বেশ নিশ্চিতভাবে বলা যায়। ফরাসী জাতীয় গ্রন্থশালায় (Bibliathaque Nationale, Paris) রক্ষিত হাতে-লেখা পুঁথির মধ্যে যদি কবির কোনও রচনা আবদ্ধ থাকে তবে সে-বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কোনও অনুসন্ধান করা হয় নি। যদিও সে বিষয়ে অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন আছে। তবে কবির প্রতিভার বিকাশলাভের স্থান যে চন্দননগর নয়, এসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ বর্ত্তমানের যে-সব প্রবন্ধলেখক কবির প্রতিভার সঙ্গে চন্দননগরের যোগসূত্র খুব ঘনিষ্ঠ ব'লে প্রকাশ করেন তাঁরাও সন্ধান করেন নি যে প্রকৃতই প্যারীতে কবির কোনও রচনা সংরক্ষিত আছে কি না।

কবির "কল্পতরু" ইন্দ্রনারায়ণ যে যোগ্য লোকের স্থান নির্ব্বাচনে দক্ষ ছিলেন এবং গুণের আদর করতেও জানতেন, এটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। কারণ কবিকে যদি কবির ইচ্ছামত একটি চাকুরি দিতেন তা হ'লে নিশ্চয়ই বাংলা সাহিত্য রায়গুণাকরকে লাভ করত না। তাই কবির কবি-প্রতিভার বিকাশলাভের সুযোগ যে চন্দননগরের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ দিয়েছিলেন, এবিষয়ে কোনও ভিন্নমত থাকা উচিত নয়। এদিক্ থেকে প্রতিভার বিকাশলাভের সুযোগ এখান থেকেই হয়েছিল, একথা সত্য। কিন্তু কবির রচনা বা গ্রন্থের দিক থেকে চন্দননগরের স্থান হিসাবে কোনও প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

হাটের পথে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শিল্পী : তারক বসু

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

দ্বিতীয় সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

বিবিধ প্রসঙ্গ

জবাহরলাল নেহরু

এখনও ছয় মাসকাল পূর্ণ হয় নাই, জবাহরলাল আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন। সেই কারণে, এক হিসাবে, এখনও সময় হয় নাই তাঁহার জীবনের ও ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের। কারণ, ইতিহাসের পাতায় বিশিষ্ট উল্লেখ ও স্থায়ী স্থান পায় তাঁহারাই যাঁহাদের জীবনের কীর্ত্তি ও অবদান পরম্পরা কালের প্রবল ঘর্ষণে ইতিহাসের কষ্টি-পাথরের উপর উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে কি ধাতুতে তাঁহাদের দেহ মন-প্রাণ গঠিত ছিল তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। কি সাক্ষ্য, কি প্রমাণ, কি গৌরবময় গুপ্ত নিদর্শন অঙ্কিত থাকিবে ইতিহাসের পাতায় জবাহরলাল নেহরুর জীবন-আলেখ্য রূপে?

তাঁহার মৃত্যুর পর দেশে-বিদেশে শত-সহস্র মুখে তাঁহার উদ্দেশে যে শ্রদ্ধা-নিবেদন উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একটিতে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই। ইহা বলিয়াছিলেন জাতিসঙ্ঘে প্রেরিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আডলাই ষ্টিভেন্সন, নিরাপত্তা পরিষদে। উহা এইরূপ:—

"Prime Minister Nehru's influence extended far beyond the borders of his own country. He was a leader of Asia and of all the new developing nations. His vision and his strength had much to do with the expanding role which those nations have come to play in recent years. And in other parts of the World as well his name had come to be synonymous with the spiritual goals and the worthy hopes of mankind. He was one of God's great creations in our time. His monument is his nation and his dream of freedom and of ever expanding well-being for all men. May that be our legacy and our dream, too."

"প্রধানমন্ত্রী নেহরুর প্রভাব তাঁহার নিজ দেশের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বহু দূর প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি এশিয়ার ও সকল নূতন প্রগতিমুখী রাষ্ট্রের একজন নেতা ছিলেন। সাম্প্রতিক কালে এই সকল জাতি যে বিশ্বের কাজে ক্রমেই বর্দ্ধনশীল অংশ গ্রহণ করিতেছে তাহার মূলে তাঁহার ধ্যানদৃষ্টি ও শক্তি বিশেষভাবে ছিল এবং পৃথিবীর অন্য দেশেও তাঁহার নাম মানব-সমাজের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যসমূহের ও মহত্তর আশার প্রতিশব্দ রূপেই গৃহীত হইতেছিল। আমাদের কালে ঈশ্বরের মহান সৃষ্টি সকলের অন্যতম ছিলেন তিনি। তাঁহার স্বজাতি ও সমগ্র মানবজাতির স্বাধীনতা ও চির-বর্দ্ধনশীল কল্যাণময় অস্তিত্বের সম্পর্কে তাঁহার স্বপ্ন, ইহাই থাকিবে তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ রূপে। উহাই যেন উত্তরাধিকার ও স্বপ্নরূপে আমাদেরও হয়।"

আডলাই ষ্টিভেন্সন বিদেশী এবং ভারত সম্বন্ধে তাঁহার কোনও মোহবন্ধন নাই। গোয়ার মুক্তিকালে জাতিসঙ্ঘে তিনি তীব্র ভাষায় ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। সুতরাং তাঁহার শ্রদ্ধাবাচনের মধ্যে অসার উচ্ছ্বাস না থাকারই কথা। আমাদের উপর এখন ক্ষুদ্রত্বের অভিশাপ বর্ত্তমান। সুতরাং আমাদের অনেকেরই আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে এই "ঈশ্বরের মহান সৃষ্টি"র পূর্ণ মহিমা লক্ষিত হইতেছে না।

খাদ্যসমস্যা ও ভেজাল

কয়দিন পূর্ব্বে এক সংবাদে দেখা গেল যে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী খাদ্য লইয়া মুনাফাবাজী ও চোরাকারবারী সম্পর্কে সরকারী মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে উহা দমনে সরকার দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু সেই সঙ্গেই তিনি বলেন যে, যাহারা কঠোর দণ্ডদানের কথা বলেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, গণতন্ত্রের দেশে একনায়কত্ব রাষ্ট্রের মত সরাসরি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা চলে না। এখানে "কিছুদিন বুঝাইয়া বলিয়া" ঐরূপ সমাজ-বিরোধী দুষ্কৃতকারীদের মতিগতি বদলাইবার চেষ্টা করিতে হয় আবার তাহাতে ফল না হইলে পরে তখন দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিতে হয়।

কথাটা সত্য, কিন্তু আংশিকভাবে সত্য। অর্থাৎ যে সত্যের পূর্ণ বিস্তারের সীমা নির্দ্দেশ নাই এবং সে কারণে উহাকে নিরুক্তিবিহীন ও অনির্দ্দিষ্ট বলা হয় এই সত্য সেই শ্রেণীর। "বলিয়া কহিয়া" ও "গায়ে হাত বুলাইয়া" কিছুদিন বুঝাইতে হইবে ইহা গণতান্ত্রিক দেশের নিয়ম, ইহা আমরা জানি। কিন্তু সেই কিছুদিন মানে কতদিন? কোন্ প্রগতিশীল গণতন্ত্রের দেশে এইভাবে গড়িমসি করিয়া বৎসরের পর বৎসর একদল অর্থপিশাচ দুর্ব্বৃত্তকে দেশের জনসাধারণের রক্তশোষণ করিতে দেওয়া হইয়াছে? কোন্ গণতান্ত্রিক দেশে এদেশের মুনাফাবাজ ও চোরাকারবারীদের মত দুষ্কৃতকারীদের এরূপ নির্লজ্জভাবে জনসাধারণের জীবনযাত্রা দুর্ব্বহ করার কাজ প্রকাশ্যে করিতে দেওয়া হইতেছে? কোন্ প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দেশে অত্যাবশ্যক পণ্য, যথা, খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ইত্যাদিতে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করার কাজে কোনও বাধা নাই, কোন্ সভ্য দেশে খাদ্যে ভেজাল মিশাইয়া সারা জাতির জীবন বিপদসঙ্কুল করার মত সাংঘাতিক অপরাধের শাস্তি এ দেশের মত হাস্যকর? এক কথায় কোন্ সভ্যদেশে আইন-কানুন বিচার-ব্যবস্থা সব-কিছুই "হিসাব-বহির্ভূত টাকার" মালিকগণ কর্ত্তৃক অবহেলিত ও পদদলিত হইতেছে, যেমন হয় আমাদের এই অভাগা দেশে? শাস্ত্রীজীর সম্মুখে এই প্রশ্নগুলি উপস্থিত করিলে তিনি কি উত্তর দেন সেটা জানা প্রয়োজন।

এই সেদিন কয়েকজন অসাধু ব্যবসায়ীর গুদাম হইতে ১ লক্ষ টিন শিশুদের অতিপ্রয়োজনীয় খাদ্য পুলিসে ধরিয়াছে। যে দুষ্কৃতকারী পামরগণ এইভাবে অসহায় শিশুদের জীবন বিপন্ন করিয়া ৫ টাকা মূল্যের মাল ১৯ টাকায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল শাস্ত্রীজী তাহাদের জন্য কি ব্যবস্থা করিতে চাহেন? হরিসঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ ও মালসা-ভোগ সেবনে কি এ জাতীয় অর্থপিশাচদের মনের কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব তিনি মনে করেন?

ঢাকায় একদল ব্যবসায়ী এইভাবে দেশের লোকের খাদ্য কৃত্রিমভাবে মহার্ঘ্য করার চেষ্টা করিয়াছিল। সেখানে ইহার প্রতিকার হয় কয়েকজন ধুরন্ধর ব্যবসায়ীকে ধরিয়া, বাজারের মাঝে উলঙ্গ করিয়া প্রচণ্ড বেত্রাঘাত করায়। আমরা, সরাসরি বিচার ত দূরের কথা, এরূপ ক্ষেত্রে দুষ্কৃত-কারীদের কোনও আইনের আওতাতেই এতদিন আনি নাই। এখন অবশ্য অর্ডিনান্স করিয়া সরাসরি বিচারের ব্যবস্থা করিতেছি। কিন্তু তাহার সীমা কতটুকু? এক মাসের কারাদণ্ড ও ২০০০ টাকা জরিমানা পর্য্যন্ত সরাসরি বিচারে দণ্ড দিলে তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না। আমরা এই অর্ডিনান্সকে বৃথা বলিব, কেননা, ইহাতে কিছু চুনোপুঁটি ঘায়েল হইতে পারে। কিন্তু এই মহাপাতকের মূলে যে-সকল অর্থপিশাচ তাহাদের কিছুই হইবে না। চোরাকারবারী ও মুনফাবাজীতে যাহারা পালের গোদা, তাহাদের লাভের পরিমাণ সম্পর্কে নীচে "আনন্দবাজার" হইতে গৃহীত একটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল:

"দৈনিক কম করিয়াও ৫০ হাজার, মাসে ১৫ লক্ষ টাকা, ইনকাম ট্যাক্স দেওয়ারও ঝামেলা নাই—'নাফার' এ হিসাব অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য। গত কয়েকদিন যাবত বড়বাজারের চিনিপটি, কাঁটাপুকুর-মৌলালী খিদিরপুর-হাওড়ার কয়েকটি গুদাম এবং গোটা কলিকাতার মিষ্টি ও মিছরির বাজার ঘুরিয়া আমি জনা ছয়েক কারবারীর সন্ধান পাইয়াছি যাহারা

গত প্রায় সাত-আট মাস যাবত চিনির 'বিলাক মারকেটে' এই অবিশ্বাস্য হারে মুনাফা লুটিতেছে।

শনিবার সন্ধ্যায় বড়বাজারের সত্যনারায়ণ পার্কে চিনি-পটির তিনজন কর্ম্মচারী গোপনে আমাকে জানায়ঃ আমরা ভগবানের নামে দিব্যি করিয়া বলিতেছি, ইহাদের সঙ্গে সাপ্লাই দপ্তরের কয়েকজন বড় বড় কর্ম্মচারীরও যোগাযোগ আছে। সম্প্রতি এই চয়জনার একজন ফ্রি-স্কুল ষ্ট্রীটের এক কর্ত্তাকে সাত শ টাকা দিয়া স্যুট তৈরী করিয়া দিয়াছে। নগদ টাকাও নিয়মিত দেওয়া হয়। এই তিনজন কর্ম্মচারীর একজনের নিকট হইতে আটা-ময়দার কালোবাজারের খবর পাইয়াছিলাম। পুলিস সেই কালোবাজারীদের কয়েকজনকে ধরিয়াছে, সুতরাং ইহাদের সংবাদ অবিশ্বাস করার কারণ নাই।

দৈনিক ৫০ হাজার টাকা নাফার হিসাবটা কিরূপে পাওয়া গেল? গড়ে দৈনিক এই চয়জন বেপসায়ী ৬৫০ বস্তা চিনি কালোবাজারে বিক্রি করে। চিনির নিয়মিত দর প্রতি কুইন্টল ১৩২ হইতে ১২৫ টাকা। কালোবাজারে বিক্রি ২০০ হইতে ২২৫ টাকা।"

আমরা এই সংবাদটি নিছক গল্প মনে করিতে পারি না, কেনন, আমাদেরও এ বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা এক সময় হইয়াছিল। যাহাই হউক এইরূপ মুনফা যেখানে একটি দ্রব্যেই হইতে পারে—অন্ততঃ ইহার অদ্ধেকও যদি হইতে পারে—তবে ইহাদের অনুচরদের জন্য ২০০০ টাকা জরিমানা ও এক মাস জেল খাটার "মজুরি" বাবদ আরও এক হাজার টাকা, মোট ৩০০০ টাকা খরচ করিতে বাধা কোথায় ও কতটুকু?

তাব পর ভেজাল। শাস্ত্রীজী খোঁজ লউন বিটেনে, পশ্চিম জার্ম্মানীতে ও মার্কিন দেশে দুধে ভেজাল ও মাখনে ভেজাল রোধ করার জন্য কিরূপ দণ্ডব্যবস্থা আছে। এদেশে সরিষার তেলে যেরূপ মারাত্মক পদার্থ ভেজাল দেওয়া হইয়াছে সেরূপ ক্ষেত্রে উত্তর আফ্রিকার এক দেশে কয়েকজন ব্যাপারীকে গুলী করিয়া মারা হয়। যে দুর্দ্দান্ত অন্যায় লাভের জন্য অসহায় জনগণকে ঐভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতে পারে তাহার মৃত্যুদণ্ড হওয়াই উচিত—ন্যূনকল্পে দীর্ঘ দিনের কঠোর শ্রমযুক্ত কারাদণ্ড হওয়া একান্তই প্রয়োজন। নয়াদিল্লীর কাজীবর্গের বিচারে তাহার কাছাকাছিও কিছু ব্যবস্থা নাই। সুতরাং সারা পৃথিবীর মধ্যে ভেজালকারীদের "রামরাজত্ব" চলিবে এই অভাগা ভারতেই!

শাস্ত্রীজী অতি সৎ ও ন্যায়পরায়ণ লোক আমরা জানি। কিন্তু দোষী ও অপরাধীর প্রতি কঠোর মনোভাব প্রদর্শন না করিতে পারার জন্যই তিনি অনেকক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছিলেন—যেমন রেলমন্ত্রী হওয়ার সময়।

এই ত গেল মুনাফাবাজী ও ভেজালের কথা। তারপর আসে ন্যায্য মূল্যে "ভোগ্যপণ্য" সরবরাহের এবং জনসাধারণের জীবনধারণের উপায়স্বরূপে ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সরবরাহের কথা—অর্থাৎ কথা, কথা, কথা!

আজও শুনিতেছি আগামী বৎসরের কোন সময়ে সরকার বাহাদুর সত্য সত্যই কথার বদলে কাজে মন দিবেন—কাজ আরম্ভ করিবেন কবে সে বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা এখনও পাওয়া যায় নাই। এ প্রসঙ্গ লিখিবার সময় শোনা গেল:—

"কলিকাতা, ১৬ই নভেম্বর—আসন্ন মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদানের প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আজ সাংবাদিকদের নিকট ঘোষণা করেন, কোন অবস্থাতেই রাজ্য সরকারের খাদ্য নীতির পরিবর্ত্তন করা হইবে না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, আগামী জানুয়ারী মাসের সুরু হইতে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে বিধিবদ্ধ রেশনিং প্রথা চালু হইবেই।

তিনি জানান, প্রতি সপ্তাহে চাল-কলগুলির উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ লেভি করা হইবে। তা ছাড়া জেলাশাসক এবং সমবায়ের মারফৎ সোজাসুজি ধান সংগ্রহও করা হইবে। ন্যায্য মূল্যে চাষীদের নিকট হইতে ধান ক্রয়ের ব্যবস্থাও করা হইবে। এই ব্যাপারে সুদূর গ্রামাঞ্চলের চাষীদের ন্যায্য মূল্যপ্রাপ্তির উপর বিশেষ নজর দেওয়া হইবে।

খাদ্যশস্যের মূল্য স্থির রাখার জন্য অন্যান্য সকল রাজ্যে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে বলিয়া শ্রীসেন অভিমত প্রকাশ করেন।"

চাষীগণ ন্যায্য মূল্য পাইবে এটা ভাল কথা। কিন্তু আমরা, অর্থাৎ অচাষী জনসাধারণ, কি মূল্যে কতটা খাইতে পাইব সে বিষয়ে এখনও এক কথাও শোনা যায় নাই। অবশ্য

মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন আগতপ্রায়, সুতরাং ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকাই শ্রেয়। আর মূল্যের বিষয়ে ত ঐ একই দিনে, একই সংবাদপত্রে (যুগান্তর) আর একটি সংবাদ আছে যাহা নিরীক্ষণে গৃহস্থজনের মন পুলকিত হইবেই। পাঠক অবধান করুন :—

"কলিকাতা, ১৬ই নভেম্বর—গম, এবং সেই বাবদ আটা, ময়দা, সুজি ও পাউরুটির মূল্য শীঘ্রই আরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

কত বাড়িবে ঠিক জানা যায় নাই। তবে সরকারী মহলের ধারণা এক কিলো গমের জন্য প্রায় ১৫ পয়সা করিয়া বেশি দিতে হইবে। আটা, ময়দা, সুজি ও পাউরুটির মূল্যও এই হারে বাড়িয়া যাইবে।

ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছে। সারা ভারতেই গম ও গমজাত দ্রব্যের দাম চড়িয়া যাইবে।"

এদিকে যে আলু কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও ২০ টাকা মণ ছিল গঞ্জে এবং কলিকাতায় চার আনা সের হিসাবে অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যাইত, তাহা আজ খাদ্য ঘরের কল্যাণে ও শ্রীমান লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রমুখাৎ শাসক-প্রবরদিগের ভয়ঙ্কর গতিতে মুনাফাবাজি নিবারণ ও শাসন প্রচেষ্টার গুণে, ১.০ কিলো দরে বিক্রয় হইতেছে। সুতরাং আগামী দিনের বাজার প্রতীক্ষায় জনসাধারণ, বিশেষে মহানগর কলিকাতার নাগরিকজন পুলকিত চিত্তে শুনিবে, না কম্পিত কলেবরে শুনিবে, তাহা বিধাতাই জানেন।

আমরা কতই খাইতে পাইব সেটা ও এখনও উহ্য। তবে সম্প্রতি পাউরুটি সম্পর্কে যে ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, সদাশয় সরকার বাহাদুর দেশবাসীর খাদ্যের পরিমাণ কতদূর কমানো যাইতে পারে সে বিষয়ে গবেষণা এরই মধ্যে আরম্ভ করিয়াছেন। আগে রেশনে গম বা চাউল না পাইলে বা রেশনের বাহিরে চাউল বা আটা না পাইলে পাউরুটিতে কতকটা ক্ষুধা নিবারণের পথ ছিল। যাহাদের ৯টা-৫টা খাটিয়া তিন-চার মাইল হাটিয়া বাড়ী যাইতে হয় তাহারা চায়ের সঙ্গে ড-স্লাইস রুটি খাইয়া কোন রকমে জঠর-জ্বালা নিবারণ করিত। এখন সে পথ বন্ধ হইল। তারপর সিকি কিলো গম বা আটার বদলে সিকি কিলো পাউরুটি কে দেবে? কোন্ আইনে দোকানী রুটি ওজন করিতে বাধ্য?

গুণ্টুরে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন

বিগত ৭ই, ৮ই ও ৯ই নভেম্বর গুণ্টুরের নিকটে "নেহরুনগর" ছাউনিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির তিনদিন ব্যাপী অধিবেশন হয়। নেহরুনগরে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হইবে বলিয়া আশা অনেকেই করিয়াছিলেন। কেননা চীনে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার সম্পর্কিত নীতি ও বর্তমান সঙ্কটজনক খাদ্য পরিস্থিতির প্রতিবিধান উদ্দেশ্যে ব্যাপক রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রশ্ন, এই দুইটি বিষয়ই ঐখানে সম্যকভাবে আলোচিত হইবার কথা ছিল। এবং যেহেতু ভুবনেশ্বর অধিবেশনের পর কংগ্রেস ও কংগ্রেস কমিটিতে পুনর্বার প্রাণ সঞ্চার হইয়াছে—অর্থাৎ উহা কংগ্রেসী সরকারের প্রতিধ্বনি ও প্রতিচ্ছায়া মাত্র নয়—এই ধারণা দেশের লোকের মনে আসিয়াছে, সে কারণে ঐ আলোচনার উপর শুধু এদেশের নহে বিদেশেরও অনেকেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। আমাদেরও আশা ছিল যে, এই আলোচনায় অনেক নূতন চিন্তাধারা ও স্থির বুদ্ধিচালিত বিতর্কের পরিচয় পাইব। দুঃখের বিষয় সে সকল আশাই নিষ্ফল হইয়াছে এবং আলোচনায় যদিও কিছুটা বাস্তবমুখী চিন্তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, তাহার শেষের দিকে অবাস্তব ও অসার কোন্দল উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় নাই।

এই তিনদিনের অধিবেশনে যদি কোন কিছু সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়া থাকে, তবে তাহা এই যে, ভারতের কর্ণধাররূপে যাহারা বিরাজ করিতেছেন তাহাদের চিন্তা ও সমীক্ষণ শক্তি এখনও আড়ষ্ট, অনড় ও বাস্তববিমুখী। উপরন্তু তাঁহাদের কোনও বিষয়ে ধীর-স্থিরভাবে আলোচনা কিভাবে ও কি পরিবেশে করিতে হয় সে সম্বন্ধেও কোন ধারণা নাই। নহিলে ঐরূপ ঔটি প্রশ্ন, যাহার মধ্যে দেশের স্বাধীনতা ও মরণ-বাঁচন সমস্যা নিহিত রহিয়াছে, তাহার আলোচনা ঐরূপ হাটের মাঝে যাত্রার পালাগানের প্রথায় পরিচালিত হইত না। খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, তাহার একাংশ—অর্থাৎ সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা—সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম সুস্পষ্টভাবে সরকারের মত

ব্যক্ত করেন। কিন্তু আলোচনাকালে সেই নিয়ন্ত্রণ কতদূর ব্যাপক হইবে এবং কিভাবে চালিত হইবে তাহার বিষয়ে বলা হইল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগামী ১৭ই ও ১৮ই নভেম্বরে নয়াদিল্লী মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে গৃহীত হইবে। এবং এ বিষয়ে অন্যান্য বক্তাদিগের কথার মধ্যেও নূতন কোনও তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল না। এমনকি খাদ্যে অনটনের মূলে যে কণ্টকময় প্রশ্ন রহিয়াছে, যাহাকে "জনসংখ্যা বিস্ফোরণ" বলা হইয়াছে, সে-বিষয়ে কেহ একটা কথাও উচ্চারণ করিলেন না!

পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ সম্পর্কে আলোচনায় কংগ্রেস সংসদীয় পার্টির সম্পাদক শ্রীবিভূতি মিশ্র বলেন, "জাতীয় প্রতিরক্ষার ব্যাপারে অন্যের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না। ভারতে পারমাণবিক অস্ত্র তৈয়ারী করা হইবে কি না সে বিষয়ে জাতির নেতারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লইতে পারেন না। এ বিষয়ে ভোট দ্বারা দেশবাসীর মতামত জানা উচিত। আমরা পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত না করার সিদ্ধান্ত যদি এখনই লই তবে হয়ত কিছুদিন পরে তাহা করিতে আমাদের বাধা হইতে পারে। চীন যদি আমাদের আক্রমণ করে তবে আমাদের আত্মরক্ষা বা রাশিয়ার শরণাপন্ন হইতে হইবে। ইহাতে চলিবে না, আমাদের নিজস্ব অস্ত্র চাই।"

তিনি আরও বলেন, "ভারত যদি নিজেকে শক্তিশালী না করিয়া তোলে তবে সে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির নিকট মানমর্যাদা পাইবে না। ভারত ইতিমধ্যে চীনের কাছে আঘাত পাইয়াছে এবং ভারতের কিছু অংশ এখনও চীনের দখলে আছে। ক্ষুদ্রাস্ত্র দিয়া প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা যাইবে না।"

বিহারের এম-পি শ্রীকমলনাথ তেওয়ারী বলেন যে, প্রতিরক্ষার ব্যাপারে পারমাণবিক বোমা প্রস্তুতির বিষয়টি একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। এ ছাড়া কয়েকজন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যের মত ছিল—শ্রীবিভূতি মিশ্র তন্মধ্যে একজন—যে, এখন পারমাণবিক বোমা তৈয়ারী না করা হউক, এখন হইতেই তাহার প্রস্তুতি অগ্রসর করা উচিত যাহাতে প্রয়োজন হইলে দ্রুত ঐ অস্ত্র নির্ম্মাণ করা সম্ভব হয়।

চীনা আক্রমণের ফলে ভারতের যে অবস্থার অবনতি হয় তাহার মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকায় ভারতের মান-সম্ভ্রমে হানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা চীনের সম্মুখে আমাদের সেনাদল অতি নিকৃষ্ট অস্ত্র ও ততোধিক জঘন্য খাদ্য-শীতবস্ত্র ইত্যাদির কারণে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, একথা জগৎ জানিতে পারিয়াছে। আমাদের কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র গলাবাজি, অন্ধ বিশ্বাস ও ভাবের উচ্ছ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া দেশের প্রতিরক্ষা বিষয়ে বিষম অবহেলা করিয়াছেন একথা বিশ্বজগৎ জানে। এই অবহেলার কারণেই আমাদের সামরিক পরাজয়ের অপমান, এদেশের পবিত্র ভূমির দশ হাজার বর্গমাইল শত্রুকবলিত এবং বিশ্বজগতে মাথা হেঁট করা মানিয়া লইতে হইয়াছে। বর্তমানে চীন তাহার অস্ত্রবল বৃদ্ধি করিয়াছে এই পারমাণবিক বোমা নির্ম্মাণের দ্বারা, যাহার ফলে সারা জগতের জোট-নিরপেক্ষ জাতিবর্গের মধ্যে চীনের সম্পর্কে কিরূপ ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাও সকলেরই জানা। সুতরাং শ্রীবিভূতি মিশ্র ও তাঁহার সহিত পারমাণবিক অস্ত্রের বিষয়ে একমত যে সকল সদস্য ছিলেন তাঁহাদের উৎকণ্ঠার যথেষ্ট কারণ আছে, একথা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিবেন।

আরও বিশেষ কথা এই যে, ইহারা প্রস্তুতির কথা বলিয়াছেন। অস্ত্র নির্ম্মাণ প্রতিযোগিতার কথা উঠে নাই, সে কথা অবান্তরভাবে ইহাদের বিরোধী দুইজনে ভারি মহাশয়গণ তুলিয়াছেন। বিশ্বজগৎ জানে যে প্রতিরক্ষা বিষয়ে যে প্রস্তুতি আমাদের করা উচিত ছিল ১৯৫০ সালে, এবং যে প্রস্তুতির কথা আমরা, নিজেদেরই ন্যায়ধর্ম্মনীতি-জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া সারা জগৎকে "অহো আমি কি সাধু, আমি কি নিষ্ঠাবান ও ধর্মপ্রাণ, সে কথা বুঝহ" শুনাইবার কারণে, ভাবোচ্ছ্বাসে মগ্ন হইয়া, কাজের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃতির গর্ভে চালিয়া, আট বৎসর "তূরীয়" ভাবে কাটাইয়াছি, সেই প্রস্তুতি-বিষয়ক কাজই আজ আমরা চীনের নিকট বিষম ভাবে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, চতুর্গুণ খরচে ও বহুদেশের কাছে দরবার করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে করিতেছি। সুতরাং পারমাণবিক অস্ত্র বিষয়ে প্রস্তুতির কথা বলায় কি বেদ অশুদ্ধ হইয়াছে তাহা শুধু তাঁহারাই জানেন, যাঁহারা বাস্তবকে সাদা চোখে দেখা অন্যায় মনে করেন।

বিষয়টা ছিল প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত, অর্থাৎ চরম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-সংক্রান্ত। কেননা, ইহার সঙ্গে ভারতের চল্লিশ কোটির

অধিক নরনারীর স্বাধীনতা,পবিত্র ভারতভূমির প্রতি অংশের অচ্ছেদ্য নিরাপত্তা ও ভারতীয় জাতির উন্নতশিরে জগতে থাকার প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। উচিত ছিল, সেই হেতু, প্রস্তাবিত বিষয়টির প্রতিটি অংশ, স্থিরচিত্তে ও বাস্তবমুখী দৃষ্টিতে, পরীক্ষা ও সমীক্ষা করা। আরও উচিত ছিল প্রথমেই বলা যে, এরূপ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিচার হাটের মধ্যে, ভিড়ের গোলেমালে, করা চলে না। সুতরাং বিশেষ অধিবেশনে, শুধু সদস্যদের সম্মুখে ইহার আলোচনা ও বিচার চলিবে। সেইরূপে আলোচনা ও বিচারের পর সিদ্ধান্ত যাহাই হইত তাহার একটা ওজন ও বিশেষত্ব থাকিত, সে সিদ্ধান্ত প্রস্তুতি বা নির্মাণের স্বপক্ষেই হউক বা বিপক্ষেই হউক। বিচার অবশ্যই বাস্তবমুখী হওয়া প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ প্রতিরক্ষার ব্যাপারে এই প্রস্তাবের অনুকূল বা প্রতিকূল প্রত্যেকটি কথা প্রতিরক্ষারই হিসাবে করা উচিত ছিল। ন্যায়নীতি, লোকধর্ম ইত্যাদির প্রশ্ন তখনই উঠিত যখন ঐ অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষার ব্যাপার সম্মুখে আসিত। এখানে বলা প্রয়োজন যে, মস্কৌতে যে পারমাণবিক অস্ত্র সম্বন্ধে চুক্তিতে ভারত স্বাক্ষর করিয়াছে তাহাতে ভূগর্ভ মধ্যে ঐরূপ পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিস্ফোরণের নিষেধ বোধ হয় নাই। পারমাণবিক শক্তির কোনওপ্রকার পরীক্ষা হইবে না এইরূপ সর্ত্ত শুধুমাত্র আমাদের নেতৃবর্গের স্ব স্বকপোল কল্পিত।

যদি ঐভাবে বিচারের ফলে কোনও বাস্তব কারণ—যাহার মধ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তি অবশ্যই ধরা যাইতে পারে—প্রদর্শিত হইত যাহা ঐরূপ অস্ত্র নির্মাণ বা নির্মাণ প্রস্তুতির বিরোধী, তবে সে কারণ দর্শাইয়া এই প্রস্তাব নামঞ্জুর করিলে কাহারও কোন কথা বলিবার থাকিত না। তাহার বদলে এরূপ লোকহাস্যকর ভাবোচ্ছ্বাস প্রদর্শনে আর যাহাই হউক বিশ্বজগতে আমাদের মান-মর্য্যাদা কমিবে ছাড়া বাড়িবে না। অবশ্য অনেক বন্ধু মনভুলানো কথা বলিবেন।

প্রস্তাবের বিরোধিতা যাহারা করেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী যাহা বলেন তাহাতে ছিল (১) এক-একটি পারমাণবিক বোমা তৈয়ারী করিতে চল্লিশ-পঞ্চাশ কোটি টাকা খরচ করিতে ভারত সরকার রাজী নয়, (২) নৈতিক ও আন্তর্জাতিক কারণে তিনি এই বোমা তৈয়ারীর বিরোধী। ইহা ভিন্ন তিনি বলেন, (৩) চীনের এই বোমাকে ঘিরিয়া সবরকম ভীতি ও হুমকির যেদিক আছে ভারত তাহা অপসারণের চেষ্টা দেখিবে, এবং সর্ব্বাগ্রেই তিনি বলেন (৪) "এমন প্রস্তাবের আলোচনাতেও আমরা রাজী নই"।

অন্য বক্তাদের মধ্যে শ্রীদেবর ও শ্রীফকরুদ্দিন আমেদ "গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি" পাড়িয়াছেন। শ্রীদেবরের প্রতিরক্ষা বিষয়ে কথা না বলাই উচিত ছিল কেননা, তিনি ওদিকটাই তাঁহার বিবেচনার বাহিরে চিরদিন রাখিয়াছেন। সর্দার স্বরণ সিং এই প্রস্তাবকে পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে জট পাকাইয়া দেখিয়াছেন এবং সে কারণে তার অন্যথায় যুক্তি-পূর্ণ ভাষণের মধ্যে এই বিষয়টা অতি খেলোভাবে দেখান হইয়াছে। "দ্রুত পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য করিয়া যাওয়াই চীনা বিস্ফোরণের সমুচিত জবাব" যদি তিনি সত্য সত্যই বলিয়া থাকেন তবে বলিতে হইবে যে, তিনি শুধু যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে লঘুভাবে দেখিয়াছেন তাহাই নয়, তিনি অবান্তর প্রসঙ্গে তাহা চাপা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এবং বাড়ীতে আগুন লাগিলে ভাইটামিন ভক্ষণ বা হরিতকী সেবন প্রায় একই পর্য্যায়ের বিধান!

শ্রীমেননের বাক্যরাজির মধ্যেও অসংলগ্ন ও অবান্তর অনেক কিছুই আছে—যেমন থাকে উঁহার মন্তব্যে। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত এক প্রশ্ন তিনি তুলিয়াছেন, "ধরুন, আমরা আণবিক বোমা তৈরী করিলাম, কিন্তু ফাটাইব কোথায়—রাজস্থানে?" এরূপ প্রশ্নের সহজ উত্তর, "হাঁ, রাজস্থানে—ভূগর্ভে", যেমন হইতেছে রাশিয়ায় ও মার্কিন দেশে, কিংবা বঙ্গোপসাগরের "ব্যারেন দ্বীপপুঞ্জে, মাটির নীচে"। কিন্তু ঐ প্রশ্নের পূর্ব্বে যে প্রশ্ন, প্রস্তুতি অর্থাৎ তৈয়ারী করার আয়োজন ও যোগাড় এবং প্রস্তুতকরণের মধ্যে যে প্রভেদ, সেটা কি বিবেচনা করা যায় না। "আমরা ঐরূপ বোমা প্রস্তুত করিতে সক্ষম" এই কথা কি আজই পূর্ণরূপে সত্য? না ইহার জন্য অন্য অনেক ব্যবস্থা ও উপাদানের যোগাড় প্রয়োজন? যদি তাহা হয় তবে সেটা অগ্রসর করিলে অর্থব্যয় ছাড়া অন্যদিকে লোকসান কি? লাভের হিসাবে যাইবে যে, আমাদের স্বপক্ষে যাহারা ও যে রাষ্ট্রগুলি আছে তাহাদের অনেক ভরসা বাড়িবে।

শ্রীশাস্ত্রীর কথার মধ্যে (১) সম্বন্ধে হিসাব ঠিক কি না

সে-বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে বলা যায়, (২) সম্বন্ধে বলা যায় যে, রাষ্ট্রনীতির কঠোর বাস্তবময় দৃষ্টিতে যে নীতি দাঁড়ায় সে ছাড়া অন্য নৈতিক প্রশ্ন প্রতিরক্ষার ব্যাপারে অবান্তর। আন্তর্জ্জাতিক কারণ কি তাহা তিনি জানান নাই। (৩) ভীতি ও হুমকির প্রতিকার ভারত কিভাবে করিবে তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিলে তবে এই আশ্বাস গ্রাহ্য হইতে পারে, (৪) এরূপ উক্তি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে করা উচিত ছিল কি না তাহা তিনি নিজেই স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিবেন। যে একদল সদস্য কোন বিষয়ে আলোচনা করিতে উৎসুক, সেখানে তিনি "আলোচনা করিতে রাজী নয়" এরূপ মনোভাব প্রকাশ কি স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া বলিতে পারিতেন ?

শ্রীকৃষ্ণ মেননের ৪০ মিনিটি ব্যাপী বক্তৃতার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল পারমাণবিক বোমার অমানুষিক বিনাশ-শক্তির পরিচয় ও ব্যাখ্যা। তাঁহার মতে "এই অস্ত্রকে যুদ্ধাস্ত্র বলা যায় না এবং ইহা আত্মরক্ষার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে না অথবা শত্রু পরাজয়েও ব্যবহৃত হইতে পারে না, কেননা, ইহার শক্তি নিরবচ্ছিন্ন ও ব্যাপক ভাবে সর্ব্বধ্বংসাত্মক, অর্থাৎ ইহা যেখানে প্রয়োগ করা হয় সেখানের সবকিছুই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। সংসদে বৎসরের পর বৎসর আমরা বলিয়াছি যে, ভারত ধ্বংসাত্মক কাজে আণবিক শক্তির ব্যবহার করিবে না সুতরাং এই মূলনীতি সম্পর্কে কোনও আপোষ হইতে পারে না। মস্কোর পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ও অনেকেই জানিত যে, চীন আণবিক বোমা ফাটাইতে পারে সুতরাং সেই বিস্ফোরণে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই।"

শ্রীকৃষ্ণ মেননের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটা প্রায় সম্পূর্ণ সত্য এবং কোনটার মূলে সত্য ও বাকিটা ভুল ধারণা-প্রসূত। কিন্তু তাঁহার ভাষণের সমস্ত কিছুই যদি ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও কয়েকটা কথার বিচার স্থির চিত্তে করা প্রয়োজন থাকে। এবং আমরা সেই কারণেই স্থির চিত্তে ও স্থির বিচারে এই বিষয়টি আলোচনা ও বিবেচনা করার উপর ঝোঁক দিতে চাই—কেননা আমাদের মতে এইরূপ চরম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিচার ঐরূপ ভাবোচ্ছ্বাসে বেসামাল হইয়া করা উচিত হয় নাই, যেভাবে উহা গুণ্টুরে করা হইয়াছে। সেই কারণে এই বিষয়ের পুনর্ব্বিচার প্রয়োজন, কেননা :—

প্রথমতঃ—পারমাণবিক অস্ত্র নি * ও পরীক্ষা এক বস্তু এবং উহার নির্ম্মাণের প্রস্তুতি—অর্থাৎ উহা নির্ম্মাণের পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও অন্য সরঞ্জাম যোগাড় ও আয়ত্তাধীন করা—সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।

দ্বিতীয়তঃ—বর্ত্তমান জগতে দুর্ব্বলের অহিংসনীতি ও শান্তিবাদ ইত্যাদিকে অধিকাংশ দেশ ও জাতিই অসামর্থ্যের আচ্ছাদন মনে করে এবং সেই কারণে মর্য্যাদা দেয় না। চীনের যুদ্ধ অভিযানের সম্মুখে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার শোচনীয় ব্যর্থতার পর আমাদের নীতিবাদ ইত্যাদিকে জগতের অধিকাংশ দেশই ভিন্ন চক্ষে দেখিতেছে। সে-কারণে সভ্যজগতে আজ আমাদের স্থান পূর্ব্বেকার মত উচ্চে নাই, ইহা আমাদের বুঝা উচিত এবং এই মর্য্যাদা-হানির ফল আমাদের পক্ষে কিরূপ ক্ষতিকারক হইয়াছে তাহাও আমাদের "খোলা চোখে" অবধারণ করা উচিত।

তৃতীয়তঃ—পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার মানবত্ব-বিরোধী ও মনুষ্যজগতের সকল কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ন্যায়ধর্ম্মের পরিপন্থী, ইহা ধ্রুব সত্য। কিন্তু ইহাও সত্য যে, জগতে যতদিন হিংসাদ্বেষ, সাম্রাজ্য-লালসা ও ক্ষমতালোলুপতা থাকিবে, ততদিন এই পাপকলুষপূর্ণ মনুষ্যজগতের উপর বিধাতার চরম অভিশাপরূপে এই সভ্যতা ধ্বংসকারী অস্ত্রের ভয়ও থাকিবে। এবং সর্ব্বোপরি ইহাও কঠোর ও নির্ম্মম সত্য যে, এই অস্ত্রের অধিকারী যদি মানবত্ব বা ন্যায়ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হয় তবে তাহাকে ঐ অস্ত্রপ্রয়োগ হইতে নিরস্ত করার একমাত্র উপায় ঐ অস্ত্র দ্বারাই প্রতিঘাতের অবশ্য-সম্ভাবতা প্রদর্শন করা।

এবং সর্বশেষে : - ইহা সুস্পষ্টভাবে জানা প্রয়োজন যে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সব কিছুই কঠিন ও কর্কশ বাস্তবের পর্য্যায়ে পড়ে। সুতরাং সেগুলির বিচার বাস্তবমুখী হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন, কেননা, প্রতিরক্ষায় ভাবাবিষ্ট হওয়া মারাত্মক ভুল।

অবনীনাথ মিত্র

বিগত ১১ই নবেম্বর রাত্রে একটি কর্ম্মময় জীবনের অবসান হয়। বাঙ্গালী সাধারণজনের জীবনে, বিশেষে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের সন্তানের জীবনে, ব্যর্থতার অভিশাপ আনয়ন করে যে সকল কারণ, সে সকল কারণের প্রতিকার যে কতদূর সম্ভব, এই কর্ম্মময় জীবনটি ছিল তাহার

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাধারণ বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের সীমাবদ্ধ অর্থসঙ্গতি, উচ্চশিক্ষায় অপারগতা এবং যে সকল সুযোগ-সুবিধার দ্বারা বাঙ্গালী সাংসারিক উন্নতি সাধারণতঃ করে, সে সকলেরই অভাব ছিল অবনীনাথের কর্ম্মজীবনের আরম্ভকালে। তবে তাঁহার ছিল দৃঢ়চিত্ত, আত্মনির্ভর ও অসাধারণ কর্ম্মলিপ্সা এবং ঐ সকল গুণের বশে তিনি সকল বাধা অতিক্রম করিয়া জীবন-সংগ্রামে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

স্বদেশীযুগে বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন, "এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী।" সেই সঙ্গেই ছিল বাঙ্গালী জীবনের নিদারুণ ব্যর্থতার চিত্র—"দিনে দিনে বাড়লো দেনা, করলি নাকো বেচা কেনা, হাতে নাইরে কড়ার কড়ি। ওরে, ঘাটে বাঁধা দিন গেলোরে, মুখ দেখাবি কেমন করে? দে, খুলে দে, পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি"।

অবনীনাথের কৈশোরের কিছুদিন কেটেছিল শান্তি-নিকেতনে। হয়তো কবিগুরুর জাগরণের গান তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল এবং সেই কারণেই অন্যান্য অল্প-সঙ্গল বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সন্তানের মত নৌকা ঘাটে বাঁধিয়া ও কপাল চাপড়াইয়া জীবনের পথে দেবের মুখ চাহিয়া চলার বদলে তিনি নিজের শক্তি সামর্থ ও উদ্যমের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন।

মহাকবি শেক্সপিয়র বলিয়া গিয়াছেন—

"There is a tide in the affairs of men,
Which, taken at the flood, leads on to fortune;
Omitted, all the voyage of their life
Is bound in shallows and in miseries."

"মানুষের জীবনযাত্রায় জোয়ার আসে, সেই ভরা জোয়ারে তরী বাহিলে সৌভাগ্যের লক্ষ্যে পৌছানো যায়; হারাইলে, (সে সুযোগ) জীবনতরীর সমস্ত যাত্রাই কাটে দুঃখে, মরা গাঙ্গে আটকা পড়িয়া।" অবনীনাথের জীবনের জোয়ার আসে বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের স্থাপনার কালে। তিনি পাঞ্জাবে বিস্কুট তৈয়ারী করা শিখিয়া ১৯০৮ সালে ফিরেন এবং অদম্য উৎসাহে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এখানে বিস্কুটের কারখানা চালাইতে থাকেন। সেই সঙ্গে হাতের কাছে যে কোন কাজ আসিত, অর্থাগমের জন্য উদয়াস্ত খাটিয়া সে কাজ করিতে তিনি চেষ্টিত হইতেন—যদি বুঝিতেন সে কাজ তাঁহার যত্ন ও উদ্যমে সিদ্ধ হইতে পারে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ছিলেন তাঁহার পিসতুতো দাদা। বসু-বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনার সময় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র চাহিয়াছিলেন যে শুধু নামে নয়, আকারে-প্রকারে ও সৌষ্ঠবে উহা মন্দির তুল্যই হয়। তাঁহার সেই কল্পনা চিত্রের রূপায়ন সাধারণ ঠিকাদারের সাধ্য নয় এবং কোনও ইঞ্জিনীয়ারও প্রতিপদে নির্দেশ না পাইলে ইহা নির্ম্মাণে সমর্থ হইবে না তিনি বুঝিয়াছিলেন। সেই কারণে তাঁহার বহু বয়ঃ-কনিষ্ঠ এই মামাতো ভাইকে তিনি নিয়োগ করেন এই কাজে—তাঁহার উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা দেখিয়া—১৯১৭ সালে। সেইদিন হইতে জীবনের প্রায় শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিটি ইট-পাথর কড়ি-বর্গাকে, প্রত্যেকটি লতাগুল্ম বৃক্ষকে, নিজের দেহের অংশ জ্ঞানে, পরম যত্নে রক্ষণাবেক্ষণে চেষ্টিত ছিলেন। নিদারুণ Pereripial neuritis রোগে হাত পা অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইবার পর তিনি বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের কর্ম্মসচিবের পদ-ত্যাগ করেন। তবে গভর্নিংবডি ও কাউন্সিলে তিনি ছিলেন এবং বিশেষ অসুস্থ না হইলে প্রত্যহ বিজ্ঞান মন্দিরে যাইতেন।

বন্ধুগোষ্ঠির মধ্যে তিনি রসিক, সহৃদয় স্বচ্ছ ও সরল-চিত্ত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বহু সাহিত্যিক ও অন্য খ্যাতিপন্ন ব্যক্তি "চানুদা"কে চিনিতেন এবং সকলেই ছিলেন তাঁহার গুণমুগ্ধ। জীবনের শেষ কয় বৎসর ঐ নিদারুণ রোগে—যাহার কারণ নির্ণয় ও প্রতিকার এদেশের প্রসিদ্ধতম চিকিৎসক বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, মায় ভেলোরের মার্কিন হাসপাতাল, করিতে পারে নাই—তাঁহার হাত পা ধীরে ধীরে অবশ হইতে থাকে। মৃত্যু পলে পলে অগ্রসর হইতেছে, দেহের যন্ত্রণাও দিবারাত্র চলিতেছে। এই অবস্থাতেও তিনি হাসি-কৌতুকের ঢেউ ছুটাইতেন বন্ধু-সমাজে মিলিত হইয়া, সে যেন মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া যমকে পরিহাস করার জন্য। কি অদম্য জীবনীশক্তি কি অসম্ভব দৃঢ়চিত্ত ছিল আমাদের এই প্রিয় বন্ধুর, সে কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার চিরশান্তির প্রার্থনা জানাই।
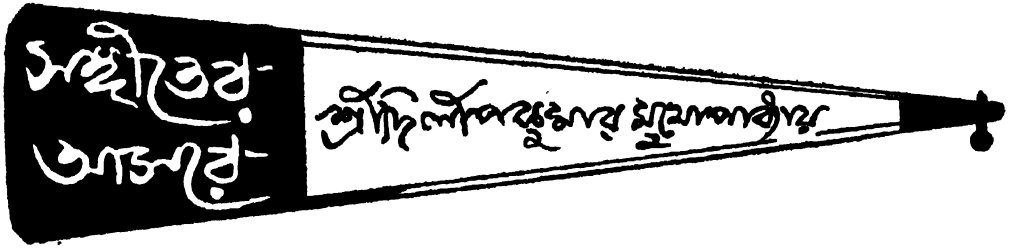
সুরের আসরে দুর্ঘটনা

সুরকার ও সঙ্গতকারের সহযোগিতায় আসরে অপূর্ব সৌন্দর্যময় রসসৃষ্টি হয়ে থাকে। তেমনি আবার অনেক অপ্রীতিকর ও নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেছে সুরের আসরে। এমন কি মারাত্মক দুর্ঘটনা পর্যন্ত। তিনটি আকস্মিক দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত এখানে বর্ণনা করা হবে। সব ক'টিরই ঘটনাস্থল কলকাতা। তিনটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটে সঙ্গতকারের, এ এক লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে রেষারেষির ফলে মৃত্যু ঘটেছে, তা নয়। আকস্মিকভাবে হৃদ্‌ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া কিংবা করোনারি থ্রম্বসিসের (সেকালে রোগের নির্ণয় এ নামে না হ'লেও) মতন কোন কারণে বাদকের মৃত্যু হয়েছে, মনে হয়। সেই তিনটি কাহিনী একে একে বিবৃত করা হবে।

(১) হীরা বুল্‌বুল্ ও গোলাম আব্বাস

উনিশ শতকের এক সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা ছিলেন হীরা বুল্‌বুল্। অসামান্য কণ্ঠমাধুর্যের জন্যে বুলবুল শব্দটি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং সেই নামেই তিনি সুপরিচিতা ছিলেন সঙ্গীত-জগতে। সে আমলের গায়িকাদের মতন তিনিও ছিলেন বাঈ-শ্রেণীর এবং বিগত কালের অনেক সঙ্গীতনিপুণা বাঈজীদের মতন তিনি ধ্রুপদও গাইতেন। যেমন তাঁর পরবর্তীকালের শ্রীজান বাঈ এবং তাঁরও পরে গহরজান, আগ্রাওয়ালী মালকাজান প্রভৃতি ধ্রুপদ শুনিয়ে গেছেন আসরে। ধ্রুপদ গান তখন সঙ্গীতচর্চার ভিত্তি হিসেবে গণ্য হ'ত।

হীরা বুলবুল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় বিখ্যাত ছিলেন। সঙ্গীতক্ষেত্র ছাড়া আর একটি কারণেও হীরার জন্যে এক আন্দোলন হয়েছিল রাজধানীতে। এবিষয়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" গ্রন্থে জানিয়েছেন, "হীরা বুলবুল্ নামে প্রসিদ্ধ বারাঙ্গণা তখন কলিকাতা সহরে বাস করিত। ঐ হীরা বুলবুল্ একজন পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোক ছিল। হীরা সহরের অনেক ধনী ও পদস্থ লোকের সহিত সংসৃষ্ট হইয়াছিল। অনুমান করি ১৮৫২ সালের শেষে বা ১৮৫৩ সালের প্রারম্ভে হীরা আপনার একটি পুত্রকে (নিজ গর্ভজাত কি পালিত, তাহা জানি না) তদানীন্তন হিন্দু কলেজে ভর্তি করিবার জন্য পাঠায়। ইহাতে বারাঙ্গণার পুত্রকে হিন্দু সন্তান বলিয়া কলেজে ভর্তি করা হইবে কি না, এই বিচার ওঠে।......এই বিষয় লইয়া তদানীন্তন এডুকেশন কাউন্সিল ও হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে মতভেদ ঘটে। সেই মতভেদ সত্বেও বালকটিকে ভর্তি করাতে দেশীয় হিন্দু ভদ্রলোকদিগের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দত্ত পরিবারের সুবিখ্যাত বংশধর রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় সেই আন্দোলনের সারথি হইয়া, এই ১৮৫৩ সালের শেষে বা ১৮৫৪ সালের প্রারম্ভে হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজ নামে এক কলেজ স্থাপন করেন। সিন্দুরিয়াপটিস্থ সুপ্রসিদ্ধ গোপাল মল্লিকের বিশাল প্রাসাদে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতঃপূর্বে কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি মহামতি (বীটন) বেথুন সাহেবের সহিত বিবাদ করিয়া গবর্নমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রবাবু তাহাকে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।"

এই হীরা বুলবুলের গানের আসর সেবার বসেছিল শোভাবাজার রাজবাড়ীতে। তাঁর গানের সঙ্গে সঙ্গত করেন পাখোয়াজী গোলাম আব্বাস। সে আসরে দুর্ঘটনার কথা বলবার আগে গোলাম আব্বাসের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। তখনকার স্বনামপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ-বাদক গোলাম আব্বাস পশ্চিমা হলেও সুদীর্ঘকাল বাংলা দেশের সঙ্গীতক্ষেত্রে অবস্থান করেন। রামমোহন রায়

তাঁর ১৮২৮ খ্রীঃ স্থাপিত ব্রাহ্মসমাজে গোলাম আব্বাসকে নিযুক্ত করেছিলেন কৃষ্ণপ্রসাদ ও বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ গায়কদের সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্যে। পরে গোলাম আব্বাস সঙ্গতযন্ত্র শিক্ষা দেবার জন্যে কলকাতায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন বলেও জানা যায়।

হীরা বুলবুল ও গোলাম আব্বাসের সেই শোভাবাজারের আসরে নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটে। বাজনা শেষ করবার পরেই সেখানে মৃত্যু হয় গোলাম আব্বাসের। কেন ও কিভাবে আসরে তাঁর আকস্মিক জীবনাবসান ঘটেছিল, তার দু'টি বিবরণ পাওয়া যায়। একটি জনশ্রুতি এবং আর একটি, সেকালের এক সঙ্গীতজ্ঞের লেখা বিবরণ। দু'টিই এখানে উল্লেখ করা হ'ল। মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনীটি এইরকম শোনা যায়: সে আসরে হীরা বুলবুলের গানের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাবার আমন্ত্রণ যখন গোলাম আব্বাস পেলেন, প্রথমে নাকি তিনি সম্মত হন নি। বাঈজীর গানের সঙ্গে সঙ্গত করলে তাঁর মর্যাদার হানি হবে, এমন মন্তব্য করেও উদ্যোক্তাদের আহ্বানে আসরে যোগ দেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এই বিশেষ শ্রেণীর গায়িকার সম্বন্ধে তাঁর কটু মতামত হীরার কানে পৌঁছেছিল। তারই প্রতিক্রিয়ায় হীরা নাকি আসরে এমন কূট তাল-লয়ে ধ্রুপদ গেয়েছিলেন যে, প্রথমে গোলাম আব্বাস সঙ্গত করতে পারেন নি। পরে হীরা নিজের বাঁ-পায়ে ঠুকে সম দেখিয়ে দেওয়ায় সঙ্গত আরম্ভ করেন তিনি। এবং বাজনা শেষ হবার পরই এই প্রচণ্ড অপমানের জ্বালায় গোলাম আব্বাসের সেই আসরে মৃত্যু ঘটে।

গোলাম আব্বাসের মৃত্যুর অন্য এক কারণ জানা যায় বিখ্যাত মৃদঙ্গী গোপালচন্দ্র মল্লিকের বিবরণী থেকে। মৃদঙ্গাচার্য মুরারিমোহন গুপ্তের শিষ্য গোপালচন্দ্রের কথা পাখোয়াজী কেশবচন্দ্র মিত্রের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। গোপালচন্দ্রের আর একটি পরিচয় ছিল—তিনি মনীষী কৃষ্ণদাস পালের শ্বশুর। মল্লিক মহাশয়ের ওই বিবরণ কিন্তু মুদ্রিত নয়। তাঁর বোল্ ইত্যাদি সংগ্রহের খাতায়, সেকালের সঙ্গীতজ্ঞদের নানা প্রসঙ্গ কথার এক স্থানে লিখেছেন যে,—গোলাম আব্বাস পাখোয়াজী শোভাবাজার রাজবাড়ীর আসরে হীরা বুলবুলের সঙ্গে বাজাবার পরে সর্দিগর্মিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর কারণ নিয়ে অনেক গুজবের সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেসব সত্য নয়। সর্দিগর্মিতেই গোলাম আব্বাসের মৃত্যু হয়েছিল, ইত্যাদি।

এই দু'টি বিপরীত বিবরণের মধ্যে কোন্‌টি সঠিক বলা শক্ত। সেজন্যে দু'টি বৃত্তান্তই দেওয়া হ'ল, পাঠক পাঠিকাদের বিবেচনার জন্যে। লেখকের মনে হয়, গোপাল মল্লিকের মতামত সত্য হ'তে পারে। কিংবদন্তীটি মুখে মুখে পল্লবিত কাহিনী বোধ হয়। কারণ পরে যে দুর্ঘটনার বর্ণনা করা হবে তাতে দেখা যাবে যে, আধুনিককালেও এমন একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রে কি রকম অলীক গুজবের সৃষ্টি হয়েছিল।

(২) দর্শন সিং

দ্বিতীয় দুর্ঘটনার স্থান হ'ল ১১ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, টপ্ খেয়াল-গায়ক লালচাঁদ বড়ালের বাড়ী। লালচাঁদ তখন স্বর্গত। তাঁর সঙ্গীতজ্ঞ পুত্রেরা যে-সব জলসার আয়োজন করতেন, তারই একদিনের ঘটনা। 'লালচাঁদ উৎসব'-এর কোন দিনের কথা নয়, অন্য একটি আসর।

১৯২৩-এর ডিসেম্বর কিংবা ১৯২৪ এর জানুয়ারীর এক রাত্রে সেখানে জলসা বসেছে। উপস্থিত গায়ক-বাদকদের মধ্যে আছেন—ইন্দোরের বীণকার মজিদ খাঁ, বীণকার ও গায়ক লছমীপ্রসাদ মিশ্র, সরোদবাদক হাফিজ আলী খাঁ, তবলাবাদক দর্শন সিং প্রভৃতি।

রাত তখন দ্বিতীয় প্রহর। এবার হাফিজ আলী খাঁ সরোদ বাজাবেন, তবলায় সঙ্গত করবেন দর্শন সিং। হাফিজ আলী সে-সময় সঙ্গীত জগতে এতখানি প্রসিদ্ধি লাভ করেন নি। তিনি তখন যুবক, বয়স ত্রিশের সামান্য বেশি। খুব বিখ্যাত না হ'লেও, তাঁর অপূর্ব মিষ্ট ও তৈরি হাত এবং গুণপনার জন্যে তিনি সঙ্গীতজ্ঞ মহলে পরিচিত হয়েছেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, তাঁকে কলকাতার সঙ্গীত-রসিক সমাজে আসন নিতে অনেকখানি সাহায্য করেন বড়াল-ভ্রাতারা।

তবলিয়া দর্শন সিং-এর পরিচয় অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এই আসরের সময়ে তিনি কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সবিশেষ প্রসিদ্ধ। বয়স তখন ষাট পার হয়ে গেছে "সঙ্গীত সঙ্ঘ"র তবলা-শিক্ষক দর্শন সিং-এর।

সেদিন সিংজীর শরীর তেমন ভাল ছিল না। বাজাবেন কি না একথাও কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেছিলেন। বাজাতে রাজি হন্ তিনি হাফিজ আলীর সঙ্গে, শ্রোতাদের খানিক আনন্দ দেবার কথায়।

হাফিজ আলীর সরোদের সঙ্গে তাঁর তবলা বাজনা আরম্ভ হ'ল। প্রথম দুর্ঘটনায় কিংবদন্তীর মতন এখানে কোন কারণ অবশ্য দেখা দেয় নি। অর্থাৎ দুই গুণীর মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ছিল না। সুতরাং বাজনা

জমল ভালই। খাঁ সাহেবের সুমিষ্ট সুরলহরীর সঙ্গে দর্শন সিংয়ের "সাথ্ সঙ্গত" আসরের সকলে বেশ উপভোগ করতে লাগলেন। বাজনা চলল প্রায় এক ঘন্টা।

তারপর যথারীতি তাঁদের অনুষ্ঠান শেষ হ'ল। হাফিজ আলী একটি তেহাই দিলেন এবং তবলাতেও একটি জবাবী তেহাই মেরে উপসংহার করলেন সিংজী।

পরমুহূর্তেই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। দর্শন সিং তবলায় শেষ ঘা দিয়েই অকস্মাৎ ঢলে পড়লেন। তাঁর একপাশে বসেছিলেন লছমীপ্রসাদ, অন্যদিকে রাইচাঁদ বড়াল। দর্শন সিং তাঁর ওপর হেলে পড়তে আচমকা ভয় পেয়ে লছমীপ্রসাদ তাকে ঠেলে দিলেন রাইবাবুর দিকে। দর্শন সিং এর দেহ রাইবাবুর কোলে ঢলে পড়ল—বাক্যহীন, স্পন্দনহীন। সেই মুহূর্তে লছমীপ্রসাদ বা রাইবাবু বা আসরের অন্য কেউ ভাবতেই পারেন নি যে, দর্শন সিং আর ইহলোকে নেই! এ যে অভাবিত ব্যাপার। যে সমর্থ মানুষ এক ঘণ্টা তবলা বাজালেন প্রেমের সঙ্গে এবং যে বাজনার লয়ও এমন কিছু দ্রুত ছিল না, তিনি তেহাই মারবার পরই মৃত্যুমুখে পড়বেন, এমন ধারণা করা কারও পক্ষেই সম্ভব হয় নি।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে বুঝতে পারলেন সেই শোচনীয় দুর্ঘটনার কথা। আসরে হুলুস্থুল পড়ে গেল। ডাক্তার নিয়ে আসা হ'তে তিনি পরীক্ষা করে জানালেন যে, দর্শন সিংয়ের ইতিপূর্বেই মৃত্যু ঘটেছে।

ব্যাপারটি অতিশয় দুঃখের। কিন্তু দর্শন সিংয়ের দিক্ থেকে দেখলে বলা যায়—শিল্পীর আদর্শ মৃত্যু! সঙ্গীতের আসরে ব'সে সঙ্গীত সাধকরূপে আপনার কর্তব্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সজ্ঞানে মাত্রায় মাত্রায় পালন করে ইহ-জগৎ থেকে তিনি বিদায় নিলেন। সঙ্গীতশিল্পীর পক্ষে এর চেয়ে কাম্য মৃত্যু আর কি হ'তে পারে?

এই আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা কিন্তু গুজব-বিলাসীদের দ্বারা পল্লবিত হয়ে একটি মুখরোচক কাহিনীতে পরিণত হ'ল। সেই অলীক কিংবদন্তী এখনও কোন কোন ব্যক্তির মুখে শোনা যায়: যুবক হাফিজ আলী বৃদ্ধ দর্শন সিংকে আসরে জব্দ করবার জন্যে প্রচণ্ড দ্রুত লয়ে সেদিন বাজিয়ে-ছিলেন এবং সেই দ্রুত সঙ্গত করতে গিয়ে প্রাণান্ত হয় সিংজীর, ইত্যাদি।

এই গুজব কলকাতার কোন কোন সঙ্গীত-মহলে এমন বিস্তার লাভ করে যে, হাফিজ আলী আসরে বাজাবার সময়ে ঠেকা দেবার তবল্‌চি পেতেন না বেশ কিছুদিন। হয়ত মুজরো এসেছে, কিন্তু সঙ্গতীর অভাবে তিনি সে আসরে যোগ দিতে পারতেন না। অনেক সময় তিনি রাইচাঁদবাবুকে (ওস্তাদ মসিদ খাঁর শিষ্য) তাঁর সঙ্গে বাজাতে অনুরোধ করতেন এবং এই ভাবে তাঁর মহ্‌ফিল্ সম্ভব হ'ত। এমন অকারণ 'বদনাম' রটেছিল সরোদী হাফিজ আলী খাঁর।

(৩) দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য

নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন-এর প্রতিষ্ঠাতা, সঙ্গীতপ্রেমী ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের পাথুরিয়াঘাটার (৪৬) বাড়ীতে তৃতীয় দুর্ঘটনা ঘটে। ১৯৩৮ খ্রীঃ (১৩৪৫ সালের ২৪ আশ্বিন) তাঁর ভবনের দোতলার ঘরে সেদিন সন্ধ্যার পর গানের আসর বসেছে। উপস্থিত আছেন ধ্রুপদী গোপাল-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুপদী অমরনাথ ভট্টাচার্য, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, নাটোর মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায়, মৃদঙ্গাচার্য দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য, তবলাগুণী হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অযোধ্যা পাঠক প্রভৃতি। দুর্লভচন্দ্রের পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। সেদিনের আসরে তিনিই ছিলেন প্রধান সঙ্গতকার।

প্রথমে অমরনাথ ভট্টাচার্য, তারপর গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের সঙ্গে বাজাবার পর দুর্লভচন্দ্র মধুর কণ্ঠ ধ্রুপদী ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গত আরম্ভ করলেন। ললিতচন্দ্র হলেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী-শিষ্য মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র এবং কণ্ঠ-মাধুর্যের জন্যে স্মরণীয় গায়কদের অন্যতম। ললিতচন্দ্র প্রথমে পিতার এবং পরে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর শিক্ষায় সঙ্গীত-জীবন গঠিত করেন।

ললিতচন্দ্র প্রথমে সে আসরে গাইলেন চৌতালে 'হে আদি অন্ত।' দুর্লভচন্দ্র বাজালেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিপুণ রীতিতে। আসর সুরে, মৃদঙ্গের মেঘমন্দ্রধ্বনিতে ভ'রে উঠল। ললিতবাবু তারপর ধরলেন সুর ফাঁকতালে দরবারী কানাড়া—'বাজত ঝাঁঝ মৃদঙ্গ।'

তাঁর মধুকণ্ঠের সঙ্গে দুর্লভচন্দ্রের পাখোয়াজ মিলে আসর তখন জমজমাট।

হঠাৎ, যাঁরা ভট্টাচার্য মহাশয়ের সামনে বসেছিলেন তাঁদের চোখে পড়ল—তিনি শুধু বাঁ-হাতে বাজাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ ভাবতে পারেন নি যে, দুর্লভচন্দ্রের ডান হাত তখন সম্পূর্ণ বিবশ হয়ে পড়েছে এবং সেজন্যেই তিনি কেবল বাঁ-হাতে ঠেকা দিচ্ছেন! তারপরই তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন একেবারে। ল পড়বার আগে জড়িতস্বরে শেষ কথা উচ্চারণ করেছিলেন—'বাজাও।'

অকস্মাৎ তাঁকে জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়তে দেখে ললিতচন্দ্র বিমূঢ় হয়ে গান থামিয়ে ফেললেন। হায় হায় করে উঠলেন শোকবিহ্বল অনেক শ্রোতা। সুরের শান্ত আনন্দময় আসরে যেন বজ্রপাত হল। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ তৎপর হয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের আনালেন অবিলম্বে। কোন কিছুরই ত্রুটি হ'ল না। কিন্তু দুর্লভচন্দ্রের জ্ঞান আর ফিরে এল না। সেখানেই ২৮ ঘণ্টা জ্ঞানশূন্য অবস্থায় থাকবার পর শেষ নিঃশ্বাস পড়ল তাঁর। জ্ঞানের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গীত-সাধনার নিমগ্ন থেকে ভট্টাচার্য মহাশয় অনন্ত সঙ্গীত-লোকে প্রয়াণ করলেন।

কৌকভ খাঁ ও কোকভ রাগ বা কুকুভা

ওস্তাদ কৌকভ খাঁ তখন কিছুদিন থেকে কলকাতায় বসবাস আরম্ভ করেছেন। কিন্তু ভালভাবে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন নি এখানকার সঙ্গীত-সমাজে। পেশাদার তিনি, তাই প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত ব্যবসায়ীদের প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে তাঁকে নিজের আসন ক'রে নিতে হচ্ছে। জাতিতে পাঠান, স্বভাবে আফগানী ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতার অভাব নেই। নতুন ক্ষেত্র কঠোর পৌরুষে জয় ক'রে নেবার উদার মনোভাব আছে। আর সেই সঙ্গে অসাধারণ রেওয়াজী তৈরি হাত। শিশুকাল থেকে পিতা নিয়ামৎউল্লার তালিম পেয়েছেন, জ্যেষ্ঠ করামৎউল্লার সঙ্গে রেওয়াজ করেছেন জুটিতে। শুধু তৈরির দিক থেকেই আসর মাৎ করতে পারেন। তার ওপর রীতিমত গুণী। তাই কলকাতার সঙ্গীত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্থান করে নিচ্ছেন। এমন সময়কার এক আসরের কথা।

অবশ্য কৌকভ খাঁ প্রথম থেকেই কলকাতার সঙ্গীত-প্রেমী বাঙ্গালী ধনী সমাজের আনুকূল্য পেয়েছিলেন। তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কাশী থেকে। সে হ'ল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখন তাঁর পশ্চিমাঞ্চলে যথেষ্ট খ্যাতি হয়েছে, উত্তর ভারতের প্রায় সব দরবারে গুণপনার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। কিন্তু স্থায়ীভাবে কোথাও বসবাসের সুযোগ পান নি। প্রথম চাকুরি হয় তাঁর কলকাতায়, যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গীত-দরবারে।

তারও প্রায় ৬ বছর আগে, বর্তমান শতকের প্রারম্ভে, কৌকভ খাঁ এক মহা গৌরব অর্জন করেছিলেন। বিশ শতকের প্রথম বছরে ফ্রান্সের রাজধানীতে যে বিশ্ববিখ্যাত প্রদর্শনী (Paris Exhibition) হয়, সেখানে পৃথিবীর জাতিদের সামনে ভারতের নানা শিল্পকৃতির পরিচয় দেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। সেজন্য পণ্ডিত মতিলাল ভারত-বর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিধিত্ব করবার যোগ্য নানা শ্রেণীর শিল্পী, কারুশিল্পী প্রভৃতি এমন কি মল্লবীর পর্যন্ত বহু ব্যয়ে সেখানে নিয়ে যান। সেই দলে সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন কৌকভ খাঁ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ করামৎউল্লা খাঁ। একজন ধ্রুপদী ও সঙ্গতকারও ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। সেই প্যারীস প্রদর্শনীর একদিনের সঙ্গীতের আসরে সরদ বাজিয়ে সমবেত ইউরোপীয় শ্রোতাদের কৌকভ খাঁ চমৎকৃত করে দেন। সকলে বিশেষ ক'রে উদ্দীপিত হয়েছিলেন তাঁর অতি দ্রুত লয়ে বাজনার জন্যে।

সেই দ্রুততার জন্যে কলকাতার আসরেও তিনি চমক সৃষ্টি করতেন। অত দ্রুত বাজালেও তাঁর হাতে থেকে কখনও বেসুর শোনা যেত না—তাঁর বাজনা অনেকবার শুনেছেন এমন বিচক্ষণ শ্রোতাদের এই মত। অবশ্য, শুধু দ্রুত লয়ে বাজানোই তাঁর প্রধান বা একমাত্র কৃতিত্ব ছিল না—দ্রুততা ত শুধু অভ্যাসের ব্যাপার, সঙ্গীতের রস-সৃষ্টিতে তা কখনই বড় জিনিষ নয়। সেই সঙ্গে তাঁর রাগ-বিস্তারের নৈপুণ্য, রাগরূপের শিল্পসম্মত উপস্থাপনা ইত্যাদিও ওস্তাদসুলভ ছিল। সরদ ও ব্যাঞ্জো বাদকরূপে আসরে যথার্থ গুণী ও শিল্পী সত্তারই প্রকাশ করতেন তিনি।

তাঁর যে আসরে সেদিন বাজনার কথা এখানে বলা হবে, তা হ'ল ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটের মহিষাদল রাজপরিবারের ভবন। কৌকভ খাঁ তখন কলকাতার সঙ্গীতজগতে উদীয়মান কলাবত, তাই সে আসরের শ্রোতারা তাঁর গুণের পরিচয় পাবার জন্যে উৎসুক ছিলেন। কয়েকজন পেশাদার সঙ্গীতজ্ঞও আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, খাঁ সাহেবের গুণপনা সাক্ষাৎ জানতে।

এই আসরের আগে কোন কোন জলসায় এমন হয়েছে যে, কৌকভ খাঁ সুযোগ পেলে এখানকার গায়ক বা বাদককে অপদস্থ করেছেন। অন্য সঙ্গীতজ্ঞের ওপর নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ক'রে আসরকে প্রভাবিত করতে চেয়েছেন বৃহত্তর সঙ্গীতক্ষেত্রে প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্যে। হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল মশায়ের সঙ্গীতসভার আসরে তাঁর সঙ্গীতগুরু নন্দ দীঘল সেতারীর সঙ্গে বচসা করেছেন তিলক কামোদ রাগের বিস্তারের পদ্ধতি নিয়ে। নন্দ দীঘল অপমানিত হয়েছেন। এ পর্যন্ত যারা খাঁ সাহেবকে আসরে দেখেছেন তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে তিনি রীতিমত দাপটওয়ালা লোক। তাঁর ধাতুতে একটা আক্রমণাত্মক ভাব আছে যা তিনি প্রয়োজন বোধ করলেই প্রকট করতে পারেন।

কিন্তু এদিনের আসরে, ওয়েলেসলির মহিষাদল ভবনে, খাঁ সাহেবের যুদ্ধবিলাসী মনের আর একরকম প্রকাশ দেখা গেল। এখানেও তিনি সহ-সঙ্গীতজ্ঞদের ভীষণভাবে এক হাত নিলেন, কিন্তু সে আক্রমণের পদ্ধতি বিচিত্র। তা যেমন তির্যক, তেমনি তীব্র মর্মভেদী।

আসরে তিনি সচরাচর মাথায় পাগড়ি চড়িয়ে দরবারী পোষাকে বাজাতে বসতেন। এখানেও তেমনি মুরেঠা শোভিত হয়ে সরদ যন্ত্রটি স্বর মিলিয়ে নিলেন কোলে রেখে। আসরে কলকাতার কয়েকজন নামকরা গায়ক-বাদক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন বিখ্যাত ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোকভ খাঁ যন্ত্রে ঝঙ্কার তুলে আলাপচারী আরম্ভ করলেন। যে রাগটি তিনি বাজাতে লাগলেন, তা তেমন প্রচলিত ছিল না। (এবং এখনও প্রায় অপ্রচলিত)। রাগের নাম কোকভ বা কুকুভা। এটি বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত, সম্পূর্ণ জাতি। বাদী মধ্যম, সম্বাদী ষড়জ। উত্তরাঙ্গ প্রধান, অর্থাৎ তার গ্রামে স্বরবিহার বেশি। দু'টি নিখাদেরই ব্যবহার হয়, বাকি স্বর শুদ্ধ। ঝিঁঝিট ও আলাহিয়ার মিশ্রণে কোকভ বা কুকুভা গঠিত। এ রাগের এই ধ্যান পাওয়া যায়—

> সুপোষিতাঙ্গী রতি মাণ্ডতাঙ্গী
> চন্দ্রাননা চম্পকদামযুক্তা।
> কটাক্ষিণী স্যাৎ পরমা-বিচিত্রা
> দানেন যুক্তা কুকুভা মনোজ্ঞা॥

খাঁ সাহেব এ রাগ কেন নির্বাচন করেছিলেন বলা যায় না। হয়ত কলকাতার আসরে অপ্রচলিত ও অপরিচিত হবে মনে ক'রে এবং নিজের নামের সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্যেও বোধহয় আকর্ষণ বোধ ক'রে। যা হোক, খানিকক্ষণ আলাপ করবার পর বাজনা থামিয়ে যেন শিষ্টাচার বশে কাছাকাছি গুণীদের উদ্দেশে নিজের ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন—কেমন, ঠিক হচ্ছে ত?

তাঁদের প্রত্যেককে আলাদা ভাবে সবিনয়ে ওই প্রশ্ন তিনি করলেন—কেমন লাগছে আপনার? রাগ ঠিক আছে ত?

যাঁদের কাছে জানতে চাইলেন, তাঁরা সকলেই জানালেন যে, হ্যাঁ, চমৎকার হচ্ছে, সব ঠিক আছে।

তাঁরা হয়ত অতশত ভেবে বলেন নি। সভার মধ্যে যেমন ভদ্রতা, সৌজন্য দেখাতে হয় সেইভাবেও বলতে পারেন, বলা যায় না সঠিক। তবে হিন্দুর ভদ্রতার সুযোগ রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতিতে যেমন বিদেশীরা বরাবর নিয়েছে, কোকভ খাঁ তেমনি সঙ্গীতের আসরেও নিলেন।

কিন্তু গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়কে যখন কোকভ খাঁ ওইভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি সম্মতি জানালেন না। গম্ভীর মুখে নিরুত্তর রইলেন। খাঁ সাহেবের কথার কোন জবাব না দেওয়ায় তাঁর আচরণ অনেকের কাছে ভাল লাগল না। অসৌজন্য প্রকাশ পেলে যেন। যাঁরা প্রশংসা করেছিলেন, তাঁদের ব্যবহার বড় ভদ্র মনে হ'ল। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের ওইরকম স্বভাব ছিল, কি করবেন তিনি? যা মনোমত হয় নি তাকে সুখ্যাতি জানাতে পারতেন না। এজন্যে অনেক জায়গায় অপ্রিয় হতেন, জনপ্রিয় হ'তে পারতেন না কখনও। পছন্দ অপছন্দ, শাদা কালো সত্য-মিথ্যা তাঁর কাছে সুস্পষ্ট ছিল, কখনও মিলে-মিশে একাকার হয়ে যেত না। বিবেক বিসর্জন দিয়ে সকলের প্রিয় হবার দিকে লক্ষ্য ছিল না তাঁর। যেমন খাড়া বসে থাকতেন, তেমনি রইলেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের উত্তরের আশায় খানিক অপেক্ষা ক'রে খাঁ সাহেব তাঁর বোমা বিস্ফোরণ করলেন। মারাত্মক শ্লেষের সঙ্গে বললেন—উও ত 'দুম' হ্যায়! (ও ত লেজ!)

অর্থাৎ তিনি এতক্ষণ রাগের লেজ বা শেষাংশটি বাজিয়েছেন। রাগের পদ্ধতিগত সম্পূর্ণ রূপ এমন নয়।

যাঁরা সুখ্যাতি করেছেন, তাঁরা এই রাগের বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছেন তাঁরা নিজেদের।

কোকভ খাঁর কথায় তাঁদের মাথা হেঁট হয়ে গেল। উঁচু মাথা রইল শুধু গোপালবাবুর।

মুচকি হেসে তারপর খাঁ সাহেব জানালেন যে, এইবার তিনি যথার্থ রীতিসম্মত রাগালাপ করবেন, সকলে শুনুন।

এই ব'লে বাজনা আরম্ভ করলেন।

বসন্তের সেই গানটি

কোন কোন গুণীর বেশি প্রিয় থাকে একটি বা কয়েকটি রাগ। সেই সব রাগ তাঁরা গভীরভাবে সাধনা করেন, তাদের প্রগাঢ় রহস্য আর সৌন্দর্যের সন্ধান ও আস্বাদন করেন নিত্য নতুন ক'রে। অন্তরঙ্গ অনুশীলনের ফলে রাগগুলির রূপ-বিস্তারে তাঁরা অনন্য অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হন। তখন বলা যায়, তিনি সেই রাগে সিদ্ধ। তাঁর মতন ক'রে সেই রাগ যেন অনেকেই ফোটাতে পারেন না। সেই রাগ আর কারও গলায় বা বাজনায় বুঝি তেমনটি আর শোনা যায় না।

এমনিভাবে অনেক গুণীর একটি-দু'টি রাগে সিদ্ধিলাভের কথা জানা যায়। সেই সব রাগের সঙ্গে তাঁদের সাধকদের নামের স্মৃতিও অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে আছে। যথা, ধ্রুপদী মুরাদ আলী খাঁর মালকোষ ও ইমন। বীণকার-রবাবী সাদিক আলী খাঁর শুদ্ধ কল্যাণ ইমন কল্যাণ ও দরবারী কানাড়া। ধ্রুপদী যদু ভট্টের দরবারী কানাড়া। সুরবাহার-সেতারী ইমদাদ খাঁর পুরিয়া। ধ্রুপদী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ভৈরব। অঘোরনাথ চক্রবর্তীর ভৈরবী। সুরশৃঙ্গারবাদক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগেশ্বরী ও দরবারী কানাড়া। খেয়াল-গায়ক বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কামোদ। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর দরবারী কানাড়া। ধ্রুপদী মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কেদারা। ধ্রুপদী ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরট ও ধুরিয়া মল্লার। ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়ানট, ইত্যাদি।

তেমনি ধ্রুপদী হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসন্ত। এন্টালীর মধুকণ্ঠ গায়ক হরিনাথের বসন্ত রাগের গান একটি শোনবার বস্তু ছিল। একে ত তাঁর কণ্ঠে হৃদয়স্পর্শী জোয়ারি—অমন জোয়ারিদার গলা খুব কম গায়কদেরই শোনা গেছে—তার ওপর তাঁর সাধা বসন্ত রাগের হিল্লোল। 'মাধব মাধব মাধব' উত্তরাঙ্গ-প্রধান বসন্তের এই গানখানি যখন তিনি অপরূপ সুরেলা কণ্ঠে উদাত্ত চিত্তে গাইতেন, আসরে উদ্দীপনার সঞ্চার হ'ত। এমন কোন আসর নেই যা তিনি এই গানে মাতিয়ে দিতেন না। 'শঙ্কর উৎসব'-এর মতন বড় প্রকাণ্ড জলসা থেকে আরম্ভ ক'রে অনেক ঘরোয়া আসরে [illegible] বসন্ত গাইতে তিনি অনুরুদ্ধ হ'তেন আর মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখতেন শ্রোতাদের।

এই গানটির প্রসঙ্গে নাটোর মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের কথা এসে পড়ে। সেকথা বলবার আগে হরিনাথের সঙ্গীত জীবনের কিছু পরিচয় জেনে রাখা যায়।

বাংলার যে গুণীদের নাম কণ্ঠমাধুর্যের জন্যে অমর হয়ে থাকবার যোগ্য, বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন। কিন্তু আত্মপ্রচারে একান্ত বিমুখতার জন্যে তাঁর গুণের উপযুক্ত খ্যাতি তাঁর হয় নি, যদিও অতি নিষ্ঠাবান সঙ্গীতসাধক ছিলেন। গ্রামোফোন কম্পানী একাধিকবার আমন্ত্রিত হয়েও সম্মত হন নি রেকর্ড করতে। নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের এলাহাবাদ অধিবেশনে যোগ দিতে অনুরুদ্ধ হয়েও যান নি, দলাদলি এড়াবার জন্যে। অতি নির্বিরোধী, শান্তিপ্রিয় মানুষ। পরনিন্দা কোথাও হ'তে আরম্ভ হ'লে সেখান থেকে উঠে যেতেন, এমন চরিত্র বাংলা দেশে দুর্লভ!

শঙ্কর উৎসব প্রভৃতি অপেশাদার বার্ষিক জলসা ছাড়া কয়েকটি মাত্র ঘনিষ্ঠ বাড়ীর ঘরোয়া আসরেই বেশি গাইতেন তিনি। কলকাতার অন্য অনেক আসরেও কখনও কখনও গেয়েছেন এবং তখনকার সঙ্গীতরসিক ও গুণীরা তাঁর গুণপনার পরিচয় পেয়েছেন। স্বনামধন্য অঘোরনাথ চক্রবর্তী তাঁকে কৌতুক ক'রে এক একদিন বলতেন, 'তোর গলাটা আমায় দিতে পারিস?' কিংবা 'তোর মতন গলা যদি পেতাম!' সরোদী হাফিজ আলী খাঁ তাঁর গান শুনে বলেন, 'এমন সুরেলা গলা সারা ভারতে খুব কম শুনেছি।'

যে সব ঘরোয়া আসরে তাঁর গান বেশি হ'ত, তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হ'ল—এলগিন রোডের নাটোর ভবন, লালচাঁদ বড়ালের বাড়ী, এন্টালীর দেব লেনের দেব-গৃহ প্রভৃতি। এন্টালীর এই দেব পরিবারের গৃহ ছিল এ অঞ্চলে উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতচর্চার প্রধান কেন্দ্র। এ বংশের ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বিখ্যাত গায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন এবং রীতিমত সঙ্গীতচর্চা করতেন। এ পরিবারের আর এক ব্যক্তি, উপেন্দ্রনারায়ণ দেব এমন সঙ্গীতপ্রেমী ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন যে, ভারতের কোন গুণী কলকাতায় এলে তাঁর গান, বাজনার অনুষ্ঠান এ বাড়ীতে করতেনই, তা যত ব্যয়সাধ্যই হোক। এখানে আগমন ঘটেনি, এমন ওস্তাদ কমই ছিলেন। যাঁরা এ বাড়ীর আসরে বেশিবার যোগ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নাম করা যায় রমজান খাঁ, বিশ্বনাথ রাও, অঘোরনাথ চক্রবর্তী, আলাউদ্দীন ও হাফিজ আলী খাঁ, লালচাঁদ বড়াল প্রভৃতির। গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরির আগেকার যুগে এই পরিবারের উদ্যোগে গায়কদের মোমের চোঙায় ঘরোয়া রেকর্ড হয়েছিল। সেই সব ব্যক্তিগত রেকর্ডে লালচাঁদ বড়াল, হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির গান ধরা ছিল, কিন্তু পরে নষ্ট হয়ে যায়। সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদের এমনি নানা পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন এন্টালীর এই দেব-পরিবার!

হরিনাথের সঙ্গীত শিক্ষা ও সঙ্গীতচর্চাও দেব-গৃহের জন্যে সম্ভব হয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই তিনি স্বভাব সুকণ্ঠ ছিলেন এবং গান শিক্ষা করতেন শুনে শুনে। তাঁর বাড়ীও দেব লেনে। নিকট প্রতিবেশী হওয়ায় স্কুলজীবন থেকেই দেব-বাড়ীর সঙ্গীতের আসরে নানা গুণীর গান শুনে সঙ্গীতে আরও আকৃষ্ট হন। এ বাড়ীর ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেবের গান শুনে তিনি গাইতেন। একদিন এ বাড়ীর নীচের তলায় বসে তিনি গান গাইছেন, এমন সময় ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ওপর থেকে তা শুনে হরিনাথের প্রতিভার পরিচয় পান এবং রীতিমত শেখাতে চান তাঁকে। এইভাবে

হরিনাথের গান শিক্ষা আরম্ভ হয়। নিয়মিত রেওয়াজও তিনি করতেন দেব-পরিবারেরই এন্টালীর একটি বাগান-বাড়ীতে।

ছ'-সাত বছর তাঁকে গান শেখাবার পর নগেন্দ্র-নারায়ণের মৃত্যু হয়। তার পর হরিনাথ অঘোরনাথ চক্রবর্তীর কাছে ক'বছর শিক্ষার সুযোগ পান। এই পরিবারেরই আনুকূল্যে চক্রবর্তী মশায় মাঝে মাঝে দেব-বাড়ীতে গান উপলক্ষ্যে বাস ক'রে থাকেন। সেই সময় তাঁর কাছে শিখতেন হরিনাথ।

পরে তাঁর চাকুরিজীবন আরম্ভ হয়, কিন্তু সঙ্গীতচর্চা অব্যাহত ভাবেই চলে। সঙ্গীতকে সেকালের অনেক বাঙালী সঙ্গীতসাধকের মতন তিনি জীবিকারূপে নেন নি বটে, কিন্তু সঙ্গীতে তাঁর নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য ছিল পেশাদার ওস্তাদদেরই সমান। ভূবন [illegible] নামে তাঁর একজন শিষ্য ছিলেন। দেব-বাড়ীর সুরেন্দ্রনারায়ণকেও তিনি সঙ্গীত শিক্ষা দেন কিন্তু দক্ষিণা নেন নি কখনও। সেখানে সঙ্গীতজ্ঞই কেবল পরিচিত থাকেন। এই হ'ল তাঁর সঙ্গীত সাধনার ইতিবৃত্ত।

বসন্ত রাগে তাঁর সিদ্ধির কথা নিয়ে এ প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হয়েছিল। তেমনি ভৈরবীতেও সিদ্ধ ছিলেন তিনি। [illegible] ওই আসরে তাঁর সমাদর ছিল বেশি।

আগেও বলা হয়েছে, তাঁর গুণগ্রাহীদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ছিলেন জগদিন্দ্রনাথ রায়। নাটোর মহারাজ অনেক গুণের আধার। একদিকে তিনি যেমন ক্রিকেট ক্রীড়া-মোদী, অন্যদিকে তেমনি সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক। আবার সেই সঙ্গে শুধু সঙ্গীতপ্রেমী বা সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক নন, নিজে সঙ্গীতজ্ঞও; সঙ্গতকার ছিলেন, পাখোয়াজ বাজাতেন। পাখোয়াজ শিখেছিলেন মৃদঙ্গী গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। নিজের বাড়ীর কিংবা ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের ঘরোয়া আসরে পাখোয়াজ বাজাতেন। সঙ্গীতের সভায় একজন রসজ্ঞ সমঝদার ছিলেন জগদিন্দ্রনাথ।

হরিবাবুর গানের একজন মুগ্ধ শ্রোতা তিনি। কতবার বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়কে নিজের বাড়ীর আসরে আমন্ত্রণ করেছেন, তাঁর গান শুনেছেন। তাঁর গানের সঙ্গে বাজিয়ে-ছেনও কোন কোন দিন। বিশেষ করে, হরিবাবুর বসন্ত রাগের ওই গানখানি শুনতে তিনি ভালবাসতেন। কতবার ফরমায়েস ক'রে শুনেছেন—'বসন্তের সেই গানটি।' তাঁর আগ্রহে গানটি গেয়ে গায়কও বড় তৃপ্তি পেতেন।

ওই গানখানি জগদিন্দ্রনাথের এত প্রিয় হয়ে পড়ে যে, পরে আর তার সুরের নাম কিংবা ভাষাটাও বলবার দরকার বোধ করতেন না। শুধু বলতেন, সেই গানটি। আর হরিবাবু বসন্ত রাগে গাইতেন—মাধব মাধব মাধব।

জগদিন্দ্রনাথের যাঁরা অন্তরঙ্গ, তাঁরাও জানতেন হরি-বাবুর ওই গানখানি তাঁর কত প্রিয়—এবং তাঁর অনুরোধে গানটি গেয়েছেন হরিবাবু।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় জগদিন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। গড়ের মাঠে সকালবেলা বেড়াবার সময় একদিন মোটরের ধাক্কায় জীবনান্ত ঘটে তাঁর। আত্মীয়স্বজন থেকে আরম্ভ করে কলকাতার সাহিত্যিক সমাজ, সঙ্গীতজ্ঞ মহলেও এই বেদনা-দায়ক ঘটনা গভীর শোকের ছায়া ফেলে।

অনেক জ্ঞানীগুণীদের যে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া গেল তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে, তাঁদের উপস্থিতিতে। তিনি আর ইহলোকে নেই, কিন্তু তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর গৃহের শ্রাদ্ধসভায় তাঁরা সমবেত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ আছেন, বিশেষ হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

খানিকক্ষণ পরে অন্দর মহল থেকে লোক মারফৎ হরি-বাবুর কাছে অনুরোধ এল—'সেই গানটি' তিনি যেন একবার শোনান।

'সেই গানটি' যিনি শুনতে এত ভালবাসতেন, তাঁর এই শ্রাদ্ধবাসরের শোকগম্ভীর পরিবেশে গানখানি গাওয়া সময়োচিত সৃতিতর্পণই হ'ল।

বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় গাইতে আরম্ভ করলেন—মাধব মাধব মাধব…

সেই প্রাণস্পর্শী সুরে তেমনি গভীর দরদ দিয়ে তিনি গাইতে লাগলেন। জগদিন্দ্রনাথের আত্মা যেন সেখানে সমুপস্থিত, সভার সকলে যেন তাঁর স্নিগ্ধ-মধুর ব্যক্তিত্ব অন্তরে অনুভব করছেন, এমন আবহ সৃষ্টি হ'ল তাঁর গানে।

সকলের মনে হ'ল যেন কোন অদৃশ্য লোক থেকে আজও জগদিন্দ্রনাথ তাঁর সেই বসন্তের প্রিয় গানটি হরিবাবুর কণ্ঠে শুনছেন—

মাধব মাধব মাধব
মদন মথন মধুসূদন,
মনমোহন মদন জনক
মুকুন্দ মুরলিধর মুরারে।
মায়াপতি ভক্ত বৎসল হরে॥

বিশ্বামিত্র

চাণক্য সেন

।। বার ।।

হরিশংকর ত্রিপাঠি শিল্পমন্ত্রী হবার কিছু পরেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁরা পাখা কেটে দিলেন।

রাজনীতির বাইরের লড়াই সবাকার চোখে পড়ে। দলে দলে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, নীতিতে নীতিতে লড়াই। সে-লড়াই যখন সংবিধান-অনুমোদিত খোলা রাজপথে সবাকার দৃষ্টির সামনে ঘটে, তাকে বলা হয় গণতন্ত্র। তন্ত্র যাই হোক, বাইরের লড়াই ছাড়া রাজনীতি নেই।

যা লোকচক্ষুর বাইরে তা হ'ল রাজনীতির গোপন সংঘাত। ঠাণ্ডা লড়াই। ক্ষমতার উত্তাপে রাজনীতির গর্ভদেশ সর্বদা জলে; সেখানে সহকর্মীদের মধ্যে রেষা-রেষি, দুই আপাত-সমভাবীর মধ্যেও ভাবনা ও উচ্চাশার সংঘর্ষ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রাজনীতির এদিক বেশ ভাল জানেন; শীতল সংঘাতে হাত তাঁর পাকা। হরিশংকর ত্রিপাঠির সঙ্গে তাঁর মনের বা মতের মিল ছিল না। নিজেকে তিনি কখনও বিদ্বান্, উচ্চশিক্ষিত ভেবে অহংকার করতেন না, বড় বড় কিতাব পড়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিতে যাঁরা পারদর্শী, তাঁদের দলে ছিলেন না কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোনদিন। কিন্তু হরিশংকর ত্রিপাঠি যে স্কুলের পরে কলেজের মুখ দেখেন নি এজন্যে তাঁকে তিনি কিছুটা তাচ্ছিল্য করতেন। শ্রমিক-নেতৃত্ব ব্যাপারটা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে কখনও হাস্যকর, কখনও মেকি চাল মনে হ'ত। সমাজবাদী বা সাম্যবাদীরা শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে রাজনীতির হাতিয়ার রূপে কাজে লাগাবে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তা বুঝতে পারতেন। তারা শ্রেণী-সংগ্রামে কম বেশি বিশ্বাসী; সমাজের চতুরবর্ণ নিয়ে যে-সংগঠন, তার এক বর্ণের সবাধিপত্য তাদের লক্ষ্য। কিন্তু কংগ্রেস ত শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাস করে না! কংগ্রেস চায় চতুঃ-বর্ণের যুগপৎ সর্বোদয়; তার কাছে মালিক ও শ্রমিক, জমিদার ও চাষী, দুই কণ্ঠ-পাকড়ি-ধরিছে-আকড়ি শত্রু নয়। গান্ধীজি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম প্রজা-বিদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কৃষাণ সভা গঠন করে তার নেতা হয়ে বসেন নি। বল্লভভাই প্যাটেল 'সর্দার' খ্যাতি পেয়েছিলেন মজদুরদের সংঘবদ্ধ সংগ্রামে জয়লাভ করিয়ে: তিনিই সত্যিকার ভারতের প্রথম শ্রমিক-নেতা; অথচ, কই, তিনি ত পরিণত রাজনৈতিক জীবনে শ্রমিক-নেতার ভণ্ড ভূমিকা গ্রহণ করেন নি! অতএব, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিশ্বাস করতেন, কংগ্রেসে থেকে শ্রমিক-নেতা, কৃষাণ-নেতা, মালিক-নেতা, জমিদার-নেতা হওয়া অবাঞ্ছনীয়, বেআইনী। তা ছাড়া হরিশংকর ত্রিপাঠির শ্রমিক-নেতৃত্বের গোপন তথ্য তাঁর জানা ছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বলিষ্ঠ চরিত্র ভেজাল পছন্দ করত না। দুর্গাভাইএর গান্ধীপন্থী আদর্শবাদ তিনি শ্রদ্ধা করতেন। মন্ত্রীসভায় এমন চার-পাঁচজন সহকর্মী ছিলেন, কর্ম-ক্ষমতা, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব পরিমিত হ'লেও, তাঁদের মধ্যে ভেজাল ছিল না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁদের স্নেহ করতেন, কিছুটা শ্রদ্ধাও। শ্রদ্ধা তাঁর একেবারে ছিল না মাধব দেশপাণ্ডের মত ভীরু স্বার্থান্বেষীর প্রতি অথবা হরিশংকর ত্রিপাঠির মত (তাঁর মতে) ভেজাল শ্রমিক-নেতাকে।

ভেজাল ঘাটতে হ'ত কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে প্রতিদিন। তাঁর নিজের মধ্যেও ভেজাল। সে খবর তিনি জানতেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আত্মচেতনা ছিল রাজ-নৈতিক নেতার নয়, শিল্পীর। প্রদীপকে তিনি পাদ-দেশের অন্ধকারটুকু নিয়েই গ্রহণ করতেন। দেবতার পায়ে যে কাদা লেগে রয়েছে এ জ্ঞানটুকু তিনি কদাচ হারাতেন না। রাজনীতি করতে গিয়ে তিনি যতটা সম্ভব রসিক মন বাঁচিয়ে রাখতেন; তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে একটি গোপন কৌতুক-হাস্য সর্বদা চিক্ চিক্ করত। তিনি জানতেন রাজনীতির খেলা খেলতে গিয়ে তাঁকে অনেক ভেজাল ব্যবহার করতে হচ্ছে। এ প্রয়োগ অনেক সময় তিনি কৌতুকবোধ নিয়ে করতেন।

জানতেন, ক্ষমতার তপ্ত-স্বাদ তাঁর প্রিয়, পাওয়ারের মাদকতা রূপসী রমণীর কাঞ্চন যৌবনের মত নেশাপ্রদ। স্ত্রীলোকের নেশা কাটে, ক্ষমতার মাদকতা কাটিতে চায় না। জানতেন, এ মাদকতা ব'য়ে বেড়াবার উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব উদয়াচলে একমাত্র তাঁরই আছে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিষ্কলুষ ছিল না; রাজনীতি করতে গিয়ে নিজের সন্তানদের ভবিষ্যৎকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। কিন্তু তাঁর নীতিবোধ বর্ণ-পরিচয়ের সদা-সত্য-কথা-বলিবে, না-বলিয়া-পরদ্রব্যে-হাত-দিও-না-র নিস্তেজ সীমানায় বন্দী ছিল না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিশ্বাস করতেন, জীবনের নীতিবোধ দু'রকম, দুর্বলের ও সবলের। যে দুর্বল তার নীতিবোধ হওয়া উচিত শাস্ত্র, শিষ্ট, সদাচার-আশ্রিত। যে সবল, সে স্রষ্টা সে তার নিজের নীতি-মালার রচয়িতা। সিসিল রোড্‌স্ দুর্নীতি করেছিলেন, আবার তেমনি পূব-আফ্রিকায় ইংরেজের সাম্রাজ্যও স্থাপন করেছিলেন! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কার্লাইলের কথায় সায় দিয়ে বলতেন, জীবনে চলতে গিয়ে শেষপর্যন্ত একটা প্রশ্নই বড় হয়ে দাঁড়ায়—হোয়েদার ইউ ওয়াণ্ট টু বি এ হিরো অর এ কাওয়ার্ড। তুমি বীর হ'তে চাও, না ভীরু?

হরিশংকর ত্রিপাঠির রাজনৈতিক পাখা কাটতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মিছরি-ছুরি ব্যবহার করলেন।

একদিন ডেকে পাঠালেন ত্রিপাঠিজীকে জরুরী পরামর্শের জন্যে।

দুজনে একত্র হয়ে দু'চার দশটা সাধারণ কথা-বার্তার পর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আসল বিষয়ের অবতারণা করলেন।

মন্ত্রীদের মধ্যে কিছু কিছু দপ্তরের পুনঃ বণ্টন প্রয়োজন হয়েছে। কয়েকটি দপ্তরের পরিচালনায় তিনি সুখী বা সন্তুষ্ট নন। কোন কোন মন্ত্রীর সুদক্ষতার প্রমাণ পেয়ে তিনি তাঁদের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতে মনস্থির করেছেন। তাঁর নিজের দপ্তর-ভারও কিঞ্চিৎ লাঘব করা প্রয়োজন।

হরিশংকর ত্রিপাঠি বললেন, "আপনার এ সংকল্প প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই। আশা করি শ্রমিক-দপ্তর পরিচালনা আপনাকে কোনওরূপে হতাশ করে নি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিবেদন করলেন, "বরঞ্চ উল্টো, ত্রিপাঠিজী। আপনার সুদক্ষ নেতৃত্ব দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছি। মন্ত্রীসভা গঠনের সময় আপনি অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ দপ্তর চেয়েছিলেন। অকপটে স্বীকার করছি, তখন আপনাকে আমি পুরো বিশ্বাস করতে পারি নি। না, না, মানুষ হিসাবে, কংগ্রেসের নিরলস কর্মী হিসাবে আপনাকে আমি চিরদিন শ্রদ্ধা করে এসেছি। কিন্তু মন্ত্রীত্বে আপনি কতখানি যোগ্যতা দেখাতে পারবেন, আমার কিছুটা সন্দেহ ছিল। তা ছাড়া, যাঁরা আপনাকে আমার চেয়ে তখন বেশি জানতেন, অর্থাৎ আপনার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাঁদের কেউ কেউ—নাম বলতে অনুরোধ করবেন না—আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আজ অবশ্য আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ ক'বছর যেভাবে আপনি শ্রমিক-দপ্তরের নেতৃত্ব ক'রে এসেছেন, তাতে আপনার যোগ্যতার প্রচুর প্রমাণ আমি পেয়েছি। সুতরাং আপনাকে আমি অন্য কোনও দপ্তরের দায়িত্ব দিতে চাই।"

বিগলিত হরিশংকর জোড় হাতে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নমস্কার করলেন।

বললেন, "কোশলজি, কারা আপনার কানে আমার সম্বন্ধে কুৎসা রটিয়েছে আমার জানা নেই। কিন্তু আমি কায়মনোবাক্যে আমার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। আজ যদি আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে আপনি নিঃসন্দেহ হয়ে থাকেন, সে আপনার গৌরব। শুধু এটুকু বলতে চাই, যে দায়িত্বই আমাকে দেন না কেন, আমি যথাসাধ্য পালন করব। এবং, আমাকে বিশ্বাস করে আপনি কদাচ ঠকবেন না।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে বললেন, "সে আমি জানি হরিশংকরজি।"

কিঞ্চিৎ ইতস্তত ক'রে হরিশংকর প্রশ্ন করলেন, "কোন্ দপ্তরের ভার আমার ওপর ন্যস্ত হবে জানতে পারি কি?"

"এখনও তা আপনাকে সঠিক বলতে পারব না, ত্রিপাঠিজি। একাধিক দপ্তরের কথা আমি ভাবছি। কিন্তু পুনঃ বণ্টনের ব্যাপারে একসঙ্গে অনেক কথা বিচার করতে হচ্ছে। যে দপ্তরের ভারই আপনাকে দি' না

কেন, বর্তমানের চেয়ে আপনার দায়িত্ব অনেকে বেড়ে যাবে।"

এই কথাবার্তার এক সপ্তাহ পরে মন্ত্রীসভার দপ্তর পুনঃবণ্টিত হয়েছিল। হরিশংকর হয়েছিলেন শিল্পমন্ত্রী। নিজের একান্ত বিশ্বাসভাজন নিরঞ্জন পরিহারকে দেওয়া হয়েছিল শ্রমিক দপ্তরের দায়িত্ব।

হরিশংকর ত্রিপাঠি প্রথমে বেশ খুশি হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, তাঁর নিজস্ব শ্রমিক-দলের সাহায্যে শিল্পপতিদের সঙ্গে এক নতুন ধরণের সম্পর্ক তিনি স্থাপন করতে পারবেন। ভেবেছিলেন, প্রাদেশিক শ্রমিক কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে মালিকদের কাছে তিনি অসামান্য খাতির পাবেন; শ্রমিক ও মালিকদের সহযোগিতার নতুন পথের হবেন দিগ্‌দর্শক।

বছর খানেকের মধ্যে এ স্বপ্ন তাঁর ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

প্রথম ধাক্কা এল মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে। শাসন-যন্ত্রকে উন্নত করবার জন্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রস্তাব করলেন মন্ত্রীদের কেউ কংগ্রেসের সংগঠন-ক্ষেত্রে নেতৃত্ব-পদে বহাল থাকবেন না। হাই কমাণ্ড প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। হরিশংকর ত্রিপাঠিকে প্রাদেশিক জাতীয় মজদুর কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইস্তফা দিতে হ'ল। শুধু তাই নয়, নিরঞ্জন পরিহার সুকৌশলে যাঁকে এ পদে বহাল করলেন তাঁর সঙ্গে হরিশংকরের প্রাচীন ব্যক্তিগত বৈরিতা।

কিছুদিনের মধ্যে বিলাসপুরের কাপড়ের কলে ধর্মঘট বাধল। দেখা গেল, নিরঞ্জন পরিহারের শ্রমিক-নীতি অন্যপথ ধরেছে। তিনি শ্রমিকদের অধিকাংশ দাবি সমর্থন করলেন মালিকরা ভূতপূর্ব মন্ত্রীর নীতি আঁকড়ে ধ'রে শ্রমিকদের কাছে হরিশংকর ত্রিপাঠির মান-মর্যাদা অনেকখানি কমিয়ে দিলেন। নিরঞ্জন পরিহার মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ণ সমর্থন নিয়ে শ্রমিক-মালিক বিবাদ মেটাবার জন্যে এ্যাডজুডিকেটর নিযুক্ত করলেন। শ্রমিকরা পেল অনেক কিছু। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রভাব বেড়ে গেল তাদের মধ্যে। এ্যাডজুডিকেটরের আদালতে নিরঞ্জন পরিহারের উৎসাহ পেয়ে শ্রমিকদের মুখপাত্ররা এমন অনেক কিছু গোপন তথ্য প্রকাশ ক'রে দিল, যাতে শ্রমিকদের জানতে বাকী রইল না যে, হরিশংকর ত্রিপাঠি আসলে তাদের চেয়ে মালিকদের স্বার্থকেই বেশি রক্ষা ক'রে এসেছেন।

হরিশংকর ত্রিপাঠির রাজনৈতিক জীবনে শ্রমিক-নেতার ভূমিকায় যবনিকা পড়ল।

এই নাটকীয় ঘটনার উদয়াচলের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে একটি নারীর আবির্ভাব হ'ল। তার নাম সরোজিনী সহায়। হরিশংকর ত্রিপাঠি যে শ্রমিক-নেতৃত্ব চিরদিনের জন্যে ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, যে-নেতৃত্ব গ্রহণ করবার যোগ্যতা নিরঞ্জন পরিহারের ছিল না, যার মূল্য বা প্রয়োজন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল তখনও অনুভব করেন নি, সে-নেতৃত্ব হঠাৎ দখল ক'রে বসল সরোজিনী সহায়। পরবর্তীকালে দেখা গেল সরোজিনী সহায় উদয়াচলের রাজনীতিতে ভ্রষ্ট উর্বশী।

হরিশংকর ত্রিপাঠি ও সুদর্শন দুবে একসঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখ্যমন্ত্রীপদে পুন নির্বাচনের বিরোধিতা করছিলেন।

সুদর্শন দুবের উচ্চাশা মুখ্যমন্ত্রীত্ব নিজের আয়ত্তে আনা। কিন্তু হরিশংকরের সঙ্গে হাত মেলাতে গিয়ে তিনি এ উচ্চাশা সাময়িকভাবে হজম করতে প্রস্তুত ছিলেন। ত্রিপাঠিজিকে তিনি বুঝিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী হবার যোগ্যতা তাঁরই সবচেয়ে বেশি।

চন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে নিজের খাস দপ্তরঘরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যখন কথা বলছিলেন, তখন মধ্যাহ্ন আহারের অবসরে হরিশংকর ত্রিপাঠির বাড়ীতে একটি রাজনৈতিক চক্রের বৈঠক বসেছিল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হরিশংকর, সুদর্শন দুবে, মহেন্দ্র বাজপাই, প্রজাপতি শেউড়ে এবং আরও চারজন কংগ্রেসী নেতা, যাঁদের সহযোগিতায় সুদর্শন দুবে অনেকখানি নির্ভর করছিলেন।

সুদর্শন দুবে বলছিলেন, "হাই কমাণ্ড থেকে আজ বা কাল পরিষ্কার নির্দেশ আসবার কথা। আমরা চাইছি, হাই কমাণ্ড নির্দেশ দিন কোশলজি মুখ্যমন্ত্রীত্বের জন্যে দাঁড়াতে পারবেন না। তার বিরুদ্ধে অভিযোগের যে স্মারকলিপি পাঠান হয়েছে তার ওপর আমরা হাই কমাণ্ডের অভিমত চেয়েছি।"

প্রজাপতি পেউড়ে বললেন, "নিরঞ্জন পরিহারের দিল্লী মিশন সম্বন্ধে কিছু খবর পেয়েছেন?"

সুদর্শন জবাব দিলেন, "যা জানতে পেরেছি তাতে হাই কমাণ্ডের মনোভাব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।"

প্রজাপতি পেউড়ে পকেট থেকে একখানি পত্র বার করলেন। বললেন, "এই চিঠি গতকাল দিল্লী থেকে এসেছে। রমেশ পাতিলের চিঠি। লিখেছে, আমাদের অভিযোগে হাই কমাণ্ড খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করছেন না। তা ছাড়া, কোশলজির অনুপস্থিতিতে উদয়াচলে স্থায়ী ও বলিষ্ঠ মন্ত্রীসভা গঠন সম্ভব কি না সে বিষয়েও হাই কমাণ্ডের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

সুদর্শন দুবে বললেন, "এ সন্দেহ দূর করতে হবে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল ছাড়াও উদয়াচলে কংগ্রেসী শাসন চলবে, বরং আরও ভালভাবে চলবে, হাই কমাণ্ডকে তা বোঝাতে হবে।"

মহেন্দ্র বাজপাই মন্তব্য করলেন, "আপনি ত বোঝাবার চেষ্টা কম করেন নি। কিন্তু বড় কর্তারা বুঝছেন কই?"

উত্তেজিত কণ্ঠে সুদর্শন দুবে বললেন, "যদি না বুঝে থাকেন, সে দায়িত্ব আপনাদের। আপনারা আমার সঙ্গে একমন নিয়ে দাঁড়াচ্ছেন না।"

এমন কঠিন অভিযোগের হরিশংকর ত্রিপাঠি ছাড়া সবাই প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন।

সুদর্শন দুবে ব'লে চললেন, "আপনাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি সত্যিকারের মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। কোশলজীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও আপনারা তলে তলে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আসছেন। যদি আমি হারি, আপনাদের যাতে অন্তত মন্ত্রীত্বটুকু থাকে।"

এমন সময় চাকর এসে খবর দিল মাধব দেশপাণ্ডের উপস্থিতির।

মাধব দেশপাণ্ডে ঘরে ঢুকে দেখলেন আহার্য-সামগ্রী অর্ধভুক্ত প'ড়ে আছে, ঘরময় থমথমে গাম্ভীর্য।

বিব্রত হয়ে দেশপাণ্ডে বললেন, "অবস্থা বুঝি আশাপ্রদ নয়?"

সুদর্শন দুবে শুধু বললেন, "বসুন।"

মাধব দেশপাণ্ডে আসন গ্রহণ করলে হরিশংকর ত্রিপাঠি প্রথম কথা বললেন।

"কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল সহজ প্রতিপক্ষ নন। একবার হারলেও দ্বিতীয়বার তিনি হারতে চাইবেন না। সুদর্শন ভায়া, আপনি বোধ করি যথেষ্ট তৈরি না হয়েই সমরে নেমেছেন।"

সুদর্শন দুবে বললেন, "মোটেই নয়। প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রায় সম্পূর্ণ আমাদের সঙ্গে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে পদত্যাগ করতে আমরা বাধ্য করেছি। দেখেছেন ত, বিধান সভার অধিকাংশ কংগ্রেসী সদস্য আমাদের পক্ষে ভোট দিয়েছে।"

"দিয়েছিল", হরিশংকর ত্রিপাঠি সুদর্শন দুবেকে সংশোধন করলেন। "প্রথম পর্বে আমরা জিতেছি। কিন্তু সে জেতার মধ্যেও অর্ধেক পরাজয়। যদি সেদিনই সে-সভায় আপনি নতুন নেতা নির্বাচন করিয়ে নিতে পারতেন, জয়লক্ষ্মী আপনার বশীভূত হতেন। আপনি—আমরা—তা পারি নি। কোশলজী এক সপ্তাহের সময় পেয়ে আসল সংগ্রামে অর্ধেক জিতে গেছেন।"

সুদর্শন দুবের মুখে কথা সরল না। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পরে নিরুত্তেজ কঠিন স্বরে প্রশ্ন করলেন, "তা হ'লে এখন কি আমরা রণে ভঙ্গ দেব?"

ত্রিপাঠি বললেন, "না। আমাদের কাউকে দিল্লী যেতে হবে।"

"কে যাবে?"

"আপনি।"

"আমি যেতে প্রস্তুত। কিন্তু এখানকার সব কিছু আপনারা সামলাবেন ত?"

সাংগঠনিক চারজন নেতাই মত দিলেন, বর্তমান সঙ্গীন মুহূর্তে সুদর্শন দুবের বিলাসপুর ত্যাগ করা উচিত হবে না।

মহেন্দ্র বাজপাই বললেন, "উড়ে যাবেন, উড়ে আসবেন। দুদিনে এখানে এমন কি গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হবে?"

নেতা চারজন পুনরায় বললেন, এ কাজ উচিত হবে না।

হরিশংকর ত্রিপাঠি মৃদু হেসে বললেন, "সুদর্শনজি, দু'দিনের জন্যে যাদের ছেড়ে দিতে ভয় পান, তেমন সমর্থকদের নিয়ে রাজত্ব করা আপনার কঠিন হবে।"

সুদর্শন দুবে কঠোর স্বরে জবাব দিলেন, "আনুগত্য, ত্রিপাঠিজি, একমাত্র ক্ষমতার তাপে শক্ত হ'য়ে লেগে থাকে। যতক্ষণ দলের সদস্যরা ভাববেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলই মুখ্যমন্ত্রীত্বে বহাল থাকছেন, ততক্ষণ তাদের আনুগত্য পদ্মপাতায় শিশিরবিন্দু। কিন্তু যে-মুহূর্তে আমরা তাঁকে গদিচ্যুত করতে পারব, সে মুহূর্তে সবাই একে একে, দলে দলে আমাদের সঙ্গে আঠার মত লেগে থাকবেন।"

মাধব দেশপাণ্ডে অভ্যাসবশত ব'লে উঠলেন, "নারায়ণ! নারায়ণ!"

মহেন্দ্র রাজপাই বললেন, "দুবেজি যদি দিল্লী যেতে না পারেন, তা হ'লে এ গুরু কর্তব্যের দায়িত্ব বহন করতে পারেন একমাত্র দেশপাণ্ডেজি।"

মাধব দেশপাণ্ডে ব'লে উঠলেন, "অসম্ভব। আমি কদাচ এ কাজ গ্রহণ করতে পারব না।"

সুদর্শন দুবে প্রশ্ন হাঁকলেন, "কেন?"

"আমার দেহ সুস্থ নেই। কাল থেকে বাতের ব্যথাটা বড় বেড়েছে।"

"কূটনৈতিক অসুস্থতা?"

"অসুস্থতাটা সত্যিকারেরই। তবে ইচ্ছে হ'লে কূটনৈতিকও বলতে পারেন। আমার পক্ষে এ ব্যাপারে দিল্লী যাওয়া যে কতখানি নিরর্থক, দুবেজি ভালই জানেন। উদয়াচলের রাজনীতিতে মহারাষ্ট্র-সম্প্রদায়ের স্থান নগণ্য। এ রাজনীতির নেতৃত্ব আপনাদের। হাই কমাণ্ডকে যদি বোঝাতে হয় আপনারাই বোঝাবেন।"

সুদর্শন দুবে ঈষৎ হেসে বললেন, "কিন্তু আপনাকে ত আমরা মুখ্যমন্ত্রী করব ভেবে এসেছি।"

মাধব দেশপাণ্ডেও পাণ্ডুর হাসলেন।

"দুবেজি, আপনি রসিক লোক ব'লে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু বাতব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষের রসবোধটা যদি প্রখর না থাকে তা হ'লে মার্জনা করবেন।"

তের

সকালে পূজার ঘরে পদ্মাদেবী যখন মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, "তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে," প্রশ্ন করেছিলেন, "কখন সময় হবে?" তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না এই নিশ্ছিদ্র ব্যস্ততার দিনে পত্নীর সঙ্গে কথোপকথনে সময় নষ্ট করেন। কিন্তু পদ্মাদেবীর প্রশ্নের মধ্যে নিহিত কঠিন দাবির দুর্নীভূত ব্যঞ্জনা তখনই তাঁর কানে লেগেছিল। পরমুহূর্তে, তাঁর নিস্তেজ আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে পদ্মাদেবীর অনুরোধ আদেশের চেয়েও কঠোর ভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল: "দুপুরে বাড়ী এসে খেও। তারপর কথা হবে।" কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বুঝেছিলেন, এ দাবি না মেনে উপায় নেই। সারাদিনে আজকাল বহুদিন পদ্মাদেবীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সামান্য, বহুদিন দুপুরে খাবার পর্যন্ত তাঁকে দপ্তর-বাড়ীতে গ্রহণ ক'রে সারা অপরাহ্ন অবিরাম কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। রাত্রেও অনেক সময় দপ্তর-বাড়ীতেই তিনি শয্যাগ্রহণ করেন। স্ত্রীর সঙ্গে যে-সাক্ষাৎটুকু তিনি একেবারে এড়াতে পারেন না, সেটি প্রাতঃকালে পূজার ঘরে পদ্মাদেবীর নীরব উপস্থিতি। পূজার সময় পদ্মাদেবী কথা বলেন না। দু'ঘণ্টা গৃহ-দেবতার পদতলে চোখ বুজে নীরবে স্বামীর দুরত্ব উপেক্ষা ক'রে তাঁর সঙ্গে একত্র ব'সে থাকেন। পূজার পর কখনও বা দু'চারটে মামুলী কথাবার্তা হয়, কোনও দিন বা হয় না। যেদিন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দুপুরে আহারের জন্যে বাড়ী আসেন, পদ্মাদেবী নিজের হাতে তাঁকে ভোজ্য পরিবেশন করেন। সাধারণতঃ এ সময়ে আরও কেউ কেউ নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রাজনীতি বা দলনীতি নিয়ে আলোচনা চলে, পদ্মাদেবী নিজের উপস্থিতিকে যত সম্ভব সংক্ষিপ্ত, সংকুচিত রাখেন। মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাড়ীতে শুতে আসেন। পদ্মাদেবী স্বামীকে বিছানায় শুইয়ে মশারি গুঁজে দিয়ে কখনও কদাচিৎ পাশের চেয়ারে বসে দু'চারটে কথা বলেন নিতান্ত সাংসারিক বিষয়ে। আবার কখনও কোন কথাই বলেন না।

স্বামী-স্ত্রীর এ বিরাট ব্যবধান ধীরে ধীরে বহুদিনে

তৈরি ; এখন দু'জনেরই প্রাচীন অভ্যাস। পরিণত যৌবনে জনসাধারণের কর্মপরিধিতে প্রবেশ করার পর কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জীবনে অন্য রমণীর পদসঞ্চার ঘটেছে, কিন্তু পদ্মাদেবীর সঙ্গে ব্যবধানের তাই একমাত্র কারণ নয়। প্রধান কারণ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রাজনীতি। তার সঙ্গে পদ্মাদেবী নিজেকে একেবারে মানিয়ে নিতে পারেন নি ; পদ্মাদেবীর কোন প্রয়োজন বোধও করেন নি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। দৈহিক সম্পর্ক তাঁদের মধ্যে বহু বছর শেষ হয়ে গেছে ; আত্মিক কোনও সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে নি। পদ্মাদেবীর নীতিবোধ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে দুর্বল প্রতিবাদের চেয়ে বেশি মর্যাদা পায় নি। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ঘরের সুনীতি দিয়ে যে রাজনীতি করা যায় না পদ্মাদেবীকে তিনি বার বার তা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। সেও কয়েক বছর আগেকার কথা।

চন্দ্রপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়েই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দপ্তর-বাড়ী থেকে নামলেন। সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে নীচে আসতে দেখতে পেলেন তিওয়ারী দাঁড়িয়ে।

"দুর্গাপ্রসাদভাই তিনটের সময় আসছেন।"

"কে?"

"দুর্গাপ্রসাদভাই।"

"কি দরকার তার?"

"আপনি তাকে আসতে বললেন, তাই।

"ও। আচ্ছা।"

"গোপালকৃষ্ণণকে চারটের সময় আসতে বলেছি।"

"বেশ।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পা বাড়ালেন।

"আরও খবর আছে।"

"বল।"

"কিছুক্ষণ আগে হরিশংকরজির বাড়ীতে ও-পক্ষের বৈঠক বসেছিল।"

"কে কে ছিল?"

"ত্রিপাঠিজি, দুবেজি, প্রজাপতি শেটুঢ়ে, মহেন্দ্র বাজপাইজি, দেশপাণ্ডেজি।"

"ঐ মেয়েটি ছিল না?"

"না।"

"তার সঙ্গে দেখা করেছ?"

"সন্ধ্যাবেলা করব।"

"তুমি নিজে যেয়ো না।"

"না।"

"বৈঠকে কি হ'ল?"

"দুবেজি নাকি খুব গরম গরম কথা বলেছেন।"

"হুঁম্। একটা কাজ কর।"

"বলুন।"

"আচ্ছা, এখন থাক। আমি খেতে যাচ্ছি। তুমি খেয়েছ?"

"না।"

"খেয়ে নাও। পরে দেখা ক'রো।"

তিওয়ারী বিদায় নিলে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চন্দ্রপ্রসাদকে বললেন, "তোমার খাওয়া হয়েছে, রাজকুমার?"

"অনেকক্ষণ, পিতাজি। বেকার মানুষের ভয়ংকর খিদে পায়।"

"পাইলট হ'তে যাচ্ছ। দেহ মজবুত রাখতে হবে ত!"

"দেহ খুব মজবুত আছে, পিতাজি।"

"তুমি একটা কাজ করতে পারবে?"

"নিশ্চয় পারব।"

"কি কাজ না জেনেই বলছ?"

"আপনি কি এমন কিছু কাজ আমায় দেবেন যা আমার অসাধ্য?"

"এ কাজটা সহজ নয়।"

"আপনার জন্যে দু-একটা কঠিন কাজ আমি করেছি, পিতাজি।"

"তা করেছ।"

"তা হ'লে বলুন।"

"বসন্তকে বিয়ে করতে পারবে?"

চন্দ্রপ্রসাদকে চুপ দেখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তার কাঁধে হাত রাখলেন।

"চুপ কেন? লজ্জা করছে?"

"না পিতাজি।"

"যদি পার ক'রে ফেল। তোমরা দুজনে রাজী হ'লে আমি গিয়ে দুর্গাভাইএর কাছে প্রস্তাব করব।"

"আপনি?"

"দুর্গাভাই এ প্রস্তাব নিয়ে কদাচ আমার কাছে আসবেন না।"

"তাতে আপনার অসম্মান হবে, পিতাজি।"

"অসম্মান? অসম্মান হবে কেন? তুমিই ত একটু আগে বলছিলে তোমাদের জন্যে সত্যিকারের সম্মানজনক কিছু আমি করি নি। তুমি এয়ার ফোর্সে যাচ্ছ, তাও আমার কিছুমাত্র সাহায্য না নিয়ে, জেনে বড় আনন্দ হচ্ছে, রাজকুমার। তোমার জন্যে এটুকু করতে আমার অসম্মান হবে না।"

"কিন্তু, পিতাজি, কন্যাপক্ষেরই ত আপনার কাছে আসা উচিত।"

"দুর্গাভাই মেহ্‌তা সাধারণ লোক নন। তাঁর নীতি-বোধ অত্যন্ত প্রখর। আমি যতদিন মুখ্যমন্ত্রী, আমার পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে কখনও তিনি এ গৃহে উপস্থিত হবেন না।"

বাড়ীতে ঢুকে দেখলেন পদ্মাদেবী বারান্দায় অপেক্ষা করছেন।

হালকা স্বরে বললেন, "আমি কি অতিথি যে দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমার অপেক্ষা করছ?"

পদ্মাদেবী মৃদু স্বরে বললেন, "বড় দেরি হয়ে গেল। এত বেলায় খেলে শরীর ঠিক থাকে না।"

"তবু ভাল আজ নিমন্ত্রিত কেউ নেই।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্নানঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুলেন। খাওয়ার বড় ঘরের দিকে পা বাড়াতে পদ্মাদেবী বললেন, "ও-ঘরে নয়। আমার ঘরে তোমার খাওয়া দেওয়া হয়েছে।"

এঘর বাড়ীর ভেতরের দিকে, পেছনের বাগানের গায়ে। বহুদিন পরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পত্নীর ঘরে প্রবেশ করলেন।

মেঝেয় রেশমী আসন পেতে আহারের ব্যবস্থা। কাঁসার থালে গরম লুচি, বেগুন ভাজা ও তরকারি। আচমন ক'রে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আহারে প্রবৃত্ত হলেন। পদ্মাদেবী অদূরে মেঝেয় বসলেন।

তরকারি মুখে দিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "নিজের হাতে রেঁধেছ দেখছি।"

পদ্মাদেবী ম্লান হাসলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "কি সব কথা আছে বলছিলে। ব্যাপারটা গুরুতর মনে হচ্ছে। বলতে সুরু কর।"

"আগে খেয়ে নাও।"

"জানই ত আমি ধীরে-আস্তে খাই। খাওয়ার পরে বেশিক্ষণ বসতে পারব না। আজ এক মুহূর্তের অবকাশ নেই।"

"তা হ'লে বলি। আমার কোনও কথা তুমি কোনও দিন শোন নি। জানি আজও শুনবে না। তবু বলব।"

"বল।"

"তোমার সংগ্রামের সংবাদ কি?"

"জয় নিশ্চিত মনে হচ্ছে।"

"তা হ'লে আমাকে বলতেই হবে।"

"বলো না।"

"তুমি এই গদী এবার ছেড়ে দাও।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নীরবে একখানা লুচি শেষ করলেন।

তারপর বললেন, "কেন?"

"তোমার বয়স হয়েছে। এ পরিশ্রম আর তোমার সইবে না। দেহ ভেঙ্গে যাবে।"

"অর্থাৎ, মরে যাব। এ বয়সে মৃত্যুকে ত ভয় পাবার কথা নয়।"

"মরে যাওয়া-না-যাওয়া ভগবানের হাত। তোমার বয়স হয়েছে। অনেকদিন ত এ কাজ করলে। এবার অন্যরা করুক।"

"যাদের করার সম্ভাবনা তাঁদের বয়স আমার চেয়ে বিশেষ কম নয়।"

"তা হ'লে নতুন কাউকে এ দায়িত্ব দিয়ে দাও।"

"মুখ্যমন্ত্রীত্ব ত আমার জমিদারী নয় যে উইল করে কারুর হাতে তুলে দেব! এ হ'ল রাজনীতির লড়াই। আজ যদি আমি না থাকি, তবে কার হাতে যাবে আমি কি ক'রে বলব?"

"দেশ-শাসন কেবলমাত্র রাজনীতি হয়ে গেল কেন? দীর্ঘকাল তোমরা দেশের সেবা করে এসেছ। এখন করছ দেশের কল্যাণ, উন্নতি, সংগঠন। এর চেয়ে বড় কাজ আর কি হ'তে পারে? এত বড় উত্তরাধিকার বইতে পারার মত মানুষ তোমরা তৈরী করছ না কেন? কেন এই দেশকল্যাণ কেবল রাজনীতি হয়ে উঠল?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সহজে প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "এ প্রশ্ন আমার মনেও অহরহ জেগে রয়েছে। আমরা স্বাধীনতা পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের প্রায় সব নেতাদেরই শাসনকার্যে যোগ দেবার আহ্বান এল। এমন যে নীতি-পরায়ণ দুর্গাভাই, তিনিও সরকারের বাইরে থাকতে পারলেন না। ক্ষমতার উত্তাপে আমাদের অন্তরে ঘুমন্ত সকল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল: শাসনকার্যকে আমরা রাজনীতি ক'রে তুললাম। অথচ হাজার হাজার দেশকর্মী, যারা বছরের পর বছর ইংরেজ আমলে দেশের জন্যে আত্মত্যাগ করেছে, তাদের আমরা রাখলাম শাসন ও সংগঠনের বাইরে। পুরাতন আমলাতন্ত্র নিয়েই সুরু হ'ল আমাদের জনকল্যাণ রাজত্ব। আজ আমরা রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে এমন জড়িয়ে গেছি যে, এর থেকে মুক্তির পথ বুঝি আর খোলা নেই। এর মধ্যে, এই আমাদের সবকিছু প্রচেষ্টার মধ্যে, কোথায় যেন মস্ত বড় ফাঁক আর ফাঁকি রয়ে গেছে। তার আন্দাজ পাই, অথচ তার চেহারা খুঁজে বার করবার অবকাশ নেই, উপায় নেই। প্রদীপের আলো যখন কমে আসে, সে দপ্ দপ্ করে বেশি তেজে জ্বলতে চায়; নতুন তেল না হ'লে যে সে আর জ্বলবে না এ জ্ঞান তার থাকে না।"

"তুমি ত অনেক করেছ। এবার তুমি এ দায়িত্ব ছেড়ে দাও।"

"আমি করি নি কিছুই, পদ্মাবাঈ। পাঁচ বছর মুখ্যমন্ত্রী থাকবার পরে এখন যেন পরিষ্কার দেখতে পাই কত কিছু না-করা রয়ে গেছে, যা-কিছু করেছি তার মধ্যে কত ফাঁক, কত ভেজাল। এ দেশের মাটিতেই বুঝি এমন কিছু রয়েছে যা পূর্ণতার পথ চিরদিন আগলে দাঁড়ায়। ধরো, এই এমন সাধের আমার বিদ্যামন্দির-গুলি। ভেবেছিলাম, সমস্ত উদয়াচলে হাজার হাজার বিদ্যামন্দির স্থাপন ক'রে দশ বছরে নিরক্ষরতা অনেকখানি দূর ক'রে দেব। গ্রামে গ্রামে স্কুল খোলা হ'ল, শিক্ষক নিযুক্ত হ'ল, অর্থ খরচ হ'ল অনেক। অথচ পরিণামে দেখা গেল, স্কুল আছে ত শিক্ষক নেই, শিক্ষক আছে ত ছাত্র নেই। এমন কি এমন অনেক 'স্কুল' আছে যার অস্তিত্ব কেবল সরকারী ফাইলে, রিপোর্টে।"

"এ গলদ দূর করবার ক্ষমতা তোমার আর নেই। তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, তোমার শক্তি কমে গেছে। এবার তুমি ছেড়ে দাও।"

"বার বার তুমি একথা বলছ কেন?" কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কণ্ঠে এবার উষ্মা।

"শুধু এ জন্যে, যে আমার ভয় করছে।"

"কিসের ভয়?"

"এতকাল তুমি উদয়াচলের নেতৃত্ব করে এসেছ তোমার দুর্বলতা, আর কেউ না জানুক, আমি জানি। অন্যায় করেছ, স্খলন হয়েছে বার বার তোমার। তবু তোমার অসীম শক্তিতে তুমি তাদের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছ। অনেকে তোমার বদনাম করে, নিন্দা করে, কিন্তু সবাই তোমাকে শ্রদ্ধাও করে। জানে, তুমি দশ ভাগ অন্যায় করেও নব্বুই ভাগ ন্যায় ক'রে থাক। গত পাঁচ বছরে তুমি মুখ্যমন্ত্রীর সমুচিত অনেক কিছু করেছ; সঙ্গে সঙ্গে উদয়াচলের জন্যে যা করতে পেরেছ আর কেউ তা পারত না।"

"তা হ'লে?"

"কিন্তু এবার তোমার পতন হ'তে সুরু করেছে।"

"পতন!"

"হ্যাঁ। তুমি ক্ষমতার লড়াইয়ে জড়িয়ে গেছ, জিতবার জন্যে এমন মূল্য নেই যা তুমি দিতে তৈরি নও।"

"মিথ্যে কথা।"

"মিথ্যে কথা সে নয় তা তুমি খুব ভাল করে জান। তুমি শঠতা, ছল, চাতুরি, কূটনীতি সব কিছুর আশ্রয় নিয়েছ লড়াইয়ে জিতবার জন্যে। তুমি এমন লোকেদের সাহায্য নিচ্ছ যারা তোমার সামনে এসে দাঁড়াতে ভয় পেত। জিতবার পর তারা যা চাইবে, না দিয়ে তুমি পারবে না। সুদর্শন দুবের সঙ্গে লড়বার জন্যে তুমি তারই মত নীচে নেমে এসেছ। পাঁচ বছর আগে মুখ্যমন্ত্রীত্ব তুমি আপন গৌরবে অধিকার করেছিলে। দুর্গাভাইজি পর্যন্ত তোমার নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজ তুমি আর তা নও।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নীরবে ভোজন করতে লাগলেন।

পদ্মাদেবী কাতর কণ্ঠে বললেন, "তা ছাড়াও তুমি

অন্যায় করেছ। তোমার ছেলেদের ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্যে তুমি যা করেছ—অনেক গোপনে করলেও—আমি তা জানি।"

"মা হয়ে তোমার তাতে আপত্তি করা উচিত নয়।"

"আমি শুধু মা নই, তোমার স্ত্রীও। তুমি আমার সঙ্গে সম্পর্ক বহুদিন নষ্ট করেছ, তবুও আমি তোমার স্ত্রী। তুমি নিজের ন্যায় পরিশ্রমে ছেলেদের জন্যে কিছু রেখে যেতে পারলে আমার গৌরব হ'ত। তোমার ক্ষমতার আসন থেকে লুকিয়ে যা করেছ তাতে আমার গৌরব নেই, আছে অপমান।"

"থাক। অত বক্তৃতা দিও না।"

"বক্তৃতা দিতে আমি চাই নি। শুধু তোমায় বলতে চেয়েছি, এখনও তোমার মান, যশ, সুনাম অনেক। এসব তুমি সারা জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমে অর্জন করেছ। যদি এখন তুমি অবসর নাও, দেশশুদ্ধ লোক তোমায় ধন্য দেবে। যদি না নাও, যদি আবার তুমি মুখ্যমন্ত্রী হও, তা হ'লে এতকালের অর্জিত সব কিছু কয়েক বছরে তুমি হারাবে। যাদের নিয়ে, যে অস্ত্রের ব্যবহারে তুমি জিতবে তারা তোমায় একেবারে নীচে নামিয়ে আনবে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আহার শেষ হয়ে গেল। গণ্ডূষ ক'রে তিনি ন'ড়ে বসলেন। চোখে মুখে তাঁর ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই। বরং এক ক্লান্ত ঔদাসীন্য গৌরবর্ণকে পাণ্ডুর করেছে।

বললেন, "এ সব কথা আমিও যে না-ভাবি তা নয়। কিন্তু উপায় নেই। আমরা যারা দেশ-চালনার দায়িত্ব নিয়েছি, আমরণ সে দায়িত্ব পালন করতে হবে। যারা আমার নেতৃত্ব ভাঙতে চায় তাদের ভাঙতে না পারলে আমার তৃপ্তি নেই। ক্ষমতার নেশা আছে, মানি। কিন্তু আমার এ জেদ নেশাজাত নয়। আমি জানি, উদয়াচলের শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে এমন ব্যক্তি এখনও একমাত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল। বাকী সবাই ভীরু, অপদার্থ, কাপুরুষ। দুর্গাভাই মেহতা পর্যন্ত। তাঁর সাহস নেই দলের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন, আমি তোমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত। শুচিবাইগ্রস্ত বিধবার মত তিনি নিজের সুনাম বাঁচাবার জন্যে ব্যস্ত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি শুচিশুদ্ধ। পদ্মাবাঈ, যে বীর—যার যোগ্যতা আছে, যে বড় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনেক অন্যায় তার দেহ স্পর্শ করে না। মহাভারতের কথা ভেবে দেখ। ভীম, অর্জুন, ভীষ্ম—অন্যায় করেন নি কে? অমন যে যুধিষ্ঠির তাঁকে পর্যন্ত যুদ্ধে জিতবার জন্যে মিথ্যা বলতে হয়েছিল। যে সংগ্রামে নেমেছি তাতে জয়লাভই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। জয়ের পরেকার ক্লান্ত দিনগুলি অবসাদ আনবে জানি। অনেক ভেজাল, অনেক মিথ্যা দিয়ে জয়লাভের পর মোটা মাশুল দিতে হবে, তাও জানি। কিন্তু পেছুবার আর উপায় নেই।"

পদ্মাদেবী অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "এবার আমি চলি। কাজ রয়েছে।"

পদ্মাদেবী বললেন, "কাল ভোরে আমি কাশী যাচ্ছি।"

"কোথায়?"

"কাশী।"

"কার সঙ্গে?"

"একজন কাউকে সঙ্গে নেব।"

"কবে ফিরবে?"

"কিছুদিন থাকব।"

"বাড়ীটা খালি আছে?"

"আছে।"

"বেশ। যাও।"

"আর একটা কথা আছে।"

"বলো।"

"কমলাকে আমি কিছু গহনা আর টাকা দিতে চাই।"

"কোন্ কমলা?"

"তোমার পুত্রবধূ। দুর্গাপ্রসাদের স্ত্রী।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নীরব রইলেন।

"বিয়ের পর থেকে সে কিছু পায় নি। আমার বাপের বাড়ীর দেওয়া গহনার অর্ধেক আমি তাকে দিতে চাই। আমার নামে যা টাকা আছে তা থেকে পাঁচ হাজার টাকাও।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তখনও নীরব।

"কমলা কখনও কিছু চায় নি। নেবে কিনা তাও জানি নে। কিন্তু দিতে আমাকে হবেই। এবং আজই।"

"আজই?"

"হ্যা। আজ রাত্রে আমি তার কাছে যাচ্ছি।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে, ক্লান্ত স্বরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "বেশ।"

দরজার বাইরে যাবার মুখে ফিরে দাঁড়ালেন।

"একটা কাজ করো।"

"কি?"

"দুর্গাপ্রসাদের পত্নীকে দেব বলে একবার এক ছড়া হার কিনে এনেছিলাম। সেটা আছে?"

"আছে।"

"ওদের একটি মেয়ে আছে, না?"

"আছে। খুব সুন্দর দেখতে।"

"তার জন্যে নিয়ে যেয়ো।"

ক্রমশঃ

কথা ও কাজ

"এখন আর কথা কহিবার সময় নয়, কাজের সময় আসিয়াছে;" "বাঙ্গালী কেবল বকে, কাজ করে না;" "বক্তৃতা টক্তৃতা রাখিয়া দাও, কাজ কর;" এইরূপ অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কথাগুলি ভাল কিন্তু ওগুলির মধ্যে সত্য আংশিকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। একটুও কথা না বলিয়া কোনও বড় কাজ করা যায় কি? কথা না বলিয়া কাজে প্রেরণা জন্মাইবে কেমন করিয়া? উদ্দীপনা কোথা হইতে আসিবে? কাজ যে কেন করা দরকার, তাহাও ত বুঝাইয়া দেওয়া চাই। কেমন করিয়া কাজ করিতে হইবে, তাহা বাক্যের দ্বারা জানান আবশ্যক। কাজ করিবার আদেশ বাক্যের দ্বারা দিতে হয়। যুদ্ধ যে একটা এতবড় কাজ, তাহাও বিনা বাক্যব্যয়ে হয় না। যাহারা খুব কর্মিষ্ঠ জাতি, তাহারা বাঙ্গালীর চেয়ে সোরগোল বেশী বই কম করে না। কিন্তু ইহা সত্য কথা যে, কেবল বকা ভাল নয়, ফাঁকা আওয়াজ ভাল নয়, কাজের চেয়ে বক্তৃতা বেশী হওয়া উচিত নয়। কথাও চাই, কাজও চাই। কোন্‌টির পরিমাণ বা অনুপাত কিরূপ হইবে, তাহা কেহ বলিয়া দিতে পারে না।

কথাও খুব বড় কাজ, যদি তাহার ভিতর প্রাণ থাকে। জগতের ধর্ম-প্রবর্ত্তকেরা মানুষ ও পশুর চিকিৎসালয়, অন্ধ আতুরদের সেবাশ্রম, অনাথালয়, বিদ্যালয়, পতিতা নারীদের জন্য উদ্ধারাশ্রম, এসব স্থাপন করিয়া যান নাই; তাঁহারা কেবল কথা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কাজের চেয়ে সেসব কথার মূল্য, সেসব কথার শক্তি, সেসব কথার ফল কম নয়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১৩২১।

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

দ্বাবিংশ অধিবেশন—কলিকাতা, ১৯০৬

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অগ্রদূত বাঙালী জাতিকে দুর্বল করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বদ্ধপরিকর হয়। ইংরাজ শাসকগণ মনে করলেন যে যদি বঙ্গদেশকে খণ্ডবিখণ্ড করে বিভক্ত করা যায় তা হ'লে বাঙ্গালীর সংহতি শক্তি নষ্ট হবে। লর্ড কার্জন বড়লাট নিযুক্ত হওয়ার বহু পূর্বেই এই দুরভিসন্ধি ইংরাজ প্রভুগণের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছিল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার কাছাড় ও শ্রীহট্ট (সিলেট) জেলা দুটি বিচ্ছিন্ন করে আসামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। তৎপর ১৮৯১ সালে একটি পরামর্শ সভায় মিলিত হয়ে বাংলার ছোটলাট, আসাম ও বর্মার চীফ্ কমিশনারদ্বয় ও কতিপয় সৈন্য বিভাগের বড় কর্তা লুসাই হিল এবং সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সহিত যুক্ত করা সাব্যস্ত করেন। ১৮৯৬ সালে আসামের তদানীন্তন চীফ কমিশনার স্যর উইলিয়ম ওয়ার্ড অনুরোধ করেন যে, লুসাই হিল এবং চট্টগ্রাম বিভাগের সঙ্গে ঢাকা বিভাগের ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাও যেন আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ওয়ার্ডের পরবর্তী চীফ কমিশনার স্যর হেনরী কটনের বিরোধিতায় পরিকল্পনাটি ধামাচাপা পড়ে। কেবলমাত্র লুসাই হিল আসামভুক্ত করা হয়। (১)

উপরোক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরে ক্ষমতাপ্রিয় দাম্ভিক লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের বড়লাট নিযুক্ত হয়ে এদেশে আসেন। তিনি এসেই ভারতবাসীর অনিষ্টমূলক বহু আইনকানুন বিধিবদ্ধ করলেন। সেই সবের বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কেবলমাত্র এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, তাঁর কার্যাবলীর তীব্র প্রতিবাদ বঙ্গদেশেই আরম্ভ হয়। সুতরাং তিনি আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল বঙ্গদেশকে চূর্ণ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন। দপ্তরের পুরাতন নথিপত্র ঘেঁটে বঙ্গদেশ বিভাগ করার ধামাচাপাপড়া পরিকল্পনাটি বের করলেন এবং ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর ভারত গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করল যে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাসহ সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এই প্রস্তাবে বঙ্গদেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং বাংলার সর্বত্র প্রতিবাদ সভা আহূত হ'ল। ইহার ফলে বাংলা দেশে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হ'ল তা—অভূতপূর্ব। দেশাত্মবোধের প্রবল স্রোতে সমগ্র বঙ্গভূমি যেন প্লাবিত হয়ে গেল। ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দেশের সকলে ইহাতে যোগ দিল। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সঙ্গীতের সঙ্গে কত অজ্ঞাত অখ্যাত কবির রচিত স্বদেশ সঙ্গীতে সমস্ত দেশ মুখরিত হয়ে উঠল। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে বাংলার আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হ'ল। যাঁরা এই স্বদেশী আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা এর কথা ভুলতে পারবেন না। যে-সকল ভূম্যাধিকারিগণ স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে দেখে স্বয়ং লর্ড কার্জন বড়লাটের উচ্চাসন থেকে নেমে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বহির্গত হলেন এবং ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত রায় চৌধুরীর প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। মহারাজা যথারীতি অতিথি সৎকার করলেন কিন্তু তিনি তাঁর সংকল্পে দৃঢ় রইলেন। ময়মনসিংহে বিফল মনোরথ হয়ে ঢাকায় গিয়ে এবং নানা প্রকারে প্রলুব্ধ করে ও ধর্মান্ধতা জাগিয়ে ঢাকার নবাব সলিমুল্লা প্রভৃতি কয়েকজন মুসলমান নেতাকে স্বমতে আনয়ন করলেন। ফলে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজের কতকাংশ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সমর্থন করল।

অতঃপর অকস্মাৎ মুষ্টিমেয় মুসলমান ব্যতীত বঙ্গদেশের সমগ্র জনমতকে উপেক্ষা করে ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে ভারতসচিব ঘোষণা করলেন যে ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখ থেকে সমগ্র পূর্ববঙ্গ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ) এবং দার্জিলিং ব্যতীত সমগ্র উত্তরবঙ্গ আসামের সহিত যুক্ত হয়ে "ইষ্ট বেঙ্গল ও আসাম" গভর্ণমেণ্ট সৃষ্টি হবে। এই ঘোষণার পূর্বে ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারে

(১) Indian National Evolution by Ambica Charan Majumdar.

নি যে, উত্তরবঙ্গও এই ভাবে নবগঠিত প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হবে। (২)

হতোদ্যম না হয়ে বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দেশব্যাপী আন্দোলন ক্রমে বেড়েই চলল। আমি তখন রাজসাহী জেলার নওগাঁও উচ্চ ইংরাজি স্কুলের ছাত্র ছিলাম। অন্যান্য অনেকের সঙ্গে আমিও আন্দোলনে মেতে উঠলাম।

পূর্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট নিযুক্ত হয়ে স্যর ব্যামফিল্ড ফুলার স্বদেশী আন্দোলনকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য ভীষণ চণ্ডনীতি আরম্ভ করলেন।

১৯০৫ সালের বারাণসী কংগ্রেসে বঙ্গভঙ্গ রদের প্রস্তাবে কোন ফল হ'ল না। বাংলা দেশে আন্দোলন ক্রমে ভীষণ আকার ধারণ করল। এই রকম পরিস্থিতিতে সুফলের আশায় সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতাগণ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাসভাজন ভারতবর্ষের প্রবীণ দেশনায়ক অতিবৃদ্ধ স্যর দাদাভাই নৌরজীকে ১৯০৬ সালের কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের সভাপতির পদ গ্রহণ করতে সম্মত করালেন। সেই সময় আমি রাজসাহী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। তখনকার দিনে ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের বন্ধের সময় কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ত। আমরা ১০।১২ জন সহপাঠীর একটি দল গঠন করে কংগ্রেসের অধিবেশনে দর্শকরূপে যোগদান করতে মনস্থ করলাম। তখন পর্য্যন্ত রাজশাহী সহর রেলপথ দ্বারা যুক্ত হয় নি। রাজশাহী থেকে কলকাতা আসতে হ'লে হয় ঘোড়ার গাড়িতে ২৮ মাইল অতিক্রম ক'রে নাটোরে ট্রেণ ধরে সারা ঘাটে নেমে ষ্টীমারে পদ্মা পার হয়ে দামুকদিয়ায় ট্রেণে চাপতে হ'ত অথবা ষ্টীমার বা নৌকাযোগে রাজসাহী থেকে দামুকদিয়া বা লালগোলা ঘাটে পৌঁছে ট্রেন ধরতে হ'ত। আমরা কংগ্রেস অধিবেশনের ২।৩ দিন পূর্বে প্রাতঃকালে নৌকা ভাড়া করে দামুকদিয়া রওনা হলাম। শীতকালের শীর্ণা পদ্মায় নৌকাযোগে যেতে ভয়ের কোন কারণ ছিল না। তখন পদ্মার বর্ষাকালের ভৈরবী মূর্তি অন্তর্হিত হয়ে স্নিগ্ধ কোমল মূর্তি ধারণ করেছে।

কলকাতায় এসে আমরা দিশাহারা হয়ে পড়লাম। আগে থেকে বাসস্থানের কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের জনৈক পরিচিত ছাত্রের সাহায্যে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলের নিকটবর্তী পটুয়াটোলা লেনের একটি ছাত্রাবাসে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। বড়দিনের বন্ধের ছুটির জন্য কয়েকটি ছাত্র বাড়ী যাওয়ায় কয়েকটা খালি ঘর পাওয়া গেল। অদূরবর্তী একটি হোটেলে আমাদের আহারের ব্যবস্থা হ'ল তখনকার হোটেলের চার্জের কথা শুনলে এখনকার লোকের অবাক হবেন। মাত্র ১০ পয়সায় ভাত, মাছের ঝোল ও ঝাল, ডাল, ভাজা ও তরকারি—পেট ভরে ভাত খাওয়া যেত এবং রাত্রে মাছ ছাড়াও একটি গোটা হাঁসের ডিমের কালিয়া খাওয়া যেত।

পরদিন ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে সভাপতি মহাশয় বোম্বাইয়ের অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ কলকাতায় পৌঁছবেন। হাওড়া ষ্টেশনে তাঁহার অভ্যর্থনার পর শোভাযাত্রা করে নির্দিষ্ট বাসস্থানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। আমরা নিতান্ত মফঃস্বল কলেজের ছাত্র! রাস্তাঘাট ভাল চিনি না। শোভাযাত্রা হাওড়ার পুল পার হয়ে ষ্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে বিডন ষ্ট্রীটের দিকে আসবে জেনে আমরা সকাল সকাল পদব্রজে বিডন উদ্যানের কাছে উপস্থিত হয়ে বিডন ষ্ট্রীট ও আপার চিৎপুর রোডের সংযোগস্থলে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সভাপতিকে দেখার জন্য পথের দুধারে অসম্ভব ভিড়। পথের দু'ধারের বাড়ীর ছাদগুলি লোকে পূর্ণ ছিল। অলিন্দে অলিন্দে সার সার লোক। প্রত্যেক গৃহ পুষ্পমাল্যে শোভিত। এ রকম জন সমারোহ ইতিপূর্বে দেখা যায় নি।

আমরা অনেকক্ষণ ধরে শোভাযাত্রার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। নেতাদের দেখার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠল। স্কুলে পড়বার সময়ই দেশপ্রখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রদীপ' মাসিক পত্রিকায় ছাপা—নেতাদের ছবি এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "বেঙ্গলী" সংবাদপত্রের "Art Supplement to the Bengalee"র কল্যাণে কংগ্রেসের নেতাদের ছবি আমার মনে মুদ্রিত হয়ে ছিল এবং তাঁরা আমার তরুণ হৃদয়ে দেবতার আসন গ্রহণ করেছিলেন।

অধীর প্রতীক্ষার পর ক্রমে শোভাযাত্রা দেখা দিল। একখানি বৃহৎ ল্যাণ্ডো গাড়িতে সৌম্যমূর্তি শ্বেত শ্মশ্রুশোভিত বৃদ্ধ স্যর দাদাভাই নৌরজী ও তাঁহার দুই পার্শ্বে স্যর ফেরজ শাহ মেহতা ও দিনশা ইদলজি ওয়াচা (পরবর্তীকালে স্যর উপাধিপ্রাপ্ত) উপবিষ্ট। নেতাদের পদপ্রান্তে "অ্যাণ্টি সার্কুলার সোসাইটি"র শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু। নেতাদিগকে আর চিনিয়ে দিতে হ'ল না, আমার পূর্বদৃষ্ট ছবিগুলিকে যেন মূর্তি পরিগ্রহণ করে গাড়িতে উপবিষ্ট দেখলাম। গাড়ির

[২] Indian National Evolution by Ambica Charan Majumdar

ঘোড়া খুলে স্বেচ্ছাসেবকগণ গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। শোভাযাত্রা যখন আমাদের সম্মুখবর্তী হ'ল তখন সমবেত জনতা বিপুল হর্ষ ও "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করতে লাগল। পার্শ্ববর্তী গৃহগুলির উপর থেকে নেতাদের উপর লাজ ও পুষ্প বর্ষিত হ'তে লাগল। শোভাযাত্রা ও নেতাদের দর্শন করে আমরা বাসায় ফিরে এলাম।

পরদিন ২৬শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন আরম্ভ হবে। চৌরঙ্গী রোডে (যেখানে বর্তমানে কিং এডওয়ার্ড কোর্ট অবস্থিত) একটি বৃহদায়তন প্যাণ্ডাল কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য নির্মিত হয়েছিল। আমরা ২৬শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে সকাল সকাল আহারাদি সেরে কংগ্রেসের সভায় যোগদান করার জন্য রওনা হলাম। অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার বহুপূর্বে দর্শকের টিকিট কেটে প্যাণ্ডেলের প্রধান তোরণের সামনে দাঁড়ালাম। ক্রমে দর্শকের সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং ভিড় এত বেশি হ'তে লাগল যে, মনে হ'ল যেন আমি লোকের চাপে পিষ্ট হয়ে যাব। বহুক্ষণ প্রতীক্ষার পর গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে জনস্রোত প্রবল জলস্রোতের মত প্যাণ্ডেলের ভিতর প্রবেশ করতে লাগল। আমি ঐ স্রোতের আবর্তে যেন শূন্যে উত্থিত হয়ে ভিতরে উপনীত হলাম। ভিতরে লোকে লোকারণ্য। শুনলাম যে প্রায় [illegible] হাজার লোক কংগ্রেসে যোগদান করেছিল। পরবর্তীকালে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের যে রকম নিয়মানুবর্তিতা দেখেছি তা এই কংগ্রেসে দেখা যায় নি। সমস্ত বিষয়েই অব্যবস্থা বিশৃঙ্খলা। গেটে জনতা নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ভিড়ের চাপে দর্শনার্থীদের টিকিট পরীক্ষার কোন প্রশ্নই উঠল না।

নির্দিষ্ট সময়ে নেতাগণসহ সভাপতি মহাশয় প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে মঞ্চের উপর আসীন হলেন। সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকগণ দণ্ডায়মান হয়ে বিপুল হর্ষধ্বনির দ্বারা সভাপতি মহাশয়কে অভ্যর্থনা করল। মুহুর্মুহু "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উত্থিত হ'তে লাগল। "ইণ্ডিয়ান মিরারে"র সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় সভার প্রারম্ভে প্রার্থনা করলেন। পরে সমবেতকণ্ঠে কতকগুলি বালিকা জাতীয় সঙ্গীত "বন্দেমাতরম্" গাইল। মাথায় পাগড়ি দুইজন তরুণ একটি স্বদেশী সঙ্গীত (রাম রহিম না জুদা কর ভাই দিলকা সাচ্চা রাখ জী) গেয়ে সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ কলিকাতা হাইকোর্টের সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়। তিনি তাঁর অভিভাষণ পাঠ করলেন। সেই বৎসর বাংলার দুইজন সুসন্তান ও ভূতপূর্ব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় পরলোকগমন করেন। এঁরা উভয়েই কলকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার ছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় তাঁর অভিভাষণে এঁদের পরলোকগমনের জন্য শোকপ্রকাশ করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণের পর উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুত দাদাভাই নৌরজীকে কংগ্রেসের সভাপতি পদে বরণ করার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। প্রস্তাব যথারীতি সমর্থিত হওয়ার পর সভাপতি মহাশয় সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকমণ্ডলীর উল্লাস হর্ষধ্বনির মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন। ৮২ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ, শারীরিক দুর্বলতার দরুণ সভাপতির আসন থেকে উঠে তাঁহার রচিত অভিভাষণের কিয়দংশ পাঠ করে শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয়কে অভিভাষণের অবশিষ্টাংশ পাঠ করতে বললেন। তাঁহার অভিভাষণের সকল কথা এখন মনে নাই। কেবল এইটুকু মনে আছে যে, তিনি "স্বরাজের" দাবি করলেন এবং এতে সমবেত জনতার মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেল। কংগ্রেসে এই প্রথম 'স্বরাজ' কথাটি শোনা গেল।

সভাপতির অভিভাষণের পর বিষয় নির্বাচনী সমিতি গঠিত হ'ল। "বন্দেমাতরম" সঙ্গীত গীত হওয়ার সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হ'ল।

সভা ভঙ্গের পর আমরা স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনী দেখতে গেলাম। তখনকার দিনে কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী দ্রব্যের শিল্পপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হ'ত। এবার প্রদর্শনীর স্থান নির্বাচিত হয়েছিল কংগ্রেসের অদূরবর্তী পোড়া বাজারের মাঠে। (বর্তমানে চৌরঙ্গী টেরেস)। প্রদর্শনীতে নূতন স্বদেশী শিল্পের নানা সামগ্রী সজ্জিত ছিল। বিশেষ করে সাবানের তৈয়ারী নেতাদের আবক্ষ মূর্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

পরদিন ২৭শে ডিসেম্বর জাতীয় সঙ্গীতের পর কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হ'ল। শুনলাম যে বিষয় নির্বাচনী সভায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সঙ্গে স্যর ফিরোজ শাহ মেহেতার স্বদেশী ও বয়কট প্রস্তাব সম্পর্কে খুব তর্কবিতর্ক হয়েছিল।

পরলোকগত নেতাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের পর বিভিন্ন প্রস্তাব আলোচনান্তে গৃহীত হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের উপর অত্যাচারবিষয়ক সম্বন্ধে কয়েকজন ভাষণ দিলেন। এই দিনের একটি ঘটনা

আমার বিশেষ করে মনে আছে। মস্তকে পাগড়ি, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল তৎকালীন প্রচলিত পদ্ধতিমত ইংরাজিতে বক্তৃতা না দিয়ে দিলেন বাংলাতে।

কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর সেদিনকার মত সভার অধিবেশন শেষ হয়।

২৮শে ডিসেম্বর যথারীতি 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের পর সভার তৃতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। এইদিন গাইকোয়াড়ের মহারাজা তাঁহার প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে সমবেত জনতা কর্তৃক অভ্যর্থিত হলেন।

এই দিন প্রথমেই ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লার ভ্রাতা নবাব খাজা আতিকুল্লা বঙ্গভঙ্গ রদ করার প্রস্তাব উত্থাপিত করে বললেন যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে না, কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান স্বার্থের কারণে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করছে। এই প্রস্তাবের সমর্থনে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতায় সভায় জনমণ্ডলীকে মুগ্ধ ও অভিভূত করলেন।

ইহার পর যশোহরের স্বনামধন্য নেতা শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ মজুমদার মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ 'বয়কট' (বিদেশী দ্রব্য বর্জন) প্রস্তাব পেশ করলেন। প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বললেন যে, এই প্রস্তাব শুধু পণ্য বর্জনেই আবদ্ধ থাকবে না, পূর্ববঙ্গের গভর্ণমেন্টের সঙ্গে সর্বপ্রকার সংশ্রব ও অবৈতনিক (অনারারী) পদসমূহ বর্জন করতে হবে এবং কেউ যেন ছোটলাটের সঙ্গে আইন সভায় সহযোগিতা না করে। বিপিনবাবুর বক্তৃতা সভায় বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। অন্যান্য প্রদেশের নেতারা অভিমত প্রকাশ করলেন যে, বয়কট আন্দোলন যেন বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিতে উঠে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় বললেন যে, কংগ্রেস বিপিনবাবুর মত মেনে নিতে পারে না। এতে দর্শকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল এবং তারা মালব্যজীর বক্তৃতার সময় বাধা দিতে লাগল। বিরোধিতার মধ্যে তিনি ধীর-স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থেকে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। শ্রীযুক্ত গোখলের সমর্থনের পর প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর সভাপতি মহাশয় কিছু সময়ের জন্য বাহিরে গেলেন। সেই সময় ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অন্যান্য প্রস্তাব গৃহীত হবার পর স্বদেশী সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ নেতা রাও বাহাদুর আনন্দ চার্লু এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং পণ্ডিত মদন-মোহন মালব্য, মহারাষ্ট্রকেশরী বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের স্বনামধন্য নেতা লাজপত রায় এবং আরও কয়েক-জন এই প্রস্তাব সমর্থন করার পর প্রস্তাবটি কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয়।

২৯শে ডিসেম্বর চতুর্থ দিনের অধিবেশন হয়। এদিনেও কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন নাগপুরে আহূত হ'ল। এরপর সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁর বিদায় অভিভাষণে বললেন যে, কংগ্রেস দেশের সম্মুখে 'আত্মশাসন' বা স্বরাজের যে সুনির্দিষ্ট পন্থা স্থাপন করল তা যেন দেশের তরুণদের মনে পৌঁছায়।

সভাপতির অন্তিম ভাষণের পর কংগ্রেসের দ্বাবিংশ অধিবেশন সমাপ্ত হ'ল।

এই অধিবেশনে স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কে একটি প্রস্তাবে আইন সভাগুলিতে অধিক সংখ্যক ভারতীয় প্রতিনিধি-নির্বাচনের দাবি করা হয়। এই প্রস্তাবের একটি ধারায় অনুন্নত শ্রেণীর জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি ছিল। প্রস্তাবটি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক উত্থাপিত ও যথারীতি সমর্থিত হওয়ার পর মি. মহম্মদ আলী জিন্না মূল প্রস্তাব থেকে শাসন সংরক্ষণের (Reservation of Seats) ধারাটি বর্জন করার জন্য একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং মিঃ আবদুল কাসিম ও হাফিজ আবদুর রহিম উক্ত সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করেন। ফলে কংগ্রেস কর্তৃক সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে মূল প্রস্তাব থেকে শাসন সংরক্ষণের ধারা বর্জিত হ'ল। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, যে জিন্না সাহেবের মাধ্যমে এই প্রকার সম্পূর্ণ জাতীয়তামূলক অসাম্প্রদায়িক প্রস্তাব গৃহীত হ'ল সেই জিন্না সাহেবেরই দ্বিজাতি-তত্ত্বের অবতারণা করে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করলেন। (৩)

---

(৩) এই বিবরণে যে-সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ হ'ল তা অধিকাংশই আমার স্মৃতি হ'তে লিখিত বাকি অংশ কংগ্রেস রিপোর্ট হ'তে গৃহীত।

সতীশের সংসার

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

বালীগঞ্জে বাস করলেও অনেকদিন পরে শ্যামবাজার এসেছি। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, আমার পক্ষে ট্রাম বা বাসের হাতল ধরে দক্ষিণ কোলকাতা থেকে উত্তর কোলকাতা আসা দাক্ষিণাত্য থেকে উত্তরাপথে আসার মতই কঠিন হয়ে উঠেছে। তবু আজ বিশেষ দরকারে আসতে হয়েছে। পাঁচ মাথায় নেমে আর. জি. কর রোড ধরে চলেছি এমন সময় পিছন থেকে কে যেন চেঁচিয়ে ডাকল "হেই"। থমকে দাঁড়িয়ে ফিরলাম, দেখি দু'হাতে দুটো আনাজপাতি ঠাসা থলে নিয়ে টাক মাথা, বেঁটে প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। মুখখানা চেনা মনে হ'ল না। ভুল হয়েছে কি না ভাবছি এমন সময় ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন। মুখ চিনতে না পারলেও হাসি যেন চিনতে পারলাম, ভয়ে ভয়ে বললাম—"সতীশ!" ভদ্রলোক এইবার কাছে এগিয়ে এসে বললেন "ওরে রামচন্দ্র, তোকে দূর থেকে দেখেই আমি চিনেছি, তুই কিন্তু আমাকে চিনতে পারিস নি।" সত্যিই চিনতে পারি নি, অথচ সতীশ আর আমি সিটি কলেজে একসঙ্গে বি. এ পর্যন্ত পড়েছি, দীর্ঘকাল এক মেসে এক ঘরে থেকেছি। অসম্ভব পরিবর্তন হয়েছে ওর মুখের, টাক পড়েছে, লম্বা মুখখানা গোল হয়ে গেছে, অথচ গলার আওয়াজ ঠিক আগের মতই আছে। গলার আওয়াজেই ওকে চিনলাম। কি বন্ধুত্বই ছিল দু'জনে। আমার নাম রামপ্রসাদ সেন, ও আমাকে ডাকত রামচন্দ্র ব'লে। অনেকদিন পরে ওকে দেখলাম, আনন্দের আতিশয্যে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম। সতীশ হাসতে লাগল, বলল, "আমি কি করি বলত, আমার দুটো হাতই যে আটকা, আলিঙ্গন এক-তরফা হ'ল যে?" তাকে ছেড়ে দিয়ে বললাম, "তা হোক, এখন বল্ কেমন আছিস্, কি করছিস্।" সতীশ বলল, "চাকরি, চাকরি, শতকরা ৯৯ জন বাঙ্গালী যা করে। তুই ত ল' পাশ করেছিস শুনেছিলাম, ওকালতি করছিস নাকি? ওঃ, কতকাল পরে দেখা হ'ল বল ত? বি. এ. পাশ করে আমি চ'লে গেলাম বেরিলী, কোন্ বছর বি. এ. পাশ করলাম তাও ভুলে গেছি।" হো হো করে হেসে ওঠে সতীশ। বললাম, "১৯৩২ সালে রে।" মাথা নেড়ে সতীশ বলল, "হুঁ, তার পরে তোর সঙ্গে দেখা হয় নি। চল, চল, বাড়ী গিয়ে সব শুনবো, এই কাছেই আমার বাড়ী, ভবনাথ সেনের লেনে।" বললাম "না ভাই, এখন ত যেতে পারব না, একটা বিশেষ কাজে এ পাড়ায় এসেছি।" "তা হ'লে কবে আসবি বল?" বললাম, "রবিবার ছাড়া ত আসতে পারব না। সামনের রবিবারে আসব।" সতীশ বললো "আসবি কিন্তু নিশ্চয় আসবি, ২৩৩ নম্বর ভবনাথ সেনের লেন।" বললাম "আসব।" থলে দুটো নিয়ে সতীশ ভিড় ঠেলে চ'লে গেল।

অনেকদিন পরে হঠাৎ সতীশকে দেখে পুরণো কথা একে একে মনে পড়তে লাগল। সতীশ পড়াশুনোয় ভাল ছিল আবার মুগুর ভাঁজত, কুস্তিও লড়ত। মারামারি থেকে সুরু ক'রে সাগরের মেলার ভলেন্টিয়ারী পর্যন্ত সব রকম কঠিন কাজে সবার আগে সে এগিয়ে যেত। চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারত না, সুস্থ-সবল দেহের স্ফূর্তিতে তরুণ প্রাণের প্রাচুর্যে সবসময় যেন টলমল করত। মনে পড়ল তার বিয়ে করার ব্যাপারটা। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। সে বছর বি. এ. পরীক্ষা দেবে, ঝড় আর বন্যায় মেদিনীপুরের অনেক গ্রাম ভেসে গেল, রামকৃষ্ণ মিশনের ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে আর্তত্রাণ করতে বেরিয়ে পড়ল। মাস খানেক পরে যখন ফিরে এল তখন সঙ্গে নিয়ে এল একটি অনাথা তরুণীকে। বন্যায় তার পরিবারের আর সবাই ভেসে গিয়েছিল। আমরা বললাম, "ওকে আনলি কেন?" বলল, "কেউ ত নাই ওর, তা ছাড়া আমিই ওকে বাঁচিয়েছি, বানের জলে ভেসে যাচ্ছিল, ভীষণ স্রোত ঠেলে সাঁতরে গিয়ে আমি ওকে টেনে ডাঙ্গায় তুলেছি।" মেয়েটাকে নিয়ে রাখল ওর মাসীর বাড়ীতে। কিছুদিন পরে শুনলাম সতীশ তাকে বিয়ে করবে। আমরা আপত্তি করলাম, বললাম, "কার মেয়ে, কি জাত, কিছু জানিস নে, তুই বামুনের ছেলে তুই ওকে বিয়ে করবি কিরে?" জবাব দিল "বলেছে ও বামুনের মেয়ে" রেগে বল্লাম "বামুনের মেয়ে কিছুতেই নয় - মুসলমানও হ'তে পারে।" হেসে সতীশ বলল, "যে

জাতই হোক না, বামুনের সঙ্গে বিয়ে হ'লে বামুন হয়ে যাবে।" অকাট্য যুক্তি, নিরুত্তর হয়ে গেলাম। বিয়ে হয়ে গেল কিন্তু সতীশের বাবা মা মানবেন কেন, বউকে ঘরে নিলেন না। আমরা বললাম, "এবার কি করবি ?" বলল, "আমার বোঝা আমিই বইব।" কিছুদিন পরে বি. এ. পাস করে বেরিলীতে চাকরি পেয়ে বউ নিয়ে চলে গেল। ষ্টেশনে গিয়ে আমি গাড়িতে তুলে দিলাম। সেই শেষ দেখা, তার পরে আজ হঠাৎ কতকাল পরে দেখা হ'ল।

সতীশের প্রতি সত্যিই একটা প্রাণের টান ছিল তাই রবিবার আসতেই মন উসখুস করতে লাগল, বিকেল হতেই শ্যামবাজার রওনা হলাম। যথাসময়ে ভবনাথ সেনের ১১৩ নম্বর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। দরজা বন্ধ, কড়া নাড়লাম। দরজা খুলে দিল একটি যুবক, প্রশ্ন করল, "কাকে চান ?" বললাম, "সতীশবাবুকে চাই, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী।" যুবক বলল, "আসুন।" ভিতরে ঢুকলাম, পাশের একটা ঘরে গিয়ে বসলাম, বসে বসে দেখতে লাগলাম—ঘরটি বেশ সাজান, দামী সোফা সেট, দেয়ালে ছবি, একপাশে ফোন। ভাবছি জীবন-সংগ্রামে সতীশের হার হয় নি এমন সময় "কোথায় রে রামচন্দ্র" ব'লে হুঙ্কার দিয়ে ঘরে ঢুকল সতীশ। হাসতে হাসতে সামনে এসে হাত ধরে টেনে তুলে বলল, "এখানে নয়, চল, ভিতরে গিয়ে বসি। ওঃ কতকাল পরে তোকে পেলাম, কত ভালই যে লাগছে!" টানতে টানতে নিয়ে গেল অন্দরের একটা ঘরে, খাটের উপর বিছানা পাতা, সেদিকে ঠেলে দিয়ে বলল, "আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে বস।" বসলাম। সিগারেট কেস আর দেশলাই এগিয়ে দিয়ে বলল, "তখন ত খেতিস, এখন খাস কি না জানিনে, একটু বয়স হ'লে অনেকে সাধু হয়।" একটা সিগারেট ধরিয়ে সতীশকে নিশ্চিন্ত করলাম। সতীশ খুসী হয়ে হেসে উঠল, তার পরে হাঁক দিল "ওরে নরেন, ও বৌমা, কোথায় রে ডলি, সরলা কোথায়, আয়, আয়, রামচন্দ্রকে প্রণাম কর এসে।" একে একে তারা এসে ঘরে ঢুকল। সতীশ বলল, "এ নরেন, আমার ভাইপো, ব্যবসা করে, একটা ছোট প্রেস কিনে দিয়েছি, ভালই চালাচ্ছে; আর এইটি বৌমা, যেমন রূপ তেমন গুণ, আমার কি ভাগ্যি যে এমন লক্ষ্মী বৌ পেয়েছি; আর এইটি নাতনী, নাম ডলি, দেখছ ত কেমন প্লাষ্টিকের পুতুলের মত দেখতে। চার বছরের নাতনী ফোঁস করে উঠল, বলল, "না, আমি প্লাষ্টিকের পুতুল নই, আমি ননীর পুতুল।" সতীশ তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "বেশ, বেশ, তুমি ননীর পুতুল, এইবার নতুন দাদুকে প্রণাম ক'র ত।" ডলি বিছানায় উঠে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল, নরেন ও বৌমা এসে প্রণাম করল। সতীশ হাঁকল, "বউমা।" বউমা এগিয়ে এসে বলল, "কি জ্যেঠামশাই ?" সতীশ হাত নেড়ে বলল, "যাও বউমা, খাবার করে নিয়ে এস, লুচি, আলুর দম, মামলেট, রাবড়ি। রামচন্দ্র এ সব খেতে ভালবাসে, আর নিয়ে এস গোটা বার সন্দেশ, জেনে রাখ রামচন্দ্র ছিল আমাদের মেসের নাম-করা খাইয়ে।" খাবারের দীর্ঘ তালিকা শুনে আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম, বললাম, "কি যে বলিস সতীশ, আমি ও সব কিছু খাব না!" অবাক হয়ে সতীশ বলল, "কি হ'ল তোর বলতো, অত খেতে পারতিস এখন কিছুই খেতে পারিসনে ?" বললাম, "না মশায়, খেতে পারিনে, বয়স হয়েছে সেটা ভুলে যাচ্ছিস কেন ?" হেসে ফেলল সতীশ, বলল, "বয়স যে হয়েছে সেটা ভুলে যাওয়াই ত ভালরে।" বললাম, "অম্বলের ব্যথা ভুলতে দেয় কোথায়!" বৌমা আস্তে আস্তে বলল, "কিছুই খাবেন না ?" বললাম, "না খেলেই ভাল হ'ত, তোমরা যখন বলছ তখন এক পেয়ালা চা আর দুখানা বিসকিট নিয়ে এস।" শুনে চোখদুটো বড় বড় করে সতীশ বলল, "অ্যাঁ, দুখানা বিসকিট! না বৌমা, যা যা বলেছি সব নিয়ে এস।" হুকুম শুনে বৌমা হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ সতীশ আবার হাঁক দিল, "সরলা, সরলা এলিনে!" হাঁক শুনে ঘরে ঢুকল নিরাভরণা, থান কাপড়-পরা পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি মেয়ে, ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে আমাকে প্রণাম করল। সতীশ বলল, "এটি আমার কন্যা, আমার সরলা মা।" মেয়েটি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। দেখে আমার মনটা কেমন করে উঠল। সতীশ বলল, "কৃষ্ণচন্দ্র কোথায়? যা মা নিয়ে আয় তাকে, তোর কাকাবাবুকে দেখিয়ে দে।" সরলা মৃদুগলায় বলল, "খোকা ঘুমুচ্ছে বাবা।" "ঘুমুচ্ছে? আচ্ছা আমি তাকে তুলে নিয়ে আসছি"—এই বলে সতীশ বেরিয়ে গেল, একটু পরে একটি ঘুমন্ত শিশুকে কোলে ক'রে বিছানার উপর শুইয়ে দিল। দেখলাম ছেলেটি কষ্টি পাথরের মতই কাল, কৃষ্ণচন্দ্র নাম তার সার্থক হয়েছে।

আদর আপ্যায়ন, প্রণাম ও পরিচয়ের ফাঁকে ফাঁকে

আমার মনে হচ্ছিল গৃহকর্ত্রী কোথায়, তাঁকে ত দেখছি না। জিজ্ঞাসা করব এমন সময় দেয়ালে টাঙ্গান একখানা বড় ছবির দিকে নজর পড়তেই চিনলাম এই ত সেই। তিরিশ বছর আগে দেখলেও মুখখানা মনে ছিল। সতীশকে বললাম, "ছবিখানা বুঝি তোর—।" কথা শেষ করবার আগেই সতীশ বলল, "হ্যাঁ রে, আমার স্ত্রীর। মনে নেই তোর, বিয়ের পর তুই-ই ত ফটো তুলেছিলি!" এতক্ষণে মনে পড়ল ফটো আমি তুলে দিয়েছিলাম। সতীশ বলতে লাগল, "বিয়েতে তোরা বাধা দিয়েছিলি, কত ভয় দেখিয়েছিলি, কিন্তু আমি ত জানি কি জিনিসই পেয়েছিলাম। সে ছিল স্বর্গের দেবী রে, তাই বেশীদিন এ পৃথিবীতে থাকল না। দু'বছর বেরিলীতে ছিলাম, একটা ভাল চাকরি পেয়ে কলকাতা ফিরে এলাম। এখানে আসবার বছর খানেক পরেই সে মারা গেল, স্বর্গের দেবী স্বর্গে চলে গেল।" এই ব'লে সতীশ ছবির দিকে মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে থাকল।

একরাশ খাবার নিয়ে বৌমা ঘরে ঢুকল। সতীশের মন অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এল। সে খুশী হয়ে বলল, "সব এনেছ ত—দাও সামনে সাজিয়ে দাও।" আমাকে ঠেলে দিয়ে বলল, "আয় ভাই, উঠে আয়।" বললাম, "আমি অত খেতে পারব না।" "পারবি, পারবি" বলে সতীশ পাশে এসে বসল। খেতে বসলাম। কানের কাছে মুখ দিয়ে সতীশ বলল, "এইবার তোর কথা কিছু বল, প্র্যাকটিস্ কেমন জমেছে, ক'টি ছেলে, মেয়ে ক'টি?" তিরিশ বছরের ইতিহাস সংক্ষেপে ব'লে গেলাম।

খাওয়া শেষ করে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বসেছি, সতীশ হাঁক দিল, "বৌমা, ডলিকে নিয়ে এস।" ডলির হাত ধ'রে বৌমা এল। সতীশ ডলিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "নতুনদাদুকে একটু নাচ দেখিয়ে দাও, তোমার নাচ দেখতেই নতুন দাদু আজ এসেছে।" ডলি তার ছোট্ট একটি পা তুলে বলল, "আমার ঘুঙুর নেই।" সতীশ বলল, "তাতে কি, ঘুঙুর না থাকলেও তুমি বেশ নাচতে পার।" ডলি মাথায় হাত দিয়ে বলল, "আমার চুলে মালা নেই।" সতীশ হো হো করে হেসে উঠল, বলল, "সন্ধ্যাবেলা মালা এনে দেব, এখন অমনি একটু নেচে দেখিয়ে দাও।" ডলি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত দু'খানা নাচের ভঙ্গিতে উঁচু ক'রে হঠাৎ ব'লে বসল, "মা না গাইলে আমি নাচব না।" সতীশ হাঁকল, "বৌমা।" বৌমা একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে লাগল, ডলি নাচতে লাগল। খুব ভাল লাগল আমার, সতীশকে বললাম, "তোর সংসার দেখে হিংসে হচ্ছে রে, এ যে আনন্দের হাট।" শুনে সতীশ হাসতে লাগল।

সন্ধ্যা হয়ে এল, আর বসা চলে না, বললাম, "এবার যেতে হবে রে।" সতীশ হাত চেপে ধরে বলল, "আর একটু বোস।" বললাম, "নারে, আর বসব না, দূরের পাল্লা যেতে হবে, আজকের মত উঠি।" ডলিকে কোলে তুলে নিয়ে উঠে পড়লাম। সতীশ বলল, "আর একদিন আসিস।" বললাম, "আমি ত আসব, তুই আমার ওখানে কবে যাচ্ছিস বল—যেতে হবে একদিন।" "ওরে বাপরে", বলে উঠল সতীশ, "আমার যে ভাই এক মিনিট ফুরসুৎ নাই, দেখছিস ত সংসারের খুঁটিনাটি সব আমাকে দেখতে হয়, এরা ছেলেমানুষ, গুছিয়ে একটা কাজও করতে পারে না। বললাম, "আমার ভাই উল্টো, সংসারের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই।"

দোরগোড়ায় এসে ডলিকে বললাম, "একদিন দাদুর সঙ্গে আমার বাড়ী এস দিদি," ডলি বলল, "তুমি এস।" কচি হাত দু'টি ধ'রে বললাম, "তুমি গেলে তবে আসব।" গম্ভীর হয়ে ডলি বলল, "তা হ'লে চিঠি লিখ।" কথা শুনে হেসে ফেললাম, বললাম, "চিঠি লিখব, তোমার নাম-ঠিকানা বলে দাও।" ডলি বলল "পুষ্প সরকার, ১৩৩ নম্বর ভবনাথ সেনের লেন।" অবাক্ হয়ে সতীশের মুখের দিকে তাকালাম। সতীশ একটু হাসল, বলল, "চল তোকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।"

পথে বেরিয়ে সতীশ হাসতে লাগল তারপরে আমার কাঁধের উপর হাত রেখে বলল, "ঐ দেখ, তোকে বলা হয় নি। শোন বলি, যখন বেরিলীতে কাজ করতাম তখন নিতাই সরকার বলে আমার একজন বাঙ্গালী আরদালী ছিল, গরীব মানুষ, বউ আর ছোট একটা ছেলে নিয়ে আমার বাড়ীতেই থাকত। হঠাৎ কলেরায় আরদালী আর তার বউ দু'জনেই মারা গেল। ছেলেটার কি গতি হবে, বউকে বললাম, "তুলে নাও, ভগবানের দান।" ছেলেটা আমাকে জ্যেঠামশায় বলত। এখনও তাই বলে। আর ঐ যে সরলা, বড় ভাল মেয়ে, ওকে পেলাম মেদিনীপুরের দুর্ভিক্ষের সময়। একটু ফ্যান চাইতে এল, কচি বয়েস, কঙ্কালসার চেহারা, চলতে পারে না। জিজ্ঞাসা করলাম, "কে আছে তোর?" বলল "কেউ নাই,

বিয়ে হয়েছিল, স্বামী মরে গেছে। বললাম, "থাকবি আমার কাছে? বলল, হ্যাঁ বাবা, থাকব। সেই যে বাবা বলল, আজও তাই বলে।" চলতে চলতে থেমে গেলাম, বললাম "তা হ'লে তোমার কৃষ্ণচন্দ্র?" হো হো করে হেসে উঠল সতীশ, বলল, "ওকে পেলাম সেদিন রে, এবারকার হাঙ্গামায় পদ্মার পার থেকে যে জনস্রোত ভাগীরথীর পারে এসে ঢলে পড়ল তাতেই ভেসে এল কৃষ্ণচন্দ্র।" সতীশের হাসিভরা মুখের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকলাম।

একটা ধাক্কা দিয়ে সতীশ বলল, "ঐ তোর বাস এসে পড়েছে।" যখন বাসে গিয়ে উঠলাম তখন চোখে ঝাপ্‌সা দেখছি।

—

জড়শক্তি ও আত্মিক শক্তি

দৈহিক বা জড়ীয় শক্তিতেই কাজ হয়, বুদ্ধিবল, চরিত্রবল, আত্মিক শক্তিতে কিছু হয় না; কিংবা বুদ্ধিবল, চরিত্রবল, আত্মিক শক্তিতেই সব হয়, দৈহিক বা জড়ীয় শক্তিতে কিছু হয় না; ইহার মধ্যে কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ করে না। জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ দৈহিক শক্তিতে ভীম ছিলেন না, কিন্তু যদি তাঁহারা ক্ষীণজীবী, চিররুগ্ন হইতেন, তাহা হইলে সত্যপ্রচার তাঁহাদের দ্বারা হইত না। বড় বড় গ্রন্থকার, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। বাষ্পীয় কলের সৃষ্টির আগে মানুষকে নিজের হাতে যত কাজ করিয়া নানা শিল্পদ্রব্য গড়িতে হইত, এখন ততটা হয় না। কিন্তু এখনও কলকারখানার অল্পবুদ্ধি অশিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান শিক্ষিত কর্ম্মীদের মধ্যে প্রভেদ আছে, দুর্ব্বল ও বলিষ্ঠ কর্ম্মীদের মধ্যেও তদ্রূপ প্রভেদ আছে। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের মজুরেরা যে ল্যাঙ্কেশায়রের কাপড়ের কলের মজুরদের চেয়ে কম কাজ করিতে পারে, তাহা কেবল জলবায়ুর প্রভেদ বা শিক্ষার তারতম্যের জন্য নহে, শারীরিক বলের প্রভেদও তাহার একটা কারণ। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও দৈহিক এবং আত্মিক উভয় শক্তিরই প্রয়োজন লক্ষিত হয়। শারীরিক শক্তিতে পাঠানরা ইংরেজদের চেয়ে, আরবেরা ইটালীয়দের চেয়ে বা তুর্কিরা গ্রীকদের চেয়ে হীন নয়। কিন্তু তাহারা যুদ্ধে হারিয়াছে এইজন্য যে বুদ্ধি, শিক্ষা, কাজের শৃংখলা, আয়োজন, আধ্যাত্মিক শক্তি এবং শারীরিক শক্তি সব একত্র করিলে তাহারা হীন। তীতুমীরের লড়াইয়ে কোন ফল হয় নাই, ক্রমওয়েলের লড়াইয়ে ফল হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয়-অধিকার-প্রার্থিনী সফ্রেজেটদিগের উপদ্রবে ও ধমকে এখনও কোন ফল হয় নাই, কিন্তু আয়র্লণ্ডের স্বায়ত্তশাসনবিরোধী সর্ এডওয়ার্ড কার্সন এবং তাঁহার দলের ধমকে কাজ হইয়াছে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১৩২১।

বৈষ্ণবপদাবলীতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব

শ্রীযোগীলাল হালদার

অবনত আনন কএ হম রহ লিহুঁ
বারল লোচন-চোর।
পিয়া-মুখ-রুচি পিবএ ধাওল
জনি সে চাঁদ চকোর॥
ততহুঁ সঞো হঠে হটি মোঞে আনল
ধএল চরণ রাখি।
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ
তইঅও পসারএ পাঁখি॥
মাধব বোলল মধুর বাণী
সে শুনি মূহু মোঞে কান।
তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল
ধরি ধহু পাঁচ বাণ॥
তনু-পসেবে পসাহনি ভাসলি
পুলক তৈথন জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহু-বলয়া ভাগু॥
ভণ বিদ্যাপতি কম্পিত করহো
বোলল বোল না যায়—
রাজা শিব সিংহ রূপনারায়ণ
শ্যামসুন্দর কায়॥

সাধক-কবি বিদ্যাপতি এখানে পরকীয়া ভাবে আবিষ্ট হয়ে মধুর রসাশ্রিত পূর্বরাগের এই পদটিতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের সার্থক পরিণতি দিয়েছেন। ভক্তকবি ভগবানকে প্রেমিক পুরুষরূপে গ্রহণ করেছেন। ভগবানের অনন্ত রূপ এখানে অনুপস্থিত, তার পরিবর্তে তিনি শান্তরূপে ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূত। এখানেও সেই জটিলা কুটিলা। জড় সংসাররূপ স্বামী আয়ান তাঁকে আদৌ সুখ দিতে পারে না। তাই সংসারে থেকেও নেই। মন পড়ে আছে প্রাণবঁধুর দিকে। কিন্তু উপায়! পথ মিলছে না। সদা ভয়। পাছে লোকে কিছু বলে। চারিদিকে লোকের দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে তবে ত প্রাণবঁধুকে প্রাণ ভরে দেখে নিতে হবে। কিন্তু কই সে সুযোগ। হায় রে সংসার! এখানে ভক্তিপথের বহু বাধা। যেখানে সকলে অসার সংসার নিয়ে ব্যস্ত, সংসার ছাড়া আর কিছু ভাববার যেখানে বিন্দুমাত্র অবসর নেই,অর্থই যেখানে একমাত্র কাম্যবস্তু, আর সেই অর্থের জন্য যে-কোন কাজ করতে তারা দ্বিধাবোধ করে না, মনেও ভাবে না যে—অর্থ সঙ্গে আনে নি অথবা অর্থ সঙ্গে নিয়েও যেতে পারবে না, তবু যে-কোন প্রকারে অর্থ লাভে সচেষ্ট। সেখানে কেহ যদি সাধনমার্গে চলতে চেষ্টা করে, তবে সেই ভিন্নপথের পথিককে নানা বিদ্রূপ বাণে জর্জরিত হ'তেই হবে। তাই ভক্তের সদা এই ভয়-ভাব। লোকভয় সত্যই ভক্তিপথের বড় বাধা।

অথচ—অথচ ভক্তের গন্তব্য পথই ঐ ভক্তিপথ। যে-কোন প্রকারে ঐ পথে যেতেই হবে। তাই লুকোচুরির আশ্রয়। এ ছাড়া সংসারে আর উপায় কি? রাধারূপী ভক্তের তাই বড় সমস্যা। প্রাণবঁধু কৃষ্ণকে দেখবার জন্যে প্রাণে এসেছে আকুলতা। কিন্তু বাধা লোকভয়। চোখ শাসন মানে না। প্রতি তৃণে, গুল্মে, পত্রে-পল্লবে শ্যামসুন্দরকে দেখতে পাচ্ছে। অথচ সংসার-বন্ধন ছেদনের উপায় নেই। এই টানাপোড়েনে প্রাণ কণ্ঠাগত। লোক-লজ্জার ভয়ে প্রাণ ভ'রে পৃথিবীর শ্যাম-শোভার মধ্যে শ্যামসুন্দরকে দেখবার উপায় নেই। পাছে কেউ আকুল চোখের দৃষ্টি দেখে ফেলে। এই ভয়ে ভক্ত আপন মুখখানা নিচু করে রাখে। কিন্তু যে চোখে একবার শ্যামরূপ দেখেছে অনন্ত শ্যাম-শোভার মাঝে সে চোখ বাধা মানবে কেন? চকোর যেমন চাঁদের সুধা পান করবার জন্য ছুটতে থাকে, ভক্তের চোখ দু'টিও ঠিক তেমনি প্রাণবঁধুর শ্যামরূপ দেখবার জন্য চারিদিকে ছুটতে লাগল। কিন্তু সেই জটিলা-কুটিলার ভয়, ভয় সেই লোকলজ্জার। সংসারে নানা বাধা। ভক্ত কিছুতেই ভগবানকে ভাববার সময় পায় না, তথাপি ভগবানের জন্য তার

প্রাণ আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। মাঝে মাঝে যে-কোন অসতর্ক মুহূর্তে ভগবানের বংশীধ্বনি শ্রবণে প্রবিষ্ট হয়, আর তখনই শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

সই, কি আর বলিব।

যে পণ কর্‌যাছি মনে সেই সে করিব॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতির সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পর সঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভিজাই আগুনি॥

ভক্ত-কবি জ্ঞানদাস এখানে পরকীয়া ভাবে ভাবিত হয়েছেন। মধুর রসাশ্রিত পূর্বরাগের এই পদটি অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রাধা-ভাবে ভাবিত কবির পূর্ণ আত্মসমর্পণের আকূতি প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়। কবির অন্তরে অন্তরময় রূপে ভগবান্ বিরাজিত। তাই পার্থিব জগতের সর্বত্র তিনি শ্যামসুন্দরের শ্যামরূপ দেখছেন। দেখে তাঁর আশ মিটছে না। আনন্দাশ্রু উপচিয়ে পড়ছে চোখ দিয়ে। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হচ্ছে না ব'লে প্রাণ তাঁর অস্থির। ক্ষণে ক্ষণে দর্শন ও স্পর্শের আশায় তাঁর শরীর এলিয়ে পড়ছে। কখন কখন তিনি ভগবানের হাসিমুখখানি যেন তাঁর সমুখে দেখতে পাচ্ছেন। গুরুজনদের কাছে থেকেও তাঁর হুঁশ নেই, তাই মাঝে মাঝে তাঁর দেহে অকারণ-অবারণ পুলকের সঞ্চার হয়। নয়নে আনন্দাশ্রু আসে। পুলক ও অশ্রু গোপন করবার জন্য তিনি কত চেষ্টাই না করেন। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও গুরুজনের অগোচরে তাঁর সম্বন্ধে তাঁর এই ভাবান্তরে উদ্বেগ প্রকাশ করে কতই না আলোচনা করেন। ভক্ত তাতে লজ্জা পান না।

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি॥
দুহু কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু-কমল বলি সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥
চাতক-জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপ কহি সোহ নহে তুল।
না যাইলে ভ্রমর আপনি না দেয় ফুল॥
কি ছার চকোর চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥

সাধক-কবি চণ্ডীদাসের এই পদটিও অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মধুর রসাশ্রিত পূর্ব্বরাগের এই পদে কবি ভক্ত ও ভগবানের তথা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্ম-ভাবের কথা প্রকাশ করেছেন। রাধাভাবে ভাবিত ভক্ত এবং ভগবানের সম্পর্ক অতীব আশ্চর্যজনক। উভয়ের প্রাণ একসূত্রে বাঁধা, মুহূর্ত্তের অদর্শনও ভক্ত সহ্য করতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অত্যন্ত নিকটে থেকেও নিজেদের মধ্যে বিচ্ছেদ অনুভব করে ভক্ত আকুল হয়ে পড়েন। ভক্ত ও ভগবানের এ এক আশ্চর্য প্রেম! প্রেম রসাস্বাদনের এক অদ্ভুত নিদর্শন। কবিরা সূর্য ও কমলের ভালবাসার কথা ব'লে থাকেন বটে, কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের প্রেমের তুলনায় সে ভালবাসা কিছুই নয়; কারণ শীতের সময় পদ্ম যখন মরে যায়, সূর্য তখনও দিব্য সুখে থাকে। যে-প্রেমে একজন আর একজনের সুখ-দুঃখকে নিজের করে নিতে পারে না, সে-প্রেমের সঙ্গে ভক্ত ও ভগবানের প্রেমের তুলনা হ'তে পারে না। মেঘ ও চাতক, পুষ্প ও ভ্রমর, চাঁদ ও চকোর—এদের সম্পর্ক সাময়িক, নিত্যকালের নয়। তাই এদের প্রেমে

দু'জনের সমান আগ্রহ নেই। কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক নিত্যকালের। তাই সর্বব্যাপী ভগবানের অত্যন্ত কাছে থেকে, সর্বত্র তাঁর অপরূপ রূপ নিরীক্ষণ করে, বিচ্ছেদের ব্যথা অনুভব করে ভক্ত আকুল হয়ে পড়েন। রাধাভাবে ভাবিত বৈষ্ণব-ভক্তের এই প্রেমের নিদর্শন অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের সারকথা। এই পার্থিব প্রেমের গুহ্যতত্ত্ব অবর্ণনীয়।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝনুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
কহ কবি বল্লভ (বিদ্যাপতি কহ?) প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥

বিদ্যাপতির এই পদটিও অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মধুর রসাশ্রিত পূর্বরাগের এই পদে কবি ভক্ত ও ভগবানের অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা প্রেমের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। রাধাভাবে ভাবিত ভক্তের প্রেমের স্বরূপ বর্ণনাতীত। এ প্রেম জড় পদার্থের মত এক অবস্থায় থাকে না, আবার পুরাতনও হয় না; পরন্তু প্রতি মুহূর্তে নূতনত্ব প্রাপ্ত হয়। যে-প্রেম ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়, যে-প্রেম চিরনবীন চিরনূতন,—সে-প্রেমের স্বরূপ শুধু অনুভূতিগ্রাহ্য, অনুভববেদ্য অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের ইহাই চরম ভাব। ভগবান চিরনবীন চিরসুন্দর তাই তাঁর রূপ নয়ন ভরে দেখেও দেখার তৃপ্তি হয় না, প্রতিনিয়ত দেখবার আশা জাগে মনে। আকাশে-বাতাসে সর্বত্র প্রতিনিয়ত সে ধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে তার মধ্যে তাঁরই মধুর স্বর ভক্তের শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হয়। সেই স্বরের এমনি মোহিনী শক্তি যে, জীবনভোর সেই স্বর শুনলেও শোনার আশ মেটে না। লক্ষ লক্ষ যুগ ভগবানকে হৃদয়ে রেখেও অর্থাৎ ভগবানের স্পর্শ হৃদয়ে অনুভব করলেও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না।

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কন পণ ফণি মুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥
গুরুজন-বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

গোবিন্দদাসের এই পদটিতে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ পেয়েছে। মধুর রসাশ্রিত অভিসারের এই পদে কবি ভক্ত ও ভগবানের অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমের এক অপূর্ব ভাবময়তার সৃষ্টি করেছেন। ভগবানের বাঁশি যে কখন বাজবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যে-কোন সময়ে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে সে বাঁশি বাজতে পারে। তখন আর প্রস্তুতির সময় পাওয়া যাবে না। সেই না-প্রস্তুতি অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়তে হবে। কোন শিক্ষা না থাকলে তখন সমূহ বিপদ আছে। —তাই সেই অসতর্ক মুহূর্তের জন্য সাবধানী ভক্তের প্রস্তুতি চল্‌ছে। যদি কণ্টকাকীর্ণ পথে চলতে হয় তবে সেই পথের কণ্টকে পদতল ক্ষতবিক্ষত হ'তে পারে। সে-জন্য যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তাই ভক্ত আঙিনায় কাঁটা পুঁতে কণ্টকময় পথে চলার অভ্যাস করছে। বর্ষাকালে পিছল পথে আঁধার রাতে যদি চলতে হয়, তাই ভক্ত নিজ আঙিনায় জল ঢেলে পিছল করে রাত্রি জেগে চোখ বুজে চলার সাধনা

করছে। যদি সেই আঁধার রাতে সাপে কামড়ায় তাই সাপের সমুখে পড়লেও সাপ কোন প্রকার ক্ষতি করতে না পারে তার জন্ম সাপের ওঝার কাছ থেকে বিশেষ শিক্ষা লাভ করছে। ভক্তের এই ভাব দেখে গুরুজনে যদি কোন কথা বলে তবে সে তাহা শুনেও শোনে না—যেন সে কালা। সে যে সত্যই কালা এমন ভাব দেখাবার জন্ম কখন কখন এক কথার অন্য উত্তর দেয়। অন্য পরিজন যদি ভক্তের এই ভাব দেখে কোন কথা বলে তবে সে বিহ্বলের মত হাসতে থাকে। এমন ভাব দেখায় যেন সে কিছুই বুঝতে পারে নি।

মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ-আগমন-কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥
মন্দির তেজি যব পদ চার অওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ॥
একে কুল কামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দুর।
আর তাহে জলধর বরিষয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পুর॥
একে পদ পঙ্কজ (পদ কম্পিত?) পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুঃখ অবদূরে গেল॥
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়হুঁ গৃহ-সুখ-আশ।
পন্থক দুখ তৃণ— হুঁ করি না গণলুঁ
কহতহি গোবিন্দদাস॥

গোবিন্দদাসের এই পদটিতেও অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। মধুর-রসাশ্রিত অভিসারের এই পদে অভিসার-অন্তে ভক্ত ভগবানের নিকট স্বতঃ-উৎসারিত মনোভাব নিবেদন করছে। সাধনার দুর্গম পথে চলতে ভক্তের যে চরম দুরবস্থা ঘটেছিল, ভগবানের পায়ে সেই অবর্ণনীয় দুঃখের সামান্যতম অংশ নিবেদন করে সে শান্তিলাভ করতে চায়। শান্তিলাভের সেই ত প্রকৃষ্ট পথ। ভক্ত একথা ভালভাবেই জানে। আর জানে বলেই সে অকপটে ভগবানের পায়ে তার হৃদয়ভরা দুঃখ নিবেদন করছে।

ভগবানের দর্শন আশা মনে জাগলে, পার্থিব সুখ-দুঃখের কথা আর মনে স্থান পায় না, সংসার অসার বোধ হয়। কঠিন দুঃখভোগের পর ভক্তের মনোমন্দিরে ভগবানের সঙ্গে তার যে মিলন হয়, সে মিলনের আনন্দ অবর্ণনীয়। জীবনের অনন্ত দুঃখ সেই মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। অতীন্দ্রিয়ানুভূতির এই ত চরম প্রকাশ।

সখীর বচনে অথির কান।
বুঝন সুন্দরী তেজল মান॥
অরুণ নয়ান ঝরয়ে লোর।
গদগদ স্বরে বচন বোল॥
কেমনে সুন্দরী মিলব মোয়।
অনুকূল যদি বিধাতা হোয়॥
এত কহি হরি সখীর সঙ্গে।
মিলল রহি আনন্দ-রঙ্গে॥
হেরি বিধুমুখী বিমুখী ভেল।
কানুরে সো সখি ইঙ্গিত কেল॥
চরণ কমলে পড়ল কান।
সখীর বচনে তেজল মান॥
ধনি-মুখ-শশী হরি-চকোর।
হেরিতে দুহুঁক গয়য়ে লোর॥
হৃদয়-উপরে থুওল রাই।
প্রেমদাস তব জীবন পাই॥

প্রেমদাসের এই পদটিতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের এক অপূর্ব ভাব প্রকাশ পেয়েছে। মধুর রসাশ্রিত মান-এর এই পদে রাধাভাবে ভাবিত ভক্ত ভগবানের নিকট যে কত প্রিয় কত আপন—যেন অভিন্ন—তা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ভক্ত ও ভগবান্ বা জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে এক ও অভিন্ন এ কথা আমরা বহুবার বলেছি। অতীন্দ্রিয়বাদীর মনে সব সময় "সঃ অহম্, অহম্ সঃ"—এই ভাবটি জাগ্রত থাকে। তাঁর ফলে তার মন থেকে 'তিনি'—'আমি'র দূরত্ব দূর হয়ে মনে একীভাব আসে। ভক্ত ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ মিলনপ্রয়াসী। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে এই মানস-মিলন এখনও সম্ভব হয়

নি। তাই ভক্তের হয়েছে দারুণ অভিমান। সংসারে এরূপ অভিমানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অভিমান সর্বজনবিদিত। কিন্তু সে মানভঞ্জন যে কত রকমের হয়, কাব্য-সাহিত্যে সব সময় তার পূর্ণ বিবরণ থাকে না। অবশ্য আমাদের আলোচ্য ভগবানের প্রতি ভক্তের এই অভিমান সম্পূর্ণ মানসজ—এবং ইহাই অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের মৌলভাব।

ভাবটি এইরূপ। ভগবানের সঙ্গে মিলনের জন্য ভক্ত অস্থির। কিন্তু অস্থির হ'লে কি হয়? সময় না হ'লে ত তার সঙ্গে মিলনও হ'তে পারে না। ভক্ত তা বোঝে না। তাই এই অভিমান। পরে যখন তার সজাগ মনে-পাতা-আসনে ভগবানের আবির্ভাব হ'ল, তখন ভক্তের দারুণ অভিমান। তাই ভগবানের আবির্ভাবে সাড়া দিল না ভক্ত। তখন ভক্তকে প্রসন্ন করার জন্য ভগবান্ তার পায়ে ধরলেন। এ যেন নিজের পায়ে নিজে হাত দিলেন। এই ত, "সঃ অহম্, অহম্ সঃ।" ভক্তের অভিমান দূর হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ভগবানকে মনোবেদীতে বসাল। এখানে জয়দেবের প্রভাব পূর্ণ বিদ্যমান। শ্রীগীতগোবিন্দে আমরা পাই—

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনম্।
দেহি পদপল্লবমুদারম্। ॥ ৯ ॥ ১০ম সর্গ

সুবাসিত বারি ঝারি ভরি তৈখনে
আনল রসবতী রাই।
দুখানি চরণ পাখালিয়ে সুন্দরী
আপন কেশেতে মোছাই॥
অঙ্গক ধূলি বসনহি ঝাড়ই
অনিমিখে হেরই বয়ান।
তুহুঁ সনে মান করলুঁ বর মাধব
হাম অতি অলপ পরাণ॥
রমণীক মাঝে কতুই শ্যাম-সোহাগিনী
গরবে ভরল মঝু দেহ।
হামারি গরব তুহুঁ আগে বাঢ়াঅলি
অবহুঁ টুটায়ব কেহ॥
সব অপরাধ খেমহ বর মাধব
তুআ পায়ে সোপলুঁ পরাণ॥
গোবিন্দদাস কহ কাহু ভেল গদ্ গদ
হেরইতে রাই-বয়ান॥

গোবিন্দদাসের এই পদটি প্রেমদাসের উপরি-উক্ত পদটির ঠিক পরিপূরক। মধুর-রসাশ্রিত মান-এর এই পদে অতীন্দ্রিয়ভাবটি পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ পেয়েছে। ভক্তের অভিমান দূর হয়ে গেছে। তাই এখন ভগবানের সেবায় পূর্ণ আত্মনিয়োগের পালা। কতভাবে এই সেবা। এই সেবা-ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অতীত। ভক্তের একমাত্র কামনা—"যেন তোমার সেবায় রত থাকতে পারি।" এখানে রূপে-স্বরূপে একাকার হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি।" ভক্ত এখানে ভগবানের সাকার রূপের মধ্য দিয়ে অরূপের উপাসনায় রত। তাই সুবাসিত বারির দ্বারা তাঁর চরণযুগল ধুয়ে স্বীয় কেশ দ্বারা মুছিয়ে দিচ্ছে। আপন অভিমানের কৈফিয়ৎ দিতে সে বলছে যে, তিনিই তার গর্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন ব'লেই সেই অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সে তাঁর উপর অভিমান করেছিল। এখন অনুতপ্ত হৃদয়ে তাই ক্ষমা চাইছে,—যেন শ্যামসুন্দর ক্ষমাসুন্দর চোখে তার দিকে দৃষ্টি দেন। আশা আছে ক্ষমা পাবেই সে।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের শেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাঁশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়॥

মধুর-রসাশ্রিত আক্ষেপানুরাগের এই পদটিতে দ্বিজ চণ্ডীদাস অতি নিপুণ ভাবে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। ভগবানের বংশীধ্বনি ভক্তের কানের মধ্য দিয়ে মর্মস্থলে প্রবেশ করলে ভক্ত যে কিরূপ ভাববিহ্বল হয়,

সাধক-কবি চণ্ডীদাস এখানে তার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। ভাববিহ্বল ভক্ত ভগবানকে পাবার জন্য কি না করতে পারে। ভগবৎ-সান্নিধ্য, ভগবৎ-প্রেম লাভের আশায় ভক্ত তার স্বভাব-সংস্কার, আচার-আচরণ এবং এমন কি প্রকৃতির আইন-কানুন পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করে তার লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয়। এর পরেও যখন তাঁর প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়, শুধু তখনই ভক্তহৃদয় ব্যথায় ভরে যায়। ভগবৎ-প্রেমের স্রোতে ভাসমান ভক্ত কুল না পেয়ে তখন অতি অসহায় ভাবে ভেসে চলে। ভগবানকে না পাওয়ার বেদনায় মাঝে মাঝে তার শ্যাম-সমান মরণকে বরণ করতে সাধ হয়।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দু'টি কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কয় পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

মধুর রসাশ্রিত আত্মসমর্পণের এই পদে চণ্ডীদাস অতি চমৎকার ভাবে অতীন্দ্রিয়ভাবের সমাবেশ করেছেন। স্বকীয়া ও পরকীয়া—যে-কোন ভাবে এর ব্যাখ্যা চলতে পারে। নারী যেমন করে তার দয়িতের পদে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে—কিছুমাত্র ফাঁক রাখে না—এখানে ভক্ত ভগবানের পায়ে ঠিক সেইরূপে আত্মসমর্পণ করেছে। ভগবদ্ ভক্ত এখানে মুক্তিপ্রয়াসী নহে। তা ছাড়া বৈষ্ণব-ভক্তেরা মুক্তিপ্রয়াসী হয়ও না। একটি গানের কথা এখানে মনে আসছে। এক বৈরাগীর আখড়ায় অবস্থানকালে গানটি শুনেছিলাম অনেকদিন আগে। কবির নাম বা পূর্ণ গানটি আজ আর মনে নেই। তবু যেটুকু মনে আছে এখানে তার উল্লেখের প্রয়োজন মনে করি। গানটির ঐ অংশে আছে—

মুক্তি চাই না হরি (আমি মুক্তি চাই না)।
চিনি হওয়া চেয়ে চিনি খাওয়া ভালো
দেখিলাম চিন্তা করি (আমি মুক্তি চাই না)।

বৈষ্ণব-ভক্ত শুধু মৃত্যুর পূর্বাহ্নে নহে, জীবনের প্রতি মুহূর্তে ভগবানকে প্রাণপ্রিয় বলে মনে করে। আর এই মনোভাব শুধু এক জন্মের জন্য নয়। চক্রের আবর্তনের মত যতবার এই পৃথিবীতে আসা-যাওয়া করবে ততবারই ভগবান্ তার একমাত্র প্রিয় এই আশাই তার মনে বাসা বেঁধে আছে। ভগবানের চরণাশ্রয় ব্যতীত ভক্তের বাঁচবার কোন আশ্রয় নেই। কারণ ত্রিজগতে তার আপন বলতে আর কেউ নেই। ভগবানের বিচ্ছেদ মুহূর্তের জন্যও অসহনীয়। তাই তার একমাত্র প্রার্থনা—তিনি যেন তাকে মুহূর্তের জন্য চরণ ছাড়া না করবেন।

বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দু'টি চরণ
সদা লইয়া রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি॥
নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চান্দা।

জ্ঞানদাসে কয় তোমার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা ॥

মধুর-রসাশ্রিত আত্মসমর্পণের এই পদটিতে জ্ঞানদাস অপূর্ব অতীন্দ্রিয়ভাব সমাবেশ করেছেন। স্বকীয়া ও পরকীয়া—এই দুই প্রকারেই এর ব্যাখ্যা চলতে পারে। সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের সেই ভাবটি ভক্তের মনোমধ্যে এখানে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ভগবানের অতি প্রিয় বলে ভক্তের মনে যে একটি নিরীহ গর্বের ভাব থাকে, এখানে তা প্রকাশ পেয়েছে। ভগবদ্ পাদপদ্ম ছাড়া ভক্তের অন্তরে আর কিছুর ঠাঁই নেই। ভগবানই ভক্তের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, এমন কি নিজের প্রাণ থেকেও প্রিয়তর। শয়নে স্বপনে ভগবদ্-প্রেম উপলব্ধিই ভক্তের একমাত্র কর্ম।

এসখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥
ঝাম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ।
সঘন খর শর হন্তিয়া ॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥
তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥

মধুর-রসাশ্রিত মাথুর পর্য্যায়ভুক্ত এই পদটি বিদ্যাপতির কবি-প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন। এখানেও কবি অতি সুন্দর অতীন্দ্রিয়ভাব সমাবেশ করেছেন। সংসারের পিচ্ছিল পথে চলার কালে কখনও কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে ভক্তের মন থেকে ভগবান্ হঠাৎ অন্তর্ধান করেন। তারপর যখন ভক্ত-হৃদয়ে সম্বিত ফিরে আসে, তখন সে উপলব্ধি করে—তার হৃদয়স্থিত ভগবানের আসনখানা শূন্য। হৃদয়ভরা অনন্ত দুঃখ তখন তার অসহনীয় হয়ে ওঠে। সুন্দর পৃথিবীর সকলেই আনন্দিত; কিন্তু তার হৃদয়ের ধন কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে পালিয়েছেন বলে তার হৃদয় শূন্যতায় পূর্ণ হয়ে গেছে। সেই শূন্যতার ভার তার কাছে মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণাদায়ক। ভগবানের মধুর স্পর্শ-বিনা তার কিভাবে সময় কাটবে, কতক্ষণে আবার ভগবানের আবির্ভাব ঘটবে তার হৃদয়ে সেই চিন্তায় ভক্তহৃদয় আকুলিত।

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল ॥
চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে
পুলক যৌবন ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলি.ছ হিয়ার হার ॥
প্রভাত সময় কাক কোলাহলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায় ॥
মুখের তাম্বুল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে সব ভেল শুভ
বিহি ভেল অনুকূল ॥

চণ্ডীদাসের এই পদটি অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের চরম নিদর্শন। মধুর-রসাশ্রিত ভাব সম্মেলনের এই পদে কবি ভক্ত ভগবানের তথা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। ভক্ত-হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বে এক অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। একদিন কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে তিনি ভক্ত-হৃদয় থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন—শুধু তার অন্তরের আকর্ষণ যাচাই করবার জন্য। যাচাই করে তিনি দেখেছেন যে সে হৃদয়ে একমাত্র তাঁরই স্থান। তাঁর অন্তর্ধানে সেখানে উত্তাল তরঙ্গ উঠেছে, আর সুদক্ষ নাবিকের মত ভক্ত হাল ধরে আছে। বিশ্বাস তার—কূল পাবেই। আজ যে তিনি অনুকূল হয়েছেন, আজ যে তার শূন্য হৃদয় ভরে যাবে তাঁর

আবির্ভাবে পূর্বাহ্নেই ভক্ত তা উপলব্ধি করতে পেরেছে। অন্তরের অন্তস্থল থেকে যে আনন্দের বার্তা আসছে, তা প্রকাশের অতীত। চারিদিকে সে নানা শুভ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে। অতীন্দ্রিয়বাদীর এই আনন্দ শুধু মরমী-রাই বুঝতে পারে।

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
বেদি করব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
আলিপন দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার॥
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র-পল্লব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প॥
দিশি দিশি আনব কামিনী—ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাঁদক হাট॥
বিদ্যাপতি কত পূরব আশ।
দুই-এক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥

বিদ্যাপতির এই পদটিতে অতীন্দ্রিয়ভাবের পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে। মধুর-রসাশ্রিত ভাব-সম্মিলনের এই পদে কবি ভক্ত ও ভগবানের তথা জীবাত্মা ও পরমাত্মার পূর্ণ মিলনের পন্থাটি অতি চমৎকাররূপে প্রকাশ করেছেন। রাধাভাবে ভাবিত ভক্তের দেহই মঙ্গল-আচারের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। দেহ-মন্দিরই ভগবানের অধিষ্ঠানের পরম ধাম। মানুষের তৈরী মন্দির ভগবানের উপযুক্ত স্থান নহে। অন্ততঃ অতীন্দ্রিয়বাদীর কাছে নহে। ভক্তের অঙ্গই বেদী। সে তার কেশ দিয়ে সে বেদী ঝাঁট দিবে। ভক্তের সংগে ভগবানের এই মিলন বর্ণনাতীত। এ শুধু অনুভূতিগ্রাহ্য, অনুভববেদ্য। ভক্তহৃদয়ে ভগবানের পুনরাবির্ভাবে ভাবোল্লাসের সুন্দর চিত্র এখানে চিত্রিত হয়েছে।

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়াজনু ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি
যব্ তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ—
ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিলএক দেহ দীনবন্ধু॥

শান্ত-রসাশ্রিত এই পদে বিদ্যাপতি বৈষ্ণব-ভক্তের আন্তরিক প্রার্থনা জানিয়েছেন। বৈষ্ণব ধর্মের উন্মেষ-পর্বে এই জাতীয় সাধনাই ছিল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত ও পথ। এই পথেই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ ঘটে ব'লে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। ভগবানের সামীপ্য লাভই যে বৈষ্ণব ভক্তের একমাত্র কাম্য, একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই জাতীয় সাধনার ধারা পরিবর্তিত হয়ে ক্রমে ক্রমে, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধনায় পরিণতি লাভ করেছিল, "জয়দেব ও অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব" প্রবন্ধে তা আলোচনা করেছি। বৈষ্ণবী সাধনার এই ধারাটি সর্বশেষে আলোচনার কারণ—বৈষ্ণব মতের ভাব-পরিবর্তন। এটি এখন সাধনার অঙ্গীভূত না হয়ে বৈষ্ণব-ভক্তের প্রার্থনায় পরিণতি লাভ করেছে। "যেন সেবায় রত রাখতে পারি।"—এই আকুলতাই এই জাতীয় প্রার্থনার ভাবসত্য। ভক্ত তিল তুলসী দিয়ে নিঃস্ব হয়ে ভগবানকে তার দেহ-মন-প্রাণ দান করছে। "তুমি যেমন চালাও তেমনি চাল"—এই ভাবই এখন ভক্ত মনে বাসা বেঁধেছে। দিবারাত্র সেই ভাবেই সে এখন চলতে চায়। শুধু সেবা আর সেবা এই তার কাম্য। বৈষ্ণব ধর্মের লোকায়ত ভাবটি এর মধ্যে এই ভাবে প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল ব'লে আমার বিশ্বাস।

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "বৈষ্ণব পদাবলী" (চয়ন) ৫ম সংস্করণ থেকে উক্ত পদগুলির পাঠ গৃহীত হয়েছে।]

রায় বাড়ী

গিরিবালা দেবী

হেমন্তের বেলা পাখীর মতন পাখা মেলিয়া যেন উড়িয়া যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চাহিলেও সে ধরা দেয় না।

সেদিন অপরাহ্ণে এ গ্রামের ছোট বড় বৌ ঝি সকলের গ্রামপ্রসিদ্ধ মৈত্রবাড়ীর ঠাকুরকন্যা বিনুকে দেখিতে আসিলেন।

তখনকার কালে পল্লীগ্রামে বড় ননদিনীকে ছোট ভ্রাতৃজায়ারা 'ঠাকুরকন্যা' বলিয়া ডাকিত। ছোটরা ঠাকুঝি, শ্বশুর ঠাকুর, শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা বটঠাকুর বা বড় ঠাকুর। দেবররা ছোট ঠাকুর, শাশুড়ী ঠাকুরাণী। বর্ত্তমান যুগের মত ঠাকুর নামধারী পাচক সে-যুগের রন্ধনশালার অধিশ্বর হইতে পারে নাই। সাধারণ গৃহস্থ গৃহে অজ্ঞাত-কুলশীল পাচকের রন্ধন অন্ন কেহ গ্রহণ করিত না। ধনী সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা অবশ্য স্বতন্ত্র।

ঠাকুরকন্যার প্রকৃত নাম হইল শশীকলা। সে নামে ডাকিবার মানুষ এ গ্রামে আর একটিও অবশিষ্ট নাই। সে নাম বহু পূর্ব্বেই পৃথিবী হইতে মুছিয়া গিয়াছে। যাঁহারা একদা ইঁহাকে ঠাকুরকন্যা সম্বোধন করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন; তাঁহারা ত গিয়াছেনই, তাঁহাদের ছেলে-মেয়েরাও পাড়ি দিয়াছে ভবনদীতে। এখন নাতীদের পালা চলিতেছে। 'ঠাকুরকন্যা' কিন্তু বিরল পত্র বটগাছের মত এখনও দিব্য খাড়া রহিয়াছেন। কেহ বলে, "বুড়ীর বয়েস একশো দশ" কেহ বলে, "একশো পাঁচ।" যাহার যাহা খুসী বলিলেও তিনি বেশ আছেন। মাথার চুল এখনও কাঁচার ভাগ বেশি। দাঁত একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই, ফাঁকে ফাঁকে দুই-একটা হাসিলে ঝিলিক দেয়। সুঠাম মেদশূন্য, দেহ, অতসী ফুলের অনুরূপ গায়ের বর্ণ, এখনও উজ্জ্বল, অম্লান।'

কে জানে সে কত যুগ পূর্ব্বের কথা—শশিকলা অপূর্ব্ব রূপের জোরে এক সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীর রাজ-অন্তঃপুর আলো করিয়া বৌরাণী নামে বরণীয়া হইয়াছিলেন। দীন দরিদ্রের কন্যার রাজ্যভোগ বেশি দিন হয় নাই। ফিরিতে হইয়াছিল সীমন্তের সিঁদুর মুছিয়া। শশিকলার সিঁদুর মুছিয়া গেলেও সে ফিরিল প্রচুর বিত্তশালিনী হইয়া। পিতার ভাঙ্গা গৃহ মনোরম অট্টালিকায় পরিণত হইল। জলাশয় খনন হইয়া স্বচ্ছ জলে টলমল করিতে লাগিল। ঘরে বসিয়া পেট পূজা করিবার বিঘা বিঘা ধান জমি হইল। কন্যার আনীত সম্পদের সুব্যবস্থা হইবার পরে বাপ ভাই লড়িলেন যাবজ্জীবনব্যাপী মাসোহারারও জন্যে। মোটা দাগে মাসোহারা ধার্য্য হইয়া গেল।

পুরাণে বর্ণিত আছে নাগকুলে দেবী মনসা যেমন পূজিতা হইয়াছিলেন তেমনি পূজিতা হইয়াছেন ঠাকুরকন্যা। পিতামাতা, ভাই ও বধূরা ঠাকুরকন্যাকে আরাধনা করিয়া বিদায় লইয়াছে। এখন তাঁহাদের নাতি ও বধূরা সযত্নে ঠাকুরকন্যার পূজার থালি সাজাইয়া রাখিয়াছে। দেবী অপ্রসন্ন হইলে বিষম বিপাক। সংসার বৃহৎ হইয়াছে, ব্যয় মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে। গোষ্ঠীসমেত সকলে চাহিয়া আছে ওই মাসোহারার দিকে। ঠাকুরকন্যার পায়ে কাঁটা ফুটিলে পরিবারের সকলে বুক পাতিয়া দেয়। হাঁচিলে-কাশিলে উদ্বেগের অন্ত থাকে না। কাজেই ঠাকুরকন্যা আছেন পরম সমাদরে পরম যত্নে।

ঠাকুরকন্যা আঙ্গিনায় পা দিয়া হাঁক দিলেন, "ওলো ঈশানের ঈশানী বড়বৌ, কোথায় তোরা? নাতনী এসেছে একদিন ত দেখাতেও নিয়ে গেলি না? সকলের জন্যেই পরাণটা আমার আকুলি-ব্যাকুলি করে। তাই নিজেই দেখতে এলাম।"

দুর্গাসুন্দরী বারান্দায় কুশাসন পাতিয়া দিয়া ঠাকুরকন্যাকে প্রণাম করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন "আসুন ঠাকুরকন্যা, বসুন। কালকেই আপনাকে প্রণাম করাতে বিনুকে নিয়ে যাব ভেবেছিলাম। শীতের বেলা, সংসার ফেলে বেরোন হয়ে ওঠে না। ও বৌমা, বিনু, ঠাকুরকন্যা এসেছেন, প্রণাম করে যাও।"

ঠাকুরকন্যা কুশাসন অধিকার করিলে মা ও মেয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, মা সরিয়া গেল। বিনু বসিল সেখানে।

ঠাকুরকন্যা সস্নেহে বিনুর চিবুক ধরিয়া আদর করিতে

লাগিলেন, "কতদিন পরে তোর সোনামুখ দেখলাম বিনু, তুই এখনও তেমনি ছোটখাটো রোগা রয়েছিস? শরীরের বাড়বাড়ন্ত বড় কম। এখন ত শীতকালটা থাকবি এখানে? নতুন বৌকে বিয়ের প্রথম বছরে সকলেই বাপের বাড়ীতে রেখে দেয়।"

বিনু কহিল, "আমাকে এই মাসেই নিয়ে যাবে।"

ঠাকুমা আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, "না ঠাকুরকন্থা, ওরা মেয়েটাকে থাকতে দেয় না এখানে। এই ত মাত্তর পনের দিনের কড়ারে আসতে দিয়েছে। পনের দিনের কেটে গেল কটা দিন।"

ঠাকুরকন্থা গালে হাত দিলেন, "ছটাকি জমিদারদের এ আবার কেমনধারা রীতি-প্রকৃতি? এদিক নেই, সেদিক আছে। বিয়ের নামে খোঁজ নেই কুলোপনা চক্কর। হ্যাঁ, সাবেক কালে রাজা-রাজড়াদের ঘরে বৌ আটকে রাখার নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু তারা ছটাকি ছিল না, ছিল সেরকি। দেখ বড় বৌ, শশিঠাকরুণের সকলের ঘরের খবর নখদর্পণে। যত রাজা-রাজড়া জমিদার তাদের অধিকাংশ বারেন্দ্র সমাজের এই দেমাকে বারেন্দ্র বামুনরা আটখানা। কচি মেয়েটাকে ভরা শীতে আটক করিস কোন্ আক্কেলে? যত সব নাপতে কালাইয়ের কাণ্ডকারখানা।"

শ্বশুরকুলের কি কুচ্ছা ঠাকুরকন্থা ব্যক্ত করিবেন ভাবিয়া বিনু ক্ষুণ্ণ হইয়া নত নেত্রে বসিয়া রহিল। দুর্গাসুন্দরীরও প্রসন্ন হইলেন না। সকলেই জানে ঠাকুরকন্থার মুখ আলগা। তিনি একদা নামকরা ঘরের বৌরাণী হইয়া গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। এখনও জড়িত হইয়া রহিয়াছেন সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত জমিদার বংশের সহিত। কিছুকাল পূর্ব্বের শ্বশুরকুলের বিবাহ পৈতা ও অন্নপ্রাশন সকল অনুষ্ঠানেই তাঁহাকে যোগ দিতে হইত। অধুনা তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।

দুর্গাসুন্দরী সভয়ে প্রশ্ন করিলেন, "বিনুর শ্বশুরদের কি আপনি আগে থেকেই চিনতেন ঠাকুরকন্থা?"

চারিণী যেন অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, "কি বলিস বড়বৌ, রাজা দেবীদাসের বংশধরদের শশিঠাকরুণ চিনবে না? বঙ্গদেশে কে আবার ওদের না চেনে। আত্রাই নদীর তীরে ছাতকে ছিল রাজা দেবীদাসের 'রাজধানী'। নবাবের সঙ্গে বিবাদ করে রাজা দেবীদাস বিপদে পড়েছিলেন। নবাব হুকুম দেয় রাজার বংশ বিনাশ করতে। রাজার একমাত্র ছেলে তখন ছেলেমানুষ, অনেক দিনের পুরাণো বিশ্বাসী চাকর ছিল রাজার, তার নাম ভীমকালী নাপিত। রাজভবন যখন আক্রমণ হয় তখন ভীম নিজের ছেলেকে রাজপুত্রের পোষাকে সাজিয়ে শুইয়ে রেখেছিল বিছানায়। রাজার ছেলেকে সুড়ঙ্গপথে নিজের ভাইয়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দেয় কাবারীখোলা গাঁয়ে।

পরে নবাবের সঙ্গে দেবীদাসের অনেক যুদ্ধ হয়, দুই পক্ষই ক্ষমতাশালী বলবান। শেষে নবাব সন্ধি করে। কিন্তু রাজপুত্র নামে যে ভীমের ছেলেকে বধ করা হয়েছিল সে আর ফিরে আসে না। তার পর থেকে রায়বংশধরেরা নিজেদের পদবীর সঙ্গে ভীমকালী জোড়া দিয়ে নিজেদের মহানুভবতায় পরিচয় দিয়ে আসছে। দেবীদাসের রাজত্ব ক্রমে ভাগ বখরায় খণ্ডবিখণ্ড হয়ে ছটাকি জমিদারি হয়েছে।"

বিনু মোহিত হইয়া ঠাকুরকন্থার অতীত কাহিনী শুনিতেছিল। সে অল্পদিন পূর্ব্বে 'রাজস্থান' পড়িয়াছিল, রাজপুতের আদিজননী ধাত্রীপান্না তাহার হৃদয়ে গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। ইতিহাস পান্নাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। বরেন্দ্র ভূমির ভীমকে কে স্মরণ করিয়া রাখিবে? বিস্মৃতির অন্তরালে কত ভীম-অর্জ্জুন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কতক্ষণ পরে দুর্গাসুন্দরী ঠাকুরকন্থার প্রোজ্জ্বল মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা ঠাকুরকন্থা, এঁরাও নাকি রাজা গণেশের শুনতে পাই? কিন্তু এঁদের ত কোথায়ও একছিটে জমিদারীর নামগন্ধও নেই।"

ঠাকুরকন্থা সগর্জ্জনে আবার সুরু করিলেন "থাকবে কি করে?" এরা যে হারে নারে বত্রিশ পাঁজরে হা-ভাতে বারেন্দ্র বামুনের ঝাড়। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিয়েছে! রাজা গণেশের বংশধরেরা বৈরাগী ঝুলি কাঁধে নিয়ে বিলিয়ে দিয়েছিল সর্ব্বস্ব। রাজা গণেশের ছেলে বাদশাজাদির প্রেমে পড়ে মুসলমান ধর্ম্ম নিয়ে বিয়ে করেছিল বাদশাজাদিকে। যদুর আগের বিয়ে-করা বৌ যদুকে পত্তর লিখেছিল, তোর মনে নেই বড় বৌ—

যবনের লাগি যার জাতি দেয় পতি,
কি পাঠ লিখিব তারে, কহ গৌড়পতি?"

দুর্গাসুন্দরী সবিস্ময়ে কহিলেন, "আপনার এতও মনে থাকে ঠাকুরকন্থা, কতকালের কথা মনে করে রেখেছেন? আমরা আজ যা শুনি কাল ভুলে যাই।"

"তোরা যে ঘোর সংসারী বড়বৌ, স্বামী পুত্র বৌ নাতনী শত জনের ভাবনা ভাবতে হয়। আমার জীবন হয়েছে বাউলের গানের মতন 'আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাব না।' এ জীবনের মত ভগবান্ সকল দরজা বন্ধ করে রেখে দিলেন। তাই যা শুনেছি সহজে ভুলি না। সেদিন ঈশেনকে তাই বলছিলাম—"নাড়িটেপা ব্যবসা করছ, এত অহঙ্কার ভাল নয় ঈশেন। রাজা রাজড়ার বাড়ীতে তোমার রোগী দেখার ডাক আসে, তুমি তাদের মুখের ওপরে চোপা নেড়ে চলে আস যা-তা ব'লে। নিজের 'আখের' ভুলে যাও। লক্ষ্মীর ঘট উল্টে দাও লাথি মেরে। রাজা গণেশের বংশধর হয়ে গণেশ উলটিয়েই ত রয়েছে।'

আমার কথায় ঈশেন হেসে কুটিকুটি, বলে, "ঠাকুর-কন্যা, যা বলেছেন, ইচ্ছা করলে আমি টাকার গদি পেতে শুতে পারতাম, কিন্তু অসত্যকে সইতে পারি না। আশীর্ব্বাদ করুন সত্য পথে আমি যেন জন্ম জন্মান্তর গরীব হয়েই থাকি। দারিদ্র্যই আমার গৌরব।" বলিয়া ঠাকুরকন্যা চুপ করিলেন।

বেলা ডুবুডুবু, বনতলে গোধূলির ম্লান আলোর সহিত শীতের কুয়াশা ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হইতেছিল।

ঠাকুরকন্যা সচকিত হইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। ভোগের ঘরের বারান্দায় দুইটা পাকা চালকুমড়া বেড়ার গায়ে হেলান দেওয়া ছিল। ঠাকুরকন্যা সেই দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "পাকা কুমড়া দেখছি, বড়ি দিবি নাকি বড় বৌ? পাকা কুমড়ার তিতকুমড়ি রাঁধবি কি? তোর রান্না তিতকুমড়ি একদিন খেয়েছিলাম, এখনও মুখে লেগে রয়েছে। কি চমৎকার রান্না!"

"বেশ ত ঠাকুরকন্যা মূলো ষষ্ঠী এসে গেল। সেদিন আমাদের নিরামিষ খাওয়া, আপনার সঙ্গে সকলেই একসাথে বসে শ্রীধরের প্রসাদ খাব। তিতকুমড়ি রান্না করব।"

"ষষ্ঠীর দন কি তেতো খায় বড়বৌ, খেতে নেই। তিতকুমড়ি রাঁধবি কি লো? তোর ত নিত্যি তিরিশ দিন ঠাকুরভোগ রান্না রয়েছে, যেদিন খেতে ইচ্ছা হবে বলে যাব। এখন থাকুক।"

থাকবে কেন ঠাকুরকন্যা? তিতকুমড়ি না হয় টককুমড়ি করে দেব। বৌরা ঠিকমত আপনাকে নিরামিষ রান্না রেঁধে দিতে পারে ত?"

"হ্যাঁ, তা পারে, ভাইদের নাতবৌয়েরা আমার রান্না নিয়ে এ ওর ওপরে টেক্কা দিয়ে ভাল করতে চায়। ভক্তিতে করে না, ভয়ে করে। 'গোবর পোড়ে ঘুঁটে হাসে।' আমিও হাসি—"সম্পদের বার ভাই বিপদের কেউ নাই।' মাসে মাসে একমুঠো করে টাকা আসে সংসারে, তার জন্যেই আমার সেবাযত্নর অবধি নেই। আমি খাই দাই পুরাণ পাঠ শুনে দিন কাটাই। ভগবান্ অমর করে দিয়েছেন রয়েছি। যাই না ব'লে আক্ষেপ করি না, থাকছি বলেও দুঃখ নেই। আমার এখানেও কোন প্রত্যাশা নাই, সেখানে কারও জন্যে কোন আশা নাই। জন্ম ঋণ শোধ করে যাচ্ছি এইমাত্র। আমি এবার চলি বড়বৌ, দেরি হ'লে ওরা আবার ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে দেবে আমাকে ধরে নিতে। 'তোর পায়ে পড়ি না তোর গুণের পায়ে পড়ি। আমার হয়েছে সেই দশা।"

ঠাকুরকন্যা আঙিনায় নামিয়া অস্ফুটস্বরে দুর্গাসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাদবের মেয়েদের যে বিয়ে। আকাশির বিয়ে শুনেছিস বড়বৌ? দুই মেয়ের বিয়ে ঠেকে থাকে ব'লে যাদব আকাশির কুমারী নাম ঘুচিয়ে এক চণ্ডালের সাথে মালা বদল করাচ্ছে।"

"চণ্ডাল! শুনেছি সে নাকি সৎব্রাহ্মণ নাম দয়াময়।"

"হ্যাঁ, দয়ার অবতার, কিসের বামুন, সে চণ্ডাল। যাদবকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে—মন্তর পড়ার পরে তার সাথে আকাশির কোন সম্পর্ক থাকবে না, সেও জীবনে কখনও ওকে স্ত্রী বলে স্বীকার করবে না। ওকেও করতে দেবে না। তার টাকার দরকার, টাকা না হ'লে নতুন বৌ নিয়ে বাসর সাজাবার ঘর পাবে না। ওকে তুই বামুন বলিস বড়বৌ, ও মানুষ নামের অযোগ্য। যাদবের যেমন কপাল, আকাশিরও তেমনি—আহা, পদ্মফুলের মত মেয়ে, একখানা হাতের দোষ, এই অপরাধ। আমি দিন-রাত ঈশ্বরকে বলি 'ঠাকুর নারীজন্ম তুমি আর দিও না।'

ঠাকুরকন্যা বাড়ীর পথ ধরিলেন। দুর্গাসুন্দরীর পর-দুঃখে কাতর হৃদয় আশ্বস্ত হইল। যাদব পণ্ডিতের ভিটেমাটি বাঁচিয়া যাইবে। মেয়েরা উদ্ধার পাইবে। তাহাদের দিকে ঠাকুরকন্যার দৃষ্টি পড়িয়াছে। এ গ্রামের যে-কোন জাতি যে-কোন সম্প্রদায়ের কন্যাদের বিবাহে ঠাকুরকন্যা গোপনে অজস্র দান করিয়া থাকেন। তিনি গোপনে দান করিলেও ফুলের সৌরভের মত তাহা গোপন থাকে না। তিনি পিতৃসম্পর্কীয় জন্মের ঋণ শুধু পরিশোধ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন না, গ্রামের কুমারী-দেরও জন্মঋণ পরিশোধ করেন।

মূলকরূপিণী ষষ্ঠীদেবী যথাসময়ে আবির্ভূত হইলেন। "ষাট ষাট ষষ্ঠীর ধন"। বিনু উপস্থিত, এই আনন্দে দুর্গাসুন্দরী দিশাহারা।

মাইজ পাতায় পিঠালির গরু বাছুর তৈরি করিয়া জোড়ায় জোড়ায় মূলা কলা দিয়া ডালা সাজাইয়া ষষ্ঠীর আরাধনা করা হইল। বিনু রায়বাড়ীর উদ্দেশ্যে ভেংচি কাটিয়া মনে মনে বলিল, "কেমন জব্দ, এ অনুষ্ঠানে আমাকে তোমরা ধরিতে পারিলে না। দুধের কড়ার সামনে বসিয়া নিজেরা হটর হটর কর।"

বিনু সেই দিনই বৈকালে বাবার চিঠি পাইল। বিনু সংস্কৃত শিখিবে জানিয়া বাবা কত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। নফর কুণ্ডুর সহিত বিনুর জন্যে জামা-কাপড় আরও অন্যান্য জিনিষপত্র ও সংস্কৃত প্রথম পাঠ পাঠাইয়া দিয়াছেন। বিনু যেন তাহার ঠাকুমার নিকট হইতে অক্ষর পরিচয় ও অক্ষর লেখা শিখিয়া লয়। ইহার পরে সুবিধামত বাবা বাড়ী আসিয়া বিনুকে শশুরালয় হইতে আনাইয়া সংস্কৃত দ্বিতীয় পাঠ ধরাইয়া দিতে পারিবেন।

বিনু বাবার চিঠি পড়িয়া আনন্দে ও উৎসাহে অভিভূত। তাহার ত্বরা সহে না। তখনই শ্যাম ছুটিল বন্দরে নফর কুণ্ডুর কাছে।

বিনুর বাবা বিনুর জন্যে অনেক জিনিষ পাঠাইয়াছেন। কন্যা পিত্রালয়ে আসিলে তাহাকে নববস্ত্র প্রসাধন দ্রব্য দিতে হয়। বিনুর জন্যে আসিয়াছে চারিখানা শাড়ী, চারিটা সেমিজ জামা, একখানা ফুলকাটা তোয়ালে, এক বোতল চামেলী ফুলের তেল অডিকলোন, চিরুণী, বেলকুঁড়ি কাঁটা, ফিতা, একপাতা টিপ, এক শিশি তরল আলতা আর সংস্কৃত প্রথম ভাগ।

দুর্গাসুন্দরী সমস্ত জিনিষ সযত্নে তুলিয়া রাখিলেন। বিনু তখনই তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল সংস্কৃত অক্ষর পরিচয় করাইয়া দিতে। ঠাকুমা জানিতেন নাতনীর প্রকৃতি, সে যখন যেটা ধরিবে সেটা না হওয়া অবধি তাহার শান্তি নাই।

সন্ধ্যা হইতে রাত দশটা পর্য্যন্ত চলিল অক্ষর পরিচয়। বিনু অক্ষরের গোলমাল করিয়া ফেলে, সর্ব্বকর্ম্ম পরিহার করিয়া তিনি আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারেন।

শেষকালে বিনুরই পরিত্যক্ত ভাঙ্গা শ্লেট পেনসিল বাহির হইত। তাহাতে অক্ষর দাগিয়া দাগিয়া কয়েকটা অক্ষরের সহিত বিনুর পরিচয় হইল।

পরের দিন দিবসের আলো ভালরূপে ফুটিতে-না-ফুটিতে বিনুর বিদ্যারম্ভ সুরু হইয়া গেল। পেমো মলিন মুখে চাহিয়া চাহিয়া সরিয়া যায়। মা ফ্যানাভাত বাড়িয়া ডাকিয়া সাড়া পান না। ঠাকুমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। স্নানের সময় আজ আর হীরাসাগর আকর্ষণ করিতে পারিল না। পুকুরেই স্নানপর্ব্ব সমাধা হইল।

চিরদিনের মূর্খ বিনু এক বেলায় মূর্ত্তিমতী সরস্বতী হইতে চায়। সে শুনিয়াছিল সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ হয়।

বিনু সাধনা করিতে লাগিল। গোটা দিন চলিল তাহার সাধনা। সাধনায় যেমন সিদ্ধি আছে, তেমনি বিঘ্নও কম নহে।

মা ডাকেন চুল বাঁধিয়া দিতে। ঠাকুমা লালমণির দুধে প্রস্তুত কাঁচাগোল্লা চটের মতন পুরু সর চিনি মুখের সামনে ধরেন। বিনু খাইতে বসিবে না ভাঙ্গা শ্লেটে মক্স করিবে আদি ভাষার আদি অক্ষর ?

ইহারই মধ্যে বিনুর উৎসাহের শিখা স্তিমিত হইয়া আসিল। মনে পড়িতে লাগিল নঠাকুরদার রামপ্রসাদী গীত—

"আমি কারে দোষ দিব শ্যামা, স্বখাত সলিলে ডুবে মরি মা।"

এমন সময় শ্যাম আনিয়া দিল প্রসাদের চিঠি। এখানে ষ্টীমারে ডাক আসে, একবার মাত্র চিঠি বিলি হয় বৈকালে।

ঠাকুমা সহাস্যে পরিহাস করিলেন, "এই নে বিদ্যাবতী, তোর সাত রাজার ধন মাণিক এসেছে। কাল সন্ধ্যা থেকে আজ প্রায় সন্ধ্যা হয় অসাধ্য সাধন করলি, এখন বই-শ্লেট তুলে রেখে জিরিয়ে নে। ও কি এক দিনের জিনিষ, দিনে দিনে শিখতে হয়।"

ঠাকুমার সামনে স্বামীর চিঠি আসাতে বিনু ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমার অক্ষর চেনা হয়ে গেছে ঠাকুমা, এখন আকার-ইকারগুলো ঠিক করে নিতে পারলেই হয়ে যাবে।"

ঠাকুমা মুখ টিপিয়া হাসিলেন, "হয়ে যাবে, আহা, কি মগজ তোর বিনু, অক্ষর চিনলেই তুই সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিনী হয়ে যাবি ?"

বিনুর ঠাকুমার তামাসায় কান দিবার সময় ছিল না। সে অন্তরালে সরিয়া গেল প্রসাদের চিঠি লইয়া। সে এখানে আসিবার পূর্ব্বে স্বামীকে চিঠি লিখিয়া আসে নাই। আসিয়াও লেখা হয় নাই। প্রসাদ রাগে বিশ্বম্ভর হইয়া চিঠি লিখিয়াছে।

"বিন্থর এ কিরূপ নীতি, অন্যের পত্রে জানিতে হয় স্ত্রী পিত্রালয়ে গিয়াছে। শ্বশুরালয় যেন কাজ-কর্ম্মের হিসাব দাখিল করিতে হয়। বাপের বাড়ীর অজুহাত কি? এখন ত অখণ্ড অবকাশ, লেখাপড়া কতদূর অগ্রসর হইল। নম্বর দেওয়া খাতার কোন্ নম্বরে হাত দেওয়া হইয়াছে" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বিন্থ টুলের উপরে হ্যারিকেন রাখিয়া পত্র পাঠ স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিয়া গেল।

এখানে আসিবার পূর্ব্বে স্বামীকে চিঠি লিখিয়া আসিবার কথা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। এখানে আসিয়াও তাহাকে স্মরণ হয় নাই। নম্বরী খাতা বিন্থ সঙ্গে ইচ্ছা করিয়াই আনে নাই।

স্বর্গে আসিয়া ধান ভানিতে তাহারও ইচ্ছা ছিল না। যেখানকার খাতা-বই সেইখানেই পড়িয়া আছে।

বিপন্ন বিন্থ এখন কি উত্তর দিবে? বিশ্বম্ভরের নিকটে বিশ্বেশ্বরী হইলে এক্ষেত্রে চলিবে না। ক্ষণকাল ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিন্থ চিঠি লিখিল, বৌ মানুষ নিজের আসিবার কথা কি লিখিবে? যাঁদের কাছ থেকে এসেছি তাঁরা জানাবেন এই জন্যে আমি জানাই নি।

এখানে এসেও গোলমালের ভেতরে রয়েছি। সারাদিন ঠাকুমা-মা কাছে থাকেন তাঁদের সামনে স্বামীকে চিঠি লেখা চলে না। তা ছাড়া দিন-রাত লোক আসছে আমাকে দেখতে। ঠাকুমার সঙ্গে মাঝে মাঝে বুড়ো-বুড়ীদের সঙ্গে দেখা করতে এ পাড়ায় ও পাড়ায় যেতে হয়। না গেলে তাঁরা রাগ করেন।

এখানে নানা উৎসব লেগে রয়েছে। আমাদের লালমণির খুব সুন্দর একটা বাছুর হয়েছে তার নাম মঙ্গলা। সেদিন গোক্ষুর ধারে শোধ হ'ল। পাড়ার রাখালরা সবাই এসেছিল। তার পরেই গেল মুলোষষ্ঠী। আমি এখন বড় হচ্ছি, মা-ঠাকুমার কাছ থেকে কাজ শিখতে হয়, তাই চিঠি লেখবার সময় পাই নি।

আগের লেখাপড়া এখন আমার বন্ধ। বাবা সংস্কৃত প্রথম ভাগ পাঠিয়েছেন। আমি ঠাকুমার কাছে সংস্কৃত পড়ছি। অক্ষর চেনা হয়ে গেছে, লিখতেও পারি বেশ। আমাদের সেই সুন্দর মেয়ে আকাশির বিয়ে, এই মাসেই হবে। বর ব্রাহ্মণ হলেও সে চণ্ডাল বলছে। তার নতুন গয়না দেখি এসেছি। সংস্কৃত শিখছি বলে আমি চিঠি লিখতে পারি নি, তাতে রাগ ক'রো না।"

প্রসাদ বড় চিঠি লিখিতে বলে কিন্তু কি কথা দিয়া বিন্থ বড় চিঠি লিখিবে খুঁজিয়া পায় না। তবু অদ্যকার চিঠি তাহার ছোট হইল না এই আত্মপ্রসাদে বিন্থ চিঠি লেখা শেষ করিয়া বিন্থ চলিল মায়ের সন্ধানে, মা রান্না চড়াইয়াছেন। ঠাকুমা মণ্ডপে জপ করিতেছেন। পেমো মা'র সহিত রাতের ভাত খাওয়া সারিয়া চলিয়া গিয়াছে। কাল প্রভাতে আসিবে কাজে। ঠাকুরদাও বাড়ী নাই, বাহির হইয়াছেন বন্দরে রোগী দেখিতে।

ব্রজেশ্বরী এক গামলা কলাইয়ের ডাল বাঁটিতে বসিয়াছে বিরস মুখে।

বিন্থ ডাল বাঁটার কাছে বসিয়া বলে, "কাল বুঝি বড়ি দেওয়া হবে বেজদিদি? এক রকম ডালের, না দু'রকম ডালের।"

ব্রজ বিরক্তির সহিত জবাব দেয়, "মটর, কাঁচা মুগ, ঠাকুরী (কাল কড়াই) ডালের কুমড়া বড়ি ওনারা ভোগের নেদে দিয়া রাখিছে। মুসুরী মাষকলাইএর কুমড়া বড়ি আমি দিয়া রাখিছি মাছের ঘরের লেগে। এ বড়ি হইবে বিনা কুমড়ায় তোমাগো দেওনের নেগে।"

বিন্থ এলোচুলে বসিয়াছিল, মা পিছন দিক্ হইতে তাহার চুল আঁচড়াইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "কতবার ডাকলাম চুল বাঁধতে, তোর সময় হ'ল না। রাতে কি এমনি এলোকেশী হয়ে থাকে? সিধে হয়ে একটু বোস চুলটা বেঁধে দেই।" এমাসের প্রথমে শুক্লপক্ষে আমাদের প্রথম বড়ি দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আর দিনক্ষণ দেখতে হয় না। মা বলছিলেন, "তুই বড়ি দিতে খুব ভালবাসিস, তাই ডাল ভেজান হয়েছে। কাল বিনে কুমড়ায় তুই বড়ি দিস।"

বিন্থ চুলের গোড়া-বাঁধা ফিতা ধরিয়া বলিল, "বিনা কুমড়ায় কেন মা? আমি ত চিরকাল কুমড়া দিয়েই বড়ি বসিয়েছি।"

"এতকাল যা করেছিস এখন কি তা করা চলে মা? তোর শ্বশুরবাড়ীতে কুমড়ার বড়ি দিতে নেই। তাদের নিয়ম এখন থেকে মেনে চলতে হবে।"

মা মেয়ের চুল বাঁধিয়া ভিজা গামছা দিয়া মুখ মুছাইয়া দিলেন। সিঁদুরের কৌটা আনিতে মা'র ভুল হইয়াছিল। বিন্থ যে এখন সীমন্তে সিঁদুর পরিবার অধিকারিণী হইয়াছে, সেটা মা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

তিনি চুল বাঁধিবার হাত একচিমটি সাজি মাটি দিয়া ধুইতে ধুইতে বলিলেন "ঘরে গিয়ে সিঁদুর পর গে। বিন্থ, রাতে আয়নায় মুখ দেখতে নেই, আন্দাজে যদি সিঁথের সিঁদুর না দিতে পারিস তা হ'লে কৌটাটা আমার কাছে নিয়ে আয়।"

বিন্থ চলিয়া গেল। শয়ন গৃহে সিঁদুর পরিতে।

এখনও

শ্রীমতী বাণী রায়

যে সাঙ্গ অনাঙ্গরাঙ্গ, প্রণয়প্রসাঙ্গ,
যে সাঙ্গ মগধ দেশে মধুধ্বজ কাল,
সেখানে হৃদয় পায় অগাধ প্রশ্রয়,
সেখানে সবুজ দ্বীপে সুপ্ত মহাকাল।
হৃদয়, আশ্বাস পাও মুক্ত আলিঙ্গনে,
হৃদয়, সেখানে তুমি একক অপ্সরা,
মাগধী যৌবন জাগে মাধ্বীর চষকে,
অনন্ত বসন্ত ঋতু যাপে মুগ্ধ ধরা।
বর্ত্তমান পদে পদে রক্তঝরা পায়ে
সেখানে আবীর হয় শীতার্ত্ত শোণিত,
বন্ধন প্রয়াস থেকে সেখানেই চ্যুত,
গুহাশায়ী সুখ থাকে পালঙ্কে শায়িত।
জীবনযৌবন আর জরা আর মরা
একটি গানের সুরে সেখানে স্পন্দিত।

হৃদয়, শরণ নাও—বিলম্বিত ক্ষণ,
পিনেলোপী করাঙ্গুলি শেষ করে জাল,
ইউলিসিস নাই এলে বাঁধবে কঠিন,
মোহান্ধ যৌবনতটে ক্রুদ্ধ মহাকাল।
পাখীর ডানার বেগ নামাও শরীরে,
অবসাদ মননের ফেল গঙ্গাজলে,
পদ্মিনী সময় হাতে আনে পদ্মডালা,
বিস্মরণী স্বপ্ন তার লেখা পলে পলে।
ডালে ডালে যৌবনের অনেক লতিকা,
অতি বর্ষা ক্ষত দেহে করে উৎখাতিত,
সময় এবার হয় মাকড়সা-লূতা,
তুমি অভিমন্যু—সপ্ত সংগ্রামে পাতিত।
ধুলোর প্রসঙ্গে নিত্য বয় রাতদিন,
পূরবী বাতাস করে মধুঋতু ক্ষীণ।

এখনও সময় আছে, মৃত্যুর উদাস
বাতাস এখনও দূরে ; প্রান্তভাগে কাঁপে
দেহশাড়ি শুধু সেই হাওয়া লেগে লেগে,
এখনও কিশোরী রাধা অভিসার যাপে।
হৃদয়, চাতক নও জানি ভাল করে,
তবু জানি শূলপাণি দণ্ডীস্বামী নও,
মাথায় বইএর বোঝা অহেতুক বও,
তুমি এক কমলিনী দহ সরোবরে,
বেঁধেছ উদাসী করী—নাই তার গতি,
ভারতী নামালো লেখ্য—মঞ্চে নামে রতি।

চিরাচির

নিখিলকুমার নন্দী

রোজ যেই রোদটুকু ক্ষীণ এই বারান্দায় আসে
অজর সুনিত্য যেন কেঁপে ওঠে অনিত্য বাতাসে
এমনি হৃদয় তার নৃত্যছন্দ মুহূর্তমোহিত
অনন্ত সে নীল লীন অকস্মাৎ সান্তলোহিত
ক্ষণিকা শাশ্বতী যার ম্লান মালা চিরকাল-জ্বলা
তাকে-সে-ভুলেছে ভাব বস্তুতই স্বভাবের ছলা

যেমন এক্ষণ এল নম্র পদপাতে সেই মন্দগতি আত্মস্থ
জঙ্গমে,
সেই ঈষদ্বিকশিত দন্তমূলে উড়ু উড়ু চুলের সঙ্গমে,
সেই পাণ্ডু প্রিয় গালে অনু-রাগে তিলোত্তমায়,
পেলব কপালে সূক্ষ্ম-অনুভাবী উদাস বেলায়
চোখের আকুল কালো—সুব্যাকুল সমুদ্রের রাত,
আবছা সিঁথির পথে বড় টিপে উষাময়ী লালিমা
প্রভাত ;
চলেছে সে পথ বেয়ে ইতস্তত চাহনি চকিত
অগ্র ও পশ্চাতে স্থিরচিত্ততায় যেন আচম্বিত
দূর প্রত্যাশার রশ্মি লম্ববান বৈকালী প্রচ্ছায় ;
সকালের রুচিমত অরুণ কিরণে তার উত্তরীয়
জড়িয়েছে গায়।

নিতান্ত অচেনা তবু তার মুখে অঙ্গভঙ্গে মুকুরের মায়া
ফুটিয়ে তুলেছে এ কি চিরাচির চেনাচেনা চূর্ণ চিকুরের
স্বর্ণছায়া
মর্মের দুরান্ত ছাপ ; শান্ত জীবন যাকে অনায়াসে
ভোলে
যখন অশান্ত এসে হানে সে-ই মুহূর্ত দুরন্ত করে তোলে
রাত্রি ঘন রাত্রি ছেয়ে সূর্যের প্রথম চুম্বন
ঠাণ্ডা এই বারান্দায় ক্ষীণতায় উদার উদাত্ত
আলিঙ্গন :
এসেছে যে চলে গেছে প্রাকৃত সে বারবার আসে।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে বেকার-সমস্যা

একটি হিসাবে প্রকাশ যে, আজ সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সর্ব্বাধিক। হিসাবে প্রকাশ যে:

গত ৩০শে জুন পশ্চিমবঙ্গের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ-গুলির চালু খাতায় প্রায় ১,১৭,০৮৩ জন শিক্ষিত কর্ম্মপ্রার্থীর নাম ছিল—শিক্ষিত, অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেট ও তাহার উপরে। সারা ভারতে শিক্ষিত বেকারের মোট সংখ্যা ৮,০১,০৯৪।

উপরিলিখিত অঙ্কের মধ্যে নন-ম্যাট্রিকুলেটদের ধরা হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গে নন্‌-ম্যাট্রিকুলেট অথচ শিক্ষিত কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যাও অনেক বেশী।

পশ্চিমবঙ্গের এই শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে তফাসলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত বেকারের সংখ্যা যথাক্রমে ৭,৫৭৮ ও ৩১১।

পশ্চিমবঙ্গের পরে উত্তরপ্রদেশের স্থান। উত্তর-প্রদেশের আয়তন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় চারগুণ এবং জনসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশী। সেই উত্তরপ্রদেশের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলিতে ১,১৫,১০১ জন শিক্ষিত বেকারের নাম তালিকাভুক্ত আছে।

মহারাষ্ট্র আয়তনে আর জনসংখ্যায় আরও বড়, শিল্পে ও অন্য বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের সমতুল। কিন্তু সেখানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যার অর্দ্ধেকের সামান্য কিছু বেশী। জুনের শেষে মহারাষ্ট্রের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলির চালু খাতায় মাত্র ৭২,৯৮৭ জন শিক্ষিত কর্ম্মপ্রার্থীর নাম ছিল।

মহারাষ্ট্রের আয়তন ১,১৮,৭১৭ বর্গমাইল, আর কেরলের ১৫,০০১ বর্গমাইল। কিন্তু কেরলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেশী—৭৭,৮৫৪।

শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সবচেয়ে কম জম্মু ও কাশ্মীরে—মাত্র ১,১০৩। তারপর আসামে—১০,৩১১। শিক্ষিত অর্থে ম্যাট্রিকুলেট ও তাহার উপর।

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের মধ্যে দিল্লীতেই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সর্ব্বাধিক—৫৩,৩৬১। কারণ, দিল্লী ভারতের রাজধানী, সারা দেশ হইতে লোক কর্ম্মের সংস্থানে এখানে আসে। দিল্লীর পরে সমস্যাজর্জ্জরিত ত্রিপুরার স্থান। সেখানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ২ ৬৭৯।

হিমাচল প্রদেশ আর পণ্ডিচেরীর সংখ্যা যথাক্রমে ২,১১৩ ও ৪৫১।

দেশের অন্যান্য রাজ্যে গত ৩০শে জুন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ছিল: অন্ধ্র প্রদেশ—৪৬,৮০০; বিহার—৪২,০২৭; গুজরাট—১৫,৪৩৮; মধ্যপ্রদেশ—৪৪,৮২৮; মাদ্রাজ—৫৭,৬৭২; মহীশূর—৪৭,৪৩৬; উড়িষ্যা—১১,১৩০; পাঞ্জাব—৪০,৮০১; রাজস্থান—৩১,৩১১ এবং মণিপুর—১,৫০৯।

কারিগরদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা কি রকম, সে সম্বন্ধে সরকার এখনও ব্যাপক পরীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। তবে অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, মাদ্রাজ ও মহীশূর—এই চারটি রাজ্যে নমুনা পরীক্ষা চালাইয়া দেখা গিয়াছে যে, গত বছর ১লা জুলাই ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপ্লোমাধারী বেকারের সংখ্যা ছিল ৩,২৮৭।

পশ্চিমবঙ্গে যন্ত্রবিদ্‌ অর্থাৎ শিক্ষিত কারিগর বেকারের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ১৭।২০ হাজার হইবে। ইহার দ্বিগুণ হইলেও অবাক্‌ হইবার কোন কারণ নাই।

এ রাজ্যে বেকার সমস্যা লইয়া আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি—কিন্তু এ বিষম সমস্যার সমাধান যে করে এবং কি ভাবে হইবে—তাহা কে বলিতে পারে জানি না।

ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮৩।১৪ শতাংশ বাস করে পশ্চিমবঙ্গে—কিন্তু সারা ভারতের মোট বেকারদের

প্রায় এক-পঞ্চমাংশই এ-রাজ্যের বাসিন্দা! এবং ইহাদের মধ্যে আবার শতকরা ৮০৷৯০ জনই বাঙ্গালী!

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেকার সমস্যা সমাধানে তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধিমত প্রয়াস করিতেছেন—ইহা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু পাশাপাশি রাজ্যগুলি যে-ভাবে এবং যে-টেকনিক অবলম্বন করিয়া রাজ্যবাসীদের বেকার সমস্যা লাঘব করিতেছেন, আমাদের রাজ্য সরকার "প্রাদেশিকতা" অপবাদ পাইবার ভয়ে সে পথে যাইতে নারাজ কিংবা সাহস করেন না।

শিশু মৃত্যুর হার

সম্প্রতি কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান ১৯৫৯-৬০ সালের কলিকাতার শিশুমৃত্যুর হারের এক ভীষণ চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতা নামক অভিশপ্ত শহরের অসংখ্য নোংরা এবং রোগের ডিপো বস্তি-গুলিতে, অন্ধকার অলিগলির স্যাঁতসেঁতে তথাকথিত ঘরের মাটির মেঝেতে যে-সকল হতভাগ্য শিশুর পৃথিবীতে প্রথম আগমন হয়—তাহাদের মধ্যে অন্তত শতকরা ৫০.৫৫ জনের জন্মের এক মাসের মধ্যেই পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হয়! রিপোর্টে প্রকাশ:

১৯৫৯-৬০ সালে ৭০ হাজার ৭৭৬ শিশুর জন্ম হয়। ঐ বছরে মোট শিশুর মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ৮৬। প্রতি হাজারে মৃত্যুর গড়পড়তা হয় ১২৮·৬৫। শিশুমৃত্যুর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। মুসলমানদের প্রতি হাজারে গড়পড়তা মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৯৯·৭৯, খ্রীষ্টানের ১২৩·৮২ এবং হিন্দুর ১১৩·৯৫। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, গরীব মুসলমান সম্প্রদায় এখনও পর্য্যন্ত নানা কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তাই এখনও অনেক মুসলমান শিশু জন্মের সময় ধাত্রী বা মহিলা চিকিৎসকের সাহায্য লয়েন না।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, জন্মাইবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শতকরা ৮·৭৭, এক হইতে সাত দিনের মধ্যে শতকরা ২৭·৬০ এবং এক মাসের মধ্যে শতকরা ৫০-৫৩টি শিশু মারা যায়।

শহরে যক্ষ্মারোগ

কলিকাতা শহরে যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িতেছে। ১৯৫৯-৬০ সালে যক্ষ্মারোগে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৫৪৭। ১৯৫৮-৫৯ সালে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৪০১। ঐ দুই বছরে হাজার-প্রতি গড়পড়তা মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ·৯৫ এবং ·৮৯।

রিপোর্ট অনুযায়ী ১০ হইতে ৩০ বছরের মধ্যে যক্ষ্মা রোগী মহিলার মৃত্যু সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা দ্বিগুণের বেশী এবং ২০ হইতে ৪০ বছরের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ। বহুক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ যক্ষ্মারোগের কারণ বলিয়া রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৫ হইতে ২০ এবং ২০ হইতে ৩০ বছরের মধ্যে যক্ষ্মারোগে পুরুষ ও মহিলার প্রতি হাজারে মৃত্যু সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ·২০ ও ·৫১ এবং ·৫০ ও ১·০৫। ৪০ হইতে ৫০ বছরের মধ্যে পুরুষ ও মহিলার মৃত্যু সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১·৩ ও ১·৩০।

শীতকালে মৃত্যু বেশী

গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে মৃত্যু সংখ্যা বেশী হয়। এপ্রিল মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত হাজার-প্রতি গড়পড়তা মৃত্যু সংখ্যা ছিল ১·৮১। কিন্তু অক্টোবর মাসে গড়পড়তা মৃত্যু সংখ্যা ছিল ২·৪৩, নভেম্বর মাসে ৩·০২, ডিসেম্বর মাসে ২·৮৯ এবং জানুয়ারী মাসে ২·৯৮।

কলিকাতা শহরে স্ত্রীলোকের মৃত্যু সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশী। ১৯৫৯-৬০ সালে শহরে মোট পুরুষ ও মহিলার মৃত্যু সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১১ হাজার ৩৫১ এবং ১৫ হাজার ৭২। এই সংখ্যা অনুযায়ী হাজার-প্রতি পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়ায় ১১·৩ এবং মহিলার ১৫·১। উল্লেখযোগ্য যে, শহরে মোট জনসংখ্যার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ হইতেছে পুরুষ।

রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, গত কুড়ি বছরের মধ্যে ১৯৪৩-৪৪ সালে এবং ১৯৫০-৫১ সালে সর্ব্বাধিক মৃত্যু ঘটে। ১৯৪৩-৪৪ সালে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৫৯ হাজার ৭৩৯ এবং ১৯৫০-৫১ সালে ছিল ৫৫ হাজার ৪১২। ১৯৫০-৫১ সালে পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে হাজার হাজার উদ্বাস্তুর আগমন হয় এবং ঐ বছরে কলেরা ও বসন্ত রোগ প্রবল মহামারী আকারে দেখা দেয়। কুড়ি বছরের মধ্যে ১৯৫৪-৫৫ সালে সর্ব্বাপেক্ষা কম মৃত্যু সংখ্যা ছিল। ঐ বছরে মোট মৃতের সংখ্যা ছিল ৩২ হাজার ১৯৭।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমানদের মৃত্যু সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। প্রতি হাজারে মৃত্যুর গড়পড়তা ছিল ১৬·৩০, হিন্দুর ১২·৬৪, খ্রীষ্টানের ৭·৬৫।

ঐ সময়ে শহরে মোট জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা হইতেছে ২১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৭৬৬, মুসলমানের ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৩৭০ এবং খ্রীষ্টানের ৭৬ হাজার ৪৫২।

১৯৫৯-৬০ সালের পর পৌর কর্ত্তৃপক্ষ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিপোর্ট আবার কবে প্রকাশ করিতে পারিবেন তাহা কেহ বলিতে পারেন না। তাই ১৯৫৯-৬০ সালের

পর পৌর শাসনব্যবস্থা কোন্ ধারায় প্রবাহিত হইতেছে, পৌর কর্ত্তৃপক্ষ নাগরিক উন্নয়নমূলক বা সেবামূলক কার্য্যে কতখানি হাত দিয়াছেন ও শাসনব্যবস্থা হইতে দুর্নীতি দমনের কতটা প্রচেষ্টা করিয়াছেন, প্রভৃতি সম্বন্ধে অদূর ভবিষ্যতে করদাতাদের সামগ্রিক রিপোর্ট পাইবার সম্ভাবনা কম।

১৯৬০-৬১ সালের রিপোর্ট যখন প্রকাশিত হইবে তখন আমাদের মধ্যে হয়ত অনেকেই ধরাধাম হইতে অন্য কোন লোকে প্রয়াণ করিব। কিন্তু যে লোকেই যাই না কেন—সেই লোকে কলিকাতা কর্পোরেশনের মত এমন সর্ব্বগুণাকর কোন প্রতিষ্ঠান নাই—এই আশা লইয়াই যাইব।

কলিকাতা শহরের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত নরকের তুলনা অনেকে করেন, কিন্তু এ তুলনায় হয়ত সেই কল্পিত-নরকবাসীরাও আপত্তি করিবে, কারণ সেই নরকের পথ-ঘাট এবং অন্যান্য সব কিছুর অবস্থা এই কলিকাতা অপেক্ষা বহুলাংশে শ্রেয়তর—এমন কথা 'প্রত্যক্ষদর্শীরা' বলিয়া থাকেন। বর্ত্তমান পৌর (উপ-) পিতারা গৌরী সেনের অর্থে নবাবী করিতেছেন—তাঁহাদের পক্ষে করদাতাদের জন্য কল্যাণকর কিছু করিবার সময় নাই বলিলেও চলে! কেহ পৈতৃক কারবার লাটে তুলিয়া পৌরপিতার বেশে লাটসাহেবী মেজাজে পৌর সংস্থার করের টাকার অপশ্রাদ্ধ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক 'মট' লেনের ঘাড় মটকাইয়া—সেইখানে তাঁহার অজ্ঞাত, অশ্রুত কিন্তু অবশ্যই পুণ্যশ্লোক দাদামহাশয়ের নাম বসাইতে লজ্জা বোধ করেন নাই! কেহ বা কলিকাতার বুকে বিনা অনুমতিতে বহুতলা-বিশিষ্ট বিরাট্ ফ্ল্যাট বাড়ী নির্ম্মাণে গোপন সহায়তা দান করিয়া নিজের ভাঁড়ে বেশ কিছু টানিয়া লইতে কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ বোধ করেন না আবার এমন কিছু সংখ্যক খেঁকি পৌরপিতা রহিয়াছেন, যাঁহারা পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারী এবং কর্ম্মী-মণ্ডলকে তাঁহাদের অভদ্র এবং ইতর ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছেন। যেমন দেখুন:

পৌরবাবাদের মোড়লী

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে:

কলিকাতা পৌরসভার কয়েকজন কাউন্সিলারের "অত্যধিক মাষ্টারীপনায়" অফিসার মহল বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছেন। অফিসারদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ হঠাৎ মিলিতভাবে প্রতিবাদ আকারে বিস্ফোরিত হইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া ওয়াকিবহাল মহল হইতে জানা গিয়াছে।

পৌরসভার যে ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন, সেই ফিনান্স কমিটির অধিকাংশ সদস্যের প্রতি অফিসারগণ বিরূপ। অফিসারদের অভিযোগ এই যে, কমিটির সভায় অনেক সময় সদস্যরা নাকি রুক্ষ মেজাজে ও অভদ্র ভাষায় অফিসারদের কার্য্যকলাপের নিন্দা করেন।

কাউন্সিলারদের এই আচরণে পৌরসভার সকল শ্রেণীর অফিসারগণ অস্বস্তিবোধ করিতেছেন। তাঁরা নীরবে ও নিঃশব্দে ইহার প্রতিকার দাবী করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

সম্প্রতি জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসারের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া জনৈক প্রভাবশালী কংগ্রেস কাউন্সিলার বলেন যে, ইহার জন্য দায়ী কয়েকজন ফিনান্স কমিটির সদস্য। কমিটির সভায় দু-একজন সদস্যের অভদ্রোচিত ভাষা প্রয়োগ ও উগ্রভাব প্রকাশ করার দরুণ অফিসারটির মৃত্যু দ্রুত ঘনাইয়া আসে বলিয়া উক্ত কাউন্সিলার জানান।

আরও অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে যে, বিভিন্ন কমিটির রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কাউন্সিলারগণ অফিসারদের প্রতি নানা কঠোর এবং অভদ্র বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যেমন: কাউন্সিলারগণ নাকি বলেন, "তোমরা কিছু বোঝো না, তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি নেই, তোমাদের শিক্ষার বালাই নেই, তোমাদের ইংরাজী লিখবার ক্ষমতা নেই, বিভাগের পরিচালনার ক্ষমতা তোমাদের নেই, এমনকি তোমরা ঠিকমত রিপোর্ট দিতে পার না, তোমাদের অযোগ্যতা ও অপদার্থতা আর বরদাস্ত করা যায় না।" একটি কমিটির চেয়ারম্যান নাকি একজন অফিসারকে প্রত্যহ চাকুরি খতমের হুমকি দিয়া থাকেন। তিনি প্রায়ই শাসাইয়া বলেন, 'মনে রাখবেন আমার দয়ায় আপনি অফিসার পদটি পাইয়াছেন।' চেয়ারম্যানের এই আচরণে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মচারীগণও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

অফিসার মহল হইতে পাল্টা অভিযোগ করা হয় যে, অনেক সময় কাউন্সিলারদের আবদার ও মেজাজী হুকুম পালন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব না হইলে প্রতিশোধস্বরূপ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে অক্রমণ হইয়া থাকে। অফিসার মহল হইতে আরও বলা হয়

যে, কাউন্সিলারগণ পৌরসভাকে তাঁহাদের জমিদারী বলিয়া মনে করেন।

এই সকল ইতর এবং অভদ্রদের সর্ব্বপ্রকার বেয়াদবী রূপ রোগের সহজ এবং সর্ব্বত্র প্রযোজ্য টোটকা মহৌষধ আছে—এবং সেই ঔষধ যে কি তাহা খোলাখুলি বলিবার প্রয়োজন বোধ করি না

কিন্তু পৌরপিতাদের ধর্ম্ম 'পিতা' অর্থাৎ করদাতাদের 'পিতামহ' শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় তাঁহার স্নেহের ধন 'পুত্রদের' প্রতি কেন দৃষ্টি দিতেছেন না? জানি পিতা স্নেহময় -কিন্তু পরম স্নেহময় পিতাও বহু ক্ষেত্রে সন্তানদের শাসন করেন বা করিতে বাধ্য হয়েন। আলোচ্য ক্ষেত্রে কেন তাহা হইতেছে না? শেষ পর্য্যন্ত লোকে অর্থাৎ করদাতারা বলিতে বাধ্য হইবে যে—"যেমন বাপ তেমনি ছেলে!"

শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় হালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসীদের নানা অনাচার, ব্যভিচার নিরাময় করিয়া দিতেছেন তাঁহার অমোঘ কবিরাজী ঔষধের প্রয়োগে—কিন্তু প্রদীপের নীচের অন্ধকার কালো চশমা ঢাকা চোখে কেন পড়িতেছে না?

কলিকাতার পৌরসভা ; পাওনা ট্যাক্স :

সদ্য প্রকাশিত কলিকাতা কর্পোরেশনের শাসন-সংক্রান্ত (Administrative) এক রিপোর্টে (১৯৫৯-৬০) প্রকাশ, যে, বাড়ীর ট্যাক্স বাবদ দেড় কোটির বেশী টাকা অনাদায়ী খাতে পড়িয়াছে—ইহা ছাড়া অন্যান্য ট্যাক্স বাবদও বহু অর্থ নাগরিকদের নিকট হইতে প্রাপ্য আছে।

পৌরসভার বাজেটে ট্যাক্স বাবদ বাৎসরিক টাকা আদায়ের যে অঙ্ক ধরা হয় তাহা অপেক্ষা অনেক কম আদায় হইয়া থাকে। প্রতি বছরই অনাদায়ী টাকার অঙ্ক স্ফীত হইতেছে।

কয়েক বছরের ট্যাক্স বাবদ কত আদায় ধরা হইয়াছিল, আদায় বাবদ টাকার অঙ্ক কত ছিল এবং কত কম টাকা আদায় হইয়াছিল, নিম্নে তার হিসাব দেওয়া হইল :

বছর	আদায়ের বাবদ	কত আদায়	কত কম
১৯৫৭-৫৮	৪,[illegible]৫,৫০,০০০	৩,৯২,৩৫,৬৩২	১,১৮,৩৯,৭৮৮
১৯৫৮-৫৯	৪,৬৬,০০,০০০	৪,১৮,৬৭,৪৮৮	১,৬৩,১৫,১৮০
১৯৫৯-৬০	৪,৭০,৫০,০০০	৪,১২,২৫,৮০০	১,৭৯,৬৯,৭৭১

পৌরসভার সদ্য প্রকাশিত ১৯৫৯-৬০ সালের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিপোর্টে এই হিসাব আছে।

রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, ১৯৩১-৩২ সাল হইতে কম ট্যাক্স আদায় সুরু হয়। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ১৯২৩ সালের মিউনিসিপাল আইনের ১৪৬ ধারা অনুযায়ী অনেক বাড়ীর মালিক ট্যাক্স বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আপত্তি জানান। তদানীন্তন পৌর কর্ত্তৃপক্ষ আপত্তির শুনানীর সময় অধিক হারে ট্যাক্সের হার কমাইয়াছিলেন। ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে। কারণ নূতন বাড়ীর সংখ্যা বাড়িতে থাকে। ১৯৪৮-৪৯ সাল পর্য্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকে। ১৯৪৯-৫০ সালে ট্যাক্স আদায় খুব কমিয়া যায়। তারপর কয়েক বছর অবস্থার 'কছুটা' উন্নতি হয়। পুনরায় ১৯৫৫-৫৬ সাল হইতে অবস্থার অবনতি হইতে থাকে।

রিপোর্টে বলা আছে যে, ঐ বছরে ১৭৯১টি বাড়ীর ট্যাক্সের হার পুনর্নিধারণ করা হয়। পুনর্নিধারণের ফলে ট্যাক্সের ভ্যালুয়েশন ৩৭ লক্ষ ১৭ হাজার ১৯০ টাকা বাড়ে। কিন্তু ৭ হাজার ৮৮৩ জন বাড়ীর মালিক ট্যাক্স পুনর্নিধারণের হারে আপত্তি জানান। পূর্ব্বেকার বছরগুলির যে আপত্তির নিষ্পত্তি হয় নাই সেই সংখ্যা লইয়া মোট আপত্তির শুনানী বাকী আছে ১৫০১৯

পৌর কর্তৃপক্ষ মহল হইতে জানানো হয় যে, রাজ্য সরকারের নিকট হইতে ট্যাক্স বাবদ প্রায় ২৯ লক্ষাধিক টাকা পাওনা আছে।

রাজ্য সরকারের নিকট হইতে ট্যাক্স বাবদ যাহা প্রাপ্য তাহা কেন যথাসময়ে আদায় করা হয় না, আমাদের পক্ষে তাহা বুঝা সম্ভব নহে। একথা বিশ্বাস করা শক্ত যে, পৌরসভার কর্ম্মকর্ত্তারা যদি ঠিক সময়ে ঠিকমত রাজ্য সরকারের দরবারে তাঁহাদের দাবি পেশ করিতেন—এত টাকা কখনই অনাদায়ী খাতে পড়িত না। কিন্তু কর্পোরেশনের নবাবদের এ সব সামান্য বিষয়ে নজর দিবার সময়াভাব একান্ত! গৌরী সেনের পয়সায় যাঁহারা 'একদিন কা সুলতান' হইয়া বসিয়াছেন—তাঁহারা গৌরী সেনের অর্থের অপশ্রাদ্ধ কর্ম্মে যতখানি দক্ষ—ওই গৌরী সেনের অর্থ আদায়ে তাহা অপেক্ষা হাজারগুণ অকর্ম্মা! তবে একটা কথা এই হইতে পারে যে, রাজ্য সরকার এবং কলিকাতা কর্পোরেশন—দুইটিই কংগ্রেসী মাসতুতো ভাইদের সুশাসনে—কাজেই এক মাসতুতো ভাই অন্য মাসতুতো ভাইকে টাকার জন্য তাগিদ দিতে পারেন না, বিশেষ করিয়া ছোট মাসতুতো

ভাইকে যখন বড়র কাছে নানা অছিলায় নানা ভাবে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া হাজির হইতে হয়!

সর্ব্ব-ভারতখ্যাত অ্যান্টি-অনাচারী শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় তাঁহার শাসনাধীন পৌরসভার দক্ষতা বিষয়ে কি ভাবেন? বলা বাহুল্য পৌরসভার ট্যাক্স ১৯৬০-৬১ হইতে ১৯৬৮ পর্য্যন্ত আরও শতখানেক কোটি খানেক অনাদায়ী স্তূপে জমা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের ঔষধের বাজার মারিবার প্রয়াস?

সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে,—

কলিকাতা, ২৭শে অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তুত ঔষধের বাজার নষ্ট করিয়া এই রাজ্যের ভেষজ শিল্পের উপর চরম আঘাত হানিবার জন্য কোন কোন রাজ্যে এখনও ব্যাপকভাবে প্রচার অভিযান চলিতেছে:

কাশ্মীরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিষদের সম্মেলনে কোন কোন রাজ্য হইতে এই প্রকার ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের সব ঔষধ ভেজাল, সুতরাং পশ্চিম বাংলার ঔষধের উপর আস্থা রাখা চলে না।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পুরবী মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন রাজ্যের পক্ষে এই প্রকার অপ-প্রয়াসের বিরোধিতা করেন। যে-সকল অসাধু ব্যবসায়ী ঔষধে ভেজাল দেয়, তিনি তাদের শাস্তি দিবার প্রস্তাব নিশ্চয় সমর্থন করবেন।

কিন্তু সেই অজুহাত দেখাইয়া পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ ভেষজ শিল্পকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করা হইলে, শ্রীমতী মুখার্জি দেশের স্বার্থে তাহার বিরোধিতা করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গের ভেষজ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টকে উপলক্ষ্য করিয়া কয়েকটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের ভেষজ শিল্পের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করার সুযোগ গ্রহণ করে।

বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তুত পাঁচ কোটি টাকার ঔষধ ভারতবর্ষের বাজারে বিক্রয় হয়। বহুক্ষেত্রে বিদেশী সংস্থার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করিয়াও মহারাষ্ট্রের ঔষধের বাজার পশ্চিমবঙ্গের অপেক্ষা বড় নহে।

বছর দুই পূর্ব্বে আর একবার পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তুত ঔষধাদি সবই ভেজাল—এই প্রকার একটা প্রবল প্রচার প্রয়াস দেখা যায় এবং এই প্রচারের ঘাঁটি ছিল বোম্বাই।

সেই সময় বহু তদন্তাদিতে প্রকাশ পায় যে, ভেজাল এবং সাব-ষ্ট্যাণ্ডার্ড ঔষধের আকর বোম্বাই এবং অন্যান্য দু-একটি রাজ্য। একথাও জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে বিশেষ করিয়া কলিকাতা শহরে এক শ্রেণীর অন্য-প্রদেশবাসী ব্যাপক ভাবে ভেজাল, জাল এবং নিগুর্ণ ঔষধের ফলাও কারবার চালাইতেছে। ইহাদের সঙ্গে কোন বাঙ্গালী যে ছিল না, এমন কথা আমরা বলি না—কিন্তু সেই কয়েকজনের অপরাধে পশ্চিমবঙ্গের বেঙ্গল কেমিক্যাল, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, বেঙ্গল ইমিউনিটি, অ্যালবার্ট ডেভিড, ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রভৃতি পুরাণো এবং বহুখ্যাত ঔষধের প্রতিষ্ঠানগুলির সর্ব্বনাশ করার চেষ্টা—(বলা বাহুল্য) অবাঙ্গালী (ঔষধের) কারবারীদের গোপন হস্তের দ্বারা পরিচালিত।

অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী এবং কারখানার মালিকরা পশ্চিমবঙ্গের সকল শিল্প-ব্যবসায় হইতে বাঙ্গালীকে প্রায় তাড়াইয়াছেন, এখন বাকি কেবলমাত্র এই ঔষধের ব্যবসা এবং ঔষধ উৎপাদনকারী কারখানাগুলি। এই-গুলি বাগাইতে পারিলেই অবাঙ্গালী মালিক এবং ব্যবসায়ীদের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বনাশ সাধনে কোন কোন রাজ্য সরকারও যে তাহাদের সহযোগিতার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিতে পারেন—একথা ভাবিতেও আমাদের কেবল দুঃখ নহে, গভীর লজ্জাও হইতেছে!

বর্ত্তমান অবস্থায় এ-রাজ্যের ঔষধ কারখানাগুলি এবং ব্যবসায়ীমহল যদি সমবেত "প্রতিরক্ষা" ব্যবস্থা না করেন—অদূরে বিপদ দেখা দিবে।

কালোবাজারের উদ্ধারিত চাউল ও আটা

দেশে যে সময় চাউল ও আটার এত টানাটানি এবং হাহাকার—ঠিক সেই সময় সংবাদপত্রে এক বিচিত্র সংবাদ পাইলাম!

কালোবাজার হইতে আটক চাল ও আটা এখন ব্যারাকপুর মহকুমার বিভিন্ন থানার খুপরিতে পচিতেছে! শুধু চালেরই পরিমাণ হইবে পাঁচ শত মণের বেশী। দুর্মূল্যের বাজারে এই বস্তুগুলির সদ্গতি করার জন্য পুলিশী দপ্তর খাদ্য দপ্তরের কর্মকর্ত্তাদের শরণাপন্ন হইতেছে তিন-চার মাস যাবত। কর্ম্মকর্ত্তারাও কোন সময়ে তাহাদের বিমুখ করেন নাই, তবে আজ নয়, কাল। সেই আজ আর কালের প্যাঁচায় পড়িয়া ক্ষুধার অন্ন এখন দুর্গন্ধের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। অধিকন্তু থানার স্বল্প পরিসরে পুলিশের নিজের কাজ চালানোও এক দুর্ভোগ।

ইতিপূর্ব্বে, বাজারে সরকার নির্দ্ধারিত অপেক্ষা বেশী দামে চাল বিক্রয় প্রতিরোধ করিয়া স্থানীয় যুবকদল

ন্যায্য দামে সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেন। পুলিশের মতে, কাজটা ভাল হইলেও আইনসম্মত নয়। তাই, পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষই ইদানীং ব্যাপকভাবে চাল, আটা এবং মাছের বাজারে হানা দিতে সুরু করে। একজন উদ্ধতন পুলিশ কর্ম্মচারীই প্রশ্ন করেন—কালোবাজারের চাল-আটা আটক করা অত্যন্ত আইনমাফিক হইয়াছে, কিন্তু পচাইয়া নষ্ট করাটার কি হইবে?

চাল-আটা ছাড়াও থানায় গুঁড়া চুন, সিমেন্টও জমিয়া রহিয়াছে। শুল্ক বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকটও পুলিশ ইহা লইয়া যাওয়ার অনুরোধ জানায়। কিন্তু প্রায় ছয় মাস যাবত্ এই বিভাগেরও সাড়াশব্দ নাই। এখন বস্তা দুইটির কোন্‌টি সিমেন্ট আর কোন্‌টি গুঁড়া চুন চোখে দেখিয়া বলা মুশ্‌কিল!

পুলিশ পক্ষের বক্তব্য: কালোবাজার হইতে আমদানী জিনিস যদি থানার হেপাজতেই রাখিতে হয় তবে পৃথক্ কামরা ও তদারকী করার জন্য বাড়তি কর্ম্মচারীর ব্যবস্থা করার দরকার।

এ বিচিত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর মন্তব্য কি হইতে পারে—ভাবিয়া পাওয়া বিষম ব্যাপার!

কেবলমাত্র ব্যারাকপুরেই নহে—এ রাজ্যের অন্যান্য নানা স্থানের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সংবাদে একই ব্যাপার দেখা যায়। প্রবাদ বাক্যে বলে, "পুলিশে ছুঁলে আঠার ঘা!"—কিন্তু এ ত মানুষের বেলায়। চাউল, আটা, চিনি এ সব বিষয়েও কি একই নিয়ম দেখা যাইবে?

শুনিতে পাই খাদ্য দপ্তরে উচ্চপদে বহু গুণী এবং জ্ঞানী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটিয়াছে—কালো-গুদাম হইতে যে সব মাল উদ্ধার করে পুলিশ—সেই সব মাল নিকটস্থ র‍্যাশন দোকানে কিংবা চৌমাথায় নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রয় ব্যবস্থা করিলে দোষ হয় কি? আর কিছু না হউক এই ব্যবস্থায় আটা সিমেন্টে, সিমেন্ট পাথরে, চাউল বেচালে পরিণত হইবে না। টাকাটা না হয় কালোবাজারীর, কিন্তু দ্রব্য-সম্ভারগুলি ত দেশের—না বিশেষ কোন বিদেশীর?

আশা করি এই সব বিচিত্র সংবাদ মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আসে—তিনি আর কিছু না হোক্—এই বিশেষ বিষয়ে একটা সরকারী পরিসংখ্যান প্রকাশ করিয়া জনগণের চক্ষুদাহ হ্রাস করিতে পারেন।

'কল্যাণীর' নূতন বাড়ী—বিক্রয়?

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মানস-কন্যা 'কল্যাণী' সম্পর্কে প্রকাশ:

বিচিত্র নগরী কল্যাণী, তার বিধিব্যবস্থাও তদনুরূপ। বর্ত্তমানে একটি চূড়ান্ত অব্যবস্থা ও খামখেয়ালীর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, যাহার ফলে বহুদূরাগত বাড়ী ক্রেতাগণ কল্যাণীতে চরম হয়রানি ভোগ করিতেছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে উন্নয়ন বিভাগ হইতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, কল্যাণীতে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট ৪ শত বাড়ী বিক্রয় করা হইবে। বিজ্ঞাপনে প্রতি বাড়ীর মূল্য ঘোষণা করা হইয়াছে ১৫ হাজার টাকা। প্রথমে নগদে দিতে হইবে ৭ হাজার টাকা, বাকি ৮ হাজার টাকা ২০ বা ২৫ বৎসরের কিস্তিতে দিতে হইবে। কিন্তু সরকার হইতে যে পুস্তিকা বিক্রয় হইতেছে তাহাতে লিখিত আছে বাড়ীর মূল্য ১১ হাজার টাকা। প্রথমে দিতে হইবে ৩ হাজার টাকা, বাকি ৮ হাজার টাকা পূর্ব্ব-লিখিত রূপে কিস্তিতে দিতে হইবে। জনসাধারণ হতভম্ব। কোন্ মূল্যটা ঠিক, পুস্তিকার না বিজ্ঞাপনের? তা ছাড়া আরও নাটকীয় ঘটনা রহিয়াছে। বিশদ বিবরণের জন্য কল্যাণীর জনসংযোগ অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বলা হইয়াছে। জনসংযোগ অফিসার বাড়ী দেখাইতে পারিতেছেন না, শুধু প্ল্যানটিই দেখাইতেছেন; কারণ তালাবদ্ধ বাড়ীগুলি নাকি এখনও কন্ট্রাক্টরদের হাতে সরকারীভাবে হস্তান্তরিত হয় নাই। শত শত ক্রেতা সময় ও বহু অর্থব্যয় করিয়া চরম নৈরাশ্য ও বিরক্তি নিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। আরও আছে—বাহির হইতে বাড়ীগুলি দেখার পথ নাই। ঐগুলি জঙ্গলে ঢাকিয়া যাইয়া বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। এ গাফিলতি আর অপচয়ের কৈফিয়ৎ কে দেয়?

বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, 'সেন-ডাইরেক্টর'ও প্রধান, কাজেই জবাব তাঁহারই দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

কল্যাণীর নব-নির্ম্মিত বাড়ীগুলি কাহাদের জন্য নির্ম্মিত বলা শক্ত।

তবে এইটুকু বলা যায়—ঐ বাড়ীগুলি মধ্যবিত্তদের জন্য নহে। কারণ কল্যাণীতে বাস করিলেও তাহাদের চাকুরি করিয়া সংসার চালাইতে হইবে, এবং ইহার জন্য কলিকাতায় প্রত্যহ আসা-যাওয়া করিতেই হইবে। কাজেই কল্যাণীতে বাড়ী কিনিলেই চলিবে না, একটি ছোট মোটর গাড়িও সেই সঙ্গে কিনিতে হইবে। রেলের উপর নির্ভর করা যায় না, কারণ রেলগাড়িগুলি আজকাল চলে খেয়াল-খুশিমত—কাহার দোষে জানি না। কিন্তু

চাকরি করিতে হইলে আপিসে সময় রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন—এবং রেলের উপর নির্ভর করিলে মাসে অন্তত দশ-পনের দিন কর্ম্মস্থলে আধঘণ্টা হইতে দেড়-দুই ঘণ্টা লেট্ হইতে বাধ্য। ইহার ফল কি তাহা জানে চাকুরিজীবী।

ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি

কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রকাশিত এক হিসাবে দেখা গিয়াছিল যে, ১৯৫১-৬১ সালে ভারতের পাক্ সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে মুসলমান জনসংখ্যা ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই হিসাবে প্রকাশ পায়:

আসামে বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৩৮·৫৬ ভাগ, বিহারে ৩২·১৯, পশ্চিমবঙ্গে ৩৬·৪৮, পাঞ্জাবে ৩৮·০১, রাজস্থানে ৩২·৮২ ভাগ।

সমগ্র ভারতের অবস্থা হিসাব করিলে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২৫·৬১ ভাগ।

সীমান্ত রাজ্যগুলিতে অন্য যে কোন সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলিম জনসংখ্যা অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে—এমন কি, দেশের সাধারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির (শতকরা ২১·৫১ ভাগ) চাইতেও বেশী।

পাকিস্থানে মুসলিম জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে—শতকরা ৩০ ভাগ—তাহার তুলনায় সীমান্তবর্ত্তী ভারতীয় রাজ্যগুলিতে মুসলিম জনসংখ্যা বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সীমান্তবর্ত্তী রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জেলা-ওয়ারি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ভারত-পাকিস্থান সীমান্ত বরাবর অঞ্চলেই মুসলিম অধিবাসীদের ভিড় অপেক্ষাকৃত বেশী। পুরুষের তুলনায় নারীদের সংখ্যার আনুপাতিক হার অনেকটা কমতির দিকেই রহিয়াছে।

পূর্ব্ব পাকিস্থানে এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণে ধরা পড়িয়াছে যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানে মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাস এবং আসাম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় সে সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে কিছুটা সম্পর্ক রহিয়াছে। সরকারী হিসাবের দ্বারাই ইহা বুঝা যায়।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া হয়, তবে, দেখা যাইবে যে, সেখানকার রাজসাহী, খুলনা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ডিভিসনে মোট ঘাটতি পড়ে ১০ লক্ষেরও বেশী। এই ঘাটতিটি আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও বিহারের পূর্ণিয়া জেলার বাড়তি মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় কাছাকাছি গিয়া পৌছে।

এই প্রকার পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ ব্রহ্মদেশেও পরিলক্ষিত হইয়াছে। ব্রহ্মের সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায় যে একমাত্র আরাকানেই পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা কমপক্ষে ২ লক্ষ! ব্রহ্মের সংবাদপত্রে আরও প্রকাশ যে, ব্রহ্মের বিভিন্ন অঞ্চলে বেআইনীভাবে প্রবেশকারী পাকিস্তানীদের পিছনে বেশ কিছু সংখ্যক লোক রহিয়াছে ঐ সব লোকের নির্দ্দেশ অনুযায়ী অনুপ্রবেশকারীরা কাজ করিয়া চলিয়াছে।

গত কয়েক বছর ধরিয়া ব্রহ্মের আরাকান অঞ্চলে পূর্ব্ব পাকিস্তানীরা অনুপ্রবেশ করিতেছে। ঐ এলাকায় পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা দুই-তিন লক্ষ হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে আরাকান এলাকাকে পাকিস্তানের সহিত যুক্ত করার জন্য যে আন্দোলন হয়, ব্রহ্ম সরকার তাহা দমন করেন।

ব্রহ্মের একটি পত্রিকা বলে: ১৯৫৮ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত আরাকানের বুথিডং এবং মংডু এলাকায় ২ লক্ষ পূর্ব্ব পাকিস্তানী বেআইনীভাবে প্রবেশ করিয়াছে।

ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, পাক্ সরকারের সমর্থন-সাহায্য না থাকিলে এমন ঘটিতে পারে না। এই বিষয়ে পাকিস্তান তাহার নয়া দোস্ত চীনের টেকনিক নকল করিয়া চলিয়াছে সার্থক ভাবে। বিনা বাধায় এই পাক-চক্র চলিতে থাকিলে দশ বৎসর পরে অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা সহজ অনুমেয়। এই প্রসঙ্গে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতে পাক্ অনুপ্রবেশে সরকারী মহল বাধা দিতে চাহিলেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সরকারী মহলের এই সৎ এবং দেশের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টায় সরকারী মহলকেই বাধা দেন। এমন মন্তব্যও তিনি করেন যে, "১০ বৎসরে দশ লক্ষ মুসলমানের আসামে অনুপ্রবেশ এমন কিছু ভয়াবহ ব্যাপার নহে!" নেহরু রোপিত বিষবৃক্ষে আজ ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত সরকারী হিসাবে দেখা যাইতেছে:

আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরাতে পাক্-মুসলিম অনুপ্রবেশ ভয়াবহ!!

রিপোর্টে প্রকাশ:

১৯৫১ হইতে ১৯৬১ সাল। এই দশ বছরে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় পাকিস্তানী মুসলমানদের

অনুপ্রবেশের ফলে এই তিন রাজ্যে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে সাংঘাতিক রকম। ইহার ফলে সমস্যাও দেখা দিয়াছে বিরাটভাবে। এই দশ বৎসরে আসামে মুসলিম বাসিন্দার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ৩৯ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ৩৮ শতাংশ এবং ত্রিপুরায় বিপজ্জনক সংখ্যা ৬৮ শতাংশ। এই সমস্যার গুরুত্ব ও তীব্রতা সম্প্রতি, এই সর্ব্বপ্রথম আন্তর্জ্জাতিক জনমানসে তুলিয়া ধরা হয় কায়রোর নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলনে।

এই তিনটি রাজ্যে মুসলিমদের জন্মহার এই দশ বৎসরে যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই তিন রাজ্যের প্রকৃত মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তদপেক্ষা অনেক বেশী। এই অতিরিক্ত বৃদ্ধির হার সংশ্লিষ্ট তিনটি রাজ্যে নিম্নরূপ:—ত্রিপুরায় ৫৭ শতাংশেরও বেশী, আসামে ১৮ শতাংশেরও বেশী এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৭ শতাংশেরও বেশী। এই দশ বৎসরে পাকিস্তানে যে হারে মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়াছে, আসাম পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার এই হার বৃদ্ধির হিসাব তাহার সহিত তুলনামূলক বিচারে সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

এই যে সমস্যা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে তাহার একমাত্র উত্তর দাঁড়ায় যে, ১৯৫১ সালের আদমসুমারী ও ১৯৬১ সালের আদমসুমারীর মধ্যবর্ত্তীকালে এই পরিমাণ পাকিস্তানী মুসলমান ভারতে আসিয়া খুঁটি গাড়িয়াছে।

অন্য দিকের চিত্র দেখুন:

পাকিস্তানী অত্যাচার

পাকিস্তানে কি রকম নিরবচ্ছিন্নভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উচ্ছেদকার্য চলিতেছে, এই পুস্তিকায় তাহারও চিত্র প্রকাশ করা হয়। ইহাতে বলা হয়:—১৯৫০ হইতে ১৯৬২ সালের মধ্যে পাকিস্তান হইতে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যত লোককে বিতাড়িত করা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা সাত অঙ্কের। এই সব হতভাগ্য পাকিস্তানে নিরাপত্তা বোধ করিতে পারে নাই বলিয়াই তাহারা পিতৃ-পিতামহের বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল, দেশ বিভাগের এত কাল পরেও পাকিস্তান তাহার নাগরিকদের এমনভাবে ভারতে তাড়াইয়া দিতেছে কেন? ইহার একমাত্র উত্তর ইহাই হইতে পারে যে, পাকিস্তানের শাসনকর্ত্তারা পশ্চিম পাকিস্তানের মত পূর্ব্ব পাকিস্তানেও এক জাতি তত্ত্ব কায়েম করিতে বদ্ধপরিকর।

এই পুস্তিকার পরিসমাপ্তিতে বলা হয়:—আন্তর্জ্জাতিক আইন স্বীকৃত বিধানবলে বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীদের পাকিস্তানে ফিরিয়া যাইতে বলা হইলে পাকিস্তান যে নিজেদের এমন চমৎকার রেকর্ড লইয়া মড়া কান্নায় বিশ্ববাসীকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে, তাহাতে অবাক হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না! কিন্তু আমরা এই দেখিয়া সত্যই অবাক্ হই যখন দেখি ভারত সরকার পাক্-আবদারে গলিয়া গিয়া, নিজের প্রজাদের সকল দুঃখ অভাব অগ্রাহ্য করিয়া পাক এবং অনুপ্রবেশকারী পাক্-মুসলমানদের প্রেমে ডগমগ হইয়া কাছা-কোঁচা খুলিয়া ফেলেন!

অবস্থা ইতিমধ্যেই প্রায় আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছে—আর কিছুদিন পরেই ভারতের মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলি পাকিস্তান-ভুক্ত করিবার জন্য দাবি যে উঠিবে, তাহাতে বিশেষ সন্দেহের কারণ নাই! এবং এই বেয়াদবী পাক্-দাবি সমর্থন করিতে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির অনেকেই আগুয়ান হইবে। এখন হইতে আমাদের আরও জমি ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত থাকাই ভাল এবং বুদ্ধিমানের কাজ হইবে।

বাঙ্গালীর পরমায়ু আর কত দিন?

বলিতে পারি না, আমরা কি খাইয়া বাঁচিয়া আছি—বাঙ্গালীর প্রাণশক্তি অতি ভীষণ বলিয়াই হয়ত কেহ আমাদের খায়েল করিতে পারে নাই এখন পর্য্যন্ত। কিন্তু আর কত দিন—ক্ষীণপ্রাণ, হীনবল, জীর্ণদেহ বাঙ্গালী আর ইহজগতে বিচরণ করিবে—কেহই বলিতে পারিবেন না— কারণ? আমাদের দুধে প্রায় আধাআধি ভেজাল। ভেজালের চোটে বিশ্বের বাজারে ভারতের চায়ের চাহিদা নষ্ট হইতে বসিয়াছে। মাখনের তিন-চতুর্থাংশই ভেজাল। মিষ্টিওয়ালারা অবশ্য ইহাদেরও টেক্কা দিয়াছে আশি শতাংশের উপর ভেজাল দিয়া। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, অ্যারারুট উৎপাদকদের সহিত কেহই পারিয়া উঠে নাই, কারণ তাহারা অ্যারারুট বলিয়া শিশু ও রোগীদের যাহা খাওয়াইতেছে তাহাতে শতকরা এক ভাগও অ্যারারুট নাই।

কলিকাতার পৌর কর্ত্তৃপক্ষ এক বছরে বিভিন্ন রকমের ৩,৬০৩টি খাদ্যদ্রব্যের নমুনা পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় ১,২৫৮টি খাদ্যের নমুনা ভেজাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। দুধের নমুনা পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, উহার ৪৩.৩ শতাংশ ভেজাল। ভেজাল সম্বন্ধে বিভিন্ন

রকমের যে-সব খাদ্যদ্রব্যের নমুনা লইয়া পরীক্ষা করা হয় তার শতকরা ৩২.১ ভাগে ভেজাল পাওয়া গিয়াছে।

বিশ্বের বাজারে ভারতের চায়ের চাহিদা আছে। কিন্তু ভারতের সেই বাজার প্রায় যাইতে বসিয়াছে। চায়ের ভেজাল প্রতিরোধকল্পে টী মার্কেট বোর্ড একটি ইনস্পেক্টার পদের সৃষ্টি করিয়াছেন। কলিকাতা পৌর-সভার ফুড ইনস্পেক্টার এবং চা-পরীক্ষক একত্রে উক্ত ইনস্পেক্টারের সঙ্গে কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু এত বাঁধন সত্ত্বেও নমুনার শতকরা ৪৮.২ ভাগ চায়ে ভেজাল পাওয়া গিয়াছে। ভেজাল সন্দেহক্রমে ২২৮টি চায়ের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তন্মধ্যে ১১০টি নমুনা ভেজাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

নিম্নে কয়েকটি প্রধান খাদ্যদ্রব্যের কতগুলি নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছে, কতগুলি ভেজাল প্রমাণিত হইয়াছে তার শতকরা হিসাব দেওয়া হইল :—

খাদ্যের নাম	পরীক্ষার সংখ্যা	ভেজালের সংখ্যা	শতকরা হিসাব
দুধ	১৫০	৬৫	৪৩.৩
ঘি	৩৪৫	১০৩	২৯.৮
মাখন	২৭	২০	৭৪.০৭
মিষ্টি	৪১	৩৩	৮০.৪
সরিষার তৈল	১০৯৬	১৯৫	১৭.৭
গম	৫	১	২০.০
সাগু	৯	৭	৭৭.৭
এ্যারারুট	৪২	৪২	১০০.০
ডাল	৩৪৫	১৯৭	৫৭.১
মসলা	৪৩৭	২২৫	৫১.৪
খয়ের	৩৬	২৭	৭৫.০
লজেন্স	৪	৪	১০০.০

উপরি-উক্ত হিসাব পৌরসভার ১৯৫৯-৬০ সালের সদ্য-প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে দেওয়া হইল।

রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, ফুড ইন্সেপেক্টারদের সতর্ক দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও দিন দিন বিশুদ্ধ খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। ইহার প্রধান কারণ আইনের ফাঁকের সুযোগে ভেজালকারিগণ দীর্ঘসূত্রতার পন্থা অবলম্বন করেন। আইনের গলদের দরুণ ব্যবসায়ীরা ভেজাল-মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য বেচিয়া যত টাকা লাভ করিয়া থাকেন আদালতের বিচারে তাহা অপেক্ষা অনেক কম টাকা জরিমানা দিতে হয়। লোভী ব্যবসায়িগণ প্রথমেই ধরিয়া লন যে, লাভের একাংশ জরিমানা দিতে হইবে। জরিমানা দিবার পর, বৃহৎ ব্যবসায়ীদের লাভের অঙ্কে সামান্যই হাত পড়ে।

বলা বাহুল্য—গত চারি বৎসরে এই ভেজালের পরিমাণ আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার উপর চাউল, আটা, সুজি, চিনি, ঘি, তৈল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের মূল্য সাধারণের সাধ্যাতীত হওয়ায় মানুষ এখন খাদ্য-দ্রব্য মনে করিয়া অখাদ্যই গ্রহণে বাধ্য হইতেছে।

পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য দেশে (অসভ্য দেশের মানুষ খাদ্যে ভেজাল কি এখনও জানে না—!) এমন ভাবে ব্যবসার নামে মানুষ হত্যা করার দেশব্যাপী বিরাট্ ষড়যন্ত্রের কথা শোনা যায় না! অন্যদেশে খাদ্য এবং ঔষধে ভেজালকারীদের সোজা বিচার করা হয়—ভেজালকারীর নিধনের সঙ্গে ভেজাল কারবারও অদৃশ্য হয়।

এ পোড়া দেশের যাঁহারা শাসক বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা চোখ রাঙাইয়া এবং অহরহ বিনম সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াই বাজি মাৎ করিতেই জানেন। কিন্তু যে-ব্যবস্থা মাত্র দু'-চারটি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী করিলে মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা এক নিমেষেই দূর হইতে পারে—সেই সহজ 'মারো গুলী' ঔষধের ব্যবস্থা যাঁহারা করিতে পারেন না। কারণ তাঁহারা অহিংস মন্ত্রে 'দীক্ষা' লইয়াছেন।

বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্ববৃহৎ এবং একমাত্র আশু কর্ত্তব্য

দেশের লোক অনাহারে মরিতেছে—পরণের কাপড় নাই, রোগে শতকরা ৬০ জন লোক ঔষধ পায় না, শিক্ষার ক্ষেত্র অতি সীমিত—তাহাও 'কন্ট্রোলিত'—আরও হাজার রকম অভাব-অনটনের চাপে যখন দেশের শতকরা ৮০ জন লোকের প্রাণ নাসিকান্ত প্রাপ্ত—ঠিক সেই শুভসময়ে আমাদের অবশ্য এবং একান্ত প্রয়োজন (কর্ত্তাদের বিচারে)—

সর্ব্বপ্রধান সরকারী ভাষা—চালু করা।

এবং "যেহেতু আগামী ১৯৬৫ সালের ২৫শে জানুয়ারীর পরে হিন্দী সর্ব্বপ্রধান সরকারী ভাষা হিসাবে গণ্য হইবে, সেই হেতু এখন হইতেই তাহার প্রস্তুতি আবশ্যক। অতএব কেন্দ্রীয় সরকারের যত রকম রেজিষ্টার ফরম আছে, তাহার শিরোনামা (হেডিং) যাহাতে হিন্দীতেও ছাপা থাকে, আগামী জানুয়ারীর মধ্যে যেন তাহার ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হইতে এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, হিন্দী অনুবাদ যথা-

যথ হইল কি না তাহাও যেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় ডাইরেক্টরেট দ্বারা ঠিক করিয়া লওয়া হয়। আদেশ হিসাবে ইহা ইস্যু করা হইলেও ইহা যে 'বাঞ্ছনীয়' তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেহ কেহ হয়ত মুচকি হাসিয়া ভাবিবেন যে, এত বিনয়ে কি প্রয়োজন? যাহা করিতে হইবে, তাহা হইবে। কিন্তু তাঁহারা আরও বিনয় দেখাইয়া বলিয়াছেন, হিন্দীতেও ছাপা হইবে, একমাত্র হিন্দীতে নহে।"

কর্ত্তাদের দয়া অসীম স্বীকার করিতেই হইবে।

হিন্দী জোর করিয়া অহিন্দীভাষীদের ঘাড়ে চাপানোর বিরুদ্ধে বহু আলোচনা আমরা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি—কিন্তু আমাদের মত ক্ষুদ্র-কর্ণদের কথা শাসক মহলের লম্বকর্ণদের বিচলিত বা কর্ত্তব্যচ্যুত করিতে পারে নাই। কারণ তাঁহাদের মতে ভারতে হিন্দীকে রাজ-সিংহাসনে বসাইতে না পারিলে দেশের ঐক্য নষ্ট হইয়া বিষম এক অনর্থ অরাজকতার সৃষ্টি করিবেই।

"আমরা মুখে সর্ব্বভারতীয় ঐক্যের কথা সর্ব্বদাই বলি এবং ঐক্যই যে আমাদের কল্যাণের একমাত্র পথ, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যা-কিছু ঐক্যের পরিপন্থী, তাহারই দিকে আমাদের ঝোঁকটা প্রবল। সর্ব্বভারতের অনিচ্ছুক কাঁধে হিন্দী চাপানোর জিদ আমরা কোন কারণেই আপাতত সরাইয়া রাখিতে প্রস্তুত নই। হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা, এইভাবে তাঁহাদের একই দেশে একই গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোতে একটি সুবিধাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ে পরিণত করার যে চেষ্টা চলিতেছে, অথবা তাহার প্রতিক্রিয়ায় দ্রাবিড় কাজাগমদের উদ্যোগে যে অনিষ্টকর ভেদ-নীতির আন্দোলন চলিতেছে, তা প্রত্যাশিত সংহতির ঠিক বিপরীত পথেই কি আমাদের ঠেলিয়া দিতেছে না? খুঁটাইয়া দেখিলে এমনি আরও অনেক জিনিস পাওয়া যাইবে যে সম্বন্ধে আমাদের সতর্কতা প্রয়োজন। আসলে সংহতির শপথ-বাক্যে যখন আমরা বাহির হইতে আক্রমণের হাত হইতে দেশের অখণ্ডতা রক্ষার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিতেছি, তখন যাহাতে ভিতরের বিপদ্ সম্বন্ধেও আমাদের সচেতনতার অভাব না হয়, সেদিকে আমরা নেতৃত্বকে হুঁসিয়ার হইতে আহ্বান করিতেছি।—"

কিন্তু কোন্ নেতৃত্বকে এ-কথা বলা হইতেছে? কেন এ সাবধান বাণী শুনিতে—লম্বকর্ণ হইলেই যে কেহ সব কথা শুনিতে পাইবে—এমন কোন নিয়ম নাই।

বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী হালে বহু মূল্যবান্ বাস্তব কথা বলিতেছেন—তাঁহার বহু কাজ এবং বিচার-বিবেচনা দেশের লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিতেছে—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি হিন্দী-গোঁয়ার্ত্তুমিকে প্রশ্রয় দিতেছেন? দেশ অপেক্ষা কি হিন্দী বড় হইল?

শিক্ষার গঙ্গাযাত্রা!

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ব্যাপারে যে ভেজাল চলিতেছে তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আমরা পূর্ব্বে আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস পাই—ফল? বিফলত!

"শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ত্তমানে চালু ভেজাল প্রতিষ্ঠানগুলি তুলিয়া দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা-পরামর্শদাতা পর্ষতের বাঙ্গালোর অধিবেশনে একটি শাস্তিমূলক আইন প্রণয়নের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শিক্ষাদানের নামে ছাত্রদের প্রতারিত করিয়া টাকা রোজগার করিয়া থাকে, এমন ভেজালকারবারীর সংখ্যা এ দেশে কম নয়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড দেখিয়া ছাত্রেরা আকৃষ্ট হয়, প্রয়োজন বিশেষে মোটা বেতনও দিয়া থাকে। বিনিময়ে সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা লাভ করিলেও তাহা কোন কাজে আসে না। কারণ প্রয়োজনীয় অনুমোদন না থাকায় কোথাও এই সব প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমার স্বীকৃতি মেলে না। টাকা রোজগারই সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়ায় এইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানেরও কোন ব্যবস্থা নাই। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরনের দুর্নীতি কিন্তু বৎসরের পর বৎসর বিনা বাধায় চলিয়া আসিতেছে। ফলে জাতীয় অবক্ষয়ের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে: পানের দোকান খুলিতে বা ঠেলাগাড়ি চালাইতেও সরকারী ছাড়পত্রের দরকার হয়, কিন্তু এ-দেশে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খুলিতে কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না। সকলের চোখের সামনেই এইসব প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল ধরিয়া নির্ব্বিবাদে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে। অন্য কোন দেশে শিক্ষা লইয়া এমন প্রকাশ্য চোরাকারবার চলে বলিয়া আমাদের জানা নাই। আশার কথা, বিলম্বে হইলেও এই ধাপ্পাবাজি বন্ধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা নিজেই উদ্যোগী হইয়াছেন।

"সরকারী গাফিলতিই এই ভেজালকারবারীদের এতদিন প্রশ্রয় দিয়াছে। এগুলি বন্ধ করিবার জন্য আইন পাস হইতেছে, ভাল কথা। শিক্ষাক্ষেত্রে যে জালিয়াতির ফলে লক্ষ লক্ষ ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইতেছে,

তাহা বন্ধ করিতে হইলে কেবলমাত্র আইন পাস করিলেই চলিবে না, সমস্যার সমাধানের জন্য মূল ধরিয়াই টান দিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সীমিত হওয়া সত্ত্বেও মাধ্যমিক পর্য্যায়ে ছাত্রসংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশে ক্রমবর্দ্ধমান কল-কারখানার জন্য কারিগরি শিক্ষার চাহিদাও বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রাখিয়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বাড়ে নাই, শিক্ষার মান বজায় রাখিবার কোন চেষ্টাও হয় নাই। চাকুরিতে প্রবেশের ব্যাপারে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমার উপর অতিরিক্ত গুরুত্বদান ছাত্রদের এইসব জালশিক্ষাবিদ্‌দের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। কারণ পঠিত বিষয়ে জ্ঞান অপেক্ষা সার্টি-ফিকেট-লাভের প্রশ্নই ছাত্রদের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। এই কারণেই ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা-বৈতরণী পার হওয়ার জন্য টিউটোরিয়াল হোমেও ভিড় জমায়।"

বর্ত্তমানে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর সব-গুলিই প্রায় 'কমার্শিয়াল' কারবার, একথা বলা অন্যায় হইবে না।

স্কুল-কলেজরূপ গুদামগুলিতে ছাত্রছাত্রীরূপ মাল ঠাসিয়া—বেতন বাবদ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করাই যেন এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির একমাত্র কাম্য! আর এই বিচিত্র 'গুদামে' 'ঠাই' পাইবার জন্য অভিভাবকদের যে অসম্ভব ভাড়া (মূল্য?) দিতে হয়, তাহাও ক্রমশঃ মানুষের সাধ্যের বাহিরে যাইতেছে।

স্কুল-কলেজ বর্ত্তমানে wholeseller অর্থাৎ পাইকার ব্যবসায়ী এবং ব্যাঙের ছাতার মত হাজার হাজার যে টিউটোরিয়াল স্কুল বা কলেজ কলিকাতা এবং অন্যান্য শহরে দেখা যায়, তাহাদের retailer অর্থাৎ খুচরা কারবারীদের সহিত অবশ্যই তুলনা করা যায় এবং এক শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষক—দুইটি কারবারেই নিয়মিত শেয়ার হোল্ডার! অর্থাৎ পাইকার এবং খুচরা—দুই কারবার হইতেই 'ছাত্র-অভিভাবক-মার', নিজের শেয়ার অর্জ্জন করিতেছেন! বলা বাহুল্য ইঁহারা এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট পরিমাণে 'ভেজাল' চালাইতেছেন—ভেজালের মাত্রা হয়ত শতকরা ৮০।৯০ হইতে পারে।

রিকশ টানিতে এবং কুলীগিরিতেও লাইসেন্স লাগে—কিন্তু ছাত্র-মার কারবার বেপরোয়া চালাইতে কোন বাধা নাই—বাধা দিবারও কেহ নাই!

ইতিহাস কথা কয়

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

দশ

তুঘলকাবাদ নতুন দিল্লী হ'তে বেশী দূর নয়। মাইল বারো দক্ষিণে। ক্রমানুসারে এটিই দিল্লীর চতুর্থ নগরী। দিল্লী অর্থে দিল্লীর সাম্রাজ্য। ইবনবতুতা এই মত সমর্থন করেছেন। প্রথম নগরী পুরাতন দিল্লী বা 'কিলা রায় পিথোরা'। দ্বিতীয় নগরী কিলোখেরী বা নয়া শহর। তৃতীয় সিরি এবং চতুর্থ তুঘলকাবাদ।

কিলা রায় পিথোরা (Qil'ah Rai Pithora) পৃথ্বীরাজ চৌহানের সৃষ্টি। চৌহানবংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজের কাহিনী ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। শুধু বীরত্ব এবং শৌর্যের জন্য নয়, রাজা পৃথ্বীরাজের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি রোমান্সের কাহিনী। জয়চন্দ্র-নন্দিনী সংযুক্তার পরিণয় হয়েছিল রাজা পৃথ্বীরাজের সঙ্গে। কিন্তু সে মিলন যোগাযোগ করে স্থাপিত হয় নি। কনৌজের অধিপতি জয়চন্দ্র গাহড়বাল তাকে কন্যাদানে রাজী ছিলেন না, কিন্তু সংযুক্তার রূপ-গুণের খ্যাতি অনেকবার শুনেছেন পৃথ্বীরাজ মনে মনে তিনি কামনা করেছিলেন সংযুক্তাকে। রাণীরূপে পেতে হ'লে এমনি মেয়েরই প্রয়োজন তার। সংযুক্তাও শুনেছিলেন পৃথ্বীরাজের বীরত্ব ও শৌর্যের কথা। স্বয়ম্বর সভায় বরমাল্য ত এমনি বীরেরই প্রাপ্য। কন্যার ইচ্ছায় স্বয়ম্বর সভা ডাকলেন জয়চন্দ্র। আহ্বান জানালেন খ্যাত-অখ্যাত বহু নরপতিকে। মালা হাতে সভায় এলেন সংযুক্তা। দাসী পরিচয় করিয়ে দিলেন মহামান্য নৃপতিদের সঙ্গে। কিন্তু রাজকুমারীর মন ওঠে না। কাজলকালো আয়ত দু'টি আঁখি কার স্থির শান্ত দু'টি চোখ খুঁজে ফেরে। একের পর এক রাজা-মহারাজাদের পেরিয়ে আরও এগিয়ে চলেন সংযুক্তা। তবু চারি চক্ষের মিলন হয় কই?

নিমন্ত্রণ পান নি পৃথ্বীরাজ চৌহান। কিন্তু নিমন্ত্রণ না পেলেই কি মুখ ফিরিয়ে থাকতে হয়? ছদ্মবেশে সভার দ্বারে এলেন পৃথ্বীরাজ। জয়চন্দ্র আহ্বান জানান নি বলেই কি সংযুক্তাকে অপরের ঘরণী হ'তে দিতে পারেন তিনি? ছদ্মবেশধারী পৃথ্বীরাজকে হয়ত চিনেছিলেন সংযুক্তা। সেই স্থির অচপল শান্তপ্রেমের দৃষ্টি মুহূর্তেই সংযুক্তাকে আবিষ্ট করে তুলল। কয়েক সেকেণ্ডের মাত্র ব্যাপার। সংযুক্তাকে নিয়ে সওয়ার হলেন পৃথ্বীরাজ। সুশিক্ষিত অশ্ব অল্পসময়েই তাদের নিয়ে এল কনৌজ হ'তে বহু দূরে। রাজা জয়চন্দ্রের সীমা ছাড়িয়ে—

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা কাহিনী এবং স্বয়ম্বর সভার উপর খুব একটা বিশ্বাস করেন না। অনেকের মতে পৃথ্বীরাজ এবং জয়চন্দ্রের মনোমালিন্য সংযুক্তাঘটিত নয়। বিবাদের আসল কারণটা রাজনৈতিক। উত্তর ভারতের পরাক্রমশালী রাজা জয়চন্দ্র উদীয়মান রাজশক্তি পৃথ্বীরাজ চৌহানের প্রাধান্য খর্ব করতে একান্তভাবে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন আক্রমণের পর মহম্মদ ঘোরী আবার ফিরে যাবেন এবং উত্তর ভারতে গাহড়বাল রাজার নিরঙ্কুশ একাধিপত্য স্থাপিত হবে। জয়চন্দ্রের দূরদর্শিতার অভাব ছিল। ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে।

চাঁদ কবি পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'পৃথ্বীরাজ রসৌ'তে পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার কাহিনী ও স্বয়ম্বরসভা হ'তে সংযুক্তা হরণ লিখেছেন।

পৃথ্বীরাজ চৌহান সোমেশ্বরের পুত্র এবং বিশালা দেওএর নাতি। কানিংহাম সাহেবের মতে তার রাজত্বকাল বেশী দিনের নয়। মাত্র বাইশ বৎসর—১১৭০-১১৯১ খ্রীঃ পর্যন্ত। কিন্তু সৈয়দ সাহেব এটিকে আরও দীর্ঘ ব'লে অভিহিত করেছেন। তার মতে রাজত্বকাল সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর মত। কর্ণেল টড বলেন যে, মাত্র আট বৎসর বয়সে চৌহানরাজ দিল্লীর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন।

কিলা রায় পিথোরার সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। উত্তর সীমান্তে তখন গজনীর মুসলমান সুলতান পাঞ্জাবের কিয়দংশে আধিপত্য বিস্তার করেছেন। যে-কোন সময়েই মুসলমান আক্রমণ দিল্লীর পথে ধাবিত হ'তে পারে। শহরকে সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে মুক্ত করবার জন্য কিলা রায় পিথোরা বা দুর্গ তৈয়ারী সুরু হ'ল। ইংরাজ ঐতিহাসিকের মতে এটি ১১৮০ খ্রীঃ কিংবা

এই কুতুবমিনারের আশপাশের জায়গার উপর গড়ে উঠেছিল কিলা রায় পিথোরা এবং এরই কাছাকাছি কোথাও ছিল সিঁড়ি

১১৮৬ খ্রীঃ। আমেদ খান সাহেব বলেন যে, দুর্গ তৈয়ারী ১১৪৩ খ্রীঃ সুরু হয়।

কিলা রায় পিথোরা আজ প্রায় অস্তিত্বহীন। সেই বিশাল প্রাচীরবেষ্টনী, মধ্যবর্তী গেটগুলির সব ভগ্নস্তূপও চোখে পড়ে না, একদা এই দুর্গ এবং নগরীর পরিধি প্রায় পাঁচ মাইলের মত বিস্তৃত ছিল। সাকুল্যে দশটি সুন্দর গেট প্রাচীরবেষ্টনীর মধ্যে শোভা পেত। কারও কারও মতে গেটগুলির সংখ্যা আরও বেশী। সম্ভব যে চৌহান রাজাদের পরে খিলজী সুলতানেরা পুরাতন দিল্লী এবং রায় পিথোরার কেল্লার কিছু সংস্কার সাধন করেন। হয়ত সে সময় প্রাচীরবেষ্টনী এবং গেটগুলির কিছু পরিবর্তন করা হয়। সম্ভবত নামগুলিরও পরিবর্তন হয়।

Beglar সাহেব এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তার মতে দুর্গ মধ্যবর্তী একটি প্রাচীর আলাউদ্দিন খিলজী তৈয়ারী করেন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বার্ণির বিবরণে আরও সমর্থন পাওয়া যায়। ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সীমান্তে এক ঝোড়ো মেঘের আবির্ভাব হয়। মোঙ্গলরা তাদের নেতা সলদীর নেতৃত্বে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হয়। পুরাতন দিল্লী এবং কিলা রায় পিথোরা তখন ভগ্ন এবং জীর্ণ। দূরদর্শী সুলতান তখনই দুর্গ এবং পুরাতন শহরের সংস্কার-সাধনের আদেশ দিলেন। ১৩১ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের পরবর্তী সুলতান মুবারক শাহ এই অসমাপ্ত কাজকে শীঘ্র সমাপ্ত করবার জন্য আর একটি আদেশ দেন। ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইবনবতুতা পুরাতন দিল্লী এসেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন দুর্গের প্রাচীরের

নিম্নভাগ পাথরে গঠিত, উপরের অংশ ইটে গাঁথা। প্রথমটি হিন্দু রাজার সৃষ্টি, দ্বিতীয়টি মুসলমান নরপতির।

গেটগুলির মধ্যে বদাউন গেটই প্রধান ও প্রসিদ্ধ ছিল। এক সময় সুরাপান নিষিদ্ধ এবং বেআইনী ঘোষণা করেছিলেন আলাউদ্দীন খিলজী। এই বদাউন গেটের সামনেই সুলতান তাঁর সুরাপাত্র এবং সুরাকে ছুঁড়ে ফেলে দেন। গেটের সামনে ছোট ছোট কক্ষে সুরাপান নিষিদ্ধ আইন অমান্যকারীদের বন্দী করে রাখা হ'ত। একদা এই বাদাউন গেটের সামনেই নৃশংসতার চরম খেলা দেখিয়েছিলেন আলাউদ্দীন। বার বার মোঙ্গলদের আক্রমণে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন সুলতান। সলদি, কুৎলুঘ খাজা, ইকবাল মন্দ বিভিন্ন মোঙ্গল নেতার নেতৃত্বে মোঙ্গলেরা দিল্লীর সীমান্তে উপনীত হয়েছে। আক্রমণ করেছে হিন্দুস্থান, আবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে। ক্রোধে উন্মত্ত সুলতান বন্দী মোঙ্গলদের হত্যা করে বদাউন গেটের সামনে কঙ্কালের এক পিরামিড গ'ড়ে তোলেন। হয়ত সুলতানের মনে হয়েছিল, অত্যাচারের এই চরম নিদর্শন দেখে মোঙ্গলরা আর কোনদিন হানা দিতে সাহস পাবে না।

এই পুরাতন দিল্লীর সঙ্গে বঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, হত্যাকাণ্ড, নৃশংসতা, অগ্নিকাণ্ড বহু কিছু লোমহর্ষক ইতিহাস জড়িয়ে আছে। এই পাঁচ মাইল পরিধির দুর্গ এবং শহরের মধ্যে অতীতের বহু দ্রষ্টব্য আজও বর্তমান, লৌহস্তম্ভ (যার কাহিনী আগেই বলা হয়েছে), কুতুবমিনার, পুরাতন হিন্দুরাজাদের মন্দিরের ভগ্নস্তূপ, দাসবংশীয় রাজাদের কীর্তি, নানা সমাধি,—সরকারের আর্কিওলজিক্যাল বিভাগ সযত্নে রক্ষা করছেন।

একদা যেখানে শত শত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, মহারাজা এবং সুলতানদের আদেশে মেদিনী কম্পিত হবার উপক্রম হ'ত, আজ সেখানে শান্ত নিস্তব্ধতা। যেখানে রক্তনদী মৃত্তিকাকে রাঙ্গিয়ে দিয়েছে, আজ সেখানে বিচিত্রবর্ণ কুসুমের সমারোহ। সত্যিই এই হলদে, গোলাপী, আকাশী-নীল রঙের নানা ফুলের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের দুজনেরই কারও মনে হ'ল না যে, ইতিহাসের কোন মহাশ্মশানের ওপর আমরা এসে দাঁড়িয়েছি। সুনীল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে সূর্যজ্বলা সকালে, দুর্গ অভ্যন্তরের মাটি, বিচিত্রবর্ণ কুসুমরাজি, নানা দর্শকদের দেখতে দেখতে আমাদের মনে এক বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হ'ল। কবে কতদিন আগে সংযুক্তা এই মাটির বুকেই নরম নরম পা ফেলে হেঁটে গিয়েছেন। সুলতান ইলতুৎমিস জ্যোৎস্নারাতে বেগমদের নিয়ে সারাদিনের রাজ্যশাসনের ক্লান্তি অপনোদন করতেন। আর রাজিয়া? শাসনকার্যে পারদর্শিনী রাজিয়া অন্য সব বিষয়েও কম দক্ষ ছিলেন না। এই মাটিতেই পুরুষের পোষাক পরিধান করে রাজিয়া হেঁটে গিয়েছেন। সে-সব দিন পৃথিবীতে বড় পুরাতন। বৃদ্ধের মনে-আসা শৈশবের অসংখ্য চাপল্যের স্মৃতির মতই রোমান্সের গন্ধভরা।

এগার

কিলোখেরী (Kilokheri) বা কিলোঘেরী (Kilugheri) অল্পসময়ের মধ্যে নয়া শহর নামে পরিচিত হয়। বলবনের পৌত্র সুলতান কাই কুবদ (Kai Qubad) আনুমানিক ১২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ইতিহাস মতে সুলতান কাই কুবদের বহু আগেই কিলোখেরীতে একটি রাজ-আবাস গ'ড়ে উঠেছিল। তবে সম্ভবত সুলতান কুবদই এটিকে আরও বড় করে তোলেন। শোনা যায়, যমুনাতীরে তিনি সুন্দর একটি উদ্যান রচনা করেন এবং এই উদ্যান-সংলগ্ন একটি অট্টালিকায় পরিপূর্ণ বিশ্রাম উপভোগ করেন। দেখাদেখি বহু পাত্রমিত্র অমাত্যই কাছাকাছি বসবাস করতে সুরু করেন। তখনকার দিনে রাজার সঙ্গেই গ'ড়ে উঠত নগরী। তাই সুলতানের উদ্যান অট্টালিকার চারপাশে অল্পসময়েই তৈরি হ'ল একটি জনপদ।

পরবর্তী সময়ে জালালুদ্দীন ফিরোজ শাহ খিলজী কিলোখেরী দুর্গ দখল করেন এবং দুর্গটির নানাবিধ পরিবর্তন সাধন করেন। অল্পসময়ের মধ্যেই কিলা রায় পিথোরা পুরাতন দিল্লী আখ্যা পায় এবং কিলোখেরী নয়া শহররূপে পরিচিত হয়ে ওঠে।

কিলোখেরীর পর সিরি। এর অন্য নাম দিল্লী-আলাই বা আলাউদ্দীনের দিল্লী। মোঙ্গলদের আক্রমণে আলাউদ্দীন খিলজীর মনে শান্তি ছিল না। তাই কিলা রায় পিথোরার তিনি সংস্কার-সাধন করেন। কাছাকাছি নতুন এক দুর্গ নির্মাণ করেন সুলতান। ইতিবৃত্ত বলে প্রায় আট হাজার মোঙ্গলের কঙ্কালের ওপর এই দুর্গের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন আলাউদ্দীন। প্রতিশোধের ইচ্ছা এমনি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছিল আলাউদ্দীন খিলজীর হাতে। নতুন দুর্গের নাম সিরি। শুধু দুর্গ নয়, দুর্গকে কেন্দ্র করে এক জনপদ গ'ড়ে উঠল সিরিতে।

সিরি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় শেরশাহের আমলে। দুর্গ এবং নগরীর বহু উপাদানই কাজে লাগিয়েছিলেন শেরশাহ। তার নতুন নগরী শেরগড় গড়ে উঠল যমুনার তীরে। সিরি জনপদের এক সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন তৈমুর।...উঁচু উঁচু অট্টালিকা-শোভিত জনপদটি প্রায় গোলাকৃতি। দুর্গের প্রাকার পাথর এবং ইটের মজবুত সৃষ্টি। সাতটি গেট বা প্রবেশদ্বার আছে নগরীর। দুর্গ হ'তে পুরাতন দিল্লী পর্যন্ত একটি প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন সুলতান—

কিলোখেরী বা সিরির আর কোন চিহ্ন নেই। সময়ের কাছে হার মেনেছে এরা। কাল তাদের বিনষ্ট করেছে সম্পূর্ণ ভাবে। দীর্ঘ সাত শত বৎসরে, ইতিহাসের বহু অঘটন ঘটেছে। যুদ্ধে, বিদ্রোহে, অত্যাচারে, হিংসায়, দিল্লীর আকাশ-বাতাস চিরকালই গুমরে গুমরে কেঁদেছে। হাহাকারে আর আর্তনাদে ভরে উঠেছে যমুনার তীর। রক্তের বন্যা বয়ে গেছে নগরীর উপকণ্ঠে আর প্রান্তরে।

বার

ইতিহাসে গিয়াসুদ্দীন তুঘলক শাহ যথেষ্ট পরিচিত। তুঘলকাবাদ তার সৃষ্টি। দুর্গ এবং জনপদ নির্মাণ সম্ভবত ১৩২১ খ্রীঃ সুরু হয়। ১৩২৩ খ্রীঃ নির্মাণকার্য মোটামুটি শেষ হয়েছিল ব'লে জানা গিয়েছে।

তুঘলকাবাদের সঙ্গে গিয়াসুদ্দীন তুঘলক শাহ ছাড়া আর একটি নামও জড়িয়ে আছে। ইনি ফকির নিজামুদ্দীন আউলিয়া। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার বিস্তৃত বিবরণ এই পরিচ্ছেদে নয়। সেটি অন্যত্র সন্নিবেশিত হবে। কিন্তু গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার যে বিরোধ এবং মনান্তর সুরু হয়েছিল, কালক্রমে তাই তুঘলকাবাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তুঘলকাবাদের কথা জওহরলাল নেহরু তাঁর 'Glimpses of World History' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। দাস বংশের সুলতানদের কথা বলতে গিয়ে তিনি পরিচ্ছেদের যবনিকা টেনেছেন— 'Near Delhi you can still see the ruins of Tughlaqabad. This was built by Muhammad's father'.

তুঘলকাবাদ আজ ধ্বংসাবশেষ মাত্র। ছোট্ট একটি বসতি ছাড়া আর কিছু নয়। এর প্রসিদ্ধি শুধু ইতিহাসের সেই অধ্যায়ের জন্য, যখন গিয়াসুদ্দীন তুঘলক প্রবল প্রতাপশালী ছিলেন। যে সময় তার আদেশে শত শত শ্রমিক আর কুশলী শিল্পী গ'ড়ে তুলেছিল রাজধানী তুঘলকাবাদে।

তুঘলকাবাদের আকৃতি অনেকটা ষড়ভুজের অর্ধাংশের মত ছিল। পরিধিতে জনপদ প্রায় চার মাইলের মত বিস্তৃত ছিল। একটা পাথুরে জমির উপর দিকে দুর্গের অবস্থিতি। চারপাশে স্রোতজলে ক্ষয়প্রাপ্ত দীর্ঘ গভীর খাত। শুধু একপাশে একটি নীচু জমি। সম্ভবত ওটি কোন হ্রদের শুকনো তলদেশ। দুর্গের প্রাচীর বড় বড় পাথরের খণ্ডে নির্মিত। কানিংহাম সাহেব একটি পাথরের কথা উল্লেখ করেছেন। এটি প্রায় ১৪ ফুট লম্বা ছিল, আড়াই ফুটের মত চওড়া, ওজন ছয় টনের কম নয়।

দক্ষিণ দিকের দুর্গপ্রাকার প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু। প্রাচীরগাত্রে ছোট ছোট গর্ত ছিল। নীচে প্রায় সাত ফুট চওড়া অট্টালিকার উপরিস্থিত ফাঁকবিশিষ্ট প্রাচীর। সম্ভবত এই প্রাচীরে দাঁড়িয়ে আক্রমণকারীদের ছোট ছোট ক্ষেপণাস্ত্র বা বর্শা-বল্লমের সাহায্যে প্রথম বাধা দেওয়া হ'ত। এরও পশ্চাতে প্রায় ১৫ ফুট উঁচু আর একটি প্রাচীর ছিল। সমভূমি হ'তে উচ্চতা সাকুল্যে নব্বই ফুটের মত। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। সমস্ত স্থানটির প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ জুড়ে রাজ-আবাস অবস্থিত ছিল। ঘরগুলি গম্বুজবিশিষ্ট এবং তার ওপর rampart বা দুর্গবপ্র রচিত হয়েছিল। জেনারেল কানিংহাম মনে করতেন যে, ঘরগুলিতে সুশিক্ষিত অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য বাস করত।

তুঘলকাবাদ অনেকেরই মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। এই বিরাট্ পাথরগুলি একত্রে সংযোজিত করে এই বিশাল দুর্গের সৃষ্টি খুব সহজ কথা নয়। দেওয়ালগুলি এমনি সুদৃঢ় ছিল যে, একমাত্র গুরুতর ভূকম্পন ছাড়া তা নষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না।

প্রধান প্রবেশদ্বারে পৌঁছবার পথটি খাড়াই এবং পাথুরে। বিভিন্ন ভগ্নাবশেষ পথের উপর এসে পড়ায় পথ আরও দুর্গম হয়েছে। তুঘলকাবাদের প্রবেশদ্বারও পাথরের নির্মিত। যে পাথর সাইজমত কেটে নেওয়া হয়েছে অসংখ্য বিভিন্ন বড় আকারের শিলা থেকে। তুঘলকাবাদের মোট তেরটি প্রবেশদ্বার ছিল এবং সাতটি পুষ্করিণী অধিবাসীদের জলের চাহিদা মেটাত।

গ্রীষ্মদিনের উত্তপ্ত সূর্যকিরণ থেকে অব্যাহতি লাভ করার জন্য গিয়াসুদ্দীন তুঘলক মাটির অভ্যন্তরে কতক-

গুলি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করান। সুলতান নিজে আটটি গোলাকৃতি প্রকোষ্ঠের একটি আবাসে গ্রীষ্মদিন যাপন করতেন। এই আবাসটির ছাদ বা উপরিভাগ খিলানের আকারে গঠিত ছিল এবং প্রায় দু'ফুটের মত একটি ফাঁক বাইরের আলোক ঘরের ভিতর আনতে সাহায্য করত।

তুঘলকাবাদের উপরিভাগ প্রায় ধ্বংস। দূর থেকে লক্ষ্য করলে দর্শকের মনে যে গভীরতা রেখাপাত করে, কাছে এসে তার কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। আজকের তুঘলকাবাদ অতীতদিনের এক বীভৎস কংকালমাত্র।

গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের নামে তুঘলকাবাদ। খুব কঠোর লোক ছিলেন সুলতান। যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন গিয়াসুদ্দীন। তখনকার দিনে তিনিই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। গিয়াসুদ্দীন তুঘলক শাহের মৃত্যু সম্বন্ধে সুন্দর একটি গল্প আছে। গল্প নয়, ঐতিহাসিক সমর্থিত ঘটনা, তখনকার দিনে রাজ্যলাভের জন্ম সর্বপ্রকার হীন ষড়যন্ত্র করতেও কেউ কুণ্ঠিত ছিলেন না। পিতাকে সরিয়ে তার স্থানে অভিষিক্ত হবার এক অদম্য ইচ্ছা পেয়ে বসেছিল সুলতান পুত্র মুহম্মদ শাহকে। হয়ত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ঠিক পছন্দ করতেন না গিয়াসুদ্দীন। কাছে কাছে ছোট ছেলে মামুদকেই নিয়ে ফিরতেন। মুহম্মদ শাহের মনে ভয় ছিল। হয়ত গিয়াসুদ্দীন তুঘলক মামুদকেই দিয়ে যাবেন রাজধানী তুঘলকাবাদ। সেই পুরাতন বিদ্বেষ…। নিজের পথ নিষ্কণ্টক করার জন্ম যে কোন পন্থা অবলম্বন। দিনে দিনে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলতে লাগল মুহম্মদের মনে। কোন্ পথে মনস্কামনা সিদ্ধ হ'তে পারে?…

এই বাসনা পূর্ণ করতে এক ফকিরের আশীর্বাদ পেলেন মহম্মদ শাহ। ফকিরের নাম নিজামুদ্দীন আউলিয়া।

আনুমানিক ১৩২৫ খ্রীঃ গিয়াসুদ্দীন তুঘলক গিয়েছিলেন সুদূর বাংলা দেশ। বাংলার শাসনকর্তা বাহাদুর শাহ বিদ্রোহী হয়েছিলেন। সৈন্যদলসহ সুলতান পৌঁছলেন বাংলা দেশে। বিদ্রোহীদের দমন করতে দেরি হ'ল না তাঁর। বাহাদুর শাহকে বন্দী করে সুলতান পাঠিয়ে দিলেন দিল্লী।

নিজামুদ্দীন আউলিয়ার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না সুলতান। দিল্লীতে থাকতেন ফকির, তুঘলক শাহ তুঘলকাবাদে। বাংলা দেশ থেকে ফিরবার পথে কে একজন সুলতানের কর্ণগোচর করল যে ফকির ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সুলতানকে আর ফিরতে হবে না। কথা শুনে জ্বলে উঠলেন তুঘলক শাহ। বললেন—দিল্লী পৌঁছে এই দুর্বিনীত ফকিরকে সমুচিত শাস্তি দেবেন। নৃপতিদের উক্তি দেশের এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্তে যেতে সময় লাগে না। সে দিনের বেতারহীন ভারতবর্ষেও গিয়াসুদ্দীনের এই উক্তি অল্পসময়ের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার শুভানুধ্যায়ী ফকিরকে বললেন দেশ ছেড়ে চলে যেতে। কঠোর লোক সুলতান। কথায় আর কাজে ফারাক নেই বেশী। কিন্তু নিজামুদ্দীন যেন অনড়, অচল। তিনি হেসে বললেন—'দিল্লী দূর অস্ত—'। অর্থাৎ দিল্লী এখনও অনেক দূর।

এদিকে সদলবলে ছুটে আসছেন তুঘলক শাহ। দিল্লী আর দূর নয়। রাজধানী থেকে মাত্র ছয় মাইল দূরত্বে মুহম্মদ শাহ পিতাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে। জায়গাটির নাম আফগানপুর। মাত্র তিনদিনে আফগানপুরে এক কাঠের মণ্ডপ তৈরি করিয়েছিলেন মুহম্মদ শাহ। তার মধ্যে বিশ্রামের জন্য ঘরও নির্দিষ্ট ছিল। শ্রান্ত, ক্লান্ত পিতাকে অভ্যর্থনা করতে হবে। সমস্ত রাত্রি বিশ্রাম নিয়ে গিয়াসুদ্দীন তুঘলক আবার ছুটে চলবেন দিল্লীর পথে। সেই দুর্বিনীত ফকির নিজামুদ্দীন আউলিয়াকে সমুচিত শাস্তি দেবেন তিনি।

শান্ত মধুর এক বিকেলে তুঘলক শাহ এসে থামলেন আফগানপুরে। অমাত্যের দল কুর্নিশ জানাল তাকে। আহারাদি শেষ করলেন গিয়াসুদ্দীন তুঘলক। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বার্নি বলেন যে, এই সময়ে আকাশ থেকে একটি বিদ্যুৎ নেমে আসে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারান গিয়াসুদ্দীন তুঘলক ও আরও অনেকে।

বজ্রপাতের এই কাহিনী নানা কারণে অনেকে বিশ্বাস করেন না। পর্যটক ইবনবতুতা গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের মৃত্যু সম্বন্ধে অন্য এক কাহিনী বলে গেছেন। নিঃসন্দেহে সেটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

আসলে এই মণ্ডপটি মুহম্মদ শাহ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নির্মাণ করিয়েছিলেন। এর বিশেষ একটি অংশে আঘাত করলেই সমস্ত মণ্ডপটি ভেঙে পড়বে। সুলতান তুঘলক শাহ এসে পড়ার খানিক পরেই মুহম্মদ শাহ পিতার কাছে এক প্রস্তাব করেন। তার সামনে হাতীদের এক শোভাযাত্রা হোক। সুলতান তা দেখতে দেখতে বিশ্রাম উপভোগ করুন। গিয়াসুদ্দীন সম্মতি দিলেন। ছোট ছেলে মামুদকে পাশে নিয়ে

বসলেন সুলতান। হস্তীদের আড়ম্বরপূর্ণ প্রদর্শন অবলোকন করার জন্য। অকস্মাৎ সেই অঘটন ঘটল। কড় কড় শব্দ। তারপরই সমস্ত মণ্ডপটি লুটিয়ে পড়ল ভূমিতে। হয়ত কোন একটি হাতীই সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে ধাক্কা দিয়েছিল। ফলে সমস্ত মণ্ডপটির ভূমি নিতে দেরি হয় নি।

তুঘলক শাহ মারা গিয়েছিলেন। বড় বড় কাঠের থাম সরিয়ে যখন তার মৃতদেহ পাওয়া গেল, তখনও এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য অপেক্ষা করছিল। মরবার আগেও বৃদ্ধ পিতা দু' হাত বাড়িয়ে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন মামুদকে। ছোট ছেলের মৃতদেহের উপর তার দু'টি হাত শেষবারের মত বিছানো ছিল। অন্ধ পুত্রস্নেহ! আহা, যদি নিজে মরেও ছোট ছেলেটার প্রাণ রক্ষা করতে পারি। গিয়াসুদ্দীন তুঘলক শাহের মনে এই ছিল শেষ ইচ্ছা।

মুহম্মদ শাহের ষড়যন্ত্রের শেষ ছিল না। কাষ্ঠমণ্ডপ ভেঙে পড়ার বহুক্ষণ পরও, কুঠার ও শ্রমিকদের যন্ত্রপাতি হাতে দেখা যায় নি। সূর্যাস্তের বেশ কিছুক্ষণ পরে সুলতানের দেহের জন্য অনুসন্ধান সুরু হয়েছিল। গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের মৃত্যু সম্বন্ধে আরও দু'টি মত আছে। কেউ বলেন যে কাষ্ঠমণ্ডপের নীচে সুলতানের মৃতদেহ পাওয়া যায়। আর একদল বলে যে অর্ধমৃত ও মূর্চ্ছিত সুলতানের দেহে যেটুকু প্রাণ ছিল তা মুহম্মদ শাহের দলবল শেষ করে দিতে এতটুকু দ্বিধা করে নি।

পরবর্তীকালের আবুল ফজল মুহম্মদকে এ ব্যাপারে অব্যাহতি দেন নি। তার মতে মাত্র তিনদিনে এই বিরাট মণ্ডপ রচনা করা এবং তাতে সুলতানকে রাত্রিবাস করবার আমন্ত্রণ জানান মুহম্মদ শাহের উচিত হয় নি। ইতিহাস বলে যে সমস্ত কাষ্ঠমণ্ডপটির প্ল্যান করেছিলেন উজীর খাজা-ই-জাহান। মুহম্মদ শাহ সুলতানের পদ পেয়ে তাঁকে ভোলেন নি। চিরদিন তাঁর প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

তুঘলকাবাদ আজ সম্পূর্ণ বিনষ্ট। সে অতীতদিনের কোন আড়ম্বর, বৈভবের এককণা, ঐশ্বর্যের কোন রেশ সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবহেলিত, পরিত্যক্ত তুঘলকাবাদ আজ শুধু ইতিহাসের মূক সাক্ষী। বহুদিন সকলে তাকে পরিত্যাগ করেছে। আজ শুধু সে পুরাণো স্মৃতির ধারকমাত্র।

ভাঙ্গা বাড়ী এবং পাথরের ভগ্নাবশেষের ওপর প্রত্যুষে সূর্যের লাল আলো এসে পড়ে। জ্যোৎস্না-রাতে চাঁদ রূপালী কিরণ ফেলে। শীতে হু হু উত্তুরে হাওয়া বয়। হয়ত গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের বিদেহী আত্মা আজও ভাঙ্গা বাড়ীর কোণে কোণে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

তুঘলকাবাদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একজন কিন্তু বহুদিন আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি নিজামুদ্দীন আউলিয়া। দিল্লীতে বসেই একদিন তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তুঘলকাবাদ আর থাকবে না, পরিত্যক্ত অথবা নগণ্য হয়ে পড়ে থাকবে তুঘলকাবাদ নগরী। আউলিয়ার কথা সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। দিল্লীর চতুর্থ নগরী অতি অল্পদিনে তার প্রাধান্য হারিয়েছিল। নিজামুদ্দীন ঠিকই বলেছিলেন—ইয়া বসে গুজর

ইয়া রহে উজর।

অর্থাৎ

"Either be inhabited by Gujars
or be abandoned." [ক্রমশঃ

—*—

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

একুশ

রাত্রে রামকিঙ্করের ঘুম ভাল হয় নি। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সবিতার কথা ভেবেছে। তার গ্রাম্যমন সংস্কারে আবদ্ধ। সে ভাবতেই পারে না, কোন মেয়ে বিবাহে আপত্তি করতে পারে। নানা দিক্ দিয়ে নিজেকে সে বোঝাবার চেষ্টা করেছে: সবিতা গ্রামের মেয়ে নয়, ছোট মেয়েও নয়। সে শিক্ষিতা এবং বড় মেয়ে। কিন্তু তথাপি তার মন সংস্কারের ঊর্দ্ধে উঠতে পারে নি। সকল সময় খুঁৎখুঁৎ করেছে।

বোধ হয় এই মানসিক চঞ্চলতার জন্যেই রাত্রে তার ভাল ঘুম হয় না। বুকের ওপর দুঃস্বপ্নের মত হরেকৃষ্ণ ত আছেই, তার ওপর জুটল সবিতার দুশ্চিন্তা।

সুতরাং খুব ভোরেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

তখনও দোকানে কেউই ওঠে নি। রামকিঙ্কর নিচে এসে শিক-দিয়ে-ঘেরা সেই বারান্দায় বসল।

রাস্তায় তখনও অন্ধকার রয়েছে। গ্যাসের আলো জ্বলছে। কর্পোরেশনের লোকেরা রাস্তায় জল দিচ্ছে। রামকিঙ্করের মনে পড়ল কলকাতায় আসার প্রথম দিকের কথা। ভোরে এইখানটিতে এসে বসতে তার অদ্ভুত ভাল লাগত। সেদিন আজ কত দূরে পিছিয়ে গেছে। এখন সে আর গ্রামের ছেলে নয়, শহরের ছেলে। শহরের ছেলে, কিন্তু গ্রামের সহজ-সরল মনটিকে এখনও বয়ে নিয়ে চলেছে।

অন্ধকার ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসতে লাগল। রাস্তায়, দেওয়ালের গায়ে, এখানে-সেখানে দু'একটা আলোর আঁচড় পড়তে লাগল। দোকানের কর্মচারীরা একে একে এসে নিজের নিজের জায়গায় বসতে লাগল। যে ছেলেটি ধূপ-ধুনা দেয়, সে ঘরে ধূপ ধুনা দিয়ে গেল।

আরও একটু পরে উত্তর দিকের সরু গলিটা যেখানে এই বড় রাস্তায় এসে পড়েছে, সেইখানে আধ-ঘোমটা দেওয়া একটি মেয়েকে দেখতে পেলে। মেয়েটি এই দিকেই আসছিল। বোধ হয় রামকিঙ্করকে দেখেই ওইখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

তাই বটে। মেয়েটি সারদা। চোখে চোখ পড়তেই ইশারায় তাকে ডাকলে।

রামকিঙ্কর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। দোকান থেকে আড়ালে গলির মধ্যে সারদাকে নিয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলে, কি খবর সারদা? তুমি কি আমার কাছেই আসছিলে?

সারদা ফিক্ করে হেসে ফেললে: নয়ত আর কার কাছে?

অপ্রস্তুত ভাবে হেসে রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার?

—অনেক দিন ও বাড়ি যান নি। বৌরাণী আপনাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছেন।

রামকিঙ্কর বললে, ওদিকে যেতে ভয় হয়, সারদা। গিন্নীমার জন্যে। সেইজন্যে যাই নি। তবে ওই পার্কে কয়েকদিন গেছি। যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয়।

—ওখানে আর আমি কি জন্যে যাব?

তাও বটে। রামকিঙ্করের জন্যেই ওখানে সারদার যাওয়া। সে নেই ত আর কি জন্যে যাবে?

রামকিঙ্কর বললে, বৌরাণীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া কি ঠিক হবে?

—অসুবিধে কি?

—গিন্নীমা রেগে আছেন। বোধ হয় তাঁর ইঙ্গিতেই হরেকেষ্ট আমাকে দাঁতের জাঁতায় পিষছে। কতদিন চাকরি রাখতে পারব বুঝতে পারছি না। অনেক দুঃখের মধ্যে অনেক ভয়ে ভয়ে আছি। যদি বৌরাণী ডাকেন, আমাকে যেতেই হবে। কিন্তু ক'টা দিন একটু সাবধানে থাকাই কি ভাল নয়?

রামকিঙ্করের মুখখানি বড় করুণ লাগল।

সারদা একদৃষ্টে সেই চিন্তাক্লিষ্ট করুণ মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বললে, তা হ'লে থাক। আমি বৌরাণীকে গিয়ে বলব। তার পরে কাল আপনাকে জানাব।

—কোথায়! এখানে নয়।

একটু ভেবে সারদা বললে, তা হ'লে বরং কাল সন্ধ্যায় সেই পার্কে যাবেন। সেখানে কথা হবে।

ব'লেই আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে হন হন ক'রে চ'লে গেল।

দোকানে ফিরে রামকিঙ্কর দেখে হরেকৃষ্ণ গদিতে এসে বসেছে, এবং বোধ হয় তাকেই খুঁজছে।

রামকিঙ্কর যেতেই হরেকৃষ্ণ রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় গিয়েছিলে?

রামকিঙ্কর বললে, চা খেতে।

—চা ত সব আমরা এইখানে বসেই খাই।

—এ চাটা বাজে। গলির মধ্যে একটা চায়ের দোকান আছে, বেশ ভাল চা দেয়।

হরেকৃষ্ণ হাসলে। এই বাজে চা খেয়েই ত এতদিন চালালে। আর চলছে না?

—না। বলেই রামকিঙ্কর ভিতরে চলে গেল।

হরেকৃষ্ণ গজ গজ করতে লাগল: বড়লোকের বাড়ীতে বাস করার এই হচ্ছে বিপদ্। গরীবখানায় ফিরে কিছুই আর মুখে রোচে না।

তার কথা শুনে সবাই হাসতে লাগল। এই ক'টা মাস বড়লোকের বাড়ীতে বাস ক'রে রামকিঙ্করের যে চাল বেড়েছে, তা ওদেরও চোখে পড়েছে।

মুখের ওপর জবাব দেওয়ার জন্যেই হোক, রামকিঙ্কর একটা লম্বা তাগাদার ফর্দ পেল। রাণাঘাট লাইনের অনেকগুলো জায়গা। সন্ধ্যার আগে রামকিঙ্কর পার্কে উপস্থিত থাকবে কথা দিয়েছে। যেতেও হবে অনেকগুলো যায়গায়। টাকা আদায়ের ব্যাপার, সুতরাং প্রত্যেক যায়গায় বেশ কিছুটা করে সময়ও যাবে। রামকিঙ্কর কোনমতে নাকে-মুখে কিছু দিয়ে আটটায় বেরিয়ে পড়ল।

অসহ্য গরম পড়ে গেছে। তার ওপর দুর্দান্ত ভিড়। সন্ধ্যার মুখে যখন রামকিঙ্কর শিয়ালদহে এসে পৌঁছল, তখন তার দেহে আর পদার্থ নেই। শরীর এবং মন দুইই ধুঁকছে।

মন বিরক্তিতে পূর্ণ। রাগ হ'ল বৌরাণীর ওপর। বেচারা গরীবের ছেলে, কোনমতে সারাদিন খুটে খুটে গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড় করছে। বৌরাণী যেন সেটুকুতেও বাদ সাধছেন। তাকে তাঁর কি কারণে দরকার হ'তে পারে? শাশুড়ীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাকে রামকিঙ্কর কি সাহায্যই বা করতে পারে? ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই লাগে, নল-খাগড়ার প্রাণ যায়। রামকিঙ্করের হয়েছে সেই অবস্থা।

সে স্থির করলে আজকে সন্ধ্যায় সারাদাকে এই কথাটাই সে বুঝিয়ে বলবে, যাতে বৌরাণী আর তাকে ডাকাডাকি না করেন। একবার কোন রকমে বি. এ.টা পাশ করতে পারলে সে যেখানে হোক একটা চাকরি যোগাড় করে ওটা ছেড়ে দেবে। এই কটা দিন বৌরাণী যদি তাকে রেহাই দেন, সে বেঁচে যায়।

ভাবতে ভাবতে পার্কে এসে দেখে তাদের বসবার নির্দিষ্ট কোণটিতে সারদা আগেই এসে বসে আছে। আর প্রবেশপথের দিকে বারবার তার খোঁজে চকমক করে চাইছে।

দু'জনেই দু'জনকে দেখে হেসে ফেললে।

সারদা জিজ্ঞাসা করলে, এত দেরি হ'ল যে?

রামকিঙ্কর তখনও হাঁপাচ্ছে। বললে, আমার ত তোমার মত চাকরি নয়। সকাল আটটায় দুটো নাকে-মুখে গুঁজে রাণাঘাট লাইনে তাগাদায় ছুটেছিলাম। এই ফিরছি। এখনও দোকানেও যাই নি, মুখে-চোখে জলও দিই নি।

সারদা এত কথা জানত না। দেরির জন্যে পরিহাস করতে গিয়ে লজ্জা পেয়ে গেল। ব্যস্তভাবে বললে, আপনি তাড়াতাড়ি পুকুরে হাত-মুখ ধুয়ে আসুন। আমি বসছি।

গরমে ও ভিড়ে রামকিঙ্করের দেহ ও মন জলের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সামনের পুকুরে হাত-পা মুখ ধুয়ে এবং অঞ্জলি ভরে খানিকটা জল পান করে সে সুস্থ হ'ল। মনও খানিকটা প্রফুল্ল হ'ল।

সারদার কাছে এসে স্মিতহাস্যে বললে, বল, কি খবর?

সারদা হেসে বললে, অনেক খবর।

—একটা একটা করে বল। শুনি।

সারদা বললে, বৌরাণীর ওপর বাবু আর অত্যাচার করেন না।

রামকিঙ্কর অবাক্: হঠাৎ তাঁর এই সুমতি হ'ল কি করে?

হাত উল্টে সারদা জবাব দিলে, কি জানি, বাবু। কেউ বলছে, বৌরাণী ওষুধ করেছেন।

রামকিঙ্কর হেসে ফেললে।

সারদা বললে, হাসলেন? কিন্তু ওষুধ সত্যি সত্যি আছে। যদিও বৌরাণী করেছেন কি না জানি না।

রামকিঙ্কর বললে, তুমি তাঁর খাস ঝি। ওষুধ করলে তুমি জানতে পারতে না?

—পারতাম। সেইজন্যে মনে হয়, ওষুধের কথাটা বাজে।

—হ্যাঁ। নিরীহ মানুষকে অকারণে আর কত মারা যায়? বিশেষ যে মানুষ মারলেও কাঁদে না, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খায়। কিন্তু সন্ধ্যের সময় বাইরে বেরনোর অভ্যেসটা কি ছেড়েছেন?

সারদা ফিক্ করে হেসে ফেললে: না। সে সব ঠিক ঠিক আছে।

—তা হ'লে আর কি? বৌরাণীর যে দুঃখ, সেই দুঃখ।

সারদা বললে, না, তার চেয়ে কিছু কম দুঃখ। বৌরাণী এখন মাঝে মাঝে হাসেন।

ব'লেই গলার স্বর নামিয়ে বললে, কিন্তু সে হাসি যেন কি রকম। মাঝে মাঝে আমারই ভয় করে। আমার কি মনে হয়, জানেন?

—কি?

—বৌরাণী সর্বক্ষণ কি যেন একটা ভাবছেন। কি যেন একটা করবেন। সেই কাজে আপনাকে বোধ হয় তাঁর দরকার হবে।

রামকিঙ্কর সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি কাজ?

—তা কি করে জানব? হয়ত কাজের মুখে বলবেন। তার আগে পাছে আপনি হাতছাড়া হয়ে যান, সেইজন্যে ছলে-ছুতোয় আপনার সঙ্গে যোগটা রাখতে চান। আলগা আলগা যোগ। আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমাকে কখন ছুটি দিয়েছেন, জানেন?

—কখন?

—চারটেয়। আমি তখনই চলে আসছি দেখে বললেন, ওই রকম করে যাবি নাকি? আমি বললাম, তবে আর কি করে যাব? বললেন, একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যা। ওই রকম বেশে কি রাস্তায় বেরোয়?

সারদা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

রামকিঙ্করের দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তার চোখ-কান দিয়ে যেন গরম হাওয়া বেরুচ্ছে।

বললে, বৌরাণীর মাথায় কি ঘুরছে তুমি কিছুই অনুমান করতে পার না?

সারদা বললে, না। তবে মনে হয়, একটা ভয়ঙ্কর কিছুর জন্যে তিনি তৈরি হচ্ছেন। তাঁর মনের কথা কেউ জানে ব'লে মনে হয় না। একটি যদি জানেন ত ডাক্তারবাবু।

—ডাক্তারবাবু!

—সেই যে যাঁর কাছে আপনাকেও যেতে হয়েছে চমৎকার। আজকাল বৌরাণীর খুব ঘন ঘন অসুখ হচ্ছে, তিনিও খুব ঘন ঘন আসছেন।

রামকিঙ্কর স্তব্ধভাবে বসে রইল।

সারদা বললে, আমার ভয় হয়, ডাক্তারবাবু না খুন হয়ে যান।

রামকিঙ্কর শিউরে উঠল: খুন!

—ও বাড়ীতে অনেক আগে এ রকম ঘটনা ঘটেছে বলে শোনা যায়। বড়লোকদের পক্ষে আশ্চর্যের কিছু নেই।

রামকিঙ্কর সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কে খুন করবে! কেন খুন করবে!

—গিন্নীমাই করাবেন। স্বার্থের জন্যেই করাবেন।

—স্বার্থটা কি?

—তা কি আমি জানি? তবে বৌরাণীর ঘরে ডাক্তারবাবুর অত ঘন ঘন আসা নিশ্চয় তিনি পছন্দ করবেন না।

দু'জনে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইল।

সারদা বললে, তবে হয়ত সাহস করবেন না।

—কেন?

—মনে হয় আজকাল গিন্নীমা যেন বৌরাণীকে ভয় করতে সুরু করেছেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। বৌরাণীর ব্যাপারে গিন্নীমা আজকাল বড় একটা নাক গলান না। যাকে শাসন করা বলে, তা ত একেবারেই করেন না। বৌরাণীরও চাল-চলনে আর সেই আড়ষ্ট ভাব নেই। এখন তাঁর নিজের মহলের ভার তিনি নিজেই হাতে নিয়েছেন।

রামকিঙ্কর ও বাড়ী থেকে কতদিন হ'ল এসেছে? বোধ হয় মাসখানেকের কিছু বেশী। এর মধ্যে ও বাড়ীতে এত পরিবর্তন এসেছে? আশ্চর্য!

তার মনে হ'ল, সে যেন একটা অত্যন্ত জটিল ডিটেকটিভ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ শুনছে। তার মনের মধ্যে আগ্রহ এবং কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল। ভেবেছিল, এর মধ্যে থাকবে না, এই কথাটাই আজ সারদাকে জানিয়ে দিয়ে আসবে। কিন্তু কৌতূহল বড় পাজি জিনিষ।

সে বললে, আমরা যে এখানে দেখা করি, এও ত গিন্নীমা নজর রাখতে পারেন?

—পারেনই ত। আর হয়ত করছেন। আমি যখন বেরিয়ে আসি, তখন আমার পিছু পিছু একজনের আসা কিছুই কঠিন নয়।

রামকিঙ্কর সভয়ে চারিদিকে চাইলে, কাছাকাছি ব'সে কেউ তাদের কথা শুনছে কি না।

বললে, তা হ'লে এখানে দেখা করা ত ভয়ের ব্যাপার।

ওর ভয় দেখে সারদা ফিক্ করে হেসে ফেললে। বললে, তা হ'লে কোথায় দেখা করব ?

—অন্য কোন নিরাপদ জায়গা নেই ?

একটু ভেবে সারদা বললে, আছে। কিন্তু সেখানে কি আপনি যাবেন ?

—কোথায় ?

—আমার বাসায়।

—তুমি ত ও বাড়ীতেই দিন-রাত্রি থাক। তোমার আবার বাসা আছে নাকি ?

সারদা হেসে বললে, আছে। চাকরি আমাদের তালপাতার ছায়া। তার ওপর ভরসা করতে পারি না। তাই থাকি-না-থাকি, বাসা একটা রাখি। তার ভাড়াও দিয়ে যাই।

রামকিঙ্কর উৎসাহিত হয়ে বললে, সে ত ভাল কথা। সেইখানেই আমাদের মাঝে মাঝে দেখা হ'তে পারে। সে কত দূর ?

—দূর বেশী নয়। কিন্তু—

সারদা থেমে গেল।

রামকিঙ্কর বললে, থামলে যে ? সেখানে যাওয়ার কিছু অসুবিধা আছে ?

—অন্য অসুবিধা কিছু নেই। কেবল—

—কেবল ?

—জায়গাটা খুব ভদ্র নয়। বস্তি। যাবেন ?

সারদা মুখ নামালে।

—কেন যাব না ?—রামকিঙ্করের কণ্ঠে উৎসাহ অব্যাহত। বস্তি, তা কি হয়েছে ? আমার যেতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই। আসল কথা কি জান, গিন্নীমার ত গুণের ঘাট নেই। তাঁকে আমার বড় ভয় করে। সেইজন্যে এখানে দেখা করতে চাই না। তোমার বাসায় হ'লে নিশ্চিন্তে দেখা করতে পারি। ঠিকানাটা দেবে ?

সারদার চোখে কৃতজ্ঞতার আভাস ফুটে উঠল।

লক্ষ্য করে রামকিঙ্কর বললে, আমাকে কি তুমি মস্ত বড় বাবু ঠাওরেছ, সারদা ? আমিও তোমাদের মতই গরীব মানুষ। দিন আনি, দিন খাই। আমার কাছে তোমার কুণ্ঠার কিছু নেই।

সারদা আনন্দে গলে গেল। ঠিকানাটা দিয়ে বললে, আমি ত সেখানে রোজ যাই না। কচিৎ কখনও যাই। কবে আপনার যাওয়ার সুবিধা হবে, বলুন। আমি সেদিন থাকব।

হিসাব করে রামকিঙ্কর বললে, বিষ্যুৎবারে আমাদের দোকান বন্ধ থাকে। সেইদিন আমার পক্ষে যাওয়া সুবিধা। কখন যাব বল ?

সারদা বললে, সন্ধ্যের মুখে। যেমন সময় আজ এখানে এসেছিলেন। অসুবিধা হবে ?

—কিছুমাত্র না।

—চিনে যেতে পারবেন ত ?

—কেন পারব না ? তুমি বরং রাস্তাটা একটু বুঝিয়ে দাও।

সারদা রাস্তাটা বুঝিয়ে দিলে।

উঠতে উঠতে রামকিঙ্কর বললে, ঠিক আছে। আমি ঠিক সময়েই যাব। তুমি উপস্থিত থেক।

কথাটা রামকিঙ্করের মাথায় ঢোকে নি, সুবলই ঢুকিয়ে দিলে।

তাগাদা সেরে রামকিঙ্কর যখন ফিরল, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রোজই এইরকম হয়। সকাল আটটায় বেরোয়, ফেরে সন্ধ্যা সাতটায়।

সুবল বললে, ব্যাপারটা বুঝছ না, রাম ?

—কি ব্যাপার ?

—এমন ভাবে তোমাকে তাগাদায় পাঠানো হয় যে, সকাল আটটায় বেরিয়েও সন্ধ্যা সাতটার আগেও ফিরতে পার না।

—যত পারছে খাটাচ্ছে। তা ছাড়া আর কি বল ?

—আরও একটু আছে।

—কি বল।

—হরেকেষ্ট, যে কারণেই হোক, তোমাকে দোকানে বসতে দিতে চায় না। সব সময়ে বাইরে বাইরে রাখে।

কথাটা রামকিঙ্করের মনে লাগল

বললে, কেন বলত ?

—তুমি কিছু আন্দাজ করতে পার না ?

রামকিঙ্কর আন্দাজ করতে পারে। কিন্তু মুখে বললে, না।

—এই দেখ! এত লেখাপড়া শিখেছ, আর এই সোজা কথাটা আন্দাজ করতে পারছ না?

—কই আর পারছি?

—হরেকেষ্টর চেহারাটা লক্ষ্য করেছ?

—না।

—চেহারাটা বেশ একটু শাঁসালো হচ্ছে না? গালে মাংস লাগছে। ভুঁড়িটা একটু নেয়াপাতি ধরনের হচ্ছে।

রামকিঙ্কর নিজেও তা লক্ষ্য করেছে।

বললে, কি ব্যাপার বল ত?

—ব্যাপার আর কি। রস জমছে।

—কোথা থেকে?

—এই দোকান থেকেই নিশ্চয়। খাতাপত্র বোঝ একমাত্র তুমি। তা তোমাকে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বাইরে রেখেছে। সুতরাং ডান হাত, বাঁ হাত সমানে চলছে। কাজেই গালেও মাংস লাগছে। ভুঁড়িও ফুলছে।

রামকিঙ্কর বললে, তোমরা কিছু ধরতে পার না?

—বুঝতে পারি, কিন্তু ধরব কি করে?

তা ঠিক।

রামকিঙ্কর বললে, মালিকরাও কেউ খোঁজ রাখেন না। সুতরাং সুবিধাই হয়েছে।

সুবল বললে, আগে গিন্নীমা মাঝে মাঝে খাতা তলব করতেন। বাবুও হঠাৎ একসময় ধূমকেতুর মত এসে উদয় হতেন। কি জানি কেন, দু'জনেই এখন চুপচাপ।

রামকিঙ্কর ভাবতে লাগল।

সুবল ব'লে চলল, দোকান আর বেশীদিন চলবে না, বুঝলে? তোমার আর কি? বি. এ. পাস করে তুমি কোথাও একটা ঢুকে পড়বে। বিপদ্ হবে আমাদেরই। কোথায় চাকরি পাব, বল?

রামকিঙ্কর চিন্তিত হ'ল। দোকানের জন্যে নয়, সুবলদের জন্যে নয়, নিজের জন্যেও নয়। ভিতরে ভিতরে গিন্নীমা ও বৌরাণীর মধ্যে যে দড়ি টানাটানির গোপন খবর সে পাচ্ছে, একি তারই ফলশ্রুতি? গিন্নীমা কি ধীরে ধীরে ঢিল দিচ্ছেন? অথবা দিতে বাধ্য হচ্ছেন? গিন্নীমা যেরকম অসামান্যা বুদ্ধিশালিনী মহিলা, তাতে বৌরাণীর মত ছেলেমানুষের পক্ষে এত অল্পদিনের মধ্যে পাল্লায় এতখানি জোর আনা কি সম্ভব?

সারদার সঙ্গে এর পরে যেদিন দেখা হবে, সেদিন হয়ত কিছুটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। অথবা নাও পাওয়া যেতে পারে। বৌরাণী সারদাকেও সব কথা বলেন না। কিছু কিছু সারদা যে বুঝতে পারে, তা নিজের বুদ্ধিতে বোঝে।

রামকিঙ্কর মনে মনে স্থির করলে, ক'টা দিন সে বাইরে তাগাদায় বেরুবে না। হরেকৃষ্ণ কি করছে, একটু লক্ষ্য রাখা দরকার। বৌরাণী হয়ত তার ভরসা করেন।

পরদিন সকালে মাথায় একটা রুমাল বেঁধে সে নিচে দোকানে নামল। তার দিকে না চেয়েই হরেকৃষ্ণ তার আসা টের পেলে।

বললে, রাম, আজ তোমাকে যেতে হবে গার্ডেন-রীচের দিকে। সেখান থেকে একবার শিবপুরে যাওয়া দরকার।

রামকিঙ্কর বললে, আজকের দিনটা বাদ দিন।

—বাদ দেব! রামকিঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে হরেকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলে, মাথায় ওটা কি বেঁধেছ?

—রুমাল। যন্ত্রণায় মাথা যেন ছিঁড়ে আসছে।

হরেকৃষ্ণ কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। যন্ত্রণার কথায় তার মন কিছু নরম হ'ল ব'লে বোধ হ'ল না।

বললে, দেখ বাপু, আমরা গরীব মানুষ। খেটে-খুটে খাই। মাথাই ছিঁড়ুক, গড়িয়ে গড়িয়েও আমাদের কাজে বেরুতে হবে। তাগাদাটা বিশেষ দরকার।

রামকিঙ্কর বললে, তা হ'লে অন্য কাউকে পাঠান। আমি বরং গদিতে ব'সে ব'সে যে-সব কাজ, তাই করি।

হরেকৃষ্ণ হাসলে: গদিতে ব'সে ব'সে যে-সব কাজ, তা করবার লোক আছে। কিন্তু তাগাদায় যাবার লোক তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। বিলেত-বাকি জোর তাগাদা দিয়ে আদায় করতে হবে। বাবু মুহুর্মুহু টাকা চাইছেন। না দিতে পারলে রেগে যাবেন। তখন আবার আর এক বিপদ্ আসবে।

সেকথা রামকিঙ্কর ভ্রূক্ষেপও করলে না। গদির একপ্রান্তে চেপে বসল।

বললে, কিন্তু আজ আমি কিছুতেই বেরুতে পারব না। বিপদই আসুক, আর যাই আসুক।

রাগে হরেকৃষ্ণর মুখ লাল হয়ে উঠল। এবারে বাবুদের বাড়ী থেকে আসার পর থেকে রামকিঙ্কর নিচু হয়েই আছে। কেন নিচু হয়ে আছে, গিন্নীমা পরিষ্কার

করে না বললেও, সুচতুর হরেকৃষ্ণ টের পেয়েছে, রামকিঙ্করের উপর গিন্নীমার আগেকার অনুগ্রহ আর নেই।

বললে, তা হ'লে আমাকে গিন্নীমাকে জানাতে হয়।

—জানাবেন। বলবেন, আমি মরতে মরতে তাগাদায় যেতে পারব না।

দাঁতে দাঁত চেপে হরেকৃষ্ণ বললে, আচ্ছা।

গদির মাঝখানে হরেকৃষ্ণ রাগে কাঁপছে। অন্যপ্রান্তে রামকিঙ্কর নিশ্চিন্তে গুম হয়ে বসে। সমস্ত দোকান নিস্তব্ধ। হরেকৃষ্ণর রাগ দেখে সুবলরা দোকানের আনাচে-কানাচে স'রে পড়ল। তারা ভয় পেয়ে গেল বটে, কিন্তু মনে মনে খুশীও হ'ল। ইদানীং হরেকৃষ্ণর বার বড্ড বেড়েছে। রামকিঙ্করের কাছে এমনি একটা ধাক্কা খাওয়া দরকার ছিল।

সুবল খানিকটা অনুমান করলে, রামকিঙ্করের তাগাদায় না যাবার কারণটা কি হ'তে পারে। সম্ভবতঃ, সে গদিতে বসে হরেকৃষ্ণর কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে চায়।

অন্যেরা খুশী হয়ে বলাবলি করতে লাগল: আরে বাবা, ও আজ বাদে কাল বি. এ পাস করবে। ও কি তোমাকে গেরাহ্য করে, না তোমার তিন পয়সার চাকরিকে গেরাহ্য করে? গিন্নীমাকে ব'লে তুমি আর ওর কি করবে? গিন্নীমার কাছে যা পাবার, তা ওর পাওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন ওর পাখা গজিয়েছে। যখন দরকার হবে, বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাবে।

খদ্দের আসে, যায়। সেই থমথমে অবস্থাতে দোকানের কাজ চলে।

অনেকক্ষণ পরে হরেকৃষ্ণ একটু নরম হয়ে বললে, শরীর যখন খারাপ, তখন এখানে বসে না থেকে ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়লেই ত পার।

রামকিঙ্কর মনে মনে নিজেকে তৈরি করে ফেলেছে। বললে, এখানে থাকলে আপনার অসুবিধা আছে?

থতমত খেয়ে হরেকৃষ্ণ বললে, আমার আর অসুবিধা কি? তোমার ভালর জন্যেই বলা।

রামকিঙ্কর বললে, এইখানেই এখন থাকি, যতক্ষণ পারি। না পারলে, ওপরে যাব।

হরেকৃষ্ণ আর কিছু বললে না।

ক্রমশঃ

ঋষি লিও টলস্টয়ের প্রথম জীবন

শ্রীকমলা দাশগুপ্ত

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

পঁচিশ বছর বয়সের সময় টলষ্টয়কে ইউরোপের একটা বড় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়। সেখানকার অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী জীবন ও সাহিত্যসাধনাকে প্রভাবান্বিত করে।

তিনি ডেনিউব গেলেন। টার্কির সঙ্গে যুদ্ধ চলছে রাশিয়ার। তিনি রাজকুমার গর্চাকভ-এর অধীনে ছিলেন। তাঁকে টলষ্টয় অনুরোধ করেন তাঁকে যেন যুদ্ধের গুরুতর ক্ষেত্রে পাঠান হয় যেখানে তাঁর সেবা সর্বাধিক হ'তে পারে। টলষ্টয় টার্কি ছেড়ে কিশিনেভ পৌঁছলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দিতে চেয়েছিলেন বলে তাঁকে সেভাষ্টাপোল পৌঁছতে হয় ৭ই নবেম্বর, ১৮৫৪। তিনি সাব-লেফটানাণ্ট পদে প্রমোশন পেয়েছিলেন।

মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনী সেভাষ্টাপোলের উত্তরে ক্রিমিয়াতে পৌঁছেছিল ১৪ই সেপ্টেম্বর। তাঁরা আল্‌মাতে রাশিয়াকে পরাজিত করেছিলেন। রাশিয়ান সেনাপতি মেনশিকভ শহরটা ছেড়ে দিয়ে উত্তরে সরে গিয়েছিলেন। নৌসেনাবাহিনীর সেনাপতি কর্নিলভ তাঁর নৌসেনা-বাহিনী নিয়ে আপন প্রাণের বিনিময়ে এই সময় রাশিয়াকে রক্ষা করেছিলেন। রাশিয়ার সমগ্র সেনা-বাহিনী কর্নিলভ-এর এই বীরত্বে উদ্দীপ্ত হয়ে মেনশি-কভকে দিয়ে রাশি রাশি অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধরসদ আনিয়ে এগার মাস ধ'রে সেভাষ্টাপোল রক্ষা করেছিলেন। যদিও মিত্রপক্ষ তখন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে ও সমরসম্ভারে বিপুল-ভাবে সজ্জিত ছিল।

আত্মরক্ষার প্রস্তুতি যখন সম্পূর্ণ, তখন টলষ্টয় সেভাষ্টাপোল পৌঁছলেন। দিন পনের পরে টলষ্টয় তাঁর ভাই সার্গিকে লিখলেন—চারদিন আগে আমি সেভাষ্টাপোল ছিলাম। শত্রু দক্ষিণ দিক্ থেকে শহরটা আক্রমণ করে। তখন আমাদের সেখানে রক্ষা ব্যবস্থাই ছিল না। এখন সেখানে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করা হয়েছে। সেখানকার দুর্গে আমি প্রায় সপ্তাহখানেক ছিলাম। ওখানে কামানশ্রেণী ও সৈন্যশ্রেণীর গোলকধাঁধায় পড়ে আমি শেষদিন পর্যন্ত পথ হারিয়ে ফেলেছি, ঠিক যেমন করে লোকে ঘনজঙ্গলে হারিয়ে যায়। শত্রু-সৈন্য আর অগ্রসর হতে পারছে না, কামানের গোলা তাদের আটকে দিচ্ছে।

আমাদের সৈন্যদের মনোবল চমৎকার রয়েছে। পুরাকালের গ্রীক বীরগণও বুঝি এমন বীরত্ব দেখায় নি। নৌসেনাপতি কার্নিলভ সৈন্যবাহিনীর মধ্য দিয়ে যাবার সময় তাদের স্বাস্থ্যকামনা করেন না, তিনি বলেন, "বালকগণ, মরতেই যদি হয় এখন মরবে?" সেনাবাহিনী পরমশ্রদ্ধাভরে এবং উৎসাহের সঙ্গে চীৎকার করে ওঠে, "আমরা মরব।" তাদের মুখে প্রতিজ্ঞার রেখা ফুটে ওঠে। বাইশ হাজার সেনা ইতিমধ্যেই তাদের শপথ রক্ষা করে মৃত্যুবরণ করেছে।

একটি মরণোন্মুখ সেনা আমাকে বলেছে, তারা একটা ফরাসীবাহিনীকে পরাজিত করেছিল, কিন্তু পুনরায় যুদ্ধরসদ এসে আর পৌঁছল না। একদল নৌসেনা ত্রিশ দিন কামানের গোলার মধ্যে থেকে যুদ্ধ করার পর তাদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ব'লে ঘোর আপত্তি জানায়। কোথাও গোলা পড়লে পর সৈন্যবাহিনী সেই গোলা থেকে ফিউজ বার করে নেয়। মেয়েরা সৈন্যদের জন্য বুরুজ (Bastions) তৈরি করে। আহত এবং নিহতের সংখ্যা গোনা যায় না। গোলাবৃষ্টির মধ্যেই পাদ্রীগণ (Priests) ক্রশ নিয়ে যুদ্ধের অগ্রভাগে বুরুজে চলে যান এবং কামানের গোলার মধ্যে থেকেই প্রার্থনা করেন। একটা ব্রিগেডের ১৬০ জনের বেশী লোক আহত হয় তবুও তারা যুদ্ধের ফ্রণ্ট ছাড়তে চায় না। ২৪শে অক্টোবরের পর আমরা শান্ত আছি। সেভাষ্টাপোল চমৎকার লাগছে। শত্রু আর গুলী করছে না—তারা সেভাষ্টাপোল আর নিতে পারবে না, সে কাজ তাদের পক্ষে অসম্ভব। আমি এখনও যুদ্ধের সামনে গিয়ে কাজ করি নাই, কিন্তু এই গৌরবের দিনে যারা সামনে গিয়ে যুদ্ধ করছে তাদের দেখছি, তাই আমার সৌভাগ্য। ৫ই নবেম্বরের যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। ১৫০০ কামান দু'দিন ধরে অবিরাম আক্রমণ করে চলেছিল। সেভাষ্টাপোল তাতে পরাজিত ত হয়ই নি এমন কি

আমাদের সুরক্ষিত কামানশ্রেণী এবং সৈন্য ও রসদসম্ভার দুইশত ভাগের একভাগও নষ্ট করতে পারে নি। শত্রুপক্ষ কিন্তু সকল বিষয়ে আমাদের চেয়ে উন্নত ছিল।

যখন আমি ফ্রন্টিয়ারের বাইরে ছিলাম তখন ছিলাম রুগ্ন, একা, দরিদ্র। ফ্রন্টিয়ারের এদিকে এসে আমি ভাল আছি, ভাল বন্ধু পেয়েছি, কিন্তু টাকাগুলি যেন ফস্কে পালিয়ে যায়।

সেই সময় একটি সামরিক সংবাদপত্র প্রকাশ করবার অনুমতি সম্রাট দেন নি। তাতে টলষ্টয় খুবই মনঃক্ষুণ্ণ ও নিরাশ হয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনাও বদলে গেল। তিনি আণ্টি টাটিয়ানাকে লিখলেন—ক্রিমিয়ার যুদ্ধ যদি ভালভাবে শেষ হয় এবং আমার পছন্দমত ভাবে যদি আমাকে নিয়োগ করা না হয় এবং রাশিয়াতে যদি যুদ্ধ না থাকে তবে আমি সেনাবিভাগ ছেড়ে দেব এবং পিটার্সবার্গে গিয়ে মিলিটারী একাডেমিতে যোগদান করব। কারণ আমি সাহিত্যসেবা ছাড়তে চাই না, ক্যাম্প-জীবনে তা অসম্ভব। তা ছাড়া আমি কিছু মঙ্গলকর কাজ করতে চাই, শুভব্রতী হ'তে চাই।

১১ই মার্চ গর্চাকভ সেভাষ্টাপোল এলেন। তিনি টলষ্টয়ের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলেন কিন্তু তাঁকে ষ্টাফ-এর পদে উন্নীত করা সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিতে পারলেন না।

১লা এপ্রিল বোমাবিধ্বংস হবার সময় টলষ্টয়দের সেনাবাহিনীকে সেভাষ্টাপোলে আবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে ১৫ই মে পর্যন্ত তাঁকে বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে থাকতে হয়। তিনি তখন চতুর্থ বুরুজের (Fourth Bastion) ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। এই বুরুজকে সেভাষ্টাপোলের দক্ষিণতম স্থানে পাঠান হয়। সেটা ছিল আত্মরক্ষার পক্ষে তখন বিপদের চরমসীমায়। কিন্তু টলষ্টয়ের ভাল লাগছিল বসন্ত ঋতুটা এবং নিজের লোকেদের। অত বড় সংকটের সময়েও ঐ ছয়টা সপ্তাহ তাঁর স্মৃতির একটা মধুরতম সময় মনে হয়েছিল। তারপরে তাঁকে ১৪ মাইল দূরে বেলবেক্ নামক স্থানে পাহাড়ের ওপর যুদ্ধ করবার জন্য একটা দলের ভার দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে গিয়েও তাঁর খুবই ভাল লাগছিল।

টলষ্টয় 'কন্‌টেম্‌পোরারি' নামক পত্রিকায় লিখেছিলেন, '১৮৫৪ সালের ডিসেম্বরে সেভাষ্টাপোল (Sevastápole in December 1854)।' এই প্রবন্ধে সেই সময় সেভাষ্টাপোলে চতুর্থ বরুজের যুদ্ধ-কাহিনী তিনি জলন্ত ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন। এক জায়গায় লিখেছেন—বিপদবরণ করার একটা অবিরাম মোহ আছে, যে সৈন্যদের এবং নাবিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন তাদের দেখতে এবং লক্ষ্য করতে তাঁর ভাল লাগত, যুদ্ধের শৃঙ্খলা ও পদ্ধতি সবই তাঁর এত ভাল লাগত যে, ওখানটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করত না। বিশেষ ক'রে তাঁর ভাল লাগত যেখানে আক্রমণ ও হতাহত হ'ত সেখানে নিজে উপস্থিত থাকতে।

এই যুদ্ধের পরে একদিন অফিসারগণ আগুনের চারিদিকে ঘিরে বসে গল্প করছিলেন। একজন প্রস্তাব করলেন, ষ্টাফ অফিসারগণ সঙ্গীত রচনা করবেন। সকলেই একটি করে কবিতা লিখবেন।

কবিতা লিখলেন অনেকেই, হ'ল যাচ্ছেতাই। তার পরদিন টলষ্টয় নিজে রচনা ক'রে একটা কবিতা পড়ে শোনাতে লাগলেন। সকলে গানটা লুফে নিলেন, তাঁরা গাইতেই আরম্ভ করলেন। দেখতে দেখতে সে গান সমস্ত সেনাবাহিনীতে মুখে মুখে ফিরতে লাগল গানের সুরে। এমন কি সমগ্র রাশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ল গানের কপিগুলি।

আক্রমণের দিন সমাপ্ত হয়ে আসছিল। টলষ্টয় চেয়েছিলেন সেভাষ্টাপোল যেতে। সে অনুযায়ী তাঁকে ২৭শে আগষ্ট সেখানে রেডষ্টেড-এর উত্তরে ষ্টার ফোর্টে পৌঁছতে হয়। ঠিক সেই সময় ফরাসীরা মালাখভ দখল ক'রে নেয়।

মালাখভ দখল হয়ে যাবার পর সেভাষ্টাপোল রক্ষা করা আর সম্ভব ছিল না। পরদিন রাত্রে রাশিয়ানগণ নিজেরাই সেভাষ্টাপোলে আগুন লাগিয়ে দেন। যে-সমস্ত যুদ্ধরসদ সরিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না তা তাঁরা পুড়িয়ে দিতে থাকেন। মিত্রপক্ষের হাতে শহরটা ছেড়ে দেবার আগে টলষ্টয়ের ওপর পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বুরুজ সাফ ক'রে দেবার ভার ছিল। যখন এই ধ্বংসলীলা চলছিল রুশ শক্তি তখন সাময়িক ভাবে তৈরী একটা পোল দিয়ে রেড্‌ষ্টেড্‌ পার হয়ে ওপারে চলে যায়। সেভাষ্টাপোলের উত্তরে গিয়ে রাশিয়ানগণ আত্মরক্ষার ক্ষেত্র রচনা করেন। সেখানেই তাঁরা অবস্থান করতে থাকেন যতক্ষণ না সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধি হয় ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর টলষ্টয় আণ্টি টাটিয়ানাকে লিখলেন, ২৭শে আগষ্ট সেভাষ্টাপোলে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। আক্রমণের দিনই আমাকে সেই শহরে পৌঁছতে হয়

এবং সেখানকার কাজে ইচ্ছা করেই আমি অংশগ্রহণ করি। ২৮ তারিখটা ছিল আমার জন্মদিন। জন্মদিনে শোক এবং স্মরণীয় ঘটনা ঘটল এই আমার দ্বিতীয়বার। প্রথমবার আমার এক কাকিমা মারা যান। সেভাষ্টাপোলের পতন হচ্ছে দ্বিতীয়। যখন দেখলাম শহরটাতে আগুন জলছে এবং আমাদের বুরুজের ওপর ফরাসী-পতাকা উড়ছে তখন আমি কেঁদেছিলাম। এটা গভীর শোকের দিন ছিল।

পশ্চাদপসরণের পর টলষ্টয়ের উপর ভার ছিল আর্টিলারী কমাণ্ডারদের নিকট থেকে সংগ্রহ ক'রে প্রায় কুড়িটি রিপোর্ট লিখে দেওয়া। মিথ্যায় সাজিয়ে যুদ্ধের ইতিহাস লেখার উপর তাঁর এখান থেকেই ঘৃণা ধ'রে যায়। সেনাপতির আদেশে লিখতে হয় যা ঘটে নি তাই।

টলষ্টয় যে রিপোর্ট লিখলেন সেই রিপোর্টসহ তাঁকে বার্তাবহ হিসাবে পিটার্সবার্গে পাঠান হয় অক্টোবরের শেষে। এখানেই যুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেষ হয়। টার্কি এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তাঁর দেড় বছর কাটে, ককেশাস ছিলেন তিনি দুই বছর।

এণ্ডারসনের একটা গল্পে আছে যে, পোষাক পরিচ্ছদহীন রাজাকে যখন তাঁর মোসাহেবদল চমৎকার পোষাক পরিহিত আছেন বলে তারিফ করছিল তখন একটি শিশু বলে ওঠে, রাজা কেন উলঙ্গ আছেন? টলষ্টয়ও ঠিক সেই শিশুরই মত নিজের চোখ খুলে দেখবার এবং প্রকাশ করবার ক্ষমতা রাখতেন। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর সত্যকথা বলবার মহান্ দৃঢ়তা। এই কারণেই তাঁর যুগেই তিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হ'তে পেরেছিলেন। নিজের দ্বিধা সত্ত্বেও এবং সেন্সারের কাটাকাটি সত্ত্বেও সে সময়ে ফরাসী এবং রুশ সৈনিকগণ যে বন্ধুর মত একত্র হয়ে মৃতদের সমাধিস্থ করেছিলেন সেই কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি একটা গল্পের এক জায়গায় লিখেছিলেন :—বুরুজে সাদা পতাকা উড়ছে, পুষ্পময় উপত্যকা মৃতদেহে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। নীল সমুদ্রে সূর্য আপন মহিমায় ডুবে যাচ্ছে। সমুদ্রের তরঙ্গ সূর্যের সোনালী কিরণে ঝলমল্ করছে। হাজার হাজার লোক পরস্পরকে দেখছে, হাসছে, কথা বলছে। যে ক্রীশ্চানগণ প্রেম ও ত্যাগকে সত্য বলে স্বীকার করে তারাই আজ এখানে দেখছে, তারা কি করেছে। যে ভগবান তাদের প্রত্যেককে জীবনদান করেছেন, মৃত্যুভয় দিয়েছেন, হৃদয়ে ভালবাসা দিয়েছেন যেন তারা কল্যাণ ও সুন্দরকে ভালবাসে সেই ভগবানের কাছে তারা কিন্তু নতজানু হয়ে আজ অনুশোচনা জানাচ্ছে না, তারা আজ আনন্দাশ্রু নিয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গনও করছে না।

সাদা পতাকা নামিয়ে দেওয়া হ'ল, আবার মৃত্যু ও যাতনার ইঞ্জিন চলছে, আবার নিষ্পাপের রক্ত বয়ে যাচ্ছে, আকাশ-বাতাস শোক ও অভিশাপের ক্রন্দনে ভরে যাচ্ছে।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পরে টলষ্টয় তাঁর যুদ্ধের এক বন্ধুর লিখিত "সেভাষ্টাপোলের স্মৃতি" নামক পুস্তকের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের একজন যুবক অফিসার সম্বন্ধে টলষ্টয় সেই ভূমিকায় লিখেছেন—যুবক অফিসার বলছে না যে, সে মিত্রপক্ষকে সেই রকম ঘৃণা করত যেমন করে আগেকার দিনে জু-গণ ফিলিষ্টাইনদের ঘৃণা করত। বরং কখনও কখনও দেখা যায় তাদের প্রতি তার ভ্রাতৃসুলভ সহানুভূতি আছে। সে একথাও বলছে না যে, জেরুজালেমের গির্জার চাবি আমাদের হাতে থাকা চাই অথবা আমাদের নৌবাহিনী থাকবে কি থাকবে না সে কথাও সে বলছে না। তার পক্ষে মানুষের জীবন-মৃত্যু রাজনীতির প্রশ্নের সঙ্গে সমানুপাতিক নয়।

কেন সে একাজ করেছিল তার উত্তরে এখানে টলষ্টয় বলেছেন—আমি যখন অল্প বয়সের ছিলাম তখন যুদ্ধের আগেই আমি যুদ্ধে নাম লিখিয়েছিলাম, কারণ আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। আমি এমন একটা জায়গায় গিয়ে পিছলে পড়লাম যেখান থেকে বেরিয়ে আসতে আমার ভীষণ কষ্ট করতে হয়েছিল। সেখানে আমি একটা জালে জড়িয়ে পড়েছিলাম এবং আমাকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক কাজ করতে বাধ্য হ'তে হয়েছিল—যারা আমার কোন অনিষ্ট করে নি সেই ভাইদের আমার হত্যা করতে হয়েছিল, শাস্তি এবং লজ্জা থেকে বাঁচবার জন্ম আমাকে একাজ করতে হয়েছিল। এই বইখানা (যে বই-এর ভূমিকা লিখছেন) পড়বার সময় মনে হয় লেখক জানেন যে, ভগবানের একটা বিধান আছে, প্রতিবেশীকে ভালবাস, তাকে হত্যা ক'রো না। এই বিধান মানুষের কৌশল দ্বারা রদ করা যায় না।

বইখানিতে যাতনা এবং মৃত্যুর বর্ণনা আছে। কিন্তু একথা নেই, কিসের জন্য এটা হয়। পঁয়ত্রিশ বছর আগে তা যদিও বা ভাল ছিল আজ কিন্তু আরও অন্তকিছু প্রয়োজন। আমাদের জানতে হবে কিসের জন্ম

সৈনিকগণ যাতনা এবং মৃত্যুবরণ করবে— আমরা সেকথা জানব এবং বুঝব। সেই মূল কারণ আমরা ধ্বংস করব।

লোকে বলে, যুদ্ধ জিনিষটা আঘাত, রক্তপাত ও মৃত্যু নিয়ে অতি ভয়ঙ্কর। আমাদের রেড ক্রশ গড়ে তোলা উচিত এসবের যাতনা কমাবার জন্ত। কিন্তু আমি মনে করি আঘাত, যাতনা ও মৃত্যু যুদ্ধের ভয়ঙ্কর জিনিষ নয়। মনুষ্যজাতি চিরদিন যাতনা ও মৃত্যু বরণ করতে অভ্যস্ত। যুদ্ধ ছাড়াও দুর্ভিক্ষে, বন্তায়, মড়কে লোকে মরে। যাতনা এবং মৃত্যু নিজে ভয়ঙ্কর নয়, ভয়ঙ্কর হচ্ছে সেই কারণটা যে-কারণে মানুষ অন্তের যাতনা ও মৃত্যু ঘটায়।

মানুষের শারীরিক যাতনা, অঙ্গচ্ছেদ অথবা মৃত্যু হ্রাস করার প্রয়োজন নেই—বন্ধ করতে হবে মানুষের অন্তরাত্মার মৃত্যুর। রেড ক্রশের দরকার নেই, দরকার যীশুর সাধারণ ক্রশ যা মিথ্যা এবং প্রতারণাকে ধ্বংস করবে।

এই ভূমিকা যখন আমি শেষ করতে যাচ্ছি তখন একটি সৈনিক যুবক এসে আমার সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে নানা আলোচনা করে। তারপর তাকে আমি মদ পান না করতে উপদেশ দেই। যুবকটি উত্তর দিল, 'মিলিটারীতে অনেক সময় এটা প্রয়োজন হয়।' আমি ভাবলাম শরীরের শক্তির জন্ত বুঝি বলছে। আমি নিজের অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞান দিয়ে বুঝিয়ে দেব ভাবলাম। কিন্তু যুবকটি বলে, গেকটেপে নামক স্থানের অধিবাসীদের যখন নির্মমভাবে হত্যা করতে হয়েছিল তখন তার সৈন্তরা, তা করতে চায় নাই। সেই সময় সে সৈন্তদের মদ পান করিয়ে তারপর কাজ......। এখানেই আছে যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা বেশী ভয়ঙ্করতা—অল্প বয়সের এই বালকের মুখে আছে তার চিহ্ন, আছে তার স্কন্ধের চামড়ার বন্ধনীতে, তার পরিষ্কার বুটের ওপর, তার সরল চোখে—জীবন সম্বন্ধে তার এই বিকৃত ধারণা।

এখানেই আছে যুদ্ধের প্রকৃত ভয়ঙ্করতা। যে ক্ষত যুবকের ঐ মন্তব্যের মধ্যে পতঙ্গের পালের মত ছড়িয়ে আছে তা লক্ষ লক্ষ রেড ক্রশ কর্মীরা কেমন করে আরোগ্য করবে? সেটা যে সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতির পরিণতি!

(৪)

১৮৫৬ সালের ২০শে নভেম্বর টলষ্টয় সেনাবিভাগ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর রচনাবলীর কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলতে থাকে।

জাতক

শ্রীদীপংকর চক্রবর্তী

প্রণব মনে মনেই বলল, "অন্ধকারই ভাল। এর মধ্যে শান্তি আছে, স্বস্তি আছে।" রূঢ় আলোক যেন ইঁদুরের মত তার বুক কুরে কুরে খায়। আমি অন্ধকারেই থাকব। আলো, তুমি আমার চোখে অস্ত্র হয়ে পড়ো না; পৃথিবী, তোমার আকাশ তোমার তারা তোমার মাটি ফলফুল গাছ-পাতা ঘাস আমাকে একটু ভোলাক, ভোলাক। না, একটা অসোয়াস্তির সুর বেজে উঠল প্রণবের আহত মনটায়। এই ত সারাদিন খাটাখাটুনির পর ঘরে ফিরেছি। এ সংসারে ঔদাসীন্যের ফল মারাত্মক। প্রেম প্রীতি স্নেহ দয়ামায়া মমতা মনুষ্যত্ব ছাপার পাতায় যখন স্থান নিয়েছে, তবে কেন তাকে বার বার স্মরণ করি।

রাত হওয়াতে ঘরটা আস্তে আস্তে চুপ করে গিয়েছিল। একমাত্র শিয়রে ঘড়িটাই নির্ভয়ে শব্দ করছিল। ঘড়িটা ঠিক সময় দেয় না। কখনও চলে, কখনও চলে না। উবু করে রাখতে হয়। প্রণব চুপ করে শুয়েছিল। ভাবছিল, আবার তা হ'লে পাত্তাড়ি গোটাতে হবে। একটু যা সামান্য স্থান সংকুলান করলাম তাও টিঁকল না? শা-লা, না-নাইয়ার শতেক নাও। একটু চিন্তা করতে-না-করতেই হাসি পেল ওর। চিৎপুর থেকে দমদম, দমদম থেকে নিমতলা, নিমতলা থেকে মানিকতলা। এবার কোথায়, কোথায়—ভেবে পেল না সে। ভালই হ'ত যদি সেই ট্রেণ দুর্ঘটনায় মারা যেতাম। তবু মরতে কি ইচ্ছে করেছে তার কখনও? বাঁচার একটা আলাদা স্বাদ আছে, একটা ভিন্ন অভিজ্ঞতার তীব্র গন্ধ আছে। মরলেই ত সব শেষ। কিন্তু বেঁচে থেকে সমস্ত গলিঘুঁজি পার হওয়ার মধ্যে অনেক শক্তি, অনেক ধৈর্য, সাহস কষ্ট-সহিষ্ণুতা দরকার। কিন্তু আমি যে বেঁচে আছি একে কি বাঁচা বলে? ভাবল, কিপ্টে আর কাকে বলে। কিপ্টের উদাহরণ জিজ্ঞেস করলেই সে অজান্তেই বলতে পারবে বিনোদিনী মল্লিকের নাম। এতগুলো ঘর থাকতেও বুড়ী এই ড্রাইভারের ঘর থেকেও উঠিয়ে দিতে চাইল। কোন জানোয়ারের কাছে কি শুনেছে, না তাই বিশ্বেস করে দিব্যি সিদ্ধান্তে পৌঁছল। শালা বলে কি না এখানে মেয়ের ব্যবসা চলে। হারামজাদা, মেয়ে পটানোর আর জায়গা পেলি না, তোরা অসৎ ব্যবহারের মতলবে আছিস্। ও মেয়ে মালতী, আর ছোট্ট খুকিটি নেই, ও যাবে না, যাবে না। ভাবতে ভাবতে মাথা তেতে উঠল প্রণবের।

প্রণব একটা জ্বালা অনুভব করল বুকের গভীরে।

যে লণ্ঠনটার বুকের আগুন প্রণব ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছে, প্রণব আর তাকে দেখতে পেল না। কারণ অন্ধকারে সব সমান, কালো পর্দার গায়ে সব কিছু যেন অদৃশ্য ছবি হয়ে দাঁড়ায়। প্রণব বুঝতে পারল, কুলিগুলো হৈ-হল্লা করে ঘুমিয়েছে। চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে রামা-হৈ-এর কি পুনরাবৃত্তি। দুঃসহ। যে লোকটা অনেক রাত পর্যন্ত মেশিনের শব্দ করে জামা-প্যাণ্ট-ব্লাউজ তৈরি করে, সেও ঘুমিয়ে পড়েছে। তবু এখনও কেন ওর ঘুম এল না? ঘুম, ঘুম, ঘুম। কে বলছে, প্রণব ঘুমোস্ নে; কে বলছে, কাজ কর কাজ কর, কে বললে, প্রণব, আমরাও একদিন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আর জাগতে পারি নি—ওরা জাগতে দেয় নি; প্রণব, তুমি আমাদের জাগাবে? অন্ধকারটা প্রণবের সামনে পাক খেতে লাগল। প্রণব অনুভব করল, কারা যেন তার সামনে ভিড় করছে, বিক্ষোভও জানাচ্ছে—প্রণব শুনতে পারছে না। প্রণব এবার নিজেকে আরও দৃঢ় করতে চেষ্টা করল, হীরের মতন কঠিন।

একটা সিগ্রেট ধরালে বেশ হয়, ভাবল প্রণব। চার্মিনারের প্যাকেটটা বালিশের পাশ থেকে হাতে উঠিয়ে নিল। প্যাকেটটা খুলে একটা সিগ্রেট ধরাল। একটা মাত্রই আছে। বালিশের তলায় হাত দিল। একটা বিড়িও নেই। দুস্ শা-লা। বিরক্তিতে সারা গা জ্বলে উঠল তার। একটা দেশলাইর কাঠি বার করল প্রণব। বারুদের একটু গন্ধও পেল সে। প্রণব কাঠিটা দেশলাইর বারুদে ঘষল। একটা শব্দ করে আগুনটা দমকা চিন্তার মত জ্বলে উঠল। প্রণব সিগ্রেট ধরাল। অন্ধকারের মধ্যে আলোর ঈষৎ অনুভূতি এখন একটু ভালই লাগল প্রণবের। প্রণব ফুঁ দিয়ে আগুন নেভাল। কাঠিটা খানিকটা পুড়ে ছাই হল।

প্রণব চেয়ে চেয়ে দেখল। অন্ধকারে, এই চায়দেয়ালের অন্ধকারে, এই আগুন, সিগ্রেট আগুনটা তখন কিরকম অস্পষ্ট উজ্জ্বল সুন্দর মনে হ'ল প্রণবের।

প্রকাশ করতে না পারার জ্বালায় যারা ভোগে, তাদের কথা ভাবতে গেলে প্রণব কষ্ট পায়। মা। মাকে সে সেই ছোট থেকে দেখে আসছে, মা স্বল্পভাষী, পূজা-আরচা নিয়ে দিন কাটে, হয়ত বা তা দিয়ে নিজেকে ভুলতেও চায়। মা'র কথা মনে পড়তেই মনে পড়ল, ছবি ভাসল : মা'র পরনে থান কাপড়, গায়ের তামাটে রং, করুণ চিন্তাগ্রস্ত মুখ এবং যে পরের বাড়ীতে কাজ করে পেট চালায়, তাকে। অন্য এক মহিলা যেন তখন মনে হয় মাকে। মাকে দেখতে যেতে হবে, ভাবল প্রণব, অসুখ হয়েছে রাঁধুনীর। বাড়ীর লোকের দায় পড়েছে সেবা করতে। না, সাগু-বার্লি দেবে নিশ্চয়ই। মা'র শুকনো মুখটা চকিতে মনে পড়ল একবার। আশ্চর্য, বাবা মারা যাবার পর মা'র মুখে হাসি দেখি নি। হাসে নি ঠিক নয়, যেটুকু তা সৌজন্যের হাসি, যা ভদ্রসমাজে রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত,—এ ছাড়া তাকে আর বেশী বলা চলে না। হাসির শ্রেণীভাগ করলে মা'র হাসিকে যে তার কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায় ভাবতে গেলে অন্তত বেকুব বনবে প্রণব, সব গোলমেলে ঠেকে তার। তবে এটা নিশ্চিত, ক্ষোভ দুঃখ ব্যথা, বিদ্রোহ, অথচ নিষ্ফলতা—সব কিছু মিলিয়ে ঐ হাসিটা তৈরি। —মা তোমার কোলে মরা ছেলে, তুমি কাঁদ।

মা'র কথা ভাবতে ভাবতে বোন দুটোর কথাও মনে পড়ল তার। বোধ দুটো এখন ছোট, ফুল হয়ে ফুটেছিল, স্থির, কিন্তু ফুল শুকিয়ে শুকনো পাতা এখন। ও কি ফুলের চেহারা? তবু অভাব ওদের চেতনার প্রত্যক্ষে ভীষণ রূপ নিয়ে গলা জাপ্‌টে এখনও ধরে নি, তাই এখনও ওরা হাসে, হাসতে পারে। প্রণব নিজে প্রাণ খুলে হাসতে না পারলেও প্রাণখোলা হাসিকে বরদাস্ত করে; যারা হাসে তাদের না ভালবেসে পারে না। শৈশবটা বেশ, দিব্যি ঔদাসীন্য কল্পনায় কল্পনায় দিনরাত্রি প্রহর কাল ঘন্টাগুলো কাটান যায়। বিনু অনু স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নের কথা বলে। ওরা এখনও বুঝতে শেখে নি, ঐ দেশে সব রাজপুত্র রাজকন্যে, ওরা তাদের পাবে না—'জলবি, জলবি, তিলে তিলে জলবি, ভুলে যাবি', যেমন প্রণব ভুলেছে। দুখের ছেলেও যে নির্জলা সত্য বোঝে। স্বপ্ন-টপ্নের কথা শুনলে প্রণব চেঁচিয়ে ওঠে, রাগে অসন্তোষে। 'স্বপ্ন তুমি আমায় পথ ভুলিয়েছিলে।' কৈশোরের দিনগুলো তাই অতীতের জীর্ণ ইতিহাসের সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে, আসল এই অন্যায় জীবনে তার কোন দাম নেই। এই ত তার অবস্থা। এই ভাঙ্গা ঘর—সে জীবন কাটায় উপবাসে, অর্ধ উপবাসে, ছেঁড়া চটি, ছেঁড়া জামা নিয়ে। একরকম তাই। ভাগ হ'ল দেশ। মহাজনের আশ্বাসের পরিণতি ত শেয়ালদা স্টেশন, ক্যাম্প আর বস্তি। 'বাবা মরে গিয়ে তুমি বেঁচে গেছ। বাঁচলে তোমাকেও শেয়ালদা স্টেশনে কাটাতে হ'ত, দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাঃ চ্যাটার্জিকে কেউ পুছত না, বরং তুমি নিহত হ'তে বাবা, ঐ দাংগাতেই।' ভাবতে ভাবতে বুকে জ্বালা ধরে প্রণবের।

গরীব মেয়ের আবার আব্দার কি? নিজের ওপর তীব্র রাগে প্রণব ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। অনু বিনু আব্দার করে, সামান্য, তাই রাখতে পারি না, দাদা হয়ে এর চেয়ে লজ্জার কি আছে। অনুর আব্দার, (একটু ভাবলেই বলা চলে, আংশিক বাদ দিয়ে সবটাই প্রয়োজন) মেটানো সম্ভব নয় আমার। পয়সা কই যে বই-পেন্সিল কিনে দেব। অথচ একটু যত্ন নিলে অনুটা বেশ ভাল হ'ত। বাবার ব্রেন ও পেয়েছে। ভাবতে ভাবতে অনু বিনুর মুখ ভেসে উঠল প্রণবের চোখের সামনে। তার পর গোটা শরীর। উঃ কি চেহারা, আমসি, মেরে গেছে। ছোটবেলাকার ছবিগুলো দেখে অনু বিনু দুজনেই হো হো করে হেসে ওঠে, বিশ্বেসই হয় না ওদের। ধ্যেৎ, তুমি কাদের ফটো এনে আমাদের বলে চালাচ্ছ। আবার কৌতূহলও জন্মে। প্রণব বলেছিল, মাকে জিজ্ঞেস করিস মা ত আর মিছে বলবে না। ছোট্ট উত্তর দিয়ে বিনু চুপ করেছিল সেদিন, 'আমরা নই' এবং এও মনে মনে বলেছিল, দেখো দাদা আমরা অনেক বড় হব।'

প্রণব ভাবল, ভেবে তার বড় আশ্চর্য লাগল, ঐ কচি মেয়ে দুটো ত কম পরিশ্রম করতে পারে না—আশ্রমের ডিউটি, নানান একাজ-সেকাজ, পড়া, টুকিটাকি কত কিছু। এইটুকুন মেয়ে কত ধকল সইবে। নিজেরাই পিষে ঘাস হয়ে যাচ্ছি। মা বলেছিল, খোকা, আর টিউশনি করে কতদিন চালাবি, এবার একটা চাকরি-বাকরি দেখ্ বাবা। কি ভাগ্যটাই না করেছিলাম বাপু, শেষে পরের বাড়ীতে রান্না করা, ঝি-গিরি, সেও ভাগ্যে ছিল। কতবার বলেছে তাকে, যা না, একবার কাকাদের কাছে, যেয়ে দেখ না। বড়লোক তারা, কিছু করে

দিতে পারবে। এক মায়ের পেটের ভাই। প্রণব যায় নি। চিঠি লিখেছিল নেহাৎ মায়ের অনুরোধে, উত্তর পায় নি। অন্য লোক মারফৎ তারা প্রণবের আসার খবর পেয়েছিল, খোঁজ নেয় নি। বেহায়া নির্লজ্জের মত সেই বা যাবে কেন? গরীব আত্মীয় ঘৃণার যোগ্য। মা'র মুখে হাসি ফোটাতে আমিও ত চেয়েছিলাম। আমিও কি চাই মায়ের চোখের জল দেখতে, মাকে বোনকে নিরানন্দ অভাবগ্রস্ত দেখতে? প্রণব নিজের সম্বন্ধে সচেতন বলেই, আবেগে দুঃখের সামনেও স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। অর্থহীন পরিকল্পনা সে করে না, কারণ, সে জানে, কৌশলে তা ঠকায়। ভাবতে ভাবতে ঘরটাকে আরও অন্ধকার মনে হয় প্রণবের। শিং মাছের মত অন্ধকারটা কাতরাতে থাকে, গায়ের মত পিচ্ছিল মনে হয় অন্ধকারটা। প্রণব সিগ্রেট টানে।

সিগ্রেট টেনে মুখ থেকে ধোঁয়া ছাড়ল প্রণব। সিগ্রেটের মুখে আগুন। প্রণব আবার মশারির ভেতর থেকে ঘরটা আবছা আবছা দেখতে পেল। প্রণব সিগ্রেটটায় সুখটান দিয়ে শেষ অংশটা এবার মশারির বাইরে দেয়ালের কোণে ছুঁড়ে দিল।

প্রণব নিজেকে ভুলতে চেষ্টা করল, নিজের চিন্তাগুলোকে দুমড়ান নেকড়ার, রাংতার পুতুলের মত মনে হ'ল। মনে হ'ল ওরা সব ভিজে কাগজের নৌকো।

প্রণব এবার নিজেকে, নিজের চিন্তাকে, তার ঘর, তার পরিবেশ, আগামী, অতীত, ভবিষ্যৎ সবটাই তার মগজ থেকে সরিয়ে আলাদা করতে চাইল। দ্বিতীয় প্রণব হ'তে পারলে আজ তার অনেক ভাল হ'ত, খুব বেশি না হ'লেও স্বস্তি পেত সে ঘণ্টা কয়ের জন্যে।

কিন্তু প্রণব নিজেকে ভুলতে পারল না। একটা ভুলে-যাওয়া ফুলের গন্ধের মত সুতপাকে মনে পড়ল প্রণবের। বিচিত্র চিন্তার ভিড়ে, ঘোলাটে ঘুমের রাতে, এ অস্থির ঘরে। সুতপা, সুতপা। বেশ কয়েকবার আওড়াল নামটা। সুতপার সঙ্গে তার আর যে কোন দিন দেখা হবে সেদিন সুতপাকে দেখার এক সেকেণ্ড আগেও তা ভাবতে পারে নি প্রণব।

সুতপার সঙ্গে যে আমার দেখা হবে কে ভেবেছিল? আমি?—না। আমি ত ভাবতেই পারি নি; বোধ করি সুতপাও না। 'চিনতে পারছেন?' এই প্রশ্নটাই প্রণবকে রাস্তার মাঝে অপ্রতিভ করে তুলেছিল। সুতপার তুষারের মত সাদা মুখখানাকে সেদিন প্রণব আবার নতুন করে চিনতে পারল—নতুন দৃষ্টিতে।

সুতপার গভীর সান্নিধ্যে আসার পরেই প্রণবের মনে প্রশ্ন জেগেছিল: প্রেম করা কি পাপ? প্রেম যদি পাপ হয় তবে মানুষ প্রেমে পড়ে কেন? প্রেম যদি অন্ধকার হয় তবে মানুষ প্রেম করে কেন? প্রেম যদি স্থূল মাংস-পিণ্ডের লুব্ধতার সমাহার অথবা নামান্তর মাত্র হয়, তবে প্রেমের সার্থকতা কোথায়? প্রণব ভাবল, এ প্রশ্নের উত্তর সে পেয়েছে কি না।

প্রণব ভাবল, প্রণব গুনগুনিয়ে গাইল: যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে।

প্রণব জেনেছে, অন্ধকারে জীবন নেই, প্রেম নেই, কিচ্ছু নেই। অন্ধকার অভিশাপ, অন্ধকার হতাশ, ব্যর্থতা, মরা চোখের মত অন্ধকার। সমাজ? অন্ধকার। প্রেম? অন্ধকার। জীবন? অন্ধকার। অন্ধকার থলথলে কাদার মত, জ্যাবজেবে ঘামের মত মনে লেপ্টে আছে। আমরা সবাই অথই অন্ধকারে ডুবে আছি। আমরা সূর্য আছে জানি, সূর্য দেখি না, দেখতে পাই না; দরজা জানালা আকাশ আমাদের চোখের আড়ালে; আমাদের মুক্তির পথ নেই, আমাদের চারদিকে দেড় ইঞ্চি কারাকে কাঁটাতারের বেড়া, প্রতিদিনের সংগ্রামে আমাদের বহু-শ্রমে সঞ্চিত রক্ত ঝরে পড়ছে। আমরা দিনের পর দিন অন্ধকারে ডুবছি। আমাদের সূর্য নেই, জীবনে আলো নেই, আমরা বন্দী, কয়েদীর অন্ধঘরে নিজেদের বন্দী রেখেছি।

মুক্তি?—পাব? ভাবল প্রণব। এ যুগ যে গর্ভ-যন্ত্রণার। এ যুগ বন্ধ্যা। নবজাতকের স্থান আছে? আছে। নবজাতক নেই। ঘর আছে? আছে। ঘরণী নেই। মা আছে, কোলে ছেলে নেই। প্রণবের চিন্তা প্রশ্নের আকার ধরল, মনে জাগল, প্রণব শুধাল: পৃথিবী, এ গর্ভযন্ত্রণার শেষ দিন কবে? উত্তর পেল না প্রণব। প্রণব আবার জিজ্ঞেস করল, এ গর্ভযন্ত্রণার কবে শেষ দিন? প্রণব উত্তর পেল না। প্রণব মৃদুস্বরে গলা বাজাল:

এখন আলোর স্ফটিকে কত নির্বাসিত মুখের ছায়া
তাদের সকলের রুদ্ধ শ্বাসের চাপে এই স্তব্ধতা কি
কাটবে না?

হে বন্ধ্যা, তোমার গর্ভে যন্ত্রণা একবার নড়ুক।

মা নিশ্চয়ই অমত করবে না সুতপাকে যদি আমি বিয়ে করি। অমত হওয়ার ত কোন কারণও নেই। সুতপা সুন্দরী। গোলযোগ মাত্র অসবর্ণ। এদ্দিনে মা'র গোঁড়ামি নিশ্চয়ই ভেঙে গেছে। আর যদি বা

কিছু থাকে তবে তা পরে ঠিক হয়ে যাবে। বুড়ো গাছকে উপড়ে এনে অন্য মাটিতে বাঁচান সম্ভব নয়।

ভেবে কূল পায় না প্রণব। সীতারামপুর থেকে চিঠি এসেছে মেজদির। ক্যানসার হয়েছে। বাঁচবার আশা নেই। ভুলু, পল্টু, মিতার অসুখ। 'বিপদ আর সারবে না দেখছি।' একটা যেতে না যেতে আর একটা। প্রণব চট্ করে ভেবে নিল, সীতারামপুর যেতে অন্ততঃ দশটা টাকা দরকার। মেজটি এবার খরচ পাঠায় নি। বোধ হয় অসুখের জন্যে, খরচ পত্তর ত কম হচ্ছে না! তবে গেলে ঠিক দিয়ে দেবে। কিন্তু আগেই বা জোগাড় করবে কোত্থেকে? শহরে কে কাকে ধার দেয়? তবে ওখানে গেলে একটা চাকরি মিলতেও পারে। ভেবে প্রণব আরও গাঢ় চিন্তায় ডুবে গেল।

একটা নক্ষত্রও নিরাপদ নয়। খরচ হাঁ করেই থাকে, মুখ আর বন্ধ করে না। পেট আর পকেট, পকেট আর পেট। এ সমস্যাতেই জীবনটা গেল। মগজ, মন এ যেন ফালতো, বিলাসের সামগ্রী। নিজেকে যন্ত্র ভাবতে চকিতে কারও ভাল লাগলেও, প্রণবের গা রি রি করে। প্রণব দিশেহারা হয়ে ওঠে খরচের পরিমাণ দেখে। কুলোবে কেমন করে? কলেজে ছ'মাসের মাইনে বাকি। এ মাসে কানাইবাবুর কাছ থেকে বিশ টাকা ধার করেছে, শোধ দিতে হবে - তারপর ডাইংক্লিন, টেলারিং-এ বাকি। অসুর আব্দার, সীতারামপুর যাওয়ার খরচ, নিজের জামা-প্যাণ্ট ছিঁড়ে গেছে, বানাতে হবে; একটা আলোয়ান নেই, অল্প দাম দিয়েও একটা কেনা উচিত, নয় শীতকে ঠেকানো যাবে না। ছেঁড়া চটি। মাথা ঝিন ঝিন করে ওঠে প্রণবের।

প্রণব প্রস্তুত ছিল না। একটা কান্নার আওয়াজ পেল সে। কয়েকটা বাড়ী ডিঙিয়ে আওয়াজটা আসছে, মনে হ'ল। একটু কান পাতল প্রণব। এবার ঠিক বুঝতে পারল, স্ত্রীশাসন চলছে। এ অঞ্চলে এ কোন নতুন নয়। কেউ মদ খেয়ে মাঝরাতে এসে মাতলামি করে, বউকে মা'র; কেউ চুরি করে পালিয়ে এসেছে, রাত্রে পুলিসের ভ্যান আসে, হল্লা হয়। কখনও দারুণ তর্কাতর্কি গালাগালি খিস্তি মারামারি। গ্যাসের বাতির নীচে সেদিন শংকর আর পল্টিকে বড় বীভৎস মনে হয়েছিল প্রণবের। মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল পল্টির। শেষে তর্কাতাকর পর গজ বার করেছিল। পল্টি। ভাগ্যিস পুলিসের ভ্যান এসেছিল, নয়ত বেগতিক শংকরের জানটা খেয়ে নিত। ছবিটা আর একবার চোখের সামনে ভেসে উঠল প্রণবের। প্রণব ঘেমে উঠল।

আতঙ্কে ঘেমে উঠেছিল প্রণবের সারা শরীর। বাইরে অনেকগুলো পুরণো লোহালক্কর, খণ্ড খণ্ড হয়ে নির্বিকার পড়ে আছে। নজর একদিন কারও ছিল, এখন নেই। একটা কুকুর-মা অনেকগুলো বাচ্চা বিইয়েছে। ওদের এখনও চোখ ফোটে নি। ওদের চোখ না ফোটাই ভাল। এখন ওরা অন্ধকারে কেঁউ কেঁউ করছে, দুধের বাঁটে মুখ দেওয়ার জন্যে কাড়াকাড়ি চলছে। মা হওয়া বড় জ্বালা। হা ঈশ্বর, ওদের বাঁচিও।

রাত বাড়ে। শেয়ালের ডাক শোনা যায়। রাস্তাটার ওপারে খালের মালবাহী নৌকোগুলো থেকে থেকে গোঙিয়ে উঠছে। ট্রেণের খচাং খচাং খচ শব্দ, বাঁশিও মৃদু হয়ে বাজে যেন প্রণবের কানে। চিন্তে আর করতে পারে না প্রণব। বিছের কামড়ের মত বুকে কি যেন কামড় দেয়। করাতের ঘায়ে-পড়া কাঠের গুঁড়োর মত প্রণবের সব আশাগুলো যেন ঝরে ঝরে পড়ছে।

প্রণব আর চিন্তে করবে না। চিন্তে করতে করতে সে পাগল হয়ে যাবে। প্রণব পাশ ফিরে শুল। ঘুমোতে চাইল। ঘুম আসে না। ঘুম আসবে কি করে। বুকে জ্বালা, চোখে জ্বালা। মশারির মধ্যে অনেক মশা ঢুকেছে, কামড়াচ্ছে। নাকের কাছে কানের কাছে গুঞ্জন শুনতে পেল প্রণব। দু-একটা মারলও সে। 'একটুও নিশ্চিন্দি নেই'। ময়লা কাঁথাটা ভালভাবে গায়ে জড়িয়ে নিল প্রণব। পা গুটিয়ে নিল, শীত কম লাগবে। পাশের বিছানায় ড্রাইভারটা বেশ ঘুমুচ্ছে। কতক্ষণ ধরে নাক ডাকছে ওর। যত বিপদ্ কি তবে এই প্রণবেরই? দুশ্চিন্তা থাকলে কি কেউ দিব্যি এরকম ঘুমুতে পারে? টিনের বেড়ার নীচ দিয়ে ইঁদুর-গুলো রাস্তা থেকে এসে সারা ঘরে ছুটোছুটি করছে। পুষিটা জেগে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে মধ্যযুগীয় তেজী সেনাপতির মতন। মাঝে মাঝে তার রণহুঙ্কার শোনা যায়। হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাসটা ঢুকে প্রণবের কাঁপুনিটা আর একটু বাড়ল। চালের দিকেও কত ফুটো। একটা বেশ বড়। শুলে আকাশটা দেখতে কষ্ট হয় না প্রণবের। শুয়ে শুয়ে প্রণব আকাশ দেখে।

বাইরে অন্ধকার। তারা জ্বলে, নেভে। ঘুমুতে চাইল প্রণব।

দানাঅলা পুরো ভুট্টার গোছটার মত আজ মন্দিরটাকে মনে হয়েছিল প্রণবের। তার উঠোনে লাল-নীল রং-বেরং-এর মাছ। দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের ছবিগুলোকে মনে পড়ল। একটা মেলার সুন্দর ছবি—বিচিত্র লোক, বিচিত্র রং, বিচিত্র বেশ। দ্বিতীয়টি ক্রুশ-বিদ্ধ যীশুর—আর্ত। প্রণব ভাবল, এই চারটে দেয়াল তাকে কত জোরে বেঁধে রেখেছে, আষ্টেপৃষ্টে, প্রতিদিন এ চৌকিতে বসতে হয়, শুতে হয়। এ ঘরে আসতে হয়। যাবতীয় ব্যবহার্য সমস্ত কিছুর রাখার একমাত্র জায়গা ত এই ভাঙা ঘরটাই। অথচ এটাও তার নিজস্ব নয়।

একটা দিন এখন মনেও পড়ে। প্রণব চিন্তা করে না। চিন্তা করলেই সে উন্মনা পাগল হয়ে ওঠে। অসুখের খবর পেয়ে সকালে উঠেই প্রণব সুতপাকে দেখতে বেড়িয়েছিল বিবেকানন্দ রোডে। হন্‌হন্‌ করে পা চালিয়ে বাড়ীর সামনে এসেই প্রণবের শরীর, স্নায়ু সব কিছু হিম হয়ে গিয়েছিল। আঁতকে উঠেছিল প্রণব। কল্পনায়ও সে আনতে পারে নি। সুতপা, সুতপার মৃত্যু, সুতপা যে মরে গেছে, মারা যেতে পারে, প্রণব তা মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পারে নি। অথচ সে জানে মানুষ মরে, প্রতিদিন সংখ্যাতীত ভাবে মরছে। চারদিকে অন্ধকার ঠেকেছিল প্রণবের। স্বপ্ন-জীবন সাধ আকাঙ্ক্ষা কি সহজে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে। কত অল্প সময়ে। প্রণব সেদিন, সেখানে দাঁড়িয়ে বুঝতে পেরেছিল। সুতপা। মৃত্যু। শাবল দিয়ে কে যেন খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছিল প্রণবের বুকটা। এ যে ভেপসে মরার চেয়েও দারুণ, ভয়ঙ্কর, মর্মান্তিক। ব্লাষ্ট ফার্নেসে বরং তাকে ফেলে দিলে সে স্বস্তি পেত (মিছির যেমন মরেছে বার্ণপুরে)—ভাবল প্রণব।

ইচ্ছা সত্ত্বেও শবযাত্রার সঙ্গী হ'ল না সে। ভাবল, এখুনি নিশ্চই শ্মশানে নিয়ে যাবে সুতপার মৃতদেহটা। কিছুদূর এগিয়ে পার্কের বেঞ্চিতে বসে পড়ল। কি করবে ভেবে পেল না। মাথার শিরাগুলো টানটান হয়ে উঠেছে, চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে তার। 'সুতপাকে আমি ভালবেসেছিলাম, চলে গেল। সুতপা জীবনের প্রতি একটা মোহ, একটা নেশা ধরিয়ে-ছিল প্রণবের জীবনে, মনে। বাঁচবার চরম ইচ্ছেতেই প্রণব আরও লকড়ি জুগিয়েছিল, আগুন জ্বালিয়েছিল। এখন সে আগুনেই প্রণবকে পুড়তে হবে তিল তিল করে, বিন্দু বিন্দু করে। নিস্তার নেই। সুতপা নেই, তবে বেঁচে থেকে লাভ কি? কি নিয়ে বাঁচবে প্রণব? মা বোন তাদের নিয়ে? তাদেরই বা কতটুকু উপকার সে করেছে, করতে পারবে?

ঢং ঢং করে রাত তিনটে বাজে। ভাবতে আর পারে না প্রণব। বিনয়দার মতন লোকোশেডেই কাজ করবে সে। ক্লীনার, ফায়ারম্যান, ড্রাইভার কালিমাখা পোশাক, বেশ, তাই হবে সে, ফায়ারম্যানই হবে। কেউ তাকে চিনবে না, কালিঝুলিমাখা পোশাকে; কলকাতায় থাকবে না, বাইরে চলে যাবে, কলকাতা থেকে অনেক দূরে। পৃথিবীটা ত এই লোকোশেডেই রোজ নিজের রূপ নিচ্ছে।

মনে পড়ল, সেদিন বিনয়দার ডান-হাতটা পুড়ে ধক্‌ধক্‌ করছিল। প্রণবের বুকটাও যে পুড়ে ধক্‌ধক্‌ জ্বালা করছে, সারাক্ষণ, তা কি বিনয়দা খবর রাখে? বিনয়দাকে জিজ্ঞেস করাতে বলেছিল, 'নারে প্রণব, ওসব কিছু না, আমাদের সয়ে গেছে।' প্রণবেরও ইচ্ছে হয় সেও তার বুকের ভেতরের পোড়া ঘা-টা বিনয়দাকে দেখায়। দেখিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, 'দেখ বিনয়দা, বুকের ভেতর তাকিয়ে দ্যাখ, যদি তোমার গভীরে তাকাবার চোখ থাকে, পুড়ে খাক্‌ হয়ে গেল, এ বিরাট্‌ ঘা আর শুকোবে না।' কিন্তু কেমন করে তা দেখাবে প্রণব, কেমন করে?

প্রণব একদিন মফঃস্বলে একজিবিশনে গিয়েছিল। সে একজিবিশনে মৃত্যুঝাঁপই নাকি ছিল শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। মস্ত বড় একটা সিঁড়ি ছিল। সিঁড়িটা আকাশের দিকে ওঠান। উপরে ছিল দাঁড়াবার জায়গা। ঠিক নীচেই একটা কুয়ো। গায়ে পেট্রল লাগিয়ে আগুন জ্বালাত একটা লোক। তার পর আগুন যখন দাউদাউ করে জ্বলে উঠত, তখন সে মরণপণ করে ঝাঁপ দিত কুয়োয়। উঁচুতে লোকটা যখন আগুন জ্বালাত তখন আকাশটা লাল হ'ত, লোকের মুখে শংকা জাগত। তবু মৃত্যুঝাঁপ দেখতে যেত সবাই দু' আনার টিকিট কেটে। প্রণবের সামনে এ ছবিটা বরাবর ভেসে ওঠে, কিছুতেই ছবিটাকে মুছতে পারে না, যত মুছতে যায়, ততই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ক্ষুধিত জিহ্বা মেলে চিতার আগুনটা জ্বলছিল। প্রণব কখন এসে দাঁড়িয়েছিল খেয়াল নেই। সুতপার পোড়া খুলিটা পড়ে গিয়েছিল জ্বলন্ত কাঠগুলোর নীচে।

'যে যায় সেই বাঁচে, মরে আমিও যদি এই রকম বাঁচতাম।' বেঁচে এই বিবর্ণ কর্মক্লান্ত জীবনকে দেখবার বিলাস আর নেই। প্রণব তুমি মরবে? মরবে তুমি প্রণব? বেঁচে কি লাভ? দুঃখের তোড়ে ও ভাসচ, ভাসো, সমুদ্রে চল, মর তুমি প্রণব।

'আত্মহত্যা! হ্যাঁ, আত্মহত্যাই একমাত্র পথ তোমার।'

'মৃত্যু! হ্যাঁ, মৃত্যুই একমাত্র পথ তোমার।'

'জীবন! না, জীবন আমি চাই না।'

'ভালবাসা! না, ভালবাসা আমি চাই না।'

'পৃথিবী! না, পৃথিবী আমি চাই না।'

হঠাৎ সমস্ত আকাশ গঙ্গা ঘাট মানুষ চিন্তা জন্ম মৃত্যু আশা প্রেম হিংসা শান্তি মাথায় জট পাকিয়ে গেল; টাল খেতে লাগল চোখের সামনে।

কলেজে দেয়ালে টাঙানো মিশকালো বোর্ডটার মত মনে হ'ল এ পৃথিবীটাকে। তার ওপর কয়েকটা চকের সাদা সরু সরু কাঁপা কাঁপা দাগ। ছায়া-ছায়া চেতনায় মনে হ'ল, এ দাগগুলি পৃথিবীর ক্ষুধিত মানুষের হৃৎপিণ্ডের দাগ, ওদের বেঁচে থাকার স্বাক্ষর। 'আমার যে ক্লোরোফর্ম করা মরা ব্যাঙ।'

'মরে লাভ?' নিভন্ত পিদিমের শিখাটা বুকে জলছে। 'প্রণব, তুমি বাঁচবে না?' 'প্রণব, আমরা আবার ঘর বাঁধব, ভয় কি? তুমি আছ, আমি আছি।' 'প্রণব, তোকে যে বাঁচতে হবে, বাবা।' 'প্রণব, তুমি ভুল না মৃত্যু থেকে জীবন অনেক বড়, এর জন্যে লড়াই চাই।' মৃত্যুর মুখোমুখি অনেকগুলি উজ্জ্বল মুখ নাচতে লাগল।

প্রণবের মন আরও বিক্ষিপ্ত হ'ল।

নেপথ্যে প্রশ্ন উঠল, 'তোমরা সব ক্ষিপ্ত জুয়াড়ী, তাই বাঁচতে চাও।'

প্রণব উত্তর দিল: 'পরোয়া করি না, আমি বাঁচব, বাঁচতে চাই।'

—তোমার চারদিকে ষোড়শী মূর্তিদের তুমি বুঝি ভাবছ জীবনের একমাত্র আশা?

—ভাবলে দোষ কি? তবু বলছি, না।

—তোমরা সব স্বর্গের শিকার, তা তুমি জান?

—জানি।

—তবুও, জেনেশুনে মৃত্যুকে সামনে রেখেও তুমি বাঁচতে চাও?

—হ্যাঁ, আমি বাঁচব, মৃত্যুকে দুমড়ে হাতের মুঠোয় আনতে চাই।

ভূমিকম্পের মত নড়ে উঠল প্রণব। না, না, মৃত্যু নয়, আমি বাঁচব, বাঁচব—অনু, বিনু, মা, পৃথিবী আমি বাঁচব। আস্ত একটা জীবন চাই, একটুও যার ভাঙা নয়।

প্রণব হাঁপাতে লাগল। গায়ে শির শির একটানা একটা অনুভূতি প্রণব নিজের শরীরে অনুভব করল।

চারটের ঘণ্টা বাজল দূরের হস্টেলে। কয়েকটা কাক ডাকল। ভোর হাওয়ার আগে অন্ধকারটা যেন আরও ভারি হয়ে বাড়ীগুলোর ওপর ঝুলে পড়েছে।

—*—

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

খাদ্য সঙ্কট ও সরকারী অব্যবস্থিতচিত্ততা

খাদ্যসঙ্কট যেমন একদিকে উত্তরোত্তর ভয়াবহ পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে, তেমনি অন্যদিকে এই সঙ্কট উত্তীর্ণ হবার পথে সরকারী চিন্তার দৈন্য ও ব্যবস্থাপনায় অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দিনে দিনে অধিকতর প্রকট হয়ে উঠছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়ে সরকারী নীতি ও প্রয়োগের ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত কেবলই রদবদল হয়ে চলেছে।

আমরা পূর্ব্বেই এই প্রসঙ্গের একাধিকবার বিস্তৃত আলোচনা করেছি। বর্ত্তমান সঙ্কটের কারণ বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গেছে যে, এই পরিস্থিতি যতটা মূল্যসঙ্কটজনিত ততটা বাস্তবপক্ষে চাহিদার অনুপাতে সরবরাহে ঘাট্‌তিজনিত নয়। দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের যে সাংখ্যিক হিসাব সরকারী ঘোষণাসমূহ থেকে পাওয়া গেছে, সেটি যদি বাস্তব ও নির্ভর-যোগ্য হয় তবে একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হবে যে, দেশের সমগ্র ভোগ্যচাহিদার (consumption demand) অনুপাতে উৎপাদনে বাস্তবপক্ষে কোন ঘাট্‌তি নেই। বিশেষ পরিমাণ উদ্বৃত্তও অবশ্য নেই। সেই কারণেই দেশের সামগ্রিক মূল্যসঙ্কটের প্রকোপটি সমধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির উপরে বর্ত্তিয়েছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতির আকৃতি ও প্রকৃতি থেকে এই অনিবার্য্য সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হয় যে, কোথাও কোনপ্রকারে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের একটা বিশেষ অংশ দেশের মানুষের ভোগ থেকে সরিয়ে ফেলে খাদ্যশস্যের সরবরাহে ঘাটতি সম্পাদন ক'রে মুনাফা-বাজীর সুযোগ সৃষ্টি ক'রে নেওয়া হচ্ছে।

বস্তুতঃ দেশের শাসনসংস্থার বিশিষ্ট অধিকারীগণও এই অভিযোগ স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। প্রায় মাসাধিক কাল পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে স্বীকার করেন যে, তাঁর নিজের হিসাব মতন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বর্ত্তমান বৎসরে অন্ততঃ বিশ লক্ষ টন চাউল ভোগ থেকে সরিয়ে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী একটি ঘোষণায় বলেন যে, খাদ্যশস্যের মজুতদারেরা যদি তাঁদের অন্যায় ভাবে লুকিয়ে রাখা মজুত একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাজারে ছাড়েন তবে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হবে না এবং যে পুঁজির সাহায্যে তাঁরা এই মজুত করতে সমর্থ হয়েছেন, কি ক'রে সেই পুঁজি তাঁরা সংগ্রহ করেছেন সে সম্বন্ধেও কোন অনুসন্ধান করা হবে না। কিন্তু নির্দ্দিষ্টকালের মধ্যে যদি এই মজুত-করা খাদ্যশস্য বাজারে পৌঁছুতে সুরু না করে, তবে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী-নির্দ্দিষ্ট কালটি বহুদিন গত হয়ে গেছে, কিন্তু এই মজুত শস্য বাজারে ছাড়বার লক্ষণ আজও দেখা যায় নাই এবং এঁদের বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থারও পরিচয় পাওয়া যায় নি। এই রকম নিরর্থক ও নিষ্ফল হুমকি প্রচার ক'রে প্রধানমন্ত্রী কেবল যে নিজেকে সমগ্র দেশের জনগণের নিকট হাস্যাস্পদ ক'রে তুলেছেন শুধু তাই নয়, তাঁর এবং তাঁর অধীনস্থ শাসনসংস্থার গভীর অক্ষমতা সম্বন্ধেও তাঁরা উত্তরোত্তর নিঃসন্দেহ হয়ে উঠছেন। সম্প্রতি এই সম্পর্কে যে নূতন অর্ডিন্যান্স বা জরুরী আইন বিধিবদ্ধ ও প্রয়োগ করবার আয়োজন করা হয়েছে তার দ্বারা মূল অবস্থার যে কোন বিশেষ তারতম্য ঘটবে এমন আশা করবার মতন কোন কারণ ঘটে নি। নূতন জরুরী আইনের বলে যে অতিরিক্ত ক্ষমতা এখন সরকারের হস্তগত হয়েছে, তার চেয়ে বেশী ও ব্যাপক ক্ষমতা সরকারের উপরে দেশরক্ষা আইনের (Defence of India Rules) বলে পূর্ব্ব থেকে ন্যস্ত করা ছিল। সমাজবিরোধী খাদ্যশস্যের মজুতদার ও মুনাফা-বাজদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক প্রয়োগের কোনপ্রকার সদিচ্ছা যদি সরকারের থাকত তা হ'লে দেশরক্ষা আইনের প্রয়োগের

যায়া সেটি সহজেই সিদ্ধ করা চলত। সেটি তাঁরা করেন নাই। নূতন আইনে শাস্তির যে চরমতম ক্ষমতা গ্রহণ করা হয়েছে সেটি হাস্যকর রকমের সামান্যমাত্র। সরকার এবং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে খুব ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে যে, এই নূতন আইনের বলে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাজার বিরুদ্ধে কোন আপীলের ক্ষমতা থাকবে না। বস্তুতঃ দেশরক্ষা আইনের প্রয়োগের ফলে কারুর সাজা হ'লে তার বিরুদ্ধেও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আপীলের অধিকার নেই। তবু কেন যে এই প্রকারের একটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সাজার ব্যবস্থা-সম্বলিত নূতন আইনের প্রয়োজন ছিল সেটি সাধারণ লোকের বোধগম্য হয় না। এই ব্যবস্থা থেকে দেশের জনসাধারণের মনে এই সন্দেহ আরও দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে উঠছে যে তাঁদের প্রাণধারণের জন্য অবশ্যভোগ্য খাদ্যপণ্যাদি নিয়ে যারা মজুতদারী ও মুনাফাবাজী অবাধে করে চলেছেন, তাঁরা সরকারী মহলের বিশেষ অনুগ্রহপুষ্ট ও আশ্রিতগোষ্ঠী। এঁদের অন্যায় ও সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে সার্থক প্রয়োগের কোন সদিচ্ছা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারগুলির কখনও ছিল না, এখনও নাই। ইহা হয়ত স্বাভাবিক, কেননা ইঁহাদেরই অর্থানুকূল্যে কংগ্রেস দল আজ পর্য্যন্ত পর পর তিনবার প্রবল সংখ্যাধিক্যে ক্ষমতার গদী অধিকার ক'রে থাকতে সমর্থ হয়েছেন। ভবিষ্যতে আবারও এই গদী অধিকার ক'রে থাকতে হ'লে এঁদেরই বদান্যতার উপরে নিভর করতে হবে। অতএব এঁদের মুনাফাবাজী, সে যতই না দেশের জনসাধারণের পক্ষে প্রাণঘাতী হউক না কেন, কঠিন হাতে বন্ধ করবার মতন সৎসাহস ও ক্ষমতা বর্ত্তমান কংগ্রেস-অধ্যুষিত সরকারের নাই। তবু দেশের লোককে এঁদের সদিচ্ছার একটা প্রমাণ দেওয়া প্রয়োজন, কেননা যাহারই অর্থানুকূল্যে হউক না কেন, নির্বাচনবৈতরণী উত্তীর্ণ হইতে জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতা একান্ত প্রয়োজন। তাই নূতন জরুরী আইন প্রবর্ত্তন ও প্রয়োগের আয়োজন করে এই সদিচ্ছার প্রমাণ দেওয়া হ'ল। জনসাধারণের মনে বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কটে এমন একটা ধারণা ক্রমেই অধিকতর বদ্ধমূল হয়ে উঠছে।

বস্তুতঃ বর্ত্তমান সঙ্কটে সরকারী চিন্তা বা ব্যবস্থাপনার আজ পর্য্যন্ত যে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তাতে এমন একটা ধারণার যথেষ্ট কারণ আছে। সরকারী চিন্তাধারার যে প্রাথমিক প্রকাশ কয়েক মাস পূর্ব্বে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে দেখা গিয়েছিল, সেই সম্মেলনের প্রায় অব্যবহিত পর থেকেই তাতে রদবদলের ধারা সুরু হয়েছে এবং আজ পর্য্যন্ত এ সম্পর্কে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্ত এবং সার্থক প্রয়োগের পরিচয় পাওয়া যায় নি। প্রাথমিক সিদ্ধান্তে ঘোষণা করা হয়—(১) দেশের খাদ্যশস্যের ব্যবসায়টিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রে নেওয়া হবে; (২) দেশের খাদ্যোৎপাদক আয়োজনগুলিকেও (অর্থাৎ চাউলের কল ইত্যাদিকে) রাষ্ট্রাধিকারে নিয়ে আসা হবে; এবং (৩) দেশের সকল শহর ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে পূর্ণ র‍্যাশনিং অর্থাৎ সরকারী প্রয়োগে বণ্টন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হবে। এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার মাত্র কয়েকদিন পরেই কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের নীতিতে একটি মূল পরিবর্ত্তন ঘোষণা করেন। প্রথমতঃ, খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীকরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, দেশের সমগ্র খাদ্যশস্যের ব্যবসায়টি রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রে নেবার সঙ্গতি বর্ত্তমানে সরকারের নেই, অতএব এই ব্যবসায়টির একটা সামান্য অংশ মাত্র রাষ্ট্রাধিকারের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেওয়া হবে। এর দ্বারা এবং খাদ্যশস্যের মূল্যের নিম্নতম ও উচ্চতম হার নিয়ন্ত্রণ করে এই ক্ষেত্রে দেশের সমগ্র ব্যবসায়ের উপর যে প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হবে, তার ফলে খাদ্যশস্যের খোলা বাজারে মূল্যমান একটা নির্দ্দিষ্ট পরিধির মধ্যে সীমিত ক'রে রাখা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন। দ্বিতীয়তঃ, খাদ্যোৎপাদক শিল্পগুলির রাষ্ট্রীকরণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে চালু পুরাতন মিলগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রে নিয়ে খুব সুবিধা হবে না, রাষ্ট্রাধিকারে আধুনিক ধরনের কতকগুলি বৃহৎ মিল প্রতিষ্ঠা করবার আয়োজন করা হবে এবং বর্ত্তমানে চালু মিলগুলি যথাপূর্ব্বং ব্যক্তিগত অধিকারেই চালু থাকবে। শহর ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে পূর্ণ র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তন করবার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও বলা হয় যে, এই প্রয়োগ রাজ্য সরকারগুলির অভিমত-সাপেক্ষ।

বস্তুতঃ খাদ্যশস্য ব্যবসায়ের রাষ্ট্রীকরণ এবং র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তন সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বিরোধ ও মতভেদের লক্ষণ ইতিমধ্যে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মোটামুটি প্রচারে অন্যরকম বলা সত্ত্বেও বাস্তবপক্ষে দেশের খাদ্যনীতির একটা জাতীয় (national) স্বরূপ এখনও স্পষ্ট হচ্ছে

ওঠে নি। উদ্‌বৃত্ত-উৎপাদক রাজ্যগুলি নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ এলাকা ব'লে মনে করেন এবং দেশের সমগ্র খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কে তাঁদের কোন গভীর দায়িত্ব আছে এমন কোন স্বীকৃতির আভাস তাঁদের কথাবার্ত্তা বা কার্য্যকলাপে দেখা যায় না। ঘাটতি-উৎপাদক রাজ্যগুলি স্বভাবতঃই এই সম্পর্কে একটা একক (integrated) জাতীয় নীতির (national policy) প্রয়োজন গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা খানিকটা ঔদাস্যসূচক বলে মনে হয়। সম্প্রতি গুণ্টুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনেও এত বড় একটা জাতীয় সঙ্কটে কোন একটা স্পষ্ট সামগ্রিক নীতির বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় নি; বিষয়টি একপ্রকার আগামী মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের বিচারের উপরে ছেড়ে দিয়ে রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যে ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে এই সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যগুলির চিন্তাধারার একটা স্পষ্ট প্রকাশ পাওয়া যায়:

কেরলের গবর্ণর ও বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা শ্রী ভি, ভি, গিরি বলেন যে, বর্ত্তমান মূল্যসঙ্কটের জন্য কোন একটা একক কারণ দায়ী নয়; উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োগের ফলে একটা সামান্য পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য্য ছিল এবং পরিকল্পনার রূপায়ণেই তার আয়োজন বিধিবদ্ধ ছিল। এ ছাড়া উন্নয়নের ফলে যে অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা সাধারণের আয়ত্তাধীন হয়েছে তার ফলে ভোগবিধির অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটেছে; পূর্ব্বে যাঁরা মোটা (coarse) খাদ্যশস্যের উপরে নির্ভরশীল ছিলেন তাঁরা এখন চাউল এবং গম জাতীয় মিহি শস্যের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন; এর ফলে এই সকল শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু উৎপাদন বাড়ে নাই। এর উপরে লোকসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির কারণে চাহিদা ও সরবরাহের অন্তর্বর্ত্তী ফাঁকটি আরও বেড়েছে। কিন্তু বর্ত্তমান গভীর মূল্যসঙ্কটের পেছনে যে ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর অসহযোগিতাও ক্রিয়া করছে এ কথাও অস্বীকার করা চলে না। খাদ্যশস্যের বাজার সরবরাহের বর্ত্তমান বৎসরের স্বল্পতা যে কেবলমাত্র উৎপাদকের সরবরাহে ঔদাসীন্যের জন্য ঘটছে এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। এ ক্ষেত্রেও অন্তর্বর্ত্তী ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর ভূমিকা প্রবল; চাউলের ব্যাপারে মিল মালিক ও পাইকাররা এটি ঘটাচ্ছেন। বর্ত্তমান অর্ডিন্যান্সের বলে এদের দমান সহজ হবে ব'লে তিনি মনে করেন, এদের সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপ দৃঢ়তার সঙ্গে দমন করতেই হবে। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির আঞ্চলিক জোট তিনি সমর্থন করেন, কিন্তু খাদ্যসমস্যা সমগ্র জাতির সমস্যা এবং এর সমাধান সামগ্রিকভাবে জাতীয়ভাবে (national) করতে হবে। কেরলের মতন ঘাটতি রাজ্যে আঞ্চলিকভাবে এর সমাধান সম্ভব নয়; একমাত্র কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টায় এবং জাতীয় সংহতির দ্বারাই এর সমাধান সম্ভব। আন্তঃরাজ্য খাদ্যশস্যের ব্যবসায় সম্পূর্ণভাবে সরকারী অধিকারে চালনা করা একান্ত প্রয়োজন; তবে সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রয়োগও আন্তঃরাজ্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে চালু থাকতে পারে। মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও সরকারী খরিদ-ব্যবস্থার (procurement) দ্বারা অতিরিক্ত মুনাফাবাজী বন্ধ করা সম্ভব। যদি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীগোষ্ঠী সমাজ-বিরোধী ক্রিয়া বন্ধ না করেন তা হ'লে সরকার তাঁদের ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রে নিতে পারেন। সকল শহরাঞ্চলে, তিনি বলেন, সরকারী বণ্টনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা একান্ত প্রয়োজন। এটা কেবলমাত্র উদ্‌বৃত্ত রাজ্যগুলি যদি নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ভোগসঙ্কোচ করতে রাজী হন তবেই সম্ভব, কেননা এই ব্যবস্থার উপরেই ঘাটতি রাজ্যগুলিতে সরবরাহ চালু রাখা নির্ভর করবে। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ফলে খাদ্যশস্য ব্যবসায়ের রাষ্ট্রীকরণের প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভূত হয়েছে; স্বাভাবিক চাহিদা ও সরবরাহের (demand and supply) উপরে এই বিষয়টি ফেলে রাখা যায় না। ব্যবসায়ী-গোষ্ঠীর গত কয়েক বৎসরের ভূমিকা এই বিচারটিকে আরও দৃঢ়মূল ক'রে তুলেছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনও বলেন, বর্ত্তমান বৎসরের অতিরিক্ত খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ একটি নহে; মোটামুটি উৎপাদনে ঘাটতি, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, উৎপাদকের মজুত করবার ক্ষমতা বৃদ্ধি, সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি (inflation) এবং জনসংখ্যার একটি বিশিষ্ট অংশের ভোগবৃদ্ধি, এ সকলই যৌথভাবে এতে ক্রিয়া করছে। সরবরাহের স্বল্পতা কোথাও মাল মজুত হয়ে থাকছে এই কথাটারই সূচনা করে। আসলে বৃহৎ উৎপাদকগোষ্ঠী ও পাইকাররাই এর জন্য দায়ী। বর্ত্তমান অর্ডিন্যান্সের বলে এদের দমন করা সহজ হবে। আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ বর্ত্তমান সঙ্কটে অবশ্যই খানিকটা ক্রিয়া করছে কিন্তু বিভিন্ন এলাকার লোকেদের খাদ্যের চাহিদার বিভিন্নতার কারণে আঞ্চলিক বাধা এখনই তুলে দেওয়া ঠিক হবে না।

উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে ঘাটতি এলাকায় খাদ্যের চলাচল এবং আমদানী খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে হওয়া উচিত। বড় বড় শহরগুলিতে এখনই পূর্ণ বণ্টন নিয়ন্ত্রণ প্রবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন এবং ক্রমে সকল [শহরাঞ্চল-গুলিতেই এই নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। এখনই খাদ্য ব্যবসায়ের আংশিক রাষ্ট্রীকরণ হওয়া দরকার এবং এর দ্বারা খোলা বাজারের উপরে মূল্যস্থিতি প্রভাবিত হবে।

আর একটি ঘাটতি রাজ্য, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় বলেন যে তাঁর মতে বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ উন্নয়নের লগ্নীর অনুপাতে আশানুরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়া। প্রথম পরিকল্পনাকাল থেকেই এই ব্যাপারটি ঘটে চলেছে। প্রথম তিনটি পরিকল্পনাকালে মোটামুটি পঁচিশ হাজার কোটি টাকা লগ্নী হয়েছে। একথা সত্য যে এর একটা অংশ বৃহৎ উৎপাদক শিল্পসমূহে লগ্নী করা হয়েছে এবং এর ফল পেতে খানিকটা দেরী হওয়া অনিবার্য্য। তবুও লগ্নীর পরিমাণ অনুযায়ী উৎপাদন যদি সাধারণতঃ আশানুরূপ ভাবে বৃদ্ধি পেত তা হ'লে বর্ত্তমান সঙ্কটজনক মূল্য-পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটত না। আগামী চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ২১০০০ কোটি টাকা লগ্নীর আয়োজন করা হচ্ছে, কিন্তু এই লগ্নীর অনুপাতে যদি উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করা হয় তবে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা কোনমতেই সম্ভব হবে না। অন্ততঃ শিল্প এলাকাগুলিতে অবিলম্বে র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন, খাদ্যের অভাবে শিল্পোৎপাদন যাতে কোনক্রমেই ব্যাহত না হয় তার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। উদ্বৃত্ত এবং ঘাটতি উভয় এলাকায়ই ভোগনিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন। ভারত একটি পূর্ণ সমষ্টি, উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে ঘাটতি এলাকায় খাদ্য সরবরাহ জাতীয় (national) নীতির একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। এঁর মতে খাদ্যব্যবসায়ের পূর্ণ রাষ্ট্রীকরণ হওয়া প্রয়োজন; এর ফলে অবশ্যই দেশের জনসাধারণের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবার গুরুদায়িত্ব সরকারের উপর বর্ত্তাবে। এখনই শহর ও শিল্পাঞ্চলগুলির অধিবাসীদের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। এই সম্পর্কে বর্ত্তমান সরকারী আয়োজন দুর্ব্বল এবং অসম্পূর্ণ; এই ক্ষেত্রে অচিরে নূতন শক্তি সঞ্চার করতেই হবে।

উত্তর প্রদেশের শ্রীমতী সুচেতা কৃপালানী মনে করেন একটি সর্ব্বভারতীয় জাতীয় খাদ্যনীতির রচনা একান্ত প্রয়োজন। এই নীতির রূপায়ণ কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব কিন্তু এতে রাজ্য সরকারগুলির সহযোগ একান্ত প্রয়োজন। আন্তঃরাজ্য সরবরাহের ব্যবস্থা এইভাবেই হওয়া দরকার। খাদ্যে ঘাটতির অবস্থায় র‍্যাশনিংই একমাত্র উপায় কিন্তু এর জন্য চাই উপযুক্ত পরিমাণ মজুত। অন্যথায় কেরালায় সম্প্রতি যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল অনুরূপ অবস্থা ঘটতে বাধ্য। রাষ্ট্রায়ত্ত খাদ্যব্যবসায় খোলা বাজারের মূল্যমানের উপরে প্রভাব বিস্তার করবে কিন্তু এর জন্য চাই সরকারী অধিকারে প্রচুর মজুত, যার থেকে সাময়িকভাবে সরকারী মজুত থেকে খোলা বাজারে প্রচুর সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

মহারাষ্ট্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভি, পি, নায়ক বলেন মহারাষ্ট্রে চিরকালই খাদ্যশস্যে ঘাটতি ছিল। খাদ্যশস্যের বদলে অর্থকরী উৎপাদনে চাষীর অধিকতর নজর, বোম্বাই বন্দরে খাদ্যশস্য আমদানীকারক জাহাজ খালাসে বিলম্ব, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ইত্যাদি উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি থেকে খাদ্য-শস্য আমদানীতে বাধা, ইত্যাদি কারণে এই ঘাটতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজার সরবরাহের মন্দগতি ও পরিমাণের স্বল্পতা মজুতদারীর কারণে ঘটছে বলে তিনি মনে করেন না। ছোট চাষীর পক্ষে মাল মজুত ক'রে রাখা অসম্ভব; কিছু সংখ্যক জোতদারেরা নিজেদের একক সঙ্গতির বলে বা ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় এটি করতে পারেন—তবে কোন কোন পাইকার এ কাজ করছেন না বলা চলে না। খাদ্যে একটি সর্ব্বভারতীয় জাতীয় নীতি অনুসৃত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন এবং উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে ঘাটতি এলাকায় খাদ্য চলাচলের বর্ত্তমান আঞ্চলিক বাধা অপসারিত হওয়া প্রয়োজন। সরকারী নিয়ন্ত্রণে এবং অধিকারে আন্তঃরাজ্য খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সরকারী নিয়ন্ত্রণে র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তিত হ'লে সুবিধা হয়, তবে এর সাফল্য সরকারী মজুতের পরিমাণের উপরে নির্ভর করবে। মহারাষ্ট্রের মতন ঘাটতি এলাকায় র‍্যাশনিং কেবলমাত্র শহরাঞ্চলে সীমিত ক'রে রাখা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সর্ব্বস্তরে ভোগনিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন। খাদ্যব্যবসায়ের রাষ্ট্রীকরণ সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতেই মাত্র সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ সরবরাহের ভিত্তিতে রাষ্ট্রায়ত্ত খাদ্যব্যবসায় সঙ্কট মোচনে সমর্থ হ'তে পারে না; একদিকে যেমন

উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি অন্ততঃ কয়েক বৎসর ধরে আমদানী শস্যের উপরেও নির্ভর করতেই হবে।

উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলির মধ্যে মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কটকে বেশীর ভাগই শঙ্কাজনিত, যতটা না ঘাটতির জন্য নয় ব'লে উল্লেখ করেন। এর খানিকটা অন্ততঃ দেশের লোকের খাদ্যব্যবহারের ধারায় পরিবর্ত্তন থেকে উদ্ভূত। তা ছাড়া খাদ্যশস্যের বদলে অধিক মুনাফাপ্রসবী অন্যান্য পণ্যের চাষে চাষীর স্বাভাবিক টান খাদ্য উৎপাদনে উন্নতি ব্যাহত করছে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে কতকগুলি সমাজবিরোধী ব্যক্তি অত্যধিক মুনাফার লোভে মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছেন। এঁদের কঠিন হাতে দমন করা প্রয়োজন। নূতন অর্ডিন্যান্সের বলে সেটা করা সম্ভব হবে কি না, তার বিচার সময়সাপেক্ষ। খাদ্যনীতি অবশ্যই সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে রচিত হওয়া দরকার, তবে বর্ত্তমানের আঞ্চলিক বাধাগুলি সম্পূর্ণ অপসারিত ক'রে দেওয়া ঠিক হবে না। প্রতিটি রাজ্য নিজ নিজ প্রয়োজন সম্বন্ধে স্বভাবতঃই বেশী ওয়াকিবহাল; ঘাটতি হ'লে উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে বা তাতে না কুলাইলে কেন্দ্রীয় সরকার মারফৎ বিদেশ থেকে আমদানী করতে পারবেন; উদ্বৃত্ত থাকলে নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য ঘাটতি এলাকায় চালান দিতে পারবেন—এটি সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে নিয়মিত হওয়া দরকার। এই চলাচল সরকারী খাতে এবং কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে চালান দরকার। রাষ্ট্রায়ত্ত খাদ্যব্যবসায় আংশিকভাবে প্রবর্ত্তন করা চলতে পারে, সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীকরণ এবং বণ্টন নিয়ন্ত্রণ এখন অসম্ভব। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর ভূমিকা একেবারেই বন্ধ ক'রে দেওয়া সমীচীন হবে না। সমবায়ের ভিত্তিতে এ কাজ সুষ্ঠুভাবে হ'তে পারে।

অন্ধ্ররাজ্যের শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডী বলেন যে, চাহিদার তুলনায় চাউলের উৎপাদন একই পরিমাণের কিংবা কিঞ্চিৎ কম হওয়ার ফলে সামান্য পরিমাণ মালও যদি কোথাও আটকে যায় তাতে একটা গোলযোগের সৃষ্টি হয়। সরকারী ব্যবস্থাপনায় সকল উদ্বৃত্ত চাউল মজুত করবার ব্যবস্থা ক'রে ঘাটতি এলাকায় সরবরাহ করতে পারলে তবে অবস্থার উন্নতি হ'তে পারে। তা ছাড়া জনসাধারণের মনে খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কীয় শঙ্কাজনক আলোচনা সংবাদপত্রে, সরকারী মুখপাত্ররা এবং বিরোধী রাজনৈতিক দল করে চলেছেন এতে সমস্ত দেশে একটা ভীতির আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে বর্ত্তমান সঙ্কটটিকে আরও ঘোরাল করে তুলেছে। নূতন অর্ডিন্যান্সের বলে মানুষের খাদ্য নিয়ে যাঁরা মুনাফাবাজী করে থাকেন তাঁদের সাজার ব্যবস্থা সহজ হবে, তবে কেহ যদি মনে করেন এর ফলে ব্যবসায়ীদের মনে ভীতিসঞ্চার করবে তবে সেটা ভুল। সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে অবশ্যই খাদ্যনীতির রচনা করতে হবে, তবে বর্ত্তমানে প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে এক-একটি সম্পূর্ণ অঞ্চল হিসাবে খরিদনীতি (procurement policy) সম্বন্ধে স্বাধীনতা দিতে হবে। সরকারী অধিকারে বণ্টন নিয়ন্ত্রণ নীতি হিসাবে মন্দ নয়, কিন্তু এটি করতে হ'লে সামগ্রিকভাবে সারা দেশের উপরে এর প্রয়োগ করতে হবে। বর্ত্তমানে সরকারের এতটা সঙ্গতি আছে কি? রাষ্ট্রায়ত্ত খাদ্যব্যবসায় ও নীতির দিক্‌ থেকে সুন্দর শোনায়, কিন্তু বর্ত্তমানে এটি করবার সঙ্গতি দেশের শাসনসংস্থার আছে কি না সন্দেহ। ব্যাপারটি সাবধানতার সঙ্গে বিচার করা প্রয়োজন।

ওড়িষ্যার খাদ্যমন্ত্রী শ্রীনীলমনি রাউতরায় বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধির একমাত্র কারণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অসাফল্য বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ওড়িষ্যার ব্যবসায়ীরা পশ্চিমবঙ্গে চাউল রপ্তানী করতে [illegible] উদ্‌গ্রীব নন, কেননা পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে দর ধার্য্য করেছেন সেটা স্থানীয় খোলা বাজারেরই সমান। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গে চাউল সরবরাহে আগ্রহের অভাব দেখা যায়, এ রাজ্যে নূতন অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করবার কোন কারণ ঘটে নাই। আঞ্চলিক বাধা অপসারণ করে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে খাদ্যশস্য চলাচলের ব্যবস্থা করা উচিত এবং সুপরিকল্পিত সরকারী ব্যবস্থাপনায় আন্তঃরাজ্য এবং বিদেশ থেকে আমদানী খাদ্যশস্যের চলাচল নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। বৃহৎ শহরগুলিতে র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তন করা চলতে পারে। উদ্বৃত্ত এবং ঘাটতি সকল এলাকায়ই খাদ্যের ভোগনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে খাদ্য ব্যবসায়ের রাষ্ট্রীকরণ আংশিকভাবে প্রয়োজন কিন্তু এই ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর ভূমিকা রক্ষা করা প্রয়োজন।

আসামের অর্থমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দীন আলী আহমেদ বলেন, খাদ্যসঙ্কটের জন্য প্রধানতঃ বণ্টন ব্যবস্থার অব্যবস্থা

দায়ী। কোথাও কেহ খাদ্যশস্যের চলাচলে ব্যাঘাত ঘটিয়ে সরবরাহে ঘাটতি সৃষ্টি করছেন। আসামেও উদ্বৃত্ত উৎপাদন হওয়া সত্বেও এটি ঘটেছে। মিলমালিক ও বড় জোতদারেরা মিলে এটি ঘটাচ্ছেন। নূতন অর্ডিন্যান্সের বলে তাঁদের দমন করা সম্ভব হবে। খাদ্যনীতি অবশ্যই জাতীয় ভিত্তিতে রচিত হওয়া প্রয়োজন এবং ইহার পথে সকল আঞ্চলিক বাধা দূর হওয়া দরকার। আন্তঃরাজ্য খাদ্যব্যবসায় বৃহৎ পাইকারী সমবায় সংস্থার মারফৎ চলা উচিৎ, বর্ত্তমানে সেটি সম্ভব না হ'লে সরাসরি রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে এর ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কলিকাতার মতন কতকগুলি অতিবৃহৎ শহরাঞ্চলে র‍্যাশনিং অনিবার্য্য হ'লেও সাধারণতঃ, বিশেষ ক'রে আসামের কোন শহরে র‍্যাশনিংয়ের প্রয়োজন আছে ব'লে তিনি মনে করেন না। উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি উভয় এলাকাতেই খাদ্যে সমপরিমাণ ভোগনিয়ন্ত্রণ সম্ভব নহে; তা হ'লে অন্যান্য শিল্পজাত ভোগ্যেরও অনুরূপ সমপরিমাণ ভোগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রায়ত্ত খাদ্যব্যবসায়ের অধিকারে প্রচুর মাল মজুত হ'লেই তবে খোলা বাজারের মূল্যমানে প্রভাব বর্ত্তাতে পারে।

উপরোক্ত বিবৃতিগুলির সংক্ষিপ্তসার থেকে দেখা যাবে যে, প্রায় সকল রাজ্যের শাসনকর্ত্তারাই স্বীকার করছেন যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভেদ্য (vulnerable) শহরাঞ্চলগুলিতে র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তন করাই একমাত্র উপায়, কিন্তু যথেষ্ট মজুত ব্যতীত এর ফলাফল যে কেরলের মতনই বিষময় হয়ে উঠতে পারে সে আশঙ্কা করেন। কিন্তু এই মজুত রাজ্যের খরিদনীতির (procurement) সফল প্রয়োগের উপরে নির্ভর করে। এই প্রয়োগ প্রধানতঃ রাজ্য সরকারেরই উপর নির্ভর করে কিন্তু তার সফল প্রবর্ত্তনের দায়িত্ব এঁরা বহন করতে সাহস পাচ্ছেন না। বিহারের শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, এই দায়িত্ব গ্রহণ এবং বহন করবার সফল প্রয়োগের সঙ্গতি বর্ত্তমানে সরকারের আয়ত্তাতীত। আসামের শ্রী আলী আহমদ হয়ত এই কারণেই আসামে ভেদ্য শহরাঞ্চলেও র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তন করবার প্রয়োজনীয়তা সরাসরি অস্বীকার করেন। খাদ্যশস্যের ব্যবসায়টিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করবার প্রস্তাব সম্পর্কেও অনুরূপ দ্বিধা ও দায়িত্ব এড়াবার প্রচেষ্টার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া রাজ্য সরকারগুলির নেতৃবর্গের বিবৃতির মধ্যে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটা এই যে, বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতির মূল কারণ সম্বন্ধে হয় তাঁরা সচেতন নন কিংবা ইচ্ছা করেই ইহার সঠিক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হ'তে তাঁরা রাজী নন। যেমন রোগ নির্ণয় না হ'লে সার্থক চিকিৎসার প্রয়োগ সম্ভব নয়, তেমনি বর্ত্তমান সঙ্কটের সঠিক কারণ নির্ণিত না হ'লে সমস্যার সমাধানও সম্ভব নয়।

পূর্ব্বের আলোচনাগুলিতে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, দেশে উৎপন্ন মোটা ও মিহি খাদ্যশস্যের উৎপাদনের মোট পরিমাণ আমাদের বর্ত্তমানের ভোগচাহিদার প্রায় সম-পরিমাণ। উদ্বৃত্ত বিশেষ না হ'লেও তেমন একটা ঘাটতি নেই। অবশ্য সম্প্রতি দেশের লোকের খাদ্য ব্যবহারে যে পরিবর্ত্তন ঘটতে সুরু করেছে তাতে মিহি খাদ্যশস্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরে বিদেশ থেকে মোটামুটি বার্ষিক প্রায় ৪০ লক্ষ টন গম ও আরও প্রায় ৪ লক্ষ টন পরিমাণ যে চাউল আমদানী হয়েছে তার ফলে বেশ একটা আরামপ্রদ উদ্বৃত্ত সরবরাহের অবস্থা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু ১৯৬১-৬২ সন পর্য্যন্ত খাদ্য-সরবরাহে তেমন একটা গোলযোগ সৃষ্টি হয় নাই এবং মূল্যমানও মোটামুটি স্থির ছিল। এ বিষয়ে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬০-৬১ এবং ১৯৬১-৬২ সন উভয় বৎসরেই খাদ্য উৎপাদনে কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। ১৯৬২-৬৩ সনে উৎপাদন বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পায় কিন্তু ১৯৬২ সনের ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাস থেকেই দ্রুত খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্মরণ থাকা প্রয়োজন যে ১৯৬২ সনের অক্টোবর মাসে ভারতের উপর চীনা হামলা সুরু হয় এবং প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যে অতিরিক্ত অর্থবরাদ্দের জন্য নভেম্বর মাসে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পার্লামেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করেন তখন আমরা বলেছিলাম যে, সরাসরি ট্যাক্স ধার্য্য করে যদি এই অতিরিক্ত অর্থ টেনে নেবার ব্যবস্থা করা না হয়, তবে ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা কোনমতেই সম্ভব হবে না। আমাদের উপদেশে অবশ্য অর্থমন্ত্রী কর্ণপাত করেন নাই এবং অচিরেই খাদ্যমূল্যে আমাদের শঙ্কাজনক ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিফলন দেখা যেতে সুরু হয়ে যায়। ১৯৬৩-৬৪ এবং বর্ত্তমান বৎসরেও উৎপাদন আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত ভাবেই চলে আসছে। স্বাভাবিক কারণেই মূল্যবৃদ্ধির চাপ

খাদ্যশস্যে, অন্যান্য খাদ্যপণ্যে এবং সাধারণতঃ সকল অবশ্য-ভোগ্য পণ্যের উপরে অত্যধিক বেশী পরিমাণে বর্তাইয়াছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত এখন আর এই ধারাটিকে নিয়ন্ত্রিত করবার কোন উপায় নেই।

কিন্তু সার্থকভাবে র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তিত করতে হ'লে দেশের সমগ্র খাদ্যব্যবসায়ের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীকরণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই। এই মূল ও বাস্তব সত্যটি সরকার হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন না কিংবা তাঁহাদের আশ্রিত বুনিয়াদী স্বার্থের উপর (vested-interests) এই প্রয়োগের অনিবার্য্য অপঘাতের আশঙ্কায় এই দায়িত্বটিকে ইচ্ছা করেই এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছেন। একথা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন যে, একমাত্র প্রাথমিক খাদ্য-উৎপাদক (Primary producers) ব্যতীত আর কাহাকেও বাদ দিয়া সার্থকভাবে র‍্যাশনিং প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। ভেদ্য শহরাঞ্চলগুলিকে র‍্যাশনিংয়ের আওতায় নিয়ে এলে অচিরেই সংশ্লিষ্ট শহরতলীগুলিও ভেদ্য হয়ে পড়বে এবং ক্রমে বিস্তৃততর এলাকাগুলিতেও এর প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়বে। অতএব সার্থক র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তনের একমাত্র উপায় সমগ্র দেশটিকে একযোগে এই ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করা। গত দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় সমগ্র ইংলণ্ডে এই ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। এবং সামগ্রিক র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তন করতে হ'লে দেশে উৎপাদিত এবং বিদেশ থেকে আমদানী করা সকল খাদ্যশস্য সামগ্রিকভাবে সরকারী অধিকারের অধীন ক'রে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেটি করতে হ'লে সমগ্র দেশের খাদ্যব্যবস্থাপনায় নীতি ও প্রয়োগের কেন্দ্রীকরণ একান্ত প্রয়োজন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় রাজ্য ও লোক সভার আলোচনায় এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্য ও দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই দিনই সন্ধ্যাকালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্তের যে সংবাদ এ পর্য্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে, তাতেও একটা বলিষ্ঠ মূলনীতির আভাস পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান শাসনসংস্থার সঙ্গতি এই গুরু ও বিরাট্ দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম বলেই এই প্রকার অসার্থক ব্যবস্থাপনায় বেশী কিছুর প্রয়াস করতে এঁরা সাহস পাচ্ছেন না। কিন্তু এভাবে যে সঙ্কট-মোচনের কোন আশা নাই সেটা খুবই স্পষ্ট। আগামী ফসলের দিকে তাকিয়ে এঁরা হয়ত আশা ক'রে আছেন যে, তখন এক রকম যা হোক ক'রে সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। তা যদি সম্ভব হ'ত তবে গত দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের হ'ত।

কারলার চৈত্যগুহা ও ফ্রেস্কো চিত্র

শ্রীসুমিত সান্ন্যাল

"A major archeological discovery has been accidentally made at the ancient Karla Buddhist caves, where some paintings of unknown origin have come to light."

[Indian Express 24. 2. 63]

তাই আবার এলাম কারলা কেভ দেখতে। এর পূর্ব্বে '৬২ সালের সেপ্টেম্বরে এসেছিলাম। তখনও বর্ষা শেষ হয় নি। পথ-ঘাট ভাল ছিল না। তাই খুব একটা লোকের ভিড়ও দেখি নি। তারপরে আবার ডিসেম্বরে এসেছিলাম। শীতের বেলা। রৌদ্রে আমেজ মাখানো। তাই দর্শকের সেদিন অভাব ছিল না। নারী-শিশু-যুবার কাকলিতে পরিপূর্ণ ছিল।

আবার এলাম। মার্চ্চের প্রারম্ভে। এ যেন শীতের শেষের তুষার-গলানো উত্তাপ। তবুও বহু দর্শকের আবির্ভাব। আমারই মত বোধ হয় ঐ খবরের আকর্ষণে এসে হাজির হয়েছেন, কারলার ফ্রেস্কো দেখবেন।

পুণা থেকে ৩৬ মাইল, আর বোম্বে থেকে ৭৯ মাইল দূরে। ঠিক এমনি জায়গা থেকে আরও দু' মাইল উত্তরে কারলা কেভ অবস্থিত।

বোম্বে-পুণা রোড থেকে বেরিয়ে গেছে সুন্দর পিচ-ঢালা পথ। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এসে শেষ হয়েছে সে পথ। তাই গাড়ি আপনাকে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এনেই নামিয়ে দেবে।

নিকটস্থ রেলওয়ে ষ্টেশন—"মালভালী"। লোক্যাল গাড়িই থামে কেবল। এখানে নামলে প্রায় তিন মাইল পথ আপনাকে হেঁটে যেতে হবে। কারণ ষ্টেশনে কোন গাড়ি পাওয়া যায় না সাধারণতঃ। তবে গরুর গাড়ি চড়তে যদি অসুবিধা না থাকে তবে শীতকালের মরশুমে তা পাওয়া যায়।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে মনে হবে, ওঃ বাবা! কত উঁচু পাহাড়! কেমন ক'রে উঠব? ভয় নেই। মাত্র পাঁচ শ' ফুট উঁচু। দেখতে দেখতেই চড়ে যাবেন। দ্বারের কাছেই বাস করেন সরকারী স্থাপত্য বিভাগের কর্ম্মচারী। তিনি

কারলা গুহা মন্দিরের একটি মিথুন মূর্ত্তি

জন-প্রতি ২০ নঃ পঃ দর্শনী গ্রহণ করে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেবেন।

'কেভ' কথার অর্থ পাহাড়ের মধ্যে গুহা বা গুম্ফা। আর সে গুহা কোন মানুষের তৈরি নয়। সেগুলো প্রকৃতির অবদান। আপনা থেকেই পাহাড়ের গায়ে সৃষ্টি হয় এরকম গুহা। ঠিক সেই অর্থে "কারলা কেভ", অজন্তা কেভ, ইলোরা কেভ, ভাজা কেভ, বেদশে কেভ, শেলারবাড়ী কেভ কিম্বা নাশিক কেভ ও জুনার কেভ নামগুলো বিভ্রান্তিমূলক।

কারণ এই সব গুহাগুলো ঠিক প্রকৃতির অবদান নয়। সুদক্ষ শিল্পীর ছেনি আর হাতুড়ির ঘায়ে পাহাড় কেটে গড়ে উঠেছে এই গুহা, আজ থেকে আরও প্রায় দু' হাজার বৎসর পূর্ব্বে। কাজেই এগুলোকে বলা উচিত অতীত স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের অদ্ভুতপূর্ব্ব নিদর্শন। আমার মনে হয় Percy Brown-এর উক্তি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি বলেন:

"Rock architecture to all intents and purpose is not architecture--it is sculpture, but sculpture on a grand and magnificent scale."

কাজেই আমার ত মনে হয় 'কেভ' কথার পরিবর্ত্তে 'গুহামন্দির' কথাটা অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত হয়।

এবারে প্রথমেই বলা যাউক, 'চৈত্য' গুহামন্দিরের কথা। কারণ এটাই এখানকার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। আর তাই বোধ হয় স্থাপত্য বিভাগ থেকে একে এক নম্বর গুহামন্দির ব'লে বর্ণিত হয়েছে।

'চৈত্য' গুহামন্দিরে ঢুকতে গেলেই প্রথমে বাঁ-দিকে পরে একটি থাম্বা। তার উপরে চারটি সিংহমূর্ত্তি। আর সবচেয়ে আশ্চর্য্যেরবিষয় যে, এই থাম্বাটির উপরি-ভাগ পাহাড়ের গায়ে যুক্ত হয়ে আছে। থাম্বাটির গায়ে শিলালিপি দেখে জানতে পারা যায় যে, এটি মারাঠীদের দান।

শোনা যায় 'চৈত্য' গুহামন্দিরের প্রবেশদ্বারের ডান-দিকেও আর একটি থাম্বা ছিল, কিন্তু সেটি নষ্ট হয়ে যায়। বর্ত্তমানে সেখানে একটি শিবমন্দির আছে। এই বিরাট্ থাম্বার উপরে ছিল একটি চাকা। এ দুটো বুদ্ধের জন্ম ও নীতির নিদর্শন।

চৈত্য গুহামন্দিরের দু' পাশে ১৫টি করে থাম্বা। শেষ প্রান্তের মাঝখানে 'স্তূপ'। পেছনে আরও সাতটি থাম্বা। স্তূপের ভিতরে হয়ত কোন বৌদ্ধ সাধকের অস্থি রক্ষিত আছে। এখানে প্রত্যহ বৌদ্ধভিক্ষুরা মিলিত হতেন—বৌদ্ধ আরাধনার জন্য। আর ঐ স্তূপের ডান দিক্ দিয়ে বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করতেন। চৈত্যগুহার অভ্যন্তর ভাগ অনেকটা ইংরেজী 'U' অক্ষরের মত।

প্রবেশদ্বার থেকে পেছনের দেওয়াল পর্য্যন্ত ১২৪ ফুট ৩ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যে, ৪৫ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রস্থে, আর মেঝে থেকে উপরের ছাদ পর্য্যন্ত উচ্চতায় ৪৬ ফুট।

চৈত্যগুহার বাইরে এবং ভিতরের দিকে চন্দ্রাতপে যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য আছে—পাথরের চন্দ্রাতপে এইরকম শিল্পনৈপুণ্য আর কোথাও দেখা যাবে না। আর এই শিল্পশোভার জন্যই কারলা গুহা বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই কারুকার্য্যময় ছাদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সময়মত স্থাপত্য বিভাগের হাত পড়ায় এই পুরাকীর্ত্তি আজও সযত্নে রক্ষিত আছে।

এবার 'বিহার'গুলির প্রসঙ্গে আসা যাক। চৈত্য গুহার বাঁ-দিকে একটি তিনতলা-বিশিষ্ট বিহার (২নং গুহা)। প্রথম তলাটি প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতীয় তলার দু'দিকে চারটি করে কক্ষ। পেছনের দিকে-সারিতে পাঁচটি করে কক্ষ। সামনে বেশ প্রশস্ত হল-ঘরের মত। এই হলঘরের সঙ্গেই প্রথম তলা একটি কাঠের সিঁড়ি দ্বারা যুক্ত। আর এই হলঘর থেকেই আর একটা কাঠের সিঁড়ি তেতলায় উঠে গেছে।

তেতলার ডানদিকে তিনটি কক্ষ। বাঁদিকে পাঁচটি কক্ষ। কোন কোন কক্ষে শয়ন করার জন্য পাথরের বেদী-মত আছে। ডান-দিকে এবং পেছনের দিকে দেওয়ালে বুদ্ধের মূর্ত্তিও খোদিত করা আছে। সামনের দিকে কাঠের রেলিং দেওয়া আছে।

আর একটু বাঁ-দিকে আর একটি 'বিহার' (৩নং গুহা)। এটি দুইতলা-বিশিষ্ট। প্রথম তলাটি নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু তার বাঁদিকে আরও কয়েকটি কক্ষ আছে। তিনটি জল ধরে রাখবার জায়গাও আছে। অনেকটা আমাদের কূয়ার মতন। আর একটি ক্ষুদ্র 'চৈত্য'ও আছে।

দোতলার দু'দিকে দু'টি করে কক্ষ আছে। পিছনের দিকেও চারটি করে কক্ষ আছে। কোন কোন কক্ষে শয়ন করার জন্য পাথরের বেদীও করা আছে। সামনের দেওয়ালে একটি দরজা ও দু'টি জানলা আছে।

'চৈত্য'গুহার ডান দিকে আরও কয়েকটি বিহার আছে। প্রথমটি একটি অসমাপ্ত 'বিহার'। তারপর ছোট একটি কক্ষ। সামনেটা ভেঙ্গে গেছে। আর পেছন দিকের দেওয়ালে একটি বুদ্ধের মূর্ত্তি। তার সঙ্গেই লাগানো আর একটি চৌবাচ্চার মত জল রাখবার জায়গা। চৌবাচ্চা বলছি এইজন্য যে, এটি নিতান্তই অগভীর।

তার পাশে আরও একটি বিহার (৪নং গুহা)। পেছনের দিকে চারটি কক্ষ। আর ডান-দিকে দু'টি কক্ষ, কিন্তু অর্দ্ধসমাপ্ত। পেছন দিককার দেওয়ালেও একটি

বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত আছে। মূর্ত্তিটি বসা অবস্থায়, কিন্তু তাঁর পা পদ্মফুলের উপর ভর করে আছে। সামনের দিকে দেওয়ালে একটি দরজা ও দু'টি জানলা।

কারলার গুহামন্দির তৈরি সম্বন্ধে সঠিক কোন দিন তারিখ বলা যায় না। তবে এটুকু নিশ্চিত করে বলা যায় যে, উত্তর ভারতের ক্ষহরাত বংশের রাজা নাহাপানার কারলা দখলের পরে নয়। বরং তার আগেই কারলা গুহামন্দির তৈরি হয়েছিল। কারণ 'চৈত্য' গুহামন্দিরের গায়ে খোদিত শিলালিপিতে রাজ নাহাপানার জামাতা উশভদত্তের কথা উল্লেখ থাকায় বিশেষজ্ঞরা এই অনুমান করেন। অবশ্য স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের রীতি দেখেও বিশেষজ্ঞরা এই ধারণা করেন যে-খ্রীষ্টজন্মের পর, প্রথম শতাব্দীর পরেই কারলার গুহামন্দির খোদিত হয়। আর সেই সময়টা সাতবাহনদের রাজত্বকাল।

কারলার চৈত্যগুহা সারা ভারতের মধ্যে বৃহত্তম চৈত্যগুহা বলেই পরিচিত। কারণ বিখ্যাত স্থাপত্য বিশারদ ডা: ফার্গুসন সাহেব বলেন :

"The largest as well as the most complete Chaitya Cave in India was excavated at a time when that style was in its greatest purity and is fortunately the best preserved."

কিন্তু এই চৈত্যগুহায় গত ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন সরকারী স্থাপত্য বিভাগের অন্তর্গত রাসায়নিক বিভাগের কর্ম্মচারীরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পরিচর্য্যা করছিলেন তখনই এই ফ্রেস্কো চিত্রগুলি আবিষ্কৃত হয়। মোট পাঁচটি চিত্র এই সময় আবিষ্কৃত হয়।

প্রথম যে চিত্রটি আবিষ্কৃত হয় সেটি ডানদিকের ১৫টি থাম্বার মধ্যে ১০নং থাম্বার গায়ে। পোষাক পরিহিত একটি মনুষ্য চিত্র। মাথায় একটি টুপি। টুপিটি পাঠানদের কুল্লা জাতীয়। রঙ তার অনেকটা ইটের মত লাল। পোষাকটি শ্যাওলার মত সবুজ রঙের। কিন্তু সেই মনুষ্য চিত্রের পা দুটো খুব সুস্পষ্ট বোঝা যায় না। তবে এটুকু মনে হয় যেন একটি ধূসর রঙের কার্পেটের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

এই চিত্রটির চারিদিকে বর্ডার দেওয়া আছে। সেই বর্ডারের মধ্যে পদ্মফুলের মত চিত্র আছে। একটি হলদে আর একটি ক্রীম রঙের। যতদূর মনে হয় ফুলের চিত্রগুলি পদ্মফুলের আলঙ্করিক রূপ।

চৈত্য গুহা মন্দিরে ঢুকতে গেলে বাঁ দিকে পড়ে একটি থাম্বা

ঠিক এই ধরনের আর একটি চিত্র সাদা আর কালো রঙের পাওয়া গেছে।

তৃতীয় চিত্র 'স্তুপের পেছনে, পঞ্চম থাম্বার উপরিভাগে। এটি একটি লাল রঙের বৃত্তাকার। চতুর্থ চিত্রও খুব সুস্পষ্ট নয়। কোন একটি লাল রঙের লতার মত। এটি স্তুপের সামনে ১৬নং থাম্বার গায়ে।

পঞ্চম চিত্র একেবারেই অস্পষ্ট। চার পা-বিশিষ্ট কোন জন্তুর চিত্র বলে মনে হয়। 'স্তুপের' বাঁ দিকে অবস্থিত।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, কোন চিত্রই আমার ক্ষুদ্র ক্যামেরায় তুলতে পারি নি। কারণ ভিতরে খুবই অন্ধকার। সামান্য টর্চ্চের আলোতে কোনরকমে চিত্রগুলি দেখা গেল।

তবে একটা কথা অত্যন্ত নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে যে, এই চিত্রগুলি অজন্তা গুহাচিত্রের মত নয়। চিত্রগুলির রেখা-বিন্যাসও অজন্তার গুহাচিত্রের মত সূক্ষ্ম ও সুন্দর নয়।

নারী-শিশু-যুবার কংকালেতে পরিপূর্ণ কারলা কেভ

এই চিত্রগুলি কে বা কারা অঙ্কন করল সে সম্বন্ধে ঠিক কিছু জানা না গেলেও ইতিহাসের পাতা থেকে টুকু জানা যায় যে সেকালের বৌদ্ধভিক্ষুরাও শিল্পচর্চা
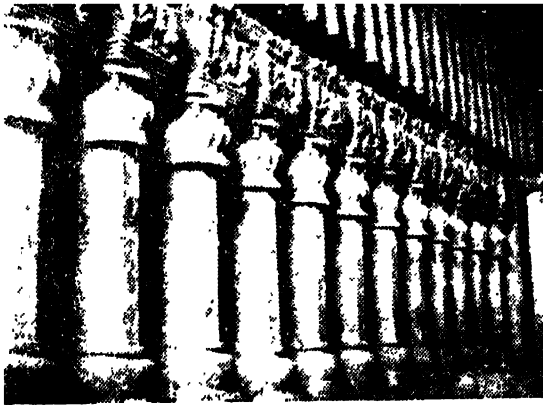
চৈত্য' গুহার বাঁ দিকে ১৫টি থাম্বার মধ্যে ১২টি থাম্বা

করতেন। কাজেই এটা বিচিত্র নয় যে, এই চিত্রগুলিও তদানীন্তন কোন বৌদ্ধভিক্ষুও অঙ্কন করে থাকতে পারেন। কারণ হ্যাভেল সাহেব তাঁর Indian Sculpture and Painting পুস্তকে বলেছেন :

"The Buddhist monks were often themselves practising artists. They used the arts, not for vulgar amusement and distraction, but as instruments for the spiritual and intellectual improvement of the people."

অবশ্য এই চিত্রগুলি এখনও ভবিষ্যতের গবেষক ও তথ্যানুসন্ধানীদের যথেষ্ট আলোক সম্পাতের অবকাশ রাখে।

দুহাজার বছরের পুরাতন কারলার 'চৈত্য কেভ'

ফিরে আসার সময় একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছিল যে, বাইরের বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষ ভাবে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও বহুজনকে দেখলাম, 'বিহার'গুলির মধ্যে বসে রীতিমত পিকনিক লাগিয়ে দিয়েছেন। এমন কি ষ্টোভ জ্বালিয়ে সজ্জি, রান্না পর্য্যন্ত হচ্ছে। অথচ এতে যদি কেভের কোন ক্ষতি হয়—তা হলে ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যের যে কত বড় অপূরণীয় ক্ষতি হবে সেটা অনেকেই বুঝেও যেন বুঝতে চান না। তখন শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষের উপর দোষারোপ চাপিয়ে সাফাই গাওয়ার প্রচেষ্টায় কোন লাভই হবে না।

তাই সেই ফার্গুসন সাহেবের কথাটাই বার বার করে মনে পড়তে লাগল :

"It would be thousand pities if this, which is the only original screen in India were allowed to perish."

যম

গী দ্য মোঁপাশা

অনুবাদ—শ্রীপ্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়

মৃত্যু-শয্যার পদপ্রান্তে ডাক্তারের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল কৃষকটি। শান্ত সহিষ্ণু চিন্তাহীন বৃদ্ধাটি দু'জনের দিকে তাকিয়ে তারা কি বলছে শুনছিল। সে মারা যাবে: এই সত্যটি সে স্বীকার করে নিয়েছিল; সময় আসন্ন, তার বয়স এখন বিরানব্বুই।

খোলা জানলা এবং দরজা দিয়ে জুলাইয়ের রোদ গলে পড়ছিল—গ্রামের চারপুরুষের কাঠের জুতোর দ্বারা স্পৃষ্ট, অসম বাদামী মাটির মেঝের উপর উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়েছিল। শস্যক্ষেত্রের ঘ্রাণ শুকনো ঘাস, শস্য এবং মধ্যাহ্ন-সূর্যের আতপদগ্ধ গাছের পাতার গন্ধও গরম বাতাসে ভেসে আসছিল। পতংগরা গুঞ্জন করছিল, শিশুরা মেলায় যে কাঠের খেলনা কেনে তার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দের মত তাদের করুণ ধ্বনিতে সারা গ্রাম ভরে গিয়েছিল।

ডাক্তার গলা চড়িয়ে বললেন: অনর, এই অবস্থায় তুমি তোমার মাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পার না, যে-কোন মুহূর্তে উনি মারা যেতে পারেন।'

আর কৃষকটি হতাশ হয়ে বারবার বলছিল: কিন্তু যে ভাবেই হোক, গম আমাকে তুলতে হবে। অনেক-দিন হ'ল এটা পড়ে আছে। এমন আবহাওয়া ভাল। মা, তুমি কি বল?

সেই মুমূর্ষু স্ত্রীলোকটি চাহনি দিয়ে আর মাথা নেড়ে তার সম্মতি দিল। এখনও নর্মানদের চিরকালের লোভের বশবর্তী হয়ে গম গোলায় ভরবার আর তাকে একলা মরতে দেবার জন্য সে তার ছেলেকে জোর করতে লাগল।

কিন্তু ডাক্তারের মেজাজ বিগড়ে গেল, মাটিতে পা ঠুকে তিনি চীৎকার করে উঠলেন: তুমি একটা পাষণ্ড, বুঝলে? আমি তোমাকে নিষেধ করছি, শুনতে পাচ্ছ? আর যদি তুমি সত্যিই তোমার গম আজ ভরতে যাও, তা হলে এখনই যাও আর তোমার মাকে দেখা-শোনা করার জন্য মাদার রাপেটকে নিয়ে এস। আমি তোমাকে আদেশ করছি—বলি, শুনতে পাচ্ছ? যদি তুমি আমার কথা অমান্য কর, তা হ'লে শোন, যখন তুমি অসুস্থ হবে আমি তোমাকে কুত্তার মত মারব—বুঝলে?

লম্বা ছিপছিপে শ্লথগতি কৃষকটি কোন সিদ্ধান্তে আসতে না পারায় উদ্বিগ্ন ছিল। ডাক্তারের ভয়ে আর অর্থব্যয়ে প্রবল অনীহার মধ্যে সে দোল খাচ্ছিল; সে ভাবনা থামাল আর তোতলাতে থাকল: দেখাশোনা করার জন্য মাদার রাপেট কত নেন?

ডাক্তার চীৎকার করলেন: আমি কি করে জানব? তুমি কতক্ষণের জন্য তাকে চাও তার ওপর সেটা নির্ভর করছে। সব শিকেয় তুলে রেখে তুমি তার সংগে ব্যবস্থা কর। আমি চাই ঘন্টাখানেকের মধ্যে সে এখানে আসুক, শুনছ?

লোকটি মনস্থির করল: আচ্ছা, আমি যাব; রাগ করবেন না, ডাক্তারবাবু।

তুমি সাবধান হও। দেখ, আমার মেজাজ খারাপ হ'লে আমি কারুর তোয়াক্কা করি না।

একলা হ'লে পর কৃষকটি মায়ের দিকে ফিরে হতাশ কণ্ঠে বলল: মাদার রাপেটকে আনতে যাচ্ছি। আমাকে ডাক্তারবাবু বলেছেন অতি অবশ্য নিয়ে আসতে হবে। আমি এখনি আনব, তুমি ভেব না।' এবং সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

বৃদ্ধা রজকিনী মাদার রাপেট গ্রামের এবং চারপাশের মৃত এবং মুমূর্ষুদের দেখাশোনা করত। তার মক্কেল-দের শেষ শবাচ্ছাদনে ঢেকে দিয়েই সে ফিরে আসত জীবিতদের জামাকাপড় ইস্ত্রি করতে। গত বছরের আপেলের মত কুঞ্চিত, বদমেজাজী, হিংসুটে, অস্বাভাবিক কৃপণ সেই বুড়ী দ্বিগুণ বেঁকে গিয়েছিল—জামাকাপড়ের উপর অজস্রবার ইস্ত্রি চালনার জন্য তার পিঠ ভেঙে গিয়েছিল; মৃত্যুর জন্য তার অস্বাভাবিক রকমের হৃদয়হীনের মত আকর্ষণ ছিল বলা চলে। যতজনের এবং যতরকমের মৃত্যু সে দেখেছে সেই বিষয়েই সে কথা বলত; শিকারী যেমন বন্দুক নিয়ে অভিযানের কথা বলে সেই রকম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সে তার গল্প বলত, যার কোন নড়চড় হ'ত না।

অনর বনটেমুস তার বাড়ীতে ঢুকে দেখল সে গ্রামের মেয়েদের কলারের জন্য নীল তৈরী করছে। সে বলল: হ্যালো! শুভসন্ধ্যা! মাদার রাপেট, আশা করি তুমি ভাল আছ!

সে মাথা ঘুরিয়ে বলল: হ্যাঁ! একরকম আছি—তুমি কেমন?

ভাল। মা ভাল নেই।

তোমার মা?

হ্যাঁ, আমার মা।

তোমার মায়ের কি হ'ল?

শীগগিরই পটল তুলবেন।

বুড়ী জল থেকে হাত বার করল এবং স্বচ্ছ নীলাভ জল তার হাত বেয়ে গড়িয়ে পড়ল ধোবার গামলায়। সে আকস্মিক সহানুভূতির সংগে বলল: উনি ভাল নেই, সত্যি?

ডাক্তারবাবু বলেছেন আজকের বিকেলটা টিকলে হয়।

তা হলে ওনার অবস্থা সত্যি খারাপ!

অনর ইতস্ততঃ করছিল। তার মাথায় যে মতলব ঘুরছে সোজাসুজি সে বলতে চায় নি; কিন্তু অন্য কিছু কি বলবে খুঁজে না পেয়ে সে বলল: শেষ পর্যন্ত তাকে দেখবার জন্য তুমি কত নেবে? তুমি জান আমরা বড়লোক নই; চাকর রাখার ক্ষমতা আমার নেই। সেইজন্যই আমার বুড়ী মার এই হাল, তাকে খুব বেশি চিন্তা আর কাজ করতে হয়েছে। বিরানব্বুই বছর বয়সে মা দশজনের কাজ করতেন। আজকালকার দিনে অমন পাওয়া যাবে না।

মাদার রাপেট ব্যবসাদারের ভঙ্গিতে উত্তর করলে: দু'রকমের দর নিয়ে থাকি। ভদ্রলোকদের জন্য দিনে দু'ফ্রাঙ্ক। আর রাতে তিন; অন্যদের জন্যে দিনে এক ফ্রাঙ্ক রাতে দু' ফ্রাঙ্ক। আমি তোমার কাছ থেকে এক আর দু'ফ্রাঙ্ক পেলে যেতে পারি।

কৃষকটি কিন্তু ভাবছিল। সে তার মাকে ভাল ভাবেই জানত; সে তার শরীরের শক্তি আর দৃঢ়তার বিষয় জানত। ডাক্তারে অভিমত দিলেও সে এক সপ্তাহ বাঁচতে পারে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে সে বলল, না। মা মারা না যাওয়া পর্যন্ত কত দিতে হবে, সেটা আমাকে বল। আমাদের দুজনেরই বেশ জুয়ো খেলা হবে। ডাক্তারবাবু বলেছেন খুবই তাড়াতাড়ি মারা যাবে। যদি তাই হয় তা হলে তোমার পোষমাস আমার সর্বনাশ। কিন্তু যদি সে আসছে কাল বা তার চেয়ে বেশি বাঁচে তা হ'লে আমি জিতব, তুমি হারবে।

লোকটির দিকে সেই পর্যবেক্ষণকারিণী বিস্ময়ে তাকিয়েছিল। এর আগে সে কোনদিন ঠিকে মজুরিতে মুমূর্ষুর দেখাশোনা করে নি। সে ইতস্ততঃ করল, জুয়োর চিন্তায় আকৃষ্ট হ'ল, কিন্তু কোথাও ফাঁদ থাকতে পারে এমন সন্দেহ করল।

সে বলল, তোমার মাকে না দেখা পর্যন্ত আমি কিছু বলতে পারব না।

তা হ'লে আমার সংগে এসে তাকে দেখে যাও।"

রাস্তায় তারা কোন কথা বলল না। মাদার দ্রুত চলতে লাগল, কৃষকটি লম্বা লম্বা পা ফেলে চলল, যেন সে প্রতি পদক্ষেপে একটি স্রোতস্বিনী অতিক্রম করছে।

রৌদ্রতাপে পরিশ্রান্ত হয়ে যে-সব গরুগুলি শুয়েছিল তারা অলসভাবে মাথা তুলল এবং দ্রুত ধাবমান দু'টি মূর্তির দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত হয়ে মাথা নীচু করল যেন তারা কিছু তাজা ঘাস চায়।

বাড়ীর কাকাকাছি এসে অনর বনটেম্পস বিড় বিড় করল: সব শেষ হয়ে গেলে আমি আশ্চর্য হব না এবং তার অচেতন আশা তার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল।

কিন্তু বুড়ী মরে নি। সে তখনও চাকাওয়ালা ছোট খাটে পিঠ দিয়ে শুয়ে ছিল, হাত দুটো লাল রঙের ছিটের চাদরের উপর রাখা ছিল—তার হাত দুটো অসম্ভব রকমের সরু, গ্রন্থিল, ঠিক যেন দুটো কাঁকড়ার মত অদ্ভুত প্রাণী—বাত, কঠোর পরিশ্রম আর প্রায় এক শতাব্দী ধরে সে যা কাজ করেছে তার জন্যে গ্রন্থিসর্বস্ব।

মাদার রাপেট বিছানার কাছে গিয়ে মুমূর্ষু স্ত্রীলোকটিকে দেখল। নাড়ী দেখল, বুকে আওয়াজ করে দেখল, শ্বাসপ্রশ্বাস শুনল আর তাকে কথা বলাবার জন্য প্রশ্ন করল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে ভাববার পর সে ঘর থেকে বেরল, অনরও তাকে অনুসরণ করল। বুড়ী রাত পর্যন্ত বাঁচবে না; সে তার মন স্থির করে ফেলেছে। কৃষক বলল—আচ্ছা—

পর্যবেক্ষণকারিণী উত্তর করল: হ্যাঁ, সে দু' দিন সম্ভবতঃ তিন দিন বাঁচতে পারে। আমি ছ ফ্রাঙ্কে কাজটা করতে পারি।

সে চীৎকার করে উঠল; ছ ফ্রাঙ্ক। ছ ফ্রাঙ্ক! তুমি কি পাগল নাকি? আমি তোমাকে বলছি মা পাঁচ-ছ ঘণ্টার বেশি বাঁচবে না।

দুজনেই একগুঁয়ে, তাই দর কষাকষি চলল অনেকক্ষণ। অবশেষে পর্যবেক্ষণকারিণী বাড়ী যাবার ভাণ করল—এদিকে সময় চলে যাওয়ায় গম ভেতরে আনা যাবে না তাই কৃষকটি রাজী হ'ল: আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি ছ ফ্রাঙ্কে রাজী—দেহ যতক্ষণ না সরান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত। 'রাজী, ছ ফ্রাঙ্ক।'

সে গম তুলতে চলে গেল, গমগুলো জ্বলন্ত রোদে পড়েছিল। পর্যবেক্ষণকারিণী ঘরে ফিরে এল।

সে তার হাতের কাজ সংগে করে নিয়ে এসেছিল, যতক্ষণ সে মুমূর্ষু আর মৃতদের দেখাশোনা করত ততক্ষণ সে সেলাই করে—কখনও নিজের জন্য, কখনও সেই সব পরিবারের জন্য, যারা তাকে দুটো কাজের জন্য নিয়োগ করে, সেলাইয়ের জন্য বাড়তি পয়সা দেয়।

হঠাৎ সে জিগ্যেস করল; মাদার বনটেম্‌পস্‌, আপনি শেষ অনুষ্ঠান করেছেন?

কৃষাণী মাথা নাড়ল আর ধার্মিক মাদার রাপেট লাফ দিয়ে উঠল: হায় ভগবান্! আপনি কি বলছেন? আমি গিয়ে পুরুতকে ডেকে আনি।

আর সে তাড়াতাড়ি চলল পুরুতের বাড়ী, এত তাড়াতাড়ি যে পার্কের ছোট ছোট ছেলেরা তাকে প্রায় ছুটতে দেখে ভাবল যে নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকবে।

পুরুত গায়ে তার বিশেষ চাদর জড়িয়ে তখনই এল; আগে আগে একজন ছোকরা গায়ক ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এল যাতে লোকে জানতে পারে যে গ্রীষ্মের শান্তিপূর্ণ গ্রামের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের দেহ চলে যাচ্ছে। দূরে যে-সব লোক কাজ করছিল তারা রোদ-টুপি খুলে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যতক্ষণ না পুরুতের বিশেষ চাদর গোলার আড়ালে অদৃশ্য হ'ল; মেয়েরা শস্যকণা কুড়োতে কুড়োতে সোজা হয়ে দাঁড়াল ক্রুশ চিহ্ন আঁকার জন্য, কালো মুরগীগুলো ভয়ে গর্তের ধার দিয়ে তাড়াতাড়ি চলল ঝোপের মধ্যে তাদের গর্তের দিকে—তার মধ্যে শীঘ্রই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। মাঠের মধ্যে একটা অশ্বশাবক দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল, চাদর দেখে সে ভয় পেয়ে গোড়ালির সংগে বাঁধা দড়ির চারপাশে বৃত্তাকারে দৌড়তে আরম্ভ করল। লাল আঙরাখা-গায়ে ছোকরা গায়ক জোর কদমে চলল; পুরুত ঠাকুর ঘাড় কাৎ করে আর গায়ে চৌকো পোষাক জড়িয়ে তার পিছু পিছু চলল বিড় বিড় করে মন্ত্র বলতে বলতে। মাদার রাপেট পুরুত ঠাকুরের পোষাকের শেষাংশটুকু ধরে দ্বিগুণ বেঁকে চার্চের মত হাতদুটো জড় করে চলল।

অনর তাদের দূর দিয়ে যেতে দেখল। সে জিগ্যেস করল: পুরুতমশাই কোথায় যাচ্ছেন?

মালিকের চেয়ে যার কল্পনাশক্তি প্রখর সেই ভাড়াটে লোকটা বলল: নিশ্চয়ই উনি আপনার মায়ের জন্য পবিত্র মহাযজ্ঞ নিয়ে যাচ্ছেন।

কৃষকটি অবাক্ হ'ল না: 'সেটা খুবই সম্ভব' এবং সে তার নিজের কাজে চলে গেল।

মাদার বনটেমপ্‌স স্বীকারোক্তি করল, ক্ষমা পেল এবং পবিত্র যজ্ঞ করল, দু'টি স্ত্রীলোককে শ্বাসরুদ্ধ ঘরের মধ্যে রেখে পুরোহিত চ'লে গেল।

মাদার রাপেট মুমূর্ষু স্ত্রীলোকটির দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকাতে লাগল যদি সে বেশিক্ষণ বাঁচে।

সন্ধ্যা হয়ে এল: অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাতাস বাড়ীর মধ্যে বইতে লাগল ঝোড়ো হাওয়ার সাথে। একটা সস্তা তৈলচিত্র দুটো পিন দিয়ে দেওয়ালে টাঙান ছিল—সেটা দেওয়ালে ঠোক্কর খেল। জানলার পর্দাগুলো একসময় যেগুলোর রং ছিল সাদা—এখন কালের সঙ্গে সঙ্গে যাদের রং মেচেতার মত আর হলদেটে হয়েছে—তাদের দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন পালাবার পথ খুঁজছে, মুক্তি পাবার বাসনায় সংগ্রাম করছে—ঠিক ঐ বুড়ীর আত্মার মত।

নিষ্কম্প চোখ খোলা বুড়ীকে দেখে মনে হয় যেন সে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে—মৃত্যু যা অতি নিকটে কিন্তু যদিও তার আসতে দেরি হচ্ছে। ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য তার সদিজমা গলা দিয়ে একটু ঘড় ঘড় শব্দ বেরোচ্ছিল; শীঘ্রই এর ইতি হবে আর পৃথিবীতে একজন স্ত্রীলোক কমবে এবং তার জন্য কেউই দুঃখ পাবে না।

রাত হ'লে অনর ফিরল। বিছানার কাছে এসে দেখল তার মা এখনও বেঁচে রয়েছে এবং মা পীড়িত হলে সর্বদাই যেমন সে প্রশ্ন করে তেমনই করল: তোমার কেমন লাগছে?

মাদার রাপেটকে এই ব'লে সে পাঠিয়ে দিলে: কাল ভোর পাঁচটায়—নিশ্চয়ই আসবে।

সে বলল: ঠিক আছে, কাল ভোর পাঁচটায়। সে সত্যি ভোরবেলায় এসে হাজির হ'ল।

অনর তখন ঝোল খাচ্ছিল—কাজে যাবার আগে সে তৈরি করেছিল নিজের জন্যে। পর্যবেক্ষণকারিণী বলল, আচ্ছা, তোমার মা কি মারা গেছে?

সে বদমায়েসের মত চোখ পিট্‌পিট্‌ করে উত্তর দিল:

না, মনে হচ্ছে একটু ভাল। আর সে বাড়ী থেকে চ'লে গেল।

মাদার রাপেট ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিল, সে মৃতপ্রায় স্ত্রীলোকটির কাছে গেল, স্ত্রীলোকটির অবস্থা একই রকম ছিল; সে খুব কষ্টে শ্বাস নিচ্ছিল, অনড় হয়ে পড়েছিল, তার চোখ দুটো খোলা আর হাত দুটো চাদরটাকে আঁকড়ে ধরা ছিল।

পর্যবেক্ষণকারিণী বুঝল যে এই অবস্থা দু'দিনও চলতে পারে, চারদিন অথবা সপ্তাহ ধরেও চলতে পারে এবং একটা আতঙ্ক তার মত কৃপণের বুকে চেপে বসল। সেই সংগে সে সেই চালাক লোকটি যে তাকে ফাঁদে ফেলেছে আর স্ত্রীলোকটি যে মর-মর করেও মরছে না তাদের উপর রেগে উঠল।

যাই হোক, সে তার কাজ করে গেল এবং মাদার বনটেম্‌পসের কুঞ্চিত মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করল।

অনর দুপুরে খাওয়ার জন্য এল: সে খুব খোশমেজাজে ছিল; খাওয়ার পর সে আবার বেরুল। সে নিশ্চয়ই গম ভালভাবে ভেতরে তুলতে পারছে।

মাদার রাপেট ক্রমেই রাগে ফুলে উঠছিল। যতই সময় যাচ্ছে ততই তার মনে হচ্ছে সেই সময়টা নষ্ট হচ্ছে এবং সময়ের আর এক নাম অর্থ। এই একগুঁয়ে বুড়ী, এই জেদী বুড়ীটাকে গলা চেপে ধরার আর একটি মাত্র মোচড়ে এই ক্ষীণ দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করার একটি আদিম বাসনা সে তার বুকের মাঝে অনুভব করল—এর জন্যে তার সময় আর টাকা দুই-ই নষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু সে ভেবে দেখল যে তাতে ঝুঁকি নেওয়া হবে; এবং আকস্মিক অনুপ্রেরণায় সে বিছানার কাছে গেল।

সে প্রশ্ন করল: তুমি কি যমকে কখনও দেখেছ?

মাদার বনটেম্‌প্‌স বিড় বিড় করে বলল: না।

তারপর সেই পর্যবেক্ষণকারিণী এই মুমূর্ষু বৃদ্ধাকে ভয় দেখাবার জন্য গল্প বলতে লাগল।

সে বলল, মরার কিছুক্ষণ আগে যম দেখা দেয় মুমূর্ষুকে। তার হাতে একটা ঝাঁটা থাকে আর তার মাথায় থাকে রান্নার পাত্র আর সে খুব জোরে চীৎকার করে। যখন সে দেখা দেয়, তখন সবই প্রায় শেষ, মুমূর্ষুরা আর কিছুক্ষণই বাঁচে। এবং সেই বৎসরই তার উপস্থিতিতে কতজনের কাছে যম এসেছে তার ফিরিস্তি শোনাল—যোশেফিন লয়জল, য়ুলানি র‍্যাটার, সোফি প্যাডাগল, সেরাফিন গ্রসপিড।

গল্প শুনে খুব অভিভূত হয়ে মাদার বনটেম্‌প্‌স বিছানায় নড়ে উঠল, মাথা ঘুরিয়ে ঘরের পিছন দিক দেখার চেষ্টা করল।

হঠাৎ মাদার রাপেট বিছানার শেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাক থেকে একটা চাদর নিল, নিজের গায়ে জড়াল; মাথায় চাপাল রাঁধবার পাত্র যার তিনটি ছোট ছোট বাঁকান পা তিনটি শিংয়ের মত আটকে রইল; ডান-হাতে নিল একটি ঝাঁটা আর বাঁ-হাতে একটা টিনের বালতি—শব্দ করার জন্য সে সেটাকে শূন্যে ছুঁড়েছিল।

মাটিতে পড়ে তা থেকে প্রচণ্ড শব্দ হ'ল; তখনি পর্যবেক্ষণকারিণী একটি চেয়ারে উঠে বিছানার পায়ের কাছের পর্দা তুলে বেরুল। বিচিত্র অংগভংগি করে আর পাত্রটি যা দিয়ে সে তার মুখ ঢেকেছিল—তার ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ চীৎকার তুলল—পাঞ্চ আর জুডির প্রদর্শনীর যমের মত ঝাঁটা তুলে সে সেই বৃদ্ধা মুমূর্ষু কৃষাণীকে শাসাতে লাগল।

ভয়ে আত্মহারা হয়ে মাদার বনটেম্‌পস্ উঠবার আর পালাবার জন্য অতিমানবীয় প্রচেষ্টা করলে; সে তার কাঁধ আর বুকটাকে বিছানা থেকে তুলেছিল; তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে পড়ে গেল। সব শেষ।

মাদার রাপেট শান্ত চিত্তে সব কিছু যথাস্থানে রাখল—ঝাঁটাটিকে তাকের এককোণে, চাদরটাকে তাকের মধ্যে, পাত্রটাকে অগ্নিস্থানে, বালতিটাকে তাকের উপর, চেয়ারটাকে দেওয়ালের সংগে ঠেস দিয়ে। তারপর সে পেশাদারের মত মৃতা স্ত্রীলোকের চোখ দু'টি বুজিয়ে দিল, বিছানার উপর একটি তালা রাখল, তারপর সামান্য পবিত্র জল ঢালল, দেরাজের উপরে পেরেক দিয়ে আটকান কাঠের শাখাটাকেও ভেজাল আর নতজানু হয়ে মৃতের জন্য প্রার্থনা করতে লাগল—তার পেশার জন্য যা সে ভালভাবেই জানে।

সন্ধ্যায় অনর এসে দেখল যে সে প্রার্থনা করছে আর তখনি সে হিসেব করে দেখল যে মাদার তার কাছ থেকে এক ফ্রাঙ্ক জিতে যাচ্ছে—কেননা সে মাত্র তিনবেলা আর একরাত্রি কাটিয়েছে—যার জন্য তার পাওনা হয় পাঁচ ফ্রাঙ্ক—কিন্তু সে তাকে ছ ফ্রাঙ্ক দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের ইংরেজী অনুবাদের তালিকা

শ্রীসুধাময়ী মুখোপাধ্যায়

(১৯১৪) গীতালি র র ১১

*আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি— Sheaves– 'Safety'– In my heart, I have cut a path
*আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে—Poems 56 –Thou hast come again
*এই শরত আলোর কমলবনে Lover's Gift 57– This autumn is mine (included in Sangeet Natak Akademi 100 songs Vol. I)
*যখন তুমি বাঁধছিলে তার, সে যে বিষম ব্যথা Fruit Gathering 49– The pang was great (202)
*পথ দিয়ে কে যায় গো চলে—Fruit Gathering 7 –Alas, I cannot stay in the house (179)
*যেথায় থাক না দ্বারে —Fruit Gathering 8 –Be ready to launch forth (179)
*আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে—V.B.Q. Vol. XII Part III Touch my life with the magic of thy fire
- Sheaves– The Magic Jewel of Fire Touch my soul with the magic jewel of fire
*তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে Sheaves –Song of the Boat If thy open wind hit the sail
*এক হাতে ওর কৃপাণ আছে—Sheaves –The Victor He hath a sword in one hand
- Poems 56—With a sword in his right hand
*শুধু তোমার বাণী নয়গো হে বন্ধু হে প্রিয় Fruit Gathering 59 –When the weariness of the road (206)
*নারে নারে হবে না তোর স্বর্গ সাধন Sheaves –The Lover –Not the path of heaven for thee
*অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে— Sheaves –The Harp of Fire– How dost thou strike
*ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু– Poems 57 Forgive my langour (Facsimile of the poet's hand writing)
কাণ্ডারী গো যদি এবার পৌঁছে থাক কূলে V.B.Q. Vol. XXIV No. 2 Autumn 1958 Tr. by the author
ফুল ত আমার ফুরিয়ে গেছে—Sheaves The Last Offering –The flowers are finished
*তোমার কাছে এ বর মাগি—Sheaves –A Boon—Grant thou me this boon
*আপন হতে বাহির হয়ে—Sheaves –The Invitation –Come out of thyself
*মেঘ বলেছে যাবো যাবো'— Fruit Gathering 61—The cloud said to me "I vanish" (204)
*বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ Sheaves—Half and Half—The net is spread over the world
ঘরের থেকে এনেছিলেম প্রদীপ জ্বেলে—Fruit Gathering 17 –I brought out my earthen lamp
তোমায় সৃষ্টি করব এই ছিল মোর পণ– Fruit Gathering 33—When I thought. I would mould you (190)
আমি পথিক পথ আমারি সাথী— Lover's Gift—The road is my wedded companion (262)
*সন্ধ্যাতারা যে ফুল দিল —Sheaves –My Part—The flower that the evening star offered
*এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো —Fruit Gathering 65—May be there is one house (211) (included in Sangeet Natak Akademi 100 songs Vol. I)
এখানে তো বাঁধা পথের অন্ত নাই — Fruit Gathering 6—Where roads are made. I lose my way (178)

যা দেবে তা দেবে তুমি— Fruit Gathering 14—My portion of the best in this world (182)
*পান্থ তুমি পান্থজনের সখা—Fruit Gathering 13—To move is to meet you (182)
জীবন আমার যে অমৃত—Fruit Gathering 21—I will meet one day the life (185)
*পথের সাথী, নমি বারম্বার—Crossing 78—Comrade of the road (284)
গতি আমার এসে Sheaves—There and Then—When my moving steps come to a halt
*অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো— Fruit Gathering 58—Yours is the light that breaks forth (206)
*ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়—Fruit Gathering 39—The wall breaks asunder (196)
(included in Sangeet Natak Akademi 100 songs Vol. I No. 12)
*যখন তোমায় আঘাত করি Crossing 23—I came nearest to you (274)
কেমন করে তড়িৎ আলোয় দেখতে পেলেম- Fruit Gathering 50—In the lightning flash of a moment (202)
যাসনে কোথাও ধেয়ে Sheaves—Open thy Eyes- Run not anywhere
এই তীর্থ দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণে—Crossing 75 Guests of my life

(১৯১৬) বলাকা র র ১২

ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা— A Flight of Swans No. 36—O the youthful. the unripe
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো—Crossing No. 22—It is the destroyer who comes
—A Flight of Swans No. 2—Now the All-Destroying is come
আমরা চলি সমুখ পানে —A Flight of Swans No. 3—We march forward
তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে কেমন করে সইব—Indian Ink (Annual) Cal. 1914 The Trumpet—Tr. by the author
—Reprinted in Fruit Gathering 35 The Trumpet lies in the dust (191)
—A Flight of Swans Your trumpet lies in the dust
মত্ত সাগর দিল পাড়ি —Indian Ink (Annual) 1914—'Crossing'—Tr. by the author
—Reprinted in Fruit Gathering 41—The Boatman is out crossing (196)
—A Flight of Swans No. 5—On this dark night, my boatman has gone crossing
তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা—Lover's Gift 42—Are you a mere picture (261)
—A Flight of Swans No. 6—Art thou a picture. only a picture
—*Modern Review*, Sept. 1922—'Picture'—Tr. K. C. Sen
একথা জানিতে তুমি ভারতঈশ্বর সাজাহান -Lover's Gift 1- You allowed your Kingly power
—A Flight of Swans 7—This you knew. O Emperor Shah Jahan
—Presidency Coll. May 1918—Tajmahal Tr. by K. C. Sen, March 1930. Prose Tr. by S. N. Moitra
—Presidency Coll. Mag. 1918—'Tajmahal' Tr. by K. C. Sen, By S. N. Moitra
হে বিরাট নদী, অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল—Fugitive I—Dark by you sweep on (405)
—A Flight of Swans 8— O Great River, Your unseen silent towers flow ceaselessly
কে তোমারে দিল প্রাণ —A Flight of Swans 9—Who gives you life, O stone
হে প্রিয় আজি এ প্রাতে—Lover's Gift 2—Come to my garden (abridged) (255)
—A Flight of Swans 10—O Beloved, This noon what shall I bring thee

হে মোর সুন্দর, যেতে যেতে পথের—Fruit Gathering 36 -When mad in their mirth (193)
—A Flight of Swans 11—O Beautiful one! when in mad revetry
V. B. Q. October 1923- -Judgment by K. C. Sen

তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে, গেল দিন- Fruit Gathering 28—Time after time, I came to your gate (188)
—A Flight of Swans 12—Day and night this thought is always in me

পউষের পাতাঝরা তপোবনে আজি—Lover's Gift 10—A message came from my youth (abridged) (260)
--A Flight of Swans 13—Why does the mad spring wind

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে- -A Flight of Swans 14- Because of the 'Tapasya'

মোর গান এরা সব শৈবালের দল – A Flight of Swans 15—My song are like water plants
—*Modern Review*, Dec. 1922- My songs, they are like moss
-By K. C. Sen

বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি উঠে অট্টহাসি—Lover's Gift 58—Things throng and laugh loud in the sky (265)
A Flight of Swans 16 -The massive universe breaks out in laughter

হে ভুবন আমি যতক্ষণ- -Crossing 72-- When my heart did not kiss you (281)
—A Flight of Swans 17—O World, As long as I loved thee not
V. B. Q. III August 1937 -Exchange of Gifts

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি ততক্ষণ Fruit Gathering 9 When I lingered among my hoarded treasure (179)
A Flight of Swans 18- -As long as I am stagnant

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে Fruit Gathering 53 I have kissed this world (203)
A Flight of Swans 19 -I have loved the world
--*Modern Review*, Nov. 1922--I have loved the world's face
Tr. by K. C. Sen

আনন্দ গান উঠুক বাজি-- A Flight of Swans 20—Let the strains of jubilant song

ওরে তোদের ত্বর সহে না আর --Lover's Gift 52—Tired of waiting, you burst your bonds (263)
- A Flight of Swans 21—O Ye, ye could not wait

যখন আমায় হাতে ধরে আদর করে ডাকলে—Fruit Gathering 10- -You took my hand and drew me (180)
—A Flight of Swans —When to your side you called me caressingly.

কোন্ ক্ষণে সৃজনের সমুদ্রমন্থনে উঠেছিল দুই নারী Lovers's Gift 54- -In the beginning of time (264)
-A Flight of Swans 23 At the beginning of creation
Presidency College Magazine March 1921 -The Two Maidens
- Tr. by Samir Mukherji

স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা ভাই--Lover's Gift 49—Where is heaven? You ask me (263)
—A Flight of Swans 24--O Brother. Do you know. where heaven is

যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল—Lover's Gift 33- The boisterous spring
-A Flight of Swans 25 -The spring that once came

এবার ফাল্গুনের দিনে, সিন্ধুতীরের—Lover's Gift 11—It was only the budding of leaves
—A Flight of Swans 26—On this spring morning, along the sea-side way

আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা—Fruit gathering 32—My King was unknown to me (190)
—A Flight of Swans 27 –My King remains unknown to me
পাখীরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান—Fruit Gathering 78—To the birds, you gave song (214)
—A Flight of Swans 28—To the bird, you have given song
যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা —F. G. 80—You did not know yourself (215)
A.F.O.S. 29—When you were alone
এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার —F. G. 42—I cling to this living raft (198)
—A. F.O.S. 30 —On this tiny raft, I shall cross the river of life
নিত্য তোমার পায়ের কাছে—F.G. 77—The world is yours at once (214)
—A.F.O.S. 31—With all its riches, your universe lies at your feet
আজ এই দিনের শেষে—A Flight of Swans 32—The sunset sky put a jewel in her glistening hair
জানি আমার পায়ের শব্দ রাতে দিনে শুনতে—F. G. 81—You in your timeless watch (216)
—A.F.O.S. 33—My footsteps, I know you hear night and day
আমার মনের জানালাটি আজ হঠাৎ গেল খুলি—F. G. 68—Suddenly the window of my heart
A.F.O.S. 34—To-day, the window of my heart opens suddenly
আজ প্রভাতের এই আকাশটি—A.F.O.S. 35—When dew falls as tears from the morning sky
—V.B.Q. July 1923—With the song, I am a song—Translated by K. C. Sen
সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোত—Fugitive III—29—When like a Flamming Scimitar (447)
—A.F.O.S. No. 1—The meandering current of the Jhelum
—March of India, February 1949—Flying Cranes—Tr. by Lila Roy—Reprinted in 'Kashmir' 1.12.50
—Presidency College Magazine March 1939—'Wild Swans'—Tr. by Lalitmohan Chatterji
দূর হতে কি শুনিস্ মৃত্যুর গর্জন ওরে দীন—F.G. 84—Do you hear the tumult (218)
—A. F. O.S. 37—Do you hear the tumult of death afar
সবদেহের ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণী—Fugitive II—15—I have donned this new robe (421)
—A.F.O.S. 38—This yearning of my body
যেদিনে উদিলে তুমি বিশ্বকবি—A.F.O.S. 39—To William Shakespeare—O Universal Poet
এইক্ষণে মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়ন বাতায়নে—Lover's Gift—There is a looker on (260)
—A.F.O.S. 40—You who looked out through the window
যে কথা বলিতে চাই—A.F.O.S. 41—All this I long to say
—Fugitive III No. 2—I have looked on this picture in many a month of March
তোমারে কি বার বার করেছিনু অপমান—Crossing 16—You came to my door in the dawn
—A.F.O.S. 42—You I have humiliated again and again
*ভাবনা নিয়ে মরিস্ কেন খেপে—A.F.O.S. 43—Why do you plague yourself with worries
যৌবনরে তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে—A.F.O.S. 44—F. O Youth, must you remain imprisoned
পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি—Poems No. 58—Pilgrim, the night of the weary old year
—A.F.O.S. 45—The last tired night of the year

আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাকো (উৎসর্গ)—V. B. Q. Jan. 1924—Dedication—To W. W. Pearson—Thy nature is to forget thyself (457)

(১৯১৬) ফাল্গুনী র র ১২

ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া—Modern Review, Aug. 1934—Breezy April, Vagrant April
—V. B. Q. April 1926—April
—Another Translation of this song in 'Cycle of Spring'—
—(Complete Translation of ফাল্গুনী by the author)—O South wind, the wanderer, come and rock me
'Full translation of ফাল্গুনী
—'Cycle of Spring'—in collected poems and plays (333-401)

(১৯১৮) পলাতকা র র ১৩

পলাতকা—ঐ যেখানে শিরীষ গাছে—Fugitive III—20—Days were drawing out as the winter ended (437)

মালা—আমি যেদিন সভায় গেলেম প্রাতে—V.B.Q. III—4 (1926) Jan.—The Wreath of Victory (abridged)

কালো মেয়ে—মরচে পড়া গরাদে ঐ ভাঙা জানালাখানি—Fugitive II 2—Behind the rusty iron gratings of theopposite window

ঠাকুরদাদার ছুটি—তোমার ছুটি নীল আকাশে—Fugitive III—12—Take your holiday, my boy (433)

হারিয়ে যাওয়া—ছোট্ট আমার মেয়ে—Fugitive III—13—In the evening, my little daughter (434)

(১৯২২) শিশু ভোলানাথ র র ১৩

শিশু ভোলানাথ ওরে মোর শিশু ভোলানাথ—Poems 63—O my child, my infant Shiva

তালগাছ—তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে—Sheaves—The Palm—Standing on the leg

রবিবার—সোম' মঙ্গল, বুধ এরা—Sheaves—Sunday—Monday, Tuesday, Wednesday and all other days come quickly from afar

মনে পড়া—মাকে আমার পড়ে না মনে—V. B. Q.—May-July 1936, Reprinted in poems 64—I cannot remember my mother

জ্যোতিষী—ঐ যে রাতের তারা—Sheaves—Star Maidens—Look at the stars, mother

সংশয়ী—কোথায় যেতে ইচ্ছা করে—V. B. Q. Feb-Apr. 1936—Reprinted in poems 65—You ask me, mother

রাজমিস্ত্রী—বয়স আমার হবে তিরিশ—Sheaves—The Mason—You think, I am a little child

বাণী বিনিময়—মা যদি তুই আকাশ হতিস্—Sheaves—Enchange—If you were the sky, mother

(১৯২২) লিপিকা ২৬

পায়ে চলার পথ—এই তো পায়ে চলার পথ—Fugitive III 36—The day grew dim, The early evening star faltered
—Golden Boat—'Pathway'

মেঘলা দিনে—রোজই থাকে সমস্ত দিন কাজ—Golden Boat (1932)—A cloudy day

—Hindusthan Standard Daily 18-12-52—On a Cloudy Day—By S. Moitra

বাণী—ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি——Fugitive III—9—The clouds thicken (432)

মেঘদূত—মিলনের প্রথম দিনে বাঁশি—Fugitive II—9—When we two first met (422)

—Golden Boat—Cloud Messenger

—V. B. Q. August-October 1950—Cloud Messenger—by S. Moitra

সন্ধ্যা ও প্রভাত—এখানে নামল সন্ধ্যা—Golden Boat (1932)—Eastern Eve and Western Dawn

পুরাণো বাড়ি—অনেক কালের ধনী গরীব হয়ে—Fugitive III 22—The house lingering on (439)

গলি—আমাদের এই গলি বাঁকানো—Fugitive III 21—Our Lane is tortuous (438)

একটি চাউনি—গাড়িতে ওঠবার সময়—Fugitive II 4—While stepping into the carriage (417)

—Eastern Post, Cal. Winter 1955-56—Glance Tr. by Sheila Chatterji

একটি দিন—মনে পড়ে সেই দুপুর বেলাটি—Fugitive II 3—I remember the day (416)

—Golden Boat 1932—A rainy noon

কৃতঘ্ন শোক—ভোরবেলায় সে বিদায় নিলে—Fugitive II 22—She went away when the night was about to wane (424)

সতেরো বছর—আমি তার সতেরো বছরের জানা—Fugitive II 24—The name she called me by (425)

প্রথম শোক—বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল—Fugitve II 27—I was walking along a path (426)

প্রশ্ন - শ্মশান হতে বাপ ফিরে এল - --Fugitive II 21—The father came back (423)

—Hind. Std., 8-5-56—The Child Question—Tr. by H. P.Chattopadhyaya

গল্প—ছেলেটির যেমনি কথা ফুটলো, অমনি সে বললে—Golden Boat—Tell me a story

মীনু - মীনু পশ্চিমে মানুষ হয়েছে—Golden Boat—Meenu

নামের খেলা—প্রথম বয়সেই সে কবিতা লিখতে শুরু করে—Golden Boat—Name

ভুল স্বর্গ—লোকটি নেহাত্ বেকার ছিল—Fugitive III 26—The man had no useful work (443)

—Golden Boat 1955—A wrong man in workers' paradise

রাজপুত্র—রাজপুত্র চলেছে নিজের রাজ্য ছেড়ে—Golden Boat—The Prince

—Hind. Std., Annual 1945—The Fairy Prince—by Khitish Ray

বিদূষক—কাঞ্চীর রাজা কর্ণাট জয় করতে গেলেন—Fugitive II—3 —The general came before the silent andangry king (428)

সুয়োরাণীর সাধ—সুয়োরাণীর বুঝি মরণকাল এল —Golden Boat 1955—The Favourite Queen

ঘোড়া—সৃষ্টির কাজ প্রায় শেষ হয়ে যখন ছুটির ঘণ্টা বাজে—Golden Boat—The Horse—Parrots Training

—The Trialof the Horse—By Surendranath Tagore

কর্তার ভূত—বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশশুদ্ধ সবাই বলে উঠলো—Parrot's Training—Old Man's Ghost

—Golden Boat—The Ghost

তোতা কাহিনী—এক যে ছিল পাখী, সে ছিল মূর্খ—Parrot's Training and other stories—Parrot's Training

—The New Age 8-5-55—The Tale of a Parrot

অস্পষ্ট জানালার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়—Golden Boat—Seen in Half light

পট—যে শহরে অভিরাম—Fugitive II—30—A painter was selling picture (427)

নতুন পুতুল—এই গুণী কেবল পুতুল তৈরি করত—Golden Boat—New Dolls and Old

—Sunday Std. Madras 23-5—The New Dolls—by Anjali Sarkar

উপসংহার—ভোজরাজের দেশে যে মেয়েটি—Golden Boat—The Last song

পুনরাবৃত্তি—সেদিন যুদ্ধের খবর ভালো ছিল না—Golden Boat—The Trophy of Victory
—Hind. Std. Ann. 1962—Repetition—by S. Moitra

সিদ্ধি—স্বর্গের অধিকারে মানুষ বাধা পাবে না—Fugitive III 23—In the depths of the forest (441)
—Golden Boat—Attainment—Alone in the depth of the forest

প্রথম চিঠি—বধূর সঙ্গে তার প্রথম মিলন—Fugitive III 18—With the morning, he came out (436)

রথযাত্রা—রথযাত্রার দিন কাছে—Fugitive III 19—The day came for the image (436)

মুক্তি—বিরহিণী তার ফুলবাগানের একধারে—Golden Boat—Salvation —Sunday Std. Madras
8-5-55—Deliverance—By Anjali Sarkar

পরীর পরিচয় - রাজপুত্রের বয়স—Fugitive III 27—It is said that the forest (445)
—Hindushan Standard Annual 1950—The Fairy Revealed
By S. Moitra
—Golden Boat 1955—The Fairy reveals Herself
Sunday Standard Madras 6-5-56—The Way of a Fairy—By
Anjali Sarkar

প্রাণমন—আমার জানালার সামনে—Golden Boat—Life and Mind

আগমনী—আয়োজন চলেইছে—Fugitive I 21—Why these preparations (413)
—Hindusthan Standard 4-4-54—A song of the coming—
by Somnath Moitra

স্বর্গমর্ত্য—মাটির প্রদীপখানি—Golden Boat—Heaven and Earth

কণিকা [সংযোজন]—এবার মনে হল—Fugitive I 33—Fiercely they rend in pieces

ভ্রম সংশোধন

ভাদ্র সংখ্যা ৫৬৫ পৃষ্ঠায়—"হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে"—

(১) মডার্ণ রিভিউ ১৯২২ এপ্রিলে প্রকাশিত কবিতার (Pilgrim) উল্লেখ ভুলক্রমে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(২) Visva Bharati Quarterly : January 1939 স্থলে 1929 হবে।

'বলাকা'র ৪৫ নং কবিতা—"পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি—"

(১) Poems 58—The last tired night of the year

(২) Modern Review, April 1922—Pilgrim

সংযোজিত হবে :

গীতালি—"মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে"—Fruit Gathering 24—"The night is dark
(486)

বিদেশের কথা

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

মাল্টা

ভূমধ্যসাগরের প্রায় মধ্যস্থানে অবস্থিত তিনটি ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টি মাল্টা গত ২১শে সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে। ১৮০২ সালে ব্রিটেন ফ্রান্সের দখল থেকে ঐ দ্বীপপুঞ্জটি ছিনিয়ে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার মাল্টাকে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করার প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু মাল্টাবাসীরা গণভোটের মাধ্যমে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তবে স্বাধীন হওয়ার পরেও মাল্টা কমনওয়েলথে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

যে তিনটি দ্বীপ নিয়ে মাল্টা দ্বীপপুঞ্জ, তাদের নাম মাল্টা, গোজো ও কোমিনো। মাল্টার আয়তন ৯৫ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ ২ হাজার। গোজোর আয়তন ২৬ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ২৭ হাজার, আর কোমিনোর আয়তন মাত্র এক বর্গমাইল ও দ্বীপটি প্রায় জনশূন্য। অর্থাৎ, সদ্য স্বাধীন মাল্টার আয়তন ১২২ বর্গ মাইল ও লোকসংখ্যা তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার। এমন একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ভারতের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন, কারণ এদেশের যে-কোন রাজ্যের ক্ষুদ্রতম জেলাও মাল্টার চেয়ে বড়।

প্রাকৃতিক সম্পদেও মাল্টা দীন, কোন উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ নেই সেদেশে। এমন কি একটি নদী বা ঝর্ণারও অস্তিত্ব নেই মাল্টায়; কৃষি ও পানীয় জলের জন্য মাল্টাবাসীদের নির্ভর করতে হয় বৃষ্টির জলের উপরে। বৃষ্টির প্রতি ফোঁটা জল একারণে মাল্টাবাসীরা সযত্নে ধরে রাখে। তার পর যে সামান্য ফসল ফলে মাল্টায়, তাতে মাল্টাবাসীদের প্রয়োজন পূরণ হয় না। একারণে খাদ্য, বস্ত্র এবং প্রায় যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য মাল্টাকে অন্যান্য দেশের শরণ নিতে হয়। এই ভাবে পরনির্ভর একটি দেশের স্বাধীন ভাবে চলা খুবই কঠিন। এই কারণে তার দেড় হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, কখনও সে স্বাধীন থাকে নি। ফিনিশিয়-রোমান-আরব-তুর্কী-স্পেনীয় শাসকদের হাতে পর পর শাসিত হওয়ার পর মাল্টা চ'লে যায় ফ্রান্সের দখলে। তার পর ফরাসী সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উনিশ শতকের প্রারম্ভে মাল্টাবাসীরা নিজেরাই ব্রিটেনের শরণাপন্ন হয়। মাল্টার আমদানি-রপ্তানির হিসাব পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় যে, ঐ দেশটি দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য কতটা অন্যের উপর নির্ভরশীল। ১৯৬১ সালে মাল্টা রপ্তানি করে প্রায় সাড়ে ছেচল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের পণ্য, আর আমদানি করে দুই কোটি পঁচানব্বই লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের পণ্য। এই আমদানি-রপ্তানিজনিত বিরাট ঘাটতি এতদিন পূরণ হয়েছে ব্রিটেনের রাজস্বভাণ্ডার ও মাল্টায় অবস্থিত নৌঘাটির জন্য ব্রিটিশ সরকারের ব্যয় থেকে। কিন্তু ব্রিটেন চলে যাওয়ার পর দশ বছরের মধ্যে ব্রিটিশ নৌঘাটি মাল্টা থেকে সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হবে এবং ব্রিটেনের রাজস্বভাণ্ডার থেকেও মাল্টা আর ঘাটতি পূরণের টাকা পাবে না। সুতরাং ইতিমধ্যে অন্য উপায়ে মাল্টা স্বয়ংসম্পূর্ণ না হ'তে পারলে মাত্র ১২২ বর্গমাইল ভূমিসম্বল ক্রমবর্ধিষ্ণু মাল্টাবাসীদের খুবই সঙ্কটের সম্মুখীন হ'তে হবে।

অবশ্য মাল্টার শাসকবর্গ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন এবং এ কারণে ইতিমধ্যেই মাল্টায় বহু ছোট শিল্প গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু মাল্টা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে পর্যটন ব্যবসায়ের উপর। ভূমধ্যসাগরীয় ঐ দ্বীপ-পুঞ্জটির পুরাকীর্তি, আবহাওয়া ও পত্রপুষ্প বিশ্বের পর্যটক-দের কাছে এক দুর্নিবার আকর্ষণ। শিক্ষিত যুবকদের বিদেশে পাঠিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্যও মাল্টা বিশেষ তৎপর। মাল্টা সরকার বেলজিয়াম, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির সঙ্গে সরকারী ভাবে ব্যবস্থা করে কর্মদক্ষ যুবকদের ঐ সব দেশে পাঠান। ১৯৪৬ থেকে

৬১ সালের মধ্যে সত্তর হাজারেরও বেশী যুবক ঐ ব্যবস্থানুসারে মাণ্টা ত্যাগ করেছে।

মাণ্টার রাজধানী ভালেট্টা একটি প্রাচীন শহর, তার লোকসংখ্যা আঠার হাজারেরও বেশী। মাণ্টায় দৈনিক সংবাদপত্র আছে পাঁচটি, তার মধ্যে দু'টি ইংরেজী ও তিনটি মাণ্টিজ ভাষায় প্রকাশিত।

জাম্বিয়া

আফ্রিকার আরও একটি দেশ উত্তর রোডেশিয়া ২৪শে অক্টোবর স্বাধীনতা লাভ করে এবং স্বাধীন হওয়ার পর তার নাম হয় জাম্বিয়া। জাম্বিয়ার আয়তন ২,৯০,৫৮৭ বর্গমাইল, এবং ৬৩ সালের হিসাব অনুসারে লোকসংখ্যা ৩৫ লক্ষ ৪০ হাজার। তাদের মধ্যে ৭২ হাজার শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশী এবং এশীয় ও মিশ্রজাতীয় কিঞ্চিদধিক এগার হাজার। আয়তন ও জনসংখ্যার হিসাব থেকেই বোঝা যাবে, জাম্বিয়া জনবিরল দেশ। প্রতি বর্গমাইলে লোক-বসতি ঘনত্ব মাত্র আট।

প্রাকৃতিক সম্পদেও জাম্বিয়া সমৃদ্ধ, তার সবচেয়ে বড় সম্পদ্ তামার খনি, যা থেকে বছরে সাড়ে তেত্রিশ কোটি ডলার আয় হয় তার। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই জাম্বিয়ার অধিবাসীরা তামার ব্যবহার জানত, পরে ইংরেজ উপনিবেশীরা এসে ঐ সব তামার খনিকে বিরাট শিল্পে পরিণত করে। কোবাল্ট ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ধাতব পদার্থও পাওয়া যায় জাম্বিয়ায়। জাম্বিয়ার খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য তার কৃষিক্ষেত্রে অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ। জাম্বিয়ার অন্যতম আকর্ষণ ভিক্টোরিয়া জল-প্রপাত। নায়গ্রার চেয়েও উঁচু ও প্রশস্ত ঐ জলপ্রপাতটি বিশ্বের পর্যটকদের অবশ্য-দ্রষ্টব্যগুলির বিশেষ একটি।

জাম্বিয়ার শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীরা সেখানকার কোন রাজনৈতিক সমস্যা নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা বা দক্ষিণ রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গদের মত কোন বিশেষ রাজনৈতিক অধিকার তারা ভোগ করে না। জাম্বিয়ার মোট জমির মাত্র ২·৫ শতাংশ আছে শ্বেতাঙ্গদের অধিকারে। জাম্বিয়ার আইন সভার ৭৫টি আসনের মধ্যে মাত্র ১০টি সংরক্ষিত আছে শ্বেতাঙ্গদের জন্য। এই বছর জানুয়ারী মাসে যে নির্বাচন হয় তাতে দশটি আসনই অধিকার করে শ্বেতাঙ্গদের দল ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পার্টি। ঐ দলটির সঙ্গে জাম্বিয়ার বর্তমান শাসকদলের কোন বৈরিতা নেই।

জাম্বিয়ার প্রেসিডেণ্ট কেনেথ কাউণ্ডাও বহিরাগত-দের সম্বন্ধে উদার নীতি পোষণ করেন। তিনি বলেন, বহিরাগত যে-সব নরনারী জাম্বিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তাঁরা যদি জাম্বিয়াকে তাঁদের মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করেন তবে জাম্বিয়ায় নিরাপদে ও সসম্মানে থাকার ব্যাপারে তাঁদের কোনই অসুবিধা হবে না। বিদেশীদের স্থান দেওয়ার মত যথেষ্ট জায়গা আছে জাম্বিয়ায়।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে জাম্বিয়ায় যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে কেনেথ কাউণ্ডার নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ন্যাশনাল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পার্টি ৭৫টি আসনের মধ্যে ৫৫টিতে জয়ী হন। হ্যারী এনকুম্বলার নেতৃত্বাধীন প্রধান বিরোধী দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস পান ১০টি আসন। কাউণ্ডা এবং এনকুম্বলা এক সময় একই দলে ছিলেন এবং প্রেসিডেণ্ট কাউণ্ডা এখনও তাঁর প্রাক্তন সহকর্মী ও বর্তমান বিরোধী দলনেতা এনকুম্বলার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। অনেকটা গণতন্ত্রের মৌলিক প্রয়োজনেই আজ জাম্বিয়ায় দু'টি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাম্বিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক যথেষ্ট নিকট ও সৌহার্দপূর্ণ হওয়ার সুযোগ আছে। জাম্বিয়ার সর্বজনশ্রদ্ধেয় জননেতা কেনেথ কাউণ্ডা নিজেকে গান্ধীবাদী বলে পরিচয় দেন। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও অহিংসা তাঁর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ। গান্ধী-অনুসৃত পথেই তিনি জাম্বিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত করেন এবং শাসকপক্ষের শত প্ররোচনাতেও সে-পথ থেকে বিচ্যুত হন না। জেলেও তিনি গান্ধীর লেখা পড়ে সময় কাটাতেন। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে কেনেথ কাউণ্ডা জাম্বিয়ার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর প্রশাসনিক সাফল্য ও জাম্বিয়ার অগ্রগতি ভারতবাসী মাত্রেরই আনন্দের কারণ হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারত সারা বিশ্বের বন্ধুত্বলাভের জন্য প্রাণপাত করলেও তার প্রকৃত বন্ধুর

সংখ্যা খুবই নগণ্য। সেইদিক থেকে বিচার করলে জাম্বিয়ার বন্ধুত্বের মূল্য ভারতের কাছে সীমাহীন।

কানাডায় বিক্ষোভ

গ্রেটব্রিটেনের রাণী ও কানাডার রাষ্ট্রপ্রধান এলিজাবেথের কানাডা সফরকে কেন্দ্র করে এবার কানাডায় খুব রাজনৈতিক চাঞ্চল্য দেখা দেয়। রাণীর সফর অবশ্য উপলক্ষ্যমাত্র, বিক্ষোভের প্রকৃত কারণ উত্তর আমেরিকার ঐ বিশাল দেশটির দুই প্রধান জাতীয়তার ক্রমবর্ধমান বিরোধ।

কানাডার এক কোটি আশি লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় পঞ্চান্ন লক্ষ ফরাসী, বাকি সকলে ইংরেজ অথবা ইংরেজী ভাষী। ঐ পঞ্চান্ন লক্ষ ফরাসীর মধ্যে আবার পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি বাস করে শুধু কুইবেক প্রদেশে। ১৭৬৩ সালে ইংরেজরা কুইবেক ফরাসীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কানাডার সঙ্গে যুক্ত করে। তারপর দু'শ বছর ধরে সম্পদবহুল ঐ দেশটিতে ইংরেজ ও ফরাসীরা মিলে-মিশে একটি জাতি গঠনের চেষ্টা করেছে, কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায় যে, ঐ সংহতির প্রয়াস খুব বেশি সফল হয় নি। কানাডার পার্লামেণ্ট ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে ইংরেজীর সঙ্গে ফরাসীও সরকারী ভাষা। কুইবেক প্রদেশেও ইংরেজীর মত ফরাসী সরকারী ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু ফরাসীরা এইটুকু স্বীকৃতিতে সন্তুষ্ট নয়, তাদের দাবি কানাডার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের সকল বিভাগে এবং তার আটটি প্রদেশ ও দু'টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ফরাসীকে ইংরেজী-ভাষার সমান মর্যাদা দিতে হবে। ফরাসীদের মধ্যে শতকরা কুড়িজনও ভাল ইংরেজী জানে না, এ কারণে কানাডার সকল সরকারী দপ্তরে বা রেল, বন্দর, ইত্যাদি বড় বড় সংস্থায় ফরাসী পদস্থ কর্মচারীর সংখ্যা অতি নগণ্য। দেশের শিল্প উদ্যোগেও ফরাসীদের ভূমিকা নগণ্য। এ সবের সঙ্গে ধর্মীয় পার্থক্যও কানাডার ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে কম ব্যবধান সৃষ্টি করে নি। কানাডার ইংরেজরা প্রোটেষ্টাণ্ট, আর ফরাসীদের মধ্যে শতকরা সাতাশিজন ক্যাথলিক। এসব কারণে কুই-বেকের ফরাসীদের একাংশ এখন এত বিক্ষুব্ধ যে, তারা নিজেদের কানাডিয়ান না ব'লে কুইবেকোস ব'লে পরিচয় দেয় এবং কুইবেককে কানাডা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তারা একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ঐ বিচ্ছেদ-কামীরাই রাণী এলিজাবেথের কানাডা সফরকালে একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভ সংগঠনের চেষ্টা করে। তারা রাণী এলিজাবেথকে কানাডার রাষ্ট্রপ্রধান ব'লে স্বীকার করতে চায় না। রাণী তাদের মতে 'এ্যাংলো-স্যাক্সন সাম্রাজ্য-বাদের প্রতীক' যে 'সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন' থেকে তারা মুক্তি পেতে চায়। রাণীর সফরের পূর্বে কুইবেকের ফরাসী পত্রিকাগুলির মাধ্যমে এমন গুজব পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে যে, রাণী কুইবেক সফরে গেলে ফরাসী সন্ত্রাসবাদীরা তাঁকে হত্যা করতে পারে। কানাডা সরকারের দৃঢ়তার জন্য অবশ্য শেষ পর্যন্ত রাণীর কানাডা সফর নির্বিঘ্নে শেষ হয়, এবং নিশ্ছিদ্র পুলিশ প্রহরার মধ্যে বুলেট-প্রুফ গাড়িতে চেপে রাণী কোনরকমে কুইবেক সফর শেষ করে আসেন।

কিন্তু কুইবেকের ফরাসীদের খুব সহজে শান্ত বা নিরস্ত করা যাবে ব'লে মনে হয় না। কানাডার প্রধান জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি কুইবেকে খুবই দুর্বল। সেই প্রদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জীন লেসেজ ও তাঁর সমর্থকরা "আমরাই আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা" এই ধ্বনি দিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। তাঁরা অবশ্য মুখে কুইবেকের স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করেন না, কিন্তু কানাডার ইংরেজ-প্রভাবিত জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ সুস্পষ্ট।

ব্রিটেনে শ্রমিক শাসন:

তের বছর বাদে শ্রমিক দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে আবার ব্রিটেনের শাসন দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে শ্রমিক দল যুদ্ধজয়ী চার্চিলের নেতৃত্বে পরিচালিত রক্ষণশীল দলের বিরুদ্ধে আশাতীত সাফল্যলাভ করে ব্রিটেনের শাসনা-ধিকার লাভ করেন। কিন্তু পাঁচ বছর পরে আবার যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে শ্রমিক দল জয়ী হ'লেও আগের বারের মত সাফল্য অর্জন করতে পারেন না। মাত্র সাত ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মিঃ এটলী

আবার মন্ত্রিসভা গঠন করেন কিন্তু সেই সামান্য সংখ্যা-গরিষ্ঠতাকে তিনি শ্রমিক দলের পক্ষে জাতির সুনিশ্চিত রায় ব'লে ভাবতে পারেন না। এ কারণে কিঞ্চিদধিক এক বছরের ব্যবধানে, ১৯৫১ সালে আবার ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন হয়। সে নির্বাচনে শ্রমিক দল রক্ষণশীল দলের চেয়ে ভোট বেশি পেলেও হাউস অফ কমন্সে রক্ষণশীল সতরটি বেশি আসন লাভ করেন, এবং স্যার উইনষ্টন চার্চিলের নেতৃত্বে আবার ব্রিটেনে রক্ষণশীল শাসন কায়েম হয়। তারপরেই নীতি ও কর্মসূচী নিয়ে শ্রমিক দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং তার ফলে ব্রিটেনবাসীদের উপর তাদের প্রভাব হ্রাস পায়। এ কারণে পরের দু'টি সাধারণ নির্বাচনেও শ্রমিক দলকে পরাস্ত হ'তে হয়।

কিন্তু রক্ষণশীল দলের একটানা তের বছরের শাসনের বিরুদ্ধেও ব্রিটেনের জনমত ক্রমে শক্তিশালী হ'তে থাকে এবং সুয়েজ সঙ্কট, ইউরোপের খোলা বাজারে ব্রিটেনের যোগদানের ব্যর্থতা, প্রফুমো কেলেঙ্কারী এবং পরিশেষে নেতা নির্বাচনে দলাদলি রক্ষণশীল দলকে ব্রিটেনবাসীদের কাছে ক্রমে ক্রমে অপ্রিয় করে তোলে। অপরপক্ষে হ্যারল্ড উইলসনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শ্রমিক দল ক্রমে ঐক্য-বদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং ব্রিটেনের নির্বাচকদের উপর তাঁদের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রায় এক বছর আগেই নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, শ্রমিকদলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা হঠাৎ কোন কারণে ক্ষুণ্ণ না হ'লে তাঁদের সাফল্য অনিবার্য হবে। শেষ পর্যন্ত তাদের ভবিষ্যৎ বাণীই সত্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু শ্রমিক দলের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা আশানুরূপ হয় নি। হাউস অব কমন্সের ৬৩০টি আসনের মধ্যে তাঁরা পেয়েছেন ৩১৭টি, রক্ষণশীল দল পেয়েছেন ৩০৪টি এবং তৃতীয় দল উদারনীতিকরা পেয়েছেন ৯টি। অর্থাৎ, শেষোক্ত দুই দলের মিলিত শক্তির চেয়ে শ্রমিক দল মাত্র চারটি আসন বেশি পেয়েছেন। বলা বাহুল্য, এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিরাপদ নয়, মৃত্যু বা অনিবার্য কারণে অনুপস্থিতি যে-কোন মুহূর্তে এই সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার অবসান ঘটাতে পারে। সে-কারণে শ্রমিকদলের কোন কোন নেতা লিবারেল দলেরও সঙ্গে কোয়ালিশন করার প্রস্তাব করেছেন। লিবারেল দলেরও তাতে খুব আপত্তি নেই, কারণ অবিলম্বে আবার একটা সাধারণ নির্বাচনের ঝুঁকি তাঁরাও নিতে চান না। কিন্তু শ্রমিক দলের ইস্পাত জাতীয়করণের প্রস্তাব তাঁরা মানতে রাজী নন, এবং শ্রমিক দলও তাঁদের নির্বাচনী ফতোয়া পুরাপুরি কার্যকরী করতে দৃঢ়সঙ্কল্প। এ অবস্থায় "লিব-ল্যাব কোয়ালিশন" হওয়া একটু কঠিন হবে। সুতরাং শ্রমিক দলের সাফল্যে যাঁরা আনন্দিত হয়েছেন, শ্রমিক দলের ক্ষমতাসীন থাকার অনিশ্চয়তা ইতিমধ্যেই তাঁদের চিন্তিত করে তুলেছে।

শ্রমিক দলের সঙ্গে এশিয়া ও আফ্রিকার প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের একটা আত্মিক সংযোগ আছে। কারণ শ্রমিক সরকারই ভারত, বর্মা, সিংহল প্রভৃতির স্বাধীনতা ত্বরান্বিত ক'রে যে উপনিবেশ-বাদ-বিরোধী অভিযান সুরু করেন তারই ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে অর্ধশতাধিক দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। আজও ব্রিটেনে শ্রমিক শাসন রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গদের মুক্তি অভিযানকে নতুন করে অনুপ্রাণিত করে তুলেছে। এই মুহূর্তে কোন কারণে শ্রমিক শাসনের অবসান খুবই দুর্ভাগ্যজনক হবে।

ক্রুশ্চভের পদত্যাগ ঃ

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী পদ হ'তে নিকিতা ক্রুশ্চভের হঠাৎ অন্তর্ধান সারা বিশ্বকে ব্যথিত ও বিচলিত করে। যুদ্ধক্লান্ত বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা-কল্পে তাঁর অনলস প্রয়াস ও ষ্টালিনি সন্ত্রাস থেকে কম্যুনিষ্ট দেশগুলিকে মুক্ত করার ব্যাপারে তাঁর অভাবিত সাফল্য সারা বিশ্বের শান্তি ও মুক্তিকামী মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে, এবং সকলেই আশা করেন যে, শক্তিশালী সোভিয়েট জনগণের অধিনায়করূপে অনতি-বিলম্বে তিনি বিশ্ববাসীর সম্মুখে এমন আদর্শ স্থাপন করতে পারবেন, যা দীর্ঘকাল ন্যায় ও শান্তির পথের একমাত্র দিগদর্শনরূপে সার্বজনীন স্বীকৃতিলাভ করবে। কিন্তু সোভিয়েট নেতৃত্ব হ'তে তাঁর হঠাৎ অপসারণ বিশ্ববাসীর

সেই আশাকে সাংঘাতিকভাবে আহত করে। ক্রুশ্চভের পদত্যাগের কারণ এখনও পর্যন্ত সঠিক জানা যায় নি, তবে বিভিন্ন মহল থেকে প্রকাশিত সংবাদে মনে হয়, বর্তমান সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বিরোধই এর জন্য মুখ্যত দায়ী। গোড়ার দিকে নানা রকম কথা শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট নেতারা যা বলেন তা সত্য হ'লে বুঝতে হবে যে, ক্রুশ্চভ না থাকলেও তাঁর নীতি সোভিয়েট ইউনিয়ন পূর্বের মতই অনুসরণ করবে। কম্যুনিষ্ট তথা অকম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে ক্রুশ্চভের সমর্থনে প্রবল প্রতিক্রিয়াই বোধহয় নূতন সোভিয়েট নেতৃত্বকে আপাতত সংযত করেছে। ক্রুশ্চভের শাসনকালে সোভিয়েট ইউনিয়ন সারা বিশ্বের বিভিন্ন মহলে যে শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করেছে, এখনই ক্রুশ্চভ-বিরোধী জেহাদ ঘোষণা করলে তা যে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হবে এটা হয়ত নতুন সোভিয়েট কর্ণধাররা বুঝতে পেয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট জনসন জয়ী

প্রেসিডেন্ট জনসন মার্কিন জনগণের বিপুল সমর্থন লাভ করে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসন-দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর ভোটের পরিমাণ নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের সব অনুমান অতিক্রম ক'রে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের ইতিহাসে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যের মধ্যে ৪৪টি প্রেসিডেন্ট জনসনকে সমর্থন জানিয়েছে, এবং ৫৩৮টি নির্বাচনী ভোটের মধ্যে ৪৮৬টি গেছে তাঁর অনুকূলে। প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান প্রার্থী সেনেটর গোল্ডওয়াটার মাত্র ছয়টি বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণী রাজ্যের ও ৫২টি নির্বাচনী ভোটের সমর্থন পেয়ে শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করেছেন। সাধারণ ভোটের হিসাবে দেখা যায়, জনসনের পক্ষে গোল্ডওয়াটারের চেয়ে প্রায় দেড় কোটি ভোট বেশি পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রেসিডেন্ট ইতিপূর্বে এত বেশি ভোটের ব্যবধানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করতে পারেন নি। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মহান্ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ১৯৩৬ সালে এক কোটি দশ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়ই এতদিন বৃহত্তম জয়রূপে স্বীকৃত ছিল।

প্রেসিডেন্ট জনসনের এই বিরাট্ সাফল্য তাঁর জনপ্রিয়তার চেয়েও গোল্ডওয়াটারের সঙ্কীর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল নীতির প্রতি মার্কিণ জনগণের বিরূপতা বেশি প্রমাণ করে। কারণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডিমক্রাট দল যে বিপুল সমর্থন লাভ করেছেন কংগ্রেসের দুই সভার সদস্য নির্বাচনে বা গভর্ণর নির্বাচনে সেরকম সমর্থন তাঁরা পান নি। এতে এইটাই প্রমাণ হয় যে, রিপাবলিকান দলের লক্ষ লক্ষ সমর্থক দলের প্রতি অনুগত থেকেও গোল্ডওয়াটারের বিরুদ্ধে জনসনকে সমর্থন করেছেন। আর দলকে যে তাঁরা এখনও সমর্থন করেন তার প্রমাণ দিয়েছেন অন্যান্য নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থীদের সমর্থন করে। নিউ ইয়র্ক, কালিফোর্ণিয়া, উইসকিনসন, কানসাস, কলোরাডো, ইলিনয়, ওকলাহোমা, ওয়াশিংটন, ফ্লোরিডা, মনটানা, নেভাদা প্রভৃতি রাজ্য গত নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থীকে সমর্থন জানালেও এবার ডিমক্রাটিক প্রার্থীর পক্ষে সমবেত হয়ে রিপাবলিকান প্রার্থীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সরকারী মহল মার্কিণ নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে মন্তব্যকালে বলেছেন, যুদ্ধবাদী গোল্ডওয়াটারকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত ক'রে মার্কিণ জনগণ প্রমাণ করেছেন, তাঁরা শান্তির পক্ষে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে।

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

মূল্যমানের তুলনামূলক বিচার

গত আশ্বিন সংখ্যায় ও তার পূর্বে ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় আমরা ভারতীয় মূল্যমান সম্বন্ধে কিছু তথ্য বিশ্লেষণ করেছি। তার পরও দেখা যায় যে, মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত গতিতে চলেছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে বিবিধ উপায়ে এই গতিরোধের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা। ঠিক কোন্ কারণে বা কোন্ কারণগুলির সমন্বয়ে বর্তমান মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে তাই নিয়ে এ যাবৎ বহু আলোচনা হয়েছে ; কারও মত হচ্ছে কৃষিপণ্যের উৎপাদন হ্রাসই এর অন্যতম কারণ—অপর একজন বলেন, সরকারী মুদ্রা ও রাজস্ব-নীতির অদূরদর্শিতা, আবার অপর একদল বলেন, অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজিই এর জন্য দায়ী। সম্ভবতঃ সবগুলিই কিছু পরিমাণে দায়ী। পূর্বের প্রবন্ধগুলিতে আমরা যে-সব তথ্য উপস্থিত করেছি তার থেকে সঠিক কারণ সম্বন্ধে মোটামুটি এক আভাস পাওয়া যায়।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা অন্যান্য দুই-একটি দেশের take off period-এর সময়কার মূল্যমানের গতির সঙ্গে আমাদের মূল্যমানের সাদৃশ্য বা পার্থক্য-সংক্রান্ত কিছু তথ্য উপস্থিত করছি। ইংলণ্ডের take off period বলা যেতে পারে ১৭৮৩ থেকে ১৮০২ পর্যন্ত ; যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৪৩ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত। ঐ দু'টি পর্বের সঙ্গে আমাদের take off period-এর মূল্যমান তুলনা করা নানান কারণেই ঠিক সম্ভব নয়। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তা ছাড়া Index number তৈরীর উপাদান ও পন্থাও প্রভূত বদলেছে ; উপরন্তু সরকারী ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যকলাপের পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিরও প্রচুর বদল ঘটেছে। এ সব পার্থক্যের কারণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সাদৃশ্যও কিছু কিছু আছে, কেননা মূল অর্থনৈতিক নীতি বা মতবাদ মোটামুটি তুলনীয়। চাহিদা ও সরবরাহের দ্বারা, মূল্য নির্ধারিত হবে এবং ব্যক্তিগত লাভের তাগাদায় লোকে পণ্য উৎপাদন করবে, এই মূল নীতি প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে। তাই যদিও তিনটি দেশের তিনটি বিভিন্ন সময়ের মূল্যমান বিচার করে আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারব না, তবু এই তুলনা থেকে আমরা পরবর্তীকালের জন্য কিছু চিন্তার উপকরণ পেতে পারি।

নিম্নলিখিত তালিকাতে তিনটি দেশের মূল্যমান উল্লেখ করা হ'ল—

ইংলণ্ড (১৭৯০=১০০)			যুক্তরাষ্ট্র (১৭৯১=১০০)			ভারতবর্ষ ১৯৫২-৫৩=১০০				
(১) বছর	(২) মূল্যসূচক	(৩) বাৎসরিক শতকরা বদল	(১) বছর	(২) মূল্যসূচক	(৩) বাৎসরিক শতকরা বদল	(১) বছর	(২) মাসের শেষ সপ্তাহের গড়	(৩) বাৎসরিক শতকরা বদল	(৪) মাসিক গড়	(৫) বাৎসরি শতকর বদল
১৭৮২	১১৫	...	১৮৪০	৯৭	...	১৯৫১-৫১	...	...	১১৮	...
১৭৮৩	১১৫	...	১৮৪১	৯৬	(−)১·০	১৯৫২-৫৩	১০০	...	১০০	(−)১৫
১৭৮৪	১০৭	(−)৭	১৮৪২	৮৩	(−)১৩·৫	১৯৫৩-৫৪	১০১·২	(+)১·২	১০৪·৬	(+)৪·৬
১৭৮৫	১০৪	(−)২·৮	১৮৪৩	৮১	(−)২·৪	১৯৫৪-৫৫	৮৯·৬	(−)১১·৫	৯৭·৪	(−)৬·৯
১৭৮৬	৯৮	(−)৫·৮	১৮৪৪	৮৫	(+)৫·০	১৯৫৫-৫৬	৯৯·২	(+)১০·৭	৯২·৫	(−)৫·০
১৭৮৭	১০০	(+)২·০	১৮৪৫	৮৮	(+)৩·৫	১৯৫৬-৫৭	১০৫·১	(+)৫·৯	১০৫·২	(+)১৩·
*১৭৮৮	১০০	...	১৮৪৬	৮৯	(+)১·১	১৯৫৭-৫৮	১০৬·১	(+)·৯৫	১০৮·৪	(+)৩·০
১৭৮৯	৯৮	(−)২·০	১৮৪৭	৯৮	(+)১০·১	১৯৫৮-৫৯	১১২·১	(+)৫·৭	১১২·৯	(+)৪·
১৭৯০	১০০	(+)২·০	১৮৪৮	৮৭	(−)১১·২	১৯৫৯-৬০	১১৮·৭	(+)৫·৪	১১৭·১	(+)৩·
১৭৯১	১০২	(+)২·০	১৮৪৯	৮৬	(−)১·১					
			১৮৫০	৯৩	(+)৮·১	১৯৬০-৬১	১২৭·৫	(+)৭·৪	১২৪·৯	(+)৬·
**১৭৯২	১০৭	(+)৪·৯	১৮৫১	৯২	(−)১·১					
*১৭৯৩	১১৪	(+)৬·৫	১৮৫২	৯৭	(+)৫·৪	১৯৬১-৬২	১২২·৯	(−)৩·৬	১২৫·১	(+)·২
১৭৯৪	১১২	(−)১·৮	১৮৫৩	১১১	(+)১৪·৪	১৯৬২-৬৩	১২৭·৪	(+)৩·৭	১২৭·৯	(+)২·
১৭৯৫	১৩৪	(+)১৯·৬	১৮৫৪	১২২	(+)৯·৯	১৯৬৩-৬৪	১৩৯	(+)৯·১	১৩৫·৩	(+)৫·
*১৭৯৬	১৪৪	(+)৭·৫	১৮৫৫	১২৭	(+)৪·১					
*১৭৯৭	১২৬	(−)১২·৫	১৮৫৬	১২৮	(+)০·৮					
১৭৯৮	১৩৬	(+)৭·৯	১৮৫৭	১৩৩	(+)৩·৯					
১৭৯৯	১৫০	(+)১০·৩	১৮৫৮	১০৫	(−)২১·১					
**১৮০০	১৬২	(+)৮·০	১৮৫৯	১০৮	(+)২·৯					
*১৮০১	১৭৬	(+)৮·৬	১৮৬০	১০৪	(−)৩·৭					
**১৮০২	১৩৭	(−)২২·২	১৮৬১	১০৬	(+)১·৯					
*১৮০৩	১৪৭	(+)৭·৩	১৮৬২	১৫৭	(+)৪৮·১					

* বাণিজ্যচক্রে মন্দা সুরুর বছর

** বাণিজ্যচক্রে চড়া বাজার সুরু

তিনটি দেশের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক পার্থক্য প্রচুর ; (নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন ইংলণ্ডের ব্যবসাবাণিজ্য ও মূল্যমান কি ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল তার চিত্র বর্তমান মূল্যসূচকে প্রতিফলিত হচ্ছে আংশিক ভাবে, আমেরিকার গৃহযুদ্ধের প্রতিফলনও বর্তমান তালিকায় সবটা ফুটে উঠছে না) তা সত্ত্বেও মূল্যমানের ধারা তুলনামূলক ভাবে দেখলে সাদৃশ্য ও পার্থক্য উভয়ই বিশেষ ভাবে নজরে পড়ে।

প্রথম পনেরো বছরে ইংলণ্ডের বা যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যমান উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে যতটা উঠেছে তার সঙ্গে আমাদের মূল্যমানের ঊর্দ্ধ গতি তুলনীয়। আর আমাদের Take off পর্বের ঠিক পূর্বে মূল্যমান কতটা বেড়েছে তা পাব তৃতীয় তালিকায়। এরই সঙ্গে তুলনীয় গত শতাব্দীর শেষাংশ থেকে তিনটি দেশের মূল্যের গতি ; দ্বিতীয় তালিকায় সেই তথ্য উপস্থিত করছি—

প্রথম যুদ্ধকালীন মূল্যবৃদ্ধির হিসাব বাদ দিয়ে দেখা যাচ্ছে ইংলণ্ডে ১৮৮৬র তুলনায় ১৯৪০এ মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে ৮৫.৫% শতাংশ ; যুক্তরাষ্ট্রে ৩৭.২% এবং ভারতবর্ষে ৫৭.৫%।

পূর্ব এক প্রবন্ধে আমরা দেখেছি ১৯২৯ এর তুলনায় ১৯৩৯এ ভারতবর্ষের মূল্যমান ১০০ থেকে ৭৭এ নেমে এসেছিল, আর ইংলণ্ডে ৯১ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৮১। এর থেকে মনে প্রশ্ন আসে, অন্যান্য দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারতবর্ষের মূল্যমান আরও কতদূর বাড়তে পারে ?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম পাঁচ বছরে দেখা গেছে যুদ্ধ-পূর্ব দশ বছরের (১৯২৯-১৯৩৯) মূল হ্রাসের তুলনায় পরবর্তী পর্বের মূল্যবৃদ্ধি বহু গুণ বেশি এবং অন্যান্য দেশের তুলনায়ও অত্যধিক—

	ইংলণ্ড		যুক্তরাষ্ট্র		ভারতবর্ষ	
বছর	(১) (১৮৬৭-৭৭=১০০)	(২) (১৯০০=১০০)	(১) (১৯০০=১০০)	বছর	(১) (১৯৫২-৫৩=১০০)	(২) ১৯০০=১০০
১৮৮৬	৬৯	৯৫.৮	১০২	১৮৮৬ ৯০	১৮.৬	৮৩
১৮৯০	৭২	৯৬.০	১০৫	১৮৯১-৯৫	২০.৮	৯২.৮
১৮৯৫	৬২	৮২.৭	৮৫			
১৯০০	৭৫	১০০	১০০	১৮৯৬-১৯০২	২২.৪	১০০.০০
১৯০৫	৭২	৯৬	১০৫	১৯০৩-০৭	২৩.৬	১০৫.৩
১৯১০	৭৮	১০৪	১২৫	১৯০৮-১২	২৭.৪	১২২.৩
১৯১৫	১০৮	১৪৪	১২৪	১৯১৩-১৮	৩১.৮	১৪২.০
১৯২০	২৫১	৩৩৪.৭	২৭৬	১৯১৯-২৫	৪৪.৮	২০০.০
১৯২৫	১৩৬	১৮১.৩	১৮৪			
১৯৩০	৯৬	১২৮.০	১৫৪	১৯২৬-৩০	৪০.০	১৭৮.৬
১৯৩৫	৮৩	১১০.৭	১৪৩	১৯৩১-৩৫	২৪.৪	১০৮.৯
১৯৪০	১২৮	১৭০.৭	১৪০	১৯৩৬-৪১	২৯.২	১৩০.৩

১৯৩৯ = ১০০

	ইংলণ্ড	যুক্তরাষ্ট্র	কানাডা	অষ্ট্রেলিয়া	ভারতবর্ষ
১৯৪০	১৩২'৯	১০১'৯	১০৯'৯	১১০'১	১১১'১
১৯৪১	১৪৮'৪	১১৩'২	১১৯'২	১১৬'৯	১২৮'৭
১৯৪২	১৫৫'১	১২৮'১	১২৬'৮	১৩১'৫	১৭১'৩
১৯৪৩	১৫৮'৩	১৩৫'৭	১৩২'৬	১৩৮'২	২৮৪'৩
১৯৪৪	১৬'১১	১৩৪'৯	১৩৫'৯	১৩৯'৩	২৭৫'৯

অন্যান্য যুদ্ধরত দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের মূল্য-বৃদ্ধির হারে পার্থক্য সুস্পষ্ট। ১৯২৯-এর তুলনায় ১৯৪৪-এ ভারতের মূল্যসূচক ২১২, ইংলণ্ডে ১৪৮'৫ এবং যুক্তরাষ্ট্র ১০২'৫।

মুদ্রাস্ফীতির এই চরম রূপ আমাদের দেশে যখন উপস্থিত, তারই পরে আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সুরু হয় এবং তাতে 'ডেফিসিট ফাইনান্স' (যাকে কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন "Development through inflation") অগ্রগতির এক প্রয়োজনীয় হাতিয়ার বলে গৃহীত হয়। পরিকল্পনা-পর্বের মূল্যমানের গতি নিয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব যে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ব্যাপ্ত, সেই কাঠামোর উন্নতি সাধনের জন্য কতখানি 'ডেফিসিট ফাইনান্স' করা যায় তাই নিয়ে পূর্বেও মত-ভেদ ছিল, বর্তমানে সেই মতভেদ বৃদ্ধি পেয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যে 'ডেফিসিট ফাইনান্স' প্রাধান্য পাবে না এই মর্মে যে ঘোষণা করা হয়েছে তা আনন্দের কথা। কিন্তু দেশের মূল্যমান ঠিক কোন্ স্তরে স্থিতিশীল হবে বা রাখতে হবে সে-বিষয়ে সরকার যদি অবিলম্বে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ না করেন তা হ'লে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার সম্মিলিত অঙ্ক ব্যয় করার যে শুভ সঙ্কল্প চতুর্থ পর্বের জন্য গ্রহণ করা হচ্ছে, তার কতখানি অংশ মূল্যবৃদ্ধির দরুণ ধুয়ে যাবে সে কথা বিশেষ ভাবে বিচার্য। পরিকল্পনার আকার সঙ্কোচন করার যুক্তি গ্রহণীয় নয়, কেননা আখেরে তার জন্য ক্ষতি সকলেরই; কিন্তু পরিকল্পনারই অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে মূল্যমানের গতির মধ্যেও এক পরিকল্পিত ধারা বজায় রাখা এবং সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করার সময় উত্তীর্ণ হ'তে দেওয়া বাঞ্ছনীয় হবে না।

অধিবেশনকে "অপরিমেয় সম্ভাবনার দ্বার উদ্‌ঘাটন" বলেই স্বাগত জানিয়েছেন। সম্মেলনের সভাপতি ভ্যাসিলি অ্যামিলিয়ানভ আশা পোষণ করছেন, এই মহতী শক্তি পরমাণু পৃথিবী থেকে ভয় ও সন্দেহ মোচন করে শান্তির প্রতিষ্ঠা করবে। এটাই মূল উদ্দেশ্য। সম্মেলনের আবহাওয়ায় সে উদ্দেশ্য সূচিত হয়েছে। দীর্ঘ দশ দিনের অধিবেশনে যে সহযোগিতার নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আলোচনার পথই সুগম হয় নি, দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রেও সুযোগ এনে দিয়েছে।

সম্মেলনে মোট ৭৪৯টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। শান্তিপূর্ণ কাজে পরমাণুর নানা প্রয়োগঘটিত এবং তত্ত্বগত সমস্যা তাতে আলোচনা হয়েছে। একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে সুপেয় করে তোলা, চাষযোগ্য করে তোলা। পৃথিবীতে জলের অভাব নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমুদ্রতীরবর্তী অনেক অঞ্চল চাষবাসের অযোগ্য, ফলে মানুষের বসতিশূন্য। এসব অঞ্চলই আবার শস্যশ্যামল লোক বসতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে যদি সমুদ্রের ঐ নোনা জল সুপেয় লবণমুক্ত করে তোলা যায়। তাতে পরমাণুর অফুরন্ত শক্তিই একমাত্র সমাধান। নানা রকম বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সমস্যা এর সঙ্গে জড়িত। তবে তার যদি কখনও সমাধান হয়, দুনিয়া অর্থনীতির এক বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে। সম্মেলনের বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

এই সম্মেলন বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার ভিত্তি অনেক দৃঢ় করেছে। একে অপরের সমস্যা অনুভব করেছে। একে অপরের কাছ থেকে ধারণা গ্রহণ করছে, সব মিলিয়ে একটা সম্পূর্ণ দৃষ্টিলাভ হয়েছে। সম্মেলনের সভাপতি যথার্থই বলেছেন, "এই অধিবেশন মস্ত একটা ACCUMULATOR স্টেশনের মত আমাদের প্রত্যেকের মনে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যা নিয়ে কাজ করার জন্য নূতন উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্জীবিত করেছে।" এই উৎসাহ-উদ্দীপনার ফল একটি ক্ষেত্রে অন্ততঃ বিশেষ করে অনুভূত হবে। তা হ'ল শক্তি উৎপাদন। পরমাণুর শক্তি-রহস্যকে আয়ত্তে এনে বিদ্যুৎ উৎপাদন। স্বনামধন্য বিজ্ঞানী সীবর্গ (SEABORG) বক্তৃতা দিতে গিয়ে সত্যই বলেছেন, "এই সম্মেলন উদ্বোধনের ফলে একটা নূতন যুগেরই শুরু হ'ল, তা হ'ল পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যুগ।" ১৯৫৫ সালে পরমাণু-জাত বিদ্যুতের উৎপাদন ছিল মাত্র পাঁচ কিলোওয়াট (সারা পৃথিবীতে), বর্তমানে তা পাঁচ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭০ সালের সম্ভাব্য পরিমাণ এর পাঁচগুণ, ১৯৮০ সালের মধ্যে তা বোধ হয় ১৫০ কিলোওয়াট ছাড়িয়ে যাবে। একদিন পরমাণু শক্তিই হবে দুনিয়ার শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস। সত্যই পরমাণু যুগ আজ সমাগত। তাকে নানাভাবে আমাদের বুঝে নিতে হবে। তার সমস্যাগুলি, তার সম্ভাবনাগুলি। এভাবেই সময় এগিয়ে চলবে। তবে মূল লক্ষ্য শান্তির দিকে স্থির থাকবে।

অ্যামিলানভ বলছেন, যুগের শ্লোগানই হবে এই—"প্রত্যেক পরমাণুর মিলন এবং প্রত্যেক পরমাণুর বিয়োজন—মোট কথা প্রত্যেক পরমাণুর বিস্ফোরণ, একটাই মাত্র উদ্দেশ্য সাধন করবে, তা হ'ল শান্তি।"

এই শান্তির উদ্দেশ্যেই সম্মেলনের প্রদীপ জ্বালান রয়েছে।

এ. কে. ডি

রামেন্দ্রসুন্দর

এ বছর ১৯৬৪ সাল—একটি শতবার্ষিক বছর। আজ হ'তে শত-বর্ষ আগে ১৮৬৪ সালে, বাংলার বহু মনীষী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন; এখন তাঁদের শতবর্ষপূর্তি বছর। স্যার আশুতোষ, স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ, মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর। ৫ই ভাদ্র ১৮৬৪ সাল রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম। শতবার্ষিক বছরের সূচনায় প্রবাসীর এক সংখ্যায় "পঞ্চশস্য" পর্যায়ে আমরা বাংলায় বিজ্ঞান ও দর্শন আলোচনার এই একনিষ্ঠ সাধকের সম্বন্ধে সামান্য আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম কিন্তু তা আরম্ভই মাত্র। অথবা আরম্ভ বললেও বেশি বলা হয়। সে যা হোক, আধুনিক যুগের অনেক লেখক শত বৎসরের ব্যবধানে তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন, এ সবের মধ্যে "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার "আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর সংখ্যা"টি আমাদের পক্ষে খুবই প্রীতিকর মনে হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—যে প্রতিষ্ঠান আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর আজীবন সাধনায় প্রতিষ্ঠা করে গেছেন—কিন্তু দেরি হলেও, তাঁর রচনার একটা নির্বাচিত সংকলন প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। পুরাতত্ত্ববিদ্ যেমন পুরাতন নিদর্শনগুলির মধ্য থেকে হারানো সম্পদ এবং তাৎপর্যপূর্ণ সংকেত গ্রহণ করেন, রামেন্দ্রসুন্দরও তেমনি বিজ্ঞানের বিষয়গুলির আলোচনায় খুব আধুনিকতার দাবি না করলেও তাঁর আলোচ্য বিষয়বস্তুকে স্পর্শ না করে আধুনিক ধারণার জগতের নিকট আসা যায় না। উপরন্তু, তিনি সমস্ত কিছুকে এমন একটা নিবিড় ঐকান্তিকতার স্তরে উপস্থিত করেছেন যাতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর এবং জিজ্ঞাসাবোধ উন্মুখ না হয়ে পারে না। সমস্ত বিষয়কেই তিনি আশ্চর্য আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন এই আলোই আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান ভাবনার কাছাকাছি পথ করে দেয়। রামেন্দ্রসুন্দর সে দিক্ থেকে অবশ্য-পাঠ্য।

একটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বলি: এই শতবার্ষিক বছরেই বাংলা সাহিত্যের রাজধানী কলেজ স্ট্রীটে এসেছিলাম রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনী ও রচনাবলী সংগ্রহে। রচনা ধূলিধূসরিত অবস্থায় অনেক খুঁজে যদিও বা মিলল, জীবনী নাস্তি। রামেন্দ্রসুন্দর নামে এক মহামনস্বী দিক্‌পাল যে এককালে বাংলা দেশ আলো করে ছিলেন এই নিছক বাস্তব ঘটনাই আজ তাঁর সমস্ত নিদর্শনসমেত অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সময় জটিল আবর্ত তুলে একটা মহৎ সাধনার ফসলগুলি ছত্রছন্ন করে দিয়েছে। মনে তাই নানা চিন্তা ঘনিয়ে এসেছে। অতীতের অফুরন্ত সম্পদ্ যাদুঘরের সামান্য নিদর্শনগুলির মধ্যে ধরা থাকে; এখানেও সেভাবে রামেন্দ্র-রচনাবলীর ৩টি খণ্ড থেকে সামান্য কয়টি অংশ পাঠকদের সামনে তুলে ধরলাম—রচনাবলীর পাতায় সময়ের ধুলা জমা পড়েছে—তাই আবার আজকের আলোকে তুলে ধরার এই সামান্য চেষ্টা।

* * * * * * *

"বাহ্য-জগতের যে বাহ্যতা এবং সেই বাহ্যতা মধ্যে যে চাকল্য, তাহ সমস্তই এই বহু জীবের পরস্পর আদান-প্রদান হইতে উৎপন্ন। সমস্ত Extension এবং সমস্ত Motion সেই বহু-জীবত্ব হইতেই উৎপন্ন। বহু জীব হইতেই বাহ্য-জগতের উৎপত্তি এবং বহু-জীবের কর্ম হইতেই বাহ্য জগতে কল্পিত চাকল্যের উৎপত্তি। এইরূপে আমাদের জীবনযাত্রায়

যে প্রত্যক্ষ বিরোধের অনুভূতি, সেই Perceptual ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকের বাহ্য-জগৎ, কাল্পনিক Conceptual বাহ্য-জগৎ—বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচ্য বাহ্য-জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাকে সৃষ্টি না বলিয়া বিসৃষ্টি, বিসর্গ বা বিসর্জন বলাই ভাল। জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি, চেতন জীবের-প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে যেন বাহিরে বিসর্জন করা হইয়াছে, ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে। যাহা একান্ত অন্তরের জিনিষ, তাহাকে নিতান্তই স্বতন্ত্র করিয়া শব্দরূপে, সংজ্ঞারূপে, Concept-রূপে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই Concept নিতান্তই মন-গড়া পদার্থ, কল্পিত পদার্থ, সৃষ্ট পদার্থ। সৃষ্টি করিয়া ইহাকে বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলাই ব্যবহারিক জড় জগতের সৃষ্টি। Concept-কে যদি শব্দ বলা যায়, উহার রূপ যদি বাঙ্ময় রূপ হয়, তাহা হইলে শব্দ হইতে বাহ্য-জগতের সৃষ্টি এক অর্থে সত্য। বৈজ্ঞানিকের জড় জগতের মুখ্য লক্ষণ যে ব্যাপ্ততা বা Extension, যে ব্যাপ্ততা বা Extension আকাশরূপে আমাদের নিকট পরিচিত, আমাদের শাস্ত্রে সেই আকাশকে শব্দের প্রথম প্রকাশ বলা হয়, উহাও আমরা এক অর্থে গ্রহণ করিতে পারি। আমি বলিতে চাহি, এই যে ব্যবহারিক জগৎ, এই যে বাহ্য জগৎ, এই যে জড় জগৎ, তাহা বহু জীবের অস্তিত্ব হইতেই কল্পিত; বহু জীবের মধ্যে আদান-প্রদান হইতেই উহার বিসর্গকৃতি এবং সেই বিসর্গকৃতির মধ্যে চঞ্চলা... এই যে আদান-প্রদান, ইহা বিরোধাত্মক। এই যে বিরোধটাই প্রত্যক্ষ বাহ্য জগতে বস্তুরূপে, Substance রূপে কল্পিত হয় এবং একটা Substantial জগতের বিভীষিকা লইয়া আমাদের প্রাণের উপর চাপিয়া বসে। প্রাণই এই আদান-প্রদান এবং প্রাণই এই বিরোধ। প্রাণবিদ্যা বা Biology ইহার আলোচনা করে। এই প্রাণপদার্থটাকে আর একটু ব্যাপক না ধরিলে জগৎ-প্রবাহের উৎস সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

(বৈজ্ঞানিকের আকাশ: বিচিত্র জগৎ)

* * * * *

"গৃহস্থ মাত্রেরই এই যজ্ঞ কয়টি কর্তব্য কর্ম। জগতে তিনি যে একাকী আসেন নাই, এবং একা যাইবেন না, সমস্ত জগতের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক বাঁধা আছে, সমস্ত জগৎ যে একযোগে তাঁহাকে স্থির প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, এইটি সর্বদা স্মরণ রাখিয়া জগতের যাবতীয় প্রাণীর নিকটে ঋণ স্বীকারে তিনি বাধ্য আছেন, এবং প্রত্যহ কোন-না-কোন অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিয়া, আমি যে ঋণী, এইটি সর্বদা মনে রাখিতে বাধ্য আছেন। বস্তুতঃ এই ঋণ কেহই শুধিতে পারে না; তবে এই ঋণটা স্বীকার না করিলে জগদ্ব্যবস্থার প্রতি, বিশ্বব্যাপারের প্রতি ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞা দেখান হয়। মানব, বিশ্বব্যাপারকে তুমি প্রণাম কর; এবং এই অভিপ্রায়ে প্রত্যহ কিছু-না-কিছু ত্যাগস্বীকার কর। ব্যাপক অর্থে ত্যাগেরই নামান্তর যজ্ঞ। এ স্থলে সমস্ত জগৎটাই দেবতা। জগতে যাহা কিছু আছে, সবই দেবতা। প্রত্যেকের নিকট মানুষ ঋণী এবং সেই ঋণ স্বীকারার্থে প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে কিছু-না-কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে।·· শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—"এই যে ব্রহ্মযজ্ঞ, বাক্যই এই যজ্ঞের জুহু। মন ইহার উপভৃৎ, চক্ষু ইহার ধ্রুবা, মেধা ইহার স্রুব, সত্যই ইহার অবভৃথ স্নান, স্বর্গলোক ইহার উদয়ন বা সমাপ্তি। ঋকমন্ত্র এই যজ্ঞের ক্ষীরাহুতি, যজুমন্ত্র ইহার আজ্যাহুতি, সামমন্ত্র ইহার সোমাহুতি, অথর্বাঙ্গিরস মন্ত্র ইহার মেদাহুতি, পুরাণ-ইতিহাসাদি ইহার মধু আহুতি। জল চলিতেছে, আদিত্য চলিতেছেন, চন্দ্রমা চলিতেছেন, নক্ষত্রেরা চলিতেছে। ইহাদের গতিক্রিয়া ক্ষান্ত হইলে জগদ্যন্ত্রের যে অবস্থা হয়, গৃহস্থ যে দিন অধ্যয়ন না করেন, তাঁহার গৃহেরও সেই অবস্থা ঘটে।" এই শেষের বাক্যটি আমাদের সেনেট হাউসের দরজায় (সিনেট হল আজ লুপ্ত – উদ্ধৃতিকার) খোদাই করিয়া রাখা উচিত।"

(পুরুষ-যজ্ঞ: যজ্ঞ-কথা)

* * * * *

মানুষকে সমাজের অধীন থাকিতেই হইবে; সমাজের আদেশ যুক্তিবিরুদ্ধ হইলেও মানিতে হইবে। সামাজিক জীব সমাজের অধীন; এই অধীনতার সীমা কোথায়, তাহার সদুত্তর নাই। বর্তমান প্রস্তাবে তাহার সীমা নির্ণয়ও প্রয়োজন নাই। মানুষের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এক দলকে সেই সীমারেখার এক পার্শ্বে রাখে; মনুষ্যের সমাজবশ্যতা অন্য দলকে অন্য পার্শ্বে রাখে। স্থিতিশীল ও উন্নতিশীল, উভয় দলের চিরন্তন বিরোধ। এই বিরোধের মীমাংসা কখনও হয় নাই, কখনও হইবে কি না জানি না। কিন্তু এই দলাদলি বিরোধের ফলে এই সীমারেখা ক্রমশই সরিয়া গিয়াছে। বিরোধের ফলে মনুষ্যের ব্যক্তিগত চরিত্রের ও সমাজগত চরিত্রের ক্রমেই বহুধাভাব ঘটিয়াছে। ইতিহাস সাক্ষী। অথবা প্রকৃতির বুঝি ইহাই নিয়ম। বিরোধই বোধ করি উন্নতির ও অভিব্যক্তির একমাত্র বিধাতৃনির্দিষ্ট উপায়।

(ধর্মের অনুষ্ঠান: কর্ম কথা)

* * * * *

রত্নাকরের রাম নাম উচ্চারণে অধিকার ছিল না। অগত্যা মরা মরা বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল।

এই পুরাতন পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কি না, এবিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্দ্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।......

অণুবীক্ষণ নামে এক রকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখায়, বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থ বিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও, ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ যন্ত্র একখানি সম্মুখে ধরিবা-মাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙ্গালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল পর্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: চরিত-কথা)

* * * * *

ব্যাকরণ কখনও নিয়ম বাঁধে না, উহা নিয়ম আবিষ্কার করে মাত্র

ব্যাকরণ ভাষার উন্নতির প্রতিরোধ কিরূপে করিবে, ইহা বুঝিলাম না। ভাষা স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত ও পরিবর্তিত হইবে; ব্যাকরণও নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করিবে; তাহাতে ভয় কি?

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও ত তাহাই দেখি। আমাদের এই অতি-প্রাচীন বসুন্ধরার মূর্তি যুগ ব্যাপিয়া বিকৃত হইতেছে। এই বিকৃতির নিয়ম আবিষ্কার যে বিজ্ঞানের কার্য, সেই বিজ্ঞানের নাম ভূবিদ্যা। কোটি বর্ষ পূর্বে পৃথিবীর অবস্থা যেরূপ ছিল, এখন ঠিক সেরূপ নাই। সে-সময়ে পার্থিব ঘটনা যে যে নিয়মে সঙ্ঘটিত হইত, এখন সে সে নিয়মে হয় না; আবার বহু বৎসর পরে, যখন সূর্যের তাপ মন্দ হইবে, যখন দিবাভাগের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, যখন চন্দ্রের আকর্ষণ মন্দ হইবে, তখন আর ঠিক বর্তমান নিয়মে পার্থিব ব্যাপার ঘটিবে না। কিন্তু ভূতাত্ত্বিকেরা বর্তমান কালের নিয়ম আবিষ্কার করেন বলিয়া ভূপৃষ্ঠের পরিণতি রোধ হয় না। ভাষার পক্ষেও সেই কথা। পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষার বিকৃতি রোধ করিতে পারেন নাই। সংস্কৃত ভাষা স্বাভাবিক নিয়মেই অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। অথবা বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয়া অন্য ভাষায় পরিণত হইয়াছে। কোন বৈয়াকরণ এই স্বাভাবিক বিকার রোধ করিতে পারেন নাই।

(বাঙ্গালা ব্যাকরণ ঃ শব্দ-কথা)

*   *   *   *   *

Science-এ কাজ মনন-কর্ম; বাহিরের প্রত্যক্ষগোচর কতকগুলি Percept মিলাইয়া, তাহা হইতে Concept তৈয়ার করিয়া, সেই সকল Concept-এর সম্পর্ক-নির্দ্ধারণ, ইহাই মনন-কর্ম। Inductive and Deductive logic এই মনন-কর্মের পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করে। Concept-এ পৌছিতে হইলে প্রত্যক্ষ-লব্ধ Percept-গুলিকে নাড়াচাড়া করিয়া মিলাইয়া দেখিতে হয়। প্রত্যক্ষ জগতে কোন্ ঘটনার পর কোন্ ঘটনা আসিতেছে, কোন্‌টার সঙ্গে কোন্‌টা আসিতেছে, ইহা পর্যবেক্ষণ করিতে হয়; ইহার নাম Observation বা পর্যবেক্ষণ।...কিন্তু দেখিবার সময় তিনি নিজের ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস না করিয়া পাঁচজন পথের পথিককে ডাকিয়া আনেন। পথের পথিকও একজন ছোটখাট বৈজ্ঞানিক, তাহাকেও পাঁচটি জিনিস দেখিয়া, পাঁচটা Concept খাড়া করিতে হয় বটে, কিন্তু সে আপনার Immediate Interest লইয়া, আপনার জীবিকানির্বাহের ব্যাপার লইয়া এত ব্যস্ত যে, কোনরূপ সূক্ষ্ম Concept-এ পৌছিবার তাহার অবসর নাই। সূর্য ঘুরিতেছে কিংবা পৃথিবী ঘুরিতেছে, এ বিষয়ে তাহার মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন হয় না। কেননা, ডাল-রুটি সংগ্রহ ব্যাপারে উভয়েই প্রায় তুল্যমূল্য। কাজেই সে পৃথিবীর উড়োউড়িই পর্যবেক্ষণ করে। [illegible]

সূর্যমণ্ডলে উপস্থিত হইবার তাহার প্রবৃত্তি নাই। বৈজ্ঞানিকের Interest আরও দূরব্যাপী। তিনি সাধারণ লোককে টানিয়া আনিয়া সূর্যমণ্ডলে উধাও হইয়া দৌড়িতে বলেন।···তাহার জন্য বিশিষ্ট রকমের হাতিয়ার বা Tool তৈয়ার করিতে হয়, যন্ত্র-তন্ত্র, জোড়জোড় আবশ্যক হয়। এইরূপ যন্ত্র-তন্ত্র, জোরজোড় সাহায্যে যে Observation, তাহার নাম Experiment বা পরীক্ষা। এইরূপ কোথায় দাঁড়াইয়া Observation করিতে হইবে এবং কিরূপ যন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা Observe করিতে হইবে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটাইয়া তাহা ঠিক করেন; কিন্তু Observation-এর ভারটা দেন—দশজন ইতর লোকের উপর। তাহারা Observation-এর পর যে সংবাদ দেয়—বৈজ্ঞানিক তাহাই

এইরূপে যাহা পান, তাহাই সংগ্রহপূর্বক এবং সঙ্কলনপূর্বক তাহাদের Agreements ও Differences আলোচনা করিয়া, সামান্য এবং বিশেষ ধর্মগুলি মিলাইয়া তাহাদের পৌর্বাপর্য দেখাইয়া নানাবিধ Relation বা সম্পর্ক প্রদান করেন। সাক্ষ্য গ্রহণের পর যে-সকল ফলাফল বা Result পান, সেগুলিকে Tabulate করেন, Classify করেন, generalise করেন এবং একটা general Statement দিবার চেষ্টা করেন। এই সব General Statement-কে বৈজ্ঞানিক ভাষায় Laws of Nature বা প্রাকৃতিক নিয়ম বলা হয়। Man is Mortal, এটাও যেমন একটা প্রাকৃতিক নিয়ম, Pressure of a Gas varies as its Temperature, এটাও তেমনই একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। তবে প্রথমটা আবিষ্কারে কোন বড় বৈজ্ঞানিক দরকার হয় নাই। পৃথিবীর শত কোটি আনাড়ি বৈজ্ঞানিক উহা স্থির করিয়া লইয়াছে।

(বাহ্য জগৎ : বিচিত্র জগৎ)

* * * * *

কালের কুটিল চক্রে শিক্ষা আজকাল বিজ্ঞান শিক্ষা, সাহিত্য শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, নীতি শিক্ষা, ইতিহাস শিক্ষা, হাতে-কলমে শিক্ষা বা টেক্নিকাল শিক্ষা ইত্যাদি নানা উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়া সহস্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; এবং কোন্ শিক্ষা ভাল আর কোন্ শিক্ষা মন্দ এই তর্কের কোলাহলে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এই কোলাহলের অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিতে একেবারেই অক্ষম। শিক্ষা বলিলে আমরা কেবল একটামাত্র শিক্ষাই বুঝিয়া থাকি; এবং সেই শিক্ষার অর্থ মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি, স্ফূর্তি ও পরিপুষ্টি। যাহাতে অপুষ্ট মনুষ্যত্ব পুষ্টিলাভ করে, পঙ্কিল মনুষ্যত্ব বিকাশ পায়, হীন মনুষ্যত্ব স্ফূর্তিলাভ করিয়া জাগ্রত ও চেতন হইয়া উঠে, তাহাকেই আমরা শিক্ষা নামে অভিহিত করিয়া থাকি, এবং সেই শিক্ষার আবার একটা ভিন্ন যে পাঁচটা পথ আছে, তাহাও আমাদের কল্পনায় আসে না। সত্য বটে, মনুষ্য বয়স্ক হইলে তাহাকে একটা ব্যবসায়-বিশেষ অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতে হয়—এবং সেই ব্যবসায় অভিজ্ঞতা লাভের জন্য কিছুদিন একটা সঙ্কীর্ণ রাস্তার শিকল পায়ে দিয়া বিচরণ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। কিন্তু সে বয়সের কথা, বাল্যের কথা নহে।

···বহুত্বের মধ্যে একত্ব দেখিবে; সাম্যের মধ্যে পার্থক্য দেখিবে, পাঁচবার প্রতারিত হইবে এবং প্রতারিত হইয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইবে, পুনঃপুনঃ তাহাকে প্রতারিত হইতে দিবে; যে কখন সংসারের মধ্যে প্রতারিত হয় নাই, তাহার ভাগ্যের আমি প্রশংসা করি না। সে পুনঃপুনঃ প্রতারিত হউক, তাহাকে প্রতারিত হইতে দেখিয়া তুমি দয়া করিবে না; কেবল আশার বাক্যে, উৎসাহের বাক্যে ও স্নেহের বাক্যে তাহার মনে আগ্রহের এবং প্রীতিকর ও ঔৎসুক্যের সঞ্চার কর। সে পুনঃপুনঃ প্রতারিত হউক ও অবশেষে সফলতা লাভ করিয়া পরমানন্দে ভাসিতে থাকুক; তুমি তাহার আনন্দে আনন্দ দেখাও, তাহার উৎসাহে উৎসাহিত হও, তাহার মনে উৎসাহের শক্তি আরও উদ্দীপিত করিয়া দাও। ইহারই নাম বিজ্ঞান শিক্ষা, ইহারই নাম সাহিত্য শিক্ষা, ইহারই নাম ধর্ম শিক্ষা। শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক ত্রিবিধ শিক্ষাই একই প্রণালীতে সম্পাদিত হইবে। যাহাতে শরীরে বল আসিবে, তাহাতে চিত্তে স্ফূর্তি জন্মিবে, তাহাতেই বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ লাভ করিবে, তাহাতেই ধর্মপ্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে। ইহারই নাম আবার হাতে-কলমে শিক্ষা, যে ঢেঁকিয়া না শেখে, তাহার হাতে-কলমে শিক্ষা হয় না।

(শিক্ষাপ্রণালী : নানা কথা)

গ্রন্থ-পরিচয়

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭, মূল্য দশ টাকা।

বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দী যেমন ছিল স্বর্ণযুগ, বাংলার আধুনিক ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী তেমনি একটি স্বর্ণযুগ; ইহার কারণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘাতে এদেশে সূচনা হয় এক নবযুগের। ফলে, ধর্মে, সমাজে, শিক্ষায়, সাহিত্যে এক নবরূপায়ণ চলিতে থাকে। এই রূপায়ণ-কার্যে রাজা রামমোহন রায় হইতে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় বহু মনীষী ও সংস্কারক অল্প-বিস্তর অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই যুগের এই নবরূপায়ণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে হইলে বহু তথ্যসম্ভারের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন; কিন্তু ওই তথ্যসম্ভার সংগ্রহ এক বিশেষ আয়াসসাধ্য ব্যাপার। সরকারী নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, সরকারী রিপোর্টসমূহ, সমসাময়িক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদি, মনীষিগণের দিনলিপি, চিঠিপত্র, আত্মজীবনী, সেকালের প্রখ্যাত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কার্য-বিবরণী প্রভৃতি হইতে সেই তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহারই ভিত্তিতে গবেষণা-কার্য চালাইতে হইবে। এই দুরূহ কার্য করিবার মত লোক বাংলা দেশে অতি অল্পই আছেন। এই সকল আকরের ভিত্তিতে বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে গবেষণার যে নূতন ধারা প্রবর্তিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় সেই গবেষণা-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া বঙ্গীয় সমাজের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতিতে ঢের নূতন আলোকপাত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই শ্রমসাধ্য কার্যের যে সুফল, তাহা তিনি স্বয়ং ভোগ করিয়া গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু পাঠককে তাহার সুফলটুকু দান করিয়াছেন। সমাজকে অমৃত বিতরণ করিয়া গরলটুকু নিজেই লইয়া যোগেশবাবু 'নীলকণ্ঠ' হইয়াছেন,—আজ তিনি অন্ধত্বকে বরণ করিয়াছেন।

আলোচ্যমান গ্রন্থখানি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবরূপায়ণের ইতিহাস। এই ইতিহাস দুইভাবে লিখিত হইতে পারে;—প্রথমতঃ মনীষিগণের জীবন-ভিত্তিক আলোচনায়; দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা-কেন্দ্রিক আলোচনায়। যোগেশবাবু এই গ্রন্থে এক একটি জীবনকে কেন্দ্র করিয়া নবলব্ধ তথ্যসম্ভারের ভিত্তিতে নবরূপায়ণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; দেশী-বিদেশী, বাঙালী-অবাঙালী ষোলজন মনীষীর উল্লেখযোগ্য দানের কথা লেখক স্মরণ করিয়াছেন। বাংলার নবরূপায়ণ কার্যে ঐ সকল মনীষীর মধ্যে এমন অনেকে রহিয়াছেন যাঁহাদের সার্থক দান-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ নতুবা একেবারেই নাই।

আলোচ্যমান গ্রন্থে যে ষোলজন মনীষীর জীবনী ও কীর্তিকথার মধ্য দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে আছেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, রুস্তমজী কাওয়াসজী, ডেভিড হেয়ার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন, সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী, জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন, ভগবান চন্দ্র বসু ও জেমস্ লং। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির সেবায় ইহাদের দান ভুলিবার নয়। প্রবীণ গবেষক যোগেশবাবু এই সকল মনীষীর তথ্যনিষ্ঠ জীবনই যে আলোচ্যমান গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন তাহা নয়, ব্যক্তিমানুষের জীবনের খুঁটিনাটি তথ্য পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালী সমাজের বিভিন্ন দিকে যে নব-রূপায়ণের কার্য আরব্ধ হয়, লেখক তথ্য প্রমাণের সাহায্যে তাহাও বিবৃত করিয়াছেন। অতঃপর এই গ্রন্থ-সম্পর্কে লেখকের দাবি 'এখন উনবিংশ শতাব্দীর একটি পূর্ণ রূপরেখা ইহা হইতে স্পষ্ট হইতে পারিবে' একেবারেই অমূলক নয়। যোগেশবাবুর গবেষণার পন্থাও অভিনব। ইহাতে ব্যক্তি-জীবনের নানা তথ্য বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী-জীবনের বিভিন্ন দিকেও নূতন আলোকপাত করার সুবিধা হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকাংশে স্বর্গত সজনীবাবু যে কথা লিখিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, যোগেশ-বাবুর এই পুস্তকখানি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বহু আয়াসসাধ্য গবেষণার ফল। ব্রজেন্দ্রবাবুর অসম্পূর্ণ ও অলিখিত দিক্ এইরূপে যোগেশবাবু সম্পূর্ণ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে দুই-চার জন এমন ব্যক্তির কৃতকর্মের তথ্যভিত্তিক পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, যাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কেবল ভাসা-ভাসা জ্ঞানই ছিল। প্রসঙ্গক্রমে রুস্তমজী কাওয়াসজী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তীর নাম করা যাইতে পারে। পার্শীবাগান, রুস্তমজী স্ট্রীট প্রভৃতি দানবীর রুস্তমজীর স্মৃতি বহন করিলেও কলিকাতার উন্নতি-বিধানে, জ্ঞান বিস্তারে ও জনসেবায় এই মানবহিতৈষীর দান যে অবিস্মরণীয় লেখক বিস্তৃত আলোচনার সাহায্যে আমাদের তাহা বুঝাইয়াছেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক ডিরোজিওর নিকট অধ্যয়ন করিবার সুযোগ না পাইলেও ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাব ইঁহার উপর নিপতিত হইয়াছিল। রসিককৃষ্ণ ছাত্র-জীবনের শেষ হইতে আমরণ যে ভাবে দেশের ও সমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে ডিরোজিওর প্রভাবের

কথাই আমাদের সর্বাগ্রে মনে পড়ে। স্বাদেশিকতাই যে রসিককৃষ্ণকে সকল কার্যে উদ্বুদ্ধ করিত—লেখক ইহা তথ্যভিত্তিক আলোচনায় দেখাইয়াছেন। সূর্যকুমার চক্রবর্তী সম্বন্ধেও লেখক অনেক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন।

হেনরি ডিরোজিও সম্বন্ধে আমাদের অনেকের বিরূপ ধারণা আছে বা ছিল। কিন্তু কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্বে বাংলার শিক্ষিত-সমাজে যে চিন্তা-বিপ্লবের উদ্ভব হয়, তথাকথিত ঐতিহাসিকগণ ইহাকে সমাজদ্রোহ আখ্যা দিলেও ইহা যে নূতন চিন্তার জোয়ার—আমরা তাহা অনেক সময় ভাবিয়া দেখি না। শতাধিক বৎসর পূর্বে বাঙালীর মনে যে নূতন প্রেরণা, প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য ইত্যাদি যাচাই করিয়া লইবার যে উদগ্র আগ্রহ দেখা গিয়াছিল, তাহার মূলে কোন্ কোন্ শক্তি কার্য করিতেছিল, তাহা জানিতে হইলে ডিরোজিওর কথা স্মরণ করিতেই হইবে। সে-সময়ে সমাজে যাহাকে অনিয়ম বা উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া মনে হইয়াছিল, লেখকের ভাষায় তাহাকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, 'একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠ হইতে মধ্যাহ্ন-দিবাকরের প্রচণ্ড আলোতে হঠাৎ বাহির হইলে প্রথমটা চক্ষু ঝলসিয়া যায়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আমরা তাহাতে অভ্যস্ত হই। ঐ সময়ের অবস্থাও কতকটা এইরূপ হইয়াছিল।'

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ, ও স্কুল-বুক সোসাইটি এবং ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল সোসাইটি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। লেখক প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাঙালী সমাজে যে চিন্তা-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, ঐ তিনটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা তাহার ক্ষেত্র পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছিল, আর এই ক্ষেত্রে বীজ বপনের ভার লইয়াছিলেন স্বদেশপ্রেমিক, উদার হৃদয় ও সাহিত্যপ্রাণ হেনরি ডিরোজিও। বাংলার নবযুগ প্রবর্তনের ইতিহাসে তাঁহার শিক্ষার দান অবিস্মরণীয়। লেখক যথার্থই বলিয়াছেন, 'ডিরোজিওর জীবন-কাহিনী এক-কথায় বঙ্গে নব-শিক্ষার গোড়াপত্তনের ইতিহাস।'

এইরূপে প্রত্যেকটি সংস্কারকের জীবন-কথার মধ্য দিয়া যোগেশবাবু বাংলার নব-জাগৃতির ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। মনীষীদের জীবন-ভিত্তিক আলোচনায় শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার ইতিহাসও ইঁহার দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে।

স্থূলতম গল্প-রসের যোগান দেওয়াই যে-যুগে সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, শিক্ষা যে-যুগে পরীক্ষাভিমুখী হইয়া উঠিয়াছে, সে-যুগে যোগেশবাবুর ন্যায় জ্ঞান-তপস্বী গবেষকগণ অবহেলিত হইলেও, ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাদের আসন নির্দিষ্ট হইয়া আছে। তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়া বাংলার নবযুগের ইতিহাসের অনালোচিত দিকগুলি ক্রমশঃ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তজ্জন্য সমস্ত বাঙালী জাতির তিনি ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী

জননায়ক জওহরলাল :—মণি বাগচি, রূপা প্রকাশনী, কলিকাতা-২৩। দাম চার টাকা।

জীবনীকার হিসাবে মণি বাগচির নাম ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া তাঁহার লিখনভঙ্গির গুণেই অপরাপর বইগুলি এতটা উপভোগ্য হইতে পারিয়াছে। জওহরলালের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ঘটনাই গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তাঁহার জীবন-ইতিহাসে সবচেয়ে যেটা বড় অধ্যায়—প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের কার্যক্রম, তাহাও গ্রন্থকার বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি বলিব, মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বের ঘটনাগুলিকে তিনি সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিয়াছেন। যেমন, জওহরলালের জীবনের সবচেয়ে বড় কথা তাঁহার পররাষ্ট্র নীতি। যাহার সাফল্যে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই স্তম্ভিত হইয়াছে। সেই অধ্যায়টিকে আরও ফলাও করিয়া বলা উচিত ছিল। অবশ্য তাঁর কথাতেও আছে: "১৯৫০ সন থেকে ভারত শাসন ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীরূপে নেহরুর কাজের বিরাম ছিল না। তখন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ভারতকে একটি প্রকৃত জনকল্যাণ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তাঁর চিন্তা ও কাজের অন্ত ছিল না বললেই হয়। কত সমস্যার ভেতর দিয়ে তাঁকে চলতে হয়েছিল দেশের ভিতরে ঐক্য এবং সংহতির জন্য। তাঁকে যেমন সর্বদা সজাগ ও সতর্ক থাকতে হয়েছিল, তেমনি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য তাঁর চেষ্টার বিরাম ছিল না। তিনি ত শুধু প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না, বৈদেশিক দপ্তরের দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল তাঁর ওপর। কত ধীর এবং স্থির মস্তিষ্কে তিনি এই দপ্তরের জটিল কাজ পরিচালনা করতেন তা ভাবলে পরে বিস্মিত হ'তে হয়। জোট-নিরপেক্ষ নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর বৈদেশিক নীতির সম্যক্ আলোচনা করলে পরে আমরা দেখতে পাই যে, ঘরে-বাইরে কত প্রতিকূল সমালোচনা সহ্য করে তিনি একান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত এই নীতিকে আশ্রয় করেই ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সত্যিই একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছে।"

জওহরলালকে বুঝিবার পক্ষে এই অংশটুকুই যথেষ্ট। আকারে বৃহৎ না হইয়াও, চরিত্রের সকল দিকই ইহাতে দেখান হইয়াছে। ভাষার গুণে পড়িতেও ভাল লাগে। পাঠকমহলে আদৃত হইবে আশা করি।

বিবেকানন্দের রাজনীতি :—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ৩০, ডি ডি মণ্ডলঘাট রোড, দক্ষিণেশ্বর, আড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা। মূল্য ২·৫০ নয়া পয়সা।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী অবলম্বনে গ্রন্থকার স্বামীজীর চরিত্র আলোচনা করিয়াছেন। দৃষ্টিভঙ্গি সকলের এক নয় ইহা লইয়া তর্ক চলে না। তবে মনে হয়, স্বামিজী রাজনীতি হইতে চিরদিনই দূরে ছিলেন এবং আশ্রমের বিধি-নিষেধের মধ্যে এই কথা স্পষ্টতঃ উল্লেখ দেখিতে পাই : "The aims and ideals of the Mission being purely spiritual and humanitarian, it shall have no connection with politics." যাহার জন্য নিবেদিতাকে পর্যন্ত আশ্রম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। ইহা ছাড়াও, গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত অভিমতই গ্রন্থখানিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেই ভাবনা মুখবন্ধেও প্রকাশ পাইয়াছে।

ব্যক্তিগত অভিমত লইয়া আলোচনা চলে না। তথাপি বইখানির প্রশংসা করিতেছি এই কারণে, স্বামিজীর বাণী আজকের দিনে যত প্রচার হয় ততই ভাল। স্বামিজী চাহিয়াছিলেন মানুষ গড়িতে। শরীর গঠন না হইলে, কাপুরুষের ধর্ম হয় না। যোগ-সাধনে যোগীরাও শরীর রক্ষার্থে 'আসন' করিতেন। স্বামিজীই একস্থানে বলিতেছেন, "কাপুরুষতা কিংবা রাজনৈতিক বাঁদরামোর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আমি রাজনীতি মোটেই বিশ্বাস করি না। আমার রাজনীতি- ভগবান ও সত্য, আর সব ছাই আর ভস্ম।" গ্রন্থকার নিজেই একস্থানে স্বীকার করিয়াছেন, "তবে তাঁর রাজনীতি ও প্রচলিত রাজনীতিতে তফাৎ অনেক।" একথা স্বীকার করিয়া তিনি গ্রন্থের অন্য নামকরণ করিলেই ভাল করিতেন। তবে গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। সে হিসেবে গ্রন্থখানি অমূল্য।
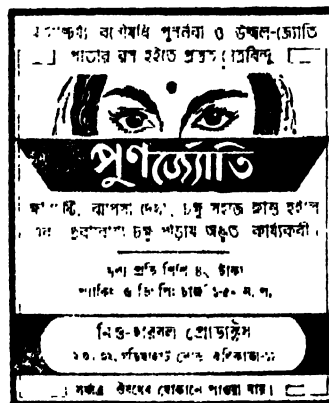
শ্রীগৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭ ২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

তৃতীয় সংখ্যা
পৌষ, ১৩৭১

কটকে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের যে অধিবেশন সম্প্রতি কটকে হইয়া গিয়াছে তাহা এই সম্মেলনের এক পর্য্যায়ে এযাবৎ যে কয়টি অধিবেশন ভারতের নানা স্থানে হইয়াছে সেগুলির অপেক্ষা অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে মনে হয়। "মনে হয়" লিখিতেছি এই কারণে যে, আমাদের বিচার নির্ভর করিতেছে অধিবেশন-ফেরৎ কয়েকজন সাহিত্যিকের মতামত এবং দৈনিক সংবাদপত্রের রিপোর্টের উপর। সম্মেলনের সবিশেষ বিবরণ ও ভাষণগুলির ছাপা বৃত্তান্ত আমাদের চক্ষুগোচর না হওয়ায় সে-সকল মতামত ও রিপোর্ট যাচাই করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা নানা প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্য সম্মেলন ইত্যাদির বিবরণ পাই—মায় তামিল পর্য্যন্ত—এবং কয়েকটি বিদেশী সাহিত্যসংস্থার বিবরণও নিয়মিতভাবে পাইয়া থাকি, সোজা ডাকযোগে কিংবা সেই দেশের দূতাবাসের সৌজন্যে। তাই তাহার কারণ ঐ সকল সাহিত্যিক সংস্থা ও সাহিত্য সম্মেলনের পরিচালকবর্গ জ্ঞাত আছেন যে, সাহিত্য সম্পর্কিত সকল কার্য্যক্রমের মূল্যায়ন সম্ভব শুধু সেই সকল পত্রিকায় যাহারা দীর্ঘদিন সাহিত্যের আসরে ঐ কাজেই বিশেষভাবে নিযুক্ত আছে।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের দিল্লীস্থ কর্ত্তৃপক্ষের এতদিনেও চেতনার উদয় হইল না যে, তাঁহাদের সংস্থার প্রকৃত গুণাগুণ বিচার সাহিত্য-বিবেচক পত্রিকাদির কষ্টিপাথরেই হইতে পারে ও উহার নিকষে স্বীকৃত মূল্যায়নই তাঁহাদের প্রয়াসের যথার্থ পরিচয়। এবং ঐ সকল পত্রিকায় বৎসরের পর বৎসর প্রকাশিত সম্যগ্‌ভাবে লিপিবদ্ধ বিবরণ ও আলোচনাই তাঁহাদের প্রয়াসের ধারাবাহিক পরিচয়। "সিনেমা-জ্যোতিষ্ক" সুলভ ক্ষণিকের ব্যক্তিগত "পাবলিসিটি" লাভের চেষ্টাই যতদিন তাঁহাদের চরম লক্ষ্য থাকিবে ততদিন এই পর্য্যায়ের বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন "নিখিল ভারতীয়" হইলেও চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত সংস্থার "খেলো সংস্করণই" থাকিবে। সাহিত্যের সেবা আতসবাজির প্রদর্শনী নয়। একথা তাঁহাদের বুঝিবার সময় হইয়াছে।

যাহাই হউক আমরা যে এত কথা লিখিলাম, তাহা অনুযোগ হিসাবে নয়; ইহা শুধুমাত্র বুঝাইবার চেষ্টায় জানাইলাম, কেননা এতটা শক্তি, সুযোগ ও বিভিন্ন সুধীজন পরিবেষ্টিত মূল্যবান তথ্যের ও চিন্তাপ্রসূত বিচারের এরূপ "অদানে অবাক্ষণে" অপচয় আমাদের কাছে ক্লেশদায়ক মনে হইয়াছে।

কটকের অধিবেশনে কয়েকজন মনীষী সুচিন্তিত ভাষণ দিয়াছেন। তাহার সারাংশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে—অন্ততপক্ষে কলিকাতায়। সেগুলির উপর কোনও আলোচনা হইয়াছিল কি না তাহার কোনও নির্দ্দেশ আমরা পাই নাই। প্রত্যক্ষদর্শী যাঁহারা আমাদের জানাইয়াছেন তাঁহারা বলেন বিশেষ কিছু হয় নাই, কেননা সেরূপ

ব্যবস্থা বিশেষ কিছু ছিল না। শাখাসাহিত্য সভাগুলিতে সভাপতি ছাড়াও অন্যেরা বলিয়াছেন শুনিলাম তবে তাহার কোনও বিশদ বৃত্তান্ত কেহই দিতে পারিলেন না।

অধিবেশনের উদ্বোধনে বিচারপতি শ্রীহরিহর মহাপাত্র যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহার সারাংশের মধ্যে আমরা সুচিন্তিত মন্তব্যের আভাস পাই 'যুগান্তর' যে সারাংশ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আছে :—

বিচারপতি শ্রীহরিহর মহাপাত্র বলেন যে, সমাজবাদী চিন্তাধারায় ভাষাকে এক নীতি, এক মাপকাঠি ও এক বর্ণের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু উহাতে সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।

তিনি বলেন যে, ভাষা কোন অঞ্চল বা রাজ্য বিশেষের সীমার মধ্য হইতে আসে নাই চেতনা, কল্পনা ও ভাবনার মধ্য দিয়াই ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে ঐ তিনের প্রকাশের মধ্য দিয়াই ভাষার যোগ্যতা বিচার করা হয় যে ভাষার মধ্যে উহা নাই, সে ভাষা টিকিতে পারে না।

তিনি বলেন যে, বাঙ্গালীরা এক মহান ভাষা ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী কিন্তু তাহাদের একথা ভুলিলে চলিবে না যে, এই ভাষা ও ঐতিহ্যের উপর ভারতের প্রতিনিধি মানবের সমান অধিকার আছে

এই মন্তব্যগুলি সাহিত্য সভার পক্ষে অত্যন্ত সমীচীন ও প্রণিধানযোগ্য এ বিষয়ে আলোচনার অবকাশ ছিল না কিন্তু বিচারপতি মহাপাত্র এই মন্তব্যগুলির ব্যাখ্যারূপে কোনও উদাহরণযুক্ত বিবৃতি দিয়াছিলেন কি না জানি না খুব সম্ভব সেরূপ কিছু ছিল না, যাহা আমরা শুনিয়াছি তাহাতে কোনও বিবরণ পাই নাই

মূল সভাপতি ছিলেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইহার ভাষণ মানসিক হইতেই বিশেষ সময়োপযোগী মনে হয়। তবে তিনি এই মতামত আরও পূর্বে এইরূপ স্পষ্ট ভাষায় দিতেন তবে দেশের লোকের আগামী দিনের 'হিন্দী দিগ্বিজয় অভিযানের সম্মুখীন হওয়ার প্রস্তুতি অনেক অগ্রসর হইয়া থাকিতে পারিত বর্তমান সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় শক্তিশালী লোকের মধ্যে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদপোষক তিনজন আছেন মধ্যমস্তরের ও সহকারী শ্রেণীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বেশ কয়েকজনই আছেন যাহারা এ বিষয়ে আরও উৎকট ধারণা পোষণ করেন। যে সকল প্রদেশের লোক হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিতে এখনও প্রস্তুত নহেন তাহাদের উচিত এবিষয়ে এখনই মুখর হইয়া উঠা।

সুনীতিবাবুর অভিভাষণে ভারতের নাগরিক ও সামাজিক জীবনে সমস্যার আধিক্যের কথার পর এক নূতন সমস্যার উল্লেখ ছিল। তিনি বলেন -

"এইরূপ শত-শত সমস্যা ও অসঙ্গতির মধ্যে, ধর্মগত বিদ্বেষের প্রতিস্পর্ধী এক নূতন ধরণের মনোভাবের এবং কর্মপদ্ধতির আবির্ভাব, প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বিগত দশ বৎসরের মধ্যে ভারতের বহু স্থলে নূতন এক উৎপাতের মত দেখা দিয়াছে—সেটির ইংরেজী নামকরণ হইয়াছে 'লিঙ্গুইজম' ইহার বাঙ্গলা করিতে পারা যায় 'ভাষাবিদ্বেষ' অথবা 'ভাষাবিষয়ক অসহিষ্ণুতা' এই পাপ আমাদের দেশে পূর্বে কখনও ছিল বলিয়া জানা যায় না।"

এই ভাষাবিদ্বেষের বিষময় ফলভোগ করিতে হইয়াছে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীকে উত্তর প্রদেশে ও বিহারে বিদ্যালয়ে শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রবল অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে বাঙ্গালাভাষীদের এই ভাষাবিদ্বেষের ফলে এবং ইহারই ফলে আসামে ব্যাপকভাবে "বঙ্গাল খেদা" আন্দোলন এবং তাহার পরিণতিরূপে ঘটে নির্লজ্জ নিষ্ঠুর ও জাতীয়তা বিধ্বংসী নারকীয় কাণ্ড, বাঙ্গালীমেধ যজ্ঞ স্বাধীন ভারতের অন্যতম কলঙ্ক

সুনীতিবাবু সেই সঙ্গে বলেন, "এই একটি বিষয়ে বঙ্গভাষী জনগণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন— তাঁহাদের মধ্যে কখনও এই 'Linguism' দেখা দেয় নাই—"

তবে ইংরাজী শিক্ষার সুফল স্বরূপে যে আমাদের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, সে কথা বলিয়া মাতৃভাষার ও ইংরাজীর সংস্পর্শে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হওয়ার কথা সুনীতিবাবু স্মরণ করাইয়া দেন। আমাদের মধ্যে জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ও দম্ভের প্রতীকরূপে মাতৃভাষাকে স্থাপিত করিবার চিন্তারও অবকাশ তখন (পূর্বদিনে) ছিল না।" এ-কথা তিনি জোর দিয়া বলেন এই ভাষাবিদ্বেষের উৎপত্তির বিষয়ে তিনি বলেন

ভারতের এই "ভাষাবিদ্বেষ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 'হিন্দী বনাম ইংরেজী' এই প্রশ্নের উপরে। এই প্রশ্নের ন্যায়সঙ্গত ও ইতিহাসানুমোদিত সমাধান না হইলে ভাষাবিদ্বেষের মূলোৎপাটন হইতে পারিবে না। উপস্থিত ক্ষেত্রে, ভারতের কোনও আধুনিক ভাষা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বাহনরূপে, বিশ্বসভ্যতার প্রকাশরূপে, ইংরাজীর স্থান লইতে পারে না— বাঙ্গালা হিন্দী মারাঠা তামিল ইত্যাদির একটিও না। কেবল বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজীর শিক্ষা এবং ব্যবহার বন্ধ করিবার চেষ্টা আদৌ কার্য্যকর হইতেছে না। ভারতের প্রবীণ নেতা ও রাজনীতিবিদ্ শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী রাজগোপালাচার্য্য

অতি খাঁটি কথাই বলিয়াছেন—ইংরাজী ভাষার সর্ব্বজনতা ও ইহার বিশ্বব্যাপী প্রয়োগ বিচার করিয়া দেখিলে, এই ভাষাকে আধুনিককালে সমগ্র জগতের পক্ষে একটি প্রধানতম ঐক্যসূত্র বলিতে হয় এবং ভারতবর্ষে যেমন কেবল বিদেশ হইতে আগত বলিয়া ডাক ও তার বিভাগ, রেলওয়ে, বিদ্যুতের প্রয়োগ প্রভৃতিকে আমরা আর বর্জ্জন করিতে পারি না, তেমন সংযোগ ও ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে, মিলনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ হইতে আর ইংরাজীকে বিদায় দিতে পারি না ধীরভাবে বিচার করিয়া এইরূপ মনোভাব হইতে মুক্ত হওয়া আবশ্যক।

ইংরাজী ভাষাকে বিদায় দিবার জন্য যে-সকল অপচেষ্টা চলিতেছে এবং সেই সঙ্গে "হিন্দী বোলো" জিগীরদারদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা ভাল তাহাদের পুত্রকন্যাদের বিদেশী ধর্ম্মসম্প্রদায়-চালিত ইংরাজী-মাধ্যম স্কুলে প্রেরণরূপ জুয়াচুরি ও ভণ্ডামির কথাও সুনীতিবাবু সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এইরূপ ভণ্ডামির উদ্দেশ্য জনসাধারণকে ইংরাজী শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া অজ্ঞ রাখিয়া ইংরাজীর সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা অর্জ্জন করার দরুণ দেশের সব বিষয়ের নেতৃত্বে নিজের সন্তান সন্ততির একচেটিয়া অধিকার স্থাপনা।

ভাষা-সম্পর্কিত ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে তিনি বলেন—

ভারত রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের দ্বারা গৃহীত সেই সব রাজ্যের সরকারী ভাষাই মুখ্যতঃ বিধান সভা ও পরিষদের ভাষা হইবে। রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে হইলে রাজ্যের সরকারী ভাষাকে অগ্রমর্য্যাদা দিতে হইবে, তবে ইংরাজীকে আবশ্যকমত রাখিতে হইবে। কেন্দ্রীয় আইন ইংরাজীতেই রচিত হউক, কিন্তু আবশ্যক মত সাধারণ নাগরিকগণের বুঝিবার জন্য হিন্দী বাঙ্গলা তামিল প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যের নানা সম্প্রদায়ের ভাষায় এই সব আইন অনুবাদের ব্যবস্থা থাকুক।

প্রাদেশিক নিম্ন আদালতের ভাষা, এখন যেমন চলিতেছে, প্রান্তীয় রাজ্যভাষা, অথবা ইংরাজী অথবা মিশ্রভাবে রাজ্যভাষা ও ইংরাজীই চলিতে থাকিবে। নিম্ন আদালতের রায় রাজ্যের ভাষায় অথবা ইংরাজীতে দিতে পারা যাইবে কিন্তু যেখানেই মোকদ্দমাকারিগণ চাহিবেন তাঁহাদের প্রার্থিত ভাষায় রায়ের অনুবাদ দিতে হইবে। সুপ্রীম কোর্টের বয়ান এবং সুপ্রীম কোর্টের রায় ইংরাজীতেই হইবে, তবে সম্পৃক্ত রাজ্যের সরকারী ভাষায় তাহার অনুবাদের জন্য কেন্দ্র হইতে অথবা রাজ্য সরকার হইতে ব্যবস্থা থাকিবে।

হিন্দীভাষার বাধ্যতামূলক ব্যবহারের জন্য যাঁহারা প্রচণ্ড আন্দোলন করিতেছেন তাঁহাদের অভিপ্রায় যে হিন্দীভাষী-দের সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ অধিকার দিয়া ভারতীয় নাগরিক-গণকে প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা সে-কথার আলোচনা করিয়া তিনি হিন্দী সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বিবৃতি দেন। তারপর আসে বিভিন্ন রাজ্যের ভাষাগত সমস্যার চর্চ্চা। তিনি বলেন—

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ভাষাগত সমস্যা সর্ব্বত্র এক নহে। দিল্লীতে বসিয়া একই প্রকারের নীতি সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত করিতে গেলে বিভ্রাট ঘটিবে যেমন প্রস্তাব করা হইয়াছে, ভারতের সমস্ত ভাষা নাগরী লিপিতে লেখা হউক, তাহা হইলেই পূর্ণ একতা হইবে। নাগরী লিপি প্রচলন করিলে (আমার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি), বাঙ্গালা উড়িয়া তামিল প্রভৃতিকে হিন্দী বর্ণবিন্যাসের ছায়ায় আনিয়া, তাহাদের কতকগুলি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের হানি করা হইবে। ওদিকে বানান ব্যাপারে বাঙ্গালী জনগণের অন্য সমস্যা আছে—পূর্ব্ববঙ্গ বা ... কোটি বঙ্গ-ভাষীদের চলিলে চলিবে না—ইহারা অধিক পরিমাণে মুসলমান, কিন্তু উর্দ্দুর চাপ হইতে বাঙ্গালাকে বাঁচাইবার জন্য ইহাদের ছাত্রেরা প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছে, পূর্ব্ব বাঙ্গালার বাঙ্গাল এবং পশ্চিম বাঙ্গালার বাঙ্গাল এই উভয়কে বাঁধিয়া এক ভাষা করিয়া রাখিয়াছে বাঙ্গালা লিপি পশ্চিম বাঙ্গালায় আমরা যদি নাগরী লিপিতে বাঙ্গালা লিখিবার ও ছাপিবার ব্যর্থ ও অনর্থকর চেষ্টা করি, তাহা হইলে জিদ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে আবার বাঙ্গালা ভাষাকে আরবী অক্ষরে লিখিবার চেষ্টা অবশ্যম্ভাবী নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে, এবং সাড়ে আট হইতে নয় কোটি বাঙ্গালীর ভাষা ভাঙ্গিয়া দুইটি পরস্পরের অবোধ্য ভাষায় পরিণত হইবে—যেভাবে উত্তর ভারতের হিন্দুস্থানী ভাষাকে নাগরী লিপিতে লেখা হিন্দী ও আরবী লিপিতে লেখা উর্দ্দু, এই দুইটি স্বতন্ত্র ভাষায় দাঁড়াইয়া উত্তর ভারতের তথা সমগ্র ভারতের পক্ষে জাতীয় সংহতির পথে এক দুরপনেয় বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। এক্ষেত্রে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ইউরোপে রোমান-লিপি ব্যবহার করে এমন জাতিসমূহের মধ্যেও রাজনীতিক ঐক্য বা সংহতি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

সুনীতিবাবুর অভিভাষণ সাধারণ সাহিত্য সভার সভাপতির ভাষণ নহে। ইহা একদিকে বিচারকের রায়, অন্যদিকে উৎকল, বঙ্গ এবং সর্ব্বভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির যোগসূত্র নির্ণয় ও বর্ণনার ভিত্তিতে রচিত রসোত্তীর্ণ নিবন্ধ। বিচারকের রায় হিসাবে, বর্ত্তমান কালে মাতৃভাষা, রাষ্ট্র-

ভাষা ও ইংরাজী বহিষ্কার লইয়া একদল নেতৃপদে অভিষিক্ত রথীমহারথী ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে গোলযোগ বাধাইয়াছেন, এই অভিভাষণে তাহার সকল দিক বিচার করিয়া দেখানো হইয়াছে। এই বিচার-ফল নির্ণয়ের পিছনে রহিয়াছে সুদীর্ঘ দিনের বিদ্যার্জন, জ্ঞানান্বেষণ ও অধ্যাপনায় কৃতিত্বের খ্যাতি, ভাষাতত্ত্বে ও বিভিন্ন ভাষা-সাহিত্যে ব্যাপক জ্ঞান, দেশ-বিদেশে জ্ঞানীজনের সাক্ষাৎকারে লব্ধ পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং সর্ব্বোপরি রহিয়াছে, ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে চালিত ফাঁদফন্দি, সাচ্চা-ঝুটা, মেকি-আসল ইত্যাদি সম্পর্কে সাক্ষাৎ পরিচয় ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সেই কারণে বাঙ্গালাভাষী তথা ভারতের অহিন্দীভাষীর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সমস্যা মীমাংসার সহিত ইহা নিকট ভাবে বিজড়িত। আমরা শুনিয়াছি এই অভিভাষণ ইংরাজীতেও মুদ্রিত হইয়াছিল। নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল তাহার সর্বভারতীয় প্রচারের ব্যবস্থা করা—সংবাদপত্র ও পত্রিকার মাধ্যমে। বর্তমান সময়ের ভাষা সমস্যা ছেলেখেলার বস্তু নহে।

এখন সাহিত্যের আসরেই ফিরিয়া আসি।

সম্মেলনের বাংলা-সাহিত্য শাখার সভানেত্রী শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর ভাষণ বিচারের বস্তু নহে। আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, সমস্যা ও তাঁহার পূরণ সব কিছুই রহিয়াছে একত্রে এই ভাষণের মধ্যে। শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী তাঁহার মনের ধারায় যে জিজ্ঞাসাবাদ চলিতেছিল বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্য লইয়া, তাহার সওয়াল-জবাব সব কিছুই সরস সহজ ভাষায় নিবেদন করিয়াছেন বাংলা সাহিত্যশাখার অধিবেশনে। জানি না ভাষণের বিষয়বস্তু লইয়া কোনও আলোচনা ঐ সভায় হইয়াছিল কি না। আমরা এই অতি-সুস্বাদ পাঁচমিশালি ব্যঞ্জনের মধ্যে পাইয়াছি একটি বিশেষ উপভোগ্য সারবস্তু। তাঁহারই ভাষায় উহা এইরূপ :—

"আমি নৈরাশ্যবাদী নই। আমার মনে হয় না, বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যে যা-কিছু হচ্ছে, তা 'কিছু হচ্ছে না'। অথবা যা কিছু হচ্ছে, তা সমস্তই একেবারে সর্ব্বনেশে কাণ্ড হচ্ছে।"

"সাহিত্য চিরদিনই দুঃসাহসিক অভিযানের যাত্রী। প্রতি পদক্ষেপই তার নতুন পরীক্ষায় চঞ্চল। বন্ধুর পথকে জয় করিতে পারাই তাহার উল্লাস। তাই অহরহই তাহার ভাঙ্গা-গড়ার খেলা। প্রতিনিয়তই সে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অস্থির। এই অস্থিরতাই সাহিত্যের ধর্ম্ম।"

আমরা সর্ব্বান্তকরণে শ্রীমতী আশাপূর্ণাকে সাধুবাদ জানাই।

শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার তাঁহার অভিভাষণে শিশুসাহিত্যের পূর্ব্বেকার ধারার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যুগের পর যুগে তাহার নানা পথে যাত্রার কথা উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে বর্ত্তমানের বিষয়ে বলেন :—

"আজ পৃথিবীর রূপ নানাভাবে পাল্টে চলেছে, দিকে দিকে নবজাগরণের সাড়া পড়েছে। আজকের এই নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দিনে আমাদের ছেলেমেয়েরা ও মা-মাসীরা কল্পনাপ্রসূত গল্প বা নীতিকথা শুনেই আজ আর ক্ষান্ত নয়। উত্তুঙ্গ তুষারাবৃত পাহাড়ের চূড়া আজ তাদের হাতছানি দেয়, মরুভূমির বুকে তাদের মন ছুটে দিতে চায়, অতল সমুদ্রের গহ্বরে ডুব দিয়ে তারা তুলে আনতে চায় অমূল্য অদৃশ্য রত্নরাজি। মহাকাশের বাইরের বায়ুমণ্ডলে যে অদৃশ্য জগৎ লুকিয়ে আছে, তার রহস্য তারা উদ্ঘাটন করতে চায়। দূর-দূরান্তরের অজানা সুর তাদের কানে ভেসে আসে—প্রাণে জাগায় নব নব আশা, কৌতূহল, আনন্দ।"

"তাই আজকের দিনে আমাদের শিশুসাহিত্যের গণ্ডি বহু বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। কোনও এক বিশেষ দেশের বা স্থানের মধ্যে সে আর আবদ্ধ হয়ে নেই।"—

প্রবীণ শিশুসাহিত্যিকের এই নির্দেশ কালোপযোগীই হইয়াছে।

সম্মেলনের অন্য অধিবেশনগুলির কোনও তথ্য আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

কলিকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেস

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫১ ও ৫২তম (যুক্ত) অধিবেশন বিগত ৩১শে ডিসেম্বর হইতে ৬ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ সালে শেষবার এই কংগ্রেস কলিকাতায় বসে। গত জুন মাসে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি। সেই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য বিজ্ঞান কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন স্যার আশুতোষের পুণ্য স্মৃতি রক্ষার জন্য এই অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত করিতে, যেহেতু এই ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস যে ১৯১৪ সালে জন্মগ্রহণ করে তাহার অন্যতম কারণ স্যার আশুতোষের উৎসাহ ও আগ্রহ। ৫১তম অধিবেশন গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে চণ্ডীগড়ে হইবার কথা ছিল। তাহা স্থগিত রাখিয়া এইবার এইখানে যুক্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু তাঁহার ভাষণে বলেন, এখন মানব সমাজের চূড়ান্ত ভাগ্যফল নির্ভর করিতেছে বৈজ্ঞানিকদিগের উপরেই। ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ছাড়া তাহাদের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌঁছান অসম্ভব। এবং বিজ্ঞানের পথ অবলম্বন ছাড়া উহার অন্য উপায় নাই।

শ্রীমতী নাইডু যাহা বলিয়াছেন সে কথাগুলি নিছক সত্য—বিশেষে বর্তমান ভারতে। শ্রীজবাহরলাল নেহরু সেই কথাই তাঁহার সভাপতির ভাষণে বলেন ১৯৪৭ সালের বিজ্ঞান কংগ্রেসে। তাঁহার ভাষা ছিল অপূর্ব। তিনি বলেন :—

"For a hungry man or a hungry woman, Truth has little meaning. He wants food. For a hungry man. God has no maning. He wants food. And India is a hungry. starving country and to talk of Truth and God and even of many of the fine things of life to the millions who are starving is a mockery. We have to find food for them. clothing. housing. education. health an soon—all the absolute necessaries of life that every man should possess. When we have done that we can philosophise and think of God. So science must think in terms of the 400 million persons in India."

"ক্ষুধার্ত স্ত্রী বা পুরুষের কাছে সত্যের প্রায় কোনই অর্থ হয় না। সে চাহে খাদ্য। ক্ষুধার্ত লোকের কাছে ঈশ্বরও অর্থহীন। সে চায় খাদ্য। এবং (যেহেতু) ভারত এক ক্ষুধার্ত অন্নহীন দেশ এবং (সে কারণে) এদেশের কোটি কোটি ক্ষুধার্ত লোকের কাছে সত্য বা ঈশ্বর অথবা মানুষের জীবনের উন্নততর ও সুন্দর বিষয়গুলির কথা বলায় তাহাদের উপহাসই করা হয়। তাহাদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, গৃহাশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির ও জীবনের অতি-প্রয়োজনীয় বস্তু সকলের—যাহা প্রত্যেক মনুষ্যেরই থাকা উচিত—সন্ধান ও ব্যবস্থা করিতে হইবে আমাদেরই। যখন সেকাজ সম্পন্ন হইয়া যাইবে তখন আমরা দর্শনতত্ত্বের চর্চা ও ঈশ্বরের চিন্তা করিতে পারি। সেজন্য বিজ্ঞানকে এখন ভাবনা চিন্তা করিতে হইবে ভারতের ৪০ কোটি লোকের দায় বুঝিয়া।"

পণ্ডিত নেহরু ভারতে বিজ্ঞানের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, এদেশে বিজ্ঞানের প্রসার-ব্যবহার ও জনসাধারণের জীবনের মধ্যে উহার প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রয়াস, উৎসাহ ও সাহায্য তিনি অকুণ্ঠভাবে দিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। এই আধুনিককালে অন্য কোন এক ব্যক্তির বা এক ব্যক্তি সমষ্টি ও তাহার অনুরূপ কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহারই উৎসাহে এদেশে জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণাগার কয়েকটিই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে ও অন্য বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য যাহাতে সংগত হয়, সে-ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই দরিদ্র দেশে একদিকে অর্থাভাব ও অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করিবার জন্য যোগ্য লোকের অভাব চতুর্দিকেই। সেই কারণে যখন বিগত দুই-তিন বৎসরের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক গবেষণার খরচ বার্ষিক দুই কোটি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া দশ কোটির উর্দ্ধে যায়, তখন প্রশ্ন হয় যে, এই টাকা ঢালিবার ফলে দেশের কৃষি, শিল্প, পূর্ত ও ইঞ্জিনীয়ারিং, যন্ত্রনির্মাণ বা প্রতিরক্ষা বিষয়ে কোথাও কিছু উন্নতি বা লাভ হইয়াছে, না কেবলমাত্র টাকার অপব্যয় ও অপচয়ই হইতেছে।

এই প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে আলোচনা এই প্রসঙ্গে অবান্তর। কিন্তু এইবারের বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি অধ্যাপক শ্রীহুমায়ুন কবির তাঁহার অভিভাষণে "রাষ্ট্র ও বিজ্ঞান" লইয়া যাহা আলোচনা করেন তাহাতে ইহারই ব্যাপক চর্চা রহিয়াছে। অভিভাষণের শেষে তিনি সেই আলোচনার ফলস্বরূপে যে সাতটি প্রস্তাব বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করিয়াছেন 'যুগান্তর' তাহার চুম্বক এই ভাবে দিয়াছেন—

ইহাকে জাতীয় নীতি হিসাবে গ্রহণের তিনি পক্ষপাতী।

(১) জাতীয় আয়ের ১ শতাংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে নিয়োগ করা হোক। আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত সঙ্গতি রাখার জন্য এই ব্যয় খুবই সামান্য।

(২) ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল গঠন করিতে হইবে যাহাতে এই সংস্থা বৈজ্ঞানিক গবেষণাকারী বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির খুব নিকটে থাকিয়া ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিকদের উপযুক্ত শিক্ষায় সাহায্য করিতে পারে।

(৩) গবেষণার ক্ষেত্রে ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলকে সম্পূর্ণরূপে পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হইবে।

(৪) প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষক সহ ৩টি অথবা ৪টি উন্নত গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে এবং সর্বপ্রকার সাজসরঞ্জামের সুবিধা সহ ঐ সকল কেন্দ্রের অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বিদেশ ভ্রমণের স্বাধীনতা দিতে হইবে।

(৫) যাহারা স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত, তাঁহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং উৎসাহ দিতে হইবে এবং

উদ্যমী তরুণ বৈজ্ঞানিকদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে।

(৬) ন্যাশনাল কাউন্সিল বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে প্রতিনিধি হিসাবে সরকারী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিদের গ্রহণ করিতে হইবে

(৭) সর্বশেষে তিনটি জাতীয় গবেষণা পরিষদ—এ্যাটমিক এনার্জি কমিশন বৈজ্ঞানিক প্রতিরক্ষা সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং স্বাধীন বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি লইয়া একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিতে হইবে এই উপদেষ্টা পরিষদ সরকারী তহবিল যাহাতে বিভক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে এবং বিভিন্ন গবেষণার ক্ষেত্রে যে-সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে এবং এই সকল পরিকল্পনার কর্মসূচী প্রণয়ন করিবে।

দুর্গাপুরে কংগ্রেসের ঊনসপ্ততিতম অধিবেশন

দুর্গাপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে এবৎসরও কংগ্রেস সরকারের দোষত্রুটির সাফাই এবং অপ্রিয় প্রসঙ্গকে "ধামাচাপা" দেওয়ার প্রথাই বহাল ছিল। তবে পণ্ডিত নেহরুর বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব ব্যাপ্ত না থাকায় সাফাই চুণকামের সময়ে নানা দিক হইতে খোঁচা ও ধাক্কা সমানে চলিতেছিল এবং ধামাচাপার কাজও পূর্বেকার মত নিরবচ্ছিন্ন মুক্ত হইতে পারে নাই। উপরন্তু কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকে. কামরাজ পূর্ববর্তী সভাপতিদিগের মত কংগ্রেস সরকার সকল কাজে প্রশংসা ও সকল মতে সায় না দিয়া অনেক বিষয়ে সতর্কবাণী বা প্রচ্ছন্নভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। বলিতে কি মহাত্মাজীর তিরোধানের পর এই প্রথমবার প্রণিধানযোগ্য কংগ্রেস সভাপতির অভিভাষণ আমাদের সম্মুখে আসিয়াছে।

বিষয় নির্বাচনী সমিতিকে সরকারী কাজের তীব্র সমালোচনার মধ্যে আলোচনা চালাইতে হয়। ওয়ার্কিং কমিটি রচিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি বিষয়ক প্রস্তাব বিষয় নির্বাচনী সমিতির সম্মুখে আসিলে পরে প্রায় দশ ঘণ্টা আলোচনা চলে (দুই দিনে)। ৪৫ জন সদস্য সমাজতান্ত্রিক আদর্শের রূপায়ণে সরকারী ব্যর্থতার কঠোর সমালোচনা করেন। প্রথম দিনেই ৭২টি সংশোধনী প্রস্তাব আসে। শেষে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী দ্বিতীয় দিনে সমালোচকদিগকে এই আশ্বাস দিলে পরে যে, এখন হইতে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা ক্ষান্ত হন। প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এই সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির কাজ ঠিকমত আগাইতেছে কি না পরীক্ষা করার জন্য সরকার একটি স্থায়ী সংস্থা গঠন করিবেন। অবশ্য সেই সংস্থার সদস্য কে বা কি জাতীয় লোক থাকিবেন, সে-কথার কোনও চর্চা হয় নাই। এইরূপ আশ্বাস দেওয়ার পর সংশোধনী প্রস্তাবগুলির প্রত্যাহারের পরে "সর্বসম্মতিক্রমে" মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়

প্রস্তাবের উত্থাপক শ্রীজগজীবনরাম নিজেই সমালোচনার খেই ধরাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি ৭৫ মিনিটের বক্তৃতায় সরকারী ব্যর্থতার নিদর্শনগুলিই তুলিয়া ধরিয়া দেখান এবং সাফল্যের বিষয়ে প্রায় কিছুই বলেন নাই। প্রস্তাবের সমর্থক পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ভিন্ন সুরে বক্তৃতা করেন এবং সাফল্য ও ব্যর্থতা দুইয়েরই হিসাব দিয়া ভবিষ্যতের কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। সমালোচকদিগের অভিযোগ সম্পর্কে 'আনন্দবাজার' সংবাদ দিয়াছেন এইরূপ—

প্রতিনিধিদের প্রধান অভিযোগ ছিল সরকার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তেমন কোন চেষ্টা করিতেছেন না। সরকারী পদস্থ কর্মচারীরা সময়ের প্রয়োজন অনুসারে চলিতে মোটেই রাজী নহেন সমাজবিরোধী শক্তিগুলিকে শায়েস্তা করার তেমন কোন তাগিদ দেখা যাইতেছে না। খাদ্যের ব্যাপারে রাজ্যগুলি নিজেদের খেয়ালখুশী অনুসারে চলিতেছে, কোন দৃঢ় সর্বভারতীয় নীতি নাই। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সরকারী ব্যর্থতারও কঠোর সমালোচনা করা হয়। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির সম্পাদক শ্রীরঘুনাথ সিংহ অভিযোগ করেন, সবচেয়ে অবহেলিত জলপথের পরিবহণ ব্যবস্থা এবং উহার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

সবসুদ্ধ কাগজে-কলমে এই অভিযোগ কঠোরতম ভাষায় পেশ করেন, প্রবীণ সদস্য শ্রী এন ভি গ্যাডগিল। তিনি বলেন, 'নেতাদের বোঝা উচিত, টন টন প্রস্তাবের চেয়ে এক কণা কাজের মূল্য অনেক বেশী।

"আন্তর্জাতিক" প্রস্তাবের মধ্যে পারমাণবিক বোমার কথা লইয়াও তীব্র মতভেদ হয়। আন্তর্জাতিক প্রস্তাবের উত্থাপক শ্রীমোরারজী দেশাই দৃঢ়কণ্ঠে পারমাণবিক বোমার বিরোধিতা করিলেও বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিকাংশ সদস্য পারমাণবিক বোমা তৈয়ারীর পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। ১৯জন বক্তার মধ্যে ১৪জনই ভারতে ঐ বোমা তৈয়ারীর দাবি জানান এবং তাঁহাদের বক্তৃতায় শ্রোতারা হাততালি দিয়া সমর্থনও জানান।

শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের বক্তৃতায় পারমাণবিক বোমা প্রস্তুতির বিরুদ্ধে যুক্তি ছিল সবই পুরণো—এবং অনেক ক্ষেত্রেই ফাঁকা ও হাল্কা। তাঁহার মতে ভারত পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতায় যোগ দিলে নিজের ধ্বংস নিজেই ডাকিয়া আনিবে। তাহার বক্তৃতায় ছিল :—

পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতায় বিরত থাকিবার ও রাষ্ট্রজোটের বাহিরে থাকিবার যে সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে, তাহা ভারতীয় ইতিহাসের চিরায়ত ঐতিহ্যের ফলশ্রুতি। ভারত-রক্ষার উদ্দেশ্যে পারমাণবিক বোমা বানাইবার লোভে যদি আমরা বশীভূত হই তাহা হইলে আমরা জাতির আত্মাকে খুন করিব।

প্রতিনিধিদের তিনি স্মরণ করাইয়া দেন যে, পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে কোনরূপ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নাই। ভারত ও চীন যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করে তাহা হইলে উভয়েরই বিনাশ ঘটিবে।

এখন অভাবী দেশবাসীর অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের সংস্থান করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই সময় জাতির স্বল্প সম্পদকে নিষ্ফল প্রতিযোগিতায় অপচয় করার কোনই সার্থকতা নাই।

পারমাণবিক বোমা বানাইবার পক্ষপাতীদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন, "আপনারা কোথায় এই অস্ত্রের পরীক্ষা করিবেন? ভারতে বসতি এত ঘন যে, যে কোন এলাকায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইলে সমগ্র জাতি বিপন্ন হইয়া পড়িবে।"

তাহা ছাড়া পারমাণবিক বোমা বানাইবার দাবি মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীনেহরুর যাবতীয় শিক্ষার বিরোধী। কাজেই শ্রীবিভূতি মিশ্র—যিনি নিজেকে গান্ধীবাদী বলিয়া অভিহিত করেন—এই বোমা বানাইবার অনুকূলে প্রস্তাব উত্থাপন করায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। কাজেই পারমাণবিক বোমা বানাইতে চাহিলে ভারত আর গান্ধী ও নেহরুর ভারত থাকিবে না।

তবে এই প্রসঙ্গটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া চিরদিনের মত এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটাইতে হইবে।

এই প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করেন শ্রীভগবৎ ঝা আজাদ ও শ্রীবিভূতি মিশ্র। তাঁহাদের বক্তৃতায় ছিল :

চীন ভারত আক্রমণ করিলে আমরা কি করিব? আমরা কি অহিংসা পরমধর্ম মন্ত্র আওড়াইব? তাঁহার মতে চীনের পারমাণবিক বোমা নির্মাণের উদ্দেশ্য দুইটি, যথা: (১) এশিয়া ও আফ্রিকায় প্রভুত্ব বিস্তার ও (২) ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার ইচ্ছা।

তিনি বলেন, পারমাণবিক বোমা বানাইবার পর চীনের শক্তি বাড়িয়াছে। মাও সে-তুং এখন কূটনীতিক যুদ্ধে ভারতকে পরাস্ত করিতে চাহিতেছে। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, কায়রো বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী চীনকে পারমাণবিক বোমা বানানো বন্ধ করিতে নিবেদন জানান। কিন্তু দুঃখের বিষয় গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশগুলির কেহ তাঁহাকে সমর্থন করে নাই।

শ্রীআজাদ বলেন যে, সকলেই শান্তি চায়। কিন্তু শান্তি স্থাপনের জন্যই শক্তি অর্জন প্রয়োজন।

ইহার পর তিনি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। উহাতে বলা হয় যে, পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন কোন দেশের ভারত আক্রমণের আশঙ্কার কথা মনে রাখিয়া দেশের প্রতিরক্ষার জন্যই ভারতের পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন করা উচিত।

শ্রীবিভূতি মিশ্র (বিহার) বলেন, চীনে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে প্রতিবেশী দেশগুলিতে ভারতের প্রতিষ্ঠা কিছুটা কমিয়াছে। তাঁহার মতে, দুনিয়া শক্তির পূজারী এবং যাহার শক্তি আছে, পৃথিবীতে তাহারই সম্মান। সুতরাং দেশের নিরাপত্তা ও সম্মানের খাতিরেই পারমাণবিক বোমা বানাইতে হইবে।

শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের বক্তৃতায় উচ্ছ্বাসের অংশই বেশী। যুক্তি যাহা আছে তাহা কাটিতে কোনই কষ্ট পাইতে হয় না। পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় বিপক্ষের মনেও ভয় জন্মান যে এদিক হইতেও পাল্টা মারণাস্ত্র প্রয়োগ হইবেই। ভারত ও চীন পরস্পরের বিরুদ্ধে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিলে উভয়েরই বিনাশ হইতে পারে কিন্তু তাহার প্রতিকার কি চীনের একতরফা অস্ত্রক্ষেপে ভারতের আত্ম-বলিদানে স্বীকৃতি দেওয়া? খরচের কথা তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আট-দশ বৎসর পূর্বে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করার জন্য অস্ত্র ক্রয়, অস্ত্রনির্মাণের কারখানা গঠন ইত্যাদির জন্য যখন সামরিক খরচের খাতে বেশী টাকা দেওয়ার কথা উঠে তখন এই মোরারজী দেশাইয়েরই সমমতাবলম্বী একদল ঠিক একই সুরে "গেল গেল, শান্তিবাদ গেল, ধর্ম গেল, অহিংসা গেল, মহাত্মাজীর পুণ্যস্মৃতি গেল।" এবং "নিছক যুদ্ধপ্রবণতা war-mongering" ইত্যাদির চীৎকার সেই অস্ত্র ব্যবস্থায় বাধা দিয়াছিলেন। এবং দুঃখের বিষয়, পণ্ডিত নেহরুও সেই যুক্তিতে সায় দেওয়ার ফলে সে সকল চেষ্টা পণ্ড হয়। ইহার প্রত্যক্ষ ফল সকলেই আমরা পাইয়াছি ১৯৬২ সনে বিশ্বাসঘাতক চীনের হস্তে পরাজয়ের নিদারুণ অপমান, হাজার হাজার বীরযোদ্ধার অস্ত্রাভাবে বিফলে প্রাণ দান এবং ১২ হাজার বর্গমাইল ভারতভূমি শত্রুর কবলস্থ হওয়ায়। এখন আবার সেই যুক্তি, সেই উচ্ছ্বাস।

যাহাই হউক লালবাহাদুর শাস্ত্রী শেষ পর্য্যন্ত পরে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে একথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজের অভিভাষণ ছিল সংক্ষিপ্ত, ৩০ মিনিটকাল ব্যাপী মাত্র। কংগ্রেস সভাপতির ভাষণ হিসাবে ইহা বোধ হয় সংক্ষিপ্ততম! এই ভাষণের অন্য বৈশিষ্ট্যও ছিল, যাহার মধ্যে প্রধানতম হইল সরকারের কার্য্যপ্রকরণ, বিধিব্যবস্থা ও দেশ-পরিচালনা ইত্যাদির উপর তীক্ষ্ণ তদারকি দৃষ্টিভঙ্গির—যাহা প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের কংগ্রেসের প্রধান কাজ ছিল—পুনঃ প্রবর্তন।

তাঁহার ভাষণের আরম্ভেই ছিল কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সেই সকল কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের প্রতি, যাহারা নেহরুর আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁহার আসনে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীকে অভিষেকের জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচন করিয়া ভারতে গণতন্ত্রের আদর্শকে জয়যুক্ত করেন। এখানে নিজের কৃতিত্ব শ্রীকামরাজ পরোক্ষভাবেও উল্লেখ করেন নাই। কংগ্রেসের ভুল-ত্রুটির কথা স্বীকার করিয়া তিনি বলেন, অতীতের সকল ভুল নেহরুর বিরাট্ ব্যক্তিত্বের আড়ালে চাপা পড়ে। কিন্তু অতঃপর আর জাতির নিকট হইতে ভুল-ত্রুটির ক্ষমা মিলিবে না। খাদ্যাভাব ও মূল্যবৃদ্ধির কথায় তিনি মুনাফাবাজির প্রসঙ্গ আনিয়া বলেন "সুখের বিষয় এই যে, কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে সরকার আজ (অর্থাৎ এতদিনে) অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের মত দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন" চতুর্থ পরিকল্পনায় খরচের ফলে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কার কথা যেভাবে উল্লেখ করিয়া যেভাবে কংগ্রেস ও কংগ্রেসী সরকারের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখাইয়াছেন তাহা 'যুগান্তর' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত অংশে বুঝা যাইবে:

শ্রীকামরাজ বলেন, পরিকল্পনা-কমিশন চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য যে-সব প্রস্তাব করেছেন, দেশের বর্তমান খাদ্যাবস্থা দেখে সে সম্পর্কে আমাদের সকলকেই কিছুটা চিন্তা করতে হবে। এই প্রস্তাবগুলি জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে; এতে বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২১,৫০০ থেকে ২২,৫০০ কোটি টাকা; হিসেব ধরা হয়েছে যে, এতে বার্ষিক উন্নয়নের হার দাঁড়াবে শতকরা ৬·৫। এত বিরাট্ পরিকল্পনায় হাত দিতে হ'লে যে বিপুল দায়িত্বভার আমাদের গ্রহণ করতে হবে, তার কথা আমাদের উপলব্ধি করা দরকার। আগামী পাঁচ বছরে ২১,৫০০ কোটি টাকা খরচ করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর আগের তিনটি পরিকল্পনায় সাকুল্যে যে পরিমাণ টাকা খরচ করা হয়েছে, এই অঙ্ক তার চাইতেও বৃহৎ; আগের তিনটি পরিকল্পনায় মোট ১৯,০০০ কোটি টাকার কিছু বেশী খরচ করা হয়েছে। এত বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করলে দেশের মূল্যমানের উপরে তার কি প্রতিক্রিয়া ঘটবে, সযত্নে তা বিশ্লেষণ করে ভেবে দেখা দরকার। চারপাশের দারিদ্র্য, দুঃখ, বেকার-সমস্যা ও শিক্ষা আমরা দ্রুত দূর করতে ব্যগ্র; যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা একটি আধুনিক সমাজে পরিণত হ'তে ইচ্ছুক; আর সেইজন্যই হয়ত ক্রমেই আমরা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর পরিকল্পনায় হাত দিতে চাইছি। কিন্তু একই সঙ্গে দেখা দরকার যে, আমাদের কর্মচেষ্টা যেন বিচক্ষণ বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

পরলোকে অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

প্রবীণ সাহিত্যিক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় গত ১লা ডিসেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৩ বৎসর হইয়াছিল।

তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে মাটির স্বর্গ, জমাখরচ, শ্রী, সকলই গরল ভেল, বরদা ডাক্তার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি ১২৮৯ সনে দক্ষিণ কলিকাতায় কালীঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আদি বাড়ী ছিল, জয়নগর মজিলপুর। তিনি সদালাপী বন্ধুবৎসল ছিলেন। এরূপ লোক আজকালকার দিনে বিরল।

বঙ্কিমচন্দ্রকে যেমনটি বুঝেছি

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র। ধূর্জটির জটাজাল থেকে নেমে-আসা যেন জ্যোতির প্রপাত। ভেদবুদ্ধিতে শতধাবিচ্ছিন্ন জাতির চিত্তের অন্ধকারকে দেশাত্মবোধের আলোকচ্ছটায় আলোময় ক'রে তুলল তাঁর গগনস্পর্শী প্রতিভা। লেখনীমুখে তিনি বহন ক'রে আনলেন স্বর্গের আগুন।

যুগে যুগে দেশে দেশে প্রতিভা যে কাজ ক'রে এসেছে সেই কাজ তিনি করলেন। সেই কাজটি হ'ল, জগতের মঙ্গল সম্পর্কে একটা নূতনতর মূল্যবোধ জাগান, যাকে এ যুগের একজন খ্যাতনামা মনীষী বলেছেন, revaluation of the world's good. জিনিয়াসের কণ্ঠে নতুনের আবাহন গীতি। যার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে সেই পুরাণোকে ভাঙতে তার লেশমাত্র দ্বিধা নেই। ঈশ্বর মানুষকে যে বিশেষ অধিকারগুলি দান করেছেন তাদের সেরা অধিকার হচ্ছে, মহাপরাক্রমশালীর স্পর্দ্ধাকে সে ধুলায় লুটিয়ে দেবার শক্তি রাখে; ধূলায় অবলুণ্ঠিত যারা তাদের ললাটে সে এঁকে দেয় রাজটীকা। প্রতিভার বরপুত্রেরা আমাদের চোখে দেয় পৃথিবীর একটা নবতর স্বপ্ন। আমরা যে-সকল ধারণায় অভ্যস্ত ছিলাম প্রতিভার আনন্দ হচ্ছে সেই অভ্যস্ত ধারণাগুলিকে পালটে দেওয়ায়।

এই কাজটি বঙ্কিমচন্দ্র অতুলনীয় কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদন করলেন। যা পর্ব্বতের গরিমা নিয়ে বিরাজ করছিল আমাদের মনে তাকে তিনি অবনমিত করলেন বল্মীকের স্তূপের পর্য্যায়ে এবং যেগুলিকে আমরা বল্মীকের স্তূপ ব'লে অবজ্ঞা করতাম তাদের দান করলেন মহাপর্ব্বতমালার গৌরব। এইবার উদাহরণের দ্বারা এই সত্যকে পরিস্ফুট করা যাক।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে ইংরেজ শাসনের জয়ধ্বনিতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কণ্ঠ ছিল মুখর। ইংরেজের শাসন-কৌশলে দেশ নাকি দ্রুত মঙ্গলের পথে আগিয়ে চলেছে। এই মঙ্গল-বিচারের কষ্টিপাথর ছিল রেলগাড়ি, ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ, নূতন চিকিৎসাশাস্ত্র, অতিকায় শহরগুলির পত্তন, বিজ্ঞানের নব নব দান। টেকনলজির দিক্ দিয়ে একটা চমকপ্রদ উন্নতিকে আমরা ভাবছিলাম দেশের শ্রীবৃদ্ধি।

বঙ্কিমচন্দ্র এসে একটা মহাজিজ্ঞাসা রাখলেন দেশবাসীর সামনে। এই মোক্ষম প্রশ্নটি হ'ল: ইংরেজের শাসন-কৌশলে দেশের প্রচুর কল্যাণ হয়েছে, এ কি সত্য, না কল্পনার বিকার? দেশের মঙ্গল—এই দু'টি কথার তাৎপর্য্য কি? দেশের সংজ্ঞা কি? মঙ্গলেরই বা সংজ্ঞা কি? ইংরেজ শাসনে শহরের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যবসায়ী এবং চাকুরিজীবীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে ঠিকই। বঙ্কিম প্রশ্ন করলেন,

"তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে?" নিজেই এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে কম্বুকণ্ঠে নতুন ভারতের কর্ণে ঘোষণা করলেন,

"হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।"

যারা ছিল বল্মীকের স্তূপের মতই অনাদৃত, বঙ্কিম সেই নিরন্ন নিঃসম্বল লাঞ্ছিত কৃষিজীবীদের ললাটে এঁকে দিলেন জয়তিলক। তাদের উপেক্ষিত জীবনকে দিলেন গিরি-শিখরের মর্য্যাদা: তারাই যে দেশ—অকুণ্ঠভাষায় দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে দিলেন এই বাণী।

ইংরেজ শাসনে দেশের মেরুদণ্ড এই চাষীদের কি কোন মঙ্গল হয়েছে? ঐ হাসিম সেখ আর রামা কৈবর্ত্ত অস্থিচর্ম্ম-সার বলদের দ্বারা ধার করা হালে চাষ করছে, 'ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত নুন লঙ্কা' দিয়ে আধপেটা খেয়ে থাকবে, গোহালের একপাশে ভূমিশয্যায় শুয়ে রাত কাটিয়ে দেবে, রেলপথের দৈর্ঘ্য আর শহরের আকাশচুম্বী সৌধমালা ওদের নিষ্প্রদীপ জীবনের অন্ধকারে কোন্ সৌভাগ্যের আলো বহন ক'রে এনেছে? ইংরেজের শাসন-কৌশলে ওদের মঙ্গল হয়েছে কতখানি?

আর একটা সাংঘাতিক প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্র রাখলেন যুগের সামনে। আর নিজেই প্রশ্নের জবাব দিলেন কঠিন ভাষায়। বললেন,

"আমি বলি অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না।"

সেদিন কেবল সভ্যতার চোখ-ঝলসানো দীপ্তিতে অভিভূত হয়ে দেশের শিক্ষিত সমাজ যখন তারস্বরে ইংরেজ শাসনের

জয়ধ্বনি করছিল, জাতির সেই মহাদুর্দিনের অন্ধকারে একজন পুরুষসিংহ অকুণ্ঠ পাদক্ষেপে মোহান্ধ স্বদেশবাসীদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং নির্ভীককণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'হুলুধ্বনি দিব না!' একক কণ্ঠের সেই জোরালো 'না' ইংরেজ শাসনের মর্য্যাদাকে সেদিন যে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল সেই আঘাত থেকে সুরু হ'ল বিপ্লবের জয়যাত্রা। পরবর্ত্তী কালে গান্ধীর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছিল 'Lord, give us the ability and willingness to identify ourselves with the masses.' হে ঈশ্বর, শক্তি দাও, প্রেরণা দাও যেন আমরা জনসাধারণের সঙ্গে প্রেমে এক হয়ে যাই। জনসাধারণের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে অনুভব করবার এই যে করুণা—এই করুণার সুরটিরও প্রথম বায়ার ঝঙ্কার বঙ্কিমের বঙ্গদেশের কৃষকে। আমাদের চেতনাকে তিনি ছড়িয়ে দিলেন দেশের কোটি কোটি হাসিম সেখ এবং রামা কৈবর্তদের মাঝে। শিক্ষিত বাঙালী সমাজের চিন্তাজগতে এ যে কত বড় বিপ্লব—সে কথা আজ উপলব্ধি করা কঠিন। বিবেকানন্দের 'দরিদ্র নারায়ণ' আর গান্ধীর 'কিষাণ-মজদুর-প্রজারাজ' এই দুইটি যুগবাণী আমাদের মনকে নূতনত্বে আর চমকে দেয় না। ওরা আমাদের ঘরের জিনিষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে-মানুষটি প্রথম সাধারণ মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কষ্টিপাথরে দেশের মঙ্গলকে যাচাই করবার আদর্শ ঘোষণা করেছিলেন তাঁর চিন্তার মৌলিকতার এবং মননশীলতার গভীরতা আমাদিগকে বিস্ময়ে হতবাক ক'রে দেয়।

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এক ঢিলে দুই পাখী মারলেন। আমাদের অন্তরলোকে ইংরেজ শাসন যে একটি মর্য্যাদার আসন অধিকার ক'রে ছিল সেই মর্য্যাদায় তিনি হানলেন চরম আঘাত। আর একটি নিদারুণ আঘাত হানলেন শহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আত্মাভিমানে। তারা ত দেশ নয়, এই কথাটি নিষ্করুণ ভাষায় ঘা দিয়ে দিয়ে তাদের মনের মধ্যে বসিয়ে দিলেন। ইংরেজ বাহাদুর আর লেখাপড়া-জানা চশমা-নাকে বাবু-সম্প্রদায়ের আসন টলিয়ে দিয়ে জয়মুকুট পরালেন যাদের মাথায় তারা ছিল সকলের নীচে, সকলের পিছে। অতিকায় ঘটোৎকচদের ধরাশায়ী করবার এবং রিক্তভূষণ অবহেলিতদের কণ্ঠে জয়মালা দোলাবার অধিকার রাখে শুধু মানুষই। তারই মনে কখনও কখনও নেমে আসে সেই স্বর্গীয় প্রেরণা, যার হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে সে দেখতে পায় নতুন পথ, জানতে পারে কালপুরুষের নিগূঢ় ইঙ্গিত। The New Spirit গ্রন্থে এলিস (Havelock Ellis) ঠিকই বলেছেন : To abase the mighty and exalt the humble seems to man the divinest of prerogatives, for it is that which he himself exercises in his moments of finest inspirations.

দেশের মঙ্গল বলতে কি বুঝায় তার সংজ্ঞা নিরূপিত হ'ল। এই সংজ্ঞার পটভূমিতে ইংরেজ শাসনের যথার্থ মূল্যও নির্দ্ধারিত হ'ল। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রকাশিত হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে গুরুর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন :

আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম।

ধর্মতত্ত্বের স্বদেশপ্রীতির বাণীর মধ্যে আনন্দমঠের 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'র প্রতিধ্বনি। Patriotism-এর আদর্শকে ভারতীয় সংস্কৃতির রঙে রাঙিয়ে আমাদের হৃদয়-আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ধর্মতত্ত্বে গুরু বলছেন,

ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্য যুক্ত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পরের সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।

বঙ্কিমের Patriotism ইউরোপীয় Patriotism নয়। "স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে"—বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় এই হচ্ছে ইউরোপীয় Patriotism-এর তাৎপর্য্য। বঙ্কিম লিখলেন, "জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এই দেশ-বাৎসল্য ধর্ম না লিখেন। পরবর্ত্তীকালে গান্ধীর সর্ব্বোদয়ের এবং জওহরলালের পঞ্চশীলের আদর্শের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের Patriotism ধর্ম্মেরই স্বীকৃতি :

"পরসমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া, আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহাকেও আপন সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের জোরালো কণ্ঠে আবার সেই 'দিব না'! ইংরেজ শাসনের গুণকীর্ত্তনে আমরা যখন পঞ্চমুখ তখন

সেই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে বঙ্কিম একা দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না।' ধর্ম্মতত্ত্বে সেই একই জোরের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, 'আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহাকেও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না।'

কিন্তু 'দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম'—এই যুগবাণী উচ্চারণ ক'রে বঙ্কিমের রসনা ক্ষান্ত হ'ল না। অবশ্যই এই আদর্শকে নব্য ভারতের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করবার একান্তই প্রয়োজন ছিল। দেশ জীবন্মৃত। দেশের কোটি কোটি চাষী নিরন্ন। তারা জীবন্ত নরকঙ্কাল। এই অগণিত চলন্ত নরকঙ্কালের মর্ম্মন্তুদ ছবি বঙ্কিমের সংবেদনশীল চিত্তকে খুব জোর একটা নাড়া দিয়েছিল। কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ত্বের মধ্যে তিনি সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, 'যাহাতে লোকের হিত তাহাই সত্য, যাহা তদ্বিরুদ্ধ তাহাই অসত্য।' এই উপলব্ধি থেকেই এল দেশরক্ষার প্রেরণা, Patriotism ধর্ম্মের বাণী। অন্নহীন বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন নিরানন্দ দেশে নবজীবনের প্লাবন আনতে হ'লে আগে দেশকে বাঁচাতে হবে তাদের হাত থেকে যারা দস্যুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আমাদের স্বাধীনতা জোরপূর্ব্বক হরণ করেছে। কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিচন্দ্র Patriotism-এর অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করলেন উলঙ্গ খরখড়্গের প্রদীপ্ত ভাষায়।

"ছোট চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরেজি নাম Justice; বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম Patriotism."

বড় চোরের ভূমিকা নিয়ে বণিকবৃত্তির আওতায় দেশের সম্পদ যারা লুণ্ঠন করছিল তাদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র অবতীর্ণ হলেন Patriotism-এর Prophet-এর ভূমিকায়।

ইউরোপীয় Patriotism সম্পর্কে বঙ্কিম যে বিশেষণটা প্রয়োগ করেছেন তা হচ্ছে দুরন্ত। এই দুরন্ত দেশবাৎসল্যকে তিনি বলেছেন 'একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ।' এর প্রভাবে পৃথিবীর অনুন্নত জাতিগুলির কি সর্ব্বনাশ হয়েছে সুপণ্ডিত বঙ্কিম তা ভাল ক'রেই জানতেন। ইংলণ্ড ইউরোপেরই দেশ। সুতরাং ইংরেজজাতির Patriotism ইউরোপীয় Patriotism-এরই একটি ভয়াবহ রূপ। ইংরেজের দেশবাৎসল্যের সর্ব্বনেশে চেহারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় শুধু ইতিহাসের পাতায় নয়; অগণিত হাসিম সেখ আর রামা কৈবর্ত্তের কঙ্কালসার মূর্ত্তিতে, কুটির শিল্পগুলির বিনাশের লোমহর্ষণ কাহিনীতে, দিগন্তপ্রসারী দারিদ্র্যের মর্ম্মান্তিক ছবিতে সেই উৎকট স্বদেশপ্রীতির ছাপ তিনি ভাল ক'রেই দেখেছিলেন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের বলিষ্ঠ মনে ইংরেজ শাসনের প্রতি অনুরাগের লেশমাত্র থাকার কথা নয়।

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী—একথা বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতকলঙ্ক প্রবন্ধের উপসংহারে আছে ঠিকই। মনে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, ইংরেজ যদি ভারতের পরম উপকারী হয় তবে বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে তিনি এমন জোরের সঙ্গে ইংরেজ শাসনের জয়ধ্বনি দিতে অস্বীকার করলেন কেন? আপাতদৃষ্টিতে যে দু'টি উক্তিকে পরস্পরবিরোধী মনে হয়—তাদের মধ্যে কিন্তু একটি গভীর সামঞ্জস্য আছে। ইংরেজ আমাদের কোন উপকার করে নি, এ কথা বললে নিছক গোঁড়ামির পরিচয় দেওয়া হয়। বঙ্কিম ভারত কলঙ্ক প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন

"ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে যাহা আমরা কখন জানিতাম না তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই, সে-পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেকখানি শিক্ষা অমূল্য। যে-সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিন্তাভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।"

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুবাণ ছিল বৃটিশ ঐতিহাসিকদের লেখায়, ইংরেজী সাহিত্যের বৈপ্লবিক মন্ত্রবাণীতে। সেই ইতিহাস প'ড়ে, সেই সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে দেশের স্বাধীনতাকে আমরা ভালবাসতে শিখলাম; গণতন্ত্রের আদর্শে আমরা উদ্বুদ্ধ হ'লাম; আমরা বৃহত্তর জাতির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ, আমাদের সত্ত্বা কেবল গ্রামের চতুঃসীমানার মধ্যে সীমিত থাকা উচিত নয়, আমি সর্ব্বাগ্রে একজন ভারতীয় এবং ভারতবর্ষ আমার স্বদেশ—এই দেশাত্মবোধ জাগ্রত হবার জন্যে ইংরেজের চিন্তা-ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয়ের অপেক্ষা করছিল। ভারতবর্ষের বিপ্লব পুষ্ট হয়েছে অক্সফোর্ড আর কেমব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তন্যরস পান ক'রে। কেনেথ কাউণ্ডা, জোমো কেনিয়াট্টা, ডাঃ হেষ্টিংস বান্দা—এঁরা ত সবাই বিলেতে লেখাপড়া-শেখা মানুষ। কিন্তু এঁরা সবাই বিপ্লবীর ভূমিকা নিয়ে আফ্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূলে কুঠার হেনেছেন। গান্ধী আইন-অমান্যের (Civil Disobedience)

অমোঘ অস্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন হেনরী ডেভিড্ থোরোর লেখায়। ইংরেজ মনীষী রাস্কিনের লেখা থেকে সর্বোদয়ের আদর্শ পেয়েছিলেন। ইংরেজের চিন্তাভাণ্ডার থেকে গান্ধী অনেক অমূল্য রত্ন আহরণ করেছিলেন ব'লে ইংরেজ শাসনকেও মেনে নিতে হবে—এমন কোন যুক্তি তিনি খুঁজে পান নি। ইংরেজের পদপ্রান্তে ব'সে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠার আদর্শ আমরা লাভ করেছি—একথা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতা হরণ করেছিল—এই নির্মম সত্যকে বঙ্কিম এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুলতে পারেন নি।

একথা বঙ্কিম নিঃসংশয়ে বুঝেছিলেন, বজ্রসুকঠিন রাজশক্তি সহজে আমাদের অপহৃত স্বাধীনতা আমাদিগকে ফিরিয়ে দেবে না। সেই স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথ আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে নয়, শক্তির মধ্য দিয়ে। আর শক্তি একতায়; তাই মহাসঙ্গীত বন্দেমাতরম্। আমাদের মধ্যে আচারগত, ভাষাগত, ধর্ম্মগত, বর্ণগত যত অনৈক্যই থাকুক, এক জায়গায় আমাদের সকলের মিল আছে। ভারতবর্ষ আমাদের সকলেরই মা। আমরা সকলেই ভারতবাসী। আমরা যে প্রদেশের অথবা যে ধর্ম্মেরই মানুষ হই না কেন, জাতিতে আমরা সবাই ভারতীয়। মার্কিন কবি হুইট্‌ম্যানের মতই বঙ্কিম মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলেন, "Affection shall solve the problems of freedom yet." স্বাধীনতার সমস্যাগুলির সমাধানের নিশ্চিত পথ হচ্ছে প্রেম। যারা পরস্পরকে ভালবাসে তারা দুনিয়ায় অপরাজেয় থাকবেই। একজন মহারাষ্ট্রীয়ের হাতের সঙ্গে হাত মেলাবে একজন রাজপুত। একজন আসবে পাঞ্জাব থেকে, একজন উৎকল থেকে, আর একজন গুজরাট থেকে আর এরা হবে একজন আর একজনের বন্ধু। এমনটি যদি হ'ত, জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসী যদি প্রেমে এক হয়ে যেত, ইংরেজের সাধ্য ছিল না ভারতবর্ষকে এতকাল শৃঙ্খলিত ক'রে রাখে। কিন্তু জাতিপ্রতিষ্ঠা ব'লে এ দেশে কিছু ছিল না। ভারতবর্ষ আমাদের সকলেরই স্বদেশ—দেশাত্মবোধের এই স্বর্ণসূত্রেই শুধু আমরা একত্র মিলিত হ'তে পারতাম। সেই প্রেমে, সেই ঐক্যে আমাদের শক্তি দুর্জ্জয় হ'ত আর সেই দুর্জ্জয় শক্তিতে আমরা হ'তাম বন্ধনমুক্ত।

'বন্দেমাতরম' মহামন্ত্রের উদ্গাতা খেয়ালের মাথায় এ মহাসঙ্গীত রচনা করেন নি। ঐ মহাসঙ্গীত রচনার পিছনে ছিল দীর্ঘকালের চিন্তা এবং স্বপ্ন! ভারত-কলঙ্ক প্রবন্ধের শেষের দিকে একটা মর্ম্মান্তিক আক্ষেপের সুর বেজে উঠেছে লেখার মধ্যে। লেখক ভারতের ইতিহাস বিশ্লেষণ ক'রে বলছেন, শিবাজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রীয়ে মহারাষ্ট্রীয়ে যখন ভ্রাতৃভাব হয়েছিল, অজিতপূর্ব্ব মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ পেল সেই প্রেমের দুর্ব্বার ধাক্কায়। আর একবার পাঞ্জাবে জাতির অভিমান ভুলে ব্রাহ্মণ আর জাঠ যখন এক হয়ে গেল, রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে গ'ড়ে উঠল দুর্দ্ধর্ষ খালসা—ইংরেজকে রামনগর আর চিলিয়ানওয়ালায় প্রমাদ গুণতে হয়েছিল, ছাড়তে হয়েছিল ত্রাহি ত্রাহি ডাক। ইতিহাসের এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বঙ্কিমের চিত্তে গভীর রেখাপাত করে এবং তাঁর মনে একটি যুগান্তকারী ভাবের তরঙ্গ তোলে। বঙ্কিমের নিজস্ব ভাষায় এই ভাবটি হ'ল:

"যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদয় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?"

'কি না হইতে পারিত?' 'কি না হইতে পারিত?'—কত প্রভাতে, কত মধ্যাহ্নে, কত গভীর রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে বঙ্কিমের সমস্ত চিত্তকে আলোড়িত ক'রে একটি প্রশ্ন ঠেলে ঠেলে উঠেছে: যদি সাম্প্রদায়িকতার, প্রাদেশিকতার, জাত্যাভিমানের সমস্ত বেড়াকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে ভারতবর্ষের কোটি কোটি নরনারী একটা বিরাট্ আদর্শের প্রেরণায় মিলে যেত তবে কি না হ'তে পারত? তবে কি মোগল সাম্রাজ্যের মত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও ভারতবর্ষে লুপ্ত হয়ে যেত না? আর একটা চিলিয়ানওয়ালার সংগ্রামে সমস্ত ভারতের সম্মিলিত শক্তি ইংরেজ শাসনের দুর্গকে ধূলিসাৎ ক'রে দিত না?

সমুদয় ভারতকে একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ করবার স্বর্ণ-সূত্রটি বঙ্কিমচন্দ্র পেয়ে গেলেন দু'টি শব্দের মধ্যে। একটি শব্দ 'বন্দে' এবং অপরটি 'মাতরম্'। বন্দেমাতরম সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ভারতবর্ষকে তন্দ্রাচ্ছন্ন অতীত থেকে জাগিয়ে দিল একটা নূতনতর চেতনার অরুণরাঙা প্রভাতের মধ্যে। নব জাতীয় জীবনের সেই ব্রাহ্মমুহূর্তটি যখন স্বর্গ থেকে আগুন নেমে এসেছিল বঙ্কিমের লেখনীর মুখে আর সেই অগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিল মহাসঙ্গীত বন্দেমাতরম্।

নবজীবনের মন্ত্র পাওয়া গেল। ভেদবুদ্ধির সর্বনেশে দানবটাকে পরাস্ত করবার পাশুপত অস্ত্র মিলল বন্দেমাতরম্-এর মহাগানের মধ্যে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীর বেয়নেটের মুখ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে গেলে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ত সর্বাগ্রে চাই, আরও কিছু চাই। প্রেমের শক্তির সঙ্গে অস্ত্রবল। বঙ্কিমচন্দ্র গান্ধীপন্থী ছিলেন না। অবশ্য উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিমায় মিল প্রচুর। দেশের নিরন্ন অর্দ্ধ-উলঙ্গ চাষীদের মঙ্গল উভয়েরই মর্ম্মমূলে। অন্যায়কে বাধা দেওয়ার বাণী

দু'জনেরই কণ্ঠে। স্বাধীনতা দু'জনেরই মর্মের মহাসঙ্গীত। দু'জনেই বিশ্বাস করতেন ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে নিজস্ব সম্পত্তি ক'রে রেখেছে নিছক বারুদের জোরে এবং দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম। বড় চোরের হাত থেকে নিজস্ব রক্ষার নাম Patriotism—এই হচ্ছে বঙ্কিমের দেশবাৎসল্যের সংজ্ঞা। ইংলণ্ড যাতে চোরাই মাল ছাড়তে বাধ্য হয়, তারই জন্যে Quiet India আন্দোলন। গান্ধী এবং বঙ্কিম উভয়েরই বদ্ধমূল ধারণা ছিল, সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষের মত এত বড় একটা মূল্যবান্ সম্পত্তি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করবে না। গান্ধী বলেছিলেন, force must be matched to force. শক্তির বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ করতে হবে। বঙ্কিমও আবেদন নিবেদনের পথে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনিও শক্তিপ্রয়োগে বিশ্বাস করতেন। তবে সেই শক্তি গান্ধীর অহিংস আত্মিক শক্তি নয়, গাণ্ডীবধন্বার ধনুর্ব্বানের মারবার শক্তি। Patriotism এর অনুপম বঙ্কিমী ভাষ্যের পটভূমিতে কৃষ্ণচরিত্রের নিম্নলিখিত লাইনগুলি বঙ্কিমের জীবনদর্শনকে বুঝতে সাহায্য করবে প্রচুর।

"যে দস্যু প্রতাপ্ত হইয়া নিশীথে আমার গৃহ প্রবেশপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিতেছে যদি বিনাশ ভিন্ন তাহাকে নিবারণের উপায় না থাকে তবে তাহাকে বিনাশ করাই আমার পক্ষে ধর্ম্মানুগত। যে বিচারকের সম্মুখে হত্যাকারীকৃত হত্যা প্রমাণিত হইয়াছে, যদি তাহার বধদণ্ড রাজনিয়োগসম্মত হয় তবে তিনি তাঁহার বধাজ্ঞা প্রচার করিতে ধর্ম্মত বাধ্য এবং যে রাজপুরুষের উপর বধের ভার আছে, সেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য। সেকেন্দর বা গজনবী মহম্মদ আত্তিলা বা জঙ্গেজ, তৈমুর বা নাদের, দ্বিতীয় ফ্রেড্রিক বা নাপোলেয়ন পরস্ব বা পররাষ্ট্রাপহরণ জন্য যে অগণিত শিক্ষিত তস্কর লইয়া পররাজ্য প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ লক্ষ হইলেও প্রত্যেকেই ধর্ম্মতঃ বধ্য। এখানে হিংসাই ধর্ম।"

কিন্তু 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।' জাতির হৃদয়-আসনে তখন বিরাজ করছেন চৈতন্যদেবের প্রেমময় কৃষ্ণ বাঁকা বাঁশরি হাতে শ্রীরাধাকে বামে নিয়ে। শিখিপুচ্ছধারী চৈতন্যের কৃষ্ণে একটি করুণ কোমল শান্তস্নিগ্ধ লালিত্যের মধুর অভিব্যক্তি। কিন্তু কৃষ্ণ কি শুধু জয়দেব গোসাইয়ের এবং চৈতন্যমহাপ্রভুর প্রেমময় কৃষ্ণ? কুরুক্ষেত্রের কপিধ্বজরথের সারথীর মধ্যে গীতাসিংহনাদকারী যে প্রচণ্ড মনোহর কৃষ্ণকে আমরা দেখেছি প্রলয়ঙ্করের ভূমিকায়—সেই কৃষ্ণ কি নিছক কবিকল্পনা? Essays on the Gitaর মধ্যে গীতাভাষ্যের অরবিন্দ ভগবানের বিশ্বরূপের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি কঠিন সত্য বলেছেন:

The weakness of the human heart wants only fair and comforting truths or in their absence pleasant fables: it will not have the truth in its entirely because there is much that is not clear and pleasant and comfortable, but hard to understand and harder to bear.

"মানব-হৃদয়ের দুর্ব্বলতা সত্যগুলিকে চায় শুধু তাদের ললিতরূপে। মধুরে তার লোভ। মধুর সত্য না পেলে সে নিজেকে ভোলাবে কল্পিত কাহিনীর লালিত্য দিয়ে। সত্যকে তার সামগ্রিকরূপে সে দেখতে নারাজ। পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা যতটা দুর্ব্বোধ্য তার চেয়ে বেশী দুঃসহ।"

অরবিন্দ বলছেন:

আমাদের এই সংগ্রামের এবং শ্রমের জগৎ ধ্বংসলীলায় ভীষণ। বিপুল সঙ্কটের আবর্ত্তসঙ্কুল জলরাশি ঠেলে আমাদের জীবনতরী টলমল করতে করতে চলেছে। এমন একটা জগতের মধ্যে আমরা রয়েছি যেখানে আমাদের প্রতি পদক্ষেপে কিছু না-কিছু চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সে আমাদের ইচ্ছাতেই হোক্ আর অনিচ্ছাতেই হোক্। এখানে every breath of life is a breath too of death. জগতের মৃত্যুময়, পাপময় এই ভীষণ দিকটার জন্যে ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তা কোন মহাপরাক্রমশালী শয়তানকে দায়ী করে নি, অপরাধী করে নি কোন স্বাধীনসত্তাবিশিষ্ট প্রকৃতিকে অথবা মানুষকে ও তার পাপকে।

অরবিন্দ আবার বলছেন:

We have to see that God the bountiful and prodigal creator, God the helpful, strong and benignant preserver is also God the devourer and destroyer.

অন্তহীন সৃষ্টির লীলায় যিনি স্রষ্টার এবং রক্ষাকর্ত্তার ভূমিকায় সেই ঈশ্বরকেই দেখতে হবে ধ্বংসের প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে।

বঙ্কিমচন্দ্র চৈতন্যের এবং জয়দেব গোসাইয়ের ললিতমধুর প্রেমময় কৃষ্ণের পরিবর্তে মহাভারতের শক্তিময় প্রচণ্ড-মনোহর কৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত করলেন নবভারতের হৃদয়-মন্দিরে। কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম লিখেছেন,

"জয়দেব গোসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না। এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতির হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে।"

বঙ্কিম ক্ষমাসুন্দর খৃষ্টকে অথবা করুণাঘন বুদ্ধকে আদর্শ

পুরুষের আসন যেন নাই, কৃষ্ণের মাধুর্য্যস্রোতে সদা-ভাসমান গৌরাঙ্গকেও নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, য়িহুদীরা রোমকের অত্যাচারপীড়িত হয়ে যদি স্বাধীনতার যুদ্ধে যীশুকে সেনাপতিত্বে বরণ করত তিনি 'কাইসরের পাওনা কাইসরকে দাও' ব'লে প্রস্থান করতেন। বুদ্ধ বা গৌরাঙ্গ যুদ্ধের ধার দিয়েও যেতেন না। বঙ্কিমের মতে "কৃষ্ণও যুদ্ধে প্রবৃত্তিশূন্য—কিন্তু ধর্ম্মার্থ যুদ্ধও আছে। ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগত্যা প্রবৃত্ত হইতেন।" মহাভারতের কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিয়েছেন যুদ্ধ করবার প্রেরণা—কারণ গাণ্ডীবের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিপুঞ্জের অত্যাচারে জর্জ্জরিত আর্ত্ত মানবতাকে রক্ষা করবার আর কোন উপায় ছিল না।

ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে তার সম্পত্তি করে রেখেছিল। পররাষ্ট্রাপহরণের অপরাধে সে অপরাধী। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের উপরে তার ঐশ্বর্য্য। যিনি দেশরক্ষাকে গুরুতর ধর্ম্ম বলে বিশ্বাস করতেন, "আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহারেও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না"—এই ছিল যার বজ্রদৃঢ় সংকল্প, তিনি ছিলেন আগা-গোড়া বিপ্লবীর ধাতুতে গড়া। আর সেই জন্যেই কৃষ্ণচরিত্র লিখলেন যাতে তিনি যেন কৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার জন্যে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

বঙ্কিম ক্ষেত্রবিশেষে হিংসা ধর্ম্ম বলতে কুণ্ঠিত হন নি। গীতা ভাষ্যের অরবিন্দ লিখেছেন :

No real peace can be till the heart of man deserves peace; the law of Vishnu cannot prevail till the debt of Rudra is paid.

মানুষের হৃদয় যদি এখনও সেই আদিমবর্ব্বরের লীলা-ভূমি হয়ে থাকে। তবে প্রকৃত শান্তি কেমন ক'রে আসবে? রুদ্রের দেনা শোধ না করা পর্য্যন্ত বিষ্ণুর নীতি অচল থেকে যাবে। প্রেমধর্ম্ম প্রচারের জন্যে জগদ্‌গুরুদের আবির্ভাব হবেই, কারণ ঐ পথেই মানুষের পরম মুক্তি। কিন্তু এখনই দরকার অত্যাচারের বিলুপ্তি, এখনই প্রয়োজন দুষ্টের দমন এবং ধরিত্রীর উদ্ধার। আসুরিক শক্তিপুঞ্জের অত্যাচারে বিপন্ন মানবতা কাঁদছে গাণ্ডীবধন্বার আবির্ভাবের জন্যে। শক্তির অহঙ্কারে যারা অন্ধ তারা ত আর্ত্তের কান্নায় কান দেবে না। তাই ত জগৎ জুড়ে সশস্ত্র বিপ্লবের লীলা চলেছে আর এই নির্ম্মম বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি রেখেই শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন :

But not till the Time Spirit of man is ready can the inner and ultimate prevail over the outer and immediate reality Christ and Buddha have come and gone but it is Rudra who still holds the world in the hollow of his hand.

চরম সত্য আমরা কামনা করব নিশ্চয়ই। প্রেমের এবং ঐক্যের আদর্শকে আমরা কখনই বর্জ্জন করতে পারি নি। কিন্তু mankind এখনও unevolved. মানুষের হৃদয় থেকে এখনও ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হয় নি। তার স্বভাবে পশু এখনও প্রবল। এই তিক্ত সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে জগত এখনও রুদ্রের করতলগত হয়ে থাকবে এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে! শৃঙ্খলিত মানবতা দুঃখমোচনের প্রতীক্ষায় কতদিন অপেক্ষা ক'রে থাকতে পারে? কবে অর্থগৃধ্নু সমাজপতি শাইলকেরা সর্ব্বহারাদের দুঃখে বিচলিত হয়ে স্বেচ্ছায় তাদের সম্পদে সবাইকে ভাগ দেবে, এর জন্যে ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা ক'রে থাকা সাধারণ মানুষের ধৈর্য্যের বাহিরে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, এই যুদ্ধের পটভূমিতে অর্জ্জুনের মনে নীতিগত একটা সমস্যার উদয়, ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্যের আদর্শকে অনুসরণ ক'রে অর্জ্জুন সত্যের, ন্যায়ের এবং ধর্ম্মের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে নররক্তে পৃথিবী প্লাবিত করবেন, না যুদ্ধ থেকে, হিংসা থেকে বিরত থাকবেন, এই দ্বন্দ্ব, কৃষ্ণের বাণীতে এই সমস্যার সমাধানের আলো—এই সব নিয়েই গীতা। বঙ্কিম, অরবিন্দ, গান্ধী সবাই গীতার ভাষ্য করেছেন। গীতার মধ্যে গান্ধী দেখেছেন অহিংসার জয়জয়কার। গীতার ব্যাখ্যায় অরবিন্দের এবং বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গিমা স্বতন্ত্র। অরবিন্দ বা বঙ্কিম—কেউ যুদ্ধের সমর্থক নন। গান্ধীর মতই এঁরা শান্তিবাদী। কিন্তু হিংসার এবং অহিংসার আদর্শগত দ্বন্দ্বে অহিংসা গান্ধীর কাছ থেকে যে অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছে অরবিন্দের ও বঙ্কিমের কাছ থেকে তা পায় নি—একথা জোরের সঙ্গেই বলা যেতে পারে। শেষোক্ত দুই জন কি অধিকতর বাস্তববাদী ছিলেন?

ফানুস

শৈলেন রায়

হঠাৎ ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেণটা থেমে গেল। বিহারের ছোট্ট একটা ষ্টেশন। বেশ রাত হয়ে গেছে। যাত্রীর ওঠানামা বিশেষ হ'ল না। হুইসিল দিয়ে ট্রেণ ছেড়ে গেল। হঠাৎ চলন্ত ট্রেণে আমাদের কামরাতেই লাফিয়ে উঠে পড়ল একটি লোক। শীতের রাত, গায়ে তার গরম ওভার কোট, মাথায় ফেল্টের টুপি, চোখে কালো চশমা। এত রাতে, এভাবে এরকম একজন লোককে দেখে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপায় আর কি! সেই এক মুহূর্তের মধ্যেই মনে হ'ল—ষ্টেশনে আমাদের কামরা থেকে কাচা বাচ্চাসহ যে বিহারী পরিবারটি নেমে গেলেন, তার পর আর দরজার ছিটকিনি লাগানো হয় নি। কটমট করে স্বামীর দিকে তাকাতেই হঠাৎ কানে এল—'আরে, ছবিদি না?'

আগন্তুক ততক্ষণ মাথার টুপি খুলে হাসতে হাসতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ও, এ দেখছি অঞ্জন—কতদিন আগেকার সেই অঞ্জন। বিশেষ পালটায় নি কিন্তু অঞ্জন। সেই রকম একমাথা কোঁকড়ান চুল, সেই সমস্ত দাঁত বের করে প্রাণখোলা হাসি—এমন কি সেই কালো চশমাটা পর্যন্ত ঠিক সেই রকম আছে। এই চশমা নিয়ে যে কি ঠাট্টাই না করত বনানী!

বনানী বলত—'জান ছবিদি, ও কালো চশমা পড়ে কেন? চক্ষুলজ্জা কমে যায় বলে। আর তা ছাড়া—' 'চোখে-মুখে যেন দুষ্টুমি খেলে যেত বনানীর।' 'আর তা ছাড়া—এদিক-ওদিক দেখবারও ভারী সুবিধে, তাই না?'

হো হো করে হেসে উঠত অঞ্জন—'তোমার কি হিংসে হয় নাকি তাতে?'

—আমার বয়েই গেছে—'এসব বিয়ের আগেকার কথা। বেশ অনেকদিন হয়ে গেল বৈকি!

—'ও হরি, তুমি আবার কি ভাবছ এত! জামাই বাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে তোমার কথা ত ভুলেই গিয়েছিলাম ছবিদি।'

কত কথাই মনে হয়। মনে হয়, এই সেদিনও 'দিদি চা খাব' বলে এসে দাঁড়াত সে। না বললেও রেহাই নেই। ঘ্যান ঘ্যান সুরু করে দেবে। বড্ড ঘ্যানঘ্যানে স্বভাব ছিল অঞ্জনের। এখনও কি সেরকমটি আছে, না পালটেছে একটু। ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। একটু যেন মোটা হয়েছে অঞ্জন। মাথায় কোকড়ান চুল, লাল ঠোঁট দু'টি তার সেই আগেকার মতই আছে যেন।

বনানী বলত—'কাকাতুয়া! কাকাতুয়ার ঠোঁট লাল। আর তোমার ঠোঁটও যেন ঠিক কাকাতুয়ার মত। মেয়েলী ঠোঁট তোমার।'

অঞ্জন হারবার পাত্র নয়। সোফায় হেলান দিয়ে হাসতে হাসতে বলত—'কিন্তু চুল? তুমিই ত বলেছ, আমার চুল না কি—' ছুটে ঘর ছেড়ে চলে চলে যেত বনানী, লজ্জায়ই হয়ত।

—'তুমি কথা বলছ না কেন ছবিদি?' অঞ্জন খুসীর আনন্দে ঝলমলিয়ে ওঠে।

—'এই ত বলছি, কতদিন পর দেখা বল ত?'

—'তা হবে অনেকদিন, এই পর গিয়ে—যাক সেকথা, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পরেও পাওয়া যাবে। বাড়ী গিয়ে হিসেব করলেই হবে।'

—'বাড়ী?'

—'হাঁ, বাড়ী। আমার বাড়ী। পাটনার বাড়ী। যেখানে আমি থাকি, বনানী থাকে, বাবলু থাকে, আমাদের বুড়ো রামধুন থাকে, আর—'

বাধা দিয়ে বললাম—'থাক, আর লিষ্ট বাড়াতে হবে না। বাবলু ছেলে বুঝি? কই, সে খবর ত দাও নি।'

—'দেব কেন? কেউ না আর আমাদের খবর রাখে বল?' ঝাঁজিয়ে ওঠে অঞ্জন।

হেসে মেনে নিলাম—'তা বটে। দোষ আমার।'

বলতে বলতেই গাড়ীর গতি কমে এল।

অঞ্জন ব'লে উঠল, 'পাটনা এসে গেল। জামাইবাবু উঠুন, ছবিদি তুমিও ওঠ ত, বিছানাটা বেঁধে ফেলি।'

—'সে কি ! বিছানা বাঁধবে কেন !'

অঞ্জনের আর এক মুহূর্ত দাঁড়াবার সময় নেই যেন—'ওঠ আগে, পরে বলছি।' উঠে দাঁড়াতেই বলল, 'নামতে হবে এখানে, আমাদের বাড়ী যেতে হবে, থাকতে হবে অনেকদিন, তোমাদের অত সহজে ছাড়ছি না।' হঠাৎ যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল—'কি খুসীই না হবে বনানী। তুমি কিন্তু আগে ঘরে ঢুকতে পারবে না ছবিদি। জামাইবাবু আপনিও বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমি ডাকলেই ভেতরে ঢুকবেন। এমন মজা হবে—'চোখের সামনে মজার সেই দৃশ্য দেখে যেন আনন্দে হেসে ওঠে অঞ্জন। সেই আগেকার ছেলেমানুষী হাসি।

অঞ্জন যেন বড় হয় নি একটুও। সেই ছেলেমানুষী যেন রয়ে গেছে আজও। সেই সেদিনকার মত। যেদিন বি, এস-সি পাশ করেছিল সে।

তা প্রায় বছর দশেক হ'ল বৈ কি! কি মজাই সে করেছিল বনানীকে নিয়ে সেদিন!

রান্না করছি সকাল বেলা। দৌড়তে দৌড়তে অঞ্জন এসে সোজা রান্নাঘরের সামনে হাজির। আনন্দে দিশেহারা হয়ে এক হাত দূরের আমিকে চেঁচিয়ে ডেকে উঠল—

ছবিদি।

চমকে উঠে বললাম—'কি হল?'

—'আমি পাশ করেছি ছবিদি।

—'ওমা, কি মজা, কি খাওয়াবে বল?'

—'তুমি যা খেতে চাইবে। মিষ্টি, চপ, কাটলেট, মুরগীর মাংস—' হঠাৎ কি মনে হ'তেই একটু চুপ্ সে যায় অঞ্জন।

—'অবিশ্যি, তুমি ত এসবের কিছুই ভালবাস না ছবিদি। তুমি ত শুধু চা—' কি রকম করুণ শোনায় তার গলা।

তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই যেন সেদিন বলেছিলাম—'খাব না কেন? মুরগীর মাংসই খাই ত, তোমার জামাইবাবুও মুরগীর মাংস ভালবাসে। তা ছাড়া—' হয়ত খানিকটা দুষ্টুমি করেই বলেছিলাম—' বন্যাও ত খুব ভালবাসে মুরগীর মাংস খেতে।'

অঞ্জন বড় বিব্রত বোধ করত আমার মুখে ঐ বন্যা নাম। ওটা যেন ওর নিজস্ব—শুধু ওরই। ওই নামটা আর কারুর মুখে শুনতে যেন চায় না সে। কবে কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে ওর নিজের মুখ দিয়ে আমার সামনেই হয়ত বন্যা নামটা বেরিয়ে গিয়ে থাকবে। নইলে আমি জানবই বা কেমন করে? যেটা ওদের নিজস্ব—একান্ত গোপনীয় নাম!

ছোট্ট একটা 'বেশ তাই হবে' ব'লে অঞ্জন চুপ করে গিয়েছিলো।

হঠাৎ কলিং বেলের আওয়াজ শুনতেই অঞ্জনের চোখে দুষ্টুমি খেলে যায়। বলে, 'নিশ্চয়ই বনানী। আজ বেশ মজা করা যাবে। তুমি ব'লো আমি ফেল করেছি আর আমি মুখ গোমরা করে বসে থাকব—' এতে কি মজা হবে তা অঞ্জনই জানত। তবে সেদিন তার কোন আনন্দই নষ্ট করতে আমার খারাপ লেগেছিল। আমি রাজী হয়ে গেলাম।

সামনের ঘরে অঞ্জন মাথা নীচু করে বসে আছে, দরজা খুলে দিতেই এক ঝলক দুরন্ত হাওয়ার মত বনানী ঘরে ঢুকে পড়ল। উচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়ল সে।

—'জানো ছবিদি, আজ রেজাল্ট বেরিয়েছে।' বলতে বলতেই অঞ্জনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই থমকে গেল সে। জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম, 'খবর ভাল নয়', ততক্ষণ অঞ্জন দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে। কান্নার আবেগে সমস্ত শরীর তার দুলে দুলে উঠছে বুঝি।

বললাম—'যাই, চা'র জল চাপিয়ে আসি', হাসি চাপতে চাপতে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

একটু পরে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম, বনানী ঝুঁকে পড়ে দু হাত অঞ্জনের কোঁকড়ান চুলে হাত বুলচ্ছে আর বলছে—'তাতে কি হয়েছে অঞ্জু। সামনের বার নিশ্চয়ই হবে। আঃ, কি হচ্ছে। এরকম করে না। আমি যে তা হ'লে—' বলতে বলতে গলা ধরে আসে বনানীর। সেদিন সে-সময় ঘরে ঢোকা আমার আর হয় নি।

কতদিন আগেকার কথা, অথচ মনে হয় যেন সেদিন!

—'তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে ছবিদি। আমরা কিন্তু এসে গেলাম। মনে থাকে যেন। তোমরা আগে ঢুকবে না। ট্যাক্সিতেই ব'সে থেক তোমরা—আমি ডাকলে যাবে কিন্তু।'

তার সব কথাই মেনেছি, অঞ্জনের ডাক শুনে আমরা নেমেছি, তারপর যা কাণ্ড !

বনানী ত প্রথমটা কি করবে ভেবেই পায় না কিছু। তারপর ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে সে কি আদর !

—'এতদিনে তবু খোঁজ পড়ল। সেই কবে বিয়ের পর পাটনায় চলে এলাম। না একবার খোঁজ নেওয়া, না যেতে বলা।'

বলতে ইচ্ছে হ'ল— 'ওরে মুখপুড়ী! তখন কি তোদের সময় ছিল রে! বেশী খোঁজ-খবর নিলেই কি খুশী হতিস্ তখন?'

সেই বনানী। সেই ছোটখাটো মেয়েটি, দেখতে সুন্দরী না হ'লেও সুশ্রী বলা চলত তাকে। চোখ দু'টি জীবনের উচ্ছলতায় পূর্ণ। এ কি চেহারা হয়েছে বনানীর! মোটা হয়েছে—ভীষণ ভাবে মোটা হয়ে গেছে সে। গালের মাংসের চাপে অমন সুন্দর চোখ দুটি আজ যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু স্বভাবটা যেন আগের মতই আছে। আর কাউকেই কথা বলতে দেবে না সে। রাজ্যের যত কথা তার মুখে—'জান, ছবিদি, তোমার ওপর না ভীষণ রাগ হয়েছিল আমার। যখন তুমি আমার চিঠির জবাব পর্যন্ত দাও নি—'

তাকে বাধা দিয়ে বললাম— 'চিঠির জবাব ত দিয়েছিলাম। পাও নি কেন বুঝলাম না ত।'

—'ছাই দিয়েছ—' আরও কি বলতে যাচ্ছিল সে। অঞ্জন বাধা দিয়ে বলল— 'তোমরা কি ঝগড়াই করবে না খেতে-টেতে দেবে কিছু। বুড়ীর ত আবার চা না হ'লে চলবে না—তা রাত যতই হোক না কেন!'

বুড়ী বলে খ্যাপাত ওরা দুজনাই আমাকে, বিয়ের আগে থেকেই।

বেশ কয়েকটা দিন পাটনায় ছিলাম সেবার। কর্তা অবিশ্যি দু'দিন পরেই চলে গিয়েছিলেন।

ওরা আমাকে কিছুতেই যেতে দেয় নি। জোর করে ধরে রেখেছে। আগের মত ছেলেমানুষই রয়ে গেছে যেন দু'জনে।

বনানী কিন্তু সে কথা মানে না। জানো ছবিদি, ও না কি রকম দিনকে-দিন যেন বদলে যাচ্ছে। কাজ আর কাজ। প্রায়ই বাইরে যেতে হয় কাজে। একা একা ভাল লাগে না থাকতে। প্রথম প্রথম ত ভয়ই লাগত, এখন অবিশ্যি অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। তা ছাড়া বাবলু থাকায় সময়টাও কেটে যায়। বাবলু ঠিক অঞ্জনের মতই হয়েছে যেন দেখতে, একমাথা কোঁকড়ান চুল, লাল ঠোঁট দু'টি, টকটকে গায়ের রং। মোটা সোটা গড়ন। বহুদিন পর যেন অঞ্জন আবার ফিরে এসেছে বাবলুর মধ্যে।

বিয়ের আগে বনানী বলত—' আমি ত বিয়ে করব না। আমি চাকরি করব—স্বাধীন ভাবে থাকব, তোমাকে কিন্তু মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে থাকতে হবে ছবিদি।'

অঞ্জন ফোঁড়ন কাটত—'একা ছবিদি যেতে বসেছে জামাইবাবুকে ছেড়ে।' সান্ত্বনা দেবার জন্যেই যেন বলত 'আমি কিন্তু তোমাদের দুজনকেই নিয়ে রাখব ছবিদি। জানো ছবিদি, আমি কলকাতার বাইরে চাকরি করব, কলকাতার এই ঘিঞ্জি আমার ভাল লাগে না। বেশ নির্জন ছোট খাটো কোন সহর—গ্রাম হ'লেও আপত্তি নেই। বিয়ে করব না—বেশ থাকব একা একা।'

বনানী বহুদিন আমার গলা জড়িয়ে বলেছে—'তোমাকে আমি খুব ভালবাসি ছবিদি। অঞ্জনের কথা ছেড়ে দাও। পুরুষ মানুষ শুধু মুখে বলে। আমি কিন্তু তোমার পাশে পাশেই থাকব চিরদিন।'

কিন্তু আমার পাশে পাশে থাকা তার হয় নি। বিয়ে হ'লে, অঞ্জন চাকরি পেল। বনানীকে নিয়ে চলে গেল। যাবার দিন বনানীর সে কি কান্না!

যে ক'দিন পাটনায় ছিলাম, অঞ্জন অফিস যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিল এক রকম। সকালবেলা কোনমতে বুড়ী-ছোঁয়া করেই চ'লে আসত, হাকডাক করে বলত—'চল ছবিদি, তোমাকে নালন্দা দেখিয়ে নিয়ে আসি। কোন দিন বা—'চল তাড়াতাড়ি, সহরের বাইরে ঘুরে আসা যাক, না হয় সহরের মধ্যেই ঘোরা যাবে খানিকটা।'

বনানী যেন আর পারছে না। এত ঘোরাঘুরি, দৌড়-ঝাঁপ আর যেন সইছে না তার। মাঝে মাঝে যেন

ভয় পেয়েই ধীরে ধীরে আপনার মনেই বলত—' অঞ্জনের যে কি হ'ল? এমনি কিন্তু অফিসের পর একেবারে বেরোতে চায় না। শুধু কাজ আর কাজ, না হ'লে বই মুখে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকা।'

সত্যিই দশ বছর আগেকার অঞ্জন যেন আবার ফিরে এসেছে। সেদিন বিকেলে হাসতে হাসতে বলে— 'আচ্ছা ছবিদি, তোমার খুব কষ্ট হয় এভাবে ঘোরাঘুরি করতে, তাই না? কিন্তু কি করব বল—সব যে দেখাতে ইচ্ছে করে তোমাকে. আরও যে কত কি বাকী রয়ে গেল—কত কি যে তুমি দেখতে পেলে না।' নিজের মনেই হিসেব করতে বসে যায় যেন সে।

হেসে বলি— 'পাটনায় যে এত সব দেখবার জিনিষ ছিল আগে ত জানতাম না কোনদিন।'

মুরুব্বি চালে অঞ্জন বলে—' দেখবার চোখ থাকা চাই ত। যাক্, কথা বলে কাজ নেই। চল, আজ একটা বাংলা ছবি এসেছে, দেখা যাক। কতদিন ছবি দেখি না। বনানী তুমিও ঠিক করে রেডি হয়ে নাও।'

বনানী যায় নি। শরীরটা তার আবার ভালো যাচ্ছে না ক'দিন মাথাও ধরেছে বুঝি। আমাদেরও আর যাওয়া হয় নি সেদিন।

...মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই পাশের ঘর থেকে চাপা মেয়েলী গলার আওয়াজ কানে এল—' অাপিস কামাই দিয়ে এত মাতামাতি আগে ত কোনদিন দেখি নি। দেখা হ'য়েছিল—নিয়ে এসেছো, বেশ করেছো ভালই করেছো. কিন্তু এদিকে যাবার যে নাম নেই—'

— চুপ করো। ছবিদি থাকছে না—তাকে জোর করে ধরে রাখা হয়েছে

—'রাখা হয়েছে! কেন এতদিন ধরে কিসের রাখা—' সাপের ফণা লকলকিয়ে ওঠে।

—'চুপ করো, চেঁচিও না। নীচু মন তোমার। ছবিদি যদি শুনতে পায়—'

—কি, কি হবে তা'হলে? হাতে মাথা নেবে নাকি তা'হলে আমার—'গলা যেন বুজে আসে বনানীর। কিছুক্ষণ চুপ চাপ।

হঠাৎ অঞ্জনের চাপা গর্জন—' খবরদার বনানী। চুল ধরে টানবে না কিন্তু। ঘুমোই নি আমি—'

—ঘুমোও নি ত মটকা মেরে পড়ে আছ কেন? কথার জবাব দাও আমার—'

অনেকদিন আগেকার কথা, সব কথা আজ আর মনেও নেই, পরদিন সকাল বেলাই ক'লকাতার গাড়ী ধরলাম. অঞ্জন ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিলো।

হুইসিল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল, অঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল. হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল—' আমি জানি ছবিদি, তুমি আর কোন দিন আসবে না—' গাড়ী তখন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে চলেছে।

তখনও দাঁড়িয়ে আছে অঞ্জন। ধীরে ধীরে কত দূরে সরে যাচ্ছে সে। ছোট হ'তে হ'তে বিন্দু হয়ে যাচ্ছে যেন অঞ্জন!

আমার সামনে ভেসে উঠল বহুদিন আগেকার ফেলে আসা একটি দিন! যেদিন বি. এস. সি পরীক্ষায় মিথ্যে ফেল করে মুখ কাঁচু মাচু করে আমাদের সামনের ঘরে বসেছিলো অঞ্জন। বনানীর সঙ্গে মজা করবার জন্য।

সেই দিনটি!

এল্‌গিন মার্ব্বল্‌স্

জুল্‌ফিকার

চব্বিশ শ' বছরেরও আগের কথা, সে যুগে এথেন্সে ফাইডিয়াস্‌ নামে একজন অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পীর অভ্যুদয় হয়েছিল। এই গ্রীক্‌ শিল্পী রচিত মর্ম্মর মূর্ত্তিগুলি শিল্প জগতের অপার বিস্ময়! ভাস্কর্য্যে ফাইডিয়াসের অতুলনীয় সৃজন প্রতিভায় মুগ্ধচিত্ত শিল্প-বিশেষজ্ঞেরা তাঁকে যেমন উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি জানিয়েছেন, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন শিল্পীর ভাগ্যেই ততখানি সোচ্চার প্রশংসা মেলে নি, ভবিষ্যতেও মিলবে কি না সন্দেহ। তাঁদের কথায়,

'His work stands unchallenged as the noblest ever produced by human hands.'

প্রাচীন গ্রীক্‌ বা হেলিনিক স্থাপত্যে শিল্প-দক্ষতার প্রকৃষ্ট ও গৌরবময় নিদর্শন হচ্ছে পার্থিনন বা এথেনা দেবীর মন্দির এবং সেখানে স্থাপিত তাঁর বিশাল মর্ম্মর মূর্ত্তি। গ্রীকদের যিনি এথেনা, তিনিই পরবর্ত্তী যুগে রোমানদের মিনার্ভা—জ্ঞান ও প্রকৌশলের অধিষ্ঠাত্রী, হিন্দুদের যেমন সরস্বতী।...

এথেন্স নগরীর উপকণ্ঠে এ্যাক্রোপোলিস (উঁচু শহর) নামক ছোট পাহাড়ের উপর এথেনা দেবীর এই মন্দির—পার্থিনন স্থাপিত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৪৭ থেকে ৪৩৮ সালের মধ্যে। ডোরিক (Doric) পদ্ধতিতে নির্ম্মিত এই দেবালয়টি দৈর্ঘ্যে ২২৮ ফিট, প্রস্থে ১০১ ফিট ও উচ্চতায় ৬৬ ফিট। এর ধ্বংসাবশেষ দেখতে আজও নানা দেশ থেকে হাজার হাজার দর্শক ও শিল্পানুরাগী এথেন্সে এসে থাকেন।

একধারে আটটি, অন্যধারে সতেরটি অত্যুচ্চ স্তম্ভের সারি, চারিদিকে ঘোরানো মার্ব্বেল পাথরের বারান্দা। মাঝে মন্দির-প্রকোষ্ঠে স্থাপিত হয়েছিল এথেনা পার্থিননের প্রতিমা—ভাস্কর ফাইডিয়াসের অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

*

পার্থিননের পুব ও পশ্চিম দিকের থামগুলোর মাথার উপর পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে অনেকগুলি মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। পূর্ব্ব ধারে দেখান হয়েছিল দেবী এথেনার জন্ম আর পশ্চিম ধারে এ্যাটিকার জন্ম ও এথেনার সঙ্গে বরুণদেবের (Poseidon) দ্বন্দ্ব যুদ্ধ।

উত্তর ও দক্ষিণ ধারে স্তম্ভ-শীর্ষে মূর্ত্তিলাঞ্ছিত যে চৌকো পাষাণ ফলক (metopes) ছিল, তাতে লাপিথাদের সঙ্গে নরাশ্ব বা Centaurs-দের লড়াই প্রভৃতি অনেকগুলো পৌরাণিক ঘটনাকে রূপায়িত করা হয়েছিল—ছাদের কার্ণিসের নীচে চারদিকে ঘোরানো লম্বা ফালি জায়গাটায় (Frieze) বিভিন্ন দেবদেবীর মিছিলের দৃশ্য —সর্ব্বত্রই শিল্পী ফাইডিয়াসের হাতের যাদু স্পর্শ।...

পার্থিনন সম্বন্ধে বিস্ময়-বিমূঢ় বিশেষজ্ঞদের অভিমত প্রশস্তির সীমাতিক্রান্ত। বস্তুতঃ কোন প্রশংসাই এই অনবদ্য স্থাপত্য শিল্পকর্ম্মের পক্ষে যথেষ্ট নয়। শিল্পরসিকেরা বলেছেন—

—'Undoubtedly it was the most beautiful and noblest building ever erected by man and even as a ruin it is one of the wonders of the world.'

অপরূপ হেলিনিক শিল্প-সম্ভারের কিছু কিছু ব্রিটিশ মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে। সুদূর গ্রীস থেকে কি ভাবে এগুলোকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে আসা হ'ল, তার এক ইতিহাস আছে। সেই কথাটাই বলব এখানে।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কনষ্টাণ্টিনোপলে (ইস্তাম্বুল) ব্রিটিশ রাজদূত নিযুক্ত হয়ে এলেন লর্ড এলগিন। গোটা গ্রীস দেশটা তখন রোমের বাদশার অধীন। গ্রীক্‌ শিল্পকলা বা হেলিনিক আর্ট সম্বন্ধে তুর্কী শাসকদের আদৌ আকর্ষণ বা উৎসাহ ছিল না। গ্রীসের প্রাচীন মন্দিরগুলো যে ভগ্নদশায়, আর সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তিগুলো—শিল্প-নৈপুণ্যের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন,যে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে, সে বিষয়ে তুর্ক কর্ত্তাদের বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা বোধ ছিল না।

লর্ড এলগিন ছিলেন শিল্পরসজ্ঞ, বিদগ্ধ ব্যক্তি, গ্রীক্‌ ভাস্কর্য্যের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হবার পর, তার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা জেগেছিল তাঁর মনে।

পার্থিনন ও এথেন্সের অন্য একটা মন্দির নাইক এ্যাপ্টেরস (Nike Apteros) থেকে বহু অর্থব্যয়ে কয়েকটি চমৎকার মর্ম্মর মূর্ত্তি ও উৎকীর্ণ শিলাপট সংগ্রহ করে লর্ড এলগিন অনেক কষ্টে দেশে নিয়ে এসেছিলেন।

তাঁর এই মর্ম্মর শিল্প সংগ্রহ, যা বিলাতের যাদুঘরে রক্ষিত আছে—তাকে বলা হয়ে থাকে 'এলগিন্ মার্ব্বলস্।'

*

তুরস্কে রাজদূত থাকাকালীন এথেন্সে সফরে এসে, লর্ড এলগিন প্রাচীন গ্রীক্ দেবালয়গুলির ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা ও মূর্ত্তিগুলির দুর্দ্দশা দেখে নিতান্ত ব্যথিত হয়ে উঠলেন। মন্দির-গাত্রে গ্রীক্ ভাস্করেরা যে অপরূপ শিল্প-শৈলীর স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা বিলুপ্তির মুখে। পার্থিননের পশ্চিম ধারটায় আশেপাশে তুর্কীদের অনেকে বাড়ীঘর বেঁধে বাস করছে। একটা অপরিচ্ছন্ন বস্তি গড়ে উঠেছে অমন মহান্ ও সুদৃশ্য মন্দিরটির গা ঘেঁষে। এমন কি ফাইডিয়াসের হাতে-গড়া মূর্ত্তি ভেঙ্গে সেই পাথরের গুঁড়োর মশলা (mortar) দিয়ে কোন কোন জায়গায় গেঁথে তোলা হয়েছে দেওয়াল। বর্ব্বর তুর্কীদের এই যথেচ্ছাচারে বাধা দেবার কেউ ছিল না। লর্ড এলগিন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানালেন, গ্রীক্ শিল্পের এই সব অমূল্য নিদর্শন যাতে নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায় পৃথিবীর বুক থেকে, সেজন্য যথাসম্ভব এই সব মূর্ত্তিগুলিকে ইংল্যাণ্ডের যাদুঘরে স্থানান্তরিত করা দরকার। তাঁর এই প্রস্তাবে ইংরেজ সরকার কোন সাড়া দিলেন না। সে-যুগের সরকারী চাঁইদের কেউই কোনরূপ উৎসাহ দেখালেন না এই শিল্প সংগ্রহের ব্যাপারে। অত দূর দেশ থেকে গুরুভার মূর্ত্তিগুলি সযত্নে বহন করে আনবার ব্যয়ভার বহন করতে গভর্ণমেণ্ট রাজী হলেন না।

অগত্যা এলগিন স্থির করলেন নিজের খরচায়ই এদেশ থেকে গ্রীক্ শিল্পের নমুনাগুলো সংগ্রহ করে, সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরবেন। যে-সব মূর্ত্তিগুলো ও প্রস্তরফলক তখনও অক্ষত ছিল, কিন্তু যেগুলি সহজে অন্যত্র নিয়ে যাবার সুবিধা ছিল না—এলগিন তাদের প্লাষ্টারের ছাপ তুলে নিলেন। আর যেগুলো স্থানান্তরিত করা সম্ভব, সেগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানর জন্য সংগ্রহ করে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

১৮০১ সালে ইস্তাম্বুলের তুর্কী গভর্ণমেণ্ট এলগিনকে ঢালাও হুকুম দিলেন যে পার্থিনন মন্দিরের আশেপাশে তিনি ইচ্ছানুযায়ী খননকার্য্য চালাতে পারবেন এবং পছন্দমত যে-কোন মূর্ত্তি বা মর্ম্মর ফলক অপসারণ করতে পারবেন। এথেন্সের গভর্ণরের কাছ থেকেও আদেশ মিলল, একখানা মেটোপ ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাবার। লর্ড এলগিন এই কাজে তিন চার শ' মজুর লাগালেন। উঁচু থেকে অনেক মূর্ত্তি নীচে নামিয়ে আনা হ'ল। Frieze থেকে অনেকগুলো উৎকীর্ণ দৃশ্য খুলে নেওয়া হ'ল। অনেক তুর্কীর বাস্তু কিনে নিয়ে, ভেঙে তাদের ভিত খুঁড়ে উদ্ধার করা হ'ল কারুকার্য্যমণ্ডিত সাদা পাথরের ফলক। বছর খানেকের মধ্যে দু'শ' মস্ত মস্ত কাঠের বাক্সে প্যাক হয়ে অনেকগুলি পাথরের মূর্ত্তি ও ফলক, বাইরে পাঠানোর জন্য তৈরী হ'ল। কিন্তু এ দেশ থেকে ওগুলো নিয়ে যাবার পথে দারুণ একটা বিঘ্ন দেখা দিল।...

*

তখন ১৮০৩ সাল।

হঠাৎ ইউরোপে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ল, দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ বোনাপার্টের বিজয় অভিযানে তখন গোটা ইউরোপ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। এলগিন দেশে ফিরে আসার নির্দ্দেশ পেয়ে মালপত্তর-সমেত দেশের দিকে রওনা হয়েছেন, এরই মধ্যে লেগে গেল যুদ্ধ। ফ্রান্সে এসে তিনি আটকা পড়ে গেলেন। বেশ কয়েক বছর তাঁকে প্যারীতে বন্দী জীবনযাপন করতে হ'ল। তাঁর সংগৃহীত মর্ম্মর মূর্ত্তিগুলি বাক্সবন্দী অবস্থায় দীর্ঘ নয়-দশ বছর পড়ে থেকে, অবশেষে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে এসে পৌঁছাল।

এই শিল্প সংগ্রহের কাজে লর্ড এলগিনের কমসে কম খরচ হয়েছিল সত্তর হাজার পাউণ্ড ষ্টার্লিং অর্থাৎ ন'লাখ টাকারও বেশী।

অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর পার্লামেণ্টে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল যে, ইংরেজ সরকার মার্ব্বেলগুলো কিনে নেবেন, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের জন্য।

দাম ধার্য্য হ'ল পঁয়ত্রিশ হাজার পাউণ্ড—অর্থাৎ লর্ড এলগিনের মোট ব্যয় হয়েছিল, তার মাত্র অর্দ্ধেক টাকা। কিন্তু এ নিয়ে আর কোন ওজর-আপত্তি তুললেন না লর্ড এলগিন। হয়ত দেশের চলতি প্রবচনটা তাঁর মনে পড়েছিল—

'একদম রুটি না জোটার চেয়ে আধখানা রুটিও যদি মেলে মন্দ কি?'

তা ছাড়া আর্থিক অস্বচ্ছলতাও তাঁর বিশেষ ছিল না।

*

এই প্রসঙ্গে অনুরূপ আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে যখন লর্ড লিটন গ্রীসে মূর্ত্তি সংগ্রহে

ব্যস্ত ঠিক সেই সময় মিশর দেশে বিখ্যাত ব্রিটিশ আর্কিওলজিষ্ট স্যার র‍্যালফ এ্যাবারক্রোম্বী প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। হঠাৎ একদিন মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে ভূগর্ভের অন্তরাল থেকে দেখা দিল রক্তিম গ্র্যানিট (Granite) পাথরের সূক্ষ্মচূড় একটা স্তম্ভ (Obelisk)। তার গায়ে লেখা হাইরোগ্লাইফিক (Hieroglyphic) বা চিত্রাক্ষর থেকে জানা গেল যে, ওটা মিশর-রাজ তৃতীয় থথেমিশ (Thothemis) খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ষোড়শ শতাব্দীতে, সূর্য্যদেব আমনরা'র পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, থিবস নগরে (গ্রীকেরা যার নাম দিয়েছিল হেলিওপোলিস বা সূর্য্য-নগর) তাঁর রাজসভার সম্মুখস্থ চত্বরে।

এই বিশাল স্তম্ভটি উচ্চতায় সাড়ে আটসট্টি ফিট আর ওজনে দুশো টন বা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মণের কাছাকাছি। এই স্তম্ভটিকেও দেশে নিয়ে আসবার কথা ভেবেছিলেন এ্যাবারক্রোম্বি, গ্রীস থেকে যেমন মূর্ত্তি নিয়ে আসবার মনস্থ করেছিলেন লিটন। তাঁরও ভাগ্যে সরকারী সাহায্য মেলে নি। ভদ্রলোকটি অতি কষ্টে হাজার নয়েক পাউণ্ডের (অর্থাৎ প্রায় ১,২০,০০০৲) মত অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর ইচ্ছা অপূর্ণ ই রয়ে গেল।

এর পর মিশর-রাজ খেদিভ মহম্মদ আলী রাজা চতুর্থ জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক কালে তাঁকে এই ঐতিহাসিক স্তম্ভটি উপঢৌকন দিতে চাইলেন, কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বর এই অতিকায় প্রস্তর স্তম্ভটিকে বহন করে আনবার বিপুল ব্যয়ের কথা চিন্তা করে বিনম্র ধন্যবাদ জানিয়ে উপহারটি প্রত্যাখ্যান করলেন।

অবশেষে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বহুকষ্টে এটাকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে আসা হ'ল কাঠের খাঁচায় পুরে, সমুদ্র দিয়ে ভাসিয়ে। লণ্ডনে টেমস নদীর বাঁধের ধারে ওয়াটারলু ব্রীজের কাছে এটাকে সংস্থাপিত করা হয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে Cleopatra's Needle। এটা আনবার জন্য এক পয়সাও ব্যয় করেন নি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট। স্যার ইরাসমাস উইলসন নামক এক ভদ্র-লোকের অর্থানুকূল্যে সুদূর মিশরের মরুভূমি থেকে এই ভারী পাথরটাকে বয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল।

উপরের দুটো ঘটনা থেকেই ইংরাজ জাতির শিল্প-প্রীতি ও গভীর আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

রায়বাড়ী

গিরিবালা দেবী

প্রভাতে বিনুর ঘুম ভাঙ্গে না। ঠাকুমা আসিয়া তাড়া দেন, "ও বিনু, বড়ি দিবি কখন? রোদ্দুরে যে বারান্দা ভরে গেল। রোদ লাগলে তোর মাথা ধরবে। উঠে মুখ ধুয়ে বাসি কাপড় ছেড়ে আগে বড়ি ক'টা বসিয়ে দে। তুই বড়ি দিতে ভালবাসিস বলেই ডাল ভেজানো।"

বিনু খুপরি পিঁড়িতে বসিয়া কলাইয়ের ডালের বড়ি দিতেছে। ব্রজ কাঁসি ভরিয়া ডাল ফেনাইয়া দিতেছে। আর মনে মনে রাগে ফুলিতেছে—"হাঁড়ি হাঁড়ি রকমারি বড়ি ঘরে থাকতে আবার বড়ির পাট। বাবা, কি আহ্লাদি মেয়ে। বড়ি দিতে ভালবাসে, ভেজাও ডাল। বেঁটে-ঘষে ফেনাও, তবে না খুকুমণি কাপড়ের টুকরোয় বড়ি বসাবেন। এত দিন যে মেয়ে আকাশের চাঁদ চেয়ে বসে নি, এই আশ্চর্য্য। এমন সোহাগের মেয়েকে পরের ঘরে পাঠায়? সেখানে দিচ্ছে ছেঁচে-কুটে।"

ঠাকুমা এগিয়ে আসেন, "এককাঠা ডালের বড়ি যে তুই এক দণ্ডেই বসিয়ে দিলি বিনু, হাত নয় ত কল যেন। আজ নাকি তুই ফ্যানাভাত খেতে চাস নি, পেমোর মা তোর জন্যে গরম চালভাজা, কাঁঠালের বীচি-ভাজা ক'রছে। হাত ধুয়ে গরম গরম খেয়ে নে।"

বিনু তেল-নুন মাখা কাঁঠালের বীচি ও চালভাজার বাটি নিয়ে পৈঠায় পা ছড়িয়ে খেতে বসে। তাহার পদতলে পেমো, তাহাকেও খাইতে দেওয়া হইয়াছে।

রৌদ্রে ঝলমল সকাল বেলাটা বিনুর বড় মিঠে লাগে। তরুপত্রের দুর্ব্বাদলের শিশির এখনও শুখায় নাই। মনে হয় কাহার যেন মুক্তার মালা ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

কয়েক দিন হইল বাহিরের আঙ্গিনায় ধান মাড়াই হইতেছে। ভিতরের আঙ্গিনায় রৌদ্রে শুখাইতে দেওয়া হইতেছে ধামা ধামা ধান। পায়রারা ঝাঁক ধরিয়া নামিয়া পড়িয়াছে ধান খাইতে। গৃহে প্রচুর পাইলে বাহিরে যাইবে কেন খাদ্যানুসন্ধানে।

গোক্ষুরধারের দিন মঙ্গলা বাছুরটা অন্দরে আসা-যাওয়ার পরে তাহার এদিকটা চেনা হইয়াছে। মঙ্গলা পেট ভরিয়া মায়ের দুগ্ধ পান করিয়া রৌদ্রে শয়ন করিয়া অঘোরে ঘুমাইয়া লয়। তাহার পরে লেজ উর্দ্ধে তুলিয়া দৌড়াতে থাকে ভিতরের আঙ্গিনায়। ধানের উপর দিয়া দৌড়াইয়া ধান ছিটাইয়া দেয় চারিদিকে। দাসী বিরক্ত হইলেও মুখে তাহা প্রকাশ করিতে পারে না গৃহিনীর ভয়ে। গৃহিণীর নাতনী যে বাছুরের ছুটাছুটি দেখিতে ভালবাসে, গলা জড়াইয়া ধরিতে ভালবাসে। সারাদিন তাহাদের ছড়ান-ছিটান ধান ঝাড় দিয়া জড় করিতে হয়। বিনুর হৃদয় হইতে সেই অভিমানের ক্ষীণ মেঘরেখা নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। প্রাপ্তির আনন্দে গৌরবে সে হইয়াছে উচ্ছ্বসিত। অদর্শনে যাহারা দূরে সরিয়া গিয়াছিল, অনুক্ষণ দর্শনে তাহারা আবার হৃদয়ের প্রান্তে নিবিড় হইয়া সরিয়া আসিয়াছে।

দুর্গাসুন্দরী ভাবিয়াছিলেন জলযোগের পরেই তাঁহাকে লইয়া বিনু বোধহয় বিদ্যাচর্চ্চায় বসিয়া যাইবে। তাঁহার যে শত অজস্র কাজ, বিনুকে বিমুখ করিবেন কিরূপে? কিন্তু সে-পথে সে গেল না লক্ষ্য করিয়া তিনি আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন।

বিনু পেমোকে সঙ্গী করিয়া চলিল বনবিতানে। মা বাধা দিলেন, "কোথায় চললি? বই-সেলেট নিয়ে একটু-খানি বোস্ গে। ফেলে রাখলে কি কিছু শেখা হয়? কাল অত উৎসাহ দেখলাম, আজ বই ছুঁচ্চিস না কেন?"

বিনু গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, "একটা দিন মাটি করেছি ব'লে রোজ কি মাটি করব মা? আমার কি আর কাজ নেই? এসে অবধি এপর্য্যন্ত বাগানের চারদিকটা ভাল করে দেখাই হয় নি। পেয়ারা বাগানে কাল পেমো দুটো পাকা পেয়ারা দেখেছে উঁচু ডালে আমি এখন পেয়ারা পাড়তে যাচ্ছি। সমস্ত পাকা কলা কে তোমাদের কাটতে বলেছিল? এককাঁদি গাছে রাখলে ত নন্দন পাখীটা চ'লে যেত না?"

"নন্দন পাখী, সে কি?"

পেমো বলে, "হ, বৌমা, আইছিল নন্দন পক্ষী কলা পাকনের কালে। তার এত বড় ন্যাজ, এত বড়

মাথায় ঝুঁটি দুধবরণ।" মা হাসেন। মেয়ে প্রবেশ করে গভীর অরণ্যে।

আহারাদি মিটিয়া গেলে ঠাকুমা নিরালা অবকাশে বিনুকে ধরিলেন, "বাবা তোর জন্মে কত সুন্দর জিনিস পাঠিয়েছে, তুই তার কিছুই ত ভাল করে দেখ্‌লি না? আয়, এখানে একটু থির হয়ে বসে সব দেখ।"

সত্যই বিনু কাপড়-জামা প্রসাধন দ্রব্য ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিবার অবসর পায় নাই। সংস্কৃত শিক্ষার প্রথম উপাদান পাইয়া সে আনন্দে মত্ত হইয়াছিল। সে উদ্দীপনা যেমন জোয়ারের জলের মত সবেগে আসিয়াছিল, তেমনি সবেগে চলিয়া গিয়াছে। সে যে রসের রসিক নহে, তাহার নিকটে রসের ভাণ্ডারের মূল্য কি?

বিনু পিতার অসীম স্নেহের উপহার পাইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে কহিল, "আমার কত জামা-কাপড় পরে রয়েছে আলমারিতে; বাবা ফের এত জামা-কাপড় পাঠিয়েছেন। এত দিয়ে আমি কি করব ঠাকুমা? এই ঢাকাই শাড়ীটা, একটা সেমিজ জামা আমার আকাশিকে দিতে ইচ্ছে করছে। ওর বাবা ত কলকাতায় থাকেন না, বাহারে শাড়ীও দেখেন না; ওর কিছু নেই। চণ্ডালের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে।

"চণ্ডাল কথাটা তুই বুঝি ঠাকুরকন্যার কাছ থেকে শিখেছিস্। কলকাতা থাকলেই বাহারে শাড়ী কেনা যায় না। কিনতে পয়সা লাগে। আকাশির বিয়েতে শাড়ী মিষ্টি ত আমাদের দিতেই হবে। আমি কিনে দেব। তার জন্যে তুই কেন দিতে যাবি তোর ঢাকাই শাড়ী?"

"আমার যে আরও অনেক রয়েছে ঠাকুমা, ওর একটাও নেই। তুমি যদি দাও তা হ'লে ওর দুটো হবে। নেমন্তন্ন বাড়ীতে পড়ে যেতে পারবে।

ঠাকুমা জানিতেন বিনুর প্রকৃতি ছেলেবেলা হইতে তাহার নিজস্ব যাহা তাহা সে একাকী ভোগ করিতে পারে না। নিজের ভোগের জিনিস অপরকে ভাগ না দিলে তাহার শান্তি হয় না। ইহাতে তাঁহারা ভ্রমেও তাহাকে বাধা দেন নাই। বাধা দিলে আত্মসুখ-পরায়ণ লোভসর্ব্বস্ব হইবে বলিয়া।

ঠাকুমা বলেন, "তোর যখন এত ইচ্ছে হয়েছে বিনু তা হ'লে তুই নিজে হাতে করে আকাশিকে দিয়ে আসিস।"

বিনু মাথা দোলায়, "না ঠাকুমা, গিন্নীপনা করে আকাশিকে দিতে আমার লজ্জা করবে। বিয়ের দিন তুমিই তাকে দিয়ে দিও। আমার অনেক হয়েছে ওরও কিছু হোক।"

বিনুর ত্যাগের সংকল্পে ঠাকুমা মনে মনে প্রীত হন। তাঁহাদের মধ্যবিত্ত সংসার ভোগের নয়, ত্যাগের।

তরুর অনেক অনেক দিন একপক্ষ কাল দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া আসিল।

সেদিন প্রভাতে রায়কর্ত্তার নিকট হইতে পত্রবাহক উপস্থিত হইল এবাড়ীর কর্ত্তার কাছে। "আগামী সোমবারে শ্রীমতী বধূমাতাকে আনিতে গাড়ি যাইবে। তাহাকে প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।"

"মাটি নড়ে ত রায়বাড়ীর কথা নড়ে না", সকলেরই মন ভারী হইল বিনুর ত কথাই নাই। কিন্তু বিনুর উপরে আরও কিছু ছিল "মড়ার ওপরে খাঁড়ার ঘা।" বৈকালে প্রসাদের চিঠি আসিল। বিনু সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেছে সে ইহাতে মহা পুলকিত। সে লিখিয়াছে, "যে-কোন ভাষাই হোক না কেন তাহা শিক্ষা করা গৌরবের বিষয়। তোমাদের বাড়ীতে সকলে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। বংশের সম্মান বজায় রাখিবার জন্য বহুদিন পূর্ব্বেই তোমার সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করা উচিত ছিল। যে যাহা হোক এখন যে শিক্ষার প্রতি তোমার মন হইয়াছে ইহাতে আমি আনন্দিত।

মার চিঠিতে জানিলাম আগামী সোমবারে তুমি আমাদের বাড়ীতে যাইতেছ। সেখানে গিয়া ভাল হইয়া থাকিবে। পড়াশোনায় মনোযোগী হইবে। আমার চিঠির জবাব এখান হইতেই দিয়া যাইবে। তুমি সংস্কৃত কেমন শিখিতে শিখিয়াছ তাহা সংস্কৃত অক্ষরে আমাকে লিখিবে।"

বিনুর তাসের ঘর বাতাসে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই যে সংস্কৃত অক্ষর কয়েকটা চিনিয়া বইখানা সে ফেলিয়া রাখিয়াছে আর তাহা খোলার অবকাশ পায় নাই।

মা মেয়ের চুল বাঁধিয়া দিতে আসিয়া দেখিলেন মেয়ে স্বামীর চিঠি লইয়া আধোবদনে বসিয়া রহিয়াছে।

মাকে দেখিয়া চিঠিখানা লুকাইতেও সে ভুলিয়া গিয়াছে। সেকালের স্বামীর চিঠি গুরুজনদের সম্মুখ হইতে গোপনে রাখিতে হইত। এতদিন বিনুও তাহাই রাখিয়াছে আজ প্রথম তার ব্যতিক্রম।

মা ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'একি বিনু, তুই

নিয়ে এমন ভাবে বসে রয়েছিস্ কেন? প্রসাদ ভাল আছে ত?"

"হ্যাঁ, আমাকে সংস্কৃতে পত্রের উত্তর দিতে লিখেছে। মা, তোমরা আমাকে এমন মূর্খ করে রেখেছিলে কেন? এখন আমি কি করি?" বলিতে বলিতে বিনু কান্নায় ভাঙিয়া পড়িয়া মা'র কোলে মুখ লুকাইল।

মা তাহার মস্তকে স্নেহ হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার মনোনেত্রে ভাসিয়া আসিল একটি কচি কোমল সুমিষ্ট মুখচ্ছবি। তাহাকে অকালে হারাইয়া ইহার প্রতি তাঁহারা এতটুকু চাপ দিতে সাহস করেন নাই। যাহা লইয়া ঐ থাকিতে চায় থাকুক। হাত ধরাধরি করিয়া যেমন দুই ভাই-বোন এখানে আসিয়াছিল, অনাদরে উৎপীড়নে আবার যদি হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়া যায়।—এই আতঙ্কে বিনুকে লেখাপড়ার জন্য শাসন করা হয় নাই; তাড়ন করা হয় নাই।

মা নিজেকে সংযত করিয়া শান্ত মুখে বলিলেন এরই জন্যে কান্না, ছিঃ ছিঃ তুই কি বোকা। তোর মতন বয়েসের মেয়ের যা শেখা দরকার তা তুই বেশ শিখেছিস মা। গাঁয়ে মেয়েদের স্কুল নেই, তোর ঠাকুরদা-ঠাকুমাকে খালি বাড়ীতে ফেলে আমি তোর বাবার কাছে সহরে থেকে তোকে লেখাপড়া শেখাতে পারি নি। এখান থেকে যা সম্ভব তা তোর হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি—তুই প্রসাদকে লিখেছিলি 'সংস্কৃত শিখেছি।' তা না হলে সে ত কাঁচা ছেলে নয় যে তোকে সংস্কৃতে পত্রের উত্তর দিতে লিখবে?"

বিনু কথাও বলে না, মুখও তোলে না, তেমনি অঝোরে কাঁদিতে থাকে। সকাল বেলা রায়বাড়ী হইতে তাহার আমন্ত্রণ লিপি আসিবার পর হইতে বিনুর হৃদয়ে ঘনঘোর কালো মেঘরেখার সঞ্চার হইয়াছিল, সেই মেঘ ঝরি-ঝরি করিয়াও এতক্ষণ ঝরিয়া পড়ে নাই। প্রসাদের চিঠি বর্ষণের উপলক্ষ্য মাত্র।

মা কোল হইতে বিনুর মুখ তুলিলেন, অঞ্চলে অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "তুই চুল বেঁধে গা মুছে তারপরে ধীরে-সুস্থে তাকে লিখে দিস, "আমি এখনও চিঠি লেখার মত সংস্কৃত শিখি নাই। শিখিলে লিখিব'।"

মা কত সহজে বিনুর এত বড় সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। বিনুর মেঘম্লান হৃদয়-আকাশে নক্ষত্রের দীপ্তি ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল।

আবার সেই পথ। সেই ছায়া-ঢাকা পাখী-ডাকা মাঠ। সেদিন ছিল রৌদ্রকিরণোজ্জ্বল মধ্যাহ্ন। আজ অপরাহ্ণ।

বিনু ফিরিয়া চলিয়াছে রায়বাড়ীতে। সেই জুড়ান গাড়োয়ান। নবীন ও কামিনীর মা সঙ্গী। সেদিন কত আশা-আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। আজ বিষাদ ও অশ্রুজল।

বিনু পর্দা-ঢাকা গাড়ির ছইয়ের ভিতরে শয়ন করিয়া চোখের জলে ভাসিতেছিল। পথ বা পথের পাশের কোন দৃশ্যাবলী আজ তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছিল না। বাহ্যদৃষ্টির সম্মুখ হইতে তাহার যাহা কিছু শোভাময় সরিয়া গিয়াছে। হৃদয়ের পট-ভূমিকায় জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে কত মনোহর চিত্র, সুমধুর স্মৃতি।

কামিনীর মা বলে, "বৌমা, তুমি মুখ গুঁজে এমনি ধারা পড়ি রইলে ক্যানে? গ্যাশের গাছ-গাছালি, গ্যাশের মাটি চাইয়া দ্যাখ। মধ্যিখানে একটা মাঠ—দুই দিকে দুই গেরাম তার নেগে কেডা এত কাঁদন কাঁদে? নতুন ত যাইচ না, এইলো তোমাগো যাওন লইয়া যাইচে না ক্যানে। কত চ্যাংড়া ম্যায়ারা শ্বশুরঘর করিছে, তোমাগো নাগাল এত অবুঝ আর দেখি না। উঠি মাঠে-ঘাটে তাকাইয়া মনেরে সুস্থির কর। ম্যায়া জনম হইলেও পরের ঘরে যাইতে হয়। তার নেগে এত কাঁদে না কেউ।"

বিনু উঠিয়া বসেও না, কথাও বলে না। ঘরমুখো বলদ ছুটিয়া চলিয়াছে।

সাঁঝের প্রদীপ জ্বলিবার পূর্ব্বেই গাড়ি আসিয়া থামিল সিংহদরজায়। আবার বাড়ীর সকলে আগাইয়া আসিলেন বধূকে নামাইয়া লইতে।

সুমন্ত অধরে হাসির লহর ছুটাইয়া বিনুকে জড়াইয়া ধরিল 'বইদি' বলিয়া।

শ্বশুর-শাশুড়ীদিগকে প্রণাম করিয়া বিনু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল তরুর সহিত। ঠাকুমা ও ছোটঠাকুমা হারাণী পসারীরা প্রাচীর দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদের ভিড়ে সরস্বতী অনুপস্থিত।

ঠাকুমা প্রণত বিনুর গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া কহিলেন, 'আমার শূন্য পুরী আলো করি' এলি মণিবালা? ক'টা দিন তোর চাঁদমুখ না দেখে পরাণ আমার অস্থির করেছে।'

মনোরমা বলেন, "বৌমা, তুমি ঘরে যাও। কাপড় ছেড়ে হাত-পা ধুয়ে জল খেয়ে নাও।"

বিনুর সহিত ঠাকুমা কয়েক হাঁড়ি মিষ্টি দিয়াছেন। সন্দেশ, কাঁচাগোল্লা, পাটালি গুড় আর স্বহস্তে প্রস্তুত পাকা কুমড়ার মোরব্বা, লালমণির দুধের বড় বড় ক্ষীরের নাড়ু।

বিনু নিজের গৃহে প্রবেশ করা মাত্র তরু তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, "ও বৌদি, তুমি ত এখানকার কাণ্ড-কারখানা জান না। আমার ফুলমণি আর নেই, পুড়ে মরেচে।"

বিনু সচমকে জিজ্ঞাসা করে, "ফুলমণি পুড়ে মরেছে কেমন করে? কৈ কামিনীর মা ত কিছু বলেনি?"

"আমিই তাকে বলতে মানা করে দিয়েছিলাম। তুমি শুভক্ষণে যাত্রা করে এখানে আসবে, তখন কি মড়া-টড়ার খবর দিতে হয়। পসারী ঢেঁকি-শালায় সেদিন মুড়ি ভেজে উনুনে ঢাকা না দিয়ে চলে গিয়েছিল। ফুলমণি ইঁদুর ধরতে গিয়ে রাতে উনুনে পড়ে গিয়েছিল, আর উঠতে পারে নি। সকাল বেলা সবাই দেখলে সে আর নেই।" ব'লে তরু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিনুর চোখও শুষ্ক রহিল না। মনে পড়িল তাহাকে নিভৃতে বসিতে দেখিলে ফুলমণি লেজ ফুলাইয়া গরর গরর শব্দ করিয়া কোলে বসিতে উদ্যত হইত। বিনু বিরক্তি ভরে তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিত। সেই ফুলমণি আর কাহারও কোল অধিকার করিতে ফিরিয়া আসিবে না। লেজ ফুলাইয়া ডাকিবে না মিউ মিউ।

এ জগতে মানব হোক জীবজন্তু হোক কাহাকেও অবহেলা করিতে নাই। যাহাদের জীবন ক্ষণভঙ্গুর তাহাদের সকলের সহিত সদয় কোমল ব্যবহার করিতে হয়।

বিনু নিজের চোখ মুছিয়া গভীর স্নেহে তরুর অশ্রুমলিন মুখ মার্জ্জনা করিয়া প্রশ্ন করে, "ফুলমণির না দুটো বাচ্চা ছিল, তারাও কি মরে গেছে?"

তরু সবেগে ঘাড় দোলায়—"ওকি কথা বৌদি, ছিঃ! ষাট্, তারা দুই ভাইবোন বেঁচে রয়েছে। আমাদের কালজি যে কি কাণ্ড করেছে তা ত তুমি জান না,—উনুন থেকে সকাল বেলায় আধপোড়া ফুলমণিকে যখন তোলা হ'ল তখন লালজি-কালজির কি কান্না। আমি পচা পুকুরের পাড়ে তার মাথায় একটা তুলসী গাছ দিয়ে পুঁতে রাখতে বললাম হরিকে। ওদিকে কোদাল হাতে ফুলমণিকে নিয়ে হরি চলে গেল। এদিকে ছানারা ক্ষিধের জ্বালায় চিৎকার করে প্রাণ দেয় আর কি। চুমুক দিয়ে দুধ খেতে ত শেখেনি, করি কি? ঠাকুমা বলেন, 'ধরে ঝিনুকে করে দুধ খাইয়ে দে।'

"যেমন বাচ্চা দুটোকে উঠোনে এনেছি দুধ খাইয়ে দিতে তেমনি কালজি ছুটে এসে তাদের গা চেটে দিতে লাগল। তার পরে শুয়ে পড়ল। বাচ্চারা হাতড়ে হাতড়ে দুধ খেতে সুরু করলে কালজির। সকলে অবাক্ হয়ে দেখতে লাগল বেড়ালের বাচ্চার কুকুরের দুধ খাওয়া। পাড়ার লোক ছুটে এল দেখতে। তারপরে মা কুকুরের ছানা দুটোকে ভেতরে এনে ওদের থাকবার জায়গা করে দিয়েছেন কাঠের ঘরের কোণে। এখন ওরা সবাই সেইখানে থাকে। লালজি পাহারা দেয় বাইরে, কালজি ভেতরে।"

বিনু আশ্চর্য্য হইয়া যায়। "মাগো কি কাণ্ড, শুনিনি কোথায়ও। বেড়াল নাকি কুকুরের দুধ খায়?"

তরু কি যেন বলিতে গিয়া ক্ষিতিকে দেখিয়া থামিয়া গেল। ক্ষিতির সঙ্গে সুমন্ত।

ক্ষিতি বিনুকে হেট হইয়া প্রণাম করিয়া বলে "বৌঠান, অনেক দিন থেকে এলেন বাপের বাড়ী। কেমন ছিলেন?"

বিনু তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট বাঁকায় "অনেক দিন আবার কোথায়? মাত্তর পনেরটা দিন। তুমি ত বাড়ীর পাশ দিয়েই স্কুলে যাওয়া-আসা করেছ, এক-দিনও ত আমার সাথে দেখা করতে যাও নি?"

"যাব কি করে, সঙ্গে যে একগাদা ছেলে থাকত বৌঠান, তাদের নিয়ে কি যাওয়া যায়? তাই যেতে পারি নি। তুমি ত কতদিন বাদে ফিরলে, আমার জন্যে কি এনেছ বৌঠান?"

বিনু সহসা অপ্রতিভ হয়, লজ্জিত হয়। সে ত জানে না এক গাঁ হইতে আর এক গ্রামে গেলে ছোটদের জন্য কিছু আনিতে হয়। ঠাকুমা যে হাঁড়ি হাঁড়ি খাবার দিয়াছেন সকলের জন্যে সেটা উল্লেখ করিতে সে ভুলিয়া গেল।

ইতিপূর্ব্বে বিনু ক্ষিতিকে টাকাটা-সিকিটা দিয়া খুসী রাখিয়াছে। এক্ষেত্রেও সর্ব্বাগ্রে তাহার তাহাই স্মরণ হইল। ঠাকুমা তাহার খরচপত্রের জন্য কয়েকটা টাকা দিয়াছেন। বিনু আঁচলের চাবি দিয়া বাক্স খুলিতেই তাহার চোখে পড়িল মা বাক্স গোছাইয়া দিবার সময় অডিকলোনের বোতলটা ফুলকাটা তোয়ালে দিয়া জড়াইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কায়

অনেক কথা বলব। বলিয়া লবঙ্গ বৃন্দাবনী ছাপানো শাড়ীতে ফুলেল তেলের বোতলটা সযত্নে জড়াইয়া অঞ্চলের নিচে রাখিল।

তরু আড়চোখে সেদিকে চাহিয়া 'আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে' বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

ছোটঠাকুমা শয়ন করিতে আসিলেন।

মেয়েরা শ্বশুরালয়ে প্রস্থানের পরে মনোরমা দুইবোন বধূকে লইয়া আহারে বসিতেন। তরু অনেক রাত জাগিতে পারে না। সন্ধ্যার পরে যাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

পাশাপাশি দুইজনা খাইতে বসিয়া মনোরমা শান্ত-গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "শোন বউমা, তোমাকে একটা কথা ব'লে সাবধান করে দিচ্ছি,—বৌমানুষের অত গিন্নীপনা ভাল নয়। কেউ যদি কোন জিনিস ভাল বলে তখুনি কি তাকে সেটা দিতে হয়? তরু তোমার আপনার জন, তাকে ভালবেসে যদি কিছু দাও তার সঙ্গে পাড়া-পড়শীর সমান হওয়া চলে না। তোমার বাবা সেই মুল্লুক থেকে তোমাকে যা পাঠান তুমি কোন্ সাহসে তা অন্যকে দিতে যাও। এর পরে যাকে যা দিতে চাও আমাকে বলে দিও। তোমার দিদিমা কাশী থেকে তোমাকে অত বড় একটা পিতলের বাক্স এনে দিয়েছিলেন সেটাও তুমি দান-খয়রাৎ করে বসেছিলে; তখন আমি কিছু বলি নি। আর একটা কথা, তোমার কাছে যে ছোটখাটো গয়নাগুলো রয়েছে কালকেই সেগুলো তুমি আমার কাছে এনে রেখ। আমি বুঝতে পেরিছি এর পরে সে-সব পগার পার হবে।"

বিনু অধোবদনে মাছের কাঁটা বাছিতে লাগিল। সে জীবনে কাহাকেও কিছু দিতে গিয়া বাধা পায় নাই। খেয়ালমত নিজস্ব যাহা অপরকে দান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে। তাহার কাছে পাত্রাপাত্রীর বিচার ছিল না। ভাল-মন্দের তারতম্যবোধ ছিল না। কিন্তু আজ শাশুড়ীর উত্তাপহীন কোমল কণ্ঠস্বরে সে লজ্জিত না হইয়া পারিল না। বড়রা শুধু শাসনই করেন না তাঁদের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী।

ক্রমশঃ

—*—

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

ষড়বিংশ অধিবেশন—কলিকাতা, ১৯১১

(এক)

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল উভয় বঙ্গের গবর্ণমেণ্টের দমননীতি। বিপ্লবী দলের কার্য্যতৎপরতা বেড়ে চলল। দেশের সংহতি নষ্ট করার জন্য তদানীন্তন বড় লাট মিণ্টোর প্ররোচনায় ঢাকায় সর্ব্বভারতীয় মুসলিম লীগের সৃষ্টি হ'ল। গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে বড় লাট লর্ড লিটনের মুসলিম লীগের একটি ডেপুটেশন বিধান সভাগুলিতে ও অন্যান্য সংস্থায় মুসলমানদের জন্য পৃথক্ সংরক্ষিত আসনের দাবি উপস্থিত করল। সুপ্রসিদ্ধ মৌলানা মহম্মদ আলি পরবর্ত্তীকালে কংগ্রেসের সভাপতি-রূপে উক্ত ডেপুটেশনকে হুকুমপালন (Command Performance) বলে অভিহিত করেছেন। ডেপুটেশনের ফলে ১৯০৯ সালের আইনে (India Councils Act of 1909) বিধান সভাগুলিতে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের প্রথা প্রবর্ত্তন করে দেশের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিভেদের সৃষ্টি করা হ'ল। এতেও না হয়ে গভর্ণমেণ্ট জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতিতে এই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন করল। এতে দেশব্যাপী ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি হ'ল। ১৯০৯ সালের অধিবেশনে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে।

লর্ড মিণ্টোর পর ১৯১০ সালের নবেম্বর মাসে লর্ড হার্ডিং বড় লাট নিযুক্ত হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। নূতন বড় লাটের নিয়োগে সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নেতারা বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলন নবীন উৎসাহে সুরু করে দিলেন এবং স্থির করলেন যে, ১৯১১ সালের মে মাসে টাউন হলে একটি সভার আয়োজন করে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সংযুক্ত বঙ্গের ক্ষোভ প্রকাশ করা হবে। এই সিদ্ধান্তের অল্পকাল মধ্যে ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতার পথে একজন পুলিস কর্ম্মচারী বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়। এই ঘটনায় বিচলিত হয়ে বড় লাট সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আহ্বান করে বলেন যে, তাঁরা যেন গভর্ণমেণ্টকে আর বিব্রত না করেন। ক্ষোভ প্রকাশ করার উদ্দেশ্য যদি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তা হ'লে সে উদ্দেশ্য ভাল ভাবে সাধিত হবে যদি তাঁরা গভর্ণমেণ্টের নিকট তাঁদের দাবি লিখে জানান। তিনি আশ্বাস দিলেন যে, তাঁদের কথা বিশেষভাবে বিবেচিত হবে। তদনুসারে পরিকল্পিত টাউন হলের সভার আয়োজন পরিত্যক্ত হয় এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট একটি মেমোরিয়াল পাঠান হয়। এরই ফলস্বরূপ ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে দিল্লী দরবারে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণানুসারে উভয় বঙ্গ নিয়ে সপরিষদ গভর্ণরের অধীনে একটি প্রদেশ; বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর নিয়ে সপরিষদ লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের অধীনে "বিহার ও উড়িষ্যা" প্রদেশ, চীফ কমিশনারের অধীনে আসাম প্রদেশ গঠিত হ'ল এবং রাজধানী কলিকাতা হ'তে দিল্লীতে অপসারিত করা হ'ল।

বঙ্গভঙ্গরদের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ামাত্র সমস্ত বাংলা দেশ যেন আনন্দ স্রোতে ভেসে গেল। কলিকাতা শহরে চরমপন্থী ও নরমপন্থী (Extremists and Moderates) যাহারা চলতিভাষায় গরম ও নরম দল নামে কথিত হত) উভয় দলের নেতা বিপিনচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা খোল-করতাল ও অন্যান্য বাদ্যভাণ্ড সহযোগে শহরের রাস্তায় রাস্তায় প্রদক্ষিণ করল। আমিও অন্যান্য ছাত্রসহ পরমানন্দে তাতে যোগ দিলাম। আনন্দের আতিশয্যে আমরা ভুলে গেলাম যে, এর দ্বারা বাঙ্গালী, জাতির এবং সমগ্র ভারতবর্ষের কি অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল। এই ব্যবস্থা দ্বারা বাংলা দেশ একটি চিরস্থায়ী সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগুরু প্রদেশে পরিণত হ'ল। বাংলার সংহতি নষ্ট করার জন্য যে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল পরবর্ত্তীকালে নূতন প্রদেশ গঠনের ফলে শুধু বঙ্গদেশই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হ'ল। স্বাধীনতার যে আন্দোলন বঙ্গভঙ্গ দ্বারা সুরু হয়েছিল

বঙ্গভঙ্গ দ্বারাই সেই স্বাধীনতা অর্জ্জিত হ'ল। ভারতের নেতাদের রাজনীতি ইংরাজের কূটনীতির নিকট পরাজিত হ'ল।

(দুই)

এই রকম পরিস্থিতির সময় ১৯১১ সালে ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের বন্ধের সময় কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। তখন আমি প্রেসিডেন্সী কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, সুতরাং কংগ্রেসে দর্শকরূপে যোগদান করার সুযোগ পেলাম।

এই বৎসরের কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি ইংলণ্ডের শ্রমিক দলের নেতা মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড তাঁর পত্নীর মৃত্যুর জন্য ভারতবর্ষে আসতে অক্ষম হওয়ায় লক্ষ্ণৌয়ের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বিষণনারায়ণ দর কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। আজকের পাঠকেরা ভারতের জাতীয় সম্মিলনের সভাপতি পদে একজন ইংরাজের নির্ব্বাচনের সংবাদে বিস্মিত হবেন সন্দেহ নেই কিন্তু জেনে রাখুন, কংগ্রেসের সৃষ্টি ১৮৮৫ সাল হ'তে ১৯০৬ পর্য্যন্ত, একাদিক্রমে এই বাইশ বৎসর ধরে ভূতপূর্ব্ব রাজকর্ম্মচারী মিঃ এ.ও. হিউম কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং; ১৯১১ সালের পূর্ব্বে মিঃ জর্জ ইউল (কলিকাতার ইংরাজ ব্যবসায়ী), স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবর্ণ (অবসরপ্রাপ্ত ইংরাজ সিভিলিয়ান ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য), মিঃ আলফ্রেড ওয়েব (ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য—আয়রিশ), ও স্যর হেনরী কটন (অবসরপ্রাপ্ত ইংরাজ সিভিলিয়ান) কংগ্রেসের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন। এঁদের মধ্যে স্যর উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ দু'বার সভাপতিত্ব করেছেন।

অধিবেশনের পূর্ব্বদিন ২৫শে ডিসেম্বর সভাপতি শ্রীযুক্ত বিষণনারায়ণ দর যুক্তপ্রদেশের (বর্ত্তমান উত্তর প্রদেশ) অন্যান্য প্রতিনিধিসহ কলিকাতায় পৌছিলেন। যথারীতি তাঁকে হাওড়া ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করে শোভাযাত্রাসহ তাঁর বাসস্থানে নিয়ে যাওয়া হ'ল, ১৯০৬ সালের কংগ্রেসের সভাপতির অভ্যর্থনার সঙ্গে এবারকার অভ্যর্থনার কোন তুলনাই হয় না। শোভাযাত্রা দেখার জন্য মুষ্টিমেয় লোক পথের ধারে ধারে সমবেত হয়েছিল। পরদিন প্রকাশ্য অধিবেশনেও এই পার্থক্য অনুভূত হয়। দর্শকসংখ্যা সামান্য। গ্যালারির বহু অংশ খালি পড়ে ছিল। প্রতিনিধি সংখ্যাও কম। ১৯০৬ সালের কংগ্রেসে প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ১৬৬৩, এবারকার অধিবেশনে মাত্র ৪৪৬ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ায় তখন বাংলা দেশ আনন্দ সাগরে নিমগ্ন, তথাপি কংগ্রেসের অধিবেশন সম্বন্ধে জনমত এত উদাসীন কেন? কারণ ছিল। কংগ্রেস তখন নরমপন্থী ও চরমপন্থী অর্থাৎ নরম ও গরম দলে বিভক্ত। নরমদলের হাতেই তখন কংগ্রেসের কর্তৃত্বভার ছিল। নাগপুর গরমদলের কেন্দ্রস্থল বিধান কংগ্রেস কর্তৃপক্ষগণ ১৯০৭ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনের স্থান নাগপুর থেকে নরমদলের ঘাটি সুরাট শহরে স্থানান্তরিত করেন কিন্তু উভয় দলের সংঘর্ষের ফলে সুরাট কংগ্রেস ভেঙ্গে যায়। কংগ্রেসের ইতিহাসে কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ হওয়ার আর কোন দৃষ্টান্ত নেই। কংগ্রেসের অধিবেশন পণ্ড হওয়ার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ নরম দলের নেতারা মিলিত হয়ে গরম দলকে কংগ্রেস থেকে বের করে দেবার উদ্দেশ্যে এক সভায় মিলিত হয়ে কংগ্রেসের নিয়মাবলীর এক খসড়া প্রস্তুত করেন। পরে এলাহাবাদ কনভেনশনে ঐ নিয়মাবলী পাশ করা হয়। এতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্যর ক্রীড স্থির করা হয়। এই নিয়মানুসারে উপনিবেশসমূহে যে রকম স্বায়ত্ত শাসন প্রচলিত আছে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সেই রকম স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লাভ করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলে স্থির হয় এবং প্রত্যেক প্রতিনিধিকে এই ক্রীড সই করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর ফলে কংগ্রেস থেকে গরম দলের বহিষ্কার এবং নরম দলের একাধিপত্যের পথ প্রশস্ত করা হয়। কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের পূর্ব্বের মত সশ্রদ্ধ অনুরাগ বহুল পরিমাণে হ্রাস-প্রাপ্ত হওয়ার কারণই হ'ল এই—সুতরাং ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ব্বের ন্যায় জন-সমারোহ হয় নি।

এবারকার কংগ্রেসের অধিবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল আপার সারকুলার (বর্ত্তমান আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়) রোডের পার্শ্বে গ্রিয়ার পার্কে (বর্ত্তমান মহিলা উদ্যান)।

(তিন)

যথাসময়ে ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে আমরা কংগ্রেসের প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে দর্শকের জন্য নির্ম্মিত গ্যালারিতে স্থান

গ্রহণ করলাম। মোটেই ভিড় ছিল না। গ্যালারি ও ডেলিগেটদের স্থান অর্দ্ধেকের বেশী ফাঁকা ছিল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতাগণ সমভিব্যাহারে সভাপতি মহাশয় প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করলেন। যথারীতি "বন্দেমাতরম" গীত হওয়ার পর অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হ'ল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এ্যাটর্ণী ও ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কংগ্রেসের সভাপতি ও সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দকে অভ্যর্থনা করে তাঁর অভিভাষণ পাঠ করলেন। তিনি বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য আনন্দ এবং ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত আর এন মুধলকর, শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে মাদ্রাজের নবাব সৈয়দ মামুদ (পরবর্ত্তীকালের কংগ্রেসের সভাপতি) ও শ্রীযুক্ত রামভূজ দত্ত চৌধুরী মহাশয়গণের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বিষণনারায়ণ দর মহাশয় সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হয়ে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করলেন। তিনি দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর সমর্থন করলেন এবং বিধান সভায় সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথার বিশেষ নিন্দা করলেন। সভাপতির অভিভাষণ অন্তে বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতি গঠিত হয়ে সেদিনকার মত সভা স্থগিত হ'ল।

(চার)

পরদিন "বন্দেমাতরম" গানের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হ'ল। প্রথমেই সভাপতি মহাশয় এক প্রস্তাব দ্বারা রাজা ও রাণীর প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করলেন এবং আশা প্রকাশ করলেন যে, তাঁদের ভারত আগমনের ফলে দেশের প্রভূত উপকার হবে। হর্ষধ্বনি দ্বারা প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "থ্রি চিয়ার্স দেয়ার ম্যাজেষ্টিস কিং এণ্ড কুইন—হিপ্ হিপ্ হুররে" আওয়াজ তুললেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পে পড়েছিলাম, "কনগ্রেস সভায় যখন তিনি (গল্পের নায়ক) পদার্পণ করিলেন তখন সকলে মিলিয়া উঠিয়া দাড়াইয়া বিজাতীয় বিলাতী তারস্বরে 'হিপ্ হিপ্ হুররে' শব্দে তাঁহাকে উৎকট অভিবাদন করিল। আমাদের মাতৃভূমির কর্ণমূল লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল।" আজ তা আমার চক্ষুর এবং কর্ণের গোচরীভূত হ'ল।

এর পর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য সম্রাট্ ও গভর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করলেন। শ্রীযুত রায়বাহাদুর আর. এন. মুধলকর, শ্রী সি. পি. রামস্বামী আয়ার (পরবর্ত্তীকালে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, স্যর উপাধিপ্রাপ্ত মাদ্রাজের এ্যাডভোকেট জেনারেল, বড় লাটের আইন সদস্য ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মন্ত্রী হন। বর্ত্তমানে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য) শ্রীযুক্ত মুরলীধর রায়, শ্রীযুক্ত দিনশা হদগজী ওয়াচা (ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসের সভাপতি ও পরবর্ত্তীকালে স্যর উপাধি ভূষিত) শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ মজুমদার, (পরবর্ত্তীকালে কংগ্রেসের সভাপতি) মিঃ মহম্মদ আলি (পরবর্ত্তীকালে মৌলানা ও কংগ্রেসের সভাপতি), ও শ্রীযুক্ত রামভূজ দত্ত চৌধুরী (শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর স্বামী) মহাশয়গণ উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করলেন। প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

এই প্রস্তাবের পর বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ ও নেতা তেজ বাহাদুর সাপ্রু মহাশয় (পরবর্ত্তীকালে স্যর উপাধিভূষিত ও বড় লাট সভার সদস্য)। প্রস্তাব সমর্থন করলেন বিহারের প্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর লাল মহাশয়। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই প্রস্তাবে সীমা নির্দ্ধারণের সময় সমগ্র বাংলাভাষী জেলা সমূহকে এক শাসনাধীনে রাখার প্রার্থনা ছিল। বিহারের প্রতিনিধি স্বরূপ তৎকালীন কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি পরলোকগত বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল সম্বন্ধে বিহারীদের বর্ত্তমান মনোভাব তৎকালে অজ্ঞাত ছিল।

দমননীতিমূলক আইনগুলির (Seditions Meetings Act, Press Act and the deportation without trial Regulations) প্রত্যাহার সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়। যথারীতি সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব পাশ হ'ল।

স্বদেশী সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করলেন উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ নেতা উকীল শ্রীযুক্ত অনারেবল মধুসূদন দাস মহাশয় (কলিকাতায় সাধারণ উড়িয়া সমাজের নিকট তিনি "মধু বালিষ্টর" নামে পরিচিত ছিলেন)। প্রস্তাবটি সমর্থিত ও গৃহীত হ'ল।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের যে কথা আমার স্মরণপথে বিরাজ করছে, গভর্ণমেণ্টের অর্থনীতি (finance) সম্বন্ধে সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ ও অর্থনীতিজ্ঞ শ্রীযুক্ত ওয়াচা মহাশয়ের বক্তৃতা। এ সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করে তিনি বিষয়টিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে জানালেন যে, প্রত্যেক ভাগের উপর তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলতে পারেন কিন্তু সময় অল্প সেজন্য তিনি বিশদভাবে বলতে পারবেন না। তিনি

গভর্ণমেণ্টের অর্থনীতি সমালোচনা করে অনর্গল তথ্যসমূহ কংগ্রেসের সামনে প্রকাশ করলেন। এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন বিনা বাক্যব্যয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (পরবর্ত্তীকালে ডাক্তার উপাধিভূষিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকনমিকসের মিণ্টো প্রফেসর)। এই প্রস্তাব এবং আরও কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় সেদিনকার মত কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হ'ল।

(পাঁচ)

তৃতীয় দিনের কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গীত হ'ল। সভা আরম্ভের পর জানা গেল যে, মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল এবং মাদ্রাজের অন্যতম নেতা মাননীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়ার অকস্মাৎ পরলোক গমন করেছেন। কংগ্রেস তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করল।

মহামতি গোখ্‌লে কর্ত্তৃক উত্থাপিত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা বিলের সমর্থনে প্রস্তাব উপস্থিত করলেন—মাদ্রাজের শিক্ষানুরাগী মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর এল. এ. গোবিন্দরাঘব আয়ার। এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন নাগপুরের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার হরি সিং গৌর (পরবর্ত্তীকালে স্যর উপাধিভূষিত), এলাহাবাদ হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ডঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অসাধারণ বাগ্মী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ। স্বয়ং গোখ্‌লে মহাশয়ও এই প্রস্তাব সমর্থন করে অতি সুন্দর অভিভাষণ দিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

এর পর ১৯০৯ সালের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা আইনানুসারে (The India Councils Act of 1909) গঠিত নিয়মাবলীতে বিধান পরিষদসমূহে যে সাম্প্রদায়িক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বেসরকারী সংখ্যাগুরু সদস্য সংখ্যাকে প্রকৃতপক্ষে অকর্ম্মণ্য করা হয়েছে, সেগুলির পরিবর্ত্তনের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় (পরবর্ত্তীকালে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ও স্যর উপাধিভূষিত) তিনি প্রস্তাব সম্বন্ধে তথ্য বহুল ও সুচিন্তিত বক্তৃতা দিলেন। যথারীতি সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব মঞ্জুর হল।

স্থানীয় সংস্থাগুলিতে (Local Bodies) পৃথক্ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন লক্ষ্ণৌ চীফ কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোকরণ নাথ মিশ্র মহাশয় (পরবর্ত্তীকালে লক্ষ্ণৌ চীফ কোর্টের জজ)। যথারীতি সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

তৎপরে কতকগুলি মামুলি প্রস্তাব পাশ করার পর কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয় (পরবর্ত্তীকালে "রাউলেট মিত্র" নামে কুখ্যাত, স্যর উপাধিভূষিত ও বাংলা গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী) ভারতীয় হাইকোর্টগুলি সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করে বললেন যে, কলিকাতা হাইকোর্টের মত ভারতের অন্যান্য হাইকোর্টগুলির সম্পর্কও একমাত্র ভারত গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে থাকা উচিত। এ না হ'লে হাইকোর্টের স্বাধীনতা ও সম্ভ্রম ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। স্বাধীন ভারতেও এই বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রস্তাব পাশ হ'ল।

অন্যান্য প্রস্তাবের পর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় (কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার, 'কলিকাতা উইকলি নোট্‌স্‌'-এর সম্পাদক, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের ভ্রাতা এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা) দক্ষিণ আফ্রিকার সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। এই প্রস্তাবে দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের সহিত আপোষের ফলে এশিয়া-বিরোধী আইন প্রত্যাহারের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তজ্জন্য শ্রীযুক্ত এম. কে. গান্ধী মহাশয়কে (তখন 'মহাত্মা' নামে পরিচিত হন নি) ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী হিন্দু-মুসলমান, জরথুষ্ট্রিয়ান (পার্শী) ও খ্রীষ্টান নির্ব্বিশেষে সমুদয় ভারতীয়গণকে তাঁদের ত্যাগ ও দুঃখবরণের জন্য অভিনন্দিত করা হয়। এই প্রস্তাব সমর্থন করেন বিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সি. ওয়াই. চিন্তামণি (পরবর্ত্তীকালে যুক্তপ্রদেশ, অধুনা উত্তর প্রদেশ গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী), দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীনে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত সোরাবজী সাপুরজী (ইনি ৮ বার কারাবরণ করেন) এবং গান্ধীজীর সহকর্ম্মী ও ভক্ত সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ইহুদি-নেতা শ্রীযুক্ত এইচ. এস্. এল. পোলক মহাশয়গণ। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আগামী বৎসরের অধিবেশনের জন্য পাটনাতে কংগ্রেস আহ্বান করেন কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও বিহারের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত হাসান ইমাম (পরবর্ত্তী কালে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ এবং কংগ্রেসের সভাপতি)

পরিশেষে শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

বাংলা ও বাঙালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'কনট্রোল-কিং' শ্রীপ্রফুল্ল সেনের 'কিং-কনট্রোল' :

প্রভুদের কথা এবং প্রতিশ্রুতিতে যদি মানুষের পেট ভরে তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার আজ আর দুঃখ-অভাবের কোন কারণ থাকিতে পারে না! —এ সোনার দেশে এখন আর কিসের অভাব? চাউল, আটা, ময়দা, সরিষার তৈল, মুগ-মুসুরী ডাইল, চিনি, দুধ, তরিতরকারিতে দেশ পূর্ণ—অর্থাৎ অবিলম্বে সবই মিলিবে, তাহারই বিষম প্রতিশ্রুতিতে পূর্ণ! মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার সুকণ্ঠে বেতার ভাষণে বলেন—"বন্ধুগণ! এবার ধানের ফসল আশাতীত রকম হইয়াছে" এবং অদূরে সেই সুদিনের আলো দেখা যাইতেছে যখন পশ্চিম বাংলার মানুষ বেদম আহার এবং নাকে খাঁটি সরিষার তৈল-প্রদান করিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে খাটিয়ায় নিদ্রা যাইবে! কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রকার ভরসার কথার সঙ্গে খাদ্য-শস্যের পরিসংখ্যান—ইতিপূর্ব্বে যতবার (এবং বহু-বহুবার) আমরা শুনিয়াছি—প্রায় প্রত্যেক বারই বাস্তবে ফলিয়াছে তাহার বিপরীত! এবারেও যে তাহাই ঘটিবে না, এমন কথা সরকারী মহলে মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয়জনেরাও জোর করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের সত্য-সহযোগিতা পাওয়া গেলে হয়ত এতটা ভাবনার কথা কাহারও মনে হইত না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উপর কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের একটা পরম বিরূপ-স্নেহের টান যে আছে এবং আমাদের বিপদ-কালে সেই স্নেহ যে সবিশেষ সক্রিয় হইয়া উঠে, তাহাও এ পোড়া-বঙ্গবাসীদের জানা আছে।

কর্ত্তাদের একটা কথা মনে করাইবার একান্ত প্রয়োজন, এবং তাহা এই যে:

"খাদ্যের অভাব একমাত্র খাদ্য দিয়াই মেটানো সম্ভব এবং ক্ষুধা কোন উপদেশও মানে না, কোন আইনও গ্রাহ্য করে না, ইহা অতি পুরাণো কথা। অথচ এই কথাটা আজ গোটা ভারতেই মর্ম্মান্তিক-ভাবে উপেক্ষিত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে আমরা চাউল, ডাইল, আটা, চিনি, তৈল, মাছ ইত্যাদির নিয়মিত অভাবে ও দফায় দফায় মূল্যবৃদ্ধিতে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছি।...দেশজোড়া ব্যাপক বেকারী ও স্বল্প আয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বিপরীত হারে নিত্যব্যবহার্য্য খাদ্য-সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি সারা দেশেই একটা আশঙ্কিত দুর্নিমিত্তের ছায়াপাত করিয়াছে। তাহারই আংশিক চেহারা প্রকট হইয়াছে কেরলে এবং এখানে প্রকাশটা ক্রুদ্ধ ও উত্তেজনাপূর্ণ, সেই কারণেই আরও উদ্বেগ-জনক।

"...দেশের মানুষ আজ প্রশাসনের সঙ্গে কোন কল্যাণের যোগ লক্ষ্য করিতেছেন না। বরং সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও অনটন সম্পর্কে একটা ঔদাসীন্য বা উপেক্ষার ভাবই যেন আমাদের সরকারী কর্ম্মপদ্ধতির মধ্য দিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। আসল দুঃখ-দুর্দ্দশার চেয়ে ক্রমবর্দ্ধমান এই মানসিক অবসাদ ও হতাশাই হইয়াছে বেশী বিপজ্জনক, কারণ ইহার ফলে ব্যাপক একটা স্নায়বিক অসহিষ্ণুতা সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দেশ উন্নয়নের অধ্যায়ে দেশবাসীকে (পৃথিবীর সর্ব্বত্রই) কিছু ক্লেশ ও কৃচ্ছ্রতা হয়ত সহ্য করিতে হয়। কিন্তু কষ্টটা যদি উপরতলা-নীচুতলায় সমভাবে বন্টিত হয়, তাহা হইলে তাহাই সমাজে একটা ভারসাম্য আনে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এদেশে আঘাতটা শুধু নীচুতলার উপরই পড়িতেছে।

"এই কারণেই নিম্নতলায় প্রতিক্রিয়াজনিত বিষম চাঞ্চল্য দেখা দিতেছে, যা প্রশমিত করা দরকার। বলা বাহুল্য সে জন্য জীবনধারণের সর্ব্বনিম্ন প্রয়োজন যাহা, তাহা সাধারণের ক্রয়-সামর্থ্যের মধ্যে আনিতে হইবে। লাঠি দেখাইয়া নয়, শান্তির গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিয়াও নয়, খাদ্য দিয়াই ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে হইবে। এই সনাতন ও সুবিদিত পথ ছাড়া অন্য পথ নাই। গোটা ভারতের পক্ষেই একথা সমান প্রযোজ্য। সমাজ জীবন যদি

খাদ্যাভাবজনিত হৈ-হুল্লোড় ও অশান্তিতে আলোড়িত হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া শাসকদের পক্ষে শুভ হইবে না।"

আমাদের বিচক্ষণ এবং পরম পরিসংখ্যানবিদ্ মুখ্যমন্ত্রী কন্‌ট্রোল দ্বারাই এবার এ-রাজ্যের খাদ্য এবং অন্যান্য সমস্যা দূর করিতে বিষম প্রয়াস করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। একথা স্বীকার করিব যে, ভাণ্ডার যদি পূর্ণ থাকে এবং র‍্যাশন যদি যথাযথ এবং পর্য্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে কন্‌ট্রোল সার্থক হইতে পারে—কিন্তু ভাঁড়ারে কয়েক শত মণ চাউল, ডাইল,আটা-ময়দা, চিনি মাত্র সম্বল এবং হাতে ভিক্ষার থলি লইয়া কেন্দ্রের মুখ চাহিয়া কত দিন এবং কি ভাবে রেশন ব্যবস্থা চলিতে পারে জানি না।

কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে র‍্যাশন-ব্যবস্থাকে টর্পেডো করিবার জন্য ইতিমধ্যে একদল অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী খাস কলিকাতা শহরের বুকে বসিয়াই তাহাদের পাপ-পরিকল্পনা প্রায় পাকা করিয়াছে। এই ব্যবসায়ী-চক্রের বৈঠক গোপনে হইলেও তাহার কিছু সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য কলিকাতার পুলিস এ-সংবাদ কর্ত্তামহলে দিয়াছেন, কিন্তু কর্ত্তামহল এ-বিষয়ে কি চিন্তা করিতেছেন—তাহা প্রকাশ পায় নাই। তবে এই-টুকু মাত্র বলা যায় যে, বিশেষ ব্যক্তি এবং সবিশেষ মহলে এই শক্তিশালী ব্যবসায়ীদের প্রতি শাসকদের মনোভাব ক্রমশ কোমল হইতে কোমলতর হইতেছে। শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইবে যে, যে ব্যবসায়ী-চক্র পশ্চিম-বঙ্গের বাঙ্গালীদের জীবন সর্ব্বদিক হইতে বিপর্য্যস্ত করিতেছে, সেই তাহারাই শাসক-মহলে 'মিত্রশক্তি' বলিয়া গৃহীত হইবে।

'নাই-রাজ্য' পশ্চিমবঙ্গ—বাঙ্গালী কি অবলুপ্তির পথে?

ঘরে "চাল নেই, ডাল নেই, তেল নেই। যা আছে তাও সাধ্যের বাইরে। এদিকে বাড়ী নেই, চাকরি নেই—স্কুলে-কলেজে ঠাঁই নেই—এমন কি অপেক্ষাকৃত সামনের সারিতে বসে খেলা অপেরা দেখার মত নির্দ্দোষ আমোদগুলোও যেন আজ ক্রমেই মধ্য-বিত্তের হাতছাড়া। দারিদ্র্য মধ্যবিত্তের জীবনে অজ্ঞাত নয়। প্রায় দেড়শ বছর আগে মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—মধ্যবিত্ত তাঁরাই, যাঁরা 'দরিদ্র অথচ ভদ্র'। বস্তুত প্রধানত এই 'ভদ্র' শব্দটি বলেই মধ্যবিত্ত, অন্যান্য খেটে-খাওয়া মানুষের থেকে স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত। উল্লেখিত সমীক্ষাটিতেও দেখা গেল—মধ্যবিত্ত তার ইতিহাসে এই অকালেও খরচের ভঙ্গিতে সম আয়বিশিষ্ট অন্য-দের থেকে স্বতন্ত্র। এখনও সে ভাল বাসা, ভাল পোষাক, ভাল শিক্ষা, ভাল চিকিৎসার জন্যে যত খরচ করে, তার সুরে আর কেউ তার কাছাকাছি আসে না। এখনও ঘরে ডাল-ভাত খেয়ে মধ্যবিত্ত কর্ম্মক্ষম ছেলেকে কলেজে পাঠায়, এখনও সে কমপক্ষে একটা খবরের কাগজ রাখে, গৃহশিক্ষক রেখে মেয়েকে গান শেখাতে চায়।

"কিন্তু এই বেপরোয়া জীবনযুদ্ধ আর কতকাল সম্ভব? ধরে-রাখা লক্ষ্মীর ঝাঁপি বহুকাল আগেই শূন্য হয়ে গেছে, আপিসের কো-অপারেটিভ ইত্যাদিও সারা। ক্লান্তির লক্ষণ আজ মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে; ক্ষয় এবং স্খলন কোনটাই আজ আর সেখানে গোপন নয়। খাদ্যের বাজেট ক্রমেই ছাঁটাই হচ্ছে, বড়দের দুধ খাওয়া অনেক-দিন উঠে গেছে, বেবী ফুডের বিকল্প হিসাবে ঠাকুমা কি খাওয়াতেন তাই আবার চালু করার চেষ্টা চলছে; এমন কি সিগারেট পর্য্যন্ত ব্লেডে কেটে একাধিকবার খেতে বারণ নেই! শুধু কি তাই? দুই পরিবার আজ একটি খবরের কাগজে কাজ চালাচ্ছে, পারি-বারিক ডাক্তারকে 'কল' না দিয়ে মধ্যবিত্ত হাসপাতালের বেঞ্চিতে আশ্রয় নিচ্ছে: এবং রাত ন'টায় আলো নিভিয়ে দিলে কত পারসেণ্ট 'কারেণ্ট খরচ' কমে বসে বসে পরিবার-পরিজনকে তাই বোঝাচ্ছে। তার চেয়েও মারাত্মক খবর, আত্মীয়বাড়ী, গতায়ত ত বছরে এক-বার কি দু'বার, কাউকে চা-খেতে বলার আগে আজ তিনবার থতমত খায়, নতুন বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখলে তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে পালাতে চায়; অধিকাংশ বই-ই তার কাছে অপাঠ্য, সিনেমা 'বাজে', রেষ্টুরেণ্ট বিলাসিতা এবং অনেক আমোদই—'ভালগার'।"

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা গত কিছুদিনের মধ্যে আরও খারাপের দিকে গিয়াছে। সিনেমার কিউ এবং ক্রিকেট-ফুটবল মাঠের ভিড় দেখিয়া কেহ যদি অদ্যকার বাঙ্গালী সমাজের অবস্থা-বিচারে প্রয়াস পান, তিনি প্রতারিত হইবেন। জীবনের অন্য সকল দিকে ব্যর্থ হইয়া বেকার বাঙ্গালী যুবক এবং বালকের দল সিনেমা-থিয়েটার, ক্রিকেট-ফুটবলকেই মৃত-সঞ্জীবনী

রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ইহারাই বা শতকরা কতজন?

একদিকে দেখিতেছি শহরে আট-দশ হইতে তের-চৌদ্দ-পনের-বিশতলা আকাশভেদী বিরাট্ বিরাট্ ম্যান্‌সন্ নির্ম্মিত হইতেছে (অবশ্য এই সব ম্যান্‌সনের মালিক কিংবা মালিকগোষ্ঠীর শতকরা ৯৯.৯ জন অন্য প্রদেশাগত) এবং সেই তালে জাতি হিসাবে বাঙ্গালী দ্রুতগতিতে পাতাল প্রবেশ করিতেছে! তের-চৌদ্দ-তলা বাড়ীগুলি হতভাগ্য বাঙ্গালীদের অবশ্যই কাজে লাগে এবং সেই অন্তিম কাজে—ঐ সব বাড়ীর ছাদ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া জীবন-সমস্যার পরম সমাধান! হিসাব লইলে দেখা যাইবে, এই ভাবে বহু হতভাগ্য বাঙ্গালী যুবকের স্বর্গ, (পাতাল?) লাভ ঘটিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও অধিক পরিমাণে ঘটিতে থাকিবে!

"ওরা জন্মেছে এই দেশে"—

'ওরা' অর্থাৎ এই পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা। এদেরই সম্পর্কে দেশের নেতা এবং কর্ত্তারা বহুবিধ বাণী দিয়া থাকেন অহরহ। অদ্যকার ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতে কি করিয়া, কোন্ পথে জীবনে উন্নতি করিবে, দেশের মাথা উঁচু করিবে—এই বিষয়েও তাঁহারা মূল্যবান্ নির্দ্দেশ দিতেও কসুর করেন না। বলা বাহুল্য আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়েদের কথাই বলিতেছি।

এ-রাজ্যের মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের আজ প্রধান কাজ হইয়াছে, র‍্যাশনের দোকানে লাইন দেওয়া—প্রত্যহ প্রায় ৫ হইতে ৭।৮ ঘণ্টা ধরিয়া। এ-বিষয়ে এক ভদ্র-মহিলা লিখিতেছেন:

"রেশনের দোকানে লাইন দিতে হবে, কে যাবে (?) না বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরা। তেলের দোকানে বলুন, ডালের দোকানে বলুন অর্থাৎ যেখানে লাইনের প্রশ্ন, সেখানেই বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ডাক। বাড়ীর কর্ত্তা অফিসে যাবেন তাঁর সময় নেই, আমরা বধূরা দোকানে লাইন দেব এমন সমাজ আমাদের নয়। বাড়ীতে ঝি নাই, চাকর নাই—আছে কেবল বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা। কাজেই রাত পোয়াতে-না-পোয়াতে কার্ড হাতে থলে দিয়ে ওদের দোকানে পাঠান ব্যতীত উপায় নেই। তা না হ'লে খাওয়া জুটবে না—উনুনে হাঁড়ি উঠবে না।

"নেতাবাবুরা সগর্ব্বে বলতে পারেন, হতভাগ্য জাতটাকে স্বাবলম্বী, কষ্টসহিষ্ণু করার পক্ষে এটা একটা আদর্শ পথ। তা ঠিক আদর্শই বটে। বাবুদের খেলার মাঠে, রেলে, থিয়েটার-সিনেমায় যাতে লাইন দিতে না হয় তার জন্য কত ব্যবস্থা। ভবিষ্যৎ জাতি রেশনে বাজারে লাইন দিয়ে স্বাবলম্বী কষ্টসহিষ্ণু হচ্ছে না জাহান্নামে যাচ্ছে এই জিজ্ঞাসা নিয়ে নীচের কাহিনী অবতারণা করছি।

"রেশনের লাইনে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমদানী হচ্ছে অশ্লীল-অশ্রাব্য কথাবার্ত্তা। ভালটা মানুষ যত তাড়াতাড়ি না শেখে খারাপটা শেখে তত তাড়াতাড়ি। রেশন লাইনে গীতা-রামায়ণের কথকঠাকুর থাকেন না—যারা থাকে তাদের কুকথার ভিতর দিয়ে ছোটদের মনে কুচিন্তা প্রভাব বিস্তার করছে। বিদ্যা অর্থাৎ লেখাপড়ার পাট প্রায় উঠে গেছে, আর এক বিদ্যে তাদের হচ্ছে। কি করে পরে গিয়ে আগে দাঁড়াবে, কি করে ব্ল্যাক মার্কেট করা যায়, কি করে দোকানীকে পয়সা কম দেওয়া যায়, ইত্যাদি সাত-সতের বিদ্যের জাহাজ তাদের মাথায় দানা বেঁধে উঠছে। কষ্টসহিষ্ণুতার চরমের ওপর চরম তারা করছে। পশুদের ক্লেশ নিবারণের সঙ্ঘ আছে—তারা যদি আমাদের বাচ্চাদের রেশন নেবার ক্লেশ দেখতেন ত মানুষ পশুর ক্লেশের তফাৎ করতে পারতেন না। সেই কোন্ ভোরে রেশন দোকানে লাইন দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদ-বৃষ্টির মধ্যে পড়ে থাকা এবং ফাউ স্বরূপ ধাক্কাধাক্কি বচসা তাদের বরাদ্দে আছে। সর্ব্বশেষে বিজয়-গর্ব্বে রেশনের বোঝা নিয়ে বাড়ী ফেরে—সে দৃশ্য লিখে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই। বোঝা টানতে তাদের মেহনত কি করে বোঝাব ভেবে পাইনে। এত কষ্টের সান্ত্বনা তবুও থাকত যদি ওদের পেটে পরিপূর্ণ খোরাক দেওয়া যেত। পুষ্টিকর খাদ্য কেবল ওদের স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের বইতে লেখা আছে—চোখে দেখল না কেমন সে খাদ্য। নেতাবাবুদের লেকচারবাজির অভ্যাস যদি না থাকত তবে হলফ করে বলতে পারি রেশনের দোকানে কচি কচি ছেলেমেয়েদের পাঠাবার বিরুদ্ধে অর্ডিনান্স জারি করে দিতেন। অবশ্য 'ওরা' অর্থাৎ আমাদের পেটের সন্তানেরা জন্মেছে এই দেশে।"

—বারাসতের কথা।

ইহার উপর মন্তব্য করার কোন অবকাশ নাই।

"পঞ্চায়েতী"—বিলাস

"যারা চাষ করে খায় তাদের সবাইকে সংসার

চলার উপযোগী ভূমি দিতে হবে এই ছিল গান্ধীজীর একান্ত ইচ্ছা। ভূমি পুনর্বণ্টনের কাজে কবে নাগাদ হাত দেওয়া হবে, কি ভাবে জমি বিলি-ব্যবস্থা করা হবে, কতদিনের মধ্যে এ-কাজ শেষ করা হবে—এ-ধরণের কোন কথার উল্লেখ পঞ্চায়েতী রাজ উদ্বোধনের সভায় শুনি নি। অথচ আমরা সকলেই জানি উৎপাদন প্যাটার্ণ ও উৎপাদন পরিবেশের ওপরে উৎপাদনের পরিমাণ বহুলাংশে নির্ভর করে। যে-কোন একটা দিকে খানিকটা পরিবর্তন সাধন করলেই উৎপাদন বৃদ্ধি বজায় রাখা যায় না; উভয় দিকেই সমান দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। উন্নত বীজ, রাসায়নিক ও কম্পোষ্ট সার এবং রোগ ও কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করে যতটুকু উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব তা দিয়ে ক্রমবর্দ্ধমান অন্নের চাহিদা কিছুতেই মিটবে না। ভূমির পুনর্বণ্টন ও চকবন্দী করণের কাজে এখনই হাত দেওয়া উচিত; জমি হস্তান্তরের অবাধ অধিকার খর্ব্ব করা একান্ত প্রয়োজন, বিভিন্ন অঞ্চল অনুযায়ী নানা ধরণের বাস্তবানুগ ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনাকে বিশেষ ভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এই ধরণের কাজ গ্রহণ না করলে উৎপাদন বৃদ্ধির উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হবে না। কে না বোঝে—সুন্দর ও অনুকূল পরিবেশ মানুষের কাজের উদ্যম বাড়িয়ে দেয়, আর প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ কর্ম্মবিমুখ হয়ে পড়ে।

"সচ্ছল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গড়ে তোলা ছিল গান্ধীজীর লক্ষ্য—যেখানে আহার, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য মানুষ পরনির্ভরশীল হবে না, যেখানে কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিকে বেকার ও অর্দ্ধবেকারের মত জীবন যাপন করতে হবে না। পঞ্চায়েতী রাজের উদ্বোধনী সভায় এ-আদর্শের অনুকূলে কোন কথা শুনি নি।

"খাঁটি জিনিস সংগ্রহ করা যখন অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, অসদাচার যে সময় অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে, সরকারী বিভাগগুলি যখন প্রাণহীনতার চরম পরিচয় দিচ্ছে এবং রাষ্ট্র-পরিচালকদের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা যখন দ্রুত নিম্নগামী হ'তে চলেছে তখন পঞ্চায়েতী রাজের এই রাজ্যজোড়া আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং চা-পানের জন্য ২০ হাজারেরও অধিক অর্থ ব্যয়ের কি সার্থকতা ছিল তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। বিশেষতঃ গান্ধীজীর জন্মদিনে—যিনি স্বাধীনতা দিবসে খণ্ডিত স্বরাজ-প্রাপ্তিতে মনোবেদনায় সারাদিন অনশন ক'রে ছিলেন; যিনি জনসাধারণের অর্থ অত্যন্ত হিসেব করে ব্যয় করতেন এবং যিনি সঙ্কল্পের দিনকে প্রার্থনার দিন হিসেবে গণ্য করতে বলতেন।"

"ঈশ্বর রাষ্ট্রনায়কদের শুভবুদ্ধি দিন !!"—

('অভ্যুদয়' পত্রিকায় প্রকাশিত—"পঞ্চায়েতী রাজ ও গান্ধীজয়ন্তী—প্রবন্ধ হইতে।)

ঈশ্বর রাষ্ট্রনায়কদের শুভবুদ্ধি দিন !!—

—'আমেন'—

কোন অপরাধে ?

খুলনার জগদীশ মল্লিক নামে এক হতভাগ্য উদ্বাস্তু স্রোতের জলে খড়কুটার মত ভাসিয়া সুদূর দক্ষিণ ভারতে কোয়েম্বাটুর শহরের উপকণ্ঠে এক শিবিরে ঠাঁই লইয়াছিলেন। সম্ভবত গত জানুয়ারীতে আয়ুব খাঁ-র মশালচিরা ইঁহার ঘর জ্বালাইয়াছিল। সন্ত্রস্ত পরিজনের হাত ধরিয়া আরও অসংখ্য ভাগ্যহত নরনারীর সঙ্গে উদ্বাস্তু জগদীশ মল্লিক চলিয়া আসিয়াছিলেন সীমান্তের এপারে, পশ্চিম বাঙ্গলায়। বৎসর ঘুরিল না। ২৭ই ডিসেম্বর মাদ্রাজ পুলিসের গুলীতে জগদীশ মল্লিক নিহত হইয়াছেন। ইহাই পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের নিদারুণ বিধিলিপি। একটা প্রবচন মনে পড়িতেছে—"রামে মারিলেও মরিব, রাবণে মারিলেও মরিব"। নিহত জগদীশ মল্লিকের ভাগ্যে ইহা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে। কে জানিত, রাবণের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া প্রজারঞ্জক রামচন্দ্রের নিযুক্ত পুলিসের হাতে এই বিড়ম্বিত মানুষটির মৃত্যু ঘটিবে? জগদীশ মল্লিক ইহা জানিতেন না, জানিলে, পিতৃপুরুষের ভিটা আঁকড়াইয়া মৃত্যুবরণ করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয় ছিল।

"মহাবীর ত্যাগী সরকারী নোট সম্বল করিয়া লোকসভায় এই হত্যাকাণ্ডের একটা বিবরণ দাখিল করিয়াছেন। ত্যাগীজী মন্ত্রীপদে না থাকিলে তিনি নিজেও এই বিবরণকে একতরফা ও হৃদয়হীন বলিতেন। পুলিস কনেষ্টবলের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের বচসাকে কেন্দ্র করিয়া এই বিপত্তির উদ্ভব। বচসা হওয়া অসম্ভব নয়, উদ্বাস্তুরা ক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ইহাও না হয় স্বীকার করিয়া লওয়া গেল। কিন্তু ত্যাগীজী ইহা বলুন, এর জন্য গুলী চালনার মত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল কি না? আরও প্রশ্ন আছে, পুলিসের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের বচসার কারণ কি? অধ্যাপক হেম বড়ুয়া বলিয়াছেন, পুলিস কনেষ্টবলটি নাকি একটি উদ্বাস্তু নারীর সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করিয়াছিল। ত্যাগীজী এই প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া গিয়াছেন। বিবরটি তদন্তাধীন। তদন্তে সব তথ্য বাহির হইবে কি না জানি না।

তবে লোকসভায় উত্থাপিত এই অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের নিকট হইতে আমরা স্পষ্ট উত্তর দাবি করিব। কারণ, কোয়েম্বাটুরের ঘটনা শুধুমাত্র একটি নিঃস্ব মানুষের প্রাণহানির ঘটনা নয়, ইহার সঙ্গে ভারত সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন নীতির প্রশ্ন জড়িত আছে।

"পশ্চিমবঙ্গে স্থানাভাব বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই উদ্বাস্তুদের সব গিয়াছে। উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব সারা ভারতের। এই নীতি ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এবং অন্যান্য রাজ্যও ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। মাদ্রাজ সরকার আগ্রহের সঙ্গেই এই উদ্বাস্তুদের গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা উদ্বাস্তুদের সাহায্যও করিতে চান। কিন্তু সরকারী নীতির উদ্দেশ্য শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিসের হাতে কি এইভাবে নষ্ট হইবে? অতীত ইহাদের দুঃস্বপ্ন, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মানুষ যত দরিদ্রই হোক, নিজের ঘরবাড়ী ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে তার একটা সাযুজ্য ও সহমর্ম্মিতা থাকে। তখনই সে হইয়া উঠে সামাজিক মানুষ। দেশছাড়া, সর্ব্বস্বহারা এবং অপরিচিত পরিবেশে নিক্ষিপ্ত এই মানুষগুলির মনে ক্রোধ ও ক্ষোভ এমনিতেই পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, পুলিসী ইতরতা ইহাতে আগুনের ইন্ধন দিয়াছিল। এবং অনুমান করা শক্ত নয়, এই কারণেই নারীর সম্মানহানির আশঙ্কাতেই ইহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার জবাব মিলিয়াছে পুলিসের গুলীবর্ষণে।

"ত্যাগীজী বলিয়াছেন, ভাষা-বিভ্রাটই এই দুঃখজনক ঘটনার কারণ। ইহা খোঁড়া যুক্তি। উদ্বাস্তু নারীদের লাঞ্ছনা এই প্রথম ঘটিল না এবং স্বাধীন ভারতে আসিয়া অহিংসাবাদী রাষ্ট্রের পুলিসী নির্য্যাতনে কম উদ্বাস্তুর জীবন হানি ঘটে নাই। আমরা আশা করিয়াছিলাম, মহাবীর ত্যাগীর পরিচালনায় উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন নীতিতে মানবিকতা ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা নামক শ্রেয় মূল্যবোধগুলিরও পুনর্ব্বাসন হইবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বহু দেশেই মানুষ উদ্বাস্তু হইয়াছে। কিন্তু আশ্রয়দানকারী দেশে সরকারী নীতির অদূরদর্শিতার ফলে এই ধরণের লাঞ্ছনার নজীর বিরল এই ছিন্নমূল মানুষগুলিকে নগণ্য জীবজন্তুর মত দেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া যাওয়া হইতেছে। নিজের দেশ, নিজের ভাষা এবং নিজের সমাজের শিকড়শুদ্ধ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহারা অপরিচিত জায়গায় গিয়া মাথা গুঁজিয়াছে শুধু বাঁচিবার অদম্য স্পৃহায়। আমরা তাহাদের উপযুক্ত খাদ্য কিংবা কর্ম্ম দিতে পারিতেছি না। কিন্তু ইহাদের শেষ সম্বল, নারীর সম্মান ও পারিবারিক একাত্মতাও কি ভ্রষ্টাচারী পুলিস ও নির্দ্দয় প্রশাসকদের নীতিহীনতায় জলাঞ্জলি দিতে বলিব? ইহারা ভারতবর্ষের কাছে, মানবতার কাছে, দিল্লীর মহিমান্বিত শাসকদের কাছে কি দোষ করিয়াছিল?"

'যুগান্তর'-এর মন্তব্যের সহিত কেবল বাঙ্গালী নহে, সকল সাধারণ ভারতবাসী মাত্রেই একমত, এবং ভারত সরকার, বিশেষ করিয়া শ্রীমহাবীর ত্যাগীর নিকট জবাবদিহি দাবি করিবেন। এই প্রসঙ্গে 'যুগান্তর'কে ত্যাগীর সম্পর্কে তাঁহাদের একটা পুরাণো মন্তব্যের কথা মনে করাইয়া দিতে চাই। অশেষ ত্যাগ স্বীকার করিয়া এই মহাবীর যখন কেন্দ্রে পুনর্ব্বাসন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন, সেই সময় 'যুগান্তর' তাঁহার নিকট হইতে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে সদয় এবং মানবিকতাপূর্ণ ব্যবস্থা বিধান আশা করেন। আমরাও তাই করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ দেখিতেছি 'পুরাণো বাঙ্গলা প্রবাদ বাক্যের চরম বাস্তবরূপ—'বিড়াল বনে গেলেই বন-বিড়াল হয়!' লোকসভার কোন সদস্য মন্ত্রী পরিষদভুক্ত হইলেই তাঁহার বহু বিপরীত পরিবর্ত্তন ঘটে! পূর্ব্বেও বহু ক্ষেত্রে ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে!

আরও আছে:

—পুনর্ব্বাসনের ব্যাপারে বিভিন্ন অব্যবস্থার অভিযোগে জানুয়ারী মাস হইতে দণ্ডকারণ্যে প্রেরিত ১ লক্ষ ৯৮ হাজার উদ্বাস্তু নরনারীর মধ্যে আজ পর্য্যন্ত ৪০ হাজার উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্যের শিবির ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছে। কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয়ের শৈথিল্য এই শিবির ত্যাগের সমস্যাকে আরও ব্যাপক ও তীব্র করিয়া তুলিতেছে বলিয়া স্থানীয় এক সরকারী মুখপাত্র মন্তব্য করেন। দণ্ডকারণ্যে পুনর্ব্বাসনের জন্য এখনও পর্য্যন্ত প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া মাত্র ৭ হাজার পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। অথচ শিবির ত্যাগের সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগত প্রায় ৮ লক্ষ উদ্বাস্তুর মধ্যে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে রহিয়া গিয়াছেন। ইহার উপর এই প্রত্যাবর্তনকারী ৪০ হাজার উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির উপর আরও চাপ সৃষ্টি করিতেছেন।

কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয়কে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁহাদের

টনক নড়িতেছে না। নয়াদিল্লীতে এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে একজন সেক্রেটারী, একজন অতিরিক্ত সেক্রেটারী, ৩জন ডেপুটি সেক্রেটারী এবং ১৭জন আণ্ডার সেক্রেটারীর বিরাট্ ফৌজ থাকা সত্ত্বেও শিবির ত্যাগের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে তাঁহাদের কোনরূপ শিরঃপীড়া দেখা যাইতেছে না।

জানা যায় পুনর্ব্বাসনের ব্যাপারে যথাযথ দেখা-শোনার অভাব উদ্বাস্তুদের মধ্যে নিরুৎসাহ ও হতাশার সৃষ্টি করিতেছে। ট্র্যানজিট ক্যাম্পের শিবিরবাসীদের ভাল করিয়া পরীক্ষা না করার ফলে, চাষের কাজে অনভিজ্ঞ লোকেদের ধান চাষ করিতে দেওয়া হইতেছে, আবার কৃষকদিগকে সাধারণ শ্রমের কাজে নিয়োগ করা হইতেছে। এই অব্যবস্থার ফলে, তাঁহারা কাজে কোনরূপ উৎসাহ পাইতেছেন না। ইহা ছাড়া, বহুসংখ্যক নরনারী ক্রমান্বয়ে মাসের পর মাস ট্রানজিট ক্যাম্পে থাকিয়া কোনরূপ কাজ না পাইয়া পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়া আসিতেছেন বাধ্য হইয়াই।

দণ্ডকারণ্যের পূর্ব্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের বাস্তব চিত্র এই—কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই দপ্তরে সু-উচ্চ বেতনভোগী অসংখ্য অফিসারের পূর্ণ বাহার আছে এবং দিনে দিনে আরও বাড়িতেছে। বলা বাহুল্য, কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন দপ্তরে শতকরা ৭০ জন অফিসারই অবাঙ্গালী এবং ভিটে হইতে উৎখাত বাঙ্গালীর প্রতি তাঁহাদের কোনপ্রকার মমত্ববোধ আছে—এমন কথা এখন পর্য্যন্ত শুনি নাই। এই দপ্তরের কৃপায় বাঙ্গালী উদ্বাস্তু উদ্বাস্তুই রহিয়া গেল, কিন্তু শত শত পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী এবং অন্যান্য প্রদেশের বিত্তবান ব্যক্তি 'উন্নত পুনর্ব্বাসন' প্রাপ্ত হইল!

শ্রীশৈবাল গুপ্ত দণ্ডকে কাজের কাজ কিছু করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, কিন্তু অন্যান্য কয়েকজন অফিসারের পক্ষে তাহাতে 'ব্যক্তিগত' স্বার্থে আঘাত লাগিল এবং বিষম ত্যাগী মাহাবীর ত্যাগী শ্রীগুপ্তকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন! এ-বিষয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও কিছু করিতে পারিলেন না, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও।

আজ প্রমাণিত হইল—পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে নেহরু-প্যাটেল এবং অন্যান্য কংগ্রেসী নেতারা যে-পবিত্র প্রতিশ্রুতি দেন,তাহা কথার কথা মাত্র। ক্ষমতার আসনে বসিবার লোভে এই প্রতিশ্রুতির মূল্য নেহাৎ সাময়িক ছিল। কিন্তু কেন্দ্রে যে দু-একজন বাঙ্গালী মন্ত্রী বিরাজমান তাঁহারা দণ্ডক 'ইস্যু'তে কি পদত্যাগ করিতে পারেন না? স্বর্গত শরৎ বসু এবং শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গেই কি বাঙ্গালীর সব শেষ হইল? প্রভুপদ সেবাই কি আজ বাঙ্গালীর শেষ সম্বল?

একটি পত্র

মহাশয়,

প্রথমে আপনাকে আমার আন্তরিক প্রণাম ও শুভেচ্ছা জানাই। "প্রবাসী" পত্রিকাটি আমি অত্যন্ত আগ্রহভরে পড়িয়া থাকি। আমার এই আগ্রহের কারণ "বাংলা ও বাঙ্গালীর কথা" বিভাগটি। বাঙ্গালী ও বাংলা দেশের সমস্যাগুলিকে এইরূপ একটি বিশেষ বিভাগে তুলিয়া ধরিবার জন্য আপনাকে এবং প্রবাসী কর্তৃপক্ষকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। গত শ্রাবণ সংখ্যায় "আকাশবাণী ও শ্রীমতী গান্ধী" শীর্ষক শিরোনামায় যে সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহা খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

স্বাধীনতার পর স্বাধীন ভারতে যে ভাষা সবচেয়ে বেশী অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে, সে-ভাষা হইল আমাদের মাতৃভাষা—বাংলাভাষা। বাংলাভাষাকে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন হইতে বহুদিন পূর্ব্বেই বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছে। এখন চক্রান্ত চলিতেছে কেমন করিয়া ইহাকে ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন হইতেও বিসর্জ্জন দেওয়া যায়। তাহা হইলেই হিন্দীভাষা একচ্ছত্রভাবে কায়েমী রাজত্ব চালাইতে সমর্থ হইবে। এই জঘন্য মনোবৃত্তির প্রকাশ দেখিতে পাই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি আচরণে।

বাংলাভাষার প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ আকাশবাণী আগাগোড়া করিয়া আসিতেছেন। আকাশবাণীতে বাংলা সঙ্গীতের সময় ক্রমশঃই কমাইয়া দিয়া হিন্দি-সঙ্গীত দিয়া সেই স্থান পূরণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। হিন্দী সঙ্গীত প্রচারের জন্য ভিন্ন ট্রান্সমিটার পর্য্যন্ত বসানো হইয়াছে। বিবিধ-ভারতী অনুষ্ঠানে সাড়ে তিন কোটি তথা বিশ্বের আট কোটি বাংলা শ্রোতার জন্য কেন নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা নাই—এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও প্রাক্তন এবং বর্ত্তমান বেতার-মন্ত্রীদের পত্র লিখিয়া কোনরূপ সদুত্তর পাইতেছি না। পাক্-ভারত তিক্ত সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে 'External Service' হইতে বাংলাভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারের অনুরোধ জানাইয়া বেতারমন্ত্রীকে একটি পত্র লিখিয়াছিলাম, তাঁহার সেক্রেটারী উত্তরে আমাকে লিখিয়াছেন যে আমার প্রস্তাব আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের নিকট বিবেচনার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে।

আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র হইতে বাংলা সঙ্গীতকে অনাকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে এবং পরিবর্ত্তে হিন্দী সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে—একটা বিরাট্ ষড়যন্ত্র চলিতেছে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের 'রাষ্ট্রভাষা নীতির' সহায়ক পন্থা। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের এই অপচেষ্টা শুধু ব্যর্থই হইবে না ভারতের বিপদ ডাকিয়া আনিবে। কারণ আমরা রেডিও পাকিস্তানের অনুষ্ঠান শুনিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। ফলে গত কয়েকদিন ধরিয়া ভারত-বিদ্বেষী প্রচার বাধ্য হইয়া শুনিয়াছি। কাজেই আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্র হইতে প্রচারিত বাংলা সঙ্গীত অপ্রিয় করিবার প্রচেষ্টা হয়ত সফল হইবে, লোকে বিবিধভারতী তথা হিন্দী সঙ্গীত শুনিতেই ভালবাসিবে, অভ্যস্ত হইবে, কিন্তু স্বাধীনচেতা বাঙ্গালীমনে বিদ্রোহ দেখা দিবেই। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বাঙ্গালীরা আমাদের সহায়ক হইবে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষা ও বাঙ্গালীকে হিন্দী সাম্রাজ্য-বাদের গ্রাস হইতে মুক্ত করিতে নিশ্চয় আগাইয়া আসিবে।

পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মাত্র তিন-চার শতাংশ পাহাড়ীয়া শ্রোতাদের জন্য ভিন্ন বেতার ষ্টেশন কার্শিয়াং কেন্দ্রটি স্থাপিত হইয়াছে। নেপালী ভাষা ইহার প্রচার মাধ্যম। কিন্তু আসামের ৩০ শতাংশ বাঙ্গালীর জন্য কি ব্যবস্থা হইয়াছে? ত্রিপুরায় কেন এখনও বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে না? বিহার-উড়িষ্যার লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী শ্রোতার জন্যই কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে? বর্ত্তমানের আন্দামান এবং ভবিষ্যতের দণ্ডকারণ্যের শ্রোতাদের জন্যই বা কি ব্যবস্থা রহিয়াছে? নির্ভীক সাংবাদিক হিসাবে এই সব প্রশ্নগুলি করুন। স্বজাতির দুঃখ ও লাঞ্ছনার প্রকাশই সাংবাদিকতার আদর্শ। রাজনৈতিক নেতারা চালবাজ, তাঁহারা চুপ করিয়া রহিয়াছেন। আপনি বংলাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার পক্ষে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা চালান। মাদ্রাজের D. M. K. পার্টির ভয়ে কেন্দ্রীয় সরকার দক্ষিণ ভারতীয়দের এবং তাহাদের ভাষাগুলিকে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়া থাকে। আপনি প্রশ্ন করুন, স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালীরা কি পাইয়াছে?

ভবদীয়

'শঙ্কর'

(পত্রখানি প্রশংসাপত্র হিসাবে প্রকাশ করা হইল না—পত্রে রেডিও সম্পর্কে মন্তব্যগুলির সহিত আমরা একমত, সেই কারণেই পত্র প্রকাশ করিলাম। বারান্তরে কলিকাতা রেডিও সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।)

হিন্দীর রাজ্যাভিষেক!

"অতি পরিচিত গানের ধুয়ার মত ভারতের সরকারী ভাষার প্রশ্নটি আর একবার বিগত ১২ই ডিসেম্বরের মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে জেগে উঠেছিল।

"সম্মেলন চূড়ান্তভাবে স্থির করেছেন যে, ১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে সরকারী ভাষা হিসাবে হিন্দী চালু করা হবে। সমস্ত রকম সরকারী নির্দ্দেশ ও পত্রালাপ চলবে হিন্দীতে। যে-সব রাজ্য সরকারী ভাষা হিসাবে হিন্দীকে গ্রহণ করেন নি তাঁদের ক্ষেত্রে এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে যে, সেখানে মূল হিন্দীর সঙ্গে একটি প্রামাণ্য ইংরাজী অনুবাদও জুড়ে দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের এ-সিদ্ধান্ত অবশ্য আগেকার মত দেশব্যাপী জনমতের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নি। সরকার ভাষার প্রসঙ্গটি আগে যখনই সরকারী পর্য্যায়ে আলোচিত হয়েছে তখনই নানা ভাবে বেসরকারী জন-মতের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। কাজেই এখন ধরে নিতে পারা যায় যে, হিন্দীওয়ালাদের ইচ্ছা প্রায় বিনা বাধায় পূর্ণ হ'তে চলেছে। ভারতের সংবিধান-স্বীকৃত অন্যান্য ১৪টি আঞ্চলিক ভাষার উপরে হিন্দীর এই অগ্রাধিকার ভারতের তাবৎ লোক-সাধারণ কতটা মেনে নেবে এবং ইরাজী ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ কতটা মার খাবে তা আগামী দিনের বিচার্য্য।

"ভারতীয় সংবিধানে ১৪টি আঞ্চলিক ভাষাকেই নীতিগত ভাবে সমমর্য্যাদাসম্পন্ন বলে স্বীকার করলেও হিন্দীকে সরকারী ভাষা হিসাবে চালু করার নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। সংবিধানের ৩৪৩ ও ৩৪৪ সংখ্যক ধারায় হিন্দীকে সরকারী ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করার কার্য্যকরী নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

"সংবিধানের ৩৪৪ ধারার নির্দ্দেশ অনুসারে রাষ্ট্রপতি সরকারী 'ভাষা কমিশন' গঠন করেন। শ্রীবি জি খেরের, নেতৃত্বে ২০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এই কমিশন ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাসে রিপোর্টটি সংসদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হয়। এই রিপোর্ট নিয়ে সংসদের ভেতরে ও সংসদের বাইরে দেশের জনমতের মধ্যে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। কমিশনের মূল বক্তব্য ছিল:

(১) সংবিধান অনুযায়ী ভারতে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হয়েছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজী ভাষাকে আর ভারতের সরকারী ভাষারূপে চালু রাখা সম্ভব নয়। (২) সরকারী ভাষা হিসাবে ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার তুলনায় হিন্দী সবচেয়ে সুবিধাজনক। কাজেই সর্ব্বভারতীয় কাজের মাধ্যম একমাত্র হিন্দীই হ'তে পারে। (৩) ইংরাজী থেকে হিন্দীতে প্রবর্ত্তনের প্রাথমিক পর্য্যায়ে অবশ্য হিন্দী-ইংরাজী দ্বিভাগ নীতি চালু থাকতে পারে।

"একমাত্র কৈফিয়ৎ হিসাবে কমিশন বলেন--হিন্দী-ভাষাতে ভারতের সর্ব্বাধিক সংখ্যক (!!) লোক কথা-বার্ত্তা বলতে পারে। অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে কমিশনকে প্রায় প্রকাশ্যেই বলতে হয় যে, আপাতত অন্তত প্রাথমিক পর্য্যায়ে সর্ব্বত্র হিন্দীকে অবশ্য-শিক্ষণীয় ভাষারূপে গণ্য করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সর্ব্বভারতীয় পরীক্ষা মাধ্যম, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রভৃতি উচ্চতর ক্ষেত্রেও হিন্দীকে ক্রমশঃ চালু করার সুপারিশ করা হয় কমিশনের রিপোর্টে।

"সংবিধানের ৩৪৪ (৪) ধারা মতে সরকারী ভাষা কমিশনের এই সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে রাষ্ট্রপতির নিকট রিপোর্ট দাখিলের জন্য তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থের সভাপতিত্বে ৩০ জন সদস্য নিয়ে একটি পার্লামেণ্টারী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি তাদের রিপোর্ট পার্লামেণ্টে পেশ করেন ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে। বলা বাহুল্য, সরকারী ভাষা কমিশনের রিপোর্টের যে-অভিপ্রায় ছিল—'হিন্দীকে জোর করে অন্যান্য ভাষার উপরে প্রাধান্য দেওয়া'—সে অভিপ্রায় পার্লামেণ্টারী কমিটির রিপোর্টেও অক্ষুন্ন ছিল। পার্লা-মেণ্টারী কমিটির রিপোর্টও সংসদের উভয় কক্ষের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তবে ১৯৫৭ সালের সরকারী ভাষা কমিশনের রিপোর্টের মতই সংসদীয় রিপোর্টটিও হিন্দীভাষীদের সংখ্যাধিক্যের জোরে পাশ হয়ে যায়। (স্মরণ করা যেতে পারে যে, ভারতের গণ-পরিষদে হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণের প্রস্তাবও প্রথম দিনের ভোটাভুটিতে ৭০—৭০ এবং পরের দিনের ভোটে মাত্র ১ ভোটের আধিক্যে পাশ হয়েছিল। এবং সেই ১ ভোটের জোরেই হিন্দী সমর্থকেরা হিন্দীকে ভারতের জাতীয় ভাষা ও তাবৎ মাতৃভাষাকে আঞ্চলিক ভাষারূপে কৃপা করতে সুরু করেন।

"ভাষা কমিশনের ২০ জনের মধ্যে ১৮ জন হিন্দীকে যথাসম্ভব শীঘ্র ইংরাজীর স্থলাভিষিক্ত করার মত দিয়া-ছিলেন, যদিও ১৯৬৫ সালের মধ্যে স্থলাভিষিক্ত করার ঔচিত্য সম্পর্কে কমিশন কোন স্পষ্ট মতামত দেন নি।

"পক্ষান্তরে দু'জন সদস্য-ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ পি সুব্বারাওন জোর করে এবং তাড়াতাড়ি হিন্দী না চাপিয়ে ধাপে ধাপে হিন্দী প্রবর্ত্তনের কথা বলেছিলেন।

"বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান—এই চারিটি মাত্র প্রদেশ যথাযথ হিন্দী ভাষাভাষী। অর্থাৎ ৩১০ কোটি লোকের ভাষা হিন্দী। কিন্তু কমিশন হিন্দীর দূরতর উপভাষাগুলিকে একই সূত্রের আওতায় এনে হিন্দীভাষীর সংখ্যাটা যথাসম্ভব স্ফীত করে দেখাতে চেয়েছিলেন। এর বাইরে বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণাঞ্চলের অহিন্দীভাষী লোকের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৩০ কোটি। অর্থাৎ ভেবে দেখতে গেলে হিন্দীর বাধ্যবাধকতা কার্য্যত দুই-তৃতীয়াংশের ওপর এক-তৃতীয়াংশের ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়া। কাজেই এই দুই-তৃতীয়াংশের প্রতিবাদটা অহেতুক ছিল না।

"সংসদীয় কমিটির রিপোর্টের সঙ্গে একটি মতানৈক্য নোট পেশ করেন কমিটির অন্যতম এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সদস্য শ্রীফ্র্যাঙ্ক এণ্টনী। তিনি দাবি করেছিলেন, ইংরাজীকেও হিন্দীর মতই অন্যতম সরকারী ভাষা হিসাবে গণ্য করা হোক। পরে সংসদের একটি পৃথক্ প্রস্তাবে তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

"ভাষাবিদ্ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও অহিন্দী ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হিন্দীকে জোর করে আবশ্যিক বিষয় রূপে চালু করা অনুচিত বলে মত প্রকাশ করেন। এই সব ছাত্রছাত্রীদের ডঃ চট্টোপাধ্যায় তৎকালে 'তথাকথিত দেশপ্রেমের শিকার' বলে বর্ণনা করেন। প্রসঙ্গত তিনি একথাও বলেন যে, 'ন্যায়বিচার ও সমতার খাতিরে ইংরাজীকেও অন্যতম ভারতীয় ভাষা হিসাবে স্থান দিতে হবে।'

"ভাষা কমিশনের রিপোর্টের সঙ্গে একমত না হয়ে ডঃ চট্টোপাধ্যায় সেদিন সুস্পষ্টভাবেই বলেছিলেন—"রাজনৈতিক বা শিক্ষামূলক কোন ক্ষেত্রেই হিন্দীর প্রয়ো-জনীয়তা নাই। হিন্দীর দ্বারা ইংরাজীকে দূর করে অহিন্দীভাষী অঞ্চলসমূহকে এতে বেশী প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টায় এই সকল অঞ্চলে গভীর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।"

"অহিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলের জনমতের প্রধান প্রধান সমালোচনা ছিল :

কোন একটি আঞ্চলিক ভাষাকে অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিলে জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হতে পারে।

সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে। সরকারী ভাষা হিসাবে হিন্দীর অনুশীলন বাড়লে মাতৃভাষার অনুশীলন কার্যত কমে যাবে।

অহিন্দীভাষীদের সর্বভারতীয় চাকুরি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে।

"কিন্তু কোন প্রতিবাদই আজ কার্য্যকর হয় নি। হিন্দীভাষীদের চাপে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনকে সামনে রেখে হিন্দী ভারতবর্ষের ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে জোর করে রাজাসন দখল করে নিয়েছে। এতে ভাষাসংহতি হবে কি ভাষা-সংহার হবে, তাই হিন্দী ছাড়া অন্য তেরটি জাতীয় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের চিন্তার বিষয়।"

যুগান্তরে প্রকাশিত সম্পূর্ণ রিপোর্টটি উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। কেন্দ্রীয় কয়েকজন হিন্দীভাষী মন্ত্রীর এই জুলুমের বিষয় আমরা পূর্ব্বেও বহু আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সবই হইয়াছে অরণ্যে ক্রন্দন!

৯ কোটি লোকের অর্দ্ধপক্ক এবং অর্ব্বাচীন ভাষাকে ৩৫ কোটি লোকের উপর জোর করিয়া চাপাইবার প্রয়াস সাময়িক কালের জন্য হয়ত সার্থক হইবে—কিন্তু চিরকাল এই ভাষার জুলুম মানুষ সহ্য করিবে না। বর্ত্তমান ক্ষমতাসীন কর্ত্তৃপক্ষ ভারতকে যে-হিন্দীভাষার রজ্জুতে বাঁধিয়া 'এক' করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সেই হিন্দীভাষারূপ রজ্জু একদিন, হয়ত দু'-চার বছরের মধ্যেই, ছিঁড়িয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে ভারতের সংহতিও সবিশেষ বিঘ্নিত হইবে।

গত প্রায় ৬০।৭০ বৎসর যাবৎ ভারতে যে সংহতি (হিন্দীভাষার 'প্রতাপ' না থাকা সত্ত্বেও)—ভারতীয় সকল প্রদেশের মানুষের মধ্যে যে একত্ববোধ ছিল, আজ তাহার কতটুকু আছে? কর্ত্তারা অবাস্তব হিন্দী-স্বর্গ হইতে মাটিতে নামিয়া আসুন—অনেক কিছু দেখিতে পাইবেন। মানুষ বেশীদিন 'ফুল্‌স্ প্যারাডাইসে' থাকিতে পারে না। ভয় হইতেছে এই হিন্দী-ই ভারতকে আবার শতবিভক্ত করিবে—দেশ হয়ত আবার ১০০ বছর পূর্ব্বেকার অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের পুনর্ব্বাসন ॥

জানিতে পারিলাম যে কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিচালনায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে চলিয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধিত বিলের বিভিন্ন ধারা অনুসারে পৌর কর্তৃপক্ষ পরিচালনা ব্যবস্থাকে অবিলম্বে ঢালিয়া সাজার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন।

রাজ্যপাল উক্ত বিলের একশতটি ধারার যে অনুমোদন দিয়াছেন তাহা এক বিশেষ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। সংশোধিত বিলে মোট ১২৯টি ধারা সন্নিবেশিত আছে।

সংশোধিত বিলে কমিশনারের ক্ষমতা প্রসারিত করা হইয়াছে। ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। ফিনান্স অফিসার ও চীফ একাউন্টেণ্টকে ছিটে-ফোঁটা কর্তৃত্ব দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কমিশনারকে বিস্তৃত ক্ষমতা দানের ব্যবস্থার বিরোধিতা করিয়া রাজ্য আইন সভায় বিরোধী দল সরকারের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন।

পৌরসভার অলডারম্যান ও কাউন্সিলারগণ গত ৫ই ডিসেম্বর হইতে মাসিক একশত টাকা ভাতা (অনারেরিয়াম) পাইবেন। তাহা ছাড়া প্রতিটি পৌরসভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে যোগদান ও ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে যোগদান বাবদ সদস্যরা ১০ টাকা করিয়া পাইবেন। কিন্তু এই টাকা মাসিক ৫০ টাকার বেশী হইবে না।

কমিশনারকে যে-কোন কাজ বাবদ ২৫ হাজার টাকা অনুমোদনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে কিন্তু পাঁচ হাজার টাকার বেশী যে-কোন বিষয়ে খরচা করিতে হইলে কমিশনারকে ফিনান্স অফিসার ও চীফ একাউনটেণ্টের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত পাঁচ হাজার টাকার বেশী খরচের অনুমোদন ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির ছিল।

কমিশনারকে মাসিক তিন শত টাকা পর্য্যন্ত বেতনের কর্ম্মচারীদের সরাসরি নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হইবে এবং ৩০০ টাকা হইতে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত নিয়োগের সুপারিশ মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন করিবেন; কিন্তু অনুমোদন দান করিবেন কমিশনার।

কমিশনারকে ষ্ট্যাটুটারী অফিসার ছাড়া যে কোন অফিসার ও কর্ম্মচারীকে শাস্তি দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এতদিন কমিশনার ২৫০ টাকা বেতন পর্য্যন্ত কর্ম্মচারীদের শাস্তি দিতে পারিতেন

এতদিন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ফিনান্স অফিসার ও একাউণ্টেণ্ট পদের নিয়োগের অনুমোদনের ক্ষমতা কলিকাতা পৌরসভার ছিল। নূতন আইনবলে রাজ্য সরকার ফিনান্স অফিসার ও চীফ একাউণ্টেণ্ট নিয়োগের ক্ষমতা নিজের

হাতেই লইয়াছেন। চাকুরির নিয়মাবলী রচনাও রাজ্য সরকার করিবেন। ফিনান্স অফিসার ও চীফ একাউন্টেন্টকে যে-কোন আর্থিক বিষয়ে একাউন্টস এবং এষ্টিমেট কমিটিতে পরামর্শ দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

নূতন আইনে পৌরপিতাদের আর একটি ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। পৌরসভা রাজ্য সরকারের অনুমোদন ব্যতীত কোন জমি পাঁচ বৎসরের বেশী লীজ বা দান করিতে পারিবেন না এবং কোন কাউন্সিলার কমিশনারের অনুমোদন ব্যতীত কোন অফিসারের নিকট হইতে কোন রেকর্ড চাহিতে পারিবেন না।

আশা করি কলিকাতা পৌরসভার নূতন ব্যবস্থা সম্পর্কে নগরপালদের পালের-গোদা শ্রীঅতুল্য ঘোষের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। গত কয়েক বৎসরে কলিকাতা শহরের অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে—আর মাত্র কয়েক বৎসর যদি এই কুকর্ম্মাদের উপর শহর রক্ষার ভার ন্যস্ত থাকে তাহা হইলে অত্যকার এই কলিকাতাকে সোঁদর-বনের আওতায় পড়িতে হইবে।

সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতার যে ভবিষ্যৎরূপ কল্পনা করিয়া কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট পরিবর্ত্তন-সংশোধন করেন প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে, বর্ত্তমান অকর্ম্মা-ঢেঁকিদের কেরামতিতে বহু-গৌরবস্মৃতিজড়িত সেই একদা-বিখ্যাত প্রাসাদনগরী কলিকাতা আজ প্রায় ধ্বংসের মুখে!

আগামী পৌর-নির্ব্বাচনে কলিকাতার করদাতারা যদি বর্ত্তমান পৌর-(উপ-)পিতাদের ঝাড় সমেত করাতি-ঝাঁটার দ্বারা লবণ হ্রদে মাটি ভরাটের কাজে নিক্ষেপ করিতে পারেন—এ-শহর তবেই রাহুমুক্ত হইবে।

গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে

—আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রভুপাদ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আলুর রুটি, আটার রুটি, পাঁউরুটি উদ্ধার করিয়া এইবার দুধ হইতে ছানা তৈয়ারী বন্ধ করিবার শুভচিন্তা করিতেছেন। তিনি করুণা-বিগলিত বাণীতে বলিয়াছেন, শিশুরা দুধ পায় না, অতএব দুধ হইতে ছানা কাটা-বন্ধ করিতে হইবে। তবে রোগীদের জন্য প্রয়োজন হইলে ঘরে ছানা কাটিতে পারা যাইবে। চমৎকার পরিকল্পনা, শহরের ধনী বুড়া শিশুর দল এই ফাঁকে ঠিকই সুব্যবস্থা করিয়া লইবেন এবং এবার হইতে আমাদের জীবন্ত মুখ্যমন্ত্রীর জন্মতিথিতে উক্ত দুগ্ধপোষ্য-গণ "শিশু দিবস" পালন করিবেন। কিন্তু গোকুলের শ্রীনন্দের নন্দনের বংশধর যাদবকুলের কি অবস্থা হইবে? ইহাতে কি যাদবকুল ও মোদককুল বেকার হইবে না? একদিকের সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া অন্যদিকে ছানার মুনাকাটা ত উৎপাদনকারীদের জল দিয়া পোষাইতে হইবে? তখন এ-যুগের শ্রীনন্দের পালিত পুত্র সদাচার সমিতির সাক্ষাৎ পিতৃপুরুষদেরও সাধ্য নাই যে তাহা হইতে পরিত্রাণ করে। সরকার বেকার সমস্যা সমা-ধানের জন্য নাকি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিতেছি, তাঁহারা বেকার সমস্যা সমাধানের স্থলে নূতন নূতন বেকার সমস্যার সৃষ্টি করিতেছেন। সরকারের বিভিন্ন কাজে সহস্র সহস্র লোক দীর্ঘ দিনের পেশা হইতে নূতন করিয়া বিচ্যুত হইয়া বেকার হইতেছে। চাউল, চিনি, তৈল, আটা, ময়দা প্রায় প্রতিটি প্রধান নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য হইতে বঞ্চিত করিয়া কয়েক লক্ষ ক্ষুদ্র মুদি ও চাউল ব্যবসায়ীকে ধ্বংস করিয়াছেন। সম্প্রতি চিনি লইয়া যে ছিনিমিনি খেলিতে-তেছেন তাহাতে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরাও পথে বসিবার উপক্রম। আমরা আমাদের গণ্ডির মধ্যে বর্দ্ধমানের চিত্রই প্রত্যক্ষ করিতেছি। বর্দ্ধমান শহর এলাকায় প্রায় ১৫০টি মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী কয়েক সপ্তাহ হইতে নিয়মিতভাবে পরিমিত চিনি না পাওয়ায় তাহাদের দোকানগুলি প্রায় অচল হইয়াছে। অবশ্য দুই-চার জন বড় দোকান-দার যে-কোন উপায়েই পোষাইয়া লইতেছেন। কিন্তু সাধারণ মিষ্টান্ন দোকানদারদের কলিকাতা হইতে আকাশ ছোঁয়া দরে মিছরী আনিয়া পেটের দায়ে কিছু কিছু মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে হইতেছে। গত ২২ই নভেম্বর নবগঠিত বর্দ্ধমান মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির অধিবেশনে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, ৬৭ জন সাধারণ মিষ্টান্ন বিক্রেতাকে সপ্তাহে ৩৬·০৯ কেজি হিসাবে চিনি দেওয়া হইত, এক্ষণে উহার অর্দ্ধেক ১৮·০৪ কেজি করা হইয়াছে। উহাও আবার গত সপ্তাহ ও এই সপ্তাহে দেওয়া হয় নাই। আমরা বর্দ্ধমানের কর্ত্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি আর বর্দ্ধমানবাসীকে মিষ্টিমুখ করাইয়া মিষ্টভাষা শুনিতে চাহেন না? স্বাধীন ভারত নাকি একমাত্র চিনিতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ—ইহা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। শ্রীগদাধর যতশীঘ্র এই দয়ালু ও কর্ম্মঠ সরকারকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে স্থান দেন দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল!—

—'দামোদরে'র দুঃখ করিবার কারণ নাই। আলোচ্য বিষয়ে কলিকাতার অবস্থাও চরম এবং আমরা হাড়ে হাড়ে তাহা অনুভব করিতেছি। এ বিষয় আমরা কোন মন্তব্য না করিয়া তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামত উদ্ধৃত করিলাম।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সরকারী পরিকল্পনাকে 'অভিনব' আখ্যা দিয়া বলেন, উহাতে বাংলার মিষ্টান্ন শিল্পের উপর 'নির্মম আঘাত' পড়িবে। তিনি বলেন—"দুধ সরবরাহের ভার যদি সরকার নিজের হাতে গ্রহণ না করতেন, তা হ'লে এ আইন জারী করলেও সরকারকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা চলত না। কিন্তু সরকার হরিণঘাটায় দুগ্ধ-কেন্দ্র স্থাপন করেছেন—কলকাতা থেকে খাটাল অপসারণ করছেন। দুধ সরবরাহের দায়িত্ব আজ সম্পূর্ণরূপে সরকারের। সরকার তাতে ব্যর্থ হয়েছেন—যেমন ব্যর্থ হয়েছেন গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা পরিকল্পনায়। নিজেদের অক্ষমতা ও ব্যর্থতার জন্য আজ তাঁরা যে আইন করতে চলেছেন—তাতে বাংলার একটি অতি সুন্দর এবং প্রশংসার শিল্প নষ্ট হয়ে যাবে। বাংলার ছানা থেকে তৈরী মিষ্টান্ন আজ পৃথিবীর বহু দেশে উচ্চ প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণশিল্পীদের মত অসংখ্য মিষ্টান্ন শিল্পী-কারিগর—ব্যবসায়ী তারাও বেকার হয়ে পড়বে। তার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর ঘরের আতিথেয়তা আপ্যায়ন তাও নষ্ট হবে। আজ দেশে অন্ন নাই,—তৈল নাই—মৎস্য নাই—শাকসব্জি—চাল থেকে সুরু করে সমস্ত দ্রব্য অগ্নিমূল্য। দুধ নেই শুনছি। মিষ্টি উঠতে চলেছে। আজ বিস্মিত হয়ে ভাবছি পর পর তিনটি পরিকল্পনার প্রায় অন্তে যখন এই অবস্থা, তখন আর একটি বা দু'টি পরিকল্পনার পর আমরা কোন্ অবস্থায় উপনীত হব?

"আমি সরকারকে অনুরোধ করছি, তাঁরা দুধের উৎপাদন বাড়ান। প্রয়োজনীয় সংখ্যক দেশ-বিদেশের ভাল গরু আমদানী করুন। অন্যদিকে হরিণঘাটার বন্দোবস্ত ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুসন্ধান করে তাকে নিখুঁত করুন। যে-সব শ্বেতহাতী জাতীয় কর্ম্মচারীগুলি এসবের জন্য দায়ী, তাদের পরিবর্ত্তন করুন। বাঙালীর এমন একটি সুন্দর শিল্পকে নষ্ট করে বেশ কয়েক লক্ষ মানুষকে বিপন্ন করে তুলবেন না।"

পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা ভীষণতম—এমন অবস্থায় ৫ লক্ষ লোককে বেকার করিবার অভিনব পরিকল্পনা—লজ্জার বালাই থাকিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

পৃথিবীর উন্নত অন্যান্য দেশগুলির প্রতি আমাদের পরম-গান্ধীবাদী এবং চরম-খাদীপ্রাণ মুখ্যমন্ত্রীকে দৃষ্টিপাত করিতে নিবেদন জানাই—কি ভাবে ঐ সব দেশে কুটির শিল্পগুলিকে দেশের সরকার সযত্নে রক্ষা করিতেছে তাহা দেখিতে পাইবেন। এ দৃষ্টান্তে তিনি নিজেকে অনুপ্রাণিত করিয়া দেশের কুটির শিল্পগুলিতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে—এ-রাজ্যের অক্ষম, উদ্যমহীন কিন্তু স্বার্থপর সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে সক্রিয় চিকিৎসার বিধানও দিতে পারিবেন। স্বর্ণশিল্পীদের মত এ-রাজ্যের প্রায় ৫ লক্ষ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী ও কর্ম্মীদের বেকার করিয়া তাহাদের স্থির মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিবার ব্যবস্থাকে সুশাসন বলে না—বলে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সরকারী নির্ম্মম স্বেচ্ছাচারিতা। শিশুদের বাঁচাইতে হইলে দুগ্ধ অবশ্যই চাই, কিন্তু এই দুগ্ধ সংগ্রহ মিষ্টান্ন-বিক্রেতা ও কর্ম্মীদের হত্যার বিধান দ্বারা হইবে না। এ-ব্যবস্থা এবং বিধান অক্ষম অসহায় ক্ষমতাসীন ব্যক্তির পক্ষেই শোভা পায়। রোগ নিরাময় করিবার নামে রোগীকে স্বর্গধামে চালান করার বিধান চিকিৎসা বলিয়া কেহই স্বীকার করিবে না।

কিছু সংখ্যক অসৎ ব্যবসায়ীর পাপের দণ্ডভোগ দেশের নিরপরাধী লোকদের কেন করিতে হইবে, তাহা আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে আসে না। বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই দেশের প্রায় সকল সংবাদ এবং সাময়িক পত্র খাদ্য বিষয়ে সরকারকে সতর্ক অবহিত হইবার নিবেদন জানায়—কিন্তু সরকারী হেড-ম্যান্ ভাবিয়াছিলেন তিনি বুঝেন বেশী, জানেন আরও বেশী এবং এই জানার জোরে বিগত ১৬।১৭ বৎসর যাবৎ টন মণের বিষম পরিসংখ্যানের চাপে লোকের দেহ-মন চাঙ্গা রাখিবার প্রভূত চেষ্টা ক্রমাগত করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ-প্রধানের বেকুবীর ফল শেষ পর্য্যন্ত ফলিল, তাঁহার চাল-গম-তৈলের পরিসংখ্যান—কেবল মিথ্যাই নহে, আজ বিষম এক ধাপ্পা বলিয়াই লোকের ধারণা হইয়াছে। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ বাক্যের সত্যতা আজ বুঝিতে পারিতেছি।

চারি প্রকার মিথ্যা আছে—

১। Lies—সরল মিথ্যা
২। White Lies— শুদ্ধ শুভ্র খদ্দরী মিথ্যা
৩। Damned Lies—সাংঘাতিক মিথ্যা
৪। Statistics—ভীষণতম মিথ্যা

অন্যান্য ক্ষেত্রের কথা জানি না, কিন্তু এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর খাদ্যশস্য বিষয়ে প্রায় সকল পরিসংখ্যানই দেশের লোককে আজ অ-ভক্ষ্য অপক্ব কদলী মাত্র প্রদর্শন করিতেছে!

আমরা সবকিছু সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে র‍্যাশনিং ব্যবস্থার সার্থকতা আশা করিব—এবং ইহা যদি বাস্তবে ঘটে তাহা হইলে হয়ত বা দেশের লোক—যত কমই হউক—

কিছু কিছু খাদ্য পাইবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনমত চাউল-আটা-গম-চিনি যোগানোর দায়িত্ব কেন্দ্র সরকারের। কেন্দ্র সরকার, আশা করি পূর্ব্বের মত এবারও তাঁহাদের কথার খেলাপ করিবেন না। কেরালা সম্পর্কে কেন্দ্র-কর্ত্তারা যে বিষম তৎপরতা এবং মনোভাব প্রদর্শন করেন, আশা করি আমাদের এ-পোড়া রাজ্য সম্পর্কে তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। সকলপ্রকার নিরাশার মধ্যেও আমরা যেন ৫ই জানুয়ারী (১৯৬৫) তারিখটিকে এক শুভদিন বলিয়া ভবিষ্যতে স্মরণ করিতে পারি—আপাতত ইহার বেশী আর কিছু আশা করিবার নাই। এবার পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-র‍্যাশনিং এবং-বিলি বণ্টন ব্যবস্থা যদি সুষ্ঠু এবং যথাযথ হয়, তাহা হইলে মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে যতপ্রকার বিরুদ্ধ এবং অপ্রিয় সমালোচনা করিয়াছি তাহা প্রত্যাহার করিব সানন্দে এবং অকুণ্ঠচিত্তে। আর একটি কথা স্পষ্ট বলা দরকার—শ্রীপ্রফুল্ল সেন সম্পর্কে আমাদের ব্যক্তিগত কোন বিরুদ্ধ ভাব, বিদ্বেষ এবং অভিযোগ নাই—বরং তাঁহার নানা গুণের জন্য তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার ভাবই পোষণ করি।

'চাউলের জন্য কেন বেশী খরচ করেন··· ?'

সরকারী একটি বিজ্ঞাপনের হেড্-লাইন। (সরকারী পরিহাস?) এই বিজ্ঞাপন পাঠে জানিতে পারিলাম যে, আমাদের "···প্রয়োজন মেটাবার জন্য গমও ঃ রয়েছে।

"গমের পুষ্টিকারক গুণও বেশী; পুষ্টিকর খাদ্যের সমতা রক্ষার জন্য এবং খাদ্য-সম্পর্কিত ব্যয়ে সমতা রক্ষা করার জন্য বেশী পরিমাণে গম ব্যবহার করুন।

"তাছাড়া শাকসব্জি, ফল, মাছ, ডিম ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির মত পুষ্টিকর খাদ্যও বেশী পরিমাণে গ্রহণ করুন।

"উন্নততর ও সুষম খাদ্যের জন্য বেশী পরিমাণে গম ব্যবহার করুন!"

বিশেষ করিয়া (চাউল ছাড়া) যখন এই সকল খাদ্যদ্রব্যাদি দেশে ছড়াছড়ি যাইতেছে! আর গম? রাস্তার মোড়ে মোড়ে বস্তা বস্তা গম বিক্রি হইতেছে! যত খুশি পেটে—ভরিয়া যান।

মুক্তহস্তে দুর্গাপুর কংগ্রেসের চাঁদা

একটি সংবাদে প্রকাশ যে, মন্ত্রী খগেনবাবু জলপাইগুড়ি শহরে কয়েকদিন প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে একটি জনসভায় দুর্গাপুর কংগ্রেসের জন্য বেশ মোটা পরিমাণ চাঁদার ভরসা পাইয়াছেন। একেবারে সঠিক হিসাব নয়, তবে জানা গেল সেই অর্থের প্রতিশ্রুতি প্রায় পঞ্চাশ হাজার। ব্যবসায়ীদের কাছে মন্ত্রী মহাশয়ের আবেদন ব্যর্থ হয় নাই, তাঁহার প্রতীক্ষায় সার্থক হইয়াছে।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়ও বার্ণপুর এবং অন্যান্য স্থানে ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা চাঁদা হিসাবে লাভ করিয়াছেন।

খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা এবং জনপ্রিয় মন্ত্রীর দুর্গাপুর কংগ্রেসের জন্য চাঁদার আবেদন ব্যবসায়ীদের নিকট ব্যর্থ হয় নাই জানিয়া গভীর তৃপ্তিলাভ করিলাম।

এই প্রসঙ্গে আশা করা যাইতে পারে যে, উপর মহলে ব্যবসায়ীদের সামান্য 'আবেদন'ও একেবারে বৃথা যাইবে না।

বিশ্বামিত্র

শ্রীচাণক্য সেন

॥ চৌদ্দ ॥

দুর্গাভাই মেহতার বাংলোবাড়ী বিলাসপুর শহরের উত্তর-প্রান্তে। একদা-বিস্তীর্ণ সংরক্ষিত অরণ্যে উত্তর-প্রান্ত ছিল জনবিরল। ইংরেজ আমলে গভর্ণররা অরণ্যে পশু শিকার করতেন অরণ্য ঘিরে রয়েছে আরাবল্লী পর্বতমালার একাংশ: শাল, সেগুন ও অনেক রকম বন্য গাছের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে সরু পথ। এখন অরণ্যের অনেকখানি জনপদে পরিণত। নতুন নতুন কলোনী তৈরী হয়েছে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের রাজত্বে। একটি কলোনীর নাম কোশলনগর; অন্য নাম কে, ডি, নগর। কোশলনগরে তৈরী হয়েছে মন্ত্রী এবং উচ্চ-স্তরের রাজপুরুষদের জন্যে নতুন বাংলো। এর একটি দুর্গাভাই মেহতার। বাংলোটি এক পাহাড়ের ওপর। নীচে থেকে বেশ খানিক উঁচু উঠে গেছে পীচের রাস্তা বাংলোর গেট পর্যন্ত। গাড়ি সহজে উঠতে পারে, কিন্তু সাইকেল-রিক্‌শা টেনে তুলতে মানুষ শীতেও ঘর্মাক্ত হয়। বাংলোর সামনে ফুলের বাগান। দক্ষিণ কোণে দুর্গাভাইএর খাস দপ্তর।

মধ্যাহ্ন আহারের পরে দুর্গাভাই কদাচ বিশ্রাম নেন না। সারাদিন কর্মব্যস্ততা গান্ধী-শিষ্য-জীবনের প্রাচীন অভ্যাস। আজও আহারান্তে বাগানে পাইচারি করছিলেন। মন অশান্ত। জীবনে অনেক সিদ্ধান্ত-সংকটে পড়েছেন দুর্গাভাই। কিন্তু আজকের, বর্তমানের, সংকট অন্য রকমের। যৌবনে সরকারী কলেজের অধ্যাপনা ত্যাগ ক'রে গান্ধীজির আহ্বানে স্বাধীনতা সংগ্রামের অহিংস সৈনিক হবার সময়ও সংকট দেখা দিয়েছিল। মনস্থির করতে কষ্ট হয় নি। মনস্থির ক'রে আনন্দ, তৃপ্তি, গৌরব হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে পুনরায় সংকটে পড়েছিলেন। মন চাইছিল গান্ধীজির শিষ্য থেকেই শাসনপর্বের বহুদূরে গ্রামাঞ্চলে কাজ করতে। পারেন নি। উদয়াচলের কংগ্রেস-কর্মীদের দাবি, পত্নী মনোরমার সামাজিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পুত্রকন্যাদের অনুচ্চারিত ক্ষোভ—সব উপেক্ষা করবার সাহস ছিল, ছিল না মহাত্মার আদেশ লঙ্ঘনের। মন্ত্রীত্ব ক'রে পাঁচ বছর কেটে গেল। পাঁচ বছরে দেশের, দেশবাসীর যে-পরিচয় দুর্গাভাই পেয়েছেন তার কিছুই প্রায় জানা যায় নি সুদীর্ঘকালের দেশসেবায়। আজ একেবারে নতুন সংকট। দুর্গাভাই জানেন, ইচ্ছে করলে উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী তিনি হ'তে পারেন। এক-দিক থেকে দেখতে গেলে হওয়া তাঁর দায়িত্ব, কর্তব্য। কংগ্রেস দলে যে ভাঙ্গন ধরেছে, জয়লাভ করলেও, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তা জুড়তে পারবেন না। পদ্মাদেবী ঠিক বলেছেন, জয়ের মধ্যেও কোশলজিকে পরাজয় মানতে হবে। পাঁচ বছর আগে তিনি যে-মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আগামী সপ্তাহে দলীয় সংগ্রামে জিতেও, তিনি আর সে-মুখ্যমন্ত্রী হ'তে পারবেন না। যাদের সাহায্য নিয়ে তাঁর জয় হবে, তাদের পুরস্কৃত করতে গিয়ে নিজের বল ও মর্যাদা তিনি অনেকখানি হারাবেন। যারা হারবে, তারা গোপন হিংসায় অনবরত ষড়যন্ত্র ক'রে যাবে, যতদিন না প্রতিশোধের উল্লাসে তাদের চিত্ত বিত্তহীন হয়ে উঠবে।

কংগ্রেস-শাসনকে এ সংকট হ'তে বাঁচাতে পারেন একমাত্র দুর্গাভাই। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আজও তাঁকে রাজ-মুকুট ছেড়ে দিতে রাজী আছেন। গতকালও বলেছেন, "আপনি যদি মুখ্যমন্ত্রী হন, দুর্গাভাইজি, আমি সানন্দে অবসর নেব।" কোশলজির প্রতিপক্ষও দুর্গাভাইকে প্রাধান্য দিতে তৈরী। সুদর্শন দুবে আজ সকালেও টেলিফোনে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হবার অনুরোধ করেছেন। হাইকমাণ্ড থেকেও তাঁর অভিমত জানতে চাওয়া হয়েছে। মনোরমা পুত্রকন্যাদের নিয়ে রীতিমত রাজ-নৈতিক আন্দোলন সুরু ক'রে দিয়েছেন।

অথচ দুর্গাভাই কিছুতে মনস্থির করতে পারছেন না।

আজ সকালে এ নিয়ে মনোরমার সঙ্গে আবার ঝগড়া হয়ে গেছে। মনোরমা যে সুদর্শন দুবের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন করেছেন দুর্গাভাই তা জানতেন না। খবর পেয়ে গেলেন অপ্রত্যাশিতভাবে কন্যা বসন্তের কাছে।

রাত্রে শুতে যাবার আগে বসন্ত তাঁর জন্যে একগ্লাস দুধ নিয়ে আসে। কালও এসেছিল। দুধ পান করে গ্লাস ফিরিয়ে দিতেও বসন্ত দাঁড়িয়েছিল।

দুর্গাভাই প্রশ্ন করেছিলেন, "কিছু বলবে?"

"আপনি যদি অনুমতি দেন।"

"বল।"

"কোশলজি কি হেরে যাবেন?"

"তুমিও রাজনীতি করছ নাকি?"

"না। শুধু জানতে চাইছি।"

"মনে হয় না হারবেন।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"তা হ'লে কি আপনি হারবেন, পিতাজি?"

"আমি? আমি ত হেরেই আছি।"

"কোশলজি যদি জেতেন, তবে ত আপনার হার হবে।"

"কেন? আমি ত তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নই!"

"নন?"

"না ত।"

"তবে যে মা বললেন—"

"মা কি বললেন?"

"মা বললেন, সুদর্শনজি আপনাকে কোশলজির প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাবেন। আর, আপনি তাতে রাজী হয়েছেন।"

"মা কি করে জানলেন?"

"গতকাল সুদর্শনজি এসেছিলেন।"

"কেন? কখন?"

"দশটায়। মা'র সঙ্গে কথা বলতে।"

"হঠাৎ মা'র সঙ্গে কথা বলার কি দরকার হ'ল?"

"হঠাৎ নয়, পিতাজি।"

"ও! কথাবার্তা তা হ'লে চলে আসছে?"

"মা বললেন, এবার কোশলজির পতন অনিবার্য।"

"তোমার মা রাজরাণী হ'তে চান। বহুদিনের সখ।"

"আপনি কি প্রতিদ্বন্দ্বী নন, পিতাজি?"

"না। রাজা হবার সখ আমার নেই। মন্ত্রীত্বই হজম করতে পারি নি, আবার রাজা!"

"আমি যাই, পিতাজি।"

"শোন। তুমি কোন্ দলে জানতে পারি কি?"

"আপনার দলে, পিতাজি।"

"তুমি চাও আমি মুখ্যমন্ত্রী হই?"

"না, পিতাজি।"

"কেন?"

"জানি না।"

"আচ্ছা, এস।"

বসন্তের সুন্দর মুখখানায় খুশির ছটা দেখতে পেয়েছিলেন দুর্গাভাই মেহতা। কারণ বুঝতে পারেন নি। ভেবেছিলেন, পিতার প্রতি অন্ধ অনুরাগ। বোঝেন নি, বসন্তের ভয়, আশা, আশংকা। কোশল পরিবারের সঙ্গে সে সংগোপনে একটি অনুরাগের সেতু তৈরী করেছিল। মনোরমা কোশলদের কোনদিন সুনজরে দেখেন নি অধুনা তাঁদের নাম পর্যন্ত শুনতে পারেন না। এর ওপর যদি দুর্গাভাই ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তার সেতুটি ধূলিসাৎ হবে।

প্রাতঃরাশের সময় দুর্গাভাই পত্নীকে কঠিন ভাষায় বলে উঠলেন, "তুমি রাজনীতি করতে চাও, কর। কিন্তু আমাকে নিয়ে নয়।"

"তার মানে?"

"সুদর্শন দুবের সঙ্গে তোমার কি-সব কথাবার্তা চলছে?"

"কে বলল তোমাকে এ কথা?"

"যেই বলুক।"

"নিশ্চয় কে. ডি. কোশল! মূর্তিমান শয়তান। সর্বত্র তার গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি জানতাম তার লোক আমার পেছনে লেগে রয়েছে।"

"কোশলজি বলেন নি। কিন্তু কথা তা নয়। কথা হচ্ছে, তুমি এ ব্যাপারে মাথা গলিও না।"

"কেন? আমি উদয়াচলের নাগরিক। কংগ্রেসের কাজ আমিও করেছি। উদয়াচলের শাসনে আমারও অধিকার আছে। কে মুখ্যমন্ত্রী হ'লে প্রদেশের ভাল হবে সে বিষয়ে আমারও বলবার আছে, করবার আছে।"

"তা আছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যেই হোক, আমি হচ্ছি না।"

"কেন? তুমি কেন হবে না? প্রদেশের সবাই তোমাকে চাইছে। কংগ্রেস দলের সবাই তোমাকে চায়। হাই কমাণ্ড তোমাকে চায়। তোমার কি অধিকার আছে এত মানুষের দাবি উপেক্ষা করার?"

"অধিকার আছে। বিবেকের অধিকার।"

"বিবেক! আসলে তুমি ভীরু, কাপুরুষ! দায়িত্বের ভয়ে তুমি অস্থির। কে. ডি. কোশলের ছায়ায় ব'সে মন্ত্রীত্বের চেয়ে বড় কিছু তুমি ভাবতে পার না।"

"হয়ত তাই।"

"কিন্তু কেন তুমি ভাবতে পারবে না? তোমার মত নেতা ভারতবর্ষে ক'জন আছে? তুমি কত ভাল করতে পার উদয়াচলের! কংগ্রেসের মধ্যে যে মরণ-বিষ আজ ঢুকে গেছে তুমি তাকে বার করে দিতে পার। কে. ডি. কোশলের রাজত্বে যে ভীষণ দুর্নীতি, দৌরাত্ম্য, অত্যাচার, অনাচার, আত্মীয়পোষণ হয়ে এসেছে তুমি তা সব বন্ধ করতে পার। তোমার নেতৃত্বে উদয়াচলে রামরাজত্বের সূচনা হ'তে পারে।"

"অন্তত তুমি নিজেকে রাজরাণী মনে করতে পার।"

"চিরদিন তুমি আমায় বঞ্চিত রেখেছ। কোনও আশা আমার পূর্ণ হ'তে দাও নি। আজ, মরবার আগে, তোমাকে আমি সবার উচ্চাসনে দেখতে চাই। যে গৌরব, যে সম্মান, যে মর্যাদা তোমার প্রাপ্য, তা তুমি পেয়েছ, দেখতে চাই। তুমি আজও আমাকে বঞ্চিত রাখবে। এই তোমার বিচার?"

দুর্গাভাই তিক্ত, ভারি মন নিয়ে দপ্তর-ঘরে চলে এসেছিলেন। রমণীর মনে যখন উচ্চাশার আগুন জ্বলে, তখন বুঝি বিপদ্ সমাসন্ন।

মনোরমাকে দেখে, তাঁর কথা শুনে আর একটি নারীকে মনে পড়েছিল দুর্গাভাই-এর। তিনি তাঁর স্বামীর মাথা থেকে রাজমুকুট সরিয়ে নেবার জন্যে ব্যাকুল। যে-মুকুটের জন্যে মনোরমার লোভ অসীম, তাতে তাঁর নিস্পৃহা সীমাহীন। অথচ একদিকের লোভ অন্যদিকের নিস্পৃহা: দুই-ই সমান দুর্বল।

রাজনীতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকার দরুণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দৈনন্দিন শাসনভার প্রায় সম্পূর্ণ দুর্গাভাইএর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালে বড় কোনও কাজ সরকার হাতে নিচ্ছিলেন না; নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি স্থগিত রাখা হচ্ছিল। তবু একটা প্রদেশের দৈনন্দিন শাসনের সমস্যা কম নয়। সাধারণত যে-সব বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মতামত দরকার তার প্রায় সবগুলিই এ ক'দিন দুর্গাভাইকে দেখতে হচ্ছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এ অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। অনুরোধকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নীতির প্রলেপ লাগিয়ে আরও বাধ্যতামূলক করেছিলেন। একখানা পত্রে দুর্গাভাইকে লিখেছিলেন, "মন্ত্রীসভা পদত্যাগের পর এক অনিবার্য অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। আপনি জানেন, মুখ্যমন্ত্রীত্বের জন্য আমি দলের সমর্থন চাইছি। যদি এই অনিশ্চিত সপ্তাহগুলিতে রাজকার্য আমি চালাই, কারুর কারুর সন্দেহ হ'তে পারে আমি শাসনযন্ত্রকে নিজের স্বার্থ-সাধনে বিনিয়োগ করছি। সুতরাং আমি দু'টি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। প্রথম, দৈনন্দিন শাসন-নেতৃত্বের দায়িত্ব অন্তবর্তীকালে আপনাকে গ্রহণের অনুরোধ করা। দ্বিতীয়ত, কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে না চাইলে তাকে ক্যাবিনেটে উত্থাপন করা। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ইচ্ছে বা প্রয়োজন হ'লে আপনি সর্বদা আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। না করলেও আমি আপত্তি জানাব না, কারণ উদয়াচলের স্বার্থ আপনার হাতে ন্যস্ত থাকলে আমার বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তার কারণ থাকবে না। আশা করি আমার এ অনুরোধ আপনি রক্ষা করবেন।"

পত্রখানা সারা ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

দুর্গাভাই সরকারের দৈনন্দিন দায়িত্ব গ্রহণে আপত্তি

জানান নি। মন্ত্রীসভা পুনর্গঠনের ব্যাপারে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আগাগোড়া তাঁকে শ্রদ্ধা, সম্মান ও সমীহ ক'রে আসায় তিনি প্রীত হয়েছিলেন। দুর্গাভাইএর চরিত্রের দুর্বলতাটুকু কৃষ্ণদ্বৈপায়নের যতটা জানা ছিল তাঁর নিজের ততটাই ছিল অজানা। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানতেন দুর্গাভাইএর কঠিন নীতিবোধ ও কৃচ্ছ্রসাধনার পশ্চাতে রয়েছে তীক্ষ্ণ আত্মাভিমান দুর্বলের, দুষ্টের প্রশস্তির উদ্দেশ্য তিনি বুঝতে পারতেন, কিন্তু যোগ্যের কাছে প্রশংসা ও সুখ্যাতির ওপর তাঁর দুর্বলতা প্রচণ্ড।

আজ সারা সকাল দুর্গাভাই সরকারী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এরই মধ্যে বিলাসপুরের রাজনৈতিক সংঘাত কয়েকবার তাঁকে স্পর্শ করে গেছে। কাজের মধ্যে একবার সুদর্শন দুবে টেলিফোন করেছিলেন, দুর্গাভাইকে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীত্বের জন্যে দাঁড়াবার পুনর্বার অনুরোধ। দুর্গাভাই অনুরোধ রাখতে অসামর্থ্য জানিয়ে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় টেলিফোন এসেছিল এক অপ্রত্যাশিত ব্যক্তির কাছ থেকে।

তাঁর নাম হরিশংকর ত্রিপাঠি।

"নমস্তে দুর্গাভাইজি। আমি ত্রিপাঠি বলছি। হরিশংকর ত্রিপাঠি।"

"নমস্তে। বলুন।"

"খুব ব্যস্ত আছেন?"

"না। ব্যস্ত কোথায়?"

"আপনাকে একটা ফাইল পাঠিয়েছি। হিন্দুস্থান অটোমোবাইল কোম্পানীর নতুন কারখানা বিষয়ে।"

"ফাইল আমি পড়েছি।"

"এ বিষয়ে ক্যাবিনেটে একবার আলোচনা হয়ে গেছে। কোম্পানী বিলাসপুরের কয়েকজন ব্যবসায়ী গঠন করেছেন। সরকারী ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব ক্যাবিনেট মঞ্জুর করেছেন। এখন বাকী কাজটা শেষ হয়ে গেলে ভাল হয়।"

"কিন্তু, ত্রিপাঠিজি, এ ব্যাপারটা নিয়ে কতগুলি অভিযোগ কাগজে বেরিয়েছে।"

"মিথ্যা অভিযোগ।"

"তা হ'তে পারে। আমার মনে হয়, এ বিষয়টা বর্তমানে স্থগিত থাক। নতুন ক্যাবিনেট সব বিষয় পুনর্বিবেচনা ক'রে যা কর্তব্য করতে পারবেন।"

"কিন্তু, দুর্গাভাইজি, আমি যে ওদের কথা দিয়েছি—"

"সে কথার কি এখন কিছু দাম আছে, ত্রিপাঠিজি? আজ বাদে কাল আপনি বা আমি মন্ত্রীসভায় থাকব কি না তার নিশ্চয়তা নেই। আবার আপনি হয়ত মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসবেন। ব্যাপারটা কিছুদিনের জন্যে স্থগিত থাকলে ক্ষতি হবে না। অন্তত আমার ত তাই মত। আপনি অবশ্য কোশলজিকে ব'লে দেখতে পারেন।"

"কোশলজিকে ব'লে কিছু লাভ নেই। আপনি যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তখন দেখছি আর কিছু করার নেই।"

"কসুর মাপ করবেন।"

"না, না। তারপর ব্যাপার কেমন দেখছেন?"

"কোন্ ব্যাপার?"

"এই মন্ত্রীসভার?"

"আমি আর দেখছি কৈ? দেখছেন, দেখাচ্ছেন ত আপনারা!"

"আপনি কি সত্যি উদয়াচলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে রাজী নন?"

"রাজী না-রাজীর কথা নয়, ত্রিপাঠিজি। যোগ্য নই।"

"তা হ'লে কোশলজিকে হারাবার উপায় রইল না।"

"আমার মতে, ত্রিপাঠিজি, কোশলজি হারবার পাত্র নন।"

"আপনাকে পেলে আমরা ওকে হারাতে পারতাম।"

"তাতে আপনাদের জয় হ'ত; আমার নয়।"

"আপনি শেষ পর্যন্ত কোশলজিকেই সমর্থন করবেন?"

"না। আমি কাউকে সমর্থন করব না।"

"আমার একটা অনুরোধ আছে, দুর্গাভাইজি।"

"বলুন।"

"একজনকে আপনার কাছে পাঠাতে চাই। আপনি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন?"

"কাকে?"

"এক মহিলাকে।"

"মহিলা? কে তিনি?"

"তিনি একজন নামকরা শ্রমিক-নেত্রী। উদয়াচলের আই. এন. টি. ইউ. সির সভানেত্রী।"

"ও। সরোজনী সহায়?"

"জি।"

"আমার কাছে তাঁর কি কাজ?"

"তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।"

"আজকাল আমার সময় বড় কম। কি ব্যাপারে দেখা করতে চান জানলে ভাল হ'ত।"

"দুর্গাভাইজি, সরোজিনী সহায় উদয়াচলের রাজনীতিতে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় কাজ করবে। এ আমার ভবিষ্যদ্বাণী নয়। তার সঙ্গে আলাপ করলে আমার কথার সত্যতা আপনি যাচাই করতে পারবেন।"

"বেশ। তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন।"

"কখন?"

"কাল কোনও সময়ে।"

"কাল সরোজিনী কানপুর যাবে। আজ হ'লে ভাল হ'ত।"

"বেশ। আজ বিকেল চারটের সময়।"

আহারান্তে দুর্গাভাই মেহতা বাগানে পাইচারি করছিলেন। মন সর্বদা অশান্ত: কোথায় যেন, সবকিছুর মধ্যে, মস্ত বড় ফাঁক আর ফাকি। আসলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে। দুর্গাভাই ইতিহাসের ছাত্র নন, কিছু পাঠ করেছেন সযত্নে দীর্ঘকাল ধরে জেলে, জেলের বাইরে। ভারতবর্ষের ধারাবাহিক কোনও ঐতিহাসিক পরিচয় নেই। সম্রাটদের কাহিনীর ঔজ্জ্বল্যে প্রজাদের চেনা যায় না। বড় বড় আলোকিত দীপমালার মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস অনন্ত-প্রবাহিত অসীম গভীর কাল-সমুদ্র। আমাদের চিন্তাধারায়ও, তাই, কালাতীত বিরাটতা আছে, বস্তুনিষ্ঠ, বাস্তবানুগ চিন্তার স্বাক্ষর নেই। আমরা বাস্তবের চেহারা দেখতেই রাজী নই, বাস্তব থেকে পালাবার ইচ্ছা আমাদের মজ্জাগত। তাই আমাদের মুখে যত সহজে নীতির ললিতবাণী উচ্চারিত হয় তত সহজে নীতি বাস্তবে পরিণত হ'তে চায় না। আমরা বৃহতের স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি, বড়র মাহাত্ম্য আমাদের সম্মোহিত ক'রে রাখে; ছোট ছোট কাজের সুচারু সম্পাদনে আমাদের ধৈর্য নেই, আগ্রহ নেই। কোনও কিছুতে আমাদের গভীর, আন্তরিক বিশ্বাস নেই। কোনও কিছু ভাল ক'রে, পূর্ণ ক'রে সম্পূর্ণ করার আগ্রহ আমাদের নেই। অর্ধেক সফলতাতেই আমরা পরিতৃপ্ত; সব কিছু বিফলতার কারণ সংগ্রহে আমরা সহজ-পটু। পাঁচ বছরের মন্ত্রীত্বে দুর্গাভাই প্রতি পদে এ-সব দেখে এসেছেন। কোনও কিছুই কেন যেন পরিপূর্ণভাবে ক'রে ওঠা গেল না এ পাঁচ বছরে। নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ হ'ল, হাসপাতাল হ'ল; অথচ রুগীরা এখনও অচিকিৎসায়, বিনা চিকিৎসায় শত শত মরছে; ডাক্তাররা কাজে ফাঁকি দিচ্ছে, রুগীর প্রতি তাদের প্রাণের দরদ নেই। শিক্ষকদের মাইনে বাড়ান হ'ল, কিন্তু শিক্ষার উন্নতি দেখা গেল না। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অমন সাধের বিদ্যামন্দিরগুলি ব্যর্থ প্রচেষ্টার করুণ সাক্ষী। বাঁধ তৈরী হ'লে তাতে ফাটল দেখা দেয়; নতুন তৈরী রাস্তা এক বছরে গর্তে গর্তে কুৎসিত হয়ে ওঠে; গোয়ালা ক্রমাগত দুধে জল মেশায়; ব্যবসায়ীরা খাদ্যে ভেজাল মেলায়।

দুর্গাভাই-এর ধারণা ভারতবর্ষের আসল অভাব চরিত্রের। ছ' হাজার বছরের একটানা বেঁচে থাকায় জাতির চরিত্রে দারুণ ঘূণ ধ'রে গেছে। অথচ তিনি নিজে দেখেছেন স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দেশের ঘরে ঘরে চরিত্রের আশ্চর্য বিকাশ হয়েছিল। অত বড় আলো এত শীঘ্র কেন নিভে গেল দুর্গাভাই আর একবার এই হতাশ প্রশ্নের জবাব খুঁজে ব্যর্থ হলেন। কোথায় যেন মস্ত ফাঁকি আত্মগোপন ক'রে আছে। স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই এত সহজে এমন লোভী হয়ে উঠলাম কি করে? আজ যে মন্ত্রীত্ব নিয়ে এমন এক জঘন্য লড়াই চলেছে, আমাদের মধ্যে এমন একজনও কেন নেই যিনি ক্ষমতা ত্যাগ করবার জন্যে নিঃসংকোচে প্রস্তুত! কেন আমিও পারছি না সর্বকিছু ছেড়ে দিয়ে গ্রামে গিয়ে জনসেবায় বাকী জীবন কাটিয়ে দিতে? কিসের এই নিদারুণ মোহ—কোন্ সুরার এই অনির্বাণ নেশা?

দুর্গাভাইএর মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। শরীর অসুস্থ বোধ হ'ল। বাগানে কয়েকখানা চেয়ার পাতা ছিল। তিনি বসলেন। চিন্তায়, ভাবনায়, কাজের চাপে দেহ ক্লান্ত, মন অবসন্ন।

মনোরমার দোষ নেই। সে চিরদিন চেয়েছে সুখ, মান, প্রতিপত্তি, অর্থ, বিলাসিতা। বড় লোকের ঘরে সুপাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। জীবনের সকল ভোগ-বিলাসের নিশ্চিত অধিকার নিয়ে সে দাম্পত্য জীবন সুরু করেছিল। কিন্তু ভাগ্য তার জীবনকে অন্য পথে নিয়ে গেল। আমি নেমে গেলাম স্বদেশী করতে; তার জীবনে আরম্ভ হ'ল অনিচ্ছুক আত্ম-নির্যাতনের পালা। দারিদ্র্য, সংযম, ক্লেশ কোনওদিন যে চায় নি আমি দীর্ঘকাল তাই তার জীবনে বোঝাই ক'রে চাপিয়ে দিলাম। অন্য দেশ হ'লে মনোরমা স্বামী ত্যাগ ক'রে অন্য জীবন বেছে নিত। ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দু সমাজে তা সম্ভব ছিল না। তাকে কেবল আমার জীবনের তিক্ত সহগামিনী হ'তে হয় নি, আমার সন্তানের জন্ম দিতে হয়েছে, যে-সন্তানদের, একমাত্র বসন্ত বাদে, সে তার নিজের অতৃপ্ত ক্ষুধার তপ্ত জ্বালা দিয়ে মানুষ করেছে। গত পাঁচ বছরে মনোরমা অনেকাংশে তার প্রাচীন ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করেছে। পারে নি। মন্ত্রীর সামান্য বেতনের বেশি অর্থ তার হাতে পৌঁছয় নি। অন্য মন্ত্রীদের বিত্ত হয়েছে, অর্থ জমেছে, বাড়ী হয়েছে, ছেলেরা বড় চাকরি পেয়েছে, ব্যবসা ফেঁদে প্রচুর রোজগার করছে। অথচ দুর্গাভাই দেশাই দরিদ্র, তাঁর নিজের ঘরবাড়ী নেই, সন্তানদের জন্যে তিনি কিছু করতে পারেন নি। এই পাঁচ বছরে মনোরমার সঙ্গে বোধকরি এক সপ্তাহও তাঁর সদ্ভাবে কাটে নি। এখন তার জিদ চেপেছে সে উদয়াচলের মুকুটহীন রাণী হবে! আমাকে মুখ্যমন্ত্রীর সিংহাসনে বসিয়ে সে তার আজীবন গৌরব-লোভ চরিতার্থ করবে। অথচ সে জানেও না, তার বোঝবার ইচ্ছে নেই, ক্ষমতা নেই, কেন আমি মুকুট হাতে পেয়েও মাথায় পরতে রাজী নই। এ জীবনের পরিণত শেষ বছরগুলিতে এতকালের সংরক্ষিত একমাত্র সম্বলটুকু লোভে পড়ে আমি হারাতে রাজী নই।

বাগান থেকে ঢালু রাস্তার নীচ পর্যন্ত অনেকখানি দেখা যায়। দুর্গাভাই হঠাৎ দেখতে পেলেন বেশ দূরে একটি লোক উঠে আসছে। আগন্তুকদের বেশির ভাগ আসে হয় মোটর গাড়িতে নয় সাইকেল রিক্শায়। পায়ে হেঁটে আসে সাধারণত কুলি-মজুর, চাকর-বাকর। চাপরাশীরা আসে সাইকেল, যতক্ষণ পারে সাইকেল চালিয়ে, তারপর সাইকেল টেনে তুলে। বাগানে ব'সে দুর্গাভাই অনেকবার দেখেছেন আরোহী-সহ সাইকেল-রিক্শা টেনে তুলছে ঘমাক্ত মানুষ, আরোহী নেমে গিয়ে তার ভার লাঘব করা বাহুল্য মনে করেছে। আজ যে লোকটি পায়ে হেঁটে পাহাড়ী রাস্তা উঠে আসছে সে ভদ্রসন্তান। পরণে পায়জামা, সার্ট, জবাহর-কোট। উঠে আসছে মাথা নীচু করে, পিঠ বেঁকে, একটানা পায়ের পর পা এগিয়ে। অপরাহ্নের রোদ পড়েছে সারা রাস্তায়। আকাশ নেমে এসেছে রাস্তার শেষে। নীল আকাশের পটভূমিতে বাঁকা উঁচু পথে লোকটির উঠে-আসা দেখতে দুর্গাভাইএর কেমন ভাল লাগল। মনে হ'ল, মানুষ বুঝি এমনি জীবন-পথে উঠে আসে, নিজের আনন্দিত পরিশ্রমে, নীল আকাশের উদার অসীমকে পটভূমি ক'রে।

সমস্ত উঁচু পথে উঠে এসে লোকটি ক্লান্ত হয়ে খানিক দাঁড়াল। বাংলো থেকে তখনও সে প্রায় আধ ফার্লং দূরে। দু'-চার মিনিট দম নিয়ে আবার সে এগোতে লাগল। হঠাৎ থেমে তাকাল গাছের ডালে। বুঝি-বা দেখল কোনও গান গাওয়া পাখী। রইল দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ। আবার এগোতে লাগল। আবার থামল। ছোট্ট এক প্রায়-উলঙ্গ ছেলে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে কি যেন বলল। পকেট থেকে কি যেন বার ক'রে দিল তার হাতে। নিশ্চয় পয়সা। এবার বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এল। থামল এসে একেবারে বাড়ীর দরজায়। ফাটক খুলে ঢুকতে যাবে এমন সময় নজর পড়ল বাগানে চেয়ারে গা এলিয়ে-বসা দুর্গাভাই-এর ওপর। বিব্রত হয়ে থমকে দাঁড়াল।

দুর্গাভাই বললেন, "চন্দ্রপ্রসাদ যে। এস, এস।"

ফাটক বন্ধ ক'রে চন্দ্রপ্রসাদ এগিয়ে এল। দুর্গাভাই-এর হাঁটু স্পর্শ ক'রে প্রণাম জানাল।

"তারপর? পায়ে হেঁটে যে?"

"আমি ত পায়েই হাঁটি কাকাবাবু।"

"তাই নাকি?" দুর্গাভাই হেসে ফেললেন। "মুখ্য-মন্ত্রীর পুত্ররা পায়ে হাঁটে, এটা খবর বটে।"

"কাকাবাবু, আমি পায়ে হাঁটি, আবার পাখায় উড়িও।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। তুমি ত পাইলট।"

"আপনার শরীর সুস্থ আছে ত, কাকাবাবু? অনেকদিন পরে আপনাকে এমন একা দেখতে পেলাম।"

"শরীরের কথা এ-বয়সে না তোলাই ভাল। একটু আগে হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল। তাই এসে একটু বসেছি।"

"আপনাদের মাথা, কাকাবাবু, তাই সময়-অসময়ে এক-আধটু ঘোরে। আমি যদি মন্ত্রী হ'তাম আমার মাথা দিনরাত বনবন ক'রে ঘুরত।"

"তুমি যাঁর পুত্র, তাঁর মাথা কদাচ ঘোরে না।"

"পিতাজির কথা বলছেন, কাকাবাবু?"

"উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলছি।"

"তাঁকে ত আমি চিনি না, কাকাবাবু। তাঁকে আপনি. আপনারাই চেনেন।"

"তুমি তাঁকে চেন না?"

"না। আমি আমার পিতাজিকে এক-আধটু চিনি। এবং তাঁর মাথা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মাথা ভগবান আমায় দেন নি।"

"তাই নাকি? বসো, বসো। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে। হালকা কথা, হাসির কথা আজকাল শুনতেই পাই না।"

"মন্ত্রীরা বুঝি হাসেন না, কাকাবাবু?"

"নিশ্চয় হাসেন। দেখ না, আমি তোমার কথা শুনে কেমন হাসছি।"

"আমিও বন্ধুদের তাই বলি। বলি, মন্ত্রীরা শুধু হাসেন না, হাসানও।"

"কাদের?"

"দেশশুদ্ধ সবাইকে। সারা দুনিয়াকে।"

"তাই বুঝি? তোমরা সবাই আমাদের নিয়ে হাস?"

"না, কাকাবাবু, কখনও না। আপনি আমাদের নমস্য।"

"সর্বনাশ। তোমাদেরও।"

"কাকাবাবু, দেবতাদের দুরবস্থা দেখুন। চোরও যদি পূজা দেয়, ঠেলতে পারেন না। আপনি আমাদের যতই অযোগ্য মনে করুন, নমস্য না হবার অধিকার আপনার নেই।"

"আচ্ছা, আচ্ছা। মানলাম। তা, বল দেখি ব্যাপার-স্যাপার চলছে কেমন?"

"আমার? যেমন চিরদিন চলে আসছে। পায়ে হেঁটে।"

"আর আমাদের?"

"ঝড়ের বেগে।"

"তাই নাকি? আমি ত ঝড় দেখতে পাচ্ছি নে।"

"ঝড় ত আছেই, কাকাবাবু। তবে মহীরুহ উৎ-পাটিত হচ্ছেন না।"

"ঠিক বলছ?"

"কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলকে তাঁর প্রতিপক্ষ চেনে না। তিনি ভাঙবেন, কিন্তু নত হবেন না।"

"এবার তিনি ভাঙছেন মনে হচ্ছে না।"

"আপনার আন্দাজের সঙ্গে আমার আন্দাজ মিলে যাচ্ছে কাকাবাবু।"

"তবু আমি মনে করি কোশলজি ঠিকপথে যাচ্ছেন না।"

"কেন?"

"আমি যদি তাঁর অবস্থায় পড়তাম, মন্ত্রীসভার পদত্যাগের পর হাই কমাণ্ডকে জানাতাম, হয় একেবারে নিজের পছন্দমত নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের অনুমতি চাই, নয়ত মুখ্যমন্ত্রীত্বে আমার প্রয়োজন নেই।"

"এ পরামর্শ পিতাজিকে আপনি দিয়েছিলেন, কাকাবাবু?"

"দিয়েছিলাম। কংগ্রেস-সভাপতি যখন বিলাসপুরে এসেছিলেন, তখন।"

"কি বললেন তিনি।"

"যা চিরদিন আমায় বলে এসেছেন। আমার

আদর্শবাদ তিনি শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু রাজনীতি আমি বুঝি না।"

"আপনার সঙ্গে আমার এ বিষয়ে মিল আছে। রাজনীতি আমিও বুঝি না, কাকাবাবু।"

"তোমার ভাই-রা ত বেশ বোঝে।"

"তারা বুদ্ধিমান। আমার ও পদার্থের কিঞ্চিৎ অভাব।"

"তোমার মাতৃদেবী কেমন আছেন, চন্দ্রপ্রসাদ?"

"সুস্থ আছেন, কাকাবাবু। কাল সকালে কাশী যাচ্ছেন।"

"কাশী? হঠাৎ?"

"আজ দুপুরে পিতাজিকে পদত্যাগের অনুরোধ করেছিলেন।"

"কিসের?"

"মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণ না করার। ভোটে জিতে, মুখ্যমন্ত্রীত্ব অন্য কাউকে দেবার।"

"তাই নাকি? তারপর?"

"পিতাজি রাজী হন নি।"

"তাই ভাবীজি কাশী যাচ্ছেন?"

"জি, কাকাবাবু।"

"তোমার মাতৃদেবী মহাপ্রাণা, চন্দ্রপ্রসাদ।"

"আমিও তাই মনে করি, কাকাবাবু।"

"সঙ্গে কে যাচ্ছে?"

"বাড়ীতে বেকার একমাত্র আমি। আমিই যাচ্ছি।"

"বেশ করছ। তুমি পুত্রের কাজ করছ।"

"মা আপনাকে একখানা পত্র দিয়েছেন।"

"পত্র! আমাকে? দাও।"

"আমি ভেতরে যেতে পারি, কাকাবাবু?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। যাও, ভেতরে যাও। তোমার কাকীমা বোধকরি দিবানিদ্রা দিচ্ছেন। কিন্তু বসন্ত আছে। যাও।"

চন্দ্রপ্রসাদ বাড়ীর ভেতরের দিকে পা বাড়াল। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, "কাকাবাবু, আপনি একমাত্র মন্ত্রী, যাঁর বাড়ীর দরজায় পুলিস পাহারা নেই। অর্থাৎ আপনি কারাবন্দী নন। মুক্ত মানুষ। আমাদের মত লোফাররাও বিনা বাধায় আপনার বাড়ী ঢুকতে পারে। আর যে-কেউ যখন খুশি বাড়ী থেকে বাইরে যেতে পারে।"

দুর্গাভাই দেশাই মৃদু হাস্যে একবার তাকালেন। পরক্ষণে, পদ্মাদেবীর পত্রে মনোনিবেশ করলেন।

দেখতে পেলেন না, মনোরমা বাড়ীর অন্যতম ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে বসলেন। চমকে উঠলেন, গাড়ি যখন ষ্টার্ট নিল। গাড়ি দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হ'ল। দুর্গাভাই জানতে পেলেন না মনোরমা কোথায় গেলেন। জানবার ইচ্ছেও হ'ল না।

পদ্মাদেবীর পত্র সংক্ষিপ্ত। পড়তে দু'মিনিট লাগল। লিখেছেন, "মাননীয় দুর্গাভাইজি, চন্দ্রপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে আমি কাল প্রাতে ৺বারাণসী যাচ্ছি। কিছুদিন থাকবার ইচ্ছে। হয়ত আর নাও ফিরতে পারি। পবিত্র কাশীধামে মরতে পারলে বিশ্বনাথের চরণে স্থান পাব। যাবার আগে ওঁকে আমার শেষ অনুরোধ জানিয়েছিলাম। উনি রাখতে পারেন নি। ওঁর ভার আমি ভগবানের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। আর কিছুটা আপনার ওপর। দেখবেন, এত বড় মানুষটা যেন অনেক নীচে না নেমে যান।

"আপনাকে আমার আর একটি অনুরোধ আছে। আমার পুত্রদের মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে দুর্গাপ্রসাদ আর চন্দ্রপ্রসাদের। দুর্গাপ্রসাদ অন্য পথ বেছে নিয়েছে। চন্দ্রপ্রসাদ বিমান বিভাগে কাজ পেয়েছে। পিতার কোনও সাহায্য না নিয়ে নিজের যোগ্যতায় সে মানুষ হ'তে চাইছে। সে যদি কোনও প্রার্থনা নিয়ে আপনার দরবারে হাজির হয়, তাকে নিতান্ত অযোগ্য মনে না করলে, অনুগ্রহপূর্বক ব্যর্থ করবেন না।"

॥ পনের ॥

বিলাসপুর শহরের কোনও সহজ-পরিচয় কেন্দ্রস্থল নেই, যেমন আছে কলকাতার চৌরঙ্গী, বোম্বাই-এর চার্চ-গেট, নতুন দিল্লীর কনট প্লেস। যে-অংশে ঐতিহাসিককালের মারাঠা দুর্গ, তার মাইলখানেক দূরে পুরাতন বাজার। হাল আমলে আর এক বাজার-বিপণি কেন্দ্র গ'ড়ে উঠেছে সদর-অঞ্চলে, এখানটা শহরের ফ্যাশন-পাড়া। অর্থাৎ চমকপ্রদ দোকানপাট এ অঞ্চলে। এখানকার বড় রাস্তার নাম এককালে ছিল

সদর রোড; স্বাধীনতার পরে হয়েছে লিবার্টি রোড। এ রাস্তায়ই লিবার্টি সিনেমা। সিনেমার ডানদিক্ দিয়ে কিছু পথ এগোলে এক সারি কতকগুলি দোকান— রেডিও, বই, দর্জি, কাপড়-জামা ইত্যাদির। এই দোকানগুলির সামনে দিয়ে বেরিয়েছে আর একটা গলি ভেতরের দিকে। এ গলির প্রান্তদেশে "মর্ণিং টাইমস্" পত্রিকার দপ্তর এবং ছাপাখানা।

বাড়ীটা খুব সাধারণ। একতলা একটানা বাড়ী। টিনার ছাদ। মেঝে মাঝে মাঝে ভেঙ্গে গিয়ে দাঁত-বার-করা মাটির কুৎসিৎ ভেংচানি। বাড়ীটা এককালে ছিল মাধ্যমিক বিগ্যালয়। ঘরগুলি পর-পর পাশাপাশি। প্রথম ঘরে বিজ্ঞাপন-ম্যানেজার, অ্যাকাউন্টেন্ট এবং সার্কুলেশন ম্যানেজার একসঙ্গে বসে। দ্বিতীয় ঘর সম্পাদক সুভাস চট্টোপাধ্যায়ের। তৃতীয় ঘরে দু'জন সহকারী সম্পাদক এবং সম্পাদকের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী। চতুর্থ ঘর রিপোর্টারদের। পঞ্চম ঘরখানা সবচেয়ে বড়: এখানে সাব-এডিটরদের দপ্তর। টেলি-প্রিন্টর মেশিনের অবিরাম আওয়াজ। তারপরে ছোট্ট অন্ধকার একটুকরো ঘরের মধ্য দিয়ে পেছনের দিকে ছাপাখানায় যেতে হয়। ছাপাখানায় একটা লাইনো মেশিন এবং অনেকগুলি হাতে-ছাপার কেস। 'মর্ণিং টাইমস' লাইনো ও হাতে-ছাপার মিশ্রিত উৎপাদন। রোটারী নেই, বড় দুটো ইলেকট্রিক ট্রেড্‌ল্ মেশিনে কাগজ ছাপার ব্যবস্থা। মুখ্যমন্ত্রীর কাগজ হ'লেও 'মর্ণিং টাইমসের' প্রচার মাত্র সাত হাজার। রোটারীর প্রয়োজন হয় না।

কাগজের পরিচালনার জন্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে-ব্যবস্থা করেছিলেন তাকে ক্রটিহীন বলা চলে না। আইনত 'মর্ণিং টাইমসের' মালিক অম্বিকাপ্রসাদ কোশল। ম্যানেজিং এডিটর হিসেবে রোজ কাগজে তাঁর নাম বেরোয়। ম্যানেজারদের ঘরে তার জন্যে নির্দিষ্ট টেবিল-চেয়ারও আছে। কিন্তু কার্যত অম্বিকাপ্রসাদ কাগজের জন্যে কিছুই করে না। সম্পাদকীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার যোগ্যতা তার নেই। ব্যবসা সে বোঝে না। মাসে দু'-একদিন কিছুক্ষণের জন্যে সে আসে, চ্যাটার্জির ঘরে বসে গল্প করে, চা খায়। ম্যানেজারদের সঙ্গে দু'-চারটা কথা ব'লে বিদায় নেয়। কখনও-সখনও টাকার বিশেষ প্রয়োজন হ'লে তার দেখা পাওয়া যায়। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আদেশ আছে তাকে কাগজের ম্যানেজিং এডিটর হিসেবে মাসে দু' শ টাকা পর্যন্ত দেবার। কিন্তু কোনও মাসেই সে পুরো টাকা নেয় না।

সম্পাদকীয় দায়িত্ব পুরো সুভাস চট্টোপাধ্যায়ের। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাকে কাগজ চালাবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। সপ্তাহে একদিন সুভাস তাঁর সঙ্গে দেখা করে। কাগজ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রাদেশিক রাজনীতির ব্যাখ্যা করেন। কি কি বিষয়ে কিভাবে সম্পাদকীয় লিখতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে দেন। বড় কোনও সংবাদ থাকলে সুভাসকে ডেকে পাঠান। একজন রিপোর্টার, সীতাচরণ পণ্ডিত, সর্বদা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নির্দিষ্ট নীতির চতুঃসীমানায় কাগজের দৈনন্দিন পরিচালনার দায়িত্ব পুরোপুরি সম্পাদকের। সম্পাদকীয় বিভাগে নিয়োগ, বেতন-বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়েও সুভাস চট্টোপাধ্যায়ের কথাই মেনে চলা হয়।

সম্পাদনার বাইরে কাগজের সত্যিকারের পরিচালনার ভার জগন্মোহন তিওয়ারীর। নিউজ প্রিন্ট কেনা, ব্যবসাদারদের সঙ্গে সংযোগ করা, বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা, ছাপাখানার নানা সমস্যা সমাধান: সবই তিওয়ারীকে করতে হয়। এই আশ্চর্য কর্ম-ক্ষমতাবান মানুষটি রোজ একবার "মর্ণিং টাইমস" দপ্তরে আসে। তার জন্য কোনও নির্দিষ্ট বসবার স্থান নেই। সে ঘরে ঢুকলেই দু'জন ম্যানেজার চেয়ার ছেড়ে দেয়। কখনও সে বসে বিজ্ঞাপন ম্যানেজারের চেয়ারে, কখনও বা সার্কুলেশন ম্যানেজারের। সেখানকার কাজ সেরে সোজা চলে যায় ছাপাখানায়। ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে বিদায় নেবার পথে সুভাস চট্টোপাধ্যায়ের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে "এডিটর সাহেব কোনও সেবা করতে পারি কি?" সুভাসের কোনও কিছু বলবার থাকলে ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে। "সমস্যা"র সমাধানে তিওয়ারী যাদুকর। লাইনো মেশিনের মেরামত দরকার—কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মিস্ত্রী এসে হাজির হয়। নিউজ প্রিন্ট মাত্র তিনদিনের আছে—

তৃতীয় দিনেই নতুন সাপ্লাই এসে হাজির। কোনও সাব-এডিটর এ্যাডভান্স কিছু টাকা চায় অথচ ক্যাশিয়ারের কাছে টাকা নেই; মণিব্যাগ থেকে তিওয়ারী টাকা বার করে দেয়। যদি-বা কখনও এমন কোনও সমস্যা দেখা দেয় যা তার সমাধানের বাইরে, সে বলে, "কোশলজির সঙ্গে কথা বলে আপনাকে কাল জানাব"। এবং কাল সাধারণত পর্শু হয় না।

তিওয়ারীর মত কর্মঠ, বিশ্বস্ত ও অনুগত সেবক সচরাচর দেখা যায় না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল ছাড়া তার জীবনে আর কিছু নেই। কোনওদিন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সামান্য সমালোচনাও কেউ তার মুখে শোনে নি। তাঁর প্রশংসা করবারও প্রয়োজন হয় না জগন্মোহন তিওয়ারীর। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই যেন তার মনে জাগে না; নিঃপ্রশ্ন নিরুত্তর আনুগত্যে তাঁর সেবাতেই সে পরিতৃপ্ত। জগন্মোহন তিওয়ারীর যে স্ত্রীপুত্রপরিবার বাড়ীঘর কামনা-বাসনা-ব্যথা-আনন্দ আছে একমাত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল ছাড়া আর কারুর মনে বোধকরি তা উদয়ও হয় না। সুভাষ চট্টোপাধ্যায় মাঝে-মধ্যে তাকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে গিয়ে বোবা জবাব পেয়ে নিরস্ত হয়েছে; নিজের কোনও কথাই যেন তিওয়ারীর বলার নেই, অনুভব করার নেই। ভোর সকালে সে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের গৃহে হাজির হয়; প্রভাতে গাত্রোত্থান ক'রে বাইরে এসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেখতে পান সে হাজির; রজনীর অর্ধেকের বেশি প্রায়ই তার কাটে মুখ্যমন্ত্রীর কাজে, সেবায়, না-হয় আদেশের অপেক্ষায়। সকাল-বেলা যেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জগন্মোহন তিওয়ারী নামক রবোটের গায়ে দম লাগিয়ে দেন; দীর্ঘ-অগ্রসর রাত্রি পর্যন্ত তাঁর হাতে দম দেওয়া রবোট একটানা চলে।

সেদিন অপরাহ্নে সুভাষ চট্টোপাধ্যায় নিজের ঘরে টেবিলে বসে টাইপ-রাইটারের ওপর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখছিল। এ কাজ তাকে রোজ করতে হয়, এবং রোজই করবার সময় সে অন্য-মানুষ হয়ে যায়। দেশের বা বহির্দেশের নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে তার নিজের ধ্যানকে বহুজনের মনে সঞ্চারিত করবার সময় আপনার বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেচনার দৈন্যের সঙ্গে কর্তব্যের অলঙ্ঘনীয় দাবি মিশে গিয়ে এক অনধিগম্য অনুভূতি সৃষ্টি করে। কেবল মনে হয়, আমার এমন কি যোগ্যতা আছে, যে নিজের বিচার বহুমানসে ব্যাপ্ত করতে যাচ্ছি? আজ যা লিখছি, ছাপার অক্ষরে সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত অবয়বে সে ত আমার বক্তব্য নয়, একখানা পত্রিকার মন্তব্য! কয়েক হাজার মানুষ তা পড়বে, তাদের চিন্তাধারা তার দ্বারা প্রভাবিত হবে; এই প্রভাব বিস্তারের যোগ্যতা কি আমার আছে?

আজও প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে একই সন্দেহ সুভাষের মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছিল। নিত্যকার এ ভার তার সহনীয় হয়ে গেছে; এ ভারটুকু আছে বলেই, সে জানে, তার সম্পাদকীয় পাঠকের মন স্পর্শ করে। আশ্চর্য, এ ভারটুকু সর্বাগ্রে যিনি টের চেয়েছিলেন, তাঁর নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল। সুভাষ তখন সবেমাত্র "মর্ণিং টাইম্‌সে"র সম্পাদনা গ্রহণ করেছে। প্রথম সম্পাদকীয় লিখতে গিয়ে অন্তরে সে এ গুরুভার সর্ব-প্রথম টের পেয়েছে। যে-সব পাঠকদের সে চেনে না, জানে না, চেনবার জানবার কোনও উপায় পর্যন্ত নেই, অথচ যাদের সঙ্গে প্রতিদিন সকালে তার নৈর্ব্যক্তিক পরিচয় অনিবার্য, তাদের কাছে তার কুমারী নিবন্ধ দিয়ে সে জবানবন্দী রচনা করেছিল। সম্পাদকীয়ের নাম দিয়েছিল, "এ পেপার এ্যাণ্ড দ পিপল"—পত্রিকা ও জনসাধারণ। লিখেছিল, "সংবাদপত্রের কর্তব্য পাঠকদের কাছে রোজকার দেশ-বিদেশের সংবাদ পৌঁছে দেওয়া। সম্পাদকের কর্তব্য নির্দিষ্ট ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা; দেশ-বিদেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা। এ আলোচনা সম্পাদক ও পাঠকের মধ্যে দৈনন্দিন ভাব আদান-প্রদানের সেতু। পত্রিকার মন্তব্য কোনও ব্যক্তি-বিশেষের মন্তব্য নয়; তার মূল্য প্রাতিষ্ঠানিক। সম্পাদকের এমন কোনও অবধারিত ক্ষমতা নেই যা তাকে বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল পাঠকের ঊর্ধ্বে আসন দিতে পারে। দুনিয়াদারীর সঙ্গে বুদ্ধিগত, পেশাগত পরিচয় তার বেশি ব'লে সে হয়ত কোনও কোনও বিষয়ের তাৎপর্য বেশি বোঝে; কিন্তু পাঠক-মন প্রভাবিত করবার সময় সর্বদা প্রতি ছত্রে সে নম্র বিনয়ে মার্জনা চেয়ে থাকে। ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে নিত্য নতুন সমস্যার সঙ্গে নবগঠিত দেশীয় সরকারের

অবিরাম সংঘাত, যেখানে অনভ্যাসে অলস মানুষকে প্রতিদিন নতুন নতুন দেশী-বিদেশী ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হয়, সংবাদপত্র সম্পাদক কামনা করে পাঠকের সঙ্গে নিবিড় কথোপকথন, সম্পাদকীয় স্তম্ভকে জনসভার মঞ্চে পরিণত ক'রে বক্তৃতার সন্দেহজনক আত্মপ্রীতি নয়।"

পরের দিন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সঙ্গে দেখা করতে গেলে প্রথমে দু'-চারটে কুশল প্রশ্নের পর তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "সাহিত্য কর নাকি?"

"আজ্ঞে না।"

"বাঙ্গালী মাত্রেই ত কবি বা সাহিত্যিক। তুমিও নিশ্চয় ছোটবেলা কবিতা লিখতে। হয়ত এখনও লিখে থাক।"

"এখন আর লিখি না।"

"তোমার সম্পাদকীয় পড়লাম। বেশ লাগল। লিখতে বসে বুকে ব্যথা করছিল, না?"

"আপনি টের পেয়েছেন?"

"তা একটু পেয়ে গেলাম। ওটার সঙ্গে আমারও পরিচয় আছে।"

"জানি। আপনার কবি-খ্যাতি আমার অজানা নয়।"

"খ্যাতিটা অনেকে জানে। ব্যথার খবর বড় কেউ রাখে না।"

"সৃষ্টির মধ্যে বেদনা ত থাকবেই।"

"তোমার বিনয় দেখে খুশি হ'লাম। সম্পাদকীয়ই লেখ, বা সাহিত্য-কাব্য রচনা কর, সৃষ্টির মধ্যে যেন সর্বদা বিনয় থাকে। আমাদের উপনিষদের ঋষিরা বলেছেন, যারা মনে করে আমরাই ধীমান, আমরা সব জেনে বসে আছি, তোমরা আমাদের কথা সসম্মানে শোন আর মান্য কর, তারা আসলে অজ্ঞান ও অবিদ্যায় অন্ধের দ্বারা চালিত হয়ে অন্ধের ন্যায় পরিভ্রমণ করে।"

"রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও এর অভিব্যক্তি দেখতে পাই। একটু শুনবেন?"

"নিশ্চয়। বল। বুঝব না পুরো। তবু তাঁর কবিতা শুনতেও ভাল লাগে।"

সুভাষ বলেছিল:

যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে।
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "না। ইংরেজীতে অর্থ বলে দিয়ো না। আর একবার ধীরে ধীরে বল। আমি বুঝতে পারব।"

দ্বিতীয়বার শুনে, "অতি বড় কথা। 'তোমার আসন গভীর অন্ধকারে'। বাঃ! এমন কথা আর কেউ বলেন নি। হ্যাঁ, তুমি মাঝে মাঝে আমাকে রবীন্দ্রকাব্য পড়ে শুনিও।"

"আপনার সময় হবে?"

"সময় করে নেব। আমরা রাজনীতি করবার সময় দুর্বিনীত, আত্মতৃপ্ত, দাম্ভিক ও ক্ষমতামত্ত হয়ে উঠি। আমি যদি সম্পাদকীয় লিখতে বসি, তা হ'লে, তুমি যা বলেছ, তাই হবে—মস্ত এক বক্তৃতা দিয়ে বসব। কিন্তু, ভগবানের কৃপায়, রাজনীতি আমার সবটুকু সত্তা গ্রাস ক'রে বসে নি।"

"সে আপনার সৌভাগ্য।"

"সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য, জানি নে। মাঝে মাঝে মনে হয়, দারুণ দুর্ভাগ্য। বয়স বাড়লে বুঝবে খণ্ডিত সত্তা নিয়ে জন্মানোর জ্বালা কি ভয়ানক। আমার মধ্যে যে-মানুষটা রাজনীতি করে, শিল্পী তাকে সর্বদা ব্যঙ্গ করে, উৎসনা করে তার দৈন্য দেখিয়ে দেয়। আর শিল্পী যখন একটু অবসর পেয়ে সৃষ্টির মোহে মগ্ন হ'তে চায়, রাজনৈতিক এসে তার পিঠে দারুণ কশাঘাত হানে।"

"দেশের লোক আপনার দু' পরিচয়কেই মান্য করে।"

"এ মান্য-করার মধ্যে অনেক ফাঁকি আছে, সুভাষবাবু। বহু বছর রাজনীতি করছি—এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। একদিন যা স্বপ্নেও ভাবি নি, আজ তাই হয়েছি—একটা সমগ্র প্রদেশের ভাল-মন্দের দায়িত্ব নিয়ে বসে গেছি। যে-আত্মসন্দেহ সম্পাদকীয় রচনার সময় তোমাকে ভারাক্রান্ত করে, আমাকেও অনেক সময় সে পেয়ে বসে। দেশশাসনের জন্য আমরা ত

কেউ নিজেদের তৈরী করি নি। স্বদেশী করেছি দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করতে; একদিন যে তার অগ্রগতির কর্ণধার হ'তে হবে এমন কথা কখনও মনে হয় না। আজ শাসন করতে গিয়ে প্রতি পদে নিজের দীনতা বুঝতে পারি। আপশোস হয়। লেখাপড়ায় এমন ফাঁক রয়ে গেছে, অনেক সমস্যার প্রকৃত অর্থই যেন বুঝতে পারি নে। মনে হয়, যা করছি তা ঠিক করছি তো? প্রতিদিন প্রকাশ্যে সবাকার কাছে নিজের দুর্বলতা ঢাকতে ঢাকতে, প্রতিটি কাজকে সবচেয়ে ভাল ব'লে জাহির করতে করতে একদিকে যেমন আত্ম-সমালোচনার সময় পাই নে, অন্যদিকে সংক্ষিপ্ত নিরালা মুহূর্তে সংশয়, সন্দেহ যেন জমাট অন্ধকারের মত মনে চেপে বসে। জান সুভাষবাবু, রাজনীতির খেলা চলে শকুন্তলার আংটির জোরে। এ বস্তুটি যে কি তা জানবার জো নেই। যতক্ষণ সঙ্গে আছে, সবাই তোমার চিনবে, মানবে, ভয় করবে, শ্রদ্ধা করবে। একবার হারাল ত তুমি একেবারে তলিয়ে গেলে। তখন আংটি ফিরে পেলেও আর নিতে নেই। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম' পড়েছ? মনে আছে শেষ দৃশ্যে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুনঃ পরিচয়ের কাহিনী। দুষ্মন্ত বলছেন—এই আংটি পেয়ে তোমাকে মনে পড়ল, তোমাকে চিনলাম। এবার তোমার আঙুলে এ শোভা পা'। 'তেন হি ঋতু-সমবায়চিহ্নং প্রতিপদ্যতাং লতাকুসুমম।' লতার ফুল ঋতুরাজ বসন্তের সঙ্গে মিলনের চিহ্ন ধারণ করুক। কিন্তু শকুন্তলা আর আংটি স্পর্শ করতে রাজী নন। 'ণ সে বিস্‌সসেমি'—এ আংটিকে আমি আর বিশ্বাস করি না। যে-কথা কালিদাস পরিষ্কার বলতে পারেন নি তা হ'ল, 'আমি তোমাকেও আর বিশ্বাস করি না। তুমি আংটি হারিয়ে আমাকে চিনতে পার নি, আমি তোমার মনে নিজের গৌরবে অধিষ্ঠিত নই। তোমাকে আর আমার সেই কুমারী জীবনের নিটোল বিশ্বাস দিতে পারব না। রাজনীতিতেও তাই। একবার আংটি হারাল ত বিশ্বাস গেল। পুনর্বার সে বিশ্বাস আর ফিরে আসে না।"

আজ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে বসে সুভাষ চট্টোপাধ্যায়ের শকুন্তলার আংটি মনে পড়ছিল। প্রবন্ধের বিষয় ছিল উদয়াচলের রাজনীতি। সংগ্রামের সময় সুভাষ সাধ্যমত কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পতাকা তুলে ধরেছিল সংবাদপত্রের মাধ্যমে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সে শ্রদ্ধা করে; তার প্রতিপক্ষকে শ্রদ্ধা করবার কোনও কারণ সে খুঁজে পায় নি। সুতরাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পতাকা তুলে ধরায় তার অন্তরে ক্ষোভ ছিল না। চাকরির দাবি ছাড়া, আন্তরিক সমর্থনও তার ছিল। তথাপি বার বার মনে পড়ছিল কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরই মুখে শোনা শকুন্তলার আংটির ব্যাখ্যা। এবার কি তিনি আংটি হারিয়েছেন? লোকের আস্থা, শ্রদ্ধা, ভয় আর কি তাঁর আয়ত্তে নেই? প্রতিপক্ষ তাঁর নামে অনেক কুৎসা রটিয়েছে। তাঁর রাজত্বের অনেক দোষ, স্খলন, অন্যায় আজ জনসাধারণ জানতে পেরেছে। দুর্নীতি, দুরাচার, অত্যাচারের সুদীর্ঘ তালিকা পাঠান হয়েছে দিল্লীর দরবারে। এতেও কি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শকুন্তলার আংটি হারান নি? যদি তিনি সংগ্রামে জেতেন, যে আস্থা ও শ্রদ্ধা উদয়াচলে এতদিন তাঁর প্রাপ্য ছিল, তা কি তিনি আর পাবেন? অথচ, কই, শকুন্তলার মত ত তিনি আংটি বর্জন করতে প্রস্তুত নন! খর্বিত জন-শ্রদ্ধা নিয়েও তিনি ক্ষমতায় আসীন থাকতে চান; ক্ষমতা ত্যাগের প্রশ্ন ত তাঁর মনে দানা বাঁধে নি।

সুভাষের মন একরকম ভাবছিল, মাথা আর হাত অন্যরকম লিখছিল, এমন সময় দ্বারপথে ধ্বনিত হ'ল, "এডিটর সা'ব, কোনও সেবা?"

সুভাষ তাকিয়ে দেখল, জগন্মোহন তিওয়ারী।"

বলল, "আসুন, তিওয়ারীজি, বসুন। একটু কথা আছে।"

তিওয়ারী ঘরে ঢুকে চেয়ার টেনে বসল।

"আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে যে?"

তিওয়ারী কাজের কথার অপেক্ষায় নীরব রইল।

"খেয়েছেন?"

সেই একই নীরব অপেক্ষা।

"খবর চাই।"

"কোন্ খবর?"

"লড়াই-এর।"

"লড়াই কোথায়?"

"উদয়াচলে। বিলাসপুরে।"

"এ আবার লড়াই!"

"কোশলজির জয় নিশ্চিত?"

"নারায়ণ জানেন। আমি কি ক'রে বলব?"

"প্রতিপক্ষের খবর বলুন। কাগজে ছাপবার মত।"

"আমি ত আপনার রিপোর্টার নই।"

"কিন্তু আপনি যতটা জানেন, এ সহরে তত আর কেউ জানে না।"

তিওয়ারী সামান্য শুধু হাসল।

"কিছু নতুন হেড লাইনের হরফ চাই।"

"ছাপাখানায় শুনছিলাম। কি চাই বলুন।"

সুভাষ ড্রয়ার থেকে একখানা কাগজ দিল।

"কবে দরকার।"

"কালই।"

"বিজয়ের আগের দিন। পণ্ডিত পার্টি-মিটিং।"

"আচ্ছা।"

তিওয়ারী বিদায় নিলে সুভাষ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ শেষ করল। সেক্রেটারীকে ডেকে বলল, ছাপাখানায় পৌঁছে দিতে।

চেয়ার ছেড়ে সাব-এডিটরদের ঘরে যাবে এমন সময় দেখতে পেল তারই ঘরের বাইরে অম্বিকাপ্রসাদ।

"আসুন, অম্বিকাপ্রসাদজি। আসুন।"

"আপনার কাছে একটু দরকারে এসেছি সুভাষবাবু।"

"আজ্ঞা করুন।"

অম্বিকাপ্রসাদ ম্লান হাসল। চেয়ারে বসতে বসতে বলল, "আজ্ঞা করার আমি কেউ নই, আপনি ভালই জানেন।"

"এককাপ চা খাবেন? আনতে বলি?"

"বলুন। একটা সমস্যায় আপনার পরামর্শ চাই?"

"আমার পরামর্শে যদি কাজ হয় নিশ্চয় দেব। ও বস্তুটি দিতে খরচ লাগে না।"

"আপনার কি মনে হচ্ছে?"

"মুখ্যমন্ত্রীর বিষয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"আমার ত মনে হচ্ছে, চিন্তার কোনও কারণ নেই।"

"অর্থাৎ, পিতাজি জিতবেন?"

"আমার ত তাই বিশ্বাস।"

"বিশ্বাসের হেতু?"

"অনেক। প্রথমত, সুদর্শন দুবের নেতৃত্ব কেউ মানতে রাজী নন। তাঁর দল স্বার্থান্বেষীতে ভরা। এঁরা ইতিমধ্যেই নিজেদের মধ্যে কলহ সুরু করে দিয়েছেন। রাজনৈতিক পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে সুদর্শন দুবে দল ধরে রাখতে পারবেন না। শুনছি, এ লোভ আপনার পিতাজিও দেখাচ্ছেন। খবর পেয়েছি, সুদর্শন দুবের প্রধান সমর্থকদের কেউ কেউ এরই মধ্যে কোশলজির দলে ফিরে এসেছেন। তাঁরা কেউ মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করতে রাজী নন। তা ছাড়া, হাই কমাণ্ড বর্তমান সময়ে কোশলজির মত নেতাকে ত্যাগ করবেন বলে মনে করতে পারছি না। উদয়াচলে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের নেতৃত্ব করবার মত যোগ্য লোক এখনও আর নেই।"

"কেন? দুর্গাভাই মেহতা?"

"তিনি ত নেতৃত্ব চান না।"

"সত্যি চান না, না তলে তলে নিজের আসন তৈরী করে নিয়েছেন?"

"আমার মনে হয় সত্যি চান না বলা ঠিক হবে না। চান। তবে, দুর্গাভাই জানেন সুদর্শন দুবের দল নিয়ে সুশাসন সম্ভব নয়। দুর্গাভাই রাজনৈতিক সতীত্বে বড় বেশী বিশ্বাস করেন। নষ্টের সুনামটুকু তিনি কিছুতেই হারাতে চাইবেন না।"

"তা হ'লে আপনার বিশ্বাস দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই।"

"কোশলজির বিজয় সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। তবে দুশ্চিন্তার অন্য কারণ থাকতে পারে।"

"কি কারণ?"

"এই ধরুন, উদয়াচলে কংগ্রেসী মন্ত্রীত্বে এবার যে ভাঙ্গন ধরল তার পরিণাম কি হ'তে পারে। হেরে গিয়ে সুদর্শন দুবে যা করবে তাতে কংগ্রেসের আত্মশক্তি কতটা কমে যাবে। নতুন মন্ত্রীসভা গঠনে কোশলজিকে কি নীতি গ্রহণ করতে হতে পারে। তাঁর নেতৃত্বের এর পরে কি অবস্থা হবে। আরও অনেক প্রশ্ন দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করতে পারে।"

"এবার আপনাকে আসল ব্যাপারটা বলি। আপনি জানেন আমার চাকুরি পাবার ইতিহাস?"

"না।"

"এটুকু বুঝতে পারেন যে পিতাজির জন্তেই আমার চাকুরি?"

"তাই যদি হয়ে থাকে আশ্চর্যের কিছু নেই।"

"নিজের যোগ্যতায় ল কলেজে পড়ানর কাজ আমি পেতে পারতাম না।"

"নিজের যোগ্যতায় এদেশে অনেকেই কাজ পায় না। অন্তত যাঁরা ভাল কাজ করেন।"

"তথাপি, আমার কর্মজীবন নিয়ে মনে বড় অশান্তি।"

"কর্মজীবনে শান্তি, আনন্দ, সার্থকতা এদেশে অধিকাংশের ভাগ্যেই জোটে না।"

"অনেকের কথা আমি জানি নে। নিজের কথা জানি। আমরা পাঁচ ভাই পাঁচ রকমের। আমার মাকে আপনি জানেন না। তাঁর মত স্তায়নিষ্ঠ সত্যপরায়ণ স্ত্রীলোক বেশি নেই। পিতাজিকে আপনি জানেন। উভয়ের চরিত্রের মিশ্রিত ছায়া আমাদের পাঁচজনের মধ্যে। আমি মা'র কাছ থেকে পেয়েছি অশান্ত বিবেক, কিন্তু পিতাজির পৌরুষ, আত্মবল আমার নেই। আমার পরের ভাই দুর্গাপ্রসাদই বাপ-মায়ের প্রকৃত পুত্র। সে নীচ জাতের বিধবা বিবাহ করে বামপন্থী রাজনীতির পথে চলতে চলতে পরিবার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। সূর্যপ্রসাদ পিতাজি আর মায়ের চরিত্রের দুর্বলতা নিয়ে তৈরী। শ্যামা-প্রসাদের ওপর মায়ের প্রভাব নেই—পিতাজির কিছু আছে। আর সবচেয়ে ছোট চন্দ্রপ্রসাদ বাপ-মায়ের আদরের ছেলে, তার মধ্যেও বিদ্রোহ আছে, তবে সে কখনও রাজনীতি করবে না। তা ছাড়া পিতাজিকে সে অত্যন্ত ভালবাসে। এখন দেখুন, আমাদের ভাইদের মধ্যে মিল নেই একেবারে।"

"এমন অনেক পরিবারে দেখা যায় অম্বিকাপ্রসাদজি।"

"কলেজের কাজ পিতাজি আমায় করে দিয়েছেন কিন্তু তিনি আমাকে সবদা হেয় চোখে দেখেন। নিজের যোগ্যতায় দাঁড়াতে পারি নি ব'লে আমার ওপর তাঁর শ্রদ্ধা নেই। এই যে বিরাট সংকট যাচ্ছে, তাঁর কোনও কাজে আমার ডাক পড়ে নি। কোনও দায়িত্বই তিনি আমায় দেন নি।"

"রাজনীতি সবার আসে না। আসা ভালও নয়।"

"চন্দ্রপ্রসাদকে তিনি অনেক কাজের ভার দেন। আমার সঙ্গে কোনও বিষয়ে আলোচনাও করেন না।"

"অম্বিকাপ্রসাদজি, আমাকে এসব কথা বলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে। কেন বলছেন, বুঝতে পারছি না।"

"এক্ষুণি বুঝবেন। আপনি পিতাজির আস্থাভাজন। আপনাকে তিনি স্নেহ করেন। আমার একটা কাজ আপনাকে করতে হবে।"

"বলুন। নিশ্চয় করব।"

"পিতাজিকে আমার কথাগুলো বলতে হবে। যদি তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠপুত্রের মর্যাদা না দেন তা হ'লে আমার পক্ষে ল কলেজে কাজ করা আর তাঁর পরিবারে এক অন্নে বাস করা আর সম্ভব নয়। তা হ'লে আমি নিজের ভাগ্য নিজেই দেখব।"

"একথা আমায় বলতে হবে?"

"বললে আমি কৃতজ্ঞ হব।"

"আপনি বলতে পারেন না?"

"না। কোনওদিন কোনও গুরুতর বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয় নি। আজ হঠাৎ একথা বলা সম্ভব নয়।"

"একথা বলবার একটা সুযোগ বার করতে হবে।"

"কিন্তু তাঁকে খুব শীঘ্র বলা দরকার।"

"কেন? এত তাড়া কিসের?"

"তাড়া আছে।"

"চেষ্টা করব।"

"আপনি পরদেশী। আপনাকে অনেক কথা বলা চলে। আশা করি কিছু মনে করেন নি।"

"মনে করব কেন? বরং আপনি সমস্যায় পড়ে আমাকে বন্ধু বলে মনে করেছেন তাতে আনন্দ পেয়েছি। আমরা সাধারণ মানুষ। কিন্তু অম্বিকাপ্রসাদজি, সব মানুষের আসল সমস্যাই এক। আর, সব সমস্যার মধ্যে বিবেকের সমস্যা প্রধান। তা শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।"

অম্বিকাপ্রসাদ একটু চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, সুভাববাবু, তিওয়ারীকে আপনার কি মনে হয়?"

"কোশলজির পরম অনুগত সেবক।"

"আর কিছু?"

"এছাড়া অন্য পরিচয় কিছু আছে নাকি?"

"একটা কথা আপনাকে বলি। তিওয়ারী আমার মা'র ছায়া পর্যন্ত মাড়াবার সাহস রাখে না।"

"কেন?"

"না, বলব না। বলা ঠিক হবে না।"

"তা হ'লে নিশ্চয় বলবেন না।"

"ওকে একটু সামলে চলবেন সুভাষবাবু।"

"তাই নাকি?"

"পিতাজি মুখ্যমন্ত্রীতে পুনবার বহাল হবার পর, আপনাকে বলে দিলাম, আপনার কাগজের মালিক হবে জগন্মোহন তিওয়ারী। ম্যানেজিং এডিটর হিসাবে নাম বেরবে তারই।"

ক্রমশঃ

ভক্তি ও সৎকর্ম্ম

যেমন কথা ও কাজের একটা অনাবশ্যক বিরোধ ঘটান হয়, তেমনি ভক্তি ও সৎকর্ম্মের মধ্যেও যেন কোন ঝগড়া আছে এইরূপ কথা মাঝে মাঝে শুনা যায়। যাহারা খুব ভাববিলাসী, তাহারা কাজের লোক না হইতে পারে। কিন্তু ভাববিলাসিতা যে ভক্তি তাহা কে বলিল? কথায় কথায় চোখে জল আসে এমন লোকেরও প্রকৃত ভক্তি না থাকিতে পারে; আবার যাহার চোখে সহজে জল আসে না এমন প্রকৃত ভক্তও অনেক আছেন। সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সৎকাজ করিবার শক্তি প্রকৃত ভক্তি হইতে পাওয়া যায়। কোন কাজ যে কাজের মত কাজ, ভগবানের সহিত যুক্ত না হইয়া তাহা স্থির করা কঠিন। যশের জন্য বা অন্য কোনপ্রকার লাভের জন্যও অনেক সময় সৎকাজ করা হয়। তাহা সাত্ত্বিক কর্ম্ম নহে। প্রকৃত ভক্ত যিনি তিনি সাত্ত্বিকভাবে কাজ করিতে পারেন। পূজা অর্চ্চনা ধ্যান ধারণায় বেশী সময় দিলে সৎকর্ম্মের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় কিনা, তাহা বিচার্য্য বটে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সময় ভাগ করিয়া দেওয়া কাহারও সাধ্য নয়। নিজ নিজ প্রকৃতি ও শক্তি অনুসারে প্রত্যেক সময় ভাগ করিয়া লইবেন। "মধ্যপথ অবলম্বন কর" বলা সহজ, কিন্তু এই মধ্যপথের রেখা নির্দ্দেশ কে করিবে?

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২১

ইতিহাস কথা কয়

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

তের

দিল্লী জু দেখে আমরা হতাশ হয়েছিলাম। কালী-বাড়ী থেকে অনেকখানি পথ দিল্লী জু। চার মাইল ত হবেই। দিল্লীর পথে পথে সাদা বিচরণশীল ষ্টেট বাস দেখা যাবে না। বাসের নির্দিষ্ট সময় আছে। প্রায় বিশ মিনিট থেকে ত্রিশ মিনিট পর পর এক একখানি বাস আসে। যে কোন লোকের পক্ষে এই দীর্ঘ সময় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু বাসের জন্য অপেক্ষা আপনাকে করতে হবে না। পথে পথে সতত ধাবমান অটোযানের সর্দারজী আপনাকে সহাস্য হাতছানি জানাবেন। মাইল মাত্র ছ আনা। তবে মিটারে কত উঠবে তা নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে। উঠবার সময় মাইল মিটারের সংখ্যাটা দেখে নিন। নামবার সময়ও তাই করতে হবে। যত মাইল অতিক্রম করলেন সেই হিসেবে ভাড়া।

কলকাতার কলকোলাহলের কাছে দিল্লী নিতান্তই ... এখানের হৈ-হট্টগোলকে যদি সমুদ্র গর্জনের সঙ্গে তুলনা করি তবে দিল্লীর কলকাকলী মৃদু-ঝর্ণার মর্ম্মর ধ্বনি মাত্র। ঠিক এতখানি ফারাক। আকাশ আর জমিনের মত। সন্ধ্যাবেলায় কনট্ প্লেসে ঘুরে দেখেছি। অফিস ছুটির পর চৌরঙ্গীর যে অবস্থা হয় তার সঙ্গে কি কোন অংশে তুলনা চলে? দিল্লীর পথ শান্ত জনবিরল। কলকাতার রাস্তা মনুষ্যাকীর্ণ, কোলাহলমুখর। তবে সবদেশে সর্বকালে মনুষ্য-সমাজের হাসিকান্না, সুখদুঃখ, প্রেম-ভালবাসার যে চিত্রটি দেখা যায় তা দিল্লী আর কলকাতাতেও একই। সন্ধ্যার স্বল্প-আলোকিত অন্ধকারে কনট প্লেসের এককোণে ফিসফিস কথাবার্তায় মগ্ন প্রেমিক যুগলকে ঠিকই দেখা যাবে। পথপার্শ্বের ফুলদোকানীর কাছ থেকে রক্ত গোলাপের তোড়া সংগ্রহ করছেন কেউ, সাগ্রহে উপহার দিচ্ছেন কোন সুন্দরী যুবতীর হাতে। চেয়ে থাকলে হয়ত লক্ষ্য করবেন যে সলজ্জ প্রেমের মিষ্টি হাসি ফুটে উঠেছে প্রেমিকার চোখের কোণে। আর তখনই শুধু আপনার মনে হবে যে এই আকাশের নীচে কলকাতার ময়দান, ইডেন গার্ডেন আর লেকের মাঠ মিশে গেছে দিল্লীর কনট প্লেস ও এমনি আরও নানা স্থানের সঙ্গে।

দিল্লী জু আমাদের ভাল লাগে নি। অটো থেকে নেমে টিকিট কেটে ঢুকলাম। শেষ ফেব্রুয়ারীতেও দিল্লী আর আগ্রার মধ্যে বেশ একটু তফাৎ। আগ্রায় দিনেও বেশ শীত-শীত অনুভব করেছি। কিন্তু দিল্লী ঠিক উল্টো। দিনে বেশ একটু গরম, আর রাত্রে শীতও প্রচণ্ড। গেট পেরিয়ে খানিকটা খোলা জায়গা। অপর্যাপ্ত ফুল ফুটেছে সেখানে। এত ফুল শুধু কি দিল্লীতেই ফোটে? যেন এক ফুলের দেশে এসেছি আমরা। সত্যি, কি বিচিত্র পুষ্পসম্ভার।

জু থেকে বেরিয়েই ঠিক করলাম যে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সমাধি দেখতে যাব। সারি সারি অটো-যান অপেক্ষা করছে। কতদূর হবে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সমাধি? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে দু'জনেই উঠলাম অটোযানে। অটোযানের চালক এক অল্প বয়সী সর্দারজী।

বললাম, 'নিজামুদ্দীন আউলিয়া দেখতে যাব। নিয়ে চলুন।'

"নিজামুদ্দীন?" সর্দারজী প্রশ্ন করলেন।

বললাম, "হ্যাঁ। ফকির সাহেবের দরগা।"

অটোযানের গতি যেখানে শুরু হ'ল, সেটি দিল্লীরই একাংশ। ফকির আউলিয়ার নামে জায়গাটিরও নাম নিজামুদ্দীন বিখ্যাত। জনের কাছে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সমাধি আজও তীর্থ-বিশেষ। ভাঙ্গাচোরা ঘরবাড়ী, একচাপে মনুষ্যবসতি, সংকীর্ণ পথ—ফকির সাহেবের দরগার চারপাশটি খুব একটা সমৃদ্ধির চিহ্ন বহন করে না।

ইতিহাসে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মত খ্যাতি এবং সম্মান অন্য কোন ফকির সাহেব পেয়েছেন বলে মনে হয় না। বিখ্যাত চিস্তি সম্প্রদায়ের শিষ্য নিজামুদ্দীন আউলিয়ার অগ্রবর্তী অনেকের কাছেই রাজকীয় সম্মান সাগ্রহে বহন করে নিয়ে গেছেন বিভিন্ন মুসলমান নরপতি। নিজামুদ্দীন শুধু ধর্মকে আঁকড়ে ছিলেন না।

অসামান্য রজেনৈতিক দূরদর্শিতার অধিকারী হয়েছিলেন তিনি।

আনুমানিক ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার জন্ম। দিল্লীতে এসে ঘিয়াসপুর গ্রামে বসবাস সুরু করলেন তিনি। ঘিয়াসপুরের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসুদ্দীন বলবন। অল্প অল্প করে ফকির সাহেবের খ্যাতি ছড়াতে লাগল। মনুষ্য চরিত্রের গূঢ় ব্যাখ্যা নিজামুদ্দীন আউলিয়া সহজেই করতে পারতেন। অভিজ্ঞতা তাকে যথেষ্ট জ্ঞান দিয়েছিল এবং সেই অভিজ্ঞতা তিনি পুরোপুরি কাজে প্রয়োগ করতেন।

ফকির সাহেবের অলৌকিক শক্তির সম্বন্ধে কতকগুলি গল্প প্রচলিত আছে। শোনা যায় যে, উপাসনা করবার এক বিশেষ মুহূর্তে তিনি জানতে পারেন যে জালালুদ্দীন ফিরোজ শাহ খিলজী মাণিকপুরে নিহত হয়েছেন। নিজের ভক্ত এবং শিষ্যদের কাছে এই কাহিনী তিনি ঘোষণা করেন। গিয়াসুদ্দীন তুঘলক যখন এগিয়ে আসছিলেন দিল্লীর পথে তখন তিনি সহাস্যে ঘোষণা করেন—'দিল্লী হিনোজ দূর অস্ত'। দিল্লী এখনও অনেক দূর। আফগানপুরে মারা গেলেন তুঘলক শাহ দিল্লী পৌঁছান তাঁর আর হ'ল না। আর একবার এই অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন নিজামুদ্দীন আউলিয়া। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে তৌর্মা শিরিণের নেতৃত্বে একদল মোঙ্গল সৈন্য দিল্লীর সীমান্ত আক্রমণ করে। কিন্তু অকস্মাৎ কিছুদিন পরই এই দুর্দান্ত লুটেরার দল তাদের তাঁবু গুটিয়ে ফিরে যায়। জনশ্রুতি যে ফকির সাহেবের প্রার্থনার শক্তিতেই মোঙ্গলবাহিনী ফিরে যেতে বাধ্য হয়। শ্লীম্যান সাহেব বলেছেন যে ঠগীর দল জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগায় শ্রদ্ধা নিবেদন করত।

এই শান্ত-সুন্দর স্থানটির যারা রক্ষণাবেক্ষণকারী তাদের অভ্যর্থনা এবং বিনয় প্রশংসার দাবি রাখে। অটো থেকে নামতেই এক যুবক সহাস্যে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর সঙ্গেই আমরা ঢুকলাম ফকির সাহেবের দরগা দেখতে। সরু পথ। দু'পাশে ভিখারীর সংখ্যা কম নয়। ডান দিকেই ছোট একটি পুষ্করিণী। তিনদিক প্রাচীরে ঘেরা। পুকুরের জল কেমন শ্যাওলা রঙের। এই শীতে জলও কম। সেই যুবকটি বললেন, 'এই হ'ল ফকির সাহেবের দীঘি। এরই পাড়ে দাঁড়িয়ে ফকির সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—দিল্লী দূর অস্ত।'

তুঘলকাবাদের অধিপতির সঙ্গে আউলিয়ার যে বিরোধ সুরু হয় তার মূলে এই পুষ্করিণী। ইতিহাসে ধর্মশক্তির সঙ্গে রাজশক্তির বিরোধের নজীর কম নেই। ইংলণ্ডের টমাস বেকেট এই প্রসঙ্গে একটি উজ্জ্বল নাম। বেকেটকে স্মরণ করে ইতিহাসে একটি স্মরণীয় উক্তি রয়েছে—'If ever a dead man won a fight, it was Thomas Becketee'. ধর্মশক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন দ্বিতীয় হেনরী। নিজামুদ্দীন আউলিয়া কিন্তু পরাভব স্বীকার করেন নি গিয়াসুদ্দীন তুঘলক শাহের কাছে। তুঘলক শাহই হেরে গিয়েছিলেন সে দ্বন্দ্বে। তবে বেকেট মরে হয়েছিলেন জয়ী, নিজামুদ্দীন জয়ী হয়ে জীবিত ছিলেন।

তুঘলকাবাদ গড়ে তুলেছিলেন গিয়াসুদ্দীন। দুর্গ, প্রাচীর, রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্যদের বাসগৃহ। তখনকার দিনে মেশিনের সাহায্য ছিল না। যা-কিছু গড়তে হবে সবটুকু মানুষের হাতে। দূরদূরান্ত থেকে মালমশলা বয়ে আনবার জন্য মানুষ কিংবা গৃহপালিত পশু টানা শকটই ভরসা। তুঘলকাবাদের কাজে অনেক, অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল সুলতানের। বহু শ্রমিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যদি তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় তুঘলকাবাদের বসতি।

কিন্তু একই সময়ে ফকির সাহেব কাটাচ্ছিলেন দীঘি। অনেক শ্রমিক আউলিয়ার দীঘি কাটতে এল তুঘলকাবাদের কাজ ফেলে। বিত্তহীনের কাছে রাজশক্তির কোন মোহ নেই, ফকিরের দরগা তাদের মনকে টানে। তারপর নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মত ফকির সাহেব। যিনি নানা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। রাগে তুঘলক শাহ আদেশ জারি করলেন ফকিরের দীঘি কাটতে কোন মজুর যাবে না। দিবসে তারা কাজ করবে তুঘলক শাহের রাজপ্রাসাদ গড়ে তুলতে। সুলতানের ফরমান। জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেল শ্রমিকেরা। সুলতানকে তারা করত ভয়, ফকিরকে ভক্তি। ভয় দেখিয়ে কি ভক্তি কেড়ে নেওয়া যায় মানুষের মন থেকে? অমন ফকির সাহেবের কাজ কি ফেলে দিতে পারে নিরন্ন শ্রমিকের দল? এই বিশাল পৃথিবীতে তুঘলক শাহ তাদের আপন নয়, কিন্তু ফকির সাহেব নিঃসন্দেহে ভরসা।

সমস্ত দিন ধরে কাজ চলে তুঘলকাবাদ দুর্গের। গিয়াসুদ্দীন তুঘলক ভাবেন আউলিয়ার দীঘি খোঁড়া

আর হ'ল না। নিজের মনেই তিনি হাসেন। সামান্য ফকির। দেশের সুলতানের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়।

কিন্তু দীঘির খনন কাজ বন্ধ হ'ল না। শ্রমিকের দল আউলিয়ার প্রতি প্রেমের চরম নিদর্শন দেখাল। দিবস যদি কেড়ে নেয় সুলতান তাতে ভয় কি? 'রাতি কৈনু দিবস'। সন্ধ্যার পর শ্রমিকের দল জড় হ'ল ফকিরের কাছে। স্বল্প-আলোকিত রাতে একসার কোদাল পড়তে লাগল, ঝপা ঝপ, ঝপা ঝপ। লণ্ঠনের আলোয় শ্রান্ত-ক্লান্ত মুখগুলি নীরবে কাজ ক'রে যেতে লাগল। স্তব্ধ যামিনীতে আউলিয়ার দীঘির কাজ সুন্দর এগিয়ে চলল।

তুঘলক শাহ সব শুনলেন। তার আর সহ্য হচ্ছিল না। ফকিরের প্রতি এই প্রীতি প্রেম ও আনুগত্য রাজশক্তির প্রতি ভ্রূকুটি বলে মনে হ'ল তার পুনরায় রাজ আদেশ ধ্বনিত হ'ল তার কণ্ঠে। ফকিরকে তেল বেচতে পারবে না কেউ। বিনা তেলে আউলিয়ার দীঘি কেমন করে কাটা হবে? লণ্ঠনের আলোয় অন্ধকারের কালিমা না দূর হ'লে কোদালের ঝপাঝপ শব্দ কেমন করে ভাঙবে তামস রাত্রির নিস্তব্ধতা।

কিন্তু অঘটন সেদিনও ঘটত। কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকেরা দেখল তেলের প্রয়োজন জলই মিটিয়েছে। দীঘির বুকে শত শত কোদালের আঘাত বার বার ফিরে আসতে লাগল। আউলিয়ার দীঘি কাটা তুঘলক শাহ বন্ধ করতে পারলেন না।

লম্বায় প্রায় একশত আশী ফুট, চওড়ায় ওরই দুই-তৃতীয়াংশ। কিন্তু আউলিয়ার দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে আমরা আর সময় নষ্ট করতে পারলাম না। এরই মধ্যে সূর্য্য হেলে পড়েছে। রোদ বাদামী হয়ে এল। অনেক-গুলি সিঁড়ি ঘাটের উপর জেগে। সেই যুবকটি বললেন, এই দীঘির তলদেশ পর্যন্ত এমনি সিঁড়ি গেছে নেমে। সম্ভবত ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে এর খনন কার্য শেষ হয়। ফকির সাহেব দীঘির জলকে তার আশীর্বাদ দিয়ে যান। আজও বহু লোক বিশ্বাস করে যে পুষ্করিণীর জলে দুরা-রোগ্য ব্যাধি দূর হয়।

নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সমাধি বর্গাকৃতি বেদীর উপর। কুড়িটি মার্বেল পাথরের স্তম্ভ সমাধি সৌধের ভার বহন করছে। চারপাশে বারান্দা-বেষ্টিত একটি ঘরে আউলিয়ার প্রস্তরময় শবাধার। ঘরটিও বর্গাকৃতি এবং একটি মাত্র প্রবেশদ্বার। তবে বারান্দার থামগুলির মধ্যবর্তী প্রবেশ-পথ খিলানবিশিষ্ট। সমাধির উপর একটি শ্বেত মার্বেলপাথরের গম্বুজ। মাঝে মাঝে কালো মার্বেলের দাগ সমস্ত গম্বুজটির চারিপাশে ছড়ান। সর্বোপরে একটি তামার চুড়া। উপরিভাগের চার কোণে চারটি ছোট ছোট গম্বুজ। এগুলিরও মাথায় ছোট ছোট তাম্রচুড়া। গম্বুজগুলিকে যুক্ত করে ছাদের আলিসার মত নাতি-উচ্চ বেষ্টনী। এর উপরেও ছোট গম্বুজ—
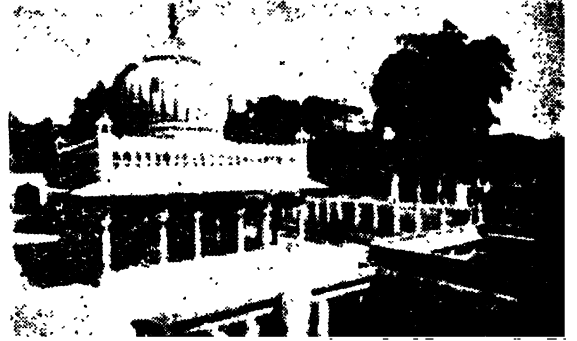
নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধি,—জাহানারা ও মহম্মদ শাহের সমাধিও এইখানেই

ঘরটির মধ্যে অনেকগুলি মার্বেলপাথরের জাফরিকাটা জাল। দেওয়ালের মধ্যখানের জাফরির কাজ, অন্যগুলির চেয়ে বিস্তৃত। ঘরের মধ্যে আলোকের বন্যা এরাই আনে।

সমাধির ঠিক উপরে একটি কাপড়ের চাঁদোয়া। এর চারপাশে নানা গ্লাস-বল অলংকারের মত সাজানো। প্রস্তরময় শবাধার বেষ্টন করে কাঠের একটি রেলিং। এটি সামান্য উচ্চ।

নিজামুদ্দীন আউলিয়ার এই সমাধি-সৌধ এবং এর মধ্যকার কারুকার্য ও নানা বিন্যাস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুলতান ও আমীর-ওমরাহের অবদান। এতে যোগ দিয়েছেন ফিরোজশাহ তুঘলক, সৈয়দ ফরিদ খান, মুর্তাজা খান, খলিউল্লা খান, দ্বিতীয় আলমগীর, আহমদ বকস্‌, ফৈজুল্লা ও দ্বিতীয় আকবর। এদের মধ্যে ফিরোজশাহ তুঘলক ঘরটিতে অলংকরণের ব্যয়ভার বহন করেন। কেউ সৌধগাত্রে লিপি উৎকীর্ণ করিয়েছেন। কেউ বা সমাধির জন্য একটি মুক্তা-শুক্তি-খচিত পর্দা উপহার দিয়েছেন। লাল বেলেপাথরের থামগুলি সরিয়ে নবাব আহমদ বকস্‌ খান মার্বেলপাথরের স্তম্ভ নির্মাণ করান। দ্বিতীয় আকবর শিখরের মার্বেল-গম্বুজ এবং চকচকে তাম্রকলকটি নির্মাণের আদেশ দেন। আসলে এ সবই ফকির সাহেবের স্মৃতির প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন।

যুগে যুগে মানুষের ভোগলিপ্সা ও আসক্তি অনেকেরই মনে বৈরাগ্যের ছায়াপাত করে। মোগল যুগের এরকম একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ এখানে করা সমীচীন মনে করি। বাদশাহ আকবরের সভায় হুসেনউদ্দীন নামে একজন আমীর ছিলেন। হঠাৎ একদিন তার মনে এল সংসার-বৈরাগ্য। এই সংসার নিছক মায়া। বাদশাহ, অর্থবল, বৈভব, ক্ষমতা সবই পার্থিব। এর মূল্য নগণ্য। কাজেই এখানে মিথ্যে সময় নষ্ট করে লাভ কি?

হুসেনউদ্দীন বাদশাহকে নিবেদন করলেন মনোভিলাষ। সংসারে আর নয়—এবার সংসারের বাইরে। রাজপদ পরিত্যাগ করে হুসেনউদ্দীন চলে এলেন নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগায়। আকবর বাধা দেন নি। সংসারের মায়া যে কাটাতে পেরেছে সেই ত জ্ঞানী। এই অল্পবয়স্ক জ্ঞানী মানুষটি প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে ছিলেন দিল্লীতে। ফকিরের জীবন কাটিয়ে গেলেন বৈভব ও ঐশ্বর্য ত্যাগ করে।

চৌদ্দ

নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সমাধি-প্রাঙ্গণে আরও তিনটি মার্বেল স্মৃতিচিহ্ন বর্তমান। এগুলির চারপাশে মার্বেল পাথরের পর্দাজাতীয় বেষ্টনী। এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ, মোগল-বংশধর মীর্জা জাহাঙ্গীর ও শাজাহান-দুহিতা জাহানারা বেগম।

হতভাগ্য মহম্মদ শাহ সমস্ত অঙ্গে অকল্পনীয় অপমানের কালিমা মেখেও দীর্ঘদিন দিল্লীর বাদশাহ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। এই বিড়ম্বিত জীবনটির নশ্বর দেহ যেখানে রাখা হয়েছে তা একটি আয়তাকার মার্বেল পাথর গঠিত বেষ্টনীর মধ্যে। প্রাচীরটি প্রায় দেড় মানুষের মত উঁচু। ভিতরের বড় সমাধিটিই বাদশাহের।

দুর্ভাগ্য মহম্মদ শাহের জীবনের সঙ্গী হ'ল যেদিনই তিনি বাদশাহ পদে অধিষ্ঠিত হলেন, সেইদিন থেকে। ফারুকশায়ার নিহত হওয়ার পর সৈয়দ ভ্রাতাদ্বয় আরও দু'জনকে দিল্লীর মসনদে বসিয়েছিলেন। কিন্তু তাদেরও জীবনান্ত হ'তে বেশী দেরি হয় নি। তারপরই মহম্মদ শাহ এলেন দিল্লীর মসনদে।

মোগল সাম্রাজ্যের তখন আর সে জেল্লা নেই। হাঁটুভাঙ্গা 'দ'-এর মত অবস্থা। রাজ্য ভেঙ্গে যাচ্ছে টুকরো টুকরো হয়ে। প্রদেশের শাসনকর্তারা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করছেন। মোগল রাজশক্তির সে বিদ্রোহ দমন করার মত শক্তি নেই।

এই ভাঙ্গা মসনদে বসে মহম্মদ শাহ শাসন করছিলেন। দাক্ষিণাত্যের গভর্ণর নিজাম-উল-মুলকের সঙ্গে তার বিরোধ সুরু হ'ল। মতবিরোধ থেকে মনান্তর। মনান্তর পরিণত হ'ল ঘোরতর বিবাদে। এরই মধ্যে একদিন ভূমিকম্প হয়ে গেল রাজ্যে। দুর্ভাগ্য ত একা আসে না। আসে মিছিল করে—গরুর গাড়ির মত সারিবন্দী হয়ে।

অপমানিত নিজাম-উল-মুলক পারস্যের নাদির শাহকে চিঠি লিখলেন। এই দুর্বিনীত সম্রাটকে উপযুক্ত শাস্তি দিন তিনি। আর শতগুণ করে বাড়িয়ে লিখলেন দিল্লীশ্বরের হীরা-জহরত, মণিমুক্তা, চুণী-পান্না, সোনাদানার কথা। বলা বাহুল্য নাদির প্রলুব্ধ হলেন। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে নাদির শাহ পারস্য হ'তে রওনা হলেন। সঙ্গে ছত্রিশ হাজার সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য। খুব একটা কষ্ট হয় নি তার। আগমনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ না হলেও বহুলাংশে সুগম করে রেখেছিলেন নিজাম-উল-মুলক। লাহোর এবং পেশোয়ারের মোগল সুবেদারেরা যুদ্ধের একটা মহড়া দিলেন মাত্র। নাদির শাহের অশ্বারোহী সৈন্যের দ্রুতগতি দ্রুততর হ'ল দিল্লীর পথে।

মহম্মদ শাহের সৈন্যবাহিনী বাধা দিতে এগিয়ে গেল। কার্ণালের (Karnal) প্রান্তরে সারি সারি তাঁবু পড়ল মোগলবাহিনীর। দু'পক্ষই মুখোমুখি রইল বসে। একে প্রতীক্ষা করতে লাগল অন্যের আক্রমণের। তারপর হঠাৎ এক সময় সুরু হ'ল যুদ্ধ। ফল সুনিশ্চিত। মহম্মদ শাহ হারলেন নাদির শাহের কাছে।

কয়েকদিন নিজের মনে ভাবলেন মহম্মদ। পরামর্শ নিলেন। নিজামের বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন বৈরীভাব খানিকটা আঁচ করতে পারলেন। তারপর একদিন নাদির শাহের শিবিরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন।

নাদির শাহ কিন্তু রাজকীয় অভ্যর্থনা দিয়ে গ্রহণ করলেন মহম্মদকে। বন্ধুর মত ভৎসনা করলেন রাজ্যের সমস্ত বিষয়ে মন প্রয়োগ না করার জন্য। সৈন্যবাহিনীর ব্যর্থতাও বার বার উল্লেখ করলেন। দিল্লীর সাম্রাজ্য কুক্ষিগত করবেন না নাদির। রাজধানী ছেড়ে তিনি চলে যাবেন, এই বিশাল অভিযানের ক্ষতিপূরণ অর্থ পেলেই।

অপমানের পঙ্কে পা বাড়ালেন দিল্লীশ্বর। মার্চের প্রথম। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ। আকাশ নির্মেঘ নীল, রৌদ্রদগ্ধ তপ্ত-পাণ্ডুর। নাদির শাহ আর তার সৈন্যবাহিনীকে পথ দেখিয়ে দিল্লীর দিকে যাত্রা করলেন মহম্মদ শাহ।
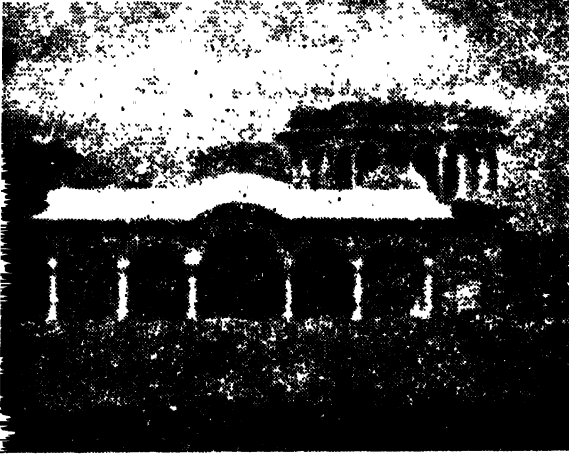
নাদির শাহকে নিজ আবাস ছেড়ে দিয়ে মহম্মদ শাহ এসে রইলেন শাহ বুজে।

রাজপ্রাসাদে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন নাদির। বিজয়ীর প্রতি বিজিতের আতিথ্যে ত্রুটি রইল না কোন। সৈন্য-বাহিনীর ওপর কঠোর আদেশ ছিল পারস্যের অধিপতির। লুঠতরাজ, অত্যাচার, মেয়েদের সম্ভ্রমহানি যেন এতটুকু না হয়। একটুও বরদাস্ত করবেন না তিনি।

কিন্তু নীল আকাশের দেবতা বোধহয় নাদির শাহের ইচ্ছা শুনে মনে মনে হেসেছিলেন। যে রক্তস্রোত কয়েক ঘণ্টা ধরে দিল্লীর রাজপথে বয়ে গেল, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। নাদির শাহ দিল্লী পৌঁছবার পরদিন সন্ধ্যায় একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল। নাদির শাহ নিহত হয়েছেন। গোলমাল প্রথম সুরু হয় পাহাড়গঞ্জ অঞ্চলে। কিছু পারসীক সৈন্য নিহত হ'ল জনতার হাতে। মধ্য-রাতে নাদির শাহের কানে যখন এ খবর পৌঁছল তখন তিনি তা বিশ্বাস করেন নি। খবরের সত্যতা যাচাই করবার জন্য দু'জন প্রহরীকে পাঠালেন তিনি। কিন্তু তারা আর ফিরে এল না। পরদিন সকালে নাদির শাহ ছুটে এলেন রোশনউদ্দৌল্লা মসজিদে। হঠাৎ একটা গুলী ভেসে এল তার দিকে। কোন্ অলক্ষ্য থেকে আততায়ী তাগ করেছিল। কিন্তু নাদির শাহ রক্ষা পেলেন। কার্তুজের বল তার পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল।

নাদির শাহ আর অপেক্ষা করেন নি। সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিলেন তিনি। দিল্লীবাসী কেউ যেন রেহাই না পায়। লুঠতরাজ আর খুন-জখম সুরু হ'ল দিল্লীর পথে। বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে সুরু হ'ল বীভৎস হত্যালীলা। যারা বন্দী হয়েছিল সৈন্যদের হাতে তাদের সারিবন্দী করে দাঁড় করান হ'ল যমুনার তীরে। উন্মুক্ত তরবারি দিয়ে মস্তক ছেদন করল পারসীক সৈন্যরা। দেহ ধড়ফড় করল মাটিতে, মুণ্ড ভেসে গেল যমুনার জলে।

সকাল সাতটা থেকে বিকেল পর্যন্ত চলল এই তাণ্ডব। সহস্র সহস্র মৃতদেহে ভরে উঠল রাজপথ, আর্তনাদ আর মিনতির করুণ সুরে বারবার বিদীর্ণ হয়ে গেল দিল্লীর আকাশ-বাতাস। অসহায় মেয়ে-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ, শিশু ও পঙ্গু-সকলেই প্রাণ হারাল দুরন্ত এই মৃত্যুঝটিকায়। ইতিহাস বলে যে, ঘটনার পরিস্থিতি দেখে মুহম্মদ শাহ এক মিনতি-পত্র পাঠান নাদির শাহের কাছে। পত্র পড়ে হত্যালীলা বন্ধের আদেশ দেন নাদির শাহ শুধু মুহম্মদ শাহের করুণ মুখ চেয়ে।

আর একটি কাহিনীও আছে। মসজিদের সিঁড়িতে উপবিষ্ট ছিলেন নাদির শাহের প্রধান চিকিৎসক মীর্জা মেধী। মুহম্মদ শাহের প্রধানমন্ত্রী তার কাছে এক দীর্ঘ কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী আবেদনপত্র এনে অনুরোধ করেন। নাদির শাহের কাছে দিল্লীর অধিবাসীদের এই মিনতিপূর্ণ আবেদনপত্র পৌঁছে দেন তিনি। এই নারকীয় হত্যালীলা বন্ধ হোক।

প্রধানমন্ত্রী আসিফ জাকে মীর্জা মেধী হেসে বলেছিলেন, এই দীর্ঘ আবেদনপত্র পড়ে শেষ করবার আগেই দিল্লী যে জনশূন্য হয়ে যাবে। কাজেই প্রধান মন্ত্রী এই আবেদনপত্রকে আরও সংক্ষিপ্ত করে দিল। হতবুদ্ধি আসিফ জা হতাশ হয়ে বসে পড়লেন সিঁড়িতে। তার মুখে আর বাক্য সরে নি।

তখন মীর্জা মেধী নাদির শাহের কাছে গিয়ে বললেন—"হিন্দুস্থানের প্রধানমন্ত্রী নগ্নমস্তকে, অশ্রুজলে ভিজে আপনার দ্বারে উপস্থিত। শংকিত চিত্তে জাঁহাপনার কাছে একটি প্রশ্নের উত্তর চান তিনি। আর কতক্ষণ যুদ্ধজয়ী পারসীক সৈন্যরা তাদের হাত জলের বদলে শুধু শোণিতে ধৌত করবে।"

নাদির শাহ হত্যালীলা বন্ধ করার আদেশ দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, উজীরের পাকা চুল আর দাড়ি তার মনের ক্রোধ ও বিদ্বেষ দূর করে দিয়েছে। এমনই নিয়মানুবর্তিতা যে, আদেশদানের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা-লীলা, লুঠতরাজ সব বন্ধ হয়ে গেল। যে সৈনিক মস্তক ছেদনের জন্য তরবারি উন্মুক্ত করে হতভাগ্যের গলায় বসিয়েছিল, সে তখনই তার তরবারিকে সংযত করে নিল। সেই অভাগা দিল্লীবাসীকে আর প্রাণ দিতে হ'ল না।

বহুদিন ধরে পরিত্যক্ত ছিল রোশনউদ্দৌল্লা মসজিদের চারিপাশ। যে গেটের কাছে প্রথম হত্যা সুরু হয়, আজও দিল্লীতে তার নাম 'খুনী দরওয়াজা'। মৃতদেহের স্তূপ সরিয়ে নগরীকে পরিষ্কার করতে বহুদিন লেগেছিল বাদশাহের। সমস্ত দিল্লীর বুকে বিভীষিকার এক প্রেতচ্ছায়া অনেকদিন ধরে চেপে বসে রইল।

তারই মধ্যে একদিন বাজল পরিণয়ের সুর। কি যেন মনে হ'ল নাদির শাহের। যাবার আগে নিজের এক ছেলের সঙ্গে, এক শাহজাদীর বিয়ে দিলেন তিনি। হিন্দুস্থান আর পারস্যের মধ্যে মিলনের এক নতুন সেতু বাঁধতে চাইলেন সম্রাট। যা হয়ে গেছে সে করুণ ভয়াবহ স্মৃতি ভুলে যাক সকলে। তবু তাই কি হয়? মাত্র এই ক'দিনের ব্যবধানে কেউ কি ভুলতে পারে এই বিভীষিকাময় ঘটনাবলী? জোর করে মুখে হাসি আনল দিল্লীবাসীরা। বিয়ের বাজনা বেজে উঠল। আনন্দ উৎসবের জোয়ার আনতে চাইল রাজপুরুষেরা। সব হ'ল। আলো জ্বলল, বাজি পুড়ল, নর্তকী নেচে নেচে যৌবনের জয়গান গাইল। সুরা আর বিভিন্ন উত্তেজক পানীয়ের স্রোত বয়ে গেল। সলমা চুমকির কাজ-করা ঘাগরা আর ওড়না পরে বাঈজী গান শোনাল। তবু নাদির শাহের মনে হ'ল কোথায় যেন একটা ভুল হয়েছে তার। তবলচীর হাতের তাল-লয় কেন কেটে যাচ্ছে? মাঝে মাঝে গানের সুর কেন বেখাপ্পা মনে হয় কানে?...... মহম্মদ শাহের মুখ উজ্জ্বল নয়। কিসের যেন একটা দুর্লংঘ্য বাধা দু'জনের মধ্যে। নাদির চিন্তিত হয়ে রইলেন।

নাদির শাহের পুত্রবধূ, সেই শাহজাদীর সমাধিও এখানেই। প্রসব হ'তে গিয়ে মারা যায় মেয়েটি। মা আর ছেলে দু'জনেই শুয়ে আছে চিরনিদ্রায়।

যাবার আগে অনেক কিছু নিয়ে গিয়েছিলেন নাদির শাহ। ইতিহাসে সেসব লেখা আছে। প্রায় চার কোটি টাকা, ময়ূর সিংহাসন ও ইতিহাসখ্যাত কোহিনূর হীরক। কিভাবে নাদির শাহ হীরকটি হস্তগত করেন সে সম্বন্ধে সুন্দর একটি গল্প প্রচলিত আছে। কোহিনূরকে আঁকড়ে ছিলেন মহম্মদ শাহ। তিনি জানতেন যে হাতে পেলে নাদির শাহ কিছুতেই রেখে যাবেন না এই দুষ্প্রাপ্য হীরকখানি। সন্তর্পণে কোহিনূরকে লুকিয়ে রেখেছিলেন মহম্মদ শাহ। তাঁর শিরস্ত্রাণের মধ্যে, যেন কেউ না জানতে পারে। কাকপক্ষীতেও না টের পায়।

হয়ত নাদির শাহ গণনা করতে পারতেন। কিংবা কোহিনূরই আর থাকতে চায় নি হতশ্রী মোগল বাদশাহদের কাছে। বিদায়ের দিন নাদির শাহ এলেন মহম্মদ শাহের কাছে। নানা ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন তিনি। আতিথেয়তা ও সৌজন্যের প্রতীক হিসাবে মস্তকের পরিধেয়টি দেওয়া-নেওয়া করতে চাইলেন। এই সুন্দর প্রস্তাবে কেউ কি অসম্মতি জানাতে পারে? কোহিনূর নিয়ে চলে গেলেন পারস্যের অধিপতি। কোহিনূর নয়, মোগললক্ষ্মীই চলে গেলেন হিন্দুস্থান ছেড়ে পারস্যের পথে।

বেলা পড়ে এসেছিল। সন্ধ্যার তরল অন্ধকার নামতে দেরি নেই আর। হতভাগ্য সম্রাট মহম্মদ শাহের সমাধির সামনে আমরা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। এই প্রবঞ্চিত ও বিড়ম্বিত জীবনটির কথা ভেবে সকলেরই মন সহানুভূতিতে সরস হয়ে উঠবে। মসনদের ওপর বসেও যে যন্ত্রণা, জ্বালা ও অপমান ভোগ করেছেন বাদশাহ তা কল্পনাও করা যায় না। নাদির শাহ যখন প্রস্থানের উদ্যোগ করছেন তখন সভা ডেকে বিদায় দিতে হয়েছে তাকে। মুখে কৃত্রিম হাস্য এনে তাকে বলতে হয়েছে যে এত শীঘ্র নাদির শাহ চলে যাওয়ার জন্য সমস্ত দিল্লী এবং সম্রাট্ স্বয়ং বিষণ্ণ বোধ করছেন।

বিষণ্ণতা মহম্মদ শাহের সমস্ত জীবন জুড়ে। সুদীর্ঘ আঠাশ বৎসরকাল মসনদে থাকার পর ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে এই বিষণ্ণ জীবনদীপটি নির্বাপিত হয়।

চোখ

শ্রীপ্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শাড়ির আঁচলটাকে ভাল করে জড়িয়ে নেয় আরতি। অগ্রহায়ণের শেষ দিক। খুব শীত না থাকলেও একটা শীত-শীত আমেজ এর মধ্যেই অনুভব করা যায় যেন। নিখিলেশ কোন কথা বলে না: সামনে ধূসর সন্ধ্যার দীর্ঘ ছায়া মিলিয়ে যাচ্ছে যেন। ধীরে ধীরে কালো হয়ে উঠল পদ্মার জলে। দূরে ও-পারের বাড়ীগুলির আলো জলে উঠছে একটার পর একটা। এপারের নৌকাগুলি ঘাটে বাঁধা। দু'-একটা নৌকা পদ্মার মাঝ-জলে; পাল খাটানো সবগুলির। বেশ লাগছে একটানা জলের শব্দটাকে।

আরতি চোখ তোলে নিখিলেশের দিকে। নিখিলেশের চোখের তারায় সামনের ঘাটে-লাগানো নৌকার লণ্ঠনের আলোটা জলছে যেন। নিখিলেশ চোখ ফেরায়। নিস্তব্ধ হ'ল দু'জনের চোখ।

আরতি বলল, তুমি ত বললে না?

নিখিলেশ বলে, কি?

আরতি নিজের হাত দুটো কোলের কাছে টেনে নিয়ে, বলে যা জানতে চেয়েছি।

নিখিলেশ চোখ দু'টি সরিয়ে নিয়ে আনে আরতির চোখ থেকে। কিছুক্ষণ পর বলে, যা বলতে চেয়েছি তা না বললেও কি আমার বলা হয় নি আরতি? পৃথিবীর এমন অনেক কিছুই আছে যা না বললেও অনেক বলা হয়ে যায়।

আরতি এবারে হাসল, পরে বলে, জানি তুমি লুকোচ্ছ।

নিখিলেশ আবার চোখ টেনে আনে আরতির দিকে. বলে, আমি সবার কাছ থেকে মুক্তিই চেয়েছি। তুমি ভুল বুঝ না যেন। আমি কিছুই লুকোই নি আরতি: আমি হাঁফিয়ে উঠি যখন দেখি সকলেই আমাকে বাঁধতে চায়। তুমি ত জান না, হয়ত সেদিন বিনতা আমার কাছ থেকে শুধু দুঃখই নিয়ে গেছে. আর তুমিও হয়ত দুঃখই নিয়ে যাবে।

আরতি চুপ করে থাকে। সামনে নদীর ঐ বালির সাদা চরটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। সন্ধ্যার ধোঁয়া-গুলি জট পাকাচ্ছে যেন তাকেই ঘিরে।

নিখিলেশ বলে, কি, চুপ করলে যে?

আরতি নিরুত্তাপ কণ্ঠে উত্তর দিল, আমার তরফ হ'তে আর কিছু বলার নেই নিখিলেশ।

নিখিলেশ নিশ্চুপ, কিছুক্ষণ পর বলে ওঠে, তুমি ত জানই আরতি. আমি যে এক একসময় কেমন হয়ে উঠি, কি যে চাই, কিছুই বুঝি না। নিজেকে শুধরাবার কত চেষ্টাই যে করেছি. তার আর হিসাব নেই। ভাবি, এ এক অন্যায় প্রবঞ্চনা কিন্তু কিছুরই কূল-কিনারা করতে পারি না।

আরতি চুপ করে থাকে, আপনার মধ্যে আপনার প্রতিফলন আজ মিলিয়ে দেখতে চায় সে। নিখিলেশ হয়ত ঠিকই বলছে—এটা সৃষ্টিকর্তার এক অন্যায় প্রবঞ্চনা, যদি আরতি এলই তবে সে সুন্দর এক জোড়া চোখ নিয়ে এল না কেন? হয়ত নিখিলেশ বাঁধা পড়ত।

আবার চুপচাপ। মাঝিরা গান গাইছে। পাখীরা ঘরে ফিরছে। একটা উদাসী আত্মার নিঃশ্বাস বয়ে নিখিলেশের হাত-ঘড়িটা শব্দ করে চলেছে।

আরতি বলে, তুমি মুক্তিই যদি চেয়েছ নিখিলেশ তবে চৈতীকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চাইছ কেন বল ত?

খানিকটা আপন মনে হাসল নিখিলেশ, তারপরে শূন্যের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল, এ বন্ধন মুক্তির আরতি।

বুঝতে পারলাম না। আরতি প্রশ্ন তোলে।

নিখিলেশ সহজ ভাবে বলে, এতে না বোঝার কি আছে আরতি? মন যেখানে মুক্ত হ'তে পেরেছে সেখানেই ত আসল মুক্তি।

আরতি চুপ করে থাকে। নিজের হাতের আঙুল-গুলির দিকে তাকিয়ে ধীর গলায় বলে, তুমি যে কি নিখিলেশ, আমি বুঝি না।

নিখিলেশ বলে, সব জিনিসটা বুঝতে যাওয়া বোকামি আরতি। নাও রাত হয়ে এল, এবার ওঠা যাক।

আরতি দ্বিধা না করেই উঠে দাঁড়াল। আবার নিস্তব্ধ হ'ল চারিদিক, রাত্রির অন্ধকার নেমেছে। পায়ে

পায়ে মনের প্রশ্ন কেবল ভারী হ'তে লাগল। আরতি প্রশ্ন করে, তুমি কবে যাচ্ছ এখান থেকে ?

নিখিলেশ বলে, আগামী শুক্রবার।

কণ্ঠের তাপ শীতল হয়ে এসেছে যেন। আরতি অনুভব করল নিখিলেশের মনে আরতি বরফের পাহাড় হয়ে গিয়েছে। কৌতূহল ঢেউ তুলল। আরতি প্রশ্ন করল, কাল কি করবে ?

চৈতীর কাছে যাব। নিখিলেশের কণ্ঠস্বরে কোন বৈলক্ষণ্য নেই। সহজ কথা সহজ করে বলে দিতে পারল কিন্তু আরতির মুখটা কালো হয়ে এল, আরতি তবুও হাসবার চেষ্টা করল। না হাসলে সে নিজেকে অপমানিত করবে। তাই হাসতে হাসতে আগের দিন-গুলির মত সহৃদয় ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা তুলে ধরল, আসছে পরশু ত আসছ আমাদের বাড়ী ?

নিখিলেশ মাথা নাড়ল।

তারপর বিচ্ছেদের কালো পাহাড়। আরতি বুঝতে পারল সব। আজকের বিকাল সব পরিষ্কার করে বলে দিয়ে গেছে। এত সহজে সে হেরে যাবে কোন দিনও জানত না। তাই নিজের ঘরে এসে কাঁদল। নিখিলেশ শুনতে পেল না। কেবল তার মনের আকাশে ইন্দ্রধনুর ছটা পড়ল। তারপর আগামী দিনের অনেক কিছুর পাওনা মিটবে ভেবে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন বিকালের সোনালী রোদ সোনালী স্বপ্ন হয়ে নিখিলেশের কাছে এল। অপেক্ষমান হৃদয়ের সব তৃষ্ণা অমৃত হয়ে ভরে উঠল। নিখিলেশ পা বাড়াল। চৈতীর মন অনন্তের আকাঙ্ক্ষা হয়ে সকাল হ'তে ডেকেছে, দ্বিধা আর লজ্জায় থেমে গিয়েছিল। এখন ত আর কোন বাধা নেই, তাই পায়ের চলায় ছন্দ তুলল। চৈতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। দেখা হ'ল—অনেক তৃষ্ণা, অনেক গান, অনেক সুরে ভরে গেল। চৈতী বলল, সেই কখন থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

নিখিলেশ হাসল। চোখে চোখ রেখে অনেক তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর বলল, মাসীমা আছেন ত চৈ ?

চৈতী নিয়ে এল নিখিলেশকে। ঘরে ঢুকেই প্রণাম করল মাসীমাকে। মাসীমা নিখিলেশকে আশীর্বাদ করলেন তারপর হঠাৎ কি কাজ মনে পড়তেই তিনি নিখিলেশ আর চৈতীকে বসতে বলে চলে গেলেন।

নির্জন ঘর। মুখোমুখি দু'টি হৃদয়। পাশের বড় দেওয়াল ঘড়িটা হ'তে পেণ্ডুলামের আওয়াজ। নিখিলেশ নিস্তব্ধতার তাল ভঙ্গ করল, ডাক দিল, চৈ।

চৈতী চোখ তোলে। নিখিলেশ সেই চোখের দিকে তাকাল, তারপর বিহ্বল হয়ে পড়ল। এবার লজ্জা পেল। চৈতী উত্তর দিল, কী বলছ ?

মাসীমা চলে গেলেন কেন জান ? নিখিলেশ জিজ্ঞাসা করল।

যদিও চৈতী জানে তবুও মিথ্যে করে বলল, না।

নিখিলেশ এমন উত্তর পছন্দ করল না কিন্তু মনে মনে লজ্জা পেল। লজ্জার মেঘ সরাতে অন্য কথা বলল, হাজারিবাগে কেমন কাটল দিনগুলি ?

চৈতী সহজ হয়ে বলল, খুব ভাল, কিন্তু পুরোপুরি আনন্দের দিনগুলি উপভোগ করতে পারি নি।

নিখিলেশ জানে কেন তবুও প্রশ্ন করল, কেন বল ত ?

এবার চৈতী হাসল। গালের দুটো দিকের নিখুঁত টোলটা নিখিলেশ লক্ষ্য করে। আরতিরও অমনি টোল পড়ত গালে। চৈতী এবারে বলে, বিয়োগের ফল সব সময়েই কম, তুমি এখানে আর আমি ওখানে কি করে হবে বল ত ?

নিখিলেশ মুখ ঘোরায়। এত কথা জমেছিল নিখিলেশের মনে কিন্তু নিখিলেশ কেন জানি বলতে পারছে না সব। নিখিলেশের শুধু মনে হচ্ছে সে যদি কেবল চুপ করে থাকে তা হ'লে সব কথা তার বলা হয়ে যাবে। তাই সে চুপ করে থাকে। মাঝে মাঝে চৈতীর দিকে চোখ তুলে চেয়ে থাকে। চোখে চোখ পড়তেই চৈতীর টানা টানা চোখ দু'টি সে দেখতে পায়। অদ্ভুত মায়াঞ্জন লেগে থাকে যেন, মোহময় স্বপ্নমাধুরী দুটো চোখের স্বপ্নে যেন বার বার কথা কয়ে ওঠে। নিখিলেশের মনে হয় এক চোখপাগল মনের হরিণ আজ বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে চায় বনহরিণীর চকিত চাউনিতে। এক দৃষ্টিসুন্দর ভাষাহীন রমণীয়তা সময়ের প্রতিটি স্পন্দনকে মধুময় করে তুলতে চাইছে যেন।

চৈতী প্রশ্ন করল, কি, কথা বলছ না যে ?

নিখিলেশ সংহত হয়। মাসীমা ঘরে ঢোকেন। বনবীর ট্রে নামিয়ে দেয় সামনের টেবিলে। চৈতী ঘরের বাইরে যায়। পোষাক বদল করবে। কিছুক্ষণ পর আবার ঘরে ঢোকে। নিখিলেশ এতক্ষণ কথা বলছিল মাসীমার সাথে। চৈতীকে দেখে তাঁদের দু'জনের কথা থেমে যায়। চৈতী জানে এতক্ষণ তাদের কি কথা হচ্ছিল। তার না শুনলেও চলবে।

একটা ক্রীম-ইয়েলো শাড়ি গোটা গায়ে জড়িয়ে

পথ চলে চৈতী, সঙ্গে নিখিলেশ। মাসীমাই চৈতীকে নিয়ে বেড়াতে যাবার কথা বলেছেন নিখিলেশকে, পথে বসন্তের অভিসার। পথে কোন কথা বলা হ'ল না। কথা বলতে দু'জনের কারুরই ভাল লাগে নি। তাই নীরবে পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্য নিয়েছে। পদ্মার পারে এসে থেমে যায় দু'জনেই। সন্ধ্যা হয় নি তবুও সন্ধ্যার আভাস। নিখিলেশ স্তব্ধ। চৈতী চকিতা। নিখিলেশের একটা হাত এসে চৈতীর হাত ছুঁয়েছে। চৈতীর হাত বাঁধা পড়েছে, যেমন ভাবে মন তার বাঁধা পড়েছিল ছয় মাস আগে।

চৈতী কথা বলে না। নিখিলেশ চুপ করে থাকে। তবুও যেন চৈতী শুনতে পাচ্ছে নিখিলেশের কথা।

সবুজ ঘাসের ওপর তারা দু'জন বসে পড়ল। নিখিলেশ হাতটা এখনও ছাড়ে নি। চৈতী ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে নি। কিছুক্ষণ চুপচাপ। নিখিলেশ বলে, হাজারিবাগে আমার অনুপস্থিতি তোমার কাছে খুব খারাপ লেগেছিল, তাই না?

চৈতী মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বলে, হুঁ। আবার চোখ তোলে সে নিখিলেশের দিকে। নিখিলেশ চোখ ফেরাতে পারে না। চোখে চোখ দিয়ে বহুক্ষণ কেটে গেল।

নিখিলেশ বলে, মাসীমা বলেছিলেন কি জান?

চৈতী বলে, কি?

সামনের ফাল্গুনে আমাদের বিয়েটা সেরে নিতে।

চৈতীর সপ্রশ্ন চোখ, তার উত্তরে তুমি কি বললে?

নিখিলেশ বলে, সেই উত্তরটাই ত তোমার কাছ হ'তে জেনে নেব।

চৈতী এবার মাটির দিকে তাকায়, পরে বলে, আমার উত্তরটাই কি তোমার উত্তর?

নিখিলেশ বলে, হ্যাঁ।

দূরে একটা পাখী ডাকল। আকাশটাকে আরও রঙ্গীন লাগল, আর ধূসর সন্ধ্যা অনেক দূরে অস্পষ্টভাবে কথা বলল। চৈতী চুপ করে থেকে সময় গুণছিল, তারপর বলল, আমারও তাই মত।

আবার চুপচাপ। পদ্মার জল গতকালের মত কালো হয়ে এসেছে চৈতীর কালো চোখের মত। পদ্মার গভীরতাও চৈতীর চোখের গভীরতার কাছে হার মানে যেন।

চৈতীকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে নিখিলেশ তার বাংলোয় ফিরল। পৃথিবীটা অনেক সুন্দর, অনেক আনন্দময়, অনেক উচ্ছল। ভালবাসল আর বহুদিন পর নিখিলেশ নিজের ঘরে বসে গান করল।

পরদিন আবার বিকাল এল। পদ্মার ঘাটে সেই নৌকা, এধারে সারি সারি আমগাছ। সন্ধ্যার ধূপছায়া বৈরাগ্যের ছাপ পড়েছে। কবির এক উদাস খেয়ালের মত প্রকৃতি আজ উদাসী। দূরের চরটা যেন নিশ্চিন্তে পদ্মার জলে মাথা গুঁজে দিয়ে শুয়ে আছে। তার পিঠে ধোঁয়াগুলি জট পাকাচ্ছে ধীরে ধীরে। আরতি সরে এল নিখিলেশের কাছে। নিখিলেশ চোখ তোলে।

আরতি বলে, আমি ভাবতেই পারি নি তুমি আজ আসবে।

নিখিলেশ বলে, কেন?

আরতি এবার খানিকটা অনুস্বরে বলে ওঠে, যে-চোখ তোমায় কাছে টানে, যে-চোখ তোমায় মুক্তি দেয়, সে চোখ ফেলে আমার কথার যে মূল্য দেবে আমি ভাবতেই পারি নি, তাই আমি এক একসময় ভাবি…।

নিখিলেশ বলে, কি?

আরতি বলে, তুমি এক অদ্ভুত বস্তু আমার কাছে অদ্ভুত এক স্বপ্ন, জানি তোমায় পাব না তবুও তোমার পূজা ক'রে মনে মনে। বহু দূরে চলে গেলেও বহু দূরে তোমায় রাখতে পারি না। আবার মনে মনে কাছে টেনে নিই, তাতে শান্তি পাই।

সমবেদনায় মন ভরে ওঠে নিখিলেশের। কিন্তু সমবেদনা জানিয়ে আরতির প্রেমকে ছোট করতে চায় না সে, তাই সে বলে, এ তুমি জেনে-শুনে ভুল করছ আরতি। তোমার মধ্যে যে তুমি আছ তাকে ব্যথা দিয়ে শান্তি কখনই পাওয়া যায় না।

আরতি বলে, আমার মধ্যে যে আমি আছি সেই ত আমার সত্তা নিখিলেশ। আমার মন-প্রাণ সেই ত সব। আজ যেদিকে তাকাই সেখানেই দেখি তুমি। এক একসময় মনে হয়, প্রমথেশের ভালবাসাকে স্বীকার করি, তখনই সর্বদিক হ'তে বাধা আসে। আমার আমিই বিদ্রোহ করে ওঠে। তুমি কি চাও, আমি এই বিদ্রোহের মধ্যে আর একটা লোককে টেনে এনে তাকে আজীবন ফাঁকি দিয়ে যাব?

নিখিলেশ চুপ করে থাকে। কিছুক্ষণ পর বলে, তোমার মধ্যে এ বিদ্রোহকে জাগিয়ে রাখতে যাওয়াটাই তোমার মস্ত এক ভুল আরতি। এই গোটা বিশ্বে ত কত অশান্তি, কত ক্ষোভ, কত দুঃখ, যেটুকু সুখ আছে তা ত তার তুলনায় অনেক কম। সেই সুখের সামনে এদেরকে প্রাধান্য দিয়ে চরম দুঃখবাদী হওয়া

ছাড়া আর উপায় কি? সেটা ত সুস্থ জীবনের পরিচয় নয়!

আরতি নিখিলেশের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে, জীবনের সুস্থতা-অসুস্থতার প্রশ্ন এটা নয় নিখিলেশ। এটা মনের প্রশ্ন। তুমি একাউনটেন্সি পাস করেছ, ব্যাংকের লাভ-লোকসান তুমি হিসেব করে বের করতে পার। সেটা কাগজ-কলমের, কিন্তু মনের কাগজ-কলমে তার সঠিক হিসেব হয় কি?

নিখিলেশ বলে ওঠে, কি পেতে পার, কি পাওয়া যেতে পারত আর কি পাও নি এ হিসেব নিয়ে না চললেও এমন অসুবিধা কিছু একটা হয় না। এমন অনেক মানুষই ত আছে, যারা জীবনে সবচেয়ে বেহিসাবী; সে যাক গে, প্রমথেশ যে তোমায় ভালবাসে এটা ত মিথ্যে নয়?

আরতি বলে, আমি যে তোমায় ভালবাসি এটাও ত মিথ্যে নয়?

নিখিলেশ বলে, তাতে হ'ল কি?

আরতি এবার হাসে, তুমি এখনও ছেলেমানুষ আছ নিখিলেশ, ভালবাসা ভালবাসতে শেখালেও ভালবাসা ভাগাভাগি সহ্য করে না।

নিখিলেশ চুপ করে থাকে। আরতি আবার বলে, পূর্ণতাই ভালবাসার প্রতীক। খণ্ডতাকে আশ্রয় করে যে ভালবাসা, সে ভালবাসার অখণ্ড কোন সত্তা নেই; তুমি যে চৈতীকে ভালবাস, সে চৈতী কিন্তু তোমার অখণ্ড ভালবাসার বস্তু নয়। তুমি চৈতীকে ভালবাস নি, ভালবেসেছ চৈতীর চোখ দু'টিকে। সেটা খণ্ড ছাড়া আর কি?

নিখিলেশ আহত হ'ল যেন। পরে বলে, খণ্ডতার মধ্য দিয়েই ত অখণ্ডকে লাভ করা যায় আরতি। যে চৈতী তার চোখ দিয়ে মনের ভাষাকে ফুটিয়ে তোলে তার চাউনিতে সেই চোখকে ভালবেসে তার মনকে ভালবাসতে নিশ্চয়ই পারব, তুমি দেখে নিও।

একটা অনভিপ্রেত আঘাত এসে বিঁধল আরতিকে। তবুও সে চুপটি করে চেয়ে থাকে নিখিলেশের দিকে। আরতি একটু পরে বলে, ওটা প্রেম নয় নিখিলেশ, মোহ।

নিখিলেশ বলে, সব প্রেমের সুরুই ত মোহ দিয়ে।

আরতি বলে, না, মহৎ প্রেমের আদর্শ তা নয়।

নিখিলেশ আর কোন কথা বলে না। আরতি দূরে চেয়ে থাকে। সন্ধ্যে নামছে নিঃশব্দে। আরতির নিঃশ্বাসের মত নিঃশব্দে অন্ধকার টেনে আনছে যেন। আরতি বলে, রাত হয়ে আসছে, এবার ওঠা যাক।

নিখিলেশও বিশেষ আপত্তি করল না। দু'জনে পথ হাঁটে। আরতি প্রশ্ন করে—তুমি বোধ হয় আগামী পরশু রওনা হ'চ্ছ?

হ্যাঁ। নিখিলেশের স্বরটা গম্ভীর।

আরতি বুঝতে পারে নিখিলেশ হয়ত তার কথায় আঘাত পেয়েছে। কিন্তু আরতি কি তাকে আঘাত দিতে চেয়েছিল? মনের কোনেই হাতড়িয়ে ফিরল প্রশ্নটা। আরতি আঁচলটা বাঁ-হাত দিয়ে টেনে নেয়। সে বলে, ইচ্ছা ক'রে তোমায় দুঃখ দিতে চাই নি নিখিলেশ; যদি আমার কথায় দুঃখ একান্ত পেয়ে থাক তাতে আমি লজ্জিত।

নিখিলেশ এবার সাড়া দেয়, ক্ষোভ থেকে যে দুঃখের সৃষ্টি সে দুঃখ ঝেড়ে ফেলা যায় আরতি, কিন্তু দুঃখ থেকে যে দুঃখের সৃষ্টি, সে দুঃখ মোছা যায় না।

আরতি খানিকটা আনন্দিত মনে হ'ল, তবুও সংযত। পরে বলে, আমার ত একটা দুঃখ নয় নিখিলেশ, আমার দুঃখটা প্রমথেশকেও ঘিরে। ভাবি, এ এক অন্যায় বিচার, যে পেতে চায় সে পায় না আর যে পায় সে পেতে চায় না। এটাই হয়ত এ বিশ্বের বড় এক সংঘাত। এটাই সৃষ্টির মাঝে অনাসৃষ্টি।

নিখিলেশ ভাবে, কিছুক্ষণ পর বলে, তোমার সত্যকে শ্রদ্ধা না করে পারলাম না আরতি। তুমি যতই হাস না কেন? তোমার সত্য যে তোমার কতখানি প্রীতির পাত্র সেটা তুমি নিজে না জানলেও আমি জানি। বিশ্বাস কর, আমি এক একসময় ভাবি কিন্তু ভাবতে গিয়েও নিজেকে হারাতে পারি না; যে-ভাবনা নিজেকে হারাতে না জানলো সে-ভাবনা কি গভীর হ'তে পারে কখনও?

আরতি চোখ তুলে একবার চেয়ে দেখে নিখিলেশকে, আবার দৃষ্টিটা মাটির দিকে রেখে পথ চলে। খানিকটা হেঁটে আরতি বলে, আজ বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল নিখিলেশ।

নিখিলেশের চিন্তাটা চমকাল একবার। আরতি প্রসঙ্গ পালটাতে চায় কেন? আর বেশী কথা হ'ল না। বিদায় নেবার আগে আরতি বলে, কাল ত আর দেখা হচ্ছে না, দিল্লী থেকে ফিরে এলে আবার হয়ত দেখা হবে।

নিখিলেশ প্রশ্ন করে, কাল দেখা হবে না কেন?

আরতি অতি সহজ সুরেই বলে ফেলে যেন, তোমার চোখ যে তোমার পথ চেয়ে রইবে। আরতি একথাটা বলেই যেন অপ্রস্তুত হ'ল মনে মনে। আরতি কিন্তু এ কথাটা বলতে চায় নি মোটেই।

নিখিলেশ ঘুরে তাকাল আরতির দিকে। আরতি জিজ্ঞাসা করে, রাগ করলে?

বেশ গম্ভীর গলায় নিখিলেশ উত্তর দিল, না।

পরদিন, দুপুর বেলায় নিখিলেশ বাইরের পৃথিবীর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল। তারপর গতকালের কথা মনে পড়ছিল। বাইরের ডেকচেয়ারে বসে তাই সে ভাবছিল, আরতির ওপর অভিমান করা কি তার ঠিক হবে? অভিমানের ক্ষেত্রে অধিকারের প্রশ্ন আছে, তাই সে ঠিক করল, আজ যাবে না সে আরতির কাছে।

বিকালের একটু আগেই বের হ'ল সে। রাত করেই সে ফিরবে চৈতীর কাছ হ'তে।

বাইরের গেটটা খোলার শব্দ হ'তেই চৈতী বেরিয়ে আসে, চৈতী দেখে এটা নিখিলেশের ব্যতিক্রম। এতটা সকালে নিখিলেশ কোনদিনই তার সঙ্গে দেখা করতে আসে নি বড় একটা। যেমন ভাবে গোলাপ গাছে গোলাপ আপনি ফোটে ঠিক তেমনি ভাবে চৈতীর হাসি ফুটে ওঠে ঠোঁটে কিন্তু সপ্রশ্ন দৃষ্টি চোখে, এত সকালে যে?

নিখিলেশ বলে, কাজ ছিল না, তাই এমনি এলাম।

নিখিলেশের কথাগুলি খানিকটা লজ্জাজড়িত। সহজ হবার চেষ্টা করে সে, খুব আশ্চর্য হয়ে গেলে নিশ্চয়ই।

চৈতীর চোখ-মুখ দুটোই একসঙ্গে হেসে ওঠে।

নিখিলেশ প্রশ্ন করে, মাসীমা কি করছেন?

চৈতীর মুখে হাসি তখনও লেগে রয়েছে, বলে, মা নেই।

নিখিলেশ প্রশ্ন করে, কোথায় গিয়েছেন?

চৈতী বলে, ডাঃ মিত্তিরের স্ত্রীর সঙ্গে প্যালেস দেখতে, একেবারে ফাঁকা।

চৈতীর দিকে তাকিয়ে দেখল নিখিলেশ। চৈতী লজ্জা পেল খানিকটা। পরে নিখিলেশও অনেকখানি লজ্জা পেল।

নিখিলেশ বলে, একটু অসুবিধে হচ্ছে না?

চৈতী পাল্টা প্রশ্ন রাখে, কিসের অসুবিধা?

এই আমরা দুজনে কেউই সহজ হ'তে পারছি না।

চৈতী কোন উত্তর দিল না। মুখটা নামিয়ে রাখে নীচের দিকে। হয়ত এ কথাটা তার নিজেরও।

কিছুক্ষণ পর নিখিলেশ বলে, আজ যাই চৈ।

চৈতী বলে, কেন?

নীচের দিকে মুখটা রেখে নিখিলেশ বলে, এটা প্রয়োজন।

চৈতী এবার কোন কথা বলে না; নিজের হাত মেলে আঙুলগুলি একবার দেখে নেয় সে।

নিখিলেশ বলে, কি উত্তর দিচ্ছ না যে?

চৈতী বলে, তুমি কি কোন প্রশ্ন রেখেছ আমার সামনে?

নিখিলেশ এবার হাসল, আমার কথাগুলি কি প্রশ্ন হ'তে পারে না?

চৈতীও হাসল, পরে বলে, বলবার রীতি তার অনেকাংশে নির্ভর করে, যাক্ গে, তোমার কি হ'ল বল ত? কেবলই বাজে কথার জাল বুনছি আমরা।

নিখিলেশ বলে এটা এক ধরনের পলায়ন চৈ। তাই নয় কি? ভাল ছবির পিছনে পরিবেশ থাকে। ছবি ফুটে উঠবার তারও দায়িত্ব বড় কম নয়। আজকের খাপছাড়া পরিবেশ আমাদের সবার কথাগুলি লাগামছাড়া করে দিচ্ছে।

তাতে দোষটা কার? চৈতী প্রশ্ন করে।

সহজেই নিখিলেশ বলে ফেলে, দু'জনের।

চৈতী চুপ করে। নিখিলেশ যেন আর একমানুষ হয়ে পড়েছে। অদ্ভুত ত?

নিখিলেশ বলে, আমি কিছুতেই মানতে পারছি না চৈ, তুমি হয়ত জান না চৈ। তোমার সামনে আমার অব্যক্ত অনেক ব্যক্ত, তাই চুপ করে থাকি; তুমি হয়ত ভাব, আমি ভাবতে ভালবাসি, তা নয় চৈ। সেখানে অনুভব থাকে প্রবল তাই অভিব্যক্তি কম আর আজ চুপ করে থাকলে কোথায় যেন অনুভবে দ্বিধা আসে। সঙ্কোচে সঙ্কুচিত হচ্ছে সারা মন, তাই ভাব আমার ভাবনা হয়ে উঠেছে।

চৈতী বলে, তোমায় কোন দিনই বুঝতে পারি না নিখিলেশ। তুমি কি ভাবে ভাবতে ভালবাস, কি অনুভূতি তোমার অনুভব জাগায়, মাঝে মাঝে আমার অহঙ্কারকে পীড়িত করে অত্যন্ত নির্মমভাবে। তবুও আমার সান্ত্বনা…।

থামলে কেন চৈ? নিখিলেশ চোখ তোলে।

আমার সান্ত্বনা, সারা জীবন তুমি আমায় বুঝবার

নিখিলেশ বলে, সুযোগ নেবার প্রশ্নেও যোগ্যতার প্রশ্ন দেখা দেয়।

চৈতী প্রশ্ন করে, সে যোগ্যতা আমার নিশ্চয়ই আছে ?

নিখিলেশ তাকায় চৈতীর মুখের দিকে। চৈতীর চোখ ভারী হয়ে নেমেছে। নিখিলেশ বলে, তোমার-আমার মধ্যে আবার সন্দেহকে পথ করে দিচ্ছ কেন চৈ, ও বস্তু ভয়ানক অন্ধকারের। ওকে দূরে রাখাই ভাল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আজ ছুটি দাও চৈ।

প্রথম কথাটা শুনে চৈতীর ঠোঁট দুটো মনের সাথে হেসে উঠল যেন। পরে শেষ কথাটা শুনে সেগুলি আচমকা থেমে গেল। চৈতী নিরুত্তর থাকে, পরে বলে, আর একটু বসবে না ?

আজ নয় চৈ। মন যখন নিষেধ করেছে একবার তখন আজ যাই। কাল দিল্লী যাচ্ছি। এবার অপেক্ষা করার পালা অনেক দিন-রাত্রি পেরিয়ে আবার দেখব, আবার দেখা হবে।

চৈতী মুখ ঘোরায়। মুখে রাঙ্গা হাসি, চোখে স্মিত দৃষ্টি, আলো আঁধারের ঘন ঘন ছায়া ছায়া ব্যক্ত-অব্যক্তের দোলা। হয়ত কিছু বলা, কিছু না-বলা মন আজ চোখে এসে বাসা বাঁধতে চায়। নিখিলেশ স্তব্ধ। চৈতীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ছুটি নেয় সে।

বিকালের শেষ নিঙ্‌ড়ানো রোদ, গলানো সোনার মত গাছের মাথায় মাথায় রঙের ছোপ ধরিয়েছে; গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে বাঁকা হয়ে এসে পড়েছে ওদের দু'জনের সামনে। দূরের পিচ-ঢালা পথটার দিকে তাকিয়ে নিখিলেশ বলে, তুমি বিশ্বাস কর আরতি, আমি আমার সত্যকে এড়াতে আজ পারি নি। ভেবেছিলাম আসব না, তবুও টেনে আনল। পারলাম না তাই নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে। তুমি কি বলতে চাও, এ সত্য আমার মনের নয় ?

আরতি হাসল একবার, পরে বলে, আমি কি তাই বলেছি নিখিলেশ, তুমি অভিমান করে আসবে না ঠিক করেছিলে তবুও এলে, এতে আমারই এক বড় লাভ। যদি প্রশ্ন কর, কেন ? তবে বলব, তুমিও আপার ওপর অভিমান করতে জান।

নিখিলেশ প্রশ্ন করে, এই সামান্য লাভেও তুমি সন্তুষ্ট আরতি ?

আরতি বলে, সবটা লোকসানে যেতে দিতে মন চায় না।

নিখিলেশ চুপ করে। দূরে নীল আকাশে যে মেঘটা খয়েরী ছিল একটু আগে সেটা গোলাপী হয়ে এল সহসা, সেদিকে তাকিয়েছিল এক নিবিষ্টে। আরতি নিখিলেশের দিকে একবার তাকিয়ে মুখটা নামিয়ে নেয়।

নিখিলেশ বলে, আমি বুঝতে পারছি আরতি, মনের খাতাটা ব্যাঙ্কের খাতার চেয়ে স্বতন্ত্র।

আরতি প্রশ্ন করে, কেন ?

নিখিলেশ বলে, আমার মধ্যেও অনুতাপ আজ মাথা খুঁড়ছে বারে বারে। শুধু এই কথাই বলে চলেছে, অনুতাপ চিত্তের শোধন না চিত্তের দংশন।

এটা তোমার ভুল নিখিলেশ। মন যেখানে অনুতাপে পোড়ে সে অনুতাপ দুর্বলতার, ন্যায়-অন্যায় সবই ত তোমার মন জানে, তবে এ তোল কেন ?

নিখিলেশ আবার চুপ করে, পরে বলে, মন না জানে এমন ন্যায়-অন্যায় আমরা অহরহই করে থাকি।

আরতি বলে, সে মন অন্ধকারের নিখিলেশ।

নিখিলেশ বলে, আমি বুঝি না আরতি, আমাদের সব চাওয়ার পিছনে পাওয়ার প্রেরণা থাকে সেই পাওয়াই যদি হারিয়ে গেল তবে এ চাওয়ার অর্থ কি ?

আরতি হেসে ফেলে, বলে, সেটা সৃষ্টি নয়। প্রেরণার কথা যখন আনলে তবে বলব সেটা প্রেরণা নয়, প্রবৃত্তি। প্রেরণার উৎস আপন মনের গভীরতা থেকে।

নিখিলেশ এবার কিছু বলে না। আরতি বলে, তুমি জান না হয়ত আজ প্রমথেশ এসেছিল, নানা হাসি-গল্পে সকালটা কেটে গেল, আমি জানি ও কি বলতে চায়। কিন্তু তবুও ওকে এমন সুযোগ আমি দিই নি যাতে সে প্রসঙ্গও টানতে পারে। কিন্তু কি আশ্চর্য সে-প্রসঙ্গ ও টেনেছিল। বলত নিখিলেশ, যে-প্রসঙ্গ এড়ানোর জন্য আমি এত সজাগ ছিলাম সে-প্রসঙ্গ ও টেনে আনতে পেরেছিল কি ক'রে ?

নিখিলেশ চেয়ে থাকে আরতির দিকে।

আরতি বলে, এটাই হ'ল ওর প্রেরণা। ওর মনের গভীরতা থেকে যে-প্রশ্ন বার বার উঁকি দেয় সে-প্রশ্ন ওর আপনা হতেই প্রকাশ পেল, আমি না চাইলেও।

নিখিলেশ বলে, তুমি কি বললে ?

আরতি বলে, সেদিন যার আভাস মাত্র দিয়েছিলাম সেটা আজ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলাম।

তুমি ভুল করলে আরতি, এটা যে তার পক্ষে কত বড় আঘাত তা তুমি জানতে না ?

আরতি বলে, আঘাত জেনেই ত আঘাত করলাম। ভাবলাম, আঘাত পেয়ে বকুল ঝরার মত ঝরে পড়বে নিশ্চয়ই।

নিখিলেশ চোখ তোলে।

আরতি বলে, সে-কথার কোন প্রত্যুত্তরই দিল না। শুধু বলল, সব মিলিয়ে ভালবাসার সার্থকতাই ত এটা। সারা মনপ্রাণ দিয়ে ঢেলে যাকে সাজিয়েছি, সে সাজানো টাই আমার সত্য, এর বাইরে আমার কোন সত্য নাই।

নিখিলেশ প্রশ্ন করে, এর উত্তরে তুমি কিছু বললে না?

আরতি বলে, বলতে পারলাম কই? সব কথাই আমার হারিয়ে গেল। ভাবলাম, এটা কি হ'ল? অথচ এটা ত আমি চাই নি। পরে অবশ্য ওকে বলেছিলাম, আমার মধ্যকার ফাঁকি নিয়ে তুমি ফাঁক পূরণ করতে চেয়ো না প্রমথেশ। ওতে তোমার আদর্শ আহত হবে।

এর উত্তরে ও কি বলল জান? ও বলল, আমি ত শূন্য পূরণ করতে চাই নি আরতি, আমি চেয়েছি তোমার মধ্যেকার ফাঁকিকে ভরে তুলতে, কেননা তুমি ত নকল নও, তাই আদর্শের হাতে অচল হবার ভয় নাই।

নিখিলেশ বলে, এটা কথা না কথিকা বুঝি না আরতি।

আরতি বলে, আমিও ঠিক তাই।

সন্ধ্যা নেমেছে জানান না দিয়েই, ওরা কেউ বুঝতে পারে নি। শিশিরের শব্দের মত কখন যে সন্ধ্যা এসে গেছে খেয়াল ছিল না। অন্ধকার ঘিরেছে তাদের দুজনকেই, কুয়াশা পড়ছে ভয়ানক। কাছের আরতি মনে হচ্ছে দূরের যেন। অন্ধকারে আরতির মুখ আবছা দেখে নিখিলেশ। আরতির হাত টেনে নেয় নিখিলেশ। হঠাৎ হাতটা যে কেন টেনে নিল নিখিলেশ বুঝতে পারে না। আরতি হাতটা এলিয়ে দেয় নিখিলেশের কোলে। নিখিলেশ চুপ করে থাকে, কিছুক্ষণ পর বলে, তুমি প্রমথেশকেই বিয়ে কর আরতি।

আরতি চোখ তোলে। অনুমান হ'ল নিখিলেশের। প্রথমটা আরতি কোন কথা বলে না, পরে বলে, আমি তাই কিছু সময় চেয়ে নিয়েছি প্রমথেশের কাছে।

নিখিলেশ প্রশ্ন করে, প্রমথেশ আপত্তি করে নি?

আরতি বলে, না।

আবার চুপচাপ। একটা ছিপ নৌকা সামনে দিয়ে খুব জোরে বেরিয়ে গেল। মাছ-ধরার নৌকা হবে হয়ত।

আরতি বলে, রাত হয়ে এল অনেক, এবার ওঠা যাক।

নিখিলেশ আরতির হাতটা নামিয়ে দেয় কোল থেকে, পরে বলে, বেশ, ওঠ।

রাস্তায় আরতি বলে, তুমি কালকে ত দিল্লী যাচ্ছ, ফাল্গুনের আগে ফিরছ না নিশ্চয়ই।

নিখিলেশ কথার কোন উত্তর দেয় না। মাথা নাড়ে শুধু।

আরতি নিজের ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট কার্ড বের করে, বলে, এটা আমার দার্জিলিং-এর ঠিকানা, তুমি যদি কখনও সময় পাও ত যেও।

নিখিলেশের সপ্রশ্ন দৃষ্টি আরতির ওপর, বলে, তুমি দার্জিলিং চললে নাকি?

সংক্ষেপে আরতি বলে, হুঁ।

নিখিলেশ বলে, কবে?

আরতি বলে, সামনের সপ্তাহে।

তারপর আর কোন কথা হয় নি। নিঃশব্দে বিচ্ছেদ হ'ল।

আরতি সেদিন দার্জিলিং পাহাড়ে। টেলিগ্রাম এল দিল্লীর ঠিকানায়। নিখিলেশ বিব্রত হ'ল। টেলিগ্রামের ভাষাই নিখিলেশকে বিব্রত করেছে। পর পর দুটো একটা বাড়ী থেকে আর একটা চৈতীর মা করেছেন। কলকাতা যেতে লিখেছেন।

কেমিষ্ট্রী ক্লাসে সামান্য অ্যাসিড সলিউশন করতে গিয়ে নাইট্রিক অ্যাসিড পড়ে একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে চৈতীর। হাসপাতালের বেডে কয়দিন থাকতে হয়েছিল তারপর আর হাসপাতালে নয়, গোটা একটা বাড়ী ভাড়া করেছেন চৈতীর বাবা।

নিখিলেশ স্তব্ধ, নির্বাক্। অস্ফুট বেদনা সারা মুখে এনে দিয়েছে বিষাদ আর নিরাশার ছবি। এ বেদনা, এ ব্যথা সারা মনের, সারা হৃদয়ের। চৈতী নিখিলেশের সাড়া পেয়েই সাড়া দিয়ে উঠেছে।

নিখিলেশ এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেছে নিজের জায়গায় এ চৈতী ত সে চৈতী নয়। কোথায় গেল সে? হারিয়ে গেল কি? নিজের মাথার চুলে হাত দিয়ে বাইরের চলমান জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে একটা গোটা দিনই কেটে গেছে নিখিলেশের।

রাতে ডাক দিল চৈতী। নিখিলেশ সাড়া দিয়েছিল। চৈতী আবার ডাক দেয়, কোথায় তুমি, এত দূরে কেন নিখিলেশ?

নিখিলেশ উত্তর দিতে পারে নি। কে দূর করল নিখিলেশকে? প্রশ্নটা ছুড়ে দিল নিজের মধ্যে। প্রশ্ন ত আর চুম্বক নয় যেটা উত্তর টেনে বের করবে।

চৈতীর দুটো চোখই বাঁধা। একটা চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে ডাক্তার সেই কথাই বলেছেন। অপারেশন

হবে। চৈতী আবার ডাক দেয়, একটু কাছে এস না নিখিলেশ।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিখিলেশ কাছে যায়। নিখিলেশ চোখ ঘুরিয়ে থাকে অন্যদিকে। চৈতী বলে, এ কি হ'ল নিখিলেশ।

নিখিলেশ কথা বলে না। কে যেন বোবা করে দিয়েছে তাকে।

এমারজেন্সী জানিয়ে সে ছুটি চেয়ে পাঠিয়েছে আরও সাত দিনের।

পাহাড়ের গায়ে দু'জনে তখনও বসে। সূর্য ডুবে গেছে, হিম পড়ছে বাইরে। ঘরে উঠে এল, বাইরের শীতের চেয়ে আরতির মনের শীতলতা অনেক বেশী।

আরতি নিখিলেশের কথা শুনে হেসেছিল। নিখিলেশ আহত হ'ল ভয়ানক ভাবে। নিখিলেশ তবুও প্রশ্ন করে, এ কি হ'ল আরতি?

আরতি কথা বলে না। নিখিলেশ বলে, তুমি কোন কথা বলছ না কেন আরতি?

আমার ত কিছু বলার নেই, নিখিলেশ।

তবুও তুমি চুপ করেই থাকবে?

আরতি বলে, তোমার কথাই চুপ করিয়ে দিয়েছে আমাকে, নিখিলেশ।

নিখিলেশ প্রশ্ন করে, কেন?

আরতি বলে, এতে আর প্রশ্ন তুলো না, তাতে আমার চেয়ে তুমিই বিব্রত হবে বেশী।

নিখিলেশ বলে, তোমার কিছু না-বলাতে কম বিব্রত হচ্ছি না।

আরতি চুপ করে থাকে। একটু থেমে পরে বলে, আমার কিছু বলাতেই কি সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে?

উত্তর না মিললেও সান্ত্বনা মিলবে আরতি।

আরতি বলে, সান্ত্বনা চেয়ে আর ছোট হয়ো না নিখিলেশ, বরং মেলাতে চেষ্টা কর।

খানিক থেমে নিখিলেশ বলে, চৈতী আর আমি দুটো আলাদা হয়ে গিয়েছি, সেটা লক্ষ্য করেছ কি? মেলাতে চেষ্টা করলেও কি মেলানো সম্ভব হবে?

আরতি বলে, সেটাই সম্ভব করতে হবে নিখিলেশ।

এ তুমি অন্যায় বলছ আরতি। নিখিলেশের দৃষ্টিতে প্রতিবাদের চিহ্ন।

আরতি বলে, এটা অন্যায় নয় নিখিলেশ। সেদিন বলেছিলাম মনে আছে হয়ত তোমার, অখণ্ড সত্তাই ভালবাসার প্রাণ। আজ চৈতীর একটা মাত্র অভাবই তোমার চোখে বড় হয়ে ধরা দিল, বাকীগুলি তুমি ভুলতে সুরু করলে।

নিখিলেশ বলে, তুমি প্রাণকে হত্যা করে প্রাণের প্রতিষ্ঠা কি করে আশা কর আরতি? যে চৈতী একদিন আমার সামনে আলো আনত, সেই চৈতী আজ অন্ধকার আনছে। এত অন্ধকারের মধ্যে আলোর প্রতিষ্ঠা কি করে সম্ভব, কি করে সম্ভব আবার নতুন করে নতুন জীবনকে স্থায়িত্ব দেওয়া?

আরতি বলে, ওটা তোমার অনুযোগ নিখিলেশ। পৃথিবীতে আলোও যেমন সত্য, অন্ধকারও ঠিক তেমনি সত্য।

নিখিলেশ বলে ওঠে, পৃথিবীর সব সাধনাই ত আলোর সাধনা।

আরতি বলে, অন্ধকারকে এড়িয়ে নয় নিশ্চয়ই।

নিখিলেশ চুপ করে। আরতি একটু থেমে আবার বলে, তুমি ফিরে যাও নিখিলেশ। চৈতীকে গ্রহণ কর তোমার সমস্ত অনুযোগ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে। অন্ধকারের মধ্যে আলোকের প্রতিষ্ঠা কর, সেটাই কঠিনতম সাধনা, সেটাই তোমার ব্রত। কিছুক্ষণ থেমে পরে আবার বলে, ভালবাসা একটা ব্রত, এটা ভুলে যেও না নিখিলেশ।

নিখিলেশ নির্বাক্। কাঁচের সাসি-আঁটা জানলার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে পরে চোখ তুলে চায় আরতির দিকে। আরতি চেয়ে আছে নির্নিমেষ নয়নে। নিখিলেশ বলে, তুমি আমার সঙ্গে চল আরতি।

আরতি বলে, না, সে হয় না নিখিলেশ, তুমি একাই যাও।

নিখিলেশ প্রশ্ন করে, কেন?

আরতি বলে, আমি যে প্রমথেশকে কথা দিয়েছি।

গান

ভূমিকা

[বাংলা দেশে বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত প্রথম সেবা-প্রতিষ্ঠান দাসাশ্রম—মৃগাঙ্কধর রায়চৌধুরী, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যাহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—সাধক ইন্দুভূষণ রায় ছিলেন সেই দাসাশ্রমেরই প্রধান সেবাদাস। ইন্দুভূষণ রায় মরমিয়া সাধক ছিলেন। ১৮৮০ হইতে ১৮৯০ সালের মধ্যে "প্রকৃতি-গায়িকা" নামে তিনি গানগুলি রচনা করেন। তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন এবং ভক্তজনসমাজে, একতারা বা এস্রাজ সহযোগে, গানগুলি তিনি গাহিতেন। বরিশালে, অশ্বিনীকুমার দত্ত, জগদীশ মুখোপাধ্যায় (মাষ্টার মশায়), মনোমোহন চক্রবর্তী, বরদাকান্ত রায়, রেবতীমোহন সেন, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রভৃতি ভক্তদল তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া ভাবোন্মত্ত প্রাণে তাঁহার গান শুনিতেন। জগদীশ মুখোপাধ্যায় যেমন জ্ঞানী তেমনি ভক্ত মানুষ ছিলেন। প্রধানতঃ তিনিই—মনে হয় অশ্বিনীবাবুর অর্থানুকূল্যে—গানগুলিকে "রসলীলা" এই নামে বিস্তারিত টীকাসহ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন।

ভক্ত ইন্দুভূষণ—১৮[illegible] সালে কিছুকাল দেওঘরে অবস্থান কালে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, নিত্য সন্ধ্যায় ভুলি করিয়া ইন্দুভূষণের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইতেন।

"সে কোন জোছনা দেশ সই রে" এই গানটি শুনিতে শুনিতে বসু মহাশয় মত্ত হইয়া পড়িতেন এবং ইংরাজী ভাষায় উচ্চতম প্রশংসার বাণী সকল উচ্ছ্বসিত হইয়া উচ্চারণ করিতেন। জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ইংরাজীতে লিখিত সেই উচ্ছ্বাস বাণী রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে আনাইয়া "রসলীলা"র পিছনে মলাটের উপর ছাপাইয়াছিলেন, আমি সেই লেখা পড়িয়াছি জ.

বেহাগ | ত্রিতাল

সে কোন্ জোছনা-দেশ সই রে।
যেথা অগণন চকোর মধুপানে বিভোর
নাহি জানে নিত্য সুখ বই রে॥
পাষাণ ভেদিয়া ফুটে জীবনের ফুল রে,
সাগর অমৃতময় নাহি তার কূল রে,
সেথা প্রেম-নিঝরিণী যত উরধগামিনী
কই সে দেশ সই কই রে॥
বদন সোহাগে চুমে চরণের মূল রে,
প্রাণময়ী ভাষা যথা নাহি তায় ভুল রে,
যে দেশের অভিধানে দুখ মানে সুখ রে,
তুমি মানে আমি বই নই রে।
সাকার ডুবিয়া মনে নিরাকার চুপে,
নিরাকার ফুটে উঠে সাকার রূপে,
নিরাধার মহাপ্রাণ দিবানিশি জাগে,
কই সে দেশ সই কই রে॥

কথা ও সুর : ইন্দুভূষণ রায় — সুরস্মৃতি : শ্রীজীবনময় রায়

স্বরলিপি : শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

II সা সা গা গা | গা গা গমা - পধা | পা - মা - াঃ - গঃ | রগা - া - রসা ন্সা I
সে কো ন্ জো ছ না দে০ ০শ স ০ ০ ই রে ০ ০০ ০০
[মপা পা]

I { মা মপা পা পা | পা -া পা পা | মপা পা পা পা | পা - া পা ধা I
অ গ০ ণ ন চ ০ কো র ম০ ধু পা নে বি ০ ভো র

I ণা র্সা র্সা র্সণা | ণা ণধা পা -া | পা - ধা-পা - মা | গা - া (গা মা)} [রসা - ন্সা II
না হি জা নে০ নি ত০ স্ব প্ ন ০ ০ ই রে ০ সে পা ০০ ০০

II পা পা না না | না না না নর্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সর্রা - নর্সা র্সা - া I
পা খা ভে দি য়া ফু টে০ জী ব নে র ফু০ ০ল্ রে ০

I পা পা -র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সর্রা - র্সা | না না ধপা - া | ধনা - র্সা ধনা - া I
সা গ র অ মৃ ত ম০ য়্ না হি তা০ য়্ ফু০ ল্ রে ০

I { মা - পা পা পা | পা পা পা পা | মপা পা পা পা | পা - া পা - ধা I
প্রে ম নি ঝ রি ণী য ে উ র ধ গা মি ০ নী ০

I ণা - র্সা - ণা ণধা | ণর্সা - ণধা পা - া | পা - ধা - পা - মপা | মগা -া (গা মা)} -রসা - ন্সা II
ক ০ ই সে০ দে০ ০শ স ই ক ০ ০ ০ই রে০ ০ সে পা ০০ ০০

II সা সা - পা পা | পা পা পা পা | মপা পা পা পা | পা - া পধা - মা I
ব ন্ ন্ সো হা গে চু মে চ০ র ণে র মু ল রে০ ০

I পা ধা ণা র্সা | ণা ণধা পা পা | পা ধা পা - মা | মগা - রগা গা - া I
প্রা ণ ম য়ী ভা ষা০ য থা না হি তা য়্ ভু০ ০ল্ রে ০

I গা গা গা -া ৷ গা গা গমা রা ৷ গা -মা পা মা ৷ গা -া গমা -রা I
যে দে শে র্‌ অ ভি ধা০ নে দু খ্‌ মা নে সু খ্‌ রে০ ০

I রা গা মা পা ৷ মা মা গা -া ৷ রগা -গগা -গগা -ন্‌রা ৷ সা -া -া -া I
তু মি মা নে আ মি ব ই ন০ ০০ ০০ ০ই রে ০ ০ ০

I পা পা -না না ৷ না না না নর্সা ৷ র্সা র্সা র্সা -া ৷ সর্রা -নর্সা র্সা -া I
সা কা র্‌ ভু বি য়া ম রে০ নি রা কা র্‌ চু০ ০০ পে ০

I পা পর্সা র্সা -া ৷ র্সা র্সা র্সর্রা র্সা ৷ না -ধা ধপা -া ৷ ধনা -র্সা ধনা -াধ } I
নি রা কা র্‌ ফু টে উ০ ঠে সা ০ কা র্‌ রূ০ ০ পে ০

I { পা পা পা -া ৷ পা পা পা -া ৷ সপা পা পা পা ৷ পা -া পা -ধা I
নি রা০ ধা র্‌ ম হা প্রা ণ দি০ বা নি শি জা ০ গে ০

I ণা-র্সা-ণা ণধা ৷ ণর্সা-ণধা-পা-া ৷ পা-ধা-পা-মপা ৷ মগা-া (গা মা)} ৷ রসা-ন্‌সা II II
ক ০ ই সে দে০ ০শ্‌ স ই ক ০ ০ ০ই রে০ ০ সে ণা ০০ ০০

উর্বশীর মন

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

উর্বশী সেনের রূপের সঙ্গে উর্বশীর কোন তুলনা হয় না। তবু মেয়ে হবার পর বাবা-মা আদর করে নাম রাখলেন উর্বশী। ছেলেপিলে সকলেরই সুন্দর হয় না। কিন্তু সুন্দর একটি নাম রাখতে সাধ যায় বৈকি! পাড়া-পড়শী আড়ালে বলেছিল, মায়ের রূপের একটুও পায়নি উর্বশী। সবটাই বাপের মত। কথাটা মিথ্যে নয়। উর্বশীর মা সত্যিকার সুন্দরী। বয়স এলেও শরীরের বাঁধন আজও ঢিলে হয় নি তার। গায়ের রং একটুও মলিন হয় নি। সেই যৌবনদিনের গোলাপী রঙের মত আজও তার ত্বক উজ্জ্বল, অমলিন।

সে তুলনায় উর্বশীর বাবা রীতিমত অসুন্দর। বেঁটে-খাটো ভদ্রলোক। গায়ের রং আঁধারবর্ণ। পুরু ঠোঁটের সঙ্গে মাংসল গাল দুটো তার চেহারাটাকে আরও বেমানান করে দিয়েছে। মাথার চুল মিশমিশে কালো কিন্তু পাতলা ও চিক্কণ নয়। বাপের গায়ের রং পুরোটাই উর্বশীর গায়ে এল। তেমন লম্বা হ'ল না মেয়ে। মরালীর মত গ্রীবাদেশ কাঁধ ছাড়িয়ে অনেকখানি উঠল না। শুধু চোখ দুটো মায়ের মত হ'ল উর্বশীর। টানা টানা আয়ত কালো চোখ। কাজল পরিয়ে দিলে আরও সুন্দর লাগত।

রূপ না থাকলেও রূপোর পয় উর্বশীর। ওর জন্মের পরই বিপিনবাবুর প্র্যাকটিশ উঠল জমে। কেমন করে কি করে নাম ছড়াল, বিপিনবাবু নিজেই ভাল করে বুঝে উঠতে পারলেন না। শুধু একদিন মনে হ'ল এটর্ণীরা যে তাড়াবন্দী কেস পাঠাচ্ছে আর সেগুলি নেওয়া যাবে না।

বছর না ঘুরতেই বিপিনবাবু ফুলে-ফেঁপে উঠলেন। পুরণো গাড়িটা বেচে দিয়ে নতুন মডেলের বিলিতী গাড়ি এল। শ্যামবাজারের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে বালিগঞ্জের নতুন বাড়ীতে এলেন উঠে। জায়গা কিনলেন লেকের কাছে। একটা নাম করা কন্ট্রাক্টর ফার্মকে প্ল্যানমাফিক বাড়ী করতে বলে পাঠালেন।

নতুন বাড়ীতে এসে উর্বশীর ঠাকুমা একদিন বলেছিলেন,—'এ মেয়ের নাম তুই পাল্টে দে বিপিন। উর্বশী কেন হবে, মেয়ে তোর লক্ষ্মী। যেদিন তোর ঘরে এসেছে সেদিন থেকেই বাড় বাড়ন্ত। তুই নিঃশ্বেস ফেলতে সময় পাচ্ছিস নে।' একটু থেমে আবার শোবার ঘরের দিকে চেয়ে জোর গলায় বললেন, 'রূপ নিয়ে কি হবে? শুধু রূপ ধুয়ে ত আর জল খাওয়া যায় না। আয়-পয় থাকে তবে বুঝি—'

কথাটা উর্বশীর মাকে উদ্দেশ্য করে শোনানো। বাপের অবস্থা ভাল নয় তেমন। শুধু রূপের জোরেই বিয়ে হয়েছিল। ভাল ঘরে, ভাল বরে। তখন ওকালতি সবে সুরু করেছেন বিপিন। একদিন মক্কেল আসে ত, দশদিন মাছি তাড়াতে হয়। এমনি অবস্থা প্রায় দু'বছর। সে দিনগুলো মনে পড়লে ভয় পান বিপিনবিহারী।

দেখতে-শুনতে তেমন না হ'লেও লেখাপড়ায় মাঝা-মাঝি। লরেটো থেকেই স্কুলের গণ্ডি পেরুল উর্বশী। লরেটো কলেজেই রয়ে গেল। একবার ইচ্ছে হয়েছিল স্কটিশে যায়। কিন্তু বিপিনবিহারী মত দেন নি। তাছাড়া বড্ড দূর। লেক থেকে অনেকখানি।

মেজে-ঘষে নিজেকে মোটামুটি চলনসই করে নিল উর্বশী। কলেজে এসে প্রথম জানল নিজেকে। ভেজানো ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। শরীরের সমস্ত গঠন, খুঁত, সৌন্দর্য আঁতি-পাতি করে খুঁজে বেড়াল। তারপর থেকেই নিজেকে নিয়ে পড়ল উর্বশী। সবটুকু আড়াল করে শুধু সৌন্দর্য-টুকু মেলে ধরা। নিরলস সাধনা উর্বশীর। অল্পদিনেই নতুন আর্টে সে পারদর্শিনী হয়ে উঠল। কলেজে সঙ্গিনীদের মধ্যে, বাড়ীতে ঘরোয়া পরিবেশে, বাইরের পার্টি আর পিকনিকে উর্বশী সেন অনায়াস দক্ষতায় সকলের সঙ্গে সুন্দর ভাবে মিশল।

বি. এ. পাশ করে বেশীদিন বসে থাকতে হ'ল না। বাইশ পেরোবার আগে পদবী বদল হ'ল উর্বশীর। রায় থেকে সেন। ওর প্রিয় বন্ধুরা বলল, গায়ের রং ফর্সা না হ'লে কি হবে? উর্বশী সব মিলিয়ে দেখতে কি খারাপ? বিমান সেন পছন্দ করেই বিয়ে করেছেন। চমৎকার ম্যাচ হয়েছে দু'জনের।

উর্বশীকে যারা হিংসে করত, তারা অন্য কথা রটাল। উর্বশীকে বিয়ে না করে উপায় ছিল না বিমান সেনের। নতুন উকীলের কি অমনি পসার হয়? শ্বশুর যদি মুরুব্বী হন তা হ'লে জুনিয়র করে নেবেন অনেক কেসে।

ছোটখাটো মোকদ্দমায় নিজেই সওয়াল করবে। কদিন আর হাইকোর্টে বেরুচ্ছে বিমান সেন? অমন উকীল করিডোরে গিজগিজ করছে। আর কম টাকা নিয়েছে না কি বিমান সেন? পেইণ্টের আড়ালে কতখানি আর লুকোতে পেরেছে উর্বশী, কালো মেয়ে ব'লে কি দ্বিগুণ টাকা ঢালতে হয় নি বিপিনবাবুকে?

টাকা নিয়ে বিপিনবাবুর চিন্তা ছিল না। কোন এক অদৃশ্য দেবতা কয়েক বৎসর ধরে তার দিক লক্ষ্য ক'রে শুধু নোটের তোড়া ছুঁড়ে চলেছেন। বিপিনবাবুর কাজ শুধু লুফে নেওয়া। খেলা বেশ জমে উঠেছে। লাফা-লুফি খেলা। বিপিনবাবু শুধু লুফে নিচ্ছেন।

বিমান সেনের অবস্থা ভাল। সত্যি লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে উর্বশী। বাড়ীতে আসার পরই রোজগার বেড়ে গেল বিমান সেনের। পৈতৃক আমলের হিলম্যান গাড়ি ছিল। সেটা ছাড়া আর একটা ফিয়াট্ নিল উর্বশী। ছোটখাটো গাড়ি। নিজেই চালাবে। নিউ আলিপুরের বাড়ীর লনে ছুটির দিনের সন্ধ্যের বুকে ডিনারের আয়োজন প্রায়ই হতে লাগল। দরজা-জানলার পুরণো পর্দাগুলো বাতিল করে সুন্দর জাপানী কাপড়ের পর্দা ঝুলিয়ে দিল উর্বশী। আসল কথাটা হ'ল রুচি। পয়সা অনেকেরই থাকে। কিন্তু সুন্দর ছিমছাম জীবনযাত্রা ক'জন লোকের? বেঁচে থাকা একটা আর্ট। উর্বশী সেন বিমানকে কথাটা নানাভাবে বোঝাল।

মোটামুটি বশ করেছিল উর্বশী। বিমান ওকে ভালবাসতে সুরু করল। রঙে যেটুকু ঘাট্‌তি ছিল, লাস্যে-হাস্যে সেটুকু পুরণ করে দিল উর্বশী। আদর করে একটা ছোটখাটো নাম দিতে চেয়েছিল বিমান। কিন্তু উর্বশী রাজী হয় নি। বিমানের কানের কাছে মুখ এনে সে শুধু ফিসফিস করে বলল, 'অন্য নাম নয়, তোমার কাছে শুধু উর্বশী নামেই থাকতে চাই।'

দু'বৎসর পর মেয়ে এল কোলে। উর্বশীর মেয়ে। বিমান বলেছিল, মেনকা নাম থাক।

ঠোঁট উল্টিয়ে উর্বশী বলল, 'ছাই পছন্দ তোমার। ওর নাম রাখব ডোডো।'

'সে কি?' বিমান হেসে বলল, 'উর্বশীর মেয়ে ডোডো হবে কেন?

'আমার ইচ্ছে'। একটা নারীসুলভ কটাক্ষ করল উর্বশী। বলল, 'বিমানবাবুর মেয়ের নাম তা হ'লে এরার হোস্টেস রাখতে হয়।

দুপুরের দিকে হাত খালি। কোন কাজ নেই। ডোডো ঘুমোয়। অবশ্য ওর জন্য আয়া আছে। তারই হেফাজতে ডোডো থাকে। উর্বশী শুধু গাল টিপে আদর করে মেয়েকে। কিংবা আয়া সাজিয়ে দিলে অতিথি-অভ্যাগতের সামনে মেয়েকে কোলে নিয়ে দাঁড়ায়।

কার্তিকের শেষে হাওয়ায় শীতের ঈষৎ কাঁপন লেগেছে। নিউ আলিপুরের গাছে গাছে পাতা ঝরার দিন এল ব'লে। আকাশ ঝকঝকে নীল। রোদ ম্লান, নিরুত্তাপ।

অন্য দিনের মতই ফিয়াট্ গাড়িখানা নিয়ে বেরুল উর্বশী। বাপের বাড়ীতেই ড্রাইভিং শিখেছিল। লাইসেন্স নিয়েছে। বিয়ের পর এলোমেলো মোটরিং করে অনেক সহজ হয়েছে। এখন অনায়াসে এগিয়ে যায়। কলকাতার রাজপথে ভিড়ের মধ্যেও দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাতে অনেকে দেখেছে উর্বশীকে। চোখে সানগ্লাস, কানের কাছে চুলগুলো অল্প অল্প উড়ছে।

পার্ক ষ্ট্রীটে ঢুকে বাঁ-দিকে থামল উর্বশী। গাড়িখানা রাখার পক্ষে এই জায়গাটাই ভাল। কি ভীষণ বেড়ে গেছে গাড়ির সংখ্যা। কলকাতায় হয়ত এমন দিন আসবে যখন মাইলখানেক দূরে গাড়ি রেখে মানুষকে হেঁটে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে হবে। নিজের মনে একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব অনুভব করল উর্বশী। জিভের সাহায্যে একটা চুক্ চুক্ শব্দ করল।

রাস্তা পেরিয়েই বড় দোকানটা। নানা ধরণের পাথর আর গহনার সম্ভার। শপিং করতে এসে মাঝে মাঝে এখানটায় ঢোকে উর্বশী। পাথর খুঁজে বেরানো একটা 'হবি' ওর। গহনায় পাথর বসিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখবে। ওর অধিকাংশ গহনাতেই পাথর সেটিং আছে। মাঝে মাঝে বদলায় উর্বশী। একটা পাথর অনেকদিন ধরে পরবে না।

দোকানদার চেনে ওকে। মোটা মতন গুজরাতী ভদ্রলোক, জহুরীর চোখ। শুধু পাথর নয়, ইচ্ছুক ক্রেতাদের মধ্যে আসল আর মেকি যাচাই করে নিতে দেরী হয় না, উর্বশীকে প্রথম দিনই আবিষ্কার করেছিলেন ভদ্রলোক। সমাদর করে নিয়ে এসেছিলেন ভিতরে। চেয়ারে বসিয়ে আগেই অর্ডার করলেন এক পাত্র দামী আইসক্রীম।

উর্বশী মৃদু আপত্তি জানিয়েছিল।

সেই থেকে দোকানটায় মাঝে মাঝে আসে উর্বশী। বিমানকেও নিয়ে এসেছে দু'একবার।

গুজরাতী ভদ্রলোক কাজ করছিলেন। ঝানু সেলসম্যান। ক্রেতার মনোরঞ্জন করা সুন্দর আয়ত্ত। উর্বশীকে দেখে হেসে বললেন, 'আসুন ম্যাডাম।

সমস্ত মাস ধরে ত আপনাকেই প্রতীক্ষা করছি।'

'কেন ? আমি ছাড়া আর কি খদ্দের নেই আপনার ?'

ভদ্রলোক উদাসীনের মত হাসলেন।

'নেই কেন ? কেনার লোক ত অনেকই আছে। কিন্তু আসল ব্যাপার জানেন কি ম্যাডাম। আমার জিনিষগুলো তাদেরই হাতে দিতে মন চায়, যাদের রুচি আছে। শিল্পীর মন আছে।'

অল্পবিস্তর তোষামোদ। উর্বশী বোঝে। তবু শুনতে ভাল লাগে। শুনতে ইচ্ছে করে। বিশেষ করে মেয়েদের। স্তুতি পেলে আর কিছু চায় না। তাকে সব তুলে দিতে পারে। কিছু অদেয় থাকে না।

'নতুন কি পাথর-টাথর এসেছে দেখান।' উর্বশী চেয়ারে বসতে বসতে বলল।

ভদ্রলোক যেন তৈরী ছিলেন। দুটো বাক্স খুলে ধরলেন সামনে। নানা রঙের, নানা ধরণের। নানা সাইজের পাথর।

একটা মালা ভারী পছন্দ হ'ল উর্বশীর। লাল পাথরের সারি, অনেকটা রুদ্রাক্ষের মালার মত। গুণে গুণে পাথরগুলো দেখল উর্বশী। গলায় পরল একবার। দোকানের চেম্বারে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়াল। নানা-ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেকে দেখল। তাকে মানায়। খুব সুন্দর লাগে।

গুজরাতী ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'ম্যাডাম, ক্ষমা করলে একটা কথা বলি।'

'বলুন না।' উর্বশী অভয় দিল।

'আপনাকে যা দেখাচ্ছিল না। স্প্লেনডিড।'

উর্বশী খুশী হ'ল। মালাটা খুলতে খুলতে বলল, 'কি দাম বলুন ?'

'সাত শ।'

একটু যেন মিইয়ে গেল উর্বশী। চোখ দুটো সামান্য করুণ দেখাল। ঠিক এতটা দাম আশা করেনি। একটু ভারী গলায় বলল, সাত'শ দাম ?

'ওটা রেয়ার ষ্টোন ম্যাডাম। একটাই মালা এসেছে।'

কি একটু ভাবল উর্বশী। তারপর আবার ঝল্‌মলিয়ে উঠল। চোখ দু'টি খুশী-খুশী, ঠোঁটের কোনে মিষ্টি হাসি। বলল, 'রেখে দিন আজ। কাল-পরশুই ওকে নিয়ে আসছি। দেখবেন, আবার কাউকে বেচে দেবেন না যেন।'

ভদ্রলোক এমন একটা ভাব দেখালেন যেন মালাখানা দু-চারদিনের জন্য নয়, সমস্ত জীবনভোর উর্বশীর জন্য তুলে রাখবেন।

বলচেন, 'আগেই ত বলেছি ম্যাডাম। আমার জিনিষ সবাইকে বিক্রী করতে মন যায় না। আপনি বললেন, আর কি যাকে-তাকে বেচে দিতে পারি ?'

রাস্তায় নামল উর্বশী। ঘড়ির কাঁটায় চোখ রাখল। তিনটে বাজতে দেরি নেই। এবার ফিরবে। হঠাৎ ওর মনে কেমন একটা বিষণ্ণ আর্দ্রতা ভেসে এল। লাল পাথরের মালাটা নিয়ে ফিরতে পারলে খুব উৎসাহিত বোধ করত উর্বশী। কিন্তু সাত শ' টাকা দাম, বিমানকে না ব'লে কাজটা করা ঠিক হ'ত না।

গাড়ির কাছে আসতেই কে একটি মেয়ে এগিয়ে এল ওর কাছে। উর্বশী মুখ তুলে চাইল। অল্পবয়সী মেয়ে। বাইশ-তেইশের বেশি নয়। পরণের কাপড়-চোপড় অতি সাধারণ। পায়ের শ্লিপারগুলো রীতিমত জীর্ণ।

'একটু সাহায্য করবেন আমায় ?'

'কি সাহায্য ?' উর্বশী যেন খানিকটা আঁচ করল।

'বড় বিপদে পড়েছি, কয়েকটা টাকা পেলে'—

টাকা ?'

'বললে বিশ্বাস করবেন না, আজ দু'দিন একবেলা খেয়ে আছি।'

এই মরমর কার্তিকের বিকালে হঠাৎ মনটা কেমন সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল উর্বশীর। দুঃখ, বেদনাবোধ, পরোপকার করবার একটা প্রবৃত্তি ওর মনকে সিক্ত করে তুলল। মেয়েটির দিকে মমতামাখানো দৃষ্টিতে চাইল সে।

বলল, 'কয়েকটা টাকায় তোমার কি হবে ? তার চেয়ে আমার সঙ্গে চল, তোমার সব কথা শুনে কোন একটা চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা করে দেব।'

মেয়েটি কি যেন ভাবল। তারপর আমতা আমতা করে প্রশ্ন করল, 'যাব ? মানে আপনার সঙ্গে ?'

'হ্যাঁ। আমাকে ভয় কিসের ? আমি তো তোমারই মত মেয়ে।'

গাড়িতে উঠে মেয়েটি জড়সড় হয়ে বসল। কেমন একটা কুণ্ঠিত-কুণ্ঠিত ভাব। এমন গাড়িতে হয়ত কোনদিন বসেনি। হয়ত কোনদিন ভাবতেও পারে নি এমনি গাড়িতে উর্বশীর মত মেয়ের সঙ্গে যাবে।

মাঝেরহাট ব্রীজ পেরিয়ে গাড়ি নিউ আলীপুরে ঢুকল। ইতিমধ্যেই দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করে নিয়েছে উর্বশী। ক'ভাইবোন ওরা ? বাবা-মা কোথায় আছেন ? কতদিন এসেছে কলকাতায় ? লেখাপড়া কতদূর শিখেছে।

এখন অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে মেয়েটি। উর্বশীকে একটু আপন আপন মনে হচ্ছে। নির্ভর করতে পারা যায় এমন একজন।

উর্বশী ভাবছিল অন্য কথা। চট্ করে মেয়েটিকে গাড়িতে তোলা ঠিক হল কি? কিন্তু সাত শ' টাকার পাথরের মালাটা না কিনে আনতে পারার জন্য অবসাদ তার মনে অদ্ভুত একটা মমতার সঞ্চার করল। এ জগতে যারা বঞ্চিত, তাদের জন্য অনুভব করা, সহানুভূতি জানানর একটা অদম্য প্রবৃত্তি তাকে হঠাৎ পরোপকারী করে তুলল।

ড্রয়িং-রুমে এসে সোফার উপর ওকে বসাল উর্বশী। বয়কে ডেকে খাবার দিতে বলল। জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবে, না কফি?'

মেয়েটি বলল, 'শুধু চা'ই বলুন। আবার খাবার-টাবার কেন?'

'তাতে কি হয়েছে? খেয়ে-টেয়ে আগে সুস্থ হয়ে নাও।'

বাথরুমে ঢুকল মেয়েটি, মুখহাত ধোবে। ঝকঝকে তকতকে বাথরুম। মার্বেল পাথরে এতটুকু দাগ নেই। দেওয়ালে চৌকো আয়না, বেসিনের কাছে ছোট্ট একটা তাক মতন। তাতে হেয়ার ক্রীম, সুগন্ধি তেল, দাঁত মাজবার পেষ্ট, ব্রাশ, টুকিটাকি প্রসাধন সামগ্রী, সব সাজানো।

ভাল করে মুখ হাত ধুল মেয়েটি। পরিষ্কার করে মুছল। চুলগুলো আঁচড়াল সযত্নে। নারীসুলভ বাসনাকে দমন করতে না পেরে সামান্য একটু প্রসাধন করল।

সোফার সামনে টেবিলে খাবার দিয়েছে বয়। নানা ধরণের খাবার। কেক, স্যাণ্ডউইচ থেকে সন্দেশ পর্যন্ত। অনেক, একরাশ।

মেয়েটি বলল, 'এত খাবার আমি কি খেতে পারব?'

'যা পার তাই খাবে।' উর্বশী হেসে বলল।

অল্প অল্প কিছু খেল মেয়েটি। লজ্জা আর অপরিচিত পরিবেশকে কাটিয়ে উঠতে পারল না। উর্বশী বুঝতে পারল। ওকে আর পীড়াপীড়ি করল না।

বাইরে গাড়ির শব্দ। উর্বশী জানলা দিয়ে দেখল। আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরেছে বিমান। অন্য দিনের তুলনায় বেশ একটু আগে।

ড্রয়িং-রুমে ঢুকে বিমান অবাক্ হ'ল।

'কি ব্যাপার উর্বশী? উনি—'

'তোমাকে বলছি সব। জামা-কাপড় ছেড়ে এস।'

বিমান ভিতরে গেলে উর্বশী হেসে বলল, 'আমার স্বামী। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব এলে।'

'তুমি একটু আসবে এদিকে।' ভেতর থেকে ডাকল বিমান।

'যাচ্ছি।' উর্বশী সাড়া দিল। মেয়েটিকে বলল, 'তুমি বস একটু। আমি এখনই আসছি'

কাছে যেতেই বিমান বলল, 'মেয়েটি কে?'

'খুব বিপদে পড়েছে, পার্ক ষ্ট্রীটে দেখা। সাহায্য চাইছিল আমার কাছে। বাড়ী নিয়ে এলাম।'

'যত সব ঝামেলা তুমি জোটাও।'

'আস্তে'। উর্বশী চাপা গলায় বলল। 'মেয়েটি ভদ্রঘরের। একটা চাকরি চায়। ভাবছি আমাদের ইভ'স ক্লাবের ওকে সেক্রেটারী করে নেব। তুমি কি বল?'

'নট এ ব্যাড আইডিয়া।' বিমান টাইয়ের বাঁধন খুলতে খুলতে বলল। 'তুমি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। লাইটহাউসে ভাল ছবি এসেছে—ফেয়ার-ওয়েল টু আর্মস। ওকে বরং তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও।'

'দাঁড়াও। অত চট্ করে কি বিদেয় করা যায়? একটা ভদ্রতা ত আছে।'

'ও। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? ওকেও না হয় সঙ্গে নিলে। হয়ত এসব হলে কোনদিন যায় নি।'

'ওকে?' উর্বশী মুখ তুলে চাইল।

'হ্যাঁ। ভারী চার্মিং মেয়েটি। মুখখানা দেখেছ, কি সুন্দর। ফিগারটাও বেশ। আমি ত ভাবলাম, তোমার কোন পুরণো বান্ধবী-টান্ধবী।'

হাসি হাসি মুখখানা কেমন শক্ত দেখাল উর্বশীর। শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল। দেরাজের টানা থেকে দশটা টাকা বের করল। টাকাগুলো নাড়া-চাড়া করতে করতে কি যেন ভাবল উর্বশী। সাহায্যের পক্ষে দশটা টাকাই যথেষ্ট। বিমানের কথাগুলো ওর মনে পাহাড়-ঘেরা উপত্যকায় ধ্বনিত-হওয়া প্রতিধ্বনির মত বার বার অনুরণিত হ'ল। ··· মেয়েটি চার্মিং··· মুখখানা সুন্দর·····। আর ফিগারটা বেশ। উর্বশী ত ঠিক এভাবে চিন্তা করে নি।

মিনিট দশ পরে আবার শোবার ঘরে এল উর্বশী। বিমান তখনও বিছানায় শুয়ে।

'কি ব্যাপার? তুমি তৈরী হচ্ছ না?'

'এখনই হচ্ছি। কতক্ষণ আর লাগবে। মেয়েটি চলে গেল কি না। ওকে এগিয়ে দিয়ে এলাম।'

'চলে গেল?' বিমান উঠে বসল।

—'হ্যাঁ। সিনেমা যাওয়ার কথা ওকে বললাম। কিন্তু মেয়েটি রাজী হ'ল না।'

'কেন?'

'কি জানি। রেফুজী মেয়ে সব। কেমন ধরণের যেন।'

বিমান চুপ করে রইল।

একটুখানি থেমে উর্বশী আবার বলল, 'ভেবে দেখলাম ইভ'স ক্লাবের কেরাণীর চাকরিটা ওকে দেওয়া ঠিক হবে না। অজানা-অচেনা মেয়ে। শেষে কি গণ্ডগোল করে বসবে।'

বিমানের কোন ভাবান্তর হ'ল না।

সে তাড়া দিয়ে বলল, 'আর দেরি ক'র না, পাঁচটা কখন বেজে গেছে। তৈরী হও এবার।'

'যাচ্ছি গো যাচ্ছি।' উর্বশী একটা কটাক্ষ করে উত্তর দিল।

অনেকক্ষণ ধরে উর্বশী সাজল। ড্রেসিং আয়নার সামনে যত্ন করে প্রসাধন করল। সেই নতুন ছাঁটের বিলিতী ছিটের জামাটা গায়ে দিল। ঘাড়, গলা, পিঠের অনেকখানি অনাবৃত রইল। কানে হীরের দুটো দুল, গলায় উজ্জ্বল পোখরাজের মত চৌকো সাইজের পাথরের মালা। গালে ঠোঁটে রং মাখল উর্বশী। নীলচে আলোয় ঘরের মধ্যখানে এখন ওকে অপরূপ দেখাচ্ছে। অভিসারিকার মত চঞ্চল দৃষ্টি।

কখন পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকেছে বিমান। কাছে এসে উর্বশীর কাঁধে হাত রাখল।

অন্যদিন হ'লে নিজেকে সরিয়ে নিত উর্বশী। প্রসাধন নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকায় বিমানকে দূরে যেতে বলত। আজ কিন্তু এতটুকু নড়ল না উর্বশী। বরং মাথাখানা হেলিয়ে দিল বিমানের বুকে। ঘাড় ফিরিয়ে বিমানের চোখে চোখ রাখল, মদির, কামনাভরা দৃষ্টি। সম্মোহিত করার পক্ষে যথেষ্ট।

'বিমান।' মিষ্টি করে উর্বশী ডাকল।

'কি উর্বশী?'

'তুমি আমায় ভালবাস?'

—'ভীষণ।'

একটুক্ষণ থামল উর্বশী। বিমানের ঘাড়ে গলায় ওর অগ্রভাগে নেল পালিশ-করা আঙুলগুলি স্বচ্ছন্দ বিহার করতে লাগল।

'আজ চিমনলালজীর দোকানে গেছলাম।'

—'কি কিনলে?'—

—'কিনি নি। একটা পাথরের মালা দেখে এসেছি। সাত শ' টাকা দাম। তুমি ওটা আমাকে প্রেজেণ্ট করবে?' উর্বশীর গলা বেশ গাঢ় শোনাল।

'বেশ ত কালই যাওয়া যাবে।' বিমান স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল।

'এবার চল, ছ'টা যে প্রায় বাজে।'

না, সব কথা এখনও বলা হয় নি উর্বশীর। আরও কিছু বাকী। স্বামীর কাছ থেকে এক পা পিছিয়ে অপরূপ মোহিনী ভঙ্গিতে দাঁড়াল সে, ঠোঁটে বিজয়িনী নারীর চিত্তজয়ী হাসি ফুটে উঠল।

উর্বশী বলল, 'বিমান, এ্যাম আই চার্মিং?'

(বিদেশী গল্পের ছায়া আছে।)

অমৃতসর

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

জুন মাসের মাঝামাঝি। মধ্যাহ্নের···অনেক আগে থেকেই বহ্নি-বন্যার স্রোত বয়ে যাচ্ছে উত্তর প্রদেশের গ্রাম, জনপদের উপর দিয়ে। পূর্ণ মধ্যাহ্নে ট্রেণ-কামরা ত অগ্নিতপ্ত লৌহকটাহ। তারই মাঝখানে রোদে ঝলসান কিশলয়ের মত আমরা চলেছি দেশভ্রমণে—কাংড়া কুলুর দিকে। এইটিই নাকি ওই অঞ্চলে বেড়াবার উপযুক্ত সময়।

চলেছি অমৃতসর মেলে—পঞ্চাশ মাইলের মত ঘোরা পথে।

আগেকার দিনের কথা আলাদা—কাশ্মীর, ডালহৌসী অথবা কাংড়া উপত্যকায় যেতে হ'লে আজকাল বেশীর ভাগ যাত্রীই অমৃতসর হয়ে যায় না। ওটা ঘোরা পথ। সেকালে কাশ্মীর যেতে হ'লে পাঠানকোটের ধারে-কাছেও কেউ ঘেঁসত না—রাওলপিণ্ডি ছিল একমাত্র গতিমুক্তিদাতা। ভারত ভাগের পর পাঠান-কোটের ভাগ্য ফিরল—কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের সরাসরি যোগাযোগ ঘটল এই পথে। আবার এই পথকে সংক্ষিপ্ত ও সুগম করতে মুকেরাইনে রেল লাইন বসল। পঞ্চাশ মাইলের মত সংক্ষিপ্ত পথে সময়, অর্থ আর দেহক্লেশ বাঁচাতে যাত্রীরা জলন্ধর সিটি—মুকেরাইনের গাড়িতে চাপতে লাগলেন—অমৃতসর আরও দূরে স'রে গেল।

আমরা কিন্তু ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নগুলির আকর্ষণে অমৃতসরকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারি নি। পাঞ্জাবে এসে অমৃতসরকে দেখব না এটা যেন দেবমূর্ত্তি না দেখে মন্দির পরিক্রমার মত মনে হয়েছিল। সুতরাং পরের দিন বেলা সাড়ে ন'টার সময়ে আমরা অমৃতসরে এসে নামলাম।

স্টেশনে নেমে প্রথম চেষ্টা হ'ল ভালমত একটি বিশ্রাম-স্থান ঠিক করা। যাঁরা হোটেল-রেস্তোঁরায় থাকা-খাওয়ার সুবিধা বোধ করেন, তাঁদের কাছে এটা একটা সমস্যাই নয়। আমাদের জায়গা বাছাবাছির হাঙ্গামা একটু ছিল। ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে সম্প্রতি ওটা মেনে নিতে হয়েছে। ডাক্তারের নির্দ্দেশ মত তেল ঘি মশলা বর্জ্জিত রান্নার ব্যবস্থা নিজেদেরই করে নিতে হয়—পথ্য নির্ব্বাচনে সতর্ক না হ'লে চলে না। বিদেশ-বিভূঁয়ে এই বাধা মাঝে মাঝে বেশ প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু ভ্রমণের নেশা লাগলে এ আর কতটুকু বাধা! ভালমত একটা আশ্রয় মিললে স্টোভ বা কুকারে আহার্য্য তৈরী করে নেওয়া সহজই। আশ্রয়স্থলটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলে, আলো জল আর শৌচাগারের সুব্যবস্থা থাকলে সেই ত স্বভবনতুল্য সুখপ্রদ আবাস। অমৃতসরে তেমনি একটি আশ্রয় আমরা পেয়ে গেলাম।

রেল স্টেশনের সামনে মস্ত বড় একটা বাগান আছে। তার কিছু অংশ জুড়ে সরকারী দপ্তরখানা. কিছু অংশ এলোমেলো গাছগাছালিতে ভর্ত্তি—সাধারণের বিচরণ-ভূমি। তার ওপিঠে চওড়া রাজপথ। এখানে এলে শহরের চেহারাটা ঠিকমত মালুম হবে না, যেহেতু জনবসতিপূর্ণ শহর আরও খানিকটা দূরে। তবে এই জায়গাটাও হোটেল ধর্ম্মশালা চা এবং আনাজপাতির দোকানগুলি মিলিয়ে রীতিমত শহর হয়ে উঠেছে। একটা চটকদার সিনেমা হাউসও মাথা তুলেছে।

অমৃতসর নামটা শুনলে যেমন ইতিহাসের একটি গৌরবমণ্ডিত অধ্যায়কে মনে পড়ে এবং জাঁকজমক পূর্ণ একটি শহরের ছবি চোখে ভেসে ওঠে (ছবিটা সম্ভবত: আধুনিক ছাঁদের পথঘাট, বাড়ীঘর, আলোক-সজ্জা ইত্যাদি নিয়ে), এ জায়গাটা মোটেই তা নয়। ইতিহাসের গৌরব অবশ্য কালজয়ী, কিন্তু স্টেশনটা সেই পুরাতন দিনের; পথঘাটে আধুনিক সংস্কারের চিহ্ন সামান্যই, সৌধ-বিপনিতে তেমন চমকই বা কই! শহরের পুরাতন অংশে পুরাতন দিনেরই আধিপত্য. নূতন অংশের সংযোজন তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

আমরা আশ্রয়ের সন্ধানে পার্কের ওপিঠে একটি ধর্ম্মশালায় এলাম। ম্যানেজার আমাদের দেখেই ঘাড় নাড়ল—অর্থাৎ স্থান নেই।

রিক্সাওয়ালা বলল, আরও দু'টি ধর্ম্মশালা আছে—চলুন দেখা যাক্। আধ ফার্লঙের মধ্যে পাশাপাশি তিনটি ধর্ম্মশালা। এলাম মাঝেরটিতে। এটি একতলা কিন্তু নূতন—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ম্যানেজার কোথায় গিয়েছিল—তার জন্য খানিকটা অপেক্ষা করতে হ'ল। জায়গাটা ভারি পছন্দ হয়ে গেল—ভাবছিলাম, জায়গা মিলবে কি?

অবশেষে ম্যানেজার এলেন। একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক। একহারা লম্বা চেহারা, দিব্য ফুর্ত্তিবাজ। এক হাতে খাবারের ঠোঙা অন্য হাতে চায়ের গ্লাস। চলনটা আদুরে দুলালের মত। মুখের ভাবটাও কেমন কেমন, যেন নিজের ভাবেতেই মশগুল রয়েছে।

বললাম, জায়গা হবে? আমরা—

সবটা না শুনেই ঘাড় কাত করে হাসল। আমাদের ভিতরে নিয়ে এসে তিন-চারখানা ঘর দেখিয়ে বললে—যেটা খুশি নিয়ে নাও।

মন্দ নয়—যেন সাক্ষাৎ কল্পতরু!

আমরা বাথরুমের সামনা-সামনি ঘরটা বেছে নিলাম। সদ্য চুনকাম-করা ঘর—এখনও চুনের ঝাঁজালো গন্ধ বার হচ্ছে। আলো আছে, খাটিয়া আছে। আরও গোটা দুই কল আছে, শৌচাগারের অবস্থা সন্তোষজনক।

তখন বেলা এগারটা বাজে। সূর্য্য আকাশের প্রায় মাঝখানটিতে এসেছে এবং···ময়ূখমালা তীব্রতর হয়ে উঠছে। কিন্তু উত্তর ভারতের মত অসহ্য জ্বালাময় প্রদাহ ছিল না। 'লু' ছিল না। উত্তাপ ছিল বাংলা দেশের মত, দেহ ঘর্ম্মাক্ত হচ্ছিল। রাত্রিতে এখানেও উঠোনে খাটিয়া পেতে শোওয়ার ব্যবস্থা দেখে আশ্বস্ত হলাম।

আহার বিশ্রামে কিছু সুস্থ হয়ে বেলা চারটে আন্দাজ আমরা শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। দিনটা ছিল মেঘলা। তাপ ছিল সামান্যই। টাঙ্গায় করে ঘোরাফেরার অসুবিধা হ'ল না।

আগেই বলেছি অমৃতসর নামটা যেমন শ্রুতিরোচক, শহরটি তেমন নয়নলোভন নয়। নূতন চওড়া পথের দু'ধারে নূতন নূতন সৌধ অট্টালিকা মাথা তোলেনি—সংখ্যার তারা স্বল্প। পুরাতন অংশ, সেই আদিকালের স্বপ্নে বিভোর। আঁকা-বাঁকা সরু সরু গলি, পাথর-বাঁধানো প্রায় অসমতল রাস্তা, তেমনি পুরণো ধাঁচের দোকান-পাট, পণ্যবস্তুর চেহারা বা বিন্যাস সেই পুরাকালের। পথের দু'পাশে খুপরিমত দু'-তিনতলা বাড়ী, জানালা-দরজার সৌষ্ঠব নাই। এই সব দৃশ্য পশ্চিমের যে-কোন মাঝারিগোছের শহরে এলেই দেখা যায়। লোকের ভিড়ে যানবাহনের বাধায় মাঝে মাঝে আমাদের গাড়িটা আটকে যাচ্ছে। ফলে ভাল করে চোখ মেলে কিছু দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল না।

তবু বৈচিত্র্য ছিল। মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদ আর চেহারার বৈচিত্র্য। পোশাকের ও খাবারের দোকানগুলি একটু আলাদা চেহারার; বাসিন্দাদের রুচিকে প্রকাশ করছে। খানিকটা উত্তর প্রদেশের আদল এলেও মর্জ্জিমেজাজে ভিন্নতর। আবার ভূমি-প্রকৃতিও তেমন রুক্ষ নয়।

টাঙ্গাওয়ালা বলেছিল—দুর্গামন্দির, স্বর্ণমন্দির, জালিয়ানওয়ালাবাগ আর সরকারী উদ্যান ঘুরলেই মোটামুটি শহর দেখা হয়ে যাবে। সময়ও লাগবে অনেকখানি।

গাড়ি প্রথমেই এল দুর্গামন্দিরের সামনে। তখন আকাশে মেঘের দল জমাট আসর বসিয়েছে—শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টি আসছে।

তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে।

পাথর-বাঁধানো প্রশস্ত অঙ্গনের পর সুউচ্চ তোরণ। সেই তোরণের মাঝখান দিয়ে সিকি ফার্লং-টাক গেলে তবে মন্দির। প্রকাণ্ড এক সরোবরের মাঝখানে রয়েছে মন্দিরটি—হুবহু স্বর্ণমন্দিরের ছবির ছকে ছক মিলিয়ে তৈরী। কিন্তু স্বর্ণমন্দিরের পরিবেশ আরও বিশাল গাম্ভীর্য্যময়, সরোবর আরও বিস্তৃত। এমনই দীর্ঘ সেই সরোবর যে, এপারে দাঁড়িয়ে ওপারের মানুষকে চেনা যায় না।

দুর্গামন্দিরের গঠন-নৈপুণ্য এমন কিছু নয়। উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের কোন শিল্প-শৈলীকে আশ্রয় করে তা গড়ে ওঠেনি। মন্দিরের গায়ে শিল্প-সমাবেশও নাই। আগাগোড়া মন্দির, অঙ্গন তোরণ, আর তোরণ থেকে সেতুপথ পর্য্যন্ত বিজলী আলোর স্তম্ভ ঝাড় বাতিদান দিয়ে পরিপাটি করে সাজানো। রাত্রিতে আলো জ্বললে দীপান্বিতার শোভায় অপরূপ হয়ে ওঠে।

সেতুর মাঝ-বরাবর এসেছি, ঝড় উঠল। চারিদিক ধুলোয় ভরে উঠল। আঁধিই এসে গেল। আমরা তাড়াতাড়ি মন্দিরের মধ্যে চলে এলাম।

এই মন্দিরে দেবতার জন্য আলাদা গর্ভগৃহ নাই। সুপ্রশস্ত একটি হলঘরের একাংশে খানিকটা উঁচু বেদী—তারই উপরে দেবদেবীরা বিরাজ করছেন। হলঘরটি বিজলী ঝাড় লণ্ঠন ছবি আয়না দিয়ে সাজানো—মেঝেতে চওড়া একটি ফরাস পাতা। সেই ধবধবে ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে ও বাদ্যযন্ত্র কোলের কাছে রেখে কয়েকজন শ্রোতা ও শিল্পী ভজন গানের আসর বসিয়েছেন। শিল্পীদের সামনে মাইক যন্ত্র। যন্ত্র-বাহিত সুর লহরী হলঘর ছাপিয়ে সুবিস্তৃত বহিরঙ্গণে ছড়িয়ে পড়ছে। সেখানেও শ্রোতার সংখ্যা ত কম নয়।

এইভাবে ভজন সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা স্বর্ণ-মন্দিরেও পরে দেখেছিলাম। আর সে ব্যবস্থাটা

সাময়িক বলে মনে হয় নি—আমাদের দেশে অহোরাত্র-ব্যাপী কীর্ত্তন আসরের সমগোত্রীয় সেটা।

বিস্মিত হলাম দেবদেবী মূর্ত্তির সামনে এসে। কারণ, আমরা এসেছি দুর্গামন্দিরে অথচ সেই দেবীকে কোথাও দেখলাম না। দেখলাম, বেদীর মাঝখানে রয়েছেন লক্ষ্মীনারায়ণ—দু'পাশে রামসীতা আর রাধা-কৃষ্ণ। এঁরাই প্রধান মূর্ত্তি বলে মনে হ'ল। সেই এক আদ্যাশক্তির প্রতীক হিসাবে এঁদের প্রতিষ্ঠা কি না কে বলবে। তবে দেশটি যে পুরাণ-তন্ত্র-বিহিত পরমা-শক্তির মহিমা-কীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ নয় সেই, মূর্ত্তির রূপ-কল্পনায় ও পূজা অর্চ্চনায় তন্ত্রবিধি অনুসরণ করে চলে. তার বহু প্রমাণ জলন্ধরে, জ্বালামুখীতে, কাংড়ায়—এমন কি হিমালয়ের অভ্যন্তর ভাগে পরে পেয়েছি।

দেবদেবীর সিংহাসন, বসন ভূসণ, পূজা অর্চ্চনার সমারোহ, মন্দিরের সজ্জা-ঐশ্বর্য্য দৃষ্টিকে টানে বই কি। আবার ভক্তিরস-ধারার প্লাবনে মনকে অভিষিক্ত করার বা ঐ জাতীয় একটি পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়াসও প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। তবু স্বীকার করব, যে পরিবেশে দেব মহিমাকে সমগ্র চিত্ত দিয়ে অঙ্গীকার করা সম্ভব, এত আয়োজন উপকরণ সত্ত্বেও তা যেন এখানে মিলছে না। চণ্ডী স্তোত্রে শক্তি ও ঐশ্বর্য্যময়ী দেবীর মহিমার কথা বলা হয়েছে। তিনি সর্ব্বত্র রূপময়ী, সর্ব্বত্র সিদ্ধিদাত্রীও বটে, তবু বৈকুণ্ঠের ঐশ্বয্য, অযোধ্যার রাজ্যপাট অথবা বৃন্দাবনের প্রেম-মাধুর্য্যের সঙ্গে 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি'-কে মানিয়ে নেওয়া কঠিন। পাকা সাধকদের দেবদেবী কল্পনা—কোন বস্তু-আরোপিত রূপ বা গুণকে আশ্রয় করে বিকশিত হয় না—রূপগুণ-হীন কল্পনাতীতকে অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মকে তাঁরা ভজনা করে থাকেন। তাঁদের পক্ষে সবই সহজ। কিন্তু রূপের তরঙ্গ দিয়ে ভাবের বেলাভূমিকে যাঁরা সরস করে রাখতে চান, তাঁদের বেলাভূমি বিপরীত তরঙ্গ-বৃত্তের আঘাতে একটু কঠিন হবে—সে আর আশ্চর্য্য কি!

মন্দির দেখে বার হয়ে এলাম। তখন ঝড়ের তাণ্ডব থেমেছে, বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে রয়ে রয়ে। একটানা হ'লে মন্দির থেকে বার হওয়া যেত না। তাড়াতাড়ি কয়েকখানা ফটো নেওয়া হ'ল, তারপর গাড়িতে এসে বসা গেল। আকাশে কিন্তু দুর্য্যোগের ভয় লেগে রয়েছে। বৃষ্টি পড়ছিল টিপি টিপি।

ভাগ্য ভাল। জালিয়ানওয়ালাবাগের সঙ্কীর্ণ পথে গাড়ি দাঁড়াবার আগেই আকাশ খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

বাগের ঠিক সামনেই গাড়ি থামল না। খানিকটা পায়ে হেঁটে আমরা প্রবেশ-তোরণে পৌছলাম। কি জানি কেন বুকটা কেমন ভারি হয়ে উঠল।

ইতিহাসের পাতায় রক্তাক্ষরে লেখা সেই অমর নাম—জালিয়ানওয়ালাবাগ! ১৯১৯ সনের ১৩ই এপ্রিলের আগে এই নামের সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়নি—এই নাম আসমুদ্র হিমালয়ের নরনারীকে পরশাসন গ্লানি-মোচনের প্রয়াসে অধিকতর অধৈর্য্য করে তোলে নি। ঘনবসতিপূর্ণ শহর এলাকায় ঘিঞ্জি গলিঘুঁজি আর সৌধ-অরণ্যের জটলায়, দোকান-পসরার ভিড়ে, ক্রেতা-বিক্রেতার হৈ হৈ হট্টগোলে এ নাম চাপা পড়েছিল। সজ্জারিক্ত একান্ত অখ্যাত এই উদ্যান কোনদিনই হয়ত ইতিহাসের পাতায় উঠবে বলে স্বপ্ন দেখেনি। অথচ সেই একদিন.........

প্রথম মহাযুদ্ধান্তে ভারতবর্ষ আশা করেছিল আত্ম-নিয়ন্ত্রণের তথা স্বদেশে নিজেদের কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের অধিকার লাভ করবে: প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন, মিঃ লয়েড জর্জ্জ প্রভৃতির ঘোষণায়, বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে এমনই একটা বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল সর্ব্বদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের চিত্তে। কিন্তু যুদ্ধশেষে ভের্সাই সন্ধিপত্র রচিত হওয়ার পর এই বিজয়ী নেতাদের সদিচ্ছা অনুরূপ পরিগ্রহ করল। আশাভঙ্গে ভারত-বর্ষে জাগল বিক্ষোভ।

ইতিপূর্ব্বে স্বাধীনতার আন্দোলনকে (ইংরেজের ভাষায় বিদ্রোহ) দমন করার জন্য 'ভারত-রক্ষা' নামে একটি অস্থায়ী আইন বলবৎ ছিল। বিপ্লব ও অরাজকতা দমনের অজুহাতে এখন সেই আইনটিকে স্থায়ী এবং ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করার সুপারিশ করল রৌলট কমিটি। এর নাম হ'ল রৌলট আইন। এই আইনে ভারতবাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার অধিকার খর্ব্ব ও সঙ্কুচিত করার ব্যবস্থা রইল। সন্দেহ-মাত্র গ্রেপ্তার ও নির্ব্বাসন আর অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে আইনশৃঙ্খলা-ভঙ্গকারী বলে ঘোষণা করা যাবে—যার ফলে সেখানকার অধিবাসীরাও পাইকারী ভাবে এই আইনের আওতায় এসে অনুরূপ দণ্ডফলভাগী হবে। এমন কালো আইনের বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিবাদ সুরু হ'ল। কিন্তু সব প্রতিবাদ তুচ্ছ করে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভোটের জোরে এটা পাস হয়ে গেল—১৮ই মার্চ্চ ১৯১৯ সালে। আইনটির মেয়াদ হ'ল তিন বছর।

প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী বোম্বাইয়ে সত্যাগ্রহ সভা

তৈরী করে হরতাল ঘোষণা করলেন ৩০শে মার্চ্চ। পরে তারিখ বদলে হ'ল ৬ই এপ্রিল। দিল্লীতে ও পাঞ্জাবের কোন কোন জায়গায় দু'দিনই হরতাল হয়েছিল। পাঞ্জাবের দু'জন জননেতা ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ সফিউদ্দিন কিচলু গ্রেপ্তার হলেন ৯ই এপ্রিল। পরের দিন ১০ই এপ্রিল এরই প্রতিবাদে অমৃতসরে আবার হরতাল হ'ল। ওইদিন যখন সমবেত জনগণ রেল ষ্টেশনের দিকে নিরুপদ্রব মিছিল নিয়ে এগিয়ে আসছিল—তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্ত পুলিশ দু'বার গুলিবর্ষণ করল। জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে কতকগুলি সরকারী অফিস ও ব্যাঙ্ক পুড়িয়ে দিল—ইংরেজ বাসিন্দাদের উপর চড়াও হ'ল। ফলে কিছু লোক নিহত হ'ল।

এই সময়ে পাঞ্জাবের গবর্ণর ছিলেন মাইকেল ওডায়ার। ১২ই এপ্রিল তিনি শহরে সৈন্য মোতায়েন করার আদেশ দিলেন আর জেনারেল ডায়ারের উপর দিলেন শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার। ওই দিনই সর্ব্ব-প্রকার সভা-সমিতি বন্ধ করে দেবার বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করা হ'ল। কিন্তু সে নির্দ্দেশ যথাসময়ে জনসাধারণের গোচরে আসে নি। তারা পূর্ব্ব নির্দ্দেশমত জনপ্রিয় নেতাদের মুক্তির দাবিতে ১৩ই এপ্রিল বৈকালে জালিয়ানওয়ালাবাগে এক সভায় সমবেত হ'ল। দশ হাজার হিন্দু মুসলমান ও শিখ মিলে যখন সভার কাজ সুরু করেছে, সেই সময়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে জেনারেল ডায়ার সৈন্যসামন্ত নিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগের একমাত্র প্রবেশ-পথটি অবরোধ করে বসল। বাগটির অবস্থান বড় বিচিত্র। একেবারে শহরের মাঝখানে, চারধারে দু'তিনতলা ইমারতের বেড়া দিয়ে ঘেরা, কোন কোন স্থানে পাঁচ-ছ হাত উঁচু পাঁচিল। প্রবেশ পথ মাত্র একটি, যার সামনে সশস্ত্র সৈন্য ও মেসিনগান সাজিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জেনারেল ডায়ার। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে ডায়ার নির্ব্বিচারে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলী চালনার হুকুম দিল। রক্তগঙ্গা বয়ে গেল বাগে। প্রায় হাজার জন গুলীর মুখে প্রাণ দিল, আহত হ'ল এর তিন গুণ। স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তাক্ত অধ্যায়ে আর একটি রক্তরাঙা অধ্যায়—জালিয়ানওয়ালাবাগ এই ভাবে সংযোজিত হ'ল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রবেশ-তোরণে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেই লেখাগুলি চোখের সামনে জল জল করে ভেসে ওঠে। হ্যাঁ, মনের আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে স্মৃতি-সমুদ্রকে উদ্বেল করার অপেক্ষা রাখে না—চোখের সামনেই ইতিহাসের পাতাটিকে খুলে রাখার ব্যবস্থা করেছেন সরকার। সেই লেখা পড়ে চিত্ত ভারাক্রান্ত হবেই। বাগের মধ্যে সুউচ্চ শহীদ স্তম্ভগুলি বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যে থম থম করছে। আজকের মেঘ-মলিন আকাশের নীচেয় সেই দিনের দুঃস্মৃতি-ব্যথা নূতন করে জেগে উঠছে। আমরা ধীরে ধীরে পরিক্রমা সুরু করলাম। শহীদ স্তম্ভের বাঁ-ধারে একটা ইঁদারার কাছে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের দেখে একজন শিখ যুবক আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। বিষণ্ণ গলায় বললেন, জানেন, এই কুয়োর ইতিহাস? যখন গুলী চলেছিল—সেকালে এটার পাড় উঁচু করে বাঁধানো ছিল না এখন যেমন রয়েছে—সেই সময়ে গুলী-খাওয়া মানুষগুলো পালাতে গিয়ে যা ঘটেছিল—ওই দেখুন লেখা রয়েছে কুয়োর মাথায়।

পাথরের লেখাটা পড়লাম। শিউরে উঠলাম। দুর্ঘটনার পর একশো কুড়িটি মৃতদেহ তোলা হয়েছিল ইঁদারার ভিতর থেকে।

সরে এলাম সেখান থেকে। কিন্তু রক্তাক্ত স্মৃতির কবল থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় ছিল না। পার্কের দেওয়ালে, ইমারতের গায়ে আরও বহুতর গুলীর ছিদ্র চোখে পড়ল। অসহায় নিরস্ত্র মানুষের প্রাণ রক্ষার শেষ চেষ্টার মুখে মৃত্যুদূতের নিশানা! নির্ম্মম নরঘাতকের কলঙ্ক-চিহ্ন জালিয়ানওয়ালাবাগের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

ভারাক্রান্ত চিত্তে আমরা শহীদ স্মৃতিক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এলাম।

এবার টাঙ্গা চলল ভিন্ন একটি প্রশস্ততর পথ দিয়ে। মনে হ'ল, এদিকটা শহর পরিকল্পনার অধুনাতন অংশ। বাড়ী-ঘরগুলি গায়ে গায়ে লাগানো নয়—গঠনরীতিতে কিছু সৌষ্ঠব আছে। পরিচ্ছন্ন বেশবাসের মানুষও কিছু দেখলাম। আমাদের টাঙ্গা এসে দাঁড়াল প্রকাণ্ড একটা দালানের সামনে। গঙ্গার ঘাটে যে রকম চাঁদনি থাকে, সেই রকম খোলামেলা একটি বড় দালান—তারই মধ্যে ফুল এবং আরও কয়েকটি জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসে আছে দোকানীরা। এটি বিখ্যাত শিখ-গুরুদ্বার স্বর্ণমন্দিরের প্রবেশ-পথ।

একটা জলভর্ত্তি চৌবাচ্চার পাশ কাটিয়ে আমরা চাঁদনিতে ঢুকছিলাম, একজন ফুলের দোকানী হাতজোড় করে বিনীতকণ্ঠে বলল, বাবুজী, আগে জুতো খুলে রাখুন ওই চৌবাচ্চার জলে হাত-পা ধুয়ে নিন, তারপর ভিতরে আসুন।

বললাম, মন্দির ত এখান থেকে বহুদূরে, সেখানে ঢুকবার আগে জুতো ছেড়ে নেব।

শিখ দোকানী সবিনয়ে বলল, না বাবুজী, গুরুদ্বারের চৌহদ্দির মধ্যে জুতো পরে চলা নিয়ম নয়। আর মাথায় একটা কিছু দিয়ে দিন। আপনাদের টুপি কি পাগড়ি ত নেই, রুমালটা বেঁধে নিন মাথায়।

চৌবাচ্চায় পা ধুতে গিয়ে দেখি এক শিখ যুবতী মাথায় জল ছিটিয়ে, সকলকার পা-ধোয়া সেই জল চরণামৃতের মত পান করল।

খালি পায়ে মাথায় রুমাল বেঁধে আমরা সেই চৌতারার প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে সুবিশাল মন্দির অঙ্গনে নেমে এলাম। কি দীর্ঘ বিস্তৃত অঙ্গন! আবার তার কোলে তেমনি বিশাল সরোবর! এপারে দৃষ্টি মেলে ওপারের চেনা মানুষকে সনাক্ত করা যায় না। সরোবরের মাঝখানে ক্ষুদ্রায়তন স্বর্ণমন্দির—সোনার পাতে মোড়া অথবা সোনার জলে রং করা—ঝক্‌ঝক্ করছে। ডানদিকে ঘুরে আমরা মন্দির-তোরণে এলাম। প্রবেশ-তোরণটি বেশ উঁচু এবং কারুকার্যখচিত। ওই দরজার ভিতর দিয়ে একটি মাত্র প্রশস্ত সেতুপথ মন্দিরের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছে। দলে দলে ভক্তিপ্রাণ শিখ নরনারী সেই পথে আসা-যাওয়া করছে। তারা সেতুপথে পা দেবার আগে তোরণে নতজানু হয়ে প্রণাম করছে—সেখানকার ধুলো তুলে মাথায় ঠেকাচ্ছে, আঁচল বা রুমাল দিয়ে সেই পথের ধুলো জঞ্জাল সাফ করছে। তারপর মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে সেতুপথ অতিক্রম করছে। ভিড় জমেছে রীতিমত। ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি নাই, কলকল কলরব নাই, শৃঙ্খলাবদ্ধ শান্ত-সংযত ভক্তিনম্র দু'টি বিপরীতমুখী মানুষের স্রোত ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—আর মন্দিরের দিক থেকে প্রাঙ্গণের দিকে ফিরে আসছে। মাইক যন্ত্র-বাহিত ভজন গানের সুর লহরী মন্দিরগর্ভ থেকে সেতুপথ বেয়ে বিশাল অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ছে।

এই মন্দিরকে মাঝখানে রেখে শহর কায়াকান্তিময় হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। এই নদীতুল্য বিশাল সরোবরের নামেই শহরের খ্যাতি বিশ্বময়। হাঁ, অমৃতময় এই সরোবর—একটি বিশাল জনপদের জীবনধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

সে অনেক দিন আগেকার একটি ঘটনা। এখানে তখন জনপদের অস্তিত্ব ছিল না। এক জনবসতি-হীন তৃণ-পাদপশূন্য সুবিস্তৃত প্রান্তর রৌদ্রদগ্ধ আকাশের নীচের মৃত্যুফাঁদ পেতে নিশ্চল দেহ এলিয়ে পড়ে থাকত, নিদাঘ মধ্যাহ্নে কোন রাহী এই প্রান্তরে পদপাত করত না। আশেপাশে গ্রাম ছিল যদিও, গ্রামবাসীরাও পথ সংক্ষেপ করতে এদিক্ দিয়ে হাঁটত না।

তেমনি এক নিদাঘ মধ্যাহ্নে গুরু নানক অতিক্রম করছিলেন এই প্রান্তর। সঙ্গে ছিলেন বুধাভাই, নানকের প্রিয় ভক্তশিষ্য। মাথার উপরে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড অতিশয় অকরুণ হয়ে উঠেছিলেন সেদিন, দিশাহারা প্রান্তর তীব্র ময়ূখমালার বহ্নিবলয় রচনা করে পথিকের জীবনীশক্তি শোষণ করার আয়োজন করেছিল। প্রাণঘাতী তৃষ্ণার তাপে জর্জ্জরিত হয়ে উঠলেন বুধাভাই; গুরুকে বললেন, আর চলতে পারছি না, তৃষ্ণায় শুকিয়ে উঠছে বুক।

নানক বললেন, এইখানে অপেক্ষা করছি, তুমি একটু এগিয়ে যাও। সামনেই দেখবে একটা সরোবর, জলপান করে এস।

এগিয়ে গেলেন বুধাভাই। দেখলেন সরোবর, কিন্তু সে মরীচিকা ছাড়া কিছু নয়। নিদারুণ রৌদ্রে ফুটিফাটা হয়ে গেছে সরোবরে সর্ব্বাঙ্গ—এক ফোঁটা জল নাই, যা কণ্ঠতালুকে সরস করতে পারে। বুধাভাই হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। গুরুকে জানালেন সব কথা।

গুরু হেসে বললেন, তুমি দেখছি গুরু আর সৎনামের উপর এখনও নির্ভর করতে শেখ নি। "ওয়াহ গুরু" ব'লে এগিয়ে যাও, সৎনাম জপ কর, তোমার তৃষ্ণা অবশ্যই মিটবে।

এবার গুরুনাম জপ করতে করতে এগিয়ে গেলেন বুধাভাই। অবাক্ হয়ে দেখলেন, পুকুরের তলদেশ থেকে উৎসারিত হচ্ছে স্নিগ্ধ সুপেয় জলধারা। বুধাভাইয়ের তৃষ্ণা মিটল—সঙ্গে সঙ্গে এই অলৌকিক শক্তির কথা ছড়িয়ে পড়ল চারিধারে। দলে দলে মানুষ এসে দেখল সেই দৃশ্য। পুনরুজ্জীবিত পুষ্করিণীটার নাম রটে গেল লোকের মুখে মুখে—অমৃত সায়র। অমৃত সায়র ঘিরে একটা জনপদ জন্ম নিল। পরে চতুর্থ শিখগুরু রামদাস এই পুষ্করিণীকে সুবৃহৎ জলাশয়ে পরিণত করলেন। মাঝখানে নির্ম্মাণ করলেন শিল্পকলাময় একটি মন্দির। এই মন্দিরই শিখেদের চিরশ্রদ্ধার 'দরবার সাহিব' আর এই তীর্থ অমৃতসর।

পরবর্ত্তীকালে শিখদের পরাভূত করে আহমেদ শাহ ধ্বংস করেন এই মন্দির। অমৃতসর পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের অধিকারে এলে উনি মন্দির পুনঃনির্ম্মাণ করেন—সোনার পাত দিয়ে মন্দিরের গম্বুজ মুড়ে

দেন। তখন থেকে শিখ-স্বর্ণমন্দির নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এই মন্দির।

পরবর্ত্তীকালে আরও সংস্কার হয়েছে মন্দিরের, সংযোজিত হয়েছে অনেক কিছু। বাবা অটল স্তম্ভ, শ্রীগুরু রামদাস নিবাস, গুরুকা লঙ্গর, শিখ মিউজিয়াম, শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির কার্য্যালয়, একাধিক পুষ্পোদ্যান, জন সমাবেশের ময়দান, বাজার প্রভৃতি নিয়ে স্বর্ণমন্দির এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ এক নগর।

এই মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই—রয়েছেন গ্রন্থ সাহেব। শিখ দশগুরুদের উপদেশ আর অনুশাসনের বাণীবদ্ধ বৃহৎ গ্রন্থ। মূল্যবান্ চীনাংশুকে মোড়া ও পুষ্পমালো সুসজ্জিত গ্রন্থ। গ্রন্থ সাহেবের সামনে বসেছে ভজন গানের আসর। বাদ্যযন্ত্র কোলে করে সঙ্গীতশিল্পীর দল সঙ্গীত পরিবেশন করছেন।

সেই ভক্তি-গম্ভীর গানের অর্থ আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি, সুরসমৃদ্ধ স্বরলহরীতে আত্মনিবেদনের আকুতি-টুকু অনুভব করেছিলাম। নীরবে শ্রদ্ধা জানিয়ে পরিক্রমা করেছিলাম মন্দির। তারপর সেতুপথ দিয়ে ফিরে এসেছিলাম অঙ্গনে। অনেকক্ষণ ধরে বসেছিলাম সেখানে। একটা জাতির জন্ম-রহস্যের যবনিকা ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে গিয়েছিল—ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ এক মহিমাকে অনুভব করেছিলাম। সেই মূলমন্ত্র দারুণ দুর্য্যোগের দিনেও জাতির চৈতন্য পথভ্রষ্ট হয় নি। আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান—তারই লাগি ত্বরা পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু শুধু প্রাণদানের দুর্জ্জয় সাহস ও সঙ্কল্প নয়, সুকোমল সেবাবৃত্তিতেও সেই সব চিত্ত ছিল সর্ব্বদিকে প্রসারিত। সেই বৃত্তি শুধু মন্দির দুয়ার মার্জ্জনার রীতিতে আবদ্ধ নয়, মন্দির-অঙ্গনে একটি ইঁদারার সামনেও প্রসারিত হয়েছে দেখলাম।

জল তৃষ্ণা পেয়েছিল। জলের সন্ধানে একটা ইঁদারার সামনে এসে দেখলাম, তৃষ্ণা নিবারণের দৃশ্য। একজন লোক ইঁদারা থেকে জল তুলছিল—জন দুই মিলে ভর্ত্তি করছিল জলপাত্রগুলি। গ্লাস বা ঘটি জাতীয় পাত্র নয়, পিতলের গামলা জাতীয় পাত্র। জল পানান্তে পাত্র নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা সেই উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি ধুয়ে-মেজে পরিষ্কার করে দিচ্ছিলেন। এই কাজ তাঁরা আনন্দের সঙ্গেই করছিলেন। একদলের কাজ শেষ হতে-না-হতে আর একদল এসে তাঁদের হাতের কাজ তুলে নিচ্ছিলেন। মনে হ'ল মন্দির ঘুরে যাঁরাই এদিকে আসছিলেন তাঁরাই পালা করে সেবাবৃত্তির সুযোগ গ্রহণ করছিলেন। বহুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদ আভরণ তাঁদের সেবাধর্ম্মের পরিপন্থী হয় নি। ধর্ম্মের এই সুস্থ ও সার্থক রূপ দেখে মুগ্ধ হলাম বই কি! সকল ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তকেরা মানবসেবাকে শ্রেষ্ঠতম বৃত্তি বলে কীর্ত্তন করেছেন। একটি মাত্র ঈশ্বরকে অন্বেষণ না করে মানুষের মধ্যে তাঁরই বহুরূপের মাহাত্ম্যকে উপলব্ধি করার কথা বলেছেন।

এই মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শ্রীগুরু রামদাস নিবাস বা ধর্ম্মশালা। জাতি ধর্ম্ম বর্ণ নির্ব্বিশেষে যে কেউ এখানে আশ্রয় এবং আহার পেতে পারেন। সেবার পরিপূর্ণ রূপটি এখানে একটি রাত্রি বাস করলে চোখে পড়বে।

আকাশ এতক্ষণে মেঘমুক্ত হয়েছিল—অপরাহ্ণ বেলার আকাশে আলো নরম হয়ে উঠছিল। তবু এটা গ্রীষ্ম-কালের আকাশ—আর বাংলার চেয়ে এ আকাশে বিদায়ী সূর্য্যের স্থায়িত্বকাল অধিক। টাঙ্গা বালক তাড়াতাড়ি সরকারী উদ্যানের দিকে গাড়ি চালিয়ে দিল।

পথের এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে কিছু গরম দুধ পান করা গেল। এদিকে দুধটা মেলে প্রচুরই। কিন্তু শুধু দুধ খাওয়ার চেয়ে চায়ের সঙ্গে সেটা মিশিয়ে পান করাই রেওয়াজ। চায়ে দুধ মেশানো বলাটা হয়ত ঠিক হ'ল না, দুধে চা মেশানো বললে অর্থটা পরিষ্কার হয়। অর্থাৎ দুধ আর চা আধাআধি মিশিয়ে এক গ্লাস পানীয়। ছোট্ট একটুখানি কাপে করে চা খাওয়ার চলন দেখছি না—হয়ত সেটা রেষ্টুরেন্টের ভব্য পরিবেশে ভব্য রকম ব্যবস্থা। পথের ধারে পাতা বেঞ্চিতে ব'সে যে চা-পানের বিধি (আর এইটাই ত যত্র-তত্র) তার অনুপান দুধ-চা আধাআধি, বেশ বড় চামচের দু'তিন চামচ চিনি আর আধার একটি বড় কাঁচের গ্লাস। একাধারে খাদ্য আর পানীয়। অন্ততঃ দু'কাপ পরিমাণ পানীয়-ভর্ত্তি একটি গ্লাস না হ'লে পানার্থীর মন ওঠে না। এমনি দু'গ্লাসের খরিদ্দারও অনেক দেখলাম।

এবার আমরা শহরের একটা দিক ঘুরে কোম্পানীর বাগানে এলাম। এদিককার রাস্তাগুলো চওড়া, বাড়ীগুলো ছাড়া-ছাড়া কোনটা বা কেয়ারি-করা আছে। প্রাচীন খানদানি বংশের মত তার বাহ্য অবয়বটা! বিপুল কলেবর আকাশ-ছোঁয়া সব মহীরুহ সারবন্দি দাঁড়িয়ে আছে সজাগ প্রহরীর মত। পুরাতন ইতিহাসের অনেক পাতা এদের সামনেই লেখা হয়েছে, অনেক প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের ক্ষত ওদের কাণ্ড ও শাখা-

দেহে সুচিহ্নিত। দু'চার ফার্লং জুড়ে এদের বিস্তার—আমাদের গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে লাগল। দূর থেকে তরুশ্রেণীর ঘন বিন্যস্ত শাখাপল্লব দেখে অরণ্য বলে ভ্রম হবে—এর মাঝখানে এলে অবশ্য সে ভ্রম থাকবে না, মনোরম একটি উদ্যানই তার সর্ব্বসাধ্য সাজ-সজ্জা নিয়ে মনোহরণ করতে চাইবে। উদ্যানের মাঝখানে একটা সরকারী দপ্তরখানাও রয়েছে। কেয়ারী-করা লনের কোথাও ছেলেরা ছুটোছুটি লাফালাফি করছে, দোলনায় দুলছে, উপর থেকে লাফ খাচ্ছে। কোথাও নিরালা কোণ বেছে নিয়ে কোন দম্পতি প্রেমগুঞ্জনে অভিনিবিষ্টচিত্ত, কোথাও বা তরুণ প্রণয়ীযুগল ভাবী মিলনের মধুর স্বপ্নজাল বুনছে। সমবয়সীরা মিলে সরবে রাজনীতির চর্চ্চা করছে এক জায়গায়, এও কানে এল।

বাগানটা তাড়াতাড়ি ঘুরে নিলাম। সারা উদ্যানে গাড়ি চলাচলের পথ গেছে এঁকে বেঁকে, ছক কেটে কেটে। সেই পথে টাঙ্গা ঘুরতে লাগল। এক জায়গায় টাঙ্গা থামিয়ে জল খেয়ে নিলাম।

বাগান ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে আকাশের আলো ফুরিয়ে গেল। আমাদের টাঙ্গা বাগান থেকে বেরিয়ে আর একটি নূতন রাজপথ ধরল। অথবা সেই রাজপথই আলোর মালা প'রে আর এক চেহারায় নূতন হয়ে উঠল। কয়েক ঘণ্টায় মোটামুটি পরিক্রমা করে নিলাম শহরটাকে।

ধর্ম্মশালায় পৌছে দেখি বিরাট এক মেলা বসে গেছে। উত্তর প্রদেশের দু'-তিনটি কলেজ মিলিয়ে প্রমোদ-ভ্রমণার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীর দল জমায়েৎ হয়েছে সেখানে। দলটি কাশ্মীর ঘুরে এখানে এসেছে—গন্তব্য স্থান লখ্‌নাউ। ধর্ম্মশালার প্রায় সবটাই ওরা দখল করে নিয়েছে কিন্তু সেজন্য অসুবিধা বিশেষ হ'ল না। রাত্রিতে সুবিস্তৃত উঠোনে সারি সারি খাটিয়া পড়ল—মেয়েরা আশ্রয় নিলেন 'প্রশস্ত ছাদে। রাতটি আরামেই কাটল।

পরের দিন দুপুরে চাপা রোদের তেজটা বেশ চড়া লাগল। যেমন একটা অসহ্য গুমোটের ভাব।

আমরা স্থির করেছিলাম আজ বৈকালে অমৃতসর ত্যাগ করব। বেলা পাঁচটায় প্যাসেঞ্জার গাড়িটি ধরে রাত নটায় পৌঁছব পাঠানকোট। ওখান থেকে রাত আড়াইটায় কাংড়া ভ্যালীর গাড়ি ছাড়বে। সেটা ভোরবেলাতে পৌঁছবে জ্বালামুখী। আপাতত আমাদের গন্তব্যস্থান জ্বালামুখী।

মালপত্র গুছিয়ে টাঙ্গা ডাকবার উদ্যোগ করছি—হঠাৎ সূর্য্যের আলো নিবিয়ে চারিদিক অন্ধকার করে ঝড় নেমে এল। কাল অপরাহ্ণ বেলার সেই আঁধি, তবে বেগটা আরও দুর্দ্দান্ত। বাংলার কালবৈশাখীর মতই হাজিরাটা এর সময়মতই দেখছি। আজ শুধু ঝড়ই এলো না। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বর্ষণ এবং তার সঙ্গে করকাপাত। দুঃসহ তাপপীড়িত ধরিত্রীকে সুশীতল করার অপ্রত্যাশিত আয়োজন! যেমন বাংলায় তেমনি এখানেও, সব বয়সের নরনারী প্রকৃতির এই উদ্দাম লীলার সুযোগ নিয়ে শৈশব কালে ফিরে গেল। ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি করে 'শিল' কুড়োবার সে কি ধূম! পিতা অন্তরীক্ষ্য এখন মাতা বসুমতীর কোলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন নানান সাইজের তুষার-গোলক আর মায়ের ছেলেমেয়েরা বয়সের সীমা পদ-মর্য্যাদা শিক্ষা সহবৎ ভুলে আদিম উল্লাসে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে চীৎকার করে সেই খেলনা বা খাদ্য তুলে নিতে লাগল। আধঘণ্টা ধরে চলল এমন মাতামাতি। অতঃপর এখানকার রঙ্গমঞ্চে খেলা শেষ করে আঁধি অন্য রঙ্গক্ষেত্রে পাড়ি জমাল হয়ত। শীতল হ'ল অমৃতসর।

পরের দিন কাংড়ার পথে দেখেছি, ঝড়বৃষ্টির নাট্যলীলা সেদিককার রঙ্গমঞ্চেই ভাল ভাবে জমেছিল। শুনলাম ওই উপত্যকার রঙ্গমঞ্চটি সারা পাঞ্জাবের মধ্যে এমনি বাদল-নাট্য অভিনয়ের উপযোগী করে তৈরী। সেখানে বর্ষণ এবং করকাপাত এই কালের নিয়মিত ঘটনা।

যাক এদিকে অমৃতসর ঠাণ্ডা হ'ল—ভালই হ'ল। খুশিমনে বেরিয়ে পড়লাম। ষ্টেশন ত কাছেই, ধর্ম্মশালা থেকে একটা ঢিল ছুঁড়লে তার সীমানায় অনায়াসে পৌঁছে যায়। সেখানেও ছোট্ট একটি কৌতুক নাটিকার অভিনয় অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। সে নাট্যের লীলা দেখে মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমরা হেসেছিলাম প্রচুর। আমাদের হাতে তখন প্রচুর সময় ছিল এবং আমরা একেবারে নিরুপায় হয়ে পড়ি নি বলেই কৌতুকটা জমেছিল।

ব্যাপারটা এই—আমরা অমৃতসর-পাঠানকোট প্যাসেঞ্জার গাড়িটা ধরব বলে বেশ খানিকটা সময় থাকতেই ষ্টেশনে এসেছিলাম। গাড়িটা তখনও প্ল্যাটফর্মে আসেনি। আধঘণ্টা পরে গাড়িটা এল—ছাড়বে আরও চল্লিশ মিনিট পরে। সুতরাং তাড়াহুড়োর কিছু ছিল না। মজুর যথারীতি সব পিছনের একখানা কামরায়

আমাদের তুলে দিলে। কামরাটায় দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না। আমরা কামরার দরজা-জানালা বন্ধ করে পরম নিশ্চিন্তে গল্প জুড়ে দিলাম। গল্প করছি-ত-করছিই হঠাৎ এক সময়ে খেয়াল হ'ল অনেকক্ষণ ত হয়ে গেল গাড়ি ছাড়ছে না কেন। ষ্টেশনের ঘণ্টা বা গার্ডের বাঁশী কোন কিছুর সাড়াশব্দ ত পাচ্ছি না—বরং যেটুকু সাড়াশব্দ এতক্ষণ কানে আসছিল, তাও যেন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এসেছে। এটা কি ইঞ্জিন খারাপ, কি লাইন ব্লক কিংবা আরও কিছু গরবর হওয়ার ইঙ্গিত! এমন ত হামেশাই হচ্ছে।

মনে হ'ল অনেকক্ষণ বসে আছি। ঘড়ি দেখলাম, গাড়ি ছাড়ার সময় পেরিয়ে আরও পনের মিনিট গেছে। সন্দেহ হ'ল, ঘড়িটা কি আগিয়ে চলেছে!

নাতিকে বললাম, নেমে দেখ তকি ব্যাপার।

নাতি প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, গাড়িটা ত নেই।

সে কি—গাড়ি নেই কি কথা! একি ভোজবাজি! তাড়াতাড়ি নেমে দেখি সত্যিই তাই। আমাদের বগিটাই শুধু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে—যাত্রীসমেত গাড়িটাই অদৃশ্য!

আমাদের হতচকিত দেখে দু'জন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। বললেন, আপনারা কোথায় যাবেন?

পাঠানকোট।

সে গাড়ি ত এই মাত্র—এই পাঁচ মিনিট আগে ছেড়ে গেল।

কিন্তু আমরা—, আর কিছু বলতে পারলাম না।

ভদ্রলোক বললেন, বুঝেছি, যা হয়েছে।

কি হয়েছে? হতভম্বের মত শুধোলাম।

আপনারা দুয়োর-জানালা বন্ধ করে বসেছিলেন—তাই টের পান নি। ওরাও আপনাদের দেখতে পায় নি।

কারা আমাদের দেখতে পায় নি।

ভদ্রলোক বললেন, এ বগিটা গাড়ির সঙ্গে জোড়া ছিল ঠিকই, পরে যাবে না বলে কেটে রাখলে। আপনাদের আগের কামরায় আরও জনকয়েক প্যাসেঞ্জার ছিল তাদের রেলের লোকরা নামিয়ে দিলে। দুয়োর বন্ধ করে বসেছিলেন বলে ওরা আপনাদের দেখতে পায় নি। তা কি আর করবেন, ঘণ্টাখানিক বাদে একটা এক্সপ্রেস ট্রেণ আছে—তাতেই চলে যান পাঠানকোটে।

এই কথায় আমাদের হতভম্ব ভাবটা কেটে গেল। আমার প্রাণভরে হেসে নিলাম: ভাগ্যিস্ আর একখানা গাড়ি আসছে, না হ'লে এটা বিয়োগান্ত নাটকের রূপ গ্রহণ করত না কি!

একস্প্রেসে প্রচুর ভিড় ছিল—কোনরকমে ঠেলে-ঠুলে ত ওঠা গেল। সান্ত্বনার কথা এইটুকু, কর্ম্মভোগের স্থিতিকাল মাত্র চার ঘণ্টা। রাত এগারোটায় আমরা পাঠানকোট পৌঁছব।

লাইনটা মনে হ'ল অধুনা অবহেলিত—যেমন শাখা পথগুলি হয়ে থাকে। পথের মাঝে একটি মাত্র বড় ষ্টেশন—গুরুদাসপুর। স্থানটির সঙ্গে কিছু পরিচয় ঘটেছিল ইতিহাসের কল্যাণে।

ষ্টেশনটি জমকালো। অনেক শিখ জওয়ান এখানে নামল। লম্বায় চওড়ায় দশাসই চেহারা—বীরোচিত বপু। এরা বেশীর ভাগই পল্টনের লোক। জাঠ শিখ। অমৃতসরে কিন্তু বহু শিখকে দেখেছি খর্ব্বাকৃতি, কৃশকায় বাংলা দেশের জলহাওয়ায় বাড়া মানুষের মত। তাদের নাকি পল্টনে নেয় না: অন্তত ইংরেজ আমলে সেই নিয়ম ছিল। এদের বলে রামদাসিয়া শিখ। এই দু'রকম শিখের কথা জানা ছিল না। শিখ বলতে আমরা দুর্দ্ধর্ষ জঙ্গী জোয়ান মানুষকেই জানি—সামরিক প্রয়োজনে যাদের শক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন গুরু অর্জ্জুন তেজ বাহাদুর গোবিন্দ সিংএর দল। তেমনি ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ জানত বাঙ্গালীর একটিমাত্র পরিচয়—অসামরিক জাত, লেখনী চালনায় ও মন্ত্রণায় যাদের দক্ষতা অসাধারণ। বারভূঁইয়ার রাজ্যপাট, তাঁদের তৈরী বাঙ্গালী পল্টনের শৌর্য্যবীর্য্যের কথা—সে সব ত ইংরেজ আমলের কীর্ত্তি নয়। অতএব ইংরেজের লেখনীতে তাদের অন্য পরিচয়। তারও আগেকার ইতিহাস ত কিংবদন্তীর মত হয়ে গেছে। এখন স্বাধীন ভারতে এই সব অপ-কলঙ্ক অবশ্য দূর হয়ে গেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের হাতিয়ারও দৈহিক যোগ্যতার মাপকাঠিকে বদলে দিয়েছে। অসামরিক দেশ বলে ভারতবর্ষের কোন স্থানটাই আর চিহ্নিত নয়।

ভিয়েৎনাম

শ্রীঅনিলকুমার দাশগুপ্ত

কিছুদিন আগে মার্কিন জাহাজ উত্তর ভিয়েৎনাম কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ফলে আমেরিকা আক্রমণকারীদের দমন করার জন্য বিরাট্ নৌবহর পাঠিয়ে দেয়। অপর পক্ষে চীন তাদের সাহায্য দানের জন্য এগিয়ে আসে এবং মন্তব্য করে, আমেরিকার এই প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা বিশ্ব-সঙ্কট ডেকে আনবে। সোভিয়েট রাশিয়াও মুক্ত কণ্ঠে আমেরিকার এই কাজের নিন্দা করেছে। চীনের ঘোষিত এই বিশ্ব-সঙ্কট তথা বিশ্বযুদ্ধ হোক আর না হোক, এ কথা বলা চলে যে, কোরিয়া, সুয়েজ, কিউবা ও ভিয়েৎনাম পরিস্থিতি বিশ্বযুদ্ধের এক একটি সোপান। বড় রকমের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার যে কতকগুলি বাধা আছে (এখানে সেই দীর্ঘ আলোচনার জায়গা নয়) তা অপসারিত হওয়া মাত্রই এই রকম কোন একটি উপলক্ষ্যে বিশ্বযুদ্ধ ঘটতে পারে।

অনুমিত বিশ্বযুদ্ধ কমিউনিষ্ট ও (বা পশ্চিমী অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ) রাষ্ট্রের মধ্যে হবে বলেই মনে করা হয়ে থাকে; তার কারণ, সমস্ত পৃথিবী এখন কমিউনিষ্ট ও অ-কমিউনিষ্ট এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে আছে। আরও দেখা যায় যে, উল্লিখিত যে-কোন সঙ্কটেই এই দুই দলই কাঁপিয়ে পড়ে। কোরিয়ায় ও কিউবায় আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যেই বিবাদ হয়। মিশরে পশ্চিমী রাষ্ট্রের সঙ্গে (সুয়েজ নিয়ে) যুদ্ধে প্রেসিডেণ্ট নাসের যখন ব্যতিব্যস্ত, তখন রাশিয়ার হুমকিতেই তিনি পরিত্রাণ পান। বর্তমানে ভিয়েৎনামেও দেখা যাচ্ছে সেই কমিউনিষ্ট ও অ-কমিউ-নিষ্টেরই দ্বন্দ্ব। এখানে একদিকে চীন ও অপরদিকে আমেরিকা লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

ভিয়েৎনামের ইতিহাস নানা যুদ্ধবিগ্রহে ভরা। সংপ্রতি দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে যে, অশান্তি আর হাঙ্গামা তার বিবরণ আগে দেওয়া হ'ল এবং এর পূর্বেকার ইতিহাস আনুপূর্বিক বর্ণিত হয়েছে পরে।

বর্তমান পরিস্থিতি

১৯৬৩ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে দক্ষিণ ভিয়েৎ নামের প্রেসিডেণ্ট নোদিন দিয়েম-এর সরকার ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাদের ফলে যে রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়, তা নানা আকার গ্রহণ ক'রে দিনের পর দিন চলতে থাকে।

যদিও বৌদ্ধরা এখানে শতকরা ৭০ জন এবং রোমান ক্যাথলিকরা শতকরা মাত্র ১০ জন, তবুও প্রেসিডেণ্ট নো তাঁর নিজের ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মকে দমন করতে চাইলেন। তিনি ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে হুয়ে-তে নো দিন থাক-এর বিশপরূপে অভিষেকের পঞ্চবিংশতি বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পোপের পতাকা প্রকাশ্যে উত্তোলন করেন। অথচ প্রেসিডেণ্ট নো-র সরকার ৭ই মে ঘোষণা ক'রে ৮ই মে যে দিনটিতে বুদ্ধদেবের জন্মদিবস পালন করা হয়ে থাকে সেই দিনে বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলন নিষিদ্ধ ক'রে দিলেন। আবার হুয়ে রেডিওকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল তারা যেন ৮ই মে-র ধর্ম অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রচার না করে। এর প্রতিবাদ জানাবার জন্য শিশু ও স্ত্রীলোক সহ ১০,০০০ লোক নিয়ে গঠিত এক বৌদ্ধ জনতা রেডিও ষ্টেশনের বাইরে সমবেত হয়। এই সময় সৈন্যদল আহূত হয়ে কাঁদনে গ্যাস ও পরে মেশিনগান থেকে গুলী ছোড়ার ফলে নয়জন হত ও প্রায় ২০ জন আহত হয়েছিল।

১৫ই মে (১৯৬৩ খ্রীঃ) বৌদ্ধ পুরোহিত প্রেসিডেণ্ট নো-র কাছে পাঁচটি দাবি পেশ করেন, যথা—(১) বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলনের স্বাধীনতা; (২) বৌদ্ধধর্ম ও ক্যাথলিক ধর্মের আইনসঙ্গত সমান মর্যাদা; (৩) বৌদ্ধ নির্যাতনের অবসান; (৪) বৌদ্ধদের ধর্ম প্রচার ও পূজা করার স্বাধীনতা এবং (৫) ৮ই মে যারা নিহত হয়েছে তাদের পরিবারকে সাহায্য দান ও এর জন্য যারা দায়ী তাদের শাস্তিবিধান।

১৯৬৩ সালের ৩রা জুন হুয়ে-তে ছাত্র বিক্ষোভ ভেঙ্গে দেবার জন্য গ্যাস ছোড়া হ'লে দেশের অবস্থা আরও খারাপ হয়।

এবম্বিধাবস্থায় মার্কিণ দূত বৌদ্ধদের সঙ্গে মিটমাট করার জন্য চাপ দেওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেণ্ট নো তাতে কর্ণপাত করেন নি। তার কারণ অনুমান করা হয় যে, তিনি তাঁর পরিবার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে নিজের ধর্ম-সংক্রান্ত নীতিতে অবিচলিত রইলেন। অবশেষে বৌদ্ধ-নেতারা ১২ই জুন ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা ধর্মের ভিত্তিতে তাঁদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

১২ই জুন সায়গনের এক মাঠে ৭৩ বৎসর বয়স্ক এক বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁর পোষাকে পেট্রল লাগিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা

গেলেন। অন্যান্য বৌদ্ধরা তাঁকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছিল যে, পুলিশ সে বেষ্টনী ভেদ করে তাঁকে বাধা দিতে পারে নি।

অবশেষে ১৬ই জুন প্রেসিডেণ্টকে বৌদ্ধদের সঙ্গে চুক্তি করতে হয়। এই সর্তাবলীতে মার্কিনের হাত ছিল ব'লে কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হ'তে পারে নি।

অতঃপর বৌদ্ধদের আন্দোলন পুনরায় সুরু হ'ল। প্রেসিডেন্ট নো-কে পত্রে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে, যদি ১৬ই জুনের চুক্তি কার্যকরী করা না হয় তবে নতুন ক'রে আন্দোলন পরিচালনা করা হবে। ফলে, প্রেসিডেণ্ট এই চুক্তি কার্যকরী করার জন্য আদেশ দিলেন; কিন্তু নানা প্ররোচনার জন্য আন্দোলন জোর হ'তে লাগল। আরও অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আত্মাহুতি দিল। ক্রমে সৈন্যদল কর্তৃক প্যাগোডাসমূহ আক্রান্ত হ'ল এবং দলে দলে বৌদ্ধরা বন্দী হ'ল।

এইভাবে বিশৃঙ্খলা চলার সময় বৈদেশিক মন্ত্রী ভু ভান মাউ পদত্যাগ করেন। এদিকে ছাত্ররাও সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে থাকে। এমনি অশান্তির মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আবার সামরিক অভ্যুত্থান হয়। সায়গনে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা—২রা নভেম্বর তুমুল যুদ্ধের পর প্রেসিডেণ্ট নো-র সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং প্রেসিডেণ্ট ও তাঁর রাজনৈতিক উপদেষ্টা নেচু দিন নু এই দু'জন নিহত হন বা অন্যমতে আত্মহত্যা করেন।

সামরিক বিদ্রোহ কমিটি (Military Revolutionary Committee) ৪ঠা নভেম্বরে গঠনতন্ত্রে সংশোধন সাপেক্ষে বন্ধ রেখে সাময়িক সংবিধান গ্রহণ করল এবং স্থির হ'ল মেজর জেনারেল ডুয়োং ভ্যান মিন রাষ্ট্রের প্রধান রূপে ক্ষমতা ব্যবহার করবেন।

এই সরকারও অধিক দিন স্থায়ী হ'ল না। ১৯৬৪ সালের ৩০শে জানুয়ারী জেনারেল নুয়েন খান ও জেনারেল ত্রান থিয়েন খিয়েম-এর নেতৃত্বে এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে মেজর জেনারেল ডুয়োং ভ্যান মিনের শাসনের অবসান হয়। তখন নুয়েন খান প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

সর্বশেষ খবরে প্রকাশ যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ক্ষমতাসীন জঙ্গী চক্র-ছাত্র ও বৌদ্ধদের প্রতিবাদের নিকট নতি স্বীকার করেছে এবং মেজর জেনারেল নুয়েন খানকে প্রেসিডেণ্টের পদ থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মেজর জেনারেল নুয়েন খান (Nguyen Khanh) মাত্র দশ দিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেণ্ট (রাষ্ট্রপ্রধান) পদে অধিষ্ঠিত হন।

ইতিহাস

ভিয়েৎনামীদের আদিম অধিবাস লোহিত নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে। এখানে জলাভূমিগুলিকে চাষের উপযোগী ক'রে তারা খাদ্যশস্য উৎপাদন ক'রতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তাদের বংশবৃদ্ধি হ'তে থাকে। ইন্দোনেশীয়রা পার্শ্ববর্তী পর্বতসমূহ দখল ক'রে বাস করছিল; কিন্তু ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ক্রমাগত চীন দেশ থেকে (আই, মান ও মেও) আক্রমণের ফলে তাদের সেখান থেকে হ'টে যেতে হয়।

চম্পা রাজ্য

মধ্যযুগে চাম (Chams) নামে ইন্দোনেশীয় এক-শ্রেণীর লোক সমুদ্রোপকূলের বৃহৎ অংশ—লোহিত নদীর ব-দ্বীপের দক্ষিণে এবং মেকং নদীর উত্তর ভাগ জুড়ে বাস করত। এরা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় সভ্যতাধীনে এসেছিল। চাম-বা সমুদ্রে পার হয়ে মশলা, মুসব্বর (aloes) কাঠ ও গজদন্তের ব্যবসায় করত। তাদের শিল্প খ্মের-দের (Khmers) শিল্পের মত বিখ্যাত। চাম রাজ্য 'চম্পা'-র রাজধানী প্রথমে ছিল ইন্দ্রপুরায় (টোবেনের নিকট) এবং পরে ছিল বিজয়-এ। এই রাজত্ব কম্বোডিয়ার সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত থেকেও দীর্ঘ ১২০০ শত বর্ষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েৎনামীরা চাম-দের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হ'লে চম্পা রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে গেল এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এর অস্তিত্বই রইল না।

নাম-ভিয়েৎ বা আন্নাম রাজ্য

মেকং নদীর ব-দ্বীপ খ্মের রাজ্যের অংশবিশেষ ছিল। কোন এক চীনা সৈন্যাধ্যক্ষ যিনি চীন সাম্রাজ্যের দক্ষিণ অংশে শাসক নিযুক্ত হন, তিনি লোহিত নদীর তীরে নাম-ভিয়েৎ রাজ্য স্থাপন করেন। হন-বংশীয় চীনারা এই রাজত্বের অবসান ঘটায় খ্রীষ্ট পূর্ব ১১১ অব্দে। ফলে, এই স্থান সাম্রাজ্যের প্রদেশ রূপে পরিগণিত হয়ে গিয়াও-চি নাম ধারণ করে। পরবর্তী কালে এর নাম পরিবর্তন ক'রে রাখা হয় 'আন্নাম' অর্থাৎ দক্ষিণের রাজ্য। এইভাবে ভিয়েৎনামীদের চীনা সভ্যতা গ্রহণ করতে হয়। এরা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ক'রেছে বটে; কিন্তু কৃতকার্য হতে পারে নি।

তাং সম্রাটরা এই রাজ্য-শাসনকালে খুব নির্যাতন চালিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁদের বংশধর বা উত্তরাধিকারীরা দশম শতাব্দীতে দুর্বল হয়ে পড়াতে ভিয়েৎনামের ওপর

আধিপত্য বজায় রাখতে পারল না। এই সময় ভিয়েৎনামীরা চীনের প্রভুত্ব স্বীকার করলেও কার্যত তারা স্বাধীন হ'ল।

কিছুকাল ধরে অরাজকতা পুনঃ সামন্ত-শাসনাধীনে চলার পর দেশ 'লি' বংশের দ্বারা সুসংবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ হয়। এই লি বংশের রাজত্বকাল চলে একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। পরবর্তী তান রাজবংশ ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্বকালের মধ্যে কুবলাই খাঁ-র প্রেরিত মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং চম্পা রাজ্যের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এখানে আবার অল্প কয়েক বছর চীনের নিয়ন্ত্রণ চলার পর একটি নতুন রাজবংশ 'লে' চীনাদের সরিয়ে দেয়। লে-থান-টোন নামে শক্তিশালী এক শাসক (১৪৬০-৯৭), ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'চাম'-দের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হন।

ভিয়েৎনামীরা আগেকার চাম-রাজ্যের সর্বত্র সামরিক উপনিবেশ স্থাপন করে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ ক'রে তারা ক্রমে ক্রমে মেকং নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং সেখানকার অধিবাসী খ্মেরদের বিতাড়িত অথবা পরাস্ত করল। ১৮ শতকের প্রারম্ভেই তার সমগ্র ব-দ্বীপে সম্পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'লে' বংশের আধিপত্য নামে-মাত্র ছিল, কিন্তু আসল ক্ষমতা ত্রিন ও নুয়েন এই দুই পরিবারের মধ্যে বণ্টিত হয়েছিল। প্রথমোক্ত অর্থাৎ ত্রিন উত্তরে এবং শেষোক্ত পরিবার অর্থাৎ নুয়েন দক্ষিণে ক্ষমতাসীন হ'ল। চাম ও খ্মের রাজ্যসমূহে সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ এই নুয়েন পরিবারের দ্বারাই হয় এবং এর ক্ষমতা যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল ততই ত্রিন পরিবারের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে লাগল, বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

ইউরোপীয়দের আগমন ও ফরাসী অধিকার

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ জাহাজ ভিয়েৎনামের উপকূলে আসতে থাকলে ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রপাত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকরা স্থানয়-এ অধিষ্ঠিত হ'ল এবং ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা আন্নামের সর্বত্র কাজ করতে লাগল। এই ধর্মযাজকদের অন্যতম আলেকজান্দ্রে দ্য রোদেস নামে একজন ফরাসী ভিয়েৎনামী ভাষার জন্য রোমান বর্ণমালা গ্রহণ করেন।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে টে-সোন, ত্রিন ও নুয়েন এই উভয়কেই ক্ষমতাচ্যুত করে; কিন্তু শেষোক্ত পরিবারের ১৫ বছর বয়স্ক একটি বালক—নুয়েন আন (১৭৬২-১৮২০) দক্ষিণে প্রতীপ বিদ্রোহ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করে। একজন ফরাসী বিশপ ও কতিপয় ফরাসী পদস্থ কর্মচারীর সাহায্যে টে-সোনকে পরাস্ত ক'রে এই বালক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হ'ল এবং হ্যানয়ে প্রবেশ করল। অতঃপর ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে গিয়া-লং নাম ধারণ ক'রে ঐক্যবদ্ধ ভিয়েৎনাম-এর (আন্নাম) সম্রাট হ'ল। 'গিয়া লং'-এর উত্তরাধিকারী মিন-মাং (১৮২০-৪১) ও তু দাক (Tu-Duc, ১৮৪৮-৮৩) ফরাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের নীতি পরিত্যাগ ক'রে খ্রীষ্টানদের ভয়ঙ্কর ভাবে নির্যাতন করতে লাগলেন। এর প্রতিকারের উদ্দেশ্যে এসে ফরাসীরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ভিয়েৎনাম জয় করল এবং দ্বিতীয় মহাসমরের পর যে পর্যন্ত না ভিয়েৎনাম পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করল ততদিন পর্যন্ত প্রভুত্ব করতে লাগল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফরাসী রিপাবলিকের পতন ঘটলে ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে জাপানীরা চীন আক্রমণের জন্য টংকিং-এর ঘাঁটি ব্যবহারের অধিকার পায়। ক্রমে ১৯৪১ সালের জুলাইতে জাপানীরা দক্ষিণ ইন্দোচীন অধিকার করে।

ভিয়েৎনামীদের অভ্যুত্থান

১৯৪৫ সালের ৯ই মার্চ জাপানীরা ফরাসী শাসনের অবসান ঘটিয়ে তাদের নিজেদের লোক নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করল। এর মূলে ছিল 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য' নীতি। কিন্তু বেশিদিন যেতে না-যেতেই ১৯৪৫-এ আগষ্ট হিরোশিমায় আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে জাপানীরা ভিয়েৎনাম থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। ইত্যবসরে ভিয়েৎনামীরা ক্ষমতাসীন হ'ল। এই 'জাতীয়' দলের নেতা হলেন হো-চি-মিন নামে একজন প্রবীণ কমিউনিষ্ট।

এদিকে মিত্রপক্ষীয়রা পটসডামে স্থির করল যে, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম যথাক্রমে চীন ও ব্রিটিশ কর্তৃক অধিকৃত হবে। কিন্তু শেষে ব্রিটিশের পরিবর্তে ফরাসীদের অধিকার হ'ল; অতএব তারা 'হো-চি-মিন'-এর সঙ্গে কথাবার্তা চালালেন। জেনারেল জ্যাক্স লেকলার্ক (Jaques Leclerc) ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ হাইফং-এ অবতরণ করেন এবং পরে হ্যানয় অধিকার করেন। ফ্রান্স তখন ভিয়েৎনাম রিপাবলিককে ইন্দোচীন ফেডারেশন ও ফরাসী ইউনিয়নের অংশ হিসাবে স্বীকার করে নেয়।

১৯৪৬ সালের ২৩শে নভেম্বর ফরাসীরা হাইফং-এ অবৈধ অস্ত্র আমদানী বন্ধ করার চেষ্টা করলে গোলাগুলী বিনিময় হয়। এই থেকেই দীর্ঘকাল যুদ্ধের সূচনা হয়।

ক্রমে ক্রমে ফরাসীদের এমন অবস্থা হ'ল যে, তারা 'কনভয়' অর্থাৎ রক্ষী ব্যতীত সহর ছেড়ে বের হ'তে পারত না। ক্রমে অবস্থার চাপে পড়ে ফরাসীরা আন্নামের ভূতপূর্ব সম্রাট্ বাও দাই-এর সঙ্গে মিটমাট করতে চেষ্টা করল। তদনুযায়ী ১৯৪৯ সালের ৮ই মার্চ যে চুক্তি হয় তার ফলে ভিয়েৎনাম ফরাসী ইউনিয়নের মধ্যে স্বাধীন হ'ল; কিন্তু বাও দাই-এর শাসন জনগণকে আশানুরূপ ভাবে আকৃষ্ট করতে পারল না।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা চীন সীমান্তের লাংসোন (Langson) অঞ্চল ছাড়তে বাধ্য হ'ল। ফলে কমিউনিষ্ট চীনের পক্ষে ভিয়েৎনামকে অবাধে অস্ত্র সরবরাহের সুবিধা হ'ল। সালে ফরাসীরা ব-দ্বীপ অঞ্চল থেকে শত্রু বিতাড়ন করতে সমর্থ হ'ল।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে থাই দেশ অধিকার ক'রে ভিয়েৎনামীরা লাওস আক্রমণ করে এবং উত্তর-পূর্ব অংশে স্বাধীন সরকার (প্যাথেট লাও) গঠন ক'রে প্রায় লুয়াং প্রবাং এর উপকণ্ঠ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারীতে ভিয়েৎনামীরা মধ্য লাওস দখল করে এবং ঐ মাসে দিয়েন বিয়েন ফু-তে প্রবেশ করে।

ভিয়েৎনাম বিভাগ

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পিয়েরে মেন্দেস ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ইন্দোচীনে দীর্ঘ যুদ্ধের অবসান করা স্থির করেন। তাঁর প্রস্তাবক্রমে ২১শে জুলাই জেনিভা সম্মেলনে এই যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হয় এবং এখানে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, কমিউনিষ্ট চীন, (কার্যতঃ de facto) উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়া অংশ গ্রহণ করে। এই যুদ্ধবিরতির ফলে ইন্দোচীনে সপ্ত বর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান হ'ল এবং স্থির হ'ল কিছুকালের জন্য ভিয়েৎনাম বেন হয় Ben Hoi নদী দ্বারা উত্তরে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র ও দক্ষিণে জাতীয় রাষ্ট্র এই দুই ভাগে বিভক্ত হবে। এই নদী অক্ষাংশের কাছ দিয়ে প্রবাহিত। উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই উভয় অংশেই দু' বছর পরে নির্বাচন হবে স্থির হ'ল।

উত্তরে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র

ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেণ্ট হ'লেন হো চি মিন এবং মন্ত্রীসভার (কাউন্সিল অব মিনিষ্টারস্) চেয়ারম্যান হ'লেন ফান বান দোং। ২৯শে অক্টোবর (১৯৫৬) লাও দোং (কমিউনিষ্ট বা শ্রমিক) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, পার্টির প্রথম সম্পাদক ট্রুয়োং চিনকে বিতাড়িত করলে হো চি মিন রাষ্ট্রের প্রধান রূপে থেকেও তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। এই রাজত্বকালে ত্রি-বার্ষিক পুনর্বাসন পরিকল্পনা ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল। প্রায় ৮০টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের প্রবর্তন ও ২৪০টির পুনর্গঠন করা হয় চীন, সোভিয়েট, পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকীয়দের সাহায্যে।

দক্ষিণে জাতীয় রাষ্ট্র রিপাবলিক অফ ভিয়েৎনামের প্রধানরূপে এলেন আন্নামের ভূতপূর্ব সম্রাট বাও দাই; কিন্তু ১৯৫৫ সালের ২৩শে অক্টোবর শতকরা ৯৮ জনের ভোটে তিনি অপসারিত হলেন এবং প্রেসিডেণ্ট পদে আসীন হলেন প্রধানমন্ত্রী ন দিন দিয়েম। তিন দিন পরে সাধারণতন্ত্রের অস্থায়ী সংবিধান বলে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রেসিডেণ্ট ঘোষিত হলেন।

১২৩ জন নির্বাচিত সভ্য নিয়ে 'কনষ্টিটিউয়েণ্ট এ্যাসেমব্লী' গঠিত হ'ল ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে এবং নতুন গঠনতন্ত্র গৃহীত হ'ল ৭ই জুলাই। এই সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ছয় বছরের জন্য সাধারণ নির্বাচন দ্বারা রাষ্ট্রের প্রধানরূপে নির্বাচিত হবেন।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত জেনেভা সম্মেলনের সহসভাপতি (Co-chairman) যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েটের মধ্যে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে এক চুক্তি স্বাক্ষর দ্বারা দুই ভিয়েৎনামকে সংযুক্ত করার ভিত্তিতে যে সাধারণ নির্বাচন হবার কথা ছিল তা স্থগিত রাখা হ'ল।

১৯৫৯ সালে উত্তর ভিয়েৎনামীরা প্রবলভাবে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের শাসকদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করতে লাগল। ৭ই আগষ্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বৈদেশিক মন্ত্রী ভু ভান মাউ বৃটিশ ও সোভিয়েট বৈদেশিক মন্ত্রীদ্বয়, যাঁরা ১৯৫৪ সালে জেনেভা সম্মেলনের সহসভাপতি ছিলেন, তাঁদের কাছে কমিউনিষ্টদের দ্বারা যুদ্ধ বিরতির সর্তভঙ্গের তালিকাসহ নোট পাঠিয়েছিলেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর বিদ্রোহী কমিউনিষ্টরা কয়েক ঘণ্টার জন্য কু ও ক দিন দখল করেছিল। ভিয়েৎনামে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (International Commission for Supervision and Control in Vietnam—I. C. S. C.) অধিকাংশ সদস্যই উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করার ক্ষমতা কমিশনের ওপর দেওয়ায় উঃ ভিয়েৎনাম প্রবল আপত্তি করেছিল।

সোভিয়েট বিমান লাওসে প্যাক্তে লাওকে সৈন্য সরবরাহের জন্য উঃ ভিয়েৎনামের বিমানক্ষেত্র ব্যবহার করতে থাকায় দঃ ভিয়েৎনাম তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

জেনেভায় লাওস সম্পর্কে ১৪ জাতির যে সম্মেলন হয় তাতে উভয় ভিয়েৎনাম থেকেই প্রতিনিধি যায়।

মে মাসে প্রেসিডেন্ট কেনেডি দঃ ভিয়েৎনামকে অধিক সামরিক সাহায্য দান ঘোষণা করলে উঃ ভিয়েৎনাম I. C. S. C.-র কাছে প্রতিবাদলিপি পাঠায়।

৯ই এপ্রিল নো দিন দিয়েম দ্বিতীয় বারের জন্য ভিয়েৎনাম সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। সারা বছর ধরে কমিউনিষ্ট সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ দ্রুত বেড়েই চলতে লাগল এবং কোন কোন জায়গায় সন্ত্রাসবাদীদের আধিপত্য বিস্তৃত হ'ল।

দঃ ভিয়েৎনামে সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গেরিলা বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দেবার জন্য বিশেষ সৈন্যদল ও ডিসেম্বর মাসে লোকজনসহ ৩৬টা হেলিকপ্টার পাঠিয়ে দিল।

উত্তরে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েৎনামে এই বছরে (১৯৬১ সালে) দু'টি বিশেষ জিনিষ পরিলক্ষিত হ'ল যেমন—(১) ক্রমবর্দ্ধমান খাদ্য ঘাটতি ও (২) কমিউনিষ্ট শাসনের বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ বাধা সৃষ্টি। জুলাই ও আগষ্ট মাসে পরিস্থিতি এতদূর খারাপ হ'ল যে, ধ্বংসকারীরা বড় বড় শস্যাগার পুড়িয়ে দিল এবং হাজার হাজার টন চাল নষ্ট করে দিল।

তখন দেশের অভ্যন্তরে সংখ্যালঘুদের মধ্যে প্রকাণ্ড বিদ্রোহ দেখা দিল এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হ'ল। উঃ ভিয়েৎনাম সরকার ঘোষণা করল যে, এই গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামীরা। এর প্রতিকারের জন্য নিরাপত্তা রক্ষাকারীদের শক্তি বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও বিশৃঙ্খলা বেড়েই চলল।

ভৌগোলিক বিবরণ

ইন্দোচীনের পূর্ব অংশের নাম ভিয়েৎনাম। ভিয়েৎনামের অর্থ হচ্ছে দক্ষিণের দেশ (Land of the South) উত্তরে চীন, পূর্বে ও দক্ষিণে টংকিং উপসাগর ও দক্ষিণ চীন সাগর এবং পশ্চিমে কাম্বোডিয়া ও লাওস দ্বারা ভিয়েৎনাম বেষ্টিত। ৮°৩৩´ থেকে ২৩°২´ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং ১০২°১১´ থেকে ১০৯°২৮´ দ্রাঘিমা পর্যন্ত জায়গা জুড়ে এর অবস্থান। ১৯৫৪ সালের ২১শে জুলাই থেকে ভিয়েৎনাম দু'টি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে (রিপাবলিক) বিভক্ত হয়েছে—(১) উত্তরে কমিউনিষ্ট শাসিত ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েৎনাম ও (২) দক্ষিণে রিপাবলিক অফ ভিয়েৎনাম।

প্রাকৃতিক গঠন অনুযায়ী ভিয়েৎনামকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) উত্তর ভিয়েৎনাম, (২) মধ্য ভিয়েৎনাম, ও (৩) দক্ষিণ ভিয়েৎনাম।

(১) উত্তর ভিয়েৎনাম-এর দু'টি সুস্পষ্ট অঞ্চল দেখা যায়, যেমন ব-দ্বীপ অঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চল। দক্ষিণস্থ চীনা স্তূপ পর্বতের প্রান্ত ভাগ এই পার্বত্য অঞ্চল সৃষ্টি করেছে। লোহিত নদীর দক্ষিণে এই পর্বত উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ-পূর্ব অভিমুখী এবং নদীগুলিও এই দিকে প্রবাহিত। সর্বোচ্চ শিখর ফান সি পান এবং তার উচ্চতা ১১,১১২ ফিট।

লোহিত নদী য়ুনান থেকে উঠে ৭২৫ মাইল প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। এর পলিমাটি জমে ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। সোং থাই বিন এর ব-দ্বীপ, যার ওপর হাইফং বন্দর অবস্থিত তার সঙ্গে লোহিত নদীর ব-দ্বীপ মিশেছে।

(২) মধ্য ভিয়েৎনাম-এর দীর্ঘ উপকূলে পলিমাটি দ্বারা রচিত যে সব সমভূমি আছে তা আন্নামী পর্বতমালার সামনে অবস্থিত। এই সব ছোট ছোট সমভূমির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে থান হোয়া ও ভিন (উত্তরে অবস্থিত), হুয়ে (মধ্যে) ও কুই নোন—Qui Nhon (দক্ষিণে অবস্থিত)। সমুদ্রোপকূল বালুস্তূপ বা সৈকত শৈল (dunes) ও অন্তরীপে পরিপূর্ণ।

দক্ষিণে অনেক দূর প্রসারিত মই (Moi) মালভূমি এবং এর সর্বোচ্চ অংশ মাদার এ্যাণ্ড চাইল্ড (৬,৫৩০ ফিট) ভারেলা অন্তরীপের কাছে অবস্থিত। লাওসের সঙ্গে মধ্য ভিয়েৎনামের যোগাযোগ সাধন ক'রছে গিরিবর্ত্মগুলি।

(৩) দক্ষিণ ভিয়েৎনাম—পুরাকালে মেকং নদীর পলিমাটি জমে জমে কোন এক উপসাগর বুজে যাওয়ার ফলে এই অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। এর কিছু অংশ কালক্রমে শুকিয়ে যায় আর বাকি অংশ জলাভূমি রূপে থেকে যায়। পূর্বদিকে সায়গননদী (Riviere de Saigon) ও তার উপনদীসমূহ কতকগুলি পর্বতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং মেকং নদী কতিপয় শাখাসহ সমুদ্রে পড়েছে। পোলো কোণ্ডোর দ্বীপটি কূল থেকে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত।

জলবায়ু

দক্ষিণে অবস্থিত সায়গনে বাৎসরিক উত্তাপের অল্পই তারতম্য ঘটে। জানুয়ারী মাসের গড় উত্তাপ ২৬° সেঃ ও এপ্রিল মাসের উত্তাপ ২৯° সেন্টিগ্রেড। উত্তরস্থ হ্যানয়ের তাপমাত্রা জুন মাসে গড়ে ২৮°সেঃ এবং সর্বনিম্ন তাপ ৬° সেন্টিগ্রেডে নেমে যায়।

ভিয়েৎনামে উষ্ণমণ্ডলীয় মৌসুমী জলবায়ু। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আগত গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বায়ু মে মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত ঘটায়। মধ্য ভিয়েৎ-

নামে অল্প পরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। সায়গন (দঃ ভিয়েৎনাম) ও হ্যানয়ে (উঃ ভিঃ) ৫৮ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়; কিন্তু মধ্য ভিয়েৎনামে অনেক বেশি বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার হুয়েতে (Hue) ১১৬ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় এবং পর্বতে আরও বেশি হয়।

উদ্ভিদ

উত্তরদিকে অবস্থিত বনরাজির সঙ্গে দক্ষিণ চীনের বনসমূহের সাদৃশ্য আছে। এখানকার বনে নানা প্রকারের পতনশীল (deciduous) বৃক্ষ এবং বেত ও বাঁশ গাছ পাওয়া যায়।

দক্ষিণে নিরক্ষীয় চিরহরিত অরণ্য, তার মধ্যে আর্থিক দিক থেকে মূল্যবান্ নানাবিধ গাছ এবং বহু রকমের তাল জাতীয় বৃক্ষ আছে। পর্বতসমূহ পাইনের বনে আচ্ছাদিত।

জীবজন্তু

হরিণ, বুনো ষাঁড়, মহিষ, হাতী, বাঘ ও ময়াল সাপ পার্বত্য অঞ্চলে (বিশেষতঃ দক্ষিণে) প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মাছ ও দৃঢ়বর্মী কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি নদীতে, হ্রদে, এমনকি ধানক্ষেতে অজস্র মেলে।

ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েৎনাম টংকিং ও আন্নামের উত্তর অংশ নিয়ে গঠিত। এর উত্তর সীমায় চীন, পশ্চিমে লাওস, দক্ষিণে রিপাবলিক অফ ভিয়েৎনাম বা সপ্তদশ অক্ষাংশ এবং পূবে দক্ষিণ চীন সাগর অবস্থিত।

আয়তন— ৫৯,৯৩৪ বর্গমাইল

লোকসংখ্যা— ১,৫৯,১৬,৯৫৫ (১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে)

রাজধানী—হ্যানয়, লোকসংখ্যা: ৬,৩৮,৬০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)

বন্দর— হাইফং,—লোক সংখ্যা: ৩,৬৭,৩০০ (১৯৬০)

রিপাবলিক অফ ভিয়েৎনাম

কোচিন চীন ও আন্নামের দক্ষিণ অংশ নিয়ে গঠিত। উত্তরে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েৎনাম (১৭শ অক্ষাংশ), পশ্চিমে লাওস, কম্বোডিয়া ও শ্যাম উপসাগর এবং দক্ষিণ ও পূবে দঃ চীন সাগর দ্বারা বেষ্টিত।

আয়তন— ৬৬,৯৪৮ বর্গমাইল

লোকসংখ্যা— ১,৪১,০০,০০০ (১৯৬০ সালের গণনা অনুযায়ী)

রাজধানী—সায়গন

লোকসংখ্যা: ১'৪ মিলিয়ন (১৯৬০)

বন্দর—চোলন

প্রধান সহর—হুয়ে „ ১,০২,৮১৪ (১৯৬০)

ভিয়েৎনামীরা দক্ষিণ শাখা মঙ্গোলীয় জাতির অন্তর্গত। তাদের ভাষা এক অংশাত্মিক (monosyllabic) এবং চীনা ধরণে অথবা কুয়ক-নু (Quoc-gnu রোমান অক্ষরের ভিত্তিতে) অক্ষরদ্বারা লেখা হয়। তারা সমভূমিতে বাস করে এবং সংখ্যায় ১,২০,০০,০০০ জনেরও অধিক। ভিয়েৎনামের দক্ষিণ দিকে বাস করে কাম্বোডীয়গণ (৩,০০,০০০), আন্নামী পর্বতমালায় বাস করে মই (৭,২০,০০০) এবং উত্তর পর্বতসমূহে বাস করে থাই (৭,০০,০০০), মুয়ং (২,০০,০০০), মান (৯০,০০০) ও মেও (৮০,০০০) প্রভৃতি। এ ছাড়া সহরে ৪,০০,০০০ চীনা ব্যবসায়ী এবং ৪০,০০০ ইউরোপীয় অথবা তাদের মিশ্রণে উদ্ভূতগণ বাস করে।

আমদানী ও রপ্তানী

চাউল, কয়লা, রবার ও ভুট্টা রপ্তানী হয়। শিল্পজাত সামগ্রী, যন্ত্র, মোটর গাড়ি ও বস্ত্র আমদানী করা হয়।

চা ও কফির চাষ যুদ্ধের জন্য ব্যাহত হয়েছে। আরণ্য দ্রব্য, ধৃত মৎস্য ও পালিত পশু দ্বারা স্থানীয় বাজারের চাহিদা মেটান হয়। প্রধান শিল্পগুলিও (সিমেণ্ট, বস্ত্র ও সংরক্ষিত মাছ) স্থানীয় প্রয়োজন মেটায়।

ধর্ম

ভিয়েৎনামে কনফুশীয়, বৌদ্ধ ও রোমান ক্যাথলিক ধর্ম প্রচলিত। এ ছাড়া আধুনিক সম্প্রদায়ের লোক (যেমন—কাওদাই ও হোয়া-হাও) এখানে অনেক আছে।

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

বাইশ

এদিকে রামকিঙ্করের পরীক্ষার ফল বার হবার সময় ঘনিয়ে আসতে লাগল। এবং যত ঘনিয়ে আসে ভিতরে ভিতরে রামকিঙ্কর তত দমে।

তার কলেজের বন্ধু বেশী নয়। বলতে গেলে একটিই—বিশ্বনাথ। বাকি যা, কলেজ বন্ধ থাকলে তাদের সঙ্গে দেখাই হয় না।

বিশ্বনাথ নিত্য নতুন গুজব নিয়ে আসে। সে গুজবের কোনটিই আনন্দদায়ক নয়। খবরের কাগজে একদিন বেরুল বি. এ.-র ইতিহাসের প্রথম পত্রের কিছু উত্তরপত্র খোওয়া গিয়েছে। পরীক্ষক কুলির মাথায় করে সেগুলি আনছিলেন। কিছুদূর আসার পর সেগুলিকে আর দেখতে পেলেন না। লোকটি কোথায় পালাল কে জানে!

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, কি হবে তা হ'লে?

বিশ্বনাথ বললে, একটা কিছু গোজামিল দিয়ে কাজ সারা হবে আর কি!

—কি রকম গোজামিল?

—হয়ত অন্য পেপারের মার্ক দেখে সেই অনুপাতে একটা কিছু বসিয়ে দেবে।

রামকিঙ্কর রেগে বললে, সে ভারী অন্যায় খবর, যারা হারানো পেপারে ভাল লিখেছে, এই ব্যবস্থায় তারা কম পেয়ে যাবে।

বিশ্বনাথ বললে, আর কি করা যাবে বল। যা হারিয়েছে, তা ত আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবার কারও কারও ভালও হ'তে পারে।

—কি রকম?

—যারা খারাপ লিখেছে অন্য পেপারের তুলনায়, তারা বেশী পেয়ে যাবে।

—তা যাবে।

হঠাৎ রামকিঙ্কর খুব খুশী হয়ে উঠল: আমার উত্তর-পত্র যদি ওর মধ্যে থাকে ত ভাল হয়।

কেন? ওটা ভাল হয় নি?

—মোটেই না।

—তবে যে পরীক্ষা দিয়ে এসে বললি, ভালই হয়েছে?

রামকিঙ্কর অপ্রস্তুত ভাবে বললে, কি জানি, পরীক্ষা দিয়ে আসার পরে তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, সব কি রকম গুলিয়ে যাচ্ছে, এখন মনে হচ্ছে, কোন পেপারই আমার ভাল হয় নি। আমি ফেল করে যাব! তুই ত খুব ঘুরছিস। কিছু খবর যোগাড় করতে পারলি?

ক্ষুন্নকণ্ঠে বিশ্বনাথ বললে, কিচ্ছু না। কত লোকের কাছে যে ধর্না দিচ্ছি রোজ, তার ইয়ত্তা নেই। সবাই ভরসা দিচ্ছে, কিন্তু কেউ কিছু খবর দিতে পারছে না।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, আমার কাছে এলে আমি খবর দিতে পারতাম।

সোৎসাহে বিশ্বনাথ বললে, তোর কি কেউ জানা আছে না কি? আমার রোল নাম্বার ত জানিস। দেখবি একবার চেষ্টা করে?

গম্ভীর ভাবে রামকিঙ্কর বললে, দেখেছি।

—দেখেছিস! কি দেখেছিস?

—তুই যদি কাউকে না বলিস ত বলি।

—কাউকে বলব না। তুই বল।

—তুই সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেয়ে গেছিস।

তার নিজেরও মন এতে সায় দিলে। তবু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, গুল দিচ্ছিস না ত?

—না।

—তোর নিজেরটা জেনেছিস?

—সেও এক রকম জানাই।

—পাস করেছিস?

—না বোধ হয়।

—না বোধ হয়! বোধ হয় কেন?

—বোধ হয় একটু আছে। যাক গে, আমার কথা ছেড়ে

দে। রোদে রোদে তুই আর ঘুরিস না। গ্যাট হয়ে বাড়ীতে গিয়ে বোস।

কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই, যা হবার, তা হবে।

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, সবিতা বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না কেন? যে ছেলেটির সঙ্গে কথা হচ্ছে, সে কি তেমন ভাল ছেলে নয়?

—দেখ, ভাল ছেলে আমরা কোথায় পাব? একটি ভাল ছেলে কিনতে যে টাকা লাগে, তা আমাদের নেই। গেরস্ত ঘরের ছেলে, বি-এ পাস করেছে, মোটামুটি চাকরি করে, দেখতে-শুনতে মন্দ নয়, এই রকম একটি ছেলে আর কি।

—তা হ'লে ত ভালই বলতে হবে। সবিতা কি আরও ভাল ছেলে চায়?

—তাও ত বলছে না। তা ছাড়া আমরা ভেবেছিলাম, ছেলেটির জন্যে অনেক টাকা খরচ করতে হচ্ছে, সেইটিতেই ওর বোধ হয় আপত্তি। কিন্তু তাও নয়।

—তবে?

—ও বলছে, বি. এ. পাস না করে বিয়ে করবে না কথাটা কিছু মিথ্যে বলছে না। বাঙ্গালী পরিবারে উপার্জনে অক্ষম মেয়েরা অনেক অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে। লেখা-পড়া শিখলে সেই অসহায় ভাবটা কেটে যায়।

রামকিঙ্কর বড় বড় চোখ মেলে বিশ্বনাথের কথা শুনছিল

বিশ্বনাথ বললে, কিন্তু আমরা ভাবছি বাবার শরীরের কথা। বি-এ পাস করলেও মেয়ের বিয়ে বিনা খরচায় হবার জো নেই। বাবা যদি ততদিন বেঁচে না থাকেন? তার ওপর আর কয়েকমাস পরেই বাবা অবসর নেবেন। হাতে কিছু টাকাও থাকবে। টাকার পাখা আছে। সবিতা বি-এ পাস করা পর্যন্ত সে টাকা কি থাকবে? বাবা-মা সেই কথা ভাবছেন।

বলেই বললে, কিন্তু ভেবে আর কি হবে? ছোট মেয়ে ত নয়, বড় হয়েছে। নিজের ভালমন্দ বুঝতেও শিখেছে। ওর মতের বিরুদ্ধে কিছু ত করা যায় না।

রামকিঙ্করের মন কিন্তু তাতে সায় দিতে পারলে না। বড় হয়েছে? কত বড় হয়েছে? নিজের ভালমন্দই বা সে কতটুকু বোঝে? ওঁদের উচিত ছিল, জোর করে বিয়ে দেওয়া। কেন সাহস করলেন না, কে জানে!

কিন্তু মুখে সে কথা বললে না। অন্যের পারিবারিক ব্যাপারে কথা বলতে যাওয়া উচিত নয়। রামকিঙ্কর চুপ করে রইল।

দিন দশেকের মধ্যেই পরীক্ষার ফল বার হ'ল।

রামকিঙ্কর দোকানের কাজে খুব ব্যস্ত ছিল। সে টেরও পায় নি যে, খবর বেরিয়েছে। বিশ্বনাথ ছুটতে ছুটতে এসে খবরটা দিলে

—রামকিঙ্কর, তুমি পাস করেছ।

রামকিঙ্কর এত বড় খবরের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে ধরেই নিয়েছিল ফেল করবে। তার মনকেও প্রায় প্রস্তুত করেই এনেছিল। খবরের জন্যে কোন প্রকার ব্যস্ততাও ছিল না। আজ যে খবর বেরুচ্ছে, তাও সে জানত না।

জিজ্ঞাসা করলে, আমি কি রকম?

ওর পিঠে দুটো থাবা দিয়ে বিশ্বনাথ চিৎকার করে বললে, পাস করেছ! পাস করেছ!

এতক্ষণে রামকিঙ্কর যেন ব্যাপারটা বুঝলে। তার মনের মধ্যে একটা হিল্লোল উঠল কিন্তু শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, আর তুমি?

—আমিও সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছি। তোমার খবরটা ঠিক। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে তুমি ভুল খবর সংগ্রহ করেছিলে।

রামকিঙ্কর হাসলে। বললে, আমার দুটো খবরই আমার নিজের কারখানায় প্রস্তুত। খবরের জন্যে আমি কোনদিন কোথাও বেরুই নি। সে সময়ও নেই

এতক্ষণে সে দোকানের অন্য লোকদের মুখের দিকে চাইবার সময় পেল। ঘর নিস্তব্ধ। সকলেই যেন কি রকম স্তব্ধ হয়ে গেছে। হরেকৃষ্ণর মুখখানি ছোট হয়ে গেছে। চোখে দুশ্চিন্তা, যেন রামকিঙ্করের সঙ্গে যুদ্ধে সে হেরে গেছে।

রামকিঙ্কর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বিশ্বনাথকে বললে, চল, বাবা-মাকে প্রণাম করে আসি। তাঁরা খবরটা জানেন?

বিশ্বনাথ বললে, না। আমি রাস্তায় কাগজখানা দেখে তাড়াতাড়ি তোমার কাছেই আসছি। চল, যাই।

সুলোচনা তখন রান্না করছিলেন। চন্দ্রনাথের আপিসের

ভাত, সেই সঙ্গে সবিতার স্কুলেরও ভাত। চন্দ্রনাথ তেল মাখছিলেন। এমন সময় ওরা দু'জন এল।

দু'জনেই টিপ টিপ করে চন্দ্রনাথকে প্রথমে প্রণাম করলে। চন্দ্রনাথ অবাক্। প্রণামটা কিসের?

সবিতা ঘরের মধ্যে ছিল। সে সেইখান থেকেই চিৎকার করে উঠল, মা, দাদা, রামদা দু'জনেই পাস করেছে।

এতক্ষণে চন্দ্রনাথ ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করলেন।

—পাস করেছিস? ফল বেরুল?

—হ্যাঁ।

রামকিঙ্কর বললে, বিশু অনার্স পেয়েছে, সেকেণ্ড ক্লাস।

—তাই নাকি? তোর অনার্স ছিল?

—ছিল।

ওরা দু'জনে ছুটল রান্নাঘরে মা-কে প্রণাম করতে।

বিশ্বনাথ বললে, আপিসের কাজ এবং বাড়ীর তামাক—এ ছাড়া সংসার সম্বন্ধে বাবা আর কোন খবরই রাখেন না।

সুলোচনা রান্না করছিলেন। সবিতার চিৎকার হয়ত কানে গিয়েছিল কিন্তু রান্নার ব্যস্ততার মধ্যে তার অর্থ ঠিক বুঝতে পারে নি। ওরা এসে প্রণাম করতেই বুঝলেন।

তাড়াতাড়ি বললেন, পাস করেছিস? দাঁড়া, তোরা ও-ঘরে বোস, মাছের ঝোলটা নামিয়েই যাচ্ছি।

মিনিট দশেক পরেই তিনি এলেন, দু'হাতে দু'প্লেট খাবার নিয়ে।

বললেন, আজ তোদের জীবনের একটা মস্ত বড় দিন। আমি আশীর্বাদ করি, তোদের কল্যাণ হোক।

তারপর বললেন, বিশু ত এম-এ পড়বে, আর তুই কি করবি, রাম?

রামকিঙ্কর বললে, কিছুই ভাবি নি, মা। পাস করবো ব'লে আমি তৈরীও ছিলাম না।

—দোকানেই থাকবি? না, অন্য কোন চাকরি-বাকরি দেখবি?

রামকিঙ্কর বললে, দোকানে থাকতে পারব না বলে মনে হচ্ছে না, মা। আবার চাকরিই বা কোথায় পাব, তাও জানি না।

—থাকতে পারবি না কেন?

—অনেক গোলমাল, মা। দোকানেও, বাবুদের বাড়ীতেও।

—কিন্তু গিন্নীমা ত তোকে খুব ভালবাসেন।

—বাসতেন নিশ্চয়ই। নইলে আমার পক্ষে লেখাপড়া শেখা সম্ভবই হ'ত না। কিন্তু এখন যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে।

—কেন?

—সে অনেক কথা, মা। কিন্তু বড়লোকের বাড়ীর ব্যাপারে না থাকাই ভাল।

শুনে সুলোচনার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, তা সে যাই হোক, তাঁকে তুমি কোনদিন ভুল না। তোমার মা যা করতে পারতেন, তার চেয়ে তিনি বেশি করেছেন। হয়ত কোন কারণেই তিনি তোমার ওপর চটে গেছেন, তাঁকে খুশি করবার চেষ্টা ক'রো।

রামকিঙ্কর হাসলে। বললে, মা, তাঁকে আপনি কোনদিন দেখেন নি। পুরুষের মত শক্ত একটি মেয়ে। ওই বিপুল সম্পত্তি তিনি চালাচ্ছেন। তাঁকে কেউ খুশি করতে পারে না, যতক্ষণ না তিনি নিজের ইচ্ছায় খুশি হচ্ছেন। ব্যবহার থেকে বোঝবার উপায় নেই, তিনি কার ওপর খুশি আর কার ওপর চটা। খড়্গ ঘাড়ে পড়বার আগে কিছু বোঝা যায় না। আর যখন ঘাড়ে এসে পড়ে, তখন করবার কিছু থাকে না। সব শেষ হয়ে যায়।

সুলোচনা জিজ্ঞাসা করলে, পাসের খবর তিনি জানেন? তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিলি?

রামকিঙ্কর বললে, এই ত খবর পেলাম। এখুনি যাব।

সুলোচনা বললেন, তাই যা বরং। আগে তাঁকে প্রণাম করে আয়।

গরদের শাড়ীখানি পরে গিন্নীমা ঠাকুরদালানে তাঁর অভ্যস্ত জায়গাটিতে বসেছিলেন। রামকিঙ্কর তাঁকে প্রণাম করে হাসিমুখে মুখ তুলে চাইলে।

গিন্নীমা বোধ হয় একটা কিছু ভাবছিলেন। অন্যমনস্ক ছিলেন। রামকিঙ্করের আকস্মিক আবির্ভাবে চমকে উঠলেন। কিন্তু তখনি নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর?

রামকিঙ্কর বললে, আমি পাস করেছি।

শুনে গিন্নীমার ঠোঁটে একটা শীর্ণ হাসির রেখা ফুটে উঠল।

বললেন, বেশ, বেশ। তোমার সম্বন্ধে আমার ভয় ছিল। নানা কারণে তোমার পড়ায় অনেক বাধা হয়েছিল। এবার কি করবে ঠিক করছ? এম. এ. পড়বে?

—আজ্ঞে, না।

—কেন? টাকার প্রশ্ন?

রামকিঙ্কর হেসে বললে, আজ্ঞে, না। আপনি যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ টাকার চিন্তা করি না।

রামকিঙ্কর লক্ষ্য করলে, এই কথায় গিন্নীমা যেন খুব প্রসন্ন হলেন না।

সে বলতে লাগল, আমার ত অনার্স ছিল না। তাই এম. এ-তে ভর্তি হ'তে পারব না। আমার নিজেরও খুব পড়বার ইচ্ছা নেই। আপনার দয়ায় এই যতটা হ'ল, তাই যথেষ্ট।

রামকিঙ্কর তোয়াজের ভঙ্গিতে হাসতে লাগল।

গিন্নীমা জিজ্ঞাসা করলেন, এর পরে কি করবে ভাবছ? কোন ভাল চাকরি-বাকরির চেষ্টা করবে নিশ্চয়?

উদাস কণ্ঠে রামকিঙ্কর বললে, কোথায় পাব? মুরুব্বির জোর না থাকলে চাকরি পাওয়া যায় না। আমার ত মুরুব্বির জোর নেই।

—তা বটে। গিন্নীমা ঘাড় নাড়লেন।

এই সময় সারদা অন্দর থেকে বেরিয়ে ঠাকুরদালানের উঠান পার হয়ে ব্যস্তভাবে বাইরে চলে গেল। তাদের দিকে চাইলেই না। রামকিঙ্করের বুঝতে বাকী রইল না যে, এই ব্যস্ততাটা ভানমাত্র। ওদের দিকে না চাওয়াটা সারদা, এবং সম্ভবতঃ বৌরাণীও, তাকে আগেই লক্ষ্য করেছে। এবং তার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে বাইরের মোড়ের মাথায় অপেক্ষা করছে।

গিন্নীমাকে রামকিঙ্কর যথেষ্ট ভক্তি করে। তাঁর কাছে সে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। কিন্তু বৌরাণী সারদার মারফৎ মধ্যেখানে এসে পড়লেই তার সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। কেন হয়, সে নিজেও জানে না।

সারদা চলে যেতেই রামকিঙ্কর উসখুস করতে লাগল। সে ভুলেই গেল যে, সে গিন্নীমার সামনে বসে আছে এবং গিন্নীমা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করছেন। সারদার ব্যস্তভাবে এবং কোনদিকে না চেয়ে চলে যাওয়া তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি।

একটুক্ষণ উসখুস করে রামকিঙ্কর গিন্নীমাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

গিন্নীমা জিজ্ঞাসা করলেন, চললে।

রামকিঙ্কর বললে, যাই। দোকানে অনেক কাজ পড়ে আছে।

—আচ্ছা।

প্রতিবার পাস করার পর যখনই রামকিঙ্কর গিন্নীমাকে প্রণাম করতে এসেছে, গিন্নীমা তাকে পেট ভরে মিষ্টি খাইয়েছেন। এবারে সে বিষয়ে কোন কথাই বললেন না। হয়ত ভুলে গেছেন, নয়ত ইচ্ছা করেই খাওয়ালেন না। রাস্তায় এসে পড়ার আগে রামকিঙ্করেরও তা খেয়াল হয় নি। খেয়াল হ'তে তার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। গিন্নীমা কি সত্যিই তার ওপর অপ্রসন্ন হয়েছেন?

মোড়টা ফিরতেই রামকিঙ্কর দেখলে, রাস্তার একপাশে সারদা দাঁড়িয়ে। রামকিঙ্করের চোখে চোখ পড়তেই সারদা হাসলে।

বললে, বাবাঃ! কতক্ষণ থেকে আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি! গিন্নীমার সঙ্গে কথা আর শেষ হয় না। কি অত কথা?

রামকিঙ্কর হেসে বললে, আজে-বাজে কথা। কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন?

সারদা বললে, দরকার আছে ব'লেই দাঁড়িয়ে আছি। বৌরাণী এই দশটা টাকা দিলেন আপনাকে মিষ্টি খাবার জন্যে।

রামকিঙ্কর অবাক্: আমাকে! কি ব্যাপার?

সারদা হাসতে হাসতে বললে, আপনি পাস করেছেন। তাই আপনাকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন। আপনাকে ডেকে পাঠাবার ত উপায় নেই, তাই আমার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

—আমি পাশ করেছি উনি জানলেন কি করে?

—তা জানি না। বোধ হয় গিন্নীমাকে প্রণাম করতে দেখে অনুমান করেছেন।

—আমাকে ডেকে পাঠালেই ত পারতেন।

—ওই যে বললাম, তার উপায় নেই।

—কেন?

—গিন্নীমার মাথার পিছনের দিকেও আজকাল দুটো

চোখ গজিয়েছে। আমাদের তিনজনকে তিনি সন্দেহ করেন। তিনজনের ওপরেই তাঁর খর দৃষ্টি। চর আছে সবত্র। খুব সাবধানে থাকবেন। আমি আর দাড়াব না।

ব'লেই হন হন করে বাড়ীর দিকে চলতে লাগল।

রামকিঙ্কর ছুটে এসে তাকে ধরলে। জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার কিছু বললে না ?

সারদা খুব ব্যস্ত। বললে, এখন নয়। দেখা হ'লে আরেক দিন বলব।

—কবে দেখা হবে ?

সারদা একটু ভাবলে। বললে, এখনি বলতে পারছি না। বোরাণীকে জিগোস করে আপনাকে জানাব। এখন যাই, কেমন ?

সারদা চলে গেল।

একটু থমকে দাঁড়িয়ে থেকে রামকিঙ্করও দোকানের দিকে ফিরতে লাগল। মনে মনে চিন্তা : এরা কি একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস রচনা করছে ? এবং সেই উপন্যাসের সেও কি একটা চরিত্র ? অথচ সে নিজে কিছুই জানে না।

ওদের পরিবারে কোন ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়েছে কি না, সে তার কিছুই জানে না। তাকে জানাবার কেউ কোন প্রয়োজনও বোধ করে নি। তেমন গুরুতর ব্যক্তিও সে নয়। শুধু বোরাণীর কয়েকদিন ফরমাস খেটেছে বলেই গিন্নীমা যদি তাকে সন্দেহ করেন, তা হ'লে তিনি তার ওপর অবিচার করেছেন। গিন্নীমার ক্ষতি হ'তে পারে, এমন কোন কাজ সে করে নি। অত্যন্ত সন্দিগ্ধ প্রকৃতির মহিলা ব'লেই তিনি তাকে সন্দেহ করেন। নইলে সন্দেহের যথার্থ কোন কারণ নেই। এ বিষয়ে রামকিঙ্করের বিবেক পরিষ্কার। গিন্নীমা তাকে স্নেহ করেন ব'লে আর কেউ তাকে স্নেহ করতে পারবে না, তার কোন মানে নেই। এই স্নেহের জন্যে সে যেমন গিন্নীমার কাছে কৃতজ্ঞ, তেমনি বোরাণীর কাছেও। বরং বলা যেতে পারে, অন্যায়ভাবে গিন্নীমার স্নেহে আজ ভাটা পড়েছে, কিন্তু বোরাণীর স্নেহ সমান আছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এই দশটি টাকা। আনন্দ করে কত গোপনে সারদার হাত দিয়ে পাঠিয়ে ত দিয়েছেন। সুখবরটা দিতে সে বৌরাণীর কাছে যায়ও নি। অত্যন্ত স্নেহ করেন বলেই খবরটা অনুমান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

অথচ গিন্নীমা, যার কাছে খবরটা দিতে সে নিজে গিয়েছিল, এবং অতক্ষণ বসেছিল, মিষ্টি খাওয়াবার কথা তাঁর খেয়ালই হ'ল না !

ওদের বাড়ীতে কিছু একটা গোলযোগ চলছে, সে সন্দেহ রামকিঙ্করের মনে উঠেছে। যদিচ কি নিয়ে গোলযোগ, তা সে জানে না। সারদা জানতে পারে। কিন্তু তাকে কোনদিন বলে নি। বিশেষ আজ সারদার ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা তার কাছে বিসদৃশ ঠেকেছে।

রামকিঙ্কর ভাবতে ভাবতে চলেছে, হঠাৎ সুবলের সঙ্গে দেখা।

জিজ্ঞাসা করলে, অমন হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলেছ, সুবল ?

সুবল বললে, তোমার খোঁজেই।

—আমার খোঁজে !

—হ্যাঁ। পরীক্ষার ফল শুনে সেই কখন বেরিয়েছ, ফেরার নাম নেই। হরেকেষ্ট রেগে কাঁই।

—কি বলছে সে ?

—বলছে, বি এ পাস করে তুমি ত দোকানের মাথা কিনে নাও নি, তার জন্যে দোকানের কাজও বন্ধ থাকবে না।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, কে বলছে বন্ধ রাখতে ? আমার যদি জ্বর হ'ত, তা হ'লে কি হ'ত ? দোকানের কাজ বন্ধ থাকত ? দোকানে কাজ করবার আর কেউ নেই ?

সুবল মাথা নেড়ে বললে, অত আমি জানি না বাবা। বললাম ত, হরেকেষ্ট রেগে কাঁই। অনেক নাকি কাজ পড়ে রয়েছে। তার সঙ্গে মোকাবিলা করবে চল।

ক্রমশঃ

মায়া

শ্রীবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

অন্তরে যে নিতুই যাওয়া-আসা,
দেশান্তরে থাকা তোমার সাজে ?
ছন্দে মম গাঁথা তোমার ভাষা,
কণ্ঠে মম তোমারি গান বাজে।
ফাগুন যবে পলাশ ডালে-ডালে
আগুন জ্বালে নাচের তালে-তালে,
নিঃশ্বাসে তা'র দূরের মায়া-জালে
আগুন লাগে, লুটায় সে যে লাজে—
তখনও মায়া, কেমনে রও দূরে,
জীবন মম বাঁশরী সম
যখন মরে ঝুরে ?

শাঙনে নভ-আঙনে কালো মেঘে
পুলকে নাচে যবে বিজলী-বালা,
ভিজে হাওয়ার পরশ বুকে লেগে
শিহরি কাঁপে তরুণী বন-মালা,
ভাদরে মেঘ-আদরে ভরা নদী
রসোচ্ছ্বাসে উছল নিরবধি,
বিরহ-গীতি জাগায় প্রাণে যদি,
কদম-কেয়া সাজায় যদি ডালা—
তখন মায়া, যতই থাকো দূরে,
বিরহ মম বাঁশরী সম
ডাকিবে সুরে সুরে।

নিদাঘে যবে বিবশ বন-ডালে
গলিত ফুল, চকিত পশুপাখী,
ঘূর্ণি হাওয়া চূর্ণি ধূলি-জালে
অন্ধ করে দিগন্তের আঁখি,
তৃষার বাণে চাতক জর'-জর',
বেতসী কাঁপে হুতাশে থর' থর',
বিষাদ-বিষে মালতী মর' মর'
লুটায় ভূমে ধুলায় দেহ ঢাকি'—
তখনও মায়া, কেমনে রও দূরে ?
বেদনা যবে বাঁশরী রবে
ফুকারে সুরে সুরে ?

শরতে প্রাণ-পরতে আঁকো ছবি
শুভ্রতার বিজয় বাণী-ভরা,
কবির মাঝে তুমি যে মম কবি,
আমার এ দীন জীবন-মনোহরা !
হেমন্তেরি কুহেলি-ভরা প্রাতে
কুহক-খেলা দিগন্তেরি হাতে,
সে খেলা হেরি প্রভাত-শিশু মাতে
হাসিটি তা'র বিহগ-গীতি-ঝরা—
তখনো মায়া, রইতে পারো দূরে ?
হাসিতে তব বাঁশরী নব
বাজে না সুরে সুরে ?

শীতের মাঠে উদাস বাটে বালা,
আপন মনে ভ্রম কি অভিমানে ?
এবার আনো ভুলে থাকার পালা,
তুলে রাখার স্বপ্ন ভাঙো প্রাণে।
আজিকে আশা-রিক্ত-তরু-শাখে
বেদনা মম বিহগ-সম ডাকে,
সিক্ত হাওয়া হাঁকিছে নদী-বাঁকে
মিশায়ে সুর নদীর কলগানে।
সুদূর তব মধুর,—মায়া,—জানি ;
নিকট কর মধুরতর
আবির্ভাবে রাণি !

কেশবতী কন্যা গো—

শ্রীকৃষ্ণধন দে

কেশবতী কন্যা গো, বাঁধবে না কেশ ?
মন্থর সন্ধ্যা যে এল শিয়রে,
বনতুলসীর মৃদু গন্ধভরা
ফাগুনের লিপি এল তোমারি ঘরে !
দিগন্তে বাঁকা চাঁদ মিটি-মিটি চায়,
ফসলহারানো মাঠ ঢুলে তন্দ্রায়,
জোনাকিরা জ্বালে দীপ বনের ছায়ায়,
মায়াবী রাতের নেশা উতলা করে !

কেশবতী কন্যা গো, বাঁধবে না কেশ ?
গভীরা রজনী হ'ল অধীরা আরও,
শোননি চাঁপার বনে হাওয়ার হাসি ?
—ঢেউয়ে ঢেউয়ে কেঁপে যায় সুরটি তারও !
রাতজাগা পাখী যদি কাঁপায় ডানা
অভিসারিকার সে কি হবে নিশানা ?
কেতকী-বীথির পথ নাই যে জানা,
কাঁটায় জড়াল বুঝি আঁচল কারও !

কেশবতী কন্যা গো, বাঁধবে না কেশ ?
তামসী রাত্রি হ'ল ধ্যান-মধুরা,
দিগন্তে কেঁপে ওঠে ডুবুডুবু চাঁদ,
ছায়াপথে নেমে আসে দিগ্বধূরা।
উতলা হাওয়ায় ঘুমজড়ানো চোখে
তোমায় কি ডাকে তা'রা কল্পলোকে ?
সিঁথির সিঁদুর খোঁজে রাঙা অশোকে,
বেণীতে দোলাতে চায় কৃষ্ণচূড়া ?

কেশবতী কন্যা গো, বাঁধবে না কেশ ?
নিশিগন্ধার মালা নেবে না তুলে ?
ঘুম-ঘুম বাতাসের পেয়ে চুম্বন
জড়াবে না বেল-কুঁড়ি তোমার চুলে ?
আঁকাবাঁকা পথ গেছে নদীর পারে,
ঝিল্লীনূপুর বাজে সুরবাহারে,
হাতছানি দেয় কারা আলো-আঁধারে
—পায়ের শিশির মোছে আঁচল খুলে !

কেশবতী কন্যা গো, বাঁধবে না কেশ ?
শুকতারা ডেকে ডেকে গেল যে ফিরে,
বাতাসে জানি না কোন্ সুরা মেশানো,
তৃষার স্বপন কাঁপে অধর ঘিরে !
উষার নীলাভ আলো গেল ছড়ায়ে
তন্দ্রা-অবশ দুধ-বরণ কায়ে,
তোমার মনের রঙে রঙ্ মিশায়ে
রূপকথা ছবি হ'ল পুরব তীরে !

বিদেশের কথা

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

মার্কিন নির্বাচন : উত্তর সমীক্ষা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যগুলি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রেসিডেন্ট জনসনের আগে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণী রাজ্যগুলি থেকে কেউ কোনদিন ডিমক্রাটিক বা রিপাবলিকান দলের প্রার্থীরূপে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশটি রাজ্যের মধ্যে মাত্র যে ছয়টি রাজ্যের সমর্থন জনসন পান নি তার মধ্যে পাঁচটি দক্ষিণের এবং আর একটি তাঁর রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী গোল্ডওয়াটারের নিজ রাজ্য এরিজোনা। দক্ষিণের অন্যতম রাজ্য আলবামা দীর্ঘকাল ডিমক্রাটিক দলের সমর্থক থাকলেও এবারের নির্বাচনে জনসনের বিরোধিতা করেছে। অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে মিসিসিপি ১৮৭২ সালের পর এই প্রথম রিপাবলিকান প্রার্থীকে সমর্থন করল এবং দক্ষিণ ক্যারোলিনা করল ১৮৭৬ সালের পর এই প্রথম। জর্জিয়াও ইতিপূর্বে কখনও ডিমক্রাটিক দলের বিরুদ্ধে যায় নি। আবার অপরদিকে ভারমণ্ট রাজ্য এইবারই প্রথম ডিমক্রাটিক প্রার্থীকে সমর্থন করল; মেইন রাজ্যও এইবার নিয়ে মাত্র দ্বিতীয়বার ডিমক্রাটিক দলের অনুকূলে গেল। ১৯১২ সালে আর একবার মেইন ডিমক্রাটিক প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়েছিল।

এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মোট ৬ কোটি ৯১ লক্ষ ৬৯ হাজার ভোটার ভোট দেয়, এত বেশী ভোটার যুক্তরাষ্ট্রের কোন নির্বাচনে অংশ নেয় নি। '৬০ সালের নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ ৩৯ হাজার। ভোটার সংখ্যা অবশ্য লোকবৃদ্ধির জন্য প্রতিবারই বাড়ার কথা। কিন্তু এবারের বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় নি, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে যেসব শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তাদের সকলেরই এবার ভোটার হওয়ার কথা। তার ওপর ওয়াশিংটন, ডি-সি'র অধিবাসীরা এইবারই প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেলেন, সেখানে ভোটার সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রের ভোটার তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের মধ্যে শতকরা ৭৮ জন এবারের নির্বাচনে ভোট দেয়।

প্রেসিডেন্ট জনসন নির্বাচনে মোট ভোট পান ৪,২৩,২৮,৩৫০, এত বেশী ভোট ইতিপূর্বে কেউ পান নি। ১৯৫৬ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার পেয়েছিলেন ৩,৫৫,৯০,০০০ ভোট। প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে এত বেশী ভোটের ব্যবধানও ইতিপূর্বে কেউ রাখতে পারেন নি, গোল্ডওয়াটারের চেয়ে তিনি প্রায় এক কোটি সাতান্ন লক্ষ ভোট বেশী পান। ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর ভোটের ব্যবধান ছিল প্রায় এক কোটি এগার লক্ষ। প্রদত্ত ভোটের মধ্যে জনসন পেয়েছেন ৬১.২ শতাংশ; ইতিপূর্বে ১৯৩৬ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পেয়েছিলেন ৬০.৮ শতাংশ ও প্রেসিডেন্ট হার্ডিং ১৯২০ সালে ৬০.৪ শতাংশ।

মার্কিন কংগ্রেসের দুই সভা 'সেনেট' ও 'হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস'-এও দীর্ঘদিন প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে এত বেশী শক্তির পার্থক্য ঘটে নি। সেনেটে একশ' জন সদস্যের মধ্যে এখন ডিমক্রাটের সংখ্যা ৬৮ ও রিপাবলিকানের সংখ্যা ৩২; এবারের আংশিক নির্বাচনে দু'টি আসন রিপাবলিকানদের হাতছাড়া হয়েছে। আর হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে হাতছাড়া হয়েছে ৩৮টি আসন। 'হাউসে'র ৪৩৫টি আসনের মধ্যে ডিমক্রাটরা জয়ী হয়েছেন ২৯৫টিতে ও রিপাবলিকানরা ১৪০টিতে। যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যের মধ্যে ৩৩টির গভর্ণর ডিমক্রাট ও ১৭টির রিপাবলিকান।

ডিমক্রাট দলের বিপুল সাফল্যের কারণ বিশ্লেষণকালে প্রেসিডেন্ট জনসন বলেন, প্রেসিডেন্ট কেনেডি যে ন্যায় ও শান্তির পথে যুক্তরাষ্ট্রকে চালিত করতে চেয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা প্রকৃতপক্ষে সেই পথই বেছে নিয়েছেন। রিপাবলিকানপ্রার্থী গোল্ডওয়াটার যে সঙ্কীর্ণ, প্রতিক্রিয়াশীল ও বিপজ্জনক নীতি অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ রিপাবলিকান সমর্থকও তা অনুমোদন করেন নি।

গোল্ডওয়াটার কিন্তু এতে নিরাশ হন নি। নির্বাচনের পর এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের আড়াই কোটিরও বেশী লোক তাঁকে ভোট দিয়ে প্রকৃতপক্ষে রিপাবলিকান দলের নীতি ও পথের প্রতিই পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। ৩রা জানুয়ারীর পর তাঁর যখন আর কোন কাজ থাকবে না তখন দলকে নূতন আদর্শের ভিত্তিতে গ'ড়ে তোলার জন্য তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন।

কঙ্গোয় সঙ্কট ঃ

স্বাধীন কঙ্গোর চার বছরের ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন হানাহানি ও অনর্থক রক্তপাতের ইতিহাস। বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদীরা ঐ বিশাল রত্নগর্ভা দেশটিকে দীর্ঘকাল নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করেছে কিন্তু তার বিনিময়ে ন্যূনতম রাজনৈতিক শিক্ষাটুকুও কঙ্গোলীদের দেয় নি। ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার চাপে যেদিন বেলজিয়ান সরকার কঙ্গোর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে সেইদিনই কঙ্গোর উপজাতিগুলির মধ্যে ক্ষমতার লড়াই সুরু হয়ে যায়। আজও তার অবসান হয় নি।

প্রথমে বেলজিয়ানদের প্ররোচনায় ও সক্রিয় সহযোগিতায় শোম্বের নেতৃত্বে কঙ্গোর সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রদেশ কাতাঙ্গা বিদ্রোহ করে। কঙ্গোর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অস্বীকার করে কাতাঙ্গায় স্বাধীন সরকার গঠন করেন শোম্বে, ফলে সারা কঙ্গো জুড়ে গৃহযুদ্ধ সুরু হয়ে যায়। সেই গৃহযুদ্ধের আগুনে কঙ্গোর প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বা প্রাণ হারান, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে সারা দেশ রসাতলে যাওয়ার উপক্রম হয় ও প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশে একটি করে পাল্টা সরকার গঠিত হয়ে আফ্রিকার মানচিত্র থেকে কঙ্গোর নাম প্রায় মুছে যায়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপের ফলে ঐ শোচনীয় অবস্থা থেকে কঙ্গো শেষ পর্যন্ত রক্ষা পায়, কিন্তু কঙ্গোর দুঃখের অবসান তাতে হয় না। কারণ কঙ্গোর ভৌগোলিক অখণ্ডতা কোনরকমে বজায় থাকলেও তার রাজনৈতিক বিভেদ ও বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে কঙ্গোর শাসনব্যবস্থার পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত হন, তার সব দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের মুখ্য কারণ শোম্বে। শোম্বে তার অপ্রিয়তা ও কুখ্যাতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, তাই বেলজিয়ান বন্দুক ও শ্বেতাঙ্গ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গিনের জোরেই তিনি ক্ষমতাসীন থাকতে চান।

কিন্তু কঙ্গোর স্বাধীনচেতা মানুষরা স্বাধীনতার ছদ্মাবরণে ঐ নগ্ন উপনিবেশবাদ মেনে নিতে অসম্মত হয়। তাই শত প্রতিকূলতার মধ্যেও আবার কঙ্গোর বিভিন্ন স্থানে শোম্বে-বিরোধী অভিযান সুরু হয় ও কঙ্গোর উত্তর-পূর্ব দিকে ষ্টানলিভিল নগরে প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্রোহীদের পাল্টা সরকার। ক্রমে কঙ্গোর সমগ্র উত্তর ও পূর্ব অংশ বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায় এবং শোম্বের ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী সেই প্রচণ্ড আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। আফ্রিকার তথা বিশ্বের প্রায় সকল সদ্যস্বাধীন দেশগুলির পূর্ণ সমর্থন লাভ করে কঙ্গোর বিদ্রোহী পাল্টা সরকার। শোম্বেকে কেউই কঙ্গোর প্রকৃত প্রতিনিধি বলে স্বীকার করে না এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে চরম অপমানিত হয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হয়।

কিন্তু কঙ্গোর পাল্টা সরকারের প্রধান ক্রিষ্টোফ জিবনে ক'দিন আগে ষ্টানলিভিল ও বিদ্রোহীদের অধিকারভুক্ত অন্যান্য স্থানের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের নজরবন্দী ক'রে ও মার্কিন মেডিক্যাল মিশনারী ডাঃ পল কার্লসনকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে এক সাংঘাতিক ভুল করেন। জিবনে হয়ত আশা করেছিলেন যে, শ্বেতাঙ্গদের গ্রেপ্তার করে বা তাদের উপর পীড়নের ভয় দেখিয়ে তিনি কঙ্গোর ঘরোয়া ব্যাপারে পশ্চিমীদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে পারবেন। কিন্তু তিনি বোধহয় ভাবতেই পারেন নি যে, ঐ শ্বেতাঙ্গদের উদ্ধারের অজুহাত কঙ্গোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পশ্চিমীদের সরাসরি হস্তক্ষেপের সুযোগ এনে দেবে। তা ছাড়া স্বদেশবাসীদের জীবনের অনিশ্চয়তা ও চরম বিপন্ন অবস্থা কোন মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্র কখনও নীরবে মেনে নেয় না। রাজনৈতিক ন্যায়-অন্যায়ের চেয়ে অনেক বড় নিরপরাধ মানুষের জীবন। এ কারণে কঙ্গোর বিদ্রোহী সরকার সহস্রাধিক শ্বেতাঙ্গ সম্বন্ধে কঠোর মনোভাব নেওয়া মাত্রই বেলজিয়ান ছত্রী সৈন্যবাহিনী মার্কিন বিমানবাহিত হয়ে ব্রিটেনের সহায়তায় ষ্টানলিভিলে অবতরণ করে ও তড়িৎগতিতে বিদ্রোহীদের ঘাঁটিগুলি দখল করে নেয়। বিদ্রোহী সরকারও তখন মরিয়া হয়ে শ্বেতাঙ্গদের উপর নিষ্ঠুর পীড়ন সুরু করে, যার ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই ডাঃ কার্লসনসহ শতাধিক শ্বেতাঙ্গ নরনারী ও শিশু প্রাণ হারায়। অন্য বন্দীদের কোনরকমে উদ্ধার করে বেলজিয়ান ছত্রী সৈন্যবাহিনী। আর ঐ সুযোগে শোম্বের ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীও বিদ্রোহীদের ঘাঁটিগুলি পুনর্দখল করে নেয়। কয়েকদিনের মধ্যে বিদ্রোহী সরকার প্রায় সম্পূর্ণ নির্মূল হয় ও বিদ্রোহী সরকারের নেতারা নিরুপায় হয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্তবর্তী রাজ্য সুদানে গিয়ে আশ্রয় নেন। বিদ্রোহীদের দখল-করা প্রায় সব অঞ্চলই এখন শোম্বের দখলে, শোম্বের ভাড়াটে সৈন্যদের অত্যাচারে চরম সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে সে সব স্থানে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবহ শোম্বের বিরুদ্ধে কঙ্গোর স্বাধীনতাকামী মানুষদের অভিযান যে সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল তার জন্য বিদ্রোহীদের হঠকারিতাই বেশী দায়ী।

রুশ-চীন বিরোধ ঃ

ক্রুশ্চভের অপসারণের পর বিশ্বের বিভিন্ন মহলে রুশ-চীন আঁতাত সম্বন্ধে যে আশা বা আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তা ইতিমধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। ক্রুশ্চভ দূরে সরে যাওয়ার পরেই সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান নেতারা বোধহয় বুঝতে পারেন যে, ক্রুশ্চভ গত দশ বছরে সোভিয়েট

ইউনিয়নের ভিতরে ও বাহিরে, সারা বিশ্বের রাজনীতিতে কি গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেন। কম্যুনিষ্ট দুনিয়ায় এ ধরনের ক্ষমতার হাতবদল কোন নতুন ঘটনা নয়, কিন্তু তা কখনও বিশ্বের রাজনীতিকে এমনভাবে আলোড়িত করে নি। ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশগুলি এবং খোদ সোভিয়েট জনগণ ইতিপূর্বে কখনও একটি মানুষের পক্ষে এমনভাবে রুখে দাঁড়ায় নি। ফলে সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান নেতৃবৃন্দের পূর্ব-মনোভাব যাই থাকুক না কেন, এখন তাঁরা স্পষ্ট করেই এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, "বার্ধক্য ও অসুস্থতার জন্য" ক্রুশ্চভ পদত্যাগ করলেও সোভিয়েট ইউনিয়নের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে না। ভারতকে তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন, ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী পূর্বের মতই দৃঢ় থাকবে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের পূর্ব-প্রতিশ্রুত কোন সাহায্য ও সহযোগিতা থেকে ভারত বঞ্চিত হবে না। ভবিষ্যতে দুই দেশের মৈত্রীবন্ধন আরও দৃঢ় করার জন্য উভয় দেশের নেতৃবৃন্দই আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের চুক্তি লঙ্ঘন করে চীন যে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, তার বিরুদ্ধেও সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ জানান হয়েছে। সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, শান্তি ও সহ-অবস্থানের নীতিই সোভিয়েট নীতি এবং তা সফল ও সার্থক করার জন্য তাঁরা পূর্বের মতই সচেষ্ট থাকবেন।

সুতরাং ক্রুশ্চভের অন্তর্ধানের পর যতটা আশা নিয়ে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই মস্কোয় গিয়েছিলেন, তার অনেক বেশী নৈরাশ্য নিয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছে। চীনা পত্রিকাগুলিতে এখনই বলা সুরু হয়েছে যে, ক্রুশ্চভের পতন হ'লেও ক্রুশ্চভবাদের অবসান হয় নি; আর ক্রুশ্চভবাদ হ'ল নিছক শোধনবাদ ও বিপ্লববিরোধী নীতি।

সিংহল মন্ত্রিসভার পতন ঃ

সিংহলে বাহান্ন মাস স্থায়ী সিরিমাভো মন্ত্রিসভার অকস্মাৎ পতন শুধু ঐ দ্বীপরাষ্ট্রটিরই নয়, সারা এশিয়ার রাজনীতির পক্ষে একটি উদ্বেগজনক সংবাদ। এশিয়ার সদ্যস্বাধীন দেশগুলির প্রায় সবক'টিতে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু হ'লেও ভারত ও সিংহল এখনও পর্যন্ত গণতন্ত্রের পথ ত্যাগ করে নি। কিন্তু সিংহলে ক্রমে ক্রমে যেসব অনিবার্য পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে তাতে ঐ দেশটির পক্ষে খুব বেশীদিন গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখা সম্ভব হবে ব'লে মনে হয় না।

সিংহলে গণতান্ত্রিক শাসনের প্রধান বাধা তার অগণিত রাজনৈতিক দল। সিংহল স্বাধীন হওয়ার সময় তার প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি; সে দলটি এখনও বৃহত্তম দল হ'লেও আর ক্ষমতাসীন নয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করে, কিন্তু বিরোধী দলগুলির ঐ ঐক্যও শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে না। সিংহলের দ্বিতীয় বৃহৎ দল শ্রীমতী বন্দরনায়েকের নেতৃত্বাধীন শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টি; ১৯৬০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টির চেয়ে শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টি প্রায় ১২ শতাংশ ভোট পেলেও অন্যান্য দলগুলির সহায়তায় পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সমর্থ হয়। সিংহলের তৃতীয় বৃহৎ দল ট্রটস্কিপন্থী সম-সমাজ পার্টি। যাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রীমতী বন্দরনায়েক প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করেন তাদের অনেকে শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করায় শ্রীমতী বন্দরনায়েক পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার একান্ত প্রয়োজনে এই বছর আগষ্ট মাসে সম-সমাজ দলের সঙ্গে কোয়ালিশন গঠন করেন। কিন্তু সেটা শ্রীমতী বন্দরনায়েকের প্রধান নির্ভর, তাঁর মন্ত্রিসভার প্রবীণতম সদস্য শ্রী সি. পি. ডি সিলভার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না, এবং তিনি তাঁর তেরজন অনুগামী নিয়ে অকস্মাৎ বিরোধী দলে যোগ দেওয়াতেই মুহূর্তের মধ্যে সিরিমাভো মন্ত্রিসভার পতন হয়। সংবাদে প্রকাশ, শ্রী ডি' সিলভা আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নূতন একটি দল গঠন করবেন। তামিলভাষীদের ফেডারেল পার্টি সিংহলের আর একটি উল্লেখযোগ্য দল; তা ছাড়াও আছে কম্যুনিষ্ট পার্টি, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক জোট 'মহাজন একসাথ পেরামুনা,' 'জাতিকা বিমুক্তি পেরামুনা,' ইত্যাদি। মার্চ মাসে সিংহলে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা হচ্ছে; তা যদি হয় তবে ইতিমধ্যে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে এমন অবস্থা কিছুতেই সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না, যাতে তাদের পক্ষে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ সম্ভব হ'তে পারে। সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে এই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত।

শ্রীমতী বন্দরনায়েকের মন্ত্রিসভার পতন ঘটায় সিংহলস্থ ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের ভবিষ্যৎ আবার অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। কারণ সিরিমাভো বন্দরনায়েক ভারতে এসে এ সম্বন্ধে যা ব্যবস্থা ক'রে যান তা সিংহল পার্লামেন্টে অনুমোদিত হওয়ার সুযোগ পেল না। সুতরাং সাধারণ নির্বাচনের পর সিংহলের নতুন সরকার নয়াদিল্লী চুক্তি অনুমোদন না করা পর্যন্ত এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছুই বলা যাবে না।

পাঞ্চজন্য

হলডেন

জন বার্ডন স্যাণ্ডারসন হলডেন সম্প্রতি গত হলেন অধ্যাপক জে বি এস হলডেন নামেই তিনি আমাদের এবং বিশ্বের বিজ্ঞানীসমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন তাঁর প্রসঙ্গে আমার একটা গল্পের কথা মনে পড়ে। সে গল্পটা আগে বলে নি। জার্মানের এক হিল স্টেশনে (Hill Station) বেড়াতে গিয়ে এক ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে স্থানীয় এক রাসায়নিকের পরিচয় হ'ল। আগন্তুক ভদ্রলোক রসায়নশাস্ত্রের লোক না হ'লেও বিজ্ঞান হ'ল তাঁর সাধনার বিষয় তিনি একজন পদার্থবিদ্। তাঁদের আলাপ তাই স্বাভাবিকভাবে বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ নিয়ে উঠল আগন্তুক ভদ্রলোক বললেন, দেখুন, আমি রসায়নশাস্ত্রের লোক না হ'লেও এ বিষয়ে আমার ইণ্টারেষ্ট আছে। আমি এ সম্বন্ধে যথাসম্ভব খোঁজ রাখার চেষ্টা করি। আচ্ছা, রসায়নের কি নিয়ে আপনার কাজ।

জার্মান রাসায়নিক। কয়লাজাত জিনিষ হ'ল আমার গবেষণার বিষয়।

পদার্থবিদ। কয়লাজাত জিনিষ। সত্যি, এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার কয়লা থেকে যে হরেক রকম ওষুধ পাওয়া যেতে পারে কে আগে তা ভাবতে পেরেছিল।

রাসায়নিক। দেখুন, সে বিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞ নই। কয়লাজাত রং সম্বন্ধেই আমি বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি

পদার্থবিদ। কয়লা থেকে এত রকমের রং তৈরি হয়েছে এ সম্বন্ধে যত ভাবি ততই আমি অবাক্ হই। কয়লা কালো, অথচ—। সত্যি, রসায়ন বড় আশ্চর্য বিষয়!

রাসায়নিক আপনি একটু ভুল করছেন। কয়লা থেকে তৈরি সমস্ত রং নিয়ে আমি কাজ করি নি। কয়লাজাত একমাত্র এনিলিন ডাই সম্বন্ধেই আমি বিশেষজ্ঞ।

পদার্থবিদ। এনিলিন ডাই-এর আমি নাম শুনেছি। আমাদের ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে অদ্ভুত সব কাজ করেছেন শুনতে পাই। টেষ্ট টিউবে এনিলিন ব্লু রং আমি নিজেই দেখেছি। সত্যি, বড় অপূর্ব।

রাসায়নিক। দেখুন, এনিলিন ব্লু সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই, কালো রং-এর এনিলিন ব্লাক সম্বন্ধেই আমি বিশেষজ্ঞ।

অনুরূপ আরেকটা গল্প শুনেছিলাম ডাক্তারদের নিয়ে। কিন্তু অধিক বলার প্রয়োজন দেখি না। গল্পের তাৎপর্য একটিতেই পরিস্ফুট হয়েছে। বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, যাঁরা বিজ্ঞানী গবেষক, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ তাঁদের নিজের বিশেষ বিষয়টি নিয়েই সন্তুষ্ট, তার বাইরে—এমন কি বিজ্ঞানেরই অন্য বিষয়ে পর্যন্ত তাঁদের জ্ঞানের বহর আর পাঁচজন সাধারণের মত। গল্পের ঐ বিশেষজ্ঞ রাসায়নিকের সঙ্গেই তাঁদের তুলনা। বিজ্ঞানের নানা শাখায় পারঙ্গম বিশেষজ্ঞ সত্যই বড় দুর্লভ। অধ্যাপক হলডেন এই দুর্লভদেরই একজন ছিলেন। গল্পের পদার্থবিদ ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর তুলনা। বরং তুলনার থেকেও কিছু বেশী। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদলাভ নিঃসন্দেহে বিশেষ একটি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভের নিদর্শন। হলডেন তাঁর সুদীর্ঘ শিক্ষক জীবনের বিভিন্ন সময়ে ফিজিওলজি (শারীরবিদ্যা), বায়ো-কেমিষ্ট্রি (জীব-রসায়ন), জেনেটিকস্ (প্রজনন-তত্ত্ব) এবং বায়ো-মেট্রি'র অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন

হলডেনের সম্বন্ধে আরও বড় কথা—বিজ্ঞানের বহুমুখী বিষয়গুলির বাইরেও তাঁর আগ্রহ ও কৌতূহল পরিব্যাপ্ত ছিল। যে বৈজ্ঞানিক ধারণা ও চিন্তাপ্রণালী বর্তমান যুগের বিশেষত্ব, আশ্চর্যের কথা এই যে, সেই ধারণা ও মন অধিকাংশ বিজ্ঞানীর পক্ষেই ল্যাবরেটরীর সীমানার বাইরে নিষ্ক্রিয় থাকে। পৃথিবীর নানা জটিল রাজনৈতিক আবর্তের মধ্য থেকে তিনি ঘটনার তাৎপর্য সন্ধান করতেন বিজ্ঞানের বিচিত্র বিষয়ে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা ছাড়াও তিনি "ডেলি ওয়ার্কার" পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন এক প্রখর রাজনৈতিকবোধ তাঁর জীবনবোধকে বিশেষত্ব দান করেছিল জীবনের কোন পর্যায়েই তিনি স্থির হয়ে বসে থাকেন নি। পরবর্তী কালে (১৯৫৭ সালে) জন্মভূমি ইংলণ্ড ত্যাগ করে এই ভারতকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করলেন। এখানেও তিনি এক জায়গায় টিঁকে থাকেন নি। বরানগরের ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইন্ষ্টিটিউশন ছেড়ে ভুবনেশ্বরের জেনেটিকস্ ও বায়োমেট্রি ল্যাবরেটরীর কর্মভার গ্রহণ করলেন। এখানেই তাঁর শেষ কর্মজীবন।

অধ্যাপক হলডেনের জীবনে বার বার পালাবদল হয়েছে। বহু বিষয় মত ও দেশের মধ্যে তাঁর জীবন বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত নানা পরিবর্তন, অস্থিরতা ও প্রতিভাত পাগলামির পিছনে এক সূর্যমুখী ধারণা ও মন সর্বদা কাজ করত।

ফুল সূর্যমুখী সারাদিন সূর্যের দিকে মুখ তুলে থাকে। হলডেনের মহাজীবন এ রকম এক শুভ্র সূর্যমুখী ফুল। এই সূর্যের নাম সত্য ন্যায়বোধ ও অবিচল বিশ্বাস।

এ. কে. ডি

শিল্পমেলা

মেলা হ'ল মিলনক্ষেত্র। আবহমানকাল থেকে মেলার এই পরিচয়ই আমরা জানি। আধুনিক যুগে এই মেলা শিল্পমেলার রূপ নিয়েছে। শিল্পমেলা মিলনক্ষেত্র, সে-ই সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতি কতটা হ'ল না-হ'ল তা জেনে নেওয়ার মাপকাঠি বটে। বিজ্ঞানের যে অফুরন্ত সম্ভার তার সামান্য কয়টি মাত্র সাধারণের জীবনে এসেছে। বিজ্ঞানের অসামান্য দিকগুলি জেনে নিতে হ'লে আমাদের তাই শিল্পমেলার দর্শক হ'তে হয়। শহরে, জনপদে উঁচু উঁচু স্তম্ভ থাকে, খুব অল্প লোকেই তার উপরে গিয়ে ওঠে, কিন্তু সকলের পক্ষেই তা দর্শনীয়। শিল্পমেলাকেও

ন্যু ইয়র্ক বিশ্ব শিল্পমেলার অভিনব প্রতীক

ন্যু ইয়র্কের শিল্পমেলার একটি প্রধান আকর্ষণ আলোকস্তম্ভ
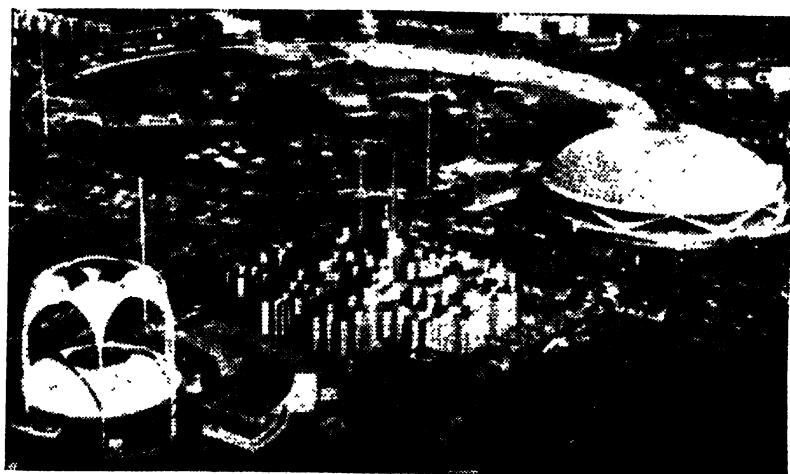
আমার কাছে এ সব উঁচু স্তম্ভ বা চূড়াগুলির মতই মনে হয়। বিজ্ঞানের যে-সমস্ত অভিনব ফসলগুলি সাধারণের পক্ষে কখনই সম্ভব হ'ত না, শিল্পমেলার আলোকিত অনুষ্ঠানের মধ্যে তাই একবার জীবনে সত্য হয়ে ওঠে। যা আছে অথচ যা কি না ধরাছোঁয়ার বাইরে মানুষ তার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। শিল্পমেলার উদ্দেশ্য এভাবে আর এক উপায়ে সার্থক হয়ে ওঠে।

সম্প্রতি (গত এপ্রিল মাসে) আমেরিকার নিউ ইয়র্কে যে আন্তর্জাতিক শিল্পমেলার আয়োজন হয়েছিল তার রূপায়ণের মধ্যে এ কথারই তাৎপর্য সত্য হয়ে উঠেছে। আমাদের পক্ষে যখন তার দর্শক হওয়ার কোন উপায় নেই, কয়েকটি ছবির মধ্য দিয়েই আমাদের তুষ্ট হ'তে হবে।

ভারত কি এটম বোমা তৈরি করবে ?

এ প্রশ্নেরই এক পরিপূরক প্রশ্ন: ভারত যুদ্ধসজ্জায় পরমাণু শক্তি ব্যবহারের পক্ষে কি বিরোধী? এক প্রশ্নের সঙ্গে আর এক প্রশ্নের গিঁট বাঁধা রয়েছে। একটি প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে আর একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। ভারত দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর অনেক আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিল। মানুষের নূতন শক্তি যে পরমাণু, তার ব্যবহার মানুষের মঙ্গলের জন্যই একমাত্র নিয়োজিত থাকবে, যুদ্ধের প্রয়োজনে তার ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা উচিত—এমন কথা ভারতের জনগণমন অধিনায়ক নেতারা বার বার ঘোষণা করেছেন। মোট কথা, ভারত যে অস্ত্র হিসাবে পরমাণু শক্তি ব্যবহারের বিরোধী, এ নিয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ দেখা যায় নি। কিন্তু যা এতদিন স্পষ্ট ছিল, যার উত্তর এতদিন সুনির্দিষ্ট ছিল, তাই যেন আবার নূতন করে গোলমেলে মনে হচ্ছে। অবশ্য বিষয়টি যখন পরমাণু-সংক্রান্ত—আলোচনার ডালপালা নানা দিক থেকে উঁকি মেরে সমগ্র প্রসঙ্গটাকে জটিল (অথবা আপাত-জটিল) করে তোলে এ সমাধানের স্পষ্ট নির্দেশ, তাই কম্পাসের কাঁটার মত বার বার কেঁপে কেঁপে ওঠে। প্রতিটি পুরাণো প্রশ্নের উত্তরই এভাবে নূতন পরিস্থিতির সূচনায় যাচাই করে নিতে হয়। চীন কর্তৃক পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ এমন একটি উপস্থিত ঘটনা। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করে প্রশ্ন উঠেছে: ভারত কি পরমাণু অস্ত্রসজ্জায় নিষ্ক্রিয় থাকবে? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক, চীনের সঙ্গে ভারতের বর্তমান সম্পর্কের কথা চিন্তা করলে এ প্রশ্ন অস্বীকার করা যায় না। অনেকের মুখে প্রশ্নটি তাই আরো চোখা হয়ে উঠেছে: ভারত কি এবার এটম বোমা তৈরি করবে না? প্রশ্নের মধ্যেই প্রশ্নকর্তার জবাব প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

পৃথিবীতে শক্তির এক বিরাট মহিমা আছে, বিশেষত তা যখন রুদ্র, ধ্বংসের রূপ। মানুষ এটম বোমার নিন্দা করছে, কিন্তু তার অভাবনীয় ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে বিস্মিতও হয়েছে; তার নির্মাণকারী বিজ্ঞানীদের দিকে প্রশংসার চোখে তাকিয়েছে। এটম বোমা মানুষের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও সংগঠন শক্তির ফসল। এটম বোমার প্রশংসা করে মানুষ বোধ হয় সেই বিশেষ গুণাবলীরই প্রশংসা করে থাকে। ডাকাতের সাহসের যেমন আমরা প্রশংসা করে থাকি। আমরা এতগুলি কথা বললাম, তার কারণ এই যে, বোমা তৈরির মূল উদ্দেশ্য যাই থাক তার তৈরির মধ্যেই একটা গৌরব বোধ রয়েছে। যেমন রয়েছে রকেট ছোঁড়া বা স্পুৎনিক ওড়ানোর মধ্যে। বিতর্কের অবকাশ যাতে না থাকে তাই আবার বলি, স্পুৎনিক আর এটম বোমাকে আমরা একসূত্রে গাঁথতে যাই নি, বলার উদ্দেশ্য এই যে, বিজ্ঞানের সাধনা একটি বিশেষ পর্যায়ে উঠলেই একমাত্র এটম বোমা বা স্পুৎনিক সম্ভব হ'তে পারে। সেদিক দিয়ে এই পাওয়ার একটা বিশেষ দাম আছে। যে-সব দেশের তা আছে, সে-দেশের লোকেরাই তারা উপভোগ করে। রাশিয়া স্পুৎনিক ওড়ালে চীন বা পোল্যাণ্ড (মূল একই মতবাদে বিশ্বাসী বলে) আনন্দ পায় কিন্তু রুশজাতি যতটা পায় ততটা নিশ্চয়ই নয়। আমাদের মন্তব্যের উদ্দেশ্য স্পষ্ট, তাই প্রশ্ন হ'ল ভারতে এটম বোমা যদি সম্ভবও হয় তবে সাধারণ দেশবাসী হিসাবে আমরা কতটা গৌরবভাগী হব এবং সামরিক বাহিনীই বা কতখানি মনোবল ফিরে পাবে। তার পরেও প্রশ্ন থেকে যায়: ভারত যদি বোমা তৈরি করতেও চায়, অদূর ভবিষ্যতে তা সম্ভব হবে কি না। ভারত নদীর বুকে বড় বড় বাঁধ বসিয়েছে, বড় বড় ইস্পাত কারখানা বসিয়েছে, এমন কি গবেষণামূলক রকেট পর্যন্ত আজ ভারতের মাটি থেকে আকাশে উঠছে। কিন্তু এ সমস্ত বড় বড় ঘটনার আড়ালে আর একটা প্রশ্ন আমাদের যাচাই করে নিতে হয়: এ সমস্তের মূলে ভারতীয় যন্ত্র, কারিগরি বুদ্ধি এবং অর্থ কতখানি কাজ করেছে। ভারতে ইউরেনিয়াম আজ উৎপন্ন হচ্ছে, কিন্তু পুরো এটমিক রিয়েক্টার যন্ত্রটি বিদেশ থেকে আমদানী হয়েছে, বহু বিদেশী বিজ্ঞানী আমাদের পরমাণু শক্তি কমিশনের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। ভারত অবশ্য ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে, কৃতী বিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়ার এবং যন্ত্রকর্মী তৈরি হচ্ছে। কিন্তু আর্থিক প্রতিবন্ধকতা আরও অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের অগ্রগতির পথে বাধা থাকবে।

ভারতে এটম বোমা তৈরি করা হবে কিনা গুণ্টুর কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যখন এ সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল তখন তারই অনতিদূরে শিশুপুত্রের জননী রেশন দোকানে চালের দোকানে মারা যায়। ভারত বোমা তৈরি করবে কি করবে না, আমাদের মতে তার উত্তর এই শোচনীয় ঘটনার মধ্যে নিহিত আছে।

মূল্য

সারা পৃথিবীতেই আজ শিক্ষকের ঘাটতি। শিক্ষাই মানুষকে তার এই বর্তমান উন্নতির স্তর থেকে ভবিষ্যতের আরও উন্নতির স্তরে নিয়ে আসে, অথচ মূলেই এই অসামঞ্জস্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে নূতন কয়টি তথ্য জেনে রাখুন, বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কার অভিনব ফসল মানুষের কাছ থেকে কি পরিমাণ দাম আদায় করে নিচ্ছে।

নূতন এক ধরনের (PROTOTYPE) বোমারু বিমানের যা দাম তা দিয়ে ২,৫০,০০০ (আড়াই লক্ষ) স্কুলশিক্ষকের এক বছরের মাইনে দেওয়া যায়। অথবা ঐ পরিমাণ টাকায় এক হাজার ছাত্রের পড়ার ব্যবস্থাসহ ৩০টি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান তৈরি করা যায়।

একটি সুপারসনিক (শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী) যোদ্ধা বিমান নূতন ডিজাইনে তৈরি করতে সর্বসাকুল্যে যা খরচ তা দিয়ে ত্রিশ লক্ষ লোকের বাসোপযোগী ছ' লক্ষ বাড়ী তৈরি করা যায়।

বিজ্ঞানের প্রতিটি চিত্তাকর্ষক দর্শনীয় জিনিষগুলির মূলে এমনি সব বেহিসাবী হিসাব রয়ে গেছে। বিজ্ঞানের এত উন্নতির ফলেই তাই সারা পৃথিবীতে সাধারণের অবস্থার তেমন উন্নতি হচ্ছে না। মানুষের যা নিয়ে এত গর্ব, বিজ্ঞানের সে-সমস্ত ঘটনাগুলির দাম এ সব সাধারণ লোকেরাই জুগিয়ে আসছে।

বিদ্যুৎ প্রসঙ্গে

বিদ্যুৎ সভ্যতার প্রাণপ্রবাহ। বিদ্যুৎ শক্তি ছাড়া আমরা পৃথিবীর বর্তমান চেহারার কথা চিন্তা করতে পারি না। স্বাধীনতার পর থেকে (১৯৫১) ভারত পরিকল্পনামত উন্নতির পথে এগিয়ে চলছে। কিন্তু বিদ্যুৎ শক্তিকে তা যেন কিছু অবহেলা করেছিল। ফলও তাই হাতে হাতে ফলেছে। বিদ্যুতের ঘাটতি এত দূর পর্যন্ত ছড়িয়েছিল যে, কলকাতা বোম্বাই কানপুর মাদ্রাজ এবং রাজধানী দিল্লীতে সাধারণের জীবনযাত্রাকেও তা স্পর্শ করেছিল, রাতে বাতি জ্বলে নি। দিনে কলকারখানা বন্ধ ছিল। দেশের আর্থিক উন্নতি এভাবে ব্যাহত হলে অবস্থা অতটা শোচনীয় না হলেও "বিদ্যুৎ রেশনিং" আজও চালু রয়েছে। প্রসঙ্গটি বর্তমানে কিছু পুরাণো এবং ইতিমধ্যে বহু আলোচিত হলেও তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে চতুর্থ পরিকল্পনার তৈরির মুখে আর একবার পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে।

প্রথম পরিকল্পনার মুখে ভারতে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন শক্তি ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট। পরিকল্পনামত যদি কাজ হয়, ১৯৬৬ সালে উৎপাদন দাঁড়াবে ১১৩ লক্ষ কিলোওয়াট; তার মানে জনপিছু বছরে ৯৫ ইউনিট (কিলোওয়াট পাওয়ার)। বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার ছাড়া একমাত্র পেশীর শক্তির জোরে দেশ বা জাতি আর্থিক উন্নতির বনিয়াদ গাঁথতে পারে না। তুলনার সুবিধার জন্য বলি, জাপান এবং ইতালীতে ১৯৫৮ সালেই বিদ্যুতের জনপড়তা ব্যবহার ছিল এর প্রায় দশগুণ।

ভারতে বিদ্যুৎ শক্তির মূল উৎস কয়লা ও জলশক্তি। ১৯৬৬ সালের সম্ভাব্য হিসাবমত, মোট ১১৩ কিলোওয়াটের মধ্যে ৪'৭ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ (জলশক্তি থেকে তাড়িত বিদ্যুৎ), ৬'৫ লক্ষ কিলোওয়াট কয়লা থেকে, ২'৫ লক্ষ কিলোওয়াট জ্বালানী কয়লা তেল থেকে, এবং ৩ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তির উৎস পরমাণু।

ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে কয়লা বাঁচিয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্তু তার বিকল্প রূপে নদীর জলস্রোতকে কাজে লাগাতে হবে; জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রধান অসুবিধা হ'ল তার প্রাথমিক ব্যয়-ভার। ভারত তাই কয়লা ও জলস্রোত দুয়ের উপরই প্রধানভাবে নির্ভর করছে। আগামী চতুর্থ পরিকল্পনায় মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সিকি অংশই যোগাবে কয়লা—এ জন্য পরিকল্পনার শেষ বছরে বার্ষিক ১৩৯০ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লার জোগান রাখতে হবে।

কয়লা বা জলশক্তি নির্ভর বিদ্যুতের আর এক অসুবিধা তাদের আঞ্চলিক দানবদ্ধতা। কয়লা প্রধানত বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে, আর জলশক্তির ভাণ্ডারগুলি প্রধানভাবে হিমালয়ের কোলদেশেই সহজলভ্য। ভারতবর্ষ এত বিরাট দেশ, তার সমস্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ শক্তি ছড়ানোর জন্য তাই উপযুক্ত তার-ব্যবস্থা (পরিবহন ব্যবস্থা) চালু করতে হয়। দেশের এক অঞ্চল আর এক অঞ্চলের মধ্যে মাকড়সার জালের মত এক সুবিস্তৃত বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে। এজন্য দেশব্যাপী ২২০।২৩০ হাজার ভোল্টের তার টানতে হবে। আনুষঙ্গিক কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যাগুলি যোগ্য মহলের বিবেচ্য।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের তৃতীয় উৎসরূপে ভারত পরমাণু শক্তির উপর নির্ভর করছে। ক্রমে এটিই বোধ হয় প্রধান স্থান নেবে। তারাপুরার পরমাণু শক্তি-সমর্থিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ১৯৬৬ সালে সম্পূর্ণ হবে। ভারতে তখন পরমাণু যুগের সূচনা হবে। আমেরিকা রাশিয়া ব্রিটেন এবং ফ্রান্সে যে-যুগ অনেক আগেই সূচিত হয়েছে।

ভারত এটম বোমা তৈরির পথে যাক বা না যাক, এটম থেকে ইলেকট্রিসিটি তৈরির পথ তাকে নিতেই হবে। বিদ্যুৎ তৈরির কাজে পরমাণু ব্যবহারের কাজে ভারতকে ক্রমশ তৈরি হয়ে নিতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞানের অর্থনীতি সে দাবিই আজ রাখছে।

এ. কে. ডি.

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ পরিকল্পনার প্রস্তুতি

চতুর্থ প্ল্যানের খসড়াতে দু'টি উল্লেখযোগ্য কথা আছে (১) সাময়িক এবং কিছু পরিমাণে অনিবার্য মূল্যবৃদ্ধি-জনিত অসুবিধা সত্ত্বেও পরিকল্পনার আকার ছোট করা হবে না, (২) ডেফিসিট ফাইনান্স-এর সাহায্যে পরিকল্পনার ব্যয়ভার মেটানো আর হবে না।

বিশদ বিবরণী প্রকাশসাপেক্ষে মনে হচ্ছে যে যদি সম্ভাব্যতার আওতার বাইরে না যায় তা হ'লে এর থেকে সুবিবেচনার কাজ আর হ'তে পারে না।—এই সূত্রে আমরা তিনটি পরিকল্পনার কতকগুলি বিশেষ তথ্য এই প্রবন্ধে উপস্থিত করছি, এর থেকে আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ের গতি বিশ্লেষণ করা সহজ হবে।

প্রথম প্ল্যানপর্ব থেকে টাকার বরাদ্দ কত হয়েছে বা করা হবে স্থির হয়েছে এবং জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার কত আশা করা হচ্ছে তা নিম্নলিখিত তালিকায় লক্ষ্য করা যায় (টাকার অঙ্ক কোটি টাকা)।

(১নং তালিকা দ্রষ্টব্য)

প্ল্যানের প্রথম দশ বছরে যত টাকা ব্যয় করা হয়েছে, সমপরিমাণ টাকা পরবর্তী পাঁচ বছরে এবং সেই অঙ্কের দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা পরবর্তী পাঁচ বছরে বরাদ্দ করা হয়েছে। পূর্ব-নির্দিষ্ট হারে জাতীয় আয়বৃদ্ধি করতে হ'লে এর থেকে ধীর গতিতে মূলধন বিনিয়োগ করা চলে না; অতএব চতুর্থ প্ল্যানপর্বে যত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই টাকা জোগাড় করতেই হবে। মূল্যবৃদ্ধি-জনিত যে সমস্যা বর্তমানে সকলকে চিন্তিত করেছে, সেটি রোধ করার জন্য প্ল্যানের আকার খর্ব করা আপাত-দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত মনে হ'লেও ভবিষ্যতের কথা ভেবে বাতিল করা হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখা যাচ্ছে আরও কিছুকাল হ্রাস পাবে না, অতএব মোট জাতীয় আয় বাড়লেও মাথাপিছু আয় আশানুরূপ হবে না।

যত টাকা এযাবৎ ব্যয় করা হয়েছে তার সম্পূর্ণ অংশ এখনও দেশের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করার কাজে সম্পূর্ণ নিয়োজিত হয় নি, তার জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে আমাদের মূলধন বিনিয়োগের হার উত্তরোত্তর বাড়িয়ে যেতেই হবে; মূল্যমানের ওপর এর জন্য যে চাপ অনিবার্যভাবে পড়ছে, তা রোধ করতে হ'লে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কার বা উন্নতি ঘটানো দরকার, প্ল্যানের আকার ছোট করলে সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান ঘটবে না।

প্রশ্ন ওঠে: (১) যত টাকা ব্যয় করা হয়েছে তার সমস্ত অংশটিই কি অপরিহার্য ছিল? অথবা (২) বিভিন্ন খাতে যে বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তার মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধন করলে অগ্রগতির সঙ্গেই মূল্যবৃদ্ধি রোধ সম্ভব হয় কি না।

যত টাকা ব্যয় করা হয়েছে তার থেকে কম ব্যয় করে সমপরিমাণ ফল পাওয়া যেত কি না, এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে বার করতে হ'লে প্ল্যানের নীতিকথায় যেতে হবে না; পরিকল্পনার রূপায়ণে যাঁরা লিপ্ত, তাঁরা সকলেই এর উত্তর দিতে পারবেন। অপর প্রশ্নটি আলোচনা করতে হ'লে বিভিন্ন খাতে যে ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেই তথ্য বিচার করে দেখতে হয়:

(২নং তালিকা দ্রষ্টব্য)

[১নং তালিকা]

	১ম প্ল্যান (১)	২য় প্ল্যান (২)	উভয়ের যোগফল (৩)	৩য় প্ল্যান (৪)	চতুর্থ প্ল্যান (৫)
১। মোট সরকারী ব্যয় (Plan outlay Public Sector)	১৯৬০	৪৬০০	৬৫৬০	৭৫০০	১৫৬২০
বেসরকারী ব্যয় (Private Sector)	১৮০০	৩১০০	৪৯০০	৪১০০	৬৯৮০
মোট	৩৭৬০	৭৭০০	১১৪৬০	১১৬০০	২২৬০০
২। মূলধন বিনিয়োগ (Investment) সরকারী ও বেসরকারী	৩৩৬০	৬৭৫০	১০১১০	১০৪০০	২১২৭৫
৩। জাতীয় আয়ের তুলনায় মূলধন বিনিয়োগের হার	৬.৭%	১০.৮%		(১৪ – ১৫%)	(১৭ – ১৮%)
৪। জাতীয় আয় (১৯৬০,৬১ মূল্যে) (১৯৫০-৫১) (প্ল্যানপর্বের শেষ বৎসরে)	১০২৪০ (১৯৫৫-৫৬) ১২১৩০	১৪৫০০		১৯০০০	২৫০০০
৫। জাতীয় আয়-বৃদ্ধির হার	—	+২০%		+৩১%	+৩১.৬%
৬। মাথাপিছু গড় আয় (টাকা) (১৯৬০-৬১ মূল্যে) —১৯৫০-৫১ ২৮৪	১৯৫৫-৫৬ ৩০৬	৩৩০	——	৩৮৫	৪৫০
৭। মাথাপিছু আয়-বৃদ্ধির হার	—	+৭.৮%	......	+১৬.৭%	+১৬.৯%
৮। জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ১৯৫০-৫১	৩৬১	৪৩৯	——	৪৯২	৫৫৫
৯। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ...		+২১.৬%	......	......	+২৬.৪%

(২নং তালিকা)

	পরিকল্পনার ব্যয় (কোটি টাকা)				
	কৃষি, সেচ, ইত্যাদি	খনি, শিল্প ইত্যাদি	যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	অন্যান্য	মোট
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১। প্রথম পরিকল্পনাপর্ব—					
(ক) সরকারী মোট বিনিয়োগ	৬০১	৩৭৭	৫২৩	৪৫৯	১৯৬০
(খ) বেসরকারী মূল-	(৩১%)	(১৯%)	(২৭%)	(২৩%)	(১০০)
ধন বিনিয়োগ	—	—	—	—	১৮০০
					মোট ৩৭৬০
২। দ্বিতীয় পরিকল্পনাপর্ব—					
(ক) মোট সরকারী মূলধন বিনিয়োগ	৬৩০	১৪০৫	১২৭৫	৩৪০	৩৬৫০
(খ) বেসরকারী	৬২৫	৮৯০	১৩৫	১৪৫০	৩১০০
	১২৫৫	২২৯৫	১৪১০	১৭৭০	৬৭৫০
	(১৮%)	(৩৪%)	(২১%)	(২৭%)	(১০০)
৩। তৃতীয় পরিকল্পনাপর্ব—					
(ক) মোট সরকারী মূলধন বিনিয়োগ	১৩১০	২৬৮২	১৪৮৬	৮২২	৬৩০০
(খ) বেসরকারী	৮০০	১৩৭৫	২৫০	১৬৭৫	৪১০০
	২১১০	৪০৫৭	১৭৩৫	২৪৯৭	১০৪০০
	(২০·৩%)	(৩৯%)	(১৬·৭%)	(২৪%)	(১০০)
৪। চতুর্থ পরিকল্পনাপর্ব—					
(আনুমানিক অঙ্ক)	৪০০০	৮৪৫০	৩৬৫০	৫১৬০	২১২৭৫
	(১৮·৮%)	(৩৯·৭%)	(১৭·২)	(২৪·৩%)	(১০০)

দেখা যাচ্ছে যে পূর্ববর্তী পর্বের তুলনায় মোট অঙ্ক উত্তরোত্তর বেশি ধার্য হ'লেও কৃষি, সেচ প্রভৃতি বাবদ ব্যয়ের অংশ যথেষ্ট বাড়ে নি। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত ব্যয়বরাদ্দের শতকরা ভাগ কত, সেটি নীচের তালিকায় উপস্থিত করা হ'ল :—

(৩নং তালিকা দ্রষ্টব্য)

[তালিকা নং ৩]

	(১) কৃষি, সেচ ইত্যাদি	(২) খনি, শিল্প ইত্যাদি	(৩) যানবাহন ও যোগাযোগ	(৪) অন্যান্য	(৫) মোট
*প্রথম প্ল্যানপর্ব	৩১%	১৯%	২৭%	২৩%	১০০
দ্বিতীয় প্ল্যানপর্ব	১৮%	৩৪%	২১%	২৭%	১০০
তৃতীয় প্ল্যানপর্ব	২০·৩%	৩৯%	১৬·৭%	২৪%	১০০
চতুর্থ প্ল্যানপর্ব	১৮·৮%	৩৪%	২১%	২৭%	১০০

* প্রথম পর্বের সঙ্গে পরবর্তী পর্বগুলির অঙ্ক ঠিক তুলনীয় নয় ; প্রথমটিতে সরকারী (Public Sector) ব্যয়বরাদ্দ (Plan outlay) ;

দ্বিতীয় প্ল্যানপর্ব থেকে কৃষির জন্য বরাদ্দ টাকার হার অপেক্ষাকৃত হ্রাস পেয়েছে দেখা যাচ্ছে। অনেকের মতে এই শ্রেণীতেই অপেক্ষাকৃত বেশি হারে টাকা বরাদ্দ না করলে দেশের খাদ্যসমস্যাও মিটবে না এবং কৃষি ও শিল্পে উচিত ভারসাম্যও প্রতিষ্ঠিত হবে না।—চতুর্থ পর্বে মোট অঙ্ক কৃষির জন্য অনেক বেশি ধরা হলেও হারাহারি ভাবে পূর্বের মতই রয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে।—অতঃপর আমরা সরকারী মোট ব্যয়ের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি।

[তালিকা নং ৪]

সরকারী (Public Sector) মোট ব্যয় (Plan outlay)

	কৃষি, সেচ ইত্যাদি (ক)	খনি, শিল্প ইত্যাদি (খ)	যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (গ)	অন্যান্য (ঘ)	মোট (ঙ)
১। প্রথম প্ল্যান	৬০১	৩৭৭	৫২৩	৪৫৯	১৯৬০
	(৩১%)	(১৯%)	(২৭%)	(২৩%)	(১০০)
২। দ্বিতীয় প্ল্যান	৯৫০	১৫২০	১৩০০	৮৩০	৪৬০০
	(২০%)	(৩৪%)	(২৮%)	(১৮%)	(১০০)
৩। প্রথম পর্বের তুলনায় দ্বিতীয় পর্বে শতকরা বৃদ্ধির হার	৫৮%	৩০৩%	১৪৮·৫%	৮০·৮%	১৩৫%
৪। তৃতীয় প্ল্যান	১৭১৮	২৭৯৬	১৪৮৬	১৫০০	৭৫০০
	(২৩%)	(৩৭%)	(২০%)	(২০%)	(১০০)
দ্বিতীয় পর্বের তুলনায় ৫। তৃতীয় পর্বে শতকরা বৃদ্ধির হার	৮০·৮%	৮৩·৯%	১৪·৩%	৫৬·৬%	৬৩%

এমন এক জটিল সমস্যার কথা ওঠে, যা নিয়ে বহুকাল হ'ত প্রকৃতির খামখেয়ালীর জন্য; জলসেচ ব্যবস্থার ব্যাপক আয়োজনের পর কৃষি-উৎপাদনে অপ্রতুলতার জন্য ঠিক পূর্বের মতই প্রকৃতিকে দায়ী করা চলে না। আর অগণিত কৃষকগোষ্ঠী যদি আশানুরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি না করে থাকতে পারে তার একটি কারণ হচ্ছে উৎপাদন ও মূল্যের অসামঞ্জস্য; এবিষয়ে পূর্বের এক প্রবন্ধে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি। কৃষির জন্য ব্যয়বরাদ্দ যদি যথে হয়ে থাকে তা হ'লে ফল আশানুরূপ কেন হচ্ছে না তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে

চতুর্থ পর্বের সরকারী ব্যয়ের তুলনীয় তথ্য সঠিকভাবে এখনও প্রকাশিত না হওয়ায় ঐ অঙ্কটি এখানে উল্লেখ করা গেল না।—তিন ও পাঁচ কলমে দেখা যাচ্ছে বৃদ্ধির হারে প্রচুর পার্থক্য; তিন নং, কলমে মোট বৃদ্ধি যেখানে ১৩৫%, সেখানে কৃষির ক্ষেত্রে ৫৮%, শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে ৩০৩%; অপর দিকে যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় তিন নম্বরের তুলনায় পাঁচ নম্বর কলমের পার্থক্যও লক্ষ্যনীয়। জাতীয় সঞ্চয়, বৈদেশিক সাহায্য ও ডেফিসিট ফাইনান্স-এর সমষ্টিগত অঙ্কও যখন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, তখন উদ্যোগপর্বে শিল্পোন্নয়নের দিকেই ঝোঁক দেওয়া ছাড়া উপায় নেই, সে কথা অতি সত্য। এখানেই অবশ্য প্রশ্ন আসে; কৃষির জন্য যে টাকা ব্যয় করা হয়েছে তা যথেষ্ট ব'লে মেনে নিলেও, ফলাফল যদি আশানুরূপ না হয় তা হ'লে ত্রুটি কোথায় থেকে যাচ্ছে? আগেকার দিনে কৃষকের চেষ্টা ব্যর্থ

ধরে বহু আলোচনা হয়েছে কিন্তু ফল কিছু হয় নি। কৃষি ও শিল্পে ভারসাম্য বজায় রাখার যে কঠিন কাজ আমরা গ্রহণ করেছি, সেই কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে, হয় টাকার বরাদ্দে ঘাটতি পড়ছে না হয় ত ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। এ বিষয়ে বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

অতঃপর চতুর্থ প্ল্যানের সূত্রে যে প্রশ্ন অনিবার্যভাবে আসছে সেটি হচ্ছে অর্থসঙ্গতির কথা। ডেফিসিট ফাইনান্স আর করা হবে না; বৈদেশিক সাহায্যের হারও কমিয়ে আনতে হবে; অতএব আভ্যন্তরীণ সূত্র থেকেই প্রয়োজনীয় টাকা তুলতে হবে।

তৃতীয় প্ল্যানে সরকারী খাতে ব্যয়বরাদ্দ আছে ৭৫০০ কোটি টাকা; চতুর্থ প্ল্যানে বরাদ্দ হচ্ছে ১৫৬২০ কোটি টাকা, অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি।

তৃতীয় প্ল্যানের অন্তর্বর্তী রিপোর্টে (mid-term

appraisal) দেখা যাচ্ছে মোট ৭৫০০ কোটির মধ্যে ৪৭৫০ কোটি (অর্থাৎ ৬৩·৩% শতাংশ) আভ্যন্তরীণ ঋণ, ট্যাক্স ও অন্যান্য সূত্রে সংগৃহীত হবে : বাকী টাকার মধ্যে বৈদেশিক সাহায্য ২২০০ কোটি (অর্থাৎ মোট অঙ্কের ২৯·৮ শতাংশ) আর ডেফিসিট ফাইনান্স ৫৫০ কোটি টাকা (অর্থাৎ মোট অঙ্কের মাত্র ৭·৩ শতাংশ)। তৃতীয় প্ল্যানের প্রথম তিন বছরে যত টাকা ব্যয় হয়েছে (৪১৯৮ কোটি টাকা) তার মধ্যে ৫৬·৬% এসেছে আভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে, ২৮·৭% এসেছে বৈদেশিক সাহায্য থেকে এবং বাকি ১৪·৭% এসেছে ডেফিসিট ফিনান্স থেকে।—চতুর্থ প্ল্যানের ব্যয়বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হয়েছে এবং ডেফিসিট ফিনান্স খুব সঙ্গত কারণেই বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মোট ১৫৬২০ কোটি টাকার কতখানি কোন্ সূত্র থেকে সংগৃহীত হবে ?

এই বিষয় নিয়ে আগামী বারে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের ইংরেজী অনুবাদের তালিকা

শ্রীসুধাময়ী মুখোপাধ্যায়

(১৯২৫)—পুরবী—র র ১৪

বিজয়ী—তখন তারা দৃপ্ত বেগের বিজয়রথে Poems 60 From triumph to triumph
Fruit Gathering 80--Those Walk on the Path of Pride (221

পঁচিশে বৈশাখ রাত্রি হল ভোর *Hindusthan Standard* 8-5-1945 The Twentififth Baisakh
--By Indira Devi

Reprinted in V. B. Q. May-July 1945

আনমনা—আনমনা গো আনমনা, Poems 67 My heart feels shy

আশা—মস্ত যে সব কাণ্ড করি V. B. Q July 1925 With a grand scheme in mind

ঝড়১—সুপ্তির জড়িমা ঘোরে Poems 71 Half asleep on the shore

ভাবীকাল—ক্ষমা করো, যদি গর্বভরে Poems 70 Pardonme, if in my pride

অতিথি – প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে নারী · Poems 72 Woman thou hast made my days of exile tender

অন্তর্হিত – প্রদীপ যখন নিবেছিল · Golden Boat The Vanished one The Lamp had been put out

আশঙ্কা —ভালোবাসার মূল্য আমায় · V. B. Q. · Aug-Oct. 1941 ·Love's price Tr. by The Author

কঙ্কাল—পশুর কঙ্কাল ওই Poems No. 73 A beast's bony frame
Golden Boat 1932 Skeleton · An animals bones lie crumbling
V. B. Q. April 1925 The Skeleton Tr. by the Author

বদল—হাসির কুসুম আনিল Poems 74 She left me her flower of smile

তুলনীয়—তার হাতে ছিল হাসির কুসুম-গান,

ইটালিয়া—কহিলাম ওগো রাণী V. B. Q. April 1925 To Italia

নমস্কার—অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার V. B. Q. VI 3, Oct. 1928 Namaskar (abridged)
—Tr. by Kshitish Chandra Sen

পাদটীকা ১। প্রবাসী ১৩৩১ চৈত্র—পৃষ্ঠা ৭১৩ দ্রষ্টব্য। 'ঝড়' কবিতা আরম্ভ হয়েছে 'সুপ্তির জড়িমা ঘোরে' থেকে।—এর আগে 'ঝড়' নামে রবীন্দ্র রচনাবলীতে যে কবিতা আরম্ভ হয়েছে 'অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা' পংক্তি দিয়ে তা 'বিশ্ব দুঃখ' নামে প্রবাসী ১৩৩২ জ্যৈষ্ঠে বার হয়।

[পূরবী ১ম সংস্করণ সঞ্চিতা অংশে ছিল, বর্তমানে সঞ্চয়িতায়]
--Translation of the whole poem by Kshitish Chandra Sen was reprinted in the Sri Aurobindo Mandir Annual Cal. in 1941. and in Salutation to Sri Aurobinda. Sri Aurobindo Asram, Pondicherry in April 1949

শিবাজী উৎসব— [পূরবী ১ম সংস্করণ সঞ্চিতা অংশে ছিল, বর্তমানে সঞ্চয়িতায়] *Hindusthan Standard* Ann 1955 Shivaji Festival by Lila Majumdar

(১৯২৭ — লেখন — রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪

গবে কাজ করি V. B. Q. Feb April 1941 --God honours me when I Sing
-Reprinted from Fire-flies (1928)— page 105

অকালে যখন বসন্ত V. B. Q. May– Oct. 1941 Spring hesitates at Winter's door
Reprinted from Fire-flies— page 88

স্ফুলিঙ্গ — (স্ফুলিঙ্গ বইতে গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য

অন্নহারা গৃহহারা চায় ঊর্ধ্বপানে India Speaks. May 1946- The Famished. the homeless
Liberty. 6 Sept. 1931

হে সুন্দর খোলো তব নন্দনের দ্বার- V. B. Q. Aug -Oct. 1946--A Translation by Haridas Mitra.
This poem was composed on the Occasion of the Opening of Santiniketan Kala Bhavan in Decembr 1929

গান্ধী মহারাজ---Gandhi Maharaj -Tr. by the Author in V. B. Q. Feb. 1941

নববর্ষ এল আজি দুর্যোগের ঘন অন্ধকারে- *Hindusthan Standard* Daily 16-4-39--The New Year comes encircled by the darkness of danger and difficulties

(১৯২৯) মহুয়া—র র ১৫

উজ্জীবন—ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু The Herald of Spring p. 23—Resurrection- Leave you bed of ashes. O God of love

বিজয়ী—বিবশ দিন বিরস কাজ The Herald of Spring p. 80 - The conqueror--The day was dull. cheerless the work

দ্বৈত—আমি যেন গোধূলি গগন, ধেয়ানে মগন --The Herald o Spring p. 67 Duality-- I am like the twilight dust lost in meditation

সন্ধান—আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায় —The Herald of Spring p. 78 -Search- -Under the profound shadow of your eyes

উপহার—মনিমালা হাতে নিয়ে দ্বারে গিয়ে
এসেছিনু ফিরে —The Herald of Spring p. 75- Gift--With a necklace of diamonds did I approach

মায়া—চিত্তকোণে ছন্দে তব বাণীরূপে
সংগোপনে —The Herald of Spring p. 50 -Mark -In the rhythm of your mind

নির্ঝরিণী—ঝরণা তোমার স্ফটিকজলের
স্বচ্ছ ধারা —The Herald of Spring p. 68--The Waterfall—O Waterfall in thy clear sparkling stream

প্রকাশ—আচ্ছাদন হতে ডেকে লহো মোরে তব চক্ষুর আলোতে —The Herald of Spring p. 74—Unfolding
From obscurity bring me into the light

*বরণডালা—আজি এ নিরালা কুঞ্জে, আমার অঙ্গ মাঝে—The Herald of Spring p. 24—The Tray of offering —To-day in this sheltered grove

উদ্ঘাত—অজানা জীবন বাহিনু রহিনু আপন মনে —The Herald of Spring p. 82—Revealed—My life have I borne so long

অসমাপ্ত—বোলো তারে, বোলো এত দিনে তারে দেখা হল—The Herald of Spring p. 25—Incomplete—Tell him. Oh tell, At last have I caught a glimpse

অচেনা—রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়বি কী করে —The Herald of Spring p. 43—The unknown—O unknown one, How will you escape my grasp

অপরাজিত—ফিরাবে তুমি মুখ. ভেবেছ মনে আমারে দিবে দুখ ? —The Herald of Spring p. 33—Unconquered—Will you turn away your face from me

*নির্ভয়—আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে —The Herald of Spring p. 65—Fearless—We two shall not dally

দূত—ছিনু আমি বিষাদে মগনা অন্যমনা —The Herald of Spring p. 35—Messenger, Listless. immersed in sorrow, I lingered

দায় মোচন—চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল—The Herald of Spring p. 70—Debt Remission—If it pleases you, then say

সবলা—নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার —The Herald of Spring p. 45—Sabala—O Lord of Destiny !
—Poems 89 Why deprive me. my Fate, of my Worker's right
—*Modern Review*—June. 1936—Why deprive me of my Fate

প্রতীক্ষা—তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি—The Herald of Spring p. 29—Expectation—In anxious expectation. I am waiting

সাগরিকা—সাগর জলে সিনান করি—March of India. 1959—The Lady of the Sea—Tr. by Humayun Kabir

পথবর্তী—দূর মন্দিরে সিন্ধু কিনারে—The Herald of Spring p. 72—By the Way side—You walk along the sea shore

মুক্তরূপ—তোমারে আপন কোণে স্তব্ধ করি যবে —The Herald of Spring p. 56—The full vision—When I hide you in a corner

আহ্বান—কোথা আছ ? ডাকি আমি। শোনো শোনো —The Herald of Spring p. 77—Call—Where are you ? O hark to my call

দীনা—তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনো কহিনি—The Herald of Spring p. 31—The poverty stricken—I never boasted. I knew you completely

সৃষ্টি রহস্য—সৃষ্টির রহস্য আমি তোমাতে করেছি অনুভব—The Herald of Spring p. 83—The mystery of creation—The mystery of creation have I realised

হেঁয়ালী—যারে সে বেসেছে ভালো তারে সে কাঁদায়—The Herald of Spring p. 44—Riddle—She makes him weep whom she loves

দর্পণ—দর্পণ লইয়া তারে কী প্রশ্ন শুধাও এক মনে—The Herald of Spring p. 69—The Mirror—O fair one ! looking at the mirror

একাকী—চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী—The Herald of Spring p. 47—The lonely one—The moon is infinitely lonely

আশীর্বাদ—স্বর্ণিল অরুণ রশ্মি আজি ওই তরুণ প্রভাতে —The Herald of Spring p. 61—Blessing—The soft light of the morning sun has flooded the sky

নববধূ—চলেছে উজান ঠেলি তরণী তোমার—The Herald of Spring p. 41—The young bride—The boat is sailing upstream

পরিণয়—শুভখন আসে সহসা আলোক জ্বেলে—The Herald of Spring p. 27—Marriage—The auspicious moment comes

গুপ্তধন—আরো কিছুখন না হয় বসিয়ো পাশে—The Herald of Spring p. 63—Hidden Treasure—O Stranger, Tarry a while

প্রত্যাগত—দূরে গিয়েছিলে চলি—The Herald of Spring p. 48—The Returned—You wandered far away

পুরাতন—যে গান গাহিয়াছিনু কবেকার দক্ষিণ বাতাসে—The Herald of Spring p. 76—The past—The airs that I hummed long ago

ছায়া—আঁখি চাহে তব মুখ পানে—The Herald of Spring p. 52—Shadow—Mine eyes gaze at you

বিদায়—কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও—The Herald of Spring p. 37—Parting—The chariot of time rushes past—V.B.Q. Nov. 35—Jan. 36—Farewell, my friend—Tr. by the Author

প্রণতি—কত ধৈর্য্য ধরি ছিলে কাছে দিবস শর্বরী—The Herald of Spring p. 64—Salutation—With what patience, you stayed

নৈবেদ্য—তোমারে দিইনি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি—The Herald of Spring p. 81—Offering—To you I have not given happiness

অশ্রু—সুন্দর তুমি চক্ষু ভরিয়া এনেছ অশ্রুজল—The Herald of Spring p. 79—Tears—O Beautiful one! You have come, eyes filled with tears

অন্তর্ধান—তব অন্তর্ধান পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন—The Herald of Spring p. 60—Disappearance—In thy parting canvas, I behold thy eternal form

বিরহ—শঙ্কিত আলোক নিয়ে দিগন্তে উদিল শীর্ণ শশী—The Herald of Spring p. 40—Separation—The crescent moon climbed the sky

বিদায় সম্বল—যাবার দিকের পথিকের পরে ক্ষণিকের স্নেহখানি—The Herald of Spring p. 54—The parting assurance—She whispered into the ears of the parting traveller

দিনান্তে—বাহিরে তুমি নিলে না মোরে, দিবস গেল বয়ে—The Herald of Spring p. 55—Day's end—The last rays of the sun have departed

*অবশেষ—বাহির পথে বিবাগী হিয়া কিসের খোঁজে গেলি—The Herald of Spring p. 58—O Restless heart! In search of what

ক্রমশঃ

গ্রন্থ পরিচয়

ললিত-রাগ :— রণজিৎকুমার সেন, দেবশ্রী সাহিত্যসমিধ, ৫৭ সি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম চার টাকা।

বইখানি উপভোগ্য উপন্যাস। ঘটনা-চিত্রণে নয়, চরিত্র-চিত্রণে মধুর চরিত্রগুলিই গল্পকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। নইলে এমন কোন নূতন দিগ্‌দর্শন নাই, এমন কোন প্লটের কসরৎও নাই—তবু, পড়িতে ভাল লাগিল, এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া গেলাম। আমার মনে হয় গ্রন্থ সম্বন্ধে ইহাই বড় প্রশস্তি। গল্পের ব্যাকগ্রাউণ্ড বৃহৎ নয়—একটি ক্ষুদ্র পরিবেশ। রিটায়ার্ড জজ কাঞ্চনবাবুর বাড়ী। হেনাই এ বাড়ীর 'মক্ষিরাণী'। উচ্চশিক্ষিতা হেনা মনের দিক থেকেও কালচার্ড; যাঁহারা আসে তাহারা হেনারও যেমন বন্ধু, কাঞ্চনবাবুরও তেমনি বন্ধু। এই সহজ সরল অমায়িক লোকটি কেহ আসিলে আর ছাড়িতে চান না। এই পরিবারে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারাই মিশিয়া গিয়াছেন, যেমন করিয়া মিশিয়াছে পল্লব ও বীরেন; পল্লব হেনার গানের শিক্ষক, বীরেন ক্লাসমেট। দুজনের প্রতিই সমান আকর্ষণ হেনার। সময় সময় এই আকর্ষণ-দ্বন্দ্বে হেনাকে দুলিতে হইয়াছে। হেনার মা করবী দেবী, সত্যই মা; সুন্দর এই চরিত্রটি। আর একটি চরিত্র কপিল। লেখক এই কপিলকে আনিয়া, গল্পের যে ভাবে মোচড় টানিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কুশলী হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। কপিলের আগমনেই পল্লব চরিত্রটি এমন উজ্জ্বল হইয়া ধরা দিয়াছে।

আর ভাল লাগিল গল্পের সমাপ্তিরেখা। গ্রন্থের নামকরণের সঙ্গে সুন্দর একটি সঙ্গতি আছে।

শ্রীগৌতম সেন

শিক্ষাগুরু আশুতোষ :—শ্রীমণি বাগচী। জিজ্ঞাসা, ৩৩নং কলেজ রো, কলিকাতা, ডিমাই ৮ পৃঃ, ২২৬ পৃ।

গ্রন্থটি আশুতোষের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গ্রন্থকারের সময়োপযোগী নিবেদন। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন, "মণিবাবুর সময়োচিত পুস্তক 'শিক্ষাগুরু আশুতোষ' এখনকার পাঠকেরা যত্ন করিয়া পড়িবেন, এরূপ আশা করা যায়। এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় কৃতী লেখকের সযত্ন তথ্যানুসন্ধান, নিরাসক্ত বিচার-বিশ্লেষণ আর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বিদ্যমান।"

আশুতোষ অনন্যসাধারণ মনীষা ও কর্মশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মনীষা ও শক্তি তিনি দেশের শিক্ষার বুনিয়াদ গড়িয়া তুলিবার কাজে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। পরাধীন দেশে জাতির মনীষা ও চরিত্র গঠনের এই মূল কাজটি করিবার জন্য তাঁহাকে কি প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিতে, কত অলঙ্ঘনীয় বাধা ও বিপত্তি অসম সাহসের সহিত ও অদমনীয় উদ্যম ও সাধনার দ্বারা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল তাহার ইতিহাস আজ প্রায় বিস্মৃতির অন্তরালে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কোন জাতিই তাহার বিশিষ্ট পথিকৃৎদের কথা ভুলিয়া গিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তাঁহাদের সাধনার মধ্যে যে ভবিষ্যতের পথের ইঙ্গিত থাকিয়া যায়, সে কথা ভুলিয়া গেলে ইতিহাসের গতি বিপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে স্তব্ধ হইয়া পড়ে।

দেশে লোকশিক্ষা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরী, একথা কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু ইহার মূল শক্তি ও প্রেরণা জোগায় উচ্চশিক্ষার বনিয়াদটি। উচ্চশিক্ষা ব্যতীত স্বাধীন ও নির্ভীক চিন্তাশক্তির ও চরিত্রের বিকাশ সম্ভব হয় না। এবং এই উপাদানটি হইতেই জাতির জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রাণের শক্তি সঞ্চারিত হয়। এই উচ্চশিক্ষার কাঠামোটি গঠন করিতে আশুতোষ তাঁহার বিরাট প্রতিভার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। পরাধীন রাষ্ট্রে এই কাজটি কত কঠিন ছিল তাহা আজ হয়ত অনুমান করা সহজ হইবে না। কিন্তু তথাপি, আশুতোষের নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগগুলি এবং বিশেষ করিয়া মূল গবেষণায় কেবল দেশের নহে, বিদেশেরও প্রতিষ্ঠাবান্ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা আকর্ষণ করিয়াছিল।

দেশে আজ উচ্চশিক্ষার কাজে গভীর ব্যর্থতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় প্রকট হইয়া উঠিতেছে। পুরানো কাঠামো ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নূতন ভাবে এই স্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার একটা প্রয়াস চলিতেছে। নূতন করিয়া কিছু গঠন করিতে গেলে হয়ত পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া ফেলা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আজ উচ্চশিক্ষায় বিশেষজ্ঞতা (Specialization) ও প্রয়োগশীলতার (appliance) উপর অত্যধিক জোর প্রায় মাধ্যমিক স্তর হইতেই দিবার প্রয়াস করা হইতেছে। ইহার ফলে যে মাধ্যমিক উদার বিস্তারের উপরে আশুতোষ তাঁহার পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় স্নাতকোত্তর বিশেষজ্ঞ শিক্ষার কাঠামো গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহার ফল ভাল কি মন্দ হইতেছে তাহার বিচারের প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী হইয়া পড়িয়াছে।

স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান বিশেষজ্ঞতা ও প্রয়োগশীলতার উপরে অত্যধিক আস্থা, শিক্ষার্থীর মননশীলতাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। জাতির জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগের জন্য যে উদার দৃষ্টি, বলিষ্ঠ চরিত্র ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশের প্রয়োজন, শিক্ষার যে নূতন পরিবেশ এখন গড়িয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে যেন তাহার আভাস ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। আশুতোষের শিক্ষা দর্শনের মধ্যে এই গণ্ডিবদ্ধতা অতিক্রম করিয়া উদার, বলিষ্ঠ পরিবেশে শিক্ষাকে অগ্রসর করিবার পথের নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে।

বর্ত্তমান গ্রন্থে গ্রন্থকার আশুতোষের জীবনের এই বিশেষ সার্থকতাটিকেই প্রধান স্থান দিয়েছেন। আশুতোষের জন্মশতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে গ্রন্থকারের এই প্রচেষ্টার একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। গ্রন্থটি সুখপাঠ্য, ভাষা সাবলীল এবং ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। গ্রন্থটি বহুলপ্রচার হইলে দেশের ও জাতির, বিশেষ করিয়া বঙ্গভাষাভাষীর উপকার হইবে বলিয়া মনে করি।

বিপ্লবের অন্তরালে বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য। সুশীল প্রকাশন, ১০নং রমা রোড সাউথ সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা ৩৩। ডিমাই ১৬ পেজী, পৃঃ ১৯০। মূল্য ৫, টাকা মাত্র।

মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার পর হইতে বিপ্লববাদী দেশসেবকদের প্রতি নেতৃমহলে একটা অশ্রদ্ধা ও বিরূপতার আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার প্রয়াস চলিয়া আসিতেছে। ইহা কেবল যে অন্যায় তাহা নহে, দেশের রাষ্ট্র-স্বাধীনতা যজ্ঞে বিপ্লববাদের যে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল এবং সেই অসংখ্য একনিষ্ঠ দেশসেবকের দল সকল প্রকার স্বার্থত্যাগ করিয়া আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সেবার কথা অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, ইতিহাসকেই অস্বীকার করিতে হয়। মহাত্মা গান্ধী দেশসেবার নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার পূর্বে যে প্রস্তুতির ইতিহাস ছিল, তাহাকে অস্বীকার করিলে সত্যকেই অস্বীকার করিতে হয়। এমন কি এ কথাও অস্বীকার করা চলে না যে, গান্ধী নেতৃত্বের সমসাময়িক কালেও এই আত্মত্যাগী বিপ্লববাদীর দল যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার দ্বারা দেশের রাষ্ট্রস্বাধীনতা অর্জনের কাজটি অনেক পরিমাণে সুগম হইয়াছিল। ইঁহাদের নিষ্ঠা ও ত্যাগ অতুলনীয় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার যোগ্য। একমাত্র দেশের স্বাধীনতা ব্যতীত ইঁহাদের জীবনের আর কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না, এমন কি খ্যাতির আকাঙ্ক্ষাও নহে। এই নিষ্ঠা মহৎ নিষ্ঠা, এই ত্যাগ মহত্তম ত্যাগ।

বর্ত্তমান গ্রন্থে গ্রন্থকার এই সকল জীবনীর উপাদান অবলম্বন করিয়া একটি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। ইহাই বর্ত্তমান গ্রন্থের আসল মূল্য। সাহিত্যের বিচারেও ইহাকে সুখপাঠ্য বলা চলে।

করুণাকুমার নন্দী

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

চতুর্থ সংখ্যা
মাঘ, ১৩৭১

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রভাষা সমস্যা

বিগত গণতন্ত্র দিবসের দিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার হিন্দী-ভাষী মন্ত্রীগণের বিশেষ উৎসাহের ফলে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণা বেতার ভাষণের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ সর্ব্বভারতে প্রচার করেন। তিনি ভাষণ দিয়াছিলেন হিন্দীতে এবং অবশ্য সেই সঙ্গে অহিন্দীভাষীদেরও কিছু আশ্বাস দেন যে, হিন্দী রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হইলে তাঁহাদের যাহাতে অসুবিধা না হয় সরকার সেদিকে দৃষ্টি রাখিবেন। অন্যদিকে কনষ্টিটিউশন ক্লাবে সরকারী ভাষা সম্মেলনের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী কতকগুলি কথা বলেন, যাহার মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার বিশেষ কোনও চিহ্ন ছিল না। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনী প্রসঙ্গ কথার ও গুলজারীলাল নন্দের বেতার ভাষণের সংক্ষিপ্তসার এইরূপ—

নয়াদিল্লী, ২৭শে জানুয়ারী—সরকারী ভাষারূপে হিন্দীকে দ্রুত ইংরাজীর স্থলাভিষিক্ত করিবার জন্য গতকাল প্রধান-মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে ২৭শে আহ্বান জানান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সতর্ক করিয়া দেন যে, হিন্দীকে ঐ আসনে বসাইতে গিয়া দেশের ঐক্য ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত হইবে না।

মাদ্রাজে হিন্দীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য প্রধান-মন্ত্রী ডি-এম-কে দলকে তিরস্কার করেন এবং বলেন, যাঁহারা হিন্দীর বিরোধিতা করিতেছেন, তাঁহাদের ইহা বোঝা উচিত যে, সংবিধানের তিনটি নীতিনির্দেশক নীতি অনুসারেই সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন।

এখানে কনষ্টিটিউশন ক্লাবে সরকারী ভাষা সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীশাস্ত্রী এই কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী জনগণকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, ইহার পর হইতে ইংরাজীর স্থলে হিন্দীকে বসাইবার দ্রুত ব্যবস্থা করা হইবে। তবে তিনি এ কথাও বলেন যে, ইহা করিতে গিয়া যদি জাতীয় ঐক্য বিঘ্নিত হয় তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রীশাস্ত্রী বলেন, সত্যি করিয়া বলিতে গেলে আজিকার দিনে ইংরাজীর স্থলে পুরাপুরিরূপে সরকারী ভাষার আসনে হিন্দীরই অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কিন্তু অহিন্দীভাষা জনগণের অসুবিধা যাহাতে না হয় তজ্জন্য হিন্দীর সহিত ইংরাজীর ব্যবহার অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ গতকাল জন-গণের উদ্দেশে আশ্বাস দেন যে, সরকারী কাজকর্ম্মের ব্যাপারে হিন্দীর প্রচলনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইবে যাহাতে সরকারী কাজ চালাইয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা না হয়।

শ্রীনন্দ বলেন, যাহারা হিন্দী জানে না, হিন্দী

ব্যবহারে তাহাদের যাহাতে অসুবিধা না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা হইবে।

প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সকল ঘোষণায় দেশের অ হিন্দীভাষীদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, কেননা সারা দেশের উপর এইরূপে হিন্দী চাপাইয়া দিবার কোনও অধিকার গণতন্ত্রবাদসম্মত কোনও মন্ত্রীসভার নাই। শ্রীশাস্ত্রী বলেন যে, সংবিধানের তিনটি নীতিনির্দ্দেশক ধারা অনুসারেই সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি একথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, সারা ভারতের শতকরা প্রায় ৭০ জনের কাছে হিন্দী অবোধ্য বিদেশী ভাষা রূপেই এখনও রহিয়াছে। হিন্দীকে সংশোধন ও সহজ করার প্রায় কোনও সুসংবদ্ধ চেষ্টা এই দীর্ঘ ১৭ বৎসরে করা হয় নাই। উহা সর্ব্বভারতে গ্রহণযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য করার কোনও বিশেষ চেষ্টা না করার পিছনে হিন্দীওয়ালাদিগের বিশেষ মতলব আছে, এ সন্দেহও অহিন্দী অঞ্চলের লোক করিতেছে।

"হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ" অহিন্দীভাষীদের কাছে কোনও অলীক উপাখ্যান বস্তু নয়। সংবিধানের ৩৪৩ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা হইলে সরকারী সকল কাজে, সরকারী সকল চাকুরীর বা শাসনতন্ত্রের সকল অধিকারীর পদের জন্য প্রতিযোগিতায় অহিন্দীভাষীদের অন্যায় ও অসম বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। বিচার ব্যবস্থায় হিন্দী চলিলে অহিন্দীভাষীদের উপর যে ভাষার দরুন অবিচার করার ও জুয়াচুরীর পথে ঠকাইবার পথ খুলিয়া যাইবে তাহা ত বিহারে ও মধ্যপ্রদেশে অহিন্দীভাষীগণের অভিজ্ঞতায় নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার পূর্ণ মর্য্যাদা দান যে অহিন্দীভাষীদের দাসত্বের প্রকরণ, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

এ সকল কথা অহিন্দীভাষী অঞ্চলে প্রকাশ্যে, সভা-সমিতিতে ও সংবাদপত্রে, কিছুদিন যাবৎ ব্যক্ত হইতেছে। কেন্দ্রীয় সংসদে এই সকল বিষয়ে প্রবল বিতর্কের পর ১৯৬৩ সনে, পণ্ডিত নেহরুর বিবেচনাপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক আইন প্রবর্ত্তিত হয়, যাহার অর্থ এই যে, যতদিন না অহিন্দী অঞ্চলের জনসাধারণ হিন্দীকে ভারতরাষ্ট্রের সরকারী ভাষা রূপে গ্রহণ করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চাহিবে, ততদিন ইংরাজী সহযোগী ভাষা রূপে চলিবে এবং সরকারী ব্যবস্থায়, পরীক্ষায়, বিচারে ও অন্য সকল কাজে ইংরাজীর ব্যবহারে কোনও বাধা বা প্রতিকূল ব্যবস্থা থাকিবে না।

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও শ্রীগুলজারীলাল নন্দ এ সকল কথাই জানেন এবং তাঁহাদের সততা ও দেশপ্রেম সন্দেহের অতীত। কিন্তু এ সবকিছু জানিয়াও তাঁহারা ঐরূপে হিন্দীর রাজ্যাভিষেক করায় প্রবৃত্ত হইলেন কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, তাঁহারা প্রাদেশিক ভাষার গণ্ডির উর্দ্ধে উঠিতে এখনও সমর্থ হন নাই এবং সে কারণে পণ্ডিত নেহরুর ন্যায় প্রায় সর্ব্বভারতীয় অনুভূতি তাঁহাদের মধ্যে এখনও সঞ্চারিত হয় নাই। সে কারণে মাতৃভাষাকে "রাজ-ভাষা"রূপে বরণ করার উল্লাসে তাঁহারা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে, ইহার ফলে ভারতের সকল অহিন্দীভাষী অঞ্চলে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে এবং দেখা দিয়াছেও সেইভাবে! ২৭শে জানুয়ারী মাদ্রাজ হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ আসে—

মাদ্রাজ সরকার শহরের সমস্ত কলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে সোমবার পর্য্যন্ত কলেজ বন্ধ রাখার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

আজ প্রত্যুষে মাদ্রাজের শহরতলী 'ভিরুগম্বাকমে' রঙ্গ-রাজন নামে ৩২ বৎসর বয়স্ক একজন ডাককর্ম্মী নিজের দেহে আগুন লাগাইয়া আত্মহত্যা করেন।

নিজের দেহে কেরোসিন ঢালিবার ও অগ্নিসংযোগের আগে রঙ্গরাজন 'তামিল দীর্ঘজীবী হউক' বলিয়া চীৎকার করেন। তিনি নানারূপ হিন্দীবিরোধী ধ্বনিও করিতে থাকেন।

হিন্দীকে কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা হিসাবে ঘোষণার প্রতিবাদে গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হিন্দী বিরোধীদের ইহা হইল দ্বিতীয় আত্মহত্যা।

গতকাল মাদ্রাজের আর একটি শহরতলী কোদম্বকমে ২২ বৎসরের যুবক শিবলিঙ্গম্ নিজের দেহে আগুন লাগাইয়া আত্মাহুতি দেন।

তিরুচিরাপল্লীতে তিনদিনের জন্য সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা অনুসারে আজ এক আদেশ জারী করা হইয়াছে।

দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাঘাম দলের সদস্যরা জাতীয় পতাকাকে টানিয়া নামাইবার চেষ্টা করিলে এই নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।

চিদাম্বরমে ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলী চালনার ফলে

একজন ছাত্র নিহত হয় ও কয়েকজন আহত হয়। মাদ্রাজেও একদল উত্তেজিত ছাত্রকে হটাইবার জন্য পুলিশ লাঠি চালনা করে।

আজ ও কাল মাদ্রাজ, কোয়েম্বাটুর, মাদুরা প্রভৃতি শহরে ব্যাপক ধরপাকড় হইয়াছে। এই দুইদিন ধরিয়া দক্ষিণ ভারতের শহরগুলির পথে পথে বাহির হইয়াছে অসংখ্য হিন্দী-বিরোধী মিছিল। কয়েকটি স্থানে অগ্নি সংযোগের ঘটনাও ঘটিয়াছে। এখানকার অধিকাংশ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাই ক্লাসে যোগদান করে নাই।

মাদ্রাজ রাজ্যে প্রবল বিক্ষোভ ব্যাপকভাবে দেখা দিবার পর সেখানের মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টই বলেন যে, ইংরাজীর বহিষ্কারে তিনি সম্মতি দেন নাই এবং সকল কাজে ও সকল বিষয়ে অহিন্দীভাষীদের ইংরাজী ব্যবহারের অধিকার অব্যাহত থাকিবে এবং হিন্দী না জানার দরুন তাঁহার রাজ্যের কাহারও কোনও বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইলে তিনি তাহার প্রতিকার করিবেন। ইহাতেও আন্দোলন থামিয়া যায় নাই দেখিয়া এবং উহা পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রদেশ ইত্যাদিতেও আরম্ভ হইতেছে দেখিয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যদের চৈতন্য হয়। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হিন্দীভাষী অনুচরবর্গ তাঁহাদের বুঝাইয়াছিল যে, এই আন্দোলন দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম প্রমুখ বিরোধী দলের উস্কানিতে হইয়াছে। কিন্তু বিক্ষোভের প্রচণ্ড ভাব দেখিবার পর ও আন্দোলন অন্যান্য প্রদেশেও সঞ্চারিত হইতেছে বুঝিবার পর দুইজনেই হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা রূপে অধিষ্ঠিত করার কাজ স্থগিত রাখা স্থির করেন এবং সেই বিষয়ে তাঁহাদের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ ও ব্যবস্থার কথা প্রচারিত হইবার পর এই বিক্ষোভের উত্তেজনা কিছু অংশে প্রশমিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত লালবাহাদুর শাস্ত্রী সংবিধানের ধারা ও তিনটি নীতিগত নির্দ্দেশের কথা তুলিয়া নিজ কার্য্যের সমর্থন করিয়াছেন। এখানেও বেশ কিছু বলিবার আছে। সংবিধানে ঐ ধারা ও নীতিনির্দ্দেশ কিভাবে আসিয়াছিল তাহার পূর্ণ ইতিহাস বা বিবরণ সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাব যে কংগ্রেস "কনসামব্লি" পার্টির সভায় উত্থাপিত হয়—সেটা যে গণতন্ত্রমত অনুযায়ী সাধারণের নির্ব্বাচিত সদস্যদের সভা ছিল না, সে-কথাও দেশের অধিকাংশ লোকেই জানেন না। সেই সভার কাজের কিছু বিবরণ সেই সভার সভাপতি ডাক্তার আম্বেদকার ও সেই প্রস্তাবের উত্থাপক শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার তাঁহাদের লিখিত দুইটি পৃথক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অত্যন্ত তীব্র বাদানুবাদের পর দেখা যায় যে, ঐ প্রস্তাবের স্বপক্ষে ৭৭জন ও বিপক্ষেও ৭৭জন, তারপর নানা তর্কের পর দ্বিতীয়বার ভোট লইয়াও যখন পূর্ব্বের অবস্থাই আছে দেখা গেল তখন চেয়ারম্যান তাঁহার "কাষ্টিং ভোট" দিয়া এক ভোটে হিন্দীকে উদ্ধার করেন।

সংবিধানের অনেক কিছুই কাঁচা ও অকেজো, তাহার কারণ উহা রচিত, গঠিত ও বিবেচিত হইয়াছিল অনভিজ্ঞ ও অপ্রশস্ত জ্ঞানযুক্ত লোকেদের দ্বারা। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রের উহার বিধান ভুল হয়।

এই প্রসঙ্গ শেষ করার সময় মাদ্রাজ হইতে যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা অতি নিদারুণ। হিন্দী-বিরোধী জনতা ঐ রাজ্যের নানা অঞ্চলে ব্যাপক হাঙ্গামা চালাইয়া অবস্থা দ্রুতগতিতে এরূপ আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে আনিয়াছে যে মাদ্রাজ সরকার সামরিক বিভাগের সাহায্য চাহিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং ইতিমধ্যে প্রতিবেশী চারটি রাজ্য হইতে সশস্ত্র পুলিশ আনাইয়া কাজে লাগাইয়াছেন। শেষ সংবাদে জানা যায় এইরূপ—

হিন্দীকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে সমগ্র মাদ্রাজ রাজ্যে ছাত্রেরা পুনরায় যে আন্দোলন সুরু করিয়াছে, আজ তাহার তৃতীয় দিনে মাদ্রাজ রাজ্যের তিনটি শহরে পুলিশের গুলীতে একুশজন নিহত ও অনেকে আহত হন। ছাত্রদের বিক্ষোভ দমনের জন্য পুলিশ গুলী চালায়। জনতার আক্রমণে গুরুতর আহত হওয়ার পর দুইজন দারোগা জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হইয়া মারা যান।

কোয়েম্বাটুর ও মাদুরাইতে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে এবং লাঠি চালায়।

অবস্থা খারাপ হওয়ায় শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য প্রয়োজন হইলে অসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য সেনাদলকে প্রস্তুত থাকার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপদ্রুত তিনটি এলাকায় (তিরুচেনগোড়ে, তিরুপপুর ও কারুর) সেনাদল প্রেরণের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

সালেম জেলার তিরুচেনগোড়েতে জনতার উপর পুলিশের গুলীচালনার ফলে দুইজন নিহত ও দুইজন আহত

হইয়াছে। এখানে প্রাপ্ত সরকারী সংবাদে জানা যায় যে, আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের জন্য জনতা থানা আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিল। অপরাহ্নে পাঁচ হাজার লোকের এক উচ্ছৃঙ্খল জনতার উপর দ্বিতীয়বার গুলী চালাইতে একজন নিহত ও দুইজন আহত হয়।

কোয়েম্বাটুর জেলার কোয়েম্বাটুর, তিরুপপুর ও ভেল্লাইকোয়েলেও পুলিশ গুলী চালায়। তিরুপপুরে চারজন ও কোয়েম্বাটুর শহরে দুইজন এবং ভেল্লাইকোয়েলে ১ জন নিহত হয়।

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার মাদ্রাজের বিক্ষোভ ভয়ানক রূপ গ্রহণ করায় বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। আনন্দবাজারের সংবাদ এইরূপ—

মাদ্রাজে হিন্দীবিরোধী আন্দোলনের প্রচণ্ডতায় উদ্বিগ্ন ভারত সরকার এখন বিবেচনা করিতেছেন অহিন্দীভাষীদের ভয় ঘুচাইতে আর কি করা যায়।

মাদ্রাজের ঘটনাবলী রাজধানীতে পৌঁছার পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দের সহিত এক জরুরী বৈঠকে বসেন। বৈঠকে হাজির ছিলেন অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী এবং খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম। শ্রীনন্দ মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভক্তবৎসলম ও শ্রীকামরাজের সহিতও যোগাযোগ করেন। শ্রীনন্দ কেরল যাত্রা বাতিল করিয়াছেন।

একদল কাণ্ডজ্ঞানবিহীন লোকের "হিন্দীরাজ" স্থাপনের প্রবল চেষ্টায় এই অতি বিষম প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। আরও দুঃখের বিষয় যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঐ লোকদের চাপে পড়িয়া এরূপ বিপরীতমুখী, "হিন্দী প্রতিরোধ" আন্দোলনের সম্ভাবনার কথা ভাবিয়াও দেখেন নাই। আশা করা যায় এইবার সেই সকল লোক যে কতদূর স্বার্থসর্বস্ব ও নির্বোধ সেকথা ইঁহারা বুঝিবেন।

নির্বোধ বলিলাম এই কারণে যে, যেভাবে হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষা দাঁড় করাইবার চেষ্টা তাঁহারা করিতেছেন তাহাতে না আছে বুদ্ধি-বিচারের চিহ্ন, না আছে পাণ্ডিত্যের কোনও লক্ষণ।

এতদিন কাজ ও অঢেল টাকা খরচ করার পর সরকারী "হিন্দী ডাইরেক্টোরেট" এক ইংরাজী ও হিন্দী "পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ" অর্থাৎ ইংরাজী-হিন্দী টেক্‌নিক্যালেজ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে অতি সুস্পষ্টভাবে দু'টি কথা প্রমাণিত হইতেছে। প্রথমত, হিন্দী কিরূপ অনগ্রসর ভাষা ও দ্বিতীয়ত, ঐ ডাইরেক্টোরেট কিরূপ কর্ম্মক্ষম!

বহু ইংরাজী শব্দের, যাহার অতি উত্তম বাংলা তৎসম কথায় পারিভাষিক শব্দ রচিত বা যোজিত হইয়াছে, হিন্দী কষ্টকল্পিত পারিভাষিক শব্দ ইহাতে সংগৃহীত রহিয়াছে। সে শব্দগুলি সাধারণ হিন্দীভাষী জনে ত বুঝিবেই না, কেননা তাহাতে পাণ্ডিত্য দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে, সহজবোধ্য বা শব্দার্থ-অনুগামী করার কোনও চেষ্টাই করা হয় নাই। আবার অনেক ক্ষেত্রে, যেখানে একই ইংরাজী শব্দ নানা অর্থে প্রযুক্ত বা ব্যবহৃত হয়, সেখানে এমন কয়েকটি অর্থ দেওয়া হইয়াছে যাহা সবল যৌগিক শব্দে ব্যবহার চলে না। যেমন Security শব্দের হিন্দী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে "সুরক্ষা, প্রতিভূতি, জমানত, ঋণপত্র, ঋণ ধার"। বলা বাহুল্য এই পারিভাষিক শব্দগুলি যিনি বা যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের ইংরাজী শব্দার্থ—বিশেষে যেখানে বিভিন্ন সংজ্ঞায় একই শব্দ ব্যবহৃত হয় সে জাতীয় শব্দার্থ-সম্পর্কিত জ্ঞান অপেক্ষা বোধ হয় তেজারতি কারবারের জ্ঞান অধিক ছিল, সে কারণে টাকার লেন দেন বা ঋণ "সুরক্ষিত" করার জন্য খাতকের যে জামিন বা প্রতিভূ হয় তাহার কথাও ঋণ সুরক্ষা ব্যবস্থার কথাই ইঁহাদের মস্তকে প্রবেশ করে। তারপর Security শব্দযোগে উৎপন্ন নানা যৌগিক শব্দ ও তাহার পরিভাষা ইঁহারা দিয়াছেন যাহা সব কিছুই ঋণ সম্পর্কিত। কিন্তু যখন "Security Council"—অর্থাৎ জাতিসঙ্ঘের সেই কমিটি যাহার সম্মুখে ভারতকে বার বার দাঁড়াইয়া পাকিস্তানের মিথ্যা অভিযোগের উত্তর দিতে হইয়াছে সেই কমিটি বা কাউন্সিল—এই শব্দ তাঁহাদের সম্মুখে আসিল তখন ইঁহারা আকাশ পাতাল হাতড়াইয়া কোনও পারিভাষিক শব্দ রচনা করিতে পারিলেন না, কেননা উক্ত কাউন্সিল আর যাহাই বিচার করুক দেনা-পাওনার কথা করে না। শেষ পর্যন্ত ইঁহারা উক্ত যৌগিক শব্দটাই বাদ দিলেন।

আবার এক একটি শব্দের যে পারিভাষা রচিত হইয়াছে তাহা নিছক ও অনেক ক্ষেত্রে নিদারুণ ভুল। যেমন Sea-level-কে বলা হইয়াছে (level, Sea, Geog) সমুদ্রতল।

যে মহাশয় ইহা রচনা করিয়াছেন তিনি এ-বিষয়ে এতই পণ্ডিত যে, Sea-level শব্দের ব্যুৎপত্তি বা ব্যবহারের কোন খোঁজ করাও প্রয়োজন মনে করেন নাই। করিলে জানিতেন যে উহার অর্থ সমুদ্রপৃষ্ঠ সমুদ্র-তল নয়, কেননা সমুদ্র-তল কোথাও বা Sea-level হইতে কয়েক ফুট মাত্র নীচে, আবার কোথাও বা উহা সাত মাইলেরও অধিক নীচে। সমুদ্রতল বলিতে যে সমুদ্রের নিম্নদেশই ইঁনি বলিয়াছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই কেননা ঐ গ্রন্থেই Sea-bottom শব্দেরও অর্থ আমরা পাই "সমুদ্র-তল"।

বাংলায় "Security Council অর্থে "নিরাপত্তা পরিষদ" ও "Sea Level" অর্থে "সাগরাঙ্ক" শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়। দুইটিই যথার্থ অর্থ বহন করে এবং দুইটিই সংস্কৃত মূল হইতে গঠিত সুতরাং উহা অনায়াসেই উহাদের এই পারিভাষিক শব্দসংগ্রহে স্থান দেওয়া যাইত। কিন্তু তাহা হইলে "হিন্দীরাজ" কি অক্ষুণ্ণ থাকিত? যাই হোক ঐ পুস্তিকা দেখিলে বুঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দী ডাইরেক্টরেটে মহাপণ্ডিত অনেক থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের পাণ্ডিত্য হিন্দীভাষার গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ এবং শব্দকোষ বা Lexicon জাতীয় অভিধান রচনা সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনও জ্ঞান নাই।

হিন্দীকে সর্বভারতীয় রূপ না দিয়াই উহাকে রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টায় যে অনর্থ বাধিয়াছে তাহাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় একটা উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে যে সমস্যা-পূরণের কোনও ইচ্ছা বা চেষ্টা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সকল হিন্দীভাষী সদস্যের মনে জাগিয়াছে মনে হয় না। নয়া-দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ—

নয়াদিল্লী, ১১ই ফেব্রুয়ারী—ভাষার প্রশ্নে মতবিরোধের জন্য কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম আজ রাত্রে মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পেট্রোলিয়ম এবং রাসায়নিক দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ও ভি আলাগেসানও অনুরূপ কারণে তাঁহার পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

এই প্রসঙ্গে শ্রীসুব্রহ্মণ্যম প্রধানমন্ত্রীকে একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাহাতে তিনি নাকি লিখিয়াছেন যে, বর্তমান ভাষা-নীতিতে তিনি সন্তুষ্ট নহেন। পরলোকগত জওহরলাল নেহরু ভাষা সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা বিধিবদ্ধ করা হউক তাহাই তিনি চাহেন।

জানা গিয়াছে, অহিন্দীভাষী অঞ্চলের মন্ত্রীরা নাকি এই বলিয়া দাবি করেন যে, অহিন্দীভাষী অঞ্চলের লোকেরা যে পর্যন্ত চাহিবেন সে পর্যন্ত ইংরাজী সহযোগী ভাষা হিসাবে চালু থাকিবে বলিয়া পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী যে আশ্বাস দিয়াছিলেন তাহা সংবিধান সংশোধন করিয়া তাহাতে যুক্ত করা হউক। হিন্দীভাষী অঞ্চলের মন্ত্রীরা কিন্তু তীব্রভাবে উহার বিরোধিতা করেন। পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমহাবীর ত্যাগীই নাকি বিশেষভাবে সাংবিধানিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন।

হিন্দীভাষী মন্ত্রীদের একথাটা মাথায় ঢুকিতেছে না যে, যে-সন্দেহের দরুন মাদ্রাজের নানাস্থলে ও মহীশূর, কেরালা ইত্যাদি রাজ্যে এরূপ প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে এবং তাহার ছায়া বঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি অঞ্চলে ক্রমে ঘনীভূত হইতেছে, সেই সন্দেহ তাঁহাদের এই জিদ করার দরুন আরও দৃঢ়মূল হইবে। তাঁহারা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিবেন যে, সংবিধানে যাহাই থাকুক ভারতের জনগণের শতকরা ৭০ জনের প্রবল বাধা দেওয়া সত্ত্বেও উহা কার্যকরি করার ইচ্ছা বাতুলতামাত্র।

বস্তুতপক্ষে হিন্দীর রাষ্ট্রভাষা হওয়ার সকল সম্ভাবনা নষ্ট করিয়াছেন একদল নির্বোধ লোক, যাঁদের ধারণা ছিল যে, তাঁহারা ও তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণ শুধুমাত্র মাতৃভাষাকে সম্বল করিয়া সারা ভারতের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিবেন। এবং এখন যাহারা সেই অলীক স্বপ্ন আঁকড়াইয়া আছেন তাঁহারা তাঁহাদের এই অন্যায় জিদের দরুন ভারতের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা কিভাবে নষ্ট করিতে চলিয়াছেন তাহা বুঝিবার ক্ষমতাও যেন হারাইতে চলিয়াছেন মনে হয়।

শ্রীযুক্ত লালবাহাদুর শাস্ত্রী বেতার ভাষণ দিয়া অহিন্দী-ভাষীদের আশ্বাস দিয়াছেন। ভাষণ হিন্দীতে হওয়ায় তাহার উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় বিশেষ বাধা পড়িয়াছে। তাঁহারও এদিকে চেতনার উদয় হওয়া প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান মণ্ডলের বিরোধী দলগুলি

বর্তমান বৎসরের বাজেট অধিবেশনের আরম্ভেই যে অপরূপ নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহাতে পশ্চিমবঙ্গ বিধান মণ্ডলে সরকারের বিপক্ষ রূপে যাহারা অধিবেশনের

উদ্বোধনে বাধা দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিরোধী দলের নেতা সকলেই ও নির্দ্দলীয়ও একজন ছিলেন। ঘটনার বিবরণ (আনন্দবাজার) এইরূপ—

রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইডু সদস্যদের সম্বোধন করিয়া তিন তিন বার তাঁহার ভাষণ পড়িতে সুরু করেন। কিন্তু বিরোধী পক্ষ হইতে সর্ব্বশ্রী হেমন্ত বসু, জ্যোতি বসু, শশাঙ্কশেখর সান্যাল ও অন্যান্য কয়েকজন বারবার তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিতে থাকেন সমস্বরে। রাজ্যপাল অবশেষে তাঁহার ভাষণের কপি টেবিলের উপর রাখিয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া যান।

রাজ্যপাল সভাকক্ষ ত্যাগ করার পর সদস্যদের মধ্যে একটি বিভ্রান্তি ও বিহ্বলতার সৃষ্টি হয়। মনে হয় অনেক সদস্যই এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সভাকক্ষের ভিতরে ও বাহিরে রাজ্যপালের সভাত্যাগকে কেন্দ্র করিয়া নিয়মতান্ত্রিক বাক-বিতণ্ডা চলিতে থাকে।

অপরাহ্ন ৪॥ ঘটিকায় পৃথকভাবে বিধান সভা ও বিধান পরিষদের বৈঠক সুরু হইতেই উত্তেজনার ঢেউ বাহির হইতে গিয়া সভাকক্ষ দুইটির ভিতরে ছড়াইয়া পড়ে। আবার তুমুল হৈ-হট্টগোল চলে। এই অবস্থায় কয়েক মিনিটের মধ্যে বিধান সভার অধিবেশন মুলতুবী হইয়া যায়।

বিধান পরিষদের বিরোধী সদস্যগণ পুনঃপুনঃ বলিতে থাকেন যে, রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণ পাঠ করেন নাই। অতএব পরিষদের কাজ এই অবস্থায় চলিতে পারে কি না, সে সম্পর্কে তাঁহাদের সংশয় আছে। তাঁহারা চেয়ারম্যানের অভিমত জানিতে চাহেন। এবং এই বিষয়ে চেয়ারম্যানের অভিমতের সহিত একমত না হইতে পারায় বিরোধী সদস্যগণ প্রতিবাদে সভাকক্ষ ত্যাগ করিয়া যান।

শ্রীহেমন্তকুমার বসুর বক্তব্য ছিল—

খাদ্য সঙ্কটের দরুন বিরোধী পক্ষ হইতে রাজ্যপালকে শীতকালীন অধিবেশন আহ্বানের জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছিল। সে অধিবেশন কেন ডাকা হয় নাই, তাহা তিনি জানিতে চাহেন। তিনি বলেন, শিক্ষকদের ব্যাপার লইয়াও এখনও পর্য্যন্ত কোন সুরাহা হয় নাই। সরকার ধানের যে দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন সে দর কৃষকেরা পাইতেছে না। তাঁহার অভিযোগ, "দলগত স্বার্থের" জন্য রাজনৈতিক বন্দীদের ধরিয়া রাখা হইয়াছে। তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া হইতেছে না।

শ্রীজ্যোতি বসুর বক্তব্য ছিল—

বিধান মণ্ডলীর ১৬ জন সদস্যকে বিনা বিচারে ভারত-রক্ষা বিধি অনুসারে আটক রাখা হইয়াছে। বিধান মণ্ডলীর বর্ত্তমান অধিবেশনের ব্যাপারে রাজ্যপালের সমন জেলের ভিতরে তাঁহাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। তাঁহার মতে এই সমন রাজ্যপালের প্রথম আদেশ (অর্থাৎ আটক রাখার আদেশ) নাকচ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সরকার তাঁহাদের অধিবেশনে যোগ দিবার অনুমতি দেন নাই।

বিধান পরিষদের নির্দ্দলীয় সদস্য শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল কি বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহার বিবৃতি কোথায়ও প্রকাশিত হয় নাই। সে বক্তব্য যাহাই হউক ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রথম দিনের শেষ পর্য্যন্ত অধিবেশনে বাধা দেওয়ার প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের বক্তব্যের মধ্যে এমন কিছু আমরা পাইতেছি না যাহাতে বাজেট অধিবেশনের মধ্যে যথারীতি উত্থাপন করিয়া বিতর্কের সৃষ্টি করা যাইত না। এইভাবে বিধান মণ্ডলের মধ্যে হট্টগোলের সৃষ্টিতে তাঁহাদের কাহার কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল জানি না। তবে যদি শুধু-মাত্র বিধান মণ্ডলের কাজে বাধা দিবার ক্ষমতা তাঁহাদের কতটা আছে তাহার প্রকাশই উদ্দেশ্য ছিল তবে তাঁহারা সফলকাম হইয়াছেন।

কিন্তু এত আস্ফালন, এত তর্জ্জন-গর্জ্জন, বাক্‌বিতণ্ডা সব কিছুই দ্বিতীয় দিনের মধ্যে শেষ হইয়া গেল যেভাবে, তাহাতে মনে হয় যে, বাজেট অধিবেশন পণ্ড হইয়া যাইলে গণ্ডগোল সৃষ্টিকারীদেরও সুবিধা হইবে না, এ বিষয়ে তাঁহাদের বেশ জ্ঞান ছিল।

প্রথম দিনের অধিবেশনে, বিরোধী দলের মতে রাজ্যপাল যথাযথভাবে উদ্বোধনী সম্পন্ন করেন নাই। এ বিষয়ে বিপক্ষের নেতৃবর্গের মধ্যে কথাবার্ত্তায় ও আলোচনায় কোনও মতদ্বৈধ ছিল না। পরের দিন, মঙ্গলবার, প্রথম চার ঘণ্টা তীব্র বাদানুবাদ, তর্ক ও সোরগোলের মধ্যেও ঐ একই দৃঢ় মতের প্রকাশ বিরোধী দলের তরফ হইতে আসে। তার-পর অধিবেশন দেড় ঘণ্টার জন্য মুলতুবী রাখা হয় এবং সেই সময়ে স্পিকারের ঘরে বিপক্ষের নেতৃবর্গকে পূর্ব্বদিনের অধি-বেশনে গৃহীত টেপ-রেকর্ড চালাইয়া শোনান হয়। রেকর্ড শুনিয়া বিপক্ষ দল দমিয়া যান, কেননা তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণের প্রথম পঙক্তি পড়িয়া

উদ্বোধনের আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং পরের সোরগোলে তাঁহার গলার স্বর চাপা পড়িয়া যায়। বিপক্ষ নেতাদের উক্তি ছিল যে রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণ আদৌ পড়িতে আরম্ভ করেন নাই। তিনি শুধু সদস্যদের বসিতে ও চুপ করিতে কয়েকবার অনুরোধ করিয়া সফলকাম না হওয়ায় সভাকক্ষ ছাড়িয়া যান। এবং যেহেতু ভাষণ প্রকৃতপক্ষে আরম্ভই হয় নাই অতএব বাজেট অধিবেশনও আরম্ভ করা হয় নাই এবং ঐ অবস্থায় যাহাই প্রস্তাবিত ও গৃহীত হইবে তাহা সংবিধান বিরোধী কাজের সামিল দাঁড়াইবে। টেপরেকর্ডে রাজ্যপালের কণ্ঠে স্পষ্টই শোনা যায়—"Members of the West Bengal Legislature, as I rise to welcome your..." তারপর বিপক্ষের চীৎকার ও তারপর রাজ্যপালের কণ্ঠে "Please sit down" "Silence please"...

স্পীকারের রায়, যে অধিবেশনের উদ্বোধন যথারীতিই হইয়াছে এবং সংবিধানের ১৭৬ (১) ধারা প্রয়োজনীয় সর্ত্তগুলি পালিত হইয়াছে, এই টেপ-রেকর্ডের সাক্ষ্যের উপর স্থাপিত। বিপক্ষ দল ঐ রেকর্ড শোনার পর স্পীকারের রায় গ্রহণ করেন। এই ভাবে দুই দিনব্যাপী হট্টগোল ও বিতর্কের টানা-পোড়েনের শান্তি হয়!

বিধান মণ্ডলে ও সংসদে বিপক্ষ দল থাকা শুধু সমাজতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র সম্মত ব্যবস্থা নয়, যথাযথ ভাবে গঠিত ও উপযুক্ত নেতৃত্বের অধীনে চালিত হইলে উহা সাধারণতন্ত্রবাদ-সম্মত দেশে নানা ভাবে জনসাধারণের বিশেষ উপকারেও লাগে, কিন্তু বিরোধী দলের নেতৃবর্গ যদি শুধু নিজস্বার্থ ও দলগত স্বার্থপুত্তি বা নিছক নেতিমূলক কাজের মারফৎ সরকারী ব্যবস্থা পণ্ড করাই তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য মনে করেন তবে তাঁহাদের অস্তিত্বের অধিকারই শুধু ব্যর্থ হয় না, উহা দেশের ও দশের স্বার্থেরও বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গ বিধান মণ্ডলে এবারে বিপক্ষ দল যে কাণ্ডকারখানা করিলেন তাহাতে আর যাহাই হউক জনস্বার্থের দিকে কোনও চিন্তার লক্ষণ ছিল না।

প্রকাশ্যভাবে খুন

এদেশে শান্তি-শৃঙ্খলার কি অবস্থাই না দাঁড়াইতেছে! দিনে দ্বিপ্রহরে লোকজনের সম্মুখে প্রকাশ্যে খুন-খারাপি যেন হঠাৎ চতুর্দ্দিকেই চলিতেছে। এই অল্পদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে সর্দ্দার প্রতাপ সিং কায়রণের হত্যাকাণ্ডের যে খবর আসে তাহাতে ছিল যে বেলা সাড়ে এগারোটার সময় দিল্লী হইতে চণ্ডীগড় যাওয়ার রাজপথে, রাসোই নামে এক গ্রামের কাছে, সর্দ্দার কাইরণের গাড়ি এক রাস্তা-মেরামতি তদারককারী ফ্লাগ দিয়া থামায়, যাহাতে অন্যদিকের গাড়িগুলি পাস করার পথ পায়। রাস্তা ঐখানে মেরামত চলিতেছিল বলিয়া তাহার সঙ্কীর্ণ অংশই খোলা ছিল। গাড়ি যেই থামিল সেই মুহূর্ত্তে চারিজন লোক—যাহারা সকাল আটটা হইতে বন্দুক ও পিস্তল লইয়া ঐখানে ছিল এবং লোকজনকে বলে যে, তাহারা খরগোস শিকারের জন্য আসিয়াছে—লাফাইয়া গাড়ির কাছে যাইয়া গুলী চালাইয়া গাড়ির মধ্যেই সর্দ্দার কাইরণ ও তাঁহার ব্যক্তিগত সহকারী অজিত সিংকে মারে। অন্য আরোহী পাঞ্জাব সরকারের অফিসার বলদেও কাপুর ও ড্রাইভার গাড়ি ছাড়িয়া পালাইবার চেষ্টা সত্ত্বেও একজন গাড়ির পাঁচগজ ও অন্যজন বিশগজের মধ্যে নিহত হন। হত্যাকারীরা তারপর পাশের ক্ষেতের পথে উধাও হয়।

দিনে-দুপুরে হত্যাকাণ্ড। যেখানে কুলী-মজুর তদারককারী কুলী-সর্দ্দার ইত্যাদি অনেকে ছিল এবং রাস্তায় মোটর চলাচলও ছিল, এমন স্থলে প্রকাশ্যে হত্যাকাণ্ড সারিয়া মেঠোপথে আততায়ীদের প্রস্থান। এবং খুনীদের একজনও ধরা পড়িয়াছে সে খবর এখনও জানা যায় নাই, যদিচ চেষ্টা খুবই চলিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে সমস্ত জিনিষটা অতি পরিপাটি ভাবে আগে থেকেই সাজানো ছিল। এই চারজন আততায়ী তিন-চার ঘণ্টা ধরিয়া হাসি-ঠাট্টা চালাইয়াছে, নিজেরা খাইয়াছে ও কুলিসর্দ্দারদের খাওয়াইয়াছে মুখ ঢাকিবার বা অস্ত্রশস্ত্র প্রচ্ছন্ন রাখিবার কোনও চেষ্টাই করেন নাই। মনে হয় এই হত্যার ব্যাপারে চক্রান্তকারীগণ বেশ নিশ্চিন্ত যে তাহারা ধরা পড়িবে না। যাহাই হউক, দেখা যাউক ইহার কিনারা হয় কি না।

তার পরের দিনেই কলিকাতার এণ্টালী অঞ্চলে হত্যা করা হয়। যুগান্তরে যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহা এইরূপ—

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী—আজ দুপুরে এণ্টালীর শম্ভু-বাবু লেনে শ্রীনীরদবরণ পাল নামে এক ব্যক্তিকে কিছু লোকের দৃষ্টির সম্মুখেই গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে, শ্রীপাল ঐ এলাকায় পচাবাবু নামে পরিচিত এবং তাঁহার কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে।

এই হত্যার বিবরণ সম্পর্কে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহা হইল এই যে, শনিবার রাত্রে পাড়ায় একটি 'ম্যাজিক শো'-র ব্যাপার লইয়া দুই দলের মধ্যে ঝগড়া হয় এবং শ্রীপাল ঝগড়ায় মধ্যস্থ হইয়া উহা মিটাইয়া দেন। কিন্তু এই ঝগড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুই দলের এক দল আজ শ্রীপালের বাড়ীতে আসে এবং তাঁহাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করে। ইহাতে শ্রীপালের সঙ্গে উহাদের কথা কাটাকাটি আরম্ভ হইয়া যায়। কথা কাটাকাটি চলিতে থাকার সময় ঐ দলের একজন তাঁহাকে গুলী করে। মুহূর্ত্তে শ্রীপাল মাটিতে পড়িয়া যান এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার বাড়ীর খুব কাছেই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়। তাঁহার বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর।

যাঁহাদের দৃষ্টির সম্মুখে এই ঘটনা ঘটিয়াছে, তাঁহাদের

মধ্যে দুইজন আততায়ীদের নাম বলিয়াছেন। প্রকাশ যে উহার' দাগী আসামী। কিন্তু আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

সাধারণভাবে খুন-জখম ইত্যাদি ত দেশে আছেই। কিন্তু এরূপ দুঃসাহসিক বেপরোয়াভাবে খুন যদি ঠিকমত তদন্ত ও জোর খোঁজের ফলে হয় তবেই ভাল, নহিলে বলিতে হইবে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলারক্ষার ভার যাহাদের উপর তাঁহাদের কাজে ত্রুটি আছে।

মাদ্রাজে ভাষা লইয়া যাহা চলিয়াছে তাহারই প্রতিচ্ছায়ারূপে কলিকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলে এক ছাত্র মিছিলের দলও যেভাবে ছোরা ও ভোজালী দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহাও শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গের নজরে আসা বিশেষ প্রয়োজন।

পরলোকে স্যার উইনষ্টন চার্চিল

গত ২৪শে জানুয়ারী জীবনযুদ্ধে অপারজেয় উইনষ্টন চার্চিল ৯০ বৎসর বয়সে মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। উইনষ্টন চার্চিল নিঃসংশয়ে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম মহানায়ক, জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এবং রাষ্ট্রজ্ঞানী। তাঁহার নব্বই বৎসর বয়স না বলিয়া নব্বইটি যুগ বলাই সঙ্গত। তাঁহার এই একক জীবনে কি না হইয়া গেল! শান্ত ভিক্টোরীয় দিন হইতে পারমাণবিক যুগ—বুয়র যুদ্ধ, প্রথম মহাযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, সাম্রাজ্য সূর্য্যের উদয় ও অস্ত! তিনি স্বয়ং একটি ইতিহাস। এরূপ ঐতিহাসিক ব্যক্তি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই।

তাঁর জীবনও বিচিত্র। ১৮৭৪ সনের ৩০শে নভেম্বর উইনষ্টন চার্চিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা লর্ড র‍্যানডল্‌ফ চার্চিল মারলবরোর সপ্তম ডিউকের তৃতীয় সন্তান ছিলেন। চার্চিল হ্যারো এবং স্যাণ্ডহার্ষ্টে পড়াশুনা শেষ করিয়া ১৮৯৫ সালে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। ব্রিটেনের ইতিহাসে এতবড় পুরুষ অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর সময়ে তাঁর মত এতখানি ঘটনাবহুল, অভিযান-প্রমত্ত অথবা বিশ্ববিশ্রুত জীবন আর কেহই কাটান নাই। আর কাহারও জীবন এত বিচিত্র প্রতিভায় উদ্ভাসিতও ছিল না। সৈনিক, যুদ্ধের সংবাদদাতা, রাষ্ট্রনেতা, ঐতিহাসিক, গ্রন্থকার, চিত্রশিল্পী এবং বক্তা - একে একে সব ভূমিকাতেই তিনি ছিলেন। আর পাঁচজনের অবসর গ্রহণের বয়সে তিনি নিয়তির আহ্বানে সাড়া দিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ জনসাধারণের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বহুধা প্রতিভা এবং ক্ষমতা, রাষ্ট্রসভায় তাঁর ব্যক্তিত্ব—সবকিছু মিলাইয়া তিনি খুবই অসাধারণ চরিত্রের মানুষ ছিলেন। জীবন-সাফল্যের সর্ব্বোচ্চ চূড়া তিনি অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন তাঁহাকে রণপোত বহরের অধিনায়ক রূপে মন্ত্রীসভায় লইয়াছিলেন। তারপর সামরিক বিপর্য্যয়ের ফলে যখন ব্রিটেন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে অত্যন্ত শঙ্কাজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে তখন সমস্ত পার্লামেন্টের সম্মতিক্রমে তিনি প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। এই পদে তিনি যে অপরিসীম শৌর্য্য ও বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং যে ভাবে শত্রু বিমানের আক্রমণে বিধ্বস্ত ও বিপরীত যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আচ্ছন্ন দেশের লোককে বীরত্বপূর্ণ ভাষণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা জগতের ইতিহাসে চিরদিন উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

তিনি সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ভারত বা অন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশের লোককে সামান্য মাত্র স্বাতন্ত্র্য দেওয়ারও বিরোধিতা করিতেন সুতরাং সে দিকে আমাদের বা অন্য ভূতপূর্ব্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশের লোকেদের তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা বা শ্রদ্ধা নিবেদনের কোনও কারণ তিনি দেন নাই। কিন্তু সভ্য জগৎ যখন হিটলারের আক্রমণের ফলে চরম দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার সম্মুখীন তখন ইহার অজেয় পৌরুষই তাহাকে প্রতিরোধ করে, সেকথা আমাদের স্মরণ করা উচিত।

পরলোকে ডাঃ রফিউদ্দীন আমেদ

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক ও পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী ডাঃ রফিউদ্দীন আমেদ পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল।

তিনি ১৮৯০ সনের ২৪শে ডিসেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আই. এস. সি পাস করিয়া তিনি আমেরিকায় যান এবং ১৯১৫ সনে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রাজুয়েট হইয়া ফিরিয়া আসেন। ১৯২০ সনে কলিকাতা ডেণ্টাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি সুনাম অর্জ্জন করেন। রাজনৈতিক জীবনেও তাঁহার মত উদার ছিল। ১৯৩২ হইতে ১৯৩৬ সন পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার এবং ১৯৪২ হইতে ১৯৪৪ সন পর্য্যন্ত উহার অল্ডারম্যান ছিলেন। দন্ত-চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি ছিল। ১৯২৮ সনে তিনি ইন্টারন্যাশন্যাল ডেণ্টাল কলেজের ফেলো হন এবং ১৯৪৭ সনে বোষ্টনে আন্তর্জ্জাতিক ডেণ্টাল কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। রফিউদ্দীন আমেদ পশ্চিম বাংলায় ডাঃ রায়ের প্রথম মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়া ১৯৬২ সনের সাধারণ নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত মন্ত্রী ছিলেন। রাজনীতির বাইরেও মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন জনবৎসল। চিকিৎসক হিসাবে তিনি দেশের অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশবাসী একজন দরদী চিকিৎসককে হারাইল।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসাহিত্যে কোন্ কোন্ অংশে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব পড়েছে, তাই নিয়ে আলোচনা করতে হ'লে কবি-গুরুর সর্বপ্রথম রচনা নিয়েই অগ্রসর হওয়া সঙ্গত। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর প্রথম দিকের রচনা অবলম্বনে বিস্তৃততর আলোচনা করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য প্রবাসী—কার্তিক ১৩৬৯, আষাঢ় ১৩৭০, শ্রাবণ ১৩৭০, কার্তিক ১৩৭১)। এই প্রবন্ধে রয়েছে আরও খানিকটা অগ্রগতির প্রয়াস।

বৈষ্ণব পদাবলীতে অভিসার একটি প্রধানতম অংশ। দয়িতের উদ্দেশ্যে মুগ্ধা নারীর সংকেত-স্থানে যাত্রাই অভিসার। যেমন তিনি অভিসারে যাত্রা করেন, তেমনই নায়কও ব্যাকুলচিত্তে তাঁর জন্য করেন প্রতীক্ষা। দুর্জয় ও অলঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করেই প্রিয়তমের সঙ্গে মিলতে হয় নায়িকাকে। অষ্টধা অভিসারের মধ্যে বর্ষাভিসার সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রাবণের ঘনতমসাবৃত দুর্যোগময়ী রজনী, ঘন ঘন মেঘগর্জন, কুলিশপতন, বায়ুর বিক্ষোভ ও প্রচণ্ড বেগ, কন্টকাকীর্ণ সর্পসঙ্কুল পথ ইত্যাদি কোন বাধাই রাধিকাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে নি। ভগবানের বংশীধ্বনি যে শ্রবণ করেছে তারই প্রাণে জেগেছে মিলনের সুগভীর আর্তি। ভগবানের সেই আহ্বান অহরহ ধ্বনিত হ'লেও সংসারহাটের কোলাহলে আমাদের কানে এসে পৌঁছায় না। অভিসারের পদে এই অধ্যাত্মব্যঞ্জনা সুপ্রকট।

বৈষ্ণব পদাবলীর এই অভিসার তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। ১২৮৭ সালে রচিত বাল্মীকি-প্রতিভায় বর্ষাভিসারের অনুরূপ গীতধ্বনি শোনা যায় বনদেবীদের মুখে,—

> রিম ঝিম ঘন ঘনরে বরষে।
> গগনে ঘন ঘটা, শিহরে তরুলতা,
> ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে।
> দিশি দিশি সচকিত দামিনী চমকিত,
> চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে।

রবীন্দ্রনাথ-রচিত এই গানটিতে বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর প্রভৃতি পদকর্তাদের প্রভাব রয়েছে,—

> ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
> শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত ॥
> দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
> হেরইতে উচকই লোচন-তার ॥—গোবিন্দদাস
>
> গগনে অবঘন মেহ দারুণ
> সঘনে দামিনী চমকই।—রায়শেখর
>
> ঝলকই দামিনী দহন সমান।
> ঝন ঝন শবদ কুলিশ ঝন ঝন—শেখর
>
> গরজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া-গরজন
> রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।—জ্ঞানদাস

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বৈষ্ণব পদাবলী-নিহিত অভিসার রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সীমা-অসীমের মিলনই ব্যক্ত হয়েছে। এ-বিষয়ে 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি বলেছিলেন—'ভগবান আমাদিগকে কখনই ছাড়েন না; পাপের ঘোর অন্ধকারে যখন আমরা পড়িয়া থাকি, তখনও সেই পাপীর দুঃখের ভার নিজ মাথায় লইয়া তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা করেন। সংসারাসক্তচিত্ত আমরা সংসারের সহস্র ঝঞ্ঝাট ছাড়িয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারি না। তিনি দুর্গম পন্থায় দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকেন—পাপীর কাছে আসিতে কণ্টকাকীর্ণ পথে তাঁহার পদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, তথাপি তিনি আমাদের ত্যাগ করেন না।"

১২৮৮ সালে রচিত 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এ বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। একদিন রাত্রিতে বসন্ত রায় হঠাৎ উদয়াদিত্যকে দেখে বলে উঠলেন,—

> বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ?
> সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।
> চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে সেথায় ত আদর মিলে?
> এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ?

উক্তিটি খণ্ডিতা রাধার অনুরূপ। কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় রাধিকা সারারাত্রি অপেক্ষা করছিলেন সংকেতকুঞ্জে; কিন্তু কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর সঙ্গে নিশি যাপন করেছেন—এই অনুমানে রাধিকা সখেদে সখীকে বলছেন—

আমারে নৈরাশ করি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে হরি
নিশিবাস কৈল তার ঘরে।—বলরাম দাস

এদিকে রাত্রি প্রায় শেষ। রাধাকে মনে পড়ায় চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ ত্যাগ করে কৃষ্ণ রাধিকার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন; তখন অভিমানে রাধিকা বলে উঠলেন,—

অসময়ে কেন আইলা চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলা
মিটিল ক্ষণেকে কিহে প্রণয়ের আশ;
এখনও হয়নি ভোর কাটিল কি ঘুমঘোর
রাধিকারে শুনইতে করুণার ভাস।—শেখর

এখানে স্পষ্ট প্রতীয়মান রবীন্দ্রনাথ খণ্ডিতা রাধার মনের কথাই প্রকাশ করেছেন 'বৌঠাকুরাণীর হাট' এ বসন্ত রায়ের মুখ দিয়ে। উদয়াদিত্যকে দেখে বসন্ত রায়ের উক্তি এবং চন্দ্রাবলীকুঞ্জ প্রত্যাগত কৃষ্ণের প্রতি অভিমানিনী রাধিকার উক্তির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

১২৮৮ সালে রচিত 'রুদ্রচণ্ড' এ অমিয়া চাঁদ কবির উদ্দেশে আক্ষেপ করে বলে,—

পাখী যদি হইতাম, রুদ্রচণ্ডের তরে
সুনীল আকাশে গিয়া উষার আলোকে
একবার প্রাণ ভরি দিতেম সাঁতার

অমিয়া চাঁদ কবিকে ভালবাসে; কিন্তু পিতা রুদ্রচণ্ড বাধ সেজেছেন। যদি চাঁদ কবি রুদ্রচণ্ডের গৃহে আসে তবে তার মহা অকল্যাণ হবে—এ কথা জানিয়ে দেন রুদ্রচণ্ড কন্যাকে। তাই অমিয়ার আক্ষেপোক্তি, যদি সে পাখী হ'ত, তবে আকাশ দিয়ে উড়ে চাঁদ কবির সঙ্গে মিলতে পারত।

রাধিকার আক্ষেপ-উক্তিতেও অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় বৈষ্ণব পদাবলীতে। শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে কালিন্দীতটে বসে বংশীধ্বনি করেছেন। গৃহপরিজন বেষ্টিতা রাধিকার মন আকুল হয়ে উঠেছে। রুদ্রচণ্ড-কন্যা অমিয়ার মত রাধিকাও গৃহশাসনে আবদ্ধ। তাই রাধিকা নিরুপায় হয়ে বলছেন—

পাখী নহোঁ তার ঠাই উড়ি পড়ি জাওঁ।—
বড়ুচণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

পাখী জাতি যদি হউ পিয়াপাশে উড়ি যাউ
সব দুখ কহো তছু পাশে।—বিদ্যাপতি

রাধিকার এই আক্ষেপের কথা কবিশেখরের কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য 'গোপালবিজয়' এও দুর্লক্ষ্য নয়। কৃষ্ণবিরহাতুর রাধিকা বলছেন,—

হেন মন করে পাখি হইঞাঁ উড়ি পড়ি।

পাখী হয়ে প্রিয়তমের কাছে উড়ে যাওয়ার কল্পনা শুধু পদাবলীতে নয়; বৈষ্ণব কাব্যেও রয়েছে। এ-ভাবনা রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন বৈষ্ণব গ্রন্থ থেকেই।

একদিন প্রভাতে শ্রীদাম, সুদাম, সুবলাদি সখা রাজপথে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণের জন্য। তারা কৃষ্ণকে নিয়ে যেতে চায় গোষ্ঠে; কিন্তু মাতা যশোমতীর অনুমতি না হ'লে ত কৃষ্ণ যেতে পারে না। তাই কৃষ্ণ মায়ের কাছে মিনতি জানায়,—

আগো মা আজি আমি চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া
চরণেতে পরাহ নূপুর।
অলকা-তিলক ভালে বনমালা দেহ গলে
শিঙ্গাবেত্র বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাস সুবলাদি বলরাম
সভাই দাঁড়াইয়া রাজপথে॥
—বিপ্রদাস ঘোষ, পদরত্নাবলী

কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে শ্রীদামাদি সখা গোষ্ঠে যাওয়ার কল্পনাও করতে পারে না; তাই তারাও নন্দরাণীর কাছে গিয়ে কৃষ্ণের জন্য কাতরতা প্রকাশ করেছে কৃষ্ণকে ছেড়ে দিতে। কৃষ্ণসখাদের করুণ মিনতিপূর্ণ অনুরূপ এই কাতরতা প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর কৃষকদের গানের মধ্য দিয়ে,—

হেদে গো নন্দরাণী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।
আমরা রাখাল বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে,
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।
হেরো গো প্রভাত হ'ল, সূর্যি উঠে,
ফুল ফুটেছে বনে—

আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব
আজ করেছি মনে।
ওগো পীতধড়া পরিয়ে তারে
কোলে নিয়ে আয়।
তার হাতে দিয়ো মোহন বেণু,
নূপুর দিয়ো পায়
রোদের বেলায় গাছের তলায়
নাচব মোরা সবাই মিলে।
বাজবে নূপুর রুনুঝুনু
বাজবে বাঁশি মধুর বোলে।
বনফুলে গাঁথব মালা
পরিয়ে দিব শ্যামের গলে।

কৃষ্ণসহ রাখাল বালকদের গোষ্ঠগমন-চিত্র রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর রেখাপাত করে। ছেলেরা যমুনাতীরে অফুরন্ত প্রকৃতির মুক্ত সম্পদের মধ্যে যে-প্রাণের স্পর্শ পেয়েছিল তা তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ না করে পারে নি, তাই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসীকে কৃষকদের মুখে গোষ্ঠের গান শুনিয়েছেন।

যমুনা-পুলিনে সংকেতকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের মিলনচিত্র রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। সংকেত করেও কৃষ্ণ ঠিক সময়ে না আসায় রাধিকার বেদনার কথাও কবিগুরুর মনে গভীর রেখাপাত করে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ মালিনীদের গানের মধ্য দিয়ে সে বেদনার প্রকাশ দেখতে পাই নিম্নোক্ত গানে,—

কই সে হ'ল মালা গাঁথা, কই সে এল হায়!
যমুনার ঢেউ যাচ্ছে বয়ে, বেলা চলে যায়।

ব্রজগোপীদের মন নিয়ে খেলা করছেন কৃষ্ণ। রাধা ও গোপীরা আক্ষেপ করে বলে, কৃষ্ণের জন্য তাদের কুলাচার, গৃহধর্ম ছারখার হয়ে গেল; অথচ কৃষ্ণ তাদের কাছে ধরা দিচ্ছেন না। তাই গোপীরা আক্ষেপ করে বলছে,—

মন-চোরার বাঁশী বাজিও ধীরে ধীরে।
আকুল করিল তোমার সুমধুর স্বরে॥
আমরা কুলের নারী হই গুরুজনার মাঝে রই
না বাজিও খলের বদনে।
আমার বচন রাখ নীরব হইয়া থাক
না বধিও অবলার প্রাণে॥—কানাই

ঠিক অনুরূপ মনোবেদনা ব্যক্ত হয়েছে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ কৃষকরমণীদের মুখে: তাদের প্রাণ নিয়ে পুরুষজাতি ছিনিমিনি খেলছে। তাই মদনশরাতুরা মেয়েরা বড়ই আক্ষেপে নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করছে ব্রজলীলার গান গেয়ে—

কথা কোস নে লো রাই, শ্যামের বড়াই বড়ো বেড়েছে।
কে জানে ও কেমন করে মন কেড়েছে।
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশি, শুধু হাসে মধুর হাসি,
গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে।

বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসের অন্তর্গত মানের পরিচয় দুর্লভ নয়। উক্ত নাট্যকাব্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ পথতপথচারিণী রমণীদ্বয়ের পরস্পর কথাবার্তার মধ্য দিয়ে রাধিকার মানের কথাই প্রকাশ হয়ে পড়ে,—

বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান করে থাকা আজ কি সাজে!
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চলো চলো কুঞ্জমাঝে!
আজ কোকিল গেয়েছে কুহু, মুহুরমুহু
আজ কাননে ঐ বাঁশি বাজে।
মান করে থাকা আজ কি সাজে!

যমুনাতীরে কুঞ্জে বসে কৃষ্ণ রাধা রাধা ব'লে বাঁশি বাজান। সেই ধ্বনি আকুল করে রাধিকার মন। সংসারের কাজে পড়ে তার সহস্র বাধা; কাজের মধ্যে ত্রুটি ধরা পড়ে ক্ষণে ক্ষণেই। আর অসংখ্য গঞ্জনাবাণ বর্ষিত হ'তে থাকে চারদিক থেকে। চোখের জলে রাধিকার বুক ভেসে যায়। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে কৃষ্ণের কাছে ছুটে চলে রাধিকা শত বাধা-বিপত্তি, লোকলজ্জা অগ্রাহ্য করে। কবিশেখরের 'গোপাল বিজয়'-এ এই চিত্র অপরূপ ভঙ্গিকায় অঙ্কিত,—

বাঁশী-মান শুনি গোপী হাকলি বিকলি।
চন্দ্রের উদয়ে যেন সমুদ্র উথলি।
সঙ্কেত পাইয়া গোপী করিল পয়ানে
চালিল সাপিনী যেন মন্ত্র নাহি শুনে॥

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ একদল পথিকের গানের মধ্য দিয়ে উক্ত ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে,—

মরি লো মরি

আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
ভেবেছিলেম ঘরে রব, কোথাও যাব না—
ওই যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বলো কি করি?
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনাতীরে
সাঁজের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে—
ওগো তোরা জানিস যদি
আমায় পথ বলে দে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!

এখানে লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের যে গ্রন্থচতুষ্টয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলি কবির তরুণ বয়সে রচিত। এই সময় কবির মনে নানা ভাবাবেশের সঞ্চার হ'লেও বৈষ্ণব পদাবলীর মূল সুরটি সর্বত্রই অব্যাহত। হয়ত, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সিদ্ধান্ত তিনি সর্বত্র মেনে নেন নি, তথাপি বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি তাঁদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাই নিবেদন করেছেন। কোথাও তিনি বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, কোথাও বা দেখিয়েছেন স্বাতন্ত্র্য; কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যের রসধারা তাঁর মনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল—কবিগুরুর নানা রচনার মধ্যে এর সাক্ষ্য রয়েছে।

যোগ্যং যোগ্যেন

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

সেই থেকে কখনও কোন বিয়ের ব্যাপারে কেউ যদি পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে আমার কাছে আসে, আমি স্পষ্ট তাকে জানিয়ে দিই—এ ব্যাপারে আমার কিছু করবার নেই।

অথচ আগে অনেক করেছি, অনেক করবার ছিল। তাতে ছেলেপক্ষ এবং মেয়েপক্ষ উভয়েই উপকৃত হয়েছে। আমার বড়জোর এক সন্ধ্যা নেমন্তন্ন জুটেছে; ভেবেছি—কারুর জন্যে কিছু করা গেল।

কিন্তু বিধাতার বোধ করি ইচ্ছে ছিল না—এ কাজে আমি আর অগ্রসর হই। তাই চৌরঙ্গীর রেস্তোরাঁয় সেদিন সান্ধ্য-চায়ে বসে অমন একটা বিপর্যয় আমাকে সহ্য করতে হ'ল।

ব্যাপারটা খুলেই বলি।

রিটায়ার্ড সেরেস্তাদার অমর চৌধুরী আমাকে ধরেছিলেন তাঁর ছেলে অমলের জন্যে একটি পাত্রী দেখে দিতে। অমল আমার অপরিচিত ছিল না, দরকারমত মাঝে মাঝে আমার কাছে আসত। আধুনিক যুগের ছেলে, হাল-আমলের কিছু কিছু সমাজ-কর্মের দিকে তার ঝোঁক ছিল। যেমন—লাইব্রেরী গড়ে তোলা, কোন বিশেষ বিষয়ের বিতর্ক-আলোচনায় যোগ্যতানুযায়ী পুরস্কার দেওয়া ইত্যাদি। এসব কাজে আমার উৎসাহ আগাগোড়া। সেই সূত্রেই অমল মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে তার পরিকল্পনার কথা বলত, শুনে আমি খুসী হ'তাম। পাত্র হিসেবেও সে মোটামুটি ভাল। গায়ের রং ফর্সা, লম্বা-চওড়া চেহারা, স্বাস্থ্যবান্ এবং রুচিবান্। যে-কোন মেয়ের পক্ষেই লোভনীয়। আরও লোভনীয় যে, মধ্যবিত্ত যে-কোন ছেলের তুলনায় তার রোজগারটা খারাপ নয়, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড আর ইন্‌কাম ট্যাক্স কাটাকুটি গিয়েও মোটামুটি শ' তিনেক টাকা ঘরে আনত। বয়সের দিক দিয়েও খুব বেশি এগিয়ে যায় নি, সবে তখন ত্রিশে পড়ল। পাড়ার সুবাদে আমাকে সে দাদা বলেই ডাকত।

এক সময় অমলকে কাছে ডেকে তার বাবার প্রস্তাবটা তার কানে তুলে বললাম, 'তোমার বাবা ত মেয়ে দেখতে বলেই খালাস, মোটামুটি ভাল ঘর ও স্বাস্থ্যবতী হ'লেই তিনি খুসী। কিন্তু তোমারও ত একটা স্বতন্ত্র রুচি আছে! কি রকম মেয়ে চাও তুমি, বল।'

প্রথমটা লজ্জায় কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রইল অমল, পরে বলল, 'বাবার সঙ্গে যখন আপনার কথা হয়ে গেছে, তখন এ সম্পর্কে আমি আর কি বলব, বলুন?'

বললাম, 'না বললে আর জিজ্ঞেস করছি কেন? আধুনিক ছেলে তুমি, বিয়ের ব্যাপারটা যখন সবই জানো, তখন ক'নের গলায় মালা দেবার আগে তার সম্পর্কে এমন অহেতুক লজ্জারই বা কি আছে? বল, ব'লে ফেল কি রকম মেয়ে চাই, সেই বুঝে কাজে লাগি।'

অমলের মুখে এবারে বুঝি এক টুকরো হাসি ফুটল! গামছা নিংড়াবার মত দু' হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'মানে—একেবারে ঠিক ঘরের ঝি রাঁধুনি নয়, সঙ্গে নিয়েও যাতে দুটো ভাল যায়গায় বেরনো যায়, এই রকম আর কি!'

—'অর্থাৎ, ঘরের ঘরণীকে পথের বান্ধবী হিসেবেও চাও, এই ত?' বলে অমলের মুখের দিকে তাকাতেই গদগদকণ্ঠে এবারে হেসে উঠল সে, বলল, 'মানে—আপনি ত বুঝতেই পারছেন, আমি আর কি বলব!'

—'ঠিক আছে, আর কিছু বলতে হবে না।' বললাম, 'শেষ পর্যন্ত দু'দিকের ব্যালান্স যদি না রাখতে পার, তবে সামলাতে হবে তোমার নিজেকেই; তখন আমাকে কিংবা তোমার বাবাকে দায়ী করলে চলবে না।'

—'না, না, তা কেন করব, সে কি একটা কথা নাকি!' বলতে বলতে এবারে পাশ কাটিয়ে উঠে গেল অমল।

কিন্তু অমর চৌধুরীকে যখন আমি আশ্বাস দিয়েছি, তখন এই ফাল্গুনেই যাতে শুভ কাজটা চুকে যায়, সেদিকে খানিকটা মন দিলাম। অমল বলেছে মিথ্যে নয়, ছেলেটার রুচি আছে। তার সেই রুচিমতই এবারে কাজে অগ্রসর হলাম। বাংলা দেশে মেয়ের বাপের যা দৈন্যদশা, তাতে

কয়েকদিনের মধ্যেই প্রায় ডজনখানেক মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু কথাবার্তা চালিয়ে দেখলাম—এর কোনটিই অমলের মনে ধরবে না। অতএব এসো বাহ্য।

আবার নতুন করে জাল ফেললাম। এবারে যে মেয়েটির সন্ধান পাওয়া গেল, সে দেখতে-শুনতে মোটামুটি সুন্দরী ইতিমধ্যেই কি একটা স্কুলে মিস্ট্রেসের কাজে ইণ্টারভিউ দিয়ে এসেছে: গৃহকর্মে পারদর্শিনী। এমন ঘরণীকে পথের বান্ধবী ক'রে নিতে অমলের অসুবিধে হবে না। যে লোকটি খোঁজ এনেছিল, তাকে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে এলাম মেয়েপক্ষের সঙ্গে। শুনলাম মেয়েটিব নাম উর্বশী বিশ্বাস। আলাপ করে ভাল লাগল। চোখে গগল্‌স, কপালে কুমকুম-টিপ, উন্নত নাসিকা, হাসলে গালে টোল পড়ে, চিবুকের পাশের ছোট্ট একটি তিল সারা মুখের সৌন্দর্য যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে। যে পরিবারের মেয়ে, সেই বিশ্বাসদের কোন বাজে সংস্কার নেই। মেয়েদের সঙ্গে অবাধে মিশবার সুযোগ আছে।

এসে অমলকে বললাম, 'এবারে যা হোক্ একটা চান্স পেলে। চল, আলাপ করিয়ে দিই। কিছুদিন মেলামেশা করে দেখ দু'জনে মিলে ঘর বাঁধতে পারবে কি না। সেই বুঝে তোমার বাবাকে কথা দিই।'

অমলও হয়ত এতকাল এরকম একটা কিছু সুযোগই খুঁজছিল, এবারে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই সে নিজের সম্পর্কে বিশেষ তৎপর হয়ে উঠল।

কয়েকদিনের মধ্যে তাকে আর কোন সমাজকর্মে বা সাংস্কৃতিক কাজে চোখে পড়ল না। এতদিন এ সব ব্যাপারে অমলই ছিল পাণ্ডা, এবারে দেখলাম—তার অনুপস্থিতিতে এদিকটা এবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবার মত অবস্থা। তবু মনে মনে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হ'লাম যে, সমাজের এদিকটা ঠাণ্ডা হ'লেও সংসারের একটা বড় দিক ধীরে ধীরে বেশ গরম হয়ে উঠছে। প্রেমের উষ্ণতা সে কি কম? উর্বশীর সঙ্গে হয়ত রীতিমত জমে উঠেছে সে!

ধারণাটা আমার মিথ্যে নয়। জমেই উঠেছিল অমল। দিন কয়েক বাদে হঠাৎ সে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। কি সপ্রতিভ দৃষ্টি, সমস্ত সত্তায় কি যেন এক অদ্ভুত চাঞ্চল্য! ভাবলাম, নারীপ্রেম পুরুষকে হয়ত এমনিই চঞ্চল করে!

অমল বলল, 'আমি উর্বশীর কথা পেয়েছি, বিয়েতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। বাবাকে যা বলবার আপনি বলবেন। তবে উর্বশী হয়ত নিজের মুখে আপনাকে কিছু বলতে চায়। সেজন্যে কাল সন্ধ্যায় চৌরঙ্গীর কোন রেস্তোরাঁয় আমরা মিলতে চাই। চা খেতে খেতে দিব্যি কথা হ'তে পারবে।'

বললাম, 'বেশ ত, সেখানে হয় আমাকে নিয়ে যেয়ো।'

তাই গেল অমল। এনগেজমেণ্ট অনুযায়ী উর্বশীও যথাসময়ে এসে রেস্তোরাঁয় পৌঁছাল। এবারে একটা কেবিন বেছে নিয়ে আমরা গিয়ে ব'সে পড়লাম।

ইতিপূর্বে উর্বশীর সঙ্গে আমার খুব একটা তেমন কথা হয় নি। কাকার সংসারে সে মানুষ, তার কাকার সঙ্গেই যা প্রাথমিক আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু তা নিয়ে উর্বশীর দেখলাম কোন সঙ্কোচ নেই। বলল, 'আমার একটা চাকরি পাবার কথা আছে, পেলে আপনাদের তরফ থেকে কোন আপত্তি থাকবে না ত?'

বললাম, 'আপত্তি যাতে না ওঠে, অমলের বাবাকে আমি সেই ভাবেই বলব। এ বাজারে ঘরকরণার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও অর্থকরী কিছু করুক, ব্যক্তিগতভাবে আমি তা পছন্দ করি। আর এ ব্যাপারে অমলের বাবারও মনে হয় না যে কোন আপত্তি থাকবে, বিশেষতঃ তিনি যখন রিটায়ার্ডম্যান, না কি বল অমল?'

অমল বলল: 'এব্যাপারে দয়া করে আমাকে টানবেন না।'

ইতিমধ্যে পর্দা সরিয়ে বয় এসে সামনে দাঁড়াল। অর্ডারটা অমলই দিতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে আমি বললাম, দাঁড়াও, আমি বলছি। শুধু চা ত ঠিক জমবে না, তার আগে বরং তিনটে মোগ্‌লাই পরটা আর কষা মাংস দিক।'

অর্ডার নিয়ে বয় চলে গেল।

উর্বশী বলল, 'আমার কিন্তু এসবে কিছুই দরকার ছিল না!'

বললাম, 'দরকার কি আমারই ছিল? তবু এত দূরে এসে শুধু এক কাপ চা খেয়ে ফিরে যাবার কোন মানে হয় না। চায়ের সঙ্গে তাই যা সামান্য কিছু-টা—'

এবারে মুখ টিপে হেসে অপাঙ্গে একবার অমলের মুখের দিকে তাকাল উর্বশী।

বয় এসে খাবার দিয়ে গেল।

বললাম; 'এ ত কিছুই নয়। এর পর তোমাদের হাতে ক'ত খাব।'

এবারে দু'জনে প্রায় সমস্বরেই ব'লে উঠল, 'সে ত আমাদের সৌভাগ্য।'

সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা-চামচ চলতে লাগল। দেখলাম—উৎসীর তাতে একটুও অসুবিধে হ'ল না; বুঝলাম—অভ্যাস আছে।

ছোটখাটো কথাবার্তা চলতে লাগল, সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল খাওয়া। কিন্তু যে ব্যাপারটার জন্যে আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না, হঠাৎ এবারে তাই ঘটে গেল। এতক্ষণ দিব্যি খাচ্ছিল অমল, কোন অসুবিধেই হচ্ছিল না। হঠাৎ সে পরটার সঙ্গে হাড়সমেত একখণ্ড মাংসে কামড় দিতেই তার উপরের পাটির পুরো সেট দাঁত খুলে এসে পড়ল পরটার ডিসের ওপর। অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে অপ্রস্তুত হ'লে মনে ক্ষোভ থাকত না অমলের। কিন্তু উৎসীর সঙ্গে প্রণয়-রঙ্গে ও প্রাক-পরিণয় মুহূর্তে মনে হ'ল সমস্ত সত্তা যেন তার ধ্বসে গেল। দেখতে দেখতে সারা মুখ লাল হয়ে উঠল তার; আমার বা উৎসীর মুখের দিকে যে চোখ তুলে তাকাবে, এমন আর সাধ্য রইল না অমলের।

বিস্ময়ে আমার সমস্তটা মন ভ'রে গেল। অমলের যে ফল্‌স টিথ, তা এই প্রথম জানলাম, আগে জানবার কোন অবকাশ হয় নি। উৎসীও নিশ্চয়ই জানত না; তাই প্রথমটা হতচকিতের মত হাতে তার কাঁটা-চামচ থেমে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ কেমন একটা উদ্‌গত হাসিতে ফেটে পড়ল সে, হাসতে হাসতে দু'চোখ বেয়ে তার জল নেমে এল। চোখে কিছুতেই আর গগল্‌স চেপে রাখতে পারল না; নামিয়ে হাতে নিয়ে রুমাল বার করতেই আমার চোখে পড়ল—এক চোখে তার জল, আর একটা চোখ স্থির হয়ে আছে, সে চোখটা পাথরের।

বিস্ময়ে আর-একবার আমি নিজের মধ্যে চমকে উঠলাম। উৎসীর গগল্‌স ব্যবহারের রহস্যটা এতক্ষণে দিনের মত পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে।

কিন্তু উৎসী একটা মিনিটও আর অপেক্ষা করল না। বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমি আর বসতে পারছি না, আমি চলি।' ব'লে প্লেটের খাবার অসমাপ্ত রেখেই দ্রুত সে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

অমলের সঙ্গে তার যেমন কোনদিনই আর দেখা হয় নি, আমিও তেমনি তাদের হয়ে অমর চৌধুরীকে কোন কথা দিতে পারি নি।

লিরিক কবি এমিনেস্কু

অমিতা রায়

বিপুলা এ পৃথিবীর কোথায় যে কোন বিস্ময় লুকিয়ে আছে বলা শক্ত। ইউরোপের পূর্বপ্রান্তের কোন দেশের প্রকৃতিতে ভারতের পূর্বশেষ বাংলা দেশের প্রকৃতির মতন স্নিগ্ধ শ্যামলিমার দর্শনলাভ যেমন বিস্ময়কর, তেমনি বিস্ময়জনক সেই দেশের কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতির আর মানবপ্রকৃতির সেই সুরে বেজে ওঠা—যে-সুরে সে বারে বারে বেজেছে বাঙ্গালীর মনে—বাঙ্গালীর গানে।

পূর্ব ইউরোপের অন্তর্গত রুমানিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে বাংলা দেশের প্রকৃতির সাদৃশ্য সত্যিই লক্ষ্যণীয়। রুমানিয়ার ভেতর দিয়ে যদিও চলে গেছে তুষারমৌলি আল্পসের গিরিমালা আর যদিও শীতে তার উত্তাপ নেমে যায় হিমাঙ্ক ছাড়িয়েও বহু নীচে—তবুও শরতে-বসন্তে তার সমতলভূমি বাংলার মতনই শস্যশ্যামলা। 'ডনারেয়া', 'প্রাহোভা' আর 'বিস্তৃৎসা'-র জলধারায় সে বাংলার মতনই নদীমাতৃক আর তেমনি করেই তার এক প্রান্ত জুড়ে রয়েছে সমুদ্রের উর্মিমুখর বালুবেলা। বাংলার পলিমাটির গুণে যেমন কোমল বাঙালীর মন—রুমানিয়াবাসীর মনও তেমনি কোমল, তেমনি আবেগপ্রবণ। তেমনি গীতিময় তার ভাষা।

বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। তবু সব ফেলে বাঙালীর মন ধায় কবিতা আর সঙ্গীতের দিকে। রুমানিয়ার লাতিন মনেরও সেই অবস্থা। তেমনি-ই তারা গান-পাগল। তাদের সাহিত্যের আসরে তাই সর্বজনের মনের রাজা হলেন কবি-রাজ এমিনেস্কু। মিহাইল এমিনেস্কু।

বাঙালী কবির মতনই লিরিক কবি এমিনেস্কুর কাব্যে বেজে উঠেছে নদীজলের তরঙ্গ-কল্লোল। বেণুবনের মর্মর। রাখাল ছেলের বাঁশির সুর আর—আর যা বেজেছে, তা চিরকালের সাহিত্যের উপজীব্য—মানুষের মনের দু' একটি চিরন্তন অনুভূতি।

আজ থেকে এক শ' বছরেরও আগে—১৮৫০ সালে—রুমানিয়ার এক গ্রামে জন্ম হয় মিহাইল এমিনোভিচের। এমিনেস্কুর পারিবারিক নাম ঐটাই। তারপরে তাঁর বাল্য আর কৈশোর কাটে গ্রাম্য প্রকৃতির-কোলে—বনের ছায়ায়, হ্রদের তীরে আর পাহাড়ের উপত্যকায়। তখন থেকেই তিনি ইস্কুল-পালানো ছেলে। জার্মান স্কুলের নিয়ম-নীতির কঠোরতা যখনই অসহ্য হয়ে উঠত, তখনই কিশোর মিহাইল পালিয়ে যেত কৃষকদের ঘরে। মাঠের ওপরে যেখানে থোকা থোকা সাদা ফুলের মতন ভেড়ার পাল চরাচ্ছে মেষপালকেরা সেই-খানে। লোকসঙ্গীত আর রূপকথার আকর্ষণে মিহাইল গিয়ে জুটেছে সেখানে। নয়ত বনের মধ্যে চিন্তায় বিভোর হয়ে বসে থেকেছে।

অবশেষে চোদ্দ বছর বয়সে মিহাইল একদিন ঘর ছেড়ে চলে গেল। লোকসঙ্গীত আর লোকসাহিত্য সংগ্রহের জন্যে পায়ে হেঁটে ফিরতে লাগল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। যত গরুর গাড়ির গাড়োয়ান, রাখাল, চাষী আর যত গাঁয়ের বুড়ো-বুড়ীর কাছে ধর্না দিল সে। পরবর্তীকালে এই লোক-সাহিত্যের প্রভাব এমিনেস্কুর কাব্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

মিহাইলের বাবা ছিলেন সম্পন্ন গৃহস্থ। বাউণ্ডুলে পাগল ছেলেকে নিয়ে তাঁর চিন্তার শেষ ছিল না। তাকে ঘরে ধরে এনে জোর করে আবার স্কুলে পাঠালেন। যুগ-যুগান্তরের লোকের মুখের গান তখন কিশোর মিহাইলের মনে বাসা বেঁধেছে। তার কাব্য-প্রচেষ্টার সুরু তখন থেকেই।

ষোল বছর বয়সে মিহাইল তার প্রথম কবিতা পাঠাল একটি মাসিক পত্রিকায়। কবিতার ভাব কাঁচা। ভাষায় রয়েছে পূর্বসূরীদের আঙ্গিকের ছাপ। তবু যেন পত্রিকার সম্পাদক কি এক সম্ভাবনা দেখলেন তার মধ্যে। বালককে উৎসাহ দেবার জন্যে সেই কবিতা প্রকাশিত হ'ল। কি ভেবে যেন সম্পাদক লেখকের নামটা সামান্য বদলে দিলেন। লিখলেন—মিহাইল এমিনেস্কু। কেন যে তিনি তা করেছিলেন, সেকথা কেউ জানে না। তিনি নিজেই কি জানতেন যে, এই নাম একদিন তাঁর দেশের সাহিত্য-জগতে আলোড়ন তুলবে? ছড়িয়ে যাবে দেশান্তরে?

মিহাইল এমিনেস্কুর সেই প্রথম আত্মপ্রকাশ 'ফামিলিয়া' পত্রিকার পাতায়। তারপর কাব্যচর্চা বাড়তে লাগল। বাবার উদ্বেগও বাড়তে লাগল সেই সঙ্গে। তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ছেলেকে পাঠালেন ভিয়েনায়।

এমিনেস্কুর প্রথম যৌবনের পাঁচ বছর কাটল ভিয়েনা আর বার্লিনে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যয়নে। আর সাহিত্য? সে আকর্ষণ ত তার অন্তরের অন্তরতম দেশে স্থান নিয়েছে।

এমিনেস্কুর বাবা বিদগ্ধ লোক ছিলেন। তাই কৈশোরে নিজ গৃহেই মলিয়ের আর ভলতেয়ার পড়া ছিল এমিনেস্কুর। এখন তার সঙ্গে যোগ হ'ল শিলার, গ্যয়টে, হাইনে। তরুণ এমিনেস্কুর প্রতিভার দীপে হ'ল অগ্নিস্পর্শ।

বিদ্যার এমন কোন শাখা ছিল না, যেখান থেকে এমিনেস্কুর আগ্রহ পল্লব সঞ্চয় করে নি। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি—এমন কি শারীরবিদ্যাও। খেয়ালী মনের পিপাসা মেটাতে কঠিন পরিশ্রমে দেহ হ'ল ক্লিষ্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে ১৮৭৪ সালে যখন তিনি রুমানিয়ায় ফিরে এলেন, তখন এমিনেস্কু সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। শীর্ণ দেহ, প্রদীপ্ত আয়ত চক্ষু, কাঁধের ওপর লুটিয়ে-পড়া চুল আর চোখমুখে কি যে চাঞ্চল্য, কি যে উদ্‌ভ্রান্ত ভাব—যেন জনতার মধ্যে থেকেও কোন্ সুদূরে তাঁর মন বিচরণ করছে। সে যেন এক প্রতিভার জ্বলন্ত মশাল।

রুমানিয়ার 'ইয়াশ' শহর সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত। সেইখানে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিচালকের পদ গ্রহণ করলেন তিনি। সেই সঙ্গে আকাদেমী ইনষ্টিট্যুটে তর্কশাস্ত্রের ও পরে জার্মাণ ভাষার অধ্যাপকের পদও তিনি পেলেন। বই আর কাজ। জ্ঞান-আহরণ আর সাহিত্য-সৃষ্টি। কর্মের উন্মাদনায় গেল দু'বছর।

তারপর রাজনৈতিক আকাশে এল পরিবর্তন। দেশের মন্ত্রিসভা বদলাল, সেই সঙ্গে বহু কর্মীর পদচ্যুতি হ'ল। মিহাইল এমিনেস্কু পথে এসে দাঁড়ালেন। অন্য এক সাহিত্যিক-বন্ধু তাঁকে নিয়ে গিয়ে রাখলেন নিজের বাড়ীতে। তাঁরই উদ্যোগে এক সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদ পেলেন এমিনেস্কু। ইয়াশ থেকে কিছুদিন পরে এলেন রাজধানী বুখারেষ্টে। এক পত্রিকা ছেড়ে অন্য পত্রিকায়।

তারপর দারিদ্র্য আর সংগ্রামের ইতিহাস। চিরদিনের শিল্পী-জীবনের ইতিহাস। অনাহার, অনিদ্রা, সমালোচনা, দলগত রাজনীতির চক্রান্ত। তারই মধ্যে ডুবার প্রেরণার দাবি। অশান্তির আঘাতে বাজানো সুরের বীণা। পারিপার্শ্বিকের অসুন্দরের বেড়া ডিঙিয়ে চিরন্তন সুন্দরের সাধনা। বেদনার হোমাগ্নিতে সত্যের পরিচয়।

চিরকালের লিরিক কবিদের মতন এমিনেস্কুরও কাব্যের প্রধান অবলম্বন হ'ল—প্রকৃতি আর প্রেম। তবু প্রকৃতি—তাঁর প্রথম জীবনের লীলাসঙ্গিনীই তাঁর প্রথমা। তাঁর অদ্বিতীয়া। প্রকৃতির পটভূমিকাতেই যে শুধু তাঁর প্রেম সম্পূর্ণ তা নয়। তাঁর মনের বিচিত্র অনুভূতিরও তুলনা ঐ প্রকৃতির মধ্যেই।

"আর যেমন…" এই নামে একটি তিন স্তবকের কবিতা তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধের সাক্ষ্য বহন করে তিন ফোঁটা অশ্রুবিন্দুর মতন মুক্তার দ্যুতিতে টলমল করছে।

আর যেমন…

আকুল হাওয়ায় 'প্লোপি'র শাখা
মোর জানালায় আছড়ে পড়ে
আমার হৃদয় যেমন করে
তোমায় কাছে পাবার তরে।
গহন দীঘির অতল কালোয়
তারার ক্ষীণ রশ্মি জ্বলে
যেমন তোমার ভাবনা দিয়ে
উজল করি বেদনারে।
নিবিড় মেঘের আঁধার হতে
চাঁদের কিরণ ভরল ধরা
বিরহ মোর হোক না আঁধার
স্মৃতি তো মোর আলোক-ভরা।

প্রকৃতির মধ্যেই যেমন তার অন্তরের অনুভূতির তুলনা, তেমনি প্রকৃতির সান্নিধ্যেই তিনি খুঁজেছেন প্রিয়ার সঙ্গ। প্রেম তাঁর সেইখানেই সার্থক। প্রেম আর প্রকৃতি মিশে গেছে তাঁর কবিতায়। তার ভাবে, ভাষায় ফুটে উঠেছে লোকসঙ্গীতের সহজ সৌন্দর্য। এমনি একটি কবিতা—পাহাড়ী সাঁঝ।

পাহাড়ী সাঁঝ

সন্ধ্যা হল—একটি দুটি ফুটছে তারা আকাশ মাঝে
গাভীরা ধায় গোষ্ঠপানে, রাখাল ছেলের শিঙা বাজে।
ঝর্ণাধারার উৎসমুখে জলের রোদন আকুল করে
সালকিয়েমেরি তলায় প্রিয়ে, দাঁড়িও ক্ষণেক আমার তরে॥
পাতার ঘন জাফরি দিয়ে দীঘল চোখের দৃষ্টি হানি
দেখো ক্ষণেক—আকাশ পরে ভাসছে চাঁদের তরীখানি।
ঝরিয়ে দিয়ে হিমের কণা মেঘ ভেসে যায় ধীরে ধীরে
উপত্যকায় নামল ছায়া—চাঁদ জাগে ঐ গিরির শিরে॥
কূয়োর থেকে তুলছে কে জল—আওয়াজ তারি আসছে ভাসি
পাহাড় চূড়ার গোষ্ঠগৃহে রাখাল বুঝি বাজায় বাঁশি।
লাঙল কাঁধে ফিরছে ঘরে ক্লান্ত চাষী দিনের শেষে
গীর্জাঘরের ঘণ্টাধ্বনি সাঁঝের বায়ে আসছে ভেসে॥
আঁধার ঘনায়—গ্রামের ঘরে নামবে এবার নীরবতা
'সালকিয়েমেরি' তলায় বসে আমরা শুধু কইব কথা।
হেলিয়ে মাথা তোমার কাঁধে ধরে তোমার কোমল পাণি
প্রহর ভরে শুনব শুধু তোমার মুখের প্রেমের বাণী॥

রাত্রি যখন গভীর হবে ঘুমের কোলে পড়ব ঢলে।
এমন রাত কি এই জীবনে আসবে সখি এবার গেলে?

ঐ প্রকৃতির কোলেই যে কেটেছে তাঁর শৈশব। আজও যে তার ডাক তাঁক উন্মনা করে তোলে। সেই আহ্বান ভাষান্বিত হয়েছে তাঁর "যেয়োনাকো" কবিতায়।

যেয়োনাকো

—আমায় ছেড়ে যাস নে বাছা
কতই তোরে ভালবাসি
আমি ছাড়া কে বোঝে বল
তোর প্রাণের ঐ কান্নাহাসি।

বিজন বটের আঁধার ছায়ায়
বসিস আমার রাজার ছেলে
জলের পানে কি সে দেখিস
কাজল ঢাট নয়ন মেলে।

জলের ঢেউয়ের কলরোলে
ঘাসের বনের মরমরে
ত্রস্ত মৃগীর চলার ধ্বনির
অর্থ যত শিখাই তোরে।

মগ্ন হয়ে চাঁদের আলোর
বিস্ময়েতে অনুপম
নিমেষ মানিস বরষ যেন
বরষ কাটে নিমেষ সম।'

বনভূমির নিবিড় মোহে
হারিয়ে সেদিন আপনাকে যে
শুনতে পেতাম সকল কথা
উঠত সে গান মর্মে বেজে।

আজ যবে যাই তাহার কাছে
ভাষা তাহার আর না বুঝি
কৈশোরের সে অরণ্যে আর
কেমন করে পাব খুঁজি?

শুধু আনন্দে নয়, বেদনাতেও বাঁশি বেজেছে—রুমানিয়ার প্রান্তরের বাঁশি ধ্বনিত হয়েছে কবির অন্তরে। সেই বাঁশি শোনা যায় 'গিরিশৃঙ্গে' কবিতায়।

গিরিশৃঙ্গে

গিরিশৃঙ্গে পাণ্ডুর চন্দ্রিমা
ম্লান আজি জোৎস্নার হাসি
অরণ্যের শুষ্ক পত্রদলে
বেজে ওঠে বিচ্ছেদের বাঁশি।

মরণের মধুর বিরহ
ছায় মোরে নিশীথিনী সম
বনানীর বাঁশরীতে বাজে
ভাষাহারা ক্রন্দন মম।

এমিনেস্কুর সমস্ত সত্তায় জড়িয়ে আছে প্রকৃতি—আর তার সঙ্গে মিশেছে প্রেমের অনুভূতি। কিন্তু সেখানেও তিনি সম্পূর্ণ রোমান্টিক। তাঁর মানসী— জায়া নয়, বধূ নয়, শুধুই প্রেয়সী। সে কখনও দেহধারিণী, কখনও স্বপ্ন, কখনও কল্পলোকবিহারিণী। সে অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনা।

যে-কোন রোমান্টিক কবির মতনই তাঁর প্রেরণার উৎস—আপনহারা বিস্মৃতি। মর্ত্য-পরিবেশের ঊর্ধ্বে তার কাব্যলোক। কিন্তু সেই কাব্যলোক থেকে যে-মুহূর্তেই তিনি বাস্তব জগতে ফিরে এসেছেন, সেই মুহূর্তেই গানের খেয়া গেছে হারিয়ে। তখনই এসেছে বিষণ্ণতা। শ্রীহীন ঘর, সঙ্গীহীন জীবন জাগিয়েছে বেদনা। অমনি কবির মন উধাও হয়ে গেছে ভাবলোকে। জেগেছে সুর—সুরের পথ বেয়ে সুরু হয়েছে স্বপ্নস্বরূপিণীর অভিসার। এমনি নিরাশা আর কল্পনার সমন্বয়ে অনবদ্য হয়ে উঠেছে 'নিঃসঙ্গতা' নামে একটি কবিতা।

নিঃসঙ্গতা

নিশীথ রাতে ঘরের কোণে
অগ্নিশিখা উঠছে কাঁপি
ফুলিঙ্গ ধায় শূন্যপানে
স্তব্ধ প্রহর একলা যাপি।

কুলায়ে ফেরা পাখীর মতন
আবেশ ঘেরে হৃদয় মম
কত মধুর মোহের স্মৃতি
ঝঙ্কারিছে ঝিল্লী সম।

যীশুর পায়ে যেমন করে
মোমের ফোঁটা গলে পড়ে
আমার মনের জ্বালার স্মৃতি
তেমনি ধীরে পড়ছে ঝরে।

শূন্য আমার এ ঘর-দুয়ার
সবই শ্রীহীন সবই মলিন
যতই ভাবি সাজাব ঘর
বিষণ্ণতায় যায় কেটে দিন।

ভাবনা আমার বুকের ভিতর
ব্যথার প্লাবন দেয় ছুলিয়ে
অমনি জাগে সুরের জোয়ার
দেয় সে সকল কাজ ভুলিয়ে।

তারই মাঝে একেক রাতে
বাতি যখন ফুরিয়ে আসে
চমক দিয়ে বক্ষে মম
সে এসে মোর দাঁড়ায় পাশে।

শূন্য এ ঘর পূর্ণ করে
ভরিয়ে সে দেয় শূন্য হিয়া
আঁধার ভরা এই জীবনে
লক্ষ প্রদীপ উজলিয়া।

রজনী মোর প্রহর হারায়
সময় কাটে আপন মনে
নিবিড় তাহার বাহুর ডোরে
অস্ফুট প্রেম-গুঞ্জরণে।

লাতিনজাতিসুলভ রোমান্টিক মন—তার সঙ্গে মিশেছে দর্শনের গভীরতা। এমিনেস্কুর বিখ্যাত কবিতা-গুচ্ছ 'পাঁচটি পত্রে'র প্রথম পত্রে পড়েছে সেই দার্শনিক চিন্তার ছায়া। পূর্ণিমার চাঁদ সেখানে কবির মনে মিলনের আনন্দ আর বিরহের বেদনা জাগায় নি, জাগিয়েছে অনাদি অনন্তকালের জিজ্ঞাসা। প্রথম পত্রের সুরু হয়েছে সেই চিরন্তনের ধ্যান দিয়ে।

"বিষণ্ণ সায়াহ্ন যবে ক্লান্তপক্ষে নিঃশ্বসিয়া ওঠে
সময়ের দীর্ঘপথ মুহূর্তেরা করে উত্তরণ—
বাতায়ন পথে নামে পূর্ণিমার আলোর জোয়ার
শতাব্দীর বেদনার স্মৃতি যেন তার সাথে ভাসে।
তখন সহসা মনে জাগে—
কিছু তার ছিল স্বপ্নে কিছু অনুভবে।"

বিশ্বনিখিলের অনুভূতিতে সেখানে কবির মন বিলীন হয়ে গেছে। বিশাল বিশ্বের ক্ষুদ্র গ্রহের ক্ষুদ্র প্রাণী এই মানুষের দল। রাজ্য-সাম্রাজ্যের পতন-উত্থান, এত যুদ্ধ, এত গবেষণা এত শুধু সূর্যালোকে ধূলিকণার নৃত্য। একদিন শূন্য থেকে উৎসারিত হয়েছিল জীবন। বিশৃঙ্খলা থেকে এসেছিল সৃষ্টি। তারপরে এল স্থিতি, এল সুন্দর। চলল অন্তহীন তরঙ্গলীলা। আর সব তরঙ্গ লয় হ'তে থাকল অশেষের সমুদ্রে। সহস্র জীবনের বুদ্বুদ সৃষ্ট হ'ল, নিঃশেষে হ'ল লুপ্ত।

কত যুগের কত দেশের কত মানুষের সুখদুঃখ—আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ সেই সব নগণ্য ঘটনার সাক্ষী এই পূর্ণিমার চাঁদ। কত মরু, কত নন্দনকানন, কত উৎসব, কত ক্রন্দন সে ভরিয়ে দিচ্ছে তার নির্বিকার নিরপেক্ষ জ্যোৎস্নার প্লাবনে। নিঃসঙ্গতার সমুদ্রে ভাসমান সেই চাঁদের স্তব ধ্বনিত হয়েছে এই সুদীর্ঘ কবিতাটিতে।

দর্শন-প্রভাবিত আর একটি কবিতা—'সম্রাট ও প্রোলেতারিয়া।' তার মধ্যে রয়েছে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমগ্র মধ্য ইউরোপের তৎকালীন মনোভাবের চিহ্ন।

ধূমাচ্ছন্ন জানলার কাঁচের মতন যাদের অস্বচ্ছ ভবিষ্যৎ—সেই প্রোলেতারিয়ার দিকে চেয়ে থেমে গেছে কবির সুললিত বাণী। দৃপ্ত কণ্ঠে প্রেরণা দিয়েছেন তাদের—জানতে বলেছেন আপনাকে—জাগতে বলেছেন আপন অধিকারে। সেই আত্মবিস্মৃত চিরবঞ্চিতদের ডেকে তিনি বলেছেন—

ভুলো না তুমি কত শক্তিশালী। তুমি সংখ্যাগরিষ্ঠ। জীবন তোমাদের জন্যই। ভেঙ্গে ফেল এই অসাম্য। বহুজনের রক্তের মূল্যে আর ভরিয়ো না একজনের পানপাত্র। ভুলো না প্রবঞ্চকের মিথ্যা আশ্বাসে। জীবনের সুখদুঃখ জীবনের সঙ্গেই শেষ। পরলোকের প্রাপ্তির আশায় ইহলোকে বঞ্চিত ক'রো না নিজেকে।

রুমানিয়ায় তখন একদিকে বিলাসের বাহুল্য আর একদিকে পুঞ্জীভূত দুর্দশা। ফরাসী ভাবধারার বিকৃত অনুকরণের বাতি জ্বলছে তার সাজঘরে। রুমানিয়ার যৌবনকে ডেকে সেদিন এমিনেস্কু বারে বারে বলেছেন—অনুকরণে মহত্ব নেই, আছে আত্ম-অবমাননা। 'পাঁচটি পত্র' কবিতাগুচ্ছের তৃতীয় পত্রে রুমানিয়ার এক বীর রাজকুমারের যুদ্ধের বর্ণনাছলে দেশবাসীর মনে প্রেরণা দিয়েছেন তিনি দেশপ্রেমের। বিদেশী সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করেছে যে-দেশ, সে-দেশ কি পারবে না বিদেশী বৈভবের মোহ এড়াতে? এমিনেস্কুর 'তৃতীয় পত্র' তাই দেশপ্রেমের গভীরতায় ও ভাষার মাধুর্যে রুমানিয়ার জনপ্রিয়তম কবিতাগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে।

সকলের বেদনা যে অন্তরে গ্রহণ করে তার বেদনার দোসর পাওয়া ভার। তার জ্বালার শেষ নেই। দীপশিখার মতন জ্বলতে জ্বলতে এমিনেস্কুর সমস্ত সত্তা যেন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল। তার ওপর বাইরের জগতের ঘাত-প্রতিঘাত। ব্যক্তিগত জীবনে সংগিহীনতা। সবচেয়ে বড় নিঃসঙ্গতা মনের। এমন কেউ নেই যার কাছে যাওয়া যায়, যাকে পাওয়া যায়, যাকে সব কথা বলা যায়। তাঁর প্রতিভার জ্যোতির গণ্ডি পেরিয়ে কে আসবে তাঁর কাছে?

১৮৮৩ সালে লেখা এমিনেস্কুর রূপক-কাব্য 'শুক্রগ্রহ' তাঁর উত্তরসূরীদের কাছে তাঁর জীবনদর্শনের মতন প্রতিভাত হয়েছে।

কোন্ রূপকথার যুগে এক রাজকন্যা নির্জন নিশীথে দূর আকাশের শুক্রগ্রহকে দেখে তাকে ভালবাসল। প্রতি সন্ধ্যায় জানলায় দাঁড়িয়ে সে অধীর হয়ে ডাকতে লাগল আকাশচারী নক্ষত্রকে—এস আমার ঘরে, এস আমার চিন্তায়—তোমার কিরণধারায় উদ্ভাসিত করে তোল আমার জীবন।

রাজকুমারীর সেই আহ্বান পৌঁছাল নক্ষত্রের কানে। অবশেষে সে একদিন মানবদেহ ধরে এল তার ঘরে। নক্ষত্রের জ্যোতিতে রাজকুমারীর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তার মূর্তি দেখে ভয় পেল রাজকন্যা। নক্ষত্র চাইল মর্ত্যলোকের প্রেয়সীকে নিয়ে যেতে তার আপন জগতে—অমর্ত্যলোকে। রাজকন্যা তার প্রিয়কে পেতে চাইল মাটির পৃথিবীতে—সাধারণ মানুষ রূপে।

দেবযানী যেমন চেয়েছিল কচ তার বৃহৎ কর্তব্যের জগৎ ত্যাগ করে ধরাতলে তার নিত্যদিনের সঙ্গী হোক—তেমনি এমিনেস্কুর নায়িকা চাইল আকাশের নক্ষত্র তার মাটির ঘরে নরদেহ ধরে নেমে আসুক।

অবশেষে রাজকন্যার আকন্দনে শুক্রগ্রহ ত্যাগ করতে চাইল তার অমরত্ব। বিশ্ববিধাতার কাছে গিয়ে সে বলল—প্রভু, ফিরিয়ে নাও আমার অমরত্ব। বিদায় দাও আমাকে তোমার নক্ষত্রের সভা থেকে। আমি মানুষের দেহ ধরে মাটির ঘরে জীবন যাপন করতে চাই।

কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের থেকে নিষ্কৃতি চাইলেই কি নিষ্কৃতি মেলে? বিধাতা তার নিবেদনে কর্ণপাত করলেন না। বললেন—নির্বোধ, চেয়ে দেখ, একবার পৃথিবীর দিকে। দেখ, কার জন্যে, কিসের জন্যে বিসর্জন দিতে চাইছ তোমার দুর্লভ অমরত্ব?

শুক্রগ্রহ চেয়ে দেখল নীচে। রাজকন্যা তখন প্রাসাদের এক ক্রীতদাস যুবকের প্রণয়ে মত্ত। তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে রাজকুমারীর দেহমন। সে-ও যে তারই মতন মাটির জীব। তাকে সে জানে, চেনে, ভালবাসে। দূর আকাশের নক্ষত্র মোহ জাগায়, কিন্তু ঘরের মধ্যে তার নৈকট্যের ভয়ঙ্করতা সহ্য হয় না।

তবুও—প্রেমিকের বাহুবন্ধনের মধ্যে থেকেও রাজকুমারীর চোখ পড়ল শুক্রের প্রতি। আবার সেই হারানো মোহ জাগল তার মনে। সে ডাক দিল—এস আমার ঘরে। আলোকিত কর আমার জীবন।

ক্ষুদ্র গণ্ডির প্রেমে তখন শুক্রগ্রহের বিতৃষ্ণা এসেছে। তার মন উঠেছে বিরূপ হয়ে। মর্ত্যের কন্যা—তার কাছে প্রাসাদের ক্রীতদাস আর আকাশের নক্ষত্র দু'-ই সমান। নক্ষত্রের অমরত্ব বিসর্জনের সে যোগ্য নয়। সে ত্যাগের মহিমাও সে বুঝবে না।

নক্ষত্রের নিঃসঙ্গ আত্মা তাই অনন্তকালর শূন্য পরিক্রমার পথই বেছে নিল। তার ক্ষুব্ধ হৃদয়ের বেদনা গুমরে উঠল—তোমরা ত তোমাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিজ নিজ ভাগ্যে সুখী। আর আমার যে রয়েছে অসীম অমরত্ব। অনন্তকাল ধরে এই তুহিনশীতল নিঃসঙ্গতাকে বহন করে বেড়াতে হবে আমাকে।

কবির জীবনেও প্রেমের স্থান নিল ব্যর্থতা। এল একাকীত্ব—এল অবসন্নতা। তখন হেমন্তের ঝরাপাতা দেখে মনে পড়ে বিবর্ণ প্রেমপত্রের কথা। উর্বশীর প্রেমে যে শান্তি নেই—আছে জ্বালা। তারপরে দীর্ঘশ্বাস আর ক্রন্দন। তখন ঐ ঝরাপাতার পথ বেয়ে যাওয়া।

তখন—'ঝরা পাতা গো আমি তোমারি দলে
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে
ফাগুন দিল বিদায়-মন্ত্র
আমার হিয়াতলে'

—রবীন্দ্রনাথ

রুমানিয়ার কবি এমিনেস্কুও গেয়েছেন ঝরাপাতার গান। সে গান বৈরাগ্যের নয়—মরণের প্রতীক্ষার।

ঝরা পাতা

বাতায়ন-পথে হেমন্ত-বায়ু
দিয়ে গেল ঝরা পত্রখানি
মরণই বুঝি বা তার হাত দিয়ে
পাঠাল আমারে তাহার বাণী।

এমনি পত্র কত না পেয়েছি
পূর্ণ প্রেমের মধুর রাগে
বিবর্ণ তারা আজি এরই মত
সে শুধু আমারই মরমে জাগে।

ঝরে-পড়া পাতা ফেলে-আসা দিন
সে কি কভু কেউ স্মরণে রাখে
প্রণয়ের লিপি যে লেখে সে ভোলে
যে পায় সে তারে যতনে রাখে।

আজও তারা মোর ডালিতে রয়েছে
মৃত প্রণয়ের সাক্ষ্য বহি
জানি সে ভ্রান্তি তবু সে ভুলের
স্মৃতির অনলে নিজেরে দহি।

মাধুর্যে ভরা সে ব্যর্থতারে
পারি না ভুলিতে ক্ষণিকের তরে
শুধু দিন গুণি, শেষের অতিথি
মরণ কখন আসিবে ঘরে।

ব্যর্থ প্রেমের সে-রাগিণী আজও
বাজে হৃদয়ের বিষণ্ণতায়
তারি মাঝে যেন ঝরাপাতাখানি
আনিল বহিয়া হেমন্ত-বায়।

ক্লান্ত তাহার চরণশব্দে
শুনি মৃত্যুর পদধ্বনি
সব জ্বালা মোর সে এসে জুড়াবে
দিবে সে শান্তি চিরন্তনী।

তখন মরণই একমাত্র প্রিয়। নিরুদ্দেশ যাত্রার শেষ লক্ষ্য।

একদিকে অন্তর-ভরা বিষাদ, আর একদিকে বহি-র্জগতের সংঘাত। সমালোচকদের চুলচেরা বিচার—নিষ্ঠুর দংশন। তুলনামূলক সমালোচনা। অলঙ্কার-বিশ্লেষণ। সমালোচকদের প্রতি বিতৃষ্ণায় বিদ্রূপ করে এমিনেস্কু লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা—'আমার সমালোচকরা':

আমার সমালোচকরা

কুসুম ফোটে লক্ষ কোটি
ফল ফলে না সব কুসুমে
অনেক কলির রঙীন জীবন
মরণ এসে ঝরায় ভূমে।

সহজ বড় কথার পরে
কথার মালা গেঁথে যাওয়া
অর্থবিহীন শূন্যধ্বনি
ছন্দে মিলে যায় তো গাওয়া।

কিন্তু যখন তীব্র ব্যথা
অনুভূতি, আবেগ, আশা
হৃদয় মাঝে আছড়ে ফিরে
আকুল হয়ে যাবে ভাষা।

কুঁড়ির দ্বারে গন্ধ যেমন
অন্ধ বেগে আঘাত হানে
তেমনি করে বেদন যখন
কোন বাধার বাঁধ না মানে।

বক্ষ-ফাটা সেই বেদনায়
মুক্তি দিতে, দিতে বাণী
সফল হবে, হে বিচারক,
তোমার শীতল তৌলখানি?

সত্য যখন তোমার কাছে
কণ্ঠ চেয়ে কেঁদে মরে
তখন বুঝি, সমালোচক,
মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে?

বিচারপতি, প্রণাম তোমায়,
একটি কথা জানাই খালি
কাব্য তোমার কথার মালা,
ব্যর্থ তোমার ফুলের ডালি।

নিরন্তর আত্মপীড়নে এমিনেস্কুর শরীর-মনের সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে আসছিল। এমিনেস্কুর এক উত্তরসাধকের লেখায় তাঁর মনের সেই সময়কার অস্থির যন্ত্রণার কথা জানা যায়:

—"এক সন্ধ্যায় গেছি তার কাছে। মাথায় লম্বা লম্বা চুলের মধ্যে আঙুল চালাচ্ছেন আর অস্থিরভাবে সারা ঘরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। আমাকে দেখে বলে উঠলেন—আর আমি সহ্য করতে পারছি না। বললাম—কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নাও না কেন? বললেন—কেমন করে নেব? কোথায় যাব? টাকা নেই, সময় নেই, আর সবচেয়ে বড় কথা, এমন কেউ নেই যার ওপরে কাজের ভার দিয়ে যেতে পারি। কত কাজ আছে। কত কথা বলার আছে, কে নেবে সেই ভার? সেদিন বুঝি নি কেন এই অস্থিরতা, কেন এত দুশ্চিন্তা। বুঝলাম এক সপ্তাহ পরে। কাগজে বেরুল—মিহাইল এমিনেস্কুর মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে।

অসামান্য ভাবনার বোঝা আর বহন করতে পারল না তাঁর মস্তিষ্ক। নক্ষত্রের জ্যোতিতে মানুষের দেহ গেল জ্বলে। সে হ'ল ১৮৮৩ সাল। এমিনেস্কুর তখন মাত্র ৩৩ বৎসর বয়স। বন্ধুরা তাঁকে চিকিৎসার জন্য পাঠালেন ভিয়েনায়। জনসাধারণের কাছে, ধনীদের কাছে পাতলেন ভিক্ষাপাত্র। সুস্থ হয়ে উঠে সেই গ্লানিই এমিনেস্কুকে পীড়িত করল সব-

চেয়ে বেশী। চিঠি লিখে মিনতি জানালেন এক বন্ধুকে—ক্ষান্ত দাও। আর ভিক্ষা নয়। ও জীবনে আমার রুচি নেই।

তখন জনমতে এসেছে বিতৃষ্ণা। প্রশস্তিতে তখন তিনি বিগতস্পৃহ। সব কবির মতন তাঁরও শেষের বাসনা তখন নির্জন সমারোহহীন মৃত্যু—নিঃশব্দে মিশিয়ে যাওয়া ধরণীর সঙ্গে।

এই সময়ে লেখা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গান—"আছে শুধু একটি তিয়াষা।"

আছে শুধু একটি তিয়াষা—
প্রদোষের নিঃশব্দ তিমিরে
আমারে মরিতে দিয়ো একা
জনহীন সমুদ্রের তীরে।

শবাধার মোর তরে নয়
পট্টবস্ত্রে নাহি প্রয়োজন
বসন্ত-তরুর শাখা দিয়ে
রচিয়ো আমার আচ্ছাদন।

লঘুগতি সায়াহ্নের চাঁদ
ভেসে যাবে ঝাউবন-শিরে
গাভীদের ঘণ্টাধ্বনি যবে
মিশাইবে শীতল সমীরে।

তখনি পর্বতগাত্রে বুঝি
নির্ঝরিণী উঠিবে আকুলি
নির্জন সমাধি-'পরে মম
ঝরিবে 'ভেই'-এর পাতাগুলি।

পুঞ্জীভূত স্মৃতির হিমানী
মৃত্যুর শূন্যতা দিবে ভরি'
সন্ধ্যাতারা উদিবে আবার
কত না রাতের ব্যথা স্মরি'।

আমার বিদায় ব্যথা ভরে
ঝরে নাকো যেন অশ্রুজল
বনান্তের বহিবে বিলাপ
হেমন্তের শুষ্ক পত্রদল।

উচ্ছসি উঠিবে দীর্ঘশ্বাস
অশান্ত সমুদ্র-সমীরণে
অখণ্ড নৈঃশব্দ্য মাঝে যবে
মিশে যাব পৃথিবীর সনে।

এক বছর পরে সুস্থ হয়ে কবি দেশে ফিরলেন। আবার এলেন 'ইয়াশ' শহরে। দীপ্তিহীন নক্ষত্রের ভাষাহীন দৃষ্টি দেখে অনুরাগী বন্ধুরা বেদনায় শিউরে উঠলেন। এবারে কবির ভাগ্যে ছিল বাণিজ্য-বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ করে জীবিকা-নিবাহ করা। পড়াতে হ'ল ভূগোল আর সংখ্যা-তত্ত্ব। ভিয়েনায় ছাত্রজীবনের নির্বিচার জ্ঞান সাধনার এই কি সার্থকতা? ক্লান্ত দেহ, সদ্য-রোগমুক্ত মস্তিষ্ক। তার ওপর অনভ্যস্ত বিষয়ে শিক্ষকতা। আবার পরিশ্রম, আবার অসুস্থতা। দু'বছর বাদে আবার মানসিক চিকিৎসালয়। তখন জনসাধারণের আবেদনের ফলে তৎকালীন রাজা ও রাজসরকার এমিনেস্কুকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যৎসামান্য মাসিক ভাতা মঞ্জুর করলেন।

কিছুদিন পরে এমিনেস্কু সেরে উঠলেন। তাঁর এক বোন তখনও জীবিত। তাঁরই সেবা শুশ্রূষায় আবার যেন হারানো শক্তি ফিরে পেলেন কবি। ছাই-চাপা আগুন নেববার আগে একবার জ্বলে উঠল।

এবারে কবি এলেন বুখারেষ্টে। আবার সংবাদপত্র-সম্পাদনা। এবারে আর কবিতা নয়। জীবনের শেষ পর্বে কয়েকটি নিবন্ধে এমিনেস্কু লিপিবদ্ধ করে রেখে গেলেন কাব্য সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারা। তার মধ্যে অমর করে দিলেন রুমানিয়ার লোকসঙ্গীতকে।

১৮৮৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে ৩৯ বৎসর বয়সে এমিনেস্কুর যন্ত্রণাময় জীবনের শেষ হ'ল। রুমানিয়ার কাব্য-সাহিত্যের উজ্জ্বলতম অধ্যায়ে পড়ল সমাপ্তির রেখা।

জীবন ত শেষ হ'ল। শেষ হ'ল যন্ত্রণার। কিন্তু চিরায়ত্ত কালের হাতে কি কিছুই থাকবে না? এমিনেস্কু একবার এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন—আমার জীবনের বঞ্চনা আর অনাহারের গ্লানির দলিল কি রেখে যাব ভবিষ্যকালের জন্যে? না—আমার সৃষ্টিতে যেন আমার ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ছাপ না পড়ে।

এমন কথা কি রবীন্দ্রনাথও বলেন নি? বলেন নি কি—'দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি লজ্জা দিও না। যে দুঃখ সকলের নয়, তাকে প্রকাশ করো না সকলের কাছে।'

লেখনী তাঁদের লজ্জা দেয় নি। মরদেহধারী কবিদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অমর হয়ে আছে তাঁদের কাব্য।

এমিনেস্কুর স্বদেশ তাঁকে চিনেছে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অপ্রকাশিত বহু কবিতা উদ্ধার করে প্রকাশ করা হয়েছে। আজকের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কনস্তান্তসার সমুদ্র-তীরে আজ স্থাপিত হয়েছে কবির মূর্তি। হয়ত তাঁর আত্মা তৃপ্ত হয়েছে তাতে। শেষের বাসনা মেটাবার প্রয়াস করেছে তাঁর দেশের লোকেরা এমনি করে।

আর এমিনেস্কু বেঁচে আছেন অসংখ্য রুমানিয়াবাসীর প্রাণের খেলায়—তাদের হাসিকান্নার গানে। সেই ত তাঁর চিরস্থায়ী দলিল।

গান-পাগল বাঙালীর কবি তাঁর শেষ পারানির কড়ি করে কণ্ঠে নিয়েছিলেন গান। আর গান পাগল রুমানিয়ার কবিও কোলাহলের সাগরের মধ্যে ভাসিয়ে দিয়েছেন গানের তরী। সেই গানই তাঁকে কালের সাগর পার করে নিয়ে যাবে—

লক্ষ শত তরী যারা
সাগরজলে ভাসল হেলায়
ডুববে কতই মাঝ-দরিয়ায়
ঢেউয়ের দোলায় হাওয়ার খেলায়।

লক্ষ পাখী যাযাবরী
এ কূল হতে ও কূলে ধায়
কতই হবে দিশাহারা
ঢেউয়ের দোলায় হাওয়ার খেলায়।

লক্ষ মানুষ পথ হারাল
আশার কুহক মরীচিকায়
শূন্যে তারাও মিলিয়ে যাবে
হাওয়ার খেলায় ঢেউয়ের দোলায়।

অবুঝ মনের ভাবনা যত
কূল হারাল গানের ভেলায়
বাজবে তারাই অনন্তকাল
ঢেউয়ের দোলায় হাওয়ার খেলায়।

(কবিতাগুলি মূল রুমানিয়ান থেকে লেখিকা কর্তৃক অনূদিত)

রায়বাড়ী

গিরিবালা দেবী

"কুতুর কুতুর ময়না, কাল দেব গয়না, আজ দিলাম বায়না।"

তরু প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিয়া কাঠের ঘরের পৈঠায় বসিয়া কুকুর বিড়ালের বাচ্ছাদের আদর করিতেছিল। তাহারা এখন দিব্যি বড় হইয়া উঠিতেছে। মানুষের আদর সোহাগ বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারে। পারে না নামিতে পৈঠার নীচে। চারিটা বাচ্চা তরুর সম্মুখীন হইয়া হাত চাটিয়া দিতেছে লেজ নাড়িতেছে ভেউ ডাকিতে মিউ তাহাদের বিচিত্র কলরবে সচকিত হইয়া কালজী একবার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছে শাবক কয়টিকে।

বিনু তরুর কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া ছানাগুলিকে আদর করিতে লাগিল।

তরু বিনুর হাত সরাইয়া দিয়া চাপা স্বরে ধমক দিল "এদের ছুঁয়ো না বৌদি। ছুঁলেই তোমার জাত যাবে। নেয়ে শুদ্ধ না হওয়া অবধি তুমি নিয়মের ঘরের বারান্দায় উঠতে পারবে না। তরকারীর জালা ছুঁতে পারবে না বারান্দায় আমার নাকি জাত গেছে। আমিও যাই না ওদের ত্রিসীমানায় মাড়াতে; আমার দরকার কিসের? ওঁরা সারাদিন যা খট খট করে তৈরী করেন আমার খাবার ইচ্ছা হ'লে মা'র কাছে চাইলেই পাই। এখন ত তুমি এসেছ আজ থেকে তোমার হাতেও সরাকাঠি পড়বে, তুমিই আমাকে দিও বাপু এটুকু-সেটুকু খেতে।"

বিনু বলিল, "আমি এখন কি কাজ করব তাই ভাবছি, কয়েকদিনের পরে আমার যেন কেমন নতুন নতুন লাগছে।" কামিনীর মা অনবরত ঠেলিয়া ঠেলিয়া রায়বাড়ীর গণ্ডির ভিতরে তাহাকে অনেকটা প্রবেশ করাইয়াছিল, কয়েকদিনের অনুপস্থিতিতে সে গণ্ডির দ্বার যেন বন্ধ বন্ধ লাগিতেছে। তাই বিনু তরুর শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছে।

তরু বলে, "বৌদি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? মা চায়ের ঘরে গেছেন, তুমি সেখানে চলে যাও। আজ না তোমাদের পাটাই পুজো। তোমাদের কাজের খটাপটা রয়েছে। দেখ গে ঠাকুমা ঢাক বাজাচ্ছেন পচা মালীর বৌকে নিয়ে।"

বিনু নীরবে পা বাড়াইতেই তরু তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "শোন বৌদি, আর একটা কথা—তুমি তোমার সমস্ত জিনিস আমাদের বিলিয়ে দিয়েছ দেখে মা রাগ করছেন। বললেন, 'ওর বাবা ওকে ভালবেসে যা দিয়েছেন তাতে তোরা ভাগীদার হ'লি কেন?' আমিও শুনিয়ে দিয়েছি, বৌদি ভালবেসে দিয়েছে আমরা নিয়েছি। আমরা ত পর নয়। পরে নেয় কেন? আমাদের জিনিস হ'লে আমরাও বৌদিকে দেব। তুমি কিন্তু রাগ ক'রো না, তোমার বৃন্দাবনী শাড়ীর কথা, ফুলেল তেলের কথা আমিই মাকে বলে দিয়েছি।"

বিনু সে-কথার জবাব না দিয়া চলিয়া গেল চায়ের ঘরে।

ঠাকুমা তখন হাতীর মাথায় বসিয়া গালবাদ্য বাজাইতেছিলেন, "ও পচার বৌ, শোন লো, পচার ত মনে আছে—আজ পাষাণ চতুর্দ্দশী পুজো। কুশ দিয়ে পাঠাই ঠাকরুণ যে তাকে গ'ড়ে দিতে হবে? নাটাইয়ের কনার ঢাওর-এর কুশ, দেখতে এক রকমই। যে ব্রতী, তাকে উপোস করে থাকতে হয়। বিকেলে পুজো করে ভোগ দিয়ে কথা শুনে তবে জল খাওয়া। পুরোহিত মন্তর পড়ান বটে কিন্তু যার নামের পুজো তাকেই বসে করবার নিয়ম। ভোগ একটা সাধারণ, মাছ ভাত ডাল তরকারি ভাজা অম্বল। আসল কথা হ'ল পাষাণাকৃতি পিঠে পায়েস ভোগে দিতে হবে।"

মালীবৌ সায় দেয়, "আপনাগো বাড়ীতে পিঠে পায়েস বাদ যায় কবে মাঠান। শীত ক্যাবলি আসিতেছে, শীতভোর নাগাই থাকিবে পিঠা খাওন। আমি ঝাড়-ছড়া দিবার লেগে আইসার কালে দ্যাখা আইছি, বাড়ীওয়ালা কুশা নয়া পাঠাই বানাইতে বসিছে। হইয়া গিলেই দিয়া যাইবে। আপনাগো পুজ্যা ত সেই সাঁজের খনে?"

ঠাকুমা অকস্মাৎ মালীবৌয়ের প্রতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুই কি কইছিস বৌ, তোর যে 'এক মাঘেই শীত পালায়।' চিরটা কাল করছিস কর্ম্মাছিস, খাচ্ছিস-দাচ্ছিস, তবু ভুল করিস কেনে? রায়বাড়ীতে সাঁঝে আবার পাঠাই হ'য়ে থাকে? দুপুর গড়ান্তে আমাদের পুজো। পাটাই আছে দুই রকম দুপুরে আর রাতে।

আমাদের রাতের পুজোই হ'ত। আমার দিদিশাশুড়ী লোভে পরে বিকেলে করে গেছেন।"

মালীবৌ উঠোন ঝাড় দিতে দিতে চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ, তেঁনার বুঝি সখ হইছেল বেলা-বেলি মায়ন-তাড়ন করিতে ?"

"সখ না সখ, নেমন্তন্নের লোভ। সেবার ভূঁইয়া বাড়ীর বড় ছেলের বিয়ের খুব ধুমধাম হয়েছিল। গাঁসুদ্ধ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীদের নেমন্তন্ন হ'য়েছিল বৌভাতে। সেদিন ছিল পাষাণ চতুর্দ্দশী ব্রত। শহরের মতন এদেশে ত রাত-বেরাতে ভোজ হয় না। যা হয় দিনে-দুপুরে। আমার দিদিশাশুড়ী নেমন্তন্নে যাবেন বলে বিকেলেই বর্ত্ত 'সেরে রাখলেন। সেই থেকে দুপুরের পরে আমাদের পুজো হয়।"

মালীবৌ হাসে, "এমনি কতা শুনি নি মাঠান, আগে-ভাগে পূজ্যা সারি বিয়াবাড়ী যাওন। নেমন্তন্নের খাওনের কি সখ ?"

"সেকি খাওয়ার জন্যে, তা নয়। বাড়ীতে কি কম খেত তারা? সকল বাড়ীর বৌ-ঝি এক জায়গায় হবে, কার কি নতুন গয়না হয়েছে, কে কেমন ভাল শাড়ী পেয়েছে তারই সন্ধান নিতে গাঁ ঝেঁটিয়ে একখানে হওয়া। একজনার দেখলেই আর একজন এসে কর্ত্তা-দের কাছে বায়না ধরত—'অমুকের তমুক আছে, আমার নেই'।"

মালীবৌয়ের এ-দিকটা ঝাড় হইয়াছিল। সে উত্তর না দিয়া সরিয়া গেল অন্যদিকে।

ঠাকুমা স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ছোট হোক, বড় হোক একটা অনুষ্ঠান আছে, নাকে সরিষার তৈল দিয়া তিনি ঘুমাইয়া থাকিলে চলিবে কেন? সকলের পিছনে গরু না তাড়াইলে ইহাদের কোন কাজ সিদ্ধ হয়? দাঁত থাকিতে কেউ দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না। ঠাকুমা দাঁতের মর্য্যাদা বুঝাইতে গেলেন ওই দিকে।

এদিকে বিনুও কাজের নির্দ্দেশ পাইয়া বর্ত্তিয়া গেল।

মনোরমা বধুর পিত্রালয়ের আনীত মেঠাই সকলকে ভাগে ভাগে সাজাইয়া চায়ের সঙ্গে খাইতে দিলেন। ভোজনের সময় তরু কোনকালে পিছাইয়া থাকে না। প্রসাদ বাঁটার সময় ঠিক হাজির।

মা দুইখানা রেকাবিতে তরু ও বিনুকে খাবার দিয়া বলিলেন, "বৌমা, তুমি খেয়ে হাত ধুয়ে তরকারি নিয়ে ব'সো গে। কোটাকাটি হয়ে গেলে পুজোর সাজ-নৈবিদ্য ফল কেটে জলপানি সাজিয়ে রাখতে হবে। কামিনীর মাকে বলেছি বড়ভোগের ঘর ধুয়ে-মুছে মাটি দিয়ে পুকুর তৈরি করে বেদী গেঁথে রাখতে। ঐখানেই পুজো হবে, ঐখানে ভোগ বেঁধে দেব।

তরু বলে, "তোমাদের পাটাই বর্ত্ত ঠিক আমার নাটাই বর্ত্তের মত, না মা? তফাৎ, কলার ডাঁটার বদলে কুশের প্রতিমা। ভোগে তারও পিঠে, এর আবার পিঠে, পায়েসের সাথে ভাত-মাছের ভোগ। আমার পুজোয় পুরুত লাগে না, তোমাদের পুরুত এসে মন্তর পড়ায়। তুমি ভোগে কি রান্না করবে মা?"

"যা সাধারণ তাই, তবে পায়েস পিঠে লাগবে। ভাবছি, এক্ষুনি নেয়ে ছোটভোগের ঘরে গিয়ে ভোগ চড়িয়ে দেইগে। এক রান্না দুই জায়গায় করে কি হবে? রান্না করে নারায়ণের ভোগ, পাটাইয়ের ভোগ দুই বাসনে ঢেলে রাখব। পিঠে পায়েস ও-ঘরে হ'লে ওরাও ভোগের পরে মুখে দেবে। ভোগ সেরে এদিকে এসে মাছ আর আতপ চালের এক হাঁড়ি ভাত হ'লেই এদিকের ভোগ হয়ে যাবে'খন।"

বিনু তরুর কানে কানে কি যেন বলিল।

তরু কহিল, "বৌদি, পাটাই পুজোর মাছ-ভাত রাঁধতে চাচ্ছে মা।"

মায়ের মুখে আনন্দের দীপ্তি খেলিয়া গেল। তিনি স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন "উপোস করে যে ভোগ রাঁধতে হয় বৌমা, পরে সারাজীবন ভরে কত ভোগ-রাগ রান্না করতে হবে। আজ তুমি জল খেয়েছ, না খেলেও গোটা বেলা উপোসী থেকে পারতে না, কষ্ট হ'ত। তুমি পাঁচমিশালী একটা তরকারি কোটগে। ছোলা ভেজানো আছে, ছোলা দিয়ে রান্না হবে। পরে আর যা কুটতে হবে আমি বলে দেব। পসারীকে মটরের শাক তুলতে বলেছি, বড়ি দিয়ে শাক-পিঠালি হবে। চালতের অম্বল। পাঁচ পদের ভাজা।"

মনোরমা চায়ের পর্ব্ব মিটাইয়া দিয়া অন্য কাজে চলিয়া গেলেন।

তখনও তরু-বিনুর খাওয়া শেষ হয় নাই। তরু বলে, "বৌদি, তুমি যে মা'র কাছে পাটাইয়ের ভোগ রান্না করতে চাইলে মা যদি স্বীকার হ'তেন তা হ'লে কি করতে? তুমি যে কিচ্ছু রান্না জান না!"

"তোমার কাছ থেকে শিখে নিতাম তরু, তুমি আমার চেয়ে ভাল জান।"

তরু প্রসন্ন হইল। উনুনের উপরে কড়ায় চায়ের

জন্য খানিকটা দুধ বসান রহিয়াছে। তরু হাত ধুইয়া সেই দুধ হইতে কয়েক হাতা দুধ পিতলের মগে লইয়া বাহির হইয়া গেল কালজিকে দিতে। কালজিকে প্রচুর দুধ না দিলে তরুর আদরের মাতৃহীনা শিশু দুইটি স্তনদুগ্ধ-বিনে মরিয়া যাইবে।

কামিনীর মা ঘর পরিষ্কার করিতে আসিয়া আহ্লাদে আটখানা। "বৌমা, তুমি নাকি পাটাই পূজ্যার ভোগ রাঁধিতে চাইছিলা, তোমাগো শাউরী খুসী হইয়া কইল আমারে। পরের ঘরে বুদ্ধি খাটায়ে থাকন লাগে মা, এই ত তোমাগো রাঁধন করিতে হইল না, একডা মুকের কতায় কত তুষ্ট হইলেন। তোমার 'নাঠিও ভাঙ্গিল না; সাপও মরিল না।' এমতি বুদ্ধি খাটাইবা পায়ে পায়ে। আচ্ছা বৌমা, সাহস করি যে কইছিলা—যদি সত্যি রাঁধিতে হইত তবে কি করিতা?"

"কি আবার করতাম, তোমাকে নিয়ে দাঁড করিয়ে রাখতাম মাসী।"

"হ, পূজ্যার ভোগে আমাগো যাইতে দিইত কি না ঘরে।"

"ঘরে না যেতে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে বাইরে।"

কামিনীর মা হাসে, "সাবাস বুদ্ধি ম্যায়ার, এবারে বুদ্ধি খুলিচে। এহন বড় হইতেছ, সগল দিকে মাথা খাটাইবা। 'করিলে পরের ঘর, ঘাম দিয়া ছাড়ে জ্বর'।"

দুর্গোৎসবের বড়ভোগের গৃহের মাঝখানে পটাই পূজার জলাশয় তৈরী হইয়াছে মাটি দিয়া, বেদীও মাটির। মণিরাম ভোগের জল তুলিয়া চাল ধুইয়া ভোগের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। বিনু নিয়মের পূজার সাজ-নৈবিদ্য-জলপানি গোছাইয়া রাখিয়া তরুর সহিত ক্ষুদ্র পুকুরের পাড়ে ও বেদীর ওপরে আলপনা দিতেছিল।

বিনু তরুকে শিখাইতেছিল তরুলতা ও কলমিলতা আঁকা। বিনু স্নানান্তে খেজুরছড়ি শাড়ীখানা পরিধান করিয়াছে, তাহাকে মানাইয়াছে চমৎকার।

ছোটভোগের ঘরে তুমুল সমারোহ তখন শেষ হয় নাই।

এমন সময় লবঙ্গ একটা বোনা হস্তে উপস্থিত হইল বিনুদের নিকটে। লবঙ্গ বোনা-সেলাইয়ের ওস্তাদ। লোকে তাহার শিল্পকলা দেখিয়া ধন্য ধন্য করে। লবঙ্গ মেনীর গায়ের একটা উলের জামা আরম্ভ করিয়াছে। প্যাটার্ণ যুঁই ফুলের ঝাড়।

বিনু একখানা খুবড়ি পিঁড়ি পাতিয়া আহ্বান করিল, "আসুন পিসিমা, বসুন, কি সুন্দর আপনার বোনা হচ্ছে।"

তরু লোলুপ দৃষ্টিতে বারেক বোনার দিকে তাকাইয়া বলে, "বৌদির আলপনা দেখেছেন পিসিমা? কি সুন্দর কলমিলতা তরুলতা দিয়েছে। তরুলতা আমাকেও শিখিয়ে দিয়েছে। এই ধারের লতাটা আমি দিয়েছি; কিন্তু বৌদির মত সোজা হয় নি।"

"ক্রমেই হবে। প্রথমে সকলের হাতে বাঁকা-চোরা হয়। তুই নিজেই তরুবতী, তোর আবার তরুলতা আলপনা! মেনীর জন্যে শীতের জামাটা বুনতে নিয়েছি। মনে হচ্ছে কাঠ-গোলাপ রংএর উল যা আমার আছে তাতে কুলোবে না। বৌয়ের বাক্সে দেখেছিলাম বাণ্ডিল বাণ্ডিল উল। ও ত বুনতে জানে না, শুধু শুধু নষ্ট হবে। চল না বৌ, চট করে তোমার উলের সঙ্গে আমারটা মিলিয়ে দেখিগে।"

বিনুর আলপনা শেষ হইয়াছিল, সে উঠিয়া লবঙ্গর সহিত যাইতে উদ্যত হইল।

তরু বাধা দিল, "বৌদি, তুমি এখন শোবার ঘরের আলমারি বাক্স খুললে সেজদি তোমাকে পুজোর কাজে হাত দিতে দেবে না। আমি নতুন কাপড় জলে না ধুয়ে পরেছি বলে আমাকে কিছু ছুতে দিচ্ছে না। মা বলেছেন আলপনায় দোষ নেই, তাই আলপনা ছুঁচ্ছি। কাঠগোলাপী উল বেড়ার বন্দরে নাকালিকায় বন্দরে ঢের পাওয়া যায়, সেজদি কার্পেট বুনছে কত রং-বেরংএর উল আনিয়ে।"

লবঙ্গ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "তা হ'লে এখন আমি চলি। বিকেল বেলা ত তোমাদের পুজো-অর্চ্চনা। রাতে আবার রং ঠাওর করা যায় না। কাল দুপুরে আসব।"

লবঙ্গ চলিয়া গেলে তরু বিজ্ঞের মত গম্ভীর মুখে বলিল, "বৌদি, তুমি বড় বোকা! তোমার উল নেবার ফিকিরে আসা হয়েছিল। সেজদি ত তোমার জিনিস নেবে না। ওর ভারী হিংসুটে স্বভাব। সেজদি এলে তাকে দিয়ে বুনিয়ে নিলেই হবে। আচ্ছা বৌদি, তুমি বোনা শেখো নি, তবু তোমার বিয়ের সময় বোনার বাক্স দিয়েছিলেন কেন? তুমি যদি জামা বুনতে জানতে তা হলে মেনীর মত আমারও হ'ত।"

বিনু ধীরে বলে, "জামা আমিও জানি তরু, কিন্তু যুঁই ফুল জানি না। কফিপাতা, ঝিনুক বরফি এই সব।"

তরুর দীঘল চোখ আনন্দে জল জল করিতে লাগিল, 'তুমি যদি এত সব জান বৌদি, তবে বোন না কেন? তাই ত বলি, বোনা না জানলে ওঁরা বেতের

বোনার বাক্স ভরে কাঁটা হাড়ের কাঁটা ক্রুশ কাঠি সূচ সুতো কাঁচি রাজ্যের পশম দেবেন কি কারণে? তুমি আমাকে কফিপাতা জামা করে দিও। কতদিন লাগবে তোমার? মেনীর জামা হবার আগে পারবে ত?"

"খুব পারব, বুনলে আবার ক'দিন? তুমি কি রং ভালবাস সেটা আজ ঠিক করে দিও, আমি আজ থেকেই সুরু করে দেব।"

"তোমার চাবি কোথায় বৌদি, আমি আলমারি খুলে উলের রং ঠিক করিগে। বিছানার নীচে চাবি রেখে দাও কেন? ওটা ভারি খারাপ। যার ইচ্ছে সেই ত হাতিয়ে বের করে নিতে পারে সব। বৌ-মানুষের আঁচলে চাবি রাখলে ঘোমটার কাপড় সরে যায় না। আমি আঁচলে চাবি রাখতে খুব ভালবাসি। সেই জন্তে মা আমাকে এক গোছা রূপোর চাবি গড়িয়ে দিয়েছেন।"

"আমার দাদামশাই আমাকেও রূপোর রিংএর বারটা রূপোর চাবি গড়িয়ে দিয়েছিলেন আমি তা আকাশিকে দিয়েছি। একখানা হাত ওর অবশ বলে কাপড় এলোমেলো হয়ে যায়। ওর মা কোমরে এঁটে কাপড় পরিয়ে পিঠে চাবি ঝুলিয়ে দেন, এখন কাপড় ঠিক থাকে।"

"তুমি বড় উড়নচণ্ডী বৌদি, বারো বারোটা রূপোর চাবি একজনাকে দিয়ে দিলে? কেউ ভালবেসে কিছু দিলে সমস্তই কি ধরে দিতে হয় অন্তকে? তোমার এ স্বভাব ভাল না বাপু!"

বিনু আর জবাব দেওয়া হইল না। মনোরমা ওদিকের কাজ সারিয়া এদিকে আসিলেন।

সপ্রশংস নেত্রে আলপনা নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "বৌমা বুঝি আলপনা দিয়েছে, দিব্যি হয়েছে। তুই ওর কাছ থেসে শিখিস তরু?"

তরু সোৎসাহে বলে, "তাই শিখছি মা, বৌদির দেখে এদিকের তরুলতা আমি দিয়েছি। দেখ মা, একটা কথা, কেউ আমার নাম জিজ্ঞেস করলে এখন থেকে তুমি কখনো বলতে পারবে না "তরুবতী"। বতী শুনে আমার ঘেন্না করে, এখন থেকে আমি তরুলতা হ'লাম।"

মা হাসিতে হাসিতে ভোগ চড়াইয়া দিলেন।

বিনুকে বলিলেন, "পুজোর সব এখানে সাজিয়ে এনে রাখ বৌমা। রেখে যাও ছোটভোগের ঘরে, ওঁরা এখন খেতে বসবেন।"

রাত হয়েছে। আজ খাওয়া-দাওয়া মিটে গেছে তাড়াতাড়ি।

যথাসময় পুরোহিত আসিয়া পাষাণ চতুর্দ্দশীর পূজা করাইয়া গিয়াছেন মনোরমাকে দিয়া। এ পূজার ঢাক ঢোল বাজে না। শঙ্খ-ঘণ্টা ও উলুধ্বনিতেই পার্ব্বণ সমাধা হয়। সারাদিন উপবাসের পরে মনোরমা সন্ধ্যা হইতে-না-হইতেই ছেলে মেয়ে বৌকে লইয়া প্রসাদ খাইয়া উঠিয়াছেন।

কর্ত্তা রাত্রে ভাত খান না। প্রচুর গাওয়া ঘৃতে ময়ান দেওয়া আটার রুটি, ক্ষীর ও দুই-একটা মিষ্টি খাইয়া থাকেন।

আজ তাঁহার খাবার শয়নগৃহে ঢাকা পড়িয়াছে। নিয়মের ঘরে দুধেরও তেমন হাঙ্গামা ছিল না। পনের আনা দুধের পায়েস পিঠা হইয়াছে। বাকী দুধ বিনু জাল দিয়া ক্ষীর করিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

ঠাকুমা এখন বচন ঝাড়িতেছেন বিনুর গৃহের সিঁড়িতে বসিয়া। ছেলের ভয়ে সন্ধ্যার পরে হাতীর সিংহাসনে আসন পাড়িতে পারিতেছেন না। অগ্রহায়ণ মাস যায়, উত্তুরে বাতাসে শীতের আমেজ দিতেছে। খে'লা বারান্দায় রাতে মাকে বসিয়া থাকিতে মহেশবাবু নিষেধ করিয়াছেন। সে নিষেধ ঠাকুমা সম্পূর্ণ পালন না করিলেও কিছু কিছু মানিতে হয়। তিনি বিলক্ষণরূপে জানেন তাঁহার পুত্রের অন্তঃপুরে গতিবিধির সময়।

ছোট ঠাকুমা মালা জপিতে বসিয়াছেন তাঁহার ছোট-ভোগের ঘরে। সরস্বতী পাতলা একটা পশমের গায়ের কাপড় গায়ে জড়াইয়া গড়াইতেছে নিয়মের বারান্দার বেঞ্চিতে। সুমন্তকে লইয়া মনোরমা শয্যা লইয়াছেন।

রন্ধনশালায় পাচকরা দাসদাসীদের হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত রান্না করিতেছে। মালীবৌ তাহাদের দুই স্বামী-স্ত্রীর পাওনা এক গামলা প্রসাদ লইয়া গিয়াছে। প্রসাদ আছে প্রচুর, শুধু ভাত হইলেই দাসদাসীরা রাতের আহার মিটাইতে পারে।

কামিনীর মা ঠাকুমার অনতিদূরে প্রদীপের সলতে পাকাইতে নিমগ্ন। নিয়মের দিকে শূদ্রাণী দাসীর সলতে অচল। চলের সলতেও কম নয়। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত হলঘরে তেলের প্রদীপ জ্বলে। তাহার পরে তেলের সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাইতে হয় প্রতি ঘরে। মণ্ডপের ও তুলসীতলায় বেলতলায় প্রদীপ দিতে হয় রায়-রঙ্গিণীদের।

বিনু-তরু ঘরের নিভৃতে আলোর সামনে ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিয়াছে।

ঠাকুমা আক্ষেপ করিতেছেন, "শোন রাজেশ্বরী, আজ আমার পেসাদের জন্মতিথি। চতুর্দ্দশী ছেড়ে যেমনি

পূর্ণিমা লাগল, তখুনি শাঁখ বেজে উঠল সূতিকা-ঘরে। কর্ত্তার কাছে খবর গেল পূর্ণিমায় তাঁর বংশের প্রথম 'পূর্ণচন্দ্র' উদয় হয়েছে।

কর্ত্তার গায়ে ছিল দামী শাল, যে খবর দিয়েছিল তখনই তিনি তাকে শাল খুলে দিলেন, হাতের আংটি খুলে দিলেন। তার পরে ঝি-চাকরদের কি দেওয়া-থোওয়া। টাকার বৃষ্টি করে ফেলেন। কলসী থালা ঘটি উজার করে দিলেন। সেই দণ্ডে লোক ছুটলো বন্দরে বন্দরে। গামলা গামলা রসগোল্লা সন্দেশের ছড়াছড়ি। পাড়ায় পাড়ায় থালা থালা মিষ্টি বিতরণ। খবর পেয়ে ঢোলওয়ালারা ছুটে এসে ঢোল-কাঁসিতে ঘা দিলে। বস্তা বস্তা কাপড় পেল সকলে। আমার সেই পেসাদ।"

ঠাকুমা ক্ষণেক মৌন হইয়া রহিলেন।

কামিনীর মা পায়ের হাঁটুতে সলতেয় পাক দিতে দিতে বলে, "মাঠান, নাতি আপনাগো কি ভাগ্যিমানী, এমতি দিনে জন্ম হয় যার সে হয় লক্ষ্মীমন্ত। রায়-বাড়ীতে জন্মতিথির পুজ্যা-পাল নাই, কিন্তক দাদাবাবুর জন্মদিনে এমতি পুজ্যা হইয়া যায়। পুরুত ঠাকুর আসেন, খাওন-দাওনের ঘটা হয়। পরাণ ভরে সগলে পিঠা পায়েস খায়। এডা কম কতা নাকি?"

ঠাকুমা ক্ষুণ্ণ স্বরে বলেন, "সবই ত হয় রাজেশ্বরী, কিন্তু আমার সোনার চাঁদের মুখে যে এর এতটুকুও যায় না। এই দুঃখে আমার মন অস্থির করে। সে যে জায়গায় রইছে সে-দেশে নাকি এমন খাবার দেব্যজাত মেলে না। কলের জল দিয়ে পেট ভরাতে হয়? তার ঘরে জিনিসের হেলাফেলা, সে আমার কিছু পায় না।

'ছাড়িয়া অযোধ্যাপুরী রাম করে বনবাস,
চোদ্দ বছর পরে হবে ফের তার পরকাশ'।"

কামিনীর মা রাগ করে, "ছিঃ মাঠান, কি কইচো? এই ত পুজ্যার কালে দাবাবু আইসি থাকি গ্যাল এক মাস, ফের ছুটি পাইলেই আসিবে। তুমি যত না ভাবন কর আসলে কলকেতা ত্যামতি নয়। বন্দরের কুণ্ডুরা ত আমাগো জাতভাই, তারা বেবসা করি খায়। মাসের মধ্যে সাড়ে সতেরবার যায় কতকেতায় মাল আনতে। সে গ্যাশের খাজাগজা বাণ্ডিল ভরি ভরি আনে, ছাওয়াল ম্যায়ার লাগি। খাইতে খুব সোন্দর। দাবাবু ত দিবারাত তাই খাইচে। না খাইয়া থাকনের বান্দা রায়বাড়ীর ছাওয়াল লয়। যে গ্যাশের যে দেব্য। তার নেগে দুখু ক্যানে?"

"দুঃখ যে কেন, ঠাকুমা সেটা কামিনীর মাকে বুঝাইতে পারিলেন না। গলা বাড়াইয়া তাকাইলেন ঘরের ভিতরে।

আলোর সামনে বসিয়া তাঁহার আদরের মণিবালা কি করিতেছে। লম্বা সাদা দুইটা কাঠি, কোলের উপরে এক গোছা নীল রংএর পশম। নিকটে তরু, পুলকে যেন কদম কেশর।

আজ তরুর ঘুম নাই চোখে। লোকে যে বলে 'গরজ বড় বালাই'। তরুর গরজ বেশি, মেনীর আগে সে পশমের জামা গায়ে দিয়া সকলকে তাক লাগাইয়া দিতে চায়। মেনীকে সে ভালবাসিলেও রেষারেষি ভীষণ। সেই রেষারেষির ফলে বিনুর অনেক কাজ তরু করিয়া দিয়া বিনুকে বুনিবার সুযোগ দিয়াছে।

ঠাকুমা বলিতেন, "বিনুর আমার কলের হাত। কাজ হাতে লইলে নিমেষে সারা হয়।"

এ নিমেষে শেষ হইবার কাজ নয়। তবু ফাঁকে ফাঁকে বুনিয়া বিনু তরুর জামা অনেকটা করিয়া ফেলিয়াছে। কফিপাতা প্যাটার্ণ হাড়ের কাঠির বুনানি, অল্পেই বাড়িয়া যায়। তরু নীল রং পছন্দ করিয়া সেই বাণ্ডিলটা রাখিয়া অন্য পশমগুলি কোথায় যেন সন্তর্পণে সরাইয়া রাখিয়াছে। যাহাতে লবঙ্গ তাহার সন্ধান না পায়। তরুর উপস্থিত বুদ্ধিতে বিনু কৌতুক বোধ করে। এইটুকু মেয়ের কি বুদ্ধি, যেন ধানী লঙ্কা! ইহাদের মাথায় এতও আসে। রায়বাড়ীর মেয়ে—অ-রায়বাড়ীর মত ভোঁতা মাল নয়। রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তরু ঘুমাইতে গেল। ধীরে ধীরে সারা বাড়ী নিঝুম হইল। ছোট ঠাকুমা লেপ মুড়ি দিয়া নাক ডাকাইতে লাগিলেন।

বিনু তখনও শয্যা লইতে পারিল না। তাহার যে 'দুই নৌকায় পা'। এক নৌকা সামাল দিলে অন্য নৌকা সরিয়া গেলেই সলিলে পতন। প্রসাদকে চিঠি লিখিতে হইবে।

বিনু আলো আড়াল করিয়া জাগিয়া স্বামীকে চিঠি লিখিতে লাগিল। তাহার সহিত জাগিয়া রহিল পূর্ণিমার চন্দ্র। শুধু জাগিয়া রহিল না, বাতায়ন-পথে শুভ্র কিরণ-রেখার অঞ্জলি ঢালিয়া দিতে লাগিল বিনুর সর্ব্বাঙ্গে।

পুণ্য পৌষ মাস। সকলে বলে লক্ষ্মীমাস। এ বাড়ীতে বারমেসে লক্ষ্মীপুজো নাই। পৌষ মাসের চারিটা বৃহস্পতি বারে নতুন ধানের বাইল ও ক্ষীরের নাড়ু দিয়া লক্ষ্মীর ঝাঁপির নিকটে বসিয়া লক্ষ্মীর ব্রতকথা বলিতে হয়। উলু দিয়া ঝাঁপি নামাইতে হয়, তুলিয়া রাখিতে হয়। লক্ষ্মীর ঝাঁপিকে এদেশে লক্ষ্মীর কাঠা বলে।

ছোট একটা বেতের ধামার সারা গায়ে সিঁদুরের ফোঁটা। তাহার ভিতরে থাকে আয়না চিরুণী শাঁখা সিঁদুর শঙ্খ পাতা আলতা, আর সিঁদুরমাখা রাশি রাশি ছোট-বড় কড়ি, সমুদ্রের ঝিনুক। পট্টবস্ত্রের টুকরা দিয়া ধামার মুখ ঢাকা থাকে। ইনিই হইলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। লক্ষ্মীপূজায় চিত্রিত লক্ষ্মীর আসনে আগে লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপন করিয়া ঘটে-পটে পূজা হয়।

বিনুর শয়নগৃহের বারান্দা গোবরজল দিয়া ধুইয়া-মুছিয়া রাখা হইয়াছে। নবীন ধানের দুইটা বাইল আনিয়া রাখিয়াছে।

মনোরমা লক্ষ্মীর কাঠা সেইখানে নামান মাত্র ঠাকুমা উলু দিতে লাগিলেন। তাহার পরে ক্ষীরের নাড়ু দিয়া অনুচ্চস্বরে লক্ষ্মীর কথা বলা হইল। এ ঘটার কিছু নহে। কেহ লক্ষ্মীর কথা শুনিতে আগাইল না। ঠাকুমা পুত্রবধূকে সচেতন করিতে আপনার মনেই আরম্ভ করিলেন, "পৌষ মাসের চারটা বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীর কাঠাকে চারটে কথা শোনাতে হয়, কুকুর পিঠে, তিলের ফুল, বামুন-বামুনী, পুকুর কাটা—এই চারটে কথা। এ মাসে আমাদের পাটাইয়ের কোলের করা আছে। ছয় লোটন দিয়ে কথা শুনে ছয় আনাজের ঝোল দিয়ে একবেলা নিরামিষ খাওয়া। বারমেসে ষষ্ঠী নেই আমাদের, আর সেই জষ্টিমাসে আমষষ্ঠী। পৌষ পার্বণের আগে সকলে জিরিয়ে সাধিয়ে নিক। মাঘ মাসে আবার নানান খানা।"

ঠাকুমার অজস্র বকুনির মধ্যে তরু সগর্বে উপস্থিত হইল। তাহার চোখে-মুখে পুলক যেন উছলিয়া পড়িতেছে। তরুর গায়ে ঘন নীলবর্ণের সদ্য-বোনা হাফ কোট। কোটের হাতে গলায় ঝুলে কাঠগোলাপী পশমে ছোট ছোট ফুটি বসানো। যে কাঠগোলাপ পশমে বোনার সূত্রপাত হইয়াছিল নীলের গায়ে তাহার কত বাহার খুলিয়াছে।

তরু উজ্জ্বল মুখে বলে, "ঠাকুমা, ভাল করে চেয়ে দেখ আমাকে কেমন দেখা যাচ্ছে? বৌদি বুনে দিয়েছে। কত প্যাটার্ণ জানে। চুপ করে ঘোমটা দিয়ে থাকে বলে সকলে পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়ায়, 'বৌ কিছু জানে না, গবা।'"। তরু নিয়মের ঘরের দিকে তাকাইল। যেখানে সরস্বতী কি যেন কাজ করিতেছিল।

ঠাকুমা হাত বাড়াইয়া তরুর জামার ফুটিগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "বাঃ, দিব্যি হয়েছে। আহা, আমার মণিমালার কত যোগ্যতা। আমি কি এমনি ওর মণিমালা নাম থুইচি। তোরে জামাজোড়া গায়ে দিয়ে বেশ দেখা যাচ্ছে তনি্য, তুই নীরদবরণ সেজেছিস?"

মনোরমা লক্ষ্মীর কাঠা যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া মেয়ের গায়ের জামা দেখিয়া পুলকিত হইলেন।

এমন সময় সুমু আসিয়া বিনুকে জড়াইয়া ধরিল, "বইদি, আমাকে দিলে না নতুন জামা, লাল টুকটুকে?"

বিনু তাহাকে আদর করিয়া কানে কানে বলিল, "এবার তোমাকে দেব সুমু। তুমি লক্ষ্মী ছেলে, তোমাকে সুন্দর জামা করে দেব।"

তরু ছুটিয়া গেল সকলকে জামা দেখাইতে। মেনীর জামা এখনও শেষ হয় নাই। মেনীর আগে তরুর অঙ্গে নূতন জামা উঠিয়াছে এ গৌরব যে সীমাহীন।

কামিনীর মা পাথরকুচি গ্রামের মেয়ের অপটুতায় এতদিন ম্লান হইয়াছিল। এখন তাহারও বলার সময় আসিতেছে। বরাবরই সে স্নেহের সহিত, সহানুভূতির সহিত বিনুর দোষ-ত্রুটি ঢাকিয়া রাখিতে ব্যগ্র। সে সামান্য দাসী হইলেও তাহার হৃদয় আছে। এবার বিনুকে আনিতে গিয়া সেই স্নেহ-নদীতে জোয়ার লাগিয়াছে।

বিনুর মা তাহার হাত ধরিয়া মাথার দিব্য দিয়া বলিয়াছে বিনুর তত্ত্বাবধান করিতে। ঠাকুমা তাহাকে একজোড়া ধুতি, পাঁচটি টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন। সেখানে সামান্য দাসী হইয়া সে যে আদর-যত্ন পাইয়া আসিয়াছে, রায়বাড়ীতে সেটা দুর্লভ। কামিনীর মা অকৃতজ্ঞ নয়।

সে ঠাকুমার কথায় সায় দিল, "যা কইলে মাঠান, বৌ তোমাগো দিব্য হইচে। আহ্লাদি ম্যায়া মাসের মধ্যে সাতবার করি কলকেত্যায় থাকিছে, গাঁয়ের কাজ-কামে যুত করিতে পারে নাই। এহন দ্যাখন-শুননে শিখা লইবে সব। হাতে পায়ে কাজ য্যান নাগেনা। এই ধরিছে, এই সারিছে। বড় খর কর্ম্মা ম্যায়া।"

খরকর্ম্মা মেয়ে লজ্জায় সেস্থান হইতে পলায়ন করিল নিজের নিভৃত গৃহে। এখানে আসিয়া এ পর্য্যন্ত বোনা লইয়া একদিনও সে হাতের লেখা লিখিতে পারে নাই। এবার সে সংকল্প করিল সকল কাজের ভিতরে এবার সে খাতার পাতা ভরাইয়া রাখিবে।

খেয়ালী বিনুর সময়ের জ্ঞান কম, তখনই সে বসিয়া গেল হাতের লেখা লিখিতে। সংস্কৃত প্রথম ভাগ খানা সে মাথায় ঠেকাইয়া সযত্নে তুলিয়া রাখিল তাহার পাঠ্য-পুস্তকের সহিত। বাবা দিয়াছেন, বাবার হাতের লেখা জলজল করিতেছে শ্রীমতী বনলতা দেবী।

বাবার হস্তাক্ষর নিরীক্ষণ করিয়া বিনুর দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। একে একে মনে পড়িতে লাগিল তাহার পনের দিনের জীবনযাত্রারার ইতিহাস। ভুলিয়া থাকিতে চাহিলেই কি ভোলা যায়? জীবনের সহিত যাহারা জড়িত হইয়া আছে তাহাদিগকে হৃদয় হইতে কিরূপে মুছিবে বিনু? অদর্শনে তাহারা ক্ষীণপ্রভ তারকার মত হৃদয়াকাশে অস্পষ্ট হইয়া অন্তরাল রচনা করে থাকে, কিন্তু অন্তর্হিত হয় না।

তরু গায়ের জামা দেখাইতে পাড়া প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। এই অসময়ে বিনুকে খাতায় হাতের লেখা লিখিতে দেখিয়া তরুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

তরু প্রশ্ন করিল, "বৌদি, এখনও তুমি নাইতে যাও নি? বাড়ীর সবাই নেয়েছে শুধু আমি বাকী।"

বিনু অম্লান বদনে বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে নাইব বলে বসে রয়েছি। এখন ত কাজকর্ম্ম পাতলা হয়ে গেছে। হবিস্যি ঘরে করবারই বা কি আছে?"

"কি যে বলো বৌদি, তোমাদের এ-বাড়ীতে মেজদি নতুন কাজের পত্তন করে চেল্লাতে থাকে। ক'দিন তুমি আমার জামা বোনাতে একটু ঢিল দিয়েছিলে সেই আক্রোশে দাপিয়ে মরচে। যেমন আমার মেজদি তেমনি হয়েছে তার সঙ্গী সাথীরা। আমার গায়ের জামা দেখে লবঙ্গ পিসীর মুখ চুণ। উনি ছাড়া আর যদি কেউ কিছু করে দেখতে পারে না। উল না পেয়ে রাগে ফুলছে।"

"তুমি কোথায় উল লুকিয়ে রেখেছ তরু, তার থেকে আমাকে লাল টুকটুকে দেখে এক বাণ্ডিল বের করে দাও। আমি আজ দুপুর থেকেই সুমুর জামা সুরু করে দেব।"

তরু খুসী হয়, সুমু ছোট্ট, তাকে ত আমার আগেই করে দিতে হত বৌদি। দেখ, একটা ভাল কাজ করলে হয়, তুমি বসে বসে সুমুর জামা বোন, আমি নেয়ে-ধুয়ে তসরের শাড়ী পরে নিয়মের কাজ করে দেই।"

"তুমি ত আমার অনেক কিছু করে দিচ্ছ তরু, তুমি ছোট, তোমার সাধ্যি নেই ক্ষীর ছানা সন্দেশ করতে। সুমুর হাতকাটা সোয়েটারে বেশি সময় লাগবে না। চল, আমরা নেয়ে আসি। তরু গায়ের কোট খুলিয়া চুল খুলিতে বসিল। এই জামা উপলক্ষে তরুর সহিত বিনুর একটা হৃদ্যতা জন্মিয়াছে। মুখরা তরু বিনুকে বসাইয়া রাখিতে চাহেন, নিয়মের কাজের মধ্য হইতে ছলচুতায় বাহিরে টানিতে চাহে। কিন্তু টানিবে কাহাকে? সে গোলকধাঁধায় একবার প্রবেশ করিলে কাহার সাধ্য পথ খুঁজিয়া বাহির করে।

সম্প্রতি তরু হইয়াছে রায়বাড়ীতে অপাংক্তেয়, অস্পৃশ্য। কুকুর-বিড়ালের শাবক চারটি ইহার কারণ। তাহারা এখন কাঠের ঘরের পৈঠা ডিঙ্গাইয়া আনাচে-কানাচে অঙ্গনে খেলিয়া বেড়ায়। খুঁটিয়া খাইতে শিখিয়াছে। তরু হাট হইতে পিতলের ঘুঙুর আনাইয়া বাঁধিয়া দিয়াছে তাহাদের গলায়। তাহারা নড়িলে-চড়িলে ঝুম ঝুম শব্দে বাজে।

এখন আর কালজিকে বাটি বাটি দুধ খাওয়াইতে হয় না। বাচ্চা কয়েকটা দুধের বাটি ধরিয়া দিলে নিজেরাই চুক চুক করিয়া খায়।

দুধ অপরিয্যাপ্ত, কে তাহার হিসাব রাখে। বাড়ীর গাভীরা কলসী কলসী দুধ দিতেছে, বাজারেব দুধ তিন পয়সা চারি পয়সার উর্দ্ধে দাম ওঠে না। তখনকার সময় লোকে অনায়াসে দুধে স্নান করিতে পারিত।

তরুর পোষ্যরা দুধে স্নান না করিলেও প্রচুর দুধ খাইতে পায়। দুধে-মাছে এক একটা হইয়াছে নধর-কান্তি। কিন্তু 'স্বভাব যায় না মলে', সাহেব বিবির লক্ষ্য রন্ধনশালায়, কেহ আহারে বসিলে সেইখানে উপস্থিত হইয়া লেজ ফুলাইয়া ঘুর ঘুর করিবে, মিউ মিউ ডাকিবে। বাদশা বেগম সাথীদের অনুকরণ করিতে গিয়া অবিরত তাড়া খায় "দূর দূর ছাই ছাই।" তাহাদের আস্তানা আস্তাকুঁড়ে।

চিরকাল ইহাদের বিড়ালরা শুচি আখ্যা পাইয়া নিয়মের ঘর ও ভোগশালা বাদে গোটাবাড়ী বিচরণ করিয়া বেড়াইত। কিন্তু এখন তাহাতে নিষ্ঠাবতী সরস্বতীর মহা আপত্তি। কুকুরের দুধ খাইয়া যে বিড়াল জীবনধারণ করিয়াছে, তাহার বিড়ালত্ব কোথায়! সে কুকুর হইয়া গিয়াছে।

তরুর মহা মুশ্‌কিল, ওই বিছানা ছুঁইয়া দিল, রান্নাঘরে ঢুকিল। নিয়ম-কক্ষের সিঁড়িতে বসিয়া আছে। তারা বাহির মহলে চালান করিয়াছে, দূর দূর ছাই ছাই।"

পোড়ারমুখো কুকুর-বিড়াল শাবক কিছুতেই বাহিরে যাইয়া থাকিতে চায় না। ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই অন্দর-মহলে। সেইজন্য তরু বৌদির প্রতি সদয় হইলেও কাজে সহায়তা করিতে পারে না।

ক্রমশঃ

ভাষাচার্য হরিনাথ দে

(১৮৭৭—১৯১১)

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ভাষাচর্চায় অপূর্ব প্রতিভার জন্য হরিনাথ দে-র নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। এমন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত সব দেশেই দুর্লভ। বিশেষ সেকালের আমাদের দেশে। এ বিষয়ে তাঁর স্থান শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে অনন্য ছিল। পৃথিবীর নানা ভাষায় তাঁর অধিকারের কথা প্রবাদ বাক্যের মতন প্রচলিত হয় তখনকার যুগে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে তিনি পরিগণিত হন। এত বিভিন্ন ভাষায় তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং এত অল্প বয়স থেকে নানা ভাষাগোষ্ঠীর অনুশীলন আরম্ভ করেন যে, তিনি এক আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন এই বিশেষ ক্ষেত্রে।

বিদেশী ও স্বদেশী যে-সব ভাষায় আচার্য হরিনাথ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হ'ল —ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু, ফরাসী, জার্মাণ, রুশ, স্পেনীয়, ইটালিয়ান, মিশরী, চীনা, আরবী, ফারসী, উর্দু, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, মারাঠী, হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতি।

তাছাড়া, বর্মী, সিংহলী এবং সায়ামী (শ্যামদেশীয়) ভাষায় তাঁর প্রাথমিক জ্ঞান ছিল। তিব্বতী ভাষাও তিনি শিখতে আরম্ভ ক'রে খানিকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করবার অবকাশ পান নি। আকস্মিক মৃত্যু অপূর্ণতার ছেদ টেনে দেয় তাঁর জীবনে।

মাত্র ৩৪ বছরের সংক্ষিপ্ত আয়ু! তার মধ্যেই এত ভাষা আয়ত্ত করে জ্ঞান-প্রবীণ হয়েছিলেন।

পাঁচটি ভাষায় হরিনাথ এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ছাত্রজীবনে। ল্যাটিন, গ্রীক, পালি ও সংস্কৃতে দু'বার —বৈদিক সংস্কৃত ও সংস্কৃত সাহিত্য।

তাঁর আর এক স্মরণযোগ্য পরিচয় হ'ল—বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পূর্বরূপ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর তিনি প্রথম এবং দ্বিতীয় গ্রন্থাগারিক। মৃত্যুর পূর্বে, কর্মজীবনের শেষ ৪ বছর তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত থেকে বিদ্বৎ-সমাজে সুপরিচিত ছিলেন।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর, বিশেষ বিদেশী ভাষার অনুশীলনে হরিনাথের প্রতিভার সম্যক্ ধারণা করা যায় সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে। তাঁর স্থান-কালের পটভূমিতে স্থাপন না করলে তাঁর ভাষাকৃতির মর্যাদা সঠিক দেওয়া যাবে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-উত্তর এবং যন্ত্রসভ্যতার যানবাহন ইত্যাদি সংক্রান্ত অগ্রগতির এই দিনে সুদূর দেশ, জাতি তাদের ভাষা, সংস্কৃতি নিয়ে হয়েছে অতিনিকট। বিদেশে যাতায়াত তথা ভাবের ভাষার আদান-প্রদান, পারস্পরিক সংস্পর্শ ও সহযোগিতা এবং ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ঘনিষ্ঠতা অভাবিত বৃদ্ধি পেয়েছে। দূর বিদেশ আজ প্রতিবেশী এবং প্রদেশগুলি আত্মীয়ের মতন অতি পরিচিত হওয়ার ফলে বৈদেশিক ও প্রাদেশিক ভাষা-শিক্ষা আজ বহুল পরিমাণে সহজতর। কিন্তু ৬০।৭০ বছর আগে, হরিনাথের সময়ে, তেমন অবস্থা ছিল না। সে-যুগে তাঁর তুল্য ভাষাচার্য হওয়া অসামান্য মেধার পরিচায়ক।

ভাষা আয়ত্ত করতেন তিনি সম্পূর্ণভাবে। যে-সব ভাষা তিনি চর্চা করতে ইচ্ছুক হতেন, তা শুধু লিখতে বা পড়তে শিখতেন না, সে-ভাষায় কথাবার্তা বলার দিকেও তাঁর লক্ষ্য থাকত এবং যথাসম্ভব তা' অভ্যাস করতেন। বিদেশী ভাষায় তাঁর কথোপকথনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হ'ল।

স্যার আশুতোষ তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর। রাশিয়ার সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক শেরবাট্স্কি (Prof. Tcherbartsky) এখানে আসেন এবং এখানকার কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে সংস্কৃতে আলাপ-আলোচনা করবার ইচ্ছা জানান। স্যার আশুতোষ সেজন্যে সংস্কৃত কলেজের এক খ্যাতনামা অধ্যাপককে এনেছিলেন অধ্যাপক শেরবাট্স্কির সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্যে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই সংস্কৃত অধ্যাপকের কথ্য ভাষায় তেমন অধিকার বা অভ্যাস না থাকায় রুশ অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনা করতে অপারগ হ'লেন। আশুতোষ অবস্থা দেখে বিব্রত হয়ে হরিনাথকে খবর পাঠালেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে, (তিনি তখন সেখানকার লাইব্রেরীয়ান) অবিলম্বে তাঁর ঘরে আসবার জন্যে। হরিনাথ এসে রুশ অধ্যাপকের সঙ্গে সংস্কৃতে অনর্গল কথোপকথন করলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সঙ্গে রুশ ভাষাতেও খানিকক্ষণ কথা বললেন

হরিনাথ। শেরবাট্‌স্কি এতখানি আশা করতে পারেন নি। যেমন বিস্মিত, তেমনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। এবং আশুতোষের মুখরক্ষা ও মানরক্ষা হ'ল—ভারতবর্ষেরও।

ব্রেডেনবার্গ নামে প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূ-তত্ত্বের এক জার্মাণ অধ্যাপক ছিলেন। তিনি হরিনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে হরিনাথ অনর্গল জার্মাণ ভাষায় কথাবার্তা বলতেন, তাঁকে মাঝে মঝে চিঠি লিখতেন জার্মাণ ভাষায়।

তখনকার পুরাতত্ত্ব বিভাগে পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা খিওডোর ব্লক-ও (জার্মাণ) ছিলেন হরিনাথের এক প্রিয় সুহৃদ এবং তাঁর সঙ্গেও তিনি জার্মাণে কথাবার্তা বলতেন।

জার্মাণের মতন ফরাসী ভাষাতেও অনর্গল কথা বলতে এবং যে-কোনও বিষয়ে লিখতে পারতেন হরিনাথ। অগস্ত ফর্তিয়ে নামে একজন ফ্রেঞ্চ্‌-ক্যানাডিয়ান পর্যটক কলিকাতায় আসেন ও হরিনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি তাঁকে এখানকার একটি কলেজে ফরাসী ভাষার অধ্যাপক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হ'তে সাহায্য করেছিলেন। সেই ফর্তিয়ে সাহেবের সঙ্গে হরিনাথ আলাপ-আলোচনা করতেন ফরাসী ভাষায়। প্রসঙ্গত বলা যায়, ফরাসী ভাষায় তাঁর কলমও অবাধে চলত। রবীন্দ্রনাথের 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না মোরে' গানখানি তিনি ফরাসীতে অনুবাদ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের নিষিদ্ধ নাটক 'সিরাজদ্দৌলা' ফরাসীতে অনুবাদ করে ফ্রান্স থেকে প্রকাশ করবার কথাবার্তা বলেছিলেন হরিনাথ। কিন্তু অকালমৃত্যুর জন্যে তা লেখা ও প্রকাশ ঘটে ওঠে নি।

বিস্‌কাল্লা মালাটি নামে একজন (কপ্‌টিক্‌ খ্রীষ্টান) মিশরীকে তিনি কয়েক মাস বাড়ীতে রেখেছিলেন আরবী কথ্য ভাষায় অভ্যাস রাখবার জন্যে। আরবীতে তাঁর সঙ্গে হরিনাথ সাবলীল ভাবে কথাবার্তা বলতে পারতেন।

তেমনি ফারসী (Persian) ভাষাতেও। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসীর অধ্যাপক আগা মহম্মদ কাজিম সিরাজী, আবুমুসা আহ্‌মেদুল হক (ব্যারিষ্টার স্যর আবদুল্লা সুহ্‌রাবর্দির শিক্ষাগুরু) প্রভৃতির সঙ্গে তাঁদের ফারসী ভাষায় অনর্গল কথা বলতেন হরিনাথ।

এমনি আরও দৃষ্টান্ত আছে, অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যে-সব ভাষায় তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন, তাতে লিখতেনও এবং প্রত্যেক ভাষাতেই তাঁর হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ছিল। এমনি ভাবে পাওয়া যায় তাঁর পরিষ্কার ছাঁদের চীনা ভাষায় লেখা, ফুলস্ক্যাপ কাগজে চীনা কালিতে। হরিনাথের আরবী, ফারসী, সংস্কৃত এবং চীনা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় হস্তাক্ষরের সেই সব নিদর্শন তাঁর নানা রচনার সঙ্গে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

জীবনকথা

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট আড়িয়াদহে মাতুলালয়ে হরিনাথের জন্ম হয়। সেখানকার সম্পন্ন গৃহস্থ এবং এক রূপবান্‌ পরিবারের কর্তা উমাচরণ মিত্র ছিলেন তাঁর পিতামহ। আর্নষ্ট হ্যাকুসেন নামে এক জার্মাণ ফার্মের ক্যাশিয়ার উমাচরণ মেয়েদের বাড়ীতে ভাল লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। হরিনাথের জননী তাঁর কনিষ্ঠ-কন্যা।

উমাচরণ জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেন কলকাতার এক ধনী ও অভিজাত পরিবারে। কিন্তু জামাতার পানদোষ ইত্যাদির জন্যে সুখী হ'তে পারেন নি। তাই স্থির করেন যে, কনিষ্ঠা কন্যাকে কোন দরিদ্র, বংশ-পরিচয়হীন, সচ্চরিত্র পাত্রে সম্প্রদান করবেন। সেই উদ্দেশ্যে সন্ধান করে ২৪ পরগণা জেলার বহড়ু গ্রাম-নিবাসী ভূতনাথ দে নামক এক যুবকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলেন তিনি। ভূতনাথকে তাঁর আদর্শ পাত্র মনে হয়েছিল। কারণ এই যুবক শুধু দরিদ্র নন, একেবারে নিঃস্ব, পিতৃমাতৃহীন, গৃহবিহীন। বহড়ু গ্রামের দ্বারকানাথ ভঞ্জ নামে এক পরোপকারী ব্যক্তির আশ্রয়ে বাস করেন। কিন্তু অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র, এম. এ. পর্যন্ত পড়েছেন পরবাসে থেকে।

বিবাহের পর নবপরিণীতাকে নিয়ে ভূতনাথ সেই দ্বারকানাথ ভঞ্জের বাড়ীতেই রইলেন। তারপর আইন পাঠ করে তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লেন তিনি। উমাচরণের উদ্‌যোগে কিছুদিন পরে তিনি ওকালতী করবার জন্যে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে বাস করতে গেলেন।

উমাচরণের কনিষ্ঠা কন্যা এবং ভূতনাথের প্রথম সন্তান হরিনাথ দে। তাঁর বাল্যকাল ও প্রথম শিক্ষাজীবন রায়পুরেই অতিবাহিত হয়েছিল।

তাঁর জননী সেকালের হিসাবে শিক্ষিতা ছিলেন, বলা যায়। পিত্রালয়ে (বিবাহের পূর্বে) বাস করবার সময় তিনি পিতাকে প্রতিদিন তাঁর কাজ থেকে ফেরবার পর সন্ধ্যায় টেলিমেকাস, বামাবোধিনী পত্রিকা (প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত) ও অন্যান্য সাহিত্য-

পত্র ও পুস্তকাদি পাঠ করে শোনাতেন। এইভাবে তাঁর নিজেরও বিদ্যাচর্চা হ'ত। তিনি বিশেষ বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী ছিলেন। হরিনাথের পিতা একদিকে যেমন সন্তান-বৎসল, তেমনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী এবং কৃতী-পুরুষ।

রায়পুরে অবস্থান কালে ভূতনাথ আইনজীবীরূপে প্রভূত সাফল্য ও অর্থোপার্জন করেন। তিনি ছিলেন তখনকার রায়পুরের তিন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী আইনজ্ঞের অন্যতম। অন্য দু'জন হলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার এবং তারাদাস বন্দোপাধ্যায় (কবি প্রিয়ংবদা দেবীর স্বামী, অল্প বয়সে পরলোকগত)। স্বামী বিবেকানন্দের পিতা এ্যাডভোকেট বিশ্বনাথ দত্তও সে-সময় বছর দেড়েক সেখানে আইন ব্যবসায়ের জন্যে বাস করেছিলেন।

হরিনাথের পিতা প্রচুর উপার্জন করেন এবং পরে সরকারী উকীল হন। রায় বাহাদুর খেতাবও লাভ করেন তিনি। রায় বাহাদুর ভূতনাথ দে রোড তাঁর নাম সেখানে স্মরণীয় করে রেখেছে।

তিনি সেখানে বিরাট্ গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু তার ছাদে একটি পর্ণ কুটির তৈরী করান, প্রথম জীবনের দারিদ্র্য আজীবন মনে রাখবার জন্যে।

এক বছর বয়স থেকে হরিনাথের রায়পুরে বাস। যে হরিনাথ উত্তরকালে এত বড় প্রতিভাধর ও বিদ্বান্ হয়েছিলেন, আশ্চর্যের বিষয় যে তিনি বাল্যে লেখাপড়ায় যেমন অমনোযোগী তেমনি অকৃতী ছিলেন। বিদ্যাভ্যাসে আদৌ ইচ্ছা না থাকায় প্রাইমারী স্কুলজীবনে চূড়ান্ত ব্যর্থ হন তিনি। ক্লাসে শাস্তিস্বরূপ বেঞ্চে দাঁড়ান, স্কুল থেকে পলায়ন, সারাদিন কোম্পানীর বাগানে ঘুরে বেড়িয়ে বাড়ী ফেরা—এই সব ছিল তাঁর সে-সময় নিত্য-কর্ম।

৮ বছর বয়স পর্যন্ত এমনি অপদার্থতার বদনাম তাঁর থাকে। তারপর তাঁর বিদ্যাশিক্ষার আমূল দিক্-পরিবর্তন ঘটে নাটকীয়ভাবে।

এই সময় একদিন সহপাঠী সঙ্গী নাটুর বাড়ীতে তার পিতা হরিনাথকে দেখতে পেয়ে খুবই অপমান করে। তাঁর সঙ্গে তাকে মেলামেশা করতে নিষেধ করে দেন। হরিনাথের সঙ্গদোষে তাঁর ছেলে নাটুও অমনি খারাপ হ'তে পারে।

এই তাড়নার ফলে হরিনাথের মনে দেখা দেয় ঘোর প্রতিক্রিয়া। সেদিন বাড়ীতে ফিরে পিতাকে বলেন, 'আমি এবার থেকে ভাল করে পড়ব, আমায় বই-টই সব কিনে দিন।'

ভূতনাথ পুত্রের কথা শুনে সানন্দে রায়পুরে এক পার্শীর বড় বইয়ের দোকানে ব্যবস্থা করে দেন—হরিনাথকে যেন মাসে ১০০ টাকার বই ইত্যাদি যা-কিছু প্রয়োজন দেওয়া হয়, তিনি মাসিক বিল চুকিয়ে দেবেন।

তখন থেকে হরিনাথ সেই দোকানে নিয়মিত নানা ধরনের বই দেখতেন, পড়তেন এবং সেখান থেকে বাড়ীতে নিয়ে যেতেন ইচ্ছামতন। সেই সব বই যথাসাধ্য অধ্যয়ন করতেন, বুঝতে না পারলে মা-বাবার কাছে জানতে চাইতেন, 'ইস্‌কো মতলব কেয়া? অর্থাৎ এর মানে কি?—হিন্দীতেই কথাবার্তা তখন অনেক সময় বলতেন। এইভাবে জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞান সঞ্চয় অদম্য ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে সেই বালক বয়স থেকে এবং জ্ঞানসাধনার মহৎ জীবনের সূত্রপাত হয়। সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় তাঁর জীবনের গতি-প্রকৃতি।

পিতা রায়পুরের মিশনারী সাহেবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন। সেই সূত্রে হরিনাথও মিশনারীদের সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করেন এবং তাদের সাহায্যে বাইবেলের tracts হিন্দীতে অনুবাদ করতে থাকেন অল্প বয়সেই।

তারপর থেকে তাঁর আন্তরিক ভাবে লেখাপড়া করার সুফল স্কুল জীবনেও প্রত্যক্ষ হ'ল। তিনি প্রাথমিক ছাত্রদের বৃত্তি পরীক্ষায় সফল হয়ে মাসিক ৬ টাকা নাথ-গাঁও স্কলারশিপ লাভ করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল অতিরিক্ত পড়াশোনার জন্যে। এমন কি, অত্যধিক অসুস্থতার জন্যে তাঁকে স্কুল ছাড়িয়ে নিতে হ'ল। রায়পুরে শরীর সারবার কোন লক্ষণ আর দেখা গেল না হরিনাথের।

তখন তাঁকে ভূতনাথ কলকাতায় রেখে পড়াবার ব্যবস্থা করলেন মিশনারীদের সহায়তায়। রায়পুরের পাদরিদের কলকাতায় ম্যাগ্‌রা নামে এক বিশেষ আলাপী ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর রিপন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে হরিনাথ ও তাঁর কনিষ্ঠ ভাই ভবনাথের থাকবার ব্যবস্থা হ'ল, লেখাপড়ার জন্যে। সেখানে তাঁরা এক বছর বাস করেন। এই সময় সারাদিন সাহেব ও মিশনারীদের সহবাসে হরিনাথের রীতিমত অধিকার জন্মায় কথ্য ইংরেজীতে।

ম্যাগ্‌রা সাহেবের বাড়ীতে থাকতেই তাঁর ও মিশনারীদের সাহায্যে সেণ্ট জেভিয়ার্সের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হরিনাথের যোগাযোগ ঘটে। এবং ১০ বছর বয়সে তিনি ভর্তি হন সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। এখানে প্রবেশ করবার পর থেকেই তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। নতুন

ভাষা-শিক্ষায় তাঁর আগ্রহ ও দক্ষতা প্রকাশ পেতে থাকে এবং তখন থেকেই দেখা যায় তাঁর ল্যাটিনে ঝোঁক।

ফাদাররা তাঁর শেখবার এমন ইচ্ছা ও যোগ্যতা স্কুলপাঠ্য বিষয়বস্তুর বাইরে নানা সংশ্লিষ্ট বিষয় শোনাতেন, শেখাতেন। তাঁদের সংসর্গ দিনের অনেকখানি সময় লাভ করতেন তিনি। কারণ সেণ্ট জেভিয়ার্সে তিনি বরাবর বোর্ডার ছিলেন, এনট্রান্স পরীক্ষা পর্যন্ত।

শুধু মিশনারীদের সঙ্গে নয়, তাঁদের এবং ম্যাগরা সাহেবের বাড়ীর যোগাযোগে ফিরিঙ্গী সমাজে হরিনাথের ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা আরম্ভ হয়েছিল। তার ফলে সু এবং কু দুই-ই কিছু বেশী পরিমাণে লাভ হয় তাঁর। সেই পরিবেশে একদিকে যেমন ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষা-শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার তাঁর উন্নতি হ'ল, অন্যদিকে তেমনি গুরুতর দোষ সংক্রামিত হল তাঁর চরিত্রে। তিনি সেই স্কুলজীবনেই শুধু সিগারেট নয়, সুরাপান পর্যন্ত ধরলেন! পিতামাতার সঙ্গে বাড়ীতে থাকলে নিশ্চয় এমন ঘটতে পারত না।

সেণ্ট জেভিয়ার্স বোর্ডিং-এ থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার মাস আগে এক দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত হলেন হরিনাথ। সিগারেট খেতে খেতে পড়ার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল. একদিন সেইভাবে পড়ছিলেন। সিগারেটের ছাই ফেলছিলেন বইয়ের পাশে-রাখা একটি পাত্রে। লক্ষ্য করেন নি, এক দুষ্ট বোর্ডার নষ্টামি করে সেই ছাইদানিতে বারুদ রেখে দিয়েছিল। হরিনাথের জলন্ত সিগারেটের অবশেষ বারুদের ওপর পড়তেই বিস্ফোরণ হয় এবং তাঁর চোখ পুড়ে যায়। মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত হন তিনি চোখের চিকিৎসার জন্যে। সেখানে প্রায় ৩ মাস চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় থাকেন, নিজে আর সে সময় পড়তে পারেন নি। তাঁর এক জ্ঞাতি ভাই তাঁর কেবিনে গিয়ে পরীক্ষার পাঠ্য-বিষয় তাঁকে পড়ে শোনাতেন। এইভাবে প্রস্তুত হয়ে এনট্রান্স পরীক্ষা দিলেন। স্কলারশিপ পেলেন না বটে, কিন্তু ল্যাটিন ও ইংরেজীতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন হরিনাথ। তখন তাঁর বয়স ১৪ বছর ১০ মাস। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ।

তারপর সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ে এফ. এ. পাশ করলেন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। এবার চতুর্দশ স্থান অধিকার করলেন এবং ল্যাটিন ও ইংরেজীতে সর্বোচ্চ স্থান। সেজন্যে Language-এ ডাফ্ স্কলারশিপ পেলেন।

দু' বছর পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষা দিলেন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। Double Honours পেলেন ল্যাটিন ও ইংরেজীতে। ল্যাটিনে প্রথম ও ইংরেজীতে চতুর্থ হ'লেন। ইংরেজীতেও আরও উচ্চ স্থান অধিকার করতেন কিন্তু দর্শনে ফেল করায়, এত মেধাবী ছাত্রের কথা বিশেষ বিবেচনা করে ইংরেজী থেকে ১৫ নম্বর নিয়ে পাশ করিয়ে দেওয়া হয় দর্শনে। তবু ল্যাটিনের সঙ্গে ইংরেজীতেও ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছিলেন।

হরিনাথ আই. সি. এস. পড়েন। পিতার এই ইচ্ছা ছিল। সেজন্যে তিনি আই. সি. এস. পড়তে ইংলণ্ড যাওয়া স্থির করলেন। সেকালে বি. এ. দেবার ছ' মাস পরে এম. এ. দেওয়া যেত। তাই হরিনাথ বললেন—তা হ'লে এম. এ.-টা দিয়ে যাই।

ল্যাটিনে এম. এ. দিলেন বি. এ.-র ছ মাস পরে। এম. এ.-তে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হলেন।

বিলাত যান ১৮৯৭। সেখানে কলেজে প্রবেশ করবার আগে যে অবকাশ পেয়েছিলেন, তাইতে আর একবার এম. এ. দিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সে ব্যবস্থা হ'ল, এখান থেকে প্রশ্নপত্র গেল বিলাতে। এবার পরীক্ষায় তাঁর বিষয় ছিল গ্রীক এবং তাতে তিনি ফার্ষ্ট ক্লাস পেলেন।

কেম্ব্রিজে ছাত্রজীবন আরম্ভ হ'ল Classical & Modern Language-এ ট্রাইপস্ নিয়ে।

বিলাতে যাবার পরে তাঁর গুণপনার আর একটি স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্যে ভারত সরকার তাঁকে দু'বছর মাসিক ২৫০ টাকা ষ্টেট স্কলারশিপ দেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে।

পিতাকে এ সংবাদ পত্রে জানিয়ে হরিনাথ লেখেন যে, স্কলারশিপ পেয়েছি। আর কেন টাকা পাঠাবেন।

ভূতনাথ উত্তরে সস্নেহে জানালেন—না, টাকা যেমন পাঠাচ্ছি পাঠাব। এ থাক, বই কিনো।

সে-সব নিজের কথা উল্লেখ করে হরিনাথ পরবর্তীকালে হেসে বলতেন, বিলেতে রাজার হালে থেকেছি।

কিন্তু সেই সুদূর বিদেশের নানা প্রলোভনের মধ্যে পড়ে এবং কুসঙ্গে মিশে পিতার এই স্নেহের দানের অসদ্-ব্যবহারও কিছু করলেন তিনি। উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়লেন, সেণ্ট জেভিয়ার্স জীবনের সুরাপানের প্রবৃত্তি অবাধ হ'ল। পরীক্ষার প্রস্তুতি সেই সব কারণে উপযুক্ত হয় নি। তবু Classical Language-এ পেলেন ফার্ষ্ট ক্লাস। Modern Language-এ সেকেণ্ড ক্লাস পান বটে, কিন্তু তার একটু ইতিহাস আছে। এই পরীক্ষার আগের রাত্রে বন্ধুদের সঙ্গে

এক ডিনার পার্টিতে যোগ দেন এবং অত্যধিক পানের ফলে সেখানেই থেকে যান ফিরতে অসমর্থ হয়ে। অধ্যাপকদের প্রিয় ছাত্র বলে এবং তাঁদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি তাঁর ডিনার পার্টিতে যাবার কথা বোধ হয় জেনে, পরীক্ষার সকালে তাঁর ফ্ল্যাটে খোঁজ নিতে আসেন। সেখানে না পেয়ে সন্ধান করে যথাস্থান থেকে, তাঁকে এক রকম ধরাধরি করে উপস্থিত করেন পরীক্ষা হলে। এই ভাবে পরীক্ষা দিয়েও সেই কঠিন বিষয়ে সেকেণ্ড ক্লাস পাওয়া হরিনাথের পক্ষেই সম্ভব।

কেম্ব্রিজের পাঠক্রমের বাইরেও তাঁর বিদ্যাচর্চা ছিল। ফ্রান্সের সোরবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী এবং জার্মাণীর মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মাণ ভাষাচর্চায় ডিপ্লোমা পান তিনি। এই দু' জায়গায় পাঠের ফলে কন্টিনেণ্টাল অভিজ্ঞতাও তাঁর লাভ হয়।

তা ছাড়া স্কীট মেমোরিয়াল পুরস্কার পান তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বে। এই পরীক্ষার মান অতি উচ্চ। সব বছর এ পুরস্কার ছাত্ররা লাভ করতে পারতেন না।

আরও একটি পুরস্কার পেয়েছিলেন ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় কবিতা রচনা করে। এখানে পরীক্ষার গৃহে কবিতার বিষয়বস্তু জানান হ'ত এবং improptu ওই দুই ভাষায় কবিতা লিখতে হ'ত। এ পরীক্ষাও বিশেষ কঠিন ছিল।

কিন্তু আই. সি. এস্ পরীক্ষায় হরিনাথ ব্যর্থ হন দু' বারই। অঙ্কে স্থান পেতেন নীচের দিকে, সেজন্যে অন্য বিষয়ে চতুর্থ, পঞ্চম হওয়া সত্ত্বেও ফেল করতেন। আর, ভারত সরকারের যে ক'টি পদ খালি থাকত বা প্রয়োজন হ'ত, সেই হিসাবেও পাশের সংখ্যা নির্ধারিত হ'ত।

যা হোক, অঙ্কে কাঁচা না হ'লে হরিনাথ যে উচ্চস্থান অধিকার করতেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই দু'-বারই তাঁর কাছে আই. সি. এস পরীক্ষার নানা বিষয়ে পাঠ নিয়েছেন, এমন ছাত্রও আই সি এস হয়েছেন জানা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে যে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণধন অঙ্কে পারদর্শী হয়েছিলেন এবং বি এ-তে অঙ্কে ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স পান। প্রাণনাথের আকস্মিক মৃত্যু হয়েছিল কলেরায়।......

এদিকে হরিনাথের পিতা আই, সি. এস-এ ব্যর্থতার খবর পেয়ে চিন্তিত হ'লেন। তিনি তখন রায় বাহাদুর এবং সরকারী আইনজ্ঞ হওয়ায় অনেক বড় রাজকর্মচারীর সঙ্গে তাঁর খাতিরের সম্পর্ক ছিল। পুত্রের জন্যে তদ্বির করতে লাগলেন তিনি। তাঁর বিশেষ পরিচিত, অবসর-প্রাপ্ত আই. সি. এস. রীচি সাহেব তখন বিলাতে। ভূতনাথের অনুরোধে তিনি এ-বিষয়ে সচেষ্ট হন এবং সেক্রেটারী অব ষ্টেটকে হরিনাথের অনন্য ছাত্রজীবনের পরিচয় জানাবার পর হরিনাথ একেবারে ইম্পিরিয়াল এডুকেশনাল সার্ভিসে নিযুক্ত হ'লেন।

তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি আই. ই. এস-এ প্রবেশ করলেন এবং তখন তিনি ২৩ বছরের যুবক। বিশেষ জগদীশ বসু, পি. কে. রায়, পার্সিভ্যাল প্রভৃতির তুল্য ব্যক্তি তখন প্রভিন্সিয়াল এডুকেশনাল সার্ভিসে ছিলেন। সেজন্যে হরিনাথের নিয়োগের সংবাদে ভারতবর্ষে তখন একটা সাড়া পড়ে যায়।

তারপর হরিনাথ স্বদেশে ফিরে আসেন, জাহাজে বহু টাকার বই সঙ্গে নিয়ে। এই বই কেনার অভ্যাস তাঁর শেষ পর্যন্ত ছিল। মাসে শ' দুই টাকার বিভিন্ন ভাষার বই ইউরোপ থেকে তিনি নিয়মিত আনাতেন।

এখানে এসে প্রথম পদ পেলেন, (১৯০১ খ্রীঃ) ঢাকা কলেজে, ইংরেজী অধ্যাপকের। পি. কে. রায় তখন সেখানে প্রিন্সিপ্যাল। হরিনাথ ঢাকায় থাকবার সময় লর্ড কার্জন তাঁর গুণমুগ্ধ হন। সে-সময় কার্জনের ঢাকায় আগমন উপলক্ষ্যে একটি যে মুদ্রিত পুস্তক উপহার দেওয়া হয়, তাতে ছিল ইবনে বতুতার পার্শী ভাষায় লেখা ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তের ঢাকার অংশটির হরিনাথ-কৃত ইংরেজী অনুবাদ এবং তাঁরই রচিত ল্যাটিনে কার্জনের উদ্দেশে উৎসর্গ পত্র।

হরিনাথ অসুস্থতার জন্যে সে অভিনন্দন-সভায় উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু কার্জন লেখা দু'টি পড়ে এত মুগ্ধ হন যে, তার সঙ্গে আলাপ করতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। উদ্যোক্তারা হরিনাথকে বাড়ী থেকে নিয়ে গিয়ে কার্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। লর্ড কার্জন সেদিন তাঁর ছাত্রজীবনের কৃতিত্বপূর্ণ ইতিবৃত্ত, কেম্ব্রিজের পাঠজীবন সব জানতে পারেন এবং পরে বরাবর তার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

ঢাকা কলেজে থাকবার সময়, ১৯০৩ খ্রীঃ, তাঁর পিতার মৃত্যু হয় রায়পুরে। তার এক বছর পরে ১৯০৪ খ্রীঃ হরিনাথ কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলকাতায় থাকতে ১৯০৬ খ্রীঃ আবার এম. এ. দিলেন, পালি ভাষায়। ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হলেন। পরীক্ষকদের মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য অধ্যাপক রীস্ ডেভিস। একটি প্রশ্নের উত্তরে হরিনাথ পালিতে অনুবাদ করেন পদ্যে। তা দেখে পণ্ডিত রীস্ ডেভিস বলেছিলেন—এমন আগে কখনও দেখি নি।

তারপর হরিনাথ হুগলী মহসীন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হয়ে সেখানে চলে যান। সেখানে ছ'মাস থাকবার পর তাঁর দ্বিতীয়বার বিলাত-যাত্রার সুযোগ আসে।

বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব তখন ইউরোপ ভ্রমণের উদ্‌যোগ করছিলেন। ইউরোপের কয়েকটি ভাষা-জানা লোকের প্রয়োজন হ'ল তাঁর। হরিনাথকে সে-বিষয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি বিবেচনা করে গভর্ণমেণ্টকে বলে তাঁকে নিয়ে যাত্রা করলেন।

বিজয়চাঁদের সঙ্গে এই ক'মাসের ইউরোপ ভ্রমণের মধ্যে তাঁর জীবনে আর একটি সুযোগ এল এবং সেই সুযোগ গ্রহণ করতে সচেষ্টও হ'লেন তিনি। তা হ'ল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকের পদ।

তার বছর চারেক আগে লর্ড কার্জন রাজধানী কলকাতায় ভারত সরকারের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লাইব্রেরী তখন ছিল ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের ধারে, মেটকাফ্ হলে।

কার্জনের ব্যবস্থাপনায় দু'টি লাইব্রেরীর যুক্তকরণের ফলে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ১৯০৩ খ্রী: গঠিত হয়। ভারত সরকারে হোম ডিপার্টমেণ্ট লাইব্রেরী এবং বিগত যুগের বিখ্যাত ক্যালকাটা লাইব্রেরী (যার স্থাপনায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম এবং গ্রন্থাগারিকরূপে প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম স্মরণীয়)। মেট্‌কাফ্ হলে ক্যালকাটা লাইব্রেরীর তখন নিতান্ত ভগ্নদশা ও শোচনীয় অবস্থা দেখে লর্ড কার্জন তার সঙ্গে সম্মিলিত করলেন হোম ডিপার্টমেণ্টের লাইব্রেরীকে। ক্যালকাটা লাইব্রেরীর ৬ হাজার এবং হোম ডিপার্টমেণ্ট লাইব্রেরীর ৯৪ হাজার—এই এক লক্ষ বই নিয়ে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী লর্ড কার্জনের উদ্‌যোগে প্রবর্তিত হ'ল। তিনিই ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে ম্যাক্‌ফার্লেন সাহেবকে নির্বাচন করে ইম্পিরিয়াল লাবব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।

হরিনাথ যখন বর্ধমান মহারাজার সঙ্গে ইউরোপ-যাত্রা করেছেন, তখন ম্যাক্‌ফার্লেনের হঠাৎ মৃত্যুতে পদটি খালি হয়। হরিনাথ গ্রন্থাধ্যক্ষের এই কাজ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়ে কিছু তদ্বির করেছিলেন লণ্ডনে থাকবার সময়।

দেশে ফেরবার পর, ১৯০৭ খ্রী: তাঁর নাম গেজেট-ভুক্ত হয় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক রূপে। তাঁর এই নিয়োগের খবর পেয়ে লর্ড কার্জন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বিলাত থেকে একটি ব্যক্তিগত পত্রে তাঁকে লেখেন—Right man in the right place. ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী কার্জনের প্রাণের বস্তু ছিল। কিন্তু এই বহু-আকাঙ্ক্ষিত পদটি গ্রহণ করাই হরিনাথের জীবনের কাল হয়েছিল। সে অধ্যায়ের বর্ণনা করবার আগে তাঁর শেষ দু'বার এম. এ. দেবার প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করে নেওয়া হবে।

গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হবার এক বছর পরে অর্থাৎ ১৯০৮ খ্রী: তিনি দু'বার এম. এ. দিলেন। একই বছরে এবং সংস্কৃতের দু'টি গ্রুপে—সাহিত্য ও বৈদিক সংস্কৃত। দু'টিতেই ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হ'লেন।

বেদের গ্রুপে যে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হ'লেন, তা হওয়া অত্যন্ত কঠিন। বিশেষ তিনি যখন একমাত্র সংস্কৃত চর্চা নিয়েই ছিলেন না। বৈদিক সংস্কৃতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন ফার্স্ট ক্লাস কদাচিৎ পেতেন। আর তিনি সংস্কৃতে দু'টি গ্রুপে একই বছরে পর পর পরীক্ষা দিয়েও এমন ফল দেখালেন। বৈদিক বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন পরবর্তীকালে বিখ্যাত কবিরাজ গণনাথ সেন।

পরীক্ষার প্রসঙ্গে হরিনাথের আর কয়েকটি কৃতিত্বের কথা বলা হয় নি। সে-সবও উল্লেখ করবার যোগ্য, যদিও বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা-সংক্রান্ত নয়—ইম্পিরিয়াল এডুকেশনাল সার্ভিসের ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা। সে-সব পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে মোট ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু তাও বড় কথা নয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, সে-সমস্ত পরীক্ষার উত্তর তিনি ইংরেজীতে না লিখে—যা তিনি অনায়াসে পারতেন—বিভিন্ন ভাষায় দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর আগে বা পরে আর কেউ এমন করেন নি। যথা—(প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার সময়) এডুকেশনাল সার্ভিসের ডিগ্রী অব্ অনার্স পরীক্ষা দেন সংস্কৃতে এবং ৫ হাজার টাকা পুরস্কার পান। আগে higher proficiency-র জন্যে পেয়েছিলেন ২ হাজার টাকা। তার এক বছর পরে আরবী ভাষায় ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিয়ে ৫ হাজার ও ২ হাজার টাকা পুরস্কার লাভ করেন। শেষে আর একটি ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দেন উড়িয়া ভাষায় এবং ১ হাজার টাকা পুরস্কার পান। এ সবই প্রায় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান হবার আগেকার কথা। নানা ভাষাচর্চা করতে যে তিনি কত ভালবাসতেন এবং তাদের ওপর তাঁর কতখানি দখল ছিল—এসবও তাঁর উজ্জ্বল নিদর্শন।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকরূপে চারটি বছর (১৯০৭-১৯১১ খ্রী:) তাঁর জ্ঞানসাধক স্বল্পায়ু জীবনের

শেষ অধ্যায়। তাঁর বহিরঙ্গ জীবনে তা যত গৌরবময় হোক, তাঁর ব্যক্তিজীবনের পক্ষে করুণতম এবং বিষাদাচ্ছন্ন পরিচ্ছেদ, বলা যায়। কারণ এই পদ গ্রহণের জন্যেই তাঁর জীবনে এমন চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে, যা ছিল তাঁর ধারণার অতীত।

৩০ বছর বয়সের যুবক হরিনাথ যখন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই জ্ঞাননিকেতনের ভারপ্রাপ্ত হ'লেন, তিনি তখন শুধু এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটির সাংস্কৃতিক দিকটির কথা চিন্তা করে পরম পরিতুষ্ট হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, মহৎ আশা তৃপ্ত করে জ্ঞান-সাধনার জগতে বিচরণ করবেন অব্যাহত ভাবে। বাস্তব জগতের অতি নীচ ও নিষ্ঠুর অস্তিত্বের কথা ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না। এত বড় প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের দিক এবং তার পরিচালনার বাস্তব দায়িত্বের বিষয় সম্যক্ চিন্তা করেন নি তিনি। যে লোকদের নিয়ে এই সংস্থা তাঁর চালনা করতে হয়, তাদের সম্পর্কে যথোচিত অবহিত ছিলেন না। অনভিজ্ঞই ছিলেন মানুষের চরিত্রে, বিশেষ সাধারণ বাঙ্গালী চরিত্রে। তিনি কল্পনাও করতে পারতেন না—কোন কোন মানুষের সামনে ও আড়ালে কতখানি বিপরীত দু'টি রূপ থাকতে পারে। নিয়মিত বেতনের বিনিময়ে তারা কতদূর অনিয়মিত ও কর্মবিমুখ হ'তে পারে। যাদের কষ্ট-দুর্গতিতে বিচলিত হয়ে অনুগ্রহ করে তিনি অন্নসংস্থান করে দিয়েছেন তারা কেমন নির্বিবেকে অন্নদাতার বিরুদ্ধে হীন, অন্যায় চক্রান্তে যোগ দিতে পারে। দুঃখীকে দয়া দেখিয়ে, মানুষকে বিশ্বাস করে, কর্মহীন বিপন্নকে সরকারী চাকুরি করে দিয়ে এবং পরদুঃখকাতর হয়ে হরিনাথ যে অপরাধ করেছিলেন, তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ চূড়ান্ত মূল্য দিতে হয়েছিল তাঁকে।

ঘটনা এই যে, উক্ত উচ্চ পদলাভে তিনি যেমন বহু শিক্ষিত ব্যক্তির শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন, তেমনি তাঁর সৌভাগ্যে বাঙ্গালীসুলভ ঈর্ষায় জর্জরিত হয় কোন কোন ব্যক্তি। এবং সেই জ্বালায় বিদ্ধ হয়ে অকারণ তাঁর ক্ষতিসাধন করতে চায়।

সংসারে কারুর মঙ্গলের চেয়ে ক্ষতি করা অনেক সহজ হ'লেও, হরিনাথের ক্ষতি তারা হাজার ইচ্ছা করলেও করতে পারত না, দেশের ও দশের চোখে এমন সম্মানের আসনে তিনি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁকে বাঘের শত্রুতার মুখে পড়তে হয়েছিল। রয়াল বেঙ্গল টাইগার স্যর আশুতোষের। তাঁর শত্রুতার ফলে হরিনাথের সর্বনাশ সমুৎপন্ন হয়। আগে থেকে যারা অসূয়া-পরবশ হয়ে হরিনাথের অমঙ্গল ঘটাতে সচেষ্ট ছিল, তারা তা চরিতার্থ করে আশুতোষকে আশ্রয় ক'রে।

যে হরিনাথ কলেজের ছাত্রজীবন থেকে আশুতোষের বিশেষ প্রিয়পাত্র, আশুতোষ যাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন, ঘটনাচক্রে তাঁদের মধ্যে দুস্তর মনান্তর ঘটল। সেই অতিশয় বেদনাদায়ক ঘটনাবলীর মূল সূত্র অনুসরণ করে কার্যকারণের এই রকম পারম্পর্য জানা যায়:

হরিনাথ যখন গ্রন্থাগারিকের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষ তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়কেই তাঁর কর্মকেন্দ্র করে দেশে শিক্ষাবিস্তারের মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। জনসাধারণের মধ্যে তাঁর এই শিক্ষাবিস্তারের প্রকল্প বিদেশী শাসকশ্রেণী সুনজরে দেখেন নি, এবং শিক্ষা-প্রসারের অগ্রগতি রোধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টিতও ছিলেন। সিনেট ও সিণ্ডিকেটে প্রভু-স্বার্থের প্রবল বাধা অতিক্রম করে, অনেক সময় সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে আশুতোষকে শিক্ষা-সম্পর্কিত প্রস্তাবাদি অনুমোদন করিয়ে নিতে হ'ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ামক সভা-সমিতিতে সেজন্যে তিনি চাইতেন নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব। শুধু বিরোধিতা নয়, কেউ সমর্থন না করলেও তিনি তা সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর স্বভাবেও যোদ্ধা-সুলভ এই মনোভাব ছিল।

হরিনাথ সিনেট ও সিণ্ডিকেটের এক বিশিষ্ট সদস্য। শিক্ষাক্ষেত্রে তখন তাঁর যে আসন, তাতে কোন প্রস্তাবে তাঁর সমর্থন করা-না-করার গুরুত্ব অনেকখানি। তিনি অনেক সময়েই আশুতোষের পক্ষে সমর্থন জানাতেন। কিন্তু প্রত্যেক মিটিংএ সরকারী দলের বিরুদ্ধে আশুতোষের পক্ষে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি Covenanted Service-এর সরকারী চাকুরে। সরকারের মুখপাত্রদের বিপক্ষে আশুতোষের জোটের মধ্যে তিনি কি করে সর্বদা যান? কিন্তু আশুতোষ তাঁর অসুবিধার কথা বুঝতে চাইতেন না। তা ছাড়া, এমন কোন কোন প্রসঙ্গ আসত, যা ঠিক আদর্শগত নয়, দলগত ব্যাপার। হরিনাথের স্বাধীন-চেতা স্বভাব প্রত্যেক বিষয়ে আশুতোষের অন্ধভাবে অনুসরণ করতে পারত না। হরিনাথের একান্ত অনুগত না হওয়া, কর্তৃত্বপরায়ণ আশুতোষের ব্যক্তিত্বের কাছে অত্যন্ত বিরক্তির কারণ হ'ল।

তাঁর বিরক্তির দ্বিতীয় কারণ—হরিনাথের সম্মাননায় কাতর কয়েকটি নিন্দুকের অবিশ্রান্ত মন্ত্রণা। হরিনাথের

প্রতি হিংসার্ত এবং আশুতোষের স্তাবক কয়েকজন হীনমনা লোক হরিনাথ সম্পর্কে আশুতোষের অসন্তুষ্ট মতিগতির সুযোগ বুঝে তাঁর কাছে হরিনাথের কুৎসা প্রচার করত এবং আশুতোষ সেসব কথায় কর্ণপাত ও বিশ্বাস করতেন।

শুনলে ঘৃণার উদ্রেক হবে, হরিনাথের চরিত্র নিয়ে এমন ইতর অপবাদ রটনা করত তারা। তিনি থিয়েটার দেখতে ভালবাসতেন এবং কখনও কখনও গিরীশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতির নাটক দেখতে যেতেন। অমনি অপযশ শোনা গেল যে, অমুক বিখ্যাত অভিনেত্রী তাঁর রক্ষিতা!

তাঁর সুরাপানের অভ্যাসের কথা সে-সময় ধর্তব্য ছিল না, কারণ তার কয়েক বছর আগে থেকেই প্রায় পরিত্যাগ করেছিলেন। কখনও কখনও সে-ধরনের পার্টি বা ডিনারে উপস্থিত হ'লে নিয়মরক্ষার মতন নামমাত্র পান করতেন। পানের অভ্যাস আর ছিল না, বলা যায়। তিনি স্পষ্টই বলতেন—'আর stand করতে পারি না। ওসব যা করবার বিলেতে করেছি।' সত্যভাষী হরিনাথ নিজের দোষের কথাও গোপন করতেন না। ছাত্রজীবনে যে বিশৃঙ্খল হয়েছিলেন, সে-কথা স্বীকার করতেন নিজের মুখে পানত্যাগ না করলে উল্লেখ করতে নিরস্ত হ'তেন না। কিন্তু নিন্দা রটনা যাদের পেশা তাদের সত্য নিয়ে কারবার নয়। তাই হরিনাথের বিগত জীবনের সেই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি পল্লবিত করে তাঁর বর্তমানকে মসীলিপ্ত করা ভুল।

আশুতোষ এই সমস্ত কলঙ্কের কথা বিশ্বাস করে নেবার আগে, নিরপেক্ষ সূত্রে অপবাদের সত্যতা বিচার করলেন না। একবার বিবেচনা করে দেখলেন না, যারা নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছে, হরিনাথের প্রতি তাদের ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও আক্রোশ আছে কি না। সত্যাসত্য যাচাই করে নিয়ে হরিনাথের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হ'লে আশুতোষের পক্ষে যোগ্য হ'ত।

কিন্তু নির্বিচারে আশুতোষ হরিনাথের প্রতি এতদূর বিদ্বিষ্ট হয়েছিলেন যে, একদিন সিণ্ডিকেটের মিটিং-এ উত্তেজিত হয়ে হরিনাথকে বলে উঠলেন, 'তোমার কীর্তিকলাপ সব আমি জানি।'

এত সব সম্মানিত লোকের সামনে প্রকাশ্য সভায় এমন কটূক্তিতে হরিনাথ অপমানিত বোধ করলেন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কি কীর্তিকলাপ জানেন?'

সকলের সামনে দু'জনে সেদিন বচসা হয়ে গেল। তাঁকে দেখে নেবেন—এই ধরনের কথা বলে শাসিয়ে দিলেন আশুতোষ।

মিটিং থেকে বাড়ী ফিরে সে-রাত্রে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে রইলেন। কারুর সঙ্গে বিশেষ কথা বললেন না। ক্ষোভে, অপমানে এবং বিপদের আশঙ্কায় অবসন্ন হয়ে পড়লেন তিনি। আশুতোষের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের কোন দিক তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। যাঁর প্রতি তাঁর বৈরীভাব জাগত, ছলে-বলে-কৌশলে যে-কোন প্রকারে হোক তাঁকে বিধ্বস্ত না করে ক্ষান্ত হ'তেন না বাংলার ব্যাঘ্র!

হরিনাথের দুর্ভাগ্য, বাংলা দেশেরও দুর্ভাগ্য যে তাঁকে আশুতোষের মতন ব্যক্তি শত্রুরূপে গণ্য করলেন। চূর্ণ করতে মনস্থ করলেন এই বহুমূল্য হীরকখণ্ডটি!

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গভর্ণিং বডির আশুতোষ একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। সেই পদাধিকারের সুযোগে হরিনাথকে অপদস্থ করবার উপায় সন্ধান করতে লাগলেন তিনি।

সে কাজ কঠিন হ'ল না। হরিনাথ দু'-একটি অযোগ্য, অসৎ ও বিশ্বাসঘাতক লোককে লাইব্রেরীতে চাকুরি দিয়েছিলেন। তাদের সততা ও যোগ্যতার অভাব জেনে নয়, তাদের অভাব-অনটনের কথা শুনে উপকার করবার জন্যে। এখন তাদেরই দুর্নীতি ও কর্তব্যে ত্রুটির ঘটনাগুলি হরিনাথের বিচ্যুতি ও অযোগ্যতার দৃষ্টান্তরূপে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হ'তে লাগল। এমন-কি যাদের মঙ্গল করতে গিয়ে হরিনাথ কলঙ্কের ভাগী হ'লেন, তারাই গোপনে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়ে এদিকের ত্রুটি-বিচ্যুতির নিদর্শন সরবরাহ করে আসত। আর আশুতোষ গভর্ণিং বডির সভায় তীব্র সমালোচনা করতেন হরিনাথকে দায়ী করে। হরিনাথের বিরুদ্ধে যে-চক্রান্ত হ'তে লাগল, তাতেও কোন কোন বিশ্বাস-হন্তা গুপ্তভাবে সাহায্য করতে লাগল। যেমন, এক-দিন মেট্‌কাফ হলে লাইব্রেরীর গভর্ণিং বডির সভায় ইলেকট্রিক আলো সব হঠাৎ নিভে গিয়ে সভা পণ্ড হয়ে গেল। আশুতোষ অন্ধকারে গর্জন করে উঠলেন, 'এ হরিনাথের কাজ।'

কাজটি বাস্তবিকই হরিনাথের নয়, তবে তাঁরই অনুগ্রহপুষ্ট কোন কর্মচারীর প্রত্যুপকার বটে। এমনি ভাবে হরিনাথ অপমানিত, অপদস্থ হ'তে লাগলেন। তার মাত্রা বৃদ্ধি হ'তে হ'তে শেষ পর্যন্ত গভর্ণিং বডির সভায় চূড়ান্ত অভিযোগ নিয়ে এলেন আশুতোষ। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর টাকা খরচপত্রের ব্যাপারে

গলদ ধরা পড়েছে। হরিনাথের দায়িত্ব আছে এ বিষয়ে, ইত্যাদি অভিযোগ।

অভিযোগের যাথার্থ্য তদন্তের জন্যে হরিনাথ ছ'মাস অফিসে যোগ দিতে নিষিদ্ধ হ'লেন। এই Suspension Order পাবার পর তাঁর কর্মজীবন একরকম শেষ হয়। সেই ছ'মাস শেষ হবার আগেই তিনি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৩ দিন পরে সমস্ত পার্থিব অভিযোগ ও যন্ত্রণার পরপারে উত্তীর্ণ হয়ে যান!

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তদন্তের ফলাফলের কিছু কিছু অপ্রকাশিত সংবাদ এই পাওয়া যায় যে, গভর্ণমেণ্ট জানতে পেরেছেন যে, লাইব্রেরীর কোন দুর্নীতির জন্যে হরিনাথ দায়ী ছিলেন না। অন্য লোক দোষী। হরিনাথ সসম্মানে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবেন।

কিন্তু তখন আর তাঁর সে-কথা শোনবার বিশেষ সময় নেই!

কয়েকটি তথ্য

২০,০০০-এরও বেশি বই (বিভিন্ন ভাষায়) তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে বাড়ীতে ছিল, প্রতি মাসে শ'দুয়েক টাকার পুস্তক ক্রয়ের ফলে। ২০টি আলমারিতেও সে-সবের স্থান-সঙ্কুলান হয় নি। ঢাকায় কেনা একটি প্রকাণ্ড ডাইনিং টেবিলের ওপরেও স্তূপীকৃত থাকত বই। মৃত্যুর ক'দিন মাত্র আগেও এক বাক্স ফরাসী গ্রন্থ আসে। তিনি তখন শেষ শয্যায় শয়ান। বাড়ী থেকে ফেরৎ দিতে চাওয়ায়, বিক্রেতা বলেন, 'এ বই এঁর জন্যেই আনা। টাকা দিতে হবে না। বহু বই ইনি এতদিন কিনেছেন।'

জীবনের শেষ ৪ বছর (১৯০৭-১৯১১ খ্রীঃ) মৃত্যু পর্যন্ত গড়পারে যে পৈত্রিক বাড়ীতে বাস করেন, সেই বাড়ীর পথটি তাঁর স্মৃতি বহন করছে—হরিনাথ দে ষ্ট্রীট।

তার আগে, ১৯০৪-১৯০৭ খ্রীঃ, ৭৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীটের যে বাড়ীতে ছিলেন, তা এখন নিশ্চিহ্ন। তারও আগে চার বছর (১৮৯৭-১৯০১ খ্রীঃ) বিলাতে বাস করেন।

যিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন, তিনিই কোন-না-কোন ভাষা শিক্ষা বিষয়ে উপকৃত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে কয়েকমাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক অধ্যাপনা করেছিলেন। তা ছাড়া, নানা ভাষার পরীক্ষায় পরীক্ষক থাকতেন।

এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, ক্যালকাটা হিস্টরিকাল সোসাইটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও কার্যকরী ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

অত্যন্ত পরোপকারী, দয়ালুচিত্ত ও দরদী ছিলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত থেকে আরম্ভ করে বহু দুঃস্থ পরিবারকে ও লোকদের সাহায্য করতেন, বেশির ভাগই গোপন দান।

নিজের বেশভূষার কোন বাহুল্য বা পারিপাট্য দেখা যেত না। সরল প্রাণখোলা ন্যায়বান্ ব্যক্তি, কোন রকম কপটতা ও ভণ্ডামি ছিল না। সঙ্গীত শুনতে বিশেষ ভালবাসতেন। শরীর খুব সুস্থ ছিল না। হাঁফানিতে মাঝে মাঝেই কষ্ট পেতেন ১০-১২ দিন ধরে।

এফ. এ. পড়বার সময় বিবাহ হয়েছিল, গরাণহাটার বসু পরিবারে। ৩ পুত্র ও ৩ কন্যার মধ্যে কন্যার ধারায় বংশ বর্তমান আছে।

শেষ ১০ বছরের রচনাদি

যত বড় প্রতিভাধর ভাষাচার্য ও পণ্ডিত ছিলেন, তার উপযুক্ত অবদান সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তিনি রেখে যেতে পারেন নি, সত্য। কিন্তু এমন মর্মান্তিক অকাল-মৃত্যু না ঘটলে স্থায়ী মূল্যের কিছু বড় দান তাঁর কাছে দেশ সম্ভবত পেত। তবু ছাত্র-জীবনের পরে যে ১০ বছর স্বদেশে ছিলেন, তা যে নিরলসভাবে অতিবাহিত করে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার স্মারকচিহ্ন কিছু রেখে যান সে-কথা তাঁর রচনাদির নিম্নলিখিত তালিকাটি থেকে বোঝা যায়। এ প্রসঙ্গে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, শেষ ১০ বছরের (২৪ থেকে ৩৪ বছর বয়সের) এই সব কাজ তিনি করেছিলেন তাঁর কর্মের অবসরে (অর্থাৎ অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিকের কর্তব্যের অতি স্বল্প অবসরে, সকালে বা রাত্রে, কিংবা ছুটির দিনে)। তা ছাড়া, এই শেষ পর্বে অধ্যাপনা ও লাইব্রেরীয়ানের কাজ ভিন্ন তিন বার এম. এ. পরীক্ষা ও কয়েকবার ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দেন, দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণ করেন কয়েক-মাস এবং শেষের প্রায় দু'বছর আশুতোষের সঙ্গে মনোমালিন্যের জন্যে অশান্তি ও উদ্বেগের মধ্যে কাটান। এই সবের মধ্যেও তাঁর এতগুলি সম্পাদিত ও লিখিত পুস্তক পুস্তিকা ও পত্রিকাদি প্রকাশিত হয়:

1. Macaulay's essay on Milton—Edited with introduction.

2. Macaulay's essay on Boswell's Life of Johnson—Edited.

3. Macaulay's Life of Goldsmith—Edited.

4. Palgrave's Golden Treasury—Edited with notes and many parallel passages.

5. Burke's Letters to the Sheriff of Bristol—Analysis for students.

6. Burke's speeches on American Taxation—Analysis for Students.

7. Readings from the Waverly Novels—Selected translated by Harinath De.

8. The English diary of an Indian Student by Rakhaldas Halder. with an introduction by Harinath Dey.

৯) কালিদাসের শকুন্তলার প্রথম ছ'অঙ্ক ইংরেজীতে পদ্যে অনুবাদ।

১০) গিরীশচন্দ্রের 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম তিনি অঙ্ক ইংরেজীতে অনুবাদ। ফরাসীতেও অনুবাদের ইচ্ছা ছিল।

১১) অমৃতলাল বসুর 'বাবু' নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ। মাসিক বসুমতীর ইংরেজী সংস্করণে প্রকাশিত।

১২) মঁসিয়ে ল'র ডায়রী ১১ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অনুবাদ, মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে।

১৩) পালি ধ্বনীয় সুত্তের ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট জার্নালে প্রকাশিত।

১৪) অনেক পার্শী গজল, মৈথিলী কবিতা (বিদ্যাপতি প্রভৃতির), বাংলা গানের ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ।

১৫) Herald ত্রৈমাসিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ। প্রায় তিন-চতুর্থাংশ রচনা তাঁরই থাকত।

১৬) ইব্‌ন্ বতুতার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের পূর্ববঙ্গ অংশ যে ফার্সী থেকে লর্ড কার্জনের জন্যে ইংরেজীতে করেন, তাও পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

পূরণচাঁদ নাহারকে History of Jainism লেখবার সময় হরিনাথ প্রভৃত সাহায্য করেন।

রবীন্দ্রনাথের 'যামিনী না যেতে জাগালে না কেন' গানটির যে ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন, তার দু'টি লাইনের (নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ ঊষার বাতাস লাগি; রজনীর শশী গগনের কোণে লুকায় শরণ মাগি।') তর্জমা তাঁর অনুবাদ শক্তির নিদর্শন স্বরূপ দেওয়া হ'ল :—

The lamp of light is fain to die.
Touch'd by the break of morn :
Absorbed the moon behind the sky
For shelter hath withdrawn.

তা ছাড়াও, তাঁর আরও বহু রচনা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়ে যায় এবং তা অনেকাংশে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে তাঁর স্মৃতি স্বরূপ সংরক্ষিত আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল :—

১) ফরাসী ভাষায় লিখিত একটি নাটকের তৃতীয় অঙ্ক।

২) ঋক্‌বেদের নির্বাচিত অংশের ইংরেজী অনুবাদ।

৩) ইংরেজী-পারস্য ভাষার একটি বিরাটকায় শব্দার্থ অভিধান (এটিও সম্পূর্ণ করবার অবসর পান নি)।

৪) কিরাতার্জুনের বাংলা অনুবাদ।

৫) সুবন্ধুর বাসবদত্তার ইংরেজী অনুবাদ।

৬) রামায়ণের অংশাবলীর ইংরেজী অনুবাদ।

৭) মুদ্রারাক্ষস সম্পর্কে introductory notes.

৮) আল্ ফকুরির পুস্তকের অংশ বিশেষের আরবী থেকে ইংরেজী অনুবাদ।

৯) চীনা ও তিব্বতী গ্রন্থ থেকে অনুবাদ।

১০) হাফিজের Odo to Sultan Giyasuddin অনুবাদ।

১১) পালি ভাষায় রচিত খুদ্দকপর্ব সংশোধন ও পরিমার্জন।

১২) তারিখ-ই-নসরৎজঙ্গি সম্পাদনা।

Fragments of Balavataro (a Pali grammer).

Transcription of some Buddhist Hieratic writings in Chinese.....ইত্যাদি

বাংলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সংহতির বদলে কি ? হিণ্ডীয়া ?

১৯৬২— . জানুয়ারী—আগামী কিছু কালের মধ্যেই ভারতে সংহতি-সংহার দিবসরূপে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইবে এবং এই সংহতি-সংহারের একমাত্র কারণ হইবে হিন্দীর ভারতের একমাত্র জাতীয় কিংবা সরকারী ভাষারূপে অভিষেক ! হিন্দীভাষী লাট-বেলাট-গণ জেদ এবং জবরদস্তির দ্বারা ভারতের বাকী ১৩টি ভাষাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করিয়া একমাত্র হিন্দীভাষা দ্বারাই ভারতে সংহতির মিলনসেতু গঠন করিবার অবাস্তব এবং অসম্ভব পরিকল্পনার আকাশ কুসুম রচনা করিলেন ! হিন্দী-ফ্যানাটিকদের কার্য্যকলাপ এবং চিন্তাধারা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন আমাদের দেশ এবং জাতির পক্ষে বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন—হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে চালু করা। দেশের এবং জাতির এখন আর অন্য কোন বিষয়ে কোন অভাব নাই, তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলে ভারতের জন-জীবনের সকল অভাব, দৈন্য দূর হইয়া দেশে এখন মধু এবং ক্ষীরের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এমন কি চীনা আক্রমণের কোন ভয়ই আর নাই—হিন্দীর মাধ্যমে রচিত সংহতির প্রতাপে চীনারা আর ভারতের ছায়া মাড়াইতে ভরসা করিবে না ! ১৯৬২ সালে যদি হিন্দী সর্ব্বভারতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইত, তাহা হইলে বোধহয় চীনারা ভীরু কাপুরুষের মত ভারত আক্রমণ করিয়া কয়েক হাজার বর্গমাইল ভারতীয় জমি দখল করিতেও পারিত না ! আমরা অহিন্দীভাষী মূর্খের দল একথা যদি বুঝিতে পারিতাম কয়েক বৎসর পূর্ব্বে—তাহা হইলে হয়ত ভারতের এই অবস্থা আজ ঘটিত না। এখন সকলে মিলিয়া তারস্বরে যদি "জয়-হিন্দী" বলিয়া গগন বিদারিত করিতে পারি, একমাত্র তাহা হইলেই চীনারা হিমালয় পরিত্যাগ করিয়া উত্তর কোরিয়াতে অবশ্যই আত্মগোপন করতে বাধ্য হইবে ! অতএব আসুন, সকলে মিলিয়া খোল-করতাল বাজাইয়া "জয়-হিন্দী" ত্রাণমন্ত্র কীর্ত্তন করিতে থাকি।

হিন্দী-ভক্ত এবং হিন্দীভাষী কর্ত্তারা বলিতেছেন ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক লোকই হিন্দীভাষী এবং হিন্দীতেই তাহাদের সকল প্রকার কাজকর্ম্ম, বার্ত্তা বিনিময় এবং আলাপ-আলোচনা করিয়া থাকে কিংবা করিতে সক্ষম। কিন্তু এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার অজুহাত ভূয়া :

"সংখ্যাগরিষ্ঠতার যে অজুহাতে হিন্দীকে কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষার মর্য্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছিল, তা কতটা যুক্তিপূর্ণ ? বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান—প্রকৃতপক্ষে এই চারটি প্রদেশ হিন্দীভাষী। চারটি প্রদেশে হিন্দীভাষীর সংখ্যা বড় জোর ১০ কোটি। অথচ বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং দক্ষিণাঞ্চলের অহিন্দীভাষী অধিবাসীর সংখ্যা অন্ততপক্ষে ৩০ কোটি। সুতরাং স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, সংবিধানের ৩৪৩ অনুচ্ছেদ, সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর বাধ্যতামূলকভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠের ভাষাকে চাপিয়ে দেবারই চেষ্টামাত্র।

"বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষের হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চলগুলি অহিন্দীভাষীদের দ্বারা কম অধ্যুষিত এবং সেগুলি দেশের প্রাণকেন্দ্রের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত হওয়ায় সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অপরপক্ষে অহিন্দীভাষী জন-সাধারণের সংখ্যা হিন্দীভাষীদের তুলনায় অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তারা ছড়িয়ে থাকায় তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপিত হয় নি।"

এবং ইহারই ফলে—দেশ স্বাধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে উৎকট-উদ্ভট হিন্দীওয়ালাদের অশোভন এবং অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে—ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন এবং নূতন ধারার সংযোজন সম্পাদিত হয়। ইহারই ফলে একটি মাত্র বেশী ভোটে (তাহাও সভাপতির কাষ্টিং ভোট!) গৃহীত—হিন্দীকে সর্ব্বভারতীয় ভাষারূপে গায়ের জোরে গ্রহণ করা হয়! এইভাবে ভারতীয় অন্যান্য তেরটি সমৃদ্ধতর ভাষাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিক্ষেপ করিয়া—ঐ সকল অহিন্দীভাষীদেরও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে

পরিণত করার অপচেষ্টার যে বিষম মূল্য ভারতকে দিতে হইবে—তাহার আভাস ইতিমধ্যেই প্রকট হইতেছে। উৎকট হিন্দীপ্রেমিকদের দাপট এবং আস্ফালন—গত কিছুকাল যাবৎ ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া ভদ্র-মানুষের পক্ষে অসহ্য হইয়াছে।

রাজাজী সত্য কথাই বলিয়াছেন যে—হিন্দীকে ভারতের ৩০।৩৪ কোটি লোকের উপর জোর করিয়া চাপাইবার চেষ্টার একমাত্র পরিণতি হইতে—সংহতির পরিবর্ত্তে—ভারত অচিরে আবার তের-চৌদ্দ ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে! এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে:

"হিন্দীভাষী প্রদেশগুলি, বিশেষ করে বিহার এবং উত্তর প্রদেশ অস্বাভাবিকভাবে মতবাদপ্রিয় এবং স্বার্থপর হওয়ায় ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভাববার সময় তাদের নেই। তাই একথা আজ খুবই স্পষ্ট যে ভারত-বর্ষ যদি ভাষাগত ঐক্য কামনা করে, তা হ'লে হিন্দী-প্রেমিকদের মতানুযায়ীই তা করতে হবে। অর্থাৎ অন্যান্য সব ক'টি আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করে সেই সংস্কৃতির ধারকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে রূপান্তরিত করা হবে। হিন্দীকে জোর করে সকলের স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়ার এক- মাত্র অর্থ এই।

"হিন্দীভাষীদের উগ্র স্বাদেশিকতার সঙ্গে আপোষের চেষ্টা অর্থহীন। কিছুদিন আগে ইন্দোরের অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং দায়রা জজ একটি মামলা প্রত্যাখ্যান করেন। তার কারণ মামলার আবেদনটি ইংরেজীতে লেখা হয়েছিল। একজন ভারতীয় নাগরিক যদি অন্যের অন্ধ ভাষা-প্রীতির ফলে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়, তাহ'লে বিচারের বাণী শেষ পর্য্যন্ত প্রহসনে পরিণত হ'তে বাধ্য।"

রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় কিছুদিন পূর্ব্বে এক ফর্মাণ জারী করিয়া জানাইয়াছেন: ১৯৬৭ সাল হইতে উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার উত্তরপত্রগুলি ছাত্রদের দেব-নাগরী হরফে লিখিতে হইবে। বাঙ্গলা, ওড়িয়া, উর্দ্দু প্রভৃতির পরীক্ষার উত্তরপত্রগুলি সম্পর্কে বিশেষ করিয়া ইহা প্রযোজ্য হইবে! বাঙ্গালী ছাত্রদের বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহার করা বন্ধ (আপাতত) হইবে না, কিন্তু প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বাঙ্গলা অক্ষর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হইল! সংবাদটি এইরূপ:

"The University at Ranchi (Bihar) has decided that examination in Urdu, Bengali and Oriya language papers will, from 1967, have to answer questions in the Devanagri Script."

অথচ ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকল ২৯ (১) এ আছে যে:

Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.

—Article 29 (1)—Indian Constitution.

দেখা যাইতেছে--বিহারের হিন্দী মালিকদের কাছে ভারতীয় সংবিধানের কোন মূল্যই নাই এবং এই সর্ব্ব-বিষয়ে স্বাধীন (স্বেচ্ছাচারী?) কর্ত্তাব্যক্তিরা যখন ইচ্ছা তাঁহাদের মর্জ্জিমত সংবিধানের ধারা বাতিল, সংশোধন এবং সংযোজন করিতে পারেন। ইহাতে বাধা দিবার কেহ নাই এবং সে-চেষ্টা যে বা যাহারা করিবে—তাহাদের ভারতরক্ষা (?) আইনে পাকড়াও করিয়া নির্জ্জন কারাবাসের ব্যবস্থা করা অতীব সমীচীন হইবে!

বিহারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া নির্দ্দেশের প্রতিক্রিয়া কি হইবে, তাহা বর্ত্তমানে বলা কঠিন, তবে আমরা আশা করিব যে, কলিকাতা, উৎকল এবং আলীগড় বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি বাংলা, ওড়িয়া এবং উর্দ্দু হরফের উপর তাঁহাদের পাল্টা হুকুম জারি করিতে দ্বিধা করিবেন না।

দিল্লীর অভিযান—কোন্ পথে?

"২৬শে জানুয়ারী হিন্দীর রাষ্ট্রীয় অভিষেক দিবস হইতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দ্দেশ অনুসারে প্রজাতন্ত্রী ভারতের উত্তর ও মধ্য খণ্ডে হিন্দীরই একাধিপত্য। কেন্দ্র এবং উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশের সরকারী বার্ত্তাবিনিময় চলিবে হিন্দীতে। অন্যান্য অর্থাৎ অহিন্দীভাষী রাজ্য-গুলি অবশ্য ইংরেজীতে চিঠিপত্র লিখিতে পারিবে, কিন্তু জবাব দিবার সময় দিল্লীর কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা ইংরেজীতে লিখিত চিঠির সঙ্গে একখানি হিন্দী অনুবাদও জুড়িয়া দিতে পারেন। উহা একান্ত দরকারী না হউক, কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা হিন্দীর রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা ত এইভাবে রাখা যাইবে! সাধ্যে না কুলাইলেও সাধ মিটাইতে সময়, সামর্থ্য এবং অর্থের শ্রাদ্ধ করিতে আমাদের রাষ্ট্রের দপ্তরকর্ত্তাদের দিগ্‌বিদিক জ্ঞান নাই। কাজেই দেখি-

তেছি হিন্দী চালু করার নূতন নিয়মকানুনগুলি হইয়াছে একেবারে নিশ্ছিদ্র।

"একটি ভাষাতে কাজকর্ম চালাইতেই সরকারী কর্তাদের আঠার মাসে বছর। এখন তাহার উপর ভাগ বন্দোবস্তের রকমারি নিয়ম ও ব্যতিক্রমের মারপ্যাঁচে হিন্দী এবং ইংরেজীর সাড়ে বত্রিশ ভাজা মিলাইতে বসিয়া কেন্দ্রীয় কর্তারা এই আপৎকালীন অবস্থাতেও নূতন আপদ ডাকিয়া আনিতেছেন। দ্বৈতশাসনের মত সরকারী কাজকর্মে দ্বিভাষার ব্যবহার কেবল অনর্থই বাড়াইবে। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা নাকি ইচ্ছা করিলে হিন্দীতে অথবা ইংরেজীতে নোট লিখিতে পারিবেন। সুতরাং একই ফাইলে হিন্দী এবং ইংরেজী নোটের সহাবস্থান ঘটিবে। ব্যাপারটা খুব শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছন্দ যে হইবে না, হিন্দীপ্রেমী কর্তারাও তাহা কিছুটা আঁচ করিয়াছেন। অহিন্দীভাষী কর্মচারীরা হিন্দীতে লেখা নোট বুঝিতে পারিবেন না, সুতরাং সরকারী কাজকর্ম চালু রাখিতে হইলে হিন্দী নোটের আবার ইংরেজী অনুবাদ নোট করিতে হইবে। অতএব দপ্তরে দপ্তরে চাই অনুবাদ শাখা। এই সমস্ত অনুবাদ শাখায় হিন্দী হইতে ইংরেজীর পাতা গজাইতে সরকারী কাজকর্মের ঘটা বাড়িবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তর্জ্জমা-নথির বংশবৃদ্ধির খরচ? পরিকল্পনায়, প্রতিরক্ষায় প্রয়োজনীয় টাকায় টান পড়িলেও হিন্দীকে রাজ্যপাটে বসাইবার জন্য এই এলাহী খরচে দেখিতেছি কেন্দ্রীয় কর্তারা পিছপাও নন।"

আনন্দবাজারের মতে—বন্দোবস্ত পাকা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আদেশ:

—"২৬শে জানুয়ারী হইতে কেন্দ্রের প্রধান সরকারী ভাষা হইবে হিন্দী। অতিরিক্ত সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজীর নামটা অবশ্য উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা না করিয়া উপায় নাই, কারণ ১৯৬৩ সালে প্রথম সরকারী ভাষা আইনের বিধানে হিন্দীর সঙ্গে সরকারী ভাষারূপে ইংরেজীরও তুল্য মূল্য পাইবার কথা। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিস্তারিত নির্দ্দেশাবলীর ধরণ দেখিয়া একথা মনে না করিয়া উপায় নাই যে, হিন্দীকেই এখন হইতে সরকারী কাজকর্মে পনের আনা দখল দিবার ব্যবস্থা, ইংরেজীর স্থান নিতান্ত গৌণ।

"কতকটা সরকারী ভাষা আইনের মান রক্ষার জন্য আর কতকটা অহিন্দীভাষীদের প্রবোধ দিবার উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে বটে যে, অতিরিক্ত ভাষা হিসাবে ইংরেজী সব ব্যাপারেই ব্যবহার করা যাইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দ্দেশাবলীর লক্ষ্য হিন্দীর হুকুমত প্রতিষ্ঠা। হিন্দী এবং ইংরেজী ব্যবহারের ভাগাভাগি ব্যবস্থায় ইংরেজীর ভাগ সংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত; এই ব্যবস্থার চূড়ান্ত পরিণতি ইংরেজী হঠানেওয়ালাদের মনস্কামনা সিদ্ধি, সে-বিষয়ে এখন আর কিছুমাত্র সংশয় থাকিতেছে না। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা ইংরেজীকে "লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ" রূপে চালু রাখার সপক্ষে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করায় হিন্দীওয়ালারা বিষম রুষ্ট হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাদের তুষ্টির জন্যই বোধ করি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দ্দেশগুলি এমন আটঘাট বাঁধিয়া রচিত যে, সরকারী ভাষা আইনের স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ইংরেজীকে একেবারে কোণঠাসা করার ব্যবস্থা হইয়াছে।"

সর্ব্বভারতীয় সরকারী চাকুরীর জন্য পরীক্ষা দিতে হিন্দীভাষীদের বিশেষ সুবিধাদানের ব্যবস্থাও পাকাপাকি করা হইয়াছে। ইহার সোজা অর্থ এই যে, ২৬শে জানুয়ারী হইতে প্রজাতন্ত্রী ভারতে অহিন্দীভাষীরা হইল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। জাতীয় সংহতির ভিত্তিতে ইহাকে প্রচণ্ড আঘাত ছাড়া আর কি বলা যায়?

হিন্দীকে রাজতক্তে বসান সম্পর্কে আনন্দবাজারের মন্তব্য অহিন্দীভাষী ভারতীয়দের প্রণিধানযোগ্য—

—কেন্দ্রীয় কর্তারা জানেন, এমন কি হিন্দীওয়ালারাও মুখে অন্তত স্বীকার করেন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, উচ্চশিক্ষাচর্চ্চায় এবং আইন-আদালতে ইংরেজী ছাড়া গতি নাই। হিন্দীকে রাজতক্তে বসান হইলেও উচ্চশিক্ষায় ইংরেজীর প্রাধান্য থাকিবেই। সুতরাং উচ্চশিক্ষায় এক ভাষা, কেন্দ্রীয় সরকারী কাজকর্মে ও সর্ব্বভারতীয় চাকরির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আর এক ভাষা, এমন হ য ব র ল চালাইতে গেলে জাতীয় সংহতির সর্বনাশ হইবেই, সরকারী কাজকর্ম এবং বৈষয়িক উন্নয়ন প্রকল্পের গতিও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইবে। বিস্তর জরুরী দরকারী কাজ ফেলিয়া রাখিয়া হিন্দীকে সরকারী শিরোপা পরাইবার উৎসাহে কেন্দ্রীয় কর্তারা এই যে অনর্থ ডাকিয়া আনিতেছেন তাহার প্রতিবাদে ও প্রতিবিধানে অহিন্দীভাষীদের দৃঢ়ভাবে উদ্যোগী হওয়া কর্তব্য।—

মোট কথা—দেশের সবকিছু চুলোয় যাক—কিন্তু হিন্দী চাই-ই—হিন্দী ছাড়া আর অন্য কিছু আমাদের প্রয়োজন নাই—অতএব "জয়-হিন্-দী"।

'হিণ্ডীয়ার' রাজপত্র?

আর তর সহিল না। পাছে রাজত্ব ফসকাইয়া যায়,

এই ভয়ে—দিল্লীতে বিগত ২৫শে জানুয়ারী হিন্দী-রাজের সূচনা করা হইয়াছে হিন্দীতে 'ভারত-কা-রাজপত্র'—(অর্থাৎ গেজেট অব ইণ্ডিয়া) প্রকাশ করিয়া। অতএব ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইয়া গেল—ভারতের সর্ব্বাধিক ১০ কোটি লোকের ভাষা—হিন্দী, যাহা অবশিষ্ট ৩৪ কোটি অহিন্দীভাষীদের অবনত মস্তকে রাজ-আজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে! কিন্তু হিন্দীভাষী মহারাজদের এ-বাসনা কতটুকু পূর্ণ হইবে?

হিন্দীরূপী যে বিষবৃক্ষ ১৫ বৎসর পূর্ব্বে রোপন করা হয় কয়েকজনের জোর জবরদস্তিতে—সেই বৃক্ষে ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে এবং অচিরে এই বিষ ফল সারা ভারতে যে প্রচণ্ড বিষক্রিয়া সৃষ্টি করিবে—তাহা সামলাইতে দিল্লীস্থ হিন্দী-প্রেমিকরা পারিবেন কি? ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ভারতে বিষক্রিয়া প্রকট হইয়াছে এবং আশা করা যায়—অনতিবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অহিন্দীভাষী অঞ্চলেও হিন্দী বিষফলের শোচনীয় প্রতিক্রিয়া অবশ্যই দেখা দিবে। পশ্চিমবঙ্গে কয়েকজন রাজ্যমন্ত্রী এবং সামান্য সংখ্যক স্বার্থপর কংগ্রেসী ব্যতিরেকে—অন্যান্য সকলেই হিন্দীকে রাজতক্তে বসানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। এখন যদিও এই প্রতিবাদ কেবলমাত্র বাক্যে এবং কাগজপত্রেই হইতেছে, কিন্তু সেদিনের দেরি নাই যখন এই প্রতিবাদ রাজ্যের সর্ব্বত্র সকল মহলকে সক্রিয় চঞ্চল করিবে। কয়েকজন হিন্দীভাষী কর্ত্তাস্থানীয় ব্যক্তির বেকুবী এবং জবরদস্তির প্রায়শ্চিত্ত সমগ্র ভারতকে করিতে হইবে। মূর্খ যখন "পণ্ডিত" হয়—তাহার কাছে হিতবাক্য বলার কোন অর্থ হয় না। যাদের দৃষ্টির সীমা নাকের ডগাতেই আবদ্ধ—তারা সামান্য দূরের বিপদ সঙ্কেত দেখিতে পায় না বলিয়া নিজেদের সঙ্গে দেশেরও সর্ব্বনাশ করে। ক্ষুদ্র সীমিত-দৃষ্টি শাসকের দল আজ ভারতের এই সর্ব্বনাশ করিতে বদ্ধপরিকর। ভারতের সংহতি আজ নির্ব্বাণের পথে চলিল!

হিন্দীর রাজপাঠলাভে প্রতিক্রিয়া—

"আগামী ২৬শে জানুয়ারীর শুভদিনে এক নতুন অভিশাপ নেমে আসছে ভারতের অধিকাংশ জনজীবনে। এই দিন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দী চালু হচ্ছে ভারতের সরকারী ভাষারূপে। অর্থাৎ, ভারত রাষ্ট্রের আর সব ভাষা, তা যত সমৃদ্ধ, যত ঐশ্বর্য্যশালী, যত ঐতিহ্য সমন্বিতই হোক না কেন, এদিন থেকে তার সবগুলোই পর্য্যবসিত হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীতে। এদিন থেকে হিন্দী ছাড়া আর সব ভাষা ভারত রাষ্ট্রের ভাষা নয়। আঞ্চলিক ভাষার মর্য্যাদা নিয়ে এই সব ভাষা এই দিন থেকে সেলাম জানাবে হিন্দীকে।

"বাঙ্গলাকে যে কোন মহল আঞ্চলিক ভাষায় চিহ্নিত করুন না কেন, তাতে আমাদের অপমানিত বোধ করার কারণ আছে। ভারতীয় ভাষাকে ইংরেজরা এক সময় বলত, ভার্ণাকুলার বা ক্রীতদাসের ভাষা। ভার্ণাকুলার দেশছাড়া হয়েছে, কিন্তু সে জায়গায় আমদানী হয়েছে আঞ্চলিক শব্দ। এই শব্দ অনেকটা অপবাদের মত। আমাদের লড়াই এই অপবাদের বিরুদ্ধে ও ভারতের অন্যান্য ভাষাবৈভবের কথা বিস্মৃত না হয়েও বলা চলে, বাঙ্গলা অন্ততঃ কম করেও সাড়ে দশ কোটি লোকের ভাব প্রকাশের মাধ্যম, অন্ততঃ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বাঙ্গলা রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, ভারত রাষ্ট্রের যাবতীয় ভাষার মধ্যে একমাত্র বাঙ্গলাই বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃত্যের মাধ্যমরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশ্বের বহু দেশে ভারতবিদ্যা বিষয়াবলীর মধ্যে বাঙ্গলার স্থান অনেকের ওপরে।

"আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দী চালু করার আগেও নানা চোরাগোপ্তা পথে দেশের ঘাড়ে হিন্দী চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। রেলের স্টেশনে-স্টেশনে, ডাক বিভাগের টিকিটে, টাকার ছাপে, কাগজপত্রে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাধীন আরও বহু ক্ষেত্রে তার স্বাক্ষর মিলবে।

"হিন্দী চালু করার পক্ষে যে বড় যুক্তি দেওয়া হচ্ছে, তাহা ভারতীয় রাষ্ট্রের সংহতি। জোর-জুলুম করে একটা ভাষা অনিচ্ছুকদের ওপর চাপিয়ে দিলেই যে যন্ত্রের ক্রিয়ার মত রাষ্ট্রীয় সংহতি প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন যুক্তি অচল। আর সংহতি রাষ্ট্রীয় জীবনের আরও অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। সে-সব ছেড়ে সর্ব্বাগ্রে ভাষার ব্যাপারে এমন তৎপরতা দূরদৃষ্টির অভাব বলেই মনে হয়। ভাষা-প্রশ্ন স্বভাবতঃই সংবেদনশীল।

"দেশ আজ বহুবিধ সমস্যায় শতচ্ছিন্ন। বর্ত্তমানের সর্ব্বাধিক সমস্যা অন্নবস্ত্রের সংস্থান ও অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়। সমাজদেহে নানা অসঙ্গতি এখন সমগ্র রাষ্ট্রকে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় করে রেখেছে। সর্ব্বোপরি দেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শত্রুদের তৎপরতা, পাকিস্তানের ক্রমাগত ভারত-বিদ্বেষী ক্রিয়াকলাপ, সীমান্তশিয়রে চীনের হামলাবাজি রাষ্ট্রকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। এর সঙ্গে আছে মুনাফাবাজ ও সমাজের শত্রুদের তৎপরতা, এক শ্রেণীর

সরকারী কর্ম্মচারীর অসদাচরণ, এক রাজ্য কর্ত্তৃক অপর রাজ্যের প্রতি আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস, অর্থনৈতিক শোষণ, ধর্ম্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, ভাষার ব্যাপারে অত্যুগ্র আচরণ ইত্যাদি। এত সব অনৈক্যের ঘূর্ণাবর্ত্তে গণ-মানস স্বভাবতঃই ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট। এর উপরে যদি জবরদস্তি করে অনিচ্ছুকদের উপর কোনা ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা ক্ষোভ ও রোষাগ্নিতে ইন্ধন যোগানোরই সামিল হবে। এর বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদের ভাষা এখনও হয়ত আন্দোলনের পথ অবলম্বন করে নি কিন্তু যদি কোনদিন জনমতের প্রতিবাদধ্বনি আন্দোলনের পথ গ্রহণ করে, তখন সমস্ত ক্ষোভ একত্রিত হয়ে যে-দাবানল সৃষ্টি করবে, তা অনেক কিছু পুড়িয়ে ছাই করে দেবে বলে আমরা আশঙ্কা করি। মনে হয়, আমাদের শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ দেওয়ালের লিখন পড়তে পারেন না। তাঁদের কাছে আমাদের অনুরোধ, এখনও সময় আছে, এখনও তাঁরা নিরস্ত হোন।—"

বিগত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে উপরি-উক্ত বিবৃতিটি ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ সেন, সর্বশ্রী রণদেব চৌধুরী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সাতকড়ি-পতি রায়, জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বিশিষ্ট পণ্ডিত শিক্ষাব্রতী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক এবং সমাজসেবীর স্বাক্ষরে সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য আমাদের মত নগণ্য ব্যক্তিরাও এই বিবৃতির পূর্ণ সমর্থক।

হিন্দীকে সর্ব্বগ্রাসী ভারতীয় ভাষা করিবার অভদ্র, অযৌক্তিক এবং অনাবশ্যক যে-প্রয়াস আমাদের হিন্দী ভাষী মালিকরা করিতেছেন তাহাতে বলিতে ইচ্ছা হয়।

"বিধির বিধান কাটবে তুমি (তোমরা ?) এমন শক্তিমান
মোদের ভাঙ্গাগড়া তোমার (তোমাদের ?) হাতে এতই অভিমান !"

রাজ্যের সরকারী ভাষারূপে বাঙ্গলা

প্রজাতন্ত্র দিবস হইতে বাংলা ভাষা রাজ্যের সরকারী ভাষার মর্যাদা লাভ করিতেছে। অতঃপর সরকারী কাজকর্ম্মে যথাসম্ভব বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হইবে। দার্জ্জিলিং জেলার ৩টি মহকুমায় নেপালী ভাষার ব্যবহার চালু হইবে। আন্তঃরাজ্য কাজকর্ম্মে অবশ্য ইংরাজীর ব্যবহারই চালু রহিবে।

একমাত্র হাইকোর্ট ছাড়া আর সব আদালতে ক্রমশ বাংলা ভাষা চালু করা হইবে। বিধানমণ্ডলীতে পেশের জন্য বিল, প্রশ্ন ইত্যাদি বাংলা ভাষায় রচিত হইবে। তবে বিধানমণ্ডলীর আগামী অধিবেশনেই সমস্ত বাংলা ভাষায় করা সম্ভব হইবে না বলিয়া রাজ্য সরকার মনে করেন।

ইতিমধ্যে রাইটার্স বিল্ডিংসে কাজের উদ্দেশ্যে ৩০০ বাংলা টাইপরাইটারের জন্য অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

কয়েক দিন পূর্ব্বে উপরি-উক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয়। আশা করি, রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী এবিষয়ে তাঁহার যথাসাধ্য করিবেন—এবং সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য-প্রাপ্ত হাসপাতাল, বিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও যাহাতে বাংলার মাধ্যমে সকল কাজ করেন, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

কলিকাতায় এমন কতকগুলি সরকারী এবং বেসর-কারী (সাহায্যপ্রাপ্ত) হাসপাতাল এবং সাধারণ সংস্থা আছে, যাহাদের কর্ত্তাস্থানীয় ব্যক্তিরা এখনও বাঙ্গলার নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। এই-শ্রেণীর কর্ত্তাব্যক্তি-দের বাঙ্গলার প্রতি হেনস্থার ভাব অবশ্যই পরিবর্জ্জন করিতে হইবে।

হিন্দী সম্পর্কে দিল্লী বাদশাহদের হুকুম-নির্দ্দেশাদির যদি কোন পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে পশ্চিম বঙ্গে যে সকল অবাঙ্গালী ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান আছে—তাহাদেরও সরকারের সহিত বাঙ্গলাতে পত্রালাপ করি-বার নির্দ্দেশ রাজ্য সরকার দিবেন—এ-আশাও আমরা করি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চোস্ত হিন্দীতে ভাষণাদি দিয়া থাকেন—বাঙ্গলার বাহিরে গিয়া তিনি যত ইচ্ছা হিন্দী বলুন—তাঁহার অবাঙ্গালী হিন্দীভাষী 'মিত্রো'দের হিন্দীতে প্রীতি নিবেদন করুন, কিন্তু খাস বাঙ্গলাতে বসিয়া বাঙ্গলা দেশকে আর অযথা হিন্দীবুলিতে আলাই-বেন না—এই নিবেদন।

স্কুলে ৫ম শ্রেণী হইতে হিন্দীকে অবশ্যপাঠ তালিকা হইতে অবিলম্বে বাদ দিতে হইবে—হিন্দীর বদলে আমরা তামিল তেলেগু শিখিতেও রাজী আছি—কিন্তু হিন্দী ? কদাপি নহে !

বিগত দুর্গাপুর কংগ্রেসে আমাদের শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়, প্রতিবাদ সত্ত্বেও, বাঙ্গলাতেই তাঁহার ভাষণ দান করেন। কিন্তু ইহার বিপরীত কাজ করেন—আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁহাকে বাঙ্গলায় ভাষণ দিতে বলা হইলে তিনি উন্নতশিরে এবং সগৌরবে ঘোষণা করেন—তাঁহার জন্ম বিহারে এবং তিনি হিন্দী ও বাঙ্গলার মধ্যে কোন তফাৎ দেখেন না—কাজেই তিনি হিন্দীতেই ভাষণ দান করিলেন এবং হিন্দীভাষী ডেলি-

গেটদের নিকট হইতে ভীষণ করতালি লাভ করেন! (হাততালি কি কারণে পাইলেন বলা শক্ত, তবে আশা করি ইহা পরিহাসসূচক নহে।

হিন্দীর প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ নাই —কিন্তু বিদ্বেষ নাই বলিয়াই যে একদল লোক ঐ হিন্দীকে আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবে—ইহা অসহ্য এবং আমরা যথাসাধ্য ইহার প্রতিবাদ—প্রতিরোধ সর্ব্বভাবে, সর্ব্বদা করিব।

হিন্দীকে রাজভাষা করার চেষ্টা—শৃগালকে পশুরাজের আসনে বসানর মত একটা বিকট অসম্ভব দুরাশা, নিষ্ঠুর পরিহাস!

বিহারের নূতন যুগ? সংহতির প্রথম ধাপ?

২০শে জানুয়ারী '৬৫ তারিখের সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে যে :

চাকুরিতে লোক নিয়োগের ব্যাপারে বিহার সরকারের এক সাম্প্রতিক নির্দ্দেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। বিহার সরকারের উক্ত নির্দ্দেশে প্রাদেশিকতার মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া এখানকার ওয়াকেবহাল মহল মনে করেন।

কলিকাতায় আসন্ন পূর্ব্বাঞ্চল পরিষদের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিরা ঐ বিষয়টি উত্থাপন করিবেন বলিয়া উক্ত মহল আশা করিতেছেন।

এখানকার সরকারী মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, বিহার সরকারকর্তৃক প্রদত্ত এক সার্কুলারের কপি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সার্কুলারের প্রতিটি ছত্রে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। উক্ত মহল মনে করিতেছেন যে, বিহার সরকারকে বুঝাইয়া (?) অথবা চাপ সৃষ্টি করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার যদি অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তবে ভারতের সংহতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।

তাহা ছাড়া, বিহার সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এই সার্কুলার সংবিধান-বিরোধী।

নির্ভরযোগ্য সূত্রের সংবাদে আরও প্রকাশ যে, বিহার সরকার সম্প্রতি চাইবাসার খনির মালিকদের নিকট প্রদত্ত এক সার্কুলারে জানাইয়াছেন, খনিগুলিতে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে বিহারের স্থায়ী বাসিন্দাদের যেন নিয়োগ করা হয়। এখানকার রাজনৈতিক মহল মনে করিতেছেন যে, এই সার্কুলার প্রদানের দ্বারা চাইবাসা ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে খনিগুলিতে বাঙ্গালী নিয়োগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অবশ্য বিহার সরকার তাঁহাদের "সার্কুলারে" বিহারের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আসলে তাঁহাদের অন্য উদ্দেশ্য প্রমাণিত হইতেছে।

পূর্ব্বাঞ্চল পরিষদের আসন্ন বৈঠকে বাংলা ওবিহারের মধ্যবর্ত্তী একটি বনপথ লইয়া যে গোলযোগ চলিতেছে, তাহাও আলোচিত হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিরা এই বিষয়টিও উত্থাপন করিবেন।

রাজ্য সরকারের জনৈক মুখপাত্র জানান যে, আসন্ন বৈঠকের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রাজ্য সরকারের নিকট হইতে তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত কোন কার্য্যসূচী পান নাই। তবে কোন কোন মহল মনে করিতেছেন যে, আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সুদৃঢ় করার সহিত জড়িত নানাবিধ সমস্যা লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি আলোচনার সূচনা করিতে পারেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দের এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবার কথা।

একদিকে হিন্দীদ্বারা দেশের সংহতি রক্ষার সাংঘাতিক প্রয়াস, অন্যদিকে বিহারে 'বাঙ্গাল খেদা'—সরকারীভাবে চালু করিয়া বাঙ্গালীকে কোণঠাসা করিয়া মারিবার পূণ্য-প্রচেষ্টা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি পশ্চিমবঙ্গেও বিহারের মত পাল্টা সমপ্রকার বিধান চালু করা হয়—বিহার সরকার এবং দিল্লীস্থ তাঁহাদের মামাতো-মাসতুতো ভাই ব্রাদারিয়ারা কি করিবেন, কি বলিবেন? অবশ্য এ-কথা আমরা জানি যে, পশ্চিমবঙ্গে—এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 'বিহারী-বাঙ্গালীর মধ্যে হাওড়া ব্রীজ', কখনও, পশ্চিমবঙ্গে বিহারী এবং অবাঙ্গালীদের চাকুরির ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিবেন না, কিংবা করিতে সাহস করিবেন না! ঘরের ছেলে বেকার থাকুক ক্ষতি নাই কিন্তু পরের ছেলে যেন কখনও এখানে আসিয়া চাকুরিহীন অবস্থায় না থাকে—ইহা অবশ্যই দেখিতে হইবে, কারণ, তাহাতে বাঙ্গালীকে প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট হইয়া দিল্লীর আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইবে। শূন্য-উদর বাঙ্গালী উদারতা হারাইলে, বাঙ্গলার বদনাম হইবে!

বিহার সরকার প্রথম শ্রেণীর চাকরিতে বিহারী নিয়োগ করার বিষয়ে কোন আইন কেন করিতেছেন না জানি না, পাঞ্জাবী মাদ্রাজী-উত্তর প্রদেশীকে এই শ্রেণীতে নিয়োগে বাধা দিতে চাহেন না বা পারিবেন না বলিয়াই কি? কেন্দ্রীয় সরকার কার্য্যতঃ ভারত সরকারের উচ্চতম নিয়োগ হইতে বাঙ্গালীকে একেবারেই বাদ দিতেছে। বৈদেশিক বিভাগে আজ কাহাদের এক-

চেটিয়া অধিকার? মিঃ বি. আর. সেন, মিঃ এস. কে. দে, প্রভৃতির মত পাকা এবং দক্ষ আই সি এস আজ কেন দেশছাড়া? কলিকাতার কেন্দ্রীয় সরকারের বড় বড় পদগুলিতে বাঙ্গালীর সংখ্যা শতকরা সাড়ে সাত হইবে কি? কলিকাতার বিখ্যাত অবাঙ্গালী এবং বিদেশী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে, যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও, বাঙ্গালী নিয়োগ হয় না কেন? এ-বিষয়ে দিল্লীর বক্তব্য কি?

পৌর (উপ-) পিতাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা

"—কলিকাতার নাগরিক জীবনে পানীয় জলের সঙ্কট যেন চিরস্থায়ী হইতে চলিয়াছে। প্রয়োজন অনুসারে জল পাওয়া দূরের কথা, কর্পোরেশন এতদিন যে-পরিমাণ পানীয় জল সরবরাহ করিতেছিলেন, তাহাও নাগরিকদের ভাগ্যে জুটিতেছে না। আপাতত গোলমাল পলতার বাষ্পচালিত পাম্পে। চারিটি পাম্পের একটি অচল, একটিতে বৈদ্যুতীকরণের কাজ চলিতেছে এবং নিম্নমানের কয়লায় প্রয়োজনীয় উত্তাপের অভাবে অপর দুইটি পাম্পও পুরাদস্তুর চালু রাখা সম্ভব হইতেছে না। এই অবস্থা অবশ্য একদিনে সৃষ্টি হয় নাই। বেশী দাম লইয়া নিম্নমানের কয়লা সরবরাহের অভিযোগ অনেকদিন আগেই উঠিয়াছিল। এ ব্যাপারে নাকি তদন্তও হইয়াছে। অসাধু উপায়ে অর্থ উপার্জনের জন্য মহানগরীর পানীয়জল সরবরাহের ব্যবস্থা বানচাল করিতে ঠিকাদারদের বিবেকে আটকায় নাই। হয়ত পৌরসভার উপরের স্তরে পুঞ্জীভূত দুর্নীতি এই ধরণের কাজকে বৎসরের পর বৎসর প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে। পলতার ওয়াটার ওয়ার্কসের কাজ অব্যাহত রাখিবার জন্যও পৌরকর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন নাই। পলতায় দীর্ঘ চার বৎসর যাবৎ মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল অ্যাসিস্টাণ্ট ইঞ্জিনীয়ারের পদ দুইটি শূন্য পড়িয়া আছে। এই দুইজন ইঞ্জিনীয়ারের অভাবে কাজের অসুবিধা হইতেছে,—পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার নোটে তাহা নাকি বার বার জানাইয়াছেন। জরুরী মেরামতির জন্য যন্ত্রপাতি মজুত রাখার পাটও নাকি এখন উঠিয়া গিয়াছে। কলিকাতার কয়েকটি বিশেষ এলাকা ছাড়া মহানগরীর অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের পলতার জল সরবরাহের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। মহানগরীর পানীয় জল সরবরাহ-ব্যবস্থা দেখাশুনার জন্য পৌরসভায় একটি বিশেষ কমিটিও আছে। কিন্তু তাঁহাদের কাজকর্ম্ম দেখিয়া এ কথা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, নাগরিকদের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নটি তাঁহারা তাঁহাদের দায়িত্বের তালিকা হইতে একেবারেই ছাঁটাই করিয়া ফেলিয়াছেন।"

বহু আশার পর প্রায় ৭।৮ মাস পূর্ব্বে বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপ শেষ পর্য্যন্ত বসান হইয়াছে—কিন্তু এই পাইপের উদ্বোধন সত্ত্বেও কলিকাতা শহরে জলের সরবরাহ না বাড়িয়া—ক্রমশ কমের দিকেই যাইতেছে!

পলতা হইতে টালায়—

"জল-পরিবহণের পাইপ বসাইলেই জল আসিতে পারে না। গঙ্গার লবণাক্ত ও পলিবহুল জল পানীয়ের উপযুক্ত নয়ই, ওই জল সোজাসুজি টালাতে পাঠানও অসম্ভব। এতদিন পরে গঙ্গার জল রাখার জন্য পলতায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইনটেক স্টেশন সবে তৈয়ারি হইয়াছে, কিন্তু নদী হইতে জল তুলিবার ব্যবস্থা আজও হয় নাই--ইনটেক জেটি নির্ম্মাণের অনুমোদন মাত্র কিছুকাল আগে পাওয়া গিয়াছে। পলতা হইতে অতিরিক্ত জল সরবরাহ করিতে হইলে টালা পাম্পিং স্টেশনেও নূতন জলাধার নির্ম্মাণ করা দরকার। কিন্তু টালায় ভূগর্ভস্থ জল-শোধনাগার নির্ম্মাণের কাজ নাকি সবে সুরু হইয়াছে। পৌর-কর্তৃপক্ষের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকিলে সব কাজই একসঙ্গে আরম্ভ করা যাইত। অতিরিক্ত পানীয় জল সরবরাহের সঙ্গে যে-সব পরিকল্পনা যুক্ত, সেগুলি একটি একটি করিয়া কার্য্যকর করিবার কি অর্থ হইতে পারে, তাহা বোঝা যায় না। ইহাতে হয়ত ঠিকাদারদের সুবিধা হয়, কিন্তু নাগরিকদের হয়রানির পর্ব্ব ক্রমেই দীর্ঘ হইতে থাকে।"

কলিকাতায় জল সরবরাহ প্রসঙ্গে আমরা 'আনন্দবাজারে'র সহিত একমত।

কলিকাতায় জল সরবরাহ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন দায়িত্ব আছে কি না জানি না—তবে থাকা উচিত বলিয়া মনে করি। বেশ কিছুকাল পূর্ব্বে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সস্তায় ইট প্রস্তুতের জন্য রাজ্য সরকার পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসের প্রিসেটলিং ট্যাঙ্কের পলি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত করেন। পৌরসভার সঙ্গে এক চুক্তিতে স্থির হয় যে, রাজ্য সরকার ওই ট্যাঙ্কের মাটি কাটিবেন এবং তাহার বদলে পৌরসভা কিছু ইট পাইবেন। কিন্তু রাজ্য সরকার তাঁহার দায়িত্ব পালন না করায় সব কয়টি ট্যাঙ্কেই পলি জমিয়াছে, একটিতে পলির পরিমাণ অস্বাভাবিক রকম বেশী। এ ব্যাপারে কাহার দায়িত্ব বেশী, সে বিতর্কে প্রবেশের প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, মহানগরীর ত্রিশ (?) লক্ষ নরনারীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখিবার ব্যাপারে রাজ্য সরকার ও

পৌরসভা চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়াছেন। কেবল দায়িত্বহীনতাই নহে, পরম নিষ্ঠুরতাও বলা উচিত।

আবার মূল্যবৃদ্ধি ?

সরকারী মতে এবৎসর ফসল প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়াছে—এবং সেই কারণে আগামী দুই মাসের মধ্যেই দেশের খাদ্য সঙ্কট মোচন হইবে। কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রীও এই ভরসা দিয়াছেন। কিন্তু :

"মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহ পার হওয়ার পরেও যে এরকম আশ্বাস দিতে হয়, ইহাই সরকারী খাদ্যনীতির পক্ষে কলঙ্ক। কেননা, গত দুই মাস যাবৎ বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপিয়া নূতন ফসল উঠিতেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত বাজার নূতন ফসলে ছাইয়া যায়; ফলে দরও অনেক নামিয়া থাকে। তৎ-সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে দর নামে নাই কেন—ইহাই একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য। দর নামা দূরে থাকুক, স্বয়ং সরকারই রেশন এলেকায় "ন্যায্য মূল্যের" দোকান হইতে বিক্রীত চাউল ও গমজাত দ্রব্যাদির দর অনেক চড়াইয়া একটা বিভ্রাটের সূচনা করিয়াছেন।

"বৃহত্তর কলিকাতার পুরাপুরি রেশন এলেকায় 'বাঙ্গলার মাঝারি চাউল' (বেঙ্গল ফাইন) নামে যাহা বিক্রয় হইতেছে—খোলা বাজারে কোনদিনই তাহা 'মাঝারি' চাউল বলিয়া গণ্য হয় নাই। বরঞ্চ 'কমন' অর্থাৎ নিম্নতর স্তরের 'সাধারণ চাউল' বলা যাইতে পারে। গত ১লা জানুয়ারী তারিখে ইহার দর ধার্য্য হইয়াছে কিলো-প্রতি ৭০ পয়সা। অথচ সরকার রেশন এলেকায় ক্রেতাদের নিকট আদায় করিতেছেন ৮০ পয়সা—অর্থাৎ আইনানুযায়ী ধার্য্য দর অপেক্ষা ১০ শতাংশ বেশী। গমের দরও কিলো-প্রতি ৪০ পয়সার স্থানে ৫০ পয়সা অর্থাৎ এক ধাপে ২৫ শতাংশ চড়ান হইয়াছে। মূল্যবৃদ্ধির অনুকূলে তাঁহাদের যুক্তি : বিদেশ হইতে আমদানী গমই রেশনের দোকানে বিক্রয় হয়। ইহার দর দেশী গমের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় সর্ব্বত্রই সরকারী গোলা হইতে আমদানী গম সরবরাহের দাবি উঠিয়াছে। তাহা পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই আমদানী গমের বিক্রয়-মূল্য চড়াইয়াই সরকার দু'রকম গমের মধ্যে দরের সমতাস্থাপন করিতেছেন। যুক্তিটি কি চমৎকার! ইহা ঈসপের গল্পে পিঠা ভাগ করার কাহিনীই স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু দেশের ক্ষেতে উৎপন্ন গমের দর চড়া হইলে তাহা হ্রাসের দ্বারা মূল্য হ্রাসের অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া তোলাই কি প্রয়োজন ছিল না? তৎপরিবর্তে রেশন এলাকায় গমের দর চড়াইয়া সরকার দেশী গমের দরও চড়া রাখিতে প্রেরণা দিলেন কেন? রেশন দোকানে 'বাঙ্গলার সাধারণ চাউলে'র দর চড়াইবার মূলে সরকারের যুক্তি এই যে, তদপেক্ষা কম দরে উহা বিক্রয় করিলে রাজকোষের নাকি লোকসান হইবে। ইহা সত্য হইলে এ ধারণাই অনিবার্য্য যে, সরকারী গোলায় চাউল-বিক্রেতার কম দরের 'কমন' চাউল বেচিয়া 'ফাইন' চাউলের জন্য নির্দ্দিষ্ট চড়া দর আদায় করিতেছেন। অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে মন্বন্তরের সময় সরকারের নিকট খারাপ চাউল বেচিয়া চড়া দর আদায়ের যে মওকা দেখা গিয়াছিল, এবার ইতিমধ্যেই তাহা সুরু হইয়াছে।

"রেশন এলাকায় সাধারণ লোকের উপর ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া, কিংবা সমগ্র দেশে মূল্যস্থিতির ব্যাপারে ইহার প্রভাব সরকার চিন্তা করিয়াছেন কি? পুরাপুরি এবং আংশিক—দু'রকম রেশন এলাকাতেই অধিকাংশ লোক নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত। শীতকালে সবরকম খাদ্যের প্রাচুর্য্য ঘটিবার ও দর কমিবার কথা। কিন্তু এবার ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। দাইল ও রাঁধিবার তৈল দুষ্প্রাপ্য; মাছ, সবজি ও তরকারি স্বাভাবিক অবস্থার সহিত তুলনায় দ্বিগুণ কিংবা ততোধিক চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে। ফলে, সাধারণ লোকের সংসারে দুর্দ্দশার আর অন্ত নাই। ইহার উপর স্বয়ং সরকার চাউল ও গমের দর চড়াইয়া দেওয়ায় তাহাদের জীবনযন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মাগ্‌গি ভাতা চড়াইবার দাবী উঠিলে সরকার তাল সামলাইতে পারিবেন ত?

"রেশন-বহির্ভূত এলাকার বাজার-দরের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভয়াবহ। পৌষ মাসের মাঝামাঝি হইতে রেশন এলাকায় 'সাধারণ চাউলের' দর চড়িবার পর অন্যত্র, শহর অঞ্চলে বিক্রেতারা তদপেক্ষা কম দরে সন্তুষ্ট হইবে না। গ্রামের হাটেও ইহার কাছাকাছি দর আদায়ের জন্য বিক্রেতারা যথাসাধ্য চাপ দিবে। ফলে, আষাঢ়ের সময়ই সাধারণ চাউলের দর যদি কিলো-প্রতি ৭৫ বা ৮০ পয়সা দাঁড়ায়, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে স্বাভাবিক ঘাটতির সময় দর কোন্ স্তরে উঠিবে। রেশন এলাকায় লোকের তবু সান্ত্বনা আছে যে, বছরের সব সময় একই দর বলবৎ থাকিবে। (অবশ্য যদি লোকসানের অজুহাতে তখন আবার দর চড়ান না হয়) কিন্তু, রেশন-বহির্ভূত এলাকায় শ্রাবণ-ভাদ্র মাস হইতে দর চড়াইবার চিরন্তন কৌশল ব্যর্থ করার উপায় নাই। সেজন্য নিঃসংশয়ে বলা যায়

যে, রেশন এলাকায় গম-চাউলের মূল্যবৃদ্ধি দ্বারা সরকারই বছরের মাঝামাঝি দেশের সর্বত্র আরও দর চড়াইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন।

"কৃষক কর্তৃক প্রাপ্য মিহি ধানের দর মণ-করা ২২৲না হইলেও, অন্ততঃ ২১৲ ধার্য করার জন্য জনৈক কৃষিব্যবসায়ীর বক্তব্য পূর্ব্বে 'যুগান্তরে' প্রকাশিত হইয়াছে। কতগুলি যুক্তি যেমন একতরফা, তেমনই সামঞ্জস্য-বহির্ভূত। কারণ,প্রতি বিঘা জমিতে আধ মণ মিশ্র সার ও আধ মণ বাদামের খৈল প্রয়োগ করিলে বিঘা-প্রতি মাত্র আট মণ ধান ফলিবার কথা নয়, অন্তত দশ মণ,কিংবা তারও বেশি ফসল উঠিবে। অন্যদিকে, চাষের খরচ সম্পর্কে হিসাবটাও ফাঁপান। ক্ষেতের কাজ বন্ধ থাকার জন্য বছরে প্রায় সাত মাস নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিলে তখনকার সম্পূর্ণ সংসার খরচও ক্ষেতে পাঁচ মাসের শ্রম হইতে উশুল করা সম্ভব নয়। কিংবা চাষ বন্ধ করিলে ধানী-জমিগুলি বিঘা-প্রতি বারো শত টাকা দরে বিক্রয়ের কল্পনা সম্পূর্ণই অবাস্তব। কারণ, তখন ধানী-জমির খরিদ্দাররা উপিয়া যাইবে। সংসার-খরচ চড়িবার জন্য অন্যান্য নিম্নবিত্তের মত চাষীও ক্লেশ ভোগ করিতেছে। ইহার প্রতিকার করিতে হইবে —ন্যায্য দরে বিকিকিনির সুনিশ্চিত ব্যবস্থা দ্বারা। তৎপরিবর্তে ধানের ২২৲ টাকার ভিত্তিতে মোটা ও সাধারণ চাউলের খুচরা দর মণ-করা ৩৮।৪০ টাকায় তুলিয়া দিলে অন্যান্য কার্য্যে রত লোকগুলির দুর্দ্দশা বাড়িতে পারে; কিন্তু চাষীর কোন উপকার হইবে না। কারণ, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জিনিসের দর আরও বেশী চড়িয়া যাওয়ায় চাষীর অতিরিক্ত আয় হাওয়ায় মিলাইয়া যাইবে।"

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের বর্ত্তমান বিষম অবস্থার কথা লইয়া বহুবার বহু আলোচনা হইয়াছে—কিন্তু যাঁহাদের হাতে এই ভাগ্যহত দেশের হতভাগ্য জনগণের জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে, রেশনের থলি হাতে করিয়া তাঁহাদের বাজারে ঘোরাঘুরি করিতে হয় না বলিয়া, তাঁহারা আমাদের প্রকৃত অবস্থার বাস্তবরূপ কল্পনা করিতে পারিবেন না। উপরে উদ্ধৃত যুগান্তরের মন্তব্যে তাঁহারা বিচলিত হইবেন কি?

কি ফল লভিনু হায়!

যুগান্তরের ষ্টাফ রিপোর্টার সংবাদ দিতেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার রেশনের চাউল, গম ও গমজাত সামগ্রীর মূল্য আর এক ধাপ বাড়াইবার জন্য রাজ্য সরকারের উপর চাপ দিতেছেন। আমাদের রাজ্য সরকার ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন, কিন্তু কেন্দ্রের চাপ ঠেকাইতে পারিবেন কি? যুগান্তরের (এবং আমাদেরও) মতে—

"এই সংবাদ অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বৃহত্তর কলিকাতা এলাকায় পুরাদস্তুর রেশন প্রবর্ত্তনের সরকারী সিদ্ধান্তকে আমরা অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন জানাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহা এইজন্য নহে যে, দোকানদারদের ব্যবসা তুলিয়া দিয়া সরকারী খাদ্য বিভাগ নিজেরাই নিকৃষ্ট দোকানদারিতে নামিয়া মানুষের পকেট হাল্কা করার ফিকিরে থাকিবেন। অথচ বিধিবদ্ধ রেশন চালু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতার মানুষ দোকানে গিয়া শুনিলেন, গমের দাম কিলো-প্রতি দশ পয়সা করিয়া ও "বেঙ্গল ফাইন" চালের দাম কিলো-প্রতি চার পয়সা করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। মুনাফাখোরি ও চোরাকারবারির হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া ও বাঁধা দরে বরাদ্দমত জিনিস পাইয়া মানুষ কোথায় হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে এবং অসুবিধা সহ্য করিয়াও রেশন ব্যবস্থার জন্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করিবে, তাহা নহে, রেশনিং এর প্রথম প্রভাতেই মানুষকে এইভাবে তিক্তবিরক্ত করিয়া দেওয়া হইল। এখন যদি আর একবার মোচড় দিয়া সাপ্তাহিক রেশনের দাম চড়াইয়া দেওয়া হয় তাহার পরও মানুষ রেশনের নামে জয়ধ্বনি দিবে, এতটা আশা করা কঠিন।

"বাজার দর আয়ত্তের মধ্যে রাখা সরকারী নীতির বিঘোষিত লক্ষ্য। এই সেদিন দুর্গাপুর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবেও এই বলিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে যে, 'বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্যের মূল্যহার অতি দ্রুত ও উদ্বেগজনকভাবে চড়িয়া গিয়াছে।' বেসরকারী ব্যবসায়ীদের একাংশ দাম চড়াইতেছেন বলিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে মুনাফাখোরির অভিযোগ উঠিয়াছে এবং বণ্টন ব্যবস্থায় সরকারী হস্তক্ষেপ অনিবার্য্য হইয়াছে। অথচ সরকারও যদি বেসরকারী ব্যবসায়ীদের রাস্তাই ধরেন এবং নিজেদের পণ্যদ্রব্যের দাম চড়াইতে থাকেন তাহা হইলে সরকারী নীতির অর্থ কি দাঁড়ায়?

"বলা হইয়াছে যে, খুচরা খরিদ্দারদের কাছে সরকারী চাউল ও গম যে দামে বিক্রয় করা হয়, তাহাতে পড়তা পোষায় না। এতদিন ঘাটতিটা সরকারী কোষাগার হইতে পুরাইয়া দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু এখন কেন্দ্রীয় সরকার নাকি স্থির করিয়াছেন যে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে সরকারী "সাবসিডি" তুলিয়া দেওয়া হইবে। এতদিন ধরিয়া যদি 'সাবসিডি' দিতে পারা গিয়া থাকে তাহা হইলে আজ খাদ্যাভাব ও মূল্যবৃদ্ধির এই সঙ্কটের সময় তাহা প্রত্যাহার করিয়া লওয়ার এমন কি জরুরী

প্রয়োজন ঘটিল, তাহার কোন কৈফিয়ৎ কেহ দেন নাই। তাহা ছাড়া এই একই কারণ দেখাইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে চাল ও গমের দাম বাড়ান হইয়াছে। এখন আবার নূতন করিয়া দাম বাড়ানর কি কারণ ঘটিল তাহাও দেশের মানুষ জানিতে চাহিবে। পশ্চিমবঙ্গে সরকার চাউলের যে-দাম বাঁধিয়া দিয়াছেন নিজেরা রেশনের দোকানের মারফৎ তাহার চেয়েও বেশী দামে চাল বিক্রয় করিয়াছেন। তবুও লোকসান ও 'সাবসিডি'র কথা ওঠে কেন?

"গমের দাম কুইণ্টাল-প্রতি দশ টাকা বাড়াইবার সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিগত দুর্গাপুর কংগ্রেসে তীব্র সমালোচনা হইয়াছে। একাধিক বক্তা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়াছেন যে, সরকার যে বলেন এক, করেন আর এক, তাহার একটি বড় উদাহরণ হইতেছে এই মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত। একজন এ আই সি সি সদস্য এই অভিযোগও করিয়াছেন যে, সরকার যে পরিমাণ 'সাবসিডি' দেন তাহার চেয়ে বেশী পরিমাণ টাকা আমদানী-করা গমের দাম চড়াইয়া উশুল করিয়া লইবেন, অর্থাৎ এই গম বেচিয়া তাঁহারা মুনাফা কমাইবেন। খাদ্যমন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম দুর্গাপুর অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়াও এই অভিযোগের জবাব দেন নাই। একথাও বলা হইয়াছে যে, আসলে বন্দরে জাহাজগুলির মাল খালাস করিতে বিলম্বের ফলে যে খেসারৎ দিতে হইতেছে তাহার জন্যই আমদানী-করা খাদ্যশস্যের পড়তা খরচ চড়িয়া যাইতেছে। যদি একথা ঠিক হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সরকারেরই অন্য একটি বিভাগের অকর্ম্মণ্যতার দায় রেশন-গ্রহীতাদের উপর বাড়তি বোঝা হইয়া চাপিতেছে। ইহা রেশনিং ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করার পথ নহে, রেশনিং-এর উপর মানুষের ধিক্কার জন্মাইয়া খোলা বাজারের মুনাফাখোর-দের দিকেই আবার মানুষকে ঠেলিয়া দিবার পথ।"

খাদ্যসামগ্রীর কালোবাজারী রোধ করিবার সরকারী পদ্ধতি বোধহয় ইহাই। যে-মূল্যবৃদ্ধি করিলে সাধারণ ব্যবসায়ী দণ্ডনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত, ঠিক সেই মূল্য-বৃদ্ধি করিলে সরকার বাহাদুর আইনসঙ্গত কাজ করিলেন বলিয়া আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে! এমন অবস্থায় লোকে যদি কালোবাজারী এবং সরকারকে একই পর্য্যায়ে ফেলে—তাহাতে আপত্তি করিবার কোন যুক্তি আছে কি?

একদিকে সরকার ধাপে ধাপে মূল্যবৃদ্ধি করিতেছেন আর অন্যদিকে সাধারণ মানুষ ধাপে ধাপে পাতালের দিকে নামিয়া যাইতেছে—। ইহাই যদি কংগ্রেসী সরকার এবং স্ফীতোদর নেতাদের মতে কল্যাণ-রাষ্ট্রের প্রকৃত রূপ হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস, কংগ্রেসী সরকার এবং কংগ্রেসী তথাকথিত নেতাদের যত শীঘ্র নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হইবে, দেশের পক্ষে ততই কল্যাণকর হইবে সহজ পথে যদি এ নির্ব্বাণ না হয়, তাহা হইলে একদিন —তাহাও হয়ত অবিলম্বে—কঠিন পথে জনগণ কঠিন হস্তে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসী সরকারের বিলোপ সাধন করিবে!

আনন্দ সংবাদ ? সিনেমার সংখ্যাবৃদ্ধি

আমাদের সরকারের তাল-মান-মাত্রা জ্ঞান যে প্রচণ্ড, তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। তাহা না হইলে দেশের এই স্বচ্ছল-নিরাময়-নিশ্চিন্ত অবস্থায় সরকার বাহাদুর দেশের সর্ব্বত্র সিনেমাগৃহের সংখ্যাবৃদ্ধির কথা কেন চিন্তা করিলেন? কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

—"চিত্রগৃহ তৈয়ারী সম্পর্কে আঁটসাট কয়েকটি নিয়ম ছিল; রাজ্য সরকার বাঁধন কিছু আলগা করিয়াছেন, ফলে নাকি শহর ও গ্রামাঞ্চল নূতন নূতন ছবিঘরে ছাইয়া যাইতে দেরি হইবে না। খোশ খবর, সুতরাং চিত্রপিপাসু মহলে খুশির ঢেউ বহিয়া গেল বলিয়া,তবু আমরা বেসুরো কয়েকটা প্রশ্ন তুলিতে চাই। লোকের হাতে অধুনা টাকা ধরে না, প্রথমত জানিতে সাধ হয়,এই তথ্য সরকারের গোচরে পেশ করিয়াছেন কোন্ সমীক্ষকেরা। আর যদি বাড়িয়া থাকে, ব্যয়ও বাড়িয়াছে। রোজগারে-খরচে কাটাকুটি করিয়াও যাহাদের হাতে কিছু বাঁচে সেই ভাগ্যবানেরা হয় সমাজের উপরতলায়, নয় নীচের দিকে। মাঝের তাকে ছিটাফোঁটাও সম্ভবত অবশিষ্ট থাকে না। তাহা ছাড়া বাড়তি কিছু থাকিলেই প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন—ফুর্তিতে সব উড়াইয়া দিতে হইবে, ইহাকে ঠিক সুস্থ সমাজবোধ বলে না, হায় সমাজতন্ত্র! উদ্বৃত্ত, উচ্ছ্বাস ইত্যাদিকে জাতীয় স্বার্থে বিনিয়োগ করার আরও রাস্তা আছে। ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির স্বার্থের অজুহাতও এ ক্ষেত্রে খাটিবে না, কারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা বলিয়া দিতেছে যে, বাংলায় রাশি রাশি চিত্রগৃহ খুলিলেই বাংলা চিত্রশিল্পের সুরাহা হয় না। এই কলিকাতা শহরে ও শহরতলিতে একমাত্র বাংলা ছবি দেখান হয় এমন সিনেমার সংখ্যা গুনিতে আঙুলের সব কয়টি কর‌ও লাগে না। নির্ব্বিচার লাইসেন্স-বিলি ব্যবস্থার কল্যাণে বসত-অঞ্চলে হাউসের ছড়াছড়ি,অথচ মুক্তি প্রতীক্ষায় একের পর এক বাংলা ছবি বসিয়া বসিয়া পথ চায় আর কাল গোণে! রাতারাতি কত চিত্রগৃহ হিন্দী ছবিরই একচেটিয়া হইয়া গেল, সেদিকে

অনেকের হুঁশও নাই। ভাল, নূতন চিত্রগৃহের মঞ্জুরী যদি দিতেই হয়, তবে সেগুলিতে বাংলা ছবি—একমাত্র যদি না-ও হয়, অন্তত শতকরা আশি-নব্বই ভাগ—দেখানর বাধ্যবাধকতার শর্ত্ত সরকার আরোপ করিতে পারিবেন কি? না পারিলে হিন্দী ছবিরই ফাউ-মওকা—অধিকন্তু সাহায্য-রজনী ও ম্যাটিনি মিলিয়া গেল। হিন্দী ছায়াচিত্র হিন্দীর অনুপ্রবেশের—অনুপ্রবেশ কেন, অভিযানের—সেকেণ্ড ফ্রন্ট। এই দুই নং অঙ্গনটাই ক্রমশ কেমন প্রধান হইয়া উঠিয়াছে সেটা রকে-রাস্তায়, হাটে-বাজারে, পূজার বারোয়ারীতলায় হাঁটিতে গেলে "ফিল্মী গানা"র সম্প্রসারে-অত্যাচারে অথবা শুন-শুনানিতে নিত্যই মালুম হয়।"

আমরা সিনেমা—বিরোধী নহি—সিনেমা ছবি দেখি, দু-চারখানি বাঙ্গলা এবং ইংরেজী ছবি (টকি) ভালও লাগে, কিন্তু তাই বলিয়া সিনেমাকেই জাতীয় জীবনের চরম উন্নতি এবং সাংস্কৃতির ধারক ও বাহাক বলিয়া মনে করি না। দেশের পক্ষে এবং জাতির জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলিকে বাদ দিয়া সিনেমাকে অগ্রাধিকারও আমরা দিতে পারি না।

একথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে—সিনেমা-শিল্পে বহু বাঙ্গালী নির্ভর করে, কিন্তু তাহার সংখ্যা নগণ্য। আমাদের দেশে সিরেমাকে ঠিক 'ব্যবসা' বলা যায় কিনা—তর্কের বিষয়। এ-দেশে যাঁহারা সিনেমা চিত্র-নির্ম্মাণে অর্থ এবং আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহাদের মধ্যে এমন একজনের নামও করা যায় না, যিনি শেষ পর্য্যন্ত প্রচুর বিত্ত লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। বাঙ্গলা দেশে ম্যাডান থিয়েটার্স, নিউ থিয়েটার্স, কালি ফিল্মস, রাধা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া, এম.পি. প্রভৃতি একদা-খ্যাত সিনেমা কোম্পানিগুলির অস্তিত্ব আজ নাই—এবং এই সব প্রতিষ্ঠানের মালিকগুষ্টিও আজ বিত্ত এবং বৃত্তিহীন। যে চিত্রপ্রতিষ্ঠানের এবং প্রতিষ্ঠানের মালিকের নাম ও খ্যাতি ছিল ভারতজোড়া, সেই নিউ থিয়েটার্স'ও আজ কারবার বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অথচ এই নিউ থিয়েটার্স'ই একদা ভারতীয় চিত্রশিল্পের অগ্রগতির জন্য যাহা করে, তাহার তুলনা নাই! সিনেমাকে যদি ব্যবসা বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে এই ব্যবসায়ে পয়সা করেন একমাত্র পরিবেশক এবং প্রদর্শক। তাঁহাদের লোকসান হয় না, কারণ তাঁহাদের ঘরের কড়ি দিয়া ছবি তৈয়ার করিতে হয় না।

ভারতের অন্য প্রদেশের কথা বলিতে চাহি না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আজ বিবিধ সমস্যা—মানুষের জীবনকে সর্ব্বদিক হইতে বিড়ম্বিত করিয়া তুলিয়াছে। দেশে শিক্ষার অভাব, গৃহের অভাব, খাদ্যাভাবের কথা না বলাই ভাল। বেকার-সমস্যা আজ শিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বাঙ্গালী কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিদের ধীর এবং নিশ্চিত অবলুপ্তির দিকে ঠেলিয়া দিতেছে—দেশের এই অবস্থায় হঠাৎ সিনেমা-গৃহের সংখ্যাবৃদ্ধির কি কারণ ঘটিল জানি না। মানুষ যখন লোহা, সিমেণ্ট, ইষ্টক প্রভৃতির অভাবে দেড়-দুই কামরা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিতেছে না, ঠিক সেই সময় হঠাৎ আরও নূতন সিনেমা গৃহ নির্ম্মাণ কি এতই অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল?

আরও ভাবিবার কথা—নূতন যে-সব সিনেমা নির্ম্মিত হইবে, তাহার কয়টি হইবে বাঙ্গালীর টাকায়; বাঙ্গালীর টাকায় যদি বা সিনেমা নির্ম্মিত হয়, তবে তাহা কতদিন বাঙ্গালীর হাতে থাকিবে? আরও চিন্তার কথা—বাঙ্গলা দেশের সিনেমাগুলির শতকরা অন্ততপক্ষে ৭০।৮০টি সিনেমাতে হিন্দী—বাজে ন্যক্কারজনক হিন্দী ছবিই প্রদর্শিত হয় এবং এই সকল ছবি দেখিয়া বাঙ্গলার যুবক যুবতী, বালক-বালিকারা যে-সব আদব-কায়দা, বাতচিৎ এবং 'দিল দেকে দেখো' বিষয়ে অতি উৎসাহী হইয়া পড়িতেছে—তাহাতে উদ্বেগের কারণ আছে যথেষ্ট। বাঙ্গলা ছবি সাধারণত "ভালগার" হয় না, কিন্তু হিন্দী ছবির প্রভাবে এই সব বাঙ্গলা ছবি—বাঙ্গালী দর্শকমহলে খুব আদর পায় বলিয়া মনে হয় না। হিন্দী ছবির আধিক্যে এবং 'নয়ন-মন-মজান' ভাবভঙ্গি এখন বাঙ্গালী দর্শকমহলে প্রিয়তর হইতেছে—সিনেমার সংখ্যা বাড়িলে আরও হইবে। ফলে বাঙ্গলা ছবির অতি সীমিত ক্ষেত্র আরও সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা এবং বিবিধ প্রকার গুরুতর সমস্যার কথা মনে রাখিয়া হতভাগ্য বাঙ্গলা দেশে এখন আর কোনক্রমেই সিনেমা-গৃহের সংখ্যা বাড়াইতে দেওয়া হইবে একান্ত অনুচিত এবং আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে অতীব ক্ষতিকর। সিনেমার সংখ্যা না বাড়াইয়া—বাঙ্গলা দেশে যদি বাঙ্গালীর অধীনে সিনেমাগুলিতে কেবলমাত্র বাঙ্গলা ছবি দেখান, অন্তত শতকরা ৯০টি বাঙ্গলা ছবি, বাধ্যতামূলক করা হয়—বিষম অমঙ্গলের মধ্যেও কিছু মঙ্গল অন্তত আর্থিক দিক্ দিয়া হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের শাসক মহল আশা করি—সকল দিক আবার সবিশেষ চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

সীমান্তে পাকিস্তানী পুলিসের 'ক্রনিক' হামলা!

কয়েকদিন পূর্ব্বে বসিরহাট মহকুমার খোজাডাঙ্গা

সীমান্ত পুলিশ ফাঁড়ির সম্মুখ হইতে দিনের বেলায় একজন ভারতীয় পুলিশ কনষ্টেবল পাক সীমান্ত পুলিশ দল কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে ভারতীয় পুলিশের পক্ষ হইতে নাকি একটি গুলীও বর্ষিত হয় নাই।

প্রকাশ যে, বেআইনীভাবে ভারতে আগত কয়েকজন পাকিস্তানীকে আদালতের আদেশ অনুযায়ী বহিস্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে একজন পুলিশ কনেস্টবল তাহাদিগকে লইয়া খোজাডাঙ্গা সীমান্তে উপস্থিত হয়। সে ভারত সীমান্তে দাঁড়াইয়া পাকিস্তানীদিগকে সীমা পার করিয়া দিয়া তাহাদের গতিপথ নিরীক্ষণ করিতেছিল। বহিস্কৃত পাকিস্তানীগণ সীমান্তের অপর পারে গিয়া পাকিস্তানী পুলিশের সহিত কথাবার্ত্তা বলে। সঙ্গে সঙ্গে একজন পাক-পুলিশ কিছু বলিবার জন্য ভারত সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হয়; আরও কয়েকজন পাকিস্তানী পুলিশ তাহাকে অনুসরণ করে। ভারতীয় পুলিশ কনেস্টবলটির সহিত তাহাদের কি যেন কথা হইল। হঠাৎ পাকিস্তানী পুলিশেরা ভারতীয় কনেষ্টবলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে টানিয়া পাকিস্তান এলাকায় লইয়া যায়। এই ঘটনা ঘটে ভারতের খোজাডাঙ্গার সীমান্ত পুলিশ ফাঁড়ির অতি সন্নিকটে। ভারতীয় কনেষ্টবলটি একজন বিহারী মুসলমান।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সরকারের ঔদাসীন্যের ফলে এই সীমান্তে ভারতের একশত গজের অধিক প্রশস্ত এলাকা পাকিস্তান সরকার বলপূর্ব্বক দখল করিয়া রাখিয়াছেন।

র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ফলে পশ্চিমবঙ্গের পাকিস্তানের সহিত কোন প্রাকৃতিক সীমারেখা নাই। বসিরহাট মহকুমার ইটিণ্ডা পঞ্চায়েতের খোজাডাঙ্গা সীমান্ত পুলিশ ফাঁড়ির পাশ দিয়া একটি ছোট খাল প্রবাহিত। ঐ খালের উপর একটা পাকা সেতুও আছে। ভারতীয় দলিল-দস্তাবেজে উক্ত খালের অপর পারে একশত গজ প্রশস্ত জায়গা ভারতের বলিয়া চিহ্নিত আছে। অথচ ভারতের সেই জায়গায় পাকিস্তানী সীমান্ত পুলিশের ঘাঁটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে কোন আপত্তি উঠিল না। পরন্তু সেতুর অর্দ্ধেকটা পাকিস্তানকে দেওয়া হইয়াছে। এই সীমান্তের পাইকের-ডাঙ্গা এইরূপ অপর একটি অরক্ষিত এলাকা। যে-কোন মুহূর্ত্তে এই সীমান্ত-পথ দিয়া পাকিস্তানীরা অনুপ্রবেশ করিতে পারে। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই শেষোক্ত এলাকা মুসলমান-অধ্যুষিত।

এই প্রকার ঘটনা অহরহ ঘটিতেছে, কিন্তু 'হিন্দী' প্রচারে অতি-তৎপর ভারত এবং রাজ্য সরকারের এ-বিষয় কোন মাথাব্যথা আছে বলিয়া মনে হয় না। পাকিস্তানী হামলা বন্ধ এবং প্রতিরোধ করিবার সহজ ব্যবস্থা সরকার বাহাদুর গ্রহণ করিবেন না কেন জানিতে ইচ্ছা হয়। 'দাঁতের বদলে দাঁত এবং নাকের বদলে নাক' —এই নীতি যে-কোন আত্মসজাগ এবং দেশের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ সরকার গ্রহণ করিয়া থাকেন—কিন্তু আমাদের অহিংস সরকার ক্রমাগত এক গালে চড় খাইয়া অন্য গালটি চড় খাইবার জন্য ফিরাইয়া দিতেছেন!

পাকিস্তানের হাতে সর্ব্বভাবে সর্ব্বপ্রকার অপমান-অভদ্রতা আমাদের সরকার অতি বিনীত এবং নম্রভাবে স্বীকার করিয়া চলিয়াছেন, পাকিস্তানের অপ-জন্মের পর হইতেই! ভারত সরকার হয়ত মনে করেন—এইভাবে পাকিস্তানী অনাচার-অভদ্রতা স্বীকার দ্বারা তাঁহারা বিশ্বের দরবারে প্রশংসা-গৌরব অর্জ্জন করিতেছেন, বাহবা পাইতেছেন। কিন্তু আসলে তাঁহারা পাইতেছেন ক্লৈব্যের চরমতম ঘৃণা এবং কাপুরুষতার তিলক!

আমাদের রাজ্য সরকার কন্ট্রোল-র‍্যাশন ব্যবস্থা সার্থক করিতে যে বিষম পুলিশবাহিনী নিযুক্ত করিয়াছেন —তাহাতে এক ছটাক চাউলও হয়ত যাদবপুর-দমদম হইতে কলিকাতায় পাচার হইবেনা—কিন্তু সীমান্তবরাবর যে চোরাপথে হাজার হাজার বস্তা চাউল, চিনি, গম, আটা-ময়দা পাকিস্তানে পাচার হইতেছে—তাহা রোধ করা সম্ভব হইয়াছে কি? কেন হয় নাই? পুলিশের সাহায্য-সহায়তায় এই কারবার এখনও চলিতেছে না কি? এ-প্রশ্নের জবাব পাইব না জানি।

সাধারণ লোকেও এখন স্পষ্ট কথায় বলিতেছে—যে-সরকার দেশ এবং দেশের মানুষকে রক্ষা করিবার শক্তি রাখেন না, সেই সরকারের একমাত্র কর্ত্তব্য—অবিলম্বে গদি পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান। স্বেচ্ছায় ইহা না করিলে শেষ পর্য্যন্ত অনিচ্ছায় করিতেই হইবে।

বন্ধ ক'রো না পাখা

শ্রীসমর বসু

ধীরেনবাবুর সংসারটা খুব বড় না হ'লেও, ঠিক ছোট বলা যায় না। স্বামী স্ত্রী ছ'টি ছেলেমেয়ে, বাপ-মা-মরা একটি ভাগনে। কিছুদিন হ'ল সংসারের জনসংখ্যা কিছু কমেছে, কিন্তু তাতে ধীরেনবাবুর কোন সুসার হয় নি। বরং আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে।

খেতে বসে স্ত্রীর সঙ্গে সেই প্রসঙ্গেই আলোচনা হচ্ছিল। সামনে পুজো আসছে, কি করে কি হবে। ধীরেনবাবু একা কি করে সব দিক সামলাবেন।

—এতদিন যে-করে সামলেছ সেই ভাবেই সামলাবে। কথাগুলি একটু ঝেঁজেই বলেছিলেন অপর্ণাদেবী।

—এতদিন আমার সংসারে মৃণাল ছিল, দীপা ছিল। এখন তারা নেই।

—নাই বা থাকল, তাদের ভরসায় আমাদের থাকতে হবে নাকি!

তারপর কথা কাটাকাটি, তর্ক-বিতর্ক। বাইরে তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে।

ভাতের থালা ঠেলে দিয়ে ধীরেনবাবু উঠে পড়লেন।

—তা তুমি উঠলে কেন! খেয়ে নাও।

ধীরেনবাবু কোনও কথা শুনলেন না। মুখ-হাত ধুয়ে এসে ঘরে বসে গুম হয়ে রইলেন।

অপর্ণাদেবীও কিছু মুখে দিলেন না। রান্নাঘরে বসে গজর গজর করতে লাগলেন আর কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘরের শেকল তুলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

মৃণাল চলে যাবার পর থেকেই ধীরেনবাবু কেমন যেন খিটখিটে হয়ে গেছেন। কোনও কাজই বেশ মন দিয়ে করতে পারেন না। অফিসেও অনেকের সঙ্গে খিটি-মিটি লাগে। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা এসে বোঝাবার চেষ্টা করেন, ধীরেনবাবু দোষ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেন, কিন্তু নিজেকে শোধরাতে পারেন না।

আশাভঙ্গজনিত মনোবেদনা,—না অন্য কিছু! ধীরেনবাবু ভাবতে লাগলেন।

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ওপরের বিক্ষিপ্ত মনটা ক্রমশ স্থির হয়ে আসছে। নিজের সম্বন্ধে, স্ত্রীর সম্বন্ধে, বিশেষ করে—মৃণাল-দীপা এবং জয়ন্তী সম্বন্ধে অনেক ভাবনা মনটাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলল। ধীরেনবাবু চিন্তামগ্ন হ'লেন।

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে একবার রাস্তার দিকে তাকালেন। বারান্দা থেকে বড় রাস্তাটা স্পষ্ট দেখা যায়। লোকজন যাওয়া-আসা করছে। দু'-একখানা সাইকেল রিক্সাও। চার-পাঁচটা মেয়ে দল বেঁধে চলেছে, হাতে বই-খাতা। বোধহয় কলেজ থেকে ফিরল।

—চিন্তায় বাধা পড়ল। মনটা আবার বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

—আজ কি তা হ'লে কলেজ খোলা! অফিসের ছুটি, স্কুলের ছুটি। অথচ কলেজ খোলা কেন! হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ওরা কলেজ থেকে ফিরছে না, ফিরছে শরদিন্দুর বাড়ী থেকে। স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শরদিন্দু চৌধুরীর কাছে মেয়েগুলো পড়ে।

দীপাও পড়ত। দীপাও ঠিক ওদের মত সন্ধ্যের আগে ফিরে আসত। সপ্তাহে মাত্র দু'দিন যেতে হ'ত তাকে। শরদিন্দু ভালই পড়ায়। ওর কাছে যারা পড়েছে, তারা সবাই ভালভাবেই পাশ করেছে। দীপাও ভাল রেজাল্ট করেছিল। ইচ্ছে ছিল এম. এ. পড়ে।

কিন্তু ধীরেনবাবু ঠিক মত দিতে পারেন নি। হ্যাঁ-না, কিছুই বলতে পারেন নি। কেননা অন্য ছেলে-মেয়েরাও তখন স্কুলে ঢুকেছে। বড়রা উঁচু ক্লাসেও উঠেছে। আর সেই সময় ভাগ্নেটাও এসে পড়েছিল। মৃণালের চাকরিটাও তখন হয় নি। সবদিক ভেবেচিন্তে তাই তাঁকে চুপ করে থাকতে হয়েছিল। সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না ধীরেনবাবুর।

অপর্ণাদেবী কিন্তু স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন, দু'দিন পরে যখন পরের বাড়ীর হেঁসেলে গিয়ে কবি, তখন ঐ

বইগুলোর কি দশা হবে ভেবে দেখেছিস। রাতের পর রাত জেগে, নোট মুখস্থ করে, যে কাগজখানা তুই নিয়ে আসবি, বাইরের থেকে তাকে হয়ত অনেকেই সম্মান দেবে কিন্তু দুদিন পরে দেখবি,তুইও আমাদের মত কাণা-কড়ির মূল্যে বিকিয়ে গেছিস। আমাদের ঘটে কিছু ছিল না, তাই ভাগ্যকে দোহাই দিয়ে বেশ কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু তুই ত তা পারবি না। তাই বলছি, আর না, যা পেয়েছিস তাই ঢের।

ধীরেনবাবু স্ত্রীর কথায় সায় দিতে পারেন নি। বলেছিলেন, তোমাদের সময় যে অবস্থা ছিল, এখনও তাই আছে না কি।

—নিশ্চয়ই আছে। চিরকাল থাকবে। ঘর-করণার কাজ মেয়েদেরই করতে হবে। তা সে লেখাপড়া শিখুক আর নাই শিখুক। সুতরাং আর কলেজে না পাঠিয়ে যাতে পরের বাড়ী পাঠাতে পার, সেই ব্যবস্থাই বরং কর।

—কিন্তু পরের বাড়ী পাঠাব বললেই ত আর পাঠান যায় না।

—তা ত যায় না। মেয়ে পার করতে হ'লে অনেক কিছুই চাই। অতএব টাকাকড়ি যতদিন না জোগাড় করতে পারছ, ততদিন ও ঘরেই থাকুক। কলেজে বেরুলে আবার তুমি সব ভুলে বসবে। তোমার কোনও খেয়ালই থাকবে না।

—কি খেয়াল থাকবে না?

—মেয়ে তোমার বড় হয়েছে। তার বিয়ে দেওয়া উচিত।

—আমি কি বলেছি, বিয়ে দেব না?

—না, তা অবশ্য বল নি। কিন্তু তার ব্যবস্থাও ত কিছু কর নি। কলেজে না বেরিয়ে, ও যদি ঘরের মধ্যে জটুবুড়ি হয়ে বসে থাকত, তা হ'লে ঐ ভাবনাটাই তোমায় পেয়ে বসত। এবং তার ব্যবস্থাও তুমি করতে।

ধীরেনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন,—তা হয়ত সত্যি।

কিছুদিন পর থেকেই ধীরেনবাবু চেষ্টা করতে লাগলেন কি করে দীপাকে পার করা যায়। মৃণালের চাকরি হয়েছে। ভালই চাকরি। এখন অফিস থেকে ধারধোর করে দীপার বিয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মাসে মাসে মাইনে থেকে যা কাটা যাবে, মৃণালের উপার্জন থেকে তা পূরণ হয়ে গিয়েও কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে। সুতরাং সংসারের চাকা বন্ধ হয়ে যাবে না। এই সব ভেবেচিন্তে ধীরেনবাবু চেষ্টা করতে লাগলেন। এখান-ওখান থেকে দেখেও গেল অনেকে, কিন্তু কেউ পছন্দ করল না।

কি করেই বা করবে! দীপার স্বাস্থ্য খারাপ। রোগাই বলা চলে। অত্যধিক পড়াশোনা করে এবং পুষ্টিকর খাদ্য খেতে না পেয়ে দীপার স্বাস্থ্য গেছে।

তা ছাড়া দীপার রংও ময়লা। তার জন্যে না কি ধীরেনবাবুই দায়ী।

—মায়ের মত সুন্দরী না হয়ে, বাপের মত কুৎসিত হয়েছে ব'লেই, দীপাকে কেউ পছন্দ করছে না।

ছেলেমেয়েদের সামনেই অপর্ণাদেবীর এই কদর্য মন্তব্য ধীরেনবাবু সহ্য করতে পারলেন না। বললেন, দীপা শুধু আমার দেহের রং পায় নি, বুদ্ধির জৌলুসও পেয়েছে। এবং সেই জন্যেই দীপা গ্র্যাজুয়েট হ'তে পেরেছে। অবশ্য আমার মত ইংরাজীতে অনার্স পায় নি, পেয়েছে বাঙলায়।

—হ্যাঁ, ঐ অনার্স নিয়ে ধুয়ে ধুয়ে জল খাও। অনার্স দেখে কেউ আর দয়া করে বিনাপয়সায় ওকে ঘরে তুলবে না। কিন্তু রূপ থাকলে কি হ'ত বলা যায় না।

রূপ দেখেই ধীরেনবাবুর মা, অপর্ণাকে বিনা যৌতুকেই ঘরে এনেছিলেন। বহুবার বহু প্রসঙ্গে এই খোঁটা দিয়েছেন অপর্ণাদেবী। এই মুহূর্তেও সেই লোভ আর সামলাতে পারলেন না।

মেয়েকে উপলক্ষ্য করে মা-বাবার এই কলহ, সেদিন শুধু দীপার মনটাকে ক্ষত-বিক্ষত করে নি, মৃণালকেও ক্ষুব্ধ করেছিল। দীপা সেটা বুঝতে পেরেছিল, তাই সেই-দিন রাত্রেই মৃণালের কাছে গিয়ে দীপা বলেছিল, তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম, ভরসা দাও ত বলি।

—বল না, আজ আবার আমায় এত ভয় কেন! কোনও দিন ত আমাকে 'কেয়ার' করিস নি।

—সেই জন্যেই ত আর কারোর কাছে না গিয়ে

তোমার কাছে এলাম। তোমাকেই একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

মুচকে হেসে মৃণাল বলল, তোকে আর বলতে হবে না। আমি সব বুঝতে পেরেছি। আমিও এতক্ষণ সেই কথাই ভাবছিলাম। একটা মতলবও স্থির করে রেখেছি। দেখি কতদূর কি করতে পারি। কিন্তু একটা কথা, এখন যেন কেউ টের না পায়।

—আমিও অই চাই।

—তারপর ভাইবোনে অনেক পরামর্শ হ'ল। দু'দিন ধরে কি সব লেখালেখি হ'ল। মৃণালের সঙ্গে দীপা কোথায় বেরিয়ে গেল। বিকাল বেলায় আবার দু'জনে ফিরে এল কিন্তু কাউকে কিছু বলল না। বাবা-মা, কেউই কিছু বুঝতে পারলেন না।

যেদিন পারলেন, সেদিন ধীরেবাবু আনন্দে উচ্ছল হয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাজারে চলে গেলেন, খাবার-দাবার কিনে আনবার জন্যে।

আর বাড়ীসুদ্ধ সকলকার রকম-সকম দেখে অপর্ণা-দেবী উনুন খুঁচকে, আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকার রান্না-ঘরে গুম হয়ে বসে রইলেন।

আগের দিন দীপাকে দেখতে এসেছিলেন মণিশঙ্কর-বাবু। পাত্রের মামা। মৃণালের অফিসেই কাজ করেন। দেখে তাঁর অপছন্দ হয় নি। লেখাপড়া-জানা মেয়েদের প্রতি তিনি একটু বেশী শ্রদ্ধাশীল। তাই বোধহয় ধীরেন-বাবুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, আপনার মেয়ের স্বাস্থ্যটা হয়ত খারাপ, কিন্তু সেটা বাহ্যিক। অন্তরে যা সম্পদ্ আছে সেটা গর্বের। সে-সম্পদ্ যে-ঘরে যাবে, সে ঘরকেও সমৃদ্ধ করে তুলবে। সুতরাং এত বড় লাভ আমরা ছাড়ব কেন! তবে আমার দিদিকে একবার দেখাতে হবে। কেননা, তিনিই ত ঘর করবেন। সেই-দিনই না হয় পাকাপাকি কথা হবে।

ধীরেনবাবু কৃতজ্ঞতায় আনত হয়ে বললেন, দেখবেন যাতে শুভকাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। আমি আর কি বলব বলুন।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় মৃণাল যখন অফিস থেকে ফিরল, ধীরেনবাবু তখন এই বারান্দাতেই বসে ছিলেন। কিছুক্ষণ আগে তিনিও ফিরেছেন অফিস থেকে। তখনও হাত-মুখ ধোওয়া হয় নি। বারান্দায় বসে বসে একটু বিশ্রাম করছিলেন। দূর থেকে দেখতে পেলেন মৃণাল আসছে। হাতে সন্দেশের বাক্স। ভাবলেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই মণিশঙ্করবাবুর কাছ থেকে কোনও ভাল খবর পেয়েছে। নইলে সন্দেশ কেন!

—দীপা, দীপা,—দীপা কোথায় গেল, বলতে বলতে মৃণাল সোজা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

ধীরেনবাবু তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞেস করলেন, কেন রে, দীপাকে কেন!

—একটা শুভ খবর আছে।

—তা ত বুঝতে পারছি। মণিবাবু কিছু বলেছেন বুঝি!

—কে মণিবাবু!—ও, না না, তিনি কিছু বলেন নি।

—তা হ'লে আবার কি শুভ খবর!—ধীরেনবাবু জ্র কুঁচকে মৃণালের দিকে তাকালেন।

আর ঠিক সেই সময় মাথা নীচু করে দীপা এসে ঘরে ঢুকল।

ওকে দেখে মৃণাল যেন আরও উচ্ছল হয়ে উঠল। বলল, হয়ে গেছে! এই নে তোর চিঠি।'

দীপা লজ্জায়, সংকোচে এবং গভীর আনন্দে বিহ্বল হয়ে রইল। তাড়াতাড়ি হাত বাড়াতে পারল না। তার আগেই ধীরেনবাবু চিঠিটা এক রকম কেড়ে নিয়েই বললেন, আমার চশমাটা নিয়ে আয় ত দীপা।

মৃণালের দিকে চেয়ে মুচকে হেসে দীপা চশমা আনতে চলে গেল।

ভাইবোনে ওরা ভেবেছিল, বাবা হয়ত খুব রেগে যাবেন। ওদের সঙ্গে কোনও কথা বলবেন না। কিন্তু ঠিক তার উল্টো হ'ল। চিঠি পড়েই চীৎকার করে উঠলেন ধীরেনবাবু, বললেন, এত বড় একটা সুখবর, তা কি শুধু এক বাক্স সন্দেশ দিয়ে প্রচার করা যায়। চল, আমার সঙ্গে বাজারে চল, তোরা দু'জনেই চল।

সেদিন বাড়ীতে ছোটখাটো একটা উৎসব হয়েছিল। অপর্ণাদেবী কিন্তু তা ভাল মনে নিতে পারেন নি। ওঁর

মনে হয়েছিল এতে বুঝি তিনি হেরে গেলেন। কিন্তু তবুও উৎসবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন এবং সে-সময় তাঁর মুখে হাসিও লেগেছিল।

মণিশঙ্করবাবুর সার্টিফিকেট নিয়ে দীপাকে আর পরের ঘরে যেতে হ'ল না। ভাল সওদাগরী অফিসে একটা চাকরি পেয়ে গেল দীপা। বিয়ের কথাবার্তা আপাততঃ চাপা পড়েই রইল।

তারপরও কয়েক বছর কেটে গেছে। সংসারের অবস্থা বেশ সচ্ছল হয়ে উঠেছে। অনেকগুলো টাকা একসঙ্গে ঘরে আসে, সুতরাং ঘরটার চেহারা ফেরে, সেই সঙ্গে ঘরের বাসিন্দাদেরও। ধীরেনবাবু নিশ্চিন্তেই আছেন, কোথাও কোনও উদ্বেগের কারণ নেই।

কিন্তু হঠাৎ যেদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে দীপা এবং আর একটি ছেলে এসে ধীরেনবাবুকে প্রণাম করল এবং মৃণাল পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, ইনি আমাদের অফিসেই কাজ করেন, আমার বন্ধু ; দীপারও। নাম—সমীরণ মুখার্জি। তখন ধীরেনবাবু স্তম্ভিত হ'লেন।

ঐটুকু বলেই মৃণাল থামলেও, বাকিটুকু ধীরেনবাবু অনায়াসেই বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝে কিন্তু খুশী হ'তে পারেন নি; যদিও হাসিমুখেই ওদের আশীর্বাদ করেছিলেন।

অপর্ণাদেবী কিন্তু মনে মনে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। সে-আনন্দ প্রকাশও করেছিলেন। মৃণাল-দীপার বন্ধু সমীরণকে আদর করে ঘরে বসিয়েছিলেন। নিজের হাতে নানা রকম রান্নাবান্না করে খাইয়েছিলেন। যাবার সময় বলেছিলেন—দু'জনে তোমরা সুখী হও, দীর্ঘজীবী হও।

চাকরি-করা মেয়েরা সহজে বিয়ে করতে চায় না, এই ধরনের একটা ধারণা অপর্ণাদেবীকে মাঝে মাঝে পীড়িত করে তুলত। দীপা বিয়ে না করলে, পরের দুটোর বিয়ে দেওয়া আরও শক্ত হয়ে উঠবে, এ-আশঙ্কাও মনকে উদ্বিগ্ন করত। তাই সমীরণের সঙ্গে 'রেজিষ্ট্রেশন' হ'য়ে যাওয়াতে অপর্ণাদেবী খুবই খুশী হয়েছিলেন। যাক্, মেয়েটা তা হ'লে আর আইবুড়ো ধিঙ্গী হয়ে রইল না। শ্বশুর-শাশুড়ী নিয়ে ঘরকরণা করবে। এটা কম আশ্বাসের কথা নয়! এবারে যেন অপর্ণাদেবীই জিতে গেলেন। ধীরেনবাবু মুষড়ে পড়লেন।

মুষড়ে পড়লেন দু'টি কারণে। প্রথম কারণ,—সংসারের আয়ের অঙ্ক থেকে মাসে মাসে বেশ মোটা টাকা বাদ পড়বে। সে-ঘাটতি মেটাবার সামর্থ্য নেই ধীরেনবাবুর। দ্বিতীয়তঃ, দীপা নিজেই তার স্বামী নির্বাচন করে নেওয়াতে ধীরেনবাবুর মনে হয়েছিল, দীপা যেন তার বাবাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, নিতান্ত স্বার্থপরতার জন্যেই তার বাবা ইচ্ছে করে এত দিন ধরে তার বিয়ের চেষ্টা করেন নি। তাই সে নিজে, নিজের ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে। এই দুটো চিন্তা, বিশেষ ক'রে শেষেরটা, ধীরেনবাবুকে বহুদিন ধ'রে অস্থির ক'রে তুলত। কোনও কাজেই ভাল ক'রে মন দিতে পারতেন না। দেহে-মনে কেমন যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন।

অনেক দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে মেয়েকে তিনি লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন ; অবশ্য তখন এ আশা করেন নি যে, মেয়ে তাঁকে চাকরি করে খাওয়াবে। তবে চাকরি যখন করতেই গেল, তখন একটু একটু করে অনেক রকমের বাসনাই মনের কোণে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু আজ আর ধীরেনবাবুর কোনও আশ্বাসই রইল না। দীপা এখন পরের ঘরের বউ। তার উপার্জনের ওপর ধীরেনবাবুর আর কোনও দাবিই নেই, থাকা উচিতও নয়। সে-টাকা এখন তার স্বামীর, তার শ্বশুরের। মা-বাবার সমস্ত দাবি একদিনেই তাঁবাদি হয়ে গেল। অথচ দীপা তাদেরই কাছে মানুষ হয়েছে। যে বিদ্যা-বুদ্ধির সাহায্যে দীপা আজ অর্থ উপার্জন করছে, সে-সবই দীপা তার বাবার পরিশ্রমের বিনিময়েই লাভ করতে পেরেছে। সমীরণ কিংবা তার বাবা এ বিষয়ে কোনও সাহায্যই করে নি।

তা হ'লে মেয়েদের লেখা-পড়া শিখিয়ে লাভ কি। মূর্খ মেয়ে পার করতে গেলে, কিছু না হয় বেশী খরচ হবে, লেখাপড়ার পেছনেও ত কম পয়সা গলে যায় না! লেখাপড়া জানে বলেই ত আর কেউ বিনা পয়সায় মেয়েকে ঘরে তোলে না (উপহার বাবদ সমীরণকেও অনেক কিছুই দিতে হয়েছে), তারপর সেই লেখাপড়ার জোরে মেয়ে যদি চাকরি পায়, তার ফল ভোগ করবে

ভদ্রলোক। যারা রোপন করল, অনেক যত্নে পালন করল, তারা শুধু ফলবতী বৃক্ষের দিকে নিরাশ চোখে চেয়েই থাকবে। ফলভোগ করবে যারা, তার কৃতজ্ঞতাটুকুও জানাবে না। তাই বোধহয় মণিশঙ্করবাবু বলেছিলেন, এ সম্পদ্ যে-ঘরে যাবে, সে-ঘরকেও সমৃদ্ধ করে তুলবে।

ভাবতে ভাবতে ধীরেনবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন। বারান্দায় পায়চারি করতে করতে এক সময় রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

—শুনছ, আমি এবার মৃণালের বিয়ে দেব। চাকরি করা মেয়ে ঘরে নিয়ে আসব।

—কেন? বোয়ের পয়সা না হ'লে বুঝি সংসার চলবে না।

—কি করে চলবে! দীপার টাকাগুলো আসবে কোত্থেকে।

—ও, এই কথা। কিন্তু সব দিক ভেবে দেখেছ। সব মেয়েই যে দীপার মত হবে তার কি কোনও নিশ্চয়তা আছে। তা ছাড়া, আমার ত মনে হয়, মৃণাল ঠিক সমীরণের মত নয়। সুতরাং সব দিক ভেবে-চিন্তে কাজ করা উচিত। বেনোজল ঢুকে শেষকালে যেন ঘ'রো জলকে বার করে না নিয়ে যায়।

—তার মানে?

—ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভাব, তা হ'লে অনায়াসেই তার মানে বুঝতে পারবে।

ধীরেনবাবু ঘরে এসে বসলেন। সুবিধা-অসুবিধা, অনেক কথা ভাবলেন। ভেবে নিজের সিদ্ধান্তেই স্থির হয়ে রইলেন।

অপর্ণাদেবী আর কিছু বললেন না। বয়সে যত না হোক, ধ্যান-ধারণায় তাঁকে প্রাচীন বলাই চলে। দিনগুলো যে-ভাবে দ্রুত বদলে যাচ্ছে, তার সঙ্গে তিনি তাল রাখতে পারছেন না। তাই ইদানিং আর বিশেষ কথা বলেন না। চুপচাপ থাকেন।

ওদের সংসার, ওরা যা ভাল বুঝবে তাই করবে, আমার দু'বেলা দুটো রান্না করে দেবার কথা, যদ্দিন গতর বইবে, তদ্দিন সেটুকু করতে পারলেই নিশ্চিন্ত।...

সুতরাং মায়ের মতামত না নিয়েই মৃণালের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন তার বাবা। জয়তী বলে একটি মেয়ের সঙ্গে মৃণালের একদিন বিয়ে হয়ে গেল। জয়তীরা ছিল পালটি ঘর, তাই হিন্দুমতেই বিয়ে হ'ল। দীপার মত রেজিষ্ট্রেশন করতে হ'ল না। তা ছাড়া জয়তী শুধু গ্র্যাজুয়েট নয়, সেই সঙ্গে 'ল' পাশও করেছে। আধা-সরকারী অফিসে কাজ করে অফিসর গ্রেডে। মাইনে পায় দীপার চেয়ে অনেক বেশী।

অনেক দিন আগে মৃণালের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ট্রামে। যাতায়াতের পথে। তারপর সহযাত্রী হিসেবে সে-পরিচয় আরও নিবিড় হ'ল। জানাশোনা হ'ল আরও গভীর। মনের মধ্যে নানা রঙের ছবি আঁকা সুরু হয়ে গেল। রঙে-রেখায় জীবন্ত হয়ে উঠল সে ছবি।

ধীরেনবাবুর সংসার আবার উচ্ছল হয়ে উঠল। কিন্তু অপর্ণাদেবী যেমন একপাশে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন, তেমনিই রইলেন। সংসারের উচ্ছলতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না। কিংবা তিনি ইচ্ছে করেই স্পর্শ বাঁচিয়ে দূরে রইলেন।

দীপা থাকতেও যেমন, জয়তী আসতেও ঠিক তেমনি একলা হাতে সংসারের যাবতীয় কাজ তাঁকে করতে হয়। এ-দিকটায় কেউ ফিরেও তাকায় না। তাঁর যা দুঃখ, তা তাঁর নিজস্ব, কেউ তার অংশ এতকাল নেয় নি, ভবিষ্যতেও নেবে না।

আনন্দমুখর সংসারের কল-কোলাহলের মাঝখানে থেকেও অপর্ণা দেবী সম্পূর্ণ একা-একা বসে বসেই তাঁর নিজের দুঃখের কথা ভাবেন। ভেতরের বেদনা ভেতরেই চাপা থাকে; বাইরের কেউ তা জানতে পারে না।

কিন্তু বাইরের চেহারাটাই একদিন ধীরেনবাবুকে চিন্তিত করে তুলল। বহুদিন পরে স্ত্রীর দিকে ভাল করে তাকালেন ধীরেনবাবু, বললেন, তোমার কি হয়েছে বল ত? অমন চুপচাপ থাক কেন। রাতদিন শুধু আপনমনে কাজই কর। কি এত কাজ তোমার!

—সে-কথা কোনও দিন কি জানতে চেয়েছ? মেয়ে পরের বাড়ী চলে গেল, বউ এল। তাতে হয়ত তোমার সুবিধে হয়েছে, কিন্তু আমার! আমার দিকে কেউ কি একবার ফিরেও তাকাল। কোন্‌দিন খেলাম কি না খেলাম কেউ এসে জিজ্ঞেসও করে না। তিরিশ বছর আগে কাঁধে যে জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছ, সে ত আমাকেই

বইতে হবে। দু'পাতা ইংরেজী যদি জানতুম, তা হ'লে হয়ত খাতির করতে। রাত-দিনের ঝি-চাকর রাখতে। তা যখন জানি না, তখন মুখ বুজে সব সহ্য করতে হবে বৈকি!

—অমন ঠেস দিয়ে কথা বলছ কেন?

—ঠেস আবার কোথায় দিলুম? চোখ বুজলেই টের পাবে। তখন বাপ-বেটায় কোনও কূল না পেয়ে ঝি-চাকরের দোরে দোরে ঘুরবে। তাতে পয়সা অনেক যাবে, অথচ এমন সুখটি পাবে না।

—সে কথা আমি পাঁচ শ' বার স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলে অমন গুম হয়ে থাকবে কেন?

—তা হলে কি করব। শিক্ষিত বউ পেয়েছি বলে পাড়া মাথায় করে রাখব? অত আদিখ্যেতা আমার সয় না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরেনবাবু বললেন, চাকরির মেয়াদও ফুরিয়ে এল। ভাবছি সামনের শীতে মাস চারেক ছুটি নিয়ে কোথাও বেড়িয়ে আসব। ছেলেমেয়েরা আর কেউ ছোটটি নেই। যা হোক ব্যবস্থা ওরা করে নেবে'খন। বৌমা সেদিক দিয়ে চৌকস মেয়ে। ও একলাই সব ম্যানেজ করতে পারবে।

অপর্ণাদেবী হেসে বললেন, তা হ'লে আমাকেও ছুটি দিচ্ছ! তিরিশ বছরে একসঙ্গে চার মাসের ছুটি। মন্দ কি! কিন্তু বৌমা কি একা সবদিক সামলাতে পারবে। সারাদিন খেটেখুটে এসে—

—ঐ ত তোমার দোষ। পারে না পারে তারা বুঝবে। আমাদের ত অত ভাববার দরকার নেই।

—পারলেই ভাল।

কিন্তু শীত আসবার আগেই অঘটন ঘটল।

জয়তীকে নিয়ে আলাদা ঘরভাড়া করলে মৃণাল। ধীরেনবাবু কোনও কথা বললেন না, আপত্তিও করলেন না। কেননা, ধীরেনবাবু জানতেন, আপত্তি করে কোন লাভ হবে না। জোর ক'রে কারোর কাছ থেকে ভক্তি-শ্রদ্ধা আদায় করা যায় না। ছেলে-বৌ, কেউ মূর্খ নয়। কর্তব্য-অকর্তব্য নির্দ্ধারণ করার মত ক্ষমতা তাদের আছে। তা সত্ত্বেও বুড়োবয়সে বাপ-মাকে ফেলে আলাদা থেকে যদি তারা সুখ পেতে চায়—পাক। তাতে ধীরেনবাবুর কিছু এসে-যাবে না।

এ-সব কিন্তু অভিমানের কথা। ধীরেনবাবু সত্যই ভেঙ্গে পড়লেন। এতখানি আঘাত সহ্য করার মত তাঁর মনের জোর ছিল না। তিনি অনেক আশা করেছিলেন। অনেক সুখের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল। ধীরেনবাবু আবার মুষড়ে পড়লেন।

অপর্ণাদেবী কিন্তু আগে থেকেই খানিকটা অনুমান করে রেখেছিলেন। তাই ধীর-শান্ত গলায় ধীরেনবাবুকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—এই সামান্য ব্যাপারে পুরুষ-মানুষের ভেঙে পড়া শোভা পায় না। এমন অবস্থা যে হ'তে পারে অনেকদিন আগেই ততোমাকে বলেছিলাম। আমি ত জানতাম, সব মেয়েই দীপার মত হ'তে পারে না, মৃণালও ঠিক সমীরণের মত নয়। দীপা সমীরণকে নিয়ে আলাদা হয় নি, সমীরও বাপ-মাকে ছেড়ে নিজের সুখটাই বড় ক'রে দেখে নি।

খেতে খেতেই কথাবার্তা হচ্ছিল। এক ঢোক জল দিয়ে গলার ভাতগুলোকে কোনও ক্রমে নামিয়ে দিয়ে ধীরেনবাবু বললেন, সামনে পুজো আসছে। আমি এখন একা সব দিক সামলাব কি করে।

—যেমন চিরকাল সামলে এসেছ, সেই ভাবেই সামলাবে?

—কিন্তু এতদিন ধরে সংসারটা যে অন্যভাবে চলেছে। পয়সা ছিল, অভ্যাসও তাই বদলে গেছল।

—এখন পয়সা নেই, আবার অভ্যাসটা বদলে ফেলতে হবে।

—দু'দিন পরে যখন 'রিটায়ার' করব, তখন?

—'রিটায়ার' ক'রেও ত অনেকে চাকরি করে, তোমাকেও সেই রকম একটা জুটিয়ে নিতে হবে।

—সে কি! তুমিও এই কথা বলছ! সারাজীবনই আমি খাটব না কি?

—আমি খাটছি না, তোমার সংসারে এসে আমার যে কি হাল হয়েছে, তা কি কোনও দিন চোখ চেয়ে দেখেছ!—বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন অপর্ণাদেবী। আর ধীরেনবাবু ভাতের থালা ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বাতাসে শীতের আমেজ। কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে নিলেন ধীরেনবাবু। গা'টা একটু গরম হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে মনেও জোর পেলেন। ভাবলেন, ঠিকই বলেছে অপর্ণা। একটা চাকরি জোগাড় করতে হবে। এখনই যদি 'পার্টটাইম্' কিছু পাওয়া যায়, তারও চেষ্টা করতে হবে। কারুর ওপর কোনও ভরসা নেই। দুনিয়ায় কেউ কারুর নয়। সমীরণ তার বাবাকে ছেড়ে আলাদা হয় নি, কেননা, তার বাবা একজন মোটা-মাইনের অফিসর। ধীরেনবাবুর মত যদি গরীব হ'ত তা হ'লে মৃণালের মত সমীরণও পালিয়ে যেত। দীপাও বাধা দিত না।

ছেলেমেয়েগুলো, যাদের পাখা গজায় নি, তাদের খাওয়াতে হবে, পরাতে হবে। তারপর যে দিন উড়ে যাবে, সেদিন মনে যেন কোনও ক্ষোভ না থাকে। অপর্ণা ঠিকই বলেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরেনবাবু পশ্চিম আকাশের দিকে তাকালেন। দেখলেন, একদল পাখী উড়ে চলেছে দূর দিগন্তে। শেষ আলোর রশ্মি এসে লেগেছে তাদের ক্লান্ত পাখায়।

—•—

রবীন্দ্রনাথের "রাজা"

অধ্যাপিকা আভালতা কুণ্ডু

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' এক সাঙ্কেতিক সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ্। ১৩১৭ সালের পৌষ মাসে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ সালে "King of the Dark Chamber" নামে গ্রন্থখানি অনূদিত হয়েছিল। মূল রচনা ও অনুবাদ উভয়ই স্বদেশে ও বিদেশে একখানি শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক বা রূপক নাট্যের পর্যায়ে স্থানলাভ করেছিল। কিন্তু প্রথমে কবি নিজে গ্রন্থটিকে রূপক ব'লে স্বীকার করতে নারাজ ছিলেন। বন্ধুবর C. F. Andrewsকে লিখিত পত্রে কবি লিখেছেন, "সমালোচক এবং গুপ্তচর স্বভাবতই বড় সন্দিগ্ধ। যেখানে রূপক বা বোমার নামমাত্রও নেই, সেখানেও ওরা তার গন্ধ পায়।" নাটকটিকে বাস্তবধর্মী বলে মেনে নিয়ে তার ভিতরকার সংঘাতটিকে রাণী সুদর্শনার অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী বলে গ্রহণ করতেই তিনি পরামর্শ দেন। তাঁর মতে Shakespeare-এর Lady Macbeth যদি বাস্তব চরিত্র হতে পারেন, রাণী সুদর্শনারও তা হতে বাধা নেই। তিনি বলছেন—Lady Macbethকে মানবহৃদয়ের আত্মঘাতী উচ্চাশার প্রতীক বলা যেতে পারে—অথচ আমরা তাঁকে বাস্তব চরিত্র ব'লে মেনে নিয়েছি। রাণী সুদর্শনাকে বাস্তব বলে গ্রহণ করতেই বা তবে আপত্তি কিসের?

পরবর্তীকালের নাটক রক্তকরবীর মধ্যেও রূপকের অনুসন্ধান করতে কবি নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন —"রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তবে কবির তাতে দায় নেই।" কিন্তু অনর্থ ঘটতে পারে জেনেও মানুষের মন ত অর্থ খোঁজায় নিবৃত্ত হ'তে চায় না। সমালোচকের চোখে রক্তকরবীও তাই সাধারণ নাটক নয় রূপক-সাঙ্কেতিক—রাজাও ঐ একই পর্যায়ের।

রাজা নাটকে যে উপাখ্যানটিকে কেন্দ্র করে নাটকের গতি আবর্তিত, সেটিকে বৌদ্ধজাতক কুশাবদান থেকে নেওয়া হয়েছে।

"মল্লরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিল অসাধারণ প্রজ্ঞাবান্ কিন্তু অত্যন্ত কুরূপ। তাহার বিবাহ হইয়াছিল অপূর্ব সুন্দরী মদ্ররাজ-কন্যা প্রভাবতীর সহিত। পাছে পতিকে দিবালোকে দেখিলে প্রভাবতী তাহাকে ঘৃণা করে—এই ভয়ে মাতা পুত্র-পুত্রবধূকে দিনের বেলা সাক্ষাৎ করিতে দিত না। অবশেষে কুশের আগ্রহে তাহার মা ছল করিয়া প্রভাবতীকে দেখাইল। প্রভাবতী যখন স্বামীকে দেখিবার আগ্রহ করিল তখন সুরূপ দেবরকে দেখাইয়া তাহাকে প্রবোধ দেওয়া হইল। কিন্তু পতি-পত্নীর সাক্ষাৎ আর আটকাইয়া রাখা গেল না। প্রভাবতী স্বামীর কুরূপ দেখিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কুশ তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য শ্বশুরালয়ে নীচবৃত্তি করিতে লাগিল এবং শেষে প্রভাবতীর পাণিপ্রার্থী রাজাদের হাত হইতে শ্বশুরকে রক্ষা করিয়া পত্নীপ্রেম লাভ করিল।"

কুশজাতকের এই গল্পটি সামান্য পরিবর্তিত করে রাজা নাটকের ঘটনা গড়ে উঠেছে। এ নাটকের পালা সুদর্শনার সঙ্গে রাজার সত্যকারের পরিচয় স্থাপনের পালা।

সুদর্শনা রাজার পরিণীতা স্ত্রী—কিন্তু তিনি তাঁর স্বরূপ সাক্ষাতে জানেন না। অথচ রাণীর সঙ্গে রাজার মিলন হয় প্রতিদিনই—আলোক-লেশশূন্য এক নিভৃত কক্ষে। যে কক্ষ পৃথিবীর একেবারে বুকের মধ্যে। কিন্তু সেখানকার অন্ধকারে রাণীর ভয় করে। সেইখানে রাণী প্রতিদিন রাজার আগমনকে অনুভব করেন—তাঁর বাণী তাঁর শ্রবণকে মুগ্ধ করে—তাঁর আলিঙ্গনে রাণী হন ধন্য। কিন্তু সার্থকতায় ভরে উঠল না সে মিলন—কারণ সুদর্শনা তাঁর অন্ধকারের রাজাকে তাঁর অন্তরাত্মার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলেন না। চঞ্চল হ'ল সুদর্শনার মন—তাঁর রাজ-"দর্শনই" যে রইল বাকী। "দর্শনে"র জন্য রাণী হ'লেন ব্যস্ত ও ব্যাকুল—হাত বাড়ালেন যা দৃশ্য, যা প্রত্যক্ষ, তারই মধ্যে তাঁর হৃদয়রাজ খুঁজে নেবার ব্যাকুল প্রত্যাশায়। রাণীর ব্যাকুলতা দেখে সেবারকার বসন্ত উৎসবে চোখে দেখা দেবার আশ্বাস দিলেন রাজা। কিন্তু অন্তরের অন্তরলোকে রাণী তাঁর রাজাকে দেখেন নাই—তাই রূপের জগৎ তাঁর চোখ ধাঁধালো। বার বার সাবধান করল রাণীর সখী সুরঙ্গমা কিন্তু রাণী বুঝলেন না। রাণী ভুললেন রঙের মোহে—তাঁর মনে হ'ল "সুবর্ণ"ই সত্যকার রাজা। কিন্তু সুবর্ণের সুন্দর বর্ণ প্রমাণ হ'ল মেকী বলে। বসন্তোৎসবের সন্ধ্যায় যে প্রলয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড বেধে উঠল তাতে সুবর্ণের মেকী পড়ল

ধরা। তখন লজ্জায় দুঃখে সুদর্শনার মুখ ঢাকবার জায়গা রইল না। সেদিনকার অগ্নিদাহের মধ্যে পরিত্রাতারূপে হঠাৎ দেখা দিয়েছিলেন রাজা—কিন্তু তার ভয়ঙ্কর মূর্তি সুদর্শনাকে আকৃষ্ট করলে না। তিনি স্বামী-গৃহ ত্যাগ করলেন। গেলেন পিতৃগৃহে। কিন্তু সুদর্শনার স্বামী যে রাজার রাজা! তাঁকে ছাড়ব বললেই ত ছাড়া যায় না। রাণী তাঁকে ছাড়লেও তিনি ত সুদর্শনাকে ত্যাগ করতে পারেন না। তাই পিতৃগৃহে অলিন্দের ধারে বসে রাণী শুনতেন কার অনাহত সুরের ঝঙ্কার—যে-সুরে তাঁর প্রাণমন বিগলিত হ'ত—মনে হ'ত সেই বীণার সুরে সুরে কে তাঁকে ফিরে চাইছে। পিতৃগৃহে রাণী যে আশ্রয় পেয়েছিলেন তার মধ্যে কোন গৌরব ছিল না—কিন্তু সেই অগৌরবের মধ্যেও রাণীর শান্তি মিললো না। সেখানে তাঁর পাণিপ্রার্থী নানা মিথ্যে রাজায় মিলে বাধাল নিদারুণ অশান্তি। সেই দারুণ বিপর্যয়ে রাজার অহেতুকী করুণা আবারও তাঁকে রক্ষা করল। সর্বশেষে সব অভিমান ত্যাগ করে রাণী পায়ে পায়ে পথ চলে আবার ফিরে এলেন তাঁর নিজের গৃহে। সেখানে পতি-পত্নীর পুনর্মিলনে সব দ্বন্দ্বের অবসান হ'ল। রাজার অরূপ-রূপের অপরূপ জ্যোতি রাণীর চোখের সব কালিমা ধুয়ে-মুছে দিলে।

রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্যাবলীর মধ্যে রাজা বিশেষ গৌরবের আলোকে সমুজ্জল। এ নাটকটি অধ্যাত্ম-তত্ত্বের বাহক, অথচ অতি সুন্দর এর আঙ্গিক। প্রাচীন জাতকের একটি গল্পকে সামান্য পরিবর্তিত করে নাটকের রূপ দিয়েছেন কবিগুরু। এই নাটকটির স্পষ্টার্থ অথবা বাচ্যার্থ অতি সুন্দর—অনবদ্য এর কথোপকথন—মর্মস্পর্শী এর সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা। কিন্তু বাচ্যার্থকে ছাপিয়ে ওঠে এর ব্যঞ্জনা। নাটকের প্রায় প্রতিটি দৃশ্যে যে সুরের ঝঙ্কার ঝঙ্কৃত—সেই সুর নিয়ে আসে কোন লোকাতীত রহস্যের ইঙ্গিত। ধূলির ধরণী হ'তে প্রাণমনকে নিয়ে যায় কোন রহস্যময় লোকে—যেখানে মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার চিরমিলন আর চিরবিরহের সুর চিরকাল অনাহত সুরে বেজে চলেছে।

রাজা নাটকের অন্তর্নিহিতার্থ রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপরূপ ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করেছেন অরূপরতনের ভূমিকায়। "সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধন-জন-খ্যাতি সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃতকক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না। নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল। কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল—যে প্রভু কোন বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই—যে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে। আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।"

অন্যত্র আমার ধর্ম প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে রাজা নাটকের আলোচনায় বলেছেন—

"রাজা নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা—তার পর সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে, পাপের মধ্যে দিয়ে অন্তরে-বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে।"

মানবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক, তাই এই নাটকটির উপজীব্য। পৃথিবীর আর কোন দেশের সাহিত্যে এ তথ্যটি এত সুন্দর ভাবে দেখানো বোধহয় সম্ভবপর হয় নাই। মাটির পৃথিবীতে সীমার বাঁধনে বাঁধা মানুষ। তার আয়ু অল্প কিন্তু আশা অপরিমিত। সব সময়ে সে নিজেও জানে না তার জন্ম কেন এই পৃথিবীতে, জানে না কিসে তার শান্তি কিসে তার তৃপ্তি —কিসেই বা তার মুক্তি। রাজা নাটকে কবি দেখিয়েছেন মানবাত্মার পরম গতি কোন্‌খানে- তার সমস্ত কর্ম, তার সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে কে তাকে নিয়ত আকর্ষণ করছেন। অনন্ত সৃষ্টির মাঝখানে "সীমার মাঝে অসীম" নিজেকে বেঁধেছেন। আবার সেই সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ হচ্ছে মানুষ—"the roof and crown of creation"

মানুষকে ভগবান্ অনবদ্য করে সৃষ্টি করেছেন—তাকে শুধু রূপ দেন নাই দিয়েছেন স্বাধীন ইচ্ছা—দিয়েছেন প্রেম। সেই স্বাধীন ইচ্ছা আর সেই স্বাধীন প্রেমে মানুষ

সৃষ্টির মধ্যে অনুপম। বিশ্বভুবনের রাজা হয়েও ভগবান্ এই মানুষেরই দ্বারে প্রেমের কাঙাল। তাঁর যে অসীম শক্তি আছে, সে শক্তিকে তিনি এখানে প্রয়োগ করেন না —দু'বাহু মেলে তিনি শুধু অপেক্ষা করে থাকেন কখন মানুষ তার ধন-জন-খ্যাতির সব মোহ তুচ্ছ করে তাঁর কাছে ফিরে আসবে। রাণী সুদর্শনা তাই বিশ্বমানবাত্মারই প্রতীক। এই ত সেই বিশ্বরাজের চিরকালের খেলা। তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিণয় "যে কোন চেতনার প্রত্যূষে একেবারে সমাধা হয়ে গেছে, সে কথা আমরা ত ভুলে বসেই থাকি। ভুল করে কত ভুলকেই না বরণ করি আমাদের পরম পাওনা বলে। সেই ভুল নিয়ে আসে কত-না আঘাত—কতই না বেদনা পাই সেই ভুলের মাশুল গুণে দিতে গিয়ে। শেষে বুঝতে পারি নিজের ভুল কিন্তু তখনও যায় না অভিমান—যে অভিমান ত্যাগ করলে তাঁকে অনায়াসে পেতে পারি। কিন্তু আমি তাঁকে ত্যাগ করতে চাইলে কি হবে? তাঁর কাছে আমি যে অপরিত্যজ্য! তাই যখন তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে যাই তখনও আমাদের সাধ্য নেই যে দূরে যেতে পারি।

তাঁর প্রেম আমাদের ঘিরে থাকে আমাদের অলক্ষ্যে, রক্ষা করে সকল আপদ্ হ'তে। ব্যাকুল বাঁশীর সুরে মনপ্রাণ উতলা করে ফিরে ডাকে—ফিরে এস বঁধু, ফিরে এস ব'লে। এমনি নিবিড়, এমনি গভীর তাঁর প্রেম, সে প্রেম হতে আমাদের দূরে যাবারও উপায় নেই। সুখে দুঃখে উত্থানে পতনে জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে আমরা যারা ভুলেছি যে আমরা তাঁরই "পরিণীতা"। আমরা সকলেই সেই রাণী "সুদর্শনা"।

রাজা নাটকের পরিসমাপ্তিকে কবি দেখিয়েছেন সুন্দর করে। সুদর্শনার সারা জীবনের অনুসন্ধান, তার ভুল, তার প্রায়শ্চিত্ত, তার অভিমান, তার অভিমান-গলানো চোখের জল—সবকিছুর পরিসমাপ্তি হয়েছে চির-সুন্দরের সাথে চিরমিলনের মধ্যে। সুদর্শনার এই পরমাগতি সকল মানুষেরই প্রাপ্য, এই ইঙ্গিতটুকু অতি স্পষ্ট আর ইঙ্গিতের মধ্যে রয়েছে সকল মানুষের মুক্তির ইঙ্গিত। পরামুক্তির পরম আশ্বাসে এ নাটকের পরিসমাপ্তি সুন্দর।

আধুনিক যুগে জড়বিজ্ঞানে বিশ্বাসী মানুষ সব-কিছুকেই ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেতে চায়। যা-কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তাকেই সে আর বিশ্বাস করতে চায় না, হঠাৎ অবিশ্বাস করতে চায় তার অস্তিত্বকে। যে নিত্য পরিবর্তনশীল বস্তুপুঞ্জ তার সম্মুখে নিয়ত সমুপস্থিত —তাকেই চরম ও পরম সত্য বলে মনে করে। রাণী সুদর্শনার মত বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করে বসে আছে যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরের জীবনেই সার্থকতা লাভ করবে। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধন-জন-খ্যাতি—সেখানেই সে বরমাল্য অর্পণ করে বসে আছে। আধুনিক যুগের জড়বাদী মানুষকে এ কথা বিশ্বাস করান কঠিন যে, পরমাত্মার সহিত সত্যমিলনই তার একমাত্র পরম কাম্য! সুদর্শনার জীবনে তার স্বামীর সত্যস্বরূপকে জানা এক কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জড়বাদী মানুষের পক্ষেও ঈশ্বরানুসন্ধান ও তাঁর স্বরূপকে উপলব্ধি করাকে তার জীবনের চরম সার্থকতা বলে গ্রহণ করা এক সুকঠিন সমস্যা। রাণী সুদর্শনা বুঝেছিলেন নিজের ভুল. ফিরেছিলেন তাঁর রাণীর আসনে,—রাজার সঙ্গে প্রকৃত মিলনে তাঁর জীবন হয়েছিল ধন্য। জড়বাদী মানুষকেও বুঝতে হবে তার ভুল, চোখের জলে একদিন ফিরতে হবে তার সত্যকারের প্রভু যিনি তাঁরই কাছে অন্তরের গোপন নিভৃতকক্ষে ভিন্ন যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় না।

রাজা নাটকে মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে মধুর রসময় সম্পর্কটি রাজা নাটকের উপজীব্য, তার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি অবশ্য ভারতীয় দর্শনে নূতন নয়। বৈষ্ণব-দর্শনে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা, সেও ঐ একই ভাবের বাহক। পরম বৈষ্ণব যাঁরা, তাঁদের সাধনার ধন যে-শ্রীকৃষ্ণ—তিনিও এমনি ব্যাকুল বাঁশির সুরে প্রেমবৃন্দাবনে হৃদয়-যমুনার তীরে ভক্তকে চিরকাল আহ্বান জানাচ্ছেন ব্যাকুল বাঁশির সুরে সুরে। প্রেমের বৃন্দাবনে তাই পরমপুরুষ শুধু একাই শ্রীকৃষ্ণ—বাকী সকলেই শ্রীরাধা অথবা গোপিনী-ভাবাশ্রিতা। রবীন্দ্রনাথ ধর্মমতের দিক দিয়ে বা ধর্ম-বিশ্বাসের দিক দিয়ে বৈষ্ণবদের একজন ছিলেন, একথা আমরা বলতে পারি না। কিন্তু বৈষ্ণবীয় দর্শনের মধুর রসের সাধনার ধারাটিকে তিনি যে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন তার ভূরি ভূরি প্রমাণ তাঁর কাব্যে, গানে ও অন্যান্য রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। বৈষ্ণবদর্শনে যিনি শ্রীকৃষ্ণ, রাজা নাটকের তিনিই 'রাজা'—। বৈষ্ণবদর্শনে যিনি রাধা, জীবাত্মাস্বরূপিণী—রাজা নাটকে তিনিই রাণী 'সুদর্শনা'।

রাজা নাটকে যে ভাবটি রূপক ও সংকেতের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে, সেই ভাবটি কবির অন্য কয়েকটি রচনায় স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এগুলি "রাজা" নাটক রচিত হওয়ার পূর্বে লিখিত এবং শান্তিনিকেতন উপদেশ-মালার মধ্যে সন্নিবিষ্ট। এই গ্রন্থের প্রেম, পরিণয়, প্রেমের

অধিকার-শীর্ষক রচনাগুলিতে রাজা নাটকের ভাবটির সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ মেলে। কতকগুলি উদ্ধৃতির সাহায্য নিলে এই কথাটি খুবই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। পরিণয়-শীর্ষক প্রবন্ধে কবি বলছেন—"পরমাত্মা আমাদের আত্মাকে বরণ করে নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে এর পরিণয় একেবারে সমাধা হয়ে গেছে। তার আর কোন কিছু বাকী নেই—কেননা তিনি একে স্বয়ং বরণ করেছেন। কোন্ অনাদিকাল হ'তে সেই পরিণয়ের মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে। বলা হয়ে গেছে—"যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।" এর মধ্যে আর কোন ক্রমাভিব্যক্তির পৌরোহিত্য নেই।...পরিণয় ত সমাপ্তই হয়ে গেছে, সেখানে আর কোন কথা নেই। 'এখন কেবল অনন্ত প্রেমের লীলা। যাঁকে পাওয়া গেছে তাঁকেই নানা রকম করে পাচ্ছি। —সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, লোকে-লোকান্তরে। বধূ যখন সেই কথাটা ভাল করে বোঝে তখন আর তার কোন ভাবনা থাকে না। তখন সংসার আর তাকে পীড়া দিতে পারে না—সংসারে আর তার ক্লান্তি নেই, সংসারে তার প্রেম। তখন সে জানে যিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তম হয়ে অন্তরাত্মাকে চিরদিনের মত গ্রহণ করে আছেন—সংসারে তাঁরই আনন্দরূপমমৃতং বিভাতি। সংসারে তাঁরই প্রেমের লীলা। এইখানেই নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের চিরযোগ, আনন্দের অমৃতের যোগ। এইখানেই আমাদের সেই চির-প্রাপ্তকে, সেই একমাত্র প্রাপ্তকে বিচিত্র বিচ্ছেদমিলনের মধ্যে দিয়ে পাওয়া-না-পাওয়া বহুতর ব্যবধান পরম্পরার ভিতর দিয়ে নানা রকমে পাচ্ছি। যাঁকে পেয়েছি, তাঁকেই আবার হারিয়ে হারিয়ে পাচ্ছি, তাকেই নানা রসে পাচ্ছি। যে বধূর মূঢ়তা ঘুচেছে, এই কথাটা যে জেনেছে এই রস যে বুঝেছে—সেই "আনন্দো ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।" যে না জেনেছে, যে সেই বরকে ঘোমটা খুলে দেখে নি, বরের সংসারকেই কেবল দেখেছে—সে সেখানে তার রাণীর পদ—সেখানে দাসী হয়ে থাকে। ভয়ে মরে, দুঃখে কাঁদে, মলিন হয়ে বেড়ায়—

> "দৌর্ভিক্ষাৎ যাতি দৌর্ভিক্ষং
> ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াৎ ভয়ম্।"

(শান্তিনিকেতন, ৯ ফাল্গুন ১৩১৫)

এই একই ভাবের কথা অন্যত্রও রয়েছে। একটি গানের কথাই ধরা যাক—

> "তাই তোমার আনন্দ আমার পর
> তুমি তাই এসেছো নীচে
> আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
> তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।"

যিনি তিন ভুবনের ঈশ্বর, তিনিই নাকি প্রেমের কাঙাল হয়ে নেমে এসেছেন মানুষের দ্বারে! হঠাৎ মনে হ'তে পারে, এ বড় স্পর্ধার কথা। কিন্তু কবি বলেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

"এমন যে অচিন্ত্যনীয় ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর, তাঁরই সঙ্গে এই কণার কণা, অণুর অণু বলে কি না প্রেম করবে! অর্থাৎ তাঁর রাজসিংহাসনে তাঁর পাশে গিয়ে বসবে! অনন্ত আকাশে নক্ষত্রে নক্ষত্রে তাঁর জগৎযজ্ঞের হোম-হুতাশন যুগ-যুগান্তর জ্বলছে—আমি সেই যজ্ঞক্ষেত্রের অসীম জনতার একটি প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোন দাবির জোরে দ্বারীকে বলছি, এই যজ্ঞেশ্বরের এক শয্যায় আমাকে স্থান দিতে হবে!...... মানুষ জগদীশ্বরের সঙ্গে প্রেম করতে চায় এ কি তার অত্যাকাঙ্ক্ষারই একটা চরম উন্মত্ততা? তার অহঙ্কারের অশান্ত পরিচয়?" এ প্রশ্নের উত্তরও কবি দিয়েছেন তাঁর স্বকীয় অপূর্ব ভঙ্গিতে—"কিন্তু এর মধ্যে ত অহংকারের লক্ষণ নেই। জগৎ-সৃষ্টির মধ্যে এইটিই সকলের চেয়ে আশ্চর্য যে মানুষ তাঁর প্রেম চায়।...কেন চায়? কেন না মানুষ যে অধিকার পেয়েছে। এই প্রেমের দাবি যিনি জন্মিয়ে দিয়েছেন তাঁরই সঙ্গে যে প্রেম এতে আর ভয়-লজ্জা কিসের?

...আমি যে একজন বিশেষ আমি, আমাতে তাঁর শাসন নেই, আমাতে তাঁর বিশেষ আনন্দ। সেই আনন্দের উপরেই আমি আছি, নিয়মের উপরে নেই —এইজন্যই এই আমির ব্যাপারটি একেবারে সৃষ্টিছাড়া। এইজন্যই এই পরমাশ্চর্য আমির দিকেই তাকিয়ে উপনিষদ্ বলে গিয়েছেন, "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।" এই আমি আর তিনি সমান বৃক্ষের ডালে দুই পাখীর মত দুই সখা একেবারে পাশাপাশি বসে আছেন।...আমার সঙ্গে তাঁর কথা এই যে, তুমি ইচ্ছা করে আমাকে যা দেবে তাই নেব—যদি না দাও তবু আমার যা দেবার তা থেকে বঞ্চিত করব না।

তিনি আমার এই আমিটুকুর কুঞ্জবনে বিশেষ করে নেমে এসেছেন, বন্ধু হয়ে আপনি ধরা দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, "আমার চন্দ্রসূর্যের সঙ্গে তোমার নিজের দামের হিসাব করতে হবে না। কেননা ওজনদরে তোমার দাম নয়। তোমার দাম আমার আনন্দের মধ্যে। তোমার সঙ্গেই আমার বিশেষ প্রেম বলেই তুমি তুমি হয়েছ।"

"এইখানেই আমার এত গৌরব যে তাঁকে সুদ্ধ আমি অস্বীকার করতে পারি। বলতে পারি, 'আমি তোমাকে চাইনে।' সে-কথা তাঁর ধূলিজলকে বলতে গেলে তারা সহ্য করে না, তারা তখনই আমাকে মারতে আসে।

কিন্তু তাঁকে যখন বলি, 'তোমাকে চাইনে, আমি টাকা চাই, খ্যাতি চাই' তিনি বলেন—'আচ্ছা বেশ'। বলে চুপ করে বসে থাকেন।

এদিকে কখন এক সময় হুঁশ হয় যে, আমার আত্মার যে নিভৃত নিকেতন, সেখানকার চাবি ত আমার খাতাঞ্চীর হাতে নেই—টাকাকড়ি ধন-দৌলত ত কোনমতে পৌঁছায় না, ফাঁক থেকেই যায়। সেখানকার সেই একলা জগতের আর একটি মহান্ একলা ছাড়া কেউ কোনমতেই ভরাতে পারে না। যেদিন বলতে পারব, চন্দ্র-সূর্যহীন আমার এই একলা ঘরটিতে তুমি আমার আর আমি তোমার'—সেইদিন আমার বরশয্যায় বর এসে বসবেন, সেইদিন আমার আমি সার্থক হবে।"

(শান্তিনিকেতন, ১৭ই পৌষ ১৩১৫)

আবার "প্রার্থনা" শীর্ষক ভাষণে তিনি বলছেন—"আমাদের অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে একটি নারী রয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে আমাদের সমুদয় সঞ্চয় এনে দিই। আমরা ধন এনে বলি, এই নাও। খ্যাতি এনে বলি, এই তুমি জমিয়ে রাখ। আমাদের অন্তরের তপস্বিনী এখনও স্পষ্ট করে বলতে পারছে না যে, এসবে আমার কোন ফল হবে না। সে মনে করছে—হয়ত আমি যা চাচ্ছি—তা বুঝি এইই। কিন্তু তবু সব নিয়েও, সব পেলুম বলে তার মন মানছে না। সে ভাবছে, হয়ত পাওয়ার পরিমাণটা আরও বাড়াতে হবে, টাকা আরও চাই, খ্যাতি আরও দরকার, ক্ষমতা আরও না হ'লে চলছে না। কিন্তু সেই আরও শেষ হয় না এবং এই উপকরণ যে অমৃত নয় এটা একদিন তাকে বুঝতেইহবে। একদিন এক মুহূর্তে সমস্ত জীবনের স্তূপাকার আবর্জনা ঠেলে দিয়ে তাকে বলে উঠতেই হবে—"যেনাহং নামৃতা স্যাম্, কিমহং তেন কুর্যাম্!"

…"এই অমৃতের স্পর্শ আমরা কোন্‌খানে পাই? যেখানে আমাদের প্রেম আছে। এই প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া, পুরাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না। সংসারের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে এই যে প্রেমের আভাস দেখতে পেয়ে আমরা মৃত্যুর অতীত পরম পদার্থের পরিচয় পাই—তাঁর স্বরূপ যে প্রেমস্বরূপ তা বুঝতে পারি, এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাবার জন্যে আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করি, তখন আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসেই ঠেলে দিয়ে বলতে পারি—'যেনাহং নামৃতা স্যাম, কিমহং তেন কুর্যাম' ?"

(শান্তিনিকেতন উপদেশমালা)

শান্তিনিকেতন উপদেশমালার এই অংশগুলিতে যে ভাবের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে "রাজা" নাটকের মূল কথাটিও সেই একই ভাবের ব্যঞ্জনা আনে। যে-যুগে কবি 'রাজা' রচনা করেছিলেন সেটি খেয়া-গীতাঞ্জলির যুগ, ভগবানকে কবি এসময়ে অন্তরে গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। "রাজা" সেই ভাবানুভূতিরই অনবদ্য ফলস্বরূপ।

ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস

মাদ্রাজ অধিবেশন

ডক্টর সুধীর নন্দী

ঐতিহাসিক বলেন যে ইতিহাসের গতি না কি পুনরাবৃত্ত। অতীত বর্তমান হয়ে আপনাকে সম্প্রসারিত ক'রে দেয় ভবিষ্যের দিকে। ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে ঐতিহাসিক একরূপতা প্রত্যক্ষ করেন। আমরাও তা আশা করি এবং বর্ষান্তে দর্শন কংগ্রেসে যাবার জন্য তৈরী হই সপরিবারে। এবার মাদ্রাজের পালা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের বিগত অধিবেশন হ'ল মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদার আতিথ্যের লোভনীয় পরিবেশে। উর্মিমুখর বেলাভূমি; কর্মব্যস্ত ধীবরসমাজ দৈনন্দিন জীবনায়নের অলাতচক্রে ঘূর্ণ্যমান; তাদের সেই দিন-যাপনের, প্রাণধারণের গ্লানিহীন মহিমাটুকু শিল্পী দেবী-প্রসাদের কালো পাথরে খোদাই-করা অনন্যসাধারণ শিল্প-কর্মে প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। আপনার কর্ম-মর্যাদায় সমাসীন ধীবরদের কৃষ্ণাবরণ ভাস্কর্যমূর্তি জলধির দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে আছে। পিছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোহরণ হর্ম্যমালা। বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী ভবনের অনবদ্য কারুশিল্প। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের উদ্বোধনী সভা বসল। প্রশস্ত সিনেট হলে দক্ষিণী-স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন ইতস্ততঃ দৃশ্যমান। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত এই সিনেট হলটি রুচিপূর্ণ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে উঠেছে। মাদ্রাজের অস্থায়ী রাজ্যপাল মাননীয় পি. চন্দ্র রেড্ডী এই সভার উদ্বোধন করলেন। দর্শন কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে যে বিশেষ স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হ'ল তার উদ্বোধন করলেন মাদ্রাজ রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী শ্রী আর. ভেঙ্কটরমণ। জীবনের সঙ্গে দর্শনের যে যোগসূত্রটুকু অনাদি কাল থেকে উভয়কে গ্রন্থিবদ্ধ ক'রে রেখেছে তার কথা বললেন মাননীয় রাজ্যপাল। মানুষের জীবনচর্যার মূলে, তার গভীরে যে তন্ময় দার্শনিকতা, যা যুগযুগান্তের সীমারেখা পার হয়ে আধুনিক জীবনের মর্মমূলে সুপ্রতিষ্ঠ রয়েছে তার কথা বললেন শ্রী চন্দ্র রেড্ডি। ভারতীয় দর্শন-ঐতিহ্য অতীতে আমাদের যেভাবে নানান্ বিঘ্নবিপদ উত্তীর্ণ হ'তে সহায়তা করেছে, ভবিষ্যতেও যেন তার ব্যতিক্রম না ঘটে, এই আশা প্রকাশ ক'রে তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ শেষ করলেন। মাননীয় ভেঙ্কটরমণ মহাশয় ব্যবসায়ের উপজীব্য দর্শন নিয়ে আলোচনা করলেন। ব্যবসায়ীরাও মানুষ; মানুষ হিসেবে তাঁদের জীবনদর্শন একটা নিশ্চয়ই আছে। আবার জীবিকার জন্য তাঁরা যে পথ বেছে নিয়েছেন তার মূলেও একটা নৈতিক মূল্যবোধ থাকা প্রয়োজন। এই নৈতিক মূল্যবোধটুকু তাঁদের জীবনদর্শনকে প্রভাবিত করে এবং তাঁদের জীবনদর্শনও যেন তাঁদের জীবিকা ও সর্বাত্মক মূল্যবোধকে অনুপ্রাণিত করে, এই আশা তিনি প্রকাশ করলেন। সম্মেলনের মূল সভাপতি অধ্যাপক মীর ভালিউদ্দিন সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেন নি; তাঁর প্রেরিত ভাষণটি পাঠ ক'রে শোনালেন কংগ্রেসের সম্পাদক অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয় মজুমদার মহাশয়। সভাপতি মহোদয় তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে সুফী দর্শনের দুঃখবাদের ব্যাখ্যা করেছেন। তাপদগ্ধ মানুষ দুঃখের দাহ থেকে শান্তি চায়; সান্ত্বনা খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে পড়ি আমরা। অধ্যাপক ভালিউদ্দিনের ভাষণে সেই দুঃখ-শান্তির ইঙ্গিত রয়েছে। সভাস্থ দার্শনিক ও দিকদেশাগত প্রতিনিধিবৃন্দ সহর্ষ অভিবাদনে সভাপতি মহোদয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণটিকে অভিনন্দিত করল। সভার শেষে ভারতীয় মার্গ-নৃত্যের অনুষ্ঠান। কুমারী পদ্মা ও নৃত্যোদয় গোষ্ঠীর শিল্পীরা যে নৃত্যের অনুষ্ঠান করলেন তা কলারসিক মাত্রেরই আনন্দের বস্তু। যে মহতী সভার সুরু হয়েছিল ডক্টর প্রেমলতার মনোহারী উদ্বোধন সঙ্গীতে, তার শেষ হ'ল কুমারী পদ্মা ও তাঁর সঙ্গীদলের অনুপম নৃত্য-সৌকর্যে। আমরা সভাতে যখন বীচিবিক্ষুব্ধ বেলাতটে গিয়ে রাত্রির সমুদ্রের রূপ দেখেছি দু'চোখ ভ'রে, তখনও কানে বেজেছে নৃত্যপরা দক্ষিণী কন্যার চরণের নূপুর-ধ্বনি।

২৮শে ডিসেম্বরের সূর্য উঠল দূরসমুদ্রের দিগ্‌বলয়চুম্বিত সীমানায়। Legislators' Hostel-এ প্রতিনিধিরা রয়েছেন; কর্মব্যস্ত এম্ এল্ এ ভবন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস ছাড়ল সকাল আটটার সময়। সাড়ে আটটায় সভা বসল বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী ভবনে। পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে; তার উদ্বোধন করলেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর টি আর ভি মূর্তি। প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাগ্রসর দর্শন অধ্যয়নের কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি ভারত সরকারের অর্থে ও আনুকূল্যে পুষ্ট। দর্শনের বই দেখানো হয়েছে এই প্রদর্শনীতে। ভারতীয় প্রখ্যাত প্রকাশকেরা, ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস—এরা সবাই এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিও এই প্রদর্শনীতে দেখানো হ'ল। সব মিলিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে এই প্রদর্শনীটি একটি দর্শনীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল। আমরা নানান্ অধিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে এখানে গিয়ে সময় কাটিয়েছি; পত্রপত্রিকায় যে সব আধুনিকতম প্রকাশনার কথা পড়েছিলাম, তার অনেক গ্রন্থই এই প্রদর্শনীতে আমরা দেখলাম।

সকাল নয় ঘটিকায় দর্শন কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। শাখা সভাপতিরা তাঁদের ভাষণ দিলেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর শশধর দত্ত দর্শনেতিহাস শাখার সভাপতি। তিনি তাঁর 'The Empirical Tradition' শীর্ষক সভাপতির ভাষণে আধুনিক দর্শনে ইন্দ্রিয়-গোচরতার বিশ্লেষণী ব্যাখ্যা ক'রে উপসংহারে বললেন ঃ

"The practice of philosophy is to have a direct experience of the gradual transcendence of man's empirical limitations. Symbols are necessary in the begining of such a practice, but as one proceeds, these become one and more transporent and finally vanish away into an unsayble meaning."

সভাপতি মহোদয় তাঁর সুলিখিত ভাষণে ইন্দ্রিয়োপাত্তের সীমানা পার হয়ে এক অনির্বচনীয় অর্থে উত্তরণের ইঙ্গিত দিলেন। তাঁর পরে ন্যায়শাস্ত্র ও পরাবিদ্যা শাখার সভাপতি তাঁর ভাষণ দিলেন। এই শাখার সভাপতি ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর সন্তোষ সেনগুপ্ত মহাশয়। তাঁর ভাষণের শিরোনামা হ'ল 'Statements about the future'। আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়তই ভবিষ্যৎ কাল সম্বন্ধে কথা বলি। 'কাল স্কুলে যাব', 'সূর্য উঠবে', এই ধরনের কথা আমরা প্রাত্যহিক জীবনে বলি, বিজ্ঞানেও ব্যবহার করি। এই ধরনের কথার তাৎপর্য কি, এ নিয়ে ডক্টর সেনগুপ্ত তাঁর সুবৃহৎ ভাষণে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে উপসংহারে বললেন ঃ

"My contention in that science so far as it demands that a statement about the future is knowledge is dogmatic what can be rationally demanded is that one can believe in the future and not know it."

বিজ্ঞান ভবিষ্যৎ কাল সম্বন্ধে যে উক্তি করে তাকে জ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া যায় না; ভবিষ্যৎ বিশ্বাস করা যায়, তাকে জানা যায় না। বিশ্লেষণ আশ্রিত এই নৈরাশ্যবাদটুকু সম্বল ক'রে আমরা মাদ্রাজী খানা-ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। রসম্, পুরী, মকর প্রমুখ নানাবিধ খাদ্যসম্ভার ও পান-সুপারীর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। অশ্বির কাণ্ডে আমাদের জন্য ভোগ্যবস্তুর কোন কার্পণ্য করেন নি।

সন্ধ্যায় দশপ্রকাশ হোটেলের সুবিস্তৃত Skyroof-এ ব'সে তামাম মাদ্রাজের তমালতাল-বনরাজি-বেষ্টিত মনোহর রূপ দেখলেন ডেলিগেটরা আর দেখলেন ভারতীয় নৃত্যকলার পরাকাষ্ঠা, ভরতনাট্যম্। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভেঙ্কটরমণের কন্যা উমা ও মহেশ্বরীর নৃত্যনৈপুণ্য ভোলবার নয়। তাঁরা যে রস পরিবেশন করলেন তা দুর্লভ। দশপ্রকাশ সব দিক থেকে দর্শনীয়। হোটেলটিতে নিরামিষ-ভোজনের বন্দোবস্ত। বিশুদ্ধ হিন্দুপ্রথায় বিরাট্ হোটেল যে চালানো যায় তা আমাদের দেখালেন হোটেলের মালিক শ্রী কে সীতারাম রাও। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর সবটুকু ঐতিহ্য এই মহৎপ্রাণ দক্ষিণী ব্রাহ্মণ সযত্নে রক্ষা করছেন। রাত্রে তিনি আমাদের তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ জানালেন ভজন গান শোনানোর জন্য। সে এক অপূর্ব দৃশ্য; পরিবারস্থ সকলেই গৃহদেবতার সামনে আত্মহারা হয়ে ভজন গান করছেন। বিদেশী ডেলিগেটরা আমাদের সঙ্গে একাসনে ব'সে সে গান শুনলেন, ভক্তি-আপ্লুত বয়ান গৃহকর্তা সকলের হাতে প্রসাদ দিলেন; গৃহদেবতার শ্রীচরণোদ্দেশে আত্মনিবেদন ক'রে সকলে ক্যাম্পে ফিরলাম।

পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী ভবনে সকাল ৯টায় কার্যসূচী অনুযায়ী সভা বসল: নীতিশাস্ত্র ও সমাজবিদ্যা শাখার সভাপতি অধ্যাপক জি. সুকুমারন্ নায়ার তাঁর ভাষণ দিলেন। কেরল রাজ্যের এন্ এস্ এস্ হিন্দু কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক তিনি। তাঁর অভিভাষণে অধ্যাপক নায়ার নীতিশাস্ত্র ও সমাজবিদ্যার মৌল নীতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। ভাল মন্দের কি অর্থ, তার কি-ই বা ব্যঞ্জনা, এ নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা ভালই লাগল। আবেগময় ভাষায় তিনি তাঁর ভাষণের উপসংহার করলেন মানুষের জীবনদর্শন ও জীবনচর্যার সেই চিরন্তন সমস্যাটির উল্লেখ ক'রে ঃ

"The gulf between profession and practice is the perenial problem of human existence. In order to solve this problem satisfactority we may have to become martyrs. Let us welcome the crown of martyrdom and be honorable."

তারপরে ভাষণ দিলেন মনস্তত্ত্বশাখার সভাপতি ডক্টর ভাসভাদা। মনস্তত্ত্বের সাম্প্রততম গবেষণার উল্লেখ ক'রে সভাপতি মহোদয় তার বৈজ্ঞানিক চারিত্র্যের কথা বললেন। মানুষের মনের অপরিচ্ছন্ন অবজ্ঞাত পরিসরে যে-সব সত্য আত্মগোপন ক'রে থাকে যে মনুষ্য-জীবন, কর্ম ও চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে তার উল্লেখ ও ব্যাখ্যা ক'রে মনোবিদ্যার সামগ্রিক ধর্মটুকু তিনি নিরূপণ করার চেষ্টা করলেন। তাঁর ভাষণটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়েছিল। সুধীজনের সাধুবাদ অকৃপণ ভাষায় বর্ষিত হয়েছিল এই চারজন তরুণ দার্শনিকের ওপর। এঁদের পাণ্ডিত্যই এঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং আপন আপন মনীষা ও মেধার বিকাশে এঁরা সমবেত গুণীজনকে মুগ্ধ করেছিল।

নীতিশাস্ত্র ও সমাজবিদ্যা, ন্যায় ও পরাবিদ্যা,

দর্শনেতিহাস ও মনস্তত্ত্ব এই চারিটি বিভাগে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পঠিত হয়েছিল। ডক্টর চারীর 'Philosophical Exaggeration of Quantum Field Theory', ডক্টর বারলিঙ্গের 'Language and the World', অধ্যাপক বিনয়গোপাল রায়ের 'Pursuit of religious meaning', অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদারের 'The concept of Rta in the Vedes', ডক্টর জে. এন. মহান্তির 'Two kinds of doubt', অধ্যাপক শ্যামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'Value and Reality' ডক্টর দেবব্রত সিংহের 'On Transcendental Method' ও ডক্টর শ্যামলা শর্মার 'The Predominance of Practice in Aesthetics' প্রমুখ প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৪ সাল আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের শততম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপনের কাল। দর্শন কংগ্রেসে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের ওপর মূল্যবান্ একটি প্রবন্ধও পঠিত হ'ল।

দর্শন কংগ্রেস এ বছরে দু'টি আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান করেছিল। প্রথমটির বিষয়বস্তু ছিল 'The knowledge of other minds' এবং দ্বিতীয়টির আলোচ্য বিষয় ছিল 'The place of religion in education'। আমরা আমাদের মনকে, আমাদের মনের ক্রিয়াকলাপকে জানতে পারি কি না এ নিয়ে বাদানুবাদের অন্ত নেই দার্শনিক মহলে। যদি নিজের মনকে, নিজের মানসিক ক্রিয়াকলাপকে সোজাসুজি জানার সম্ভাবনা থাকে তা হ'লে অনুরূপ পথে অন্য মনের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে হয়ত অনুমান করা চলে। অন্য মনের অস্তিত্ব কি এই অনুমান-নির্ভর? না অন্য কোন পথে সাক্ষাৎভাবে অপরের মনকে জানা যায়? দীর্ঘ তিন ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা চলল এই সমস্যাটিকে ঘিরে। পরের দিনের আলোচনা-চক্রে শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্মের স্থান নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করলেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr. Premnath; ইনি সুপণ্ডিত। তথ্যাশ্রয়ী, তত্ত্ববহুল আলোচনায় ইনি বললেন যে, মানুষের সমগ্র বিচারের মধ্যেই তার ধর্ম-জীবনেরও বিচার হয়। শিক্ষা যদি মানব অস্তিত্বের সমগ্রতার দিকে লক্ষ্য রেখে থাকে তা হ'লে ধর্মকে 'এহ বাহ্য' ব'লে গণ্য করা চলে না। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-সব দর্শনবিদ্ পণ্ডিতেরা এসেছিলেন, তাঁরাও তাঁদের মতামত ব্যক্ত করলেন সুচিন্তিত ভাষার মাধ্যমে। Dr. Premnath এর সমর্থন পাওয়া গেল; বিরুদ্ধে যুক্তিশাসিত বিপরীত সিদ্ধান্তেরও অসদ্ভাব হ'ল না।

৩০শে ডিসেম্বর দর্শন কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হ'ল। ৩১শে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হ'ল। এর উদ্যোগ করেছিলেন India International Centre ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের Centre for Advanced Studies; সেমিনারে স্বাগত ভাষণ দিলেন ডক্টর কে কে পিল্লাই; উদ্বোধন করলেন ডক্টর পি. ডি. রাজামান্নার ও সভাপতিত্ব করলেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার এ. এল্. মুদালিয়র। সেমিনারে আলোচ্য বিষয় ছিল : 'Tradition and Progress'। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্বাচিত বক্তারা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কলিকাতা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্তী এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। বাংলা দেশ থেকে অধ্যাপক চক্রবর্তী ও বর্তমান নিবন্ধের লেখক এই আলোচনাচক্রে যোগ দেন। এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক অরুমুগ্যা মুদালিয়র, অধ্যাপক কাল-খাতগী, অধ্যাপক স্বামী, ডক্টর চেন্নকেশবন্, অধ্যাপক ত্রিপাঠী, অধ্যাপক ঝা, অধ্যাপক নাগরাজ রাও প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। বিদেশাগত অধ্যাপকদের মধ্যে হোয়াইট হার্স্ট, সপ্রাং ও অনৈকা ইতালীয় গবেষিকাও আলোচনা করলেন বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে। এ-কথা যুক্তিতর্কের সাহায্যে বলা হ'ল যে, ঐতিহ্য এবং প্রগতির মধ্যে কোন মৌল প্রভেদ নেই। বিভিন্ন-কালিক পরিপ্রেক্ষিতে একই সত্তার এই দ্বিবিধ নামকরণ করা হয়। ঐতিহ্যের ভালমন্দ নেই। যাকে দু'দিন আগে ভাল ব'লে 'প্রগতি' আখ্যা দিয়েছি, দু'দিন পরে তাকেই 'মন্দ ঐতিহ্য' ব'লে বিসর্জন দিয়েছি। এখানে ভাল-মন্দের আপেক্ষিক তত্ত্ব দিয়ে আমরা ঐতিহ্যকে বোঝাতে চাচ্ছি না; বলছি যে, 'ভালো' এবং 'মন্দ' এই ধারণা দুটো প্রগতি এবং ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে অচল। আলোচনাচক্রের শেষে মধ্যাহ্ন-ভোজনের বিপুল আয়োজন এবং মধ্যাহ্নভোজনান্তিক আলোচনা বিগত বৎসরের শেষ দিনটিকে স্মরণীয় ক'রে রাখবে।

এ বৎসরের প্রথম দিনটিতেও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদার আতিথ্যের মধুর আস্বাদ গ্রহণ করেছি। ওঁদের যন্ত্রযানে চ'ড়ে কাঞ্চীপুরম্ পর্যন্ত গেছি; পথে মহাবলী-পুরমের সেই দৃশ্য ভোলবার নয়। সাগরোর্মিবিধৌত, ফেনলাঞ্ছিত মহাবলীপুরমের শান্ত স্থৈর্য চিত্তকে সমাহিত ক'রে দেয়। পক্ষীতীর্থে দেখেছি দেবতার প্রতিভূ সেই শ্বেতপক্ষ ঈগল পাখী দু'টিকে; তারা এল দক্ষিণ এবং উত্তর থেকে, প্রসাদ গ্রহণ করল, আবার অনন্ত আকাশের শেষে দিগ্‌বলয়ে মিলিয়ে গেল বিশাল দু'টি পাখা মেলে। ফেরার সময় কলকাতাগামী মেলে ব'সে মহাবলীপুরমের দেবতাকে যুক্তক'রে প্রণাম ক'রে আমার কন্যা শ্রীমতী ধৃতি বললেন :

"কত অজানারে জানাইলে, তুমি।"

বাইরে তখন দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলের লবণস্বাদসিক্ত বাত্যাবিক্ষোভের প্রবল গর্জন।

বিভূতিভূষণের ছোট গল্প

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প-রচয়িতাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর স্থান আরও উঁচুতে। কিন্তু এই প্রবন্ধে আমরা কেবল ছোট গল্পের লেখকরূপে তাঁর কৃতিত্ব বিচার করব। তাঁর লেখা ছোট গল্পগুলির আলোচনাকালে গল্পকার হিসেবে তাঁর বিশিষ্টতা কোথায়, কেবল সে-প্রসঙ্গ আলোচনা করা যথেষ্ট। যে-সব ব্যাপারে তিনি অন্য সব বাঙালী গল্প-লিখিয়েদের সমধর্মী, সে-সব বিষয়ে সাধারণভাবে সব বাঙালী ছোট গল্প লেখকদের জন্যে যা, তাঁর সম্বন্ধেও মাত্র সেটুকু বলা যেতে পারে। তা এক বাক্যে এই রকম: বাঙালী কথাসাহিত্যিকসুলভ গল্পরচনানৈপুণ্য তাঁর যথেষ্ট পরিমাণে ছিল এবং অতি অল্প পরিসরের মধ্যে একটি চিত্র, একটি ঘটনা, একটি চরিত্র বিকশিত ক'রে রসান্বিত রূপে দেখাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল।

কিন্তু যে-সব ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ সমকালীন গল্পকারদের থেকে স্বতন্ত্র, সে-সব ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বের পরিমাপই তাঁর গল্পরচনানিপুণতার আসল বিচার। বিভূতিভূষণের এমন কয়েকটি স্বকীয়তা ছিল যার জন্যে তিনি যে কেবল বাংলা গল্প-সাহিত্যে নতুন সৃষ্টি করেছেন বলা যায়, তা নয়—উপরন্তু বিশ্বের ছোট গল্প-সাহিত্যেও তিনি অভিনব কিছু দান করেছেন, এমন ধরা যেতে পারে।

তাঁর রচনায় যেমন মৌলিকতা দেখা যায় বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে, তেমনি তাঁর প্রকাশভঙ্গি ও রূপরচনার মধ্যেও নিজস্বতা দেখা দিয়েছে অনায়াসসিদ্ধ ভাবে। তাঁর অভিনব বক্তব্য প্রকাশের নতুন ও বিশিষ্ট কৌশলটির পূর্বাভাষ কোথাও দেখা যায় নি। পরবর্তীকালেও তাঁর অক্ষম অনুকারকেরা সে-চেষ্টায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। এই কৌশলটির রহস্য এই: তিনি যা বলতে চান, তা বলার জন্যে আয়াস বা কষ্ট অনুভব করার কোন প্রয়োজন দেখেন না —যা সহজে তাঁর বিশ্রব্ধ ভঙ্গিটির মধ্যে এসে যায়, তাই যেন তিনি ব'লে যান, যত্ন ক'রে টেনে কিছুই বার করেন না। গল্প বলার অনায়াস ভঙ্গিই তাঁর গল্পগুলির মধ্যে মানব-মনের ও সাধারণ দরিদ্র জীবনের সুখদুঃখ স্বচ্ছন্দ ও বাহুল্যবর্জিত ভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা এনে দিয়েছে। তাঁর রচনাবলীর কোথাও কোন অশান্ত আবেগ, প্রয়াসসাধ্য বিশেষণ বা অলঙ্করণের উৎকট সাধনা দেখা যায় না। ধীর শান্ত ভাবে যেন নিরালায় বন্ধুজনের কাছে গল্প ক'রে চলেছেন ব্যস্ততার কোন বোধ না নিয়ে, বিভূতিভূষণের ভাব এই রকম।

বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে স্বকীয়তা আনা বহু-অধ্যয়নশীল লেখকের পক্ষেও দুরূহ। বিষয়বস্তুর স্বকীয়তা সৃষ্টি করা তত কঠিন নয়—কুশলী দ্রষ্টা সেটা সহজে পারেন। কিন্তু একটি নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি আয়ত্ত করা—অথচ কোন কষ্ট-কল্পনা কিংবা উৎকট আয়াস বরণের পরিচয় না দেওয়া—এই আধুনিক অধোমুখ সাহিত্যরচনার যুগে অত্যন্ত মৌলিক প্রতিভার লক্ষণ, বিশেষ প্রশংসার কাজ।

বিভূতিভূষণের বিশেষত্ববর্জিত গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথের সামান্য প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু তাঁর স্বকীয়তা-মণ্ডিত গল্পগুলি সমসাময়িক বা পূর্বতন কারও প্রভাবে ঈষন্মাত্র আচ্ছন্ন নয়। কচিৎ কোন কোন ক্ষেত্রে অপরের সঙ্গে সামান্য সাদৃশ্য মাত্র আছে।

বিভূতিভূষণের গল্পের একটি মাত্র দোষ এই যে, অনেক সময় তিনি খুব বাজে একটা প্রসঙ্গ নিয়ে গল্প জমাবার চেষ্টা করেন, যা সহজে সম্ভবপর নয়। তার অনিবার্য পরিণামে তাঁর সহজ সরল আয়াসহীন শান্ত ভঙ্গি সত্ত্বেও গল্পের বিরক্তিকর একঘেয়ে বিষয়বস্তুর জন্যে রস ক্ষুণ্ণ হয়। পল্লীজীবনবিষয়ক কোন কোন গল্প এই ধরনের।

বিভূতিভূষণের স্বকীয়তা দু'রকমের গল্পে পরিব্যক্ত হয়েছে। এক শ্রেণীর গল্পে পল্লীপ্রকৃতির পটভূমিতে প্রবাহিত সুখে-দুঃখে ভরা প্রাত্যহিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য শ্রেণীর গল্পে দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে লব্ধ এবং অতিপ্রাকৃতের ব্যঞ্জনাসমন্বিত রোমান্সের জ্যোৎস্নাবিজড়িত কুহেলিঘন পরিমণ্ডলের সূক্ষ্ম মসলিন আস্তীর্ণ। প্রথম ধরনের গল্পে তাঁর যে বৈশিষ্ট্য, তা পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসগুলিতে, ছোট গল্পে নয়। দ্বিতীয় প্রকারের গল্পে তাঁর বিশেষত্ব পূর্ণ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে এবং রোমান্টিক ছোট গল্প রচনায় তাঁকে অভিষিক্ত করেছে শ্রেষ্ঠত্বের পদবীতে। তাঁর কোন কোন উপন্যাসে এই রোমান্টিক আবহ-রচনাশক্তি অপ্রাকৃত শক্তি সমূহের ব্যঞ্জনাক্রিয়ায় এত বেশি অগ্রসর হয়েছে যে, একটা

অস্বাভাবিক অবাস্তব অতি-ঘন হয়ে মানবিক রসের আস্বাদন প্রায় সম্পূর্ণভাবে অলৌকিক জগতে ভুলে নিয়ে গিয়ে ব্যাহত করেছে—যেমন "দেবযান"-এ। কিন্তু তাঁর ছোট গল্পগুলি এই বৈলক্ষণ্য থেকে মুক্ত। সেখানে অতি-প্রাকৃতের ব্যঞ্জনা রমণীয়তায় অপূর্ব! তুহিন-নিশীথে যখন আকাশ থেকে জ্যোৎস্নাকিরণ তুষারকণা সংমিশ্রিত হয়ে স্বপ্নমগ্না পৃথিবীর বুকে ঝ'রে পড়ে আর শিহরণ-কাতরা ধরণী নিদ্রার ঘোরে একবার কুয়াসার গাঢ় আঁচলখানি সর্বাঙ্গে ভাল ক'রে জড়িয়ে নেয়, তখন নির্জন প্রান্তরে একাকী দাঁড়িয়ে-থাকা নিঃসহায় পথিকের মনে যে বিস্ময়-আতঙ্ক-রোমাঞ্চ-বিভূষিত ভীষণ সুন্দরের উপলব্ধি জাগে, সেই অনুভূতিই পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয় বিভূতিভূষণের লেখা অতিপ্রাকৃত-বিষয়ক গল্পগুলি পড়লে। অথচ, বাস্তববোধ কোথাও বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ ক'রে রোমান্সকে মরজগৎ থেকে অশরীরী প্রেতলোকে উত্তোলন করা হয় নি। মানবজীবনের মাধুরীভরা করুণ উপলব্ধিগুলি প্রচুর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের পটভূমিকায় রোমাণ্টিক বিস্ময়াবেশে পাঠকের মনোবীণায় বেহাগ রাগে সন্ধ্যারজনীর সুরটি ফিরে ফিরে বাজিয়ে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় এক পরম অপূর্ণতার কথা, করুণ বিফলতার অসহায় পরিসমাপ্তির কথা।

মেঘমল্লার আর তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প পড়লে পাঠকের মনে প্রকৃত রোমান্সের অপ্রতিরোধ্য যে-প্রভাব জন্মান্তরীণ সৌহার্দ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, সেই প্রভাব মোহমায়ার রঙীন সূত্রে বয়ন-করা করুণ মাধুরীর স্বচ্ছ বসনখানি শীতের প্রভাবে তৃণভূমির ওপর নিপতিত সূর্যস্নাত শিশিরজালের মত ছড়িয়ে দেবে। এই সব গল্পের সঙ্গে মাত্র রোমাণ্টিক আবহের দিক থেকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-বিরচিত "জাতিস্মর" গল্পগুলির কিছু মিল আছে। কিন্তু বিভূতিবাবুর অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বর্ণনশক্তি শরদিন্দুবাবুর মধ্যে নেই। বিভূতিভূষণের এই শক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছে আরণ্যক উপন্যাসে।

পল্লীজীবনবিষয়ক গল্পগুলির মধ্যে যে মানবপ্রীতি ও প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় তার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছে 'পথের পাঁচালি' ও 'অপরাজিত' উপন্যাসে। কিন্তু ছোট গল্পের সঙ্কীর্ণ পরিসরে বিভূতিবাবু তাঁর উপন্যাসে লভ্য উৎকর্ষ ঠিকভাবে সবটা ফোটাতে পারেন নি। তাঁর স্বধর্ম, শান্তভাবে যা দেখেছেন, যা অনুভব করেছেন তার কথা বলা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই সব গল্পে তাঁর মনোভাব :—

এই ত ভাল লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়···
সামনে চেয়ে এই যা দেখি চোখে আমার বীণা বাজায়।

এই মনোভাব এমন এক পথিকের, যে জগতের অনেকখানি দেখে এসে তারপর এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বাসস্থান ঠিক ক'রে সেই কেন্দ্র থেকে অল্পে অল্পে চারপাশে তার ভ্রমণবৃত্তের পরিধি বিস্তৃত করতে চায়, তাড়াহুড়া না ক'রে একটু একটু ক'রে দেখতে চায়, আমেরিকান পর্যটককের ম'ত সপ্তাহে আড়াই হাজার মাইল দেখবার গরজ যার নেই ; আনন্দের বিন্দু বিন্দু মধুক্ষরণ তার পক্ষে যথেষ্ট, এক নিঃশ্বাসে পানীয়টুকু শেষ ক'রে ফেলা তার স্বভাবে নেই। এই মনোভাবই যে তাঁর ছিল, তৃণাঙ্কুর গ্রন্থের দিনলিপিভঙ্গিম রচনায় বিভূতিভূষণ তা স্পষ্ট ক'রে খুলে বলেছেন।

কিন্তু পরম শান্তির এই অনুভূতি, অনাসক্ত জীবন-দর্শনের এই প্রকাশ ছোট গল্পের চেয়ে ডায়েরি-জাতীয় রচনাতেই ভাল ভাবে অভিব্যক্ত হয়। তবু, মৌরীফুল-ধরনের গল্পগুলিতে মানবজীবনের ক্ষুদ্র সুখদুঃখগুলি সরসভাবে রূপায়িত হয়েছে। খেলা, অবিশ্বাস্য প্রভৃতি ছোট গল্পে অপ্রত্যাশিত আঘাতে সংসারীর নীড় ভেঙে যাওয়ার কাহিনীগুলিও মর্মস্পর্শী।

তাঁর জীবনের শেষের দিকের কয়েক বছর বিভূতিভূষণ তাঁর সব গল্পেই একটু পারলৌকিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। অতিপ্রাকৃতের অভিব্যক্তি তাঁর রচনার স্বধর্ম বরাবরই : দৃষ্টিপ্রদীপ উপন্যাসে ঘরোয়া সুখদুঃখের কথা বলতে গিয়েও তিনি clairvoyance বা দিব্য-দর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন ; ক্রমশ তিনি মর্ত্য জীবনের নশ্বরতা, আকস্মিক বিলুপ্তি ও সূক্ষ্ম জগতের জীবদের অস্তিত্ব বিষয়ে বড় বেশি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠছিলেন। নিজের আকস্মিক দেহত্যাগের বিষয়ে তাঁর কোন premonition বা পূর্বানুভূতি ছিল কি না, জানি না। কিন্তু ছোটনাগপুরের জঙ্গলেই হোক, অথবা কিলিমাঞ্জারোর পাহাড়েই হোক, জগৎ তাঁর কাছে সর্বত্রই তাদের অস্তিত্বে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিল, যাদের এক সঙ্গে পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না—দেখতে পেলে ছোঁয়া যায় না, শুনতে পেলে দেখা যায় না, স্পর্শলাভ করলে ধরা যায় না। এর ফলে তাঁর সব রচনায়, গল্পে-উপন্যাসে-স্মৃতিচারণে এক উদাস করুণ ম্লান ছায়া পড়েছে—যা-কিছু দেখা যাচ্ছে, বেশ ভাল লাগছে, চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে, তা যেন হঠাৎ মিলিয়ে যাবে, এমন একটা ভাব। তার সঙ্গে মিশেছে অমর্ত্য জীবনের অস্তিত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাসজনিত জীবন্ত আত্মার শান্তি।

কিন্তু এই শান্তি সত্ত্বেও যা হারিয়ে গেল, আর যা হারিয়ে যাচ্ছে, আর যা হারিয়ে যাবে, তার প্রতি রোমাণ্টিক ব্যাকুলতা, ক্ষোভাতুর মনের বিরহবিধুর অশ্রুপাত, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শূন্যে চাওয়া, বিদায়-পথে চরণ ফেলে চ'লে-যাওয়া দিনযামিনীর অলিতে-গলিতে ভ্রাম্যমাণের স্মৃতিচারণ--বিভূতিভূষণের রোমাণ্টিক শিল্পী-প্রকৃতির দিকে অভ্রান্তভাবে সঙ্কেত নির্দেশ করে। তাই তাঁকে শান্তি ও পারলৌকিকতা সত্ত্বেও দার্শনিক না হয়ে শান্ত অতি-প্রাকৃতের রোমাণ্টিক কথাশিল্পী হতে হয়েছে। ঝগড়া গল্পটির পাতায় পাতায় এই রোমাণ্টিক মনের অনবদ্য উৎকর্ষের পরিচয়।

বিভূতিভূষণকে রোমাণ্টিক আধুনিক কথাসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে বিচার করলে তাঁর যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হতে পারে। যে রোমাণ্টিক আধ্যাত্মিকতা বঙ্কিমচন্দ্রে প্রথম ক্ষীণভাবে দেখা দেয়, তা বিভূতিভূষণ ও দিলীপকুমারে পূর্ণ বিকশিত। দিলীপকুমারের মধ্যে অধ্যাত্ম-উপলব্ধি সুপরিণত ; বিভূতিভূষণে তা অতি-প্রাকৃতের সন্ধানে প্রকৃতির মধ্যে অবগাহনে পর্যবসিত। আরণ্য-প্রকৃতি আর অতিপ্রাকৃতের বর্ণনাই তাঁর বিশ্ব-সাহিত্যেও অভিনব দান—যা ভারতীয় রোমাণ্টিক পারলৌকিক মন ছাড়া অপর কোন বৈদেশিক মনের পক্ষে রচনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং আজ পর্যন্ত আর কোথাও সৃষ্টি করা হয় নি। তাঁর আরণ্যপ্রকৃতির বর্ণনার সঙ্গে হাডসন বা কিকি বাউমের বর্ণনার, কিংবা তাঁর অতিপ্রাকৃতের ব্যবহারকৌশলের সঙ্গে ওয়েল্‌সের কৌশলের, অথবা তাঁর আধ্যাত্মিক মতবাদের সঙ্গে হাক্সলি, মম্‌ বা ইশারউডের মতবাদের কোন রকম তুলনা না ক'রেও এ-কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, আরণ্য-প্রকৃতির বর্ণনায়, অতিপ্রাকৃতের প্রয়োগকৌশলে, অন্য জগতের অস্তিত্বসম্বন্ধীয় বিশ্বাসে বিভূতিভূষণ কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যে একেবারে নতুন। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, নূতনত্ব সৃষ্টি করতে তাঁকে কোন বৈদেশিক সাহিত্যের কাছে না ব'লে ঋণ গ্রহণ করতে হয় নি কিংবা অবচেতনের অতলে নেমে গিয়ে কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় নিতেও হয় নি। স্বদেশেই সচেতন শিক্ষিত মন তাঁকে অভিনব উপকরণ আর অনুপম পরিবেশনসজ্জা এনে দিয়েছে।

বাংলা ছোট গল্পে উচ্চাঙ্গের অতিপ্রাকৃতের রহস্যরস পরিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য সকলের চেয়ে বিভূতি-ভূষণ বেশি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ছোট গল্পের ক্ষুদ্র মণি-মঞ্জুষায় যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির রত্নকণিকা তিনি বিতরণ করেছেন, সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্যে আর তুলনা নেই। বাংলা সাহিত্যে এ দিক থেকে তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তাঁর অধ্যাত্মবোধ রসানুভূতির সঙ্গে যে সামঞ্জস্য স্থাপন করেছিল, যে-কোন সাহিত্যশিল্পীর পক্ষে তা চির-দিন ঈর্ষার বিষয় হয়ে থাকবে।

—•—

বেকারের ভাবনা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

মহেন্দ্রবাবু ভাবছেন। অনেকদিন থেকেই ভাবছিলেন। ভাবনাটা বেড়ে গিয়েছিল মাস দুয়েক আগে থেকে। এখন ত আর কূল-কিনারা দেখতে পাচ্ছেন না। ভাবনাটা জগদ্দল পাথরের মত বুকের মধ্যে চেপে বসেছে—একটুও নড়ছে না।

কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন মাস তিনেক হ'ল। এমন দিন যে আসবেই একদিন তা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই ভাবনা আরম্ভ হয়েছিল। মাত্রা বেড়েছিল বেকারির দিন ঘনিয়ে আসতে দেখে। এখন ত পথে বসেই পড়েছে।

তা পড়ুক। কিন্তু একটা কিছু উপায় ত বের করতেই হবে। কিন্তু কিছুই মাথায় আসছে না যে!

অবশ্য বাড়ী একটা করেছেন মহেন্দ্রবাবু। কিছু আহামরি নয়। তবু মাথা গুঁজবার একটা ঠাঁই ত তবু রক্ষা। জীবনে এইটুকুই বুঝি তিনি সুবিবেচনার কাজ করেছিলেন। নইলে কোথায় উঠতেন তিনি? কোনও আত্মীয়ের বাড়ী? কোনও ভাড়াটে বাড়ীর একটা স্যাঁৎসেঁতে ঘরে? ভাড়াই বা জুটত কোথায়?

না, জুটত না। এমন একটা চাকুরি করেছেন যাতে পেন্সন নেই। এমন কিছু সঞ্চয় নেই যে বাকি জীবনটা নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাতে পারেন। পেন্সন-পাওয়া বুড়োদের দুর্দশাও ত কম চোখে পড়ে নি তাঁর। বাজারের থলি হাতে ক'রে রোজ সকালে বাজারে ধাওয়া, নাতি-নাতনীদের তদারক আর সাংসারিক নানা কাজে গৃহিণীকে সাহায্য করা। একটু নড়াচড়া না করলে বুড়োবয়সে শরীর টিঁকবে কি করে এ-কথা ত তাঁদেরও অনবরত শুনতে হয়। আর পেন্সনহীন ভদ্রলোকের কি অবস্থা দাঁড়াতে পারে ভাবতেই তাঁর হৃদ্‌কম্প হচ্ছে।

পেন্সন-পাওয়া বুড়োদের নিয়ে গল্প তিনি অনেক পড়েছেন। পড়ে হেসেছেন। কিন্তু চল্লিশ বছর চাকুরির পর শুধু-হাতে বেরিয়ে আসা যে কি মজাদার বস্তু, এমন কথা কি কোনও গল্পলেখক লিখেছেন?

তাই মহেন্দ্রবাবু ভাবছেন। এক নিরন্ন ভাবনা তাঁকে গিলছে।

বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা তাঁর বরাবরই কম। এখন ত আরও কম। কারও সঙ্গে যে মন খুলে কথা বলবেন এমন লোকও চোখে পড়ে না। যেখানে তাঁর বাড়ী, সেখানে তাঁরই মত আরও অনেকে নতুন বাড়ী করেছেন। জজ আছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন, সিভিল সার্জেন আছেন, ডেপুটি আছেন, স্কুল ইনস্‌পেকটার আছেন, আরও অনেকে আছেন বেশীর ভাগই অবসরপ্রাপ্ত, কেউ বা অবসর নেব নেব করছেন। কিন্তু তাঁদের কথা পৃথক। বেকার হ'লেও মোটা পেন্সন আছে। তবু তাঁদেরও দুর্ভাবনার অন্ত নেই। যাঁদের সঙ্গে আলাপ করেছেন তাঁরাও আয় কমে গিয়েছে বা যাবে ব'লে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আছেন। তাঁদের ভাব দেখলে দুঃখের মধ্যেও তাঁর হাসি পায়।

সেদিন মহীতোষের চিঠি পেয়ে মহেন্দ্রবাবু একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। মহীতোষ তাঁর অনেক দিনের বন্ধু, কলেজের বন্ধু। হ্যাঁ, সে তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুই ছিল বটে। এখনও সে খোঁজ-খবর নেয়। তবে সে পেন্সন-পাওয়া বন্ধু। পুলিশের দারোগা থেকে সে পুলিশ সুপারিন-টেনডেণ্ট পর্যন্ত হয়েছিল। এখন পেন্সন পাচ্ছে, কলকাতায় বাড়ী করেছে। তার কথা আলাদা। কিন্তু সে একটা আইডিয়া দিয়েছে তার চিঠিতে।

লিখেছে—পেন্সন পাও না বলে তোমার ভাবনা কিসের মহেন্দ্র? এককালে তুমি আমাদের ঈর্ষার পাত্র ছিলে মনে আছে? তুমি লিখতে গল্প আর কবিতা। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতে দাও নি যে তুমি সাহিত্যিক হওয়ার সাধনা সুরু করেছ। বি. এ. পড়ার সময় তোমার একটা গল্প যখন তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ মাসিক 'বঙ্গবীণা'য় বের হয়, তখন আমাদের একেবারে অবাক্‌ ক'রে দিয়েছিলে তুমি। প্রথমে ত বিশ্বাসই হয় নি যে তুমিই ওটার লেখক। আমাদের চমকে দেওয়ার জন্যই তোমারই নামের কোনও লেখকের লেখা নিজের নামে চালাচ্ছ। তুমি তখন মুচকি হেসেছিলে। কিন্তু আমাদের ভুল ভাঙ্গতেও দেরি হয় নি। তারপর যখন নানা সাময়িক পত্রে তোমার লেখা বেরোতে থাকে—বুঝতে আমাদের বাকি থাকে না যে, কালে তুমি একজন উঁচুদরের সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করবে। আমাদের তখন তোমার ওপর দারুণ হিংসে হ'ত। তুমি ত ঠিকই করেছিলে যে, সাহিত্যসেবা করেই জীবনটা

কাটিয়ে দেবে। পরের দাসত্ব তোমার সইবে না। কিন্তু কয়েক বছর পরই তুমি চাকরিতে ঢুকে গেলে। তারপর ধীরে ধীরে তোমার লেখাও কমে এল। শেষে আর কোনও কাগজেই তোমার লেখা চোখে পড়ত না। তখন কম ক্ষুণ্ণ হই নি আমি। আমার যে একজন সাহিত্যিক বন্ধু আছে—পুলিশ মহলে তাই নিয়ে কত গর্বই না করেছি। তোমার লেখা বেরোলেই আমার সহকর্ম্মীদের পড়িয়ে শুনিয়েছি। আর তোমার সেই কুকুরছানার গল্পটা? এখনও সেটা স্পষ্ট মনে আছে। মানুষের পশুত্ব আর পশুর মহত্ব তুমি কি আশ্চর্য্য সুন্দর ভাবে ফুটিয়েছিলে ঐ গল্পে। এখন ত তোমার অখণ্ড অবসর। আবার সুরু কর না কেন? শুনতে পাই দেশ স্বাধীন হবার পর বাজারে বাংলা বই বিক্রি বেড়ে গিয়েছে। লেখকরাও বেশ পয়সা পাচ্ছে। লেখার অভ্যাসটা এইবার ঝালিয়ে নাও। হয়ত গোলামির উপার্জ্জনের চেয়েও বেশী আয় করতে পারবে অবসর জীবনে।

দি আইডিয়া! মহেন্দ্রবাবুর ভাবনাটা কিঞ্চিৎ ফিকে হ'ল। শুধু শুধু ভেবে মরছেন কেন? লিখতে কি আর পারবেন না তিনি? সাঁতার শিখেছিলেন ছোট বেলায়। কতদিন যে তিনি জলে নেমে সাঁতার কাটেন নি মনেও পড়ে না। এখন যদি কেউ ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দেয়, তিনি কি ডুবে মরবেন, না সাঁতরিয়ে কূলে উঠবেন? নিশ্চয়ই ডুবে মরবেন না। সাইকেল চড়া শিখেছিলেন সেই প্রথম যৌবনে। চাকুরে জীবনের প্রথমটায় সাইকেলেই টুর করতেন। শেষটায় অবশ্য সাইকেলে চড়তে হ'ত না। এখন কি আর সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়াতে পারবেন না? নিশ্চয়ই পারবেন। ঐ যে পাড়ার নন্দদুলালবাবু, ষাট বছর বয়সেও পাকা চুলদাড়ি নিয়ে সাইকেলে চড়ে অবলীলাক্রমে বাজার-হাট করে বেড়াচ্ছেন, বুড়ো হয়েছেন ব'লে তিনিই বা পারবেন না কেন? প্রথমটা হয়ত একটু ভয় ভয় করবে কিন্তু শেষটায় কি নন্দদুলালবাবুর মত সাইকেলে চড়ে বাজার-হাট করতে পারবেন না? তবে?

আইডিয়াটা দিয়েছে ভাল মহীতোষ। এখন সেটাকে কাজে লাগাতে পারলে হয়। অনেক দিন পর তাঁর মনে একটু খুশির আমেজ দেখা গেল যেন।

মহেন্দ্রবাবু কণ্ঠে একটু জোর দিয়েই স্ত্রীকে ডাকলেন। সুনয়নী তখন রান্নাঘরে। বাড়ীতে স্থায়ীভাবে আসার পর তাঁর কাজের অন্ত নাই। তাঁর অবসর গ্রহণের আগে স্ত্রীর অবসর ছিল অনেকটা। সংসারের ছোটখাট কাজ করার পরও তখন যথেষ্ট সময় থাকত। সেই ফাঁকটা ভরতো গল্প-উপন্যাস পড়ে আর সিনেমা দেখে। তখন রান্না করার আলাদা লোক ছিল। অন্য কাজ করার জন্য একটা চাকরও ছিল। এখন ত শুধু একটা ঠিকে ঝিই সম্বল। তাও সে অন্তত মাসে চারটে দিন কামাই করবেই। সুতরাং সুনয়নীর মেজাজ ভাল থাকার কথা নয়।

স্বামীর অতর্কিত ডাকে তিনি উৎকর্ণ হ'লেন স্বামী ভাবনা-চিন্তায় ডুবে আছেন সেটা তিনি দেখছেন। কিন্তু উপায়ই বা কি? নিজের কর্মফল ভোগ করতেই হবে ত'? আজ হঠাৎ আবার ডাকাডাকি কেন?

রান্নাঘরের দরজা ভেজিয়ে তিনি স্বামীর কাছে এলেন। মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন একটুখানি। ভাবটা যেন একটু হাসি-হাসি মনে হ'ল। ব্যাপার কি?

—মহীতোষের একটা চিঠি পেলাম আজ। মহেন্দ্রবাবু বললেন।

ভ্রূ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হয়ে এল সুনয়নীর। মহীতোষ? কোন্ মহীতোষ?

—সেই যে আমার ছোটবেলার বন্ধু।

—সেই তোমার পুলিশ সাহেব বন্ধু ত?

—হ্যাঁ। পুলিশ সাহেব হয়েছিল বটে, কিন্তু পড়াশোনার দিকে ভারি ঝোঁক ছিল তার। আমাকে একটা আইডিয়া দিয়েছে সে।

সুনয়নীর ভ্রূ আরও একটু কুঞ্চিত হ'ল। আইডিয়াটা কি?

—আজকাল না কি আর বাংলা দেশের লেখকদের ভাবনা নাই। একটা কিছু লিখতে পারলেই পয়সা।

সুনয়নীর কোঁচকান ভ্রূ সোজা হ'ল। কিন্তু ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি।

—লেখকদের ভাবনা না থাকতে পারে, কিন্তু তোমার ভাবনাটা তাতে যায় কি ক'রে?

—না, ঠিক ভাবনা যায় না। তবে একটু চেষ্টা করলে আপত্তি কি? একদিন আমিও ত কিছু কিছু লিখেছি। আবার সেটা আরম্ভ করলে কেমন হয়?

সুনয়নীর একেবারে গালে হাত। বললেন, তুমি লিখবে? তবেই হয়েছে। বরং উল্টো আইডিয়া দেও তোমার পুলিশ সাহেব বন্ধুকে। মোটা পেন্সন পায়। কাগজ আর কালি-কলম কেনার পয়সার তাঁর অভাব হবে না। নিজের জীবনের কাহিনীই বরং লিখতে বলো। পুলিশ সাহেবের আত্মকাহিনী। কাটবে ভাল। বরং তাঁর বই বিক্রির ক্যানভাসার হয়ো তুমি। তাতে যদি দু'চার পয়সা পাও।

স্ত্রীর মন্তব্যে মহেন্দ্রবাবুর মুখটা আবার ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। তবু একটু হাসির ভাব বজায় রাখার চেষ্টা ক'রে বললেন, তা মন্দ বলনি। কিন্তু তুমি কি ভাব, চেষ্টা করলে আমি এখনও লিখতে পারি নে? যদি একটু সাহায্য কর—।

সুনয়নীর চোখে বিস্ময়। বললেন, সাহায্য করব? আমি? তোমাকে?

হেসে ফেললেন মহেন্দ্রবাবু।—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। মহীতোষ কি লিখেছে জান? আমার সেই কুকুরছানার গল্পটা না কি তার এখনও মনে আছে। এত ভাল লেগেছিল তার। মনে আছে ত সে গল্পটার আইডিয়া তুমিই দিয়েছিলে। তেমন দু'একটা প্লট যদি জোগাতে পার আর একবার চেষ্টা করে দেখি।

স্বামীর খোসামোদের কথাতেও সুনয়নীর মুখের থমথমে ভাব ঘুচল না। জবাব দিলেন, সেদিন অনেকদিন চলে গিয়েছে। আর ফিরবে না। এক মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। তোমার ক্ষমতা কত, অনেকদিন থেকেই জানা হয়ে গেছে আমার!

মহেন্দ্রবাবুর পৌরুষ যেন একটু মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বললেন, তোমাকে বলাই ভুল হয়েছে আমার। আচ্ছা, দেখা যাক লিখতে পারি কি না।

—তা চেষ্টা করে দেখতে পার। তবে লেখার কাগজ-কলমের পয়সাটা কোথা থেকে জোটাবে সেটাও ভেবে দেখ। জান ত, নষ্ট করবার মত পয়সা আমার হাতে নাই।

বিদ্রূপের কশাঘাত হেনে সুনয়নীদেবী চলে যেতে যেতেও বিষবাণ ছুঁড়ে দিলেন।—বসে বসে আকাশকুসুম রচনা না করে একটু সংসারের কাজে লাগলেও ত সুসার হয়। বাবুর এখনও সেই দেমাক! থলি হাতে বাজার করতে যেতে লজ্জা! আমার হয়েছে চারদিকে মরণ!

স্ত্রীর কথার ঝাঁঝে যতটা ক্ষিপ্ত হওয়ার কথা তেমন কিছু বিশেষ ভাবান্তর দেখা গেল না মহেন্দ্রবাবুর। একটু ম্লান হাসি হাসলেন। সত্যিই ত, লেখবার কাগজ-কলম আসবে কোথা থেকে। কিন্তু বাজার করা? ঐ কথা শুনলেই তাঁর গায়ে জ্বর আসে। ও জিনিষটাই তাঁর কাছে কেমন ভাল্‌গার মনে হয়। তাই এ পর্যন্ত, পারতপক্ষে ও দিকে পা মাড়ান নি। চাল, ডাল, নুন, তেল, আলু-পটল, শাকপাতা, মাছ নিয়ে দরাদরি করছে বাবুরা এ দৃশ্য দেখলেই তাঁর গা ঘিন-ঘিন করে এসেছে এতদিন। কিন্তু বোধহয় আর উপায় নাই। অবশ্য কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাজারে যাওয়ার লোকের অভাব হয় নি। বাজারে যাওয়ার জন্য অনেকেই তাক করে থাকত। চাকর-বাকর কি হারে যে চুরি করে বাজারের পয়সা—এ-কথা সুনয়নীদেবী বারবার শুনিয়েছেন। নিজে দেখেশুনে বাজার করলে টাট্‌কা আর খাঁটি জিনিস খাওয়া যায় এবং তাতে যে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে, এ সব কথা তখনও প্রায়ই শুনতে হ'ত তাঁকে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এখন বুঝি ঐ দুর্দৈব ঠেকান যাবে না আর। বর্ত্তমানে সম্বল একটি মাত্র ঠিকে ঝি। সে পাঁচ বাড়ীতে কাজ করে। তার সময়ই বা কোথায়, যদি ইচ্ছাও তার থাকে। না, ইচ্ছা তার আছে ঠিকই। সময়ও সে করে নিতে পারে কিন্তু ষোল আনা অনিচ্ছা তাঁর স্ত্রী সুনয়নীর। অনিচ্ছা থাকলেও তাকে দিয়েই কাজটা করাতে হয়। কিন্তু ফ্যাসাদ বাধে হিসেব নিয়ে। নিজের ভাবনা-চিন্তায় মগ্ন থাকলেও গিন্নী আর ঝিয়ের কথাবার্তা তাঁর কানে প্রবেশ করে। বেশ সরস বাক্যালাপ! মজা হয় যখন আনা পয়সাকে নয়া পয়সায় রূপান্তরিত করার ফ্যাশাদ এসে দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি সুরু হয়।

মহেন্দ্রবাবুর হঠাৎ খেয়াল হ'ল। গিন্নী আর ঝিয়ের কথামৃত দিয়েও বেশ একটা সরস লেখা তিনি চেষ্টা করলে লিখতে পারেন বোধহয়। আজকাল যেন কি বলে ওকে? মনেও থাকে না ছাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, রম্য-রচনা। ঐ রকম ভঙ্গির লেখাতেই না কি পয়সা বেশী। পাঠকরা না কি আজকাল ঐ সবই বেশী পছন্দ করে। মহেন্দ্রবাবু এই কথামৃত পান করেন। তাঁর মনে দিব্যি গাঁথা হয়ে গিয়েছে নিত্য কথাগুলি। হোক না কেন একঘেয়ে, নিত্য একই কথার পুনরাবৃত্তি। তবে এই ব্যাপারে যখন তাঁকেও টানা হয় তখন আর তাঁর কাছে ব্যাপারটা মজাদার থাকে না। ভাবেন, এই রে, এবার বুঝি বাজারের ঝুলি হাতে ঝুলোতেই হয়।

মহেন্দ্রবাবু চোখ মুদিত করে ভাবতে থাকেন। প্রথম দিনের ঘটনা। নব-নিযুক্তা ঠিকে ঝিয়ের হাতে দু'টি টাকা দিয়ে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাঠিয়েছিলেন সুনয়নী বাজারে। বলেছিলেন, তরিতরকারি যা দেখ অল্পস্বল্প নিয়ে এস। মাছ এক পো। ডিম যদি সস্তায় পাও নিয়ে এস দুটো। টকের জন্য দু'পয়সার কাঁচা তেঁতুলও আনবে। ঘণ্টাখানেক বাদে ঝি ফিরেছিল বাজার থেকে। বাজারের থলি নামিয়েই নগদ একটি নয়া পয়সা কর্ত্রীর সামনে ফেলে দিয়েছিল। বলেছিল, এই নেও মা ফিরতি পয়সা।

থলি থেকে একে একে বার করতে লাগলেন সুনয়নী বাজারের সওদা। মুখ বোধহয় অন্ধকার হয়ে উঠেছিল

তাঁর। থমথমে স্বরে বলেছিলেন, এই শুকনো বেগুনগুলো নিয়ে এলে বাছা। বাজারে কি ভাল বেগুন ছিল না? আর এইটুকু একফালি কুমড়া। বলি দাম কত? আলুর ত অর্দ্ধেকই পচা। একটু হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে জিনিষ আনতে হয় বাপু। যা দিলে তাই নিয়ে এলেই কি আর হয়। যাক্‌গে প্রথম দিন আর বেশী কি বলব। এরপর থেকে একটু বেছেকুছে বাজার ক'রো। মনিবের পয়সা কি আর পরের পয়সা মনে করতে হয়? মাছটা কি আনলে দেখি? এই মরেছে! আমেরিকান কৈ? এ মাছ ত উনি মুখে তুলতে চান না। আর কি মাছ ছিল না বাজারে?

ঝি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে গিন্নীর মন্তব্য শুনছিল গালে হাত দিয়ে। এই বার সে ছড়ান জিনিষের সামনে বসে পড়ল। বলল, আমার কি আর বাজার করনের অব্যেস আছে মা। আইছি পাকিস্থান ছাইড়্যা ভাইগিয়ার দোষে। পোড়া-কপালে দুখ্‌খু না থাকলি কি এ-দ্যাশে আসতি হয়। তুমি আজ কথা শুনাইত্যাছ। শুকনা বায়গুণ আন্‌ছি লাগ্যা। আলুও পচা বার করলা। মনের দুখ্‌খুটা আর কারে শোনাইমু মা? তোমারেই কই। দ্যাশে কি বাজার যাওন লাগত আমাগো। দ্যাড়শো বিঘ্যা ধান-জমি, তিন তিনটে পুকুর, দুই বিঘ্যার মত তরকারির ক্ষ্যাত। বারমাস্যা চাকরই ত আছিল চারজন। আর চাসের মরশুমে আরও জনা দশেক। কতবড় ঘরের মাইয়া, বৌ আমি। কও?

ঝি'র কথায় গিন্নীর কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া বোধহয় উপায় ছিল না।

ঝি আবার বলে চলেছে। আমাগো ক্ষেতির কি বায়গুন সেডা কি আর এই খুলে কওন যায়। এক একটা ওজনে এক স্যার, ড্যার স্যার। খামু কি, ঝাঁকা-ভরতি বাইগুন দ্যাখলিই প্যাট ভর্‌য়্যা উঠ্‌তোক। হঃ, ত্যাল চুকচুক্যা বায়গুন এই দ্যাসে আছে না কি। সব শুটকি। হাতে ছুইলেই গাডা গোলাইয়া ওঠে। আর ঐ যে মাছের কথা কইলা না? আমেরিগান্ না কি কৈ কইলা যেনি? পোড়া কপালডা আমার! আমাগো দ্যাশে ঐ ছিরির কৈ মাছ আছিল না কি? অরই নাম কৈ? আমাগো দ্যাশের বিলির কৈ, হায় মরিরে! না দেখ্‌লি বিশ্বাস করবা না তুমি! এ্যাক এ্যাকটা দ্যাড় পুয়া আধ স্যার। আর এহানে? ঐ ত ছিরির মাছ। অরে কি আর কৈ কয় না কি। ঐ মাছ নেওনের জন্যি কি ভিড় মা, কি ভিড়। আমি মাইয়া মানুষ, সেই ভিড়ে কি ঢুকতি পারি? তুমিই কও মা।

মহেন্দ্রবাবুর ঐ চিত্রটি মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে রয়েছে। সত্যিই ত। অতবড় ঘরণীর কি পরিণতি! ঝিয়ের কথায় তাঁর নিজের কথাই মনে পড়ছিল। সেদিন পর্যন্ত তিনিও ত বড় একটা কম কিছু ছিলেন না। তাঁর হুকুমে কত লোক উঠত-বসত। একটা মুখের কথা বের হ'লে লোকজন হাঁ হাঁ করে ছুটে আসত। আর এখন? যত অনিচ্ছাই হোক বাজারের থলি হাতে উঠতেও আর দেরি নাই।

সুনয়নী সেদিন বলেছিলেন—সবই শুনলাম বাছা। ভাগ্য ছাড়া ত পথ নাই। এই আমাকেই দেখ না। যাক্‌গে ওসব কথা। এখন হিসেব দেও ত দেখি। নগদ একটা নয়া পয়সা ত ফিরেছে। দু'টাকা দিলাম, সবই ত খরচ।

ঝি সুনয়নীর কথায় অবাক্ হ'ল। হিসেব? বাজার গালাম, জিনিস কিনলাম, দাম দিলাম। যা হাতে আছিল ফেরৎ দিলাম। আমার কাজ ঐ হানেই শ্যাষ।

সুনয়নী অবাক্। বলে কি ও। হিসেব দেবে না? এমন ফ্যাসাদে ত তিনি কখনও পড়েন নি। খরচ যাই হোক, হিসেব তাঁর কড়ায়-গণ্ডায় চাই-ই। যতক্ষণ হিসেব না পাচ্ছেন—তাঁর স্বস্তি নাই। আর সে ত সেই আগের আমলের কথা, যখন মাস গেলে অঢেল না হোক, নিয়মিত টাকা আসত। আর এখন? এক পয়সা আয় নেই—জমান টাকা থেকে খরচ। তাই বা আর কদ্দিন চলবে। ভাবতেও তাঁর বুক কেঁপে ওঠে। আর সেই পয়সারই হিসেব নেই? ঝি-টা বলে কি?

ঝেঁজে উঠলেন সুনয়নী। হিসেব না দিলে চলবে না বাছা। কোন্ জিনিস কত দিয়ে কিনলে বলবে না তুমি? একটা নয়া পয়সা ছুঁড়ে দিলে আর হয়ে গেল?

ঝি'র কিন্তু আশ্চর্য নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর।—তা হবে ক্যান মা, হবি না। কিন্তুক আমারই কি খ্যায়াল থাকে, কোন্ জিনিষটা কত দরে কিন্‌ছি। মুখ্যুসুখ্যু মানুষ মা। আর ঐ যে তুমি কইলা না, আলুর আদ্দেকই পচা। তার আমিই বা কি করমু মা। আমাগো বাড়ীতে ঐ যে কলাম না, দুই বিঘ্যা জমি ক্যাবল তরকারিরই আবাদ। তার এক বিঘ্যাই আলুর চাষ। পাঁচ স্যার বেছনে পাঁচ মণ আলু। সে আলু বেচ্যাও যা থাকত মা, সম্বচ্ছর ফ্যালায়ে-ছড়ায়্যা খাওন চলত। প্যাট ত কম আছিল না। মজুরই দশ-বারটা। সেই আলু পচে নি? পচ্যাছে, স্যারে স্যারে পচ্যাছে। আলুর ধরণডাই ঐ।

তা এ ত বাজারের আলু। সবই যে পচে নাই সেই আমার গুরুবল।

গিন্নীর বোধহয় সহ্য হ'ল না। তিনি ছুটে এলেন মহেন্দ্রবাবুর কাছে।

—বলি, শুনছ ত, ঝি-টা বলে কি। নগদ দিলাম দু' দুটো করকরে নোট। আনল ত ঐ সব বাজার-কুড়োনো মাল। এখন বলে যে হিসেব জানে না। আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে। এই বুড়ো বয়সে আমার কি হাড়ির হাল হচ্ছে বল দেখি। তুমি যদি সংসারের কিছু করে উপকারে আসতে তা হ'লেও আমার কিছুটা সোয়াস্তি হ'ত। কাল থেকে তোমাকেই যেতে হবে বাজারে। ঐ ঝিকে আমি আর পাঠাচ্ছি না।

কিন্তু পরদিন ঝি-ই রক্ষা করেছিল মহেন্দ্রবাবুকে। সেই উপযাচক হয়ে বলেছিল সুনয়নীকে—দ্যাও দেহি মা, বাজারের পুইসা। কাল তুমি কথা শুনাইলা না, দেহি আজ কোন্ দোকানি আমারে ঠগায়। বাজারের স্যারো জিনিষ আনুম আজ। পয়সা কিন্তুক বেশী লাগবো। জিনিসের দর এ পোড়ার দ্যাশে এক্কিবারে আগুন। হাত দিয়া ছোঁওন যায় না কি! আর আমাগো দ্যাশে কি সস্তাই না আছিল মা—।

গিন্নী বিরক্তির সুরে বলেছিলেন—থাম বাছা। তুমি পাঁচ জায়গায় কাজ কর। সময় কই তোমার দেখেশুনে বাজার করার। আজ বাবুকেই পাঠাচ্ছি বাজারে। তুমি বাজারে যাবে, জিনিস কিনবে আর হিসেব দিতে পারবে না। ও চলবে না।

ঝিয়ের স্বর শুনতে পেয়েছিলেন মহেন্দ্রবাবু। খুব দরদমাখা স্বর। বাবু যাবি বাজারে? কি যে তুমি কও মা। বাবুর কি অব্যিস আছে বাজার যাওনের। আর যা ভিড়। বুড়া মানুষ, কষ্ট হবি। আর হিসেবই বা দিমু না ক্যানে, কড়ায়-গণ্ডায় বুঝায়ে দিমু।

সুনয়নীর মুখের ভাবটা অবশ্য দেখতে পান নি মহেন্দ্রবাবু। তবে আন্দাজ করেছিলেন। সেদিনও বোধহয় দুটো টাকাই অপ্রসন্ন মুখে তুলে দিয়েছিলেন ঝিয়ের হাতে।

মহেন্দ্রবাবু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। না, ঝি-টা বেশ দরদী ত। তবে ঐ বুড়ো মানুষ কথাটা তাঁকে বড্ড বেশী খোঁচা দেয় আজকাল। ও কথাটা না বললেই পারত। তিনি সত্যিই বুড়ো অথর্ব হয়ে পড়েছেন না কি?

ঝিকে বাজারে পাঠিয়ে সুনয়নী অপ্রসন্ন মুখে এসে-ছিলেন মহেন্দ্রবাবুর কাছে। বলেছিলেন, তুমি ত বেঁচে গেলে। কিন্তু নিত্যি দুটো টাকা আমি কোথা থেকে পাই বল ত? ঝি মাগির বাজারের রসে ধরেছে। পাঁচ বাড়ীতে করছে ঝি-গিরি। আর কোথায়ও বাজারে যেতে দেয় না কি? তোমার মত অকর্মা ত আর এ তল্লাটে কেউ নেই। আমার হয়েছে মরণ! ঐ যে জজ সাহেব। পেন্সন নিয়ে এসে বসেছেন। কত বড় লোক। তেতলা বাড়ী। উনিও নিজে যাচ্ছেন বাজারে। সঙ্গে চাকরটাকে পর্যন্ত নেন না। তবে? তোমারই বা অত আদিখ্যেতা কেন? পেন্সন-পাওয়া চাকরি কর নি বলে?

সেদিন বোধহয় মোটামুটি ভাল জিনিসই এনেছিল ঝি। বিশেষ মন্তব্য কিছু শুনতে পান নি মহেন্দ্রবাবু। তবে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়েছিল হিসেব নেওয়ার সময়।

—বেগুন কতটা? এক পো? দাম কত?

—দশ আনা স্যার মা। মুখে আগুন এ দ্যাশের লোকের। ঐ দামের জিনিষ আবার মুখে তোলে। দশ আনা স্যারের বায়গুনও দেখাইলা ভগবান।

—বলি দাম কত?

—দশ পুইসা।

—দশ পয়সা? কত নয়া পয়সা নিয়েছে বলবে ত?

—দিছি দশ, পাঁচ আর দুই নয়া। সতের হ'ল না?

গিন্নী ঝঙ্কার দিয়ে বলেন—এই মরেছে। দশ পয়সায় কি সতের নয়া হয়রে বাছা। ঠকেছ। কাল এক নয়া পয়সা ফেরত নিয়ে এস, বুঝলে ত।

ঝি কিন্তু নির্বিকার। সে বেশ রসিয়ে রসিয়েই বলেছিল সেদিন।

—আমারে ঠকায় এমন মানুষ এহানে নাই। তুমি পুয়া কইলা না? স্যার, পুয়া তোমাগো দ্যাশে কি আছে মা। এখন হইছে কেজি ফেজি কি যেনি কয়। আবার কয়, গেরাম। বায়গনওয়ালা কয় কি, তোমারে আড়াইশ' গেরাম দিলাম, এক পুয়ার অনেক বেশী। দাম সতের নয়া।

ঝি-র কথায় সুনয়নী হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন, আর দাম নিয়ে বেশী চেঁচামেচি করেন নি।

ঝি'র কথার উৎস কিন্তু থামে নি। টাকা, আনা, পুইসা ত ভালই আছিল মা। স্যার, পুয়া, ছটাকই বা দোষটা কর্যাছিল কি? আমাগো পাকিস্তানে কিন্তু এ সব বালাই আছিল না। ভাগ্যির দোষে ঐ সোনার দ্যাশ ছাড়তি হইছে আমাগো। দুঃখির কথা আর কইমু কারে!

ঝি'র বাক্যস্রোতে আর ভাসতে ইচ্ছা ছিল না

সুনয়নীর। তিনি ছুটে এসেছিলেন মহেন্দ্রবাবুর কাছে।

—শুনলে ত ওর কথা। আমাকে আবার নয়া পয়সার ভেলকি দেখাতে চায়। বলি, প্রতি জিনিষে যদি একটি করে নয়া পয়সা সরায়, তা হ'লে দিনে কয় পয়সা বরবাদ যায় বল ত? তুমি বাপু এর একটা বিহিত কর। চুপ করে দিন-রাত বসে না থেকে একটু নড়াচড়া কর। শরীরও ভাল থাকবে, মনও ভাল থাকবে, সংসারে কিছুটা সুসারও হবে। না হয় বল ত আমিই বাজারে যাই। আমার ত হাড়ির হাল হচ্ছেই, ওটুকুও আর বাকি থাকে কেন?

মহেন্দ্রবাবু লেখার কথাই ভাবতে লগেলেন। মনে হচ্ছে একবার কলম আর খাতা নিয়ে বসতে পারলে আর রক্ষা নাই। গিন্নী আর ঝিয়ের কথামৃত দিয়ে লিখতে ত পারেনই। তা ছাড়া অনেক কিছুই তাঁর মনে ভাসছে। গল্প লেখার উপাদানের আজকাল অভাব আছে না কি? তিনি প্রায় বিশ বছর কোনও গল্প-উপন্যাসের বই হাত দিয়ে ছোন নি। কয়েক দিন হ'ল কিছু কিছু পড়া আরম্ভ করেছেন। পড়েন আর অবাক্ হন। গল্প লেখা যে আজকাল অত সহজ, যে-সে বিষয় নিয়েই যে গল্প লেখা যায় এমন অভিজ্ঞতা তাঁর আগে ছিল না। এককালে তিনিও লিখেছেন বটে। কিন্তু তখনকার দিন লিখতে গিয়ে কম কসরত করতে হয়েছে নাকি তাঁর। আর এখনকার লেখকেরা অনায়াসে লিখছেন—গল্প লেখার গল্প, গল্প না-লেখার গল্প। শূন্যের ওপর কারুকার্যময় প্রাসাদ গড়ে তুলছেন। না, তিনি একবার খাতা-কলম নিয়ে বসতে পারলেই আর কথা নেই। কলমের আঁচড়ে হু হু করে খাতার পাতা ভরে উঠবে।

অনেক দিন পর তাঁর মন একেবারে হালকা হয়ে গেল। তিনি দেখিয়ে দেবেন গিন্নীকে তাঁর কদর। তিনি সাঁতার দেওয়া ভোলেন নি, সাইকেলে চড়াও ভোলেন নি, লিখতেও তিনি ভোলেন নি। প্রমাণ করবেন—বয়সে তিনি প্রবীণ হয়েছেন বটে কিন্তু লেখক হিসাবে অতি আধুনিক।

ঝিয়ের কথামৃত দিয়ে তিনি লিখতে পারেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে তাঁর ঘরের কথাই ফাঁস হবে। ও না হয় এখন থাক। এখন লিখবেন প্রতিবেশীদের নিয়ে, যাঁরা তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে আছেন। লিখবেন—ডাঃ চৌধুরী সাহেবের কথা, যাঁর পাচটি ছেলের পাঁচখানি মোটর। অথচ এ নিয়ে তাঁর অহঙ্কার নাই। সর্বদাই মুখে এঁটে রেখেছেন মোনালিসার হাসি। লিখবেন সেন সাহেবকে নিয়ে, যিনি সেকালের বিলেত-ফেরত হয়েও খালি গায়ে নাতিকে পারামবুলেটারে চড়িয়ে টেনে বেড়াচ্ছেন সদর রাস্তা ধরে—মুখে যাঁর সাধকের হাসি। লিখবেন—গাঙ্গুলী সাহেবকে নিয়ে, যাঁর মুখ দিয়ে কোটেশনের পর কোটেশন বেরিয়ে আসছে—ইংরেজী, সংস্কৃত, বাংলা, ফারসী। অগাধ পাণ্ডিত্য কিন্তু সহজে বুঝবার উপায় নাই—মুখে যাঁর লেগে আছে বুদ্ধিমন্তর হাসি।

মহীতোষ ঠিক আইডিয়াই দিয়েছে। সত্যিই সে অকৃত্রিম বন্ধু তাঁর।

সুনয়নীর কথার খোঁচা তিনি অবশ্য স্মরণ করলেন। কাগজ-কলমের পয়সা জুটবে কোথা থেকে? হ্যা, লিখতে হ'লে কাগজ, কলম, কালি চাই বৈকি। শুধু মনের ভাবনা দিয়ে ত আর লেখা চলে না, ওসব উপকরণও দরকার। কলম—একটা ঝরণা কলম তাঁর এখনও আছে। বেশ দামী কলমই সেটা। এখনও বেশ লেখা চলে। কিছু কাগজের দরকার। কাগজের মধ্যে সম্বল একটি রাইটিং প্যাড। মাঝে মাঝে চিঠি লেখার জন্য দরকার হয়। তা তিনি কি এই কয় মাসেই এমন নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন যে, দিস্তাখানেক কাগজও কিনতে পারেন না? কিন্তু অকাজে ব্যয় করতে সুনয়নীর মহা আপত্তি। আর কিনতে হ'লে তাঁর কাছেই হাত পাততে হবে। পয়সা যে না দেবে তা নয়, কিন্তু পেন্সনহীন বেকার স্বামীকে বুঝিয়ে দেবে পয়সার মর্ম।

হঠাৎ মনে মনেই বলে উঠলেন—ইউরেকা। তিনি একটা মহা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তাঁর ত লেখার কাগজের অভাব হওয়ার কথা নয়। বিশ-পঁচিশ বছর আগে যখন তিনি লিখতেন, হরেক রকমের খাতা দপ্তরী ডেকে বাঁধিয়ে নেওয়া তাঁর একটা সখের ব্যাপার ছিল। সে-সব খাতার পাতা ত বেশীর ভাগই সাদা। একটা খাতার কয়েক পৃষ্ঠা লিখে আবার ধরেছেন নতুন খাতা। সে খাতা শেষ না হ'তেই আর একখানি। খুঁজে দেখলে হয়ত সাদা খাতাও দুই-একখানি পাওয়া যেতে পারে। খাত কিনেছিলেন বটে, কিন্তু লেখার খেয়াল তখন ছেড়ে গেছে।

মহেন্দ্রবাবুর মনে হ'ল খাতাগুলো তিনি নষ্ট করেননি, সযত্নেই রেখেছিলেন। বাড়ীতে স্থায়ীভাবে এসে বসার সময় কতকগুলো বইয়ের সঙ্গে সে খাতাগুলোও এসেছিল মনে হচ্ছে। তবে আর তাঁকে পায় কে? স্ত্রীর কাছে আর কয়েকটি পয়সার জন্য হাত কচলাতে হচ্ছে না। কাগজ হ'ল, কলমও আছে, কালিরও একটা শিশি দেখে-

ছেন আলমারির মাথায়। এখন আর লেখার ভাবনা রইল কোথায়?

একেবারে মনস্থির করে বসলেন মহেন্দ্রবাবু। আলমারি খুলে বের করলেন বাঁধানো খাতা। এতদিন পর লিখলেও চুপ্‌সে যাবে না অক্ষরগুলো। কলমেও নতুন করে কালি ভরে নিলেন। নিরিবিলি ঘরেরও অভাব নাই। ছেলেরা থাকে তাদের কার্যস্থলে সপরিবারে। নাতি-নাতনীরা কাছে নাই যে, হৈ-হল্লা করে তাঁর লেখার ব্যাঘাত ঘটাবে। তাঁর বাড়ীতে নিঝুম নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

স্ত্রীকে বললেন, রাত্রিতে আজ আর কিছু খাব না।

—কেন, না-খাওয়ার আবার কি ব্যাপার হ'ল? শরীর খারাপ হ'ল না কি? কই, দেখি। সুনয়নী স্বামীর কপালে হাত দিলেন। গা ত ঠাণ্ডাই আছে।

মহেন্দ্রবাবু একটু মুচকি হেসে বললেন, শরীর ভালই আছে। আজ একটু রাত জাগতে হবে কি না। তাই পেটটা খালি রাখতে হবে।

বেকার স্বামীর সঙ্গে যত বচসাই করুন না কেন, তাঁর খাওয়ার দিকে সুনয়নীর এখনও সমান তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। একটুও এদিক-ওদিক হবার জো নাই। সেই আগের মতই স্বামীসেবা চলেছে। বললেন—রাত-উপোস ভাল নয়। তা রাতই বা জাগতে হবে কেন হঠাৎ।

মহেন্দ্রবাবু হেসে বললেন—রাতের অবশ্য অনেকটাই জেগে থাকতে হয় আমাকে। বেকার লোকের ঘুম আসবে কোথা থেকে, বল? তবে আজ অন্য ব্যাপার।

সুনয়নী হাসলেন। অনেকদিন পর সেই আগেকার মত হাসি। বললেন—বুঝেছি। কিন্তু লিখতে গেলে যে খেতে হয় না, এ তথ্য আমার জানা নেই। বেশী কিছু খেও না—একটুখানি দুধ, আর দুটো নতুন গুড়ের সন্দেশ। নতুন বাজারে উঠেছে। তোমার জন্য কিনেছি।

—বেশ, তাই হবে। কিন্তু রাত যদি বেশী হয় তুমি যেন আবার ডাকাডাকি ক'রো না শোওয়ার জন্য। রাত জেগে একটু লেখাপড়া করলে আমার কিছু হবে না, তুমি দেখ।

খাতা আর কলম নিয়ে মহেন্দ্রবাবু বসলেন অনেকদিন পর। শেষ যে কবে বসেছিলেন তাঁর মনেও নাই। মনটা বেশ খুসী খুসী মনে হচ্ছিল তাঁর। একটা লেখার মত লেখা লিখবেন। এখন লেখক হিসাবে কেউ তাঁকে চেনে না। এমন একটা গল্প লিখতে হবে যে একটাতেই কিস্তিমাৎ। অনেকদিন আগের পরিত্যক্ত আসনে তিনি আবার বসতে পারবেন।

কিন্তু, ভাবতে লাগলেন মহেন্দ্রবাবু, কি নিয়ে লেখাটা সুরু করবেন আর কোথায়ই বা শেষ করবেন। একটা নিটোল প্লটই কি মাথায় আসছে। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল মহেন্দ্রবাবুর। পরিবেশটা ঠিক লেখার মত নয় মনে হ'ল। চেয়ারের সিটটা কাঠের, বড্ড শক্ত, বসতে অসুবিধা হচ্ছে। একটা ডানলোপিলোর ছোট্ট কুশন কিনতে হবে। লাইটের পাওয়ারটাও খুব কম। একটা বেশী পাওয়ারের বাল্বও কেনা দরকার। তাঁর আগেকার দিনের কথা মনে পড়ল—যখন তিনি লিখতেন। তাঁর লেখার জায়গাটা বড় সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিলেন সুনয়নী। জানলার ধারে তিন-চারটে ছোট্ট ফুলের টব। প্রায় সব সময়েই একটা-না-একটায় ফুল ফুটে থাকত। কিন্তু এখন আর সুনয়নীর সে মন নাই। সে মন তিনিই নষ্ট করে দিয়েছেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। একবার চোখেমুখে জল দিয়ে এলেন। ঘরের মধ্যেই পায়চারি করা সুরু করলেন। তারপর চেয়ারে বসে মাথা ঝাঁকালেন, কিছুক্ষণ পা দোলালেন। না, কোন মুষ্টিযোগই কাজে এল না। খাতায় আঁচড় কাটার মত একটা লাইনও তাঁর মনে এল না।

কখন বিছানায় এসে শুয়েছিলেন, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তাঁর মনে নাই। পরদিন সকালে যখন উঠলেন, তখন অনেক বেলা হয়েছে। কোনও রকমে মুখহাত ধুয়ে মহেন্দ্রবাবু স্ত্রীর সামনে এলেন। হেসে বললেন—বাজারের থলিটা দেও ত।

সুনয়নী একবার স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। বোধহয় ব্যাপারটা টের পেলেন, একটু মুচকি হাসলেন, তারপর বাজারের থলি আর দু'টি টাকা স্বামীর হাতে তুলে দিলেন। মুখ টিপে হেসে বললেন—হিসেব কিন্তু কড়ায়-গণ্ডায় চাই।

মহেন্দ্রবাবুর মনটা অনেকদিন পর খোলসা হয়েছে। বললেন—কড়া-গণ্ডার যুগ চলে গিয়েছে। হিসেব দেব নয়া পয়সায়।

অমৃতসর থেকে জ্বালামুখী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পাঠানকোটে ট্রেন পৌছল রাত এগারোটায়।

মস্তবড় লম্বা প্ল্যাটফরম। এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়োয় যেতে দু' ফার্লঙের মত মনে হয়। অন্তত কাংড়া ভ্যালির ছোট গাড়ি যে প্রান্তে রয়েছে, তার নাগাল ধরতে অতটাই হাঁটতে হ'ল। আবার মাঝ রাত্রিতে মজুরটি পারিশ্রমিক চাইল, তার অঙ্কটাও দিব্য স্ফীত। চাইবে না কেন—ওরা ত জানে আইনমত যে লেখাটা ওদের নীল কুর্তার গায়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে, সেটা মাঝ রাতের দূরতম প্রান্তিক প্ল্যাটফরমে পৌছে দেওয়ার জন্য নয়, সেটা অদৃশ্য কালির লেখা, প্রয়োজনের তাগিদে কুর্তার গায়ে আশ্চর্য্যভাবে আত্মগোপন করে। কর্তৃপক্ষ হয়ত এই বৃত্তান্ত জানেন। আইন প্রয়োগের দায়িত্বটা ওঁরা যাত্রীদের ওপর দিয়েই নিশ্চিন্ত। আর একরাশ মোটঘাট নিয়ে ক্লান্ত বিপর্য্যস্ত আসন-সংগ্রহের উদ্বেগে আকুল যাত্রী কোন্ ভরসায় বা আইনের ধারাটিকে বলবৎ করবে। সময়, শারীরিক সামর্থ্য, বাচনিক তেজ, মানসিক প্রস্তুতি কিছুই ত কার্য্যক্ষেত্রের অনুকূল নয়। অবশ্য যারা মজুরের দাবিকে অগ্রাহ্য করার শক্তি রাখেন, তাঁদেরও দেখলাম। স্ত্রী-পুরুষ আণ্ডাবাচ্চা মিলে হাতে কাঁকে মাথায় কাঁধে বাক্স প্যাটরা পোঁটলা পুঁটুলি ঝুলিয়ে দিব্যি স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলেছেন।

কাংড়া উপত্যকার গাড়িটা ছোট মাপের লাইনের মতই, যেন খেলনা-গাড়ি। ছোট ছোট বগি, সংখ্যাতেও কম। নেহাৎ লাইনটা পাতা রয়েছে বলেই চক্ষুলজ্জা এড়ানোর জন্য একটা ব্যবস্থা। তার আবার যেমন কামরা, তেমনি বেঞ্চি। খাড়া হয়ে দাঁড়ালে সাড়ে ছ' ফুট উঁচু মানুষটার মাথা ঠুকে যাবে গাড়ির ছাদে, বেঞ্চিতে বসলে নিতম্বের অৰ্দ্ধভাগ মাত্র সংস্থাপিত হবে কাষ্ঠাসনে—ইঞ্চি তেরো-চৌদ্দ মাত্র চওড়া সে আসন। পাশাপাশি দু'জন ছাড়া তিন জনের স্থান সঙ্কুলান হবে না—আবার সামনা-সামনি বসলে হাঁটুতে হাঁটু না মিলিয়ে উপায় নাই। মোট কথা অন্তরঙ্গতার নির্ভেজাল উদাহরণ হয়ে না চাপলে—এই গাড়িতে প্রতিটি মুহূর্ত্তে সংঘর্ষ অনিবার্য্য।

কিন্তু এসব বৃত্তান্ত পরে জানলাম, গাড়ির মধ্যে ঢুকে, আপাতত দেখছি প্রতিটি কামরার দরজা বন্ধ। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে যাত্রীরা নিদ্রাসুখে মগ্ন। সে নিদ্রা এমন গাঢ় যে, ধাক্কা মেরেও গাড়ির দরজা খোলানো গেল না। বেশ বোঝা গেল ভদ্রভাবে দরজায় ধাক্কা মেরে এই নিদ্রা ভাঙ্গানো যাবে না। অতএব জানালার কপাট ফেলে দিয়ে (রাষ্ট্রভাষায় পিড়কি পথে) নিদ্রিতদের কানের কাছে বিকট আওয়াজ তুললে মজুর। ফল হ'ল—কেওয়ার খুলল। কামরার দু'খানা বেঞ্চি দখল করে শুয়েছিল দু'জন ফৌজী সিপাই। আর একখানা বেঞ্চি ছিল একেবারে খালি। সেটা দখল করলাম আমরা। তাতে অবশ্য দু'জনেরই বসবার জায়গা হ'ল—আর একজন বিছানার বাণ্ডিলের উপর জায়গা করে নিলে। এমনি সঙ্কীর্ণ সেই বেঞ্চি যে, সুস্থির হয়ে বসবার উপায় ছিল না, অথচ ঐ দু'জন ফৌজী সিপাই, কি অনায়াসে দেহটাকে দু' ভাঁজ করে মুড়ে নিয়ে নিদ্রা দিচ্ছিল। নানা কৃচ্ছ্রসাধনায় অভ্যস্ত বলেই ওদের সাড়ে পাচ ফুট দেহটাকে তিন ফুট বেঞ্চিতে কুলিয়ে নিতে পেরেছিল। আমরা হলে দেহটাকে কোমর বরাবর দু'ভাঁজ করে মুড়ে নিতে পারতাম কি! ধন্য ওদের সাধনা! ঘণ্টার পর ঘন্টা ধরে ঐ ভাবেই পাশ না ফিরে (পাশ ফিরবার উপায় ছিল না) চোখ বুজে পড়ে রইল। বইয়ে পড়েছি, নেপোলিয়ন অশ্বপৃষ্ঠে ঘুমিয়ে নিতেন। সেটা যে নেহাৎ গালগল্প নয়, এই মুহূর্ত্তে তা বুঝতে পারলাম।

বসেই রইলাম। চেয়ে রইলাম বাইরের দিকে। সন্ধ্যাবেলায় শিলাবৃষ্টি হওয়াতে আবহাওয়া ছিল ঠাণ্ডা—কিন্তু বাইরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কাংড়া উপত্যকায় তামসী মূর্ত্তির কোন রূপ ছিল না। আকাশে মেঘ ছিল বলে অন্ধকার এত গাঢ়। ঘট্ ঘট্ করে গাড়ি চলছিল, দোলা দিচ্ছিল, মাঝে মাঝে এক একটা জায়গায় থামছিল। জায়গাগুলো মনে হচ্ছিল ষ্টেশনই। অন্ধকারে ছায়া ছায়া

মূর্তিগুলো এধার-ওধার নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছিল। সামান্য কণ্ঠস্বর কানে আসছিল। একটাও আলো জ্বলছিল না—শুধু গার্ডের হাতের আঁধারে লণ্ঠন থেকে একটা আলোর রেখা চকচকে ছুরির ফলার মত অন্ধকারকে চিরে চিরে দিচ্ছিল। গার্ডের বাঁশির তীব্র শব্দ মাঝে মাঝে অন্ধকারকে শাসন করছিল আর ইঞ্জিনটা ভাঙা গলায় তার সঙ্গে তাল দিচ্ছিল।

একঘেয়ে অন্ধকার দেখতে দেখতে একটু ঢুল এসেছিল, অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড গর্জনে তন্দ্রা টুটে গেল। চেয়ে দেখি ট্রেন থেমে আছে—কয়েকটি ছায়ামূর্তি চলাফেরা করছে এবং আঁধারে আলো তাদের গায়ের ওপর এক একবার বুলিয়ে গার্ড সায়েব বাজখাঁই গলায় চীৎকার করছেন। লোকগুলিও চেঁচাচ্ছে। তারা সংখ্যায় বেশী হয়েও চীৎকারের ঐকতানে গার্ডের কণ্ঠস্বরকে পর্যুদস্ত করতে পারছে না। বক্তব্য দু' পক্ষেরই অস্পষ্ট কিন্তু বিষয়বস্তুটি অত্যন্ত স্বচ্ছ। এখানে এই রাত্রির মধ্যযামে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের সুযোগ নিতে চাইছিল যাত্রীগুলি, আর গার্ড সায়েবও আর এক অন্ধকারের পটভূমিকায় তাঁর দাবিটাকে প্রবল করে তুলতে চাইছিলেন। দুনিয়ার অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে কারবার আজ সংক্রামক ব্যাধির মত পরিপুষ্ট—এই দুপুর রাত্রিতে তারই চেহারাটা অতিশয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। আঁধারে আলোটা দাপাদাপি করছিল সারা প্ল্যাটফরমে, কখনও বা গেটের কাছে; একই সঙ্গে দু'পক্ষ নিজ নিজ বক্তব্য বলে যাচ্ছিল বীর রুদ্র আর করুণ রস মিশিয়ে, আর নিশ্চল গাড়িটাও পরমসহিষ্ণু শ্রোতার মত এই কৌতুক অভিনয় উপভোগ করছিল। আমাদের মত কিছু বীতনিদ্র যাত্রীও ছিল দর্শক। পয়সা দিয়ে টিকিট কেটেছিলাম সত্য, কিন্তু মূল নাটকের সঙ্গে এমন একটি উপভোগ্য ফাউ কল্পনা করতে পারি নি।

সময়টা বড় কম নয়—আধ ঘণ্টা ধরে চলল এমনি আলোর নর্তন ও দু'পক্ষের সংলাপ-সঙ্কীর্তন। সময়ানুবর্তিতার কথা ভুলে গেল সবাই। দুষ্কৃত দলনের আবেগে উন্মত্ত হয়ে কিংবা দুর্নীতি পোষণের জিদের বশবর্তী হয়েই এটা ভুলল। অবশেষে দু'পক্ষ শ্রান্তক্লান্ত হ'লে নাটকের যবনিকা পড়ল। গাড়ি আবার চলতে লাগল।

এরই জের টেনে ঘণ্টাখানিক দেরিতে গাড়ি পৌঁছল জ্বালামুখী রোড স্টেশনে।

তার আগেই রাত্রির তিমির যবনিকা অপসৃত হয়েছিল। সকালে দেখলাম উপত্যকার রূপ। বর্ষণ-ধৌত স্নিগ্ধ শ্যামল তনু তার—বিস্তীর্ণ-তরঙ্গায়িত। সমতল ভূমি থেকে বেশ খানিকটা উঁচু—তবু সমতলের সৌন্দর্যে বঞ্চিত নয়। বাঁশ-বন আছে, আমগাছ, জামগাছ আছে, আছে দু'পাশে ক্ষেত-খামার, জলে থই থই নালা জোল ডোবা। জমিতে সামান্য জল জমেছে, মাটি নরম হয়েছে, হাল-বলদ নিয়ে চাষারা নেমেছে মাঠে; জ্যৈষ্ঠের শেষে দু'এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলে পল্লী-বাংলারও এই রূপ। নিদারুণ গ্রীষ্মের পর বর্ষার জলধারা পেয়ে মানুষ এবং ভূমি-প্রকৃতি দুইই নবজীবনের রসোল্লাসে মেতে ওঠে।

আরও এগিয়ে দৃশ্য গেল বদলে। ভূমি পাথরে কঠিন হয়ে উঠল। দু'পাশে পাহাড় দেখা দিল—একটা পাঁচশ' ফিটের মত খাদ বা-ধারে এগিয়ে এল। তার কোলে একটি ক্ষীণ-স্রোতা নদী। এখন উপল-আকীর্ণ প্রস্তর-পঙ্করাশিতে সুপ্রকট দেহবল্লরী অতি ক্ষীণ বেগধারায় তার প্রাণ-প্রবাহটি ধুক ধুক করছে। একটি সেতু পড়ল সামনে। এক পাহাড়-থেকে আর এক পাহাড়ে যাবার সংযোগ পথ। সেতু না সেতু! কয়েক-খানা লোহার পাতের উপর দুটো লাইন পাতা। গাড়িটা তার উপর দিয়ে খুব আস্তে আস্তে চলতে লাগল। আমরা যেন নাগরদোলায় চেপে শিউরে উঠলাম। দড়িটা যদি ছিঁড়ে যায়—যে ভাবনা প্রবল হয়ে উঠত ছেলেবেলায়, সেই ভাবনাই এখন পেয়ে বসল—গাড়িটা যদি উল্টে পড়ে লাইন থেকে। একই সঙ্গে দারুণ ভয় করছে—আবার ভালও লাগছে। আনন্দ এই দুই ভাবতরঙ্গে নিজের পাওনাটাকে সফল করে নিচ্ছে—পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠছে। বিপদের ছায়া পড়ে না যে সঞ্চয়ে, সে ত জঞ্জালেরই সামিল।

যাক, সেতুটাও পেরিয়ে এল গাড়ি। আবার তার গতি-বেগ বাড়ল। যত না গতিবেগ, শব্দ তার চেয়েও বেশী। অসমতল উঁচুনীচু পথে বাঁকে বাঁকে এঁকে-বেঁকে যাওয়াটা পরিশ্রমসাধ্য ত বটেই। পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত শব্দের রেশটাও দীর্ঘস্থায়ী। গাড়ি যে এক ঘণ্টা দেরিতে আসছে—সে কথা আর মনেই রইল না। লাবণ্যময়ী প্রকৃতি আমাদের মন থেকে হিসাবের কালো ছাপটুকু

অনায়াসে মুছে ফেলে দিল। জ্বালামুখী রোড স্টেশন এল অবশেষে।

জায়গাটা মোটেই সমতল নয়, তিনটি থাকে সাজানো স্টেশন। প্রথম থাকে প্ল্যাটফরম, দ্বিতীয় থাকে বুকিং আপিসসমেত শ্লেটপাথর-ছাওয়া খানিকটা আচ্ছাদন, ভদ্রভাষায় ওয়েটিং হল—তার পরের থাকে কর্ম্মচারীদের বাসগৃহ প্রভৃতি। এই সব পেরিয়ে আরও খানিকটা উপরে উঠলে বাস স্ট্যাণ্ড। ওটা পাহাড়ের খাঁজ-কাটা কোলে বড় সড়কের লাগাও—তিন-চারখানা বাস পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে এমন একটি জায়গা। এই পথটি সোজা এসেছে পাঠানকোট থেকে—শেষ হয়েছে কাংড়া উপত্যকা পেরিয়ে কুলুর শেষপ্রান্ত মানালীতে। ছ'শ মাইলের মত একটানা পথ। এই পথের উপরেও আরও তিন-চারটি থাকে তিন চারখানা চায়ের দোকান, দোকানীদের বাসগৃহ, একটা মশলা মুদির দোকান ইত্যাদি রয়েছে। চায়ের দোকান মানেই হোটেলও। এখানে চা বিস্কুট কেক এবং কিছু তেল বা দালদা ভাজা খাবার মেলে। ভাত ডাল রুটি তরকারির ব্যবস্থাও আছে।

অমৃতসরে শিলাবৃষ্টির জেরটা এদিকে লেগে রয়েছে। মাত্রাটা বেশীই হয়েছিল মনে হচ্ছে। এখনও পথেঘাটে জল জমে রয়েছে এবং সকালে গায়ে চাদর জড়িয়েও শীত ভাঙ্গছে না, রোদটা ভারি মিষ্টি লাগছে। আমরা বেঞ্চিতে বসে চা খেয়ে নিলাম।

ঘণ্টাখানিক অপেক্ষা করার পর বাস এসে গেল দু'-তিনখানা। কোনটা কাংড়া হয়ে যাবে ধরমপুর—কোন্‌টা বা জ্বালামুখী। বৈজনাথের দিকেরও রয়েছে একখানা—ওটা আসছে পাঠানকোট থেকে।

আমরা জ্বালামুখী মন্দিরের বাসে উঠলাম। ওটা মন্দির স্টেশন হয়ে যাবে হামিরপুর। বাসটা অবশ্য ঠিক সময়ে ছাড়ল না—বেশ খানিকটা দেরি করলে। তা হোক, আমাদের ত আর ট্রেণ ধরতে হবে না।

এবার একটা নূতন পথে বাঁক নিল বাস। মনে হ'ল একটা গিরিবর্ত্ম পার হয়ে চলেছি। বেশ খানিকটা এমনি এসে পড়ল খোলামেলা জায়গায়। এবার পাহাড় সরে গেল বহুদূরে, প্রায় মিলিয়ে গেল। একটি সুবিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তর প্রসারিত হ'ল সামনে। প্রান্তরটা উঁচুনীচু ঢেউ খেলানো। চলতে চলতে বাঁ-ধারে পাহাড়ের পাঁচীলটা আবার দেখা গেল—তার কোলে দু'চার মাইল মাঠের বেধ। ডান ধারের মাঠ অফুরন্ত। গ্রীষ্মকাল বলে মাঠে শস্য ছিল না। কিন্তু বৃষ্টির জল জমেছে মাঠে, আর হাল-বলদ নিয়ে চাষারাও নেমেছে দলে দলে। দু'দিকের মাঠে ভূমি প্রসাধনের মহোৎসব লেগে গেছে। লাঙলের ফলায় মাটির গায়ে আঁচড় পড়ছে—আর মাটি-কন্যা চুল আঁচড়ে মুখ দেখছে আকাশের আয়নাতে। প্রসন্ন সূর্য্যের আলো লেগে ঝক্ ঝক্ করছে আয়নাটা। পথের দু'ধারে অনেক গাছ—আম জাম, পাইনও কিছু কিছু। ফল কোন গাছে নাই, তবু ঘন পাতার সবুজ স্বাস্থ্যে প্রকৃতি শ্রীময়ী। চমৎকার লাগছে বাসের ভেলায় চেপে এই সবুজ নদীতে ভেসে যেতে।

এমন খুশি-খুশি ভাবটা বেশিক্ষণ রইল না। একটা চড়াই পথে উঠতে উঠতে বিশ্রীভাবে শব্দ করে থেমে গেল বাসটা। চালক নেমে গিয়ে কি সব কলকব্জা নাড়াচাড়া করে বাস চালু করলেন, কিন্তু অদৃষ্ট আমাদের সুপ্রসন্ন ছিল না—খানিকটা এসে আবার থেমে গেল বাস। এবার চড়াই পথে নয়, সমতলেই ঘটল অঘটন। কি ব্যাপার?

আবার নামলেন চালক। কিছুক্ষণ ধরে যন্ত্রপাতি এটা-ওটা নাড়লেন, কিছুই হ'ল না। তার পর এঞ্জিনের ঢাকনা তুলে তেলের ট্যাঙ্ক দেখে ওঁর চোখ কপালে উঠল। রসদ ফুরিয়েছে। এক ফোঁটা তেল নেই—বাস চলবে কি করে! তাড়াতাড়ি পেট্রলের টিনটা এনে উপুর করলেন ট্যাঙ্কের মুখে। হা হতোস্মি! যেটুকু তেল তা থেকে পড়ল—তা তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম! চালক তেলের টিনটা মাটিতে ফেলে দিয়ে দু'হাত নাড়তে লাগলেন। এ যেন ছোট বাচ্ছাদের হাত ঘুরিয়ে বলা হ'ল—নাড়ু ফুরিয়েছে, কি করব বল!…

করবার কিছুই ছিল না। বিজন মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি—আশেপাশে গ্রামের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, লোকজন চলাফেরা করছে না। দু'একখানা লরি ও বাস আসাযাওয়া করছে অনেকক্ষণ অন্তর। তাদেরও করবার কিছু ছিল না। দূর-দুরান্তরের গাড়ি সবাইকার—কে আর তেল ধার দেবে।

বাংলা দেশ হ'লে ব্যাপারটা কতদূর গড়াত অনুমান

করা সহজ। এখানে পরমসহিষ্ণু যাত্রীরা মুখটি বুজে রইল। চালক কেন যাত্রার পূর্ব্বে তেলের হিসাব নেয়নি এ নিয়ে রীতিমত উত্তেজনা বৃদ্ধি হ'ত—এবং তার ফলে কি কি না ঘটতে পারত! এসব কিছুই হ'ল না, তেলের টিনটা তুলে নিয়ে চালক হাঁটতে সুরু করলেন।

জিজ্ঞাসায় জানা গেল, পেট্রল আনতে উনি নিকটবর্ত্তী পেট্রল স্টেশনে রওয়ানা হলেন।

পেট্রল স্টেশন! সে কতদূর? উদ্বেগ ভরে শুধোলাম।

করীব ছে সাত মীল! উদ্বেগ-লেশহীন কণ্ঠে উত্তর এল।

সর্ব্বনাশ! এখান থেকে পায়ে হেঁটে ছ'-সাত মাইল গিয়ে পেট্রল আনবে! তদুপরি সমাচার—ওর ও নাকি হার্টের বেমারিও আছে! চলতে চলতে ওর যদি বাসের অবস্থা হয়, তা হলে ধূ ধূ মাঠের মাঝখানে আমাদের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে?

সেই দৃশ্য ভাবতে ইচ্ছে হ'ল না। তার চেয়ে গাড়ি থেকে নেমে সবাই যেমন পথের ধারে বসে গল্পগাছা করছে—তেমনি ভাবে সময়টা কাটিয়ে যেওয়া যাক।

একটা মাথা-ঝাকড়া জামগাছের ছায়ায় এসে বসলাম। তখনও গত রাত্রির ঝড়-বাদলের ঠাণ্ডা আমেজ ছিল হাওয়ায়। ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়া সারা অঙ্গে সুড়সুড়ি লাগাচ্ছে। একটা ঘুঘু ডাকছিল জামগাছের ঘন ছায়ায় বসে। কি মিষ্টি উদাস সুর! একদিকে সীমাহীন মাঠ, আর একদিকে মাইলখানিক উঁচুনীচু জমির 'পরে পাহাড় উঠেছে ঠেলে। পথটা পিছনের দিকে ঢালু হয়ে পাক খেতে খেতে নেমে গেছে। চালক এবারে হিসাব করে বাসের পিছনের চাকার তলায় দু'খানা বড় বড় পাথর ঠেক্‌নো দিয়ে গেছে—না হ'লে চাকা যদি কোনমতে একবার গড়াতে সুরু করে ত হড়হড় করে নেমে যাবে এক মাইল দু'মাইল যতক্ষণ না চড়াই আসে। বাঁকের মুখে এসে পাশের নালায় কাত হয়ে পড়াটাও স্বাভাবিক।

প্রথমটা ঘড়ি দেখেছিলাম, পরে সময়ের হিসাব রাখি নি ইচ্ছা করে। বার বার মনে আনবার চেষ্টা করছিলাম—এই বা মন্দ কি! জায়গাটা ত নতুনই—এখানে আর কোনদিনই আসব না—পিছনে কোন কাজেরও তাগিদ নাই, বসে বসে উপভোগ করি না এমন দৃশ্য-সৌন্দর্য্য! কিন্তু বেয়াড়া মন কিছুতেই কি বাগ মানছে! পথের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছি, অনেকক্ষণ বাদে একটা গাড়ি আসতে দেখে আশা জাগছে, ওই বুঝি এল কাণ্ডারী। গাড়িটা হুস্ করে বেরিয়ে যেতেই বেশী করে মুষড়ে পড়ছি।

ক্রমে রোদ চড়ল, ঘুঘুর গান থামল—হাওয়ায় স্নিগ্ধ স্পর্শ ঈষৎ তপ্ত হয়ে উঠল। বাসের মধ্যে দু'-তিনটি কচি ছেলেমেয়ে ছিল, তারা কান্না সুরু করল, মায়েরা তাদের বৃথা আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা না করে উদাস মাঠের পানে চেয়ে রইল। ক্ষণপূর্ব্বের মোহময়ী প্রকৃতি জ্বালাময়ী নিঃশ্বাসে আমাদের খুশির রংটুকু নির্ম্মমভাবেই মুছে দিতে লাগল।

ইতিমধ্যে শক্তসমর্থ-গোছের দু'তিন জন পায়ে হাঁটতে সুরু করেছে। আমাদের সঙ্গে মালপত্র যা রয়েছে—সেই ত অকূল সমুদ্রে ভাসমান ব্যক্তির গলায় শিলাবৎ। আমরা চিন্তায় চঞ্চল হয়ে ওঠা ছাড়া আর কিছুই ত করতে পারছি না—পারবও না। আর সেই কারণে সমস্ত দেহমন রীতিমত পীড়িত হয়ে উঠছে।

একটি অনড় রোগী রয়েছে আমাদের বাসে—কয়েক মাইল দূরের একটা হাসপাতালে যাচ্ছে চিকিৎসার্থে। আরও রয়েছে কয়েকজন কর্ম্মী, যাদের কর্ম্মক্ষেত্রে সময়মত হাজিরা দেওয়া প্রয়োজন। দুধ নিয়ে চলেছে কয়েকজন দুগ্ধ-ব্যবসায়ী—ওদেরও সময়ের মূল্য আছে। আশ্চর্য্য, এই মুহূর্ত্তে ওদের কথাও ভাবতে পারছি না। এক একটা মিনিট আর এগুতে চায় না—প্রতীক্ষা দুঃসহ হয়ে উঠছে।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হ'ল—একখানা মালভর্ত্তি লরি এসে থামল অদূরে। পেট্রল টিন হাতে আমাদের চালক নামলেন বিজয়ী বীরের মত। আমাদের মনেতেও বিজয় উল্লাসের ঢেউ এসে লাগল, মুক্তির স্বাদ অনুভব করলাম।

পেটভর্ত্তি খাদ্য নিয়ে দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা পরে আমাদের বাস ছুটল নবোদ্যমে। দু'পাশের প্রকৃতি আবার মোহময়ী হয়ে উঠল। ঘণ্টাখানিকের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম জ্বালামুখী শহরে।

বাস ষ্ট্যাণ্ডের সামনে বেশ খানিকটা প্রশস্ত জায়গা—ছোটখাট একটা মাঠই। দু'ধারে দোকান-পসারে-

জমাট—মাঠের মুখোমুখি প্রকাণ্ড এক ধর্ম্মশালা। সেই মাঠের কোল থেকে উঠেছে পাহাড়—এমন কিছু উঁচু নয়, লম্বাতে যদিও আদিঅন্তহীন। পাহাড়ের নাম কালীধর। মাঠ থেকে একটা চওড়া পথ উঠেছে পাহাড়ের গায়ে—একেবারে মন্দিরে গিয়ে শেষ হয়েছে। পথের দু'ধারে শহর জ্বালামুখীর ঘরবাড়ী দোকানপাট—শোভা ঐশ্বর্য্য; দোকানে আধুনিক জীবন-যাপনোপযোগী যাবতীয় উপকরণ, পথে বিদ্যুৎ আলো, জলের কল···

এসব দেখেছিলাম অপরাহ্ণ বেলায়—দেবী-দর্শনে যাবার সময়। আপাতত বাস থেকে নামতেই একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক আমাদের সামনে এসে বলল, আপনারা জওলা-মাকে দর্শন করবেন ত?

ওর বেশবাস ও প্রশ্নের ধরন থেকে বুঝলাম, ইনি পাণ্ডা পুরোহিত কেউ হবেন—যাত্রী পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে এসেছেন।

নীরস কণ্ঠে বললাম তা ছাড়া কি।

ও তাড়াতাড়ি বলল, আমার নাম রমেশ পাণ্ডা—আমরা মন্দিরের পূজারী।

বললাম, পাণ্ডার বাড়ী আমরা যাব না, ধর্ম্মশালায় থাকব।

আমার বিরক্তি গায়ে না মেখে ও বলল, আর একটা ধর্ম্মশালা আছে উপরে—সেখানে থাকলে মন্দির কাছে হবে।

হোক, আমরা এইখানেই থাকব। বলে পিছন ফিরলাম।

ছোকরা বেগতিক দেখে রণে ভঙ্গ দিল।

জানি পাণ্ডা-মাত্রই ফিকিরবাজ নয়—যাত্রীকে দোহন করার অভিপ্রায়ে ঘনিষ্ঠতা করে না। বিদেশ-বিভুঁয়ে ওরা যাত্রীদের ভরসাস্থল। গাইডও। ওরা পৌরাণিক কাহিনীর ধারক—ইতিহাসের-সূত্র সংযোজক! দেবতা বা দেব-মন্দির সম্বন্ধে ওরা যা বলে—তার অলৌকিকত্ব ও উচ্ছ্বাস অলঙ্কার বাদ দিয়ে নিলে সার জ্ঞাতব্য কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু যাত্রীর ভক্তিকে মূলধন করে জীবিকা-নির্ব্বাহের যে কৌশল অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়, তার প্রতি সাধারণের বিরাগ স্বাভাবিক। সৎ পাণ্ডাও অবশ্য বিরল নয়—তাদের কিছু কিছু পরিচয় কোন কোন স্থলে পেয়েওছি। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পাণ্ডার উপর শ্রদ্ধাভক্তি বজায় রাখা সম্ভব হয় নি। সেই সংস্কারবশতঃ আমরা রমেশ পাণ্ডাকে আমল দিলাম না। স্থির করলাম—পাণ্ডার সাহায্য নেব না। এই ত সামনেই পাহাড়—ফার্লং কয়েক উঠলেই দেবী-মন্দির; নিজেরা খুশিমত উঠব, এধার-ওধার ঘুরব—দর্শন করব, পূজা দেব। পাণ্ডার নির্দ্দেশে প্রতিটি শিলায় মাথা ঠুকে ঠুকে নির্ব্বোধ বনে কি লাভ!

কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে আমরা ধর্ম্মশালায় এলাম। চমৎকার ধর্ম্মশালা। সুপ্রশস্ত অঙ্গন—সুপরিচ্ছন্ন ঘরদোর; কল জল শৌচাগারের এমন সুব্যবস্থা কম জায়গাতেই পাওয়া যায়। উপর-নীচেয় অনেকগুলি ঘর—কোলে চওড়া বারান্দা—স্থান সঙ্কুলানের কথা মনে ওঠে না। আবার ধর্ম্মশালার দুয়ারের বাইরে পা দিলেই যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী হাতের নাগালেই সাজানো রয়েছে। পাহাড়ের গা থেকে আসল শহরের একটা অংশ ছিটকে এসে এই ধর্ম্মশালার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। চাল ডাল মশলাপাতি মনিহারী জিনিষের দোকান, আটার কল, আনাজের ষ্টল, চায়ের দোকান—খাবারের দোকান—আবার দু'-তিনটি নিরামিষ হোটেলও রয়েছে। পাই নি শুধু পানের দোকান—সেটা পাহাড়ের উপরে অবশ্য আছে।

কলে সর্ব্বক্ষণই প্রচুর জল থাকে। আমরা স্নানাহার সেরে বেশ খানিকটা বিশ্রাম করে নিলাম। অপরাহ্ণ বেলায় পাহাড়ের পথ ধরে দেবী-দর্শনে চললাম।

পথটা অল্পে অল্পে উপরে উঠেছে। পিচ-বাঁধানো খানিকটা—চওড়াও। যে-কোন অবস্থায় যাত্রী অনায়াসে ওঠানামা করতে পারে। খানিকটা উঠে দেখা গেল আর একটা নূতন পথ তৈরি হচ্ছে সরকারী তত্ত্বাবধানে। এটা তৈরি হয়ে গেলে মন্দিরে যাওয়ার পরিশ্রম ও সময় অনেক কমবে।

আমরা পুরণো পথ দিয়ে ঘুরে ঘুরে উঠছিলাম। দু'ধারে অসংখ্য দোকান—বাড়ীঘর, মানুষজন। একটা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছি, এটা কেবল ওপরে ওঠার পরিশ্রমে মনে হচ্ছিল। আর মাঝামাঝি এসে পথটাও এবড়ো-খেবড়ো পাথর-বিছানো বলে প্রতি পদক্ষেপে সাবধান না হয়ে উপায় ছিল না। বলাবাহুল্য শহরের এই অংশটা অত্যন্ত পুরণো, যে-কোন ঘিঞ্জিবসতি, প্রাচীন তীর্থপুরীর সমতুল্য। পথটা আগাগোড়াই অস্বস্তিকর, দম-আটকানো। পথের

শেষে একটি মুক্তিক্ষেত্র দেবীমন্দির না থাকলে এই পথ অতিক্রমের শ্রম সর্ব্বাংশেই ব্যর্থ। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পথটা শেষ করতে চাইলাম।

পথের শেষে একটি পুল। পাহাড়ের একটি অংশের সঙ্গে অপর অংশের সংযোজক পথ। পুল পার হয়ে নূতন একটি দৃশ্যের মধ্যে এসে গেলাম। সামনে সুউচ্চ মন্দির-তোরণ পিছনে একেবারে খাড়াই পাহাড়। একখানা বড়মত পাথর গড়িয়ে পড়লে এই জায়গাটার কি দশা ঘটবে কল্পনাতে আনা সহজ, কিন্তু সহজে সে কল্পনাকে মনে স্থান দেয় না ভক্তি-প্রাণ নরনারী। দেব-মহিমা স্বীকৃত বলে এমন কল্পনা সৃষ্টি-বহির্ভূত।

যাই হোক, মন্দির কিন্তু পুরাকালের কাহিনীকে আশ্রয় করেও নূতন কালের—বেশে সৌষ্ঠবে সযত্ন সজ্জিত। সুউচ্চ তোরণ, সুপ্রশস্ত অঙ্গন, মূল মন্দিরের কায়া এবং মন্দিরের সামনেকার অলিন্দ চত্বর, মায় শিশু বকুল তরুটি পর্য্যন্ত নূতন কালের জয় ঘোষণা করছে।

অঙ্গন প্রশস্ত, খোলামেলা, অবাধ আলো, বায়ুর দাক্ষিণ্যে ঝলমল করছে। বাঁ ধারে দেবীর পূজা-উপচারের তৈজসপত্র উপহার উপঢৌকন প্রভৃতি থাকার ঘর—সেবায়েতের গদি—খাজাঞ্চিখানা, ভোগরান্নার ঘর ডানধারে, মন্দির। মন্দিরের সামনে ছোটমত একটি নাটমন্দির, তার সামনে সিমেণ্ট, বাঁধানো উঁচু প্রশস্ত চাতাল আর দেবীর বাহন একটি ব্যাঘ্রমূর্ত্তি। চাতালের মাঝখানে, একটি সুকুমার শ্যামকান্তি শিশু বকুল তরু—তার তলাতে একটি ত্রিশূল পোতা, তারই এক পাশে এক প্রৌঢ়া ভৈরবী ধ্যানস্তিমিত নেত্রা। সব মিলিয়ে পরিবেশটি তীর্থ-মাহাত্ম্যের অনুকূল।

সেই ছোট নাটমন্দিরটুকু পার হয়ে এলেই মন্দিরের গর্ভগৃহ। মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই। দেওয়ালে দেওয়ালে আগুনের শিখা জ্বলছে। মাঝখানটায় কুণ্ডের মত বাঁধানো—গহ্বরের মধ্যে লক্ লক্ করছে অগ্নিশিখা। দিনে রাতে সব সময়েই জ্বলছে আগুন। যুগ-যুগান্তর ধরে জ্বলছে আগুন। এত তেল আর দাহ্যবস্তু সঞ্চিত রয়েছে ওর গর্ভে যার দৌলতে দিনে-রাতে যুগে যুগান্তরের শিখা রয়েছে অনির্বাণ!

যেখানে গহ্বরের কাটলে লক্ লক্ করে উঠছে আগুনের শিখা, সেখানের পাথর ধোঁয়ার দাগে কালো আর ঈষৎ উত্তপ্ত। কিন্তু হাত দুই উপরের মেঝেটা উত্তপ্ত নয়। এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার!

পাণ্ডারা বলেন—উপরটা উত্তপ্ত হবে কেন, এটা ত প্রাকৃত জনের হাতে জ্বালান-আগুন নয়—এ হ'ল জ্যোতিঃ-স্বরূপিণী মায়ের জিহ্বা। ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করার জন্য সব সময়েই প্রসারিত। এ আগুনের ধর্ম্ম নয় পীড়ন।

দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে ঠিক মাঝ বরাবর একটি শিখা জ্বলছিল। শিখাটি কাঁপছিল না, কম-বেশি হচ্ছিল না। স্থির নিষ্কম্প ধ্রুবজ্যোতির মত সুন্দর লাগছিল শিখাটিকে। এইটি নাকি মায়ের আসল মূর্ত্তি—জ্যোতি-উদ্ভাসিত কলেবর। সাধকরা ভ্রূমধ্যস্থিত যে স্থির জ্যোতি-বিন্দুতে দৃষ্টি সংলগ্ন করে অমৃত সাগরে ডুব দেন—এটি তারই প্রতীক। স্থির লক্ষ্যের সঙ্কেত-চিহ্ন।

তখন সন্ধ্যাকাল। প্রবেশ-তোরণে জয়ঢাক বাজছিল—ঘণ্টা বাজছিল—বাঁশি বাজছিল। গর্ভগৃহে পঞ্চপ্রদীপ সাজিয়ে মায়ের আরতি করছিলেন তরুণ পুরোহিত। আমরা নাটমন্দিরে বসে বসে আরতি দেখলাম।

পুরোহিতের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা—গলায় ও বাহু-মূলে রুদ্রাক্ষের মালা—এক হাতে আরতির উপচার (কখনও বস্ত্র, কখনও প্রদীপ, কখনও পুষ্প, কখনও বা চামর), অন্য হাতে নাদমুখর ঘণ্টা। পরণে রক্তাম্বর, গায়ে লাল মেরজাই, বুকের ওপরে আড়াআড়ি ভাবে বাঁধা রক্ত উত্তরীয়। সমস্ত শরীর ওর আরতির তালে তালে নাচছিল। কত ক্ষিপ্র অঙ্গক্ষেপে ও আরতি করে চলেছিল! পাশে দাঁড়িয়ে আরতির উপচারগুলি এগিয়ে দিচ্ছিল রমেশ পাণ্ডা—বাস ষ্ট্যাণ্ডে দেখা সেই তরুণ। তারও ক্ষিপ্রতা উল্লেখযোগ্য। যেন রণরঙ্গমত্ত কামিনীর অস্থির উন্মত্ত পদক্ষেপের ইঙ্গিত বহন করে সবটাই দ্রুততালে এগিয়ে চলেছিল। রণমত্ততার ছোঁয়ায় দর্শকের মনও পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিল—রুদ্ধনিঃশ্বাসে আরতি দেখছিলাম আমরা।

সারা পর্ব্বটা সারা হ'তে আধ ঘণ্টারও বেশি সময় লাগল। আরতি-শেষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম সেরে ওরা মন্দির থেকে বার হয়ে গেল। যাত্রীরা প্রবেশ করল গর্ভগৃহে। এবার দেবস্থান স্পর্শ-প্রদক্ষিণ-স্তবপাঠ-প্রণাম···নিস্তব্ধ মন্দিরগর্ভ শব্দ চঞ্চল হ'ল। ভিড়ের স্রোতে গা ঢেলে আমরাও প্রদক্ষিণ

করছিলাম—এক গৈরিকধারী আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

সেইখানে কুণ্ডের মধ্যে আগুন জ্বলছিল। দাঁড়িয়ে ছিলেন ব্রহ্মচারী। আমাদের বসতে বললেন। বসলাম। দু'-তিন হাত নীচেয় অগ্নিকুণ্ড—মেঝেতে উত্তাপ ছিল না। জিজ্ঞাসা করলেন বাংলায়, আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

উত্তর দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করলাম, আপনিও ত বাঙালী দেখছি—এইখানেই থাকেন, না তীর্থযাত্রী?

উনি বললেন, এইখানেই আছি—বার বছর। আগে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ছিলাম। এ জায়গাটা ভারি ভাল লেগে গেছে। দেবী-মাহাত্ম্য আছে—দেবী এখানে জাগ্রতা।

এর পর কুণ্ডের মধ্যে যে আগুন জ্বলছে আর দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে যে শিখাগুলি প্রোজ্জ্বল—তার পরিচয় দিতে লাগলেন। সবগুলিই আদ্যাশক্তির এক একটি অংশ—বিভিন্ন নামে চিহ্নিত।

পরিচয়-শেষে বললেন, জানেন—এমন জাগ্রত দেবী আর কোথাও নাই। কোথাও কি দেখেছেন দেবতা নিজে ভোগ গ্রহণ করেন? এখানে দেখতে পাবেন তিনি অগ্নিজিহ্বা দিয়ে নিবেদিত বস্তু গ্রহণ করছেন। আপনি ঘটিতে করে দুধ দিন—ঠোঙায় করে মিষ্টান্ন দিন—প্রত্যক্ষ করবেন দেবী তা গ্রহণ করছেন।

বললাম, এই যে আগুন জ্বলছে, একি কখনও নেভে না?

না। গহ্বরের এই আগুন যুগ-যুগান্তর ধরে রাত্রি-দিন জ্বলছে, অনির্ব্বাণ শিখা। তবে কুলুঙ্গির শিখাগুলি সর্ব্বদা উজ্জ্বল থাকে না। কুলুঙ্গি অগ্নিগর্ভ হলেও মাঝে মাঝে শিখাগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়, পুরোহিত পূজা-আরতির আগে জ্বালিয়ে দেন। কুণ্ডের আগুন সব সময়েই জ্বলছে। অবিশ্বাসীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন বহুবার। অনেকদিন আগে একবার আকবর বাদশা এই আগুন নেভাবার চেষ্টা করে কুণ্ডটা জলে ভর্ত্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এমনই দেবমহিমা, জলে ভর্ত্তি হয়েও কুণ্ডের আগুন নিভে যায় নি। বাদশা দেবমহিমা স্বীকার করে ভক্তিভরে একটা সোনার ছাতা উপহার দিয়েছিলেন। কাল সকালে যখন দেবী-দর্শনে আসবেন—সেই ছাতা দেখতে পাবেন।

একটু থেমে বললেন, তবু কি অবিশ্বাসীর সংখ্যা কমেছে! এই কালে বরং বেড়েছে। ওরা আগুন জ্বলার অন্য যুক্তি দেখায়। বলে—এই জায়গায় মাটির নীচেয় পেট্রোল আছে—পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে গন্ধক প্রভৃতি খনিজ পদার্থ আছে—আগুন নেভে না ওই কারণেই। বাসে আসতে আসতে দেখেন নি, মস্ত বড় একটা সরকারী দপ্তরখানা বসেছে পাহাড়ের গায়ে? ওখানে মাটি খোঁড়া-খুঁড়ি চলছে। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই—মাটির নীচেয় কিছু পায় নি! পাবেও না। দেবী-মাহাত্ম্য মানলে ওরা এমন বৃথা চেষ্টা করত না।

হ্যাঁ, বাসে আসতে আসতে পাহাড়ের পাদদেশে ড্রিলিং আপিসের একটা ঘোষণাপত্র চোখে পড়েছিল বটে। কাগজেও পড়েছি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ভূস্তরে পেট্রোলের সন্ধান চলেছে। গুজরাটে, আসামে, জ্বালামুখীতে—এমন কি বাংলায় কোন কোন স্থানেও তৈল অনুসন্ধান কার্য্য চলছে। জ্বালামুখী মন্দিরে অনির্বাণ অগ্নিশিখা থেকে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে এই উপত্যকায় খনিজ তেলের ভাণ্ডার আছেই আছে। ড্রিলিংএর কাজ চলেছে পুরোদমে। একটা বড় পাথরে বাধা পেয়ে কাজটা আর এগোয় নি। এমন বড় শক্ত পাথর ভেদ করার শক্তিশালী বেধযন্ত্র কোম্পানীর না থাকায় কাজটা আপাতত বন্ধ আছে। শোনা গেছে, বিদেশ থেকে যন্ত্র আনাবার তোড়জোড় চলছে—সেটা এলেই পূর্ণোদ্যমে সুরু হবে কাজ।

মনোবেদনা পাবেন বলে এইসব কথা ব্রহ্মচারীকে বললাম না।

ভূস্তরে অনেক নীচেয় তেল হয়ত আছে—পাহাড়ের এই মাঝপথে মন্দির-গর্ভে পাথরের ফাটলে আগুন জ্বলার চমৎকারিত্বও ত কম নয়।

মন্দিরের পিছন দিকের সিঁড়ি বেয়ে উঠলে পাওয়া যায় উন্মত্ত ভৈরবের মন্দির। পীঠস্থানের নীতিই, এই যেখানে দেবী, ভৈরবও সেখানে। দক্ষযজ্ঞে স্বামীনিন্দা শ্রবণে দেহ-ত্যাগ করলে কি হবে—সতীর ত্যক্ত দেহাংশ যে যে জায়গায় পড়েছিল সেইখানেই মহাকালকে আসন পাততে হয়েছে। উমা ছাড়া মহেশ্বরকে কল্পনা করতে পারি না আমরা—যেমন হিমালয়কে বাদ দিয়ে কৈলাসকে।

উন্মত্ত ভৈরবের মন্দির ছোট। ছোট একটি পাতকুয়ার মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে তাঁর মাহাত্ম্যকে প্রত্যক্ষ করতে হয়। সেখানকার একজন সেবক আমাদের নিয়ে নেমে এলেন পাতকুয়ার মধ্যে এবং একটি জায়গায় দেবদেবের মাহাত্ম্যকে প্রত্যক্ষ করালেন। পাতকুয়ার তলায় জল ছিল—আর চারপাশে পাথরের দেওয়ালে ছিল যে কয়েকটি গহ্বর। একটা গহ্বরে প্রদীপ জ্বলছিল। সেই প্রদীপের শিখায় শুকনো একটা কাঠি ধরিয়ে (অনেকটা পাটকাঠি জ্বালানোর মত) আর একটি গহ্বরের কাছে নিয়ে আসতেই দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল—অগ্নিময় হয়ে উঠল গুহা।

সেবক বললেন, এইখানে ভৈরব রয়েছেন। মূর্ত্তি নাই—তেজরূপী ভৈরব।

কে জানে যুগ যুগ সঞ্চিত কি অফুরন্ত খনিজ পদার্থের সমাবেশ—শত শত বছর ধরে এমন একটি মহিমাকে সর্ব্বক্ষণ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছে! প্রকৃতি অথবা প্রকৃতিরূপিণী দেবী—মহিমার আকর যিনিই হোন—লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি-বিস্ময় তাঁকে অবিনশ্বর করেছে।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে চন্দ্রনাথ তীর্থের কথা। সেই মহাতীর্থের বামে ও দক্ষিণে আরও দু'টি জায়গা আছে বড়িয়া ঢালা ও বড়বাকুণ্ড। সেখানে মাটিতে আগুন জ্বলে, জলেও আগুন জ্বলে। দু'টিরই দূরত্ব চন্দ্রনাথধাম (আজ ওই নামই বহাল আছে কি না, কে জানে!) ষ্টেশন থেকে পাঁচ মাইল। বহুদিন আগে বড়িয়াঢালা ষ্টেশনে নেমে সহস্রধারা জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিলাম। ভালমত পথ ছিল না—বন আর মাঠের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। একটা উঁচু পাহাড়ের মাথা থেকে উদ্দাম বেগে নেমে আসছে জলস্রোত। খাড়া পাহাড় থেকে কতগুলি ধারায় কে জানে—সহস্র হওয়াও আশ্চর্য্য নয়—সবেগে আছড়ে পড়ছে জলরাশি। জায়গাটা বহুদূর পর্য্যন্ত জলীয় বাষ্পে আচ্ছন্ন—পাহাড়ের নীচের ঘন কুয়াশার জাল। সে জাল ভেদ করে ধারা গণনা সহজ কাজ নয়। সেই আশ্চর্য্য প্রপাতের কথা বলছি এই জন্য যে, তার চেয়েও একটি বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলাম মাঠের মধ্যে, প্রপাত দেখে ফিরে আসবার পথে। ঐ দেশের একজন বাসিন্দা আমাদের দেখিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, এই দশ-বিশ মাইলের মধ্যেকার সবটুকু স্থানই শিবক্ষেত্র। এখানে জলে-স্থলে রুদ্রের মাহাত্ম্য প্রকট। তাঁর তেজ সব জায়গাতেই দেখতে পাবেন। এখানে মাটির উপরে আগুন জ্বলে—জলেও আগুন। দেখবেন?

বলে তিনি একটা শক্ত কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে মাঠের মাটি খুঁচিয়ে দিলেন। তারপর পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বাললেন। জ্বলন্ত কাঠিটা সেই খোঁচানো জায়গায় আনতেই দপ্ করে জ্বলে উঠলো আগুন। গন্ধকের গন্ধও পাওয়া গেল।

মাটিতে আগুন জ্বালিয়ে তিনি দেব-মাহাত্ম্য প্রমাণ করলেন। আমরাও উৎসাহভরে সেই মাঠের যত্রতত্র আগুন জ্বালিয়ে আনন্দলাভ করেছিলাম। বড়বা কুণ্ডেও জলের উপর আগুন জ্বলা দেখেছিলাম—সেই উত্তপ্ত জলে স্নান করেছিলাম। মাহাত্ম্য যারই হোক—বিস্ময়ের বস্তু ত!

এবার জ্বালামুখী প্রসঙ্গে ফিরে আসি। পরের দিন গ্লাসে করে দুধ এনেছিলাম—পাতার ঠোঙায় এনেছিলাম প্যাঁড়া আর এলাচদানা ভোগ।

আমাদের দেখে রমেশ পাণ্ডা এগিয়ে এল। বলল, পূজা দেবেন ত? দাঁড়ান, ফুল চন্দন জল নিয়ে আসি।

বুঝলাম—পাণ্ডা তার ব্যবস্থাটা এবার পাকাপাকি করে নেবে। মনে বিরূপ ভাবের চেয়ে কৌতূহলই প্রবল হ'ল—দেখাই যাক না পাণ্ডা ঠাকুর তাঁর দোহন কৌশল কি ভাবে প্রয়োগ করেন!

একখানা তামার থালে ফুল চন্দন অর্ঘ্য সাজিয়ে নিয়ে এল রমেশ পাণ্ডা। আমাদের নিয়ে গেল মন্দিরে। সেই কুণ্ডের ধারে এনে বসালে আমাদের। মন্ত্র পড়িয়ে পূজা দেওয়ালে। তারপর প্যাঁড়ার ঠোঙাটা কুণ্ডের পাথরের ফাটলের কাছে ধরে বলল, দেবী ভোগ গ্রহণ করলে দেখতে পাবেন—এই ঠোঙার উপরে আগুন উঠে আসবে। দেবী জিহ্বা দিয়ে স্পর্শ করবেন ভোগ।

আশ্চর্য্য, ঠোঙাটা পাথরের ফাটলের কাছে নিয়ে যেতেই আগুন উঠে এল তার ওপরে। এমনি করে দুধের গ্লাসের উপরেও আগুন উঠে এলো। অল্পক্ষণ রইল আগুন। অথচ গ্লাসে বা প্যাঁড়ায় দাহ্যবস্তু কিছু ছিল না।

মন্দিরের মধ্যে আর আশেপাশে আরও কয়েকটি দেবদেবীকে অর্চ্চনা করালে রমেশ পাণ্ডা। তারপর বলল, চারটে নয়া পয়সা দিন, দক্ষিণা।

মাত্র চারটি নয়া পয়সা দক্ষিণা! আশ্চর্য্য হবারই কথা!

এর পর পাণ্ডা বলল, এইবার গদিতে চলুন—দেবীর তৈজসপত্র—আকবর বাদশাহের সোনার ছাতা—আরও কয়েকটা জিনিষ দেখবেন। গদিতে যখন পুজোর টাকা জমা দেবেন—মুন্‌শি তখন জিজ্ঞাসা করবে—আপনার পাণ্ডা কে? আপনি বলবেন, রমেশ পাণ্ডা। কেমন?

নামটা ও বার দুই-তিন স্মরণ করিয়ে একরকম মুখস্ত করিয়ে নিলে। বুঝলাম—এইবারে ওর আসল মূর্ত্তিটা দেখতে পাব। তবু কৌতূহলী হয়ে শেষ পর্য্যন্ত দেখার অপেক্ষায় রইলাল।

দেবীর তৈজসপত্র; প্রণামী ও উপহার উপঢৌকনের দ্রব্যগুলি দেখলাম। আকবর বাদশাহের দেওয়া সেই ভারী সোনার ছাতাটা দেখলাম। সবটা ওর সোনা হয়ত নয়, সম্ভবত রূপো কিংবা অন্য কোন ধাতুদেহ আগাগোড়া সোনার জলে পালিশ (Lacquer) করা।

এই সব দেখে আমরা এসে বসলাম গদিঘরের বারান্দায়। সেখানে চশমা চোখে গম্ভীর প্রকৃতির মুন্‌শি বসে ছিলেন। তাঁর সামনে খাতাপত্রের স্তূপ। সেইখান থেকে একখানা খাতা টেনে নিয়ে ষ্টীলের কলম বাগিয়ে ধরে তিনি দেবী পূজার বিধিবিধানগুলি আমাদের বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

বললেন, এখানে পূজা মানেই ভোগ দেওয়া। দেবীর জিহ্বা পড়েছিল এইখানে—তাই দেবী রসনারূপিণী। রস হ'ল রসনার আশ্রয়, তাই প্রহরে প্রহরে নানা রসের ভোজ্যে দেবীকে আরাধনার প্রথা। মিছরী ভোগ, পুরী, অন্নভোগ, পরমান্ন ভোগ। এ সবই ভক্ত দাতাদের অর্থে এবং দেব-ষ্টেটের আয় থেকে সুসম্পন্ন হয়। ভক্তেরা যাঁর যেমন খুশি—পাঁচ দশ পঞ্চাশ, একশ যে যেমন পারেন দেবীর ভোগ বন্দোবস্ত করে দেন। যিনি যত সামান্য অর্থই দিন, তাঁর নাম উঠবে খাতায়, ভোগের হিসাব থাকবে।

এক টাকার হিসাবও লেখা থাকে?

নিশ্চয়, দানের মর্য্যাদা ত অর্থে নয়, আন্তরিকতায়।

খুশি হয়ে বললাম, তা হ'লে আমাদের নাম লিখতে পারেন।

আপনাদের পাণ্ডা কে? জিজ্ঞেস করলেন মুন্‌শি।

অসঙ্কোচে রমেশ পাণ্ডার নাম করলাম।

রমেশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অনুমান করে নিলাম—এইবার পাণ্ডা আসবে সুফল আদায় করতে। বহু তীর্থের অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল।

কিন্তু, জ্বালামুখীর স্থান-মাহাত্ম্য কিন্তু ভিন্নতর ছিল—আমাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে বেশ কিছু পরিমাণ বিস্ময় সঞ্চিত করেছিল রমেশ পাণ্ডা। যথারীতি দেবীপূজা মন্ত্র-পাঠ ও অন্যান্য দেবদেবী দর্শন করিয়ে আধ ঘণ্টারও ওপর আমাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে মাত্র চারটি নয়া পয়সা দক্ষিণা নিয়ে সে সন্তুষ্টচিত্তে দেবীপূজার আয়োজন করতে গেল। সন্ধ্যায় আবার দেখা হ'ল তা'র সঙ্গে। আরত্রিক অন্তে আমাদের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে হাত পাতল না। পরের দিন বিদায় বেলায় বাস ষ্ট্যাণ্ডে আবার ওকে দেখলাম—অপর যাত্রীর সঙ্গে আলাপ করছে। আমাদেরও দেখল রমেশ পাণ্ডা—কিন্তু পাওনাদারের মত লোলুপ দৃষ্টি ফেলে ছুটে এল না। তীর্থক্ষেত্রের পরমাশ্চর্য্য বই কি রমেশ পাণ্ডা!

বহু তীর্থ পর্য্যটন করেছি—এমন দৃষ্টান্ত কচিৎ চোখে পড়েছে। প্রথম জীবনে কামরূপ কামাখ্যাধামে দেখেছিলাম—তারপরে দেখেছিলাম সীতাকুণ্ডে, চন্দ্রনাথধামে। ঠিক মনে পড়ছে না—দক্ষিণতীর্থের দু'একটি স্থানেও যেন এই দৃষ্টান্ত দেখেছি। উত্তর ভারতে এই প্রথম দেখলাম। মনে হ'ল—দেবতার মহিমা মানুষকে নিয়েই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। শ্রীরামানুজের শিক্ষাগুরু শ্রীযাদবাচার্য্য একটি শ্লোকাংশে যথার্থ বলেছেন: হে প্রভু, এই কথাও সত্য, ভক্ত না থাকলে ভগবানের মহিমাকে প্রকাশ করার উপযুক্ত আধারই বা কোথায় মিলত!

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

(তেইশ)

দোকানে ফিরতে হরেকৃষ্ণর সঙ্গে রামকিঙ্করের একপ্রস্থ হয়ে গেল।

চোখ পাকিয়ে হরেকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলে, দোকানের কাজ কামাই করে কোথায় গিয়েছিলে আড্ডা দিতে?

রামকিঙ্কর একমুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর শান্তকণ্ঠে বললে, আড্ডা দিতে যাই নি।

হরেকৃষ্ণ বললে, আড্ডা দিতে যাও নি ত কোথায় গিয়েছিলে? দোকানের কাজে?

—না, নিজের কাজে।

—ওকেই আড্ডা দেওয়া বলে। দোকানের কাজে ফাঁকি দিয়ে নিজের কাজে যাওয়াকে। মাস মাস মাইনে নিচ্ছ, সেটা খেয়াল থাকে না?

—মাস মাস মাইনে ত আপনিও নিচ্ছেন। নিজের কাজে আপনি বেরিয়ে যান না?

রাগে, বিস্ময়ে হরেকৃষ্ণর চোখ কপালে উঠল। চিৎকার করে বললে, আমার সঙ্গে তোমার তুলনা?

—কেন নয়? আমিও যেমন দোকানের কর্মচারী, আপনিও তেমনি।

হরেকৃষ্ণ লাফিয়ে উঠল: যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! তোমাকে আমি দোকান থেকে বের করে দিতে পারি, জান?

—না, পারেন না। পারেন মালিক, আপনাকেও, আমাকেও।

দোকানের অন্য কর্মচারীরা এতক্ষণ স্তব্ধ হয়েছিল। ঘটনাটা অত্যন্ত আচম্বিতে ঘটে গেল। এখন তারা দু'জনের মধ্যে পড়ে দু'জনকেই থামাতে লাগল। সুবল এবং আর কয়েকজন রামকিঙ্করকে ঠেলতে ঠেলতে ওপরে নিয়ে গেল। কয়েকজন বয়স্ক কর্মচারী হরেকৃষ্ণকে শান্ত করতে লাগল।

হরেকৃষ্ণ বললে, বি. এ. পাস করতে-না-করতেই ধরাকে সরা জ্ঞান! যেন এর আগে আর কেউ বি. এ পাস করে নি। মুরুখ্যু ঘরের ছেলে ত, গরম হয়ে গিয়েছে। গরম আমি আজকেই ছোটাচ্ছি!

চিৎকার করেই হরেকৃষ্ণ বললে।

উপর থেকে পাল্টা চিৎকারে রামকিঙ্করও উত্তর দিলে, আপনার যা ক্ষমতা আছে, করুন। আমি আপনাকে থোরাই কেয়ার করি।

—আচ্ছা, দেখছি। বলেই হরেকৃষ্ণ উঠে পড়ল।

এই উঠে পড়ার অর্থ কি, সবাই জানে। হরেকৃষ্ণ হয় গিন্নীমার কাছে, নয় বাবুর কাছে গিয়ে সত্য-মিথ্যা সাতখানা করে লাগাবে। গিন্নীমার কাছে রামকিঙ্করেরও খাতির আছে। অথচ হরেকৃষ্ণের তেজ দেখে মনে হ'ল, তারও কোমর দড়। না হ'লে সে অমন করে তড়পাতো না। অনেক অনুনয়-বিনয় করে তারা হরেকৃষ্ণকে বসালে। বয়স্ক কর্মচারীদের উপরোধে হরেকৃষ্ণ বসল বটে, কিন্তু ঠিক শান্ত হ'ল বলে মনে হ'ল না।

বয়স্ক ব্যক্তিদের মেজাজ সাধারণত ঠাণ্ডা হয়। সকলেই ছা'পোষা খেটে-খাওয়া মানুষ। তারা রামকিঙ্করের ওপরেই চটল: হাজার হোক, হরেকৃষ্ণ ম্যানেজার ত বটে। বয়েসেও বড়। রাগের মাথায় যদি একটা কড়া কথা বলেই থাকে, তার উত্তরে রামকিঙ্করের চোখ গরম করা উচিত হয় নি।

তবু হরেকৃষ্ণকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে তারা বললে, ছেলেমানুষ, তাতে সদ্য বি. এ পাস করার খবর পেয়েছে। আপনি ওর বাপের বন্ধু। আপনি যদি ওর ওপর রাগ করেন, ছেলেটা ভেসে যায়।

হরেকৃষ্ণ অট্টহাস্য করে বললে, ভেসে যাবে কি হে! এই তেলের দোকানের সামান্য চাকরি গেলে ওর কি হয়? আজ কাগজে খবরটা বেরিয়েছে, কাল দেখবে দোকানে সায়েবের ভিড় জমে গেছে।

—সায়েবের ভীড়!

—হ্যাঁ গো, সায়েবের ভীড়। ফুটফুটে সাদা চামড়ার সায়েব। ছোঁ মেরে ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে তিনতলায় চেয়ারে বসিয়ে দেবে। সেটা জানে বলেই ত রাম আমার ওপরে চোখ গরম করতে সাহস পায়।

বয়স্কেরা হাসলে: সংসার ত দেখে নি। জানে না, কত ধানে কত চাল।

—এইবার জানবে। গিন্নীমা কতদিন আমাকে বলেছেন, ওটাকে সরাও। ছেলেটা ভাল নয়। আমিই সরাই নি। বন্ধুর ছেলে, সরালে খাবে কি? ওর যে এত তেজ হয়েছে, জানতাম না।

কি সবনাশ! গিন্নীমা নিজেই ওকে সরাতে বলেছেন? তা হ'লে ওর চাকরির পরমায়ু ঘনিয়ে এসেছে। একসঙ্গে থাকলে যেমন পরস্পরের ঈর্ষা হয়, তেমনি আবার একটা মমতাও বসে। ওরা কাজের এক ফাঁকে রামকিঙ্করের কাছে গেল। উদ্দেশ্য, তাকে ভয় দেখিয়ে নরম করা।

বললে, কাজটা ভাল কর নি, রাম। তা রাগের মাথায় যা করে ফেলেছ, করেছ। এখন চল, ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে ওঁকে শান্ত করবে।

স্নান করে নামমাত্র দু'টি খেয়ে রামকিঙ্কর চুপ করে শুয়েছিল। ঘুম আসে নি। ঘুম আসবার কথাও নয়। আজকের কলহের পরিণতি সম্বন্ধে তার মনে কোন সন্দেহ নেই। সে বুঝেছে, এখানকার অন্ন শেষ হয়েছে। হরেকৃষ্ণ কিছুই নয়। আসল ব্যক্তি গিন্নীমা। তার সম্বন্ধে গিন্নীমার মনোভাবের একটা ইঙ্গিত সে পেয়েই এসেছে: অন্য কোথাও চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছ? সঙ্গে সঙ্গে গিন্নীমার মুখের সেই রূঢ় ভঙ্গি।

গিন্নীমার হুকুম হরেকৃষ্ণ তার নিজের স্বার্থে প্রয়োগ করবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করবে, তার ক্ষমতা কত বেশি। তার দম্ভ বেড়ে যাবে।

হায়রে ভৃত্যের দম্ভ! 'তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।'

রামঙ্কিকরের হাসি এল। শুধু এই জন্যেই নয়। তার মনে হ'ল, আজকের দিনটি তার জীবনে যুগপৎ লাল এবং কালো হরফের দিন। আজকেই তার বি. এ পরীক্ষার ফল বেরুল। আজকেই তার কর্মজীবনের একটি অধ্যায় শেষ হ'ল।

শেষ হ'লই বলা যেতে পারে। সন্ধ্যের আগেই হরেকৃষ্ণ তার বরখাস্তের হুকুম নিয়ে আসবে। দিব্যচোখে সে দেখতে পাচ্ছে। তারপরে কি তা সে জানে না। এ বাড়ীতে সম্ভবত: এই তার শেষ রাত্রিবাস। 'যাত্রা করে যাত্রীদল, বন্দরের কাল হ'ল শেষ।'

যাত্রা সুরু করবার জন্যে সে ত পোটলা-পুঁটলী বেঁধে তৈরিই হয়ে আছে। শুধু যদি বুঝতে পারত, তার নৌকা এর পরে কোন্ বন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করবে, তা হ'লে মনটা সুস্থ হ'ত। মন তার চঞ্চল। নৌকা তার ভাঙা নয়। কিন্তু সমুদ্র বিক্ষুব্ধ। মন সেই জন্যেই চঞ্চল।

এই অবস্থায় বয়স্ক কর্মচারীটি এল তাকে বোঝাতে: রাগের মাথায় যা করে ফেলেছ, করেছ। এখন চল, ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে ওঁকে শান্ত করবে।

শোনামাত্র রাগে রামকিঙ্করের ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার লোকটির দিকে চেয়ে সে সটান বললে, না।

লোকটি থতমত খেয়ে গেল। হরেকৃষ্ণ রামকিঙ্করের পিতার বয়সী। তার কাছে ক্ষমা চাইতে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না।

জিজ্ঞাসা করলে, তাতে দোষ কি?

—দোষ কিছুই নেই। কিন্তু আমি ওর কাছে ক্ষমা চাইতে পারব না। তাতে চাকরি থাক আর যাক।

লোকটি রামকিঙ্করের ঔদ্ধত্যে ক্ষুণ্ণ হ'ল।

বললে, তুমি যা ভাল বোঝ, কর। আমার বলবার কি আছে? তবে আমার মনে হয়, যতদিন আরেকটা চাকরী না পাচ্ছ, হরেকেষ্টবাবুকে একটু তোয়াজ করে চললেই ভাল হয়। ধর, কালকেই যদি চাকরিটা যায়।

—যাবে।

—একটা আশ্রয় ত বটে। চাকরি গেলে থাকবে কোথায়?

—ফুটপাতে। যেখানে হাজার হাজার ভিখিরী থাকে, তাদের সঙ্গে।

লোকটি অবাক্ হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। বললে, এ ত তোমার রাগের কথা, রাম।

রামকিঙ্কর বললে, না, রাগের কথা নয়। বেশ করে

ভেবে-চিন্তেই বলছি। যদি চাকরি যায়, দেখে নেবেন। মরি সেও ভাল, তবু ওই লোকটার অনুগ্রহ ভিক্ষা করব না।

সমস্তদিন রামকিঙ্কর তার ঘরে শুয়ে রইল। দোকানের কাজে নামল না। হরেকৃষ্ণ তাকে ডেকে পাঠালে না। সকলের মনেই একটি অস্বস্তি এবং দুশ্চিন্তা। একটা ছেলে এতকাল তাদের সঙ্গে রয়েছে। সে চলে যাবে। যদিও তার নিজের দোষে, তবু ভাবতে মন একটু ভারী হয় বইকি।

রামকিঙ্কর নিজেও অবাক্ হ'ল। দোকান কি আজ বন্ধ না কি? কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না? এমন কি দুমদাম করে তেলের পিপেগুলো পড়ে, সে শব্দও উঠছে না। ছুটির দিন ছাড়া এমন নিস্তব্ধতা সে কখনও দেখে নি।

কিন্তু যে দোকান সে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তা চলছে কি চলছে না, তা নিয়ে তার দুশ্চিন্তা নিরর্থক।

পাচটা বাজে। শুয়ে থাকতেও আর ভাল লাগে না। জামাটা গায়ে দিয়ে সে নিচে নামল। বাইরে যাবার রাস্তাটা দোকান ঘরের ভিতর দিয়েই। কোনদিকে না চেয়ে রামকিঙ্কর দোকান ঘরের ভিতর দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেল। দোকানের অন্য কর্মচারীরা কিংবা হরেকৃষ্ণ কি করছে, জানবার কোন কৌতূহল তার নেই।

বড় রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ হেঁটে যাবার পর রামকিঙ্কর দাঁড়িয়ে পড়ল: কোথায় যাবে? কোথায় যাওয়া যায়? বেরিয়ে আসবার সময় সেই কথাটাই সে ভাবে নি।

দু'টি মাত্র যাবার জায়গা আছে। এক, বিশ্বনাথের বাড়ী। কিন্তু আজ সকালেই সেখানে গিয়েছিল। বিশ্বনাথ হয়ত তার ভর্তির ব্যবস্থা নিয়েই ব্যস্ত। তার সঙ্গে হয়ত দেখাই হবে না। মায়ের সঙ্গে গল্প করবার মত মনের অবস্থা তার নেই।

দুই, সারদার বাসায়। কিন্তু সারদা বাসায় আছে কি না, কে জানে। শুনেছে, প্রতিদিন এই সময় একবার করে সে বাসায় আসে। ঘর-দোর ঝাঁট দেয়। কেউ শুক আর না শুক, বিছানাটা একবার ঝেড়ে পাতে। ঘরে ধূপ-ধুনো দেয়। পাশাপাশি যারা থাকে, তাদের সঙ্গে একটু গল্প করে। তারপর চলে যায়।

সেখানে একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। থাকে ভাল। না থাকে, পার্ক ত আছেই।

আসলে, কি জানি কেন, রামকিঙ্করের মন তাকেই খুঁজছে। দোকানের রাজনীতির সঙ্গে বিশ্বনাথের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সারদার একটু আছে। দুঃখের কথা তাকেই বলা যায়। গিন্নীমার কাছে যাবার ইচ্ছা নেই, পথও নেই। বৌরাণীর কাছে সরাসরি যাওয়া যায় না। সেখানে যাবার রাস্তা সারদা।

সারদার বাসায় যেতেও তার কেমন সঙ্কোচ হয়। বস্তির অন্যান্য লোকেরা, এদের অধিকাংশই নানা বয়সের স্ত্রীলোক, তার দিকে কেমন করে যেন চায়। মনে হয়, মুখ টিপে টিপে হাসে। তবু সেই দিকেই চলতে লাগল। সারদার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।

সারদা তখন দাওয়ায় বসে কয়েকজনের সঙ্গে হাত-মুখ নেড়ে খুব গল্প জমিয়েছে। রামকিঙ্করকে দেখে অবাক্ হয়ে গেল।

বললে; হঠাৎ এলেন যে?

রামকিঙ্কর বললে, আসতে নেই?

—থাকবে না কেন? কিন্তু আজ সকালেই ত দেখা হয়েছিল। আসুন, ভেতরে আসুন।

সারদার ঘরে তক্তাপোষের ওপর একটি পরিষ্কার বিছানা সবসময়ে পাতা থাকে। সেইখানে রামকিঙ্করকে বসিয়ে সারদা মেঝেয় বসল।

বললে, হঠাৎ কেন এলেন বলুন। কিছু খবর আছে?

—গুরুতর খবর আছে। আমার চাকরিটা বোধহয় যাবে।

—সে কি!

—হ্যাঁ। দোকানের ম্যানেজার—

—হরেকেষ্টবাবু?

—তার নামটাও তুমি জান দেখছি।

—জানি। তারপরে বলুন।

—হরেকেষ্টবাবু এতক্ষণ বোধহয় গিন্নীমার কাছে চলে গেছে। দোকানে ফিরে শুনব, আমার চাকরি নেই।

রামকিঙ্কর হাসতে লাগল।

সারদা নিঃশব্দে কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর বললে, এতখানি পথ হেঁটে এসে আপনি ত একটা খারাপ খবর দিলেন। আমি একটা ভাল খবর দি, শুনুন।

—বল।

—বৌরাণীর সন্তান হবে।

খুশি হয়ে রামকিঙ্কর বললে, তাই নাকি?

—হ্যাঁ। গিন্নীমা খুশি, বাবু খুশি। বাড়ীতে একটা সাড়া পড়ে গেছে। বৌরাণীর কদর খুব বেড়ে গেছে।

রামকিঙ্কর বললে, তা হ'লে বৌরাণীর আর পরীক্ষা দেওয়া হ'ল না?

—আর কি হবে দিয়ে? বাবু একেবারে বদলে গেছেন। এখন একেবারে বৌরাণীর মুঠোর মধ্যে।

—মার-ধোর বন্ধ?

—একেবারে। এখন বৌরাণী উঠতে বললে ওঠেন, বসতে বললে বসেন।

—মদ্যপান?

—বেড়েছে। তবে আর বাইরে যান না। ইয়ার-বকসী নিয়েও নয়। যা করেন বাড়ীতে। তবে শরীরটা খুব খারাপ। পেটে একটা যন্ত্রণাও হচ্ছে। চব্বিশ ঘণ্টা মদ খেলে হবে না?

—বৌরাণী কিছু বলেন না?

—না। বাঘ সবে পোষ মানছে, এখনি অতখানি বোধহয় সাহস করেন না।

সারদা হাসলে। বললে, ডাক্তার দেখছে। কিন্তু মদ বন্ধ না করলে শুধু ওষুধে কি হবে?

দু'জনে নিঃশব্দে বসে রইল।

একটু পরে সারদা জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবছেন?

—ভাবছি, চাকরিটা গেলে খাব কি, থাকব কোথায়?

সারদা ফিক্ করে হাসলে। বললে, ইচ্ছে করলে এখানে থাকতে পারেন।

রামকিঙ্কর হেসে ফেললে। বললে, তোমার এখানে!

—কেন, দোষ কি?

গম্ভীরভাবে রামকিঙ্কর বললে, তা হয় না।

সারদাও হাসলে। বললে, সে আমিও জানি। বসুন, পালাবেন না। আপনার জন্যে একটু চা করে নিয়ে আসি।

একটু পরে ফিরে এসে সারদা জিজ্ঞাসা করলে, দোকানের কাজ আর আপনারও ভাল লাগছে না, না?

—না।

—কিন্তু অন্য কোথাও চাকরি পাবার আশা আছে?

—চেষ্টা ত করি নি। এইবার করতে হবে।

সারদা বললে, আপনার কথা বৌরাণী প্রায়ই জিগ্যেস করেন। তাঁর ভয়, বি. এ পাশ করলেন, এবারে আপনি হয়ত অন্য চাকরী পেয়ে চলে যাবেন।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, চাকরি পাওয়া অত সহজ নয়। তাঁকে বোলো, চাকরি পাওয়ার আগেই হয়ত আমাকে চলে যেতে হবে।

—ভয় পাবেন না, চাকরি আপনার নাও যেতে পারে।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, চাকরি যাবে না? আমি ত চাকরি গেছে বলেই ধরে নিয়েছি। গিন্নীমার মনের কথা টের পেয়েছি। তিনি আমাকে চান না।

—কিন্তু মনে হয়, বৌরাণী আপনাকে চান।

—কি করে জানলে?

—জানি।

—জান? আমি ত ভেবে পাই না, আমি তাঁর কোন কাজে আসতে পারি।

সারদা বললে, কাজে আসাটাই কি বড় কথা? আপনি যে সৎ লোক, এটা তিনি জানেন। তাই দোকানে আপনাকে তিনি রাখতে চান।

—কিন্তু তিনি ত আমাকে রাখবার মালিক নন।

এবারে সারদার চোখদুটো যেন দপ করে জ্বলে উঠল: কে বললে তিনি মালিক নন? যে অধিকারেই গিন্নীমা মালিক, সেই অধিকারে তিনিও মালিক। গিন্নীমা যদি ছেলের সম্পত্তির মালিক হ'তে পারেন, তা হ'লে বৌরাণী স্বামীর সম্পত্তির মালিক হ'তে পারেন না?

রামকিঙ্কর তীক্ষ্নদৃষ্টিতে সারদার মুখের দিকে চেয়ে রইল। এই একটা সন্দেহ তার মনের মধ্যে কিছুদিন থেকেই উঁকি দিচ্ছে। শাশুড়ী-বৌতে একবার লাগবে। বৌরাণী তার জন্যে অনেকদিন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছেন। কে জানে, হয়ত এই জন্যেই তিনি স্বামীর পৈশাচিক অত্যাচার নিঃশব্দে সহ্য করেছেন। স্বামী-গৃহ ত্যাগ করে যান নি।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, গিন্নীমার মত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী মহিলার সঙ্গে যুদ্ধ করা ত সহজ নয়। ওঁকে কেউ হারাতে পারে, একথা ভাবতেই পারা যায় না।

কিন্তু এই নিয়ে সারদার সঙ্গে আলোচনা করে লাভ নেই। এটুকু আভাস পেলে যে, একটা যুদ্ধ আসন্ন। তার চাকরি সরু সুতোয় ঝুলছে। সুতরাং চাকরি নিয়ে আর

সে ভয় পায় না। এই অবস্থায় যদি ডাবাডোল বেধে যায়, মন্দ কি!

কোনদিকে না চেয়ে রামকিঙ্কর দোকান ঘরের ভিতর দিয়ে সটান দোতলায় তার ঘরে চলে গেল। কোনদিকে না চেয়েও সে বুঝতে পারলে গদীতে সবাই সমাসীন। কিন্তু নিস্তব্ধ, যেন থমথমে ভাব।

চাকরিটা কি গেলই তাহলে? এই নিস্তব্ধতা এবং থমথমে ভাব কি সেই শোকে?

ঘরে গিয়ে পাঞ্জাবীটা খুলে সে বিছানাটা পেতে ফেললে। চাকরীটা যদি গিয়েই থাকে, তা হ'লে বোধহয় এখানে তার চাল নেওয়া হয় নি। আবার জামা পরে বাইরে যেতে হবে খেতে। কিন্তু তার এখনও দেরি আছে। এখন মোটে সন্ধ্যে সাতটা। ন'টার সময় হোটেলে গেলেই চলবে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে স্থির করে ফেললে, চাকরি গিয়ে থাকলেও তখনই তখনই এখান থেকে তাকে হরেকৃষ্ণ যেতে বলবে না। এতদিনের চাকরি, একটা চক্ষুলজ্জা তো আছে। কিন্তু তার পক্ষে একটা দিনও এখানে থাকা ঠিক হবে না। বাক্স-বিছানা নিয়ে সকালেই সে চলে যাবে বিশ্বনাথের ওখানে। মা হয়ত ছাড়বেন না। কিন্তু ওখানে সে খাবে না। খাবে হোটেলে। এবং ঘুরবে নানা জায়গায় চাকরির সন্ধানে। বড় জোর দু'চারটে রাত বিশ্বনাথের বাড়ীতেই কাটাবে।

তারপরে?

অন্ধকার। তার অদৃষ্টে কি আছে, সে জানে না।

ধীরে ধীরে সুবল এসে ঘরে ঢুকল। আড় চোখে একবার রামকিঙ্করের দিকে চাইলে। মুখখানি বিষণ্ণ। নিজের বিছানাটা পেতে নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল।

শুষ্ক হাস্যে রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, চাকরিটা গেলই তা হলে? কিন্তু তার জন্যে অত শোক কিসের?

সুবল তড়াক করে বিছানায় উঠে বসল। রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, গেছে!

—আমি জানি না। তোমার কাছে জানতে চাইছি।

—আমরাও জানি না।

—হরেকেষ্ট কিছু বলে নি?

—না। বিকেলে একবার বেরিয়েছিল। বোধহয় গিন্নীমার কাছেই। ফিরে এসে পর্যন্ত গুম হয়ে বসে আছে। চাকরিটা যায় নি তা হ'লে?

সুবল খুশি হয়ে উঠল।

রামকিঙ্কর বললে, বললাম ত, আমি জানি না। গেলে গেছে, থাকলে আছে।

—তুমি তা হ'লে গিয়েছিলে কোথায়?

—অন্য জায়গায়। গিন্নীমার কাছে নয়।

তারপর বললে, আমার চাল নেওয়া হয়েছে কি না, জানো?

—চাল নেওয়া হবে না কেন? চাকরি গেলেও কি দু'একদিন তুমি খেতে পাবে না?

—কি জানি, হরেকেষ্টর ব্যাপার ত।

সুবল বললে, কেন, আমরা কি নেই? আমাদের বন্ধু-বান্ধব এলে তারা কি দু'একদিন খেতে পায় না?

তা পায়। তত অভদ্র এরা নয়। দোকানে যারা কাজ করে, তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব মাঝে মাঝে আসে—থাকে, খায়। কেউ আপত্তি করে না।

একটু পরে চিন্তিত মুখে সুবল জিজ্ঞাসা করলে, তা হ'লে ব্যাপারটা দাঁড়াল কি? তোমার চাকরি আছে না গেছে? আমরা কেউ কিছু বুঝতে পারছি না।

রামকিঙ্কর বললে, বুঝে কাজ কি? হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। গিয়ে থাকলে হরেকেষ্ট এখুনি আমাকে সুসংবাদটা দেবে। তখন আমিও জানতে পারব, তোমরাও জানতে পারবে।

রামকিঙ্কর হাসতে লাগল।

সুবল বললে, কিন্তু এখনও এসে যদি না জানায়?

—তা হ'লে বুঝতে হবে, কালকের দিনটা চাকরি আছে। এখন থেকে আমার রোজকার রোজ চাকরি। সূর্য অস্ত গেলে জানব, আজকের দিন চাকরি আছে। মাইনেটা পাব।

সুবল বললে, এমন করেই বা কদিন চাকরী করা যায়?

—যতদিন অন্য চাকরি না জোটে। জুটলে আমিই ছেড়ে দোব।

সুবল জিজ্ঞাসা করলে, গিন্নীমা কি তোমার ওপর এখন আর খুশি নন?

—সেই রকম শুনছ নাকি?

—ভাসা ভাসা শুনছি।

—জানি না ভাই। এতদিন আমাকে তিনি যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন। আমি যেটুকু লেখাপড়া শিখলাম, সে তাঁরই দয়ায়। নিজের ইচ্ছাতেই গেছেন। আমি জানি না ভাই। আমরা সামান্য প্রাণী। বড় লোকের মন আমাদের কাছে অন্ধকার।

রাত্রে নটায় ওদের খাওয়া। হরেকৃষ্ণের খাবার তার ঘরে যায়। তার একটু বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দোকানের অন্য কর্মচারীরা রান্নাঘরের সামনে বারান্দায় বসে খায়।

সুবল বললে, চল, খেতে যাই। সবাই বসে গেছে।

রামকিঙ্কর উঠতে গিয়ে আবার বসে পড়ল। বললে, ঠিক জানত, আমার চাল নেওয়া হয়েছে? গিয়ে অপদস্থ হব না ত?

তার হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে সুবল বললে, না, হে না, অপদস্থ হবে না। চল।

অপদস্থ হলও না। বরং সবাই তাকে খাতির করে বসালে। যে লোকটি যে কোন দিন চলে যেতে পারে, সহকর্মীদের পক্ষে তাকে খাতির করা অস্বাভাবিক নয়। আবার এই খাতিরের মধ্যে কয়েক ফোঁটা করুণা থাকাও বিচিত্র নয়। আহা! বেচারা কতদিন এখানে চাকরী করলে আর নিজের গোঁয়ার্তুমিতে সেই চাকরীটা খোয়াতে চলেছে। বি. এ পাস করেছে, হয়ত এর চেয়ে একটা ভাল চাকরী কোথাও জুটে যেতে পারে। কিন্তু সেটা ত কথা নয়। যে চাকরীটা যেতে বসেছে, সেইটেই কথা।

রাত্রে পাশের বিছানায় শুয়ে সুবল ফিসফিস করে বললে, তোমার খাতিরটা আজ দেখলে হে!

—দেখলাম। কেন বলত?

—কেউ বুঝতে পারছে না, তোমার চাকরীটা থাকবে না যাবে। হরেকেষ্ট সোজা পাত্র নয়। তার নাকের ওপর তুড়ি মেরে তুমি যে আজকেও রয়ে গেলে, তারই জন্যে খাতির।

—এ কথা কেন মনে করছ?

সুবল হেসে বললে, কেন করছি? তোমার তাকৎ দেখে আমার নিজেরও যে তোমাকে খাতির করতে ইচ্ছা করছে। অন্ততঃ এটা আমরা বুঝছি, হরেকেষ্ট যেমনই হোক, তুমিও সামান্য নয়। এমন লোককে কেন খাতির করে বল?

রামকিঙ্কর চুপ করে রইল।

সুবল বলে চলল, হরেকেষ্টর খোঁটার জোর আছে। আজ হোক, কাল, চাকরী হয়ত তোমার থাকবে না। না থাক, হরেকেষ্টকে ধাক্কাটা কম দিলে না। সন্ধ্যে বেলায় এসে যখন হরেকেষ্ট বসল, মুখখানা তার তেল হাঁড়ির মত। এতক্ষণের মধ্যে কারোর সঙ্গে একটা কথা বলে নি।

রামকিঙ্কর তথাপি চুপ করে রইল।

তাকে উৎসাহিত করবার জন্যে সুবল বললে, খাতির কি তোমাকে সবাই সাধে করছে হে! হরকেষ্টর মুখ দেখে সবাই সন্দেহ করছে গিন্নীমার কাছে সে খুব সুবিধা করে উঠতে পারে নি। [ক্রমশঃ]

কংগ্রেস স্মৃতি

একত্রিংশ অধিবেশন—লক্ষ্ণৌ, ১৯১৬

গিরিজামোহন সান্যাল

(এক)

১৯১১ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনের ৪ বৎসর পরে আমি রাজসাহী জজ কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করি। সে-সময় রাজসাহীতে কোন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ছিল না। আমি রাজসাহীতে সর্বপ্রথম জেলা কংগ্রেস কমিটি স্থাপন করি ও তাহার সেক্রেটারী নিযুক্ত হই।

১৯০৭ সালে সুরাটে অধিবেশন পণ্ড হওয়ায় এলাহাবাদ কনভেনসনে প্রস্তুত নিয়মের বলে কংগ্রেস থেকে গরমপন্থী দল বহিষ্কৃত হয়। ফলে ১৯০৮ সাল হ'তে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত কোন কংগ্রেসের অধিবেশনে গরমপন্থী দল যোগ দিতে পারে নি। ১৯১৫ সালে স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বোম্বাই অধিবেশনে কংগ্রেস এলাহাবাদে গৃহীত নিয়মাবলী পরিবর্তন করে চরমপন্থীদের কংগ্রেস প্রবেশের পথ সুগম করে দেয়। মুসলিম লীগও তাহাদের নীতি পরিবর্তন করে কংগ্রেসের সহযোগিতায় কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে একই সময়ে, একই স্থানে মুসলিম লীগের অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য দেশে বিশেষ রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটী কর্তৃক রাজসাহীর প্রবীণ উকিল, বঙ্গীয় বিধান সভার সভ্য, পরহিত ব্রত অমায়িক সুপ্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী মহাশয়, রাজসাহীর উকিল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সরকার ও আমি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের প্রতিনিধি নিযুক্ত হই। ইহাই আমার কংগ্রেস জীবনে প্রথম প্রতিনিধিত্ব। তৎকালে পাবনা তাড়াসের জমিদার মহাশয়গণ রাজসাহীর কংগ্রেস প্রতিনিধিদের মধ্যে একজনের কংগ্রেসে যোগদান করার ব্যয়ভার বহন করতেন। তাড়াসের রাজসাহীস্থ উকিল শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার উক্ত অর্থসাহায্যে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগদান করেন। উপেনবাবু আমা অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি এখনও বেঁচে আছেন এবং রাজসাহীতে (পূর্ব পাকিস্তানভুক্ত) ওকালতি করছেন।

লক্ষ্ণৌ যাওয়ার জন্য আমরা কলিকাতা পৌঁছুলাম। লক্ষ্ণৌয়ের পথে কয়েকজন প্রতিনিধিসহ আমি পাটনায় নেমে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করি। শ্রদ্ধেয় কিশোরী বাবুও এই দলে ছিলেন।

পাটনা থেকে আমরা ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রের এক ট্রেণে রওনা হয়ে পরদিন প্রাতঃকালে মোগলসরাই পৌঁছে পাঞ্জাব মেলের জন্য অপেক্ষা করি। শুনলাম যে, এই মেলে নির্বাচিত সভাপতি ফরিদপুরের প্রবীণ নেতা শ্রীযুক্ত অম্বিক চরণ মজুমদার মহাশয়, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাংলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ আসছেন। পাঞ্জাব মেল অপরাহ্নে মোগলসরাই পৌঁছুবে। যে কয়জন আমরা পাটনা হ'তে এসেছিলাম, তার মধ্যে একমাত্র আমি মধ্যম শ্রেণীর (ইণ্টার ক্লাসের) যাত্রী। অন্যান্য সকলের দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্থ রিজার্ভ করা ছিল। তাঁদের দু'খানি বগি মোগলসরাইতে কেটে রেখে ট্রেণ চলে গেল। আমার জিনিষপত্র তাঁদের এক কামরায় রাখলাম। আমি কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে ইণ্টার ক্লাসে যাচ্ছি জেনে কিশোরীবাবু ক্ষুব্ধ হলেন এবং বললেন যে, কংগ্রেসের প্রতিনিধির পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর নীচের শ্রেণীতে ভ্রমণ করা অশোভনীয়। অত্যন্ত সাদাসিধে অনাড়ম্বর কিশোরী বাবুর মত ব্যক্তির এই মন্তব্যে তৎকালীন কংগ্রেসের আভিজাত্যের একটি চিত্র ফুটে ওঠে। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ির সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ অ্যাটর্ণী, স্বনামধন্য দার্শনিক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অসাধারণ বাগ্মী মনস্বী নেতা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, পাটনা হাইকোর্টের উকিল ও বেহারের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী, অধ্যাপক ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমল হোম প্রভৃতি মহাশয়গণ। এঁদের মধ্যে আমার বিশেষ পরিচিত ছিলেন শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত অমল হোম। অমল আমার ছাত্রজীবনের বন্ধু। ডঃ প্রমথনাথের সঙ্গে অল্প পরিচয় ছিল। পরবর্তীকালে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় দ্বয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসি। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিতও পরিচয় হয়।

জানা গেল যে, নিকটেই একটি ভাল ধর্মশালা আছে। সেখানে স্নান আহারাদির ব্যবস্থা করতে আমরা সকলেই গেলাম, কেবল বিপিনবাবুই গাড়িতে বসে রইলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হ'লেন না। তাঁর খাবার গাড়িতে পাঠাতে বললেন। কে একজন বললেন যে, যদি খাবার গাড়িতে না দিয়ে যায় তখন কি হবে? বিপিনবাবু উত্তর দিলেন, "নারায়ণ যা করেন তাই হবে।" ঘটনাচক্রে বিপিন বাবুকে ষ্টেশনের খাবারেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়েছিল।

বিপিনবাবুকে গাড়িতে রেখে আমরা সকলে ধর্মশালায় গেলাম। কিশোরীবাবু স্নান-আহ্নিক সেরে পেতলের ঘটিতে জল গরম করে চা প্রস্তুত করলেন, নিজে খেলেন, আমাকেও দিলেন।

তারপর আহারের ডাক পড়ল। খাবার ঘরে গিয়ে দেখি বসবার স্থানগুলির চতুর্দিকে সিমেন্ট-নির্মিত গণ্ডী। আমরা যে কয়জন বাঙ্গালী ছিলাম (কংগ্রেসের প্রতিনিধি ছাড়া অন্য বাঙ্গালী যাত্রীও ছিল) তাদের শালপাতায় ভাত ডাল তরকারি পরিবেশন করা হ'ল এবং ঘটিতে পানীয় জল দেওয়া হ'ল। কিন্তু বেহারী ও পশ্চিমাঞ্চলের যাত্রীদের থালায় ভাত, বাটিতে ডাল-তরকারি ও গ্লাসে জল দেওয়া হ'ল। এই না দেখে কয়েকজন বাঙ্গালী চেঁচিয়ে উঠলেন এবং বললেন, হাম লোক কি কুত্তা হ্যায়। হাম লোককো কেঁউ বর্তন নে'হ দিয়া। আমি বললাম যে, আমরা মৎস্য মাংসভোজী, সেজন্য এই দেশে এই ব্যবস্থা। আমার ঠিক পাশেই হীরেনবাবু এবং তাঁর পাশে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ বসেছিলেন।

ধর্মশালা থেকে মোগলসরাই ষ্টেশনে ফিরে এসে আমরা পাঞ্জাব মেলের অপেক্ষায় রইলাম। পাঞ্জাব মেল এলে আমাদের বগি দু'টি তাতে জুড়ে ট্রেণ লক্ষ্ণৌ অভিমুখে রওনা হ'ল। মোগলসরাই ষ্টেশনের কিছু দূরে গঙ্গা পার হবার সময় যখন ট্রেণ পুলের ওপর চড়ল তখন আমি অপর পারে নদী তীরবর্তী বারাণসীর অপূর্ব শোভা সন্দর্শন করে মুগ্ধ হ'লাম। বলা বাহুল্য যে, আমি মোগলসরাইতে ইণ্টার ক্লাসেই উঠেছিলাম। তখনকার দিনে আজকালকার মত লোকের ভীড় না থাকায় গাড়িতে স্থানাভাব ছিল না। কোন কষ্টই হয় নি। সন্ধ্যার পর ট্রেণ লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে পৌছল।

ষ্টেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও অগণিত জনসাধারণ উপস্থিত ছিল। ট্রেণ পৌছামাত্র সভাপতি মহাশয় ও নেতৃবৃন্দকে বিপুল হর্ষধ্বনি দ্বারা সকলে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁদের অভ্যর্থনার পর স্বেচ্ছাসেবকগণের সাহায্যে আমরা বাঙ্গলার প্রতিনিধিগণের জন্য নির্দিষ্ট বাসায় নীত হ'লাম। হীরেন-বাবু, বিপিনবাবু, অমল প্রভৃতি আমাদের সঙ্গে গেলেন না, তাঁহারা অন্যত্র গেলেন। প্রমথবাবু কিশোরী-বাবু ও আমি এক বাসায় উঠলাম এবং একই কক্ষে স্থান পেলাম। ডিসেম্বর মাসের দারুণ শীতে আমাদের দেহ আড়ষ্ট হয়ে উঠছিল। কৃষ্ণনগরের উকিল শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী মহাশয় পূর্ব থেকে ঐ বাসায় ছিলেন। শীতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় তিনি মন্তব্য করলেন যে, "এ আর এমন বেশি কি শীত! কৃষ্ণনগরের শীত এ অপেক্ষা কম নয়।" সন্ধ্যার পর ঘোড়ার নাদ পোড়ান ধোঁয়ায় চতুর্দিক অন্ধকার, একটা বিশ্রী গন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম।

তখনকার দিনে কংগ্রেস অধিবেশনের সময় বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান ও আহারের ব্যবস্থা করা হ'ত এবং আহারের স্থানে জাতি-ভেদও যথাসম্ভব মেনে চলা হ'ত।

বিশ্রামের পর খেতে গিয়ে দেখলাম একটি লম্বা দড়ির আসন বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই আসনে একসঙ্গে বসে সকলকে খেতে হবে। বাল্যকাল থেকে পৃথক্ আসনে বসে খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলাম সুতরাং এই ব্যবস্থায় মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। তার পর যখন ভাত পরিবেশন করতে পাচকের আবির্ভাব হ'ল তখন তাকে দেখে ত চক্ষু চড়কগাছ। মেহেদী রঙে ছোপান ছাঁটা চাপদাড়ি ও ছাঁটা গোফ দেখে তাকে মুসলমান বাবুর্চি বলে ভ্রম হ'ল। আমরা জেনে আশ্বস্ত হ'লাম যে, সে ব্রাহ্মণ এবং সকলে তাকে "মহারাজ" বলে সম্বোধন করছে।

(দুই)

পরদিন ২৬শে ডিসেম্বর বেলা ২টার সময় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হ'ল। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আমরা কংগ্রেস সভামণ্ডপে (প্যাণ্ডেলে) প্রবেশ করে বাংলা দেশের প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করলাম। তখনকার দিনের প্রতিনিধিগণ প্রায় সকলেই কোট প্যাণ্টালুন বা চোগা-চাপকান পরে কংগ্রেসে যেতেন। বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ বহু-বিচিত্র শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করতেন। মস্তকের পাগড়ী বা টুপি দেখে কে কোন্ প্রদেশের অধিবাসী তা সহজেই বোঝা যেত। বাঙ্গালী, উড়িয়া ও আসামীগণ প্রায়

খালি মাথায় যেতেন। আমি গলাবন্ধ সার্জের কোট ও প্যাণ্ট পরে এবং মাথায় একটি "পিরালী" পাগড়ি দিয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেছিলাম। একজন বোম্বাইয়ের প্রতিনিধি আমাকে বললেন যে, মস্তকাবরণ দেখে বোধ হচ্ছে যে, আপনি বাঙ্গালী। লক্ষ্ণৌয়ের দুর্জয় শীতের পক্ষে সার্জের কোট-প্যাণ্টালুন নিতান্তই তুচ্ছ। এর পর উত্তর ভারতের বহু অধিবেশনে যোগদান করেছি। প্যাণ্টালুন আর পরি নি। আলোয়ানে সর্বাঙ্গ মুড়ে থাকার মত আরাম কোট-প্যাণ্টালুনে হয় না।

বৃহৎ প্যাণ্ডেল অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত ছিল। ডায়াসে বা বেদীতে নেতাদের জন্য স্থান সংরক্ষিত ছিল, ডায়াসের পশ্চাৎদিকে নেতাদের বৃহৎ বৃহৎ ছবি টাঙ্গান ছিল। প্রতিনিধিদের জন্য চেয়ার ও দর্শকদের জন্য গ্যালারির ব্যবস্থা ছিল। দীর্ঘ আট বৎসর পরে যুক্ত-প্রদেশে কংগ্রেসের মডারেট ও একষ্ট্রিমিস্ট বা নরম ও গরম দলের যুক্ত অধিবেশন হচ্ছে। বৃহৎ প্যাণ্ডেলের ভিতর তিল ধারণের স্থান ছিল না। সভায় উৎসাহ ও উদ্দীপনার শেষ ছিল না। বহু সংখ্যক মুসলমান প্রতিনিধি ফেজযুক্ত লাল তুর্কী ক্যাপে শোভিত হয়ে সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমি ইতিপূর্বে একসঙ্গে এত অধিক সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমানের সমাবেশ দেখি নি।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতিগণ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ নির্বাচিত সভাপতি প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করলেন। বিপুল হর্ষধ্বনি ও 'বন্দে-মাতরম্" ধ্বনি দ্বারা সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শক সভাপতি মহাশয়কে অভ্যর্থনা জানাল।

সর্বপ্রথমে বাঙ্গালী মহিলাবৃন্দ কর্তৃক "বন্দে মাতরম" সঙ্গীত গীত হওয়ার পর স্থানীয় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ দ্বারা হিন্দী সঙ্গীত গীত হ'ল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করার কথা ছিল ১৯১১ সালের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিষণনারায়ণ দর মহাশয়ের। কিন্তু তাঁর অকস্মাৎ পরলোকগমনে উক্ত পদে নির্বাচিত হয় লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ আইনজীবী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগৎ-নারায়ণ মহাশয়। তিনি তাঁর অভিভাষণে পরলোকগত নেতাদের জন্য শোক প্রকাশ করলেন এবং স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন যে, অদূর-দর্শিতার ফলে মুসলমানগণ পৃথকভাবে তাঁদের স্বার্থের জন্য আন্দোলন করত। সেই অদূরদর্শিতা এখন চিরকালের তরে লোপ পেয়েছে এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক রচিত স্বায়ত্ত শাসনের পরিকল্পনার ফলে দেশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিরোধের অবসান হবে। হায়, কি দুরাশা!

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণের পর সর্ব-জনবরেণ্য রাষ্ট্রগুরু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর অনির্বচনীয় ভাষায় সভাপতির নির্বাচন প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করলেন বিদর্ভের (বেরারের) সুপ্রসিদ্ধ নেতা মাননীয় শ্রীযুক্ত আর. এন. মুধোলকর, বোম্বাই হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবী শ্রীযুক্ত চিমনলাল শীতলবাদ (পরবর্তী কালে স্যর উপাধিপ্রাপ্ত) এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর এল., এ, গোবিন্দ রাঘব আয়ার মহাশয়গণ।

যথারীতি নির্বাচিত হয়ে সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করলেন। দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু শোভিত চোগা-চাপকান ও পাগড়ি পরিহিত বৃদ্ধ সৌম্যদর্শন সভাপতি মহাশয় সকলের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক কর্তৃক কতকগুলি চিঠি-পত্র পঠিত হওয়ার পর সভাপতি মহাশয় তাঁর অভিভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। সুরেন্দ্রনাথ পুণা কংগ্রেসের সভাপতি-রূপে তাঁর ছাপা অভিভাষণ সম্পূর্ণ মুখস্ত বলেছিলেন। বর্তমান সভাপতি তাঁর পরমবন্ধু ও সহকর্মী সুরেন্দ্রনাথের অনুকরণে তাঁর মুদ্রিত অভিভাষণের মুখবন্ধটি মাত্র মুখস্ত বলে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু মহাশয়কে অভিভাষণ পাঠ করতে আহ্বান করলেন। হৃদয়নাথকে তিনি Chip of an old block, Son of Pandit Ayodhanath" বলে বর্ণনা করলেন। পণ্ডিত কুঞ্জরু সভাপতির সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করলেন, কেবল শেষাংশ পুনরায় সভা-পতি মহাশয় দাঁড়িয়ে মুখস্ত বললেন।

অভিভাষণ-অন্তে সভাপতি মহাশয় বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণকে স্ব স্ব প্রদেশ থেকে বিষয় নির্বাচনী সভার সভ্য নির্বাচন করতে নির্দেশ দিলেন। ভূতপূর্ব সভাপতি-গণ ও অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভ্যগণ তাঁদের পদগৌরবে বিষয় নির্বাচনী সভার সভ্য। বিভিন্ন প্রদেশের জন্য প্রতিনিধি দ্বারা নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল। বাংলা দেশের অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্যের সংখ্যা ছিল ২০। নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যাও ২০ ছিল।

বাংলা দেশের প্রতিনিধিগণকে প্যাণ্ডেলের বাইরে মিলিত হয়ে বিষয় নির্বাচনী সভার সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হ'ল। উক্ত ঘোষণার পরই সেদিনের

মত কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন শেষ হ'ল, তৎপর সভাপতি মহাশয় ও সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ বাংলার নেতৃবৃন্দ দৃপ্ত পদক্ষেপে বাংলার প্রতিনিধিদিগের প্রতি দৃকপাতমাত্র না করে সভামণ্ডপ ত্যাগ করে চলে গেলেন। তাঁদেরও যে উক্ত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার দায়িত্ব আছে, তা তাঁরা মনেও করলেন না।

বাংলা দেশের তিনজন ভূতপূর্ব সভাপতি উপস্থিত ছিলেন, যথা শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর রাসবিহারী ঘোষ ও শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়গণ। অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির যে ২০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন তাঁদের নাম এখানে লিপিবদ্ধ হ'ল। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার নীলরতন সরকার (পরবর্তী কালে স্যর উপাধিভূষিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য), শ্রী এ. রসুল (প্রসিদ্ধ স্বদেশী নেতা আবদুল রসুল, কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও বঙ্গীয় আইন সভার সভ্য), শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র (সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশী নেতা ও 'সঞ্জীবনী'র সম্পাদক), শ্রী জে. চৌধুরী (যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার, কলিকাতা উইকলি নোটসের সম্পাদক, শ্রীআশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের ভ্রাতা ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা), শ্রীরমণীমোহন দাস (বঙ্গীয় আইন সভার সভ্য), শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র রায় (প্রসিদ্ধ সাংবাদিক), শ্রীবসন্তকুমার বসু (কলিকাতা হাইকোর্টের নামজাদা উকিল), ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যারিষ্টার ও অধ্যাপক—পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিণ্টো প্রফেসর), শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপক), শ্রীললিতমোহন দাস (অধ্যাপক), শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মিত্র (কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল, পরবর্তীকালে বাংলা গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী ও স্যর উপাধিপ্রাপ্ত), শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক (কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল, আলিপুর বারের বিখ্যাত আইনজীবী, পরবর্তীকালে লণ্ডনস্থ ভারত সচিবের অন্যতম সদস্য, বাংলার ছোটলাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য, ইত্যাদি), শ্রীসত্যানন্দ বসু (নানাপ্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত), শ্রীকৃষ্ণদাস রায় (ফরিদপুরের জমিদার), শ্রীকিশোরীমোহন চৌধুরী, শ্রী জি. আর. দে, শ্রী আই. বি. সেন (ইন্দুভূষণ সেন, কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার), শ্রী বি. কে লাহিড়ী, (বসন্তকুমার লাহিড়ী, কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার),রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রী ডি. সি. ঘোষ (কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও পরবর্তীকালে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ট্রাইবুনালের সভাপতি) মহাশয়গণ।

আমরা বাংলার কতকগুলি প্রতিনিধি প্যাণ্ডেলের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অতি অল্প সময়ের মধ্যে ২০ জন বিষয় নির্বাচনী সভার সভ্য নির্বাচন করলাম, তার মধ্যে আমিও নির্বাচিত হ'লাম। নির্বাচিত সভ্যদের নাম দেওয়া গেল:—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বল (ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক), শ্রী বি. সি চ্যাটার্জি (বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম জামাতা), শ্রীমনমোহন নিয়োগী (ময়মনসিংহের উকিল), শ্রীরজনীকান্ত দে (কুমিল্লার উকিল), শ্রীকামিনীকুমার চন্দ (শিলচরের প্রসিদ্ধ নেতা, শিলচরের খ্যাতনামা আইনজীবী ও বড়লাটের আইন সভার সদস্য), শ্রীপূর্ণচন্দ্র মৈত্র (ফরিদপুরের বিখ্যাত উকিল), শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু (আলিপুর কোর্টের উকিল), শ্রীইন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্য, শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল, শ্রীনন্দগোপাল ভাদুড়ী, শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ (মালদহের উকিল), শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন (খুলনার উকিল), শ্রীহরিনাথ ঘোষ (বরিশালের উকিল), শ্রীপ্রিয়নাথ সেন ('ঢাকা হেরাল্ড' পত্রিকার সম্পাদক), শ্রীআবদুল কাসেম (বিখ্যাত স্বদেশী আন্দোলনের নেতা, বাগ্মী, সাংবাদিক ও বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য), শ্রীরমেশচন্দ্র সেন (ময়মনসিংহের উকিল), শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রী এইচ্. কে. ঘোষ (নোয়াখালীবাসী লক্ষ্ণৌয়ের ব্যারিষ্টার) ও শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঢাকার উকিল ও খ্যাতনামা নেতা) মহাশয়গণ।

উপরোক্ত বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভ্য নিবাচনের পর ফিরবার পথে হঠাৎ প্যাণ্ডেলের অভ্যন্তরে নজর গেল। বিস্মিত হয়ে দেখলাম যে, প্যাণ্ডেলের এক অংশে একটি নাতি বৃহৎ সভা বসেছে। কৌতূহলী হয়ে ভিতরে ঢুকে লক্ষ্য করলাম্ যে মাদ্রাজের সমস্ত প্রতিনিধিগণ বিষয় সমিতির সভ্য নির্বাচনের জন্য সকলে মিলিত হয়েছেন, ২১ জন নেতা ছাড়া মাদ্রাজের সমস্ত প্রতিনিধিই উপস্থিত ছিলেন। রীতিমত শৃঙ্খলার সহিত সভার কার্য পরিচালিত হচ্ছিল। মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল ও মাদ্রাজ আইন সভার সদস্য মাননীয় শ্রী বি. এন. শর্মাকে (পরবর্তীকালে স্যর উপাধিভূষিত ও বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বর) সভাপতি বরণ করে সভার কার্য আরম্ভ হ'ল। ভোট দ্বারা কোন্ বিভাগে কতজন সভ্য নির্বাচিত হবে প্রথমে স্থির করা

হ'ল। পরে সেই প্রথায় সভ্যগণ নির্বাচিত হ'ল। বাংলার ও মাদ্রাজের প্রতিনিধিগণের দায়িত্ব ও কার্যক্রমের প্রভেদ লক্ষ্য ক'লাম। এর পর বাসায় ফরে সেদিনকার মত বিশ্রাম নিলাম।

[তিন]

তৎপরদিন অর্থাৎ ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন হয় নি। সেদিন বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বেলা ১২॥ টার সময় উক্ত সমিতির অধিবেশন সুরু হ'ল তখনকার দিনে বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনে কোন দর্শক বা সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের প্রবেশাধিকার ছিল না। এই প্রথা খুব ভাল ছিল। পরে বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভাও ছোটখাটো কংগ্রেসের অধিবেশনে পরিণত হয়।

একটি সুদীর্ঘ লম্বা টেবিলের সম্মুখে মধ্যস্থলে সভাপতি মহাশয় এবং তাঁর দু'পাশে অন্যান্য বিশিষ্ট নেতাগণ আসন গ্রহণ করলেন। তাঁদের সম্মুখে অন্যান্য সভ্যগণ উপবিষ্ট হ'লেন। সকলের বসবার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল। পরদিনের অধিবেশনে যে-সকল প্রস্তাব উপস্থিত করা হবে সেগুলি আলোচনা দ্বারা স্থির হ'ল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নিযুক্ত কমিটি কলিকাতায় গত নবেম্বর মাসে সুরেন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বে স্বায়ত্ত শাসনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। উক্ত পরিকল্পনাটি মুদ্রিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভা শেষ হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক সভ্যের হাতে একখানি করে পুস্তিকা দেওয়া হ'ল, যাতে তাঁরা পরিকল্পনাটি পড়ে পরবর্তী নির্বাচনী সমিতির সভায় আলোচনা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসতে পারেন। আমরা বাংলার প্রতিনিধিগণ সেগুলি সযত্নে পকেটস্থ করে পরমানন্দে লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ ইমামবাড়া, ভুলভুলাইয়া, ছত্রমঞ্জিল, শাহনজফ্, অযোধ্যার নবাবগণের চিত্রশালা, বেলিগার্ড প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দেখে বেড়াতে লাগলাম। পরিকল্পনাটি পড়ার আর অবসর পাওয়া গেল না।

এই কংগ্রেসেই পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মহাশয়কে প্রথম দেখলাম। তিনি তখন প্রায় আমার সমান বয়স্ক, তরুণ যুবক, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুশ্রী চেহারা। তিনি তখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। তাঁকে অনন্যসাধারণ বাগ্মী, থিয়োসফিকাল সোসাইটির সভানেত্রী ভারতের সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণা সর্বজনশ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত মহোদয়ার সান্নিধ্যেই বেশী দেখা গেল। জওহরলালজী তখন বেসান্ত মহোদয়ার "হোমরুল লীগের" সদস্য। তাঁর সৌখীনতা ও বাবুগিরিও আমাদের নজরে পড়ল। ক্ষণে ক্ষণে তিনি বেশ পরিবর্তন করতেন। এই তাঁকে কোট-প্যাণ্ট-টাই শোভিত সাহেব মূর্তিতে দেখা গেল—পরক্ষণেই তাঁকে ধবধবে সাদা চুড়িদার পায়জামা ও শেরওয়ানী পরিহিত ও মাথায় কিস্তি টুপি শোভিত অবস্থায় দেখা গেল। নেহরু-পরিবারের বিলাসিতা তখন দেশের আলোচ্য বিষয় ছিল।

এই কংগ্রেসে যত অধিক সংখ্যক মুসলমান প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন ইতিপূর্বে কোন অধিবেশনে তত সংখ্যক মুসলমান যোগদান করেন নি। তখনকার দিনের জাতীয়তাবাদী নেতা শ্রীমহম্মদ আলি জিন্নার চেষ্টায় মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের অধিবেশন একই স্থানে, একই সময়ে হ'তে আরম্ভ হয়। এবার লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় জিন্না সাহেবের সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌয়ে প্রসিদ্ধ কৈসরীবাগের একটি হলে মুসলিম লীগের অধিবেশন হয়।

[চার]

২৮শে ডিসেম্বর বেলা ১১টার সময় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হ'ল। যথারীতি বঙ্গীয় মহিলাগণ কর্তৃক "বন্দেমাতরম্" ও স্থানীয় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক জাতীয় সঙ্গীত গীত হ'ল।

সভা আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পরে যুক্তপ্রদেশের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যর জেমস মেষ্টন লেডী মেষ্টন ও অন্যান্য অনুচরগণ সমভিব্যাহারে কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করলেন। সমবেত জনতা দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে হর্ষধ্বনি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করল।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সভাপতি মহাশয় স্যর জেমস মেষ্টনকে অভ্যর্থনা করে একটি ভাষণ দিলেন। তাহাকে তিনি বললেন যে, কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে স্যর উইলিয়াম ওয়েডারবর্ণ, প্রফেসর ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি ইংরাজ রাজপুরুষগণ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনের সময় বড় লাট লর্ড ডাফরিণের নিকট সভাপতি শ্রীদাদাভাই নৌরজী মহাশয়ের নেতৃত্বে একটি ডেপুটেশন উপস্থিত হয় এবং তৃতীয় অধিবেশনের সময় মাদ্রাজের ছোট লাট লর্ড কোনেমারা সমুদয় প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করেন। তার পর দীর্ঘকাল কংগ্রেস রাজপুরুষগণের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত ছিল। এর পর ১৯১৪ সালে লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড (মাদ্রাজের গভর্ণর) কংগ্রেসে উপস্থিত হন এবং আজ পুনরায় ছোট লাট কংগ্রেসে উপস্থিত হয়ে সকলকে ধন্য করলেন। সভাপতি মহাশয়

আশা করেন যে, ছোট লাট সাহেব জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন।

লাট সাহেব প্রত্যুত্তরে বললেন যে, কংগ্রেস ও তাঁর মধ্যে একটি আশ্চর্য্যজনক যোগাযোগ আছে। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম হয় এবং ঐ সালেই তিনি ভারতের সেবায় নিযুক্ত হন। এই সুদীর্ঘ ৩১ বৎসর তিনি সহানুভূতির সহিত এই বিরাট আন্দোলনের গতি নিরীক্ষণ করেছেন কিন্তু এই প্রথম তিনি কংগ্রেসে দর্শকরূপে উপস্থিত হ'লেন। তাঁর অপ্রত্যাশিত অভিনন্দনের জন্য তিনি সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

তৎপর পণ্ডিত বিষণনারায়ণ দর, শ্রীসুব্রহ্মণ্য আয়ার ও শ্রীদাজী আবাজী খারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হ'ল। লর্ড কিচনারের মৃত্যুর জন্যও কংগ্রেস শোক প্রকাশ করল।

শোক প্রকাশের পর সভাপতি মহাশয় ভারত সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের (loyalty) প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। মাননীয় পণ্ডিত গোকরণ নাথ মিশ্র কর্তৃক ঘোষিত (লক্ষ্ণৌ চীফ কোর্টের উকিল, যুক্তপ্রদেশের আইন সভার সদস্য এবং পরবর্তীকালে লক্ষ্ণৌ চীফ কোর্টের জজ) "থ্রি চিয়ার্স ফর হিজ ম্যাজেষ্টি দি কিং এম্পারার—হিপ্ হিপ্ হুরে" ধ্বনির মধ্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হ'ল।

এর পর অস্ত্র আইন (Arms Act) রদ করে ভারতবাসীগণকে অস্ত্র ধারণের ক্ষমতা প্রদান করার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করলেন যুক্তপ্রদেশের আইন সভার সদস্য মোরাদাবাদের উকিল শ্রীরাধাকিষণদাস মহাশয়। কয়েকজন প্রতিনিধি কর্তৃক প্রস্তাবটি সমর্থিত হওয়ার পর বাংলা দেশের পক্ষ থেকে শ্রীবসন্তকুমার লাহিড়ী প্রস্তাব সমর্থন করলেন। এর পর প্রস্তাব সমর্থন করতে দাঁড়ালেন সুপ্রসিদ্ধা কবি কোকিলাকণ্ঠী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু মহাশয়া। তিনি তাঁর অনির্বচনীয় ভাষায় ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে Your Honour, President and unarmed citizens of India" সম্বোধন করে অতি সুন্দর ভাষণ দিলেন। বাল্যকাল থেকে শ্রীমতী সরোজনী নাইডুর নাম শুনে আসছি, আজ তাঁকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। সরোজিনী দেবী তখন তন্বী ছিলেন, পরবর্তীকালের মত তাঁর মেদবহুল বিশাল বপু ছিল না। তাঁর বক্তৃতা সভাস্থ সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনছিল।

প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর স্যর জেমস ও লেডী মেষ্টন প্ল্যাটফরমে উপবিষ্ট বিশিষ্ট নেতাদের সহিত করমর্দন করে সদলবলে কংগ্রেস মণ্ডপ পরিত্যাগ করলেন। তাঁর প্রস্থানের সময় ১৯১১ সালের অধিবেশনের স্বাগত শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "থ্রি চিয়ার্স ফর স্যর জেমস এণ্ড লেডী মেষ্ট —হিপ হিপ্ হুরে, হিপ্ হিপ্ হুরে" আওয়াজ তুললেন এবং বহু প্রতিনিধি সেই আওয়াজে যোগ দিলেন।

পরবর্তী প্রস্তাবে ভারতীয়গণকে স্বেচ্ছাবাহিনীতে যোগদান ও সৈন্যবাহিনীতে অফিসার নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করতে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হ'ল। বাংলা দেশের প্রতিনিধি শ্রী বি. সি. চ্যাটার্জি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

এর পর সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন (Press Act) রদ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রী সি. পি. রামস্বামী আয়ার। তিনি সুবক্তা ও পণ্ডিত। একটি তথ্যপূর্ণ ভাষণ দিয়ে প্রেস অ্যাক্টের বিষময় ফল শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত করলেন। অন্যান্য কয়েকজন প্রতিনিধি দ্বারা সমর্থিত হওয়ার পর "বোম্বে ক্রনিকেলের" সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রী বি. জি. হার্ণিম্যান প্রস্তাব সমর্থন করতে দাঁড়ালেন। তিনি জাতিতে ইংরাজ কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের সহিত যুক্ত হয়ে ভারতের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা নিজের করে নিয়েছিলেন এবং খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি বেশ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে প্রস্তাব সমর্থন করলেন। প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

এর পর চুক্তিবদ্ধ মজুর নিয়োগ (Indentured Labour) সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করতে উঠলেন সর্বজনবরেণ্য শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মহাশয়। যদিও তখন তিনি মহাত্মারূপে দেশবাসীর নিকট পরিচিত হন নি; তথাপি দক্ষিণ আফ্রিকার কৃতকার্য্যের জন্য তাঁর খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দেশবাসীর হৃদয়ে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১৯১৪ সালে যখন তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর রাজনৈতিক গুরু পরলোকগত মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয় তাঁকে এক বৎসরকাল দেশ পর্যটন করে দেশের অবস্থা সবিশেষ জ্ঞাত হওয়ার পর রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে উপদেশ দেন। গান্ধীজী মহামতি গোখলের উপদেশ পালন করে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই প্রথম আমি গান্ধীজীকে দর্শন করলাম। পরিধানে ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবীর মত একটি জামা, তার উপর

একখানি চাদর পৈতার ন্যায় লম্বমান, মাথায় কাঠি-ওয়াড়ী পাগড়ি ও পায়ে চপ্পল। এইভাবে সজ্জিত হয়ে তিনি মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হ'লেন। সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দ বিপুল জয়ধ্বনি দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করল এবং 'হিন্দী হিন্দী' রব উঠতে লাগল অর্থাৎ উত্তর ভারতের অনেকে তাঁকে হিন্দীতে অভিভাষণ দিতে বলল। তিনি বক্তৃতার প্রারম্ভে বললেন যে, তামিল ভ্রাতাগণ তাঁকে ইংরাজীতে ভাষণ দিতে অনুরোধ করেছেন। তাঁদের অনুরোধ অংশতঃ মেনে নিয়ে তিনি তাঁদেরকে (তামিল ভ্রাতাগণকে) একটি পাল্টা অনুরোধ করছেন। তিনি বললেন যে, আগামী বৎসরের মধ্যে যদি তাঁরা (তামিল-গণ lingua franca (হিন্দী) না শিখেন তা হ'লে অন্তত তাঁর (গান্ধীজির) সম্বন্ধে তাদের বিপদ হবে, কারণ তিনি জানেন যে যখন ভারতকে স্বরাজ দেওয়া হবে তখন হিন্দীই হবে ভারতের lingua franca (১)। গান্ধীজি প্রথমে ইংরাজীতে বলে পরে হিন্দীতে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন।

মাদ্রাজের হাইকোর্টের উকিল ও মাদ্রাজ আইন সভার সদস্য মাননীয় এম্. রামচন্দ্র রাও মহাশয় প্রস্তাব সমর্থন করেন। এই রামচন্দ্র রাও মহাশয়ই রামানু-জমের মধ্যে অঙ্ক শাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভা আবিষ্কার করেন এবং তাঁর এফ. আর. এস্. হওয়ার পথ সুগম করে দেন। প্রস্তাব যথারীতি পাশ হ'ল।

তৎপরে উপনিবেশের ভারতবাসী সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সহকর্মী ও শিষ্য ইংরাজ ইহুদী শ্রী এইচ. এস. এল্. পোলক মহাশয়। সুদীর্ঘ অভিভাষণ দ্বারা তিনি ব্রিটিশ উপ-নিবেশসমূহে বিশেষতঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী-দের দুর্দশা সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। প্রস্তাব সমর্থন করলেন মাদ্রাজের "ইণ্ডিয়ান রিভিউয়ের" বিখ্যাত সম্পাদক শ্রী জি. এ. নটেশন মহাশয়। আরও কয়েক জনের সমর্থনের পর প্রস্তাব গৃহীত হল।

এর পর বেহারের তৎকালীন অন্যতম নেতা বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ মহাশয় বেহারের য়ুরোপীয় প্ল্যানটার ও রায়তের সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করে উত্তর বেহারে রায়তের উপর প্ল্যাণ্টারগণের অমানুষিক অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করলেন। বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ হিন্দীতে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাবু ও আমি একই বৎসরে, একই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে এম্.এ. পাশ করি। পরে শ্রীকৃষ্ণ বাবু বেহারের মুখ্যমন্ত্রী হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রস্তাবটি আরও সমর্থিত হয়ে গৃহীত হ'ল।

তার পর এ দিনের মত কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হ'ল।

রৌদ্রের দাক্ষিণ্য আর

চিত্রভানু

রৌদ্রের দাক্ষিণ্য আর জলের সান্ত্বনা অকৃপণ
কোনো দিন হয় নি অভাব, তবু মানুষের মন
সুখের অভাবে কৃশ, আনন্দের কৃচ্ছ্রতায় দীন।
হায় সে খুঁজেছে সুখ মানুষের হাটে প্রতিদিন
কেনা বেচা পণ্যের নিয়মে; সে যে মূঢ়, ভুল তাই
বিশ্বের আনন্দযজ্ঞে দানমুক্ত ধারা, খোঁজে নাই
সহজের অক্ষয় অঞ্জলি, নিত্য যাচা প্রসারিত
তারই চিত্ত তরে, ধুলিক্লিন্ন প্রত্যহের অগণিত
প্রয়োজন ধূলিজালে চিত্ত তার করেছে মলিন,
তাই সে মালিন্যমুগ্ধ অসুস্থ কোটরে অবলীন,
মর্ত্ত্য মানুষের দ্বারে ব্যর্থ করে স্বর্গের আহ্বান
পায়ে তার মুক্তিহীন সময়ের শিকলের টান;
তবু যে-মুক্তির ডাক আকাশে আলোকে জলে বাজে
কোলাহল পরিশ্রান্ত চিত্ত তার তা-ও শোনে না যে।

শীত আসে

কৃতান্তনাথ বাগচী

শীত আসে সীমাহীন বিস্মৃতির মত
ধূসর কুয়াশা নিয়ে দিগন্তের মনে,
কোথাও পাবে না খুঁজে স্বর্ণপদ্মক্ষত
শারদ-রৌদ্রের-সিংহ-নখরিত বনে।
শূন্য প্রান্তরের প্রান্তে অবসন্ন দিন
বিষণ্ণ আলোর শব্দ বয়ে চলে ধীরে,
বকের ডানার রেশ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ,
একটি নিঃসঙ্গ ছায়া ধরণীর তীরে।
তবু জীর্ণ পাতাদের মৃত্যুর উৎসবে
চিরপরিচিত ধূলি রঙের মাতাল,
শীতহারা অরণ্যের স্তব্ধতার স্তবে
দেখিবে তারার স্বপ্ন রাত্রির পাতাল।
শীত আসে, যত চোখে ছিল যত জল
নিভৃত সঞ্চয় তার পথের সম্বল।

ইডেন উদ্যানে সন্ধ্যা

সন্তোষকুমার অধিকারী

সব আলো ম্লান হ'লে অন্ধকার যেন পরিস্ফুট।
দীর্ঘ নীলদেহ তরু অপসৃত, প্রহরী ছায়ার
চরণে বিস্তৃত এক তৃণার্দ্র প্রান্তর;
একটি নির্জন হাত
স্থির হয়ে প'ড়ে থাকে অবসন্ন শিথিল দু'হাতে।

মসীলিপ্ত জলরেখা প্রসারিত ছায়ার মতন।
অরণ্য নিবিড় মনে অন্ধকার,
থরথর কাঁপে বিন্দু সঙ্কীর্ণ আলোতে।
একটি নিঃসঙ্গ তাল বিষণ্ণ বিজন বেদনায়
ছুঁয়ে থাকে জলের হৃদয়,
একটি নিঃশব্দ হাত আমার দু'হাতে।

অনেক মুহূর্ত কাঁপে—কাঁপে দু'টি স্পন্দিত হৃদয়
এখ-ই ছিল যে মগ্ন হৃদয়ের অমেয় দীপ্তিতে—
এখনই সে বহুদূর—অতিক্রান্ত শতাব্দীর পথ।
স্মৃতির গাঢ়তা শুধু হানে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার অংস
অন্ধকার কাঁপে চারধারে।

চোখ তোলো বনলতা, আলো দাও, দাও
তোমার দু'হাত এই হাতে;
বলো, এই অন্ধকার সত্য নয়,
ম্লান নয় শূন্যতার মত।
বলো, এই মুহূর্ত আমার মিথ্যা নয়।
ইডেন উদ্যানে সন্ধ্যা স্তব্ধ অন্ধকারে;
বনলতা,
হৃদয়ের স্পর্শ দাও, দাও
দু'হাত আমার দুই হাতে।

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

দুর্গাপুরে চতুর্থ পরিকল্পনা

দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের গত বার্ষিক অধিবেশনে ক্ষমতাসীন দলের উচ্চতম অধিকারীদের মধ্যে আগামী চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে দুইটি বিভিন্ন এবং মূলতঃ পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া গেল। একদিকে কংগ্রেসপতি শ্রীকামরাজ বলেন যে, বর্তমান প্রচণ্ড মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ২১.৫০০ থেকে ২২,৫০০ কোটি টাকা লগ্নীর পরিকল্পনা ভয়াবহ রকমের অতি বৃহৎ বলে তিনি মনে করেন এবং সেই কারণে উক্ত পরিকল্পনার জন্য লগ্নীর পরিমাণ উপযুক্ত ভাবে কমিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা দরিদ্র এবং দুর্বল শ্রেণীর দেশবাসীর উপরে যে প্রচণ্ড চাপ বর্তাইয়াছে, তার ফলে প্রস্তাবিত ২১,৫০০ কোটি টাকার লগ্নী তাহাদিগকে আরও দুর্বল ও দারিদ্র্যভার-প্রপীড়িত করে তুলবে। এই প্রস্তাবিত লগ্নী কার্যকরী করতে হ'লে যে অতিরিক্ত ৩০০০ কোটি টাকার বরাদ্দের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে করতে হবে, তার দায় বহন করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। এ সকল কারণে চতুর্থ পরিকল্পনার লগ্নীর আয়োজন উপযুক্তভাবে কমিয়ে আনা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

অপর পক্ষে কংগ্রেসের চিরাচরিত এবং বিরোধহীন ভাবে গৃহীত আর্থিক ও সামাজিক আদর্শ সম্পর্কিত প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, "আর্থিক উন্নয়নের গতিবৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন" এবং 'দূরদর্শী আর্থিক ও সামাজিক নীতির অনুসরণে বৃহত্তর চতুর্থ পরিকল্পনাকে রূপদান করতেই হবে।" এই দুইটি বিভিন্ন ও স্পষ্টত পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তির যে প্রকাশ দেখা গেল তাতে আশঙ্কা হয় যে, এই বিষয়ে কংগ্রেসের উচ্চতম অধিকারীগোষ্ঠীর পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধান ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়ে চলেছে। এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য এই যে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী কংগ্রেস সভাপতির দৃষ্টিভঙ্গির স্বপক্ষে রায় দেন। এর ফলে সম্ভবতঃ এই বিষয়ে নেতৃগোষ্ঠীর উচ্চতম পর্যায়ে খানিকটা পরিমাণে পুনর্বিবেচনার একটা আবহাওয়া ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী যে ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা কমিশনকে এই বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করবার আবেদন জানিয়েছেন, তাতে এই ধারণাই বদ্ধমূল করে। সম্ভবতঃ শীঘ্রই এখন জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের (National Development Council) একটি সভা আহূত হবে এবং সম্প্রতিকার উচ্চতম পর্যায়ের আলোচনার ফলে যে দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়েছে তাহারই অনুসরণে চতুর্থ পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাসের আয়োজন হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য প্রস্তাবিত ২১,৫০০ কোটি টাকার লগ্নী বাস্তবপক্ষে যতটা অতিবৃহৎ মনে করা হয় ততটায় দাঁড়ায় না। সরকারী হিসাবে দেখা যায় যে,১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৩ ৬৪ সনের অন্তর্বর্তী কালে দেশে মোটামুটি মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ (পাইকারী) হয়েছে শতকরা ২৫'৪ টাকা, কিন্তু খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ হয়েছে শতকরা ৪৪'৪ টাকা। এই দুইটি অঙ্কের অন্তর্বর্তী সংখ্যাটিকে যদি মূল্যবৃদ্ধির বাস্তব পরিমাণ বলে ধরে নেওয়া যায় তবে ১৯৬০ ৬১ সনের তুলনায় মোটামুটি মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় এখন শতকরা প্রায় ৩৫ টাকা। অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সনের মূল্যের ভিত্তিতে চতুর্থ পরিকল্পনার লগ্নীর ২১,৫০০ কোটি টাকার বাস্তব মূল্য দাঁড়ায় মোটামুটি ১৩,৯৭৫ কোটি টাকার মতন। এই হিসাবের ভিত্তিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, চতুর্থ পরিকল্পনার প্রস্তাবিত লগ্নীর পরিমাণ বাস্তবপক্ষে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার মোট লগ্নীর চেয়ে বেশী ত নয়ই, বরং তার চেয়ে অনেক কম। তা ছাড়া বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির আবহাওয়ায় লগ্নীর আর্থিক (financial) পরিমাণের সামান্য কম-বেশী হওয়া না হওয়া খুব একটা বেশী সুবিধা বা অসুবিধা সৃষ্টি করবার কথা নয়।

আসলে সমাজের যে দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর কল্যাণের জন্য শ্রীকামরাজ স্বল্পতর লগ্নীর ভিত্তিতে চতুর্থ পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাসের দাবি জানিয়েছেন সে বিষয়টিই বিবেচনা করা যাক। দেশের আর্থিক অবস্থা যে আজ একটা সঙ্কটজনক পরিণতিতে এসে পৌঁছেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। মূল্যমান ক্রমাগতই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে বিশেষ করে খাদ্য-পণ্যাদি এবং অন্যান্য অবশ্যভোগ্যাদির ক্ষেত্রে এর চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এই সম্পর্কে সময়োচিত প্রয়োগ ব্যবস্থা

অবলম্বন করতে পারলে বর্তমান সঙ্কটের অনেকটাই এড়িয়ে চলা সম্ভব ছিল। আমাদের দেশের কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ যে বছরে বছরে বদলায়, এ তথ্যটি আজকেই হঠাৎ আমাদের উপলব্ধিতে ধরা দেয় নি। এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন যে আশানুরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল না, এ কথাও হঠাৎ জানতে পারা যায় নি। তা ছাড়া প্রতি বৎসর দ্রুতগতিতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং কর্মসংস্থানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বৎসরই যে খাদ্য ব্যয় বেড়ে চলবে এ কথাটা আগে থেকে উপলব্ধি করবার জন্য খুব একটা অসাধারণ বুদ্ধি বা কল্পনাশক্তিরও প্রয়োজন হবার কথা নয়। তার ওপর গত দু'বছরের বাজেটে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে প্রভূত পরিমাণ অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের ফলে সঙ্কট আরও জটিল হয়ে উঠেছে। যাঁরা খুব জোর গলায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, প্রতিরক্ষা ও উন্নয়ন পারস্পরিক পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা একটা সুসমঞ্জস স্বয়ংক্রিয় গতির সৃষ্টি করবে, তাঁরা যে কেবলমাত্র দেশপ্রেমের উত্তেজনায়ই এ-রকমটা ভেবে নিয়েছিলেন এখন তারও প্রমাণের অভাব নেই।

অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রভূত উদাহরণ পাওয়া যাবে যে, কোন কোন আপাতঃ-ফলপ্রসূ প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই মূল রোগটির চেয়েও বিষময় ফল প্রসব করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই রোগের চিকিৎসা বলে যা প্রয়োগ করা হয় তাতে কোন ফলই বর্তায় না, যদিও এর দ্বারা গোষ্ঠী-বিশেষের কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভূত লাভ হয়ে থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে যে নূতন মূল্যায়নের প্রয়াস করা হয়েছিল তারই ফল তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পরিবহন, বিদ্যুৎ-শক্তি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সঙ্কুচিতপথ (bottleneck) রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যে বৈদেশিকী মুদ্রার সঙ্কট দেখা দেয় সেটা প্রথম পরিকল্পনা-কালে কর্মসংস্থান-সঙ্কটের সমাধানকল্পে যে প্রয়োগ গৃহীত হয় তারই ফল। বর্তমান মূল্যসঙ্কট মোচনকল্পে যাঁরা অতি দ্রুত কিছু-একটা প্রয়োগ-ব্যবস্থা করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন তাঁদের অতীতের এই সকল উদাহরণের দিকে দৃষ্টি দেবার সময় বা ধৈর্য নেই বলেই মনে হয়।

চাহিদা কমিয়ে মূল্যবৃদ্ধি দুই সপ্তাহের মধ্যে নিরোধ করবার খেলায় মজা পাওয়া যেতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এটা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে জীবনধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় অবশ্যভোগ্য সাধারণ পণ্যাদির বেলায় এটা আরও অসম্ভব। কিন্তু বর্তমানের চাহিদা বৃদ্ধির ধারা সংযত করতে হ'লে ঠিক এখানটাতেই আঘাত করা একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ ভোগ্য আয়ের পরিমাণ সঙ্কুচিত করতে পারলেই কেবল এটা সম্ভব করা যেতে পারে এবং তা করতে গেলে বিশেষ ক'রে নিম্ন আয়মানের ক্ষেত্রেই এই ভোগ্য আয় কমান একান্তই জরুরী। এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে সঙ্কোচন সম্ভব হ'লেই তবে চাউল, অন্যান্য খাদ্যপণ্য, বস্ত্র ও অনুরূপ অন্যান্য অবশ্যভোগ্যাদির চাহিদা সঙ্কোচ করা সম্ভব হ'তে পারে।

অন্যপক্ষে এই তত্ত্বটিও বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির চাহিদা কমান, নিম্ন আয়ের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সঙ্কোচ করতে না পারলে সম্ভব হবে না। অন্যথায় মজুরের মজুরীর হার কমিয়েও তা করা সম্ভব হ'তে পারে। মূল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে সকল আন্দোলন ও আলোচনা সাধারণতঃ হয়ে থাকে তাতে একটা মূল বিষয়ের প্রতি ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যায়। সেটি এই যে, নিম্নতম মানের আয়ের একটা প্রশস্ত পরিধিতে যে অতিরিক্ত চাহিদার অবস্থিতি দেখা যায় সেটা মূলতঃ এই ক্ষেত্রে গত কয়েক বৎসরে কর্মসংস্থানের প্রসার ও আয়বৃদ্ধি থেকেই বর্তাইয়াছে। একথা সত্য যে, উচ্চতর আয়ের ক্ষেত্রে উৎ-পাদনের মান বা পরিমাণ সঙ্কোচ না করেও আয়-সঙ্কোচের প্রভূত অবকাশ বর্তমান রয়েছে। তবে এই ক্ষেত্রটিতে সহজে কেউ হস্তক্ষেপ করতে সাহস পাবেন না, একথা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। যাঁরা এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়েন তাঁরা বিশেষ বিবেচনার অধিকারী (privileged) এবং সাধারণতঃ রাজনৈতিক শক্তিতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ এবং বর্তমান অবস্থায় অত্যন্ত কঠোর প্রয়োগ ব্যতীত এঁদের বিশেষ অধিকারে সার্থকভাবে হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা সরকারের নাই। কঠোর ব্যবস্থা এঁদের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, কেননা তা হ'লেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হবে হয় যে গণতন্ত্র নষ্ট করে ফেলবার প্রয়াস করা হচ্ছে কিংবা উৎপাদন প্রয়াস (incentive) নষ্ট হ'তে চলেছে। অতএব যাদের সামান্য মাত্র বা কোন আয়ই নেই তাঁদেরই কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত করাই একমাত্র উপায়।

এটা একটা বিকৃত চিন্তার ফলমাত্র নয়। যে আয়ের ব্যবস্থা এখনও সৃষ্টি হয় নি সেটাকে বাদ দেওয়াই সহজ পন্থা। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনার নির্দ্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারা সম্ভব হ'লে এই আয় বর্তমান বণ্টন ব্যবস্থার অধীনেও সৃষ্টি হ'তে বাধ্য। ফলে অনুরূপ গতিতে আরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটার আশঙ্কাও অমূলক নয়। সমাজের ঘাড়ে বর্তমানে চেপে-বসা সমস্যাগুলিকে অবশ্যই উপেক্ষা করা চলে না এবং তজ্জনিত মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ সম্বন্ধে উপযুক্ত এবং কার্যকরী প্রয়োগের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু এ সকল সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে বর্তমানের পণ্য

সরবরাহের অপ্রতুলতাকে চিরদিনের জন্য কায়েম করে রাখবার ব্যবস্থা করাও কোন সমাধান নয়। আপাত-সমস্যার সমাধান জরুরী। কিন্তু তার চেয়েও জরুরী ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের একটা স্পষ্ট স্বরূপের উপলব্ধি বর্তমান সমস্যার চাপে এই লক্ষ্য যাতে জটিলতার মধ্যে লুপ্ত না হয়ে যায় সেদিকে অবহিত হওয়া নিতান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

এই লক্ষ্য চতুর্থ পরিকল্পনায় যতটা বলা হয়েছে তার চেয়ে আরও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সেটা হ'লেই তবে পরিকল্পনা-বিন্যাসে কোথায় কতটা ঘাটতি (lack) বা অসামঞ্জস্য রয়েছে সেটাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কতক-গুলি শ্রীকামরাজের ভাষণে বিবৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লগ্নীর শুধু পরিমাণ নয়, তার বিন্যাস (pattern), গতি,-প্রকৃতি ও বিভিন্ন খাতের লগ্নীর পারস্পরিক সামঞ্জস্য ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে একটা স্পষ্টতর চিত্র প্রয়োজন। লগ্নীর মোট পরিমাণ যত বৃহৎ হবে ততই এই সামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, কেননা এই সামঞ্জস্যের দ্বারাই বৃহত্তর লগ্নীগুলি থেকে প্রবাহিত মূল্য চাপসৃষ্টির (inflationary pressures) আশঙ্কাটিকে নিরোধ বা অন্ততঃ সংযত করবার একমাত্র উপায়। পরিকল্পনা কমিশনের এই বিষয়ে ধারণা ও উপলব্ধি এ পর্যন্ত স্পষ্ট নয় বলেই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সর্বাগ্রে প্রয়োজন আর্থিক উন্নয়নের একটা সুসমঞ্জস ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ। পরিকল্পনা-বিন্যাসের এই অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপাদানটি পরিকল্পনা কমিশনের চিন্তায় এ পর্যন্ত লক্ষিত হয় নি।

অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান পরিস্থিতির ফলে চতুর্থ পরিকল্পনার যে প্রাথমিক রূপের প্রকাশ এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে তার ফলে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটির একটা আমূল পুন-বিন্যাস যে একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে এক ভাষণে খ্যাতনামা শিল্পপতি শ্রীজাহাঙ্গীর গান্ধী এ কথাটাই খুব স্পষ্ট করে বলেন। বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রে তিনি বলেন এখন সম্প্রসারণের চেয়েও স্থিতিস্থাপন (consolidation) চতুর্থ পরিকল্পনার প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। অন্য পক্ষে ক্ষুদ্র এবং বিস্তৃত শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভোগ্যপণ্য সরবরাহের আয়োজন প্রভূত পরিমাণে প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। এর দ্বারা একদিকে কৃষি-শিল্পের প্রয়োগ-বিধির ক্রমিক উন্নয়ন (gradual sophistication) যেমন সহজ হয়ে উঠবে, তেমনি বর্তমানের অতিরিক্ত ভোগ-চাহিদা অনুরূপ সরবরাহে সামঞ্জস্য লাভ করবে এবং মূল্যমান সংযত হবে ও স্থিতি লাভ করবে। পরিকল্পনার আকার সঙ্কোচ করে কেবলমাত্র সম্ভাব্য উন্নয়ন গতি শ্লথ করে দেওয়া হবে। তার ফলে যেমন বর্তমান সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার কোনই সম্ভাবনা নেই, তেমনি উন্নয়ন লক্ষ্যে পৌছিবারও কোন আশা সুদূর ভবিষ্যতেও নেই। তবে চতুর্থ পরিকল্পনার বর্তমান ধারায়ও সেটি হবার সম্ভাবনা যে নেই সেটাও স্পষ্ট বুঝা প্রয়োজন। একমাত্র ইহার আমূল পুনর্বিন্যাসের দ্বারাই সঙ্কট-মুক্তির ও লক্ষ্যে পৌছিবার পথ প্রস্তুত হ'তে পারবে।

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণে আবার মাশুল বৃদ্ধি

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার কর্মকর্তারা আবার পুনর্বিন্যাসের নামে ভাড়া বৃদ্ধি করেছেন। বর্তমান মূল্য-মান বৃদ্ধির ধারায় সরকারী সংস্থাগুলি কি ভাবে সক্রিয় সহযোগিতা করছেন এটি তারই একটি অন্যতম উদাহরণ। অথচ বক্তৃতায়, বিবৃতিতে এবং আরও নানাভাবে বর্তমান দেশজোড়া আর্থিক সঙ্কটের (economic crisis) জন্য যে এই ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধিই প্রধানতঃ দায়ী একথাও তাঁরা বারবার আবৃত্তি করে চলেছেন। অবশ্য বর্তমান ক্ষেত্রে কলিকাতা ষ্টেট্ বাস সার্ভিসের অধ্যক্ষ ভাড়া যে বাড়ান হ'ল এ কথা স্বীকার করেন নি; তিনি বলছেন, ভাড়ার কাঠামোটির পুনর্বিন্যাস মাত্র করা হ'ল। তা ছাড়া শেষ পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে মাসিক টিকিট ব্যবস্থা করবার পূর্ব প্রতিশ্রুতিও এঁরা এখন অস্বীকার করেছেন। ষ্টেট্ বাস সংস্থার প্রধানা-ধ্যক্ষ গাঙ্গুলী মহাশয় সম্প্রতি প্রচারিত একটি বিবৃতিতে বলেছেন যে, "নানা কারণে এখন মাসিক টিকিট ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হ'ল না।" এই কারণগুলি যে কি তা তিনি স্পষ্ট ক'রে বলেন নি। কোন সত্যকার কারণ আছে যার জন্য এই প্রতিশ্রুত ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভব হ'ল না, এমন কথাও মনে করবার মতন কোন কারণ তিনি দর্শান নি। তবে একটি কথায় এই সম্ভাব্য কারণের একটু আভাস তিনি দিয়েছেন; তিনি বলেছেন যে,বর্তমান বৎসরে এই সংস্থার সম্ভাব্য লোকসানের পরিমাণ ৪০ লক্ষ টাকার মতন হবে বলে মনে হয়। মাসিক টিকিট ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে ভাড়া থেকে আয় খানিকটা কমে যাবে বলে আশঙ্কা করা যায়; তা হ'লে এই লোকসানের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। সেই কারণেই হয়ত মাসিক টিকিট প্রবর্তন করবার পূর্ব-সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই লোকসানের আশঙ্কা হঠাৎ নিশ্চয় আবিষ্কৃত হয় নি? লোকসান যে হবেই সেটা নিশ্চয়ই আগে থেকেই অনুমান করা গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাঁরা এরকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে-ছিলেন কেন? কারণটা খুবই স্পষ্ট বলে মনে হয়। ভাড়ার পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাবের দরুন যে অনিবার্য প্রতিবাদ গড়ে উঠবে, সেটিকে এই রকম একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঠেকিয়ে

রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কেননা জনসাধারণ আশা করেছিলেন যে, এই পুনর্বিন্যাসের ফলে তাঁদের উপরে যে ভাড়াবৃদ্ধির চাপ বর্তাবে, সেটি মাসিক টিকিট ব্যবস্থার দ্বারা থাইয়ে দেওয়া যাবে। তাঁরা আশঙ্কা করতে পারেন নি যে, কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তাঁদের মাত্র ধোঁকা দেবার জন্যই এরূপ একটি অঙ্গীকার প্রচার করবেন এবং আপন উদ্দেশ্যটি হাসিল করে নিয়ে পূর্ব-প্রতিশ্রুতিটি বিনা দ্বিধায় বা লজ্জায় বাতিল করে দেবেন। বস্তুতঃ হয়েছে কিন্তু তাই। সরকারী মিথ্যাচারের এরূপ উদাহরণ আর খুব বেশী খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভাড়ার পুনর্বিন্যাসের ফলে সংযাত্রীদের উপর কতটা অতিরিক্ত চাপ বর্তাবে তার একটা আনুমানিক হিসাব সম্ভব একটি মাত্র রুটের উদাহরণ নেওয়া যাক। এই রুটে গোড়া থেকে শেষ গন্তব্য পর্যন্ত ৯টি ষ্টেজ ছিল; যথা ৮ পয়সা, ৯ পয়সা, ১২ পয়সা, ১৬ পয়সা, ১৮ পয়সা, ২১ পয়সা, ২৪ পয়সা, ২৮ পয়সা ও ৩১ পয়সা। এখন এই ৯টির মধ্যে প্রথম দুইটি ষ্টেজের ভাড়া হবে ১০ পয়সা ক'রে, তার পরের দুইটি ষ্টেজের ভাড়া হবে ১৫ পয়সা করে, তার পরের দুইটির ২০ পয়সা করে, তার পরের একটি ষ্টেজে ভাড়া হবে ২৫ পয়সা এবং শেষ দুইটি ষ্টেজে ৩০ পয়সা। অর্থাৎ প্রথম দুইটি ষ্টেজে ১ ও ২ পয়সা করে ভাড়া বাড়বে, দ্বিতীয় দুইটি ষ্টেজের প্রথমটিতে ৩ পয়সা বৃদ্ধি ও দ্বিতীয়টিতে ১ পয়সা কমতি হবে, তার পরের দুইটি ষ্টেজের প্রথমটিতে ২ পয়সা বাড়বে এবং দ্বিতীয়টিতে ১ পয়সা কমবে, তার পরের একটি ষ্টেজে ১ পয়সা ভাড়া বাড়বে এবং শেষ দুইটি ষ্টেজের একটিতে ২ পয়সা বাড়বে এবং অন্যটিতে ১ পয়সা কমবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মোট নয়টি ষ্টেজের মধ্যে ৬টি ষ্টেজের ভাড়া বাড়বে এবং মাত্র ৩টি ষ্টেজের ভাড়া কিছু কমবে। বাড়তি ষ্টেজের মধ্যে একটিতে ৩ পয়সা বাড়বে, ৩টিতে ২ পয়সা করে বাড়বে এবং মাত্র দু'টি ষ্টেজে ১ পয়সা বাড়বে। অন্য পক্ষে মাত্র ৩টি ষ্টেজে ভাড়া কমবে এবং সেই কমতির হার হবে মাত্র ১ পয়সা করে। অতএব মোটামুটি ফল এই পুনর্বিন্যাসের এই হবে যে, যাত্রীর পক্ষে ভাড়ার চাপ মোটামুটি এই রুটে প্রায় ১০ পার্সেণ্ট বৃদ্ধি পাবে। এই ভাবে অন্য সকল রুটগুলিতেও যদি ভাড়ার বর্তমান পুনর্বিন্যাসের বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে যে, সে সকল ক্ষেত্রেও মোটামুটি অনুরূপ অনুপাতেই ভাড়ার চাপ বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ কলিকাতা ও বৃহত্তর কলিকাতা এলাকার সকল নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি পরিবারের এই খাতে খরচা মাসে গড়পড়তা শতকরা ১০ টাকা করে বেড়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে একথা স্পষ্ট করে বোঝা উচিত যে, এই শ্রেণীর পরিবারগুলির অবশ্যভোগ্য ব্যয়গুলির মধ্যে প্রধান খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও পরিবহণ ব্যয়। কিছুকাল আগে আমরা একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মাসিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের যে খসড়া প্রকাশ করেছিলাম, তাতে দেখা গিয়েছে যে সাধারণতঃ নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির যানবাহনের খরচাতেই মাসিক আয়ের প্রায় শতকরা ২০টাকা খরচা হয়ে যায়। বর্তমান পুনর্বিন্যাসের ফলে এই খরচা আরও প্রায় শতকরা ২৷৷০ বৃদ্ধি পাবে।

ষ্টেট বাস সার্ভিসের দক্ষতার পরিচয় এই যে আজ পর্যন্ত এটি লোকসানেই চলেছে। গাঙ্গুলী মহাশয় এর কারণ দর্শিয়েছেন সরকারী করভার। এই করভার ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত বাস সার্ভিসগুলির উপরে বিন্দুমাত্র কম নয়, বরং কিছু বেশী। তবু তারা এই ব্যবসায়ে মুনাফা করে থাকে, কেবল সরকারী পরিচালনায় চললেই লোকসান হতে থাকে। এর একটি প্রধান কারণ, এর শিরভার-প্রপীড়িত (top h avy) উচ্চতম কর্মী-সংসদ। এক গাদা অকর্মণ্য মোটা মাহিয়ানার কর্মচারী এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। ষ্টেট বাস সার্ভিসের কারখানাগুলির দিকে তাকালেই এটা স্পষ্ট বোঝা যাবে। যতগুলি বাস রাস্তায় চালু থাকে তার তুলনায় কতকগুলি মেরামতের জন্য অচল হয়ে থাকে সেটা এর খানিকটা উদাহরণ। তার উপরে রাস্তায় চালু বাসগুলির দৈনিক কতকগুলি বাস চলতে চলতে অচল হয়ে পড়ে, তাও এর একটি অন্য উদাহরণ। তা ছাড়াও প্রচণ্ড ব্যয়ে চালু এদের নিজেদের কারখানায় ছাড়াও বাইরে কতটা মেরামতী খরচা ষ্টেট বাস সার্ভিসকে দিতে হয়, লোকসানের সেটি আরও একটি অতিরিক্ত কারণ। বাস-যাত্রীদের অসুবিধার অন্ত নাই। প্রচণ্ড ভিড় ত দৈনিক বৃদ্ধি পাচ্ছেই। তার ওপর আছে প্রায়ই দুর্ঘটনা, ষ্টেট বাসের সময়ের অনিশ্চয়তা এবং অন্যান্য অনেক অসুবিধা। ড্রাইভার, কণ্ডাক্টারের যাত্রীদের উপরে ব্যবহারও প্রায়ই অত্যন্ত আপত্তিজনক হয়ে ওঠে। মোটামুটি এই ধারণা লোকের বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, পয়সা খরচ করেও যাত্রীদের অসুবিধা ও অপমান সহ্য করে চলতেই হবে। গাঙ্গুলী মহাশয় এর যে কোন প্রকার সুরাহা করবার চেষ্টা করেন এমন কোন প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নাই। যেটুকু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে সেটুকু একদিকে অকর্মণ্যতার ও অন্যদিকে ধূর্ত ব্যবহারের। বর্তমান ভাড়ার পুনর্বিন্যাস এই ধূর্তামিরই আর একটি উদাহরণ।

ভারতে বিদেশী পুঁজির লগ্নী

ভারতে আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে অধিকতর

পরিমাণে বিদেশী পুঁজি লগ্নীর জন্য নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার আয়োজনের কথা সকলেই জানেন। কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এই উদ্দেশ্যে এবং যাতে অধিকতর পরিমাণে বিদেশী ব্যক্তিগত পুঁজি লগ্নীর পক্ষে উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হ'তে পারে এই জন্য কতকগুলি বিশেষ সুবিধার কথা ঘোষণা করেন। বর্তমানে এই সুযোগ আরও বিস্তৃত করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত অধিকারের বাইরে শিল্পায়নে বিদেশী পুঁজির সহযোগিতার এতকাল একটি সর্ত ছিল; ভারতীয় শিল্পপতিরা এ-বিষয়ে প্রাথমিক আয়োজন গঠন করবেন এবং উপযুক্ত বিদেশী সহযোগিতা সংগ্রহ করবেন। এই নীতির ফলে ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কতকগুলি অনিবার্য বাধা ও বিলম্বের কারণ ঘটেছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্পপতিরা নির্দ্ধারিত লাইসেন্স পাবার পরও বহুকাল পর্যন্ত বিদেশী সহযোগিতা সংগ্রহ করতে সফল হন নি; কোন কোন ক্ষেত্রে কাম্য বিদেশী সহযোগিতার ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন ভারতীয় শিল্পপতি নির্দ্ধারিত শিল্পটির প্রতিষ্ঠায় আর অগ্রসর হন নি। এসকল কারণে বিদেশী ব্যক্তিগত পুঁজি লগ্নী এদেশে অনেক সুযোগ ও সুবিধা সত্ত্বেও খুব একটা বিস্তৃতি লাভ করে নি। সম্ভবতঃ বিদেশী পুঁজিপতিরা ভারতীয় শিল্পপতির অধিকারে ও পরিচালনায় তাঁদের পুঁজি লগ্নী করতে খুব আগ্রহশীল হয়ে ওঠেন নি।

ভারতের উন্নয়নকল্পে বিদেশী পুঁজি লগ্নী এ পর্যন্ত কি সরকারী বা বেসরকারী প্রয়োগে বেশীর ভাগই ঋণের দ্বারা সাধন করা হয়েছে। এই ঋণ খানিকটা ঋণদাতা ও গ্রহীতা দেশ দুইটির দুই সরকারের মধ্যে চুক্তিদ্বারা সংগৃহীত হয়েছে; কিছুটা আবার ওয়ার্লড্ ব্যাঙ্ক, আই এস এফ এবং অনুরূপ আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পাওয়া গিয়েছে। এই ঋণের দায় এই পর্যন্ত যতটা গ্রহণ করা হয়েছে তার ফলে ১৯৬৫-৬৬ সন থেকে ভারতকে বার্ষিক ১১০০ কোটি টাকা হিসাবে শোধ দিতে সুরু করতে হবে—এর মধ্যে বার্ষিক ৬০০ কোটি টাকা সুদ হিসাবে দেয় হবে এবং বাকী ৫০০ কোটি টাকা আসলের কিস্তি। এই দায়টি নিতান্ত লঘু নয়। তার ওপর আছে আনুসঙ্গিক বিদেশী বিশেষজ্ঞ সহায়তার মূল্য; যার একটা মোটা অংশও বিদেশী মুদ্রায় দিতে হয়। তা ছাড়া, চতুর্থ ও পরবর্তী পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য পূর্বের তুলনায় আরও অধিকতর পরিমাণে বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন হবে। গত দুই বৎসরে আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য অনেকটা প্রসার লাভ করেছে সত্য, কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে শিল্পযন্ত্রাদির আমদানীর প্রয়োজন এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে আমাদের নীট দেয়ের পরিমাণ (balance of payments position) নিতান্তই সঙ্কটজনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার ওপর ঋণের কিস্তি ও সুদের দায় এই অবস্থাটিকে আরও সঙ্কটজনক করে তোলবার আশঙ্কা অবশ্যই আছে। তা ছাড়া বৃহত্তর চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় আনুপাতিক বৃহত্তর অঙ্কের বিদেশী মুদ্রার চাহিদা বৈদেশিক ঋণ থেকে সম্পূর্ণ মিটবে এরূপ ভরসা করা যাচ্ছে না। ফলে এদেশে বিদেশী ব্যক্তিগত পুঁজি লগ্নীর স্বপক্ষে অধিকতর আগ্রহশীল আবহাওয়া সৃষ্টি করবার জন্য সরকার উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার আয়োজন করে দেবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন।

অন্যপক্ষে অনেকে মনে করেন যে, যতটা পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার ঋণের প্রয়োজন বিদেশী পুঁজি লগ্নীর দ্বারা মেটান যায় ততই মঙ্গল। কেননা এই ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের দায় বা সুদের বোঝা ঘাড়ে পড়বে না। তা ছাড়া শিল্পায়নে এই ধরনের বিদেশী পুঁজি ও শিল্পপতিদের সহযোগীতা উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করতে পারলে, সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজনীয় বিদেশী বিশেষজ্ঞ সহযোগিতারও ব্যবস্থা হবে এবং পরিচালন দায়িত্বের বোঝাও খানিকটা তাঁরাই বহন করবেন। অতএব ঋণের চেয়ে এর বোঝা অনেক হাল্কা হবে। বিদেশী ঋণের যে মূল্য বর্তমানে ভারতকে দিতে হচ্ছে তার বোঝা যে প্রচণ্ড, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহের অবকাশ অবশ্য নেই। এ পর্যন্ত বিদেশ থেকে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির সাহায্যার্থে যত ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে তার বেশীর ভাগটাই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে। এর মূল্যের একটা মোটামুটি হিসাবের খসড়া প্রস্তুত করা যেতে পারে। এ সকল ঋণের একটা সর্ত এই যে, প্রতিটি ঋণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পের রূপায়ণের জন্য যে-সকল শিল্পযন্ত্রাদি বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে, তার অধিকাংশ অংশটাই ঋণদাতা দেশ থেকে নিতে হবে। দেখা গেছে যে, এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ গড়পড়তা মোট ঋণের শতকরা ৬০ ভাগ অধিকার করে। আমেরিকা থেকে এসব বস্তু খরিদ করবার মূল্যও অত্যধিক, সাধারণতঃ জগতের অন্যান্য দেশের তুলনায় এর মূল্য মোটামুটি শতকরা ৩৭ ভাগ বেশী। সুদের হার সাধারণতঃ বার্ষিক শতকরা ৫½ ভাগ এবং যতদিন পর্যন্ত ঋণের অর্থ সম্পূর্ণ পরিমাণে কাজে লাগান না হয়, ততদিন পর্যন্ত বার্ষিক ১% হারে ঋণ পরিচালনা খরচ (Loan servicing cost) দিতে হয়। সাধারণতঃ এই সময়টি ৩ থেকে ৫ বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অর্থাৎ তিন বৎসরে এই খাতে ৩% ব্যয় করা প্রয়োজন হয়। এর উপরে শিল্পটির রূপায়ণ ও প্রাথমিক পরিচালনা কালের

পাঁচ বৎসরে সাধারণতঃ বিশেষজ্ঞ উপদেশের (Consultation Service) জন্য ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ সহযোগিতার জন্য বার্ষিক প্রায় ৫% খরচ হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমেরিকা থেকে সংগৃহীত ঋণের মূল্য দাঁড়ায় প্রায়—আসল ছাড়াও মোটামুটি—আরও প্রায় ১৪০ পার্সেন্টের মতন কিংবা তার চেয়েও কিছু বেশী। অতএব বিদেশী ঋণের মূল্য যে দেশের পক্ষে প্রচণ্ড, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তা ছাড়া এই ঋণের সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সহযোগিতার সত্যকার কার্যকারিতা সম্বন্ধেও গভীর সন্দেহের অবকাশ আছে। এই বিষয়ে বিদেশী সরকার বা ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলির কোন সরাসরি দায়িত্ব থাকে না বা থাকা সম্ভব নয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ কুশলীর বদলে যে আমরা কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অকর্মণ্য ও উচ্চমূল্যের কারিগরমাত্র আমদানী করে থাকি এই উদাহরণও বিরল নয়। বিদেশী পুঁজি লগ্নীর ক্ষেত্রে এ সকল সমস্যার উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কা কম। বিদেশী পুঁজিপতি বা শিল্পপতি মুনাফার লোভেই এ দেশে লগ্নী করতে আগ্রহ দেখাবেন আশা করা যায়। মুনাফা করতে হ'লে যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানে তাঁরা লগ্নী করবেন তার কলকারখানাগুলি যাতে মজবুত ও আধুনিক হয়, যে-সকল কুশলী তাঁরা এর রূপায়ণ ও পরিচালনার জন্য এ দেশে পাঠাবেন তাঁরা যাতে সত্যিই দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য হন এ বিষয়ে তাঁরা যে যত্নবান হবেন সেটা অনিবার্য। এবং এঁদের মজুরি যাতে শিল্পটির আয়ক্ষমতার আয়ত্তের মধ্যে সীমিত থাকে সেটাও তাঁরা নিশ্চয়ই দেখবেন। অতএব যাতে করে অধিকতর পরিমাণে বিদেশী পুঁজি এদেশে লগ্নীর জন্য আকৃষ্ট হ'তে পারে তার আয়োজন করতে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্ররা তৎপর হয়ে উঠেছেন। এই সাপক্ষে পূর্বেই প্রভূত পরিমাণে ভারতীয় পুঁজিপতিদের আয়ত্তাতীত কতকগুলি সুবিধাজনক সর্তের প্রবর্তন করেছেন। বর্তমানে একটি মাত্র প্রতিবন্ধক যা এতদিন ছিল, অর্থাৎ এই সম্পর্কে একমাত্র ভারতীয় শিল্পপ্রয়োজকদের প্রাথমিক অধিকার এরূপ সহযোগিতার আয়োজন করবার জন্য, সেটিও এখন প্রত্যাহৃত হ'ল। এখন যে কোন বিদেশী শিল্প প্রযোজক আপন দায়িত্বে পরিকল্পনার কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নূতন শিল্প প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার সকল প্রয়োজনীয় আয়োজন ভারত সরকারের অনুমোদন নিয়ে নিজেরাই করতে পারবেন। কেবলমাত্র এটি করতে হ'লে এদেশে তাঁদের একটি কোম্পানী আইনানুমোদিত প্রতিষ্ঠান রচনা করতে হবে এবং ভারতীয় লগ্নীকারককে ইহার একটা অংশ গ্রহণ করবার আমন্ত্রণ জানাতে হবে। যদি ব্যক্তিগত লগ্নীকারকরা এতে আকৃষ্ট না হন, তা হ'লে ডেভালাপমেণ্ট ব্যাঙ্ক, কিংবা আই এফ সি, এল আই সি বা আই সি আই সি আই বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি এসকল কোম্পানীর ভারতীয় মুদ্রায় প্রয়োজনীয় পুঁজির ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।

বলা হয়েছে যে, বিদেশী ঋণের চেয়ে এরূপ বিদেশী পুঁজি লগ্নীর ব্যয় দেশের পক্ষে অনেক কম হবে। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হবে, বিশেষ করে যখন ঋণ পরিশোধের ও সুদের দায় থাকবে না। কিন্তু ঋণের দায় একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে লগ্নীকৃত বিদেশী পুঁজির মুনাফা ও বিদেশী কুশলী ও অধ্যক্ষগোষ্ঠীর সহযোগিতার মূল্য যতদিন এ সকল শিল্প চালু থাকবে ততদিনই দিতে হবে। তুলনায় কোন্ বোঝাটা শেষ পর্যন্ত বেশী ভারী হয়ে উঠবে বুঝতে খুব বেশী দূরদৃষ্টি বা বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া নূতন সর্তে বিদেশীদের আজ্ঞাধীন থেকে আত্মনির্ভরশীল ভারতীয় কুশলী ও পরিচালকগোষ্ঠী গড়ে ওঠার প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি হবার আশঙ্কা রয়েছে। তা ছাড়াও বিদেশী পুঁজিপতিদের যদি দেশের শিল্পক্ষেত্রে একটা এরূপ বিস্তৃত স্থান অধিকার করতে দেওয়া হয়, তা হ'লে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সত্বেও যে বিদেশীর আর্থিক কুক্ষিগতের অধীন হয়ে পড়বার আশঙ্কা আছে সেটাও ভাববার বিষয়।

সরকারী নেতারা মনে করেন যে, বর্তমান সর্তটি প্রবর্তিত হবার ফলে বিদেশী পুঁজির এদেশে লগ্নীর একটা প্রবাহ প্রবর্তিত হবে। অনুন্নত অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশে এখন একটা কায়েমী রাজনৈতিক শান্তি ও স্থিরতা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং সেইটিই হবে বিদেশী পুঁজি আকর্ষণ করবার প্রধানতম উপাদান। রাজনৈতিক স্থিরতা আছে সত্য, কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরে আমরা এদেশে দ্রুতগতিতে যে আর্থিক সঙ্কটের কূলে এসে পৌঁছেছি তাতে লগ্নীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশঙ্কা হওয়া অস্বাভাবিক নয়, এমনকি বর্তমান রাজনৈতিক স্থিরতা (Political Stability) বিঘ্নিত হবার আশঙ্কাও নিতান্ত অমূলক নয়। স্থির মস্তিষ্কে বিচার করে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল প্রকৃতি এবং তার রূপায়ণের ধারাই বিশেষ করে আমাদের বর্তমান আর্থিক সঙ্কটের জন্য দায়ী।

পর্বতের মূষিক প্রসব ?

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা গেল যে, মাত্র অল্প কিছুদিন পূর্বে প্রবর্তিত (এবং এটিও বারে বারে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করেছিল) কেন্দ্রীয় খাদ্যনীতি আবার নূতন করে পরিবর্তিত হচ্ছে। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সম্পর্কে সত্যিকারের কোন সুষ্ঠু ও

স্থির নীতি কখনও ছিল বা এখনও আছে এমন মনে করা ভুল হবে। বৎসরাধিক কাল ধরে দেশের খাদ্য পরিস্থিতি যখন দ্রুত একটা গভীর সঙ্কটের দিকে এগিয়ে চলছিল, তখন কেন্দ্রীয় সরকার এবং তাঁদের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সর্দার স্বর্ণ সিংহ, নিতান্ত ঔদাস্যভরে চেয়েছিলেন মাত্র। অবশ্য তিনি এবং তাঁর সহকারী মন্ত্রী শ্রীটমাস যে ক্ষণে ক্ষণে খাদ্য ব্যবসায়ীগোষ্ঠী ও মুনাকাবাজদের প্রতি কঠিন হুমকি প্রয়োগ করেন নাই এমন নয়।

তারপর যখন শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ভার গ্রহণ করেন তখন তিনি একটি জাতীয় খাদ্যনীতি রচনার প্রয়োজনের কথা বলতে সুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি খাদ্য ব্যবসায়টিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করবারও প্রস্তাব করেন। একই সঙ্গে নূতন প্রধানমন্ত্রী খাদ্যশস্য মজুতদারদের প্রতি হুমকি প্রয়োগ করেন যে, তাঁরা যদি দুই সপ্তাহের মধ্যে লুকোন মজুদ শস্য বাজারে না ছাড়েন তবে……ইত্যাদি। দুই সপ্তাহ প্রায় দুই মাসে পরিণত হ'ল। মজুতদারেরা সুস্থ চিত্তে বহাল তবিয়তে সরকারের এবং কংগ্রেস দলের উচ্চতম অধিকারীদের অন্দরমহলে যথারীতি আনাগোনা করিতেই রহিলেন, তাঁহাদের গায়ে আঁচটুকু পর্যন্ত লাগিল না।

তারপর হঠাৎ খাদ্যশস্যের মুনাফাবাজদের শায়েস্তা করবার জন্য একটি জরুরী আইন পার্লামেন্টের পুনরাধিবেশনের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে প্রবর্তিত হ'ল। চাউল, তৈল ইত্যাদির নিম্নতম ও উচ্চতম মূল্য বিধিবদ্ধ করা হ'ল এবং নির্দিষ্ট মূল্যের কমে বা বেশীতে কোন ব্যবসায়ী এ সকল পণ্য খরিদ বা বিক্রয় করলে তাদের সাজা দেবার ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই জরুরী আইনের প্রয়োগ সম্পর্কিত কোন তথ্য আজ পর্যন্ত প্রচারিত বা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। এই বিষয়ে সকল প্রশ্নই সরকার যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেছেন।

এখন জানা যাচ্ছে যে, আগামী ফাল্গুন মাসে গমের নূতন ফসল ওঠবার পরেও যে কোন ব্যবস্থা হবে এমন আশা নাই। কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করেছেন যে, তাঁদের গুদামে খাদ্যশস্যের মজুদের পরিমাণ যথেষ্ট বৃহদাকার না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন প্রয়াসে ফল হবার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য চালের বেলায় যা করা হয়েছে, গমের নূতন ফসল ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেও তার একটা নির্দ্ধারিত নিম্নতম খরিদ মূল্য ও উচ্চতম বিক্রয় মূল্য বেধে দেওয়া হবে, কিন্তু সেটি প্রয়োগ করবার কোন প্রয়াস করা হবে না। অর্থাৎ খোলা বাজারে সরবরাহ ও চাহিদার সামঞ্জস্যের ফলেই এর বাস্তব মূল্য নির্দ্ধারিত হ'তে থাকবে। এই সম্পর্কে যে বিষয়টি সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় সেটি হ'ল একদিকে এই যে পর পর দুই বৎসর ধরে বৃহত্তম চাউলের উৎপাদনের কালেই দেশের কঠিনতম খাদ্য-সঙ্কট দেখা দিয়েছে এবং অন্যদিকে এ বিষয়ে কোন সার্থক আয়োজন বা প্রয়োগের বুদ্ধি বা শক্তি কোনটাই আমাদের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নাই। হয়ত এরূপ কোন সার্থক প্রয়োগের সদিচ্ছাও তাঁদের কোন কালেই ছিল না।

ভারত কোষ : বৈজ্ঞানিক শব্দ

অশোককুমার দত্ত

বহু প্রতীক্ষার পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তত্ত্বাবধানায় "ভারতকোষ প্রথম খণ্ড" প্রকাশিত হ'ল। ভারতকোষ- নামেই প্রকাশ—বিশ্বকোষ বা বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ জাতীয় অনুসন্ধান বা রেফারেন্স বই নয়, বিশ্ববিদ্যার যে সমস্ত অংশ ভারত সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রযোজ্য তাই এখানকার আলোচনার বিষয়। ভারতকোষ গ্রন্থের উদ্দেশ্য তা বলে মোটেই খণ্ডিত বা খর্ব নয়, বিশ্বকোষের সমস্ত বিষয় এখানে স্থান পায় না সত্য, কিন্তু বিশ্বকোষে যা নেই ভারত-সংক্রান্ত সে সমস্ত বিশেষ আলোচনা এখানকার উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ। সে হিসাবে ভারতকোষ বিশ্বকোষের অনুপূরক এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ ;

ভারত কোষ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সে পরিসর বা প্রস্তুতি আমাদের নেই। তবে সীমাবদ্ধ ভাবে ভারতকোষে অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞান শব্দগুলি নিয়ে কিছু আলোচনার আমরা সূত্রপাত করতে পারি। সঙ্গত কারণেই বৈজ্ঞানিক জগতের কিছু কিছু পারিভাষিক কথা—বিজ্ঞানের নানা তথ্য ও ধারণা- ভারতকোষের প্রসঙ্গ হিসাবে স্থান পেয়েছে। প্রথম খণ্ডের দেওঘর থেকে উষানাথ সেন পর্যন্ত বিচিত্র বিষয়ে একমাত্র বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রসঙ্গ-সংখ্যা অন্যূন ৯০টি। কোষ গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলী—যাঁদের অন্তত তিনজনই বৈজ্ঞানিক—সবিশেষ বিজ্ঞান-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। আলোচিত বিজ্ঞান প্রসঙ্গগুলি মোটামুটিভাবে সুনির্বাচিত, তবে 'এরিয়েল, আলকলি. অ্যামালগাম (পারা-মিশ্রিত সংকর ধাতু), অ্যামিনো এসিড, অ্যাকুয়া-রিজিয়া, ARE (মেট্রিক পদ্ধতিতে জমির মাপ, ১০০ বর্গমিটার বা ১১৯.৬ বর্গগজ), ইলেকট্রন-ভোল্ট, ইলেকট্রোস্ট্যাটিং, এমালসন, এনজাইম, আইসোবার ইত্যাদি শব্দ আলোচিত হওয়া উচিত ছিল। INTERNATIONAL GEOPHYSICAL YEAR (আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান বর্ষ) সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু তার পূর্ববর্তী INTERNATIONAL POLAR YEAR

(আন্তর্জাতিক মেরু বর্ষ) সম্বন্ধে কোন আলোচনা নেই। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী থেকে সূচিত হ'লেও INTERNATIONAL QUIET SUN YEAR (আন্তর্জাতিক শান্ত সূর্য বর্ষ) সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় বা উপায় ছিল। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে, কিন্তু ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের মান-নির্ণয় সংস্থা ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইনষ্টিটিউশন (INDIAN STANDARD INSTITUTION) সম্বন্ধে কোন আলোচনা নেই দেখে বিস্মিত হয়েছি। বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে অন্ততঃ বিষয়-নির্বাচন ব্যাপারে সম্পাদক-মণ্ডলীর আরও বেশি সচেতন হওয়া উচিত ছিল।

কোন গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, তা একের চিন্তা বা পরিশ্রমের ফল-মাত্র নয়, বহু বিচিত্র ফুল থেকে সংগৃহীত মধুভাণ্ড মৌচাকের মত বহু লেখকের লেখায় কোষ গ্রন্থ কোষে কোষে জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। লেখা ও লেখকের এই বিচিত্র সমাবেশের ফলে সম্পাদনার দায়িত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সঙ্গীতের আসরে যেমন বহু যন্ত্রের বিচিত্র স্বরের মধ্য থেকে মূল একটি সুর জেগে ওঠে, কোষ গ্রন্থের প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে তেমনি একটা অখণ্ড বোধ যেন সঞ্চারিত হয়। এই মূল একটি সুরের অভাব ভারতকোষে বিশেষ করে অনুভূত হয়েছে। আমরা ভারতকোষে আলোচিত বিজ্ঞান বিষয়গুলিতেই মনোযোগ সীমাবদ্ধ করেছি। পৃথকভাবে দেখতে গেলে কতকগুলি বিষয় খুবই সুলিখিত, অপরাধ বিজ্ঞান, আপেক্ষিকতাবাদ, আলোক, চিত্রণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা বিষয়ানুগ এবং সত্যসত্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু এদের পাশাপাশি বহু প্রসঙ্গ রয়েছে, যাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ অস্পষ্ট, শুধু তাই নয় ত্রুটিযুক্ত। কোষ গ্রন্থে ভুল আলোচনা কি ভাবে সন্নিবেশিত হ'তে পারে এ এক আশ্চর্য বিষয়। ভারতকোষ আরও তিনটি খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে। প্রথম খণ্ডের ভুল-ত্রুটি যাতে পরবর্তী খণ্ডগুলিতেও সংক্রামিত না হয় এবং প্রথম খণ্ডের পরবর্তী সংস্করণ সংশোধনের সুযোগ পায়, সেজন্য সমালোচকের ছিদ্রান্বেষী মন নিয়ে কয়েকটি প্রসঙ্গে অঙ্গুলী নির্দেশ করছি।

অক্সিজেন। প্রায় এক পৃষ্ঠায় খুবই তথ্যপূর্ণ আলোচনা। অক্সিজেন গ্যাসের শিল্পে ব্যবহার সম্বন্ধেও উল্লেখ রয়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে ভারতের কথা কিছু উল্লেখ থাকলে ভারতকোষের মত গ্রন্থে খুবই উপযুক্ত হ'ত।

অগ্ন্যাশয়। আলোচনা প্রসঙ্গে এনজাইম-এর উল্লেখ রয়েছে। এই এনজাইম কি, কোথাও তার উল্লেখ বা ব্যাখ্যা নেই।

অঙ্গুলি ছাপ। এ সম্বন্ধেও একই বক্তব্য। "তথাকথিত" সামুদ্রিক রেখার উল্লেখ রয়েছে। এ রেখা কি?

অক্টোপাস। সঙ্গে একটি ছবি থাকলে আলোচনা সম্পূর্ণ হ'ত।

অণু। ইংরাজী MOLLCULE বলতে যা বোঝায় তার পরিভাষা হিসাবে প্রসঙ্গ-লেখক অণু কথাটির ব্যবহার করেছেন। আমরাও তা সমর্থন করি। কিন্তু অণুর প্রসঙ্গে পরমাণুর ছবি দেওয়ার কি সার্থকতা আমরা বুঝি নি। আরও আশ্চর্য, হিলিয়াম কার্বন এবং বোরণের পরমাণুর ছবি এঁকে লেখক অণু বলেই তাদের অভিহিত করেছেন। অণু আর পরমাণু সম্বন্ধে এই উপস্থাপনা বিভ্রান্তিকর, এবং যে-কোন কোষ গ্রন্থে অযোগ্য।

অণু প্রসঙ্গে আন্তরাণবিক বলের উল্লেখ করা হয়েছে। কি এই বল? অনেক পরে অবশ্য তার ব্যাখ্যা আছে। ঈথার কি? ঈথার সম্বন্ধে ভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা রয়েছে। এখানে কিন্তু তার উল্লেখ মাত্র নেই। মোট কথা, সমস্ত অণু প্রসঙ্গটিই অগোছালো, এলোমেলো ভাবে রচিত।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র। আমরা উত্তল ও অবতল এ দু'জাতীয় লেন্সের কথা জানি। অভিসারী কি ধরণের লেন্স? নূতন পরিভাষা, তাই সঙ্গে ইংরাজী প্রতিশব্দ থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল।

অনুভূ, অপভূ সঙ্গে ছবি থাকলে ব্যাখ্যা পূর্ণাঙ্গ হ'ত।

অম্ন। এখানেও ছবি না দিয়ে বিষয়টির প্রতি অযত্ন করা হয়েছে।

অবলোহিত রশ্মি। 'আলোক' প্রসঙ্গে যদিও তার ব্যাখ্যা রয়েছে, অ্যামষ্ট্রং কি?

অভিকর্ষ। MASS-এর বাংলা পরিভাষা হিসাবে বস্তু-পরিমাণ আমরাও ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে চলন্তিকা-সমর্থিত ভর কথাটিই সমধিক প্রচলিত; কোষ গ্রন্থে অভিধান-সমর্থিত শব্দের ব্যবহারই বাঞ্ছনীয় ছিল।

অভ্র। ১৩শ লাইনে আছে—"ইহা শাদা ও স্বচ্ছ"। শাদা বলতে প্রসঙ্গ-লেখক এখানে বর্ণহীন বা COLOURLESS বুঝিয়ে থাকবেন।

অশ্বক্ষমতা। HORSE-POWER-এর বাংলা হিসাবে অশ্বশক্তি না বলে অশ্বক্ষমতা বলাই শুদ্ধ প্রয়োগ। কিন্তু এ প্রসঙ্গে অশ্বক্ষমতার যে বিচিত্র ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, একটা কোষ গ্রন্থে যে তা অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে, সে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বিজ্ঞানের প্রাথমিক ছাত্র মাত্রেই জানে—জেমস ওয়াট এক মিনিটে ২২০ পাউণ্ড কুয়া থেকে ১৫০ ফুট উঁচুতে তুলতে যে ক্ষমতার প্রয়োজন তা দিয়ে অশ্বক্ষমতার পরিমাপের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। অন্যভাবে বললে তা "৫৫০ পাউণ্ডের কোনও বস্তু সেকেণ্ডে ১ ফুট উঁচুতে তুলতে যে ক্ষমতা প্রয়োজন" তার সমান। উল্লেখ করার বিষয় এক ফুট, "এক মিটার" নয়। দশমিক প্রথা বলে কোন পরিমাপ পদ্ধতি নেই, লেখক মেট্রিক পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে থাকবেন, কিন্তু মেট্রিক বা সি. জি. এস. পদ্ধতিকে দশমিক পদ্ধতি বলা যায় না। বস্তু ও দৈর্ঘ্য সেখানে দশমিক প্রথায়, কিন্তু সময় দশমিক গণনায় এখনও চিহ্নিত হয় নি।

আইনষ্টাইন। অত্যন্ত অযত্নে লেখা এই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। আইনষ্টাইন ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে কখনও চাকুরি করেন নি, ইঞ্জিনীয়ারিং বলতে যা বোঝায় সে সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণও তিনি করেন নি। আইনষ্টাইন প্রিন্সটনে বহু বৎসর অতিবাহিত করেন সত্য, কিন্তু তাঁর শেষ জীবন সেখানে কাটে নি। বহু ভুল তথ্য ও মন্তব্যে এই প্রসঙ্গটি কণ্টকিত।

আয়ন। অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট।

আকুমুলেটার। ঐ। লেখা থেকে বোঝার উপায় নেই সাধারণ ব্যাটারী (PRIMARY CELL) এবং আকুমুলেটারের মধ্যে প্রভেদ কি।

উদাহরণ এভাবে আরও বিস্তৃত করা যায়। কিন্তু অধিক আর প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গ নির্বাচন এবং তার ব্যাখ্যায় আরও সচেতন, আরও বেশি সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। ছাপাখানার ত্রুটি কোন কোষ গ্রন্থের থাকতে পারে এ সত্যই অবিশ্বাস্য, ভারতকোষে তাই সম্ভব হয়েছে। সম্পাদনায় সতর্ক দৃষ্টির অভাবই তার একমাত্র কারণ। বিজ্ঞান-বিষয়ক বর্ণনায় ছবি অনেক কথার কাজ করে, অনুপূরক বলতে যা বোঝায়, ছবি এখানে সে কাজই করে থাকে, অথচ বিভিন্ন বিজ্ঞান-প্রসঙ্গে ছবির প্রয়োজনকে অবহেলা করা হয়েছে। সমস্ত মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে

আলোচনা ভয়েতকোষে গ্রহণ করা হবে বলে মনে হয়, ভাল প্রস্তাব। কিন্তু ইণ্ডিয়াম এবং ইরিডিয়াম বাদ গেছে কেন বোঝা গেল না। এ সমস্ত মৌলিক পদার্থগুলির আলোচনায় ভারত সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য সন্নিবেশ আশা করা গিয়েছিল, কোষ-গ্রন্থকারেরা এ বিষয়েও নিরাশ করেছেন। বিশেষ করে ইউনিয়াম ধাতুর প্রসঙ্গে এ কথা সবাই অনুভব করবেন, ভারত পরমাণু গবেষণায় উদ্যোগী হচ্ছে, এজন্যই এ-বিষয়ে বিশেষ কৌতূহল।

মোট কথা, ভারতকোষ একটি কোষ গ্রন্থ রচনার নিয়ম মান পযন্ত বজায় রাখতে পারে নি, অথচ এতে তথ্যবহুল বহু সুলিখিত প্রসঙ্গ রয়েছে দেশের বহু জ্ঞানী-গুণী এতে সহযোগিতা করেছেন : বিষয় নির্বাচন সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ খাড়া করা যেতে পারে, কিন্তু ত্রুটিযুক্ত তথ্য প্রকাশের পক্ষে কোন যুক্তি বা কৈফিয়ৎ নেই। সম্পাদকীয় অমনোযোগিতা অসতর্কতাই তার একমাত্র কারণ। লেখক নির্বাচন সম্বন্ধে কোন মন্তব্য আমরা করতে চাই না, তবে এ বিষয়েও শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব সম্পাদকমণ্ডলীর। আশা করি তাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও পুনরায় বিবেচনা করে দেখবেন।

প্রসিদ্ধ ফরাসী বিশ্বকোষ 'আঁসিক্লোপেদি'তে দিদেরো যা লিখেছিলেন ভারতকোষের মুখবন্ধে তার উল্লেখ আছে—'পৃথিবীময় যে জ্ঞান ছড়াইয়া আছে তাহা সমাহৃত ও সুবিন্যস্ত করা বিশ্বকোষের উদ্দেশ্য; উক্ত জ্ঞানের মর্ম সমকালীন জনসমষ্টির নিকট ব্যাখ্যাত করা ও ভবিষ্যদ্বংশীয়ের হাতে উহা পৌঁছানর ব্যবস্থা করা কোষ গ্রন্থের লক্ষ্য।' ভারতকোষের বিজ্ঞান প্রসঙ্গগুলিতে অন্তত কোষ গ্রন্থের এই মহৎ উদ্দেশ্য সর্বাংশে সফল হয়েছে, এ কথা বলতে পারলাম না।

বিদেশের কথা

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

পাক নির্বাচন :

ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁ পাঁচ বছরের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন পাকিস্তানের স্রষ্টা মহম্মদ আলী জিন্নার ভগ্নী মিস ফতিমা জিন্না। জিন্নার জীবিতকালে মিস জিন্না ভ্রাতাকে সর্বত্র ছায়ার মত অনুসরণ করতেন এবং ভ্রাতাভগ্নী উভয়েই পাক্-জনগণের কাছে সমান ভাবে সম্মানিত ছিলেন। মিঃ জিন্নার মৃত্যুর পর ফতিমা জিন্না নিজেকে ধীরে ধীরে পাক্-রাজনীতি থেকে সরিয়ে নেন. কিন্তু তবুও যে তাঁর সমাদর পাকিস্তানের সাধারণ কাছে বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায় নি তার অভ্রান্ত পরিচয় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকালে পাওয়া যায়। পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত পাকিস্তানের যে-কোন স্থানে তিনি নির্বাচনী প্রচারে যান সেখানেই হাজার হাজার নরনারী সমবেত হয়ে তাঁকে মাদার-ই-মিল্লাত অর্থাৎ জাতির জননী বলে অভিনন্দন জানায়। শ্রীমতী ফতিমার পক্ষে এই অভূতপূর্ব জনজাগরণ শুধু জনাব আয়ুব নয়, তাঁর নিজের পক্ষেও কল্পনাতীত ছিল। এ কারণে এক সময় জনাব আয়ুবের সাফল্য সম্বন্ধে তাঁর অতিবড় সমর্থকের মনেও সন্দেহ দেখা দেয়। সকলেই এবিষয়ে একরকম নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে জনাব আয়ুব ফতিমা জিন্নার চেয়ে কিছু বেশি ভোট পাবেন, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ফতিমা জিন্না এত বেশী ভোট পাবেন যে, তার ফলে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের জয় অসম্ভব হয়ে পড়বে।

কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল সব অনুমান ও জল্পনা-কল্পনা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। পাকিস্তানের উভয় শাখাতেই জনাব আয়ুব শ্রীমতী ফাতেমা জিন্নার তুলনায় এত বেশী ভোট পেয়েছেন যা কারও পক্ষেই চিন্তা করা সম্ভব হয় নি। মোট ৮০ হাজার ভোটের মধ্যে প্রেসিডেন্ট আয়ুব পান ৪৯,৯৫১ ভোট ও মিস জিন্না পান ২৮,৬৯৬ ভোট। পশ্চিম পাকিস্তানের চল্লিশ হাজার ভোটের মধ্যে প্রেসিডেন্ট আয়ুব পান ২৮,৯৩৯ ভোট আর মিস জিন্না পান ১০.২৫৭; আর পূর্ব পাকিস্তানের চল্লিশ হাজার ভোটের মধ্যে ২১,০১২টি ভোট পড়ে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের পক্ষে এবং ১৮,৪৩৯টি পান মিস জিন্না। অপর দুই প্রার্থী কামাল ও বসির আমেদের মোট ভোটের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮৩ ও ৬৫। ৮০৪টি ভোট বাতিল হয়। মোটামুটি হিসাবে বলা যায় পাকিস্তানের প্রতি আটজন বেসিক ডিমক্রাটদের মধ্যে পাঁচজন ভোট দেন প্রেসিডেন্ট আয়ুবকে ও তিনজন সমর্থন করেন মিস জিন্নাকে। পাকিস্তানের দু'টি রাজধানীতেই মিস জিন্না প্রেসিডেন্ট আয়ুবের চেয়ে বেশী ভোট পান। ঢাকায় ৫৫৭ জন ভোটারের মধ্যে ৪৫৭ জন ভোট দেন মিস জিন্নাকে, আর মাত্র ১০০ জন ভোট দেন প্রেসিডেন্ট আয়ুবকে। করাচিতেও মিস জিন্না প্রেসিডেন্ট আয়ুবের চেয়ে বেশী ভোট পান। ভোটের ফলাফলের অন্যতম লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল, পশ্চিম পাকিস্তানে মিস জিন্নার অনুকূলে আশাতীত সমর্থন এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর কল্পনাতীত ব্যর্থতা।

প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সাফল্য ও শ্রীমতী জিন্নার

পরাজয়ের কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের সাফল্যকে বড় জোর তার কূটনীতির সাফল্য বলা যায়, কিন্তু তা কোনমতেই পাক্-জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় নয়। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, আয়ুবের সাফল্যে কোথাও পাক্-জনগণের উল্লাস প্রকাশ পায় নি, কোথাও আলোকসজ্জা ক'রে বা নিশান উড়িয়ে পাক্-জনগণ জানায় নি যে, নির্বাচনের এই ফলাফলই তাদের কাম্য ছিল। যদি সরাসরি নির্বাচন হ'ত তবে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব যে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হ'তেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রেসিডেণ্ট আয়ুব নিজেও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন বলেই তিনি মৌলিক গণতন্ত্রের ধুয়া তুলে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন এবং এমন একদল লোকের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন সীমাবদ্ধ রাখেন, যাদের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বপক্ষে টেনে আনতে তাঁর খুব বেশী অসুবিধা হয় নি। বেসিক ডিমক্রাটরা যখন জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হন তখন একজনও প্রকাশ্যে বলেন নি, যে তিনি আয়ুবের সমর্থক। শোচনীয় ভাবে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কায় আয়ুব-সমর্থক কোন প্রার্থীই আয়ুবের মুস্লিম লীগের টিকিট নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়ান নি। বরঞ্চ সকলেই নিজেদের বিরোধী দলের লোক ব'লে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে নির্বাচনে জয়ী হন। মাত্র তিন মাসের মধ্যে পাকিস্তানের উভয় শাখায় আশি হাজার প্রার্থী মনোনয়নের মত সাংগঠনিক সামর্থ্য বিরোধী দলগুলির ছিল না; তাই সুযোগ নিয়ে নিজেদের বিরোধী দলীয় ব'লে পরিচয় দিয়ে পাক্-জনগণের বিক্ষোভকে কাজে লাগায় আয়ুব-চক্র। শহরগুলিতে এ সুযোগ ছিল না। তাই প্রায় সব সহরেই জনাব আয়ুবকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে হয়। পাকিস্তানের উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয় ঐ বেসিক ডিমক্রাটদের হাত দিয়ে, সে টাকার প্রলোভন সংবরণ করা কম কথা নয়। যে ত্রিশ হাজার বেসিক ডিমক্রাট ঐ প্রলোভন সংবরণ করে ও প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের শাসনচক্রে পিষ্ট হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে মিস জিন্নাকে সমর্থন করেন তাঁদের আদর্শনিষ্ঠা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

ইন্দোনেশিয়ার মতিগতি :

মালয়েশিয়া স্বস্তি পরিষদের সদস্য হওয়ার প্রতিবাদে ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ ত্যাগ করেছে। এ ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়ার বক্তব্য: মালয়েশিয়ার আইনগত অস্তিত্ব সে স্বীকার করে না, সুতরাং রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে মালয়েশিয়ার প্রতিষ্ঠা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। তা ছাড়া উত্তর বোর্ণিওর তিনটি প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশ মালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করার ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ত যে-ভাবে ইন্দোনেশিয়ার ইচ্ছা ও স্বার্থের বিরুদ্ধে মালয়কে সমর্থন করেন সেটাও ইন্দোনেশিয়া বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারে না। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগই ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে একমাত্র বিধেয়।

এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে ইন্দোনেশিয়ার কাছে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ জানান হয়। মিশরের প্রেসিডেণ্ট নাসের, সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক ও যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট টিটো মিলিতভাবে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডঃ সুকর্ণকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ না করার অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখেন। কিন্তু তার পরেও ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ জাতীয় পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করে। ফলে ইন্দোনেশিয়া এখন আর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য নয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইতিহাসে এ ঘটনা অভিনব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জাপান ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে সাম্রাজ্যলিপ্সা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে লীগ অফ নেশনস ত্যাগ করে। তার ফলে জাপানকে শেষ পর্যন্ত যে রাষ্ট্রীয় দুর্যোগের সম্মুখীন হ'তে হয় জাপানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইসাকু সাতো সে-কথা ডঃ সুকর্ণকে স্মরণ করিয়ে দেন, কিন্তু তাতে ডঃ সুকর্ণ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার কোন তাগিদ অনুভব করেন নি।

বিশ্বের সকল দেশ যখন ইন্দোনেশিয়ার সিদ্ধান্তে মর্মাহত, তখন তাকে সোচ্চার অভিনন্দন জানিয়েছে শুধু কম্যুনিষ্ট চীন ও তার সম্পূর্ণ অনুগত তিনটি ক্ষুদ্র দেশ আলবানিয়া, উত্তর ভিয়েৎনাম ও উত্তর কোরিয়া। তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘ এখন মার্কিন সমর্থনপুষ্ট সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক মাত্র, সুতরাং ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করে উচিত কাজই করেছে। চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য করার জন্য যারা অত্যন্ত আগ্রহী তাদের কাছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্বন্ধে চীনের এই তাচ্ছিল্যকর উক্তি কি রকম লাগবে তা বলা কঠিন, কিন্তু এ থেকে এই বিষয়টি আরও সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ হ'ল যে, কমুনিষ্ট চীন কোনদিন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য হলেও আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাসে তা এতটুকুও সহায়ক হবে না। প্রথমে সংবাদ রটেছিল, চীন ও তার অনুগত রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে পাল্টা

রাষ্ট্রসঙ্ঘ গড়ে তুলবে ইন্দোনেশিয়া। কিন্তু আর কোন দেশ ইন্দোনেশিয়ার নীতি ও কার্যক্রম সমর্থন না করায় ইন্দোনেশিয়া ও ব্যাপারে আর অগ্রসর হয় না এবং জানিয়ে দেয় যে, ঐ ধরণের কোন পরিকল্পনা তার নেই। পৃথিবীর অকম্যুনিষ্ট দেশগুলির মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি বৃহত্তম এবং ঐ দলটি সম্পূর্ণ চীনাপন্থী। ইন্দোনেশীয় কম্যুনিষ্ট-নেতা আইদিৎকে বারবার মস্কোয় আমন্ত্রণ জানান হয়েছে কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। ইন্দোনেশিয়ার শাসনব্যবস্থার ওপর আইদিতের প্রভাব সীমাহীন। ড সুকর্ণকে সামনে রেখে ঐদেশে এখন শাসনকার্য চালাচ্ছে উগ্র জাতীয়তাবাদী, মুস্লিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও চীনাপন্থী কম্যুনিষ্টরা। কোন দেশের শাসনযন্ত্রে এমন অদ্ভুত তিনটি বিপরীত শক্তির সমাবেশ ঘটতে কখনও দেখা যায় নি। ফলে এখন চরম বিভ্রান্তিকর অরাজকতা চলেছে ইন্দোনেশিয়ায়, যা কম্যুনিষ্টদের প্রভাব বিস্তারের পক্ষে আদর্শ পরিবেশ বলা যায়। কম্যুনিষ্টদের চাপে ডঃ সুকর্ণ ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম বৃহৎ বামপন্থী দল মুরবা পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করেছেন। যে অবস্থা চলেছে এখন ইন্দোনেশিয়ায় তাতে যদি আর কিছুকাল পরে ঐ দেশটি সম্পূর্ণরূপে লাল চীনের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয় তবে কূটনৈতিক মহল তাতে আদবেই বিস্মিত হবে না।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম :

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে শাসন-সঙ্কটঅব্যাহত আছে। রাজনৈতিক কলহে বিপর্যস্ত ঐ দেশটিতে কয়েক মাস আগে ত্রানভান হুয়ঙের প্রধানমন্ত্রিত্বে যে অসামরিক সরকার কায়েম হয় তা সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পক্ষে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হচ্ছে না। আর ঐ অসামরিক সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট বলে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জনমত ক্রমে তীব্র হয়ে উঠছে। গত ২৩শে জানুয়ারী কয়েক হাজার বৌদ্ধ নরনারী সায়গনস্থ মার্কিন তথ্য অফিস ও লাইব্রেরীতে হানা দেয় ও সেটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অপর বৃহৎ শহর হিউতেও মার্কিন-বিরোধী বিক্ষোভ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে কম্যুনিষ্ট গেরিলাবাহিনী ভিয়েৎ কঙও মার্কিন-বিরোধী অভিযানে যোগ দেয়। ভিয়েৎ কঙ ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বনিবনা না থাকলেও মার্কিন-বিরোধী মনোভাব ক্রমে তাদের এক জায়গায় নিয়ে আসছে, এইটাই এখন কম্যুনিষ্ট-বিরোধী শক্তিগুলির কাছে সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার বিষয়। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সামরিক বাহিনীর সঙ্গেও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক এখন অবনতির মুখে। মাত্র কয়েকদিন আগে ঐ দেশের সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল গুয়েন খান প্রকাশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেনারেল টেলর স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে ঐ বিরোধের নিষ্পত্তি করেন এবং চারজন জেনারেলকে অসামরিক সরকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর ক্ষোভ তাতে দূর হয়েছে বলে মনে হয়না। শুধু ক্যাথলিকরাই এখন অসামরিক সরকারের সমর্থক, কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েৎনামের দেড় কোটি লোকসংখ্যার মধ্যে তাদের সংখ্যা পনর লক্ষও নয়। বৌদ্ধ সম্প্রদায়, সামরিক বাহিনী এবং সর্বোপরি ভিয়েৎ কঙ গেরিলাদের সমবেত আক্রমণের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কোন সরকারের পক্ষেই বেশীদিন টিঁকে থাকা সম্ভব নয়। তবু যে ত্রানভান হুয়ঙের অসামরিক সরকার অনেকদিন টিঁকে থাকতে পেরেছে তার একমাত্র কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন আছে ঐ সরকারের পিছনে। মোটামুটি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রতিদিন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পায় দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, যে টাকা তার না পেলেই নয়। তার চেয়েও বড় কথা, যুক্তরাষ্ট্রের তের হাজার সৈন্য মোতায়েন আছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে, যাদের সহায়তা ছাড়া দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পক্ষে একদিনও কম্যুনিষ্ট আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এ কারণে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বা সামরিক বাহিনীর অধিনায়করা এমন কোন বিষয়েই জোর করতে পারেন না, যা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আর যুক্তরাষ্ট্র সরকার স্থির করেছেন, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কোন সামরিক সরকারকে তাঁরা সমর্থন করবেন না। সেখানে তাঁরা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও অসামরিক শাসন কায়েম করতে চান। কিন্তু যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তাতে অসামরিক শাসন বেশীদিন কায়েম থাকা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

ব্রিটেনের রাজনীতি

গত অক্টোবর মাসে মাত্র চারভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে শ্রমিকদল যখন ব্রিটেনে মন্ত্রিসভা গঠনকরেন তখনই বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, শ্রমিক দলের পক্ষে বেশীদিন শাসনকার্য চালান সম্ভব হবে না। সম্প্রতি একটি উপ-নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার

পর শ্রমিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা মাত্র তিনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ঐ পরাজয়ে শ্রমিক দলের মর্যাদা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। গত অক্টোবর মাসের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দলের বিশিষ্ট নেতা প্যাট্রিস গর্ডন ওয়াকার স্মেথিক কেন্দ্রে রক্ষণশীল দলের প্রার্থীর কাছে পরাজিত হ'লেও মিঃ হ্যারল্ডউইলসন তাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং জঘন্য বর্ণবিদ্বেষ প্রচার করে মিঃ গর্ডন ওয়াকারকে পরাজিত করা হয়েছে বলে রক্ষণশীল দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। তারপর মিঃ গর্ডন ওয়াকারকে কমন্স সভার সদস্য করার উদ্দেশ্যে মিঃ সোরেনসেনকে লর্ডস সভার সদস্য করে লেটন নির্বাচনকেন্দ্রে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। গত ত্রিশ বছর ধরে লেটন শ্রমিক দলের শক্ত ঘাঁটি, অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনেও মিঃ সোরেনসেন আট হাজার ভোটের ব্যবধানে রক্ষণশীল প্রার্থীকে পরাস্ত করে জয়ী হন। কিন্তু গর্ডন ওয়াকার সেখানেও জয়ী হ'তে পারলেন না। মর্যাদার লড়াইয়ে শ্রমিক দলের এই পরাজয় অনতিবিলম্বে ব্রিটেনে আর একটি সাধারণ নির্বাচন অনিবার্য করে তুলেছে।

ইতিহাস কথা কয়

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

(১৫)

জাহানারা বেগম ঘুমিয়ে আছেন এখানেই। চির-নিদ্রায় শুয়ে আছেন জাহানারা। সে ঘুম আর ভাঙবে না।

মোগল সাম্রাজ্যের সৌভাগ্য সূর্য্য যখন মধ্যগগনে উজ্জ্বল, সেই সময়ে পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন জাহানারা। মমতাজের বড় আদরের মেয়ে। শাহজাহান ভেবেছিলেন কত সুখীই না হবে তার আদরিনী কন্যা। কিন্তু ভাগ্যকে এড়িয়ে চলতে পারা বড় কঠিন। বাদশা নফর, উজীর প্রহরী, প্রভু ভৃত্য, নবাব ও বান্দা সেখানে সবাই সমান। ভাগ্যকে এড়িয়ে চলা যায় না। তার ঘর্ঘর রথচক্র সকলকে নিষ্পিষ্ট করে যাবেই যাবে।

সুখ আর দুঃখ, আনন্দ আর বিষাদ, বিলাস আর বর্জন জাহানারার জীবন কাব্যে সবাই চক্রাকারে আবর্তিত। প্রথম জীবনে কত আরামেই না কাটিয়েছেন জাহানারা। সম্রাটের প্রিয়তমা কন্যা। তার মুখে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে তুলতে কত জনকেই কত আয়াস করতে হয়েছে।

মমতাজ মারা যাবার পর মেয়ের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছিলেন শাজাহান। জাহানারাও কোনদিন বাপকে ভোলেননি। স্বেচ্ছায় বন্দিনী জীবন যাপন করেছেন পিতার সঙ্গে। সম্রাটের শেষ দিন পর্য্যন্ত কাটিয়েছেন তার পাশে থেকে। আওরঙ্গজেবের শত প্রলোভনেও পিতাকে ত্যাগ করেন নি।

রোশেনারা আর জাহানারা—শাজাহানের দুই কন্যা। রোশেনারা ছোট, জাহানারা বড়। ভাইদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে যখন বিবাদ সুরু হ'ল, তখন জাহানারা নিলেন বড় ভাই দারা শিকোর পক্ষ। আর রোশেনারা অবলম্বন করলেন আওরঙ্গজেবের আনুগত্য। ইচ্ছে করলে জাহানারা মত বদলাতে পারতেন। আওরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন করে সুখ আর বৈভবকে করায়ত্ত করে নিতে কষ্ট হত না। কিন্তু আওরঙ্গজেবকে চিরদিন এড়িয়ে চলেছেন জাহানারা। ঐহিক সুখের জন্য বঞ্চনা আর বিশ্বাসঘাতকতার মুকুট মাথায় তোলেন নি।

অনেক কিছু জীবনে দেখেছিলেন জাহানারা। ছোট-বেলায় মা অর্জ্জমন্দ বেগমের মৃত্যু। মায়ের শেষ অবস্থা দেখে বাপকে ছুটে গিয়েছিলেন ডেকে আনতে। বড় হয়ে দেখলেন আদরের ভাই দারাশিকোর নির্মম হত্যা। তারপর শাজাহানের জীবনদীপ নিবল তারই চোখের সামনে। বোন রোশেনারার মৃত্যুসংবাদও পেলেন। ভাই বোন অনেকেরই জীবনের আয়ু শেষ হ'ল তারই জীবদ্দশায়। এত শোক পেয়ে হয়ত পাগল হয়ে গিয়েছিলেন জাহানারা। মৃত্যুর আগে নিজেকে বড় দীন ও সামান্য মনে হয়েছিল তার।

বিয়ে হয়নি জাহানারার। আকবরের সেই আদেশ তার জীবনে কোনদিন আসতে দেয় নি পরমবাঞ্ছিত মধুর মিলনের লগ্ন। কেন জানিনা বাদশাহ আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। রাজ পরিবারের কোন লোকের সঙ্গে শাহজাদীর বিয়ে হবে না। ওদের জীবনে শুধু বাজবে বেদনভরা বসন্তের বিষণ্ণ মধুর রাগিনী।

জাহানারা বেগমের কবর নিতান্তই সাধারণ, শাহজাদী বেঁচে থাকতেই রচনা করে গিয়েছিলেন তার সমাধি। সমাধিস্থানের উপরে ছোট একটি বাক্সের আকৃতি বিশিষ্ট মর্মর স্মৃতি চিহ্ন। এই স্মৃতিচিহ্নটির মাঝখানে ফাঁকা মতন খানিকটা স্থানে মাটি ছড়ানো। এর উপর নেই কোন আচ্ছাদন, নেই কোন রাজকন্যার উপযুক্ত আড়ম্বর, বা ব্যয়বহুল চারু চিত্রণ। শুধু সামান্য অলংকরণ মার্বেল পাথরের গায়ে অল্প অল্প খোদিত রয়েছে।

কবিখ্যাতি ছিল জাহানারার। পিতার সঙ্গে স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার করে, অবসর কাটাতে কবিতা রচনাকে অবলম্বন করেছিলেন শাহজাদী। মৃত্যুর পর তার সমাধি স্থানে যা লেখা থাকবে, সে দুছত্রও তিনি রচনা করে গিয়েছিলেন। সমাধির ঠিক মাথার কাছেই একটি মার্বেল পাথরে কালো কালো অক্ষরে সেই দু ছত্র কবিতাও লেখা রয়েছে।

বেগায়র সবজা না পোশাদ্. কোসে মাজারে মারা
কে কবর পোষে গরিবান্ হামিন্ গিয়া বসস্ত।"

অর্থাৎ, আমার সমাধির উপরে একমাত্র ঘাস ছাড়া আর কিছু না থাকে। কারণ দীন অভাজনদের কাছে ঘাসই শ্রেষ্ঠ আচ্ছাদন—

মার্বেল পাথরের স্মৃতি চিহ্নটির মাঝখানে মাটি ছড়ানো সেখানে গজিয়ে উঠেছে ছোট বড় নানা সবুজ দুর্বাদল।

নিরলঙ্কার সমাধিটির উপর এগুলিই যেন একমাত্র অলংকারের চিহ্ন।

ছোট বোন রোশেনারার নামে দিল্লীতে গড়ে উঠেছিল রোশেনারা উদ্যান। সেখানে শেষশয্যা গ্রহণ করে'ছিলেন রোশেনারা। কিন্তু রোশেনারা বাগের সমাধি একদা অনেক বেশী আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন বহন করত। জাহানারার সমাধির মত এত সাধারণ ও ঐশ্বর্য্যহীন ছিল না।

তবে উদ্যান জাহানারাও রচনা করেছিলেন। তার সৃষ্টি বেগমবাগ পরবর্তীকালে রাণীর উদ্যান নামে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু জাহানারার ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। ফকির নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগার এক কোণে শেষ শয্যা নিতে চেয়েছিলেন শাহজাদী। ঐশ্বর্য্য, বৈভব, ক্ষমতা প্রতিপত্তি, বিত্ত, সামর্থ্য অনেক দেখেছেন জাহানারা। তাই চাঁদনী চকের বেগমবাগে শেষ শয্যা নিতে কিছুতেই রাজী ছিলেন না।

তার চেয়ে এই ভালো। ফকির সাহেব একদা যেখানে বসে প্রার্থনা করেছেন, সেই মাটিই তো পরম পবিত্র। সেখানের মাটিতেই রেণু রেণু হয়ে মিশে থাকে তার কোমল দেহের প্রতিটি কণা। সেই মাটিতে শুয়েই শান্তি পাবেন জাহানারা। শীতল শান্তি তার সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে দেবে। বেগমবাগে শেষ শয্যা হলে মরেও শান্তি পাবেন না তিনি। আর ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ, সৌন্দর্য্য, সম্মান? সেকথা শাজাহানের মত তার জীবনেও সত্য—

একথা ভাবিতে তুমি ভারত……
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান'।

(১৬)

নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগায় এসে আর একটি নাম হয়ত আপনার মনে পড়বে। সেটি আমীর খসরুর।

আসল নাম আবুল হাসান। পরে আমীর খসরু নামে বিখ্যাত হন। এক হিসেবে খসরুই ভারতের শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি। এই মিষ্ট ভাষী তোতা' (খসরুর এই নাম সমাধির বাইরে উৎকীর্ণ আছে) ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তার মা বাবা ছিলেন জাতিতে তুর্কী। খুব ছোট বেলাতেই নিজামুদ্দীন আউলিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন খসরু এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ফকিরের এক অন্ধ ভক্ত ছিলেন। খিলজীদের আমলেই রাজ-অনুগ্রহ আমীর খসরুর জীবনে এসে পৌছায়। জালালুদ্দীন তাকে সভার আমীর পদে উন্নীত করেন। খিলজীদের সৌভাগ্য-সূর্য্য যতদিন অস্ত যায় নি, ততদিন খসরু রাজ-অনুগ্রহ হতে এক তিলও বঞ্চিত হন নি। আলাউদ্দীন পুত্র খিজির খান ও দেবলাদেবীর প্রেমের কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করে গেছেন খসরু। ফার্সী সাহিত্যের তা এক সম্পদ। খিলজী-দের পরই তুঘলকদের আধিপত্য। কিন্তু অমন শক্ত জবরদস্ত পুরুষ গিয়াসুদ্দীন তুঘলকও খসরুর প্রতি কঠোর ছিলেন না। যতদিন জীবিত ছিলেন আমীর খসরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। গিয়াসুদ্দীনের পর মুহম্মদ তুঘলক শাহ। খসরুর প্রতিপত্তি সে সময় আরো বেড়ে গেল। পাঠাগারের সম্পূর্ণ অধিকার রইল খসরুর হাতে। বাংলা দেশে যাবার সময় সুলতান তাকে আমন্ত্রণ জানালেন পথের সঙ্গী হতে। আমীর খসরু সানন্দে যোগ দিলেন সুলতানের যাত্রা প্রস্তুতিতে।

বাংলা দেশে বসেই সেই দুঃসংবাদ খসরুর কানে পৌছল। ফকির সাহেব আর নেই। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন নিজামুদ্দীন আউলিয়া। মনে বড় ব্যথা পেলেন আমীর খসরু। তার কবিমনের নিভৃত স্থানটি বেদনায় টনটন করে উঠল। ইতিহাস বলে পরদিনই শোকে দুঃখে ম্রিয়মান খসরু বেরিয়ে পড়েন দিল্লীর পথে। একটুও দেরী করতে চাননি খসরু। আউলিয়ার সমাধির নিকট পর্য্যন্ত না পৌঁছে তার মনে একটুকু শান্তি নেই।

দিল্লী পৌছতে বন্ধু নাসিরউদ্দীন এলেন সান্ত্বনার বাণী শোনাতে। যে যায় সে'ত আর ফেরে না। কাজেই অকারণ শোক করে লাভ নেই। বরং ধৈর্য্য ধরে আবার বুক বাঁধুন খসরু। নতুন কাব্য লিখুন, নিপুণ লেখনীতে। যে কাব্যের ঝংকার মানুষের মনের শোক বিদূরিত করবে। শীতের হিম বায়ুকে দূর করে প্রবাহিত করে দেবে বসন্তের দখিনা সমীরণ। মৃত্যুর শীতলতাকে সরিয়ে সঞ্চার করবে প্রাণের স্পন্দন।

কিন্তু আমীর খসরু আর কাব্য লিখলেন না। কথিত যে, দীর্ঘ ছয়মাস ধরে তিনি উদাস নয়নে বসে রইলেন ফকির সাহেবের সমাধির পাশে। কালো পোষাকে সর্বাঙ্গ আবৃত করে শুষ্ক মুখে চেয়ে রইলেন খসরু। দিন যায়। কালচক্র আবর্তিত হয়। এক ঋতু পার হয়ে আসে অন্য ঋতু। হেমন্তের পক্ক শস্য ভরা মাঠ দেশবাসীর মনে খুশীর জোয়ার বয়ে আনে। শীতের মলিন দিন কেটে গিয়ে পৃথিবীর বুকে ভেসে আসে বসন্তের হাসি।

কিন্তু আনন্দ আর এল না খসরুর মনে। এল না খুশীর জোয়ার ছলছলিয়ে আমীর খসরুর মানস তটে। ছয় মাস পরে দেহত্যাগ করলেন কবি। মৃত্যুই তার মনের সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে দিল।

তার বন্ধুরা ভাবলেন খসরুকে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সমাধির পাশেই কবর দেবেন। মরজগতে যারা ছিলেন

পরম মিত্র, জগতের ওপারের সেই অচেনা দেশেও ছুটি আত্মা কাছাকাছি থাকুক। শেষশয্যা ছুটি তাই যত কাছে হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু সে ইচ্ছা তার পূর্ণ হয় নি।

শোনা যায় দিল্লীতে তখন পুণ্যশ্লোক নিজামুদ্দীনের বিশেষ ভক্ত ছিলেন এক প্রতিপত্তিশালী খোজা আমীর। আপত্তি জানালেন তিনি। পুণ্যাত্মা নিজামুদ্দীনের অত কাছে কখনই সমাধি হওয়া উচিত নয় আমীর খসরুর। তাই আমীর খসরুকে অন্যত্র সমাধিস্থ করা হ'ল। চবুতরায়, যেখানে বসে নিজামুদ্দীন বন্ধু বা শিষ্যদের সঙ্গে আলোচনা করতেন, পরম মিত্র আমীর খসরুকে তারই এককোণে শুইয়ে দেওয়া হ'ল শেষ শয়নে।

আমীর খসরু বহুদিন গত হয়েছেন, কিন্তু তার অসংখ্য গান আর ছড়া ছড়িয়ে পড়েছে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে। আজও সে গান গীত হয়। আমীর খসরুর রচনা মুখে মুখে ফিরে—

বসন্ত পঞ্চমীতে পাখী গান গায়। কিন্তু আমীর খসরু আর গান রচনা করবেন না। বসন্ত পঞ্চমীর দিনে আমীর খসরুর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। কবি সম্রাটের কথা লোকে স্মরণ করে।

আমীর খসরুর সম্বন্ধে শেষ কথা শ্রীম্যান সাহেবের ভাষায় বলি,…'his popular songs are still the most popular ; and he is one of the favoured few who live through ages in the every day thoughts and feelings of many millions,'

(১৭)

দিল্লীর রাজপথে বনমালাদির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে আমি কখনও ভাবিনি। দেখা হয়ে যাবে জানলে বনমালাদির গল্প আমি মিসেসের কাছে নিশ্চয়ই করে রাখতাম। যে মেয়ের কথা আগে কোনদিন উল্লেখ করি নি, হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হবার পর অনর্গল কথা বললাম, তা দেখে ভদ্রমহিলার চোখের কোণে যদি সন্দেহের ছোট মেঘ দেখা দেয়, তবে তাকে বড় একটা দোষ দেওয়া যায় না। অবশ্য মেঘ মানেই কালবৈশাখীর তাণ্ডব নয়। কিন্তু কালবৈশাখা না হলেও চৈত্রের ধুলি ঝড় ত হতে পারে। তাই বনমালাদির মুখোমুখী হয়ে একটা অস্বস্তির কাঁটার খোঁচা মনের মধ্যে অনুভব করলাম।…

ফুলবাহার দেখে বেরিয়েছি মুঘলগার্ডেনস্ থেকে। কি সুন্দর সব ফুল। কেমন সাজানো গোছানো তকতকে বাগানখানা। আর রক্ষণাবেক্ষণ? সেটার কথা ত সর্বাগ্রে বলতে হয়। বাঁধানো পথ থেকে অসতর্কে যদি চরণযুগল একবার মখমলের মত ঘাসের উপর গিয়ে পড়ে অমনি পিছন আর সামনে থেকে মুহুর্মুহু বংশীধ্বনি। সতর্ক প্রহরী হাত নেড়ে অসতর্ক পথিককে সাবধান করে দিচ্ছে। ফুলের উপর যদি অজ্ঞান্তে হাতখানা গিয়ে পড়ে, তাহলে ত কথাই নেই। প্রহরী তখন ছুটে আসবেন আপনার কাছে। মুঘল গার্ডেনসে ঢুকে ঢিলাঢালা হবার জো নেই। সদা সতর্ক থাকতে হবে আপনাকে। শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়ান, আবার বেরিয়ে আসুন উদ্যান ত্যাগ করে।

মুঘল গার্ডেনস থেকে বেরিয়ে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। চওড়া পীচঢালা রাজপথ। দু'পাশে সুদৃশ্য কোয়ার্টার, শুনলাম পার্লামেন্টের সদস্যরা এসে ওঠেন এখানে। পথের দু'পাশে নয়াদিল্লীর সেই এক দৃশ্য। মনোহর নানাবর্ণের বিচিত্র পুষ্পসম্ভার। এক পথ থেকে অন্য পথে, হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলি।

সেক্রেটারিয়েট বাড়ীর কাছেই বাস ষ্টপ একটা। ওখান থেকেই বাস নেব ঠিক করলাম। দিল্লীতে বাস আসার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। কোন রুটের বাস ঠিক কোন সময়ে আসবে কাছাকাছি টাইম-অফিসে খোঁজ করলেই জানা যাবে। বাসষ্টপের কাছে আসতেই যেন চেনা চেনা মনে হল ভদ্রমহিলাকে। বাঙালী তো নিশ্চয়ই। হাতে বেঁটে লেডিজ ছাতা একটা। খাতা পত্র, কাগজ টাগজ একটা ফ্ল্যাট ফাইলের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে। কাছাকাছি আসতেই চোখাচোখি হল। আমায় দেখে যেন চিনতে পারলেন উনি।

অবশ্য আগের থেকে অনেক মোটা হয়েছেন বনমালাদি। গালের কাছে বেশ মাংস জমেছে। গলাটা আর আগের মত পাতলা দীঘল নয়। চিবুকের নীচে বেশ চর্বি মত একটু ঝুলে রয়েছে। রংটা আগের চেয়েও ফর্সা দেখাচ্ছে। …

প্রায় একযুগ পরে দেখা। তখন চব্বিশ পঁচিশের বেশী বয়স ছিল না বনমালাদির। বরং কমই হবে। সেই পাখীডাকা, গাছপালা মোড়া ছোট্ট মফঃস্বল শহরটিতে বনমালাদিকে একডাকে চিনত সবাই। বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী বনমালা সেনকে তারও অনেকদিন আগে থেকে চিনতাম আমরা। উনি স্কুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে মফঃস্বলের কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে যেদিন এলেন সেদিন থেকেই আমরা ওকে চিনলাম। আমরা মানে, কলেজিয়েট স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্ররা।

চোখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে বনমালাদি বললেন,—'আপনি, মানে তুমি তমাল লাহিড়ী না?

হেসে উত্তর দিলাম,—'চিনতে পেরেছেন বনমালাদি? আমি মনে মনে ভাবছি আপনি হয়ত অন্য কেউ—

—চিনবো না মানে? নাহয় খানিকটা বড়ই হয়েছ,

তাহলে চিনে নিতে পারব না। সঙ্গে বউ নিশ্চয়ই। বিয়ে করেছ কতদিন? —'

ওকে ডেকে বনমালাদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। বললাম,—'একসময় আমাদের দেশে বনমালাদিরা অনেক বছর ছিলেন। প্রায় ছ বছর হবে, কি বলেন বনমালাদি?'

—'ছ বছর তো বটেই।' বনমালাদি নিজের মনে কি একটা হিসেব করলেন; হেসে বললেন,—'বোধহয় সাতই—'

বনমালাদির পরণে পাতলা মিলের ধুতি। গায়ে ব্লাউজ সাদা রঙের। আজ চল্লিশের বুড়ী ছুঁই ছুঁই করে বনমালাদি আর সব রংকে বাহুল্য মনে করেছেন। শাড়ীর গায়ের মত মন থেকেও সব রংকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। কথাবার্তা শুনে তাই মনে হল আমার। ভদ্রমহিলা যেন বড় বেশী সাদা মাটা। অথচ সেই ছোট মফঃস্বলের শহরটিতে কত রংবাহার শাড়ীই না ব্যবহার করতেন উনি। কলেজ যাবার পথে সপ্তাহের ছ দিনে ছখানা নানা রঙের শাড়ী দেখেছি ওঁর পরণে। নিজেদের মধ্যে আমরা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্ররা আলোচনা করতাম - বনমালাদির ক বাক্স শাড়ী আছে রে?

আমাদের মধ্যে সমীর ছিল বয়সে একটু বড়। সে হেসে বলত,—'বাক্স নয় রে। বনমালাদির এক আলমারী ভর্তি শাড়ী আছে।'

আমাকে দেখে বনমালাদি বললেন,—দিল্লী কেন এসেছ? বেড়াতে, না কোন সরকারী কাজেটাজে?'

হেসে বললাম, 'দুই'ই ধরতে পারেন।'

বনমালা সেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে। আমাদের ছোট্ট মহকুমা শহরটিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অনেক উঁচু দরের লোক ছিলেন। তাই বনমালাদির ধারে ঘেঁষতে আমরা সাহস পাইনি। শীতের সকালে বনমালাদিকে বেড়াতে দেখতাম। হাতে কুকুরের গলায় বাঁধা চেনের শেষ অংশ। বিরাট আকৃতি বিলিতি কুকুর সামনে ছুটে যেতে চায়। বনমালাদিকে মাঝে মাঝে বেশ কসরৎ করতে হত যাকে টেনে ধরে রাখতে।

তবু বনমালাদির সঙ্গে একদিন আলাপ হয়ে গেল। ৺সরস্বতী পুজোয় চাঁদা চাইতে গেলাম ওঁর বাড়ী। বনমালাদির বাবা বাড়ী ছিলেন না। উনি এসে বললেন আমাদের। একটা পাঁচ টাকার নোট চাঁদা দিয়েছিলেন বনমালাদি। আমরা ভীষণ খুশী হয়েছিলাম। তখনকার দিনে পাঁচ টাকার দাম ছিল। আমরা বনমালাদিকে অনুরোধ করেছিলাম বার বার, উনি যেন আমাদের ৺পুজো দেখতে নিশ্চয়ই যান। সন্ধ্যের সময় আমরা যে নাটক আর আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছি তা যেন উনি নিশ্চয়ই দেখতে আসেন। বনমালাদি আমাদের কথা দিয়েছিলেন। উনি ঠিক আসবেন।

আমাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বনমালাদি আসবেন শুনে আমাদের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। সারা দুপুর করে আমি বারবার কবিতা পড়েছিলাম। আবৃত্তিটা ঠিকমত রপ্ত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। কেন জানিনা বনমালাদি আসবেন এই সামান্য কথাটা আমাদের মধ্যে এক অসামান্য উৎসাহের সঞ্চার করেছিল।

ওরই মধ্যে সেই ফিসফিসানি খবরটা আমাদের কানে এল, তখন আমরা ক্লাস নাইন থেকে টেন্ এ উঠেছি। শীত পেরিয়ে প্রথম ফাল্গুন দেখা দিয়েছে প্রকৃতিতে। স্কুলের পিছনের আমবনে কচি কচি মুকুল দেখা দিতে শুরু করেছে। টিফিনের সময় আমাদের মধ্যেই কে যেন খবরটা উচ্চারণ করল। বলল,—জানিস বনমালাদির বিয়ে হবে।'

—'বিয়ে হবে?' আমরা সমস্বরে প্রশ্ন করি।

'—হ্যাঁরে। বোসেদের বাড়ীর নির্মল বোসকে চিনিস, তারই সঙ্গে বনমালাদি এনগেজড্—

এনগেজড্ কথাটার মানে তখনও আমরা স্কুলের ছেলেরা ভালো করে বুঝিনি। তবু কথাটার সঙ্গে কি যেন একটা মাদকতা, কি একটা রোমাঞ্চের ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে তা আমরা বেশ উপলব্ধি করতে পারতাম। রহস্যভরা দৃষ্টি ছুড়ে আমি বললাম,—'এনগেজড্? তাই বুঝি?

খবরটা ব্যাপকভাবে আমরাই ছড়িয়ে দিলাম। বাড়ীতে মা মাসী, বৌদি দিদি থেকে শুরু করে এ বাড়ী সে বাড়ী গিয়ে বলে এলাম। সবাই অবাক, হল। বলল—বদ্যির সঙ্গে কায়েতের কি বিয়ে রে?

কথাটা বোধহয় বনমালাদির বাবার কাণেও গিয়েছিল। কারণ তারপর থেকেই হঠাৎ বনমালাদির বাইরে বেরোনো সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছল। কলেজের পথে আমরা স্কুলের ছেলেরা আর রংবাহার শাড়ী দেখি না। সেই সুন্দর ছিমছাম নারীমূর্তিটি বই হাতে কোনদিনই কলেজ ট্যাংকের পাশ দিয়ে আর হেটে গেলেন না।

মাসখানেক পরেই সংবাদটা থিতিয়ে এল। যে সংবাদ আমরাই ছড়িয়েছিলাম বিশ্বময়, তাকেই আমরা ভুলতে বসলাম। ইতিমধ্যে নির্মল বোস চলে গিয়েছেন কোলকাতায়। ইউনিভার্সিটি ক্লাসে ভর্তি হয়েছেন। বনমালাদি আবার কলেজে যাতায়াত সুরু করেছেন। কলেজ ট্যাংকের পাশ দিয়ে যে সরু পথটা চলে গিয়েছে মিশনচার্চের দিকে, সে পথে নিত্যনতুন রংবাহার শাড়ী

লক্ষ্য করছি আমরা। কোনদিন মেঘডম্বুর বৃষ্টিধারা আঁকা, কোনদিন সাতরঙা রামধনু শাড়ী।

বর্ষার শুরুতেই আমরা আবার খবর পেলাম। আষাঢ়ের মাঝামাঝি বনমালাদির বিয়ে। বর আসবেন কানপুর থেকে। কানপুরে কলেজের প্রফেসর।

আমরা আশংকা করলাম হয়ত একটা কিছু কাণ্ড ঘটবে। নির্মল বোস হয়ত আসবেন কলকাতা থেকে। বিয়ের আগে বা বিয়ের সময় কোন অঘটন হয়ত ঘটে যাবে—

শুভদিন কিন্তু নির্বিঘ্নে কেটে গেল। আষাঢ়ের বৃষ্টিভেজা রাতে শানাইয়ের সুর তার মিষ্টতা ছড়িয়ে দিল চারপাশে। ডেলাইট আর হ্যাসাকের আলোয় কন্যা সম্প্রদান করলেন বনমালাদির বুড়ী ঠাকুমা। কানপুরের বর শক্তহাতে বনমালাদির হাতটা ধরে রইলেন। আমরা পরিবেশন করলাম একসাথে। পাতা পেতে ভুরিভোজন করলাম মহানন্দে।......

তার কিছুদিন পরই বনমালাদির বাবা বদলী হয়ে গেলেন কলকাতায়। ঘটনার স্রোতে পুরানো কাহিনী হারিয়ে যায়। কখন এক সময় বনমালাদির কথা আমরা ভুলতে সুরু করেছি, তা নিজেরাই খেয়াল করি নি।

আমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে বনমালাদি বললেন—তমালকে আমি খুব ছোট দেখেছি। তখন স্কুলে পড়ত। হাফ প্যান্ট আর শার্ট পরে আমাদের বাড়ী আসত চাঁদা চাইতে—

বললাম—এখন কোথায় আছেন বনমালাদি? নতুন কি একটা জায়গার নাম করলেন বনমালাদি। উত্তর প্রদেশের কোন একটা জায়গা হবে।

বললেন—'একটা হাইস্কুল নিয়ে রয়েছি। তোমরা এস না ফেরবার পথে দু একদিন থেকে যাবে'।

—'হাইস্কুলে রয়েছেন? কোথায় কানপুরে—'

বনমালাদি হাসলেন। 'স্কুলটা একরকম আমিই গড়েছি তমাল। দিল্লীতে এসেছিলাম, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে একটা ভাল গ্র্যান্টের দাবী জানাতে। দেখছ না—হাতের একরাশ কাগজপত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি।

বললাম—'ফেরার সময় যদি পারি ত আপনার ওখানে ঠিক যাব।'

একটা কাগজ হাতে তুলে দিলেন বনমালাদি। অনেককিছু লেখা। স্কুলের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি—

বনমালাদি বাসে উঠে গেলেন। ওঁর গন্তব্যস্থানের বাস এসে দাঁড়িয়েছিল।

আমার স্ত্রী বললেন—'ভদ্রমহিলা কতদিন বিধবা হয়েছেন বলত?'—

—'বিধবা? বনমালাদি বিধবা হবেন কেন?—'

—'বারে, তুমি লক্ষ্য কর নি ওঁর সিঁথির দিকে? দেখলে না, সিঁদুর মুছে ফেলেছেন।'

অবাক হয়ে আমি কাগজটার দিকে চাইলাম। বনমালাদির ঠিকানা দেওয়া কাগজটা। ওঁর স্বামীর নামে মেয়েদের হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। কানপুর থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে এই স্কুলটার গ্র্যান্টের ব্যাপারেই এসেছিলেন বনমালাদি। এতক্ষণে সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হল আমার কাছে। কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষ বনমালাদি। এত বড় ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কথা বেমালুম চেপে গিয়েছেন আমাদের কাছে।......

(ক্রমশঃ)

ইঞ্জিনীয়ারদের প্রতি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ শ্রীহেম গুহ ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদের সম্প্রতি মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। লণ্ডন ইন্‌স্টিটিউশন অব ইঞ্জিনীয়ার্সের সমুদ্রপারবর্তী শাখার (OVERSEAS BRANCH) সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারদের একাধিপত্য হানি এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের তরুণ ইঞ্জিনীয়ারদের কারিগরি পরামর্শদানের ক্ষেত্রে সজ্জবদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়েছেন। কনসালটিং (CONSULTING) একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি, উন্নত দেশগুলিতে তার যথেষ্ট প্রসার ও কদর আছে। দেশের যে-সমস্ত ইঞ্জিনীয়ার নির্মিত ও যন্ত্র-চালনা কৌশলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাঁরা যেন সেই সঙ্গে প্রশাসন এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির বিষয়ে আগ্রহী হন।

বহু ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার দেশের বাইরে রয়েছেন। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক গুহ বলেন, উপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থা বলবৎ করা উচিত, যাতে বেতন ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন রকম বৈষম্যমূলক আচরণ সমর্থন না পায়। তিনি আরও স্পষ্ট ভাষায় বলেন, কেবলমাত্র দেশপ্রেমের ধুয়া তুলে কাজ হবে না। তাঁর বলার উদ্দেশ্য, কার্যকরী উপায়গুলি সম্বন্ধে সচেতন হ'তে হবে।

বিজ্ঞান একাডেমী

সাহিত্য একাডেমী রয়েছে, সঙ্গীত নাটক একাডেমী আছে, অথচ বিজ্ঞান একাডেমী নেই। সরকার সে-সম্বন্ধেও সম্প্রতি চিন্তা আরম্ভ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজী দেশের বিশেষ প্রয়োজন ও অবস্থা বুঝে কাজ করার জন্য এ-জাতীয় একটা একাডেমী গঠন করার প্রস্তাব দিয়েছেন।

বোধ হয় অদূর ভবিষ্যতেই বিজ্ঞান একাডেমী চালু হবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে নানা ধরনের সংস্থা সংগঠনের অভাব নেই। বিজ্ঞান একাডেমী হবে তাদের মধ্যে নতুনতম। অন্যান্য বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলি যা করতে পারে নি প্রস্তাবিত বিজ্ঞান একাডেমী যদি তা করতে পারে তবেই সব দিক দিয়ে সার্থক। এই মহান্ কাজটি হ'ল দেশব্যাপী সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযোগী অনুকূল আবহাওয়া তৈরি করা। নচেৎ বীজ পুঁতলাম, চারা হ'ল, চারা বড় হয়ে মহীরুহ হ'ল, অথচ কোন ফল দিল না, তা ত বাগানের শোভা বাড়ে মাত্র, গৃহস্থের কোন কাজে আসে না।

বিজ্ঞান একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হোক!

যক্ষ্মা—"গণরোগ"

যক্ষ্মার আরেক নাম "রাজরোগ"। রাজাদের যে এই রোগ হয় তা নয়, আসলে তার চিকিৎসায় রাজযোগ্য অর্থের প্রয়োজন। বর্তমানে চিকিৎসা ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বহু শক্তিশালী ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে। যক্ষ্মাও আজ সারে। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র (WHO) আয়োজনে মালয়েশিয়ায় যে আন্তর্জাতিক যক্ষ্মা-নিবারণী সেমিনার অনুষ্ঠিত হ'ল তার মতে ১২ মাসের অব্যাহত চিকিৎসায় (STREPTO-MYCIN, THIACETAZON বা PAS ওষুধ প্রয়োগে) শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ রোগীকে নীরোগ করতে সমর্থ। যক্ষ্মার বিরুদ্ধে অস্ত্র আজ তৈরি। তবু পৃথিবীতে আজ দেড় কোটি যক্ষ্মা রোগী; তাঁদের এক বৃহৎ অংশই হাসপাতাল, সেনেটোরিয়ামের দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিচ্ছে। যক্ষ্মা আজ বিজ্ঞানের চোখে মীমাংসিত সমাধান হ'লেও "গণরোগ" হিসাবে তা পরিব্যাপ্ত রয়েছে।

জলবিদ্যা

HYDROLOGY-র বাংলা বোধ হয় জলবিদ্যা। জলবিদ্যা জলের উৎস এবং তার ব্যবহার-সংক্রান্ত বিদ্যা। জল আমাদের কাছে প্রকৃতির এক আশীর্বাদ হিসাবে এসেছে! কিন্তু তার নূতন নূতন উৎসের খোঁজ এবং নানাভাবে ব্যবহার করার রীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে আগে নদীর পাড়ে জনপদ বসত, বর্ষণ-সিক্ত উর্বর মাটিতে ফসলের চাষ হ'ত। প্রাকৃতিক জলপ্রবাহ এবং পরিমাণের উপর পুরাণো পৃথিবীর ইতিহাস ও ভূগোল অনেকটা নির্ভর করত। কিন্তু মানুষ আজ আপন ক্ষমতায় প্রকৃতির শক্তিকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসছে। নদীর বুকে তাই বাঁধ বসে, ঊষর মরুভূমি শস্যশ্যামল হয়, "বর্ষণহীন" মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। কিন্তু এ সবের মধ্যেও জলের হিসাব-নিকাশ ঠিক ভাবে নেওয়া হয় নি। কোন্ অঞ্চলে কত বৃষ্টিপাত, সম্বৎসর নদীতে কি পরিমাণ জল বয়, ভূগর্ভে জলের পরিমাণ কত ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলের প্রয়োজন বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে আগামী বিশ বৎসরে জলের ব্যবহার বেড়ে দ্বিগুণ হবে। চাষ-বাসের কথা চিন্তা করলে জলের কথা প্রথমেই মনে পড়ে। বিশ্ব কৃষি সংস্থা (FAO) পৃথিবী থেকে ক্ষুধা ও খাদ্যের ঘাটতি দূর করার জন্য অনেক পরিকল্পনা নিচ্ছেন। স্পষ্টতই, জলের সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য জোগাড় না ক'রে এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া যায় না। জলের আরেক নাম জীবন, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে এই জলবিদ্যা বা HYDROLOGY মৌলিক সম্পর্কে বাঁধা পড়েছে।

এ সমস্ত দিকগুলি বিবেচনা করে সারা পৃথিবীতে জল সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ আয়োজন চলছে। এই পরিকল্পনা বহু লোকবল অর্থ সময়সাপেক্ষ। এই বছর (১৯৬৫) থেকে তাই "আন্তর্জাতিক জলবিদ্যা দশক" (INTERNATIONAL HYDROLOGICAL DECADE) সুরু হচ্ছে।

চাঁদের ঠিক নীচে

এই নামে মনোহর মাকওয়ানের ছবিটি প্রথম কোথায় দেখি মনে নেই, কিন্তু তার ভাববস্তু তৎক্ষণাৎ মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। চাঁদ মানুষের চোখে সেই পুরাণো চাঁদ হিসাবে নেই আর, তার অম্লান জ্যোৎস্না আজ এক নূতন পৃথিবীতে আলোকিত হচ্ছে। সেই শুভ্র রজত-গোলক যা অপরূপ এক স্বপ্নমায়া রচনা করে অনন্ত নীলিমায় ভাসমান থাকত তার মায়াজাল রৌদ্রপীড়িত কুয়াশার মতই অবলুপ্ত হয়েছে, সেই স্বপ্ন যেখান নীল শূন্যতার মধ্যে আজ মানুষের আশা ও স্বপ্ন ইমারত বেঁধে উঠেছে। চাঁদের চেহারাও পালটে গেছে। সেই জ্যোতির্ময় অখণ্ডতার মাঝে ভৌগোলিক বিবর্ত খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে, যা তুচ্ছ, তাৎপর্যহীন কলঙ্ক মাত্র ছিল তা ভেদ করে আজ পাহাড় সমুদ্র উপত্যকা কালো কালো রেখায় চিহ্নিত হয়ে উঠেছে। সমস্ত চাঁদ ও চাঁদের আশেপাশের রাজ্যে মানুষের উপনিবেশ গড়ে উঠছে। এর মধ্যে পুরাণো কালের স্বপ্ন আত্মগোপন করেছে।

স্বয়ংক্রিয়তার সমস্যা

স্বয়ংক্রিয়তা যন্ত্রের রাজ্যে শৃঙ্খলা নিয়ে এসেছে। মানুষের অনেক চিন্তা ও বিবেচনায় অংশগ্রহণ করেছে—চিন্তার জগতে তা যেন এক "মুটে", লোডার (LODER) বা কনভেয়ার (CONVEYOR) যেমন যান্ত্রিক মুটে। স্বয়ংক্রিয়তা প্রথম শিল্প বিপ্লবের পর দ্বিতীয় এক বিপ্লব নিয়ে আসছে। প্রথম শিল্প বিপ্লবের মত সামাজিক ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী—আরও দূরপ্রসারী হবে। তার একটি ইতিমধ্যেই প্রকট হয়ে উঠছে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে। এই সমস্যা হ'ল বেকারীর সমস্যা। কলকারখানার যে অজস্র উৎপাদন, তা মানুষ এবং যন্ত্রের সমবায়ে সম্ভব হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান স্বয়ংক্রিয়তার জন্য এ ব্যবস্থায় সংখ্যার দিক থেকে মানুষের প্রয়োজন কমে আসবে। যন্ত্রই মানুষের কাজ আরও বেশি পরিমাণে করে দেবে। তার চেয়েও বড় কথা, আরও বেশি নির্ভুল উপায়ে, আরও তাড়াতাড়ি করে দেবে। মানুষ যা করত প্রয়োজনমত সিদ্ধান্ত নেওয়া, যন্ত্রও তা করে দিতে পারবে। মানুষের প্রয়োজন তাই সীমাবদ্ধ হবে। মানুষই যন্ত্রকে তৈরি করেছে, সমাধানের পথে সেই তাকে নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু তারপরেই তার প্রয়োজন ফুরোবে, যন্ত্রকে চালু রাখা, তার সেবা করা, শুশ্রূষা করা এটাই তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াবে।

মানুষ যন্ত্রের কাছে খাটো হয়ে পড়ছে—হঠাৎ এ কথাই সত্য মনে হ'তে পারে। কিন্তু আসলে যা সত্য, মানুষের কাজ এবং কিছু পরিমাণ চিন্তার ভার যন্ত্র বহন করছে, বহন করছে প্রাগ্-নির্ধারিত উপায়ে—অর্থাৎ কতটা "চিন্তা" করবে, বিবেচনা করবে মানুষই তার সীমারেখা এঁকে দিচ্ছে। যন্ত্রকে আপাতদৃষ্টিতে যত বড়ই মনে হোক না কেন, তার চারিদিকে "লক্ষ্মণের গণ্ডি" কাটা রয়েছে, এই সীমানার বাইরে কাজ বা সমস্যা যত সহজই হোক না সমস্ত কুশলতা সত্ত্বেও যন্ত্র দিশাহারা হয়ে উঠবে। মানুষ আর যন্ত্রের মাঝখানে বিরাট ব্যবধান তাই বরাবরই থেকে যাচ্ছে, যন্ত্র তার সমস্ত যান্ত্রিকতা ও কুশলতা সত্ত্বেও মানুষের অধিক নয় কখনও। যন্ত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে এ পর্যন্ত, কিন্তু তা মানুষেরই সমর্থন ও মনন-শক্তির বলে।

তবু মাঝে মাঝে যন্ত্র মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। প্রথম শিল্প বিপ্লবের পর যে-কোন যন্ত্রের যান্ত্রিক শক্তি—তার নিছক কাজ করার শক্তি মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল। এর প্রতিঘাত সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিচিত্র আলোড়ন সৃষ্টি করে ইতিহাসের প্রবাহকে জটিল করে তুলেছিল। বর্তমানে বিজ্ঞানের বহুমুখী উন্নতির গুণে যন্ত্র আজ "চিন্তা" করতে শিখেছে। সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে। "লক্ষ্মণের গণ্ডি" প্রসারিত হয়েছে। মানুষ বৃহত্তর আঙ্গিনায় যন্ত্রের মুখোমুখি এসে দাঁড়াচ্ছে। মুখোমুখি বললাম, প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বললাম, আসলে কিন্তু মানুষের অনুকূল কাজের জন্যেই যন্ত্রকে এভাবে গড়া হয়েছে। স্বয়ংক্রিয়তা আজকের দিনেরই নূতন নয়, যন্ত্র গড়ার প্রথম দিন থেকেই স্বয়ংক্রিয়তা কিছু পরিমাণ ছিল, আজ তা বেড়ে উঠেছে। যান্ত্রিক দুনিয়া যে ভাবে জটিল হচ্ছে, তাতে তার নিয়ন্ত্রণে শুধু মানুষের বুদ্ধি বা চিন্তা মাত্র নয়, যন্ত্রের "বুদ্ধি" অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয়তাও কাজে লাগাতে হচ্ছে। ঠিক এখানে যন্ত্র আর মানুষ মুখোমুখি এসে দাঁড়াচ্ছে। যন্ত্র যখন মানুষের কাজ করে তখন সেই সীমাবদ্ধ বিশেষ কাজটুকু মানুষের থেকেও তা ভাল ভাবে করে। যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে, তারা তখন মানুষের দাবি বাদ দিয়ে যন্ত্রকেই গ্রহণ করে নেয়। মানুষের কাজ যন্ত্র করে, ফলে মানুষ—শ্রমিক মানুষ কর্মহীন হয়। সম্মুখ প্রয়োজনের কথা ভেবে যন্ত্রের আংশিক সুবিধাগুলির উপর যখন বিবেচনা করা হয়, বেকারীর সমস্যা সামাজিক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। যন্ত্রকে যারা গ্রহণ করে মানুষের এই জীবিকার সমস্যার সমাধানে কার্যকরী হওয়া তাদেরই নৈতিক কর্তব্য। এই কর্তব্য অবহেলিত বা বিস্মৃত হ'লে স্বয়ংক্রিয়তার আশ্চর্য কুশলতা নূতন সমস্যার সৃষ্টি করে। বর্তমানে আমাদের দেশেও তার কিছু প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানী এবং গণতান্ত্রিক সরকারকে এ বিষয়ে এখন থেকেই অবহিত হ'তে হবে।

এ. কে. ডি

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী—কমলা দাশগুপ্ত লিখিত। মূল্য ১০·০০, ৪২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের দেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল, কখনও প্রবল ভাবে, কখনও ধীর গতিতে। এই সংগ্রামে প্রথম যে নারী যোগ দিয়েছিলেন প্রকাশ্যে, তিনি সরলাদেবী চৌধুরাণী। "তিনি কেবলমাত্র নারী-মহলে নন, সমগ্র জাতিরই সেদিন একজন অগ্নিবাহিকা নেত্রী।" সে ১৯৩০-এর অনেক আগে।

ক্রমে ক্রমে বহু নারী এই সংগ্রামে একে একে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৯৩০ সালের লবণ-আইন অমান্য আন্দোলনে মেয়েরা দলে দলে কারাবরণ করেন। তখন থেকে রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে মেয়েদের অবাধ আনাগোনা। কমলা দাশগুপ্ত স্বয়ং একজন এইরূপ মহিলা-কর্ম্মী। ইনি কল্যাণী দাস, সুরমা মিত্র প্রভৃতির সহিত ১৯২৮ সালে "ছাত্রীসংঘ" গঠন করেন। বীণা দাস, প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার প্রভৃতি পরবর্ত্তী কর্ম্মীরাও এই 'ছাত্রীসংঘে'র সদস্য হন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে যে-সকল নারী নানা ভাবে যোগ দেন তাঁদের অনেকের বা অধিকাংশের সংক্ষিপ্ত জীবনী এই বইখানিতে কমলা দাশগুপ্ত লিখেছেন। অধিকাংশের ছবিও আছে। অবশ্য অনেক মেয়ের নাম নানা অসুবিধার জন্য বাদ গিয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে। স্বাধীনতার পর কমলা "প্রগাঢ় নিষ্ঠার সঙ্গেই করে গেছেন কংগ্রেসের প্রচার কাজ এবং তেমনি গঠনমূলক কাজ।"

তাঁর এই বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। আমাদের দেশের শিক্ষিতা ও অর্দ্ধশিক্ষিতা মেয়েরাও যে দেশের জন্য কত দুঃখবরণ করেছেন আজকের মেয়েদের তা জানা উচিত। জীবনটা যে কাজের জন্য একথা ভুললে চলবে না।

শ্রীশান্তাদেবী

তুয়া অনুরাগে : সমর বসু, সন্তোষ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২২, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—১। মূল্য ৪ টাকা।

বিষয়বস্তুর দিক হইতে কোন নূতনত্ব না থাকিলেও লেখার গুণে গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া পারা যায় না। বিশেষ করিয়া, গল্পের মধ্য দিয়া অতীত-কাহিনী বলিয়া লইবার কৌশলটি চমৎকার হইয়াছে। তবে লেখক ঘটনাকে বিস্তৃত করিতে গিয়া ফাঁপড়ে পড়িয়াছেন। যে কাবেরীর প্রেমের মর্য্যাদা রাখিতে বীথিকে গ্রহণ করিতে পারিল না, সে মন্দিরাকে গ্রহণ করিল কোন্ যুক্তিবলে লেখক কোথাও তাহা বলেন নাই। এ অসঙ্গতি বড় চোখে পড়ে। নারী রহস্যময়ী। কোথাও সে শান্ত সংযত, কোথাও সে উদ্দাম —নিজেকে বাঁধিতে জানে না, আবার কোথাও নারী বলিয়াছে, সেই প্রেমই বড় প্রেম - সমাজকে লইয়া যে-প্রেম গড়িয়া উঠিয়াছে। কাবেরী তাহাই চাহিয়াছিল, পাইল না। লেখক এই তিন নায়িকার সৃষ্টি করিয়া নারীর বিভিন্ন দিকটিই দেখাইয়া দিয়াছেন। সুন্দর পরিকল্পনা।

বইখানি সকলেরই ভাল লাগিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

বর্ণালী : হাসিরাশি দেবী, অনন্যা প্রকাশনী, ১৭, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

কয়েকটি কবিতা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবি হিসাবে হাসিরাশির নাম আছে। কবিতাগুলি পূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সুখপাঠ্য। আধুনিক কবিতার ধোঁয়াটে গন্ধ নাই। কবিতা যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদের ভাল লাগিবে এটুকু বলা যায়। কবিতা শিল্প, কিন্তু ছাপার অ-পরিপাটো মনকে পীড়া দেয়।

শ্রীগৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭ ২।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

পঞ্চম সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩৭১

বিবিধ প্রসঙ্গ

শিক্ষক ধর্ম্মঘটের অবসান

বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী মাধ্যমিক পর্য্যায়ের শিক্ষকদের ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়। গত রবিবার ৭ই মার্চ্চ এই কর্ম্মবিরতি ও ধর্ম্মঘট শেষ হয়। ঐ দিন, রবিবার এসপ্লানেড ইষ্ট অঞ্চলে যাহারা বসিয়াছিলেন তাঁহারা সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ সেখান হইতে চলিয়া যান।

রবিবার নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় এই আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহার পর এসপ্লানেডে ঐ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীমতী অনিলা দেবী। তাঁহার মতে শিক্ষকদের অর্থ নৈতিক লাভ না হইলেও নৈতিক জয় হইয়াছে।

সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, স্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেণ্ডারী প্রভৃতি পরীক্ষা যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে (১৫ই মার্চ্চ) সুরু হয় ইহাই তাঁহারা চান। শিক্ষক আন্দোলনের ফলে পরীক্ষা স্থগিত রাখা হইল—এই অজুহাত সৃষ্টির সুযোগ তাঁহারা দিতে চান না। তাহা ছাড়া কতকগুলি দাবিও সরকার বিবেচনার আশ্বাস দিয়াছেন। ঐগুলির মধ্যে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষক ছাড়া অন্যান্য কর্ম্মীদের বেতন হার সংশোধন, ক্রমশঃ বেশী সংখ্যক জুনিয়র হাইস্কুলকে ঘাটতি পূরণযোগ্য অর্থ মঞ্জুরী দান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত হইয়াছে ইহাতে আমরা সকলেই সুখী। শিক্ষার পর্য্যায়ে বিক্ষোভ, আন্দোলন ইত্যাদি চিন্তাশীল লোক মাত্রেরই কাছে অতি উদ্বেগজনক পরিস্থিতির পরিচয় দিতে বাধ্য। এই ধর্ম্মঘট কোন প্রকারে দেশের শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট করে নাই ইহা আশ্বাসের কথা। কিন্তু মাঝে যেভাবে দুইটি মিছিল চালিত হইয়াছিল তাহাতে অশান্তির সম্ভাবনা বেশ স্পষ্টই দেখা দিয়াছিল। কেননা সেই মিছিলে একদল কিশোর ও যুবক "শ্লোগানের" চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ লম্ফঝম্ফ করিতেছিল তাহা অশান্তির পূর্ব্বলক্ষণ রূপে অন্যজাতীয় মিছিলে বহুবার দেখা গিয়াছে। সুখের বিষয় ঐরূপ "বিক্ষোভ প্রদর্শন" আর অগ্রসর হয় নাই। ঐ মিছিলে একদিকে যেমন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অভাবপীড়িত অথচ স্থির মুখ দেখা যাইতেছিল অন্যদিকে সেই সঙ্গেই ঐ ভাবে অপরিণত-মস্তিষ্ক তরুণদের উদ্দাম "বিক্ষোভ সঞ্চালন"ও সমানে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। এই দুইয়ের সংযোগ শুধু যে বিসদৃশ মনে হইতেছিল তাহাই নয়, সেই সঙ্গে মনে এ ভাবনাও দেখা দেয় যে, ইহার পর ঐ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ ঐরূপ তরলমতি

কিশোর বা তরুণদের মধ্যে বিনয়-শৃঙ্খলার শিক্ষাদান করিতে পারিবেন কি না এবং তাহাদের সংযত করিতে সক্ষম হইবেন কি না।

শিক্ষকদের অভাব-অনটন সারা দেশের পক্ষে যেমন পীড়াদায়ক তেমনই লজ্জার বিষয়। কিন্তু শিক্ষাব্রতের সঙ্গে যে সংযম ও ধৈর্য্য এ দেশে চিরদিন বিজড়িত আছে তাহা নষ্ট হইলে শুধু শিক্ষকদের নহে, সমস্ত দেশেরই অমঙ্গল। শিক্ষক বা শিক্ষাব্রতী সম্পর্কিত কোনও আন্দোলনের কথা আলোচনা করার পূর্ব্বে একথা আমাদের বলিতেই হইবে যে, শিক্ষকের—বিশেষতঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্য্যায়ের বিদ্যায়তনে শিক্ষকদের—জীবনযাত্রা পথ এদেশে কোনদিনই সহজ ও সরল ছিলনা। তবে পূর্ব্বকালে অভাব অনটন সত্ত্বেও শিক্ষকের সংসার চলিত, তাঁহাদের পরিবারের ভদ্রস্থ রক্ষা সম্ভব হইত এবং উপরন্তু সমাজে শিক্ষকের মান-সম্ভ্রমও অবস্থার তুলনায় অনেক উচ্চে ছিল। আজ সেই অভাব-অনটন নিদারুণ কৃচ্ছ্রসাধনে পরিণত হইয়াছে। উপরন্তু পরিবারের প্রতিপালন অসম্ভব হইয়া পড়ায় শিক্ষকের জীবনের মান অবনত ও সমাজে প্রতিষ্ঠা লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আজিকার দিনে, যেখানে সমাজে মানমর্য্যাদা সব কিছুরই পরিমাপ হয় টাকার ওজনে এবং সেই টাকা কোন্ পথে আসিয়াছে যখন তাহার কোনও বিচার হয় না তখন সেই সমাজে শিক্ষকের স্থান কোথায় নামিয়া গিয়াছে তাহার বিচারই বৃথা। সুতরাং শিক্ষকদিগের আন্দোলন ও অভাব জ্ঞাপনের সবিশেষ বিচার করার পূর্ব্বে আমাদের বলিতে হয় যে, যদি সমাজের কোনও শ্রেণীর লোকের দেশের অধিকারীবর্গের নিকট অভাব-অনাটন জ্ঞাপন ও তাহার প্রতিকার দাবি করার পূর্ণ কারণ থাকে তবে সে শিক্ষক শ্রেণীর। এবং এ কথাও সত্য যে, বিনা দাবী-দাওয়ায় ও আন্দোলনে বর্ত্তমান অবস্থায় কাহারও কিছু অভাব পূরণ হয় না।

কিন্তু শিক্ষক সম্প্রদায় সমাজের চিন্তাশীল ও বুদ্ধি-বিবেচনাসম্পন্ন স্তরের অংশ। তাঁহাদের দাবি-দাওয়া কি ভাবে কতটা পূরণ হইতে পারে সে সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করিবার মত জ্ঞান-বুদ্ধি তাঁহাদের অধিকাংশেরই আছে—অন্ততঃ তাহাই আমাদের ধারণা। বর্ত্তমান সময়ে যেভাবে শ্রমিক সম্প্রদায়ের দাবি-দাওয়া লইয়া এক শ্রেণীর শ্রমিক-নেতা রাষ্ট্রনৈতিক খেলা খেলিতেছেন—যে খেলার ফলে পশ্চিম বাংলা হইতে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান অন্য প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণও যে সেই জাতীয় নেতার ক্রীড়াকন্দুক হইবেন ইহা আমরা ভাবিতেও পারি নাই। অথচ ঠিক যে ভাবে ঐ শ্রেণীর নেতা যখন কোন প্রকার যুক্তি-তর্ক বা বিচারের অবকাশ না দি। কেবলমাত্র বিক্ষোভ এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া ও নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া দাবি-দাওয়া পূরণের চেষ্টা করেন, শিক্ষকদের দাবি দাওয়ার আন্দোলনে তাঁহাদের নেতাগণেরও কতকটা সেই ধরনেরই কথাবার্ত্তা ও কার্য্য-কলাপ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছি। সুখের বিষয়, ব্যাপারটা আরও গুরুতর অবস্থায় পৌছাইবার পূর্ব্বে শিক্ষকদের মনে স্থির বুদ্ধি ফিরিয়া আসে।

"সরকারী ভাষা" ও সরকারী ভাষা আইন সংশোধন

লিখিবার সময় মাদ্রাজ রাজ্যে আবার হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন চলিতেছে। এই হিন্দী-বিরোধী আন্দোলনের ফলে কোয়েম্বাটুর হইতে পঞ্চান্ন মাইল দূরে নীলগিরি পর্ব্বত-মালার উপর অবস্থিত শৈলাবাস উতকামণ্ডে গুলী চলিয়াছিল। এই ঘটনার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কিছু অংশ নীচে দেওয়া হইল।

কোয়াম্বাটুর, ১২ই মার্চ্চ—আজ উতকামণ্ডে হিন্দী-বিরোধী বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিস দুই জায়গায়—মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের কাছে ও মার্কেট পোষ্ট অফিসের কাছে—লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস ও শেষে গুলী চালায়। গুলীতে ৬৫ বৎসরের এক বৃদ্ধ মারা গিয়াছে। আহত হইয়াছে ১৪ বৎসরের এক বালক সমেত মোট দশজন।

ঐ শহরে আপাততঃ তিন দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি হইয়াছে, কার্ফু বলবৎ হইয়াছে, পাঁচ লরী বোঝাই সৈন্য এবং দুই লরি বোঝাই সশস্ত্র পুলিস পাঠানো হইয়াছে।

সরকারীসূত্রে এখানে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, জনতা মারমুখী হইয়া উঠিলে পুলিস গুলী চালায়। শহরের দুইটি স্থানে গুলীবর্ষণের ঘটনা ঘটে। সহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের সম্মুখে পুলিস জনতার উপর গুলীবর্ষণ করে। আবার ঘটনাটি

ঘটে বাজার পোষ্ট অফিসের নিকট। বাজারে জনতা ছত্রভঙ্গ করার জন্য প্রথমে পুলিস লাঠি চালায়।

ওয়েলিংটনের মাদ্রাজ রেজিমেন্টাল সেন্টার হইতে পাঁচ লরী বোঝাই সৈন্য ও কোয়াম্বাটুর হইতে দুই লরী বোঝাই মহীশূর স্পেশাল সশস্ত্র পুলিস উতকামণ্ডে পাঠানো হইয়াছে। শহরের প্রতি পথের মোড়ে সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছে। টহলদারিও চলিতেছে।

উত্তর আর্কটের কয়েকটি জায়গায় বিক্ষোভকারীরা টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। থাকোলামে একটি ডাকঘর আক্রান্ত হয়। ভেলোরে বাস ও ভ্যানগুলির উপর হিন্দীবিরোধী পোষ্টার লাগানো হয়। —ইউ. এন. আই. ও পি. টি. আই.

মাদ্রাজ প্রদেশে হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন এতদিন শান্ত ছিল। হঠাৎ পুনর্ব্বার এই ভাবে জনতা উত্তেজিত ও অশান্ত হইল কেন সে বিষয়ে সবিশেষ কোনও খবর এখনও আসে নাই। সংবাদটি শঙ্কাজনক সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। কেননা দেখা গিয়াছে জনতা যখন তাহার জন্মগত অধিকার অপহৃত বা ব্যাহত হইতেছে এই সন্দেহ করে তখন সেই বিক্ষুব্ধ জনতাকে গুলী চালাইয়াও শান্ত করা সম্ভব হয় না। এক জায়গায় গুলী চালাইয়া ক্রুদ্ধ জনসমষ্টিকে ছত্রভঙ্গ করিলে অন্য আর এক জায়গায় আগুন জ্বলিয়া উঠে। ক্রমে এই ভাবে বিক্ষোভ ব্যাপক হইলে তাহাকে সামলানো অতি দুরূহ ব্যাপার দাঁড়ায়। আশা করা যায় মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে সচেতন আছেন।

অ-হিন্দীপ্রদেশ গুলির মধ্যে এখন সর্ব্বত্রই প্রতীক্ষা চলিতেছে যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ও সংসদ এই ভাষা সমস্যার নিষ্পত্তি কিভাবে করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার দপ্তর-চালক আমলাবর্গের মধ্যে, হিন্দীওয়ালাদেরই ওজন বেশী এবং কয়েকটি প্রধান দপ্তরের কর্ত্তাব্যক্তিদের—অর্থাৎ মন্ত্রীদের মধ্যেও হিন্দীভাষী বেশী। সুতরাং হিন্দী সরকারী ভাষা হওয়ায় স্বজন পোষণের আর একটি প্রশস্ত পথ খুলিয়া গেল ভাবিয়া আমলাতন্ত্র উৎফুল্ল হইয়া মহা উৎসাহে হিন্দীতে—বা যে অপরূপ মিশ্রভাষীকে এখন হিন্দী বলিয়া চালানো হইতেছে সেই ভাষায়—সরকারী চিঠিপত্র ইত্যাদি চালাইতে আরম্ভ করেন। এই উদ্যমে বাধা পড়িল সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে হিন্দী বিরোধের আগুন জ্বলিয়া উঠায়। সুতরাং "হিন্দী চালাও "আংরেজী হটাও" এই শুভ প্রচেষ্টা —যাহা পুরাদমে চালাইতে পারিলে হিন্দীভাষাজ্ঞানের অভাব হেতু অহিন্দীভাষীকে সরকারী সকল কাজ ও সকল উদ্যম হইতে বঞ্চিত ও ভাষাজ্ঞানের অজুহাতে আত্মীয়গোষ্ঠীর অনেক আকাট মূর্খকে "পার" করা যাইত—স্থগিত রাখিতে হইল।

তারপর অনেক জল্পনা-কল্পনা ও অনেক এলোমেলো কথাবার্ত্তা বলার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসিল এবং সেই অধিবেশনে সকল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের ডাকিয়া সলাপরামর্শ দুইদিন ধরিয়া চলিল। সবশেষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাকে নির্দেশ দেওয়া হয় ঐ প্রস্তাবকে কার্য্যকরী রূপ দিয়া অহিন্দী দেশবাসীকে আশ্বস্ত ও জাতীয় সংহতি রক্ষা করিতে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবটি এক প্রকার "জোড়াতাপ্পি" দেওয়া ও দায়সারা প্রস্তাবই ছিল। নীচে সেটি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। কেননা যেভাবে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দপ্তরের ফন্দিবাজ কর্ত্তারা ঐ ' জোলো" প্রস্তাবে আরও জল ঢালিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করার চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে অহিন্দী ভাষী চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই এবিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন। প্রস্তাবের নিম্নস্থ অনুবাদ আনন্দবাজারের :—

"সরকারের ভাষা নীতি এবং উহার রূপায়ণে আমাদের জনসাধারণের মনে এখনও যে আশঙ্কা রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি দুঃখিত হইয়াছেন। অথচ কংগ্রেসের প্রস্তাবে, জাতীয় সংহতি সম্মেলনের প্রস্তাবে, ভারত সরকারের সিদ্ধান্তে, স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আশ্বাসে এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কর্তৃক ঐ আশ্বাসের পুনরাবৃত্তিতে এই সম্পর্কে সব কিছুই পরিষ্কার করিয়াই বলা হইয়াছে।

জনসাধারণের সম্মতি ও সহযোগিতা দ্বারা সমস্ত জটিল সমস্যার সমাধানের উপরই বৈচিত্র্যে ভরা এই বিরাট্ দেশের স্থায়িত্ব ও উন্নতি নির্ভর করে—কংগ্রেস সর্ব্বদাই এই কথা বলিয়া আসিয়াছে। সেইভাবেই ভাষা সম্পর্কে মৌল নীতি বাহির করার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। এই নীতি সব রাজ্যে সব লোকের জন্যই ন্যায়সঙ্গত হওয়া প্রয়োজন এবং এই নীতি যাহাতে দেশের সংহতি বজায় রাখিতে সাহায্য করে তাহাও দেখা দরকার। এই ব্যাপারে দেশের কাছে মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর পথনির্দ্দেশ রহিয়াছে। ফলে ভাষা নীতি সম্পর্কে কতকগুলি ঐক্যমত লাভ করা সম্ভব হইয়াছে।

সরকারী ও জাতীয় ভাষা

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতীয় সংবিধানে লিখিত হয় যে, হিন্দীই ভারতীয় ইউনিয়নের সরকারী ভাষা হইবে। সেই সঙ্গে সব কয়টি প্রধান আঞ্চলিক ভাষাকেও দেশের

জাতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হইবে। সংবিধানের এই ব্যবস্থা অনুযায়ী আশা করা গিয়াছিল যে, এই ভাষাগুলির ব্যবহার ও উন্নতির জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। কমিটি মনে করেন, এই ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। কমিটি ভারত সরকারকে অনুরোধ করেন যে, সরকার যেন রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতায় হিন্দী এবং সব কয়টি জাতীয় ভাষার ব্যবহার ও উন্নতির দিকে আরও দৃষ্টি দেন। ওয়াকিং কমিটি পরিষ্কার করিয়াই এই কথা বলিতে চান, জাতীয় ভাষাগুলির সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করা সম্ভব না হইলে দেশকে যথেষ্ট আগাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না এবং নূতন, ন্যায়সঙ্গত এবং সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠনের নির্দ্ধারিত লক্ষ্যের দিকে আমাদের কোটি কোটি জনসাধারণকে আমরা পরিচালিত করিতে পারিব না।

তবে জনসাধারণের মনে যথেষ্ট ভীতি রহিয়াছে যে, তাহাদের উপর হিন্দী বা ইংরাজী চাপাইয়া দেওয়া হইবে। স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে তাহা পালন করিবে ওয়াকিং কমিটি পুনরায় বিশেষ জোর দিয়া এই কথা বলিতে চান। কংগ্রেস এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেই।

১৯৬৩ সনের সরকারী ভাষা আইনের তৃতীয় ধারায় আছে—

সংবিধান কার্য্যকরী হওয়ার পর পনের বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও, নির্দ্ধারিত দিন হইতে হিন্দী ছাড়াও ইংরাজী ভাষা চালু রাখা যাইতে পারে—

(ক) ইউনিয়নের সেই সমস্ত কাজের জন্য, যে সমস্ত কাজের জন্য ঠিক ঐ দিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা ব্যবহার করা হইতেছিল। এবং

(খ) সংসদের কাজের জন্য।

সরকারী কাজ

তা ছাড়া, এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে, প্রত্যেক রাজ্য নিজেদের পছন্দমত ভাষায় কাজ করার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন। —সেই ভাষা আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দী বা ইংরাজী হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে আদান-প্রদানের জন্য নির্ভরযোগ্য ইংরাজী অনুবাদ সহ হিন্দী বা ইংরেজী ব্যবহার করিতে হইবে; তবে যে সমস্ত রাজ্যের সরকারী ভাষা এক তাহারা ঐ ভাষায়ই আদান-প্রদান করিতে পারিবেন। তৃতীয়তঃ, অ-হিন্দীভাষী রাজ্যগুলি ইচ্ছা করিলে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত ইংরেজীতে কাজ চালাইতে পারিবেন। চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় পর্য্যায়ে কাজ চালাইবার জন্য অন্তবর্ত্তীকালে ইংরাজী সহযোগী সরকারী ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হইবে। রাজ্যগুলির মত না লইয়া এই ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন করা হইবে না।

ওয়াকিং কমিটি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কতকগুলি রাজ্য ত্রি-ভাষা নীতি কার্য্যকরী করেন নাই। দেশে ত্রি-ভাষা নীতি সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন। জাতীয় সংহতি সম্মেলন এই নীতির উদ্ভাবক। ইহা কার্য্যকরীভাবে রূপায়িত করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলিয়া ওয়াকিং কমিটি মনে করেন।

সর্ব্বভারতীয় চাকুরি

সর্ব্বভারতীয় চাকুরিতে পরীক্ষার মাধ্যমের প্রশ্নটিও ওয়াকিং কমিটি বিবেচনা করেন। ওয়াকিং কমিটি সুপারিশ করেন যে, যতদূর সম্ভব সর্ব্বভারতীয় চাকুরির পরীক্ষা হিন্দী, ইংরাজী বা প্রধান আঞ্চলিক ভাষায় গ্রহণ করিতে হইবে। পরীক্ষার্থীরা যে কোন একটি ভাষা বাছিয়া লইতে পারিবেন।

ইহাতে পরীক্ষার মান সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে। কাজেই ওয়াকিং কমিটি ভারত সরকারকে এই প্রশ্ন এবং সর্ব্বভারতীয় চাকুরিতে বিভিন্ন রাজ্যের হারাহারি ভাগের প্রশ্নটি সব দিক দিয়া বিবেচনা করিতে বলেন।

এই প্রস্তাবের সমস্ত সুপারিশগুলি এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আশ্বাস কার্য্যকরী করার জন্য ১৯৬৩ সালের সরকারী ভাষা আইন সংশোধন সহ সমস্ত ব্যবস্থাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য ওয়াকিং কমিটি ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ করেন।

বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারী এই প্রস্তাব গৃহীত ও প্রচারিত হয়। তার পর দিন যতই যাইতেছে সমস্ত বিষয়টা যেন ক্রমেই আরও "ঘোলাটে" ও অনিশ্চিতের দিকেই চলিতেছে। প্রধানমন্ত্রী ও হিন্দীভাষী কর্ত্তাব্যক্তি ও সংসদের সদস্যবর্গের মনে রাখা উচিত যে, কালের স্রোতে অ-হিন্দীভাষীদের দাবি ভাসাইয়া দেওয়ার চেষ্টা বিপজ্জনক।

হিন্দী সম্পর্কে অনেকের—বিশেষে কতকগুলি লোকের, যাহাদের মনের ভিতরে হিন্দী মারফৎ ভারতে আধিপত্য স্থাপনের লালসা অতিশয় উগ্রভাবে রহিয়াছে—নানাপ্রকার ভুল ধারণা আছে। প্রথমতঃ, হিন্দীভাষী বলিতে যে গোষ্ঠীকে বুঝায় তাহাদের সকলের মাতৃভাষা একই রূপ নহে। সম্প্রতি ভারতের ভাষা সম্পর্কিত পরিবীক্ষণের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, যদিও সর্ব্বসমেত ১৩ কোটি ৩০ লক্ষ লোকে হিন্দী বলে এই বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা একেবারে ঠিক নয়। ঐ হিন্দীভাষী অঞ্চলে ১৯০টি

ভিন্ন ধরনের মাতৃভাষা প্রচলিত আছে। বিহারে ৭৯ লক্ষ ৬০ হাজার লোক বলিয়াছে তাহাদের মাতৃভাষা ভোজপুরী, ৪৯ লক্ষ বলিয়াছে মৈথিলী ও ২৮ লক্ষ বলিয়াছে মাগধী। সেই সঙ্গে যদি যাহারা আবাধী, বাঙ্গরু, ব্রজভাষা, বুন্দেলখণ্ডী ও রাজস্থানীকে মাতৃভাষা বলিয়াছে, তাহাদেরও গণনা করা হয় তবে দেখা যায় যে, খাঁটি হিন্দীভাষী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়াছে যাহারা তাহারা সংখ্যায় কম। ২ কোটি ৩০ লক্ষ লোক এরই ভিতর আছে, যাহাদের মাতৃভাষা উর্দু। পরিবীক্ষণকারীরা এই সকল মাতৃভাষাকে হিন্দীগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলিয়াছেন।

যদি ১৩ কোটি ৩৩ লক্ষ লোককেই হিন্দীভাষী বলা হয়, তবে হিন্দী সারা ভারতের শতকরা ৩০ জনের মাত্র মাতৃভাষা বলা যাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে হিন্দীওয়ালাদের মধ্যে উগ্রপন্থীদের এই "হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের" প্রচেষ্টা যে বাতুলতা হইতে কতটুকু কম তফাতে আছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ সব মহাশয় ব্যক্তিদের কাহারও নিজ মাতৃভাষার উন্নয়ন সম্পর্কে কোনপ্রকার চেষ্টা বা ত্যাগস্বীকার কিংবা আত্মনিবেদনের কোনও নজীর পাওয়া যায় না। উত্তরপ্রদেশে স্বর্গত রামকালী চৌধুরী ও বিহারে প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের প্রচেষ্টাতেই হিন্দীর প্রথম সরকারী স্বীকৃতি লাভ ও পরে উৎকর্ষসাধন সম্ভব হয়। তারপর হিন্দীতে পত্রিকা স্থাপনা, উহা দ্বারা হিন্দীভাষার উন্নয়ন ও হিন্দী-সাহিত্যের প্রগতি, ইহাতেও বাঙ্গালী পথিকৃৎরূপে ও দীর্ঘ প্রচেষ্টা এবং বহু ক্ষতি স্বীকারের কারণে হিন্দীভাষীদের নিকট স্বীকৃতি পাইবার অধিকারী। আশ্চর্যের বিষয়, বর্তমানের এই ভুঁইফোড় হিন্দীওয়ালারা সে-সব কথা কানেও তুলিতে চাহেন না।

এই "কট্টর" হিন্দীওয়ালাদের পুরোভাগে আছেন কয়েকজন প্রধান, যাহাদের অন্যতম হইলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গুরু ও প্রধান শ্রীগোলওয়ালকর। ইঁহাদের সঙ্গে চলিতেছিল এতদিন ভারতীয় জনসঙ্ঘ কিন্তু সেখানে বিভিন্ন নেতাদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় এখন আর ঐ দুই দলের মধ্যে বাঁধন অত মজবুত নাই।

অন্যদিকে হিন্দীকে যাঁহারা মাতৃভাষারূপে প্রেমদৃষ্টিতে দেখেন অথচ সেই প্রেম যাঁহাদের বিচারবুদ্ধিকে বা দায়িত্বজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে নাই এরূপ লোকের কথা এখন ক্রমেই শোনা যাইতেছে। এইরূপ একটি ভাষণ দিয়াছেন সম্প্রতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী এস্ এস্ ধাবন। তিনি এলাহাবাদের এক কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যে ভাষণ দিয়াছিলেন (হিন্দীতেই) তাহার বাংলা অনুবাদের কিছু অংশ নীচে আনন্দবাজার হইতে উদ্ধৃত হইল।

"এলাহাবাদ—ফ্রান্সে ফরাসীর মত হিন্দী কখনও বহু ভাষাভাষী ভারতের সরকারী ভাষা হইতে পারে না। কেননা ফ্রান্সে প্রত্যেক ফরাসীরই মাতৃভাষা ফরাসী। অথচ, ভারতে মাতৃভাষা চৌদ্দটি। হিন্দীর পক্ষে এদের কোনটিকেই নিজের এলাকায় উৎখাত করা সম্ভব নয়।

এখানকার এক কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী এস্ এস্ ধাবন স্পষ্ট একথা বলেন। তিনি অবশ্য হিন্দীতেই কথা বলিতেছিলেন।

তিনি প্রজাতন্ত্রের সরকারী ভাষা হিসাবে হটেনটট সুদ্ধা এমনকি চীনাদের ভাষাও গ্রহণ করিতে রাজী—অবশ্য, জাতির সংহতি রক্ষার উহাই যদি একমাত্র পথ হয়।

ভারতের প্রত্যেক হিন্দীভাষী নাগরিক অবশ্যই আব্রাহাম লিঙ্কনের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিবেন এবং নিজেকে বলিবেন, 'জাতির ঐক্য ও প্রজাতন্ত্রের সংহতির স্থান প্রথমে এবং অবশ্যই সবকিছু দিয়া উহা রক্ষা করিতে হইবে।'

'যদি আমি প্রজাতন্ত্রকে ভিতরে ভিতরে শক্তিশালী করিতে পারি—আমি সানন্দে হিন্দীকে গ্রহণ করিব। কিন্তু যদি দেখি—কেবলমাত্র হিন্দীকে বাদ দিলেই প্রজাতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব—মনে আঘাত পাইলেও আমি প্রজাতন্ত্রের জন্য হিন্দীকে ছাড়িব।'

ভাষা প্রকাশের মাধ্যম—পূজার্চ্চনার বস্তু নয়।

জনসাধারণ বিশেষ কোন একটি ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানে ইচ্ছুক না হইলে সেই ভাষা তাহাদের ভাষা হইয়া উঠিতে পারে না। আজ যদি বাংলা, মাদ্রাজ ও কেরলের জনগণ উত্তরপ্রদেশের জনগণের সঙ্গে হিন্দী ভাষায় ভাবের আদান-প্রদানে অসম্মত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দীর মূল্য অন্তর্হিত হইবে।

তিনি আরও বলেন যে, দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু সংখ্যক হিন্দীর ধ্বজাধারীরা এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সরস্বতী, দুর্গা, কালীর মত হিন্দীকেও যেন কোন একটি দেবী হিসাবে পূজা করিতে হইবে এবং অহিন্দীভাষী জনগণের উপর ঐ পূজা চাপাইয়া দিতে হইবে।

তিনি বলেন যে, কোন জটিল সমস্যাকে ভাবাবেগের দৃষ্টিতে দেখিলে এইরূপ হয়। অথচ এই সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিদের দৃষ্টি হইতে দেখাই সমীচীন। হিন্দীর সমর্থকরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন না যে তাঁহারা যদি মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অহিন্দীভাষীদের উপর হিন্দী চাপাইয়া দেন তাহা হইলে উহাতে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত লাগিবে এবং জাতীয় ঐক্য বিপন্ন হইবে।

তিনি আরও বলেন, 'সমস্যাটিকে এই ভ্রান্তদৃষ্টিতে দেখার ফলে আমরা যাহা করিতে চাহিতেছি তাহার বিপরীত ফল

হইতেছে। ইহা জাতীয় ভাষা না হইয়া ইহার পক্ষে একটি আঞ্চলিক ভাষায় পরিণত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। একটি আধিপত্যশীল অঞ্চল বলপূর্ব্বক তাহার ভাষাকে অন্যান্য অঞ্চলের উপর চাপাইয়া দিতেছে এবং অন্যান্য অঞ্চল তাহার প্রতিরোধ করিতেছে। সুতরাং ইহা একটি সংহতিনাশক শক্তি হিসাবে গণ্য হইবে।"

বিচারপতি ধাবনের নিজ মাতৃভাষার প্রতি প্রেম ও নিষ্ঠা কিন্তু কাহারও চাইতেও কম নহে। তাহার প্রমাণ রহিয়াছে তাঁহার ভাষণের শেষাংশে। উপরে উদ্ধৃত সংবাদের শেষ এইরূপ :

"শ্রীধাবন অতঃপর উত্তরপ্রদেশ ও অন্যান্য হিন্দীভাষী অঞ্চলে ইংরাজীর স্থলে হিন্দী প্রবর্ত্তনের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, হিন্দী আধুনিক ভাবধারা প্রকাশের ভাষা হইতে পারে না ইহা যাহারা মনে করেন তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের মতৈক্য নাই। তিনি বলেন যে, এই ধারণা ভাষাতত্ত্ব ও ভাষার ইতিহাসের ধারার বিপরীত। তিনি বলেন যে, প্রাথমিক স্তরের ভাষাও জটিল ভাবধারা প্রকাশের মাধ্যম হইতে পারে।

শ্রীধাবন বলেন যে, দুর্ভাগ্যের বিষয় এই রাজ্যে হিন্দীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিবার পরেও হিন্দীভাষায় বিদেশী পুস্তকাদি ও সাময়িকপত্র অনুবাদের কাজ সামান্যই অগ্রসর হইয়াছে। অবশ্য ব্যাপকভাবে হিন্দীভাষায় বিদেশী পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদি প্রকাশ করিয়া সেইগুলি সুলভ মূল্যে ছাত্র ও পণ্ডিতদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া এক বিরাট ব্যাপার এবং প্রতি বৎসর উহার জন্য কয়েক কোটি টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু হিন্দীকে ভাব প্রকাশের ভাষা হিসাবে গণ্য করিতে হইলে তাহার মূল্য দিতে হইবে।

তিনি বলেন যে, রাজ্য শুধু হিন্দী প্রবর্ত্তন করিবে অথচ বিশ্বের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও মননশীলতার সঙ্গে তাহার কোন সংযোগ থাকিবে না ইহা সঙ্গত নহে। তিনি বলেন যে, ইহার ফলেই এই অভিযোগ আসে যে, হিন্দীকে দেবী হিসাবে পূজা করাই ইহাদের অভিপ্রায়, ইহাকে গভীর ভাব ও প্রগতিশীল চিন্তার প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে গড়িয়া তুলিবার কোন ইচ্ছা ইহাদের নাই।"

এখন আরও বহু হিন্দীভাষী নেতৃস্থানীয় লোকেই বিচারবুদ্ধির পথে চলিতেছেন। যাঁহারা হিন্দীকে সরকারী ভাষার অধিকার দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাঁহাদের মধ্যেও দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন অনেকে এখন ধীরে চলিবার পরামর্শ দিয়াছেন। জোর করিয়া হিন্দী চাপাইবার চেষ্টা যে নির্ব্বুদ্ধি ও সংহতি-নাশের পথ, একথা তাঁহারাও বুঝিয়াছেন। সম্প্রতি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়ও ধীরে চলার পরামর্শ দিয়াছেন।

ভারতীয় কলাশিল্প নিদর্শন চুরি

কিছুদিন যাবৎ একদল দুর্ব্বৃত্ত এদেশের বিভিন্ন কলাশালা হইতে মহামূল্য ভাস্কর শিল্প ও চিত্রশিল্পের নিদর্শন চুরি করিতেছে। বলা বাহুল্য এই চুরিতে প্রধান অংশীদার ও উদ্যোগী প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই একদল ব্যবসায়ী, যাঁহারা এ জাতীয় শিল্প-নিদর্শন বিক্রয় করেন। ইহাদের খরিদ্দারদিগের মধ্যে বিদেশী শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহকারীরাই বেশী মূল্যবান নিদর্শন ক্রয় করেন। এবং ইহা ভিন্ন কয়েকজন বিদেশী সংগ্রহ-শালার এজেণ্ট ও বিদেশী কলাশিল্পনিদর্শন বিক্রেতাও এদেশে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। ইঁহাদের ফরমাইস অনুযায়ী ঐ সকল স্থানীয় শিল্পকলা ব্যবসায়ী এবং কয়েকজন প্রচ্ছন্ন বিক্রেতা ঐরূপ শিল্প-নিদর্শন সন্ধান করিতে থাকেন। এতদিন এই বিক্রেতা ও ব্যবসায়ী দল স্থানীয় ভদ্রজনের নিজস্ব সংগ্রহ হইতে বাছিয়া এসব কেনা-বেচা করিত। সম্প্রতি বিদেশীরা চড়া দর দিতে প্রস্তুত হওয়ায় এই বিক্রেতাদের মধ্যে অনেকে অসৎ পথে নিজেদের অর্থাগম করিতে চেষ্টিত হইয়াছে।

জাতীয় সংগ্রহশালাগুলিতে রক্ষিত অনেক মহামূল্য শিল্প নিদর্শন এখন ঐ সব অসৎ ব্যবসায়ী নানা কারচুপি করিয়া চুরি করাইয়াছে ও করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে দুইটি দুর্লভ প্রস্তরমূর্ত্তি চুরি যায়। মূর্ত্তি দুইটি বিষ্ণু হৃষীকেশের প্রতিরূপ।

কলিকাতার সরকারী মিউজিয়ম হইতে শুনা যায় যে শিল্পকলার নিদর্শন যাহা চুরি গিয়াছে তাহার সংখ্যা হাজারের কোঠায় পড়ে। এ সম্পর্কে কাণাঘুষা কিছুদিন যাবৎ চলিতেছে। তবে কোনও সরকারী তদন্ত হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই, সুতরাং এখনও উহা "শোনা কথার" পর্য্যায়েই রহিয়াছে। এ বিষয়ে মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষের উচিত সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে সন্দেহভঞ্জন করিয়া দেওয়া।

সংগ্রহশালা হইতে চুরি যদি এই ভাবে চলে তবে এ দেশে আর আমাদের প্রাচীন শিল্প-গৌরবের কোনও নিদর্শন থাকিবে না। সরকার শুধু আইন প্রণয়ন করিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। কবে যে সেখানে চেতনার উদয় হইবে জানি না।

এদেশে এখন দারিদ্র্যের দরুন অসৎ ব্যবসায়ী ও অসৎ কর্ম্মচারীর মিতালী চতুর্দ্দিকেই হইয়াছে। তার সঙ্গে যদি চোর-ডাকাইতও জোটে এবং বেহুঁস সরকারের কৃপায় নিজেদের কুকার্য্য সমানে চালাইতে পারে তবে ত দেশের কপাল সত্যই পুড়িয়াছে।

শিক্ষার গলদ কোথায় ?

শিক্ষা-সমস্যা দিন দিন জটিল হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষা দেওয়া বুঝি আর চলে না। আগে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাইয়া অভিভাবকরা নিশ্চিন্ত হইতেন। কারণ শিক্ষা সম্বন্ধে কোন গলদ ছিল না। এখন স্কুলের খরচ এবং পাঠ্য বইয়ের বোঝা বহিতে অভিভাবকদের প্রাণান্ত হইতেছে। শিক্ষা-সংস্কার কাজে শিক্ষা পর্ষদ বছরে বছরেই নূতন নূতন পরিকল্পনা করিতেছেন। ফলে প্রতি বছরেই জট পাকাইতেছে। আমরা দেখিতেছি পূর্ব্বের শিক্ষা-পদ্ধতি ভালই ছিল। তাহাতে আর যাই হোক, ছেলে-মেয়েরা অন্ততঃ লেখাপড়া শিখিত। এখন আড়ম্বর বাড়িয়াছে, শিক্ষায় ভাঁটা পড়িয়াছে।

দিন দিন বই বাড়িতেছে, অথচ সে বইগুলি শেষ করা যাইতেছে না। ছাত্রদের যদি কোন রকমেই স্কুলে সম্পূর্ণ এবং যথোচিতভাবে পাঠ্যবিষয়গুলি শেখানো সম্ভব না হয়, তবে বিপুল হারে তাহারা ফেল করিবে—এ আর বিচিত্র কি! প্রায়ই শোনা যায়, পরীক্ষার আগে পর্য্যন্ত তাহাদের সিলেবাস শেষ হয় না। যদি সিলেবাসই শেষ করিতে না পারা যায়, তবে অতগুলি বই রাখিবার প্রয়োজন কি? ইহার উপরে আছে যোগ্য শিক্ষকের অভাব। শুধু সিলেবাসের দীর্ঘতার তুলনায় ক্লাস করার দিনগুলির স্বল্পতা এবং শিক্ষকের অভাবই নয়, স্কুল-কর্তৃপক্ষের ও শিক্ষকদের নিস্পৃহতাও ক্লাসে সিলেবাস শেষ না হওয়ার আর একটি কারণ। আর এই কারণটি অল্পবিস্তর প্রায় সকল স্কুল সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। বর্ত্তমানে স্কুলে সিলেবাস শেষ না করাটা যেন একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্কুলের শিক্ষা যেখানে এইরূপ সেখানে ছেলেদের শিক্ষা দিতে হইলে গৃহশিক্ষক রাখিতে হয়। আবার গৃহশিক্ষক একজন রাখিলেই চলিবে না। কেননা, এমন শিক্ষক সুদুর্লভ, যিনি তিনটি গ্রুপের সকল বিষয়েই যথোচিত শিক্ষাদানের ক্ষমতা রাখেন। ইংরাজী শিক্ষাদানে যিনি অদ্বিতীয়, তিনি অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারিবেন এমন কথা নয়। যেসব অভিভাবকের তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্য একাধিক গৃহশিক্ষক রাখার সঙ্গতি নাই, তাঁহাদের একজন গৃহশিক্ষকের উপরই নির্ভর করিতে হয়। ফলে তাহারা যে তিমিরে সে তিমিরে। তা ছাড়া প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্য একজন করিয়া যোগ্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করার আর্থিক ক্ষমতা কয়জনের আছে তাহাও ভাবিবার বিষয়! অথচ ছেলেমেয়েকে শিক্ষাদানের ইচ্ছা সকলেরই। অগত্যা তখন তাঁহাদের গৃহশিক্ষকের অভাবে বিকল্পের খোঁজ করিতে হয়। অর্থাৎ টিউটোরিয়াল বা কোচিং হোম।

এই হোমগুলির কাজ কি? স্কুলের মতই কয়েকটি ছেলেমেয়েকে (তা তারা বিভিন্ন ক্লাসেরও হইতে পারে) একত্রে শিক্ষাদান করা। শিক্ষাদান অর্থ, পরীক্ষায় আসিতে পারে এইরূপ প্রশ্নের সাজেশন দেওয়া। ইহাতে ছাত্রদের জ্ঞানের যে অপূর্ণতা স্কুলে না-শেখানো হেতু জন্মায়, তাহা থাকিয়াই যায়। স্কুলে প্রত্যহ অন্ততঃ পাঁচ ঘণ্টা ক্লাস করিয়াও বিভিন্ন বিষয়ের যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর সাহায্যে যে বিষয়গুলি শিখাইতে পারা যায় না, তাহা একজন শিক্ষক এক বা দেড় ঘন্টায় স্কুলের মতই সমষ্টিগতভাবে সবাইকে একসঙ্গে শিখাইতেছেন। জানিয়া-শুনিয়াও আমরা ইহা চোখ বুজিয়া সহ্য করিতেছি। কারণ ইহার বেশী আমাদের করিবার কিছু নাই।

স্কুলগুলির শিক্ষাদান-পদ্ধতির মধ্যেও এমন কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটি আছে, যাহার পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। স্কুল-শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতি এখন যেন ক্রমশঃ কলেজী ধাঁচের হইয়া যাইতেছে। তাঁহারা অনর্গল বক্তৃতা দিয়া চলিয়া গেলেন—ছাত্রেরা বুঝিল, কি বুঝিল না তাহার খোঁজও রাখিলেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমাদের পবিত্র শিক্ষাদান-কার্য্য এমন এক অপূর্ব্ব পদ্ধতিকে আশ্রয় করিয়াছে, যাহাতে ছাত্রকে সম্পূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় শিখানো হইবে না, তাহার কোনও বিষয় আয়ত্ত করিতে অসুবিধা হইতেছে কিনা প্রশ্ন করিয়া জানা হইবে না এবং আয়ত্ত করিতে না পারিলে তাহাকে পুনরায় বিষয়টি আয়ত্ত করিতে সাহায্য করা হইবে না, তাহাকে কি ধরনের প্রশ্নের সাহায্যে পরীক্ষা করা হইবে তাহার আভাস মাত্রও দেওয়া হইবে না, কি ধরনের উত্তর বাঞ্ছনীয় সে সম্বন্ধেও অজ্ঞ রাখা হইবে, অথচ আশা করিব সে সাফল্যলাভ করুক।

আর একটি কথা এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—স্কুল-কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা। স্কুল-কর্তৃপক্ষ যখনই একটি ছাত্রকে তাঁহাদের স্কুলে ভর্ত্তি করেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ছাত্রটির শিক্ষার দায়িত্ব বর্ত্তায় তাঁহাদেরই উপর। সুতরাং ছাত্রটি যাহাতে অন্তত পাসও করে, এটুকু তাঁহাদের কাছে হইতে প্রত্যাশা করা অনুচিত নয়। অথচ কার্য্যত দেখা যায় কি? না, স্কুল যেন পর্ষদের মত পরীক্ষা গ্রহণের এক কারখানায় পরিণত। মেশিনের মত সেখানে যান্ত্রিক নিয়মে শুধু ছেলেদের পাস-ফেল করানো হয়—সেখানে দায়িত্ববোধের কোনও বালাই নাই—না সিলেবাস শেষ করানোর, না শিক্ষাদানের, না ছাত্রদের অন্তত পাস করিবার

মত তৈরি করানো, না ছাত্রদের শিক্ষামানের উন্নয়নের জন্য কোনও প্রচেষ্টার।

গলদ সর্বত্রই। কিন্তু এ গলদ দূর করিবে কে?

আবার দাবি

আসামের আট হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত মিজো পার্বত্য এলাকার অধিবাসী-সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। আসামের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বিভিন্ন দিকে ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান, ত্রিপুরা ও মণিপুর সংলগ্ন এই জেলাটিকে ভারত রাষ্ট্রের অধীনে মিজো রাজ্য নামে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করার দাবী উঠিয়াছে। মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাভূমি, মিজো জেলা, উত্তর কাছাড় জেলা, কাছাড় জেলা হইতে ১৩টি দেশের ৮০ জন প্রতিনিধির এক সম্মেলনে এই দাবি করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ ও পাকিস্তানের যে অংশে মিজো উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা রহিয়াছে, তাহাকেও এই প্রস্তাবিত রাজ্যের অঙ্গীভূত করার প্রস্তাব হইয়াছে। স্কটল্যাণ্ডের স্বাতন্ত্র্যের ধাঁচে আসাম পার্বত্য রাজ্যের স্বীকৃতির আশ্বাস ভারত সরকার ইতিপূর্বে আসামের পার্বত্য রাজ্যসমূহের নেতাদের দিয়াছেন। নাগাভূমি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইয়াও বৈরী নাগাদের সহিত আপোষের নামে ভারত সরকার নিজের নাগপাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন আবার মিজো রামরাজ্যের দাবি। রাণী গুইদালোর নরহত্যা-বাহিনীর সক্রিয়তাও সুবিদিত। কাশ্মীরের সুদীর্ঘ অমীমাংসায় অভেদ্য ভারতকে ভেদ-বিরোধে জীর্ণ করিবার উৎসাহ প্রশ্রয় পাইয়াছে। উদ্দেশ্য-পরায়ণ বাহির ও ভিতরের শক্তিসমূহ ভারতকে শক্তিহীন ও ভেদ-বিরোধে সর্ব্বদা বিব্রত রাখিবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল উগ্র করিয়া তুলিতেছে। ইহাদের মধ্যে দেশী এবং বিদেশী সাধুবাবাদের মীমাংসার মোড়লী আরও ধোঁয়া বিস্তার করিতেছে। প্রীতির বুলি ও বৈরাগ্যের বুলি হইতে ক্রমাগত সাপ বাহির হইতেছে। ভারত সরকার দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াও যদি দৃঢ় না হন, তাহা হইলে দেশবাসীকে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে।

এদেশের চাষের জমি

পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যশস্য, গুড়-চিনি-শিল্পের কাঁচামাল ইত্যাদি সমস্ত কৃষিপণ্যের ব্যাপারেই পরমুখাপেক্ষী। এজন্য কৃষিজমিতে ফসল বৃদ্ধি করিবার এবং বন্যা, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির উপদ্রব হইতে জমির ফসল রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এই রাজ্যে খুবই বেশী। কিন্তু এজন্য বৎসর বৎসর প্রভূত অর্থব্যয় হইলেও এই সব ব্যাপারে তেমন কোন সুফল পাওয়া যাইতেছে না।

পশ্চিবঙ্গে প্রায় প্রত্যেক বৎসরেই বন্যার জন্য ফসলের সমূহ ক্ষতি হয়। এখানে খাদ্যশস্য, গুড়-চিনি, শিল্পের কাঁচামাল ইত্যাদির যে রকম ঘাটতি রহিয়াছে, বন্যার জন্য সেই ঘাটতির পরিমাণ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্ত্তব্য ছিল এতদিনে মানসিং কমিটির নির্দ্দেশমত সবগুলি প্রকল্প রূপায়িত করা। কেন যে তাহা হইল না সে-বিষয়ে জনসাধারণের সন্দেহভঞ্জন করা কর্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু সেচমন্ত্রী সে বিষয়ে কিছু বলেন নাই। তিনি এই বলিয়া আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, ১৯৪৭-৪৮ সনের তুলনায় ১৯৬৫-৬৬ সনে পশ্চিমবঙ্গে সেচের সুবিধাপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ ছয় গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বিবরণে সেচের প্রসারের বিষয়ে কিছুই বুঝা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে মোট কি পরিমাণ আবাদী জমি আছে, উহার মধ্যে গত ১৯৪৭-৪৮ সনে মোট কত জমি সেচের সুবিধা পাইতেছিল এবং এখন কত জমি সুবিধা পাইতেছে, সেচমন্ত্রী যদি তাহা বলিতেন তাহা হইলেই পশ্চিমবঙ্গে সেচের অবস্থার কতখানি উন্নতি হইয়াছে বুঝা যাইত। তবে সেচমন্ত্রী এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই রাজ্যে সেচের কাজ যতটা অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল ততটা হয় নাই। কেন যে হয় নাই সে-সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই। পশ্চিমবঙ্গে যে কেবলই বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের কাজ উপেক্ষিত হইয়াছে তাহা নহে। এই রাজ্যে কৃষির প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজও বিশেষভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভ করিবার সময়ে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে ভরসা দেওয়া হইয়াছিল যে, দামোদর পরিকল্পনামূলে পশ্চিম-বঙ্গের ৯ লক্ষ ৭৩ হাজার একর খারিফ ফসলের এবং ১ লক্ষ একর রবি ফসলের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই লক্ষ্য পূরণ হইবার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না।

কৃষিজাত পণ্য অধিকতর পরিমাণে উৎপাদনের জন্য এই রাজ্যে কেবল যে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থার এবং বন্যার আক্রমণ হইতে জমির ফসল রক্ষারই দরকার তাহা নহে। ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে ট্রাক্টর জাতীয় উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে চাষ, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজবপন, সার প্রয়োগ এবং কীটপতঙ্গ হইতে ফসল রক্ষা ইত্যাদিরও প্রয়োজন। কিন্তু এই সব কাজও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতেছে না। বর্ত্তমানে এই রাজ্যের খুব কম কৃষকই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ, রাসায়নিক সার, কীটপতঙ্গনাশক দ্রব্য ইত্যাদি পাইয়া থাকে। কৃষকের মূলধনেরও অভাব খুব বেশী। তারপর অনেক জিনিষই সময়মত পাওয়া যায় না। এই সমস্ত সমস্যার সমাধান না হইলে কৃষিজমির ফলন বাড়াইয়া পশ্চিমবঙ্গকে কৃষিজাত পণ্যের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করা সম্ভব হইবে না।

জন্মভূমি

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

"আমি অনেক ধনশালী বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সর্ব্ববিধ উপাদেয় সামগ্রী সম্ভোগ করিয়া যে সুখ পাই নাই, অনেক বালিকা-গৃহিণীর ধূলি নির্ম্মিত ক্রীড়াভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া, তিন্তিড়ীপত্ররূপী চিপিটক ভোজনের অভিনয় ও আহারান্তে তুলসীপত্রের তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। যে বালক রাত্রিকালে যাত্রা শ্রবণান্তর পর দিবস রাম সাজিয়া "রে দুর্বৃত্ত দশানন" বলিয়া রাবণের উদ্দেশে বক্তৃতা না করিয়াছে, তাহাকে কেমন করিয়া বালক নামে অভিহিত করিব?

আমার মনে পড়ে, বাল্যকালে ভৌগোলিক আবিষ্ক্রিয়ার অভিনয় পর্য্যন্ত করিয়াছিলাম। আমাদের বাড়ীর নিকটেই একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। একটি ছোট খাল ইহাতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এরূপ খালকে আমাদের জেলায় "জোড়" বলে। একদিন আমার ও আমার তিনজন সঙ্গীর ইচ্ছা হইল, এই জোড়টির উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করিতে হইবে! এরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষার সংবাদ শুনিতে পাইলে ষ্ট্যান্‌লী সাহেব ভয় পাইতেন কি না জানি না। যাহাই হউক, আমরা চারিজন জোড়ের তীর দিয়া প্রায় দেড় ক্রোশ গিয়া দেখিলাম, একটি ধানের ক্ষেতের মধ্যে সামান্য পয়ঃপ্রণালীর আকারে জোড়টি ঝিরঝির করিয়া বহিতেছে। অনতিদূরে কয়েকস্থানে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া অঙ্গুলি পরিমিত কুণ্ড হইতে জল নিঃসৃত হইতেছে। সেখানে তিনটি ছোট বাবলা গাছ দাঁড়াইয়া আছে। উৎপত্তিস্থল আবিষ্কৃত হইল! এত বড় একটা মহৎ কাজ অঙ্গহীন থাকে কেন? যে সুবৃহৎ স্রোতস্বিনীর উৎপত্তিস্থল নির্দ্ধারিত হইল, তাহার নামকরণ একান্ত অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। আমরা স্ব স্ব নামের আদ্য অক্ষর সংযোজিত করিয়া জোড়টির নাম রাখিলাম "কারাপরা।" হায়, কারাপরা, অপরের কর্ণে তোমার নাম কর্কশ লাগিতে পারে, অপরের নিকট তুমি উপহাসের কারণ হইতে পার, কিন্তু আমার নিকট তোমার নাম বড়ই মধুর। তুমি আমার সোনার শৈশবের কথা মনে পড়াইয়া দিলে। তোমার সেতুর পার্শ্বে তৃণশয্যায় শুইয়া কত সুখস্বপ্নই না দেখিয়াছি। একদিন অপরাহ্নে তোমার সেতুর পার্শ্বে শুইয়া তোমার ক্ষুদ্র জলপ্রপাতের কুলকুল ধ্বনি শুনিতেছিলাম। দুই দিকে দিগন্ত প্রসারিত ধানক্ষেত্র। বায়ুভরে ধানের গাছগুলি এক একবার শুইয়া পড়িতেছিল, আবার মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতেছিল। মধ্যে মধ্যে সমীরণ ধান্যরাজি হইতে সুস্নিগ্ধ অতি মৃদু সুমিষ্ট সৌরভ আনিয়া দিতেছিল—নাগরিকগণ নগরে থাকিয়া যতই অর্থব্যয় করুন না কেন, এই স্বর্গীয় সৌরভ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন। ইহা একমাত্র জনপদবর্গেরই উপভোগ্য। ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তাচলশায়ী হইলেন। পশ্চিমাকাশ যেন গতাসু সূর্য্যের চিতানল-শিখা দ্বারাই লোহিতাভ নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। এই শোভা ক্ষণকাল পরেই অন্তর্হিত হইল। ধূসরবাসা সন্ধ্যাসতীর আগমনে সমস্ত প্রকৃতি অতি প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। পশ্চিম গগনে শুক্রতারা তাঁহারই ললাটে সিন্দূর বিন্দুর মত শোভা পাইতে লাগিল। নদীটি এতক্ষণ সভয়ে ব্রীড়ান্বিতা কিশোরীর ন্যায় মৃদুগীতি গাইতেছিল। এখন সন্ধ্যা সমাগমে যেন সে হঠাৎ মুখরা হইয়া উঠিল। কিন্তু সে মুখরতা কেমন মর্ম্মস্পর্শিনী!···গ্রামের অদূরবর্ত্তী শালবনগুলি আমার বড় প্রিয়। প্রায় দুই বৎসর হইল, আমার এক কবি বন্ধুর সহিত প্রাতে উহার মধ্যে

একটি বনে বেড়াইতে যাই। যখন নিকটে গেলাম, শালপত্রের উজ্জ্বল শ্যামল শ্রী চক্ষুর পরিতৃপ্তি সাধন করিল। এই স্থানের ভূমি ঈষৎ রক্তাভ ও এরূপ কঠিন যে বৃষ্টির পরও কর্দমাক্ত হয় না। আমরা বনস্থলীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বৃক্ষপরিবৃত একটি প্রশস্ত সুশীতল স্থানে উপবেশন করিলাম। স্থানটি এমনই পরিচ্ছন্ন, বোধ হইল যেন বনদেবতাগণ অতিথি-সৎকারের জন্য উহা সম্মার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্থানমাহাত্ম্য বশতঃ আমরা উভয়েই নির্ব্বাক ও আত্মহারা হইয়া এক অননুভূতপূর্ব্ব গভীর শান্তিরসের আস্বাদন করিতেছিলাম; এমন সময় বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দে উদ্বুদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক দেখিলাম, সমীরণের একটি তরঙ্গ বৃক্ষশিরগুলি নত ও শাখাপত্ররাজি আন্দোলিত করিয়া চলিয়া গেল। শালতরুগুলি আবার চিত্রার্পিতপ্রায় নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, বনস্থলী আবার নীরব হইল। আমার বন্ধুগণও কখনও আমাকে কবিত্বাপবাদ দেন নাই। কিন্তু তৎকালে আমার মনে হইল, যেন বনদেবী মস্তক নত করিয়া সহস্র অঙ্গুলির সঙ্কেত সহকারে বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরধ্বনি ব্যপদেশে তাঁহার মানব অতিথি দুইজনকে "স্বাগত" বলিয়া অভিবাদন করিলেন। আমাদের দুইজনের একবার ঐ স্থানের নিকটে বাসগৃহ বাঁধিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ আনন্দ সকল দিনে সম্ভোগ্য নয়; সর্ব্বদা সুলভও নয়। পূর্ব্ব দিবসের আমোদ কি সকল দিন পাওয়া যায়?... বাল্যসহচরী ক্ষুদ্র নদীটির মোহন মন্ত্রে পথ ভুলিয়া কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি! সাধে কি আত্মহারা হই? অপরের নিকট আমি সম্ভ্রান্ত মান্যগণ্য "বাবু" পদবাচ্য হইলেও হইতে পারি; অপরে আমার সহিত ভদ্রতা করে; তাহারা আদর করিলে মনে হয়, বুঝি বা ইহার ভিতর কত অনাদর লুকাইয়া আছে। কিন্তু যে জন্মভূমিতে আমি নগ্নদেহে অসভ্য অবস্থায় বিচরণ করিয়াছি, যাঁহার স্নেহে শরীর মন পুষ্ট হইয়াছে, যাঁহার নিকট আমার দেহ-মনের কোন সংবাদ অজানা নাই, যাঁহার গাছগুলি আমার দেহের সহিত বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে, তিনি আমাকে যেরূপ অকপট স্নেহের সহিত কোলে নেন, এমন আর কে পারে? তাঁহার নিকট আমি যাহা ছিলাম, তাহাই রহিয়াছি। তাঁহার অঙ্গাভরণ এই ক্ষুদ্র নদীটির যে এত মোহিনী শক্তি থাকিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?"

(দাসী, মে, ১৮৯৫। পৃষ্ঠা: ২৬৭—৭১)

বাঙালী হিন্দুর বিবাহ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

সাধারণ মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কৃত্য বিবাহ অনুষ্ঠানবহুল বৃহৎ ব্যাপার। ইহার কিছু অনুষ্ঠান শাস্ত্রীয়, কিছু লৌকিক বা স্ত্রী-আচার। বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে শাস্ত্রীয় অংশের মোটামুটি মিল আছে—লৌকিক অংশে নানারূপ স্থানীয় ও পারিবারিক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত পার্থক্য সমেত সমগ্র অনুষ্ঠানের নিখুঁত বিবরণ-সংকলন বাঞ্ছনীয় হইলেও দুঃসাধ্য কার্য। বিশেষত অনেক অনুষ্ঠান এখন লুপ্তপ্রায়, অল্পপ্রচলিত বা বিকৃত। এখানে আপাতত বিবরণের একটি কাঠামো প্রস্তুত করা যাইতেছে। যাঁহারা নৃতত্ত্ব আলোচনা করেন ইহা তাঁহাদের আলোচনার সহায় হইবে আশা করা যায়—ইহা সাধারণ পাঠকেরও কৌতূহল কথঞ্চিৎ চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবে মনে হয়।

এস্থানে উল্লেখ করা দরকার যে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি সম্পর্কিত খুঁটিনাটি সমস্ত কার্যই শুভদিন দেখিয়া অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহাতে সধবা রমণীরাই (বিশেষ করিয়া যাঁহাদের প্রথম সন্তান জীবিত সেই জিয়স পোয়াতিরা) মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন। অনেক ক্ষেত্রে বিধবাদের উপস্থিতি পর্যন্ত নিষিদ্ধ। প্রতি অনুষ্ঠানে সধবাদের উলুধ্বনি বা জোকার বিশেষ প্রশস্ত। উলুধ্বনি দেওয়ার মধ্যে একটা কৌশল আছে; সকলের সে কৌশল জানা নাই বা অভ্যস্ত নহে। সেইজন্য বর্তমানে শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনির স্থান গ্রহণ করিতেছে। এই উপলক্ষ্যে পূর্ববঙ্গে মেয়েদের গান একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল। গানের উপজীব্য রামসীতার প্রসঙ্গ। যেমন

ওগো রামের মা,
তোমরা রাম সাজাইতে জান না।
রামের সাজ ভাল হ'ল না।
ও সাজ খুলে ফেলে বনফুলে সাজায়েছি দেখ না।

অথবা

আট বার বৎসরের সীতা তেরো নয় রে পোরে,
কও গিয়া সীতার মায়রে সীতা আথৈট করে
লক্ষ টাকার সাড়ী হইলে তোমার সীতা স্নান করে।
স্নান কর ওগো সীতা স্নান কর তুমি,
লক্ষ টাকার সাড়ী তোরে আনিয়া দেব আমি।

বিবাহাদি কার্যের খুঁটিনাটি নানা অনুষ্ঠানে এই রকমের অজস্র গানের প্রচলন ছিল। অনেকে মিলিয়া সমবেত কণ্ঠে এই গান করিতেন। মেয়েদের আর একটি নৈপুণ্য-পূর্ণ কাজ ছিল বরণ। নানা সময়ে, নানা উপলক্ষ্যে এই বরণ করা হইত—এই কাজে এক এক জনের বিশেষ দক্ষতা ও প্রসিদ্ধি ছিল। প্রতিমা বিসর্জনের পূর্বে প্রতিমা বরণের মত বরের বিবাহযাত্রা, বধূসহ শ্বশুরগৃহ হইতে স্বগৃহে যাত্রা এবং সেখানে উপস্থিত হওয়ার সময় বরণ উল্লেখযোগ্য। গান ও বরণ সহ বিবাহের আনুষঙ্গিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে নানাস্থানে নানারূপ স্ত্রী-আচারের প্রচলন ছিল বা আছে। ইহাদের মধ্যে নবদম্পতির জীবন-যাত্রার গতি-নির্দেশ ও ভাগ্য পরীক্ষা অন্যতম। বরকে দিয়া বধূর হাতে চাল দেওয়ান হয়, বধূ তাহা ফেলিয়া দেয়। কয়েকবার এইরূপ করার পর উভয়ের মধ্যে চাল ভাগ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। বর একটি মাটির সরার সাহায্যে জলন্ত প্রদীপ ঢাকিয়া দিলে বধূ ঢাকা খুলিয়া ফেলে। কয়েকবার এইরূপ করার পর উভয়ে মিলিয়া ঢাকা খুলিয়া দেয় এবং বর স্ত্রীর সমস্ত ত্রুটি সারিয়া লইবার প্রতিশ্রুতি দেয়। বর ও বধূর টোপরের দুইখণ্ড সোলা জল ভরা হাঁড়ির জল নাড়িয়া তাহার মধ্যে ফেলিয়া দেখা হয় সোলা দুইখণ্ড মিলিয়া গেল বা কোন্ খণ্ড আগে ও কোন্ খণ্ড পিছনে রহিল। ইহা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর ভবিষ্যৎ ঐক্য, অনৈক্য ও আনুগত্যের পরীক্ষা করা হয়।

বিবাহের প্রথম অনুষ্ঠান আশীর্বাদ, পাটিপত্র, পাকা দেখা, দিনাবধারণ, দই চিনি খাওয়া প্রভৃতি নানা নামে প্রসিদ্ধ। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বিবাহের সম্বন্ধ ও তারিখ পাকা-পাকি ভাবে স্থির হয়। এই উপলক্ষ্যে বরপক্ষ হইতে কন্যাকে ও কন্যাপক্ষ হইতে বরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে দেখা ও কিছু উপহারের দ্বারা আশীর্বাদ করা হয়—কোথাও কোথাও দেনা-পাওনার হিসাব লিখিত ভাবে দেওয়া-নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অভ্যাগতদের যে জলখাবারের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয় তাহার প্রধান উপকরণ ছিল মাঙ্গলিক দধি ও মিষ্টি; তাই অনুষ্ঠান কোথাও কোথাও 'দই চিনি খাওয়া' নামে পরিচিত।

বিবাহের দুই-এক দিন পূর্বে গায়ে হলুদ বা গাত্রহরিদ্রা,

১। শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষচৌধুরী মহাশয় তাঁহার 'আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ পদ্ধতি' গ্রন্থে (কলিকাতা ১৩৩৯) এই কার্যের সূচনা করিয়াছিলেন।

নারকোলভাঙ্গা বা আনন্দনাড়ু করা ও আইবুড়ো ভাত বা অব্যূঢ়ান্ন। প্রথম দুইটি অনুষ্ঠান অনেক স্থলে বিবাহের দিন সকালেও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বরের গায়ে কাঁচা হলুদ-বাটা স্পর্শ করান এবং মেয়ের বাড়ীতে পাঠান তাহার অংশ মেয়ের গায়ে স্পর্শ করান ইহাই হইল গায়ে হলুদ। অনেক স্থানে ইহা অধিবাসের অঙ্গ। কাঁচা হলুদ অতিশয় মাঙ্গলিক বস্তু বলিয়া পরিগণিত; বিবাহাদি ব্যাপারে ইহার বহুল ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। শুভদিন দেখিয়া অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও বিবাহের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের উপকরণ প্রস্তুত করিয়া রাখা একটি স্বতন্ত্র উৎসব। ইহাই নারকোলভাঙ্গা বা আনন্দনাড়ু তৈয়ারি করা নামে পরিচিত। বিবাহাদি কার্যে—বিশেষ করিয়া সংশ্লিষ্ট নান্দীমুখে—নাড়ু ব্যবহৃত হয়। তাহাই এই উপলক্ষ্যে পবিত্রভাবে তৈয়ারি করিয়া রাখা হয়। বিবাহের পূর্বে শুভদিনে অবিবাহিত পাত্রপাত্রীকে ভোজন করাইবার লোকাচারসিদ্ধ অনুষ্ঠান আইবুড়ো ভাত। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে পাত্রপাত্রীকে নূতন কাপড় দেওয়া হয়। এই নূতন কাপড় পরিয়াই অন্ন গ্রহণ করিতে হয়। পঞ্জিকায় এই অনুষ্ঠানের সংস্কৃত প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে অব্যূঢ়ান্ন। কোন কোন অভিধানকার ইহার সংস্কৃত রূপ কল্পনা করিয়াছেন আয়ুর্বৃদ্ধ্যন্ন। তবে আইবুড়ো শব্দের আশয় ইহাতে প্রকাশিত হয় না।

বিবাহের দিন ভোরে দধিমঙ্গলের অনুষ্ঠান দ্বারা কার্যারম্ভ। অন্নপাশন ও উপনয়নেও এই অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। পবিত্র মাঙ্গলিক দধি মুখে দিয়া শুভকার্যের সূচনা করা দধিমঙ্গলের মুখ্য উদ্দেশ্য। গৌণ এবং ব্যাবহারিক উদ্দেশ্য, দধির সঙ্গে অন্যান্য খাদ্যবস্তুর দ্বারা যাহার বিবাহ তাহার উপবাসের ক্লেশ লঘু করা। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে, বিবাহের দিন বিবাহকাল পর্যন্ত বর ও কন্যার উপবাসী থাকিবার প্রথা ছিল। এই দিন দিনের বেলার অন্য কার্য অধিবাস, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ এবং আনুষ্ঠানিক স্নান ও ক্ষৌরকর্ম। অভ্যুদয় বা বৃদ্ধি (নবগৃহ প্রবেশ, তীর্থযাত্রা, পুত্রকন্যার বিবাহাদি সংস্কার) উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া এই শ্রাদ্ধের নাম আভ্যুদয়িক বা বৃদ্ধি। এই শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষ নান্দী (প্রশস্তি) মুখে করিয়া উপস্থিত হন বলিয়া ইহার নাম নান্দীমুখ। এই উপলক্ষ্যে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহীর শ্রাদ্ধ করা হইয়া থাকে। মুখ্যত যাহাদের অনুগ্রহে আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি, আনন্দের সময় তাঁহাদের সকলকে স্মরণ করা হয়। বিবাহান্তে বরকে খাইতে দেওয়ার ভাতের চাল তৈয়ারির একটি অনুষ্ঠান কন্যাগৃহে কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। বিবাহের দিন কন্যার মাতা বা মাতৃস্থানীয়া অন্য কেহ ধান সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া সেই ধানের চাল প্রস্তুত করেন। সাত পাক ঘুরানর জন্য মেয়েকে পিঁড়িতে বসাইবার পূর্বে পিঁড়ির উপর এই চাল ছড়াইয়া দিয়া বরের ছাড়া কাপড় বিছাইয়া দেওয়া হয়। এই চাল দিয়াই রাত্রিতে বরের খাওয়ার ভাত রান্না করা হয়। ধান সিদ্ধ করিবার সময় একটি আথের পাতায় আঠার জন ভেড়য়া বা স্ত্রৈণ পুরুষের নাম লিখিয়া তাহা হাঁড়ির মধ্যে দেওয়া হয়। জ্বালানি হিসাবে আড়াইটি আখের পাতা অন্য কাঠের সঙ্গে উনানে দেওয়া হয়। রন্ধনকারিণীকে মিষ্টি মুখে দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে হয়। বিবাহের পর বর এই চালের ভাত খাইবার ভান করিয়া নববধূকে খাইতে দেয়। এই ভাতের নাম নাড়ার ভাত। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, মানমঙ্গল প্রভৃতি ছড়া প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ আছে। কোথাও কোথাও প্রচলিত জলসওয়া, জলসাধা বা জলভরণ ও সোহাগমাগা অনুষ্ঠানও উল্লেখযোগ্য। অন্নপ্রাশন ও উপনয়নেও এই অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। কয়েকজন সধবা মিলিত হইয়া নিকটবর্তী নদী বা জলাশয় হইতে ও কয়েকজন প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে কিছু জল লইয়া আসেন। এই জল বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। ইহা ঘরের এক কোণে সযত্নে রক্ষিত থাকে। বর-বধূর মাথায় ইহা ছিটাইয়া দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও গৃহকর্তা ও গৃহিণীকে সম্মিলিতভাবে জলাশয় হইতে জল উঠাইতে হয়।

বিবাহের প্রধান কার্য (কন্যাপক্ষ কর্তৃক বরকে কন্যাদান) রাত্রিতে নির্ধারিত শুভমুহূর্তে বা লগ্নে কন্যাগৃহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব লইয়া বর কন্যাগৃহে আগমন করেন এবং কন্যাপক্ষ কর্তৃক যথোচিত সংবর্ধিত হইয়া যৌতুকাদি সহ অলঙ্কৃতা কন্যাকে গ্রহণ করেন। কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে কন্যাকে বরের গৃহে আনয়ন করিয়া দান করিবার রীতি কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও প্রচলিত ছিল। ইহাদের মধ্যে বরপণের বদলে কন্যাপণের প্রচলন ছিল—কন্যাকর্তা বর পক্ষের নিকট হইতে চুক্তিমত পণ গ্রহণ করিয়া কন্যার বিবাহ দিতেন। বর বিবাহ সভায় উপস্থিত হইলে কন্যাদাতা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নূতন কাপড় চাদর দিয়া বরণ করেন। তারপর কন্যাকে পিঁড়ির উপর বসাইয়া দণ্ডায়মান বরের চারপাশে সাত পাক ঘুরান হয় এবং শুভদৃষ্টি বা মুখচন্দ্রিকার অনুষ্ঠান হয়। এই সময় আধুনিক রীতি অনুসারে বর-কন্যাকে দিয়া পরস্পরের মধ্যে মালা বদল করান হয়। মন্ত্রহীন এই লৌকিক অনুষ্ঠানের পর কন্যাদাতা সংস্কৃত মন্ত্র

উচ্চারণ করিয়া বরকে দেবতার মত বিষ্টর বা আসন, পাদ্য (পা ধোয়ার জল), অর্ঘ্য (দূর্বা, আতপ চাল ও চন্দনসহ পুষ্প), আচমনীয় (মুখ ধোয়ার জল), মধুপর্কের (কাঁসার পাত্রে করিয়া জল মিশ্রিত দধি, ঘৃত, মধু ও চিনি) দ্বারা অর্চনা করেন। মধুপর্ক দানের সময় পূর্বে গোবধের রীতি ছিল। গোবধ নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও কন্যাকর্তা গরুর প্রসঙ্গ তুলিতেন এবং বর তাঁহার নিমিত্ত নিরপরাধ গরু বধ করিতে নিষেধ করিতেন ও বদ্ধ গরু ছাড়িয়া দিতে বলিতেন। গরু নাপিতের হেফাজতে থাকিত এবং নাপিত 'গৌর্গৌ' (এই যে গরু এই যে গরু) বলিয়া গরুর উপস্থিতি জানাইয়া দিত। এখন নাপিত 'গৌর-গৌর' শব্দ উচ্চারণ করে বা গৌরবচন পাঠ করে। গৌর বচনে হরগৌরী বা রামসীতার বিবাহ-ব্যাপারের বিবরণ থাকে। তবে পুরা গৌরবচন বর্তমানে অপরিচিত - সামান্য কয়েক ছত্র দিয়াই কার্য সমাধা করা হয়। কোথাও কোথাও কন্যাদানের পরেও এই কার্য করা হয়। অবশ্য বরকর্তৃক গোবধনিষেধের অনুরোধাত্মক বৈদিক মন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা এখনও অব্যাহত আছে। অবশ্য পাঠকের নিকট তাহার তাৎপর্য অজ্ঞাত। কেবল গৌরবচন পাঠের কাজে নয় বিবাহ ও উপনয়নের অন্য কাজেও নাপিতের ও কোন কোন ক্ষেত্রে ধোপার প্রয়োজন হইত। ক্ষৌরকর্ম ও স্নান করান এই দুইটিই ছিল ইহাদের প্রধান কাজ.

আসল কন্যাদানের কার্য নিতান্ত অনাড়ম্বর ব্যাপার। একটি জলপূর্ণ পাত্রের উপরে বরের চিৎ-করা ডান হাতের উপর কন্যার ডান হাত ও তাহার উপর লাল গামছায় বাঁধা পাঁচটি ফল (পাঁচটি হরীতকী, বা আমলকী, হরীতকী, বহেরা, জায়ফল, সুপারি, এই পাঁচটি ফল) রাখিয়া হাত দুইখানি কুশ ও ফুলের মালা দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইলে কন্যাদাতা বর ও কন্যার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম তিন তিন বার উল্লেখ করিয়া সম্প্রদানকার্য সম্পন্ন করেন। সম্প্রদানের পর হাতের বাধন খুলিয়া দেওয়া হয় এবং ফল-বাধা গামছার এক প্রান্ত কন্যার কাপড়ের আঁচল ও আর একপ্রান্ত বরের চাদরের খুঁটের সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহারই নাম গাঁটছড়া বাঁধা। বিবাহের পর আট বা দশ দিনের দিন একটা ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া এই বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হয়। এই কয়দিন বরবধূর একসঙ্গে বা জোড়ে থাকিতে হয়--বিজোড় হইতে নাই। কেবল বিবাহের পরের দিন রাত্রে একসঙ্গে থাকিতে নাই—এই রাত্রি কালরাত্রি নামে পরিচিত। সম্প্রদান-পরবর্তী বিবাহের অনুষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ পাটির উপর বসিয়া করা হয়। তাই বেটীর সহিত পাটি দেওয়ার নিয়ম আছে।

সধবার প্রধান চিহ্ন ও শ্রেষ্ঠ অলংকরণ সিঁথির সিন্দুর। ইহা সম্প্রদানের পর বিবাহের দিন রাত্রিতে, রাত্রিশেষে বা বরের বাড়ীতে বধূবরণের সময় পারিবারিক নিয়ম অনুসারে বরের নিজ হাতে বধূর সিঁথিতে দেওয়া হয়। ইহা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ নহে। তবে উত্তর ভারতে ইহার ব্যবহার ব্যাপক ও সধবাদের পক্ষে অপরিহার্য। সিন্দূর সম্বন্ধে একটি কৌতুককর নিয়ম এই যে, স্ত্রী কখনও স্বামীর নিকট সিন্দুর চাহিয়া ব্যবহার করিবেন না। সধবা রমণীর সিঁথিতে সিন্দুর দেওয়া ও সধবাকে সিন্দুর দান করা মহিলাদের পক্ষে পুণ্যজনক কার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কেহ সিন্দূর পরিবার সময় অন্য কোন সধবা সামনে থাকিলে তাহাকেও সিন্দুর পরাইয়া দেওয়ার প্রথা আছে। সধবাকে আলতা সিন্দূর পরান এয়োসিন্দুর, নিত্য সিন্দুর প্রভৃতি বহু ব্রতের অঙ্গ। বস্তুতঃ সমাজে সধবা রমণীর স্থান বিশেষ গৌরবজনক। বাংলার বাহিরে সধবা সৌভাগ্যবতী বা সোহাগিন নামে পরিচিত। নানা উপলক্ষ্যে সধবাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান ও কাপড়চোপড় দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণভোজনের মত সধবাভোজন ধর্মকার্যের অঙ্গ ছিল। পক্ষান্তরে বিধবা রমণী সর্বসৌভাগ্য-বঞ্চিত। তিনি কঠোর জীবনযাপন ও ত্যাগের প্রতিমূর্তি। সকল প্রকার প্রসাধন ও অলংকরণ তাঁহার পরিত্যাজ্য। বিলাসহীন একাহারে তাঁহার দিন যাপন করিতে হয়। মৎস্য, মাংস, পান সুপারি, ও অন্য অনেক জিনিস তাঁহার বর্জনীয়। মাঝে মাঝে (একাদশী, অম্বুবাচী প্রভৃতিতে) উপবাস বা অন্নবর্জন তাঁহার পক্ষে অবশ্য-কর্তব্য। থান কাপড় তাঁহার পরিধেয়। বর্তমানে অবশ্য অনেকক্ষেত্রে এই কঠিন আচরণে কিছু কিছু শিথিলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

বিবাহের বেশির ভাগ ও প্রধান শাস্ত্রীয় কার্য অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রদানের পরে সেই দিন রাত্রেই বা তাহার পরদিন সকালে বা সুবিধামত অন্য কোন দিন। এই অনুষ্ঠানের সাধারণ নাম কুশণ্ডিকা। মূলতঃ ইহা হোমের অঙ্গ। বর্তমানে কুশণ্ডিকা বলিতে বিবাহের আনুষঙ্গিক লাজহোম, শিলা-রোহণ, সপ্তপদীগমন, পাণিগ্রহণ প্রভৃতি কর্ম ও তাহাদের অঙ্গীভূত হোমকে বুঝায়। লাজ বা খৈ মাঙ্গলিক বস্তু হিসাবে পরিচিত। বধূর ভ্রাতা বধূর হাতে খৈ তুলিয়া দিলে অগ্নিতে সেই খই আহুতি দেওয়া হয়। শিলারোহণে বধূর পা শিলের উপর তুলিয়া দিয়া তাহাকে শিলার মত স্থির হইবার নির্দেশ দেওয়া হয়। শাস্ত্রীয় এই শিলারোহণ ছাড়া বিবাহের স্ত্রী-আচারের মধ্যে বাসিবিবাহ ও বধূ

বরণের সময় বধূকে শিল ও পাথরের থালার উপর দাঁড় করাইবার প্রথা আছে। অধিবাসেও শিলা বিভিন্ন অঙ্গে স্পর্শ করান হয়। পর পর সাতটি আলপনার রেখার উপর দিয়া বর বধূকে এক এক পা করিয়া অগ্রসর করিয়া দেন। ইহাই সপ্তপদীগমন। আনুষ্ঠানিকভাবে বরকর্তৃক বধূর হস্তগ্রহণ করা পাণিগ্রহণ। এই সমস্ত অনুষ্ঠান বিবাহের অপরিহার্য অঙ্গ হইলেও বর্তমানে অল্পবিস্তর উপেক্ষিত। এই উপলক্ষ্যে পঠিত বা পঠনীয় বৈদিক মন্ত্রগুলির মধ্য দিয়া হিন্দু বিবাহের আদর্শ অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে কয়েকটি মন্ত্রের অনুবাদ এখানে দেওয়া যাইতেছে। বধূর প্রতি বরের উক্তি : শ্বশুর শাশুড়ী ননদ দেবর সকলের কাছে তুমি সম্রাজ্ঞী হও (ঋ. ১০।৮৫।৪৬)। তোমার এই যে হৃদয় তাহা আমার হউক, আমার এই যে হৃদয় তাহা তোমার হউক (মন্ত্রব্রাহ্মণ ১।৩।৯)। আমার ব্রতে তোমার হৃদয় স্থাপিত কর—আমার হৃদয়ের সঙ্গে তোমার হৃদয়ের ঐক্য হউক—এক মনে আমার বাক্য অনুসরণ কর - বৃহস্পতি তোমাকে আমার জন্য নিযুক্ত করুন (মন্ত্রব্রাহ্মণ ১।২।২১)। আমার প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ, অস্থির সহিত অস্থি, মাংসের সহিত মাংস ও চর্মের সহিত চর্ম যুক্ত করিতেছি (পারস্কর ১।১৫) প্রজাপতি আমাদের সন্তান দান করুন; আর্যমা বৃদ্ধ বয়সপর্যন্ত আমাদের মিলিত করুন; মঙ্গলময়ী হইয়া তুমি পতিগৃহে প্রবেশ কর; তুমি মানুষের প্রতি মঙ্গলময়ী হও—তুমি পশুর প্রতি মঙ্গলময়ী হও (ঋ ১০।৮৫।৪৩)। বর-বধূর প্রার্থনা : সমস্ত দেবতা আমাদের হৃদয়কে অভিব্যক্ত করুন; মাতরিশ্বা, ধাতা, সরস্বতী আমাদের হৃদয়কে সম্যক্ যুক্ত করুন (ঋ, ১০।৮৫।৪৭)। বরব সম্পর্কে আত্মীয়দের প্রার্থনা : তোমরা এখানেই থাক, বিযুক্ত হইও না। পূর্ণ আয়ু লাভ কর; পুত্র পৌত্রেরসঙ্গে নিজগৃহে আনন্দে অবস্থান কর (ঋ, ১০।৮৫।৪২)।

বিবাহ রাত্রের শাস্ত্রীয় ও লৌকিক অনুষ্ঠান শেষ হইলে স্বভাবত বাসরঘরে বরবধূর বিশ্রামের ব্যবস্থা করার কথা। কিন্তু কার্যতঃ এই বিশ্রামের সুযোগ ঘটিয়া উঠে না—হাস্য-কৌতুকে রাত্রি কাটিয়া যায়। এককালে সুপরিচিত ইহার অশোভন রূপের বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা উপন্যাসে রক্ষিত আছে। রাত্রি প্রভাত হইলে সেজতুলুনি বা আনুষ্ঠানিক বিছানা উঠানর উৎসব। এই সময়ে উপস্থিত সধবাদের যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণাদানের রীতি আছে। পূর্বে পান-সুপারি, পানের মসলা, সরিষার তেল প্রভৃতিও দেওয়া হইত। এই দিন উঠানে চারটি কলাগাছ পুঁতিয়া তৈয়ারি করা ছাদনাতলা বা কলাতলায় বাসি বিবাহের লৌকিক অনুষ্ঠান। ইহার প্রকার মোটামুটি এইরূপ : বর ও তাহার পুরোভাগে বধূ যথাক্রমে শিল ও নোড়ার উপর পা রাখিয়া চার হাত এক করিয়া সূর্যকে অর্ঘ্য দেয়। তার পর, কলাতলায় নবগঠিত ক্ষুদ্র গর্ত বা জলাশয় অতিক্রম করিয়া সম্মিলিত ভাবে কলা-তলা প্রদক্ষিণ করার পরে গৃহে প্রবেশ করে। বাসি বিবাহের পূর্বে বরবধূকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্নান করান হয়।

সাধারণতঃ এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পর বর বধূকে নিয়া নিজ-গৃহে যাত্রা করে এবং সেখানে পৌছিলে বৌ পুচ্ছা (বধূপৃচ্ছা) বৌপরিচয় বা বধূবরণ অনুষ্ঠান হয়। প্রথমে বরবধূকে উঠানে কলাতলায় নিয়া বরণ করা হয়। বধূকে দুধ-আলতা পাথরের থালার উপর দাঁড় করান হয়। তার পর তাহাদিগকে ঘরে নিয়া যাওয়া হয়। যাহাতে মাটিতে পা না পড়ে এই উদ্দেশ্যে উঠান হইতে ঘর পর্যন্ত কাপড় পাতিয়া দেওয়া হয়। ঘরের ভিতরে তৈয়ারি করা কৃত্রিম জলাশয়ের মধ্যে কড়ি থাকে। বধূ সেই লুক্কায়িত ধনরাশি উত্তোলন করে। তারপর, বধূকে গৃহের সমস্ত সামগ্রী দেখান হয় ও তাহার কানে মধু দেওয়া হয় যাহাতে সকলের কথা তাহার কানে মধুর মত বোধ হয়। শ্বশুরগৃহে বধূর প্রথম কার্য দুধ জ্বাল দেওয়া—যাহাতে দুধের মত সংসার উথলাইয়া উঠে।

বিবাহের তৃতীয় দিন ফুলসজ্জা। এই দিন ফুলের সাজে সজ্জিত বধূর সহিত বরের প্রথম বাধাহীন মিলন। এই দিন বা দুই এক দিনের মধ্যে পাকস্পর্শ বা বৌভাত উপলক্ষ্যে নববধূর পরিবেশিত বা স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণের মধ্য দিয়া আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক নববধূকে আপন জন বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া। ইহার মধ্যেই বা ইহার পরে নববধূর পিতৃ-গৃহে প্রত্যাবর্তন এবং সেখান হইতে সুবিধামত পতিগৃহে আনুষ্ঠানিক ভাবে পুনরাগমন বা দ্বিরাগমন। বাল্যবিবাহ প্রথা লুপ্ত হওয়ার ফলে এই অনুষ্ঠান বর্তমানে অপ্রচলিত – কারণ বধূর বার বছর বয়স পার হইলে বা রজোদর্শন হইলে এই অনুষ্ঠানের কোনও প্রয়োজন থাকে না। বিবাহের পরে অনুষ্ঠেয় প্রথম রজোদর্শনের উৎসব বা দ্বিতীয়বিবাহও এখন আর অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ হয় না। পূর্বে এই উপলক্ষ্যে উৎসব আড়ম্বরের প্রাচুর্য ছিল—গর্ভাধান সংস্কার ইহার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান। উৎসবে মহিলাদেরই একাধিপত্য ছিল। নৃত্যগীতাদি অনেক সময় শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করিত।

—•—

প্রত্যাবর্তন

শ্রীশৈবাল চক্রবর্তী

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে মণিমালা তার স্বামীকে ডাকল, কই, শুনছ, বাজারের টাকা দিয়ে দাও ওকে। রান্না করতে করতে উঠে এসেছিল সে, হলুদ-লাগা আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'এ বাড়ীর সব ভাল, শুধু রান্নাঘরটাই যা ছোট—।

—টাকা দেব? কাকে? দাড়িতে সাবান লাগানো বন্ধ করে অরিন্দম স্ত্রীর দিকে তাকাল, লোক জোটালে কোত্থেকে তুমি?

মণিমালা ভুরু কোঁচকাল, বলল, থেকে থেকে যেন নতুন মানুষ হও তুমি। লোক আবার জোটাব কোত্থেকে! যে সব করছে সে-ই ত রয়েছে।

—কে? ঐ শ্রীদাম? অরিন্দমের চোয়াল ঝুলে পড়ে। শ্রীদাম বাজার করবে?

মণিমালা একটু হাসে এবার, বলে, অবশ্য তুমি যদি নিজে যাও তা হ'লে আর ওকে পাঠাই না।

—আরে না না, অরিন্দম তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের কোণে চলে যায়। আমার পকেট থেকে টাকা বার করতে করতে বলে, ঐ বিশ্রী কাজটা থেকে তুমি যদি আমায় অব্যাহতি দাও তাহলে আমি দু'হাত তুলে নাচব।

—তা আর আমি জানি না। কাজকে এড়াতে পারলেই ত তোমার সুখ···মাথা দুলিয়ে বলে মণিমালা। দিন দিন যা কুড়ে হচ্ছ তুমি···।

ব্যস্ ব্যস, এখন আর আমার সুখ্যাতি গাইতে হবে না তোমায়—

বাইরে গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। হাতের কাজ সেরে শ্রীদাম এসে দাঁড়িয়েছে, তার হাতে বাজারের থলি। অরিন্দমের হাত থেকে পাঁচটাকার নোটটা নিয়ে মণিমালা শ্রীদামের হাতে দেয়।

—ভাল মাছ নেবে একটা, বুঝলে? বেশ টাটকা হয় যেন। আর যা যা ফর্দয় লিখে দিয়েছি।

টাকা নিয়ে শ্রীদাম দরজার দিকে পা বাড়ায়। মণিমালা গিয়ে ঢোকে রান্নাঘরে। বাচ্চুকে দুধ খাওয়ানোর সময় হয়েছে।

বাজারটা এখান থেকে দূরে। ঠিক বাজার নয়, হাটের মতন। বেশীর ভাগ লোক সাইকেলে যায়। যারা বেড়াতে এসেছে তারা সাইকেল-রিক্শা ভাড়া করে। শ্রীদামের ভরসা তার নিজের দুটি শ্রীচরণ।

ভাতের গ্রাস মুখে তুলে অরিন্দম বলে, সত্যি, জানো, আমি ওকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। যেন বিশ্বাস করতে পারছ না!

বাটিতে মাছের ঝোল তুলছিল মণিমালা, স্বামীর দিকে না তাকিয়েই বলে, কি বিশ্বাস করতে পারছ না?'

—তোমার ঐ শ্রীদামকে, অমন ভদ্র চেহারা, মিষ্টি কথাবার্তা অথচ মুখ বুজে কাজ করে যাচ্ছে চাকরের মত। বাজারটা পর্যন্ত করে আনল! এ যেন কেমন লাগছে আমার কাছে—

—বোধ হয় জানতে পেরেছে যে, এবাড়ীর বাবু একটি অকর্মার ধাড়ি! রসিকতা করলেও মণিমালার মুখ কিন্তু গম্ভীর।

—না, তা নয়, আমার কিন্তু সত্যি ভারী অদ্ভুত লাগছে।

—আমার ত প্রথমে খুবই সংকোচ লাগছিল ওকে বাজারের কথা বলতে···আসলে যা বুঝলাম, ও অনন্তবাবুর এই বাড়ী দুটো দেখাশুনা করে। অনন্তবাবু বছরের বেশির ভাগ সময়টাই ত কলকাতায় কাটান। হ্যাঁ, যা বলছিলাম ওকে বাজারের কথা বলব কি বলব না এমন সময় ও দেখি নিজেই বলল, আপনার কিছু আনতে হবে নাকি বৌদি? তখনই ত আমি বললাম।

খাওয়া থামিয়ে হঠাৎ সিধে হয়ে বসে অরিন্দম, গলা চড়িয়ে বলে, কি মনে হয় জান?

—আস্তে, মণিমালা সাবধান করে অরিন্দমকে, আড়চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে, ও কিন্তু কুয়োতলায়।

—আমার মনে হয়, এবার গলা নামিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলে অরিন্দম, ও নিশ্চয় ভদ্রলোকের ছেলে। হয়ত লেখা-পড়া জানে।

—দেবে নাকি তোমার অফিসে একটা চাকরি?

—না না, তা নয়, পাতে ভাত মাখতে মাখতে অরিন্দম বলে, চাকরি দেওয়া কি মুখের কথা! কথা হচ্ছে, ভদ্র-লোকের ছেলে, লেখাপড়া জানে, অথচ মুখ বুজে এই রকম

একটা কাজ করছে কেন? নিশ্চয় কিছু একটা ব্যাপার আছে।

—তা থাকা অসম্ভব কি, নিস্পৃহকণ্ঠে বলে মণিমালা। বাচ্চুকে বলে, কই হাঁ করো, বাচ্চুর গালে সে ডালমাখা ভাত তুলে দেয়। তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে, আবার নাও হ'তে পারে। দেখতে-শুনতে ভাল হ'লেই যে ভদ্রলোকের ছেলে হ'তে হবে তারও কি কোন মানে আছে?

—না, তা ত নয়ই, তবে দেখে-শুনে যা মনে হচ্ছিল তাই বললাম···আর কিছু না বলে গ্রাসের পর গ্রাস ভাত মুখে তুলতে থাকে অরিন্দম। উপর্যুপরি বাধা পাওয়ার ফলে তার উৎসাহ উপে যায়।

কাচের ডিশে চাটনি তোলে মণিমালা। আজ অনেকগুলি পদ রেঁধেছে সে। বেশ গুছিয়ে বাজার করেছিল শ্রীদাম আর তাই রাঁধতেও সে বেশ মজা পাচ্ছিল। নতুন জায়গায় দু'দিনের অগোছালো সংসারে কাজ করার একটা আলাদা আনন্দ আছে। আজকে রান্নাঘরে গলদঘর্ম হয়ে রাঁধতে রাঁধতে সেই আনন্দে বিভোর ছিল মণিমালা।

—আমার কিন্তু মনে হয় না যে ও একটা ভণ্ড, মাছের মুড়া ভাঙতে ভাঙতে বলে অরিন্দম, আমি ত দেখছি ওকে, কি ভাবে কেয়ারফুল! কখন কি হুকুম হয় তার জন্যে যেন তটস্থ হয়ে থাকে ও। মণিমালার নিষেধ ভুলে গিয়ে গলার শির ফুলিয়ে সে বলে, দাঁড় কামিয়ে ব্রুশ-বাটি রেখে ঘরে গেছি এসে দেখি যে, সে-সব ধুয়ে-মুছে তাকে তোলা হয়ে গেছে। বল ত, আজকালকার দিনে এরকম একটা লোক পাওয়া যায়? আমাদের শম্ভুটা কি রকম কুঁড়ে ছিল মনে আছে ত তোমার?

—তা আর মনে নেই! হাড় জ্বালিয়ে খেয়েছিল আমার। স্বামীর পাতের দিকে তাকিয়ে মণিমালা বলে কিন্তু তুমি হাত চালিয়ে খাও দিকি। আবার ত ঘুম হবে এক প্রস্থ। তিনদিন এসেছি, কোথাও এতটুকু বেড়ান হ'ল না! আজ বিকেলে কিন্তু ঐ পাহাড়টার ওপর চড়ব।

অরিন্দম চাটনির ডিশটা টেনে নেয়। হাত ধুতে বাইরে এসে আবার শ্রীদামকে দেখতে পেল মণিমালা। স্নান হয়ে গেছে, কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে বালতির জলে চুবিয়ে কাপড় কাচছে সে এখন। তার চুলগুলো সপ্‌সপে ভিজে, বেশ বড় বড় চুল মাথায়। শ্রীদামের গড়ন বেশ ঢ্যাঙ্গা, অরিন্দমের মত নাদুস-নুদুস নয় সে। তার শরীরে অনাবশ্যক মেদ নেই কোথাও।

কাপড়টা কাচার শেষে তারে মেলে দিচ্ছে এখন। আর কোন দিকে দৃষ্টি নেই। যখন যে কাজ করে তখন তাতে একেবারে মজে থাকে। এইবার ঘরে গিয়ে চুল আঁচড়ে, ধুতি পরে দালানে বসে খাবে ও। আসার দিন থেকে মণিমালা ওকে ঘরে খেতে বলেছে কিন্তু শ্রীদাম তাতে রাজী হয় নি। হেসে এড়িয়ে গেছে সে অনুরোধ। ঘরের ভেতর এটা-সেটা কাজ করতে করতে মণিমালা ওর খাওয়া দেখে। ভাতের গ্রাস মুখে তোলা, চিবোনো ও শেষে বাঁ-হাতে গেলাস ধরে জল খাওয়া পর্যন্ত সব ভঙ্গিগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যে ওর কি সখ! ওর সব কিছুই ভদ্রলোকের মত, অরিন্দমের চেয়ে কত কম খায় ও! এত কম খেয়ে ও খাটে কি করে আর ওই ফালি ঘরটায় একা একা ওর দিনরাত কাটে কি ভাবে এই দুই প্রশ্নে রোজ ব্যতিব্যস্ত হয় মণিমালা।

এবার চেঞ্জে আসা সার্থক হয়েছে। আবহাওয়া ভারী সুন্দর, রোদ্দুরে যেন সোনা ঝরে পড়ছে। আকাশ নির্মল, স্বচ্ছ, মাঝে মাঝে দু'টি একটি মেঘ ভেসে আসছে। অল্প শীত পড়ছে, তাই বেশ ভাল—শেষ রাত্তিরে পাতলা একটা চাদর গায়ে টেনে নিলে ফুরিয়ে-যাওয়া ঘুমটা আবার জমে আসতে চায়। সর্বোপরি এই বাড়ীটা! এখানে যে এই রকম একটা ছোট সুন্দর বাড়ী পাওয়া যাবে তা কি ওরা স্বপ্নেও ভেবেছিল! সাঁওতাল পরগণার এই অখ্যাত, গ্রাম-ঘেঁষা শহরে আসতে মণিমালার একটুও মত ছিল না। কোথায় দুধ পাওয়া যাবে, অসুখ-বিসুখ হ'লে ডাক্তার মিলবে কি না এই রকম সাত-পাঁচ দুশ্চিন্তা ছিল তার। তার চেয়ে একটা দামী পাহাড়ী জায়গায় গিয়ে মাসখানেক থাকলে বেশ লোককে বলবার মত ব্যাপার হ'ত একটা। এক মাসের নিটোল এই ছুটিটা একটা চড়া দামের হোটেলে গিয়ে চুটিয়ে উপভোগ করা যেত। নিজের হাতে হাঁড়ি-কুঁড়ি ঠেলার ঝক্কি থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মণিমালার হয়ত নিজেকে সম্রাজ্ঞী ভেবে আত্মপ্রসাদ পাবারও দরকার ছিল। যদিও টাকাগুলো গুণে দেবার সময় বেশ গা করকর করে তবু মণিমালার মনে হয়, এ সুখ তার ন্যায্য পাওনা, এ বিলাস করবার অধিকার সে বছরের বাকী মাসগুলোয় অন্ধকার রান্নাঘরে অফিসের ভাত ফুটিয়ে অর্জন করেছে।

কিন্তু একটা কথা, অন্ততঃ আজকে মণিমালা বুঝতে পেরেছে যে, এখানে এই ছোট দু'ঘরওলা বাড়ীটায় রান্না করে রোদ্দুরে ভিজে কাপড় মেলে যে আনন্দ, খুব নামকরা হোটেলে থেকে এক গাদা টাকা উড়িয়ে ফুর্তি করা তার কাছে কিছু না। এ বাড়ীটা পাওয়া যেন আশার অতীত,

যেন স্বপ্নেও ভাবা যায় নি যে একমাসের জন্যে যে বাড়ীটা ওরা ভাড়া নেবে তাতে এমন একটা মস্ত উঠোন আর দু'-পাশে দুটো ফুলন্ত করবী ফুলের গাছ থাকবে। এর ওপর ঘোরানো সিঁড়িটা গিয়ে হাত মিলিয়েছে খোলা ছাদের সঙ্গে। প্রথমে ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে মণিমালা বিশ্বাসই করতে চায় নি যে, এ বাড়ীটা এখন তাদের হাতের মুঠোয়। সে মনে মনে এঁচে রেখেছিল একটা চোখ-কাণ-বন্ধ এঁদো বাড়ী, যার ধারে-কাছে আলো হাওয়ার ছিটেফোঁটা নেই। কিন্তু একি! ওরা এসেছিল রাত্রে, আকাশে সে সময়ে জ্যোৎস্না ছিল না। কিন্তু তখন সেই সামান্য আলোয় বাড়ীটা কি রকম দেখিয়েছিল তা এখনও তার মনে আছে। মণিমালা একটু ভাবুক প্রকৃতির, কলেজে পড়ার কালে রাজ্যের বই ঘেঁটে সুন্দর সুন্দর লাইনগুলো তুলে রাখত সে খাতায়। মনের মত বাড়ীটা দেখে তার ইচ্ছে হয়েছিল দু'হাতে হাততালি দিয়ে উঠতে, কি কোন চেনা গান গুন-গুন করে গাইতে। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে সে ছাদে উঠে গিয়েছিল। তাদের চন্দননগরের বাড়ীতেও ছিল এমনি খোলা ছাদ, সেখানে সে কতদিন শুয়েছে, পরীক্ষার সময় পড়াশুনো করেছে ঐ ছাদেই কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে। কিন্তু বিয়ে হয়ে যেতে যেমন আগেকার জীবনের অনেক অনুভূতি, আলোর ইসারা আর মাধুর্য্য মুছে গেল তেমনি অদৃশ্য হ'ল ঐ খোলা ছাদটুকু। অরিন্দমের ফ্ল্যাটে দিনরাত্রির প্রভেদ বোঝা যায় কিন্তু ভোর কখন অস্পষ্ট আলোর সংকেত আনে আর দিনান্ত কোন্ সময় তার ম্লান মুখ তুলে ধরে আকাশের দিকে, তা বোঝবার উপায় থাকে না। ওদের ছাদের ওপর পেয়ারাগাছের ডাল নুয়ে থাকত আর সকালে অগুণতি পাখীর কলরবে ঘুম ভাঙত তার। ওপরে উঠে তার ভীষণ ভাল লেগেছিল, প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল নিজেকে, আর কেমন এক বেদনার সঙ্গে মনে পড়েছিল তার অনাহত, সুকুমার শৈশবকে। সীমাহীন আকাশের তলায় সে একা, তাকে ঘিরে ছিল শুধু স্তব্ধ রাতের নৈঃশব্দ। উচ্ছ্বসিত গলায় মণিমালা ডেকেছিল, 'বাচ্চু বাচ্চু, দেখবি আয়।' অরিন্দম ঠোঁটে চুরুট চেপে অল্প অল্প হাসছিল তার ছেলেমানুষী দেখে। ছোটাছুটি করলে তার স্ত্রীকে এত চঞ্চল দেখায়, শরীরে এমন আকর্ষণীয় ঢেউ জাগে তা সে আগে জানত না। শ্রীদামের ওপর তখনও কারও নজর পড়ে নি, উঠোনের একধারে তুলসীমঞ্চে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে, তার মুখ ভাল করে দেখবার উপায় ছিল না। অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে নেমেছিল উঠোনে। দূরের শালবন দেখতে পাওয়ার কথা এই ছাদ থেকে, আলোর অভাবে তাও ঠাহর করা যাচ্ছিল না। অনন্তবাবু বলেছিলেন, 'কেমন মা, ঘর পছন্দ হয়!' 'খুউব', হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে মণিমালা ঘাড় নেড়েছিল। বাচ্চু তখন ছাদময় ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছে। অরিন্দম ব্যাগ খুলে টাকা গুণে অনন্তবাবুর হাতে দিতে দিতে বলেছিল, তা হ'লে ঐ কথাই রইল। এক মাসের ভাড়াটাই রাখুন আপনি।

—বাবুর গুণের কথা শুনেছ? অরিন্দমের গা ঘেঁষে বিছানায় বসতে বসতে ঠোঁট উল্টে বলে মণিমালা, 'আবার বাঁশী বাজানো হয়।'

—না কি? ঝপ্ করে খবরের কাগজটা মুড়ে ফেলে স্ত্রীর দিকে গোল গোল চোখ করে তাকাল অরিন্দম।

—হ্যাঁ গো, তবে আর বলছি কি! গুণের জাহাজ একটি। কালই ত ধরলাম। তুমি কাল যখন বাচ্চুকে নিয়ে বেরুলে আমি ত তখন বাড়ীতে একা। হাতে কাজ ছিল না, তাই একা একা ছাদে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ কানে এল বাঁশীর সুর। প্রথমে ভাবলাম, রেডিওতে বাজছে নাকি? কিন্তু ভাল করে শুনে বুঝলাম যে, না, রেডিও'র বাঁশী এ নয়। ছাদের কোন্ থেকে তখন বাবুর ঘরের দিকে নজর পড়ল। দেখলাম বাবু ঘরে এক বন্ধুর সঙ্গে বসে, ঠোঁটে বাঁশী লাগানো।

স্ত্রীর মুখে কি যেন খোঁজে অরিন্দম। ভোমরার মত কালো চোখ দু'টিতে যেন কত কথা লুকানো! ক'দিনেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে মণিমালার, মুখে সুন্দর লাল আভা দেখা দিয়েছে। অরিন্দম হঠাৎ গর্ববোধ করে। তার স্ত্রী সুন্দরী এ কথা মনে পড়ায় বুক ফুলে ওঠে তার।

—লোকটা অদ্ভুত—তাই না? এত গুণ, চেহারাটা ভাল অথচ কিছু বোঝবার উপায় নেই।

মণিমালা বাইরের দিকে তাকায়। উদার সাঁওতালী মাঠের বিস্তার, দূর-দিগন্তে একটা ধূসর পাহাড়। এই বাধা-বন্ধনহীন প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কত অতীত দৃশ্য ভিড় করে এল তার মনে।

—কি দেখছ? শুয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম প্রশ্ন করে। স্ত্রীর আদর পাবার আশায় তার হাতটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে সে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে আনমনে মণিমালা বলে, না, ওই বাঁশীর কথাই ভাবছি। বেশ বাজাচ্ছিল।

—চেষ্টা করলে রেডিওতে চান্স পেতে পারে ও, অরিন্দম নিজের মত প্রকাশ করে। তার পর হাই তোলে দুটো। ঘুমকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। পিঠের ওপর

মণিমালার হাতের স্পর্শটা বেশ লাগছে। 'তোমার হাতে যেন সোনা মাখানো আছে', একদিন সোহাগ করে স্ত্রীকে বলেছিল সে।

পাশবালিশটা জড়িয়ে পাশ ফিরে শোয় অরিন্দম।

* * *

এখন রাত ক'টা বাজে তা ঠিক বোঝা না গেলেও নিস্তব্ধতা দেখে অনুমান করা যায় যে, বেশ রাত হয়েছে। মণিমালা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, স্থির নিষ্কম্প তার শরীর। বেশ শীত-শীত, গায়ে ভাল করে আঁচল টেনে দিল সে। উঠোনের ওপাশের ঘরটায় টিম টিম করে বাতি জ্বলছে একটা। হঠাৎ বাঁশীর আওয়াজে যেন বাতাস দুলে উঠল, প্রথমে খুব মৃদু কিন্তু তার পর সুরেলা তীক্ষ্ণ স্বর যেন মর্মে গিয়ে বিঁধল। মণিমালা চকিত হ'ল, মধ্যরাতে যেন অব্যক্ত অতীত কথা কয়ে উঠতে চাইছে। সারাদিন কাজ করে গুমোট ঘরে রাত কাটায় যে লোক, সে এমন বাঁশী বাজায় কোন্ সখে? কি খুঁজে বেড়ায় লোকটা মণিমালার জানতে ইচ্ছে করল।

—তুমি?

—হ্যাঁ আমি।

একবার মুখ তুলে মণিমালাকে দেখে শ্রীদাম মাথা নামায়। বাঁশীর সুর হারিয়ে যায়, মুখের ভাষা প্রকাশের পথ পায় না।

রাত কাঁপছে থরথর করে, বাতাস কাঁপছে বাঁশপাতায়। কানে কানে ফিসফিসিয়ে কারা কথা বলছে। রক্তে যেন কিসের সাড়া জেগেছে। কত আশ্চর্য, অদ্ভুত ইচ্ছেরা মাথা তুলছে নতুন ফুলের কুঁড়ির মতন। চোখ বুজে মণিমালা স্মরণ করল তার প্রথম যৌবনের চপলা মূর্তিকে, শরঘাসের জঙ্গলে এক আশ্চর্য হরিণী নিজের নিটোল অঙ্গের জ্যোতি দেখছে অবাক কৌতূহলে!

জানলার গরাদে মাথা তার, চুল এলানো, আস্তে আস্তে বলল, তুমি চন্দননগর ছাড়লে কবে?

—বছর চারেক হবে।

—সেই রেডিও-র কাজ শিখছিলে, তার কি হ'ল?

—কই আর, কিছু হ'ল না। যে দোকানে কাজ করতাম সেই দোকানেই চুরি হয়ে গেল। মালিক দোকান তুলে দিল।

আশ্চর্য! মণিমালা বিস্ফারিত চোখে শ্রীদামের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবল, কথা কইছে বটে, কিন্তু একবারও মুখ তুলে দেখছে না তাকে। ঘরের ভেতরও আসতে বলছে না তাকে।

ভয়, না কি সম্ভ্রম?

পেছনে তার শোবার ঘরের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মণিমালা। অরিন্দম এখন গভীর ঘুমে নিথর। এ সময়টা তার একেবারে নিজস্ব। একটু কান পাতলে তার নাক-ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

—কিন্তু তুমি এটা কি করেছ? একি জীবন বেছে নিয়েছ? অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে মণিমালা। এ কেমন সর্বনাশা সখ তোমার!

—আমার এই ভাল, ম্লান হাসি হেসে বলে শ্রীদাম। চোখে জল চিক্ চিক্ করে ওঠে তার। সেই হাসির আলোয় মণিমালা যেন তার অতীতকে স্পষ্ট দেখতে পেল। কত কালের পথঘাট, আকাশ-বাতাস, ঘর-বাড়ী মন্দির সব অবিকল অটুট রূপ নিয়ে ফুটে উঠল তার সামনে। এই ক'বছরের মধ্যে কি আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে শ্রীদামের মধ্যে। কোথায় সেই উদ্দাম চঞ্চলতা আর কোথায় এই অভিমান আর বিনয়! সমস্ত পাড়াটাকে মাথায় নিয়ে যে একদিন হৈ হৈ করে বেড়াত, যে না থাকলে সমস্ত আমোদ-প্রমোদ মাটি হয়ে যেত, আজ সে কুঁকড়ে কতটুকু হয়ে গেছে! মণিমালার তখন প্রথম যৌবন, তার মনের মধ্যে একটা সদাচঞ্চল কৌতূহল, একটা অধীর-অস্থির উত্তেজনা! ছাদে বসে ফার্স্ট ইয়ারের পড়া তৈরি করতে করতে মাথা তুলে কতবার সে এই গৌরবর্ণ যুবকটিকে দেখেছে। কিন্তু কোনদিন কথা বলার সুযোগ হয় নি।

মণিমালার মনে আছে শ্রীদামের সঙ্গে তার প্রথম আলাপ হয় মাধবীদের বাড়ীতে। মাধবীর বাবা ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। সেই সময় চন্দননগর খুব সম্ভব নবদ্বীপ থেকে এক যাত্রার দলকে চন্দননগরে আনিয়েছিল, সেই যাত্রার ব্যাপারে আলাপ করবার জন্যে শ্রীদাম ও আরও কয়েকটি ছেলে অর্দ্ধেন্দুবাবুর কাছে এসেছিল। কথা বলতে বলতে শ্রীদাম হঠাৎ মাধবীকে ডাকতে ডাকতে ভেতরে ঢোকে।

ঘরে তখন মণিমালা একা। মাধবী তার বুড়ো দাদুকে ভেতরের উঠোনে বসিয়ে স্নান করাচ্ছিল।

হঠাৎ ঘরে ঢুকে মণিমালাকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল শ্রীদাম। কিন্তু পরমুহূর্তে সে ভাব সামলে নিয়ে হাসি হাসি মুখে বলেছিল, 'মাধু কোথায়?

—ও ভেতরে গেছে। লজ্জায় আড়ষ্ট মণিমালা কোন-রকমে বলতে পেরেছিল। সে বয়সটায় ভারী লাজুক ছিল সে। হাতের তেলো ঘামে ভিজে উঠেছিল।

—আপনি রমেন দা'র ভাইঝি না? ঐ তেঁতুলতলার একতলা বাড়ীটাই ত আপনাদের?

মণিমালা ঘাড় নেড়েছিল।

—আপনাকে দেখেছি আমি।

আমিও আপনাকে দেখেছি উত্তরে মণিমালা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু সে-বয়সে অনেক মনের কথা মুখে স্পষ্ট করে বলা যেত না।

মাথা নামানোই ছিল, কয়েক মুহূর্ত পরে মুখ তুলে হঠাৎ দেখল যে শ্রীদাম তারই দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। যেন সমুদ্রে ক্লান্ত নাবিক দূরে তটরেখা দেখতে পেয়েছে।

মাঝের এই ক'টা বছরে যে ওর ওপর দিয়ে খুব ঝড় বয়ে গেছে তা মণিমালা বুঝতে পারল ওর নিষ্প্রভ চোখেরই দিকে তাকিয়ে। সেই আগ্রহ আর উজ্জ্বলতা মুছে গিয়ে এখন সেখানে শুধু লেখা রয়েছে আজ্ঞাবহনের প্রতিশ্রুতি।

ভেতরে চোখ ফেলে মণিমালা তার নিরাভরণ ঘরটিকে দেখে। সতরঞ্চি দিয়ে মোড়া ময়লা বিছানা আর রংচটা একটা টিনের স্যুটকেশ ছাড়া আর কিছু সম্বল নেই শ্রীদামের।

আর একটি জিনিস হ'ল ঐ বাঁশী।

মণিমালার মনে পড়ল চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো; ভরা আসরে বসে শ্রীদাম বাঁশী বাজাচ্ছে। প্রায় হাজার কি তারও বেশী লোক সেই আসরে বসে মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রীদামের বাঁশী শুনত। সে বাঁশী শুনতে শুনতে কি রকম উথাল-পাথাল করত মণিমালার বুক, বাঁশী থামলে তবে যেন সে সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারত।

—কেন তুমি অমন করে বাঁশী বাজাও?

—বাজাবো না? হাসি মুখে জিগ্যেস করেছিল শ্রীদাম। তখনও তার হাতে বাঁশীটি ধরা।

—না। বাগানের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল মণিমালা। বাড়ীর ভেতরে এক চোখ তার আর এক চোখ সামনে দাঁড়ানো লোকটির ওপর। 'বাঁশী শুনলে কষ্ট হয়। আমি যখন থাকব না, তখন বাজিও।'

সেই থেকে ওপাড়ায় আর কেউ শ্রীদামের বাঁশী শুনতে পায় নি। দূর দূর থেকে ডাক এলে সেখানে ছুটে গেছে, বাঁশী শুনিয়ে মাতিয়ে এসেছে। টাকার তোড়া, সোনার আংটি উপহার নিয়ে এসেছে। কিন্তু রথতলায় আর না।

মাধবী পর্যন্ত অনুযোগ করেছে মণিমালার কাছে, 'ভাখ না ছিদামদাটা কি, এত করে সবাই বলছে তবু বাবুর মন উঠছে না। বেশী অহঙ্কার…।'

শুনতে শুনতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মণিমালার মুখ, মাধুকে বলতে ইচ্ছে হয়েছে, 'বাঁশী শুনে বুকের ভেতর ভূমিকম্প হয় নি ত তোর, তুই এর যাদু বুঝবি কি?'

আজ আবার সেই বাঁশী বাজল। আজ তার বুকের মধ্যে যেন ভাঙ্গা গলায় কে কেঁদে উঠল তা শুনে।

সময়টা মাস-বছরের হিসেবে কম, কিন্তু এক সওদাগরী অফিসের পেটমোটা বড়বাবুর গৃহিণী হয়ে চার বছর শহুরে জীবনযাপন করে, দু'বেলা পান-দোক্তা খেয়ে আর নিয়মিত হারে সিনেমা দেখে আজ তার কাঠামোটাই যেন বদলে গেছে। সেই দিনকার সেই সাধ আর স্বপ্নকে কবরস্থ করে তার ওপর এ সম্পূর্ণ অন্য কেউ দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ শ্রীদাম চোখ তুলে তাকায় তার দিকে, সে দৃষ্টিতে যেন আহ্বানের ভাষা!

মণিমালার বুকটা ধক্ করে ওঠে। অরিন্দমের ভয় নয়, রাত্তিরের এই সময়টা সে ডাকাত পড়লেও ওঠে না।

ভয় তার নিজের কাছে, রক্তে এমন কল্লোল জেগেছে যে তার ভয় হচ্ছে সে নিজেই তাতে ভেসে যাবে কি না।

—তুমি ত সুখী? ভালই আছ, তাই না···সঙ্কোচ-হীন দৃষ্টি তুলে শ্রীদাম তার দিকে তাকায়।

—হ্যা, ভালই আছি। মন্দটা আর কোথায়? খাওয়া-পরার অভাব নেই কোন।

শ্রীদামের চোখ দু'টো ধক্ করে জ্বলে ওঠে। বোধ হয় তার মনে পড়ে যায় যে বাঁশী বাজানোর গুণে হাজার চেষ্টা করেও সে একটা চাকরি জোটাতে পারে নি।

আর মণিমালার মনে পড়ল যে, বাধাটা তার দিক থেকেই এসেছিল। শ্রীদামের প্রস্তাব ছিল কাউকে কিছু না বলে গৃহত্যাগ করা; মণিমালা তাতে রাজী হ'তে পারে নি।

—তুমি কোথায় যাবে এর পর? বাঁশীটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে প্রশ্ন করে মণিমালা।

—ঠিক নেই; অন্ধকারকে উদ্দেশ করে বলে শ্রীদাম, আমি ভেসে পড়েছি স্রোতে, আমাকে যে দিকে নিয়ে যাবে আমি সেদিকেই। একটু থেমে বলে, 'তবে দুর্গাপুরে আমার বন্ধু ঠিকাদারী পেয়েছেন সেখানে একটা কাজের ব্যবস্থা হতে পারে। তাই ভাবছি—'

কথা শেষ হবার আগেই শ্রীদামের একটা হাত চেপে ধরে মণিমালা, ফিস্‌ফিস্ করে বলে, আমায় নিয়ে যাবে?

—কোথায়? শ্রীদাম যেন ভূত দেখে।

—তোমার সঙ্গে।

শ্রীদামের মুখে একটা ভয়ের ছায় পড়ে। সে মণিমালার পুষ্ট শরীরের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়।

—বিশ্বাস করো, এ আমার মৃত্যুর সমান। দিন দিন

আমার কাছে বিষ হয়ে উঠেছে···তুমি আমাকে নিয়ে চল। যেখানে খুশী, যতদূর ইচ্ছে···আমি খুব খাটব, নতুন সংসার গড়ব আমরা।'

শ্রীদামের হাঁটুতে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মণিমালা। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল চন্দননগরের খোলা মাঠ, আর অনেক বিস্তৃত গুঞ্জনের মধ্যে শুনতে পেল আকুল-করা বাঁশী—তাকে ডাকছে।

কি করবে ভেবে পায় না শ্রীদাম। একটা হাত সে রাখে মণিমালার পিঠের ওপর।

এমন সময় বাচ্চুর কান্না শুনতে পাওয়া যায়। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে বসে মণিমালা। নিশ্চয় বিছানায় তাকে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে না পেয়ে ভয় পেয়েছে ছেলেটা। ধড়মড়িয়ে উঠে আঁচলে চোখ মুছে সে শোবার ঘরের দিকে ছুটে যায়। বাচ্চুর কান্না ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠছে। দরজা খুলে, মশারি তুলে একেবারে ওকে বুকে টেনে নেয় মণিমালা। 'এই যে সোনা, কি হয়েছে, এই যে আমি। না না, কাঁদে না।' বাচ্চুর কান্না তখন থেমেছে কিন্তু অভিমানে ঠোঁট দু'টি ফুলে [illegible], এমন কোনদিন হয় নি। চিরকাল সে হাত বাড়িয়েই [illegible]য়েছে।

—এই ত, কাঁদে না, রাগ হয়েছে? আহা রে···আদরে সোহাগে ছেলেকে পিষে ফেলে তার মুখ চুমোয় ভরিয়ে দিতে দিতে মণিমালা ভাবে এমন একটা দুঃস্বপ্ন দেখার পর আর এ বাড়ীতে থাকা যায় না। কালই অরিন্দমকে বলতে হবে।

স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম

পাশ্চাত্যদেশে স্বদেশের স্বার্থ অন্বেষণের নাম পেট্রিয়টিজম। ইহার সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের বিরোধ আছে। কারণ, দেখা যাইতেছে যে, মানুষ ইহার প্রেরণায় অন্য দেশের অনিষ্ট করিয়া, অন্য দেশকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, অন্য দেশ লুণ্ঠন করিয়া, অন্য দেশকে ঠকাইয়া, স্বদেশের ধন ও ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু দেশভক্তির সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের এইরূপ বিরোধ যে থাকিবেই, তাহা নয়। "আমরা অন্য দেশকে বা অন্য জাতিকে আমাদের দেশের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে দিব না, আমাদের দেশ ও জাতিও অন্যের কোন অনিষ্ট করিবে না; আমরা এইভাবে আমাদের দেশের মঙ্গল-চেষ্টা করিব;" এবম্বিধ স্বদেশহিতৈষণা বিশ্বপ্রেমের অবিরোধী। ইহা বিশ্বহিতৈষণার অনুকূলও এই পর্য্যন্ত, যে, আমাদের দেশও ত বিশ্বের অন্তর্গত; তাহার হিতচিন্তা সুতরাং আংশিকভাবে বিশ্বহিতেচ্ছা। কিন্তু ইহাও অবশ্যস্বীকার্য্য যে ইহা বিশ্বপ্রেম অপেক্ষা সংকীর্ণ আদর্শ। বুদ্ধদেব কেবল মগধবাসী বা ভারতবাসীর মুক্তির জন্য নির্ব্বাণের পথ আবিষ্কার করেন নাই, সকল মানবের জন্য করিয়াছিলেন; তাঁহার হিতৈষণা স্বদেশহিতৈষীর উপচিকীর্ষা অপেক্ষা উদার ও মহৎ। কিন্তু তথাপি স্বদেশপ্রেমের প্রয়োজন আছে। নবজাত শিশুটির প্রতি মায়ের একনিষ্ঠ বাৎসল্যকে তুমি সংকীর্ণ বলিতে চাও বল, কিন্তু উহাই বিধাতার মঙ্গলবিধান। বৈষ্ণব ভগবানকে শিশু গোপালরূপে দেখিয়া তাঁহার প্রতি বাৎসল্য অনুভব করেন। আমাদেরও দেশপ্রীতি নিজ নিজ সন্তানের প্রতি বাৎসল্যের মত প্রগাঢ় হইতে পারে না কি?

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২১

স্বাধীনতা-সাধক জ্ঞান-তাপস

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

যৌবনে স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ দেশসেবক। তারপর সুদূর বিদেশে বছরের পর বছর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সঞ্চালক। এবং উত্তর জীবনে দেশের প্রাচীন রাষ্ট্রনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক ইতিহাস যুগে যুগে বিবর্তিত সমাজ-পদ্ধতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে আত্মনিমগ্ন তাপস। অগ্নিযুগের এক আদি যোদ্ধা, পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। বাংলা দেশের মনীষী ও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এমন একনিষ্ঠ যোদ্ধা আর ক'জন ছিলেন?

একদিকে আপোস-বিবর্জিত বিপ্লব-সাধক, অন্যদিকে দুশ্চর নিরলস জ্ঞানযোগী। এই দুই আপাত-সম্পর্ক-হীন ধারার সমন্বয়ে গঠিত ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। শ্রদ্ধা-নিষ্ঠ জাতীয়তাবোধ এবং নির্মোহ আন্তর্জাতিক দৃষ্টি তাঁর চরিত্রকে এক মহৎ স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত করেছিল। একাধারে স্বাধীনতার সাধনা এবং জ্ঞানের আরাধনা যেন ইউরোপীয় মনের সঙ্গে ভারতীয় আত্মার সম্মিলন ঘটিয়েছিল তাঁর মধ্যে।

প্রাগ্-ইতিহাসের বিস্মৃত অতীতকাল থেকে সমগ্র মানব সমাজের বিকাশের নানা পর্যায়ে তাঁর যেমন অক্লান্ত অনুশীলন ছিল, তেমনি বর্তমানের নানা দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনে অপরিসীম আগ্রহ। সেজন্যে তিনি ছিলেন যুগপৎ জ্ঞানপ্রবীণ এবং চিরনবীন আধুনিক। জ্ঞানচর্চার বিপুল বিস্তৃত ক্ষেত্রে যাঁর অবাধ সঞ্চরণ, বিংশ শতকের ভারতীয় বিপ্লববাদের তিনি অন্যতম প্রধান প্রবক্তা! একটি মহাজীবন ভূপেন্দ্রনাথের।

মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের জন্যে স্বাধীনতার আন্দোলন এবং বহুমুখী বিদ্যাচর্চা এই দুই বিভাগেই একাধিক বিষয়ে তিনি পথিকৃৎ হয়ে আছেন। তাঁর জীবনবৃত্ত বিশ্লেষণ করে সেই সব গৌরবময় অবদানের কথা স্মরণ করা দেশবাসীর কর্তব্য।

[illegible] তাঁর সম্পাদিত স্বনামধন্য 'যুগান্তর' পত্রিকার (১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রথম প্রকাশ) কথা। বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী সংবাদপত্রের জগতে 'যুগান্তর' এক ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল বলা যায়। সেই অগ্নিযুগের চরমপন্থী ভাবধারা এবং সশস্ত্র সংগ্রামের আদর্শ প্রচারে এই পত্রিকা শ্রেষ্ঠ পথ-প্রদর্শক। তাই ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির প্রথম লক্ষ্য হয় 'যুগান্তর'।

স্বরাজ-সাধনার সেই আদি যুগে নব-জাগ্রত চেতনার প্রসারে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল। পত্রিকার মাধ্যমে আদর্শ প্রচারের ফলে আন্দোলনের অগ্রগতি অনেকাংশে সম্ভব হ'ত। উনিশ শতকের শেষ ভাগ ও বিশ শতকের সূচনা থেকেই বাংলা দেশে উন্মেষ হয় এক নতুন ও প্রবল জাতীয়তাবাদের। এই অনমনীয় জাতীয়তাবোধ আর আবেদন-নিবেদনের থালিতে দীন প্রার্থনার অর্ঘ্য সাজিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারে নি। নতুন শতকের ঊষালগ্নে দেখা দিতে থাকে বিপ্লবী জাতীয় চেতনা। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শ তরুণ বাংলাকে মহান্ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। তারই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাংলা দেশে প্রথম বৈপ্লবিক সমিতি, গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ শতকের প্রথম দু'বছরের মধ্যেই। সে প্রসঙ্গ এবং ভূপেন্দ্রনাথের সে ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তির কথা পরে আলোচিত হবে। এখানে বক্তব্য এই যে, সেই নতুন চেতনা ও ভাবধারার বাহনরূপে যোগ্য মুখপত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয় নেতৃবর্গের মনে। তারই সুবর্ণ ফল 'যুগান্তর'।

'যুগান্তর'-এর পরিকল্পিত স্বাধীনতার আদর্শ ছিল পূর্ণ স্বরাজ। পূর্ববর্তী যুগের নরমপন্থী নেতৃত্বের মতন তার লক্ষ্য ব্রিটিশ শাসনের মূল বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। নবযুগের এই বাণী প্রচারের মুখপত্ররূপে বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'নিউ ইণ্ডিয়া,' ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' এবং শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ সম্পাদিত 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকাত্রয়ের নামও 'যুগান্তরে'র সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু উক্ত তিনটির কোনটিই শেষোক্তের তুল্য অগ্নিমন্ত্রের বাস্তব উপাসনা করে নি। সশস্ত্র সংগ্রামের আদর্শ 'যুগান্তরে'র তুল্য ভাবে আর কোন পত্রিকায় প্রচারিত হয়'নি সে যুগে। 'বন্দে মাতরম', 'সন্ধ্যা' এবং 'নিউ ইণ্ডিয়া'-তে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশলস্বরূপ প্রধানত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথই অনুসরণ করা হ'ত। 'যুগান্তর' সেজন্যে অনন্য ছিল

সেকালে। এবং তার প্রথম সম্পাদকরূপে ভূপেন্দ্রনাথের নামও স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে বিস্মৃত হবার নয়।

সে পর্বে আরও এক কারণে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তখনকার প্রথম রাজদ্রোহের মামলায় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অভিযুক্ত হন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ: 'যুগান্তরে' কয়েকটি আপত্তিকর রচনা প্রকাশ। অভিযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বিদেশী শাসকের ইঙ্গিতে ও স্বার্থে পরিচালিত বিচারালয়ে এই উপলক্ষ্যে আরও একটি ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। আইনজ্ঞের সাহায্যে আত্মপক্ষ সমর্থনে দেশপ্রেমিকের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। বিচারালয়ের রীতি অনুসারে আইনের সহায়তায় আত্মসমর্থনে অসম্মত হ'লেন তিনি। আদালতে একটি বিবৃতি দিয়ে সেই বিপ্লবী পত্রিকার যোগ্য তরুণ সম্পাদক জানালেন যে, মাতৃভূমি ভিন্ন কারুর কাছে কোন জবাবদিহি করতে তিনি বাধ্য নন। যে স্বদেশকে তিনি সেবা করতে চান একমাত্র তার কাছেই তিনি দায়ী।

তাঁর এই দৃপ্ত, নির্ভীক ভাষণে নব জাগ্রত বাংলার প্রাণ-স্পন্দনই ধ্বনিত হয়েছিল এবং দেশময় একটি সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তরুণতর সম্প্রদায়ের মনে নব-জাগরণের উদ্দীপ্ত প্রেরণা সঞ্চার করেছিল তাঁর এই ঘোষণা। শাসক সম্প্রদায়ের বিচারে তিনি এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'লেন। কিন্তু তরুণ বাংলা মনের মন্দিরে বরণ ক'রে নিলে তাঁকে হৃদয়ের অর্ঘ দিয়ে।

পরবর্তীকালের যুগান্তর দলের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় (তাঁর 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' গ্রন্থে) তাঁদের মনে ভূপেন্দ্রনাথের এই বীরোচিত আচরণ ও কারাবরণ কি প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সম্পর্কে বলেছেন: "ভূপেনবাবু বোধহয় নিজেও জানলেন না তাঁর এই আত্মদানে কত ছাত্রকে আত্মদানের দীক্ষা দিল। আমার কাছে তিনি আজীবন একটি দৃষ্টান্তস্থল হয়ে রইলেন। এই ত প্রথম নিজেদের মধ্যে থেকে আদর্শ পাওয়া গেল।" (পৃষ্ঠা ২৬৪)

ভূপেন্দ্রনাথের সেই নির্ভীক বিবৃতি, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অস্বীকার এবং কারাবরণ ও আত্মত্যাগের জন্যে তাঁকে ভারতের প্রথম যথার্থ সত্যাগ্রহী বলা যায়।

তাঁর দ্বিতীয় সত্তায় অর্থাৎ তাঁর জ্ঞানের সাধনায়—সমগ্রভাবে তাঁর জীবনের কথা বিবেচনা করে দেখলে যা তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় মনে হয়—তিনি বহুমূল্য সম্পদ্ দান করে গেছেন তাঁর স্বদেশকে। যে-সব গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যার চর্চা তিনি আজীবন করেছিলেন ও তার ফলস্বরূপ মূল্যবান্ গ্রন্থাবলী দেশবাসীকে উপহার দিয়েছিলেন, তার মধ্যেও কোন কোন বিষয়ে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর অধিকার থাকলেও সমাজতত্ত্বই তাঁকে সর্বাধিক আকর্ষণ করত এবং এবিষয়ে শুধু স্মরণীয় অবদান রেখে যান নি, পথ-প্রদর্শকও ছিলেন। ভারতবর্ষে সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস তিনিই প্রথম গ্রথিত করেন, অধ্যাপক কোশাম্বী প্রমুখ পণ্ডিতেরা এ-বিষয়ে কার্য আরম্ভ করেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথের পরে।

নানা বিদ্যার চর্চায় তিনি যেমন গভীরভাবে আত্ম-নিয়োগ করেন তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ধরে তাও অল্প পণ্ডিত ব্যক্তির জীবনেই দেখা গেছে। তাঁর জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্র ছিল পরিধি ও প্রসারে বিরাট্। ভারতীয় সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস, হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান পদ্ধতি, ভারতের ভূমি-বিষয়ক অর্থনীতি, হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের নৃতাত্ত্বিক বিচার ইত্যাদির তথ্য ও তত্ত্বদর্শী গবেষণা তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল। এবং এই সব বিষয়ে রচিত তাঁর আকর পুস্তকরাজি দেশ-বিদেশের পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে মৌলিক চিন্তাধারার জন্যে।

বৈদিক আর্যগণ যে ভারতভূমির সন্তান এবিষয়ে তাঁর মতামত ও তথ্যপ্রদর্শনও মৌলিকতা ও যুক্তিবত্তার জন্যে গুণীজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল। স্বামী শঙ্করানন্দ প্রণীত এই সম্পর্কিত গ্রন্থে ভূপেন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকাটি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বিচার-বিবেচনার নিদর্শনস্বরূপ। বৈদিক আর্যদের বিষয়ে তাঁর মতামত পণ্ডিত সমাজে সর্বসম্মত-ভাবে গৃহীত হয় নি সত্য। পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিত সমাজে তা মানা হবার পথে জাতিগত শ্রেষ্ঠতাবোধ ইত্যাদি মনভাবজনিত নানা প্রকার বাধা আছে, বোঝা যায়। কিন্তু এ সম্পর্কে এ যাবৎ অনুসৃত পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের সিদ্ধান্ত যে যথেষ্ট নিরপেক্ষ ও যুক্তি-তথ্যভিত্তিক নয়—এ সন্দেহের অবকাশ তিনি ঘটিয়েছেন এবং তাও কম কৃতিত্বের কথা নয়।

জ্ঞানযোগী রূপে ভূপেন্দ্রনাথের যে বহুমুখী প্রতিভা তার দৃষ্টান্তও এদেশে বিরল। কারণ তিনি ছিলেন একাধারে সমাজতাত্ত্বিক ও নৃবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ, ভারততত্ত্বের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরম প্রাজ্ঞ। ভারতে মার্কসীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও তিনি অন্যতম আদি প্রবক্তা ছিলেন। জ্ঞানের রাজ্যে তাঁকে জীবন্ত বিশ্বকোষ আখ্যায় অভিহিত করলে বিশেষ অত্যুক্তি

হয় না। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচনাবলী তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্যের কথঞ্চিৎ পরিচয়-জ্ঞাপক। কারণ তাঁর সমগ্র বিদ্যা ও চিন্তাধারার প্রকাশ রচনার মধ্যে ঘটে নি।

তাঁর সুদীর্ঘ নিরলস জীবন তিনি একান্তভাবে দেশের হিতার্থেই নিয়োজিত করেছিলেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতিক সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে যখন তিনি অবসর নেন নানা দলীয় ও উপদলীয় চক্রান্তে বিরক্ত হ'য়ে এবং বিদ্যাচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, তারপরেও স্বদেশসেবার কার্য ব্যাহত হয় নি। তা প্রবাহিত হয় অন্য ধারায়। তাঁর জ্ঞানের সাধনা এবং বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা দেশের সেবারই প্রকারভেদ। জনসাধারণের মুক্তি ও স্বদেশের কল্যাণের জন্যে চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কাল-পরম্পরায় আগত সমাজ বিবর্তনের ধারার বিচার বিশ্লেষণে নিবিষ্ট হন। তাঁর বিদ্যার সাধনা এক হিসাবে তাঁর সুপ্রাচীন মাতৃভূমির মানব সমাজের জন্যে চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে অচ্ছেদ্য। সেই কল্যাণের চিন্তার প্রকাশ তাঁর রচনাবলীতে নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর গবেষণা সাধারণ মানুষের শোষণমুক্ত ভবিষ্যৎ রচনার জন্যে ইতিহাসের পৃষ্ঠপটে যুক্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় ইতিহাসের সামাজিক তথা বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা মানবিকতাবোধের আধুনিক সংস্করণ এবং তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও গভীর মানবপ্রীতির একান্ত প্রকাশ। ভারতবর্ষের ভূমিসংক্রান্ত অর্থনীতি তিনি বহু পরিশ্রমে পর্যালোচনা করেন শোষণ-জর্জর বিরাট্ কৃষক সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দশা নিরাকরণের তত্ত্ব অন্বেষণের জন্যে। তাঁর "যুগ সমস্যা" বা "জাতি-সংগঠন" বা "বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব" ইত্যাদি প্রায় সব গ্রন্থই তাঁর স্বদেশ-চিন্তার নানা সমস্যার সমাধানের প্রয়াস। দেশের কিংবা জনসাধারণের মুক্তি অথবা জীবনযাত্রা নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা তিনি অল্পই করেছিলেন। কিন্তু একথায় তাঁর বিদ্যাবিষয়ে গৌরবের কোন হানি হয় না।

এইভাবে দেখা যায়, প্রথম যৌবনে দেশের মুক্তি সাধনার যে ঐকান্তিক ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁর মানসলোক প্রভাবিত এবং অনেকাংশে গঠিতও করে। রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবার কিছুকালের মধ্যেই তাঁর মন আকৃষ্ট হয় রাষ্ট্রের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে জড়িত সমাজের গতি-প্রকৃতির প্রতি। বিদেশে দীর্ঘকাল বাসের প্রায় প্রথম থেকেই রাজনীতিক কার্য-কলাপের সঙ্গে তাঁর সমাজতত্ত্ব ও ক্রমে নৃতত্ত্বে আগ্রহ ও অধ্যয়ন আরম্ভ হয়। সুদীর্ঘ ১৭ বছর নানা দেশ-বিদেশে অবস্থানের সময়েও ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার সঙ্গে একাত্ম থেকে যখন প্রত্যাবর্তন করেন, তারপর থেকে তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন হয় পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন বিদ্যায় গবেষণা। নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে পরবর্তীকালে আর বিশেষ সক্রিয় না থাকলেও নিরাসক্ত কখনই হন নি। তবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন মুখ্যত জ্ঞানের সাধনায়। এবং তাঁর সেই জ্ঞানযোগ স্বদেশ-চর্চা থেকে কোনদিন বিযুক্ত হয় নি। যেভাবে নানা প্রকার বাধা-বিপত্তি ও দারিদ্র্যের দুর্বিপাকের মধ্যেও শেষ জীবন পর্যন্ত অধ্যয়ন ও বিদ্যাচর্চায় সমাহিত থাকেন, তা আধুনিক কালে দুর্লভ দর্শন। আত্মভোলা এক জ্ঞানতাপস ছিলেন তিনি।

ব্যক্তি-জীবনেও তিনি প্রায় তপস্বীর মতন ত্যাগী ছিলেন। সন্ন্যাসীর নিরাসক্তিতে সমস্ত স্বার্থময় ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন, অঙ্গে গৈরিক বসন ছিল না এই শুধু পার্থক্য। এবং সন্ন্যাসীর ধর্মজীবনের সাধনের পরিবর্তে তাঁর ছিল স্বদেশকল্যাণের আদর্শ। সেই আদর্শের অনুসরণে সারা জীবন অতিবাহিত করতে গিয়ে ব্যক্তিগত কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃক্পাত করেন নি। শুধু যে অবিবাহিত জীবন যাপন করেন তা-ই নয়, অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয়ের চিন্তাও কখনও মনে স্থান দেননি, যা অনায়াসেই পারতেন অধ্যাপকের বৃত্তি অবলম্বনে। কারণ একাধিক বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রীর অধিকারী তিনি ছিলেন।

এমন কি রাজনীতিক জীবনেও তৎপর হন নি আপন প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে। নচেৎ যৌবনকাল থেকে দেশের মুক্তির জন্যে চরম স্বার্থত্যাগ ক'রে এবং দেশ-বিদেশে অবস্থানকালে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পুরো-ভাগে থেকে যে বিপ্লবী যশ অর্জন করেছিলেন, তার সুযোগ গ্রহণ করলে উত্তর জীবনে অনেক সুখ-সুবিধা ও প্রতিপত্তি লাভ করতে পারতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির লেশমাত্র লোভও অসম্ভব ছিল তাঁর চরিত্রে। সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে তিনি গঠিত ছিলেন।

বিশ্ববন্দিত বিবেকানন্দ স্বামীর সর্ব-কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিনি, এবিষয়ে জ্যেষ্ঠের অযোগ্য ছিলেন না অবশ্যই। স্বার্থমগ্ন সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতার বহু ঊর্ধ্বে নভোচারী পার্বত্য ঈগল যেন। সাধারণের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করলেও সাধারণত্বের সু-উচ্চে জ্ঞানমার্গবিহারী। অথচ এই মহান্ অসাধারণতা সত্ত্বেও সাধারণের সঙ্গে সাধারণ মানবিক সম্পর্কে তাঁর কখনও ব্যাত্যয় ঘটে নি। অহমিকা-

শূন্য ছিলেন বলে কারুর সঙ্গে কৃত্রিম দূরত্ব রক্ষা ক'রে চলেন নি কখন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও এমন নিরহঙ্কার নিরভিমান মানুষ এযুগে কদাচিৎ দেখাযায়। আত্মপ্রচারে ছিল তাঁর আন্তরিক বিমুখতা। নিজের বিপ্লবী জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনা-বৈচিত্র ও কৃতিত্বের কথা প্রকাশ করতেও পরাঙ্মুখ ছিলেন। এসব বিষয়ে কোন কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত না তাঁর কাছে। স্বাধীনতার ইতিহাসে বহু তথ্যের আকার, তাঁর অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ প্রথমার্ধের জীবন তিনি রুদ্ধ পুস্তকের মতন সংগোপনে রেখে দিতেন। তার একটিমাত্র পৃষ্ঠাও উন্মোচিত করতে পারা যেত না বহু অনুরোধ-উপরোধেও। সেই ঐকান্তিক নিষ্ঠার যুগে মন্ত্রগুপ্তির প্রতিশ্রুতি তিনি চিরদিন পালন করেছেন। আত্মস্মৃতি কথনে তাঁকে কখনও সম্মত করা যায় নি। এই অসঙ্কোচ আত্মবিজ্ঞপ্তির আধুনিক কালে তিনি জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করলেও আদর্শ থেকে স্খলিত হন নি কোনদিন।

তাঁর যৌবন কালের দেশে-বিদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধে সংঘটিত কাহিনীর কিছু তিনি "অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস" পুস্তকে প্রকাশ করেছিলেন বটে, কিন্তু তা ঐতিহাসিক কর্তব্যবোধে। আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্য লেশমাত্র সেখানে ছিল না,একথা তাঁর সঙ্গে সুপরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। সেসব প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ তিনি উক্ত গ্রন্থে করবার এই কারণ জানাতেন: "ওঁরা (অর্থাৎ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি) misrepresent করতেন, তাই ও বিষয়ে বই লিখি।"

অগ্নিদিনের সেই সব অলিখিত ইতিহাসের কথা জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলেও এড়িয়ে যেতেন। বলতেন, "কেন জানতে চাও? এসব গুপ্তকথা প্রকাশ হওয়া উচিত নয়।"

যদি তাঁকে বলা হ'ত, "কিন্তু আপনার আগেকার কথা জানতে ইচ্ছা হয়। সেসব জানারও দরকার।" তিনি অস্বীকার ক'রে বলতেন, "আমাকে যদি বুঝতে চাও, আমার বই ভাল ক'রে পড়।"

পঠন-পাঠনের বিষয়ে তাঁর একটি সাবধান বাণী প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ ক'রে রাখা যায়। ভারত তত্ত্বের নানা কথা আলোচনা করবার সময় তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, "দেখো, Western Scholar-রা অনেক বিষয়ে আমাদের ইতিহাস আর culture misrepresent করেছেন। সে সব দিকে guard ক'রে প'ড়ো।"

উদার আন্তর্জাতিক দৃষ্টির অধিকারী হ'লেও জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির কোন বিষয়ে বিদেশী পণ্ডিতবর্গ বিকৃতি ঘটালে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ তাঁর আত্মসম্মানের তুল্য অপরিত্যাজ্য ছিল। এই প্রখর দেশপ্রেম এবং মানবতাবোধে উদ্দীপ্ত জাতীয় চেতনা তাঁর চরিত্রে অনেকাংশে তাঁর মহান্ জ্যেষ্ঠ,স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব। স্বামীজী শুধু ভারতের আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্যে জীবনপণ করেন নি। নিদ্রিত ভারতবর্ষকে তিনি জাগরিত করতে চেয়েছিলেন বজ্র-নির্ঘোষে। অধ্যাত্ম-মুক্তির সঙ্গে তিনি নিরন্ন নিরক্ষর জনসাধারণকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত ক'রে সর্বাঙ্গীণ জাতীয় মুক্তি কামনা করেছিলেন। একথা পরবর্তীকালের ইতিহাসে লক্ষ্যগোচর হয়েছে যে, স্বামীজীর আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক বাণী প্রচারের ফলে ভারতবর্ষের জাতীয় তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। তাঁর দেহত্যাগের তিন বছরের মধ্যেই যে বিপ্লব প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বাংলার যে তরুণ দল অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হন তাঁদের অন্যতম হ'লেন স্বামীজীর অনুজ ভূপেন্দ্রনাথ। স্বামীজীর মতবাদ ও আদর্শের প্রভাব তাঁর প্রথম জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

শেষ জীবনে ভূপেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠের জীবনের অবদান নিয়ে নতুন ক'রে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং স্বরচিত 'Swami Vivekananda—Patriot Prophet' গ্রন্থে স্বামীজীর দেশপ্রেমিক সত্তা, জাতীয় জাগৃতিতে তাঁর ভূমিকা এবং সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে তাঁর মতামত ও দূরদৃষ্টির সবিশেষ পরিচয় দিয়েছেন বিবেকানন্দের বহু উক্তির উদ্ধৃতি সহযোগে।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর কলকাতার শিমুলিয়ায় প্রতিষ্ঠাপন্ন দত্ত পরিবারে ৩, গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটে ভূপেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। হাইকোর্টের তৎকালীন প্রসিদ্ধ এ্যাডভোকেট বিশ্বনাথ দত্তের তিনি দশম ও কনিষ্ঠতম সন্তান। আত্মীয়-পরিজন ও জ্ঞাতিবর্গের বিরাট্ পরিবারের কর্তা বিশ্বনাথ শুধু অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন না, বিশেষ সংস্কৃতিবান্, সঙ্গীতপ্রেমী এবং মজলিশী ব্যক্তি ছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথের জন্মের সময়ে বিশ্বনাথের সংসার সুখে সচ্ছলতায় সঙ্গীতচর্চায় ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপে সুপরিচিত ছিল শিমুলিয়া অঞ্চলে।

কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথের শৈশবেই তাঁদের পরিবারে বিপর্যয় ঘটে যায়। অকস্মাৎ তাঁর পিতার যখন মৃত্যু হয়, ভূপেন্দ্রনাথের বয়স তখন ৪ বছরও পূর্ণ হয় নি। বিশ্বনাথ যেমন প্রচুর উপার্জন করতেন তেমন বিপুল পোষ্যবর্গ ইত্যাদির জন্য সমস্তই ব্যয় করতে অভ্যস্ত থাকায় তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য লোপ পায়। উপরন্তু তাঁর আশ্রিত জ্ঞাতিরা তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যাদের গৃহ থেকে উচ্ছেদ করবার জন্যে চক্রান্ত করে নানা প্রকারে। গৃহের অধিকার নিয়ে মামলা বাধে। নরেন্দ্রনাথ জননী ও ভগিনী-ভ্রাতাদের নিয়ে নিকটবর্তী মাতামহীর আলয়ে (৭, রামতনু বোস লেন) বাস করতে থাকেন। সেখানেই বাল্য ও কৈশোর কাল অতিবাহিত হয় ভূপেন্দ্রনাথের।

পিতার মৃত্যুর দু'বছর পরে নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন। ভূপেন্দ্রনাথ এবং দ্বিতীয় অগ্রজ মহেন্দ্রনাথের সেকালের জীবন যে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তা সহজেই অনুমেয়। ভূপেন্দ্রনাথের ৭ বছর বয়সে নরেন্দ্রনাথ বরাহনগর মঠবাসী হন এবং তাঁর ১০ বছর বয়সে স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবন আরম্ভ হয় ভারত পরিক্রমায়।

ভূপেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন সম্পর্কে এই মাত্র জানা যায় যে, তিনিও জ্যেষ্ঠের মতন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনে পাঠ করেছিলেন। স্বামীজী যখন শিকাগোর বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগ দিয়ে পাশ্চাত্ত্য জগতে ভারতবর্ষের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেন, ভূপেন্দ্রনাথের তখন ১৬ বছর বয়স। স্বামীজীর ধর্মজীবনের আচরণের অন্তঃস্থলে যে প্রখর জাতীয় চেতনা ক্রিয়াশীল ছিল, তা সে-যুগের অগ্রগামী তরুণদের মনে নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ সঞ্চারিত করে এবং ভূপেন্দ্রনাথও পরোক্ষভাবে জ্যেষ্ঠের প্রভাবে প্রভাবিত হন। স্বামীজীর সঙ্গে অবশ্য তাঁর পার্থক্য এই যে, তিনি ধর্ম ও সন্ন্যাসের পথ অবলম্বন না ক'রে জাতীয় মুক্তির জন্যে গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রনীতিক পন্থা। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভিন্ন জাতীয় জীবনের পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব এই ধারণা প্রথম যে বাঙ্গালী তরুণের মনে জন্মায় এবং তাঁরা সকর্মক হন, ভূপেন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। বাংলার প্রথম বিপ্লবী দলে যোগদান করলেন তিনি। তখন তাঁর বয়স ২২ বছর।

বাংলা দেশের যে প্রথম বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি ১০৮ আপার সার্কুলার রোডে স্থাপিত হয়, তার সভাপতি ছিলেন পি. মিত্র নামে সুপরিচিত, ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র। অরবিন্দ ঘোষ এবং চিত্তরঞ্জন দাস সহ-সভাপতি এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। বরোদা থেকে অরবিন্দ ঘোষ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠিয়েছিলেন এই সমিতির সংগঠকরূপে। এই সমিতিতে অচিরে যাঁরা যোগ দেন তাঁদের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু প্রভৃতির সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথের নামও উল্লেখ্য। কলকাতার এই গুপ্ত সমিতির দৃষ্টান্তে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে ক্রমে এই ধরনের সমিতি স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' দু'টি পৃথক্ চরমপন্থী রাজনীতিক দল নামে সুপরিচিত হ'লেও, প্রথম যুগে দু'টি সংস্থার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। একই বৃহৎ বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের দুই শাখা স্বরূপ ছিল 'অনুশীলন সমিতি' এবং 'যুগান্তর'। প্রথমটির প্রধান লক্ষ্য শরীরচর্চা—লাঠিখেলা, ব্যায়াম ইত্যাদি। এবং দ্বিতীয় শাখার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবের আদর্শ প্রচার। এই প্রচার-ধর্মীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু প্রভৃতি। দু'টি বিভাগেরই পি. মিত্র সভাপতি ছিলেন এবং বাংলার এই বিপ্লবী দল নিখিল ভারত বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। প্রতিষ্ঠানের বৈপ্লবিক প্রচারের বাহনরূপে 'যুগান্তর' নামে পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে এবং তার প্রথম সম্পাদক হন ভূপেন্দ্রনাথ। তিনি তখন ২৬ বছরের যুবক।

প্রথম বিপ্লবী দলে যোগদানের প্রসঙ্গে তিনি পরে তাঁর "অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছিলেন—"দুর্জয় সংকল্পে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকিয়া লেখক যৌবনের প্রারম্ভে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিলক-অরবিন্দ প্রমথনাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত বৈপ্লবিক সংঘে যোগদান করিয়া দেশমাতৃকার স্বাধীনতা-কল্পে ধর্মসাক্ষী করিয়া যে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি সমস্ত জীবনব্যাপী একনিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিয়াছেন।"

তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে, বিপ্লবী সমিতির পি. মিত্র প্রমুখ যে ৪ জন নেতার নাম করা হয়েছে, তার কার্যকরী সমিতিতে ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন সদস্যা। তাঁদের ৫ জনকে নিয়ে প্রথম নিখিল বঙ্গীয় বৈপ্লবিক দলের কার্যকরী সমিতি স্থাপিত হয়। সেই সংস্থার যে প্রথমে কোন নাম ছিল না, সেবিষয়ে ভূপেন্দ্রনাথ উক্ত গ্রন্থে বলেছেন, "আমরা সংগঠনের কোন নামকরণ করি নাই। সরকারী দপ্তর মধ্যে আমাদের 'যুগান্তর' আখ্যা দিয়াছে। অবশ্য আমাদের গুপ্ত পত্রিকার

নাম ছিল 'যুগান্তর'। তাই থেকে মনে হয় নামকরণ হয়।

"যুগান্তরে" প্রকাশিত কোন কোন রচনায় রাজদ্রোহের প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগে পত্রিকা-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং তাঁর জবানবন্দীতে দেশে যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, সেসব কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সে উপলক্ষ্যে দেশে সাড়া জাগবার আর একটি দৃষ্টান্ত এই যে, কলকাতায় একটি মহিলা সভা আহূত হয়ে ভূপেন্দ্রনাথের জননী শ্রীমতী ভুবনেশ্বরীকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল, এমন বীর সন্তানের জননী বলে। বিবেকানন্দ-ভূপেন্দ্রনাথের জননী সত্যই যে বীর-মাতা ছিলেন তার পরিচয় দিয়ে তিনি সেই মহিলাদের সভায় অভিনন্দনের উত্তরে বলেছিলেন যে, ভূপেনকে আমি দেশের জন্যে উৎসর্গ করেছি। তার কাজ মাত্র আরম্ভ হয়েছে।...

মাতা ও পুত্র দু'জনের বিবৃতিই তখন সমগ্র দেশে প্রচারিত ও প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। সেজন্যে কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনের সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ তাঁর সুরাটের অভিভাষণে ভারতের নারী জাগরণের প্রসঙ্গে শ্রীমতী ভুবনেশ্বরীর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন।

এক বছর সশ্রম কারাবাসের পরে মুক্তিলাভ করবার অব্যবহিত পরেই ভূপেন্দ্রনাথ দেশত্যাগ ক'রে আমেরিকায় চলে যান। এই সময় থেকে তাঁর জীবনে আর এক বিপুল ঘটনা-বৈচিত্রে পূর্ণ অধ্যায়,তাঁর সুদীর্ঘ বিদেশ-বাস, আরম্ভ হ'ল। কিন্তু কি ভাবে এবং কেন এই পলায়নের আয়োজন তিনি করেছিলেন, সে-বিষয়ে কোন কথা জানতে পারা যেত না তাঁর কাছে। দেশত্যাগের এই সংকল্প জেলের মধ্যে থেকেই করেছিলেন মনে হয়। কারণ, যেদিন কারামুক্ত হন, সেদিনই কলকাতা ত্যাগ করেছিলেন আমেরিকা যাত্রার জন্যে। অবশ্য একথা বোঝা যায় যে, তিনি দেশের কাজের দায়িত্ব নিয়েই দূর বিদেশে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনকে অন্য দেশে থেকে অন্যভাবে সংগঠন ও পুষ্ট করবার অভিপ্রায় তাঁর ছিল, নচেৎ দেশপ্রেমিকের আরব্ধ কাজ অসমাপ্ত রেখে বৈদেশিক ডিগ্রী লাভের জন্যে স্বদেশ ত্যাগ করে যাবার মানুষ ছিলেন না তিনি।

উত্তর জীবনে তিনি তাঁর "আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা" পুস্তকের প্রথম খণ্ডে এ প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন, "নানা কারণে যৌবনের প্রাক্কালে আমি দেশত্যাগী হইতে বাধ্য হই।"

সে যাত্রায় আমেরিকায় তিনি একাদিক্রমে ছ'বছর বাস করেন। সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মিলে ভারতের স্বাধীনতা ও মুক্তির কথা চিন্তা করতেন, চেষ্টা করতেন যথাসম্ভব। সেই সঙ্গে বিদ্যাচর্চায় তাঁর আত্যন্তিক প্রবণতার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনেও নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। এখানে তিনি পোষ্ট গ্রাজুয়েট পাঠ সমাপ্ত ক'রে ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। তার আগের বছর (১৯১২ খ্রী:) এখান থেকে বি. এ. ডিগ্রী পেয়েছিলেন। তিনি সমাজতন্ত্রের ছাত্র ছিলেন ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বলা বাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী স্নাতকরূপে তিনি নিজের কর্তব্য শেষ করেন নি। সমস্ত অধ্যয়নের কালেই প্রবাসী ভারতীয় এবং আমেরিকাবাসীদের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে প্রচার ও সংগঠনের কাজ অব্যাহত ছিল তাঁর। এবং ইউরোপে কার্যরত ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গেও তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন। তাই, ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পাঠ সমাপ্ত করবার পর যখন ইউরোপের বৈপ্লবিক সমিতির নিকট থেকে সেখানে কাজে যোগ দেবার আহ্বান এল, তিনি ইউরোপ যাত্রা করলেন আমেরিকার পর্ব শেষ করে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা যায় যে, আমেরিকাবাসের বিবরণ সম্পর্কে পরবর্তী কালে দু'খণ্ডে যে"আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা"লিখেছিলেন, তা আংশিকভাবে Monthly Mossenger ও "ভারতী" পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল।

আমেরিকা থেকে ইউরোপ গমন কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথের পক্ষে সহজে ঘটে নি। নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দিয়ে, বহু বিপদের সম্মুখীন হয়ে, নানা দেশ ঘুরে তাঁর গন্তব্য-স্থল বার্লিনে পৌঁছান শেষ পর্যন্ত। কারণ আমেরিকা থেকে ইউরোপে যাবার উপযুক্ত পাসপোর্ট তাঁর ছিলনা। কিন্তু তিনি সেজন্যে নিরস্ত না হয়ে পাড়ি দেন জাহাজে। তারপর গ্রীসে অবতরণ করতে গিয়ে আটক হন। সেখানে মাস চারেক পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকবার পর নিস্তার পান। এসময় ইউরোপের অনেক দেশে আত্মপরিচয় গোপন করে ভ্রমণ করতে হয় তাঁকে। ছাত্র পড়ানো প্রভৃতি নানা উপায়ে জীবিকার সংস্থান করতে হ'ত। ইটালিতেও অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তুর্কীতে প্রায় একমাস থাকেন ছদ্মবেশে।

সেসব দিনের কথায় উত্তর জীবনে উল্লেখ করেছিলেন, "জীবনাবর্তের ঘূর্ণিতে পড়িয়া কুলালের চক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান হইয়া পৃথিবীর অনেক দেশেই আমি ভ্রমণ করিয়াছি।" ("আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা," প্রথম খণ্ড)।

তাঁর সে রোমাঞ্চকর জীবন কোন অ-রাজনীতিক ব্যক্তির এ্যাডভেঞ্চারের মতন নয়, একথা বলা বাহুল্য। ভারতভূমির জন্যে এক বিপ্লবী-লক্ষ্য ধ্রুব রেখে গুপ্তভাবে নানা দেশ ভ্রমণ করে অবশেষে বার্লিনের বৈপ্লবিক সমিতিতে তাঁকে যোগ দিতে হবে। সেকালের প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলেছিলেন, "সেসব দিনের thrill তোমাদের বলে বোঝান শক্ত। আমাদের তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তখন World War-এ জড়িয়ে পড়েছে। অন্য আমরা ভেবেছি—এই এক মস্ত সুযোগ পাওয়া গেছে। এ সুযোগ নিতেই হবে।" এইভাবে দু' বছর ইউরোপের দেশে দেশে যে বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন যাপন করেন সে-প্রসঙ্গে পরিণত বয়সে "অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস" গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে বলেছেন, "ছদ্মবেশে নানা স্থান হইতে ঘুরিয়া ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বার্লিনে উপস্থিত হই, তখন কমিটির অন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। তখন ইহা সম্পূর্ণ বিদেশী সম্পর্ক-রহিত ভারতীয় বৈপ্লবিক সমিতি, নাম Indian Independence Committee (ভারত স্বাধীনতা সমিতি)।"

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে, বিশেষ প্রথম মহাযুদ্ধের কালে বিদেশে ভারতের মুক্তিসাধনার অধ্যায়ে, উক্ত সমিতি 'বার্লিন কমিটি' নামে সুপ্রসিদ্ধ। ভূপেন্দ্রনাথ যখন বার্লিনে পৌঁছলেন, তখন এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন সেকালের ভারতের অন্যতম বিখ্যাত বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বীরেন্দ্রনাথ ১৯১৫-১৬ খৃঃ বার্লিন কমিটির সম্পাদক থাকেন।

তারপর ১৯১৬ থেকে ১৯১৮ খৃঃ পর্যন্ত সমিতির সম্পাদক হন ভূপেন্দ্রনাথ। বার্লিন কমিটি গঠন ও পরিচালন সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য তিনি তাঁর শেষোক্ত গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে, বার্লিন কমিটি গঠনের পরেই জার্মান গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সংস্রব ঘটে, তার আগে নয়। ঐ গ্রন্থে সুদূর প্রাচ্য, পশ্চিম এশিয়া, তুর্কী, আমেরিকা, এবং সুইডেন প্রভৃতি ইউরোপীয় ভূখণ্ডের নানাস্থানে ভারতীয় বিপ্লবীদের কাজকর্মের বহু তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন ভূপেন্দ্রনাথ।...

বার্লিনে তিনি সবচেয়ে দীর্ঘকাল বাস করেন—প্রায় ১০ বছর। এই সময়ের মধ্যে অবশ্য তিনি ইউরোপের নানা অঞ্চলে, বিশেষ পূর্ব ইউরোপে এবং রাশিয়াতেও অবস্থান করেন।

বার্লিন বাসের সময়ে বৈপ্লবিক কাজের অবসরে ভূপেন্দ্রনাথ অক্লান্তভাবে বিদ্যাচর্চাও করতেন। নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর বিশেষজ্ঞদের অধীনে গবেষণা এবং রীতিমত অধ্যয়ন বার্লিনেই হয়েছিল। হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট (Ph. D.) লাভ করেন নৃতত্ত্ব বিষয়ে নতুন গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ।

বার্লিনেই তাঁর প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল—"How English Acquired India." এটি তিনি বৈপ্লবিক প্রচারের উদ্দেশ্যে রচনা করলেও, বইখানির ঐতিহাসিক মূল্য ছিল। পুস্তকটি ইংরেজী ও জার্মান দুই ভাষাতে প্রকাশ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ভূপেন্দ্রনাথ জার্মান, ফরাসী, গ্রীক, রুশ প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়েছিলেন।

তিনি বার্লিনে সুপরিচিত ছিলেন বিপ্লবী এবং পণ্ডিতরূপে। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে রাষ্ট্রনীতি এবং জ্ঞানমার্গ দুই পথের পথিকদেরই সম্মিলন ঘটত। তাঁর সেখানকার বাসগৃহ ছিল বিভিন্ন দেশের রাজনীতিক এবং পণ্ডিত ও ছাত্রদের মিলনস্থল। ভারতের বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু জার্মাণীতে তাঁর উদ্ভিদ জীবনের প্রাণ স্পন্দনের প্রদর্শক যন্ত্রের ক্রিয়া দেখাবার জন্যে সমাগত হ'লে, ভূপেন্দ্রনাথ সে অনুষ্ঠানের জন্যে বিশেষ তৎপর হয়ে সহযোগিতা করেছিলেন।...

অবশেষে সুদীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর পরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে। পশ্চিমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বরণীয় যোদ্ধারূপে বিপুল যশ ও বিদ্যাচর্চায় উচ্চ উপাধি লাভ করে এসে ভূপেন্দ্রনাথ পুনরায় দেশের রাজনীতিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির তিনি সদস্য ছিলেন কিছুকাল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি আবার কারাবরণ করেছিলেন। ক্রমে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি ক্ষেত্র থেকে নানা কারণে সরে এসে জ্ঞানের রাজ্যে আত্মসমাহিত হন, কিন্তু তা থেকে একেবারে বিচ্যুত হন নি, কখনও। তাঁর একটির পর একটি গ্রন্থ রচিত হ'তে থাকে এবং নানা পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। বিদ্যার রাজ্যে তারপর থেকে প্রধানত তাঁর বিচরণ হ'লেও রাজনীতিক

আন্দোলনের সঙ্গে যোগ থাকে শেষ জীবন পর্যন্ত। তিনি অধিকতর যুক্ত হয়েছিলেন বামপন্থী আন্দোলনে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ভারতবর্ষে মার্কসীয় চিন্তাধারার অন্যতম আদি প্রচারক ছিলেন। সেই সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনের প্রথম যুগের অবদান আছে তাঁর। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসেরও তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। ছাত্র ও যুব সমাজের এবং প্রগতিশীল লেখক সম্প্রদায়ের বহু সভা সম্মেলনাদিতে উদ্বোধক বা সভাপতিরূপে যোগ দিতেন চিরতরুণ মনের পরিচয়স্বরূপ।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রাক্তন বিপ্লবীদের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনেও তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সেইটিই তাঁর বৃহৎ সমাবেশে শেষ যোগদান। জ্ঞানচর্চা কিন্তু তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত করে গেছেন। তাঁর রচিত বিপুল সংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধাদির তালিকা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর আলোচিত বিষয়গুলি কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর অবদানের ফলে।

৮২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর অন্তর কখনও জরাগ্রস্ত হয় নি। যৌবনসুলভ সজীব মন শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখে ছাত্রের অক্লান্ত উৎসাহে জ্ঞানচর্চা করে গেছেন তিনি। তরুণ সমাজের চির-সুহৃদ ভূপেন্দ্রনাথের তরুণদের সঙ্গ বরাবর প্রিয় ছিল, তাদের ওপরেই তিনি আশা-ভরসা পোষণ করতেন। কেউ কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসু হয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লে তাঁর সময়ের অভাব দেখা যেত না কখনও। প্রাচীন ইতিবৃত্ত কিংবা দেশ-বিদেশের ইতিহাস, ভারত-তত্ত্বের যে-কোন প্রসঙ্গ কিংবা বাংলা ও অন্যান্য দেশের আচার-ব্যবহার থেকে আরম্ভ করে বিচিত্র সব অনুষঙ্গের কথা তিনি অনর্গল বলে যেতেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন বিদ্যার একটি বিরাট্ প্রতিষ্ঠান-বিশেষ। তাঁর সঙ্গ কিছুক্ষণের জন্যে লাভ করলেও যে-কোন শিক্ষার্থী কিছু-না-কিছু শিখে আসতেন। একটি বিষয়ে জানতে ইচ্ছুক হ'লে কথায় কথায় দশটি বিষয়ে জেনে নিতে পারতেন, বিদ্যার এমন অজস্র দাক্ষিণ্য ছিল তাঁর।

বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বেশ বোঝা যেত যে, কত বড় জ্ঞানী তিনি ছিলেন এবং যে পরিমাণ জ্ঞানের সংগ্রহ তাঁর ছিল, তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলী তার সম্পূর্ণ পরিচায়ক নয়। যে কীর্তি তিনি রচনায় রেখে গেছেন, তার চেয়ে মহত্তর বিদ্বান তিনি ছিলেন, যদিও সে-বিষয়ে তাঁর সচেতনতা ছিল না। বরং আশ্চর্য রকম সরল ছিলেন এবং অন্তরের সেই অকৃত্রিম সারল্যে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত থাকত। অবারিত দ্বার ৩, গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীটের বাড়ীতে সদরের বাঁদিকের ঘরে এসে বসতেন এই নিরহঙ্কার জ্ঞানতাপস, যে-কোন ব্যক্তি সাক্ষাৎপ্রার্থী হোক বিমুখ করতেন না কখনও। অসীম ধৈর্যে বিভিন্ন বিদ্যায় বিচিত্র তথ্যে আলোচনা করে যেতেন। তাঁর অধীত বিদ্যায় যে-কোন প্রশ্ন করলেও উত্তর থাকত সদাপ্রস্তুত।

আর এই ফাঁকি আর মেকির যুগে এমন খাঁটি চরিত্রের মানুষ তিনি ছিলেন যে, মনে হয় তাঁর সঙ্গে একটি যুগেরও যেন অবসান ঘটে গেল।

তাঁর প্রণীত বাংলা ও ইংরেজী পুস্তকের তালিকা এখানে দেওয়া হ'ল :—

(১) তরুণের অভিযান। (২) যৌবনের সাধনা। ৩) জাতি সংগঠন। (৪) যুগ সমস্যা (১৯২৬)। (৫, ৬) আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা (২ খণ্ড, ১৯২৬)। (৭) ভারতীয় একজাতীয়তা গঠন সমস্যা। (৮) সাহিত্যে প্রগতি (১৯৪৫)। ৯) বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব। (১০,১১,১২) ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি (তিন খণ্ড, ১৯৪৬)। (১৩) সমাজতন্ত্রবাদ—কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক (ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পুস্তকের অনুবাদ (১৯৫৩)। (১৪) ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৯৪৯)। (১৫) অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস (১৯৫৩)। (১৬) বাংলার ইতিহাস। (১৭) স্বামী বিবেকানন্দ।

1. How English acquired India (In English & German Editions, Germany). 2. Studies in Indian Social Polity (1944). 3. Mystic Tales of Lama Taranath (1944). 4. Vivekananda, the Socialist (1929). 5. Dialectics of Hindu Ritualism (Pt. I. From Rig Vedic time to upanishadic Age. 1950). 6. Dialectics of Land Economics of India (1952). 7. Vivekananda—Patriot-Prophet (1954). 8. Indian Art in Relation to Culture (1956). 9. Dialectics of Hndu Ritualism (Pt II. From Post-Vedic Age to Modern Time, 1957). 10. Hindu Law of Interitence (An Anthropological study, 1957). 11. The Sayings of Swami Vivekananda, with author's commentary.

নৃতত্ত্ব বিষয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধাবলীর তালিকা :

1. Observations on some Oblique-shaped Indian skulls (Man in India, Ranchi, 1932).

2. Traces of Totemism in some Tribes & Castes of Noth Eastern India (Man in India, 1933).

3. Anthropological notes on some West Bengal Castes (Man in India. 1934).

4. Ethnogical Notes on some of the Castes of West Bengal (Man in India. 1935).

5. Races of India (Journal of the Department of Letters. Vol. XXVI, Calcutta University, 1935).

6. An Enquiry for Traces of Darwin's Tubercles in the Ears of the Peoples of India (Man in India. 1935).

7. Vedic Funeral Customs & Indus Valley Culture (Man in India. 1936. 1937).

8. Anthropological Notes on some Assam Castes (Anthropological Papers. Calcutta University Press. 1938).

9. Notes on the Presence of Light-coloured Eye-Iris amongst the population of North Eastern India (Man in India. 1938).

10. A Note on the Foot & Stature Co-relation of certain Bengal Castes & Tribes. (Jointly with P. C. Mahalanobis. in "The Sankhya, Vol. 3, Pt 3. Calcutta. 1938).

11. An Enquiry into Co-relation between Age & Cephalic breadth. Age & Bigomatic breadth. Cephalic breadth & Bizogomatic breadth of the Bengal (Journal of Indian Medical Association. Calcutta. 1938).

12. An Enquiry into Co relation between Stature of Arm length. Stature & Hand length. Stature & hand breadth. Stature & Hand-index. Arm length & Hand-index ; also Somatic differences between different Social & Occupational groups of the People of Bengal (Man in India. 1939).

13. Notes on Purification & Taboo in Society.

14. An Enquiry into Racial elements in Afghanistan. Baluchistan & neighbouring lands of Hindukush (Translated from the German version of the writer's dissertations for the Doctorate, 1923 (Man in India. 1939. 1940).

15. An Ethnology of Central India & its bearing on India (Man in India. 1942).

16. Origin & development of Indian Social Polity (Man in India, 1942).

17. Preface to "Rig Vedic Culture of the Pre-historic Indus" by Swami Sanharananda, Vol. I. (Calcutta, 1946).

18. Origin of the Indo-Aryans (Hindusthan Review, Patna, 1948).

অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়ে ইংরেজী সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত তাঁর নানা নিবন্ধ :—

1. On the formation of Indian Nationality (Calcutta Review. 1925).

2. Influence of French thought on the Political Philosophy of Thomas Jefferson (Calcutta Review. 1935. Baccalanreate dissertation, New York University, 1912).

3. Ancient Near East & India : Cultural Relation (Calcutta Review. 1937).

4. Population of Bengal (Modern Review, 1937).

5. Brahmanical counter revolution (Bihar, Orissa Research Society Journal. Patna. 1941).

6. The Rise of the Rajputs (Bihar. Orissa Research Society Journal. Patna. 1941).

7. Population & Castes of Bengal (Science & Culture. Calcutta).

8. Race or Backward People (Hindusthan Standard. Calcutta. 1944).

9. Genesis of the National Flag (Hindustan Standard 1945).

10. Nationalism & National Flag (Hindusthan Standard. Puja Number. 1945).

11. Rise of Gauriya Baishnavism in Bengal (Prachyavani. Calcutta).

তাছাড়া বহু বাংলা এবং কয়েকটি হিন্দী ভাষায় রচিত তাঁর প্রবন্ধ সমকালীন পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়, কিন্তু তার তালিকা প্রস্তুত করা হয় নি। ভিয়েনা থেকে প্রকাশিত Anthropos পত্রিকায় তাঁর সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণা এবং জার্মান ভাষায় একটি বিজ্ঞানের কোষগ্রন্থে (Encyclopaedia of Sciences) তাঁর ডক্টরেট লাভের থিসিসটি প্রকাশিত হয়—এ দু'টিই জার্মান ভাষায় রচিত।

বিশ্বামিত্র

চাণক্য সেন

ষোল

সূর্যপ্রসাদ গাড়ি নিয়ে বেরোবার সময় ভেবেছিল যাবে বাল্যবন্ধু ললিতচরণ সিংহের বাড়ী। গাড়ীতে ব'সে মন বদলাল। গিয়ে উঠল আইন ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী সরিৎসাগর কোঠারীর বাড়ীতে।

সরিৎসাগর ছিলেন বিলাসপুর হাইকোর্টের নামকরা ব্যবহারজীবী। ইচ্ছে করলে অনেকদিন আগে জজ হ'তে পারতেন। না হয়ে স্বদেশীতে নেমেছিলেন। নেমেছিলেন গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্য হয়ে নয়; নিজের অন্তরের উত্তপ্ত দেশপ্রেমে।

সরিৎসাগর কোঠারীর মধ্যে যৌবন থেকে বিদ্রোহের বীজ নিহিত ছিল। বাপ লক্ষণসাগর কোঠারী ধনী জমিদার হ'লেও উদারমনা ছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল সরিৎসাগর আই. সি. এস. হয়। তাই তাকে অক্সফোর্ডে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। ইতিহাসের ছাত্র সরিৎসাগর পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে স্ফূর্তিবাজিতেও সে-সময় অক্সফোর্ড ও লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল। তার স্ফূর্তিবাজিতে উত্তেজিত আনন্দের প্রতি আকর্ষণের চেয়ে হিন্দু সমাজের প্রাচীন বাধা-নিষেধ, সংস্কার-আদেশ ভাঙ্গার বিদ্রোহ প্রবল ছিল। মাংস, মাছ, ডিম প্রকাশ্যে খেত, পশ্চিমী নাচ নাচত উল্লাসে, শ্বেতাঙ্গিনী বান্ধবীর তার অভাব ছিল না। সে ফেবিয়ান সোসাইটির সভ্য হয়েছিল; ইণ্ডিয়া লীগে পাণ্ডাগিরি করত; অক্সফোর্ড য়ুনিয়নে গরম গরম বক্তৃতা। অথচ আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্যে তৈরীও হচ্ছিল। এমন সময় সুভাষচন্দ্র বসু আই. সি. এস. পাস করেও সিভিলিয়নত্ব বর্জন করায় ইংলণ্ডের ভারতীয় ছাত্রমহলে যে নিদারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল, দেখা গেল সরিৎসাগর কোঠারী তারও পুরোভাগে। আই. সি. এস. না দিয়ে সে ব্যারিষ্টার হল। বন্ধুমহলে ঘোষণা করল, "সুভাষ বসু ও তাঁর শিষ্যদের আদালতে লড়তে হবে ত! তাই আমি ব্যারিষ্টর হয়ে দেশে যাচ্ছি। যারা স্বদেশী ক'রে ইংরেজ আইনের জালে জড়িয়ে পড়বে, তাদের জালমুক্ত করবার দায়িত্ব আমার।"

দেশের জন্যে সরিৎসাগর কোঠারী আর একটি ত্যাগ করেছিল, যার খবর তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ দু'চারজন ছাড়া অন্য কেউ জানত না। মার্গারেট ওয়াকার বান্ধবীর সীমা ছাড়িয়ে অন্তরঙ্গী হয়েছিল, সরিৎসাগর তাকে বিবাহ করবে মনস্থির করেছিল। জীবনবেদের হঠাৎ পরিবর্তনে তার সংকল্প এক্ষেত্রেও বদলে গেল। মার্গারেটকেও আই. সি. এস.-এর ভবিষ্যতের সঙ্গে পশ্চাতে ফেলে সরিৎসাগর একদিন স্বদেশে ফিরে এসে বিলাসপুর হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ সুরু করল। কয়েক বছরে তার প্রতিষ্ঠা হ'ল, রোজগার বাড়ল, নাম-ডাক হ'ল। রাজনৈতিক কর্মীদের কেস প্রথম থেকেই সে বিনা-ফি'তে গ্রহণ করত, এবং এতে দেশের সর্বত্র তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। বড় বড় নেতাদের কেস করতে সে বিলাসপুরের বাইরে যেতে, ব্যবসায় ক্ষতি সত্ত্বেও, কদাচ ইতস্তত করত না; তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য, সাধারণ স্বদেশী কর্মীদের কেস পেলেও সে সমান উৎসাহে ও ঔদার্যে গ্রহণ করত; উপরন্তু, নিজের জুনিয়ারদের দিয়ে ছোট আদালতে বিনা পয়সায় এ-সব কেসের দায়িত্ব নিত।

সরিৎসাগর কোঠারী অন্য কোনও রমণীর পাণিগ্রহণ করে নি।

রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ভূমিকাও সরিৎসাগর কোনও দিন গ্রহণ করেন নি। কংগ্রেসী দলে নাম লেখেন নি, কংগ্রেসের কোনও পদে অধিষ্ঠিত হন নি। তা হ'লেও রাজনৈতিক কেসগুলির জন্যে এবং কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি কমিশন ও কমিটির চেয়ারম্যান বা সভ্যপদ গ্রহণ করায় তার সঙ্গে সরিৎসাগরের আত্মিক সম্পর্ক দীর্ঘকাল গ'ড়ে উঠেছিল। যে-সব কমিশন বা কমিটির বিষয়বস্তু ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র বা ইংরাজের এক বা একাধিক আইনের সংশোধন অথবা প্রত্যাহার দাবির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, একমাত্র তাতেই সরিৎসাগর অংশ গ্রহণ

করতেন। কালে তিনি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসনতন্ত্র-আইনে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণয়নেও তাঁর অনেকখানি হাত ছিল। কনষ্টিটিয়ুয়েণ্ট এ্যাসেম্বলির সভ্য হিসাবে দু'বছর কাটাবার পর, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুরোধে, তিনি উদয়াচলের মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছিলেন। মন্ত্রীত্বে তাঁর লোভ ছিল না। তথাপি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করেন নি। উদয়াচলে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা তৈরি করবার ইচ্ছে ছিল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের। যে-ব্যবস্থা গ্রাম থেকে জন্ম নিয়ে, বিভিন্ন স্তরে, শহরের উচ্চতম ধাপ পর্যন্ত উঠে আসবে; যাতে বর্তমান মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থার গলদগুলি বাদ পড়বে; এবং যার মাধ্যমে সুপরিকল্পিত পথে প্রদেশের জনসাধারণকে পল্লী থেকে শহর পর্যন্ত নাগরিক জীবনের ব্যাপক পরিধিতে নানাবিধ কল্যাণসাধনে সক্রিয়ভাবে টেনে আনা যাবে। বিলাসপুর রোটারী ক্লাবে একদিন প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বায়ত্তশাসন পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছিলেন এবং এ কার্যে সুদক্ষ লোকেদের সাহায্য চেয়েছিলেন। বক্তৃতার পর কয়েকজনের সঙ্গে কিছু কথাবার্তাও হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সরিৎসাগর কোঠারী।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলছিলেন, "কোঠারী সাহেবকে ত আমরা আজকাল একেবারেই পাই নে।"

সরিৎসাগর জবাব দিয়েছিলেন, "জেলে ত আর যান না, আদালতেও আর ব্যারিষ্টারের প্রয়োজন নেই।"

"আমাদের সঙ্গে কি আপনার অতটুকু সম্পর্ক?"

"কোশলজির রাজনীতিতে আমার উৎসাহ আছে, রুচি নেই। দল-গঠন ক'রে রাজনৈতিক কোন্দল পাতান আমি কোনও দিন পছন্দ করি নি। তাই, পার্টি-মাফিক রাজনীতি আমার দ্বারা আর আর হয়ে উঠল না।"

"তবু ত সারাজীবন আপনি দেশের জন্যে কম করেন নি!"

"দেশের জন্যে করা কথাটার, মাপ করবেন কোশলজি, কোনও মানে হয় না। অথচ সর্বদা, একথা এ-দেশের লোকমুখে শুনতে পাই। স্বদেশী করবার আগে বা করবার সময় আপনারা কেউ নিশ্চয় দেশের উপকার করবার পরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন নি। যদি কেউ তাই করে থাকেন তবে তিনি স্বার্থপর। আমরা বড় কিছু করি নিজের তাগিদে, না-করে পারি নে বলে। গান্ধীজী অনেক সময় এ কথাটা বলতেন। বলতেন, ভারতবর্ষের জন্যে কিছু করার স্পর্ধা আমার নেই, এক সেবা ছাড়া। দেশের মুক্তি যদি চাই তা নিজের বন্দীত্ব অসহ বলে।"

"অতি সত্য কথা।"

"আমি দেশভক্ত এমন দাবি কদাচ করব না। ভারতবর্ষকে ভক্তি করা সহজ নয়। তার চেয়ে ভালবাসা সহজ। যাকে ভালবাসি তার দোষ দেখতে পাই নে। পেলেও ক্ষমা করি, বুঝতে চেষ্টা করি। কিন্তু দেশপ্রেম আমার কদাচ এখন উগ্র ছিল না যে আপনাদের মত সব ছেড়ে স্বদেশীতে নেমে পড়তে পারি। তা ছাড়া, বলতে দ্বিধা নেই, আপনাদের স্বদেশী অনেক সময় আমার কাছে হাস্যকর মনে হ'ত। আমি কেবল দু'জন মানুষের স্বদেশী তারিফ করতে পেরেছি—এক মহাত্মা গান্ধী, অন্য সুভাষ বোস।"

"কেন? জবাহরলাল নেহরু?"

"প্রধানমন্ত্রী আমাদের সবাকার মাননীয়। তাঁর রাজনীতির আমি প্রশংসা করি। কিন্তু তাঁর স্বদেশী সম্বন্ধে আমার মত খুব উঁচু নয়।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "ওসব আলোচনায় কাজ নেই। আমি চাই আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"

"কি ভাবে?"

"আসুন না একদিন আমার বাড়ীতে? কথাবার্তা হবে।"

সরিৎসাগর কোঠারীকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মন্ত্রীত্ব গ্রহণে রাজী করিয়েছিলেন। কথা দিয়েছিলেন, কংগ্রেসের চার আনা সদস্য ছাড়া আর কিছু তাঁকে হ'তে হবে না। তিনি কোনও দল বা উপদলে থাকবেন না। তাঁর প্রধান দায়িত্ব হবে উদয়াচলে নতুন ধরনের স্বায়ত্ত শাসন গঠন করা। সঙ্গে সঙ্গে, আইন বিভাগের ভার তিনি নিলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিশ্চিন্ত হবেন যে প্রাদেশিক আইনগুলি সুচরিত হবে, হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট তাদের বাতিল করতে পারবেন না।

বলেছিলেন, "ভুলতে পারি নে, স্বায়ত্তশাসন নিয়েই

কংগ্রেসী আন্দোলন সুরু। ইংরেজ আমলে আমরা স্বায়ত্ত-শাসন প্রসারিত ও শক্তিশালী করবার জন্যে বছরের পর বছর দাবি জানিয়েছি। আমাদের নেতাদের অনেকেরই জনকল্যাণের বাস্তবক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার হাতেখড়ি মিউনিসিপ্যালিটিতে। গান্ধীজী নিজে এ নিয়ে অনেক লিখেছেন, অনেক কাজ করে গেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হবার সময় কি অভূতপূর্ব জন-আলোড়ন হয়েছিল। সর্দার প্যাটেল আহমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি, রাজেনবাবু পাটনায়, নেহরুজী এলাহাবাদে, নেতাজী কলকাতায় স্বায়ত্তশাসনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অথচ স্বাধীন হবার পর আমাদের দেশে বোধ করি একটি কর্পোরেশন, একটি মিউনিসিপ্যালিটি জিলা বোর্ড বা য়ুনিয়ন বোর্ড নেই যা নিয়ে আমরা সামান্য গর্ব করতে পারি। দেশের শাসনভার যারা গ্রহণ করবে তাদের প্রথম শিক্ষানবীশির ক্ষেত্র হবে এ সব প্রতিষ্ঠান। অথচ, দুঃখের কথা, প্রদেশে প্রদেশে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি সরকার নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসছেন, স্বায়ত্তশাসন মরে যাচ্ছে। কর্পোরেশনগুলি দুর্নীতি, আত্মীয়পোষণ, চুরি, অপটুতা ও ব্যর্থতার উদাহরণ হয়ে উঠেছে। আমার মতে এই হ'ল কংগ্রেস শাসনের প্রধান ব্যর্থতা। গ্রাম থেকে নগর পর্যন্ত জনসাধারণের হাতে ক্রমবর্ধমান স্থানীয় শাসনের ক্ষমতা আমরা তুলে দিতে পারি নি। শাসনকে ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত করে চলেছি। আমি এ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই। এবং এ দায়িত্ব আপনার। যথাসম্ভব এ দায়িত্ব পালনে আপনার পূর্ণ অধিকার থাকবে।"

সরিৎসাগর জানতে চেয়েছিলেন তাঁর তৈরী প্ল্যান ক্যাবিনেটের অনুমোদন-সাপেক্ষ হবে কি না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেছিলেন, "হবে। কিন্তু আমি আর আপনি একমত হ'লে ক্যাবিনেট নিয়ে ভাবতে হবে না।"

"যদি একমত না হই।"

"হবার সম্ভাবনাই বেশি। আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করে ক্যাবিনেটে আনছি।"

সরিৎসাগর ক্যাবিনেটে যোগ দিয়েছিলেন পূর্বোল্লিখিত বিভাগ পুনঃ বন্টনের সময়। মন্ত্রী হয়েই তিনি নতুন পরিকল্পনার খসরা করেন নি। প্রথমত, ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত-শাসনের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন। উল্লেখযোগ্য যতগুলি রিপোর্ট গত একশ বছরে লেখা হয়েছে তা পাঠ করেছেন। কয়েকটি রিপোর্ট পাবার জন্যে তাঁকে কম বেগ পেতে হয় নি। স্বায়ত্ত-শাসন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে গিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন। উদয়াচলের স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস বিশেষ যত্ন নিয়ে অনুধাবন করেছেন। গ্রাম-কেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে গান্ধীজীর রচিত প্রবন্ধ 'হরিজন' পত্রিকার বহু বছরের ফাইল জোগাড় ক'রে প'ড়ে নিয়েছেন। তারপর নজর দিয়েছেন বিদেশের অভিজ্ঞতায় ও প্রতিষ্ঠানে। সোভিয়েট য়ুনিয়ন, য়ুগোস্লাভিয়া, ইংলণ্ড এবং স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলির স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা অধ্যয়ন করেছেন। তার পর উদয়াচলের বাইরে থেকে আমন্ত্রিত তিনজন এবং প্রদেশের দু'জন বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটি কমিটি গঠন ক'রে সমস্ত বিষয়টির ওপর দীর্ঘকালীন রিপোর্ট সংগ্রহ করেছেন। অবশেষে সরিৎসাগর নিজের বিবেচনা ও কমিটির সুপারিশ সম্বন্ধিত ক'রে নতুন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন।

এতে করে দু'বছর কেটে গেছে।

পরিকল্পনা মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রাজনৈতিক জীবনেরও হাতেখড়ি হয়েছিল জিলা বোর্ডে: স্বায়ত্ত-শাসনের সমস্যাগুলির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। সরিৎসাগর কোঠারী বিষয়টিকে এত বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় তিনি সুখী হয়েছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য মতবিরোধ ছাড়া সরিৎসাগরের পরিকল্পনায় তাঁর আপত্তি ছিল না। মতবিরোধের ক্ষেত্র এত ক্ষুদ্র ছিল যে মতানৈক্য ঘটাতে দু'জনকে বেগ পেতে হয় নি।

কিন্তু আজ পর্যন্ত সরিৎসাগরের পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নি। নতুন স্বায়ত্ত-শাসন বিল আজ পর্যন্ত বিধান সভার অনুমোদন পায় নি।

পরিকল্পনার মূল দর্শন ছিল স্বায়ত্ত-শাসন থেকে রাজনীতি দূরে সরিয়ে রাখা। সরিৎসাগর এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে, স্থানীয় শাসন দোষমুক্ত করতে হ'লে রাজনীতি থেকে তাকে বাঁচাতে হবে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এ সিদ্ধান্তে মত দিয়েছিলেন। গ্রাম পঞ্চায়েৎ থেকে নগর নিগম পর্যন্ত স্বায়ত্ত-শাসন পরিচালিত হবে উপযুক্ত জন-নির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা, কোনও রাজনৈতিক দল দ্বারা নয়। পঞ্চায়েৎ-

প্রধান নিজের দায়িত্বে সহকারী বেছে নেবেন এবং দু'বছর তাঁর শাসন চলবে ; তিনি সাহায্য পাবেন জিলা অফিসরের কাছ থেকে। একই ভাবে, মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি নির্বাচিত হবেন গণভোটে ; তিনি তাঁর 'ক্যাবিনেট' বেছে নিয়ে তিন বছর নগর শাসনের দায়িত্ব নেবেন। নগর নিগমের মেয়রদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা। নির্বাচনের সময় কেউ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হবেন না ; দাঁড়াবেন নিজের চরিত্র, কর্মশক্তি ও পুরাতন জনসেবার রেকর্ড নিয়ে। নগর নিগম থেকে পঞ্চায়েৎ পর্যন্ত নির্বাচিত কাউন্সিলারদের মেয়র থেকে প্রধান পর্যন্ত, প্রশাসন-নেতাদের পদচ্যুত করবার ক্ষমতা থাকবে না। অর্থাৎ, সরিৎসাগর কোঠারীর পরিকল্পনা গ্রাম থেকে নগর পর্যন্ত আগামী কালের প্রশাসন নেতা গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়েছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে তাঁর এই অভিনব প্রস্তাব সমর্থন করবেন, সরিৎসাগর আশা করেন নি। সমর্থনে আশ্চর্য হয়েছিলেন।

প্রথম বাধা এল ক্যাবিনেটে। দু'তরফ থেকে। দুর্গা-ভাই দেশাই আপত্তি জানালেন এক কারণে। বললেন, নতুন প্ল্যান প্রগতি-বিরোধী। কংগ্রেস এতকাল যে স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা সমর্থন করে এসেছে এ তার বিপরীত। অন্য আপত্তি এল সুদর্শন দুবের দল থেকে। মুখপাত্ররা বললেন, রাজনীতি বাদ দিলে জনগণকে ত বাদ দেওয়া হবে, বাদ দেওয়া হবে গণতন্ত্রকে। বললেন, রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্র হতে পারে না। স্বায়ত্ত-শাসনের উদ্দেশ্য গণতন্ত্রকে শক্ত করা, সবল করা। রাজনৈতিক দলগুলি যদি স্বায়ত্ত শাসনে যোগ না দিতে পারে, গণতন্ত্র গ্রামে পৌঁছবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে।

সরিৎসাগর প্রাণপণ লড়লেন। পুনরায় আশ্চর্য হ'লেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নকেও সবটুকু শক্তি নিয়ে তাঁর পাশে দেখে। বিষয়টা গুরুতর হয়ে উঠল। দুর্গাভাই শেষ পর্যন্ত প্ল্যান সমর্থন করতে রাজী হ'লেন। কিন্তু প্রাদেশিক কংগ্রেস মানল না। সুদর্শন দুবে প্রকাশ্যে প্ল্যানের বিরোধিতা করলেন। বলতে লাগলেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কংগ্রেসকে দুর্বল ও পঙ্গু করতে চান। উদয়াচলের অধিকাংশ কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটি বিরুদ্ধে দাঁড়াল। তাদের সবই কংগ্রেস-শাসিত। ব্যাপারটা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল। গণ-মত দেখা গেল নতুন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে। সুদর্শন দুবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির শরণাপন্ন হ'লেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও সরিৎসাগরকে দিল্লী যেতে হ'ল। বামপন্থী দলগুলিও বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিল।

মন্ত্রীসভায় ভাঙ্গনের প্রথম প্রকাশ্য কারণ হ'ল স্বায়ত্ত শাসন।

সরিৎসাগর কোঠারী একদিন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে পদ-ত্যাগ পত্র নিয়ে হাজির হলেন। বললেন, "কোশলজি, আপনি অনেক লড়েছেন। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধার সীমা নেই। কিন্তু আমরা হেরে গেছি। এবার আমাকে রেহাই দিন।"

"রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করছেন ?"

"না। স'রে দাঁড়াচ্ছি। দলীয় রাজনীতিতে কোনও দিন আসতে চাই নি এই ভয়ে।"

"আপনি ত নিজের ইচ্ছায় আসেন নি। আমি ডেকে এনেছি। যদি আপনার পরিকল্পনা গৃহীত না হয়, পরাজয় আমারও। আমি এত সহজে হার মানি না।"

"আপনি কি মনে করেন পরিকল্পনা আপনি চালু করতে পারবেন ?"

"নিশ্চয় মনে করি। এ ঝড় বয়ে যেতে দিন। পদ-ত্যাগ করবেন কেন ? এ সময় আমাকে একা ফেলে আপনার স'রে দাঁড়ান কি ঠিক হবে ?"

"কিন্তু—"

"এ ঝড় বয়ে যাক। ব্যাপারটা বহুদূর গড়াবে। মনে হচ্ছে মন্ত্রীসভার পতন হবে। হয়ত দেখবেন, দলের আস্থাও আমি হারিয়ে বসেছি।"

"আমার জন্যে আপনি অতটা করবেন কেন ?"

"আপনার জন্যে নয়। আমি রাজনীতি করি। আপনার জন্যে আমার রাজনৈতিক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিসর্জন দেব অত বোকা আমি নই। এ প্ল্যান আমার চাই। উদয়াচলের জন্যে, ভারতবর্ষের জন্যে। একদিন-না-একদিন সুদর্শন দুবেদের হাত থেকে মুক্তি না পেলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাকে একটা প্রদেশের প্রশাসন চালাতে হয়। আমি জানি দলীয় রাজনীতি রাজনীতি কি ভাবে সারা দেশের রক্ত দূষিত করে দিচ্ছে। আমি জানি কেন একজন ডেপুটি কমিশনারও জিলায় কাজ করতে পারে না, কাজ করতে চায় না। জিলা কংগ্রেসের

নেতারা তাদের কাজ করতে দেয় না। মন্ত্রীদের পেছনে ঘুরতে ঘুরতে তারা হয়রান হয়ে যায়। পঞ্চায়েৎ থেকে নগর নিগম পর্যন্ত রাজনীতির অত্যাচার দেশকে দীন দুর্বল করে তুলেছে। আমাদের কাল ত শেষ হয়ে এল, কোঠারী সাহেব। আমরা আজ আছি, কাল নেই। কিন্তু দেশটা ত থাকবে—তার ভবিষ্যৎ আছে, তাকে বাড়তে হবে, এগোতে হবে। আপনি এত পরিশ্রমে যা করেছেন তা দেশের ভবিষ্যতের জন্যে। এত সহজে আমি তা ব্যর্থ হ'তে দেব না।

"যদি আপনাকে পর্যন্ত পদত্যাগ করতে হয় ?"

"পদত্যাগ বোধহয় করতে হবে না। হঠাৎ একদিন দলে হেরে যেতে পারি। তাতে ভালও হ'তে পারে। নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করব।"

"আশ্চর্য আপনার আত্মবিশ্বাস !"

"তার ভিত্তি কি, জানেন ? উদয়াচলের নাড়ী-নক্ষত্র আমি জানি। আমি জানি সুদর্শন ভ্রবেকে, তার দলের প্রত্যেক মানুষকে। জানি, বিধান সভার প্রত্যেক সদস্যকে। প্রাদেশিক হ'তে মণ্ডল কংগ্রেস পর্যন্ত প্রত্যেক নেতাকে। জানি বলেই এ আত্মবিশ্বাস। জানি, কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বাদ দিয়ে উদয়াচলের কংগ্রেস শাসন চলবে না। জানি, এরা যদি আজ আমার বিরুদ্ধে ভোট দেয়, কাল আবার আমারই পক্ষে ভোট দেবে।"

সরিৎসাগর সরকারী বাংলোয় থাকতেন না। বিলাসপুরে পিতার অট্টালিকা আছে, তাতেও তিনি বাস করেন নি, প্র্যাকটিসের প্রথম কয়েক বছর ছাড়া। শহরের পুব দিকে প্রাচীন ঝিল, তার কাছাকাছি সরিৎসাগরের নিজের বাড়ী। দু' একর জমিতে মস্ত লন, বিরাট্ বাগান, টেনিস কোর্ট, সাঁতারের পুকুর—এবং ছোটছোট্ট বাসা। একতলা ধবধবে সাদা বাংলো প্যাটার্নের ছোট্ট বাড়ী—দু'খানা শোবার ঘর, লাইব্রেরী, বসবার ঘর, খাবার ঘর, বাথরুম ইত্যাদি। সবচেয়ে বড় হ'ল লাইব্রেরী ঘর। বাংলোর ডান ও বাঁ দিকে আরও দু'খানা ছোট বাড়ী, একখানায় সরিৎসাগরের দপ্তর, অন্যখানা অতিথিশালা। দপ্তরে মক্কেলদের বসবার জন্যে একখানা ঘর, মুহুরীদের জন্যে একখানা, জুনিয়রদের জন্যে দুখানা এবং সরিৎসাগরের নিজের জন্যে একখানা। অতিথিশালায় তিনখানা শোবার ঘর, একখানা বসবার ঘর এবং আনুষঙ্গিক বাথরুম ইত্যাদি। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে সরিৎসাগর অকৃতদার জীবনের জন্যে নিজেকে তৈরি করেছিলেন। বাড়ী নির্মাণের সময়ও একক জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্ল্যান তৈরি করিয়েছিলেন।

আইন-ব্যবসা ছাড়া তাঁর বহু বিষয়ে উৎসাহ ছিল। নিজের হাতে বাগান তৈরি—ফুল, ফল, সব্জি সবাইতে সমান উৎসাহ। পশুপক্ষী তিনি ভালবাসতেন ; ভারতবর্ষে মুষ্টিমেয় পক্ষী-প্রেমীদের মধ্যে তাঁর নাম সবাই জানত। বাগানে নানারকম বিদেশী গাছ লালন করা সরিৎসাগরের আর এক নেশা। বাগানটিকে তিনি অনেক বছরের চেষ্টায় একটি ছোটখাট বোটানিক্যাল গার্ডেন-এ তৈরি করেছিলেন। বাগানের কেন্দ্রস্থলে ছিল কাঁচের বেড়া দেওয়া ঠাণ্ডা-ঘর : শীতপ্রধান দেশের গাছ-গাছড়ায় ভরতি। একপ্রান্তে ছিল সরিৎসাগরের নিজস্ব জলজপ্রাণী গৃহ : নানা রং-এর মাছ দেশ-বিদেশ থেকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। পাহাড়ে বেড়ান ছিল সরিৎসাগরের আর এক নেশা। ভারতবর্ষের এমন কোনও পাহাড় পর্বত নেই যার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ নিবিড় পরিচয় ছিল না।

একক জীবন বেছে নিয়েও সরিৎসাগর নিরালা মানুষ ছিলেন না। বহু বন্ধু বান্ধব তাঁর কাছে আসত, থাকত, আনন্দ-আহ্লাদ করত। তাঁদের সৎকারের ব্যবস্থায় সরিৎসাগর কার্পণ্য করতেন না।

সরিৎসাগরের বাড়ীতে কেবলমাত্র একখানা ছবি ছিল। লাইব্রেরী ঘরে টেবিলের ওপর রূপার ফ্রেমে বাঁধান। একটি ইংরেজ তরুণীর। হাস্যময়ী সুন্দরী মার্গারেট ওয়াকার।

মার্গারেট ওয়াকারকে বিবাহ না করতে পারার পরিণাম সরিৎসাগরের আজীবন কৌমার্য কিন্তু তাঁর জীবনে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। ভাসাভাসা, ওপর-ওপর, আনন্দ স্ফূর্তি-সম্ভোগ প্রবেশ। পছন্দমত স্ত্রীলোকরা সরিৎসাগরের শয্যায় স্থান পেত ; অন্তরে কারুর স্থান ছিল না।

সূর্যপ্রসাদ যখন মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি নিয়ে সরিৎসাগরের বাড়ীর ভেতরে ঢুকল, তখন সরিৎসাগর লাউঞ্জে বসে চারজন অতিথির সঙ্গে গালগল্প করছিলেন। অতিথিদের দু'জন দেশী, দু'জন বিদেশী। দেশীদের একজন বিলাসপুরের

উদীয়মান ব্যারিষ্টর মদনমোহন সহায়, অন্যজন দিল্লীর ব্যবসায়ী, কুন্দনলাল সুদ। বিদেশীদের একজন ইংরেজ। সদ্য বিলাত থেকে এসেছেন ভারতভ্রমণে, উদ্দেশ্য ব্যবসার সুযোগ সন্ধান। নাম আর্থার হিউম। অন্যজন জার্মান রমণী, সরিৎসাগরের অন্যতমা বান্ধবী। মহিলার দিল্লীতে প্রবাস; পশ্চিম জার্মানীর রাজদূতের উদ্যোগে জার্মান ভাষা শেখাবার জন্যে প্রতিষ্ঠিত স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। নাম, হিল্ডা ষ্ট্রাউস্। কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন বিলাসপুরে সরিৎসাগরের অতিথি হয়ে।

গাড়ি ফাটকে ঢুকতে দেখে সরিৎসাগর একটু চমকে উঠেছিলেন। পরক্ষণে আরোহীর ওপর নজর পড়তে হেসে ফেললেন।

বললেন, "চীফ মিনিষ্টরের গাড়ি। কিন্তু আগন্তুক মুখ্যমন্ত্রী নন। তাঁর পুত্র সূর্যপ্রসাদ কোশল। এম. এল. এ।"

মদনমোহন সহায় বললেন, "কে. ডি. কোশলের ভবিষ্যৎ কি?"

উত্তরে সরিৎসাগর বললেন, "কে. ডি. কোশলের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। ভদ্রলোকের গুণ অনেক, শক্তি অসাধারণ; নিজের নৌকা নিজে সামলাবার ক্ষমতা রাখেন। তা ছাড়া, জীবন সুরু করেছিলেন কুশানপুরের জিলা আদালতে উকিল হয়ে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাজনীতিতে। কালে উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী। চাকরি যদি যায় হয় ভারত সরকারে মন্ত্রীত্বে প্রমোশন পাবেন, নয়ত রাজ্যপাল হয়ে নিশ্চিন্ত আরামপূর্ণ অবসর। আমার বরং মাথাব্যথা হয়, মাঝে-মধ্যে, একটা দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে। তার নাম ভারতবর্ষ।"

আর্থার হিউম বললেন, "আমার ত মনে হয় আপনারা খুব ভাল ম্যানেজ করছেন!"

"তুলনাক্রমে করছি", সরিৎসাগর বললেন। "কিন্তু আমাদের সমস্যা বড় কঠিন। পৃথিবীর এমন আর একটা দেশ নেই যার সমস্যার সঙ্গে আমাদের অবস্থা তুলনীয়।"

হিল্ডা ষ্ট্রাউস বললেন, "ইণ্ডিয়া সত্যি অতুলনীয়।"

সরিৎসাগর বললেন, "উদার বৃহৎ আকাশ, উত্তরে গগনচুম্বী হিমালয়, দক্ষিণে পশ্চিমে সীমাহীন সমুদ্র। চার হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত। বুদ্ধ, গান্ধী, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ। চল্লিশ কোটি লোক, বছরে বিশ লক্ষ তার বৃদ্ধি। ষোলটি ভাষা, কেউ অন্যের কাছে মাথা নত করবে না। শতকরা আশি জন নিরক্ষর। একশ' জনের মধ্যে সত্তর জনের পুরো দুবেলা আহার জোটে না। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। চল্লিশ কোটি মানুষের সমান অধিকার। ভারতবর্ষের সত্যি তুলনা নেই।"

গাড়ি এসে লাউঞ্জের সামনে দাঁড়াল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল সূর্যপ্রসাদ। একবার থমকে দাঁড়াল। তার পর হাতজোড় নমস্তে করল।

সরিৎসাগর এগিয়ে এলেন: "এস, সূর্যপ্রসাদ এস। গাড়ি দেখে একটু ভড়কেছিলাম। বোঝা উচিত ছিল, এ সময়ে কোশলজির পক্ষে আমার বাড়ী কেন, স্বর্গধামে যাওয়ারও উপায় নেই।"

সূর্যপ্রসাদ বলল, "পিতাজি বড় ব্যস্ত আছেন।"

"বুড়ো হয়ে গেছি সূর্যপ্রসাদ। নইলে এ কথাটা তুমি বলার আগেই বুঝতে পারতাম।"

পরিচয় করিয়ে দিলেন অতিথিদের সঙ্গে। "ইনি মিষ্টার হিউম। বিলেত থেকে এসেছেন। বলছেন, এতদিনের সাম্রাজ্য এখন স্বাধীন হয়ে বেশ ভালই সব কিছু চালাচ্ছে। ইনি ফ্রাউলিন ষ্ট্রাউস। জার্মান। বলছিলেন, ভারতবর্ষের তুলনা নেই। ইনি কুন্দনলাল সুদ। সারা ভারতবর্ষ নিংড়ে যে দৌলত দিল্লীতে জমা হয় তার বড় অংশীদার। আর মদনমোহন সহায়কে ত চেন। তোমার বাবা আমার যে ব্যবসাটি মেরেছেন, মদনমোহন তা নির্বিবেকে দখল করে বসছে। আর ইনি? ইনি সূর্যপ্রসাদ কোশল। মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র। আমাদের বিধান সভার অন্যতম কংগ্রেসী সদস্য।"

সূর্যপ্রসাদ নমস্তে, করমর্দন সমাপ্ত ক'রে চেয়ারে বসলে, সরিৎসাগর প্রশ্ন করলেন, "কি পান করবে? বীয়র না মার্টিনী? খুব চোস্ত ইটালীয়ন মার্টিনী আছে।"

সূর্যপ্রসাদ লাজুক গলায় বলল, "বীয়র।"

বেয়ারাকে অর্ডার দিয়ে সরিৎসাগর বললেন, "তারপর, সূর্যপ্রসাদ? কি মনে করে?"

"ভাল লাগছিল না। বাড়ীতে কেমন একটা গুমোট, অসহ্য পরিবেশ। পিতাজির ধারে কাছে যাওয়া যায় না।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতেও পারছি না। তাই চলে এলাম আপনার কাছে।"

"ভাল লাগছিল না, এখানে চলে এসেছে, শুনতে আমার মন্দ লাগছে না। খাও-দাও আনন্দ কর, বাগানে ঘুরে বেড়াও, বেড়াতে চলে যাও—দেখবে বেশ ভাল লাগবে। হিলডা—মানে মিস ষ্ট্রাউস—বিলাসপুরে বেড়াতে এসেছেন, আমার মতন বুড়ো মানুষ নিশ্চয় ভাল লাগছে না; তোমাকে সঙ্গী পেলে নিশ্চয় খুশি হয়ে বেড়াতে বেরোবেন। কিন্তু, সূর্যপ্রসাদ, রাজনীতির যুদ্ধের অবস্থা যদি জানতে চাও তুমি ভুল জায়গায় এসেছ। আমি এমন কোনও সঞ্জয়কে নিযুক্ত করি নি যে আমাকে অবিরাম রিপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে।"

"সে জন্যেই আপনার কাছে এসেছি। আপনি এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত। আপনার মতামতের দাম অনেক। তা ছাড়া আপনার মত বুদ্ধিমান লোক উদয়াচলে আর কে আছে?"

"তাই নাকি? সূর্যপ্রসাদ, আপনারা সকলে শুনে নিন, আমাকে উদয়াচলের সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক বলছে। ধন্যবাদ। বৃদ্ধ বয়সে এ প্রশংসার দরকার ছিল। হ্যাঁ, সূর্যপ্রসাদ, আমি অনেকখানি নির্লিপ্ত। কিন্তু একেবারে নই। আমি জানি, বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের জন্যে অনেকখানি দায়িত্ব আমার। কোশলজি আমার পেছনে শক্তভাবে দাঁড়িয়েছেন, এজন্যে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। এবং একই কারণে আমি তাঁর বিজয় চাই। এর চেয়ে বেশি এ ব্যাপারে আমার লিপ্ততা নেই। কারণ, এ কথা সবাই জানে, নতুন মন্ত্রীসভায় স্থান পেলেও আমি নেব না। পাবার সম্ভাবনাও নেই।"

মদনমোহন সহায় বললেন, "আপনি মন্ত্রী হোন বা না-হোন, উদয়াচলের রাজনীতি থেকে একেবারে স'রে থাকা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না।"

"হবে", সরিৎসাগর জোর দিয়ে বললেন। "এত দীর্ঘকাল আমি রাজনীতি করি নি, তাতে উদয়াচলের ক্ষতি হয়েছে বলে ত জানা নেই। যেই মন্ত্রী হ'লাম, অমনি গোলমাল বাধল। কোশলজি সুখে রাজত্ব করছিলেন, সুদর্শন ডুবে পরমানন্দে কংগ্রেস নামক গাভীর দুগ্ধ দোহন করছিলেন। কোথা থেকে আমি উড়ে এসে জুড়ে বসে সবকিছু গোলমাল করে দিলাম। রাজনীতি আর নয়।"

হিউম বললেন, "রাজনীতি আপনার পেশা নয়?"

"পেশাও নয়, নেশাও নয়," সরিৎসাগর মন্তব্য করলেন। "পেশা আমার আইন। নেশা অনেক—কিন্তু রাজনীতি নয়। আমাদের দেশে রাজনীতি এত বেশি লোকের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বেকারের সংখ্যা অনেক, এবং রোজ বাড়ছে। ভারতীয় গণতন্ত্রের এ এক দারুণ দুর্বলতা। রাজনীতি যাঁদের পেশা তাঁরা যে-কোনও রকমে হোক রাজনীতি করবেই। আপনাদের দেশে ধরুন, চার্চিল। রাজনীতি করেন, এটা তাঁর পেশা। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী না হ'লে তাঁর বেকার থাকার কারণ ঘটে না। তিনি বই লেখেন, ছবি আঁকেন, সারগর্ভ বক্তৃতা করেন: সময় বেশ ভালই কাটে। ব্রিটেনের শাসনভার তাঁর হাতে না থাকতে পারে, কিন্তু যুগের পর যুগ তিনি যে নির্বাচন-এলাকার প্রতিনিধি হয়ে পার্লামেণ্টে স্থান পাচ্ছেন, তাদের প্রতি কর্তব্যটুকু সম্বন্ধে তিনি নিত্য সজাগ। আজ আপনাদের হ্যারল্ড ম্যাকমিলান বিরাট্‌ ম্যাকমিলান কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টরদের সভাপতি। একদিন হয়ত তিনি হবেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রীত্ব যাবার পর প্রত্যাবর্তন করবেন নিজের ব্যবসায়ে। অর্থাৎ, মন্ত্রীত্ব ছাড়াও তাঁদের করবার কিছু আছে। তাঁরা বেকার নন। আমেরিকায় আজ যিনি পররাষ্ট্রসচিব, কাল মন্ত্রীত্ব যাবার পর হয় তিনি কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি, নয় কোনও রিসর্চ ইনষ্টিটিউশনের ডিরেক্টর। আমাদের দেশেই দেখতে পাই এক বিরাট্‌ সংখ্যক নতুন শ্রেণী: রাজনীতি ছাড়া যাদের আর কিছু করবার নেই। সূর্যপ্রসাদ কিছু ক'রো না, কোশলজির কথাই বলছি। আসলে তিনি উকিল, কুশানপুর জিলা আদালতে তাঁর একদা প্র্যাকটিশ ছিল। কিন্তু আজ মুখ্যমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে কুশানপুর জিলা আদালতে ফিরে গিয়ে ওকালতী করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। মানে বাধবে, রোজগার হবে না; ভগ্নহৃদয়ে হয়ত মারাই যাবেন। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তাঁকে থাকতেই হবে, যদি একান্ত না হ'তে পারেন তা হ'লে, দিল্লীর দাক্ষিণ্যে হয় কেন্দ্রে মন্ত্রীত্ব নয় রাজ্যপালপদ পাওয়া দরকার হবে। নতুবা বেকার, করণীয় কিছু নেই। কোশলজি অবশ্য একেবারে বেকার নাও হ'তে পারেন, তিনি কবি, তাঁর কবিযশ আছে, যদিও এত বছর মুখ্যমন্ত্রীত্ব করবার পরও কবি-লক্ষ্মী তাঁর আয়ত্তে

আছেন কি না জানি নে। কিন্তু আমাদের দশজন রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রীর মধ্যে ন' জনেরই নিজস্ব কোনও কর্মস্থান নেই। তাই দেখা যায় মন্ত্রীত্ব কেউ ছাড়তে চায় না। সবাই চায় আমরণ মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী থাকতে। টিল্ ডেথ ডু আস্ পার্ট।"

"আপনার বেলা এ কথা নিশ্চয় খাটে না।" বলল মদনমোহন সহায়।

"নিশ্চয় না!" জোর দিয়ে বললেন সরিৎসাগর। "আমি মন্ত্রীত্ব চাই নি, চাই নে, চাইব না। আমার হাইকোর্ট আছে, বাগান আছে, গাছ-মাছ আছে, পাহাড়-পবত আছে, বন্ধু-বান্ধবী আছে; মন্ত্রীত্বে আমার লোভ নেই। এবং বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করছি, আমার মত লোক ভারতবর্ষে অনেক, অনেক না হ'লে আমাদের গণতন্ত্র রাজনীতির ভেজাল খেয়ে খেয়ে অদূর ভবিষ্যতে মারা যাবে।"

সূর্যপ্রসাদ প্রশ্ন করল, "রাজনীতি পেশা হতে পারে না কেন?"

"পারে, পারা উচিত নয়," বললেন সরিৎসাগর। "আমাদের রাজনীতির বারো আনা দলবাজি। দলের ইংরেজী প্রতিশব্দ হল পলিটিক্স। মধ্যে উপদল, উপদলের মধ্যে অপদল। রাজনীতির পলিটিক্স মানে আর্ট অব গভর্ণমেণ্ট। আমরা যাকে পলিটিক্যাল সায়ান্স বলি, মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নাম 'গভর্ণমেণ্ট'। পরাধীন দেশের রাজনীতি দেশকে স্বাধীন করা। স্বাধীন দেশের রাজনীতি দেশকে শাসন করা, উন্নতির পথে এগিয়ে নেওয়া। এর জন্যে চাই অধ্যয়ন, বিচার, বিশ্লেষণ, এবং সবার আগে, একনিষ্ঠ কাজ। আমাদের রাজনীতিতে কাজ খুব কম, অকাজ বড় বেশি। তাই দেখতে পাও আজ তুমি মন্ত্রী, তোমার আদর-আপ্যায়নের শেষ নেই—বাঘ আর গরু অনবরত তোমার ভয়ে একঘাটে জল খাচ্ছে। কাল তুমি মন্ত্রী নও—কেউ তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না—তুমি নিজেও না। যেহেতু তোমার আর কিছু করবার নেই তাই তুমি আবার চাইবে মন্ত্রী হ'তে। এবং হবার জন্যে তুমি কি করবে? রাজনীতি করবে। অর্থাৎ দল পাকাবে। দল পাকাবার জন্যে বর্তমান মন্ত্রীদের পেছনে লাগবে। জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার সব কিছুর ব্যবহার করবে তোমার দলশক্তিত্ব পোক্ত করার জন্যে। এই হ'ল ভারতবর্ষে পেশাদার রাজনৈতিকের জীবন। এতে দলপতি উপদলপতিদের আখের বেশ গোছান যেতে পারে, দেশটার সর্বনাশ হ'তে বাধ্য।"

সূর্যপ্রসাদ বলল, "এজন্যেই আপনার কাছে এসেছিলাম।"

"এসব সারগর্ভ কথা শুনতে? তা হ'লে প্রায়ই এস।"

"তা নয়। আমার মনে একটা সংশয় দেখা দিয়েছে।"

"বটে?"

"ভাবছি, পিতাজির সঙ্গে রাজনীতি করে যাব, না অন্য কিছু করব।"

"এ ত দেখছি বিরাট্ সমস্যা! হ্যামলেটকেও এমন সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় নি।"

হিল্‌ডা স্ট্রাউস বলে উঠল, "সরিৎ, তুমি বড্ড ওঁর 'লেগ পুল' করছ।"

"মোটেই না। শোন সূর্যপ্রসাদ। ওকালতী করে করে আমার জিভের ধার বড্ড বেড়ে গেছে। যা বলব পরিষ্কার সোজা কথা। এটুকু তুমি নিশ্চয় বোঝ যে, তোমার বাবার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছাড়া তুমি এম. এল. এ. হতে পারবে না।"

"বুঝি।"

"এখন প্রশ্ন হ'ল দুটো। প্রথম, বাপের যদি প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকে, তা হ'লে তা ছেলেরা কেন ভোগ করবে না? দ্বিতীয়ত, যে যোগ্যতা আমি অর্জন করি নি, তা বাপ বা অন্য কারুর দাক্ষিণ্যে আমি নেব কি না। দুটোই গুরুতর প্রশ্ন। হিন্দু তার্কিকরা এ নিয়ে পাঁচ বছর অবিরাম তর্ক করতে পারেন। কিন্তু তর্কে মীমাংসা নেই। মীমাংসা ব্যক্তির সিদ্ধান্তে।"

"আপনি কি বলেন?"

"আমি? আমি বলার আগে তুমি বল। বল, তুমি রাজনীতি করতে চাও?"

"চাই।"

"তা হ'লে নিজের ক্ষেত্র গড়ে নাও। যেমন একদিন তোমার পিতাজি গড়ে নিয়েছিলেন। তাঁর বাপ ত তাঁকে নেতা বানান নি? তিনি স্বদেশী করেছেন, জেল

খেটেছেন, কংগ্রেসের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন, উদয়াচলের কংগ্রেসকে নিজের আয়ত্তে রেখেছেন। তোমার ভাই দুর্গাপ্রসাদও স্বক্ষেত্র তৈরি করছে। হোক না সে বামপন্থী —তবু তার নিজস্ব রাজনৈতিক দাবি আছে। তোমার তা আছে কি?"

"আমি ছাত্রনেতা ছিলাম অনেকদিন।"

"ছাত্রনেতা আবার কি?"

"ছাত্র কংগ্রেসের নেতা?"

"ছাত্রনেতা হন হয় মেধাবী ছাত্র, যে পরীক্ষায় প্রথম হয়, নয় গুণ্ডা-ছাত্র, যার দাপটে অন্য ছেলেরা সব কিছু করে, মাষ্টাররা ভয়ে পড়া বন্ধ করে দেয়। ছাত্র-কংগ্রেস নামক কোনও প্রতিষ্ঠান থাকার মানে নেই। ওটা হ'ল বামপন্থী দলগুলির নির্বুদ্ধি অনুকরণ। তা ছাড়া ছাত্ররা ত আলাদা ভোট দিয়ে তোমাকে বিধান সভায় নির্বাচন করতে পারে না।"

"না।"

"তা হ'লে! যদি রাজনীতি করতে চাও, নির্বাচন এলাকা বেছে নাও। গ্রামে বা শহরে। সে এলাকায় কাজ করো। কংগ্রেসের হয়ে করো বা অন্য দলের। জনসাধারণের কাছে তোমার যোগ্যতা প্রমাণ করো। নেতৃত্ব করার আগে জনসেবা করো। মানুষের শ্রদ্ধা, আস্থা অর্জন করো। জনস্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থ মিলিয়ে নাও। মাটি থেকে উঠে এস, সূর্যপ্রসাদ, মাটি থেকে। যারা মাটি থেকে উঠে আসবে না, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে তাদের নেতৃত্ব করা সম্ভব হবে না। দেখছ না, উঁচু স্তর কত তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হ'তে চলেছে? দেশ স্বাধীন হ'ল। শাসনের ডাক পড়ল। বড়, মাঝারি সব নেতারাই রাতারাতি মন্ত্রী উপমন্ত্রী রাজ্যপাল হয়ে গেলেন। একেবারে আর কিছু না হোক ত এম. পি. বা এম. এল. এ.। কংগ্রেসের কাজ, জনগণের কাজ করবার জন্যে বাকী রইল না আর কেউ। বর্তমান মন্ত্রীকুল ত অমর নয়! তারা মরলে দেশের নেতৃত্ব করবে কে?"

সূর্যপ্রসাদ সভয়ে বলল, "কেন? আমরা।"

"তোমরা?" সরিৎসাগর বীয়র পান করতে করতে ব্যঙ্গ হাসলেন, "উত্তম। কিন্তু জনগণ তোমাদের মানবে কেন? আজ তুমি এম. এল. এ. হয়েছ তোমার পিতার গৌরবে। তোমার নিজের অর্জিত নেতৃত্ব কোথায়? দলের দাপটে জনগণ যদি তোমাদের মেনেও নেয়, দেশ শাসন করতে তোমরা পারবে না। তোমাদের বধিবে যে তারা গোকুলে বাড়ছে। বাড়ছে চাষের মাঠে, কারখানায়, বন্দরে: যেখানে অগণিত ভারতবাসী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটছে, অথচ দুবেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না। গণতন্ত্রের বাণী তাদের কাছে পৌঁছে গেছে, তারা জানে যে আসলে রাজশক্তি তাদের হাতে। আমরা তাদের নাম নিয়ে যা কিছু করছি তার একাংশও তাদের কাছে পৌঁছয় না; আসলে, আমরা তাদের চিনি না, জানি না। আমরা তাদের মুখের ভাষা যদি বা বুঝি, শুনবার সময় পাই নে; বুকের ভাষা বুঝি নে। তোমাদের সঙ্গে তাদের কোনও কথোপকথন নেই। যদি তাদের মধ্যে থেকে নিজের কর্মশক্তিতে ও যোগ্যতায় নেতৃত্বের সোপান বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠতে পার রাজনীতিতে তা হ'লেই সার্থকতা পাবে। তা নইলে, আমরা চলতি পথের যাত্রীরা বিদায় নিলে আধা অরাজক ভারতবর্ষে মাত্র কিছুদিন চলবে তোমাদের দৌরাত্ম্য। তারপর কি হবে সে ভবিষ্যৎ আমি কল্পনাও করতে পারি নে।"

আপিস ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। বেয়ারা এসে বলল, "অর্থমন্ত্রী ফোন করছেন।" সরিৎসাগর সবার কাছে মাপ চেয়ে উঠতে উঠতে বললেন, "আমাকে ফোন করবার কোনও অর্থ নেই। তবু ওঁরা করেন। আমি একুণি আসছি।"

ক্রমশঃ

"আজও বাঁশী বাজে—"

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পথ ঘুরে গেল···জয়রামবাটী···সাত মাইল।
সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে কত যাত্রী আসে,
মুকুলধরা আমগাছ, আকাশছোঁয়া তাল তমালের সারি,
বেণু বনের আঁকবাঁকা পথ, আমোদরের স্বচ্ছ নীল জল,
একে একে সরে দাঁড়ায় শেষ হয় সাত মাইল।
সারদা দেবীর পূত পুণ্য জন্মভূমি ···
তাঁর পরশ রয়েছে এর মাটিতে—এর বাতাসে এর আকাশে।
মনের আকাশে অতীতের তারাগুলি ভিড় জমায়,
দেখি···পাঁচ বছরের মেয়ে গিয়েছে যাত্রা শুনতে,
ঐ পাশের গাঁয়ে···শিব সেজেছে—ঐ যে আত্মভোলা ছেলেটি···
মনে মনে···জনে জনে···বলেছে ঐ আমার বর।

সেদিনের স্বয়ম্বরা একদিন··· সত্যি বরের মালা পরিয়েছিল,
কামারপুকুরের ঐ যাত্রার দলের ছেলেটির গলায়।
দেখলাম যেন···গদাধর বর বেশে এসেছেন,
কত লোক এসেছে···যেখানে মাথা উঁচু করে উঠেছে মঠ।
হয়ত···বরযাত্রীরা পাতা পেতে বসেছে বর-ভোজনে।
কত কথা···কত আনন্দ···কত বিরহ মিলনের গাথা,
মূর্ত্ত হয়ে আছে এর শ্যাম স্নিগ্ধ সময়ের দেওয়ালে।

সেদিন একটি মেয়ে শঙ্খ বাজিয়েছিল,
সিংহবাহিনীর মন্দিরে সে বুঝি আজও দাঁড়িয়ে আছে
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে···সেই মেয়েটি আজও তার বাবাকে ডাকে···
মায়ের মন্দিরের আগল খুলে দাও।
দেবী সারদা···আর সিংহবাহিনী···
আমোদরের সানবাঁধা ঘাটে···আজও বুঝি কুলুকুলু ধ্বনি জাগে,
যখন মন্দিরে সন্ধ্যারতি হয়···
সন্ধ্যাতারা চেয়ে থাকে···জয়রামবাটীর আকাশে আকাশে।

জয়রামবাটীর মাটি মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়াই,
পথ বলে আর একটু এগিয়ে চলো ··
তিন মাইল পথ।
ভূতির খাল পেরিয়ে গিয়ে···শিবের মন্দির আর হালদার পুকুর,
গাঁয়ের নাম কামারপুকুর।
গদাধরের নিজের হাতে লাগানো আমগাছ···সেই পর্ণকুটির,
ঢেঁকিশালের মাটির তিলক পরে মঠ দাঁড়িয়েছে।
রামকৃষ্ণ···নির্বিকল্প সমাধিতে বসে আছেন,
জোট বেঁধে ফুলেরা পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রতিদিন,
পরম পরিণতির বিপুল বিশ্বাস।
হঠাৎ দেখতে পেলাম যেন,
আপন হাতে আমগাছের চারাটি লাগিয়েছে···
যাত্রাদলের ছেলে গদাই···।
কেমন কচি কচি পাতায়...বেড়ে উঠেছে গাছটি,
চোখ ফেরান যায় না···চেয়ে চেয়ে দেখে আর দেখে।
কাল বোশেখীর ঝড়ে কেঁপে কেঁপে···দুলে দুলে উঠেছে সে,
বুক দিয়ে · জড়িয়ে ধরে আছেন কিশোর ঠাকুর সারাক্ষণ,
পাছে ঝড়ে ও ভেঙ্গে যায়···ও ব্যথা পায়।
ঝড় উঠেছে ঈশান কোণে···কালো কালো পুঞ্জীভূত মেঘের দৌরাত্ম্য,
সমগ্র মানবতার অমৃত-পাদপ ঝড়ের তাণ্ডবে কম্পমান,
বুঝি ভেঙ্গে পড়ে···বুঝি লুটিয়ে পড়ে ধুলায়।
কামারপুকুরের আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছি,
দেখতে পেলাম যেন, কিশোর ঠাকুর আজও দাঁড়িয়ে আছেন,
আমগাছটি বুকে জাতীয় মুকুলের সমারোহে,
তাঁর মুখে অফুরন্ত হাসি···সেই হাসি।
জয়রামবাটী আর কামারপুকুর, ·
সারদাদেবী আর রামকৃষ্ণ ঠাকুর,
বৃন্দাবন আর মথুরা,
মাঝখানে তিন মাইল পথ,···কালের কালিন্দী
বাঁশী বাজে নিত্যকালের বিরহ যমুনার কূলে কূলে,
আজও বাঁশী বাজে।

বাংলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

দুর্গাপুর কংগ্রেস

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় খ্যাতনামা খাদি-কর্ম্মী, নিষ্ঠাবান সমাজ কল্যাণব্রতী এবং গান্ধীভক্ত। তাঁহাকে আর যাহাই বলা চলে—কখনও মিথ্যাচারী, অন্যায়-অস্পষ্টভাষী এবং স্বার্থপর বলা যায় না। খাদির উন্নতি এবং প্রচারকল্পে তিনি তাঁহার এবং পরিজনবর্গের সকল স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া বিগত প্রায় ৪০ বৎসর পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁহার বিচার-বুদ্ধিমত কাজ করিয়া যাইতেছেন। দুর্গাপুর কংগ্রেস অধিবেশন সম্পর্কে তাঁহার মতামত উপেক্ষা করা যায় না এবং এই মতামত কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী সকলেরই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, স্বয়ং মহাত্মাজীও সতীশবাবুর মতামত শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে, কখনও তাঁহার প্রতি কোন প্রকার উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই।

'রাষ্ট্রবাণী' পত্রিকায় সতীশবাবু বলিতেছন:

—কংগ্রেসের দুর্গাপুর অধিবেশন হইয়া গেল। প্রোগ্রাম মত সব ঠিক ঠিক নিষ্পন্ন হইয়াছে। উদ্যোক্তারা সন্তোষ অনুভব করিতে পারেন এমন সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান ব্যবস্থিত ও পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু দুর্গাপুর হইতে পাওয়া গেল কি? ৫৬ ঘণ্টা-কাল বিষয় নির্ব্বাচন কমিটির বৈঠক চলে। ৮ ঘণ্টায় দিন ধরিলে সাত দিনের সমকাল ধরিয়া বিচার-পরামর্শ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ দেশকে কি দিলেন? কিছুই না। তবে এত ঘটা করিয়া পরামর্শ করার সার্থকতা কি? পরামর্শ করার ঘটাটাই উহার সার্থকতা?—ভিতরে আর কিছু থাকার প্রয়োজন নাই?

তামাসা দেখাইয়া কংগ্রেসকে জনপ্রিয় করার দিন ইংরাজ আমলেই চলিয়া গিয়াছিল। এখন আড়ম্বর করাটা শুধু অনাবশ্যক নয়, অপরাধ। খোকাদের মত কেমন করিয়া সব বড় বড় নেতারা ক্ষুধার অপমানে ব্যর্থতায় জলন্ত রঙ্গভূমিতে বসিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক অধিবেশনকে আমোদ আপ্যায়নে পরিতোষের ক্ষেত্র করিয়া কয়টা দিন কাটাইয়া যাইতে পারেন, ভাবিলে আশ্চর্য বোধ হয়।

কংগ্রেস সম্পর্কে ত জনতার কোনও উৎসাহ ছিল না—প্রদর্শনী সম্পর্কে ছিল। কিন্তু প্রদর্শনী সাজাইতে কংগ্রেস নগর গঠন করার প্রয়োজন ছিল না।

জনসাধারণের আগ্রহহীনতা এত বেশী ছিল যে কংগ্রেসের একটা খোলা অধিবেশন বিষয় নির্বাচন কমিটির মণ্ডপেই হয়। তবুও উহা পথের জনতাকে আহ্বান দ্বারা জনপূর্ণ করিতে হয়।

ব্যর্থতার শেষ দুর্গাপুরেই নয়। সেখানে এতটুকু আভাষ পাওয়া গিয়াছে যে, কংগ্রেস আর সে শ্রদ্ধামণ্ডিত সংস্থা নহে যাহা দেশের প্রাণস্পর্শ করিয়া কল্যাণের দিকে লইয়া যাইতে পারে।

এই ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া আজ হয়ত দেখা দিবে না। যখন দেখা দিবে তখন হয়ত এমন আপদ লইয়া দেখা দিবে যে প্রতিকারের দিন অতীত হইয়া গিয়াছে।

যে যুবশক্তি দেশের প্রাণের স্পন্দনে সাড়া দিয়া থাকে সেই শক্তিকেও নানা মোহদ্বারা নিদ্রিত করিয়া রাখা হইয়াছে। মোহ বিতরণ করিতে খারাপ সিনেমাও একটা বড় মায়াময় জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। খেলাধূলা কাল্‌চারেল সমাবেশ নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক উৎসব দ্বারা যুব-মন আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে।

যখন জনগণ জাগ্রত হইবে তখন বিপ্লব দেখা দিবে। দেশে দেশে কালে কালে ইহাই হইয়া আসিয়াছে।

যুবশক্তি ও সত্যাগ্রহ

এই সত্যাগ্রহ কাহারা করিবেন? কাহারা সত্যাগ্রহের অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন, পরিচালনা করিবেন? নিশ্চয়ই দেশপ্রেমিক যুবগণ। তাঁহারাই সকল দেশে সর্ব্বকালে পরার্থপরতায় উদ্দীপিত হইয়া আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদান করিয়াআসিয়াছেন, এখানেও

তাহাই হইবে। যাঁহারা এদেশে গণতন্ত্র রক্ষা করিতে চান, সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চান, ধনাকে আরও ধনী এবং গরীবকে আরও গরীব হইতে দিতে চান না—ধন-বৈষম্য দ্রুত দূর করিতে চান, জীবন-ধারণের উপযোগী বেতনের ব্যবস্থা করিতে চান, নিত্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায্য মূল্যে প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিতে চান, বেকার সমস্যা দূর করিতে চান, তাঁহারাই দলে দলে এই সত্যাগ্রহে যোগ দিবেন। যত তাড়াতাড়ি এই সমস্যা-গুলির সমাধান হয়, তত তাড়াতাড়ি চীনা কমিউনিষ্টদের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইবে। ধনীদেরও এই আন্দোলনকে সর্ব্ব-প্রকারে সাহায্য করা উচিত, নতুবা ১৯১৭ সালে রুশে যাহা ঘটিয়াছিল, ১৯৪৯ সালে চীনে যাহা ঘটিয়াছে এখানেও রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে ধনিক সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করিয়া তাহাই ঘটিবে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলিকাতায় প্রেসের লোকের নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে কংগ্রেসের প্রস্তাবের ও কার্য্যক্রমের মধ্যে ভীষণ পার্থক্য রহিয়াছে। একথা বলায় দুর্গাপুরে কংগ্রেস নেতারা অনেকে খুব অসন্তুষ্ট হন কিন্তু কংগ্রেসের সাধারণ কর্ম্মীরা এই কথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন। তবুও সাহস ও দৃঢ়তার সহিত কাজে অগ্রসর হইতেছেন না—ইহাই পরম দুঃখের বিষয়।

দেশের দ্বারে সর্ব্বগ্রাসী মহাশক্তিশালী হিংসাশ্রয়ী চীন ভারতকে গ্রাস করিতে উদ্যত। জাগ্রত সত্যাগ্রহী জনশক্তিই এই শোচনীয় পতন রোধ করিতে পারে। যুবকগণ জাগো যুবতীগণ উদ্বুদ্ধ হও। সত্যাগ্রহ সংকল্প লও। সত্যাগ্রহে যোগদান কর।—

একই বিষয়ে 'পঞ্চায়েত' সাপ্তাহিক কি বলিতেছেন দেখুন:

—দুর্গাপুরে যে কংগ্রেস সম্মেলন হয়ে গেল তাতে যেটি সর্ব্বতোভাবে এবং সবচেয়ে বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে তা হ'ল কংগ্রেসের জনপ্রিয়তার হ্রাস—ভুবনেশ্বরের পর এবং বিশেষ ক'রে গত পাঁচ-ছ মাসের মধ্যে জনপ্রিয়তার সব আবরণই তার খুলে পড়েছে। এই সঙ্গে আর একটি যে মূল জিনিস অনুভূত হয়েছে বা হচ্ছে তা হ'ল কংগ্রেসের পাল্টা শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব, গণতন্ত্রের নিরাপত্তা ও দেশের সুষ্ঠু অগ্রগতির পক্ষে যা অপরিহার্য্য।

আমাদের রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষক দুর্গাপুরে সরেজমিনে হাজির থেকে জানাচ্ছেন: যে লক্ষ লক্ষ জনসমাবেশের আশায় বহু বহু লক্ষ টাকা সরকারী ও দলীয় সূত্রে খরচ ক'রে বিরাট্ রাজকীয় আয়োজন করা হয়েছিল সে আশা সম্পূর্ণই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। আরটিএ তথা ডিএম ও কংগ্রেসের চাপে চারি দিক থেকে যে-সব বাস দুর্গাপুর গিয়েছিল তারা যাত্রীর অভাবে অনেকেই আর যায় নি এবং যারাও বা গিয়েছিল তাদের দারুণ লোকসান হয়েছে। তারা অভিশাপ দিচ্ছে। ট্রেনেও আদৌ ভিড় ছিল না। দোকানগুলিতে বেচা-কেনা এতই কম ছিল যে, মোটা টাকার ভাড়া দিয়ে তারা মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। তবে, অবশ্য, চালাও পারমিটের মালের চোরাবাজারে লাভটা ভালই হয়েছে। কংগ্রেসের ভাঁড়ারে বা রান্না-শালাতেও লোকের অভাবে অপরিসীম অপচয় হয়েছে, যা দেখে এই দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যের দিনে দর্শকরা হতভম্ব হয়ে গেছে। রবিবারের জনসভায় আশা ছিল ৩।৪ লাখ লোক হবে, কিন্তু যা হয়েছিল তা ৩০,৩৫ হাজার হবে কি না সন্দেহ। আর প্রস্তাব ভাষণাদি? তা ইংরাজীতে যাকে বলে 'নূতন বোতলে পুরাতন মদ' —ছেঁদো কথার চর্ব্বিত চর্ব্বণ। তবে, মন্ত্রী ও নেতারাও ঘনায়মান বিপজ্জনক সঙ্কট এবং নিজেদের চরম ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতন, তা তাঁদের ভাষণের মধ্যে থেকেই সবিশেষ প্রকাশমান। তাঁরা আশার বাণী শোনাবার চেষ্টা করেছেন,—এবার ঠিক পথে জোর কদমে চলবেন ব'লে জানিয়েছেন জনে জনে। কিন্তু পথটাই বা কি এবং কদমটাই বা কি তালের, সে সম্বন্ধে সজ্ঞানে নীরব ছিলেন। তবে একটা কথা—এবার সমাজবাদের বা সোস্যালিজমের কপচানিটা অনেক কমেছে—অনেক, অনেক। মানুষের পেটের অন্নের সংস্থান করবার পথ না পেয়ে এবার পারমাণবিক অস্ত্র সম্বন্ধে ক্লীবোচিত তড়পানিটা বেশ জোরদার ছিল এবং "চোরের মা'র" মত মেননজীর তড়পানি বেশ উপভোগ্যই হয়েছিল। হুগলী-হাওড়া শিবিরে জোর একচোট মারদাঙ্গাতে মিয়ানো ভাবটা কেটেছিল। ভিড় ছিল সরকারী ছোট-বড় অসংখ্য কর্ম্মচারীর আর স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকার। প্রদর্শনীটা সরকারী বললেই ঠিক বলা হয়।—মনে হয় যেন সমগ্র অনুষ্ঠানটাই সরকারী। সরকারী অর্থও ব্যয় হয়েছে বহু লক্ষ।

কংগ্রেসের এখনও ভরসা যে শক্তিশালী বিরোধী দল গড়ে ওঠে নি। জনসাধারণের, আবার, তার জন্যই নিদারুণ আক্ষেপ। আকাশ থেকে তা গ'ড়ে ওঠে না, জনসমর্থনেই জনসহযোগেই যে তা গ'ড়ে ওঠে, এই মূল

কথাটাই যদি জনসাধারণ বুঝে ওঠেন তবে কংগ্রেসের সমাধি ও দেশের দুর্ব্বার অগ্রগতি সুনিশ্চিত। তা না হ'লে ঘনায়মান সঙ্কট দেশকে তছনছ করে দেবে, দেশ সংহতি ও জাতীয়তার শত্রুরা তার সুযোগ নেবে,—তার জন্য ওঁৎ পেতে আছে ভেতরে ও বাইরে।

দুর্গাপুরের কঠোর সঙ্কেত সফল হোক, দুর্ব্বার গণতান্ত্রিক বিরোধী দল গড়ে তুলতে জনগণ অগ্রসর হোন, সংগ্রামী জনশক্তি গড়ে উঠুক!—

উঠিবে কি?

এইবার দেখুন বর্দ্ধমানের 'দামোদর' সাপ্তাহিক কংগ্রেসের দুর্গাপুর সেসন বিষয়ে কি বলেন:

দুর্গাপুরে: দধি কর্দ্দম

—না, দুর্গাপুরে কংগ্রেসী সার্কাস বিশেষ জমজমাট হইল না। পাঁচ দিনব্যাপী অধিবেশনের চারিটি দিন নিতান্ত ফাঁকা ফাঁকা গিয়াছে, শেষ দিন শীতকালের রবিবার। কলিকাতা হইতে বিত্তবানদের সারি সারি মোটরকারের চড়ুইভাতি ভ্রমণকারীর সংখ্যায় এবং তাঁবেদার সংবাদপত্রগুলির কল্যাণে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া ভীড় দেখাইলেও জনসাধারণের ভক্তি ও আগ্রহের আসল রূপটি পরিস্ফুট হইয়া গিয়াছে। একেবারে নাককান কাটা তাঁবেদার কংগ্রেসী জয়ঢাক পত্রিকাগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও যে-সব পত্রিকা কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক অথচ সংযত তাঁহারাও এবারে কংগ্রেস অধিবেশনের মৃদু সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, এত ঘটা করিয়া দরিদ্র দেশে এত অর্থ ব্যয় করিয়া এইরূপ একটা বার্ষিক অধিবেশন করিবার কোন অর্থ হয় না। দামোদরের সংবাদ সংগ্রহকারী কয়েকদিনের অধিবেশনে কংগ্রেসের নানা শিবিরে পরিভ্রমণ করিয়া কংগ্রেস প্রতিনিধি ও কর্ম্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করেন নাই। জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া শিক্ষিত যুবকগণ দুর্গাপুরের কংগ্রেস অধিবেশন পরিদর্শন করিয়া অর্থের চরম অপচয়ে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে ধিক্কার দিয়াছেন। এবার নিতান্ত স্বল্প টাকায় দুর্গাপুর কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছে এবং যে কয়েক লক্ষ টাকা এজন্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা সাধারণ লোকই দিয়াছে, ধনী ও ব্যবসাদারদের নিকট হইতে লওয়া হয় নাই—এই সব জলজ্যান্ত মিথ্যা উক্তি কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ ঘোষণা করিলেও কেহ বিশ্বাস করে নাই। আমরা বর্দ্ধমানবাসী প্রত্যক্ষভাবেই জানি, যে বর্দ্ধমানের কুখ্যাত চাউল কল মালিকটি ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হইয়া কয়েকদিন কারাগারে গয়ার পিণ্ডি গিলিয়া মোটা জামিনে মুক্তি পাইলেন। পরিশেষে তিনি দুর্গাপুর কংগ্রেসে সরাসরি শ্রীঘোষের হাতে কয়েক সহস্র মুদ্রা নিক্ষেপ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত মিলিবে। শেষ পর্য্যন্ত অধিবেশন শেষে মোটা মুনাফার আংশিক নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে ৫০ হাজার টাকা দান করিবার সংবাদও সংবাদপত্রে দেখিতেছি। যাহা হউক শ্রীঘোষের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে জনসাধারণের বিচার্য্য এত পর্ব্বত-প্রমাণ ব্যয় ও বায়নাক্কার ফলে শেষ পর্য্যন্ত মুষিকই প্রসব করিল, যাহা স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১৮ বৎসরে জাতির সমস্ত শিরা-উপশিরাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতেছে। সমাজতন্ত্রের ভাঁওতা বুলি কপচাইয়া সমগ্র জাতিটাকে দিনের পর দিন অর্দ্ধাহারে রাখিয়া নির্ব্বীর্য্য করিয়াছে। আজ আবার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুধাতুর রেশনের রাজ্যে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে আসিয়া পশ্চিম-বাংলাকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উপহাসই করিয়া যাইলেন। কংগ্রেসী ধুলোটের দধিকর্দ্দমে নেতৃবৃন্দ দধি ভাগ এবং জনসাধারণ কর্দ্দম অংশ প্রাপ্ত হইলেন।—

'দৃষ্টি'র দৃষ্টিতে দুর্গাপুরে কংগ্রেস কিরূপ

—দুর্গাপুরে কংগ্রেসের ৬৯তম অধিবেশন নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে এখানে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইয়াছিল এবং তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নদীয়া জেলায় কল্যাণীতে কংগ্রেসের আর একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য নদীয়ার শুষ্ক মাঠ কল্যাণীতে রূপান্তরিত হইয়াছে, যদিও স্বাভাবিক দুর্য্যোগে অধিবেশন জমিয়া উঠে নাই। দুর্গাপুরে স্বাভাবিক কোন দুর্য্যোগ ছিল না; আড়ম্বর ছিল প্রচুর; শনি ও রবিবারে দর্শনার্থীর অভাব ছিল না, তথাপি অধিবেশন প্রাণবন্ত হয় নাই।

কল্যাণীতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীজওহরলাল নেহরু উপস্থিত ছিলেন। নব দুর্গাপুর ডাক্তার রায়ের সৃষ্টি এবং তাঁহার নাম বহন করিলেও মৃত্যু তাঁহাকে অপসারিত করিয়াছে; জ্যোতি ও প্রদর্শনীতে জওহর থাকিলেও শ্রীজওহরলাল নেহরু ছিলেন না। দুর্গাপুরের আদ্যান্তে ছিলেন শ্রীঅতুল্যচরণ ঘোষ, মধ্যে ছিলেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, অন্তে ছিলেন শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

কংগ্রেস অধিবেশনের আয়োজনের কার্য্যে প্রথমাবধি সরকারী যন্ত্র নিয়োজিত হইয়াছিল। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে সরকারী যন্ত্র দল-নিরপেক্ষ। কার্য্যতঃ কংগ্রেস

দল কংগ্রেসের সহিত সরকারকে একীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন। কংগ্রেসের দুর্গাপুর অধিবেশন ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাঁশ হইতে বিজ্ঞাপন ও বাস সংগ্রহ পর্য্যন্ত প্রতিটি কর্ম্মেই সরকারী লোক ও সরকারী প্রভাব নিয়োজিত হইয়াছিল।

বিভিন্ন রাজ্য হইতে প্রতিনিধি ও কংগ্রেস কর্ম্মীগণকে দুর্গাপুরে আনিবার জন্য ট্রেণের ব্যবস্থা হইয়াছিল অকৃপণভাবে; অনেক স্পেশ্যাল ট্রেণ প্রায় আরোহীশূন্য অবস্থায় দুর্গাপুরে উপনীত হয়; প্রথম কয়েকদিন আয়োজিত ভোজ্যদ্রব্যের বহু অংশের অপচয় হয়। ওয়ার্কিং কমিটির শূন্য পদ পূরণের জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বহুজনকেই বিশেষভাবে সংবাদ প্রেরণ করিয়া ভোট দিবার জন্য আনা হয়। অর্থাৎ দুর্গাপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানের জন্য কংগ্রেস কর্ম্মীগণের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল না।

ভুবনেশ্বরে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র লইয়া বিতর্ক ছিল। দুর্গাপুরে এ প্রশ্ন ছিল না, কথা ছিল রূপায়ণের প্রশ্ন লইয়া, কথা ছিল চীনের অ্যাটম বোমা উদ্ভূত পরিস্থিতি লইয়া; কথা ছিল খাদ্য, কর, দাম ও বেকার সমস্যা লইয়া; কথা ছিল দুর্নীতি লইয়া। কোন কথাই জমে নাই।

মহাত্মা গান্ধীর জীবিতাবস্থায় মহাত্মার কথাই কার্য্যতঃ কংগ্রেসের কথা ছিল। তাঁর পরবর্ত্তীকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর কথাই কংগ্রেসের কথা হয়। এখন নেহরু পরলোকগত; তাঁহার ব্যক্তিত্বের অধিকারী কোন পুরুষই কংগ্রেস নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত নহেন। কথা হইয়াছে কংগ্রেসে সকলে মিলিয়া-মিশিয়া চলিবেন—যৌথ নেতৃত্বে। কথা উঠিয়াছে কংগ্রেস দল এতকাল শ্রীনেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকারের অনুগমন করিয়া আসিয়াছেন; অতঃপর কংগ্রেস দল কংগ্রেস সরকারকে পরিচালিত করিবেন। প্রতিবারের ন্যায় এবারেরও কথা হইয়াছে আড়ম্বর বাদ দিয়া সাদাসিদে কাজের কংগ্রেস করিতে হইবে।

শ্রীনেহরুর সম্মতিসহ নাসিকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কংগ্রেস গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হইয়াছিল; অতুল্য-বাবুদের ভীষণ চাপে ফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া যায়।

কংগ্রেসের সোসিয়ালিষ্ট ফোরাম নিঃসন্দেহে শ্রীনেহরুর আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হয় নাই; অতুল্য-বাবুদের চাপে গণতান্ত্রিক সোসিয়ালিজম উপচাইয়া পড়িতেছে। তলদেশে ফোরাম টিঁকিবে কি না সন্দেহ।

দুর্গাপুরে ফোরামের সভা অনুষ্ঠানের জন্য অনুমতিও ফোরাম নেতৃত্ব দুর্গাপুরের উদ্যোক্তাগণের নিকট হইতে পান নাই।

তদুপরি রাঁচীর ছোট্ট কংগ্রেস, শ্রীদরবার সিংহের সহিত শ্রীকেশবদেও মালব্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কংগ্রেস নেতৃত্বের দীর্ঘদিনের আড়ম্বরপ্রিয়তার অভ্যাস এবং কর্ত্তা-ভজা বৃত্তি কংগ্রেসকে নূতন সংকল্পে বলীয়ান হইয়া নূতন পথে যাইতে দিবে বলিয়া মনে হয় না।

দলীয় শাখা কাশ্মীরে বিস্তারিত করিয়া দুর্গাপুরে কংগ্রেস একটি ভাল কাজ করিয়াছেন।—

দুর্গাপুর কংগ্রেস সম্পর্কে এই প্রকার আরও বহু মতামত প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু স্থানাভাব বলিয়া সব দেওয়া গেল না। কিছুকাল পূর্ব্বে প্রখ্যাত 'The Statesman' পত্রিকায় বিগত দুর্গাপুর কংগ্রেস অধি-বেশন সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, ঐ রিপোর্ট বঙ্গ-প্রধান শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়ের ভাল লাগে নাই—না লাগিবারই কথা, কারণ রিপোর্টে কংগ্রেসের আলোচ্য অধিবেশনের আর্থিক দিকটি লইয়া স্পষ্ট বিরুদ্ধ নানা মন্তব্য করা হয়—অতুল্যবাবু ঐ রিপোর্টের প্রতিবাদ করেন, তাহাও উক্ত পত্রিকায় পুরাপুরি প্রকাশ করা হয়—কিন্তু প্রবল-প্রতাপ আগামী কংগ্রেসপতি শ্রীঘোষ মহাশয়, পরে প্রকাশিত ষ্টেটস্-ম্যানের তিক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যের কোন জবাব এখন দিলেন না কেন (দিয়া থাকিলে তাহা আমাদের চোখে পড়ে নাই)? সে যাহাই হউক, কংগ্রেস অধিবেশন সম্পর্কে আমরা এবার যে-সকল মন্তব্যাদি প্রকাশ করিলাম তাহা 'The Statesman'-এর মন্তব্য অপেক্ষা বহুগুণে উগ্র, স্পষ্ট এবং দ্বিধাহীন। আশা করি শ্রীঘোষ এইগুলির যথাযথ জবাব দিয়া কংগ্রেসভক্ত, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বিষম-তাপিত চিত্তে কিছু শান্তিবারি সিঞ্চন করিবেন। প্রখর-প্রতাপ বঙ্গপ্রধানের প্রতিবাদ-মন্তব্যাদি আমরাও প্রকাশ করিতে সকল সময় প্রস্তুত থাকিব।

আর একটি কথা: অতুল্যবাবু ঘোষণা করেন যে, দুর্গাপুর নব-নির্ম্মিত রেল ষ্টেশনটি কংগ্রেসের জন্য নির্ম্মিত হয় নাই—হইয়াছে সাধারণের ব্যবহারের জন্য এবং উহা বরাবর থাকিবে। অতুল্যবাবু দয়া করিয়া একটু খোঁজ লইয়া জানাইবেন কি—বর্ত্তমানে 'ডাঃ বি. সি. রায় রেল ষ্টেশনটি' এখন কোথায় অবস্থিত এবং কোন্ বিশেষ "সর্ব্বসাধারণের" জন্য ব্যবহৃত হইতেছে?

পূর্ব্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালী হিন্দু আর কতদিন ?

সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানে এখনও যে-সমস্ত বাঙ্গালী হিন্দু কোন-ক্রমে সকল অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করিয়া টিঁকিয়া আছেন—আয়ুব খাঁ'র নির্ব্বাচনের পর তাঁহাদের মনোবল নিভিয়া গিয়াছে—পূর্ব্ব পাকিস্তানের উপর তাঁহাদের আর কোন বিশ্বাস নাই। এ বন্দী জীবন তাঁহাদের পক্ষে আর বেশী দিন সহ্য করা অসম্ভব। 'বারাসাতে' প্রকাশিত রিপোর্টে সবই স্পষ্ট প্রতিফলিত :

—পূর্ব্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বসবাস সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। নেহরু-লিয়াকত চুক্তির আর কোন দাম নাই। অথচ পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের ভারত প্রবেশের পথ মাইগ্রেশন প্রথার পর্ব্বতে আটক পড়িয়া আছে। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট ব্যতীত পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের ভারতে আসা বাস্তব ক্ষেত্রে এক দুঃখজনক কাহিনী। কেননা ভারত সরকার মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গাগত আশ্রয়-প্রার্থীদের উদ্বাস্তু হিসাবে স্বীকার এবং গ্রহণ করিতেছেন না। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু পরিবারের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বে ভারতে আসিয়াছেন এবং কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন একমাত্র ঐ সকল পরিবারের লোকজন মাইগ্রেশন সার্টিফকেট না লইয়া ভারতে আসিতেছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ পাকিস্তানের পাশপোর্ট ভারতে ফেরত দিতে-ছেন এবং অধিকাংশই পাশপোর্ট ছাড়া সীমান্ত ডিঙ্গাইয়া ভারতে আসিতেছেন। ইঁহারা সরকারের সাহায্য সহানুভূতির প্রত্যাশা তেমন করেন না। আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেছেন। এরূপ ভারত প্রবেশকারী হিন্দুদের সংখ্যা খুব কম নহে। অথচ লক্ষ লক্ষ পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দু পরিবার ভারতে নিরাপদ আশ্রয় লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তান এক বিভীষিকার রাজত্বে পরিণত হইয়াছে। অত্যাচার উৎপীড়নের সীমা নাই শেষ নাই। হিন্দুদের সামান্য বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় ও হস্তান্তরের কোনরূপ অধিকার নাই। দুর্দ্দিন দুরবস্থায় সামান্য বিষয় বিক্রয় বা হস্তান্তর করি-বারও উপায় নাই। পূর্ব্ব পাকিস্তানের শেষ আশা ছিল আয়ুব খাঁনের পরিবর্ত্তে মিস্ ফতেমা জিন্না পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হইলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের প্রতি কিছুটা সুবিচার করা হইবে। সেই ক্ষীণ আশার আলো নিভিয়া গিয়াছে। এখন এক দুঃসহ জীবনের সম্মুখে পাকিস্তানের হিন্দুরা উপস্থিত হইয়াছে। যখন-তখন হিন্দুদের উপর গুণ্ডাদের হামলা, অত্যাচার আরম্ভ হইতেপারে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের প্রধান ভীতির কারণ হইতেছে চীন-পাক মিতালি। পাকিস্তানের উপর হইতে গোপনে সার্কুলার দ্বারা সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কোন হিন্দু পরিবারের পাকিস্তান ত্যাগের বাধা প্রতিবেশী মুসলমান-গণ দিতে পারিবে না। এবং আরও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা পাকিস্তানের দুশমন এবং পাকভূমি হইতে তাহাদের বিতাড়িত করিবার চেষ্টা প্রত্যেক পাকিস্তানী মুসলিমদের করিতে হইবে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের অবাঙালী মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন, অত্যাচার করিতে লালায়িত, কেবলমাত্র বাঙ্গালী মুসলমানদের বাধায় তাহাদের লালসা চরিতার্থ হইতে পারিতেছে না। খুলনা, ফরিদপুর, যশোহর কয়েকটি জেলায় বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে তীব্র রেষারেষি চলিতেছে এবং কয়েক স্থানে ইতিমধ্যে তাহাদের মধ্যে মারপিট,দাঙ্গা হইয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে হিন্দু উচ্ছেদের পূর্ব্ব পরিকল্পনা ধীরে ধীরে ফলপ্রসূ হইতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের মধ্যে যেরূপ আতঙ্ক ভীতি সৃষ্টি হইয়াছে ১৯৬৫ সালের মধ্যে পুনরায় লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ভারতে উপস্থিত হইতে পারে। প্রত্যেকের মুখে এক কথা, "আর থাকা যাবে না।" মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের প্রত্যাশায় হাজার হাজার পরিবার পাকিস্তানে অপেক্ষা করিতেছে।—

এদিকের বহু সংবাদে জানা যায় যে, দণ্ডকারণ্যেও নানাপ্রকার প্রশাসনিক এবং অন্যান্য কারণে হাজার হাজার বাঙ্গালী উদ্বাস্তু দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু হইবার মুখে। যাহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এ-পারে আসিতে বাধ্য হয়, মহাবীর ত্যাগীর সুষ্ঠু শাসনে তাহারা কি আবার ও-পারে যাইবে—ধর্ম্মবদল করিয়া ?

ত্রিপুরার অভিযোগ—সীমান্ত যোগাযোগ

ত্রিপুরার 'সমাচার' সমাচার দিতেছেন :

—কেন্দ্রীয় যোগাযোগ দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীবিজয় ভগবতী সম্প্রতি রাজ্যের বিলোনিয়া মহকুমার প্রত্যন্ত সীমান্ত অঞ্চলে একটি নূতন ডাক ও তার অফিসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রদত্ত এক বক্তৃতায় রাজ্যের সীমান্তের অগ্রবর্ত্তী অঞ্চলসমূহের সহিত অভ্যন্তরের সকল প্রকার যোগাযোগ উন্নয়নের বিষয়টির প্রতি গভীরভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, এই যোগাযোগ স্থাপনের কাজ যত দ্রুত সম্পাদিত হয় ততই নিরাপদ। স্বাধীনতার পর সমগ্র দেশেই যোগাযোগ উন্নয়নের যে

ব্যাপক উদ্যম নিয়োজিত হয় তাহাতে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা যে পরিমাণ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহার তুলনায় সীমান্ত যোগাযোগের বিষয়টি এতকাল মোটেই গুরুত্ব লাভ করে নাই। ভারতের সীমান্তে চীনা আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্ন মারাত্মক জটিলতায় প্রকট হইয়া উঠিলেও সেই উদ্যোগ সম্পন্ন করার অবকাশ তখন আর অবশিষ্ট ছিল না।

উত্তর সীমান্তের এই ভয়াবহ শিক্ষাকে বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে যে আত্মহননেরই সমান হইবে এই কথার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। ত্রিপুরার ৭২০ মাইল বিস্তৃত প্রায় অরক্ষিত সীমান্ত অঞ্চলে দিনে-রাত্রিতে যে লুণ্ঠন, গৃহদাহ চুরি, জোচ্চুরির অবাধ অরাজকতা চলিতেছে সমস্যার জটিল মানচিত্রের সহিত যোগাযোগের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিকে এখন এক করিয়া বিচার করা উচিত। দুরধিগম্য, পর্ব্বত অরণ্যসঙ্কুল যে ক্ষীণ যোগাযোগ রাস্তাসমূহ অধিকাংশ অগ্রবর্ত্তী সীমান্ত অঞ্চলের সহিত অভ্যন্তরের যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে উহা দ্বারা সীমান্ত নিরাপত্তার আপৎকালীন সাহায্য ত দূরের কথা, সীমান্তবাসীর জন্য প্রতিদিনের চাল, ডাল, তেল, নুন নিয়মিত পৌঁছাইতে পারে না। ত্রিপুরার বিস্তৃত সীমান্তে একদিকে অব্যাহত পাকিস্তানী হানাদারী, অন্যদিকে অন্নাভাব, দ্রব্যমূল্যের অবাধ উর্দ্ধগতি এবং পরিস্থিতির অবনতির সুযোগে ব্যাপক চোরাকারবারীর মুখে ত্রিপুরার সীমান্ত-জীবন আজ বিপন্ন।

ত্রিপুরার সীমান্ত যোগাযোগের প্রশ্নটিকে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টই বা এত ছোট করিয়া দেখিতেছেন কেন? ত্রিপুরার জনপ্রিয় মন্ত্রীমণ্ডলী এত প্ল্যান করিতেছেন, এত জায়গায় ফিতা কাটিয়া বেড়াইতেছেন কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে তাঁহাদেরই অনিচ্ছা থাকিবে কেন? আসন্ন পরিকল্পনায় রাজ্যের যোগাযোগ উন্নয়নের জন্য সর্ব্বাধিক ব্যয়বরাদ্দ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। রাজ্যের সীমান্ত যোগাযোগ উন্নয়নের সামগ্রিক পরিকল্পনা এই বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তাব করিতেছি।—

'সমাচারের' মতে যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়—কর্ত্তাদের মতে সে রকম না হইতেও পারে। বর্ত্তমানে দেশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—ভারতে হিন্দীর সর্ব্বাত্মক প্রচলন এবং ইণ্ডিয়াকে 'হিন্দুস্থ' করিয়া দেশের সংহতির প্রতিষ্ঠা করা পাকা ভিত্তিতে!

সর্ব্বভারতে হিন্দীর মাধ্যমে সরকারী-বেসরকারী যোগাযোগ একবার স্থাপিত হইলেই 'সীমান্ত-যোগাযোগ সমস্যার সকল সমাধান এক মিনিটেই হইয়া যাইবে! এ-বিষয়ে ত্রিপুরার মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলকে দোষ দেওয়া বৃথা—কারণ, কেন্দ্রের মুখ চাহিয়া তাঁহাদের থাকিতে হইবেই! ইংরেজ আমলেও প্রদেশগুলির যে সকল বিষয়ে বহু স্বাধীনতা ছিল, কংগ্রেসী-শাসনে আজ রাজ্যগুলি সেই সব স্বাধীনতা একটির পর একটি নিজেদের দোষে কিংবা অযোগ্যতার কারণে কেন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিতে লজ্জাবোধ করিতেছেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ—কিছুকাল পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কলিকাতায় আসিয়া—দাঙ্গা দমনে—কি ভাবে কলিকাতা পুলিশের কার্য্যাদি পরিচালন ব্যবস্থা করেন তাহা উল্লেখ করা যায়। আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু বৃথা তালিকা বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন আছে কি?

ত্রিপুরায়—পূর্ব্ব পাকিস্তান আগত উদ্বাস্তু—না ঘাটকা না ঘরকা

—পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে ত্রিপুরায় আগত শরণার্থীদের পুনর্ব্বাসনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার অতঃপর আর বহন করিতে পারিবেন না—এই কথা ইদানীং সরাসরিভাবে ত্রিপুরাকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সংবাদটি নিঃসন্দেহে উদ্বেগের। নির্দ্দেশে বলা হইয়াছে: ত্রিপুরায় আগত শরণার্থী উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা অতঃপর ত্রিপুরার অভ্যন্তরেই সম্পন্ন করিতে হইবে।

ত্রিপুরায় যে শরণার্থী পুনর্ব্বাসন-এর শেষ সুযোগটুকুও ফুরাইয়াছে—এই আলোচিত সত্য ও তথ্য সম্পর্কে বহুবার ইতিপূর্ব্বে কেন্দ্রের চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছে এবং হইতেছে। সরকারী তথ্যে দেখা যায়, এখনও প্রতিদিন ৩০।৩৫টি শরণার্থী পরিবার নিয়মিত ত্রিপুরায় প্রবেশ করিতেছে। ৪ লক্ষ নাগরিক অধ্যুষিত ত্রিপুরার লোকসংখ্যা হালে প্রায় ১৪ লক্ষের উপরে। বিগত এক বৎসরে বিপুল হারে শরণার্থী প্রবেশের ফলে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। ত্রিপুরায় এমন বহুসংখ্যক উদ্বাস্তু গড়াগড়ি খাইতেছে যাহাদের এখনও কোন পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা যায় নাই। রাজ্যের বিভিন্ন সাময়িক শিবিরগুলিতে অবস্থানরত উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা এখনও চার হাজার। এই রাজ্যে কৃষিতে আর অধিক সম্প্রসারণের

সুযোগ নাই। যোগাযোগহীন এই সীমান্ত রাজ্যে পরিকল্পিত শিল্পোন্নয়নের পক্ক আম্রফল কবে আমাদের শীর্ণ রসনায় ছিঁড়িয়া পড়িবে সে-কথা ভবিতব্যই বলিতে পারেন।

সহস্র সমস্যাকণ্টকিত ও আর্থিক দিক হইতে চূড়ান্ত-ভাবে বিপন্ন এই রাজ্যের উপর পুনর্ব্বাসনের দুর্ব্বহভার চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টাকে আমরা কেন্দ্রের অত্যন্ত দায়িত্বহীন সিদ্ধান্ত বলিয়াই বিশ্লেষণ করিতেছি।

ইতিপূর্ব্বেও একই প্রশ্ন তুলিয়া সমস্যাকে দুই-একবার জটিলতর করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব এবং সমস্যার ব্যাপকতা সম্পর্কে আমরা মোটেই অনবহিত নই। কিন্তু মৃত অশ্বের পিঠে চাবুক চালাইয়া ফল কি হইবে? ত্রিপুরার পক্ষে পুনর্ব্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ একেবারেই অসম্ভব এবং অন্যান্য রাজ্যের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় সরকারকেই যখন তাহা নিষ্পন্ন করিতে হইবে—তখন এই নিরর্থক সিদ্ধান্তের দ্বারা সমস্যাকে বিড়ম্বিত করিয়া লাভ কি?—

('সমাচার')

এ-বিষয় পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা 'একই প্রকার ফুটা-নৌকায়'! কেন্দ্রীয় সরকারের নব-কর্তারা ক্রমশ উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে তাঁহাদের মনোগত প্রকৃত ইচ্ছা প্রকাশ এবং তাহার প্রয়োগ ধীরে ধীরে করিতেছেন। দেশ বিভাগের সময় বড় গলা করিয়া যাঁহারা পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দু উদ্বাস্তুদের সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব লইবার ব্রত লয়েন, তাঁহাদের অনেকেই আজ হিসাব-নিকাশের দায় এড়াইয়া অন্য-লোকে প্রস্থান করিয়াছেন। বাকী যাঁহারা আছেন তাঁহাদের একদল মেকি, একদল খোঁক এবং আর এক দল অকর্ম্মার ঢেঁকি। কথায় কথায় ইঁহারা কেন্দ্রের অর্থাভাবের কথা তোলেন —মনে হয় অর্থটা যেন কেন্দ্রের কোন পৈতৃক জমিদারী হইতেই আসে। অথচ অযথা অকাজে ইঁহাদের কোটি কোটি টাকা নষ্ট করিতে আটকায় না কেন? পাঁচ-সালা পরিকল্পনায় অযথা কত হাজার কোটি টাকায় কাহার পিতার শ্রাদ্ধ হইয়াছে, তাহার কোন হিসাব আছে কি? এই কর্তাদের যদি কোন প্রকারে একবার বছর কয়েকের জন্য উদ্বাস্তু করা যায়, একমাত্র তাহা হইলেই এই সিংহ চর্ম্মাবৃতের দল বাঙ্গালী উদ্বাস্তুর দুঃখ-বেদনা হয়ত খানিকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কিন্তু আমাদের এ-আশা পূর্ণ হইবে কি?

প্রজাতন্ত্র প্রহসন?

'দামোদর'-এর মতে:

—১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট দেশ পরশাসন বিমুক্ত হইলেও ভারতের গণপরিষদ কর্তৃক রচিত সর্ব্ববাদী-সম্মত সংবিধানকে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী হইতে আমরা অনুসরণ করিতেছি এবং ঐ দিনই প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এবারের ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতান্ত্রিক ভারত ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল। ভারতের পবিত্র সংবিধানকে মনে-প্রাণে স্বীকার করিয়া লইবার পর হইতে গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকার তাহার কতটা কার্য্যকরী করিয়াছে প্রজাতন্ত্রের ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়া তাহার হিসাব-নিকাশ খতাইয়া দেখা স্বাভাবিক। স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণের সেই পবিত্র দিন ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সত্যকারের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্মদিবস এই সাধারণতন্ত্র দিবস সাধারণতন্ত্রী ভারতের জনগণের বিচার্য্য ও আলোচনার এবং সরকারের নিকট ইহা কৈফিয়ৎ চাহিবার দিন। চাণক্যের সংহিতামতে 'প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে—' ভারত আর নাবালক নহে। গত ১৯৬৩ সালের এই প্রজাতন্ত্র দিবসে এক বিশেষ সঙ্কল্পবাণীতে ভারতের পবিত্র ভূমি হইতে আক্রমণকারী শত্রু অপসারণের যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আজিও ভারতের উত্তর সীমান্তে কয়েক হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড চীনা কম্যুনিষ্টদের কবলিত হইয়া রহিয়াছে, পশ্চিম সীমান্তে কাশ্মীরের অর্দ্ধাংশ এখনও পাকিস্তান কবলিত। অথচ এই ভারতরক্ষার নামে দেশপ্রাণতার নিকট আবেদন জানাইয়া জনসাধারণের নিকট হইতে অজস্র অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার সংগ্রহ করা হইয়াছে। গোটা কয়েক ইমারত ও রাস্তা নির্ম্মাণ হইলেই সমস্ত হইল না। ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়া দেখিতেছি খাদ্য সঙ্কট চরমে উঠিয়াছে। দুই বৎসরের মধ্যে ভারতকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করিবার যে প্রতিজ্ঞা পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী করিয়াছিলেন তাহার সমাধান আজও হওয়া দূরে থাকুক খাদ্য সঙ্কট পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বেকারে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। শাসনযন্ত্রের সর্ব্বস্তরেই দুর্নীতির রাজত্ব চলিতেছে। গণতন্ত্রের মুখোস পরিয়া ধনতন্ত্রবাদী শোষকগোষ্ঠীর তাণ্ডব চলিতেছে। গণমানস আজ নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। জাতির জনকের স্বপ্নের গ্রামরাজ আজ কৃষক নিধন রাজে পরিণত হইয়াছে। উহাদের কবল

হইতে প্রজা সাধারণকে মুক্ত করাই আজ সাধারণতন্ত্র দিবসের সঙ্কল্প হোক। প্রজাতন্ত্র আজ প্রহসনে পরিণত হইয়াছে।—

নিজেদের যখন 'প্রজা' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি—তখন আজকের 'রাজা' কিংবা 'রাজাদের' খামখেয়ালী স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

প্রতি বৎসর তথাকথিত 'প্রজাতন্ত্র' দিবস (২৬শে জানুয়ারী) গরীব প্রজাদের লক্ষ লক্ষ টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া পরম সমারোহ এবং ঢক্কানিনাদ সহযোগে প্রতিপালিত হয়। এই প্রজা-অর্থ-শ্রাদ্ধকারী উৎসবে ঘটা করিয়া কর্তাদের খানাপিনার সমারোহ সবিশেষ দেখা যায়। এ-বৎসরও ইহাই হইয়াছে—দেশের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা দেশের শতকরা অন্তত ৭০।৮০ জন লোক যখন দিনান্তে এক বেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না! দেশের লোক মরুক, শ্মশানে মৃত দেহের কিউ লাগিয়া যাক—কর্তাদের আনন্দ বিলাস, বিশেষ ভ্রমণ এবং বিনামূল্যে বাণী বিতরণ ক্রমশ বৃদ্ধি-মুখেই চলিবে। প্রতিবাদ করিবার সক্রিয় উপায় নাই। মানুষ, এখন এদেশের এই নিরাশা, এবং দুঃখ-দুর্দ্দশাকে নিত্য সঙ্গী বলিয়া মানিয়া লইয়াছি।

ভেজাল আজ কেবল খাদ্যদ্রব্য এবং ঔষধেই নহে, ভেজাল নেতৃত্ব, ভেজাল শাসক এবং ভেজাল নীতি-বাক্যে দেশে অভিভূত! এই ভেজালরাজ বা ভেজালতন্ত্র হইতে বাঁচিতে হইলে এখন কয়েকটি মাত্র অভেজাল খাঁটি মানুষের প্রয়োজন একান্ত।

'ত্রিপুরা'র চোখে ২৮শে জানুয়ারী

—২৬শে জানুয়ারী। ভারতের জাতীয় তথা প্রজাতন্ত্র দিবস। স্বাধীনতার পূর্ব্বেও এই ২৬শে জানুয়ারী আমাদের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিবস ছিল। সেদিন প্রতি বছর এই দিনটিতে আমরা পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য সংকল্প গ্রহণ করিতাম; স্বাধীনতা সংগ্রামের শপথ লইতাম। পরাধীন ভারতে যে দিবসটি পালিত হইত সংকল্প দিবসরূপে, সেই ২৬শে জানুয়ারীই স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫০ সাল হইতে প্রজাতন্ত্র দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হইতেছে। সংগ্রাম-সাধনায় যে দিনটি ছিল ঐক্য-সংহতির আধার এবং শক্তি, সাহস, প্রেরণার উৎস, সংগ্রামশেষে রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্য সেই দিনটিতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ১৯৫০ সালে। ২৬শে জানুয়ারীর সঙ্কল্পকে স্বীকৃতি ও মর্য্যাদা দেওয়ার উদ্দেশ্যই যে এই দিবসে ভারত রাষ্ট্র-কর্ণধারগণ সাধারণতন্ত্র তথা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা সেই দিন (প্রতিষ্ঠা দিবসে) ব্যাখ্যা করিয়া বোঝাইবার অপেক্ষা রাখে নাই। কিন্তু আজ, পর পর চৌদ্দটি ২৬শে জানুয়ারী অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পর পঞ্চদশ প্রজাতন্ত্র দিবসে সর্ব্বত্র সর্ব্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে সেই ২৬শে জানুয়ারী যেন অতীতের অতি ম্লান ইতিহাসের মত মিলাইয়া যাইতেছে, সেদিন নিঃস্ব, রিক্ত, পরপদানত ভারতবাসীর মধ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষায় যে বক্ষস্ফীতি, সংকল্পে যে দৃঢ়তা, প্রত্যয়ে যে পূর্ণতা, বিশ্বাসে অটলতা এবং কর্ম্মে যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা—সর্ব্বোপরি দেশ উদ্ধারে সর্ব্বস্ব ত্যাগ, এমনকি আত্মাহুতি দানে যে উৎসাহ, আগ্রহ ও উদ্যম লক্ষিত হইয়াছিল, আজ তার অণু-পরমাণুও খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। ভারত স্বাধীন হইয়াছে। সতেরো-আঠারো বছর হয় তাহার পর-পদানত জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করিয়া চৌদ্দ বছর পূর্ব্বে প্রত্যেক ভারতবাসীকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকার দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা রচনা করিয়া ভারত নিঃস্ব-মুক্ত ও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে বলিয়া দফায় দফায় সরকারী পর্য্যায়ে জাতীয় আয়ও মাথাপিছু আয়ের ক্রমোন্নতি ঘোষণা করা হইতেছে; অঢেল প্রচার চলিতেছে মিল মেসিনারী কারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার। শিল্প-সমৃদ্ধির বিপুল ভারে দেশ কেবল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। দেশের ভার সম্পূর্ণ উল্টাভাবে যাইয়া চাপিতেছে দেশবাসীর ঘাড়ে। তাহাতে দেশবাসী যেন আজ আর মাথা তুলিতে পারিতেছে না। ক্ষুধা, রোগ ও দারিদ্র্যের যুগপৎ আক্রমণে ভারতবাসী আজ এমন এক স্তরে আসিয়া ঠেকিয়াছে, যাহাকে অন্তিম দশা বলিলেও কম বলা হয়। অন্তিমকালে ২৬শে জানুয়ারীর কথা ত ছাই, বাপের নামও যে ভুলিবার কথা। দেশবাসীর দুরবস্থার কথা কেবলমাত্র বিরোধী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেই প্রকাশ পাইতেছে না. শাসকগোষ্ঠীর ভাষণেও সবিশেষ প্রকটিত। শ্রীজগজীবনরাম যিনি এই সেই দিন পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার গুরুত্ব ও দায়িত্ব-শীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, দুর্গাপুরে তিনিই বলিয়াছেন, জাতীয় আয়ের শতকরা ৯০ ভাগ মাত্র দশটি পরিবারে ভোগ করিতেছে। তারও কিছুদিন আগে প্রাক্তন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট বলিয়াছেন, একদা যে-সকল কং স-

কর্মী নিঃস্ব ছিল আজ তাহারা ধনকুবের হইয়াছে। দৃশ্যতঃ তাহাদের ধনাগমের কোন পন্থা নাই। প্ল্যানিং কমিশন আত্মসমালোচনায় বলিতেছেন—এতকাল খাদ্য উৎপাদন তথা কৃষির উপর যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া মারাত্মক ভুল হইয়াছে ; চতুর্থ পরিকল্পনায় এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করা হইবে। শিল্পায়নে ভারী শিল্প, হাল্কা শিল্প ও মৌলিক বা বুনিয়াদি শিল্প প্রভৃতি উদ্যমেও যথেষ্ট গলতি আবিষ্কৃত হইতেছে। এক কথায় বলা যাইতে পারে প্রজাতন্ত্রে প্রদত্ত সমানাধিকার ভোগ আজও ভারতবাসীর নিকট অতীতের (পরাধীন ভারতের) ২৬শে জানুয়ারীর সঙ্কল্প বাক্যের মতই অভিষ্টবাক্য মাত্র। তবে অতীত আর বর্ত্তমানের মধ্যে বিশেষ একটু তারতম্য আছে। তখন ছিলাম পরাধীন, আজ আছি স্বাধীন। প্রজাতন্ত্র আমাদিগকে চিন্তায়, বাক্যে ও প্রতীতিতে স্বাধীনতা দিয়াছে। যাহার অর্থ, আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। তাহাও পাওয়ার মত পাওয়া নহে ; অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যেখানে সম্পূর্ণ অবিন্যস্ত তথা বিপর্যস্ত সেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুখদা হইতে পারে না, বেশীর ভাগের পক্ষেই বিড়ম্বনাদায়ক হইয়াছে। স্বাধীন জাতির প্রধান ও প্রথম চাহিদাই হইল ক্ষুন্নিবৃত্তি ও রোগমুক্তি। এই দুই ব্যাপারে আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণকে প্রায়ই আক্ষেপ করিয়া বলিতে হয় ইহা করা দরকার, উহা করা হইবে বা করিতে হইবে। তাঁহারা দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষ পরিকল্পনা চালাইয়া খুব অল্প ব্যাপারেই বলিতে সক্ষম হইয়াছেন "আমরা ইহা করিয়াছি, আমরা উহা করিলাম।" নিতান্ত অসহায়ের মতই তাঁহারা বর্ত্তমানকে এড়াইয়া ভবিষ্যতের আশ্বাস ছাড়িতেছেন—যাহা শুনিতে শুনিতে আমাদের অন্তর আশার পথ হইতে নৈরাশ্যের দিকে ধাবিত হইতেছে। ইহার কারণ পরিকল্পনার ব্যর্থতা। পরিকল্পনা সামগ্রিক ভাবে ব্যর্থ হয় নাই ঠিকই, কিন্তু উদ্দেশ্য বহুলাংশে ব্যর্থ হইয়াছে। দেশের সাধারণ মানুষ পর পর তিনটি পরিকল্পনার পরেও তাহাদের সামান্যতম দাবি (ভরপেট খাদ্য) হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। অর্থাৎ আমাদের পরিকল্পনাসমূহ প্রজাতন্ত্রকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে নাই। ইহাকে নেতাজীর কথায় ব্যাখ্যা করা যায় যে, প্রজাতান্ত্রিক অনুশাসনে (গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায়) সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন বাস্তবে অসম্ভব। অর্থাৎ আমাদের প্রজাতন্ত্র ও পরিকল্পনা দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর সহ-অবস্থান নীতিতে এক-সঙ্গে চলা সত্ত্বেও দেখা যাইতেছে একে অন্যের পরিপূরক বা সহায়করূপে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয় নাই ; বরং বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে একে অন্যের পূরক বা সহায়ক না হইয়া অসহযোগীই হইয়াছে। অতএব আজ আমাদের ভাবের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আজ এই ঐতিহাসিক পুণ্য দিনে প্রজাতন্ত্রে ঘোষিত অর্থনৈতিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের উপরই সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। প্রয়োজন হয় জাতিকে আজ আবার ছত্রিশ বছর পিছাইয়া যাইয়া (২৬শে জানুয়ারীতে স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণের ন্যায়) নূতন ভাবে অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে। যে ছাব্বিশে জানুয়ারী রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনিয়াছে সেই ছাব্বিশে জানুয়ারী আনিয়া দিবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা —

বলা বাহুল্য শতকরা অর্দ্ধেকেরও বেশী ভারতবাসীর কাছে—"২৬এ" জানুয়ারীর ঘনঘটা এবং উৎসব মাত্র উপরতলাবাসী জনকয়েকের জন্য—ইহাই মনে হয়। ইহার কারণ উৎসব করিবার মত দেহের অবস্থা এবং মনের প্রস্তুতি আমাদের শতকরা ৮০ জন লোকেরই নাই। কারণ কি তাহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন নাই।

'হিন্দীয়া' সমাচার

কয়েক দিন পূর্ব্বে শ্রীলালবাহাদুর দিল্লীতে বলিয়াছেন যে, হিন্দী এবং ইংরেজি উত্তরপত্র সমভাবে মূল্যায়নের জন্য একটি 'মডারেশন ফরমূলা' উদ্ভাবিত অনুমোদিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বিকল্প মাধ্যম হিসাবে হিন্দী ব্যবহৃত হইবে না।

সংবাদে প্রকাশ যে শ্রীশাস্ত্রী আরও বলেন :

চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে অহিন্দীভাষী রাজ্যসমূহের মুখ্যমন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করা হইবে এবং তাঁহাদের অনুমোদনের পরই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ দক্ষিণ ভারতের লোকদের হিন্দীতে লেখা চিঠি ফেলিয়া দেওয়ার পরামর্শ দিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রীশাস্ত্রীকে সে সম্পর্কে মন্তব্য করিতে বলা হয়। হিন্দী প্রবর্ত্তনের ব্যাপারে ধীরগতি অবলম্বনের জন্য শ্রীকামরাজ, শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং শ্রীসঞ্জিব রেড্ডী সম্প্রতি বাঙ্গালোরে যে বিবৃতি দিয়াছেন, সে সম্পর্কেও তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয়।

উত্তরে শ্রীশাস্ত্রী বলেন, অহিন্দীভাষী রাজ্যে হিন্দীতে প্রাপ্ত চিঠিপত্রের উত্তর না দেওয়া সম্পর্কে শ্রীকামরাজ কি বলিয়াছেন, তাহা তিনি জানেন না। তিনি পুনরায়

দৃঢ়তার সহিত বলেন অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলিতে জোর করিয়া হিন্দী চাপানো উচিত নয়।

প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সংবাদে প্রকাশ যে—

কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীভক্তদর্শন আজ এখানে সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, সেসব বিদ্যালয়ে ইংরেজী ও হিন্দী অবশ্যপাঠ্য বিষয় হউক, ইহাই কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা।

ইচ্ছা খুবই সাধু এবং এই সাধু ইচ্ছাই শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইবে যে 'হুকুমে' পরিণত হইবে। হিন্দী-ভক্ত মহামান্য ভক্তদর্শন ভারতে হিন্দী-সাম্রাজ্যের পবিত্র রূপ দিব্যচোখে দর্শন করিতেছেন—আশা করি ভারত ভাগ্যবিধাতারা ভক্তের মনোবাসনা অচিরে পূর্ণ করিবেন। আর একটি সংবাদে দেখি :

হিন্দী এখন কেন্দ্রের সরকারী ভাষা এবং সমস্ত কাজ-কর্ম্মই হিন্দীতে চলিবে।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় হইতে ৩০শে জানুয়ারী তারিখে এইভাবে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। মন্ত্রণালয়ে ব্যবহারের জন্য ইস্তাহারে সরকারী পদগুলির হিন্দী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জনৈক কর্ম্মচারী ইউ-এন-আই-এর একজন প্রতিনিধিকে বলেন যে, হিন্দীর সহিত ইংরাজীর ব্যবহারও অব্যাহত থাকিবে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি ঘোষণা করেন, প্রকাশিত ইস্তাহারের বক্তব্যে তাহার প্রতিকূলতা দেখা যাইতেছে।

প্রতি পদে দেখা যাইতেছে কর্ত্তাদের কথায় এবং কাজে আকাশ-জমিন তফাৎ! ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে, পাকে-প্রকারে বিবিধ স্তোকবাক্য দ্বারা হিন্দীকে রাজাসনে কায়েম করাই দিল্লীর কর্ত্তাদের পরিকল্পনা।

দক্ষিণ ভারতে হিন্দীর বিরুদ্ধে বিষম প্রতিক্রিয়া দেখিয়াও দিল্লীর চেতনা হয় নাই—এমন কি আমাদের নবীনা-কর্ত্রী ঠাকুরাণী শ্রীমতী হিণ্ডীরা দেবীও বলেন যে —হিন্দীর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহা নগণ্য সংখ্যক লোকের দ্বারাই। বেশীর ভাগ লোকেরই হিন্দীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ কিংবা বিরুদ্ধভাব নাই এবং সকলেই মনে-প্রাণে হিন্দী কামনা করেন ভারতের সংহতি আরও জোরদার করার জন্য শীঘ্রই শ্রীমতী সর্ব্ববিষয়ে মতামত দেওয়া এবং মাষ্টারী করার ব্যাপারে তাঁহার স্বর্গত পিতাকেও বোধ হয় ছাড়াইয়া যাইবেন বলিয়া মনে হইতেছে! দিল্লীর 'কেবিনেট' লবণের গুণ আছে!

হিন্দীর পক্ষে কর্ত্তা এবং কর্ত্তাভজাদের সাফাই :

"—হিন্দী চাপাইবার স্বপক্ষে একটিমাত্র সাফাই দিল্লীর মহাপ্রভুরা গাহিয়া চলিয়াছেন—সংবিধান মান্য করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এত বড় মিথ্যা কথা বোধ করি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর কেহ কখন বলে নাই। সংবিধানের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নাই। দ্রাবিড় কাজাখাম সংবিধানের বই পোড়াইয়াছে, ইহারা সংবিধানকে ভিতর হইতে মোচড়াইয়া যখন যেমন তখন তেমন নিজেদের মতলব হাসিল করিয়াছেন। নিজেদের অসুবিধাজনক হাইকোর্ট জজকে অপসারণ করিতে সংবিধান বদলাইয়াছেন। আমেরিকান সংবিধানের প্রতিটি সংশোধনে জনসাধারণের অধিকার সম্প্রসারিত হইয়াছে, ভারতীয় সংবিধানের প্রতিটি সংশোধনে মূল সংবিধানে প্রদত্ত অধিকার অপহৃত হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের নিরাপত্তা সম্পর্কে যেটুকু অধিকার সংবিধানে প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাও অপহরণের জন্য সংশোধনী বিল আসিতেছে। লজ্জা বা শালীনতার কোন বালাই থাকিলে ইহারা সংবিধান মান্য করার কথা তুলিতেন না।

"প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন আন্দোলনের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হয় না। ভারতবাসীর অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। স্বাধীনতার পর তেলেগুভাষীরা স্বতন্ত্র অন্ধ্র প্রদেশের দাবি তুলিলে কেন্দ্রীয় নেতারা উহা মানিতে অস্বীকার করিলেন। শ্রীরামুলু অনশনে আত্মবিসর্জ্জন দিলেও তাঁহারা অটল রহিলেন। তারপর যখন সুরু হইল প্রচণ্ড আন্দোলন, রেল ষ্টেশন এবং থানা দাহন, রেল লাইন উৎপাটন, তখন প্রভুরা বলিলেন—রহ ধৈর্য্যং, দিতেছি। স্বতন্ত্র অন্ধ্র দিলেন। সমস্ত ভদ্র প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া জবরদস্তি বোম্বাইকে দ্বিভাষী প্রদেশ করিলেন। বোম্বাই এবং আমেদাবাদের লাঠির চোটে অবশেষে মহারাষ্ট্র গুজরাট মানিয়া নিলেন। নাগাদের প্রথম জবাব দিলেন—ফুঃ। মারের চোটে এখন সেই নাগাদের পদলেহনের জন্য চর পাঠাইয়াছেন। ভদ্র শান্ত সংযত আন্দোলন তাঁহাদের প্রাণে সাড়া জাগায় না, তাঁদের একথা খুব ঠিক। এবং সেই সঙ্গে ইহাও ঠিক যে, আন্দোলন মারমুখী হইয়া উঠিলে তখন তাঁহারা নতজানু হইয়া বলেন—বন্ধু, এবার কোল দাও।

শান্ত সংযত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া প্রহারের নিকট নতি স্বীকারের যে পলিসি দিল্লীর শাসকেরা অনুসরণ করিতেছেন তাহা অপেক্ষা ক্ষতিকর পলিসি আর কিছুই হইতে পারে না।—"

হিন্দীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অবিলম্বে আরও সক্রিয় এবং জোরদার না করিলে—পশ্চিমবঙ্গের হিন্দীপ্রেমী মুখ্যমন্ত্রী কি করিয়া বসিবেন বলা কঠিন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হিন্দী সম্পর্কে ইতিমধ্যেই যে-সকল উক্তি করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ—তাহাতে আমাদের ভয় এবং সন্দেহ করিবার মত যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া মনে করি।

"দু'-একটি নামমাত্র বিবৃতি এবং কলিকাতা মহানগরীর ক্ষুদ্রতম হলে ছোট্ট দু'একটি গোষ্ঠী বৈঠকে বাঙলার প্রতিবাদ শেষ হইয়াছে। সাহিত্য আকাদামির অনুগৃহীত কয়েক ব্যক্তি আলগোছে সব দিক বাঁচাইয়া একটি বিবৃতি দিয়া তাঁদের দায়িত্ব শেষ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান বক্তব্য—হিন্দী কেন্দ্রীয় ভাষা হইলে অন্যান্য ভাষার মর্য্যাদা কমিয়া যাইবে। ইহা যুক্তি নহে, কুযুক্তি। ইহা প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মর্য্যাদার প্রশ্ন নহে, ইহা একটি প্রাদেশিক ভাষাকে কেন্দ্রীয় ভাষায় পরিণত করিয়া ঐ ভাষাগোষ্ঠীতে একটি স্বাতন্ত্র শাসকশ্রেণী গঠনের প্রশ্ন, ভারতের অগ্রগতি সহস্র বৎসর পিছাইয়া দেওয়ার প্রশ্ন, ভারতীয় সংস্কৃতিকে নিম্ন কালচারে নামাইয়া আনিবার প্রশ্ন।" 'যুগবাণী'—যথার্থ কথাই বলিতেছেন।

হিন্দী-প্রতিরোধের ব্যাপারে আমাদের আশা বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রী সমাজ। সরস্বতী পূজা শেষ হইয়াছে কিছুদিন হইল—এবার তাঁহারা স্থির মস্তিষ্কে নিজেদের, বাঙ্গালী, বাঙ্গলা ভাষার, সেই সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অহিন্দী-ভাষী প্রদেশ ও প্রদেশবাসীর—ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন।

কলিকাতাস্থিত কেন্দ্রীয় সকল সংস্থাগুলিতে সাইন বোর্ড হিন্দী এবং ইংরেজিতে। দেখিলে মনে হইবে—এ-রাজ্যে বা শহরে বাঙ্গালী বলিয়া কোন জাতি বাস করে না। ইহাকেও হিন্দী চাপাইবার কারণে জবরদস্তি ছাড়া আর কি বলিব?

হিন্দী মালিকদের দেওয়ালের লিখন চোখ (যদি থাকে) মেলিয়া পাঠ করিতে বলি—ভারতবর্ষকে হিন্দীর ডাণ্ডা মারিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছেন তাহা বুঝিতে পারিবেন!

হায়! ডাঃ রায়—হায়! 'কল্যাণী'!

কল্যাণী উপনগরী গঠন করিবার কালে স্বর্গত বিধানচন্দ্রের বাসনা ছিল যে,এখানে বিষম সমস্যাকুল কলিকাতা এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালীদের একটা সামান্য কিছু সুরাহা হইবে। কলিকাতার সন্নিকটে এই কল্যাণীতে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী একটু ভদ্রভাবে বসবাসের এবং সেই সঙ্গে রুজি-রোজগারের কিছু উপায়ও হয়ত পাইবে। একই স্থানে বসবাস, শিক্ষালাভ এবং অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা বাঙ্গালী পাইবে—ডাঃ রায়ের মনের এই ইচ্ছা আজ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পরলোক গমন করিয়াছে! এ-বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট দেখুন—পুলকিত হইবেন।

কোন একদিন যদি এমন হয় যে, স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায়ের স্মৃতিবিজড়িত কল্যাণীতে বাঙ্গালীর আর কোন স্থান নেই, তা হ'লে অবাক হবার কিছু থাকবে না।

"কথা ছিল, কল্যাণী শিল্পনগরী পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করবে। সমস্যাসঙ্কুল বাঙ্গালীদের দু'একটি সমস্যার সুরাহা হবে। স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায়ের সেরূপই স্বপ্ন ছিল। কলিকাতার কাছে-পিঠে গড়া কল্যাণীর ছিমছাম পরিবেশে বাঙালী মাথার উপর খানিকটা খোলা আকাশ পাবে। বাসস্থানের সঙ্গে শিক্ষালাভের, অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা পাবে।

"...কিন্তু আজ কল্যাণীর অবস্থা কি? সরকারের একটি শিল্প সংস্থাসহ কল্যাণীর বর্ত্তমান শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২১টি। তার মধ্যে ৩টি ছাড়া আর সব ক'টাই অ-বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান। আর সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্য-রত বাঙ্গালীর সংখ্যা শতকরা মাত্র ২৭ জন। তার মধ্যে আবার শতকরা ৩ জন তথ কথিত পদস্থ কর্মচারী। বাকি সব সাধারণ শ্রমিক-মজুর, প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, এদের মধ্যে অধিকাংশই স্কুল-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

"কল্যাণী নগর-পরিকল্পনায় বাঙ্গালীর বাসগৃহ সমস্যা বিবেচনা করে তাদের অগ্রাধিকারদানের কথা বিবেচনা করা হবে বলা হয়েছিল। অথচ আজ পর্য্যন্ত গুটিকয়েক ভাগ্যবান বাঙ্গালীই সেখানে বাসগৃহ জোটাতে পেরেছেন। কল্যাণীর উন্নয়ন দপ্তর নির্মিত গৃহগুলির অধিকাংশই এখন অ-বাঙালীর আস্তানা।

"একরের পর একর জমি আজও সেখানে অনাবাদি অবস্থায় পড়ে আছে। আ-গাছা জঙ্গলে ছেয়ে গেছে চারিদিক। অথচ সরকারের কিছুই করবার নেই। এ সকল অঞ্চলের এক ছটাক জমির উপরও নাকি সরকারের

কোন হাত নেই। সবটুকু যারা আগেভাগে কিনে রেখেছেন, তাদের অধিকাংশই অ-বাঙ্গালী। কিছু কিছু ভাগ্যবান্ বাঙ্গালী যারা সুরুতে ওখানে জমি কিনেছিলেন, এখন তাদেরও দৃষ্টি নাকি কলকাতার লবণ হ্রদ এলাকার দিকে। তাদের অভিপ্রায় উত্তরকালে কল্যাণীর জমি উঁচু দরে বিক্রি করতে পারলে তা দিয়ে লবণ হ্রদ এলাকায় জমি কিনে বাড়ী করতে হ'লে এখানেই করা যাবে, কল্যাণীতে কেন?

"অথচ সরকার যখন জমি বিক্রয় করেছিলেন, তখন চুক্তি ছিল ক্রেতাকে দুই-আড়াই বছরের মধ্যেই বাড়ী করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বাড়ীর 'প্ল্যান' দাখিল করারও কথা ছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কিছুই হয় নি। আশ্চর্য্যের কথা, সব কিছু জেনেও সরকার এ ব্যাপারে নীরব।

"জানা গেছে, সরকারের সঙ্গে বেশ দহরম-মহরম আছে, এরূপ এক অ-বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নাকি এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব আছে। সেই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীই এখন প্রকৃতপক্ষে কল্যাণীর অধিকাংশ জমির মালিক। তাই জানতে ইচ্ছে হয়, তাদের কি অভিপ্রায়? সরকারী উদ্যোগের দৌড় ত দেখা গেল।"

গত ৩রা ফেব্রুয়ারীর আনন্দবাজারে প্রকাশিত উপরি-উক্ত সংবাদ আশা করি এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচর হইয়াছে বিশেষ—করিয়া উদ্ধৃত রিপোর্টের শেষ প্যারাটির উপর।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহিত "দহরম-মহরম আছে" এরূপ অবাঙ্গালী ব্যবসায় সম্প্রদায়টির নাম-ধাম-গোত্র কি?

যে-ধারায় পরম যোগ্যতার সহিত পশ্চিমবঙ্গের শাসন কার্য চলিতেছে তাহাতে কেবল কল্যাণীর নয়, একে একে সব কিছুই বাঙ্গালীর হাতের বাহিরে যাইবে। দুর্গাপুর প্রায় গিয়াছে, বোটানিক্যাল গার্ডেনও আর আমাদের নাই, সল্ট লেকের জমিও বেশীর ভাগ আবাঙ্গালীর হাতে, এ রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ অবাঙ্গালীর অধীন। কলিকাতার বসতবাটিগুলি ক্রমশ: অন্যরাজ্যের—বিশেষ করিয়া রাজস্থানীদের মালিকানায় যাইতেছে!

ডাঃ রায় পরমযোগ্য এক উত্তরাধিকারীর হাতেই আমাদের ভাগ্য অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাদেবীর পূজা

সরস্বতী পূজা, প্রাক্কালে মাইক এবং লাউড স্পীকার ব্যবহার সম্পর্কে অন্য বৎসরের মত এবারও পুলিসের বিধি-নিষেধ ঘটা করিয়া প্রকাশিত হয় এবং এবারও যথারীতি ঐ পুলিসী বিধি-নিষেধ ভঙ্গ করিয়া উহা পরম নিষ্ঠার সহিত উৎসাহী ভক্তরা প্রতিপালন করিয়াছেন! আশা করি পুলিস কমিশনার মিঃ পি কে সেন এ সংবাদ পাইয়াছেন। আমাদের বিনীত নিবেদন, ভবিষ্যতে কলিকাতা পুলিস যেন এভাবে বিধি-নিষেধের প্রহসন পরিহাস না করেন। সরস্বতী পূজার আর একটি সংবাদ—

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী—গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন হইতে শ্রীরাধারমণ শীল নামে ৪১ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তিকে আজ রাত্রে আহত অবস্থায় আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, এই ব্যক্তি সরস্বতী পূজার চাঁদা না দেওয়ায় প্রহৃত হইয়াছেন।—(যুগান্তর)।

এই প্রকার ঘটনা আগে ঘটিয়াছে কি না জানি না। কিন্তু চাঁদা না-দেওয়াতে বহুজন বিবিধ প্রকারে অপমানিত এবং নিগৃহীত হইয়াছেন—ইহা সত্য।

পূজা যদি প্রকৃত ভক্তি এবং 'ভাবগম্ভীর' (দৈনিকের ভাষায়) পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় সুখের কথা, এবং কাহারও আপত্তি করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু পূজার নামে আজকাল বাঙ্গলা দেশে কি ঘটিতেছে, তাহা দেশের মঙ্গলকামী ব্যক্তিদের একটু শান্ত ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে বলিব। বাঙ্গালী যুব সমাজের প্রাণশক্তি এবং কর্ম্মপ্রেরণা কি এই ভাবেই অপব্যয়িত হইতে থাকিবে? বিগত কালের সরস্বতী পূজা এবং আজ কালকার সরস্বতী পূজা—তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে আজ বাঙ্গালী বালক এবং যুবক সমাজ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এ-বিষয় আমাদের আর কিছু মন্তব্য করিবার নাই।

আইন করিয়া মদ বিক্রয় বন্ধ করা যায় না

সকল বাস্তব দিক বিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে মদ বিক্রয় নিষিদ্ধ করা সম্ভব হইবে না বলিয়া রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত করা হয়। বৈঠকে এই-রূপ অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, কেবলমাত্র আইনের

সাহায্যে মদ বিক্রয় বন্ধ করিয়া মদ্য পান নিবারণ সম্ভব নহে। লোকশিক্ষার মারফৎ জনসাধারণকে মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে অবহিত করা সম্ভব হইলে, তবেই মদ্যপান নিবারণ সম্ভব।

রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে টেকচাঁদ কমিশনের (আগামী ১২ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতে মদ্যপান ও মদ বিক্রয় নিষিদ্ধ করিবার পক্ষে) সুপারিশ আলোচনাকালে উল্লিখিত অভিমত প্রকাশ করা হয়। প্রকাশ, রাজ্য মন্ত্রিসভার উল্লিখিত অভিমতযুক্ত এক স্মারকলিপি কেন্দ্রের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে এইরূপ মন্তব্যও করা হয় যে, ভারতের অন্যান্য যে-সকল রাজ্যে আইন করিয়া মদ বিক্রয় নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা হইয়াছিল, সেখানেই বিপরীত ফল হইয়াছে। ঐ সকল রাজ্যে চোলাই মদ তৈয়ারী এবং সঙ্গে সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইহা ছাড়া, মদ বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবগারী শুল্ক হইতে প্রাপ্ত বার্ষিক প্রায় দশ কোটি টাকার মত রাজস্ব ঘাটতি হইবে। তবে বৈঠকে মদ্যপান নিবারণের উদ্দেশ্যে লোকশিক্ষার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে মদ্যপান-নিরোধ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত আমরা সমর্থন করি। ইতিপূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশে আইন বলে মদ্যপান বন্ধ করিবার চেষ্টা হয়—কিন্তু সর্ব্বত্রই এ-চেষ্টা পূর্ণ বিফলতা অর্জ্জন করে।

বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে "নেশাবন্দী" খুব ঘটা করিয়া করা হয়, কিন্তু প্রকৃত খবর যাঁহারা জানেন—তাঁহারা বলেন, দেশী, বিলাতী, ভাল-মন্দ সর্ব্বপ্রকার মদের হাজার হাজার বোতল ঐ সব রাজ্যে প্রত্যহ কেনা-বেচা চলিতেছে। বলা বাহুল্য—এই কারবারেরও, সকল না হইলেও,বহু পুলিস অফিসার এবং কনেষ্টবলদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা বর্ত্তমান।

এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে যে—পুলিশ অফিসার সাধারণ পুলিস সঙ্গে লইয়া হোটেলে মদ বিক্রয় ধরিতে গিয়া নিজেরাই পানানন্দে মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন! একটি-দুইটি নহে, এমন বহু ঘটনা বোম্বাই, নাগপুর, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ঘটিয়াছে—এখনও ঘটিতেছে! কাজেই মনে হয়—পশ্চিমবঙ্গ সরকার মদ্য বিক্রয় এবং পান সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে অটল থাকিবেন, কেন্দ্রের চোখ-রাঙ্গানি কিংবা স্তোকবাক্যে গলিয়া ঢলিয়া পড়িবেন না। শ্রীনন্দা হয়ত রাজ্য মুখ্য-মন্ত্রীকে 'নেশা-বন্দী'তে দীক্ষা দিবার প্রয়াস করিবেন—আশা করি, শ্রীসেন এ-দীক্ষা শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করিতে কোন দ্বিধা করিবেন না।

ভারতের পল্লীগীতি ও নৃত্য

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

ভারতের পল্লীতে পল্লীতে অজস্র লোকগীতি ছড়িয়ে আছে, সেগুলোর সব কিছুই শ্রেষ্ঠ কাব্যের পর্য্যায়ে পড়ে না। তবে তাতে কাব্যের আভরণ না থাকলেও সে গীতিকাব্যের প্রাণশক্তিতে সজীব। এসব পল্লীগীতি নানা বিষয় নিয়ে রচিত, তবে অধিকাংশ পল্লীগীতিতেই গ্রামের বধূদের দুঃখকষ্ট ও মর্ম্মবেদনার কাহিনী পাওয়া যায়। পূজাপার্ব্বণ, উৎসব বা বিয়েতে গ্রাম্যনারীরা এসব গীত গেয়ে উৎসবকে প্রাণবন্ত ক'রে তোলে। এই পল্লীগীতিগুলি থেকে আমরা নানাস্থানের সমাজচিত্র ও নারীহৃদয়ের নিবিড় অনুভূতির সহিত পরিচিত হই।

লোকগীতিতে প্রেমিক-প্রেমিকার মান অভিমান বিরহ, সামাজিক কারণে মিলনে অসমর্থ নায়িকার ক্ষোভ ও ব্যথা, ননদিনীর ঈর্ষ্যালু হৃদয়, পিতৃগৃহবঞ্চিতা বালিকা-বধূর মনের ব্যথা, প্রতাপশালিনী শাশুড়ীর অত্যাচার ইত্যাদি বহু ধরণের চিত্র ফুটে ওঠে।

অনেক পল্লীগীতিতে দেখতে পাওয়া যায় রামসীতা বা রাধাকৃষ্ণকে নায়ক-নায়িকা ক'রে কবি গীত রচনা করেছেন। পূজাপার্ব্বণে ও বিয়ের উৎসবে সাধারণতঃ এ ধরণের গীত গাওয়া হয়।

যেমন বরকে যখন সাজান হয় মেয়েরা গীত গায়—

সাজ ওহে রাম, নব দুর্ব্বাদল শ্যাম
তুমি গুণধাম কৌশল্যা নন্দন।
চন্দন পরাব কাজল লাগাব
বাপের কোলে দিয়ে করব নিরখন।

অথবা বর খেতে বসেছে, নারীরা গাইছে—

জৌনে দিন রাম জনকপুর আয়ে
দেখন আয়ী সারি দুনিয়া

জেওন ব্যাঠে লছমন রাম
পরুছন লাগি হাঁায় জনক দুলারী
বিছিয়ান কিছিনকারী।

রাম যেদিন জনকপুরে এলেন, পৃথিবীর সব লোক দেখতে এল।...রাম-লক্ষ্ণ খেতে বসেছেন, জনককন্যা পায়ের আংটির ঝঙ্কার তুলে পরিবেশন করছেন ইত্যাদি।

অধিকাংশ পল্লীগীতিতে আমরা পল্লীনারীর আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-দুঃখভরা কোমল হৃদয়ের স্পর্শ অনুভব করি। গ্রাম্য-কবিরা অতি সহজ-সরল কথায় গীতগুলি রচনা করেছেন। কিন্তু সেই অতি সাধারণ কথাগুলোই সুরের ঝঙ্কারে ও মূর্চ্ছনায় সরস হয়ে ওঠে। সব দেশেই লোকগীতির একটা বিশেষত্ব এই, তার পদাবলীর অর্থ বুঝতে না পারলেও সুরের বৈচিত্র্যে মন নানা রসে ভরে ওঠে।

পাশ্চাত্ত্য দেশের যে কয়েকটি লোকগীতি শুনেছি, সেগুলোর সঙ্গে ভারতীয় লোকগীতির তুলনা করলে দেখতে পাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুরের কিছু-না-কিছু সাদৃশ্য আছে। দিল্লী হ'তে চৌদ্দ-পনের মাইল দূরে একটি গ্রামের গুর্জ্জর ললনারা যে পল্লীগীত শোনাল তাদের সেই করুণ মধুর সুরের সঙ্গে সাদৃশ্য পেলাম স্প্যানীশ লোকগীতির সুরে।

সব দেশেই লোকগীতির তাল রাখবার জন্য একই পংক্তি বারে বারে গীত হয়। কোন কোন পংক্তিতে নিতান্ত অর্থহীন শব্দের প্রয়োগ হয় সুরের সংহতি রাখবার জন্য। আর পাশ্চাত্ত্য হোক, ভারতীয় হোক, লোকগীতির একটা বিশেষত্ব এই, গানের ভিতর দিয়েই উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে। শ্রোতাকে নিজ বুদ্ধি দিয়ে ধরে নিতে হয় কে প্রশ্ন করছে এবং কে উত্তর দিচ্ছে। পল্লীগীতির সজীবতা বহুগুণে বেড়ে যায় যখন তাকে বাদ্যের সঙ্গে নৃত্যে রূপায়িত করা হয়। কিন্তু ভারতের নারীপুরুষকে একত্র মিলে নাচগান করতে দেখা যায় শুধু আদিবাসীদের মধ্যে। মাদল বাজিয়ে, বাঁশী বাজিয়ে জোড়ায় জোড়ায় অথবা সারিবদ্ধভাবে স্ত্রী-পুরুষ লোকগীতির সঙ্গে নানা ধরণের নৃত্যকার আনন্দে বিভোর হয়।

বাংলা দেশের সাঁওতালদের, মধ্যপ্রদেশের ও বুন্দেলখণ্ডের ভীল, গোণ্ড, বনজারা, সরগুজিয়া, মাড়িয়া ইত্যাদি বহুজাতীয় আদিবাসী নারী-পুরুষের নৃত্যগীত উল্লেখযোগ্য। তাদের বাদ্যে এবং নৃত্যে উচ্ছ্বাস আছে। যদিও অনেক সময় তাদের গীতির পদাবলী অর্থহীন বা অমার্জ্জিত।

ভারতের অন্য নারীপুরুষ একত্রে না নাচলেও পৃথকভাবে তাদের মধ্যে নাচের যথেষ্ট প্রচলন আছে। নারীদের মধ্যে গুজরাটের গর্ব্বা নৃত্য, বুন্দেলখণ্ডের কলানৃত্য, গোণ্ডদের ভঁয়া নৃত্য, রাজস্থানের ঘুমর ও মেহেদী নৃত্য, মহারাষ্ট্রের গৌরী নৃত্য বিশেষ সমাদৃত।

পুরুষালী নৃত্যগীতের মধ্যে পাঞ্জাবী ভাংরা নৃত্য, আদিবাসীদের শৈলানৃত্য, রাজস্থানের রণনৃত্য, বাংলা দেশের দেবীপ্রতিমার সামনে ধুমুচিনৃত্য, এবং পূর্ব্বকালের রায়বেশে নৃত্য বীরত্বব্যঞ্জক ও চিত্তাকর্ষক। বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্যর কাল থেকে প্রচলিত সংকীর্ত্তন নৃত্যও পুরুষ নৃত্যের পর্য্যায়ে ফেলা যেতে পারে।

কিছুকাল পূর্ব্বে দিল্লীতে ভারতের গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আগত নানা প্রদেশীয় অধিবাসীরা একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে যে লোকগীতিসহ নৃত্য করল তা দেখে অনেক কিছু জানবার সুযোগ পেলাম। নৃত্যগীতি ও বাদ্যের সঙ্গে এদের পোষাকের বৈচিত্র্য দর্শকদের আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছিল। কড়ি, পুঁতি, পশুর শিং, বাঘের নখ, হাড়ের গয়না, ময়ূরের পালক ও নানা অদ্ভুত পোষাকে সজ্জিত আদিবাসীদের নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। নারীরাও বর্ণোজ্জ্বল ঘাঘরা, কাঁচুলি, ওড়না, এবং রূপা, পিতল ও হাড়ের গয়নায় দেহ অলঙ্কৃত করে নাচের আসরে নেমেছিল। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ঢোল, মৃদঙ্গ, বাঁশী, টিমকি ও চটুকোলা প্রধান।

বাংলার একান্ত নিজস্ব ভাটিয়ালী ও বাউল গান সাধারণত বাঙ্গালী পুরুষরা গেয়ে থাকে। নদীমাতৃক বাংলা দেশে নদীর বুকে পাল তুলে নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে মাঝিরা এবং কখন কখন মাঠে মাঠে গরু চরাতে চরাতে রাখাল যুবকেরা গলা ছেড়ে যে ভাটিয়ালী গান গেয়ে থাকে তা অন্যত্র শুনতে পাওয়া যায় না। যেমন—

ওরে ওরে সুন্দইর‍্যা নাওএর মাঝি
কোনদিন ছাড়িবায়রে নাও, আমি যেন জানি।

ও মাঝিরে আমার বাড়ী যাইও, মাঝি বইতে দিমু পিড়া
খাইতে দিমু তোমায় আমি শালী ধানের চিড়া।

ভাটিয়ালী ছাড়া বাংলার আর একটা নিজস্ব জিনিষ হ'ল একতারা বাজিয়ে দেহতত্ত্ব-সম্বলিত বাউল গান। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর লাউ বাজিয়ে মধুর কণ্ঠের রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহ গীতিতেও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এছাড়া বাংলার পল্লীর নিজস্ব সম্পদ, বাইচ খেলায় নৌকা দৌড়ের প্রতিযোগিতায়। পল্লীর বলিষ্ঠ যুবকরা সারি সারি নৌকায় বৈঠা বাইতে বাইতে দরাজ গলায় যে গান গায় তা প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় অতি সরস হয়ে ওঠে কখন বীররসে, কখন হাস্যরসে।

বাংলা দেশে হাড়ী, বাউরী, বাগদী শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে বহু নৃত্যগীতের প্রচলন আছে। বাঁকুড়া জেলায় বাউরী ও বাগদীদের কাঠিনৃত্য একটি সুন্দর উৎসব। পুরুষরা রঙ্গীন শাড়ী কুঁচি দিয়ে ঘাঘরার মত করে পরে, গলায় হার, কাণে দুল দিয়ে নারী সাজে। তারপর চার, ছয় বা আট জনকে নিয়ে এক একটি দল গঠন করে। হাত দেড়েক লম্বা কাঠি দু'হাতে নিয়ে কাঠিতে কাঠিতে ঠকাঠক্ আওয়াজ তুলে নাচতে সুরু করে। প্রথমে তারা ধীরে ধীরে নাচে, তারপর ক্রমশঃ নাচের তালে দ্রুত থেকে দ্রুততর হ'তে থাকে, হাতের কাঠিগুলোও দ্রুত সঞ্চালনে অদৃশ্যপ্রায় হয়ে যায়। এই নাচের সঙ্গে তারা মনসামঙ্গলের ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের পদাবলী অবলম্বনে স্বরচিত গীত গায়। কাঠিনৃত্য ছাড়া ধর্ম্মরাজের গাজন উৎসবে ঢাকীনৃত্যও উল্লেখযোগ্য। সে সময় কবিদের তরজা হয়। মানে দুইদল কবি মুখে মুখে গীত রচনা করে উত্তর প্রত্যুত্তর দেয়। প্রতিযোগিতা চলে, তবে এ উৎসবের বহু গীতই সুরুচিপূর্ণ নয়।

বাঁকুড়ার আর একটি বিশেষত্ব পটের গান। সেখানে মাল নামে এক সম্প্রদায় আছে, তারা ধর্ম্মে ও আচরণে মুসলমান ও হিন্দুর সংমিশ্রণ। তাদের ব্যবসা হ'ল মহাভারত, রামায়ণ, মনসামঙ্গল এসবের চিত্রপট দেখিয়ে গান করা, অনেক স্থলে পটগুলি বড়ই সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়। কতক পট তারা নিজেরা আঁকে, কতক বা বড় বড় পটুয়াদের দিয়ে আঁকিয়ে নেয়। বর্ষাশেষে এরা পট নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে ও বাংলার নানা অঞ্চল ঘুরে-ফিরে ছয়মাস কাটিয়ে অর্থ উপার্জ্জন ক'রে ঘরে ফিরে। কোন কোন সময় তাদের পরিবারের মেয়েরাও সঙ্গী হয়, তবে তারা পটের গানে যোগ দেয় না। তারা কাঁচের চুড়ি ফেরি করে বাড়ী বাড়ী ঘুরে পল্লীবধূ ও কন্যাদের হাতে চুড়ি পরিয়ে বেশ দু'পয়সা রোজগার করে।

ত্রিপুরা জেলায়ও একশ্রেণীর লোক এরকম পট দেখিয়ে গাজীর গান গেয়ে ভিক্ষা ক'রে বেড়ায়, তবে সে পট হ'ল বাঘের। আর নানা কাহিনী অবলম্বনে সে গীত রচিত হয়, যেমন

গাও গাও, গাওরে ভাই বাঘের কাহিনী
পঞ্চকোটি বাঘ নিয়ে নামিল বাঘিনী ইত্যাদি।

পাঞ্জাবে পাঞ্জাবী পুরুষদের ভাংরা নৃত্য একটি প্রাণবন্ত নাচ। নৃত্যকারীরা রঙ্গীন পোষাকে সজ্জিত হয়ে উদ্দাম নৃত্য করে। প্রশস্ত খোলা ময়দানে তারা নাচের ব্যবস্থা করে। সেখানে প্রথমে একটি ছোট বৃত্ত এঁকে সেটাকে ঘিরে আরও চার-পাঁচটা বৃত্ত আঁকে। ঢোলক-বাদক তার গলা থেকে ফিতে দিয়ে ঢোলক ঝুলিয়ে সেই বৃত্তে দাঁড়ালে নৃত্যকারীরা নাচের পোষাকে সজ্জিত হয়ে ঢোলক-বাদককে ঘিরে প্রথম বৃত্তে দাঁড়ায়। তাদের নাচের পোষাক হ'ল আঁটসাট চুড়িদার পাজামা, আঁটসাট রঙ্গীন সার্ট, তার উপর রঙ্গীন জ্যাকেট বা ওয়েষ্টকোট। সবার মাথায় পাগড়ি থাকা চাই-ই। পায়ে ক্যানভাসের জুতোর উপর মোটা ঘুঙুর বাঁধা। প্রত্যেকের হাতে এক একটা ছড়ি, কোন কোন সময় ছড়ির বদলে লম্বা চিমটা, তাতে ধাতুর গোলাকার পাত, অনেকটা সিকি-দুয়ানির মত গাঁথা। নাচের সময় সেগুলো থেকে মিষ্টি আওয়াজ বের হয়।

ঢোলক-বাদক প্রথমে ধীরে ধীরে ঢোল বাজাতে সুরু করে তারপর ক্রমশঃ তার তালের গতি দ্রুত হ'তে থাকে এবং সেই তালে তালে নৃত্যকারীরা এক বৃত্ত থেকে অপর বৃত্তে হাত-পা-শরীর ছুঁড়ে অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে থাকে, সে কি উল্লাসকর নাচ! কখন কখন নাচ যখন দ্রুতগতিতে চলে তখন একজন নৃত্যকারী বাদকের নিকটে এসে দাঁড়ালে বাজনা থেমে যায়।

সে গীতের একপদ রচনা করে সুর তোলে। বাকী নৃত্যকারীরা একে দুয়ে মিলে সে গীতরচনা পুরো করে। এই গীতগুলিকে পাঞ্জাবীতে বোলিয়াঁ বলে। যখন মুখে মুখে গীতরচনা সমাপ্ত হয় তখন সেই বোলিয়াঁর সবচেয়ে ভাল পদটি নিয়ে আবার নাচ সুরু হয়ে যায়, ঢোল পুরাদমে বাজতে থাকে। এই বোলিয়াঁ রচনা পাঞ্জাবী গ্রাম্য সমাজের একটি অতি আনন্দের বস্তু। তার প্রাণের আনন্দে এসব বোলিয়াঁ তৈরী করে, সেগুলো নানারূপ হাসিঠাট্টাভরা এবং কখন কখন অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট থাকে। পূর্ব্বে আমাদের বাংলা দেশের গ্রামে যে কবিগান হ'ত, তাতে কবিরা মুখে মুখে গীতরচনা ক'রে দু'দলে তর্কযুদ্ধ লাগাত, এই পাঞ্জাবী বোলিয়াঁ অনেকটা সেই ধরনের কবিগান।

ভাংরা নাচ যে সব সময়ই তান-লয় সংযোগে হবে তেমন কিছু নয়, অনেক সময় এটাকে তাণ্ডব নাচও বলা যেতে পারে। এই ভাংরা নাচে নৃত্যকারীদের অন্য ধরণের পোষাক হ'ল ঢিলে লুঙ্গি, ঢিলে কুর্ত্তা, মাথায় পাগড়ি এবং হাতে রঙ্গীন রুমাল। তাদের উজ্জ্বল রংবেরং-এর পোষাক নাচের সময় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে।

পাঞ্জাবী নারীরা বিয়ে এবং অন্যান্য উৎসবে খুব জমকালো রেশম পোষাকে সজ্জিত হয়ে গোলাকারে বসে এবং ঢোলক বাজিয়ে গীত গায়। ছোট একটুকরো নুড়ি পাথর দিয়ে ওরা বড় সুন্দর ভাবে ঢোল বাজাতে পারে। বাংলার বিশেষ করে পূর্ব্ব বাংলার আনাচে-কানাচে যে এখনও শুধু পল্লীগীতি নয়, পল্লীনৃত্যের প্রথাও একেবারে বিলুপ্ত হয় নি তা জানলাম বিখ্যাত পল্লীগীতি-গায়ক শ্রীহট্ট-বাসী শ্রীনির্ম্মল চৌধুরীর কাছ থেকে। তিনি বললেন, শ্রীহট্টের কোন কোন অঞ্চলে এখনও নাচগানের প্রচলন আছে। তাঁর মায়ের ও ঠাকুরমার আমলে নাকি চতুর্থ-মঙ্গল বিয়ের রাত্রে সালঙ্কারা সুবেশা নববধূকে নেচে দেখাতে হ'ত। যে বধূ নাচতে জানত না তাকে পল্লীনারীরা বিশেষ কৃপার চক্ষে দেখতেন। নববধূর নাচবার কথা শুনে বেহুলার নাচের কথা মনে পড়ল। পৌরাণিক যুগে গৃহস্থ নারীদের নৃত্যগীতের চর্চ্চা ছিল। সতী বেহুলা তাঁর অপূর্ব্ব নৃত্যছন্দে দেবরাজ ইন্দ্রকে মুগ্ধ ক'রে মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিলেন।

বর্ত্তমানে বাংলার আধুনিক সমাজে এসব লোকনৃত্য গীতের বিশেষ প্রচলন বা সমাদর নেই, কিন্তু রাজস্থানের, মধ্যপ্রদেশের, উত্তর প্রদেশের ও দাক্ষিণাত্যের কোন কোন পল্লীগুলি আজও নরনারীর নৃত্যগীতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

অসবর্ণ

শ্রীসুনন্দা মুখোপাধ্যায়

গানের স্কুল থেকে ফিরেছি। টেবিলের ওপর একখানা চিঠি। হাতের লেখা দেখে বুঝলাম ছোড়দার। খুললাম চিঠিখানা। মধ্যপ্রদেশ থেকে লিখেছে। প্রায় ছ'মাস হ'ল ছোড়দা বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। ছোড়দা আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। ওর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা অপরিসীম। সেই ছোড়দা আজ কতদূরে চলে গেছে। বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বাগানটা দেখা যায়। পুষ্পিত কাঞ্চন গাছ সূর্য্যাস্তের রঙে ঝলমল করছে। চড়াই পাখীর দল কুলগাছের ডালে বসে কিচির মিচির করছে অনর্গল। মা রান্নাঘরে, বাবা ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। বড়দার অফিস থেকে ফিরতে আটটা বাজবে। বড় বৌদি বাপের বাড়ী। বারান্দায় মাটির ওপরই বসে পড়লাম।

আজ ছোড়দার চিঠিটা পাবার পর থেকে কেবলই নানা কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, ছোড়দাকে ছোট-বেলায় নাম ধরে ডাকতাম। মা খুব বকুনি দিতেন, মেরে-ছেনও কতবার। ছোড়দাও তারস্বরে প্রতিবাদ করত। কিন্তু শত শাসনেও ফল হয় নি। আমি বড্ড জেদী ছিলাম, নাম ধরে ডাকাটা ছাড়ি নি। কিন্তু তাই ব'লে ছোড়দার সঙ্গে ভাব এক তিলও কমে নি। ছেলেবেলায় দু'জনে এক বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে থাকতাম। ছোড়দা আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিত, আমি ছোড়দার কপালের এলোমেলো চুলগুলো আস্তে আস্তে সরিয়ে দিতাম। ছোটবেলা থেকেই বই পড়তে ভালবাসত ও। আমাকে রাজকন্যা শঙ্খমালার গল্প বলত। ওর বলার গুণে চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠত সব। রাজ-কন্যার মূর্ত্তিটা পুরোপুরি চোখে ভাসত, তার হীরের কঙ্কণের ঝংকার, সোনার নূপুরের রুনুঝুনু, বেনারসীর খসখস সবই যেন ধরা-ছোঁয়ার জিনিষ। কল্পনার ব্যবধানটুকুও থাকত না। একটু বড় হয়ে রাজকন্যার একখানা ছবি এঁকেছিল ছোড়দা। সে ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। বাড়ীতে দাদা আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। সে চিরকাল গম্ভীর, চুপচাপ। নিজের লেখাপড়া নিয়ে থাকে। তারপর দিদি। সেও আমার চাইতে ছ'বছর আগে জন্মেছে। মনের সব কথা তাকে বলা যেত না। চিরকাল বড় হবার গর্ব্ব দিদি আর আমার মাঝখানে ব্যবধানের অন্তরাল রচনা করত। ছোড়দা আর আমার বয়সের তফাৎ কম। প্রকৃতিতেও তার সঙ্গে আমার অনেক মিল। তাই ওর সঙ্গেই সম্বন্ধটা নিবিড় ছিল।

ভোরের বেলা প্রায়ই শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর বেড়াতে বেরোতাম। ছোড়দা আর আমি। অত ভোরে মা ছাড়া বাড়ীর কেউই উঠতেন না। তখন আমি একটু বড় হয়েছি। 'ভিজে ঘাসের গন্ধভরা বনপথে'র মর্ম্ম বুঝতে শিখেছি। নীল অপরাজিতার মখমলের ঘোমটার আড়ালে শিশিরের ফোঁটা বড় ভাল লাগছে। সোনা-ঝুরির স্বর্ণরেণুর অতলে তলিয়ে যেতে চাইছে মন। বসন্ত প্রকৃতিতে এলে আগে ত কখনও চেয়েও দেখতাম না। এখন মনেও তার অস্পষ্ট আভাস পাচ্ছি। ছোড়দাও আগের চেয়ে অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে। চুপচাপ কি যেন ভাবে অনেক সময়। তার হাসির দীপ্তি আরও গাঢ় হয়েছে। বয়ঃসন্ধির সব অপ্রাচুর্য্য ঘুচে গেছে। ভারী সুন্দর লাগছে তাকে। আমার ছোড়দাকে সুপুরুষ বলা চলে না। রং তার কালো। কিন্তু তবু যৌবনের ঐশ্বর্য্য সেই কালো রঙের ভেতরও আলো জ্বেলে দিয়েছে, কিসের আভায় ঝক ঝক করছে তার প্রশস্ত ললাট। দু'চোখের দৃষ্টিতে অন্তহীন মাধুর্য্যের ভাণ্ডার। ছোড়দা তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছে। আমি তখনও কলেজে ঢুকি নি। তাই কলেজ সম্বন্ধে অপার বিস্ময় ছিল মনে। ছোড়দার কাছে কত রকম গল্প শুনতাম। সেই ছোটবেলার রূপকথার জগতের মত আরেক পৃথিবীর দ্বারও খুলে যেত চোখের সামনে। কলেজ লাইব্রেরী, কফি-হাউস, ডক্টর সুদর্শন মিত্রের ইতিহাসের ক্লাস—সব মিলিয়ে সেও আরেকটা স্বপ্নের জগৎ, কিন্তু শুধুই স্বপ্ন নয়। জানতাম, আমিও সেখানে একদিন প্রবেশাধিকার পাব।

আমরা থাকতাম বেহালা ছাড়িয়ে, সেখান থেকেই রোজ যাতায়াত করত ছোড়দা। পথের দূরত্বকে আমল দিত না। ক্লান্তির ধার ধারত না। পথে নানাজনের সঙ্গে ক্ষণপরিচয়ের উন্মাদনায় বিভোর হয়ে থাকত,

তা ছাড়া কলেজের নবলব্ধ অভিজ্ঞতা, সেও ছিল আরেক সম্পদ্। আর সেই বিহ্বলতার স্বাদ আমিও পেতাম। বাড়ীতে আমিই ছিলাম ওর সঙ্গী। ভাইবোনেদের মধ্যে ছোড়দাই লেখাপড়ায় সবচাইতে ভাল ছিল। বাবা চাইতেন ও সায়েন্স পড়ুক। কিন্তু সায়েন্স ভাল লাগত না ছোড়দার। বাবার আপত্তি সত্ত্বেও আর্টস-ই নিল ও। সত্যিই ছোড়দা মনে-প্রাণে আর্টসের ছাত্র ছিল। বোটানীর ক্লাসে বসে রজনীগন্ধার বুক চিরে দেখা ওর সাধ্যাতীত। একবার কোন মেলা থেকে একটা কারুকার্য্যবিহীন মাটির ফুলদানি কিনে এনেছিল, গায়ে তার কালো রং। সেই ফুলদানিতে রজনীগন্ধার পুষ্পিত বৃন্ত প্রায় রোজই রাখত সে। কলেজ থেকে ফেরার সময় কিনে আনত, নিজেও বারান্দার টবে রজনীগন্ধার চারা বসাত সযত্নে···অনেক সময় বর্ষার রাতে আলো নিভে যেত···সেই সময় ছোড়দার ঘর থেকে ভেসে আসত গান···দীপ নিভে গেছে···রজনীগন্ধার গন্ধ ভরেছে মন্দিরে।

গাছ থেকে পড়ে-যাওয়া ছোট্ট চড়াই পাখীর বাচ্চা রুমালে করে তুলে নিয়ে এসে পলতে দিয়ে দুধ খাওয়াতে বলত আমাকে। এরকম ছেলের পক্ষে গিনিপিগের কণ্ঠচ্ছেদনও অসম্ভব। বড় মায়া ছিল ছোড়দার মনে। পৃথিবীর সব কিছুর ওপর অপরিসীম মমতা, কিন্তু তাই বলে ভীরু ছিল না ও। সাহস যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তবু ও বোধ হয় এ যুগে অচল। ক্লাস 'প্রক্সি' দিতে চাইত না বলে, ছেলেরা ওকে 'সাধু মহারাজ' বলে ডাকত। পরীক্ষার হলে ব'সে নিজের খাতার দিক থেকে চোখ ফেরাত না দেখে ওকে ব্যঙ্গ করত ছেলেরা, "শমীক আমাদের আদর্শবাদী হয়েছেন।" তীব্র ব্যঙ্গভরা অনেক কণ্ঠস্বরই কানে পৌঁছত। প্রতিবাদ সহজে করত না। কিন্তু যখন করত, একেবারে চরমে পৌঁছে দিত। স্কুলে যখন পড়ত তখন ত পেন্সিলকাটা ছুরিটা নিয়ে ধাঁ করে বসিয়ে দিত প্রতিপক্ষের কারও হাতের চেটোয়, তা না হ'লে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘুঁষি চালাত। বড় হবার পর আর হাতাহাতি করত না, কিন্তু কেউ বেশী বাড়াবাড়ি করলে তীব্র বাক্যবাণে বিদ্ধ করত তাদের, একেবারে মর্ম্মে গিয়ে পৌঁছত সে আঘাত। রণক্ষেত্র থেকে সব বীররাই অদৃশ্য হ'ত তখন। ছোড়দার ওই মূর্ত্তির সামনে কারও আর টুঁ করবার সাহস ছিল না। কিন্তু অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের প্রকাশ ঘটত কদাচিৎ। চিরকাল রাগটা দমন করতেই চেষ্টা করত ছোড়দা। শান্ত, নম্র, বিনয়ী হবারই প্রয়াস ছিল তার। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা অগ্নিগর্ভ মানুষও লুকিয়ে ছিল তার মধ্যে। চেতনার অতল থেকে সেই অগ্নিময় পুরুষ একেক সময় আত্মপ্রকাশ করত, তখন সে জ্ঞান হারাত। বিচার করত না কিছুই। শুধু রুখতে হবে, এই কথাটাই মনে রাখত। এর থেকে কাউকেই বাদ দিত না ছোড়দা। এমন কি নিজের ভাইবোনেদেরও নয়। একদিন আমাকেই বলেছিল, "তুই যদি কখনও নোংরা কিছু করিস শম্পা, আমি কিন্তু তোকে ক্ষমা করব না।"

সত্যিই এজন্য মনে মনে তাকে একটু ভয়ও করতাম আমি। দিদি যখন এক কনট্রাকটরকে ভালবেসে বিয়ে করল, তখনও ছোড়দার সেই অগ্নিময় রূপ দেখেছি। বাবা-মা কেউই এ বিয়েতে বিশেষ আপত্তি করেন নি। দিদির স্বামী অজয়দার অর্থ-সম্পদ্ ছিল অগাধ। শুধু বিত্তবান্ নয়, রূপবানও ছিল সে। সেই ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি সকলেরই চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। প্রথম দিন অজয়দাকে দেখে আমিও কম মুগ্ধ হই নি। শুধু ছোড়দাকে দেখেছিলাম এর ব্যতিক্রম। সে পাথরের মত কঠিন হয়েছিল। জানত, তার আপত্তিতে কোন ফল হবে না। তাই মুখে কিছুই বলে নি, শুধু আমায় একবার ডেকেছিল নিভৃতে। বলেছিল, "দিদিটা শুধু শুধু এম. এ. পাস করেছে। ওর কোন বুদ্ধি হয় নি। অজয় রায়কে কে না চেনে কোলকাতায়? ও কি ভাবে টাকা করেছে···" বলতে বলতে ধক্ করে জ্বলে উঠেছিল ছোড়দার চোখ। বুঝেছিলাম সেই অগ্নিময় মানুষটা ওর সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। কথা না বাড়িয়ে সরে এসেছিলাম। দিদির বিয়ের দু'দিন আগে ছোড়দা বাড়ী থেকে চলে গিয়েছিল। গিয়েছিল শ্যামবাজারে এক বন্ধুর বাড়ী। দিদি শ্বশুরবাড়ী চলে যাবার পর ফিরে এসেছিল। ওর বিদ্রোহ আমাকে নাড়া দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু বাড়ীর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানান সম্ভব হয় নি আমার পক্ষে। আমি ছোড়দার চেয়ে অনেক দুর্ব্বল। বিয়ের পরে দিদি কয়েকবার এসেছে, অজয়দাও এসেছেন সঙ্গে। ওদের মোটরের আওয়াজ পাবার সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ঘর ছেড়ে চলে গেছে বাইরে। হয় বাগানে, নয়ত অন্য কারও বাড়ীতে। তারপর দিদি একা এসেছে, তার ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে আমার কান্না পেয়েছে, কিন্তু ছোড়দার দয়া হয় নি। সে দিদিকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে নি। অথচ অজয়দার সঙ্গে ত বিয়ের দু'বছরের মধ্যেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে

দিদির। জব্বলপুরে একটা স্কুলে কাজ নিয়ে চলে গেছে সে। ছোড়দা তবু তার সম্বন্ধে এতটুকু কোমল হয় নি, বরঞ্চ বলেছে, "দিদি নিজের কাজের প্রতিফল পাচ্ছে। লোভ করলে এরকমই হয়।" ছোড়দার কথাগুলো মাঝে মাঝে বড় রসকষহীন ঠেকে। মনে হয়, বড় রূঢ়ও। আদর্শবাদ বজায় রাখতে গেলে কি এত নির্ম্মম হ'তে হয়, নিজের একান্ত আপনজন সম্বন্ধে এমন নিষ্করুণ অবজ্ঞা কি করে জাগল ওর মনে? ভুল দিদি করেছিল ঠিকই, কিন্তু তার ফলও ত পেল বেচারী হাতে হাতে। মরীচিকার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে গিয়েছিল, পেল শুধু মরুভূমির স্বাদ। একটা সন্তান পর্য্যন্ত হয় নি, শুধু উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর অত্যাচারের ক্ষত বহন করে এনেছে সর্ব্বাঙ্গে। তবু ছোড়দা তার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে নি, জানতেও চায় নি কিছু। আমাকে বলেছে, 'মানুষকে না চিনে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়াই বা কেন?' ছোড়দার কথায় সেদিন ঠিক সায় দিতে পারি নি। কোন ভুলই কারও পক্ষে বিচিত্র নয়। তার জন্য এত কঠিন হয়ে লাভ কি? মানুষকে কি সব সময় চেনা যায়?

মা ভেতর থেকে ডাকলেন, "শম্পা কই রে?" ভেতরে গেলাম। মা একরাশ মাছের চপ গড়ছেন। "শৌভিক ওর ক'জন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছে রাত্রে, আয় ত হাতে হাতে গড়ে দে।"

চপ গড়তে বসলাম। আবার ভাবনার ছিন্ন সূত্রটা জোড়া দিতে চাইলাম। মনে পড়ল নীলার কথা। নীলারা তখন প্রথম এসেছে আমাদের পাড়ায়, আমারই বয়সী ও। স্কুলেও এক ক্লাসেই ভর্ত্তি হ'ল। তখন আমি ক্লাস টেন-এ পড়ি। তের-চোদ্দ বছর বয়েস। নীলার সঙ্গে প্রথম দিনই বেশ অন্তরঙ্গ হ'লাম। প্রথমতঃ, দু'জনে এক পাড়ায় থাকি। দ্বিতীয়তঃ দেখলাম ও-ও রবীন্দ্রনাথের পরম-ভক্ত। তাজমহল কবিতার কথা বলতে গিয়ে জলজল করে উঠল ওর চোখ, কোন এক সময় কি আলোচনাসূত্রে বলল, কি অপূর্ব্ব লিখেছেন! "বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া আজও সে কি হয়নি বাহির?"

এরকম সঙ্গিনী আগে কখনও পাই নি। এ ধরনের আলোচনায় ছোড়দাই ছিল আমার একমাত্র সঙ্গী। শুধু সঙ্গী নয়, গুরু। বাগানের এক কোণে মোড়া পেতে বসে লিপিকা পড়ত ছোড়দা। ওর গলার স্বরে কি সম্পদ্ ছিল তা ভাষায় ব'লে বোঝান যায় না। আমার মনে হ'ত ওর স্বর যাদুকাঠি ছুঁইয়ে দিত সমস্ত প্রকৃতিতে। আকাশের তারা থেকে মাটির পৃথিবী পর্য্যন্ত সেই অনামা মন্ত্রের গুঞ্জরণে মুখর হয়ে উঠত। সেই স্বরের আভাস পেলাম নীলার কণ্ঠে, খুব ভাল আবৃত্তি করত নীলা। শুধু আবৃত্তি নয়, গানের গলাও ছিল তার। সবচেয়ে সুন্দর ছিল তার নাচ। ভর্ত্তি হবার দিনকয়েকের মধ্যেই স্কুলের অনুষ্ঠানে নাচতে দেখেছিলাম তাকে। মনে হয়েছিল ওর সর্ব্বাঙ্গে গানের অভিব্যক্তি। ওর দৃষ্টিতে সুগভীর আকুতি। ছোড়দাও গিয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে। ফেরবার পথে আমিই বললাম, "ভাল লাগল নীলার নাচ? ওই যে 'শাওন গগনে' নাচল?"

"হ্যাঁ"। আর বিশেষ কিছু বলল না ছোড়দা।

এর ক'দিন পরে ওর চন্দন-কাঠের বাক্সের ভেতরে এক নৃত্যরতার ছবি আবিষ্কার করেছিলাম, ছবিটা ছোড়দার আঁকা। রেখে দিলাম ছবিখানা। ছোড়দাকে এ নিয়ে কিছু বলি নি। এর আগে কখনও কিছু গোপন করে নি আমার কাছ থেকে। মনে মনে একটু ব্যথা পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে গর্ব্বও হ'ল। নীলা ত আমারই বন্ধু। তার নাচ এতখানি প্রেরণা দিল ছোড়দাকে! এর ক'দিন বাদেই নীলা আমাকে ওদের বাড়ীতে নিয়ে গেল। আগে কখনও যাই নি। বাড়ীটা খুবই ছোট। একখানা ঘর। তাতেই থাকেন নীলার বাবা-মা আর তার চারটি ভাইবোন। এরই মধ্যে সব বেশ পরিচ্ছন্ন। নীলার মা'র মুখের হাসিটি ভারী মিষ্টি লাগল। তাঁর শীর্ণ শিরাবহুল হাতের সস্নেহ স্পর্শ মনের মধ্যে গাঁথা হ'য়ে রইল। নীলা একখানা প্লেটে দু'টি বাদামের বরফি এনে দিল। ওর বোন শীলা এনে দিল একগ্লাস লেবুর সরবৎ। খাবার পর পেছনের উঠোনে মোড়া পেতে বসলাম দু'জনে। অনেক কথা হ'ল। নীলার গভীর কাল চোখদুটো কেমন বেদনার্ত্ত মনে হ'ল। স্পষ্ট ক'রে কিছুই বলে নি নীলা। কিন্তু মনে মনে বুঝেছিলাম ওদের বাড়ীতে কেউই সম্পূর্ণ সুখী নয়। একটা অস্বস্তির ছায়া ওদের ঘিরে রয়েছে সর্ব্বদা। পরে আস্তে আস্তে জেনেছিলাম ওদের ইতিহাস। নীলার বাবা একসময় ভাল চাকরিই করতেন। স্নেহপরায়ণ, মমতাময় মানুষ ছিলেন তিনি। কর্ত্তব্যে তাঁর ত্রুটি হ'ত না কখনও। কিন্তু হঠাৎ একবার কয়েকজন সহকর্ম্মীর চক্রান্তে তাঁর চাকরি গেল। তিনি নিরপরাধ ছিলেন। তারপর থেকেই একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। মদ ধরলেন, আনুষঙ্গিক নানা দোষ দেখা দিল। সামান্য একটা চাকরি নিলেন। কিন্তু তার সব টাকাটা নীলার মায়ের হাতে এসে পৌঁছত না। তাই চরম দৈন্যের মধ্যে দিন কাটত ওদের। নীলার হাতে কয়েক গাছা কাঁচের চুড়ি ছাড়া অন্য অলঙ্কার দেখি নি। সাধারণ সাদা

খোলের দিশী তাঁতের শাড়ী ছাড়া অন্য শাড়ীও বিশেষ পরত না সে। দু'এক সময় যখন রঙীন শাড়ী পরে আসত, তখন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম ওর দিকে। সত্যি! নীলাকে সব বেশেই এত মানায়। কে যে ওর নাম নীলা রেখেছিল, তাই ভাবি। পদ্মের আভা ওর সর্বাঙ্গে। কিন্তু সে ত নীল-পদ্মের নয়, শ্বেত-কমলের শুভ্রতায় দীপ্তিময়ী ও। ওর মা মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলতেন আমাকে, "এত রূপ নিয়ে কি হবে শম্পা? এ-রূপ দেখলে আমার ভয় করে। মেয়েটা ঠিক ওর বাপের মত দেখতে। ওঁর মতই স্বভাব। এমনিতে হাসছে, গান করছে। আবার বড্ড চাপা। শেষকালে হয়ত ওঁরই মত···' কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসত নীলার মা'র গলার স্বর।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে চপ গড়া শেষ হয়ে গিয়েছে খেয়ালই ছিল না···মা-ই তাড়া লাগালেন, "এই, হ'ল তোর? এবার যা. গা ধুয়ে নে।" সত্যিই বড্ড গরম লাগছিল, তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে চলে গেলাম। স্নান সেরে ওপরে গেলাম শোবার ঘরে। ছোড়দার চিঠিটা নিয়ে চন্দন-কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখলাম। যাবার আগে এটা আমাকে দিয়ে গেছে ছোড়দা। ওর সবচেয়ে প্রিয় ছিল এই সুরভিত কাঠের বাক্সটি। ছোটবেলায় এর ওপর আমার বড় লোভ ছিল। না চাইতেই অনেক কিছু দিত ছোড়দা। কিন্তু এই বাক্সটা দিতে পারে নি। এর মধ্যে সে তার চিঠিপত্র রাখত। যাবার আগে বাক্সটার সব স্বত্ব ত্যাগ করে দিয়ে গেছে। খুলতেই সেই পরিচিত মৃদু গন্ধ এল নাকে। বাক্সের মধ্যে কয়েকটা চিঠি, ফটো, শুকনো ফুল, রঙীন কাগজ, ঝিনুক। চিঠিগুলো খুললাম, প্রায় সবই নীলার লেখা। একবার বাড়ীশুদ্ধ সকলে দীঘা বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন নীলা অনেকগুলো চিঠি লিখেছিল।·· ছোড়দা সেবার যায় নি। এখানেই ছিল। সে-সময় নীলার ছোটভাই নিতু ওর কাছে পড়তে আসত। সেই সূত্রে ওদের বাড়ীতে গিয়েছিল ছোড়দা। তখন লিখেছিল আমাকে—"তোর বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। ভাল লাগল। তোর কাছেই শুনেছি, নীলার বাবার চরিত্র-দোষ আছে। কিন্তু তবু তাঁকে অশ্রদ্ধা করতে পারলাম না। এঁর সঙ্গে অজয় রায়ের কোন মিল নেই। এ হ'ল আত্মধিক্কারের প্রতিফল। তারপর যত নীচে নেমেছেন, নামটাই সত্য হয়ে গেছে। ধ্বংসের উন্মত্ততা পেয়ে বসেছে তাঁকে।' সেদিন নীলার বাবাকে নিয়ে ছোড়দার দার্শনিক বিশ্লেষণের অর্থটা ঠিক বুঝি নি। আসলে যে এটা ওর নিজের মনের কাছেই জবাবদিহি, তা ত বুঝি নি তখনও।

দীঘা থেকে ফিরে এলাম। দূর থেকে বাড়ীর বাগানটা নজরে পড়ল, দেখলাম কৃষ্ণচূড়ার ডালে রক্তিমার আভাস। ছোড়দা ষ্টেশনে আসেনি। মনে মনে সেজন্য একটু রাগ হয়েছিল। বাড়ীতে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম। দেখি, পড়ার টেবিলের সামনে বসে তন্ময় হয়ে কি পড়ছে ছোড়দা। আরও রাগ হ'ল, বিরক্তি গোপন করে উদাস স্বরে বললাম, "কত ঝিনুক এনেছি, তোকে একটাও দেব না"।

ঝিনুকের ভাগ নেওয়া সম্বন্ধে এতটুকু ঔৎসুক্য দেখলাম না ওর। অন্য সময় হ'লে এতক্ষণে কাড়াকাড়ি সুরু করত। অগত্যা কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম। দেখি একটা নীল কাগজ ওর হাতে, তাতে লেখা—

আমার প্রেম গোলাপ সম উঠুক ফুটে
বসন্তেরই শ্যামল সরস পত্রপুটে,
আমার প্রীতি উছল সুরের ঝর্ণা ধারা,
মধুরতায় গভীরতায় আপনহারা।

হাতের লেখাটা পরিচিত। আমি উঁকি মেরে দেখছি দেখে ছোড়দা কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলল, ওই বার্ণসের কবিতার কটা লাইন, নীলা অনুবাদ করে আমায় দেখতে দিয়েছে। বলতে বলতে কাগজটা ভাঁজ করে ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিল। তারপর অকারণেই আঁচড় কাটতে লাগল খোলা খাতাটার ওপরে। নীলা কবিতা লেখে সে খবরটা জানা ছিল না। আমার আগে ব্যাপারটা ছোড়দা আবিষ্কার করেছে দেখে বলা-বাহুল্য একটুও খুশী হ'লাম না। কিছু না বলেই ছোড়দার টেবিলের কাছ থেকে সরে এলাম। অনেক গল্প জমা হয়েছিল, দীঘার সমুদ্রের অপরূপ বর্ণনা। কিছুই বলা হ'ল না। ওখানে তোলা আমার ক্যামেরার প্রথম ছবিগুলো ব্যাগের মধ্যেই রয়ে গেল। সেদিন বিকেলে নীলা এল, নিতুর হাত ধরে। দেখলাম এরই মধ্যে বেশে বাসে অনেক বদল হয়েছে তার। সাদা শাড়ীটা আর নেই। ঘন নীলরঙের শাড়ী পরেছে একখানা। নীলা আমাকে দেখে মিষ্টি হেসে এগিয়ে এল। বলল, 'আমার ঝিনুক কই?' দু'হাত বাড়াতেই আমি ঝিনুকের ভাণ্ডার উজাড় করে দিলাম ওর হাতে। ছোড়দার জন্য একটাও রাখলাম না। লক্ষ্য করলাম, কাঁচের চুড়িগুলি নেই ওর হাতে। তার বদলে দু'খানা হাতীর দাঁতের বালা। ছোড়দা বাড়ীতেই ছিল, বেরিয়ে এল একটু পরে। নিতুকে ডেকে বারান্দার একধারে

মোড়া পেতে বসল। একমনে দেখতে লাগল নিতুর ট্রানশ্লেশনের খাতা।

নীলাই বলল, "ছাদে যাবি?"

দু'জনে ছাদে গেলাম। নীলাকে কেমন অন্যমনস্ক মনে হ'ল। আলসেতে হেলান দিয়ে ও দূরের আকাশটাকে একমনে লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখেছিস, কেমন একটা একটা করে তারা ফুটছে। আকাশটাকে এমন সুন্দর মানিয়েছে। তা না হ'লে তারাদের কি এত সুন্দর দেখাত?'

"এটা কি তোর নূতন আবিষ্কার নাকি? আজকাল বুঝি খুব কবিতা লিখছিস্?"

"কবিতা ত অনেককাল আগে থেকেই লিখি। নূতন কিছু ত নয়।"

"কই, আমি ত কখনও দেখি নি।"

"দেখাব। আমাদের বাড়ী যাস্।"

কেন জানি সেদিন কথাবার্ত্তা এগোচ্ছিল না একটুও। বড় অন্যমনস্ক হ'য়ে যাচ্ছিল নীলা। কোন আলোচনাই জমল না। দীধার কথা তাকেও বলা হ'ল না। খানিক বাদে নীলাই বলল, "আজ যাই শম্পা। কাল কলেজে দেখা হবে।"

নীচে নামতেই দেখি ছোড়দা দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ পরে ছোড়দা আমার দিকে ভাল ক'রে তাকাল। বলল, "চল্ না শম্পা, ওদের এগিয়ে দিয়ে আসি।" এতক্ষণে যা ভাল করে বুঝতে পারছিলাম না, সেটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল চোখের সামনে। বললাম, "না, তুমিই যাও। আমার বড্ড মাথা ধরেছে।" আমাকে অনুরোধ করাটা যে শুধু ভদ্রতা, তা ওর গলার স্বরেই বুঝেছিলাম।

এরপর থেকে অবশ্য আর কোন কিছুই গোপন রাখে নি ওরা আমার কাছে। আমি ছিলাম সেতু। নীলা আর ছোড়দার যোগসূত্র। ছোড়দা তখন ফিফ্থ ইয়ারে পড়ে। আমরা থার্ড ইয়ারে। কলেজ থেকে ফেরার পথে প্রায়ই দেখা হ'ত ছোড়দার সঙ্গে। লক্ষ্য করতাম, নীলাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই তার সারাদিনের ক্লান্ত ম্লান মুখখানা কিসের গোপন আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। ট্রামে অজস্র ভিড়, নানা ধরনের লোকজন, পরিবেশটায় এতটুকু মাধুর্য্য থাকত না, কিন্তু তবু তারই মধ্যে কখন কোন্ জানলার ফাঁক দিয়ে গোধূলির রক্ত-আলোর দীপ্তি দু'টি হৃদয়কে রাঙিয়ে দিয়ে যেত। সত্যি, আমারও ভারী ভাল লাগত। ভাবতাম, ছোড়দা এতদিনে তার মনের মত সঙ্গিনী পেয়েছে। ওর সবতাতেই ত বাড়াবাড়ি, আদর্শ নিয়ে মাতামাতি করে সব সময়। এ যুগে ওর মনের মতন কাউকে পাওয়াই যাবে না ভেবেছিলাম। কিন্তু নীলা সত্যিই ওর যোগ্যা। ওর বাবা অবশ্য ওদের জীবনে একটা কালো ছায়ার মত জড়িয়ে আছেন। কিন্তু তবু সেই কালিমা নীলার কোথাও লাগে নি। সে নির্ম্মল। তার রুচি, বুদ্ধি, কাব্যপ্রীতি সবের সঙ্গেই ছোড়দার আশ্চর্য্য মিল। আগে ভাবতাম, ছোড়দা যদি বিয়ের পরে ছাদে ব'সে কবিতার বই পড়ে, আর তার বউ কোমরে কষে কাপড় জড়িয়ে ছ্যাঁচড়া রাঁধতে বসে, বাজারটা তেমন ভাল আনা হয় নি ব'লে সারাদিন ঘ্যানঘ্যান করে, তা হ'লে কি হবে? সংসারে ঢুকলে ছ্যাঁচড়ার তরকারি কোটাটা বাদ দেওয়া যায় না, সে কথা ছোড়দাও জানে। কিন্তু যে মেয়ে কাব্যরস বোঝে না, যার কোন এসথেটিক্ সেন্স নেই, সে শত রন্ধনপটু হ'লেও ছোড়দার জীবনে তার স্থান নেই।

সুন্দরী সম্বন্ধে কোনদিন কোন মোহ ছিল না ওর। রুচির প্রতি ছোড়দার চিরন্তন আকর্ষণ। তার মনের মধ্যে তিল তিল করে যে মূর্ত্তিটা গ'ড়ে উঠেছিল, তার পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা শক্ত। নীলার সঙ্গে সে মূর্ত্তির এতটুকু তফাৎ নেই, সে কথাও বলা চলে না। কিন্তু মিল অনেকটাই ছিল, বাস্তব আর কল্পনায় চিরকালই ব্যবধান থাকে। নীলা ছাড়া আর কেউ ছিল না কাছাকাছি, যে ছোড়দার মনে সাড়া জাগাতে পারে। লেখাপড়ায় নীলা একেবারে অসাধারণ ছিল একথা বলা চলে না, কিন্তু সাধারণের চেয়ে অনেক উর্দ্ধে ছিল তার স্থান।

পড়ার বইয়ে খুব যে একটা মনোযোগ ছিল তা নয়, কাব্যের মায়ালোকে ঘুরে বেড়াত তার মন। ইংরেজী সাহিত্যও পড়ত। পড়তে ভালবাসত খুব। কিন্তু পাঠ্য বই নিয়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারত না। একই কথা বারবার পড়ার ধৈর্য্য ছিল না তার। অথচ লাইব্রেরী থেকে আনা বায়রণ আর কীট্সের কবিতাগুচ্ছ বারবার পড়তে অদ্ভুত ভাল লাগত ওর। মাঝে মাঝে দর্শনের তত্ত্বালোচনাও পড়ত। বৈষ্ণব-কাব্যের সুর-ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তার তথ্য ও তত্ত্ব কিছুই বাদ দিত না। ভারতবর্ষের কোটি কোটি দেব-বিগ্রহ সম্বন্ধে তার আগ্রহ অপরিসীম, মনে-প্রাণে তাঁদের ভক্তি করে সে।

এই একটা ব্যাপারেই বোধ হয় ছোড়দার সঙ্গে তার কোন মিল ছিল না। ছোড়দা কোনকালে দেবদেবীর ধার ধারত না, খুব হাল্কাভাবেই উড়িয়ে দিত সব। বলত, "ভক্তির তিলক-আঁকা যতজনকে দেখেছি, তারা হয় নিজেরা বোকা নয়ত বোকাদের ঠকিয়ে খাচ্ছে।"

নীলা ছিল ঠিক তার উল্টো। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সে তার রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের জন্য মালা গাঁথতে বসত। স্নান সেরে নিত তার আগে। মায়ের গরদের ছেঁড়া শাড়ীটি গুছিয়ে পরত। কতদিন দেখেছি, গুনগুন ক'রে গান গাইতে গাইতে আমাদের বাড়ীর বাগানে ফুল তুলতে এসেছে নীলা। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে না, হরিনামের মহিমা ফুটেছে ওর স্বরে। কপালে চন্দনের টিপ। কোঁকড়া চুলের রাশে পিঠের আধখানা ঢাকা। একদিন ছোড়দাকে বলতে শুনেছি, "সকালবেলা এ বেশে তোমায় দেখতে বড় ভাল লাগে। কিন্তু এর মধ্যে শুধু এই বেশ-টুকুই সত্য, আর ত কিছুই খুঁজে পাই না।" নীলা কোনদিন তর্ক করে নি, কিন্তু মনে মনে বুঝতাম, ছোড়দার এ কথাটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি। ছোড়দাকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। কিন্তু তার পূজার ব্যাপারে কারও হস্তক্ষেপ ওর ভাল লাগত না।.........আবার ভাবনা-সূত্র ছিঁড়ে গেল। নীচে বড়দার গলার আওয়াজ পাচ্ছি। ওর বন্ধুরা বোধ হয় এসে গেছে। আমাকে এবারে যেতে হবে নীচে। নেমে গেলাম একতলায়। বারান্দায় সবাই মিলে বসেছে। ঘরের মধ্যে রূপোর ছোট্ট থালায় একরাশ বেলফুল। আরেকটা সন্ধ্যা স্পষ্ট হোল চোখের সামনে। বেলফুলের মালা জড়িয়েছিলাম খোঁপায়, নীলার শত আপত্তি সত্ত্বেও তার খোঁপায় জড়িয়ে দিয়েছিলাম মালা। মোড়া পেতে বসেছিলাম ছাদে, ছোড়দাও এল। ওর হাতে চীনেবাদামের ঠোঙা। চোখ দুটো হাস্যোজ্জ্বল। নীলার দিকে তাকাল, মুগ্ধতা ফুটল ওর দৃষ্টিতে। অপরূপ এই সন্ধ্যার নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ। বেলফুলের গন্ধ জড়িয়ে ছিল হাওয়ায়, দূরে কাদের ঘরে নিয়ন লাইট জ্বলছিল। সব মিলিয়ে একটা আশ্চর্য্য অনুভূতি জাগল। মনে হ'ল, ওদের মনের কথা কি আমার সামনে তেমন করে বলা চলবে? তার চেয়ে উঠে পড়া ভাল। নীলা কিছুতেই উঠতে দেয় নি, আঁচল চেপে ধরে রেখেছিল। অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল, সাহিত্যে রসবিকার নিয়ে আলোচনাটা জমে উঠল। ছোড়দাই বলছিল, যার পরিণতি সুন্দর নয়, সার্থক নয়, যার মধ্যে কোন প্রেরণা নেই, যে শুধু মনকে হাল্কা রঙের খেলায় ভোলায়, অগভীর উন্মাদনায় মাতায়—সে সাহিত্য মূল্যহীন। যার পরিণতি আনন্দে, অমৃত সঞ্চয় যার কোষে কোষে, যার মধ্যে অনুপ্রেরণা আর গভীর আবেগ—সেই ত সার্থক সাহিত্য। ছোড়দাই আবার বলল, "কে যেন একবার বলেছিলেন, 'মদনের বেশে দেখা দেন নি মহেশ্বর, তাঁর ভস্মময় অগ্নি মূর্ত্তিতেই মোহিত হয়েছিলেন উমা'।" কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই নীলা হাসল। আমি চুপি চুপি বললাম, ঠিক তোর দশা।

নীলা মুখ নীচু করে আবার একটু হাসল।

ছোড়দা কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমার কথাটা ওরও কানে পৌঁছেছিল। মৃদু হাসল সে। ভাবতে ভাবতে খাবার ঘরে এসে পৌঁছলাম, মা'র নির্দ্দেশানুযায়ী টেবিলটা সাজালাম। ফুলদানিতে একগুচ্ছ রক্ত গোলাপ, ধবধবে সাদা চাদর, উপুড় করা চীনেমাটির প্লেট, কাঁচের গ্লাসে জল।

একে একে সবাই এসে খেতে বসলেন। খাবার সময় কত গল্প, হৈ হৈ। আমার মন কিন্তু এদিকে ছিলনা। বারে বারেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম। সবার খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকতে চুকতে প্রায় সাড়ে নটা বাজল শোবার ঘরে ঢুকেও কিছুতেই ঘুমোতে ইচ্ছে করল না। টেবিলে এসে বসলাম চিঠির প্যাড আর কলমটা নিয়ে। ছোড়দাকে একটা চিঠি লিখব ভাবলাম। কিন্তু এক লাইনও লিখতে পারছি না। সেই হারানো দিনের স্মৃতি সার বেঁধে দাঁড়াল চোখের সামনে। আবার ফিরে গেলাম অতীতে।

ছোড়দার সঙ্গে নীলার বিয়ে হবে, একথা বাড়ীর সকলেই জানতেন। ওদের সঙ্গে জাতের অমিল থাকা সত্ত্বেও বাবা-মা'র কোন আপত্তি ছিল না। নীলাকে সকলেই ভালবাসতেন, ওর মা'র সঙ্গে আলাপ করেও সবাই খুশী হয়েছিলেন। বাবার ব্যাপারটাও জানতেন, কিন্তু সে নিয়ে প্রথমে একটু আপত্তি উঠলেও, পরে ব্যাপারটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। ছোড়দার বেপরোয়া স্বভাবের কথা সকলেই জানতেন। ও যদি কাউকে চায়, তাতে বাধা দিয়েও কোন ফল হবে না, সে কথা বুঝতেন তাঁরা। তা ছাড়া পিতার দোষে কন্যাকে অপরাধিনী করা চলে না। অতখানি অনুদার নন আমার বাবা-মা। ছোড়দার পরীক্ষা হয়ে গেলেই বিয়ে হবে এরকমই ঠিক ছিল। ওর চাকরির জন্য কারও কোন ভাবনা ছিল না, পরীক্ষার ফলাফল ওর চিরকালই ভাল হয়। একটা প্রফেসারী যে করে হোক জুটে যাবেই।

পরীক্ষার মাসখানেক আগে ছোড়দা হঠাৎ আমার পড়ার ঘরে এসে হাজির। তখন নীলা বিশেষ আসত না, পরীক্ষার জন্যই ওরা দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ রেখেছিল। মাঝে মাঝে চিঠি লিখত। ছোড়দার হাতে একটুকরো

কাগজ, বলল, পড়ে দেখ। এর আগে নীলার কোন চিঠি আমাকে পড়তে দেয় নি ছোড়দা। সম্বোধনবিহীন দু'টি ছত্র—"মা'র গুরুদেব এসেছেন চন্দননগরে। আমি আর মা যাচ্ছি। সাতদিন পরে ফিরব।" চিঠিটা পড়ে ছোড়দার মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম, সেই লুকোন আগুনের আভাটা আবার যেন দেখা দিচ্ছে ওর চোখে। মনে মনে নীলাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, পাথরের পুতুল নিয়ে ছিলি, তাই ত। এর ওপর আবার জীবন্ত মানুষ নিয়ে পুজো কেন? নীলা কি জানে না ছোড়দা কোন কালেই গুরুপূজা সইতে পারে না।

সাতদিন পরে নীলার মা ফিরে এলেন। খবর পেয়েই গেলাম ওদের বাড়ী। শুনলাম, নীলা আসে নি। ও নাকি গুরুদেবের সেবায় লেগেছে। চন্দননগরে তিনি আরও দিন ছয়েক থাকবেন। তারপর আসবে নীলা। কথাটা ছোড়দাকেও জানালাম। কিন্তু এ নিয়ে আমার সঙ্গে একটি কথাও বলল না সে। সাতদিন বাদে নীলা এল। বাইরে থেকে ওর পরিবর্ত্তন বিশেষ বোঝা গেল না। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে একদিনও এল না আর, কলেজেও আমাকে এড়িয়ে গেল। ছোড়দাও আর যায় নি ওদের বাড়ী। আমাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করে নি। অথচ ওর মুখ দেখেই বুঝতাম, অন্তরে অন্তরে ও কতখানি বেদনার্ত্ত। কিন্তু এও জানতাম, শত বেদনাতেও ছোড়দা পরাজিত হবে না কিছুতেই। নীলা যতদিন নিজে থেকে কিছু না বলবে ততদিন নীরবই থাকবে সে। তাকে লুকিয়েই একদিন নীলাদের বাড়ী গেলাম। নীলা অন্যদিনের মতই হেসে অভ্যর্থনা করল। তবু আগেকার সেই দীপ্তিটা যেন খুঁজে পেলাম না, চোখের নীচে ক্লান্তির ছায়া। বসলাম ওর পাশে। হাতে সেই হাতীর দাঁতের বালা দু'টি নেই। নিরাভরণ শুভ্র হাত দু'খানা কোলের ওপর তুলে নিলাম। বললাম, "চুড়ি খুলেছিস কেন? যোগিনী হবি নাকি?"

"তাই ত ইচ্ছে মনে মনে।" একটু হাসলো ও।

বললাম, "তবে আমার ছোড়দার মন কেন ভোলালি? এখন আর ফাঁকি দেওয়া চলবে না।"

এ কথার কোন জবাব দিল না ও। চোখের ক্লান্তির ছায়া আরও গাঢ় হ'ল। কথায় কথায় গুরুর কথা তুললাম। গুরুর নাম স্বামী সেবানন্দ। বয়েস বেশী নয়, সবে চল্লিশ পেরিয়েছে। চমৎকার গানের গলা, যখন কথামৃত পাঠ করেন, মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়। মনে মনে ভাবলাম, এরই মধ্যে মহুয়ার কবিতা পাঠ ভুলে গেল নীলা? মাস দু'য়েক আগে ইউনিভার্সিটির আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় 'আফ্রিকা' কবিতায় কে প্রথম হয়েছে, সে কথা কি ওর মনে নেই? সে সময় ওর মুগ্ধ দৃষ্টি ত আমিও দেখেছি। বলেছিল, 'কি অপূর্ব্ব বলে শমীক। শেষ হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ ধরে কানের কাছে বাজতে থাকে ওর গলার স্বর।' আর আজ কোথাকার কোন সেবানন্দ! তার পাঠে এমন কি সুধা পেল নীলা? ওর এই অদ্ভুত উন্মাদনার অর্থ বুঝলাম না। গুরুভক্তি এর আগেও অনেক দেখেছি, মেয়েদের মধ্যে এ উন্মাদনাটা বেশী, এও জানি। আমাদের দেশের শতকরা নব্বই ভাগ মেয়ে নানাভাবে বঞ্চিত। স্ত্রীরা স্বামীদের কাছে অনেক সময়ই কিছু পায় না। সংসার সন্তানসন্ততি সবই আছে, কিন্তু তবু মনের কোন আকাঙ্ক্ষাই মেটে না। নিরুত্তাপ, বর্ণহীন জীবনের গ্লানিতে সমস্ত জীবন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন একটু উত্তেজনা চায় মন, যাতে সহজে অবসাদ থেকে মুক্তি মেলে। অন্য মুক্তির পথ অধিকাংশেরই জানা নেই। আপাত-পবিত্র সহজতম পথ ভক্তিরসে (বা ভাবালুতায়) আপ্লুত হওয়া। ঠাকুর ঠাকুর খেলার মধ্যে বঞ্চিত মনের সব তৃষ্ণা মেটানো। অতৃপ্ত জীবনের সব আকাঙ্ক্ষা এই নেশাতেই পরিতৃপ্ত। পাথরের প্রতিমার চেয়ে অধিকতর কাম্য সজীব বিগ্রহ। সেখানে শুধু দান নয়, প্রাপ্তির আশাও কিছু থাকে। সেই প্রসাদ-টুকুতেই উন্মাদনা জাগায়, মনের ক্লান্তি ঘোচায়। আমরা অবশ্য চিরকাল এই গুরুপূজার ব্যাপার নিয়ে হাসাহাসি করেছি। বাবা অত্যন্ত র‍্যাশনাল লোক। মা-ও ওসব মানেন না। ফলে আমরা কিছুই মানি না। লোকে আড়ালে আমাদের পরিবারকে নাস্তিক বলত।

আজ নীলাকে দেখে অবাক লাগল, ও ঠাকুর-পুজো করে—সে কথা জানতাম। ভগবানে আমিও বিশ্বাস করি। কিন্তু মানুষ পুজোর নেশা ওকে পেয়ে বসবে, এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি। ওর জীবনে আবার অতৃপ্তি কোথায়? ছোড়দার মত ছেলের ভালবাসায় যার জীবন ধন্য হয়ে গেছে, সে ত স্বর্গ পেয়েছে মুঠোর মধ্যে। এমন মানুষকে সর্ব্বস্ব বলে পাওয়া ত রাজৈশ্বর্য্য। অথচ অদ্ভুত মোহের নেশায় তাকেই অবহেলা করছে নীলা। সেদিন নীলার উপর খুব রাগ হয়েছিল। বেশীক্ষণ থাকি নি, চলে এসেছিলাম। এর পরও কিন্তু নীলা নির্ব্বিকার। ছোড়দার দিকে তাকাতে পারতাম না আমি। বাইরে থেকে তার মনের কথা বোঝা অসম্ভব। কিন্তু তার

দীপ্ত চোখের ওপর বেদনার ছায়াটা ত আমার চোখ এড়াত না। সেই বছরই তার এম. এ. পরীক্ষা। সারাদিন ঘরে বসে পড়াশুনা করত, মাঝে মাঝে দেখতাম, জানলা দিয়ে বাগানের দিকে চেয়ে আছে। যেখানে মাধবীলতার সাদা ফুলে অজস্র মৌমাছির ভিড়। শিউলির মৃদু গন্ধে উন্মনা ভোরের বাতাস। সেই-দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে ছোড়দা। নীলার উপর প্রচণ্ড রাগ হ'ত। ও যে এ ভুল কেন করছে? একদিন কলেজে গিয়ে শুনলাম নীলা আসে নি। ও নাকি দমদমে গেছে। সেখানে সেবানন্দের জন্মোৎসবে মহাধুম। সেই উৎসবে কীর্ত্তন গাইবে নীলা। সেদিন বিকেলেই নীলাদের বাড়ী গেলাম, ওর মায়ের কাছেও মনের ক্ষোভ চেপে রাখতে পারলাম না। ছোড়দার সঙ্গে নীলার সম্পর্ক ওর মা'র অজানা নয়। দেখলাম নীলার মা-ও এই বাড়াবাড়িতে খুব অসন্তুষ্ট। বললেন, "বলেছিলাম না ও ওর বাপের স্বভাব পেয়েছে। যা-কিছু করবে চূড়ান্ত করে ছাড়বে। ও হতভাগীর কপালে অনেক দুঃখ আছে।" গুরুদেব পর্য্যন্ত বলেছেন, "তুমি এ পথে এস না। তোমার অল্প বয়েস, এখন মন দিয়ে লেখাপড়া কর, তারপর সংসার-ধর্ম্ম। সময় হ'লে আমি নিজেই ডাকব। তখন দীক্ষা নিও।" নীলা কিছুতেই সে কথা শোনে নি। এক অদৃশ্য মোহজাল ওকে ঘিরে ধরেছে। কি করব ভেবে পেলাম না। সে বছর আমাদেরও বি. এ. পরীক্ষা। দু'এক মাসের মধ্যেই টেষ্ট হ'ল। নীলা শেষ পর্য্যন্ত পীরক্ষাই দিল না। সেবানন্দও তাকে অনেক করে বলেছিলেন পরীক্ষা দিতে, নীলা শোনে নি। সে তাঁর পায়ের কাছে বসে তন্ময় হয়ে কীর্ত্তন শোনে। দিক্ষাও নিয়েছে তাঁর কাছে। এর মধ্যে আরেকদিন রাস্তায় দেখা, বললাম, "তুই কি 'চতুরঙ্গে'র শচীশ হলি নাকি? যা সুরু করেছিস!" নীলা কথাটার কোন জবাব দিল না। আস্তে আস্তে চলে গেল। এরপরে নিতুর হাতে একখানা চিঠি পাঠাল আমার কাছে।

শম্পা,

আমাকে ক্ষমা করিস। এ ব্যাপারে শমীকের সঙ্গে আমার একেবারে মেলে না। তার পরীক্ষা, তাই তাকে এ ক'দিন আর বিরক্ত করি নি। মিছিমিছি মন খারাপ হবে। কিন্তু আমার মন সত্যিই বিশ্বাসে মগ্ন হয়েছে শম্পা। গুরুদেবের আকর্ষণকে কিছুতেই তুচ্ছ করতে পারছি না। সত্যিই তিনি অতুলনীয়। তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি, দয়া কিছুরই তুলনা হয় না। তাঁর কাছ থেকে নেবার অনেক আছে। আর তাঁর গান! শুনলে নিজেকেও ভুলে যেতে হয়। তুই ত জানিস গান আমার কতখানি প্রিয়। সেই সুরের দেবতাকে তাঁর মধ্যে পেয়েছি। এমন জায়গায় আত্ম-সমর্পণ না করে পারা যায়? কিন্তু শমীক ত আমার কোন কথাতেই সায় দেবে না। তার এ-সবে বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া সে ভয়ানক জেদী, তা না হলে দু'জনে মিলে দীক্ষা নিতে পারতাম, আর সেটাই ত সবচেয়ে ভাল হ'ত। আমি এর মধ্যে ইমোশনাল কিছু খুঁজে পাই না, একজন মানুষের মধ্যে সর্ব্বোত্তম যদি কিছু থাকে, তাকে শ্রদ্ধা করব না? সে-পথে যদি মুক্তি মেলে, তা হ'লে কেন দু'হাত বাড়াব না সেদিকে? আমি বিশ্বাস করি, কোন কোন মানুষ দেবতার অংশে জন্মায়, সেই দেব-শক্তি তাঁর আছে। তাই আমি তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছি। জানি শমীক আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না। গুরু সম্বন্ধে ওর তীব্র বিতৃষ্ণার কথা আমি জানি। ওর কাছে ওর বিশ্বাস বোধ হয় ভালবাসার চেয়েও বড়। আমি কি করব, কিছুই বুঝতে পারছি না। তোর কাছে বলতে দ্বিধা নেই শমীকের প্রতি ভালবাসা একতিলও কমে নি আমার। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে মেলাতে পারছি না। কি করব বলে দে?"

চিঠিটা পড়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। কি করব বুঝতে পারি নি। শেষ পর্য্যন্ত ছোড়দাকেই দেখিয়েছিলাম চিঠি-খানা। পড়তে পড়তে প্রথমটা ছোড়দার মুখের ছায়াটা আরও গাঢ়তর হয়েছিল, শেষের দিকে দেখলাম মুখের সে কাঠিন্য আর নেই। অনেকদিন পর তার চোখের সেই দীপ্ত হাসিটা আবার ফিরে এসেছে। দরকার হ'লে ছোড়দা যে কতখানি নির্ম্মম হ'তে পারে, সে ত দিদির ব্যাপারেই দেখেছি। এক্ষেত্রে কিন্তু তার দৃঢ়তার বন্ধন শিথিল হ'ল। চিঠিটা পড়ার পর সব অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে নীলাদের বাড়ী গেল সে। আমিও গেলাম খানিক বাদে। দেখি তরমুজের সরবৎভরা গ্লাস ওর হাতে তুলে দিচ্ছে নীলা। অনেক দিন পর ছোড়দার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল দেখলাম। এতদিনের সব ক্ষোভ মুছে গেল মন থেকে। ঘরের ভেতর গিয়ে দেখি নীলার মায়ের মুখখানাও হাসি হাসি।

সব মিলিয়ে ভারী ভাল লাগল। সেদিনের পর থেকে ছোড়দা প্রায়ই যাওয়া সুরু করল ওদের বাড়ী। ওর তখন M. A. পরীক্ষা হয়ে গেছে। প্রচুর অবকাশ। ছোড়দার সেই হাসি আবার শোনা যেতে লাগল। কবিতার সুর ভেসে আসতে লাগল কানে। স্নানের ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে গান ধরে। সব মিলিয়ে ছোড়দাকে আবার

নতুন করে ফিরে পেলাম যেন। এতদিন সব কিছুকে যেন চাপা দিয়ে রেখেছিল। শুনলাম ছোড়দার অনুরোধে নীলা আবার পড়াশুনা সুরু করেছে, আগামী বছর পরীক্ষা দেবে। ছোড়দা রোজ তাকে পড়ায়। একদিন আমাকে ডেকে বলল, "নীলার ও সমস্ত ভক্তি আমি ভাঙবই। আমি প্রতিদ্বন্দ্বী সইতে পারি না। সে যে রকমেরই হোক না কেন। আমি ছাড়া ও আর কারও জন্য মন-প্রাণ ঢেলে দেবে, তা হবে না। তখন কি জানত ছোড়দা প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে ঈপ্সিতাকে হরণ করা চলে কিন্তু এযে ভক্তির অবরোধ। স্বেচ্ছাবন্দিনীকে মুক্ত করা কি সম্ভব?

ছোড়দার সঙ্গে নীলার সম্বন্ধ আবার আগের মত সহজ হয়ে উঠল। সেই সন্ধ্যায় ছাদে বসে কবিতা পড়া, গান শোনা, মাঝে মাঝে বেরিয়েও পড়ত ওরা। কোলকাতার বাইরে, কোনদিন ডায়মণ্ডহারবার, কোনদিন বা শিবপুর বটানিকাল গার্ডেন্‌সে। নীলাকে এবারে জন্মদিনে আমার মা একখানা ঢাকাই শাড়ী দিয়েছিলেন, সবুজ রঙ, গায়ে জরির বুটা। সেই শাড়ীখানা প্রায়ই পরত ছোড়দার সঙ্গে বেড়াবার সময়। আরও সুন্দর লাগত ওকে। আমিই মুগ্ধ হয়ে যেতাম। ছোড়দা ত বিভোর। কিন্তু তবু নীলা একটা জিনিষ লুকিয়েছিল ছোড়দার কাছে। সেবানন্দের কাছে যাওয়াটা সে ছাড়াত পারে নি। প্রায়ই দুপুরে যেত বিকালের মধ্যে ফিরে আসত। একদিন ধরা পড়ে গেল। সেদিন মা আর বাবা ব্যারাকপুরে মামার বাড়ী গেছেন। আমাদের একটু তাড়াতাড়িই চা খাওয়া হয়ে গেছে। বাগানে এসে বসলাম, কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায়। ছোড়দাও এল। ওর হাতে একখানা বই। হঠাৎ দেখি সামনের রাস্তা দিয়ে নীলা আসছে। ছোড়দা ঠিক লক্ষ্য করেছে। সে বই বন্ধ করে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল, ডাকল, "নীলা, শোন।" নীলা এগিয়ে এল। তার পরণে একখানা পাড়বিহীন গরদের শাড়ী। নিরাভরণ অঙ্গ। কপালে চন্দনের টিপ।

ছোড়দা প্রশ্ন করল "কোথায় গিয়েছিলে?"

নীলার সঙ্গে কথা বলবার সময় যে কণ্ঠ মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে, সে স্বর এত কঠিন শোনাল। নীলার মুখও বেশ গম্ভীর। "সব কৈফিয়ৎ কি তোমাকে দিতে হবে?

"হ্যাঁ, এদিকে শোন।"

রাস্তায় তখন বেশী লোক ছিল না। এমনিতেই এ গলিতে লোক-চলাচল কম। ছোড়দা শক্ত করে নীলার হাত চেপে ধরল। আস্তে আস্তে তাকে নিয়ে এল বাগানের মধ্যে। নীলার দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল তার দেহে কোন স্পন্দন নেই। আমি সামনের বারান্দায় উঠে দরজার আড়ালে সরে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে স্পষ্ট শুনলাম ছোড়দার গলা।

"জানি তুমি কোথায় গিয়েছিলে। একটা মানুষকে পূজো করতে লজ্জা করে না তোমার?"

"লজ্জা করার কোন কারণ নেই। তিনি শ্রদ্ধার যোগ্য।"

"শ্রদ্ধার যোগ্য ত একদিন আমাকেও মনে করো।"

"করতাম। কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে সে শ্রদ্ধা আর রইল না। যে মানুষকে সে আসনে বসিয়েছিলাম, তার সঙ্গে তোমার কোন মিল নেই। এত হিংসে কেন তোমার? তোমাকে ত এমন কখনও ভাবি নি।"

হাত ছেড়ে দিল ছোড়দা। বলল, "এই তোমার শেষ কথা নীলা? সব ভুলে গেলে? আমাদের এতদিনকার সম্বন্ধের মধ্যে কোন কিছুই কি মনে রাখবার মত নয়? শেষ পর্য্যন্ত একটা গুরুর মোহে—"

"মোহ মোটেই নয়। তাঁকে আমি ভক্তি করি। তাই বলে সংসার-ধর্ম্ম করব না, সে কথা ত একবারও বলি নি। আমার নিজস্ব মতামত বলে কি কিছুই থাকবে না? এ তোমার অন্যায় দাবী।

"তুমি ত জানো নীলা, গুরুবাদ আমি মানি না। এখন আমরা দু'জন আছি। বিয়ের পরে সংসার হবে, তারপর শুধু দু'জন থাকব না—যাদের আনব তারা কি বিশ্বাস করবে আমাকে বলে দাও। আমাদের দু'জনের মতের দ্বন্দ্বই ত দেখবে তারা। কোন বিশ্বাস গড়বে না। আর তা ছাড়া এ বিশ্বাসের মধ্যে সত্যি ত কিছুই নেই নীলা। কেন তুমি একটা পুরণো পচা জিনিষকে আঁকড়ে রয়েছ। এটা ত তোমারও জেদ।"

"তুমি তোমার কোন কিছুই তিলমাত্র ছাড়বে না। আর চাইছ আমি আমার ভক্তি-বিশ্বাস সব ত্যাগ করি।

"আমি কি কিছুই ছাড়ি নি নীলা? নিজেকেই ত তোমার হাতে দিয়েছি। আর কি চাও? মিথ্যা, অন্যায় একটা জিনিষ তাকে আঁকড়ে থাকাটা তোমার কাছে আমার চেয়েও বড় হ'ল?" ছোড়দার গলার স্বরটা বড় করুণ শোনাল।

নীলা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, "গুরুদেব ত মানুষ হিসেবে যথেষ্ট বড়। ভাল কাজ করেন, কত সেবা-প্রতিষ্ঠান খুলেছেন শিষ্যদের

টাকায়। চমৎকার পাঠ করেন, শাস্ত্রব্যাখ্যা করেন, ভাল কথাও বলেন। এর মধ্যে অন্যায়টা কোথায়?"

আবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ছোড়দার গলার স্বর, "ভাল কথা? তুমি-আমি কি ভাল কথা বলি না? তা ব'লে পোজ্ করব কেন? ধরে নিলাম তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে। তাই বলে সমাজ-সংসার সব বিষয়ে নির্দ্দেশ দেবার অধিকার পেয়ে গেছেন তিনি? আর লোকে তাকেই আদেশ বলে মাথা পেতে নিচ্ছে? কেন, আমরা কি ভাবতে পারি না?" একটু থেমে খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইল তারপর বলে উঠল, "টাকা দেন। বুঝলাম তিনি মহাদাতা। কিন্তু মানুষের মুক্তির পথ যে পুরোপুরি বন্ধ করে দেন। সমস্ত বোধ-বুদ্ধি ভাসিয়ে নিয়ে যান। এর মত জঘন্য পাপ..." আর বলতে পারল না গলার স্বর ক্রোধে অবরুদ্ধপ্রায়।

নীলা এরপর চুপ করেই ছিল। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কি বলল শুনতে পেলাম না। শুধু দেখলাম ছোড়দার একখানা হাত ওর কোলের ওপর তুলে নিয়েছে। আঙ্গুলের ওপর আঙ্গুল বোলাচ্ছে। ছোড়দার কণ্ঠস্বরও মৃদু, আমার কানে আর কিছুই পৌঁছল না। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলল দু'জনে। আমি আর থাকি নি কাছাকাছি। উপরে চলে গিয়েছিলাম।

পরদিন বিকেলে ছোড়দা নিজেই বলল, 'চল, একবার নীলাদের বাড়ী যাই।' মনে মনে বুঝলাম কালকের তর্কটা নেহাতই মৌখিক। ওদের সম্বন্ধের গ্রন্থি তেমনই অটুট আছে। দু'জনে বেরোলাম। নীলাদের বাড়ী ঢোকার আগে কীর্ত্তনের সুর কানে এল। ঢুকে দেখি ঘরে অনেক লোকের ভিড়। সকলে তন্ময়চিত্তে গান শুনছে। একজন সুপুরুষ গেরুয়াবসনধারী সন্ন্যাসী গান গাইছেন। বুঝলাম, ইনিই নীলার আরাধ্য গুরুদেব। গানের গলাটি মধুর। "চতুরঙ্গের" লীলানন্দ স্বামীকে মনে পড়ল। আমি আর ছোড়দা মিলে কতবার যে বইখানা পড়েছি। ছোড়দা পড়েও শুনিয়েছে আমাকে। বইটি তার বড় প্রিয়।

ঘরে ঢুকে আমরা দরজার কাছাকাছি বসে পড়লাম। সামনে ভাল করে তাকিয়ে দেখি সেবানন্দের অত্যন্ত সন্নিকটে বসে আছে নীলা। ঘরের সব জিনিষ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সেবানন্দের সামনে বড় একখানা রূপোর থালায় এক রাশ শ্বেতপদ্ম। থরে থরে ফল সাজানো। ধূপের সুরভিত ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘরের বাতাস। ঘরে নানাধরনের লোকের ভিড়। শুধু এ পাড়ার নয়, অপরিচিত অনেক মুখও দেখলাম। নারী পুরুষ সবই আছে। বাড়ীর সামনে দু'একখানা গাড়ীও দেখেছি। আমাদের কলেজের দু'তিনজন অধ্যাপিকাও এসেছেন। মোড়ের মাথায় প্রফেসার মিত্র অমিতাভ থাকেন। গত-বছর ডক্টরেট পেয়েছেন। তিনিও সেবানন্দ স্বামীর কাছেই বসে আছেন। দু'চোখ ভাবাবেশে নিমীলিত। শুনেছি ইনি একখানা বইও লিখেছেন সেবানন্দ সম্বন্ধে। আর আছেন সোমনাথ সাহা। নামকরা ব্যবসায়ী। শুনেছি কালোবাজারে অনেক টাকা করেছেন। তিনি সবচেয়ে কাছে বসে। গলায় সোনার হার। ইনি নাকি অনেক টাকা দান করেছেন। সেবানন্দের পাশে কয়েক-খানা বেনারসী শাড়ী রাখা আছে। শিষ্য শিষ্যাদের সকলেরই নিমীলিত চোখ। কারও কারও চোখ দিয়ে জল পড়ছে। মুখে ভক্তি-গদগদ ভাব। কেউ কেউ সেবানন্দের পায়ের কাছ ঘেঁষে বসেছে। মাঝে মাঝে হাতটা মাথায় ঠেকাচ্ছে। সেবানন্দ গান গাইতে গাইতে থালা থেকে ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন। সমবেত ভক্ত-মণ্ডলী ভক্তিভরে তুলে নিয়ে কপালে ঠেকাচ্ছে। গুরুর প্রসাদ ফুল বলে মেয়েরা আঁচলে বাঁধছে, ছেলেরা পকেটে রাখছে। নীলাকেও দেখলাম, নিমীলিত দুই চোখ। সেই সাদা গরদ পরণে। হাত জোড় করে বসে আছে। ছোড়দা আমার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল,—"দেখছিস ত এঁদের দশা। ভগবানের কথা চিন্তা করবে কখন? মানুষকে নিয়ে পড়ে আছে। তাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে দিয়েছে, তিনিই হাত ধরে মুক্তির পথে নিয়ে যাবেন।" ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণতর হ'ল তার স্বর। "আসল কথা, সত্যিকার ভগবানের দিকে হাত বাড়াতেও সাহস হয় না। এত ছোট এরা।" আমি মনে মনে সন্ত্রস্ত হ'লাম। কথাগুলি যদি কারও কানে যায়। ছোড়দার মুখের দিকে তাকাতেও ভয় করল। কীর্ত্তন থামার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে গুঞ্জন উঠল। "বাবা, আরেকখানা করুন।" "কি চমৎকার, অপূর্ব্ব!" এই ধরনের প্রশংসাধ্বনিও কানে এল। নীলা একবার চোখ খুলে তাকাল। আমাদের দেখতে পেল না। তার দৃষ্টি ভাবাবেশে আচ্ছন্ন।

সেবানন্দ আবার গান ধরলেন। কথাগুলো পরিচিত লাগল। কিন্তু সুরটা একেবারে অন্য রকম। মনে হ'ল কথাগুলোকে নিজের সুরে ঢেলে গাইছেন। অন্যের গান বিকৃত সুরে গাওয়া ছোড়দা একেবারেই সইতে পারে না। দেখলাম ওর মুখ ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠছে। মনে মনে ভাবলাম, নীলাও ত সুর সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ। সে এ ব্যাপারটাকে মেনে নিচ্ছে কি বলে?

যিনি গান রচনা করলেন, প্রাণ ঢেলে সুর দিলেন, যে সুর গানের প্রাণ, সেই প্রাণটিকে কেড়ে নিচ্ছেন সেবানন্দ, অথচ নীলা নির্বিকার চিত্তে সয়ে যাচ্ছে সব। সে কি ভক্তিতে অন্ধ, এমন কি বধির হয়ে গেছে? গাইতে গাইতে সেবানন্দ গলার মালাটি ছুড়ে দিলেন সামনে, নীলা দু'হাতে তুলে নিল সেটি, ভক্তিভরে মাথায় ঠেকাল। ছোড়দার দিকে আড়চোখে তাকালাম। মনে হ'ল একটা পাথরের মূর্ত্তিতে পরিণত হয়েছে ও। দেহে কোন স্পন্দন নেই। সেবানন্দের গান থেমে গেছে ততক্ষণে। এবার তিনি নীলাকে গাইতে বললেন। নীলা দু'হাত জোড় করে গান ধরল,—গানটি অপরিচিত। গুরুদেবের মহিমা সঙ্গীত। কেউ বোধ হয় সেবানন্দের প্রতি ভক্তি-পরবশ হয়ে লিখেছিল। মনে পড়ল মাস কয়েক আগেকার একটি সন্ধ্যা। বাগানে বসে আছি আমি আর নীলা। নীলা গাইল "তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়……" ছোড়দাও এসেছিল খানিকবাদে। সেদিনই বলেছিল নীলা, "সুর আর ভাব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আর কারও গানের সঙ্গে কি তুলনা হয়?" সেই গান আজ কোথায় হারিয়ে গেল?…

ছোড়দা আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াল না। হনহন করে বেরিয়ে এল বাইরে। আমিও সঙ্গে গেলাম। সারাপথ তার সঙ্গে একটিও কথা হ'ল না। বাড়ী গিয়ে খবর পেলাম, ছোড়দা পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছে।

নামজাদা কোন কলেজ থেকে চাকরির ডাকও এল দিন কয়েকের মধ্যে। কিন্তু এত আনন্দেও তেমন করে সুর বাজল না। উৎসব-সমারোহের অনেক কল্পনাই ছিল মনে, সব শেষ হয়ে গেল।

ছোড়দা শেষ পর্য্যন্ত লিখেই জানাল নীলাকে। চিঠিটা আমাকেও দেখিয়েছিল। লিখেছিল, "তোমাকে গুরুভক্তির কবল থেকে মুক্ত করবই, এই ছিল আমার পণ। বিফল হ'লাম। তবু আশা ছাড়িনি। যদি কোন দিন মুক্ত হ'তে পার, জেনো আমি তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছি।"

সে চিঠির জবাব পায়নি ছোড়দা। এর কয়েক দিনের মধ্যেই মধ্যপ্রদেশের সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়ে চলে গেল ছোড়দা।

বাড়ীর সকলেই তার ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন। কি একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করে বিয়ে ত করলই না, তার ওপর আবার দেশছাড়া হবার দরকার ছিল কি? ছোড়দার ব্যাপারটাকে সকলেই বাড়াবাড়ি মনে করেছিল। আমি কিন্তু রাগ করতে পারি নি—ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারি নি সামান্য বলে। নীলাকে না পাবার বেদনা কত গভীর হয়ে বেজেছে ছোড়দার মনে, সে ত একমাত্র আমিই জানি। কিন্তু যে নীলাকে এতদিন ধরে পেতে চেয়েছিল, সে নীলার সঙ্গে আজকের নীলার মিল কোথায়? এ অমিলটুকুকে স্বীকৃতি দেওয়া ছোড়দার পক্ষে অসম্ভব। সে সব সময় বলেছে, "ও ধরনের কম্প্রোমাইজের মধ্যে আমি নেই। অন্যায়কে কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারবনা।

টেবিলে বসে ছোড়দাকে চিঠি লিখতে গিয়ে আবার পড়লাম ওর চিঠিখানা। নীলার কথা কিছু জানতে চায় নি, কিন্তু জানবার জন্য যে কতখানি উৎসুক, সে ত আমি জানি। তবু জানানো হ'ল না। কত কথাই মনে পড়ছে, ওর ব্যথা কি সত্যিই মুছেছে? প্রথম লাইনটা লিখে কেটে দিলাম। কথাটা ওকে কিছুতেই লিখতে পারব না। অথচ সেই কথাটাই সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। কোনদিন ওর কাছে কিছু লুকোই নি। কিন্তু আজ এ কথাটা লেখা চলবে না কোনমতেই। কলম চলছে না। অন্য কথা লিখতে গিয়ে সেই কথাটাই মনে পড়ছে বারে বারে। আজ গানের স্কুলে গিয়ে খবরটা পেয়েছি। নীলাদের পাশের বাড়ীর মীরার কাছে। নীলার বিয়ে ঠিক হয়েছে। সেবানন্দের মনোনীত পাত্র। তাঁর এক শিষ্যার পুত্র, ব্যবসা করে, লাখ টাকার সম্পত্তি, একটি ধানকল ও কাপড়ের দোকান আছে। এ ছাড়া প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক। এ যুগে নাকি এধরনের ভক্তি সহজে চোখে পড়ে না। পরিবারের সকলেই সেবানন্দের পরম ভক্ত। মেয়েকে নাকি দেখেনওনি তাঁরা। সেবানন্দের কথাতেই রাজী। নীলা সেবানন্দের প্রিয় শিষ্যা। সেজন্য আপত্তি করবার কোন কারণও ঘটে নি। নীলাও মত দিয়েছে। এবারে আর কোন বাধা নেই তার। •

রবীন্দ্রনাথের "রাজা"

অধ্যাপিকা আভালতা কুণ্ডু

রাজা নাটকের ঘটনাপ্রবাহ—

নাটকের প্রথম দৃশ্যে দেখি বসন্ত পূর্ণিমার সন্ধ্যায় রাজার আগমনের প্রত্যাশায় রাণী সুদর্শনা অপেক্ষমানা। রাণী যে গৃহে অবস্থান করছেন সেটি একটি অন্ধকার কক্ষ —রাজপ্রাসাদের কোন্ বিশেষ অংশে এই কক্ষটি আছে রাণী নিজেও তা জানেন না। তাই দাসী সুরঙ্গমাকে জিজ্ঞাসা করছেন—"বল্ তো এটা আছে কোথায়?"

সুরঙ্গমা বললেন—"এঘর মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরি। তোমার জন্যেই রাজা বিশেষ করে করেছেন।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই দ্বারদেশে আবির্ভাব হ'ল রাজার। অন্ধকার ঘরের দাসী সুরঙ্গমা—রাজাকে তার অচলা ভক্তি। অন্ধকারের মধ্যেই রাজার আবির্ভাব সে অনুভব করে। সুদর্শনা কিন্তু অন্ধকারে দিশেহারা। রাজার ব্যাকুল আহ্বানেও দ্বার খুলে দিতে তাঁর চরণ ওঠে না। দাসী সুরঙ্গমাই তখন দ্বার খুলে দিয়ে মিলনের সুযোগ রচনা করে দিয়ে প্রস্থান করে।

নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে রাজার কথাবার্তায় ফুটে ওঠে সুদর্শনার প্রতি তাঁর গভীর প্রেম। রাণী যে রাজাকে চোখে দেখতে চান। রাজা বার বার করে তার এই চোখে দেখার নেশাকে সংযত করতে চাইলেন। বললেন—"আলোয় তুমি হাজার হাজার জিনিষের সঙ্গে মিশিয়ে আম'কে দেখতে চাও? এই গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হয়ে থাকি না কেন?"

কিন্তু রাণী বুঝলেন না। চোখে দেখা তাঁর চাই-ই। বললেন—"আমাকে দেখা দিতেই হবে।"

শেষ বারের মত সাবধান করে দিয়ে রাজা বললেন—"সহ্য করতে পারবে না—কষ্ট হবে।"

তবুও মানলেন না রাণী—অন্তরের ধনকে তাঁর চোখে দেখা চাই।

তখন রাজা বল্লেন—"আজ বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপরে দাঁড়িয়ো—চেয়ে দেখো—আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা ক'রো।"

সুদর্শনা—"তাদের মধ্যে দেখা হবে ত"—

রাজা—"বার বার করে সকল দিক থেকেই দেখা দেব।"

দাসী সুরঙ্গমা এ-সংবাদ শুনে চমকে উঠল। যাঁকে চোখে দেখে সহজে চেনবার নয়—যিনি অন্তরের অন্তরতম, তাঁকেই রাণী দেখতে চান হাজার লোকের লুকোচুরির মধ্যে। রাণীকে সাবধান করে সে বলে উঠল—"রাণী তোমার কৌতূহলকে শেষে কেঁদে ফিরে আসতে হবে।" রাণী সে সাবধানবাণী শুনেও শুনলেন না।

দ্বিতীয় দৃশ্যে বসন্তোৎসবের সমারোহ। এই উৎসবে ছিল সবারই নিমন্ত্রণ—তাই দেশীয়দের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বিদেশীরাও। বিদেশীরা রাস্তা চেনে না, জানে না উৎসবটা ঠিক কোন্‌খানে হচ্ছে। পথ জিজ্ঞাসা করাতে প্রহরীরা বললে—"এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যেদিক দিয়ে যাবে—ঠিক পৌঁছে যাবে। সামনে চলে যাও।"*

বিদেশীরা ঠিক বোঝে না—এ আবার কেমনতরো পথ বাতলানো? তাদের দেশে ত পথ সম্বন্ধে নানান কড়াকড়ি—পথঘাট এত বাঁকাচোরা যে পথ খুঁজে পাওয়াই কঠিন। শাস্ত্রের বিধান মানতে গিয়ে ওদেরই একজনের বাবা শাস্ত্রমতে গণ্ডি কেটে ঠিক উনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই জীবন কাটিয়েছিলেন। এ দেশের ধরন-ধারণ এদের কাছে বড়ই অদ্ভুত লাগে।

বিদেশীদের পিছনেই আছেন ঠাকুর্দা আর তাঁর বালকের দল। ঠাকুর্দা রাজার সখা—রাজার সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। জীবনের সুখেদুঃখে আর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তিনি রাজাকে জেনেছেন নিবিড় করে। রাজার সাযুজ্য লাভে তিনি ধন্য—রাজা তাঁর কাছে পরমপূজ্য পিতার মত, আবার পরমপ্রিয় বন্ধুও। বালকের দল গান ধরল—

---

* পরমাত্মার সাথে মানবত্মার মিলনের যে চিরন্তন বসন্তোৎসব তাতে সব পথই সমান (যত মত তত পথ)—প্রহরী কি একথাই বলতে চেয়েছিল?

"আজি দখিন দুয়ার খোলা
এসো হে এসো হে এসো হে
আমার বসন্ত এসো।"

কিন্তু এই বসন্তোৎসবের কেন্দ্রে যিনি, তাঁকে ত কই দেখা গেল না? তিনি কোথায়? তাঁকে চোখে দেখার জন্য প্রায় সকলেই উৎকণ্ঠিত। রাণী সুদর্শনার মত দেশী-বিদেশী অনেকেই তাঁকে চোখে দেখবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু এ-রাজা যে রাজার রাজা! তিনি ত সকলের চোখ ধাঁধিয়ে কোনদিনই দেখা দেন না।

রাজাকে না দেখে নানান জনে নানা কথা সুরু করে দিলে। কেউ বললে রাজার বিকট চেহারা, তাই তিনি দেখা দেন না। কেউ বললে—আসলে রাজাই যে নেই ত দেখা দেবে কে?

সংশয়ের এই প্রচণ্ড আবর্তে আসল তত্ত্বটি জানতেন শুধু দু'জন—ঠাকুর্দা আর বাউল। ঠাকুর্দা সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। এই বসন্তোৎসবের রাজা যে বিশ্বরাজ! তিনি সবার অন্তরে থেকেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন—কোন বিশেষ স্থান-কালপাত্রে ত তাঁকে ধরা যাবে না! তিনি বললেন, রাজাকে খুঁজে বেড়ানই ত ভুল। তিনি তাঁর রাজসত্তা আমাদের সকলের মধ্যেই বিলিয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁকে বাহিরে খোঁজা মিথ্যে। বললেন সুরে সুরে—

"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলবো কী সত্ত্বে।
আমরা সবাই রাজা!"

বাউলও শোনাল ঐ একই সুরের কথা। তার অন্তরের অনুভূতি সে ছড়িয়ে দিল গানে গানে—

"প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল স্থানে।"

কিন্তু বলার লোক মিললেও শোনবার মত তৈরী কাণ মিলল না। ঠাকুর্দা ও বাউলের কথার শ্রোতা মিলল না। সংশয় তাই বেড়েই চলল।

এই সুযোগে নিজেকে রাজা বলে জাহির করে বসল রাজবেশী সুবর্ণ। তার গঠন সুন্দর—কাঁচা সোনার মত গায়ের রং, তাঁর ধ্বজায় কিংশুক ফুল আঁকা।* সাধারণ লোকে দেখে বললে "রাজার মত চেহারা বটে।" রাজ-প্রসাদ লাভের আশায় চারিদিকে ভিড় জমে উঠল। নকলরাজা সকলকেই ভোলালেন, পারলেন না শুধু ঠাকুর্দা ও বাউলকে। ঠাকুর্দা জানেন তাঁর রাজা কখনও পথের লোকের চোখ ধাঁধিয়ে বেড়ান না—দেখবার চোখ যাদের আছে শুধু তাদেরই চোখে ধরা পড়ে তাঁর অনাড়ম্বর নীরব আবির্ভাব। ঠাকুর্দা তাই বললেন—"ওরে, আমার রাজা কি কখনো পথের লোকের চোখ ধাঁধিয়ে বেড়ায়?" কিংশুক ফুলের ধ্বজা উড়িয়ে যে বেরিয়েছে সে যে মেকি রাজা তা তিনি জানেন। তিনি বললেন—"আমার রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা।" সার্থক কল্পনা ঠাকুর্দার। রাজার রাজা যিনি, তাঁর প্রতীক এর থেকে সুন্দর আর কি হ'তে পারে? তিনি যে বজ্রাদপি কঠোর আর কুসুমাপেক্ষাও মৃদু।

কিন্তু ঠাকুর্দার কথা শুনলে না কেউ—রাজবেশী সুবর্ণের অনুচর সংখ্যা বেড়েই চলল। ঠাকুর্দা সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে সরে এলেন কুঞ্জবনের দ্বারদেশের দিকে। বাউল ধরল গান—

"প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল স্থানে।"

তৃতীয় দৃশ্যের প্রারম্ভে কুঞ্জবনের দ্বারে উপস্থিত ঠাকুর্দা ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। বসন্তোৎসবের পালা সুরু হয়েছে। গানে গানে মুখরিত হ'ল উৎসব প্রাঙ্গণ।

"আজি কমল মুকুল দল খুলিল!
দুলিল রে দুলিল!"

এদিকে আবার উৎসব-মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন অবন্তী, কোশল, কাঞ্চী প্রভৃতির রাজাগণ। এ সংসারে ধনজন-খ্যাতি যারা মানুষকে ভুলিয়ে রেখে তার মনকে কিছুতে ঈশ্বরাভিমুখী হ'তে দেয় না—এই রাজারা সম্ভবত তাদেরই প্রতীক। এই রাজারাও এসেছিলেন সেদিন-কার বসন্তোৎসবে যোগ দিতে। এঁরাও অন্বেষণ করে ফিরছিলেন এদেশের রাজাকে। কিন্তু রাজাকে দেখার আশা যখন দুরাশা বলে বোধ হ'ল তখন এ-দেশের রাণীকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের পেয়ে বসল। রাজগণের সঙ্গে পথেই দেখা হ'ল ভণ্ডরাজ সুবর্ণের। রাজবেশী সুবর্ণের মেকি সহজেই ধরা পড়ল বুদ্ধিজীবী সুচতুর কাঞ্চীরাজের চোখে। ধরা পড়ে সুবর্ণ পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু আপন আপন কার্য-সিদ্ধির আশায় রাজগণ তাকে কপট রাজার ভূমিকায় বহাল রাখলেন। তারপর সকলে মিলে প্রবেশ করলেন কুঞ্জবনের অভ্যন্তরে।

* ফুল হিসাবে কিংশুকের কোন গৌরব নেই। বরং গন্ধহীন ও বর্ণ সর্বস্ব বলে সে অপাংক্তেয়। রাজা মেকি—তাই তার প্রতীক কিংশুক।

ঠাকুর্দা রয়ে গেলেন কুঞ্জবনের দ্বারে। তাঁর সঙ্গে রইল যত অকিঞ্চনের দল। ওরা সবাই মিলে ধরলে গান—সর্বহারার গান—

"মোদের কিছু নাই রে নাই
আমরা ঘরে বাইরে গাই
তাইরে নাইরে না—'

* * *

যারা সোনার চোরাবালির পরে
পাকাঘরের ভিত্তি গড়ে—
তাদের সামনে মোরা গান গেয়ে যাই
তাইরে নাইরে না।"

উৎসবের কুঞ্জবনের সামনের পথে নানা লোকের ভিড়। দলে দলে লোক আসছে। একদল স্ত্রীলোক এল—ঠাকুর্দার সঙ্গে ওদের মিষ্টি রসিকতার সম্পর্ক। ঠাকুর্দা ওদের এগিয়ে দিলেন কুঞ্জবনের পথে। তারপরে এল নাচের দল। ওরা মনোহর নৃত্যের তালে তালে গেয়ে গেল গান—

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তা তা তাথৈ তা তা তাথৈ তাতা তাথৈ—

দলে দলে লোক এল আর গেল—উৎসবের অঙ্গনে লোকে লোকারণ্য। কিন্তু রাজার দর্শন পেল না তারা যাদের নেইক দিব্যদৃষ্টি। রাজা আছেন কি না আছেন সে তর্কের হ'ল না শেষ। পর পর পাঁচটি পুত্রের মৃত্যু-শোক বুকে নিয়েও ঠাকুর্দা কিন্তু তাঁকে চিনেছিলেন। সেদিনকার উৎসবের সব সুরই তাই তাঁর কাছে ঐকতানের মাধুরীতে ভরে উঠল—বেসুরো লাগল না কিছুই। যে বসন্তরাজের চরণতলে ফোটা ফুলের পাশে ঝরাফুল একই মহিমায় মণ্ডিত—সুবোধ ছেলের পাশে অবোধ ছেলেকে যিনি একই ক্রোড়ে স্থান দিয়েছেন, সেই রাজাধিরাজের প্রসাদধন্য ঠাকুর্দা—তাই তাঁর দুই চোখে আনন্দের অশ্রু টলমল করে উঠল।

চতুর্থ দৃশ্যে দেখি প্রাসাদ-শিখরে দণ্ডায়মানা রাণী সুদর্শনা ও তাঁর সখী রোহিণী। উৎসবের জনসমারোহের মধ্যে রাণী দেখেছেন সুবর্ণকে। তার চটুল রূপের মোহে রাণীর দুই চোখ বাঁধা পড়ল। তাকেই তিনি 'তার রাজা' বলে ভুল করে বসলেন। দাসী হ'লেও রোহিণীর মনে সংশয় জেগেছিল কিন্তু আপন বুদ্ধির অহঙ্কারে রাণী সুদর্শনা নিঃসংশয়ে ভুল করে বসলেন। সুরঙ্গমা সেদিন রাণীর পাশে ছিল না—তাই তেমন করে সাবধানও করলে না কেউ। রাণী রোহিণীর হাত দিয়ে তাঁর কণ্ঠের পুষ্পহার উপহার পাঠালেন সুবর্ণকে। বলে দিলেন, "কিছুই বলতে হবে না—এই মালাটি দিলেই আমার সব কথাটি বলা হবে।" কিন্তু রোহিণী ফিরে এলে আপনার ভুল বুঝলেন রাণী। সুবর্ণ পুষ্পহার পেয়ে কিছুই না বোঝার ভঙ্গিতে তাকিয়ে ছিলেন শুধু। কাঞ্চী-রাজ বলে দেওয়াতে তবে বুঝতে পারেন যে এ মালা রাণী সুদর্শনার দেওয়া। সুবর্ণ রোহিণীর হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন বহুমূল্য রত্নহার—কিন্তু এও সেই কাঞ্চী-রাজেরই পরামর্শে। সুদর্শনা সব শুনে বুঝতে পারলেম তাঁর ভুল। আত্মগ্লানিতে ভরে উঠল তাঁর মন—। কিন্তু সুবর্ণের সুবর্ণকান্তি রাণীর মনকে ভুলিয়েছিল—তিনি পারলেন না—তার দেওয়া রত্নহার দূরে ফেলে দিতে।

পঞ্চম দৃশ্যে উৎসবের রাত গভীর হয়েছে। ঠাকুর্দা তখনও ছিলেন কুঞ্জবনের দ্বারে দাঁড়িয়ে যেন "কি এক সর্বনাশের আশায়।" প্রায় সব লোক যখন উৎসবের রঙে রাঙা হয়ে ফেরার পথে তখন ঠাকুর্দা প্রবেশ করলেন কুঞ্জবনে। কুঞ্জবনের একপ্রান্তে সাত রাজায় মিলে তখন ষড়যন্ত্রে মত্ত। রাণীর প্রাসাদ-সংলগ্ন করভোদ্যানে আগুন লাগিয়ে এঁরা কার্যসিদ্ধির আশায় ছিলেন। ঠাকুর্দা নেপথ্যে দাঁড়িয়ে এদের সব কথাই শুনেছিলেন—তাই দেখতে পেয়ে সাত রাজায় মিলে তাঁকে বন্দী করে রেখে দিলে।

ষষ্ঠ দৃশ্যে করভোদ্যানে আগুন লাগাবার পূর্বাহ্নে বিপদের আভাস পেয়ে রাজার বিশ্বস্ত অনুচরেরা উদ্যান ত্যাগ করে চলে গেলেন। রাণীর সহচরী রোহিণী দ্বিধায় পড়ে পিছিয়ে পড়েছিল। কোশলরাজ আর অবন্তীরাজের সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ হ'ল। ওঁরাও পড়েছেন দ্বিধায়। করভোদ্যানের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন না পথ। রোহিণীর মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল। চারিদিকে কি এক অদ্ভুত ভয়ার্ততা! দিগন্ত হঠাৎ হয়ে উঠল লাল। রোহিণী তখন পথ খুঁজছে বাইরে যাবার। কিন্তু পথ খুঁজে পাওয়া যে দায়!

সপ্তম দৃশ্যে রাণীর প্রাসাদদ্বারে সমুপস্থিত রাজবেশী সুবর্ণ ও কাঞ্চীরাজ। আগুন তার লেলিহান শিখায় চারিদিক করেছে আবৃত। যেটুকু আগুন তাঁরা লাগাতে চেয়েছিলেন এ যে তার শতগুণ হয়ে জ্বলে উঠল। অগ্নি-কাণ্ডের মধ্যে তাঁরাও পথভ্রান্ত। এমন সময় কোথা হ'তে ছুটে এলেন রাণী সুদর্শনা। সামনেই সুবর্ণকে দেখে বলে উঠলেন—"রক্ষা করো রাজা, রক্ষা করো।" কিন্তু সুবর্ণই যে তখন রক্ষা পেলে বাঁচে! সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে সে

করল অকপট স্বীকারোক্তি—"আমি রাজা নই সুদর্শনা—আমি রাজা নই।"

সুবর্ণ ছুঁড়ে ফেলল তার ছদ্মরাজআভরণ। রাণী সুদর্শনা ম্লান হয়ে গেলেন অসহ্য লজ্জায় বেদনায়। তার মনে হ'ল এ-লজ্জার গ্লানি বহন করার থেকে তাঁর মৃত্যু ভাল। "ভগবান হুতাশন, গ্রাস করো আমাকে"—এই বলে তিনি আগুনে ঘেরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন আত্মবিসর্জন করবার উদ্দেশ্যে। সখী রোহিণী বাধা দেবার চেষ্টা করলেন—রাণী শুনলেন না সে নিষেধ।

৮ম দৃশ্যে দেখি রাণী রক্ষা পেয়েছেন অলৌকিকভাবে। আগুন তাঁকে গ্রাস করে নি। রাজার অযাচিত স্নেহ তাঁকে ঘিরেছিল সেই সর্বনাশের চরম মুহূর্তে। কিন্তু পরিত্রাণ পেলেও রাণীর ক্ষোভ অশান্ত। নিভৃত কক্ষে রাজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাণী অসঙ্কোচে ব্যক্ত করলেন তাঁর আত্মগ্লানির কথা। বললেন—

"রাজা, আমি ভুল করেছি। গ্রহণ করেছি অন্যের হাতের মালা। এই লাঞ্ছিত জীবন নিয়ে আজ আমি কি করবো?"

রাজা কত বোঝালেন—সান্ত্বনার স্নিগ্ধ স্পর্শে রাণীকে করতে চাইলেন শান্ত—কিন্তু রাণী বুঝলেন না। তাঁর মনের মধ্যে রাজার যে ছবিটি ছিল—সেদিনকার প্রলয়ের মুহূর্তে দেখা রাজার মূর্তিটি মেলে নি তার সঙ্গে। অভিমানে রাণী দূরে সরে যেতে চাইলেন। রাজার সব মিনতি ব্যর্থ হ'ল। জোর ক'রে রাণীকে ধরে রাখতে হয়ত তিনি পারতেন। কিন্তু জোর করে কিছু করবার রাজা ত তিনি নন। যিনি রাজার রাজা, মানুষের প্রেমের ভিখারীরূপে তিনি বরং সহস্র বৎসর অপেক্ষা করে থাকবেন কিন্তু আপনা হ'তে না দিলে তিনি ত কিছুই জোর করে আদায় করবেন না! তাঁর সমস্ত সূর্য-গ্রহ-তারকা যে নিয়মে চলে সেই নিয়মের বাইরে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাটুকুকে তিনি যে দিয়ে রেখেছেন লাখেরাজ সত্ব! তাই সুদর্শনা যখন রাজগৃহ ত্যাগ করলেন, তখন রাজা তাঁর পথ রোধ করলেন না—বললেন—"হাওয়ার মুখে ছিন্ন মেঘ যেমন করে চলে যায় তেমনি অবাধে চলে যাও তুমি।"

সুদর্শনা চলে গেলেন পিতৃগৃহে—কান্যকুব্জে। সেখানেও রাণীর অলক্ষ্যে রাজার অগাধ স্নেহ তাঁকে রইল ঘিরে। তাঁর অপার করুণার সাক্ষীরূপে চির-বিশ্বাসিনী সুরঙ্গমা গেল রাণীর সঙ্গে।

৯ম দৃশ্যে কান্যকুব্জরাজের গৃহে সুদর্শনার দুঃখের দিন হ'ল সুরু। কন্যার আগমনে পিতা সুখী হন'নি। কুলত্যাগিনী কন্যা পিতার মুখ লজ্জায় অবনত করে দিলে। পিতৃগৃহে সুদর্শনা আশ্রয় পেলেন—কিন্তু কন্যার গৌরবে নয়। দাসীত্বের অগৌরবের মধ্যে তাঁর দিন কাটতে লাগল।

১০ম দৃশ্যে কান্যকুব্জরাজের অন্তঃপুরে রাণী আর তাঁর দাসী সুরঙ্গমা। রাণী পতিগৃহ ছেড়ে এসেছেন—কিন্তু ভুলতে পারছেন না তাঁর রাজাকে। ব্যথায় আর অভিমানে তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ। পিতৃগৃহে তাঁর লাঞ্ছনার দিনগুলি এমনি নিভৃতে একটি একটি করে খসে পড়বে—এ তিনি সইতে পারছেন না। রাণীর মহৎ গৌরবের আসন থেকে তাঁর খসে পড়া সে কি শিউলি ফুলের খসে পড়ার মতই তুচ্ছ হবে? রাণীর আরও দুঃখ এই ভেবে যে, তিনি একাই এত দুঃখ ভোগ করছেন। কই রাজা ত একবারও এলেন না? সুরঙ্গমা বোঝায় রাণীকে—সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। বলে—"তুমি একলা না রাণী—তুমি একলা না।" বলে তোমার সাথে তোমার অলক্ষ্যে তিনি আছেন, যাঁর তুমি চির-অপরিত্যাজ্যা! সুদর্শনার মন মানে না—রুদ্ধ আক্রোশে মরে মাথা কুটে!

এমন সময় মাঠের পরে ধুলো উড়িয়ে কারা যেন অভিযান করে আসছে দেখা গেল। সুদর্শনা দেখলেন অভিযাত্রীদের পুরোভাগে তাঁর পরিচিত কিংশুক-ধ্বজা। বলে উঠলেন—"ঐ আসছে আমার রাজা—আমাকে উদ্ধার করতে।" সুরঙ্গমা কিন্তু দেখেই চিনেছে এ সেই নকল রাজার দল। সে বললে—"এ তো আমার রাজা নয়—আমার রাজা আবার কবে এমন করে ধুলো উড়িয়ে আসে?"

কিন্তু ভণ্ডরাজ সুবর্ণ আসছে বুঝেও সুদর্শনা দুঃখিত হ'লেন না। তাঁর মনে হ'ল রাজার কাছে তাঁর কোন মূল্য যদি না থাকে তবে নাই থাকুক। অন্য কোথাও যদি তাঁর আদর থাকে তবে সেই তাঁর ভাল।

সুবর্ণকে সঙ্গে করে নানা রাজার দলে কান্যকুব্জে নিয়ে এল দুর্ভাগ্যের ঝড়।

১১শ দৃশ্যে সুদর্শনার পাণিপ্রার্থী রাজার দল সংবাদ পেয়েছেন তাঁর পতিগৃহত্যাগের কথা। পিতৃগৃহে দাসীত্বের খবরও তাঁদের কাণে পৌছাল। সুদর্শনাকে লাভ করবার মানসে সাত রাজায় মিলে কান্যকুব্জে অভিযান করলেন তাঁরা। কান্যকুব্জরাজ পড়লেন মহা

বিপদে। কুলত্যাগিনী কন্যা এ কি দারুণ বিপদ্ নিয়ে এল তার সঙ্গে! কন্যাকে তিনি তীব্র ভর্ৎসনা করলেন —তারপর গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় কান্যকুব্জরাজ পরাজিত হয়ে হ'লেন বন্দী!

১২শ দৃশ্যে কান্যকুব্জের রাজান্তঃপুরে সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা কথোপকথনে রত। পিতার বিপদে রাণী অত্যন্ত বিচলিত। রাজার প্রতিই তাঁর যত অভিমান। কান্যকুব্জকে রক্ষা করতে তিনি ত কই এলেন না? রাণীর মনের অন্ধকারে কিন্তু কোথা থেকে হঠাৎ দেখা দিয়েছে আলো। রাজা যে তাঁকে এখানেও ত্যাগ করেন নি—তার আভাসটুকু তাঁর মনে থেকে থেকে দোলা দিয়ে যায়। একা গৃহকোণে বসে তাঁর মনে হয়—বাতায়নের নীচে কে যেন বীণা বাজাচ্ছে। কোথাও কাকেও দেখা যায় না—অতি-পরিচিত একটি সুরে রাণীর অন্তরটি পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর মনে পড়ে স্বামীগৃহের সেই বাতায়নটি, যেখানে সন্ধ্যার পর রাণী প্রত্যহ সাজগোজ করে দাঁড়াতেন তাঁর সেই দীপনেভানো বাসরঘরের অভিসারে। সেদিনও এমনি গানের পর গান, তানের পর তানে তাঁকে মুগ্ধ করে সেদিন পৌঁছে দিত সেই অন্ধকার বাসরকক্ষে, যেখানে তাঁর প্রভুর সঙ্গে নিয়ত তাঁর মিলন ঘটত। সেই গান কি রাণী আর কোনদিন শুনবেন না?

সুরঙ্গমা আশ্বাস দিলে—"আবার সেই গৃহে হাত ধরে আদর করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন তিনিই।"

কিন্তু সুদর্শনার এত আশা করার শক্তি আসে নি তখনও। তাঁর সমস্ত অন্তর বেদনায় ক্ষতবিক্ষত। বেদনা আরও গভীর হ'ল ক্রমে। দ্বারপথে প্রবেশ করল দ্বারী। দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে সে। কান্যকুব্জরাজ বন্দী। সুদর্শনা মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়'লেন।

১৩শ দৃশ্যে সাত রাজায় মিলে করলেন স্বয়ম্বরের মন্ত্রণা। কান্যকুব্জে তাঁরা ত বিজয়মাল্য নিতে আসেন নি—এসেছেন সুদর্শনার হাতের বরমাল্য নিতে। কান্যকুব্জরাজ বন্দী হবার পরে সাত রাজায় মিলে আর একবার যুদ্ধে নামার চেয়ে স্বয়ম্বর সভায় সুদর্শনার ইচ্ছার পরেই সবটুকু ছেড়ে দেওয়া ভাল—কাঞ্চীরাজের এ মন্ত্রণা সকলে সানন্দে গ্রহণ করলেন। কান্যকুব্জ-রাজকেও এ কথা জানান হ'ল। তিনি রাজী হ'লেন, কারণ তাঁর উপায়ান্তর ছিল না। কাঞ্চীরাজ জানতেন সুবর্ণের প্রতি রাণীর দুর্বলতার কথা। তাই স্থির হ'ল স্বয়ম্বর সভায় কাঞ্চীরাজের ছত্রধর হবে সুবর্ণ।

১৪শ দৃশ্যে রাণী, সুদর্শনা ও সুরঙ্গমাকে দেখা গেল প্রাসাদের একাংশে। স্বয়ম্বর সভায় যেতেই হবে সুদর্শনাকে, নতুবা পিতার প্রাণরক্ষা হয় না। সুবর্ণ এসে জানিয়ে গেছে সে-কথা। কিন্তু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে রাণীর ঘটেছে মোহমুক্তি। সুবর্ণের প্রতি তাঁর আর কোন মোহ নেই। তার বাহ্যরূপের মোহে তাঁর চোখ যে একদিন ভুলেছিল, একথা স্মরণ করতেও তাঁর লজ্জা হ'ল।

গভীর অন্তর্গ্লানিতে ভরে গেছে রাণীর অন্তর। অনেক চিন্তার পর মুক্তির উপায় তিনি স্থির ক'রে ফেললেন। স্বয়ম্বর সভায় রাণী যাবেন—কিন্তু সে সভায় তাঁর বরমাল্য পাবেন না কোন রাজাই—সে-মালা তিনি মৃত্যুর কণ্ঠেই অর্পণ করবেন। বুকের মধ্যে রাণী লুকিয়ে নিলেন তীক্ষ্ণ ছুরিকা। অনুতাপের অশ্রু-জলে রাণীর অন্তরের সব কালো হয়ে উঠল উজ্জ্বল। রাজার প্রতি তাঁর প্রেমও হয়ে উঠল নিবিড়। তাঁরই নাম মুখে নিয়ে রাণী মৃত্যুবরণ করতে অগ্রসর হ'লেন।

১৫শ দৃশ্যে স্বয়ম্বর সভায় রাজগণ সমবেত। সকলেরই মনে উৎকণ্ঠা—রাণী সুদর্শনা কার গলায় না জানি মালা দেন। কাঞ্চীরাজের মাথায় ছত্রধারণ করে দাঁড়িয়েছিল সুবর্ণ। সকলের মধ্যে চলছিল আনন্দমুখর কথাবার্তা। হঠাৎ সভামধ্যে সবার আসন উঠল কেঁপে। কি ব্যাপার এ? একজন বলে উঠলেন—"এ কী ভূমিকম্প না কি?"

তখন সকলকে সচকিত করে যোদ্ধবেশে সভাক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন ঠাকুর্দা। তিনি তাঁর রাজার দূত হয়ে এসেছেন—জানাতে এসেছেন যে তাঁর রাজা সমুপস্থিত দ্বারদেশে। সকলকে রাজা ডাক দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অথবা আত্মসমর্পণের জন্য। কোন কোন রাজা যুদ্ধের সম্ভাবনামাত্র শুনে রণক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। কাঞ্চীরাজ গেলেন যুদ্ধে—তাঁর সঙ্গে আরও অনেকে।

১৬শ দৃশ্যে দেখি যুদ্ধ শেষ হয়েছে। রাজাদের যে কেমন করে হার হয়ে গেল তা কেউ বুঝে উঠতেই পারলেন না। রাণী সুদর্শনার মন এখন তাঁর রাজার জন্য ব্যাকুল। যুদ্ধশেষে রাজা তাঁকে আদর করে কাছে ডেকে নেবেন—এই ছিল তাঁর আশা। কিন্তু কই—রাজা ত এলেন না! সুদর্শনার মন ভরে উঠল অভিমানে। এত অনাদর তিনি সইবেন কি করে? রাজা যে তাঁকে চিরকাল সোহাগে সমাদরে ভরিয়ে রেখেছিলেন। রাণী জানতেন না যে তাঁর রাজা যেমন

কোমল, তেমনি কঠিনও তিনি হ'তে পারেন। যে পথ দিয়ে রাণী স্বামীগৃহ ছেড়ে এসেছেন, সেই পথের ধূলাতেই ধূসর হয়ে তাঁকে পায়ে পায়ে ফিরে চলতে হবে তাঁর দয়িতের কাছে। এ ছাড়া অন্য নেই। সুরঙ্গমা তাঁকে বুঝিয়ে বললে—এ অভিমান ঘোচাতেই হবে রাণী—হারতেই হবে এ লজ্জা। বললে, "কেবল একটি ইচ্ছা থাকবে—নিজেকে নিবেদন করার ইচ্ছা।" সুদর্শনার মন মানতে চাইলে না একথা। তিনি সুরঙ্গমাকে পাঠালেন রাজার খোঁজে। রাজাকে না পেয়ে ঠাকুর্দাকে ধরে নিয়ে এল সুরঙ্গমা। রাজা তখন চলে গেছেন বহুদূরে—তিনি যে কোথায়—তা কেউ জানে না, ঠাকুর্দাও না। অভিমানে ভেঙে পড়লেন রাণী।—বললেন সুরঙ্গমাকে—

"যা যা চ'লে যা—তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্ছে। এত নত করলে তবু সাধ মিটল না? বিশ্বসুদ্ধ লোকের সামনে আমাকে এইখানে ফেলে দিয়ে চলে গেল?"

সপ্তদশ দৃশ্যে নাগরিকদলের মুখে শোনা যায় যুদ্ধোত্তর ঘটনার সংবাদ। যুদ্ধের শেষে সব রাজাই হয়েছিলেন বন্দী। এদের মধ্যে সবাই শাস্তি পেয়েছে কেবল কাঞ্চীরাজ ছাড়া। কাঞ্চীরাজ যুদ্ধে মৃতকল্প হয়েছিলেন, কিন্তু সুচিকিৎসকেরা তাঁকে সুস্থ করে তোলে। বিচারের শেষে তারি মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছেন রাজা। সাধারণ লোকে এ বিচারের মর্ম বুঝতে পারলে না। কাঞ্চীরাজই ত যত অনর্থের মূল—তবে তার এই সম্মান কেন? কিন্তু রাজার বিচারের ধারাই যে আলাদা—তাঁর বিচার সাধারণ লোকে কি বুঝবে? কাঞ্চীরাজ বীর—তিনি নির্ভীক রজোগুণ-প্রধান তাঁর চরিত্র। রাজা নাটকের কাঞ্চীরাজ আধুনিক জড়বিজ্ঞানের প্রতীক। এ বসুন্ধরা বীরভোগ্যা—তাই কাঞ্চীরাজকে রাজসম্মানে ভূষিত করলেন সেই রাজাধিরাজ।

১৮শ দৃশ্যে অমা-রজনীর নিশীথ প্রহরে পথের মধ্যে ঠাকুর্দা ও কাঞ্চীরাজ। রাজার প্রেমের ডাকে কাঞ্চীরাজকেও করেছে ঘরছাড়া। থালায় মুকুট সাজিয়ে তিনিও বেরিয়েছেন রাজার মন্দির খুঁজে বার করতে। আর ঠাকুর্দা বেরিয়েছেন তাঁর বালকদলকে নিয়ে বসন্তোৎসবের শেষ পালাটা চুকিয়ে দিতে। পথে কাঞ্চীরাজকে দেখে তাঁর বিস্ময়ের অন্ত রইলো না। এর পরেও যারা ঘরের কোণে বসেছিল তাদের পথে বার করবার পালা ঠাকুর্দার। তাঁর সঙ্গে তাঁর বালকসঙ্গীরা গান ধরলে—"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে"—

১৯শ দৃশ্যে ঐ একই রাত্রে পথে বেরিয়েছেন রাণী সুদর্শনা আর সুরঙ্গমা। রাণীর অভিমান ভাঙল শেষে। কৃষ্ণা চতুর্দশীর ঘন অন্ধকার যামিনীতে রাণী শুনেছিলেন তাঁর রাজার আহ্বান। অদেখা বীণার তারে তারে কি করুণ রাগিণীতে সেদিন বেজেছিল রাণীকে ফিরে পাবার জন্যে রাজার সেই করুণ মিনতি! সেই সুর রাণীর কঠিন অভিমানকে দিলে গলিয়ে। রাণী পথে বেরোলেন অমারজনীর নিশীথ প্রহরে। তখন পথের ধূলিকেও তাঁর মনে হ'ল মধুময়—পথ চলার কষ্টও হয়ে উঠল দুর্লভ সুখ! একটু গর্ব শুধু ছিল বুঝি রাণীর মনে, যে তিনিই আগে পথে বেরিয়েছেন—কঠিন পথ ভেঙে চলেছেন তাঁর রাজার কাছে। তাঁর আসার অপেক্ষা তিনি করেন নি। কিন্তু সুরঙ্গমা বললে—

"সে গর্বও তোমার টিঁকবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল, নইলে তোমাকে বের করে কার সাধ্য?"

গর্ব ছাড়লেন রাণী। অনুভবে বুঝলেন রাজা সেই গভীর অন্ধকারেই ধরেছেন তাঁর হাত—যেমন করে একদিন ধরতেন সেই অন্ধকার মিলন-কক্ষে। সুদর্শনার মন শান্ত হ'ল।

পথে চলতে চলতে ওঁদের দেখা কাঞ্চীরাজের সঙ্গে। কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে মাতৃসম্বোধন করলেন। রাণীর পায়ে-চলার কষ্ট বাঁচাতে এনে দিতে চাইলেন তাঁর যোগ্য রথ। কিন্তু রাণীর যে রথের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ধূলোমাটির পথে ধূলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে যে মিলন, সেই মিলনেই তাঁর চিত্ত তখন ভরপুর।

দেখতে দেখতে রাত ভোর হয়ে এল। পূবের আকাশে জাগল অরুণোদয়ের ছটা। রাজার প্রাসাদের সোনার চূড়া জেগে উঠল সামনে।

ঠাকুর্দাও চলছিলেন পথে। রাণীকে দেখে বলে উঠলেন, "ভোর হ'ল দিদি—ভোর হ'ল।" রাণী এসে পড়লেন তাঁর নিজগৃহের সম্মুখে। ঠাকুর্দা দুঃখিত হ'লেন রাজার উদাসীনতায়। রাণী এসেছেন দ্বারে, কই তার উপযুক্ত আবাহন? কোথায় রথ—কোথায় বাদ্য—কোথায় সমারোহ?

সুদর্শনার মনে কিন্তু আর কোন ক্ষোভ নেই। তিনি দেখলেন তাঁর জন্যে রাজার অভ্যর্থনা ছড়িয়ে রয়েছে

আকাশের রঙে রঙে—আর বাতাসের পুষ্পগন্ধের সমাবেশের মধ্যেই। তিনি যে আজ সকল অভিমান ছেড়ে এসেছেন। বললেন—"যে কেউ তাঁর আছে—আমি আজ সকলের নীচে।" পরম বৈষ্ণবের মতই রাণী তখন "তৃণাদপি সুনীচা"।

বিংশ দৃশ্যে অন্ধকার ঘরে রাজা ও রাণীর পুনর্মিলন ঘটল। সে মিলনে আর কোন ছেদ নেই। রাণী আজ কান্না-হাসির বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে চিনে নিয়েছেন তাঁর চিরদয়িতকে। তাঁর আর ভুল হবে না। রাণীর দু'চোখ ভরে উঠল রাজার কালো রূপের সমারোহে। বললেন—"তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।"

"তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।" উত্তর দিলেন রাজা।

এইবার অন্ধকার ঘরের পালা শেষ হ'ল একেবারে। রাণীর হাত ধরে রাজা তাঁকে নিয়ে এলেন বাইরের জগতে—আলোয়। এখন থেকে অখিল বিশ্বচরাচরের আলোয় বিশ্বরাজের সঙ্গে সুদর্শনার নিত্যমিলনের পালা।

মাঘোৎসব বা এগারোই মাঘ

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

ক্ষুদ্র বীজ থেকে বনস্পতির সৃষ্টি। একটি মাত্র দিন থেকেও এক যুগের শুভ সূচনা হয়ে থাকে। এমন একটি দিন এই এগারোই মাঘ। এই দিনটির মধ্যে এমন সত্য নিহিত ছিল যা আজ মানবতাকে সঞ্জীবিত করছে।

'এগারোই মাঘ'-এর উৎসব ব্রাহ্মসমাজের উৎসব—এই হ'ল মোটের উপর সকলের ধারণা। কিন্তু এই ধারণার বশবর্তী হয়ে থাকলে এ-দিনের উৎসবের মর্মকথাটি জানা যায় না।

"ব্রাহ্মধর্মকে কয়েকজন মানুষের জীবনের মধ্য দিয়া দেখিতে গেলেও তাহাকে ছোট করিয়া দেখা হইবে। বস্তুত ইহা মানব ইতিহাসের সামগ্রী।…ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টির মধ্যে আমরা তাহারই পরিচয় পাই।"—ধর্মশিক্ষা: রবীন্দ্রনাথ।

এই সৃষ্টির মূলে যিনি আছেন—নিরঞ্জন নিরাকার নির্বিকার ব্রহ্ম—তাঁরই উপাসনা করতে হবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রচিত ব্রাহ্মধর্মের বীজমন্ত্রে আছে—

"তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

কিন্তু যাঁকে দেখি না, যাঁর কথা শুনি না, তিনি উপাস্য হবেন কি করে? এ বড় জটিল কথা, জটিল প্রশ্ন। যাঁরা তাঁকে ধ্যানে ধারণায় পেয়েছেন, তাঁরা সকলেই জগতের কল্যাণকামী মানুষ, সাধক মহাপুরুষ। জটিল প্রশ্নের উত্তর তাঁরা যা রেখে গেছেন তাই পাই আমরা মন্ত্রে, গ্রন্থে, বাণীতে, দোঁহায়। মতে আর পথে বাদবিতণ্ডার অন্ত নেই। কিন্তু একটি সহজ কথা সকলেই স্বীকার করেন—ঈশ্বর স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় বা দুর্জ্ঞেয় হ'লেও তাঁরই সঙ্গে মানুষের জীবন নিবিড়-ভাবে যুক্ত। এই যুক্তিকে যিনি এই যুগে সকলের কাছে গ্রাহ্য করে উপস্থাপন করলেন তিনি যুগগুরু রামমোহন রায়। তাঁর যুক্তির মূলে আছেন এক ঈশ্বর—সকল মানুষের তিনি স্রষ্টা পাতা। এই প্রত্যয়ের মধ্যেই রয়েছে বিশ্বমানবের একত্ব বোধ। যে বোধ তাঁকে বুঝিয়েছিল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় একটি কথা—পৃথিবীতে মানুষ চায় পরস্পরের সহযোগিতা। সহযোগিতা সকল বিষয়ে—ধর্মে কর্মে জ্ঞানে বিজ্ঞানে। শুধু বাইরের দেশে কালে নয়, অন্তর্জগতেও। এই ব্যাপক সহযোগিতার অবলম্বনস্বরূপ হবেন সর্বব্যাপী 'সর্বনিয়ন্তৃ সর্বাশ্রয় সর্ববিৎ সর্বশক্তিমৎ'-পরমেশ্বর এবং তাঁকে কায়মনোবাক্যে প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ের গূঢ়ার্থ মানব জীবনে সর্বোচ্চ এক পরিণতির পথে যাত্রা। মত-বাদের লক্ষ্য এই পরিণতির দিকে থাকলে কোনখানেই আর

দ্বন্দ দেখা দেবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কোন একটি মতবাদকে যাঁরা পরিণতি বলে ধরে রেখেছেন তাঁদের যাত্রা কোনদিনই গন্তব্য খুঁজে পাবে না। রামমোহনের জীবন-সাধনার এই হচ্ছে মূলকথা। লোকাচারে, সংস্কারে সত্য শিব সুন্দরের বিস্মৃতিতে জগৎটাকে বিভীষিকা বলে ধরে নেবার চরম দুর্দিনে দেখা দিলেন রামমোহন। চিন্তাবীর তিনি, জ্ঞানে ভাস্বর, বিচারবুদ্ধির সম্পূর্ণ বিকাশ তাঁতে, বাধা পেল না। তিনি আঘাত করলেন জড়তার দ্বারে, তামসিকতাকে করতে চাইলেন নিশ্চিহ্ন। তাঁর চৈতন্যে উদ্‌ভাসিত হ'ল—ভূমৈব সুখম্।

জন্ম হ'ল ব্রাহ্মসমাজের। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগষ্ট। ১৭৫৫ শকের ৬ই ভাদ্র বুধবার জোড়াসাঁকোতে কমললোচন বসুর বাড়ী ভাড়া নিয়ে সমাজ বসল। এই তারিখটি ব্রাহ্ম-সমাজের ভাদ্রোৎসব উদ্‌যাপনের জন্য চিহ্নিত হয়ে আছে। ১১ই মাঘ জন্ম নিয়েছে এই দিন থেকেই।

১১ই মাঘের উৎসব প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি। সে দিনটি ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তনের দিন নয়—নবগৃহ প্রবেশের দিন। সমাজের জন্য নির্দিষ্ট নবগৃহ প্রবেশ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত উৎসবই ১১ই মাঘের উৎসবরূপে প্রচলিত।

রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর বিদেশে ব্রিষ্টল নগরে। সমাজের কাজে পড়ে বাধা। এই বাধা অপসারণের প্রস্তুতি চলে আরেকজনের জীবনে। রামমোহনের আরব্ধ কাজ সম্পাদনের গুরুভার গ্রহণ করলেন তিনি, যিনি আজ সকলের কাছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে পরিচিত।

দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজ ছাড়লেন। সাংসারিক নানা দুর্যোগ এল তাঁর জীবনে। মুক্তির পথ খুঁজতে লাগলেন তিনি। তত্ত্বানুসন্ধানী হয়ে য়ুরোপীয় দর্শন ও দেশীয় শাস্ত্রাদি পাঠ করলেন। লকে এবং হিউম-এর গ্রন্থে জড়প্রকৃতির প্রাধান্য সিদ্ধান্তে বিষণ্ণ ও বিরক্ত হলেন তিনি। উপনিষদ আশ্রয় করলেন আত্মার শান্তির জন্য। পেলেন একটি সুন্দর কথা—য আত্মদা, বলদা, পেলেন আরও সুন্দর কথা—একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তত্ত্বানুসন্ধানের তৃষ্ণা থেকে জন্ম হ'ল তাঁর তত্ত্বরঞ্জিনী সভার। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্বরঞ্জিনীকে তাঁর শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ পরিণত করলেন 'তত্ত্ববোধিনী'তে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর। সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ বা জ্ঞানোপার্জিকা সভা স্থাপন করেছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তার সভ্য। এক ঈশ্বরের প্রতীতি জন্মে তাঁর মনে এই সময়েই। আর পরিচয় ঘটে রামমোহনের সঙ্গে। দল বেঁধে প্রতিজ্ঞা করলেন ভাইদের নিয়ে—'প্রতিমাকে প্রণাম করা হবে না।' ঈশোপনিষদের ছেঁড়া পাতা থেকে যে মন্ত্র পেয়েছিলেন।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চজগত্যাং জগৎ

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

তারই প্রেরণায় গড়লেন তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা—সু-পণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্ত হ'লেন শিক্ষক। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হ'ল। সম্পাদনার ভার নিলেন অক্ষয়বাবু। এক তত্ত্ববোধিনী তিন শাখায় প্রসারিত হয়ে কর্মচঞ্চল করে তুলল দেবেন্দ্রনাথের দিনগুলি।

বিষয়সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য ট্রাষ্টডীড্ সম্পাদন করলেন পিতা দ্বারকানাথ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে। তিন বৎসরের মধ্যেই উইলও সম্পাদিত হ'ল ১৮৪৩ সালে। দেবেন্দ্রনাথের সংসার-বিরাগ লক্ষ্য করে দুঃখিত হলেন দ্বারকানাথ। দুঃখ করে বললেন তাই,

"একে তার বিষয়বুদ্ধি অল্প, এখন সে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া আর বিষয়কর্মে কিছুই মনোযোগ দেয় না।"

—মহর্ষির আত্মজীবনী, পৃ. ৭৮

পিতার কোপদৃষ্টিতে পড়ায় বাড়িতে আর উপনিষদের অধ্যয়ন চলল না। তত্ত্ববোধিনীর যন্ত্রালয় হ'ল এখন তাঁর অধ্যয়নের স্থান। অধ্যাপনা করেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। এরই মধ্যে একদিন ব্রাহ্মসমাজ দেখতে গেলেন ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে। তত্ত্ববোধিনী সভাকে এই সমাজের সঙ্গে যুক্ত করেন এই ছিল ইচ্ছা। দুই সভারই উদ্দেশ্য এক—সকলকে ব্রহ্মের দিকে, পরমকল্যাণের দিকে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু লক্ষ্য করলেন, সমাজে বর্ণভেদ রক্ষিত হচ্ছে। শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদপাঠ হয়, অথচ ট্রাষ্টডীডে লেখা আছে—'জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলে ব্রহ্মোপাসনা করতে পারবে একত্রে।' বেদনা বাজল তাঁর মনে। যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়াবেন, সেই সর্ষেতেই ভূত ঢুকেছে। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য

বর্ণ থেকে যোগ্য লোক পাওয়া নাকি সহজ নয়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ নিরস্ত হ'লেন না এতে। উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করলেন।

ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসে আচার্যের উপদেশ দিতে পারবেন এমন লোক যে-কোন ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর মানুষ থেকেও বেছে নেবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থায় ব্রতী হ'লেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন, "সংস্কৃতে নির্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র চাই—উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি দেওয়া হবে।"

ছাত্র জুটল। ছাত্রই একদিন শিক্ষা গ্রহণ করে আচার্যের গদীতে বসতে পারবে। মানুষে মানুষে কোনরূপ বর্ণবৈষম্য আর থাকবে না তা হ'লে।

তবু যেন দ্বিধা থেকে যায় মনে। যারা আসে-যায় ব্রাহ্মসমাজে, তাদের মধ্যেও বাছাই করতে হবে—আসল নকল। মন্ত্র উচ্চারণ করলেই ত হ'ল না। জীবনে তার প্রতিফলন চাই। পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করে যারা এক-ঈশ্বরের উপাসনা করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য প্রতিজ্ঞাপত্র রচিত হ'ল। এই পত্রে রইল গায়ত্রীমন্ত্রের বৃহৎ ভাবনা দ্বারা দেহ-মনের সর্বোচ্চ বিকাশের পথে নবযাত্রা। রামমোহনের ব্রহ্মোপাসনার বিধান অনুসরণেই এই প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করলেন দেবেন্দ্রনাথ।

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন তিনি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর ১৭৬৫ শকাব্দের ৭ই পৌষ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায়। এই উপলক্ষ্যে বললেন তিনি,

"যাহাতে পরিমিত দেবতার উপাসনা হইতে বিরত হইয়া এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা করতে পারি, যাহাতে সৎ কর্মে আমাদের প্রবৃত্তি হয়, এবং পাপমোহে মুগ্ধ না হই, এইরূপ উপদেশ দিয়া আমাদের সকলকে মুক্তির পথে উন্মুখ করুন।"

আচার্য বিদ্যাবাগীশ উত্তরে বললেন,

"রামমোহনের এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তিনি তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এতদিন পরে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল।" —মহর্ষির আত্মজীবনী, পৃ. ৮৫

রামমোহনের ইচ্ছাপূরণের কথায় দেবেন্দ্রনাথ আনন্দিত হবেন, এ ত নিঃসন্দেহ। সত্যব্রত গ্রহণ করবার পর তিনি বললেন,

"তত্ত্ববোধিনী সভা যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন সেই একদিন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬ অক্টোবর আর অদ্য ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের এই আর একদিন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর ৭ই পৌষ। ক্রমে ক্রমে আমরা এতদূর অগ্রসর হইলাম যে, অদ্য ব্রাহ্মধর্মের শরণাপন্ন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলাম। এই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া আমরা নূতন জীবন লাভ করিলাম।"

—মহর্ষির আত্মজীবনী, পৃ. ৮৫

দুই বছরের মধ্যে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর অবধি ৫০০ জন ব্রহ্মভক্ত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে সত্যব্রত গ্রহণ করলেন। প্রত্যেকের মধ্যে পরস্পরের এমন প্রীতির বাঁধন ছিল যা দুই সহোদরের মধ্যেও থাকে না। সদ্‌ভাবকে পুষ্ট করবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ একটি মেলার আয়োজন করলেন গেরিটি বা গলতার বাগানে। সকলের উপস্থিতিতে একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠানে ব্রাত্যদের উপবীত বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল। বর্ণভেদ দূর করবার এ আর এক উপায় বা প্রচেষ্টা।

চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষের উপর মানবতার উন্নতি নির্ভর করে। এ কথা দেবেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন ভাল করেই। তাই এমন একটি মন্ত্রের অনুসন্ধান তাঁর বুদ্ধিতে ছিল যা হবে সকল ব্রাত্যের ঐক্যসূত্র। তিনি বললেন,

"ইহাই ভাবিয়া আমি আমার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি পাতিয়া দিলাম। বলিলাম, আমার আঁধার হৃদয় আলো কর।"

সে আলোতেই তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর ঈপ্সিত মন্ত্র। উপনিষদের মুখে নদীর স্রোতের ন্যায় সহজে সতেজে বলতে লাগলেন তিনি, আর লিখে নিতে লাগলেন তাঁর প্রিয়তম গুণগ্রাহী অক্ষয়কুমার দত্ত—

"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি
যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"...ইত্যাদি।

"তিন ঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ হইয়া গেল। কিন্তু ইহার

নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে এবং তাহা আয়ত্ত করিতে আমার সমস্ত জীবন চলিয়া যাইবে, তথাপি তাহার অন্ত হইবে না।”

—মহর্ষির আত্মজীবনী, পৃ ১৭৯

মহর্ষির দীক্ষার দিন থেকে আরম্ভ করে জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত তিনি অতিবাহিত করেছেন তাঁর সত্যোপলব্ধির আনন্দ সকল মানুষকে বিতরণ করার কাজে। বাধাবিঘ্ন কম ছিল না, তবু তিনি রামমোহনের নবযাত্রাকে জয়যাত্রায় পরিণত করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। সেই জয়যাত্রার পথেই পাওয়া শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত মহর্ষির ঈপ্সিত ব্রহ্মোপাসনার মন্দির—দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার ৪৮ বছর পরে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ তারিখে শান্তিনিকেতনের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল (ভিত্তিস্থাপনের তারিখ ১৮৯০ অব্দের ৭ই ডিসেম্বর। ১২৯৭, অগ্রহায়ণ ২৮)। দেখা যাচ্ছে যে, দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষাগ্রহণের তারিখটিকে শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করার জন্যই শান্তিনিকেতন মন্দির তিনি সেই একই দিনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পুত্র রবীন্দ্রনাথও এই দিনটির সম্বন্ধে বলেছেন,

“এই সেই ৭ই পৌষ এই শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে এবং এখনও প্রতিদিন একে সৃষ্টি করে তুলছে।”

রবীন্দ্রনাথ যখন বিদ্যালয় স্থাপনের কথা ভাবেননি, তখনই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন মন্দিরকে কেন্দ্র করে একটি ব্রহ্ম বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতির খসড়াটি দেখলেই সন্দেহ থাকেনা যে পিতামহ দেবেন্দ্রনাথের উপলব্ধ সত্যের প্রচার কামনাই ছিল এর মূলে। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে (১৩০৬ ভাদ্র) রবীন্দ্রনাথ পিতৃদেব মহর্ষির অনুমতি নিয়ে শান্তিনিকেতনে গড়ে তুললেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। বলেন্দ্রনাথের পরিকল্পিত ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’ আর রবীন্দ্রনাথের ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’ নামের দিক দিয়ে শুনতে প্রায় সমপর্যায়ের মনে হ'লেও আসলে দুইজনের পরিকল্পনার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বর্তমান ছিল।

তবু রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের পুত্র। পিতৃমন্ত্রে তাঁর দীক্ষা। শান্তিনিকেতন দেবেন্দ্রনাথের, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের। ১১ই মাঘের উৎসব এখানকারও উৎসব। রবীন্দ্রনাথ বলেন, “এ উৎসব নবযুগের উৎসব।”

তিনি বলেন,

“আমরা আজ পঞ্চাশ বৎসরের উদ্ধকাল এই ১১ই মাঘের উৎসব করে আসছি।...আমরা মনে করেছিলাম আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের উৎসব। ...কিন্তু এইটুকুতেই উৎসবের শেষ পরিচয় আমরা লাভ করতে পারি নে। আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে অনেক বড়, এমন কি, একে যদি ভারতবর্ষের উৎসব বলি, তাহলেও একে ছোট করা হবে। আমি বলছি এ উৎসব মানব সমাজের উৎসব। ...আমাদের উৎসবকে ব্রহ্মোৎসব বলব, কিন্তু ব্রাহ্মোৎসব বলব না। যিনি সত্যম্ তাঁর আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে দেখব। আমাদের এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহা-প্রাঙ্গণ—এর ক্ষুদ্রতা নেই।

—শান্তিনিকেতন : রবীন্দ্রনাথ।

১১ই মাঘের ব্রাহ্মসমাজের সেই নবগৃহ প্রবেশ আজ বৃহৎ পৃথিবীতে বৃহৎ মানবপরিবারে প্রবেশ, সে কথা সত্য হোক!

রায়বাড়ী

গিরিবালা দেবী

সেদিন সে বিনুকে বলিয়াছিল, "কাজ এখন পাতলা হইয়াছে।" অল্প কাজের প্রতি বোধ হয় বিনুর চোখ লাগিয়াছিল। পল্লীগ্রামে মানুষের 'চোখলাগা' সোজা যায়।

কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার ফলস্বরূপ পাচক মণিরাম-ফণিরামের বৃদ্ধা মাতার মৃত্যু সংবাদ আসিল সুদূর উড়িষ্যা হইতে। মণিরামের স্বজনরা বুদ্ধি করিয়া তারেই সংবাদ দিয়াছিল। তার আসিল সাত দিন পরে।

দুই ভাইকেই রওনা হইতে হইল মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি করিবার জন্য। কোন কারণবশতঃ একজনা অনুপস্থিত থাকিলে কাহারও অসুখ হইলে অপরে কাজ চালাইবার সুবিধার জন্যই জোড়া ধরিয়া তাহাদিগকে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা অপর কেহ নহে, এক মা'র সন্তান।

কর্ত্তা মণিরাম-ফণিরামকে যাতায়াতের খরচ দিয়া মায়ের শ্রাদ্ধের যাবতীয় টাকা দিয়া সাত দিন পরে ফিরিবার নির্দ্দেশে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা নিয়মের চালের গুঁড়া কুটিতে এমনিই ঢেঁকিতে পা দেয় না; নিয়মের ডালের বড়ির জন্যে এমনিই গামলা গামলা ডাল বাঁটে না। কায়িক পরিশ্রম করিয়া দুই ভাই মিলিয়া একটা জমিদারি কিনিয়া রাখিয়াছে।

যাঁহারা বাকী খাজনার জন্য ভেকু সেখকে কয়েদ করিবার হুকুম দেন, তাঁহারাই আবার ধান উঠিলে বস্তা বস্তা ধান পাঠান তাহার গৃহে। পূজার সময় ভেকু-পরিবারের নূতন কাপড়, শীতের দোলাই কম্বল বিতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র এলাকায় অনাহারে কেহ মরে না। তাঁহাদের চরিত্রের বিশেষত্ব, ভীষণে মধুর, কোমলে কঠোর।

মণি-ফণি তেপান্তরে পাড়ি ধরিলে রায়বাড়ীতে সকলের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পল্লীগ্রামে রসুয়া ব্রাহ্মণের নিতান্ত অভাব। সাধারণতঃ গ্রামবাসী ব্রাহ্মণরা অজ্ঞাত-কুলশীল রসুয়া ব্রাহ্মণের হাতে খায় না। সেই কারণে পাচক সম্প্রদায়ের অত্যন্ত অভাব। পাবনা শহরে কখনও দোবে বা ওঝা দুই-একটা চেষ্টা করিলে কালে-ভদ্রে জুটিয়া যায়। রাজসাহী পাবনা বারেন্দ্রভূমি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণরা প্রাণান্তেও পাচক-বৃত্তি অবলম্বন করে না।

অগত্যা মনোরমা ঢুকিলেন রন্ধনশালায়। তাঁহার মতন পাকা রাঁধুনী সেকালেও বেশি ছিল না। রান্না করিতে তিনি অতিশয় ভালবাসতেন। সেকালের মেয়েদের বাহিরের জগৎ বলিয়া কিছু ছিল না। লেখাপড়ার বালাই ছিল না। রান্না ভিন্ন তাঁহারা করিবেনই বা কি?

কামিনীর মা বিনুকে তালিম দিয়া ঠেলিয়া দিল শাশুড়ীর পিছনে। নিয়মের কাজে হাহাকার পড়িয়া গেল। সরস্বতী মুখে বাড়াইয়া দিবার ওস্তাদ, কিন্তু হাতে-কলমে করিতে নারাজ।

বিনু কিন্তু পুলকিত, দুধের সেবার অপেক্ষা রন্ধন তাহার ভাল লাগে। রান্না চড়াইয়া সে বুনিতে পারে সুমুর সোয়েটার। তরুর সহিত গল্পসল্পও দিব্যি চলে। শাশুড়ীর অনুপস্থিতিতে পোড়াকাঠের কয়লা দিয়া হিজিবিজি কাটিলেও কেহ দেখিতে আসে না।

কয়েকদিন মনোরমার সহযোগিতায় বিনু রন্ধনে অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া গেল। এখন তাহার ভয় করে না। সাহস হইয়াছে।

সেদিন বিনু একাকী রান্না করিতেছে। মাছ আসিয়াছে তিন জাতের। কামিনীর মা কাছে নাই; তাহাদের নূতন ধানের চিড়া কোটার ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

রন্ধনশালার পিছনে পুকুরে যাইবার রাস্তা। কামরাঙ্গা গাছের পাশ দিয়া বাকিয়া গিয়াছে।

বিনু বাতায়ন-পথে তাকাইয়া সহসা চমকিত হইল। পুকুরের পাড় দিয়া কে আসে অন্দরে। গায়ে ওভারকোট, মাথায় কানঢাকা টুপি, মুখ ভাল দেখা যাইতেছে না, কেমন যেন ভালুকের মতন আকৃতি। দূর হইতে মূর্ত্তিটি জুতার মস মস শব্দ করিয়া বাতায়নের নীচে আসিল। বিনু সরিয়া গেল না, সেই দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার অজ্ঞাতসারে কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইল মাত্র।

বেলা বারটা বাজিয়া গিয়াছে। সকলে ব্যস্তসমস্ত। ঝিয়েরা সকলেই প্রায় উপস্থিত ঢেঁকিশালায়। ছোট ঠাকুমার ভোগ রান্না হইয়া গিয়াছে। তিনি পূজারীকে ডাকিতেছেন ভোগ সরাইতে।

মনোরমা বসিয়াছেন নিয়মের কর্ম্মশালায় দুধের কড়া লইয়া। ঠাকুমা হাতীর মাথায় বসিয়া অনিমেষে লক্ষ্য করিতেছেন কতক্ষণে ভোগ সরিবে।

তরু বিবিকে কোলে লইয়া বিড়ার চাপড়ার সন্ধানে অগ্রসর হইতে গিয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল, "দাদা, তুমি এসেছ? কি কাণ্ড, আসবে খবর দাও নি, বাইরে দিয়ে না এসে চোরের মতন পেছনে? ও ঠাকুমা, মা, দেখ দাদা এসেছে যে। ফুলদা কই, সুমু কোথায়? শিগগির এস সবাই, দাদা এসেছে।"

প্রসাদ ভিতরের উঠানে পা দেবামাত্র চারিদিকে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। যে যেখানে ছিল ছুটিয়া বাহির হইল।

মা বলিলেন, "প্রসাদ এলি, আগে জানাস নি? ষ্টেশনে গাড়ি পাঠান হয় নি। এতটা পথ হেঁটে এলি নাকি? তোর জিনিসপত্র কই?"

"কাল কলেজ হয়ে আমাদের বড়দিনের বন্ধ হ'ল মা, তাই রাতেই রওনা হ'লাম। মাত্র দশদিনের ছুটি, ভেবেছিলাম আসব না। তাই তোমাদের চিঠি লিখি নি। ভারি ত এতটুকু রাস্তা, তার জন্যে আবার গাড়ি। শীত-কালে হাঁটতে ভালই লাগে। ক'দিনই বা থাকা, সামান্য জিনিস একটা ব্যাগে এনেছি। সেটা আনছে গণি মোল্লা।"

বলিতে বলিতে প্রসাদ মা'র পদধূলি লইয়া ঠাকুমার কাছে গেল।

ঠাকুমা তাঁহার অশেষ স্নেহের পাত্রকে কাছে পাইয়া দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন, "পেসাদ, এলি ভাই, তুই আসবি বলেই সকালে আমার বাঁ চোখ নেচেছিল। কি পরে এসেছিস—সায়েবের মত, খুলে ফেল। গায়ে রোদ-বাতাস লাগুক। আমি পরাণ ভ'রে তোরে দেখি।"

প্রসাদ বলে, "শীতের জামা বোঝা না করে গায়ে চাপিয়েই এসেছি। বাবার সঙ্গে দেখা করে এক্ষুণি খুলে রাখছি, তুমি আমাকে পরাণ ভ'রে কত দেখতে চাও দেখ ঠাকুমা? হঠাৎ কাছে পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে, না?"

"আনন্দ হবে না? গোকুলে যে আমার গোবিন্দের আগমন 'ব্রেহ্মা নাচে, বিষ্ণু নাচে, আর নাচে ইন্দ্র গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ'।"

প্রসাদ হাসে হা হা, "কি উপমা দিলে ঠাকুমা, চমৎকার, গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ। তোমার নাচা পরে শোনা যাবে, বাবার কাছে যাই।"

প্রসাদ হলঘরের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল পিতার গৃহে।

ঠাকুমা মনের উল্লাসে হাঁক-ডাক সুরু করিলেন, "আলো ও মণিমালা, ভাগ্যে আজ অন্নপূর্ণা হয়েছিলি, তোর অন্ন ভিক্ষে নিতে শিব এসে উপস্থিত হ'ল। কি রান্না করেছিস? তখন যে কুটতে দেখলাম তিন রকম মাছ? একবার পাক-ঘর থেকে বের হয়ে চাঁদ মুখখানা দেখিয়ে যা না লো।

'আসিছে তোর চিকণ কালা, বনফুলে গাঁথ লো মালা।'

দিদি শাশুড়ীর সাদর আহ্বানে পরিহাসে বিনু বাহির হইতে পারিল না। কি এক সঙ্কোচে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। দূর হইতে নিজের স্বামীকে সে চিনিতে পারে নাই, এই লজ্জা তাহার মর্ম্মস্থলে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। ভাগ্যে কেহ কাছে ছিল না, থাকিলে তাহার ভীতিসূচক অস্ফুটধ্বনি শুনিলে কি ভাবিত? খিড়কির দরজা দিয়া ঢোকার মানে সকলকে চমকিত করা। ভরা দ্বিপ্রহরে কে আবার অমন বিজাতীয় পোষাকে মুখের অর্দ্ধেকটা টুপিতে ঢাকিয়া ঘরে ফেরে? এই রঙ্গ করিতেই বুঝি চিঠি লেখা বন্ধ হইয়াছিল। এতও জানে। এবার বোধহয় উনি আসিলেন বিনুর পড়া ধরিতে খাতা পরীক্ষা করিতে। এদিকে যে কত কাণ্ড সে-জ্ঞান নাই।

অশুভ ক্ষণে লবঙ্গ বোনা হস্তে কাঠগোলাপ রংএর উল সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল। তাহার পরে আরম্ভ হইয়া গেল কর্মনাশা ব্যাপার। তরু-সুমু নূতন জামা গায়ে দিয়া ওদিকে বুক ফুলাইতে লাগিল, এদিকে বিনু পড়িল আর এক ফ্যাসাদে। ক্ষিতি অভিমানে মুখ ফুলাইয়া বলিল, "বৌঠান, ওদের ত দিব্যি জামা বানিয়ে দিয়েছেন, আমি কি দোষ করেছি—আমাকে দেবেন না?"

বিনু অভদ্র নয়, বলিতে হইল, "ওরা ছোট, ওদের আগে দিলাম। এবার তোমাকে দেব, তুমি কি চাও?"

"এক জোড়া ফুল মোজা চাই, কালো পশমে করে দেবেন।"

বিনু স্বীকার হইয়া সুরু করিয়াছে ফুল মোজা। এদিকে মণিরাম-ফণিরামের মাতৃবিয়োগ। বুড়ীর যেন আর মরিবার সময় ছিল না। সে কি দশভূজা, তাহার কি বিদ্যা-শিক্ষা নাই? চিরকাল মূর্খ হইয়া থাকিলে তাহার কিরূপে চলিবে?

বিনুর হৃদয়ে ভয়-ভাবনা দোলা দিলেও এক অজানা পুলক-মিশ্রিত অনুভূতি জাগ্রত হইতে লাগিল।

ঠাকুমার মরা গাঙে জোয়ার আসিয়াছে। শুষ্ক তট-ভূমি প্লাবিত করিয়া উচ্ছসিত আনন্দ বারি কলকল ছলছল করিতেছে। তিনি তাহাকে চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া পঞ্চমুখ হইলেন, "ওলো রাজেশ্বরী, তোর আক্কেল দেখে বাঁচি না। কত কাল পরে আমার ঘরের নিধি ঘরে ফিরল, তাতেও তোরা ধুম ধুম ঢেঁকুস ঢেঁকুস থামাচ্ছিস না। এত বেলায় হাড়ভাঙ্গা শীতে আমার পেসাদের পুকুরের শীতলকুণ্ডে নেয়ে কাজ নেই। তার নাইবার গরমজল বসা। জল গরম হ'লে হরিকে ডেকে পাঠিয়ে দে স্নানের ঘরে। ছেলেমানুষ বৌটা কি রান্না-বাড়া করেছে কে জানে। তুই গিন্নীবান্নি মানুষ, সেদিকেও ত নজর দিচ্ছিস না? আজকের দিনেই যেন তোদের নাও কাজ বিয়ে কাজ লেগে উঠেছে। 'কাজের মুখে আগুন দেই, পিজের কাজ আগে নেই'।"

কামিনীর মা বিরক্ত হইল, "কি কইচেন মাঠান, দুই দিনের নটর-পটর, একদিনে সারি থুইছি, তাইতে আমার কিসের দোষ হইচে? 'যার লেগে করি চুরি সেই কয় চোর।' এই হইয়া গ্যাল। তুলি-পাড়ি ঘরে তুল্লেই আমি খালাস। নব্‌নেড়াও ত দাবাবুর জেরানের লেগে এতক্ষণ আথা ধরায়ে একহাঁড়ি জল বসাইয়া দিতি পারিত। খালি আগড়ুম-বাগড়ুম গালগল্প।"

ঠাকুমা নরম গলায় বলিলেন, "তোরে ভিন্ন আমি কারে কিছু কই না রাজেশ্বরী, কইলে কেউ কান দেয় না। বেশি কইলে ব্যাজার হয়ে বকর বকর করে। আমার হইচে 'ছোটলোকের কথা না সয় গায়, মশার কামড় না সয় পায়।' তোর হইয়া গেল সারা, বাঁচলাম। এখন আগে রাঁধার ঘরে ঢুকে ঠাঁই পিঁড়ির যোগাড় কর। গরম জল তুলে দে। তুই যে আমার একে একশো। তুই না হ'লে রায়বাড়ীর কিছুতে সিদ্ধি নাই।"

কামিনীর মা মানুষ ভাল, ঠাকুমার তোষামোদে গলিয়া জল হইয়া গেল।

তিন ছেলেকে লইয়া কর্ত্তা আহারে বসিয়াছেন। ক্ষিতির বড়দিনে স্কুল বন্ধ। গৃহিণী ভোজন স্থলে উপস্থিত, তরু দরজার পাশে বসিয়া, তাহার সাহেব-বিবি দরজার আড়ালে লুকাইয়া তির্য্যক দৃষ্টিতে সকলের খাওয়া লক্ষ্য করিতেছে। বিনু পরিবেশন করিতেছে।

এই প্রথম বিনু স্বামীর সামনে অন্ন ব্যঞ্জন ধরিয়া দিবার সুযোগ পাইয়াছে। এ পর্য্যন্ত বিনু খাবার এতটুকু জিনিষও প্রসাদকে হাতে করিয়া দেয় নাই। প্রসাদই বরং একদিন তাহাকে নাসপাতি খাইতে দিয়াছিল। বৌভাতের দিন বিনু বসিয়াছিল আলপনা-চিত্রিত এক বিরাট্ পিঁড়ায়, মাতৃ আদেশে প্রসাদ তাহার প্রসারিত দুই হস্তে বিবিধ খাদ্যপূর্ণ রূপার থালা অসংখ্য রূপার বাটিতে ব্যঞ্জন, রেকাবি ভরা মিঠাই-মণ্ডা, শ্বেত পাথরের বাটিতে দই-ক্ষীর কত কি, মায় জলপূর্ণ রূপার গেলাসটা দিতেও ভুল করে নাই। একখানা রূপার আধারে ছিল প্রসাধন দ্রব্য—বেনারসী শাড়ী জামা সেমিজ ইত্যাদি। সমস্ত জিনিষ বিনুকে অর্পণ করিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল স্ত্রীর সারা জীবনের ভরণ-পোষণের। সেদিন মঙ্গল প্রদীপ জ্বলিয়াছিল, উলুধ্বনি হইয়াছিল। স্বামী ত দিয়াই রাখিয়াছে, স্ত্রীর এই প্রথম।

জলপিঁড়ির অন্তরালে লুকাইয়া বিনু ভাবিতেছিল, না জানি সে আজ আপনার মনে কি অপূর্ব রান্না রাঁধিয়া রাখিয়াছে। কামিনীর মা পর্য্যন্ত কাছে ছিল না। তরুকে দিয়া রান্নাদ্রব্য একবার চাখাইবার কথা তাহার স্মরণ হয় নাই। আর তরু কোথায়? সে দাদাকে পাইয়া তাহার প্রদত্ত ছবির বই উপহার পাইয়া সুমু ক্ষিতির সহিত একত্রে নাচিয়া বেড়াইতেছে। লোকটি সত্যই লেখাপড়া ভালবাসে। ভাইবোনদের জন্য রঙীন ছবিভরা কি সুন্দর বই আনিয়াছে। বিনুর জন্য নিশ্চয় আনিয়াছে নীরস পড়ার বই, খাতার গাদা। সেই খাতাই যে বিনুর শেষ হয় নাই, বোনা না ধরিলে শেষ করিতে পারিত।

বোনার কথায় মনে পড়িল তাহার বাবার সংস্কৃত ছাত্রী রাশিয়ার কুমারী আরশোলাকে। সে বাবার নিকটে পড়িতে আসিত, তখন বিনুরা কলিকাতায় ছিল। সেই শিখাইয়াছিল বোনা। শুধু বোনা শিক্ষা দিয়া সে ক্ষান্ত হয় নাই। চমৎকার একখানা বোনার বই তাহাকে উপহার দিয়াছিল। সে বইখানা সে শাড়ীর বাক্সে সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়াছে। লুকাইয়া রাখিবার মানে কেহ যদি বোনা শিখিতে লুইয়া তাহার ভালবাসার বইখানা ছিঁড়িয়া দেয়। সে বোনা জানে বলিয়াই তাহার সঙ্গে বোনার সরঞ্জাম অভিভাবিকারা দিয়াছিলেন।

না, বিনুর ভয় কাটিয়া গেল। মনোরমা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৌমা আজ কেমন রান্না করেছে? নিজেই রেঁধেছে, আমি এদিকে আসতে পারি নি।"

মহেশবাবু সহাস্যে উত্তর দিলেন, "বেশ হয়েছে রান্না। তোমাদের বড় কষ্ট হচ্ছে, মণিরামরা বোধ হয় কাল-পরশুর ভেতরে এসে যাবে।"

মনোরমা বলিলেন, "সংসারে থাকতে গেলে সময়ে সমস্তই করতে হয়, কষ্ট আর কি?"

শীতের রাত্রি, আটটা বাজিতে-না-বাজিতেই খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেল। এবেলাও বিনু রান্না করিয়াছে।

কাপড় ছাড়িয়া লাল টুকটুকে একখানা আলোয়ান গায়ে জড়াইয়া বিনু প্রবেশ করিল তাহার শয়নগৃহে। আজ তাহার ঘরের দশবাতির ঝাড়টা তরু নবীনকে দিয়া জ্বালাইয়া দিয়াছে। এখানে ইতিপূর্ব্বে ঝাড় জ্বলে নাই। আজ হইয়াছে তরুর খেয়াল, "যদি কোন দিনই নাই জ্বলবে তবে শুধু শুধু ঝাড় ঝোলানো কেন বাপু? বাতাসে ঠুং ঠুং শব্দ হয়, দোলে, তাই দেখেই সকলের আনন্দ। দাদা আজ বাড়ী এসেছে, ঝাড় জ্বালাতেই হবে।" শুধু ঝাড় জ্বলিতেছে না, মোটা একখানা আঙ্গুরলতা আঁকা কার্পেট মেঝেয় পাতা হইয়াছে। দুই খাটে দুইটি শুভ্র বিছানা, সাটিনের লেপ, মলমলের ওয়াড়ে আবৃত হইয়া পইখানে অপেক্ষা করিতেছে। শিথানে দুইজোড়া বালিশের পাশে কুন্দফুলের বাটি। ঝাড়ের আলোকে গৃহ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর।

দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া প্রসাদ টেবিলে বই রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িতেছে। গায়ে তাহার বাসন্তী রংএর কাশ্মিরী শাল।

বিনু প্রসাধন-টেবিলের বৃহৎ স্বচ্ছ আয়নার দিকে বারেক তাকাইল—তাহার ললাটের কাঁচপোকার টিপটি আলোক পরশে ঝকমক করিতে লাগিল। ধুনোর আঠা দিয়া বিনুর মা স্বহস্তে তৈরি কাঁচপোকার টিপ তাহার কপালে পরাইয়া দিয়াছিলেন। এতদিনেও টিপ পরিয়া যায় নাই। ধুনোর আঠায় লাগিয়া রহিয়াছে। তাহাদের ওখানে খুব কাঁচপোকা। মা কাপড় দিয়া ধরিয়া কাঁচ-পোকার হুল ভাঙ্গিয়া পোকা উড়াইয়া দেন। পোকা মরে না ফের হুল গজায় তাহার। মা'র এক বাতিক কাঁচি দিয়া সুন্দর টিপ কাটিয়া কৌটা ভরিয়া তুলিয়া রাখেন। বিনুকে দিয়াছেন এক কৌটা টিপ, এক কৌটা ধুনোর আঠা।

বিনু তরুকেও পরাইয়া দিয়াছে একখানা টিপ।

—তা বিনুর সাজটা কিছু মন্দ হয় নাই। তরু আজ বৈকালে তাহার চুল বাঁধিয়া দিয়াছিল। তরু এখন তাহার অতিশয় অন্তরঙ্গ, বাধ্য। ছোট হইলে কি হইবে মেয়েটা তরতরে, খরখরে।

পরিধানের শাড়ীটাও বিনুর ফেলনা নয়, ধূপছায়া রং-এর মিহি সূতার শাড়ী।

বিনু ধীরে দরজা বন্ধ করিল। প্রসাদ ঘাড় ফিরাইয়া ডাকিল, "এই এসেছ, এস, বস চেয়ারে। তোমার মিটে গেল? তুমি ত বেশ রান্না করেছিলে, কার কাছে শিখলে?"

বিনু চেয়ারে বসিল আড়ষ্ট হইয়া। ঝাড়ের আলো যেন কোথায়ও আড়াল-আবডাল রাখে নাই। এত আলোয় কেমন যেন লজ্জাবোধ হয়।

বিনু চোখ নামাইয়া তাচ্ছিল্য ভরে বলে, "ভারি ত রান্না, শিখব কার কাছে? মা'দের রান্না দেখতে দেখতেই শিখেছি।"

"দেখেই শিখেছ, খুব ওস্তাদ ত! আমরা তিন ভাই, আর দুটি ভাই থাকলে তোমাকে দ্রৌপদী বলে ডাকতাম।"

বিনুর মহাভারত পড়া ছিল, দ্রৌপদীর উল্লেখে লজ্জায় তাহার মুখ আনত হইল। কিন্তু সেই লজ্জার মধ্যে কত আনন্দ গৌরব। যাহাকে সে এ পর্য্যন্ত কিছুই দেয় নাই,

দিতে পারে নাই, সেই তাহার সামান্য রান্না খাইয়া এত পুলকিত।

বিনু নীরব, প্রসাদ বধূর লজ্জা ভাঙাইতে নানা বিষয়ের অবতারণা আরম্ভ করিল, "তুমি ত দিব্যি বোনা জান, তরু-সুমুর গায়ের জামা দেখলাম। শুনলাম, ক্ষিতির মোজা হচ্ছে। ওরা ভাগ্যবান, তাই পায়। আমি অভাগা, কেউ কিছুই দেয় না। 'অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুখায়ে যায়'।"

প্রসাদ ইচ্ছা করিয়া গলার স্বর করুণ করিয়াছিল, বিনু তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিগলিত হইল। বিনা বাক্যব্যয়ে সে আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল তাহার কাপড়ের আলমারির নিকটে।

আঁচলের চাবি দিয়া আলমারি খুলিয়া তখনই সে ফিরিয়া আসিল প্রসাদের কাছে। কাগজের ঠোঙায় জড়ানো একটা জিনিস প্রসাদের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিল, "এই নাও, তোমার জন্যে বানিয়ে রেখেছি। ক্ষিতির মোজা হয়ে গেলেই তোমাকে মোজা, সোয়েটার, মাফলার বুনে দেব।"

প্রসাদ কাগজের ভিতর হইতে বাহির করিল গাঢ় গোলাপি পশমে বোনা মস্ত একটা গোলাপ ফুল। থরে-বিথরে পাঁপড়ি মেলিয়াছে। গোলাপের নিম্নে পকেট-ঘড়ি লুকাইয়া রাখিবার একটি পকেট।

পুলকিত প্রসাদ পকেট হইতে বাহির করিল আতরে সিক্ত একটু তুলা। আতর সুবাসে ভরিয়া গেল কক্ষ।

তখন মেয়েদের কঙ্কণসদৃশ ছেলেদের হাত ঘড়ির প্রচলন হয় নাই। বিনুর বিবাহে বিনুর বাবা জামাতাকে সোনার পকেট-ঘড়ি, চেন যৌতুক দিয়াছিলেন। বিনু গোপনে প্রসাদের জন্য এটা বুনিয়া রাখিয়াছিল। এটা তাহাকে শিখাইয়াছিল সেই বাবার ছাত্রী আরতুলা।

প্রসাদ পত্নীর প্রথম উপহার নাকের কাছে ধরিয়া মুখে বুলাইয়া আনন্দে মুখর হইল—"বাঃ, কি সুন্দর গোলাপ করেছ বিনু, মনে হচ্ছে সত্যি ফুল। বুদ্ধি করে আতর মেখে রেখেছ, এতেই এর মূল্য আরও বেড়ে গেছে। তুমি আমাকে উপহার দিলে, আমিও তোমার জন্যে উপহার এনেছি এই দেখ কত বই।"

বই শুনিয়াই বিনুর মন দমিয়া গেল। বই সম্বন্ধে প্রসাদ তাহার মনে বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছে। কি নিরস, গম্ভীর পাঠ্য-পুস্তক। সে কি উপহারের বস্তু! তবু বিনু সাগ্রহে হাত বাড়াইল স্বামীর উপহার লইতে।

নূতন বাঁধাই ঝকঝকে একগাদা বই। 'কড়ি ও কোমল', সদ্য প্রকাশিত 'নৌকাডুবি' ও 'চোখের বালি', রমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থাবলী, মেঘনাদ বধ কাব্য। ইহার মধ্যে বিনুর পাঠ্যপুস্তক একটিও নাই। বিনু স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করিয়া আনন্দিত হৃদয়ে একটির পরে একটি বই চোখের সামনে খুলিতে লাগিল।

সে কত দিতেছে তাহার মনোতুষ্টির জন্য, বিনু ভদ্রতা করিয়া কহিল, "কি সুন্দর বইগুলি, এর একটাও আমি পড়ি নি। এত বই আমার, কি মজা। এবার বুঝি আমার পড়ার বই আন নি? পড়ার বই ক'খানা আমার পড়া শেষ হয়েছে। অনেক জায়গা মুখস্থ করে রেখেছি।"

"লক্ষ্মী মেয়ের কথা, কাল আমি সে-সব দেখব। তুমি গল্পের বই পড়তে ভালবাস, এখন এইগুলো প'ড় পরে আরও এনে দেব। পড়ার বই থাকুক এখন। কেউ বুঝিয়ে না দিলে যে কিছু জানে না তার পক্ষে পড়া মুস্কিল। আমার পরীক্ষা হয়ে গেলে আমি যখন বাড়ী আসব তখন আনব তোমার পাঠ্য বই। দুই-তিন মাস বাড়ী থাকব, তার ভেতরে তোমাকে মোটামুটি শিক্ষা দিতে পারব। তুমি যত ইচ্ছা বই পড়, হাতের লেখাটা বন্ধ ক'রো না।"

বিনু প্রশান্ত চিত্তে প্রশ্ন করে, "দোলের সময় ত তুমি আর একবার আসবে?"

"না, তখন আমার পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে যাবে। পড়া-শোনার সময় এখন না এলেই ভাল হ'ত, তবু এলাম সাত দিনের জন্যে।"

"সাত দিন কেন? বড় দিনের না দশ দিন ছুটি?"

"হ্যাঁ দশ দিন কলেজ বন্ধ। কিন্তু কত দূরে থাকি তার কি হিসাব নেই? যাওয়া-আসায় কত সময় নষ্ট হয়। ও কি বিনু, তোমার কি ঘুম পেয়েছে? চোখ বুজে রয়েছ কেন?"

বিনু সচকিত হইয়া মুখ তুলিল, 'ঘুম পাবে কেন? অত আলোয় কি কারও ঘুম পায়? নবীন যে ঝাড় নিবিয়ে দিয়ে গেল না, সব মোমবাতি পুড়ে যাচ্ছে?"

'মোমবাতি হয়েছে পোড়ার জন্যেই। যে আলো

এতদিন জলে নি, আজ সে জলুক। এক মোমবাতি পুড়ে যাবে আরও মোমবাতি আছে। ঝাড় নিবিয়ে দিতে নবীনের দরকার হবে না, সময় হ'লে আমিই নিবিয়ে দেব। তোমাকে এ অবধি আমি কোন ভাল বই পড়িয়ে শোনাই নাই। এই মেঘনাদ বধখানা এবার তোমাকে পড়ে শোনাব। অনেক বড় বড় কঠিন শব্দ রয়েছে, যা তোমাকে বুঝিয়ে না দিলে তুমি বুঝতে পারবে না। না বুঝলে লেখার রস পাওয়া যায় না। এই বইখানা বুঝতে পারলেই তোমার বাংলা শেখা এগিয়ে যাবে। এর পরে আমি ফিরে এসে মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত রঘুবংশ কুমারসম্ভব ; বানভট্টের কাদম্বরী পড়ে শোনালে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে। তার পরে ইংরাজী।"

ইংরাজী শব্দ শুনিয়া বিনু সভয়ে কম্পিত হইয়া বলে, "কি যে বল তুমি, আমি কি অত শিখতে পারব ? আমার যে মোটা মাথা ? তা হ'লে অন্য বইগুলি আমি তুলে রেখে আসি। একখানা করে বের করব আর পড়া হবে। বাইরে রাখলে সকলে চেয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলবে। মেঘনাদ বধ বাইরে থাকুক, তুমি পড়বে।"

বিনু উঠিয়া সবগুলি বই সস্নেহে বুকে চাপিয়া আলমারিতে তুলিয়া রাখিয়া আসিল।

কি জানি কি ভাবিয়া পানের কর্ত্রী কামিনীর মা তাহার শিয়রের রূপার ত্রিপদির উপরে রূপার ডিবায় কয়েক খিলি পান ও মশলা রাখিয়া গিয়াছিল। বিনু পান খাইতে ভালবাসে, ডিবা খুলিয়া দুই খিলি পান মুখে পুরিয়া মশলা আগাইয়া দিল প্রসাদকে। সে পান খায় না।

প্রখর আলোয় বিনুর অস্বস্তি লাগিতেছিল, তরুর প্রতি রাগ হইতেছিল। সখের বলিহারি ! রাতকে দিন করিলেই কি সে দিবা হইয়া যায় ? রাত্রি মানুষের আরামের, শান্তির। শীতের শীতল রাত লেপের তলায় না যাইয়া উনি এখন ঝাড়ের নীচে কাব্য আলোচনা করিতে বসিবেন। আশ্চর্য্য, অদ্ভুত রায়বাড়ীর বড়ছেলে। শয়নের নাম নাই, ঘুমের কথা নাই।

বিনু স্বামীর দিকে মেঘনাদ বধ বইখানা ঠেলিয়া দিয়া বলে, "তুমি এখন পড়া সুরু করে দাও, আমি বসে শুনি। এখন থেকে সুরু না করলে বই শেষ হবার আগেই তোমাকে চলে যেতে হবে। রাত বেশী হয়ে গেলে শীতে হাড় কাঁপবে, তখন চেয়ারে বসে থাকতে পারবে না।"

প্রসাদ সহাস্যে বলে, "তোমার হাড়ে শীতের কাঁপন লাগলে তুমি লেপের নীচে যেয়ো। আমার কাঁপন লাগে না। আজ আমি পড়ব না, কাল থেকে হবে। তোমার ভয় নেই বিনু, বই শেষ অবধি তোমাকে না শুনিয়ে আমি যাব না।"

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

একত্রিংশ অধিবেশন - লক্ষ্ণৌ—১৯১৬

[পাঁচ]

২৮শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের প্রকাশ্য অধিবেশনের পর বিষয় নির্বাচনী সমিতির কার্য আরম্ভ হয়। অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ও মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রস্তুত স্বায়ত্ত-শাসনের পরিকল্পনা বিষয় নির্বাচনী সভাতে বিশেষ ভাবে আলোচিত হ'ল। আমি পূর্বেই বলেছি যে, গত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনের সময় প্রত্যেক সদস্যের হাতে মুদ্রিত পরিকল্পনা দেওয়া হয় যাতে পরিকল্পনা পড়ে প্রস্তুত হয়ে তারা উক্ত সমিতির পরবর্তী অধিবেশনের আলোচনায় যোগ দিতে পারে। আমরা বাংলার প্রতিনিধিগণ সেগুলি পকেটস্থ করে লক্ষ্ণৌ সহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে বেড়াতে লাগলাম সুতরাং ওগুলি পকেট থেকে বের করবার আর অবকাশ পেলাম না। আজ যখন সমিতির অধিবেশনে উক্ত পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হ'ল—তখন দেখে বিস্মিত হ'লাম যে, মাদ্রাজের প্রত্যেক প্রতিনিধি—কি বৃদ্ধ, কি যুবক—উক্ত পুস্তিকাগুলি লাল-নীল পেনসিলের দাগ দিয়ে ভাল করে পড়ে এবং মার্জিনে নোট করে আলোচনা সভায় যোগ দিতে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। যাঁরা আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, জনপ্রিয় নেতা মহম্মদ আলি জিন্না, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুসলিম লীগের নেতা মজঃহর-উল হকের কথা বিশেষ ভাবে মনে আছে। লক্ষ্য করলাম যে, যখনই কোন বক্তা অসংলগ্ন কথা বলেছেন তৎক্ষণাৎ মাদ্রাজের কোন-না-কোন সদস্য—বৃদ্ধ অথবা যুবক—on a point of order বলে দাঁড়িয়েছেন। Point of order উত্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশবরেণ্য নেতাদের মধ্যে যিনি তখন আলোচনা করছিলেন তিনি তৎক্ষণাৎ আসন গ্রহণ করেছেন এবং সভাপতি মহাশয়ের সিদ্ধান্তের পর পুনরায় দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য বলেছেন। এই বিতর্ক সভায় জিন্না সাহেবের ডিবেট করার ক্ষমতা ও বিশেষ বাচনভঙ্গি পরিলক্ষিত হল। লোকমান্য তিলকের সহিত জিন্না সাহেবের বাদানুবাদ বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়েছিল। জিন্না সাহেবের বক্তৃতায় তিলক মহারাজ মাঝে মাঝে বাধা দিচ্ছিলেন। জিন্না সাহেব এক সময় বললেন "You won't be able to side track me, Mr. Tilak." বাংলা দেশের বাঘা বাঘা ব্যক্তিগণ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেহ এই বিতর্কে যোগ দেন নি। আলোচনার পর পরিকল্পনা গৃহীত হ'ল। পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং বললেন যে, এ দিন তাঁর জীবনের অতি গৌরবময় দিন (proudest day of my life)। সুরেন্দ্রনাথের আনন্দোদ্ভাসিত ও গৌরবদীপ্ত চেহারা আমার মনে এখনও মুদ্রিত হয়ে আছে। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে পাটনা হাই কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মজঃহর-উল হক সাহেব আনন্দ প্রকাশ করলেন। এই মজঃহর-উল হক সাহেব পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর অধীনে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং পাটনার বিখ্যাত সাদাকত আশ্রমে ফকিরের জীবন যাপন করেন। উপরোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে কংগ্রেস সর্বপ্রথম মুসলমানদের জন্য আইন সভা প্রভৃতিতে পৃথক নির্বাচনের প্রথা মেনে নিলেন এবং নেতারা মনে করলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ চিরকালের জন্য নিবারিত হ'ল। বিপুল আনন্দের সঙ্গে আমরা সেদিন যে বিষবৃক্ষ রোপণ করলাম তার তিক্ত ফল স্বাধীন ভারতের নাগরিকগণ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এখন ভোগ করছে। লক্ষ্ণৌয়ে রোপিত বিষবৃক্ষ ক্রমে মহীরুহে পরিণত হয়ে আমাদের দেশকে দ্বিধাবিভক্ত করল।

[ছয়]

২৯শে ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে কংগ্রেসের তৃতীয় দিনের প্রকাশ্য অধিবেশন আরম্ভ হয়। যথারীতি বঙ্গীয় মহিলাগণ কর্তৃক 'বন্দে মাতরম' গান গীত হওয়ার পর জনৈক মুসলিম যুবক একটি উর্দু কবিতা পাঠ করলেন।

এবারকার কংগ্রেসের সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল কংগ্রেস লীগ কর্তৃক প্রস্তুত স্বায়ত্ত-শাসনের পরি-

কল্পনা। উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করতে যখন সুরেন্দ্রনাথ দণ্ডায়মান হ'লেন তখন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দ্বারা সমবেত জনতা তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানাল। হর্ষধ্বনি থামতে কয়েক মিনিট লেগে গেল। তৎপর সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু কংগ্রেস-লীগ স্কীম পড়লেন। এর পর সুরেন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন সুপ্রসিদ্ধা শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, মাননীয় শ্রীমজহর-উল্ হক, বোম্বাইয়ের ধনকুবের স্যর দিনশা পেটিট (জিন্না সাহেবের শ্বশুর), বিদর্ভের (বেরারের) নেতা মাননীয় শ্রী আর. এন্. মুধোলকর, বিদর্ভের অন্যতম নেতা শ্রী জি. কে. খপর্দে। যুক্তপ্রদেশের অন্যতম নেতা এলাহাবাদ হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ অ্যাডভোকেট মাননীয় ডঃ তেজ বাহাদুর সাপ্রু (পরবর্তীকালে স্যর উপাধিভূষিত ও বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বর), মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল মাননীয় রাও বাহাদুর বি. এন. শর্মা, বোম্বাই হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীজোসেফ ব্যাপিষ্টা, বোম্বাইয়ের অন্যতম ধনকুবের শ্রীজাহাঙ্গীর বোমানজী পেটিট, লক্ষ্ণৌ চীফ কোর্টের উকিল শ্রীগোকরণ নাথ মিশ্র, মাদ্রাজ হাই কোর্টের উকিল মাননীয় গোবিন্দ রাঘব আয়ার, পাঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ নেতা ব্যারিষ্টার অর্থনীতিজ্ঞ শিল্পপতি লালা হরকিষণ লাল। বেহারের তৎকালীন নেতা গয়ার ব্যারিষ্টার শ্রীপরমেশ্বর লাল, সুপ্রসিদ্ধা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও ভারতের অন্যতম স্বনামধন্য নেতা অসাধারণ বাগ্মী শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়গণ। এঁদের মধ্যে লোকমান্য তিলক, শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত, শ্রীখপর্দে ও শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতা দিতে উঠলে সমবেত দর্শকমণ্ডলী বিপুল হর্ষধ্বনি দ্বারা তাঁদের অভ্যর্থনা করে। প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল।

তিলক, বেশান্ত, খপর্দে ও বিপিন পালের নাম তখন দেশের ঘরে ঘরে প্রচারিত ছিল।

১৯০৬ সালের কংগ্রেসে লোকমান্য তিলক উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তাঁকে ভাল করে দেখতে পাই নি। এবার তাঁকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করলাম। সে সময়ে "লাল-বাল-পালের" (লালা লাজপৎ রায়, বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল) নাম লোকের মুখে মুখে ফিরত। এই ত্রি-মূর্তির দু'জন এবার কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন।

লোকমান্য তিলক অসাধারণ পণ্ডিত ও তেজস্বী নেতা ছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন চন্দ্র বা শ্রীমতী বেশান্তের মত ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারতেন না। ধীরে ধীরে যুক্তিপূর্ণ ভাষায় ভাষণ দিতেন।

শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তকে এই কংগ্রেসে প্রথম দর্শন করলাম। তাঁর বাগ্মিতার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। সুসাহিত্যিক বার্ণাড শ বলেছেন যে, তিনি (বেশান্ত) শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী। তিনি থিওসফিকাল সোসাইটির সভানেত্রী ছিলেন এবং ভারতকে তাঁর মাতৃভূমি জ্ঞানে এ দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মাদ্রাজ সহরের উপকণ্ঠে অ্যাডেয়ারে থিওসফিকাল সোসাইটির বিরাট্ প্রতিষ্ঠান ও বেনারস হিন্দু স্কুল তাঁর কর্মপ্রতিভার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সৌম্যমূর্তি বেশান্ত মহোদয়া তাঁর বাগ্মীতায় আমাদিগকে বিস্মিত ও অভিভূত করলেন।

লালা হরকিষণ লালের নাম তখন সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এই কংগ্রেস অধিবেশনের বহু বৎসর পরে একবার আমি পরলোকগত বন্ধু নলিনীমোহন রায় চৌধুরীর সঙ্গে কোন ব্যবসা-সংক্রান্ত, বিষয়ে আলোচনা করার জন্য লালা হরকিষণ লালের সঙ্গে কলিকাতায় গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে দেখা করি। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ মেধা দেখে আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলাম।

এর পরের প্রস্তাবে শ্রীসি. পি. রামস্বামী আয়ার প্রস্তাব রামস্বামী আয়ার মহাশয় স্বায়ত্ত শাসন লাভের জন্য প্রচার কার্য চালাতে কংগ্রেস কমিটিগুলিকে, হোমরুল লীগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে আবেদন জানালেন। লক্ষ্ণৌয়ের "দি অ্যাডভোকেট" পত্রিকার সম্পাদক শ্রী সি. এস. রঙ্গ আয়ার প্রস্তাব সমর্থন করার পর প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

পরের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ অ্যাডভোকেট শ্রীচিমনলাল শীতল বাদ। এই প্রস্তাবটি ছিল যুদ্ধ ও জনবল সম্বন্ধে। এ দ্বারা ভারতীয় অফিসরের অধীনে একটি সৈন্যবাহিনী অবিলম্বে গঠন করার দাবি গভর্ণমেন্টের নিকট পেশ করা হয়। শ্রী জি. এ. নটেশন কর্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

এই প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর সেদিনকার মত অধিবেশন শেষ হল।

অপরাহ্ণ ৫টার সময় বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হল। পরের দিনের প্রস্তাবগুলি আলোচনা করে সাব্যস্ত হ'ল।

[সাত]

৩০শে ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৯টার সময় কংগ্রেসের শেষ দিনের অধিবেশন আরম্ভ হ'ল। বঙ্গীয় মহিলাগণ কর্তৃক "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত গীত হওয়ার পর সভাপতি মহাশয় অধ্যক্ষ মাননীয় আর. পি. পরাঞ্জপে মহাশয়কে পাটনা ইউনিভার্সিটি বিল সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করতে আহ্বান করলেন। আমাদের ছাত্রজীবনে পরাঞ্জপে মহাশয় অঙ্ক শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান ও বিগ্তার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেই পরাঞ্জপে মহাশয়কে আজ দেখলাম। তিনি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা পাটনা ইউনিভার্সিটি বিলের বহু দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করে সেগুলির সংশোধন দাবি করলেন। প্রস্তাব সমর্থন করলেন মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর এল্. এ. গোবিন্দরাঘব আয়ার, সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক মিষ্টভাষী সৌম্যদর্শন মাননীয় ডাক্তার নীলরতন সরকার, শ্রী এস্. সিংহ (সচ্চিদানন্দ সিংহ, পাটনা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও সাংবাদিক) এবং লালা হরকিষণ লাল। প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল।

এর পর কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীইন্দুভূষণ সেন ভারত রক্ষা আইন ও ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশন (যার বলে বিনা বিচারে নির্বাচনের ও অন্তরীণের ব্যবস্থা ছিল) সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। প্রস্তাব সমর্থন করলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল শ্রী কে. এন্, আয়ার, ঢাকার উকিল সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও লাহোরের ব্যারিষ্টার লালা নানক চাঁদ মহাশয়গণ। ৯১ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীশ বাবু এখনও সুস্থ শরীরে কলিকাতায় বাস করছেন।

পরবর্তী শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উপস্থিত করলেন শ্রী জি. এস. আরেনডেল (ইংরাজ, থিওসফিকাল সোসাইটির অ্যাডায়ার সেবাশ্রমের কর্মী, শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত মহোদয়ার শিষ্য এবং সুপ্রসিদ্ধা নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী রুক্মিণী আরেনডেলের স্বামী)। প্রস্তাব সমর্থন করলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল মাননীয় এ. এস্. কৃষ্ণ রাও, মসলিপত্তনের অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার অধ্যক্ষ শ্রী কে. হনুমন্ত রাও, পাঞ্জাবের লালা সুন্দর লাল ও সীতাপুরের (যুক্তপ্রদেশ) উকিল শ্রী এ. কে. বোস মহাশয়গণ। প্রস্তাব যথারীতি গৃহীত হ'ল।

পরে কতকগুলি মামুলি প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় কর্তৃক উত্থাপিত হয়ে গৃহীত হওয়ার পর আগামী বৎসরের জন্য নির্বাচিত অল-ইণ্ডিয়া কমিটির সদস্যদের নাম সভাপতির নির্দেশে কংগ্রেসের সেক্রেটারী শ্রীসুব্বা রাও পাঠ করলেন।

সভাপতি মহাশয় তখন সকলের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা সমিতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে আহ্বান করলেন। যথাযোগ্য ভাষায় ভূপেনবাবু ধন্যবাদ দিলেন।

এর পর প্রিয়দর্শন বিখ্যাত নেতা মাননীয় পণ্ডিত, মদনমোহন মালব্য মহাশয় তাঁর স্বাভাবিক সুললিত, ভাষায় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। প্রত্যুত্তরে সভাপতি মহাশয় যথোচিত বললেন। একত্রিংশ কংগ্রেসের অধিবেশন এই খানেই সমাপ্ত হল।

লক্ষ্য করার বিষয়, জিন্না সাহেব যদিও বিষয় নির্বাচনী সমিতির বিতর্কে যোগদান করেছিলেন কিন্তু তিনি প্রকাশ্য অধিবেশনে কোন অংশ গ্রহণ করেন নি। তার কারণ হয়ত এই হ'তে পারে যে, তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন সুতরাং কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করা সমীচীন মনে করেন নি।

কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ মুসলিম লীগের অধিবেশনে যোগ দিতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। জিন্না সাহেব তখন আমাদের হৃদয়ে ভারতের স্বাধীনতাকামী বিশিষ্ট নেতারূপে প্রতিভাত ছিলেন, সুতরাং আগ্রহের সহিত অন্যান্য প্রতিনিধিদের সহিত আমিও মুসলিম লীগের অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলাম। জিন্না সাহেব য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে শোভিত ছিলেন কেবল মাথায় ছিল ফেজযুক্ত লালটুপি (যাহা সাধারণে টার্কিশ ক্যাপরূপে পরিচিত ছিল)। মুসলিম লীগের সভায় যোগদান করে বিশেষ আনন্দলাভ করেছিলাম।

৩০শে ডিসেম্বর কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হওয়ার পর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে ঠাকুর রাজেন্দ্র সিং মহাশয় প্রতিনিধিগণকে কাইসার বাগে একটি সান্ধ্য সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করেন। ঐ পার্টিতে যোগ দিতে গিয়ে কাইসার বাগের অঙ্গনে ভ্রাম্যমান লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে নিজেকে ধন্য মনে ক'রেছিলাম।

কংগ্রেস অধিবেশনের সমাপ্তির পর লক্ষ্ণৌ সহর ভাল ক'রে দেখার জন্য আমিনাবাদ পার্কে একটি বাঙ্গালী হোটেলে ২।৩ দিনের জন্য রয়ে গেলাম।

লক্ষ্ণৌ দেখার পর কলিকাতা ফেরার পথে কয়েকটি স্থান দেখার ইচ্ছা ছিল। কোন সঙ্গী পেলাম না। একাকীই রওনা হ'লাম। প্রথমে প্রতাপগড় দেখব মনে ক'রে ঐ ষ্টেশনে নামলাম কিন্তু শুনলাম যে সহর ষ্টেশন থেকে অনেক দূর, সুতরাং প্রতাপগড় দেখার ইচ্ছা দমন ক'রে ফৈজাবাদের ট্রেণের জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ট্রেণ এল। তাতে চেপে যখন ফৈজাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছুলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। জানুয়ারী মাসের প্রচণ্ড শীতে যেন জমে গেলাম। মাথায় মাংকি ক্যাপ, গায়ে সোয়েটার, কোট ও ওভারকোট। হাতে গরম দস্তানা ও পায়ে গরম মোজা থাকা সত্ত্বেও শীতে কাঁপতে লাগলাম। গাইডবুক ফৈজাবাদে কতকগুলি ধর্মশালার কথা লেখা ছিল, কোন একটি ধর্মশালাতে রাত্রি যাপনের মানসে একটি টাঙ্গাওয়ালার শরণাপন্ন হ'লাম। টাঙ্গাওয়ালাকে যে-কোন একটি ধর্মশালায় পৌঁছে দিতে বলায় সে বলল, "বাবুজী হিঁয়া ধরমশালা কাঁহা? ধরমশালা তো অযোধ্যাজী মে হ্যায়।" পুণ্যতীর্থ অযোধ্যা নগরী ফৈজাবাদ থেকে ৪।৫ মাইল দূরে অবস্থিত। আমি বিপন্ন বোধ করলাম। টাঙ্গাওয়ালা বলল যে, "হিঁয়া আচ্ছা মুসাফিরখানা হ্যায়।" আমি উত্তর দিলাম যে, "হুঁয়াই লে চল।" আমি ভাবলাম যে মুসাফিরখানা নিশ্চয়ই একটি ভাল বাসস্থান। টাঙ্গাওয়ালা আমাকে নিয়ে একটি প্রকাণ্ড ফটকের ভিতর দিয়ে মুসাফিরখানার চত্বরে পৌঁছুল। নেমে দেখি, অঙ্গনের চতুষ্পার্শ্বে টাঙ্গাওয়ালা ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর মুসলমানে ভর্তি। বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম কিন্তু উপায় নাই। টাঙ্গাওয়ালার সাহায্যে আমার স্যুটকেশ, বিছানা ইত্যাদি লটবহর দোতলায় তোলা হ'ল। মুসাফিরখানা, দেখাশুনার ভার ছিল এক বৃদ্ধা মুসলমানীর ওপর। টাঙ্গাওয়ালা তাকে ডেকে নিয়ে এল। বৃদ্ধা আমাকে একটি কামরায় নিয়ে গিয়ে সেখানে যে একটি লোক খাটিয়ায় শুয়ে ছিল তাকে হটিয়ে দিয়ে সেই ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিল। আমি টাঙ্গাওয়ালার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে তাকে পরদিন প্রাতঃকালে এসে আমাকে নিয়ে ফৈজাবাদ-সহর দেখিয়ে অযোধ্যায় পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিলাম। টাঙ্গাওয়ালা চ'লে গেলে ঘরে আমার জিনিষ-পত্র বন্ধ ক'রে বাইরের শিকলে তালা লাগিয়ে সন্নিকট-বর্তী বাজারে আহারের ব্যবস্থা করতে গেলাম। গরম পুরী ও মিষ্টান্ন দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রে মুসাফিরখানায় ফিরে এটাচি কেস থেকে মোমবাতি, বাতিদান ও দেশলাই প্রভৃতি বের ক'রে আলো জ্বাললাম। ঘরে দু-খানি খাটিয়া ছিল কিন্তু সভয়ে দেখলাম যে, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করার কোন উপায় নেই। দরজায় ছিটকানি বা খিল কিছুই ছিল না। এতে আমার মানসিক উদ্বেগ কেমন হ'ল তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। খানিক বাদে মুশাফিরখানার কর্ত্রী সেই বৃদ্ধা আমার থাকার তদারক করতে এসে আমার মনোভাব অনুমান ক'রে আমাকে আশ্বাস দিল—"বাবুজী খটকা মত কিজিয়ে; হিয়া কোই ডর নেহী।" বুড়ী আমাকে আশ্বস্ত ক'রে চলে গেল। আমি দরজা বন্ধ ক'রে একটি খাটিয়া দরজার গায়ে লাগিয়ে আর একটি খাটিয়া তার সঙ্গে ঠেস দিয়ে বিছানা পেতে শয়ন করলাম। মনে মনে স্থির করলাম যে সারারাত জেগে কাটিয়ে দেব। এই মনে ক'রে আমার শিয়রের কাছে বাতিদান রেখে আমি একখানি বই পড়তে আরম্ভ করলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ে ছিলাম মনে নেই। পরদিন প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ ক'রে উঠে কোন বিপদ ঘটে নি দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

মুখ-হাত ধুয়ে দরজায় তালা বন্ধ ক'রে আমি দোকানে চা খেতে গেলাম, ফিরে বিছানা-পত্র বেঁধে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। পূর্বরাত্রির নির্দেশমত যথাসময়ে টাঙ্গাওয়ালা এসে হাজির হ'ল। মালপত্র সমস্ত টাঙ্গায় চাপিয়ে আমি সহর প্রদক্ষিণ করতে বেরুলাম। ফৈজাবাদ সহর যুক্তপ্রদেশের একটি জেলার প্রধান সহর। এখানে একটি সৈন্যদের ছাউনি আছে। পথে যেতে যেতে দেখলাম যে অনেকগুলি বাড়ীতে বাঙ্গালী উকিলের নামের প্লেট টাঙ্গানো আছে। তখন মনে হ'ল যে, এঁদের একজনের বাড়ীতে গত কাল রাত্রে অতিথি হ'লে আরামে ও নির্ভয়ে থাকতে পারতাম। কিন্তু জানা না থাকায় সে চেষ্টা করি নি।

অযোধ্যার নবাবদিগের প্রথম রাজধানী ফৈজাবাদে ছিল। পরে লক্ষ্ণৌ সহরে স্থানান্তরিত হয়। প্রথম পাঁচজন নবাব এখান থেকেই রাজত্ব করেছেন। তাঁদের সমাধি ও ইমামবাড়া প্রভৃতি দেখলাম। সমস্ত-গুলিই অতি সুন্দর ও পরিচ্ছন্নভাবে রক্ষিত হচ্ছে। লক্ষ্ণৌয়ের ইমামবাড়ার মত বৃহৎ না হ'লেও এখানকার ইমামবাড়াগুলিও দেখতে বেশ সুন্দর। পথে নদীর

তীরে এক জায়গায় টাঙ্গা থামিয়ে টাঙ্গাওয়ালা গফতর ঘাট দেখাল ও বলল যে রামচন্দ্র—নির্বাসনের সময় এই ঘাটে নদী পার হ'য়ে সীতা ও লক্ষ্মণ সহ দক্ষিণ দিকে গমন করেন।

ফৈজাবাদ পরিদর্শন ক'রে ঐ টাঙ্গায় আমি পুণ্যতীর্থ অযোধ্যা নগরীতে পৌঁছে এক বিরাটকায় পালোয়ানের মত চেহারার এক পাণ্ডার খপ্পরে তার বাসায় আশ্রয় নিলাম। পাণ্ডার সঙ্গে সরযূ নদীতে স্নান করতে গিয়ে দেখি যে নদী বৃহৎ বৃহৎ কচ্ছপে পরিপূর্ণ। নদীতে নামতে ভয় করতে লাগল। কোন প্রকারে স্নান সেরে রামচন্দ্রের জন্মস্থান দেখতে গেলাম। রামচন্দ্রের জন্মস্থান ব'লে যে জায়গা প্রসিদ্ধ তার একেবারে গা ঘেঁষে একটি মসজিদ দণ্ডায়মান। জন্মস্থান দেখিয়ে পাণ্ডা আমাকে অযোধ্যা রাজপুরীর ধ্বংসাবশেষ দেখাতে নিয়ে গেল। বিভিন্ন কক্ষে রাজা দশরথ, রাম সীতা লক্ষ্মণ প্রভৃতির মূর্তি রক্ষিত আছে। একটি ঘরে গিয়ে দেখলাম যে, সাদা পাথরের চাকতি-বেলনা একেবারে ঘরের মেঝের সঙ্গে আঁটা আছে। শুনলাম যে এটি রন্ধনশালা ছিল এবং সীতা-দেবী ঐ চাকতি বেলনায় পুরী তৈয়ারী করতেন। কত রকমেই যে তীর্থস্থানে পয়সা উপার্জনের ব্যবস্থা হয়েছে।

দর্শনাদি সেরে ফিরে এসে পাণ্ডার বাসায় ঘৃত-সংযোগে অড়হরের দাল ও তরকারি সহ ভাত খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে বেলা পড়ে এল। আমার সে রাত্রে অযোধ্যায় থাকার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পাণ্ডার ভাব-ভঙ্গি দেখে নানাপ্রকার আশঙ্কা হ'তে লাগল। বাসায় আমি ছাড়া দ্বিতীয় যাত্রী ছিল না। ওখানে রাত্রি যাপনের জন্য পাণ্ডার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও আমি জোর ক'রে বেলা থাকতে থাকতে বেরিয়ে এসে একটি টাঙ্গাভাড়া ক'রে ট্রেণের সময়ের বহুপূর্বেই ষ্টেশনে রওনা হ'লাম। যে ট্রেণে চড়লাম সে ট্রেণ বেনারসে বদলিয়ে অন্য ট্রেণে কলিকাতা যেতে হয়। বেনারস ষ্টেশনে ট্রেণ থেকে নেমে কলিকাতার ট্রেণের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল। আমার বেনারস দেখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু অযোধ্যায় মন বিক্ষিপ্ত হওয়ায় আর কোথাও অপেক্ষা না ক'রে সোজা কলিকাতায় চ'লে এলাম এবং সেখান থেকে আমার কর্মস্থল রাজসাহী ফিরে গেলাম।

ইতিহাস কথা কয়

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

(১৮)

ইতিহাসে হাজী বেগমের কোন নাম নেই। অথচ শাজাহান অমর হয়ে রয়েছেন। মমতাজমহলের প্রতি তাঁর অচপল প্রেমের নিদর্শন মার্বেলের অবয়বে তাজমহল আজও সাক্ষ্য বহন ক'রে চলেছে। কিন্তু হাজী বেগমও অমর হয়ে থাকবার উপযুক্তা। পত্নীপ্রেমের প্রতিবিম্ব পতিপ্রেম তাকে মহীয়সী করে তুলেছে। তাজমহলের মতই সুন্দর এক স্মৃতিসৌধের স্বপ্ন শাজাহানেরও অনেকদিন আগে হাজী বেগম দেখেছিলেন চোখের আলোতে। সে স্বপ্নকে তিনি পার্থিব রূপ দিতে পেরেছিলেন বেশ কিছুদিন পরে, ছেলে আকবরের রাজত্বকাল সুরু হবার সামান্য কয়েকটি বছর গড়িয়ে গেলে।

হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধ। স্বামীর উদ্দেশ্যে বিরহকাতরা বিধবা পত্নীর শ্রদ্ধার্ঘ। স্বামীর স্মৃতিকে চোখের সামনে ধরে রাখবার জন্য তিনি গড়ে তুলেছেন এক সুন্দর স্মৃতিসৌধ। নিজামুদ্দীন যাওয়ার পথে সেই স্মৃতিসৌধ নিশ্চয়ই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

হাজী বেগম ছিলেন হুমায়ুনের প্রিয়তমা পত্নী। বাদশাহ আকবরের জননী। ইতিহাসে হুমায়ুন বড় দুর্বল হয়ে চিত্রিত রয়েছেন। পিতা বাবর তাঁর নিজের জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে গিয়েছেন পুত্র হুমায়ুনকে। কিন্তু হুমায়ুন যেন অসাফল্যের এক মূর্ত প্রতীক। পিতার গ'ড়ে-তোলা সাম্রাজ্য পাঠান শেরশাহ তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। রাজ্যচ্যুত হুমায়ুন ছুটে বেড়িয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। মরুপ্রান্তরে, জনহীন পথে, দুর্গম গিরিসংকটে তার নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী মূর্তি বারবার দেখা গিয়েছে। আশ্রয়ের জন্য হুমায়ুন ছুটে চলেছেন গিরিকন্দর, বিজন অরণ্য, নালা-নদী ডিঙিয়ে পারস্যের পথে।

হাজী বেগম বা হামিদা বেগমের সঙ্গে সেই দুর্দিনে মিলন হয়েছিল হুমায়ুনের। সেই ভ্রাম্যমান জীবনে চতুর্দশী হামিদা বেগমের কোলে এলেন আকবর। এই এক হিসেবে হুমায়ুনের খ্যাতির তুলনা নেই। সুযোগ্য সন্তানের পিতা তিনি। শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাটের জনক নাসিরুদ্দীন মহম্মদ হুমায়ুন।

আর একটি বিষয়েও হুমায়ুনের নাম ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে। তাঁর বিধবা পত্নী, সম্রাটের সমাধির উপর যে সুন্দর স্মৃতিসৌধ গড়ে তুলেছেন, তাজমহল অনেকাংশে সেই সৌধের নকল। তাজমহলের ডিজাইনার হুমায়ুনের সমাধিসৌধ দেখে অনেকখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইতিহাস এইখানে হুমায়ুনকে চিরদিন স্মরণ ক'রে রেখেছে।

পিতার সাম্রাজ্য হাতে পেয়ে হুমায়ুন দিল্লীতে এক নতুন কেল্লা স্থাপনের কথা চিন্তা করলেন। তার সভাসদদের মধ্যে অনেক জ্যোতিষী ছিলেন। ১৫৩৩ খ্রী: তাঁরা সম্রাটকে বোঝালেন যে, বৎসরটি সম্রাটের পক্ষে খুব শুভ। অতএব দিল্লীর কেল্লা নির্মাণের কাজ অবিলম্বে সুরু করা হোক। কেল্লার নাম দিলেন হুমায়ুন 'দীন পানাহ' অর্থাৎ, ধর্মের আশ্রয়স্থল। দিল্লী পৌঁছে দুর্গের ভিত্তি-প্রস্তরটি স্থাপন করলেন সম্রাট। তারপর ফিরলেন আগ্রার পথে। এবার স্থলপথে নয়, যমুনার জলে ভেসে। সুন্দর এক প্রাসাদোপম বজরা গড়িয়েছিলেন সম্রাট। যমুনার বুকে সেই তরীতে ভেসে হুমায়ুন চললেন আগ্রার পথে।

শেরশাহের কাছে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে নিদারুণ পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল হুমায়ুনকে। কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পিছু হটতে হ'ল। হয়ত হারতেন না হুমায়ুন। কিন্তু নিজের চালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছিলেন সম্রাট। রাজা হবার পর ভাই কামরাণকে পঞ্জাব, সিন্ধু নদীর পরবর্তী সমস্ত প্রদেশগুলি দিয়েছিলেন। ফলে নতুন সৈন্য আর নিযুক্ত করতে পারলেন না সম্রাট, পঞ্জাব এবং সিন্ধুনদীর তীরবর্তী কর্মঠ মানুষদের মধ্য থেকে। তা ছাড়া গৃহবিবাদ। ভাইরা কেউই তেমন সাহায্য করেন নি হুমায়ুনকে। ফল পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ।

পাঠান শেরশাহ হুমায়ুনের চেয়ে অনেক দৃঢ়চেতা ও মনোবলসম্পন্ন ছিলেন। সামান্য কয়েক বৎসরের রাজত্বকালেই তিনি অসংখ্য প্রজাহিতকর কাজ ক'রে গেছেন। গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড আজও তাঁর নাম সগৌরবে ঘোষণা করে। নানা কীর্তির জন্য খ্যাত এই পাঠান

সম্রাট বিচারক হিসাবেও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর পক্ষপাতহীন বিচারের সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে।

একদা শেরশাহের বড় ছেড়ে আদিলশাহ বেরিয়েছেন আগ্রার পথে। বিরাট্ এক হস্তীর পিঠে আরোহণ করেছেন আদিলশাহ। তার সামনে-পিছনে চলেছে সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য। হঠাৎ আদিলশাহের দৃষ্টি পড়ল পথপার্শ্বের একটি গৃহের দিকে। আগ্রার এক অধিবাসীর সুন্দরী স্ত্রী স্নান করছিলেন গৃহ অভ্যন্তরে। হাতীর পিঠ থেকে সুন্দরী মেয়েটিকে দেখলেন আদিলশাহ। সুন্দর টানা টানা চোখ, নিখুঁত অঙ্গসৌষ্ঠব। মেয়েটির অঙ্গে বসন ছিল না, শুধু শীতল জল রমণী-তনুকে সিক্ত ক'রে তুলেছিল। বাসনার তরল স্রোত প্রতিহত হ'ল আদিলশাহের মানস-তটে। মেয়েটিকে ভাল লাগল তার। তখনই মনে মনে সুন্দরীর সঙ্গ কামনা করলেন সম্রাট-সন্তান। একটি পান হাতে তুলে নিলেন আদিলশাহ। ছুঁড়ে দিলেন মেয়েটির দিকে। হাসলেন অর্থপূর্ণ হাসি।

কিন্তু রমণী মানেই ব্যভিচারিণী নয়। একথাটা জানা ছিল না আদিলশাহের। তিনি দেখেছিলেন শুধু নর্তকী আর বারবনিতা। কোনদিন খোঁজ নেন নি গৃহস্থবধূর শুচিমনের নির্মলতা। মেয়েটিকে তৎক্ষণাৎ সরে যেতে দেখলেন আদিলশাহ। গৃহদ্বার রুদ্ধ হ'ল। আদিলশাহের দেওয়া পান পড়ে রইল মাটিতে। মেয়েটি হেঁটে গিয়েছিল তার উপর দিয়ে। দুমড়ানো-মোচড়ানো পানটির দিকে চেয়ে সভয়ে সরে গেলেন আদিলশাহ।

পরদিন সেই নাগরিক এল সম্রাটের দরবারে। মেয়েটির স্বামী বলে পরিচয় দিল শেরশাহের কাছে। সমস্ত ঘটনা বিবৃত ক'রে বিচার চাইল সখেদে।

সম্রাট চিন্তিত হ'লেন। কি বিচার করবেন তিনি? মুসলমান আইনে প্রতিশোধ গ্রহণের নীতি ছাড়া অন্য কিছুর সন্ধান পেলেন না শেরশাহ। তাই রাজ-আদেশ ঘোষিত হ'ল তাঁর কণ্ঠে। অন্য কিছু নয়। ঐ নাগরিক হাতীর পিঠে চড়ে বের হবেন পথে। আদিলশাহের সুন্দরী স্ত্রী তখন স্নান করবেন নগ্ন হয়ে। সম্রাটের পুত্রের মতই পান ছুঁড়ে দেবে ঐ অপমানিত আগ্রাবাসী, আদিলসাহের সুন্দরী পত্নীর দিক লক্ষ্য করে।

শেরশাহের আদেশ হারেমের মধ্যে এক মৃত্যুশীতলতা এনে দিল। এ কি আজব আদেশ? সম্রাটের পুত্রবধূকে সইতে হবে এই অকথ্য অপমান?

হারেমের মেয়েরা লুটিয়ে পড়ল শেরশাহের চরণে। সম্রাট তুলে নিন তার আদেশ। এ নিদারুণ অপমান কোন মেয়েরই সইবে না। কিন্তু শেরশাহ অনড়, অটল। বিচারকের ভূমিকায় তিনি পক্ষপাতহীন। শেষে মেয়েদের মিনতিতে দ্রব হ'ল সেই নাগরিকের অন্তর। সম্রাটকে কুর্নিশ জানিয়ে বলল আগ্রাবাসী—রাজ-আদেশ জেনেই সে সন্তুষ্ট। আর সম্পন্ন করতে হবে না সেই আদেশ। সম্রাটের কাছে তার আর কোন অভিযোগ নেই।......

দীর্ঘ পনের বৎসর পরে আবার রাজ্য ফিরে পেলেন হুমায়ুন। শেরশাহ তখন মারা গিয়েছেন। সিংহাসনে সিকন্দর লোদী। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সিরহিন্দের যুদ্ধে সিকন্দরকে হারিয়ে দিলেন হুমায়ুন। দিল্লী আবার তার করায়ত্ত হ'ল।

সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা গিয়েছিলেন হুমায়ুন। কিন্তু তার আগের একটা ইতিহাস আছে। রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর মাত্র কয়েক মাস বেঁচে ছিলেন হুমায়ুন। এই কয়েক মাসে জ্যোতিষের উপর ভয়ানক আস্থা জন্মেছিল সম্রাটের মনে। সুন্দর এক প্রাসাদ গড়ে তুলেছিলেন বাদশাহ। জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা বসত এখানে। উজ্জ্বল পালিশসম্পন্ন ঘরগুলির নাম দিয়েছিলেন হুমায়ুন। কোনটির নাম মঙ্গল, কোনটি বুধ, কোনটি বা বৃহস্পতি। এক একটি গ্রহের নামে নাম। তার মৃত্যুর কারণও এই জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর অগাধ বিশ্বাস।

একদিন বাদশাহ শুনলেন যে শুক্রগ্রহ আজ সন্ধ্যাকাশে দৃষ্ট হবে। হুমায়ুন মনে মনে স্থির করলেন যে, শুক্রগ্রহ দেখতে পেলে তিনি কয়েকজন অমাত্যকে উচ্চতর পদে উন্নীত করবেন। এতে তার সাম্রাজ্যের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হবে। এই উদ্দেশ্যে হুমায়ুন উঠলেন শেরমণ্ডলের চূড়ায়। এমন সময় আজানের ধ্বনি শোনা গেল। কিলা কোণা মসজিদের উপর থেকে মোল্লা সুর তুলে আজান দিচ্ছিলেন। হুমায়ুন বসলেন সিঁড়িতে। আজান শোনা শেষ হ'লে নামবেন তিনি। তখন সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। আকাশে তারা ফুটেছে একটি-দু'টি। দিল্লী নগরীতে আলো জ্বলে উঠছে এক এক ক'রে। গৃহস্থবধূ শাঁখে ফুঁ দিয়ে সন্ধ্যাকে আহ্বান জানাচ্ছে।

আজান শোনা শেষ হ'ল। হুমায়ুন উঠলেন আবার। পা বাড়ালেন শেরমণ্ডলের সিঁড়িতে। কিন্তু নিয়তি দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর সামনে। হুমায়ুনকে গ্রহণ করলেন হাত বাড়িয়ে। পা ফস্কে গেল বাদশাহের।

গড়িয়ে পড়লেন হুমায়ুন। সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে চললেন নীচের দিকে। অন্ধকারে তার মৃত প্রাণহীন দেহ শেষ সিঁড়ির এক কোণে পড়ে রইল।

শেরমণ্ডল তৈরী করেছিলেন শেরশাহ। হুমায়ুন তাঁর লাইব্রেরী হিসেবে ব্যবহার করতেন এটি। জ্যোতিষ নিয়ে নানা চর্চা করেও হুমায়ুন কোনদিন টের পান নি, যে ঘরে বসে জ্যোতিষের নানা গ্রন্থ পাঠ করেছেন তিনি, সেই সৌধের সিঁড়িতেই তাঁর শেষ প্রাণবায়ু নির্গত হবে।

জ্যোতিষ তাঁকে মৃত্যুর সন্ধান দিতে পারে নি। শেষের সে ভয়ঙ্কর দিনটি তার কাছে কুয়াশাচ্ছন্ন গিরি-চুড়ার মতই রহস্যময় রয়ে গেল।

খানিকটা হেঁটে মাঝখানে এলেই সমাধিসৌধটির নিকটে। প্রায় পাঁচ ফুটের মত উঁচু একটি প্রশস্ত বেদী মতন জায়গা। আকারে প্রায় বর্গ, কিন্তু কোণগুলি কাটা। সব মিলিয়ে একটা অষ্টভুজের মত। মূল সৌধটির এই ছোট ছোট বাহুগুলির প্রত্যেকটিতে একটি খিলান-বিশিষ্ট দরজা। আর বড় বাহুগুলির উপর একধার খিলানের সুন্দর সৌষ্ঠব। এরই মাঝামাঝি ভিতরে ঢুকবার সিঁড়ি। আর তাই বেয়ে আমরা উপরে উঠলাম।

হুমায়ুনের এই সমাধি-সৌধের মধ্যে শেষশয্যা গ্রহণ করেছেন আরও অনেকে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম বেশ কয়েকটি। প্রিয়তমা পত্নী হামিদা বেগম স্বামীর সমাধির কাছেই পরম শান্তির ঘুমে চির আচ্ছন্ন

হুমায়ুনের সমাধি

(১৯)

যমুনার তীরে হুমায়ুনের সমাধি-সৌধ। চারপাশে উঁচু প্রাচীরবেষ্টিত একটি উদ্যানের মধ্যে এই সুন্দর সৌধটির রচনা হয়েছে। পশ্চিম দিক হ'তে একটি সুন্দর গেটওয়ে বা প্রবেশদ্বার অতিক্রম ক'রে হুমায়ুনের সমাধিসৌধে পদার্পণ করতে হয়। প্রবেশদ্বারের দুইদিকে যে প্রাচীর সমান্তরাল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে তার গায়ে খিলানের ভিতর ছোট ছোট ঘরের আকৃতি। প্রবেশ-দ্বার পেরিয়েই উদ্যানের ভিতর ঢুকলাম। সোজা

হয়ে আছেন। একদা স্বামীর নানা সুখ-দুঃখের যিনি হয়েছিলেন অংশীদার, নানা সঙ্কটে, দুঃসময়ের দিনে ও দুঃস্বপ্নের রাতে স্বামীর সঙ্গে থেকেছেন সহনশীলা পত্নী হিসাবে, মরণের পরে সেই স্বামীর সমাধির কাছেই তিনি রইলেন শেষ নিদ্রায় শায়িতা হয়ে। আর রয়েছেন দারাশিকো। শাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র, নিষ্ঠুরভাবে যাকে হত্যা করিয়েছিলেন ঔরঙ্গজীব। দারাশিকোর মাথা-খানি কর্তন ক'রে পাঠান হয়েছিল শাজাহানের কাছে। মস্তকহীন দেহখানিকে সমাধিস্থ করা হয়েছে এখানেই। সম্রাট জাহান্দর শাহ (ঔরঙ্গজেবের পৌত্র) এবং তাঁর

দুর্ভাগা উত্তরাধিকারী ফারুকসিয়রের সমাধি এখানেই। ফারুকসিয়রকে বিষপানে হত্যা করিয়েছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী। আর রফিউড্ডারজৎ এবং রফিউদ্দৌল্লা, যাঁরা পর পর সম্রাটের আসন গ্রহণ করেছিলেন স্বল্পতম রাজত্বকাল (মাত্র তিনমাস) কাটাবার জন্য। দ্বিতীয় আলমগীরের সমাধিও এখানেই। মন্ত্রী ইমাদ-উল-মুলক ষড়যন্ত্র ক'রে, খুন করিয়েছিলেন দ্বিতীয় আলমগীরকে। আরও বহু রাজবংশধর, ইতিহাস যাদের স্মরণ করে রাখে নি তাদেরও সমাধি এই হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধে।

মধ্যখানের ঘরটিতে হুমায়ুনের সমাধি। লাল বেলেপাথরে নির্মিত এই ঘরখানির গায়ে মার্বেলের সাহায্যে অলঙ্করণ করা হয়েছে। আকৃতিতে এটিও কোণ-কাটা বর্গক্ষেত্র বা প্রায় অষ্টভুজের মত। এই ছোট ছোট বাহুগুলিই বাইরের চারিটি অষ্টভুজাকৃতি বুরুজের এক একটি ভুজ। সমাধিসৌধের মাথায় একটি বৃহৎ আকৃতি মার্বেল গম্বুজ। বৃহৎ হ'লেও এর বহির্দিক হ'তে এটি দৃষ্টিশোভন নয়। Beglar সাহেব এটির সম্বন্ধে সুন্দর একটি তুলনা করেছেন। তাঁর মতে গম্বুজের ঘাড়টি পুরো গম্বুজটির আকৃতির তুলনায় নেহাৎই সরু। দেখলে মনে হয় কে যেন শ্বাসরোধ করে এর অপমৃত্যু ঘটিয়েছে।

গম্বুজের মাথায় একটি তামার চুড়া। অষ্টভুজাকৃতি বুরুজগুলির মধ্যে সুউচ্চ খিলান নির্মিত হয়েছে। এই খিলানের উপরের দেওয়ালকে আরও খানিকটা তোলা হয়েছে, যাতে গম্বুজটি যে সমবর্তুল ভিত্তির উপর নির্মিত, সেটি ঢাকা পড়ে। কিন্তু বুরুজের ছোট বাহুগুলির উপর খিলান অঙ্কিত হ'লেও সেখানে দেওয়ালের উচ্চতা আর বাড়ান হয় নি। পরিবর্তে এর প্রতিটি কোণে একটি আচ্ছাদনের মত রচিত হয়েছে। আচ্ছাদনের মাথায় ছোট ছোট মার্বেলের গম্বুজ।

মধ্যখানের ঘরটিতে হুমায়ুনের সমাধি। ঠিক উপর-তলার ঘরটিতে অনুরূপ নকল সমাধি। সম্রাটের সমাধি উচ্চ পালিশসম্পন্ন মার্বেল পাথরে মোড়া। প্রায় ইঞ্চি ছয়েকের মত উঁচু। সাদা মার্বেলে বাঁধান সমাধির উপর কালো মার্বেল পাথরের দাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এর উপর কোন লিপি উৎকীর্ণ করা হয় নি।

একদা হুমায়ুনের সমাধিসৌধের গম্বুজের ভিতরের ছাদে সুন্দর কারুকার্য্যের সৃষ্টি করা হয়েছিল। ছত্রিগুলি ঢাকা ছিল নীল টাইলে। গম্বুজের ভিতরের মধ্যখান হ'তে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল সুন্দর স্বর্ণলেশ। কিন্তু পরবর্তীকালে জাঠেরা তাদের গোলাবারুদে এগুলি নষ্ট করে দেয়। খোঁজ করলে বুলেটের দাগ এখনও বোঝা যায়। নীল টাইলের বদলে আজ কলঙ্কের মত কালো কালো ছোপ ছাড়া গম্বুজের গায়ে আর কিছু দেখা যায় না।

দিল্লীর স্থাপত্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সৈয়দ মুক্তবা আলী লিখেছেন—'মোগল যুগ আরম্ভ হ'ল হুমায়ুনের কবর দিয়ে। সেখানে ইরাণ তুরানের প্রাধান্য। কিন্তু ছত্রি এবং পদ্মফুলের ডিজাইন এখানে প্রচুর এবং কারু-কার্যেও হিন্দু প্রাধান্য বেশী'…।

হুমায়ুনের সমাধিসৌধের সঙ্গে তুলনা চলে তাদের। প্রথমটি বিরহকাতরা বিধবার সৃষ্টি, মৃত স্বামীকে স্মরণ করে। দ্বিতীয়টি এক প্রেমিক স্বামীর মর্মর স্বপ্ন, তার দয়িতাকে অমর করে তুলতে। একদা হুমায়ুনে ছিল, লাল বেলেপাথর, শুভ্র মার্বেল এবং নীল টাইলের সুন্দর সামঞ্জস্য। আর তাজমহল আজও শুভ্র ধবল। আলী-সাহেব লিখেছেন,… …'হুমায়ুনে দার্ঢ্য, তাজে মাধুর্য।' কারণ প্রথমটি পত্নীর সৃষ্টি, তাই পৌরুষের চিহ্ন বেশী। দ্বিতীয়টি স্বামীর রচনা, তাই রমণীসুলভ সুষমা ও লালিত্যের ছড়াছড়ি।

কিন্তু হুমায়ুনের সমাধিসৌধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি করুণ স্মৃতি। তার উল্লেখ করা সমীচীন। এখানেই দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ শিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজের কাছে ধরা দেন। আর তাঁর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের দেখার সঙ্গে সঙ্গেই গুলী করে মেরেছিলেন ক্যাপ্টেন হডসন। এই সমাধিসৌধের চত্বরেই সেদিন রক্তাপ্লুত দেহগুলি ঢলে পড়েছিল। নির্মম ও নিষ্ঠুর সেই হত্যাকাণ্ডের কোন প্রতিবাদই সেদিন সম্ভব হয় নি।

এই সুপরিসর স্থানটির মধ্যে ছোটখাটো অনেকগুলি সমাধির সঙ্গে কয়েকটি প্রিয় সম্পর্কের চিহ্ন বিদ্যমান। ফহিম খান নামক জনৈক নফরের সমাধি এখানেই দেওয়া হয়। সে ব্যক্তি ছিল আবদুর রহিম খান খানানের ভৃত্য। হুমায়ুনের পরমপ্রিয় এক নাপিতকে শেষ শয্যায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে। আকবরের পরামর্শদাতা বৈরাম খানের পুত্রের একটি সুদৃশ্য সমাধিও চোখে পড়বে। এর উপরের মার্বেল গম্বুজটি শাহ আলম অযোধ্যার নবাব আসফ-উদ-দৌল্লাকে পঁচিশ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করে দেন।

(২০)

কুতুব না দেখে দিল্লী দেখা কখনই শেষ হয় না। কুতুবমিনার,—যার নির্মাণকার্য সুরু হয়েছিল

কুতুবউদ্দীন আইবেকের রাজত্বকালে, এবং সারা হয়েছিল আরও বহু বৎসর পরে। আজও তার সঙ্গে পাল্লা দেবার মত একটি মিনারও কেউ তৈরী করতে পারে নি। হ্যাঁ, চেষ্টা করেছিলেন আলাউদ্দীন খিলজী। কিন্তু তাঁর সুন্দর স্বপ্ন পরিণতি লাভ করে নি। কিছু মিনারিকা (minaret) তৈরী হয়েছে। তাজমহলের মিনারিকাগুলি বা আহমদাবাদে রাণী সিপ্রির মসজিদে একটি সুন্দর দর্শন মিনারিকা অনেকের চোখে পড়েছে। কিন্তু কুতুবমিনার স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল।

কুতুব দেখতে বেরুলাম খুব সকালে উঠে। কালী-বাড়ীর সামনেই এক টাঙ্গাওলার সঙ্গে চুক্তি হ'ল। পুরো পাঁচ টাকা নেবে। তবে হ্যাঁ, টাঙ্গাতে চারজনের বসবার জায়গা। ইচ্ছে করলে টাঙ্গাওলা ওখানে লোক নিতে পারে। পথের পাশে দাঁড়িয়ে যাঁরা অপেক্ষা করছেন তাঁরা এসে বসতে পারেন অন্য দু'টি সীটে, স্বচ্ছন্দে। আপত্তি করবার মত কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। আসুক না দু'জনে। এতটা পথ আলাপ ক'রে যাওয়া যাবে।

কুতুব যাওয়ার জন্য অবশ্য বাসও আছে। সামান্য ভাড়া। আমি কিন্তু ইচ্ছে করেই বাস নিলাম না। যেতে যেতে ভাবলাম, ভাগ্যিস্ বাসে ক'রে যাই নি। বাসে গেলে এই মধুর শীতের সকালে এতখানি পথ এমন সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পারতাম না। সত্যি, দিল্লী থেকে কুতুব বড় সুন্দর পথ। নয়া দিল্লীর বিখ্যাত অশোকা হোটেলকে বাঁ দিকে ফেলে রেখে টাঙ্গা এগিয়ে চলল। পথের মধ্যে অফিসযাত্রী মানুষের দেখা পেলাম। দু'টি-চারটি নয়···অসংখ্য। সাইকেলের মিছিল ক'রে মানুষ চলেছে অফিসমুখো।···

কুতুবমিনারের চারপাশ বড় শান্ত ও নিস্তব্ধ। খোঁজ নিয়ে জানলাম, দ্বিতলের উপরে আর উঠতে দেওয়া হয় না। কবে কি দুর্ঘটনা যেন ঘটেছে, তাই কুতুবমিনারের দ্বিতলের ঊর্ধ্বে যাওয়া হয়েছে নিষিদ্ধ। চারজনের একটি ছোট্ট দলকে একসঙ্গে উঠতে দেওয়া হয় উপরে। এর কম হ'লে মিনারে উঠতে আছে বাধা।

টাঙ্গায় চড়ে আমাদের সঙ্গে আসেন নি কেউ কুতুব-মিনার দেখতে। সেজন্যই টিকিট কেটে অপেক্ষা করতে হ'ল আমাদের। প্রায় আধঘণ্টা আমরা ঘুরে বেড়ালাম। কুতওতুল ইসলাম মসজিদের ধ্বংসাবশেষ, আলাউদ্দীন খিলজীর তৈরী দরওয়াজা, আর্চ ও লৌহ-স্তম্ভ ইত্যাদি কিছুই বাদ দিলাম না। কাজেই কুতুবে উঠবার অনুমতি পেতে আমাদের প্রায় দশটা বাজল। একসঙ্গে প্রায় জনদশেক লোক ঢুকলাম আমরা। তার মধ্যে একটি সুন্দর যুবক আর তার তরুণী সঙ্গিনীর কথা এখনও মনে আছে। মনে থাকার অবশ্য বিশেষ একটি কারণ আছে। কিন্তু সে কাহিনীর অবতারণা আরও কিছু পরে।

কুতুবমিনার কার সৃষ্টি সে বিষয়েও সামান্য কিছু মতভেদ আছে। ইতিহাস-মতে সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেক এর নির্মাণকার্য সুরু করেন। এমনও অসম্ভব নয় যখন তিনি মহম্মদ ঘোরীর অধীনে প্রদেশের শাসন-কর্তা ছিলেন তখনই এর নির্মাণকার্য সুরু হয়ে যায়। কিন্তু সুলতান কুতুবউদ্দীন তাঁর রাজত্বকালে একে সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। এটি শেষ করেছিলেন সুলতান আলতামাস। আলাউদ্দীন খিলজী মিনারটিতে বেলেপাথর যোগ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে বজ্রাঘাতে এর উপরের দু'টি তলা বহুলাংশে নষ্ট হয়। তখন ফিরোজশাহ তুঘলক বদান্যতা দেখিয়ে এই দু'টি তলাকেই নতুন করে নির্মাণ করান। হয়ত সে সময়ই মার্বেলকে এই দু'টি তলাতেই লাল বেলেপাথরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

কিন্তু ফিরোজশাহ তুঘলকই শেষ নন। কুতুব-মিনারকে টিকিয়ে রাখতে আরও অনেককে সচেষ্ট প্রয়াস করতে হয়েছে। সিকন্দর লোদীর রাজত্বকালে বিদ্যুৎ আবার এর উপরে এসে পড়ে। সুলতান সিকন্দর লোদী সে ক্ষতিটুকু পূরণ করে দেন। তারপর বহুদিন কুতুব-মিনারের আর কোন সংস্কার হয় নি। কিন্তু ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের এবং ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে কুতুবমিনার ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্রিটিশ আমলে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মেজর রবার্ট স্মিথ বেশ কয়েক সহস্র টাকা ব্যয় ক'রে কুতুবমিনারের বহু জীর্ণতা দূর করেন। এই টাকার বেশ কিছুটা অংশ খরচ হয় মিনারের উপরের গোলাকার শীর্ষদেশটি তৈরী করতে।

কিন্তু মেজর স্মিথের তৈরী শীর্ষদেশটি বেশী দিন রাখা সম্ভব হয় নি। আসলে মেজর স্মিথ যা গড়েছিলেন তা এক হিসাবে কুতুবমিনারের ছ'তলা এবং সাততলা বলা যায়। ছয়তলাটি একটি লাল বেলেপাথরের গম্বুজ, আটটি পাথরের থামের উপর দাঁড় করান। এতে রেলিং ইত্যাদির মত আরও কিছু কারুকার্য করেছিলেন স্মিথ সাহেব। সাততলাটি আরও সাধারণ। এটি শিশুকাঠের একটি আচ্ছাদন-বেষ্টিত বস্তু। মাথায় পতাকা ধরবার একটি ধ্বজদণ্ড।

উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আদেশে শিশুকাঠের এই

আচ্ছাদনযুক্ত মণ্ডপটিকে নামান হয়। নতুন তৈরী শীর্ষ দেশটিকে ব্যঙ্গ করে দিল্লীর বণিকরা তাদের নুন ও আচারের পাত্রগুলিকে নবনির্মিত কুতুবমিনারের আকারে তৈরী করে। ফলে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ এই আটকোণা শীর্ষদেশটিকেও অপসারিত করবার আদেশ দেন। কিন্তু স্মিথ সাহেব ফিরোজশাহ তুঘলকের নির্মিত শীর্ষদেশটি ঠিক হুবহু নির্মাণ করতে না পারলেও মিনারের সংস্কারকার্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রমের সঙ্গে সমাপ্ত করেন। এর পরের দু'-একটি ছোটখাটো ভূমিকম্পেও মিনারের কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয় নি। বলা বাহুল্য এখন সরকারী আর্কিয়োলজিক্যাল বিভাগের পরিচালনাধীন হয়ে আছে কুতুবমিনার, ভাঙ্গা আলাই-দরওয়াজা, কুব্বতুল ইসলাম মসজিদের ধ্বংসাবশেষ, আর্চ ও অন্যান্য মূক ঐতিহাসিক সাক্ষীগুলি।

এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মিনারটিকে হিন্দুরাও নিজেদের দিকে টেনে নিতে চেয়েছে। এর সৃষ্টি যে এক হিন্দু রাজার, সে দাবি তারা যথাযথ উপস্থাপিত করেছে। কিংবদন্তীর মত সুন্দর গল্প তৈরী হয়েছে এই নিয়ে। প্রচলিত যে, ধনে, ঐশ্বর্যে, শক্তি ও ক্ষমতায় প্রবল প্রতাপশালী এক রাজা ছিলেন এ অঞ্চলে। পরমাসুন্দরী এক মেয়ে ছিল তাঁর। রাজকন্যা শুধু রূপমতী ছিলেন না, ছিলেন ভক্তিমতী। প্রতিদিন সকালে নদীতে গিয়ে স্নান করতেন রাজকন্যা। তার আগে জলস্পর্শ করত না মেয়ে। পুণ্যস্রোতা নদীকে না দেখে দিন সুরু করতে চাইত না তার মন। নয় রকমের পাথরে গাঁথা মালা দুলত রাজকন্যার গলায়। স্নান ক'রে সেই মালাটি নদীর জলে ধুয়ে নিতেন রাজকন্যা। তারপর গলায় পরতেন সেটিকে সযত্নে।

কিন্তু পথ দিন দিন দূর হচ্ছিল, নদী তার গতিপথ করছিল পরিবর্তন। রাজকন্যাকে যেতে হ'ত অনেকখানি রাস্তা। প্রতিদিন এতখানি পথ যাওয়া পছন্দ হয় নি রাজার। মেয়েকে তিনি নানাভাবে বোঝালেন। অবশেষে রাজকন্যাও রাজী। তবে এক সর্তে। প্রতিদিন সকালে নদীর জল চোখের সামনে দেখতে হবে তাকে।

মেয়ের জন্য অসম্ভবকে সম্ভব করলেন রাজা। বিশাল এই মিনারকে গড়লেন তিনি। এর উপরে উঠে রাজকন্যা দেখুক না চিকচিকে নদীর বালি, ছলছল নদী-জল আর বহমান স্রোত।...

রূপকথার গল্পের মত এই কাহিনাকে বাদ দিলেও আর একটা দিক আছে। এত বড় মিনার তৈরী হয়েছে শুধু ভারসাম্য রক্ষা করে। গণিতের উপর যথেষ্ট দখল না থাকলে এই বিশাল মিনার গড়ে তোলা একান্তই অসম্ভব হ'ত। এই দক্ষতা হিন্দুদেরই ছিল। সেই হিসেবে ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ মনে করেন যে, এর সৃষ্টির মূখে হিন্দুদের যথেষ্ট প্রয়াস ছিল। কিন্তু মিনারের গায়ে কুতুবউদ্দীন আইবেক এবং মহম্মদ ঘোরীর নাম উৎকীর্ণ হয়েছে। কোরাণের নাম বাণী ও আল্লার নাম খোদিত হয়েছে কুতুবমিনারের বুকে। এ সবই সাক্ষ্য দেয় যে, কুতুবমিনার রচিত হয়েছিল মুসলমান নরপতির আদেশে। তবে একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, মিনার রচনা করতে যোগ দিয়েছিল বহু হিন্দু শ্রমিক ও স্থপতি। এমনও অসম্ভব নয় যে, সমস্ত মিনারটির প্ল্যান বা কৌশল কোন হিন্দু গণিতজ্ঞের অবদান।

দশজনের ছোট্ট দলটি আস্তে আস্তে উঠতে সুরু করলাম। সিঁড়ির গায়ে বেশ অন্ধকার। খাড়াই ও অপ্রশস্ত সিঁড়িগুলি উঠতে বেশ কষ্ট। একতলা পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই আমরা দু'-এক জায়গায় বসলাম খানিকক্ষণ। আবার উঠছি। উপরে সুন্দর প্রশস্ত ব্যালকনির মত। আলো, আলো...অন্ধকারের কণা মাত্র নেই।

কুতুবমিনারের দ্বিতলই বেশ উঁচু। এখান থেকে বহুদূর দেখা যায়। নয়া দিল্লীর প্রাসাদশ্রেণী, ইতিহাসের নানা ধ্বংসাবশেষ চেয়ে চেয়ে দেখলে চোখে আসে। সহযাত্রীরা সবাই ব্যস্ত। কেউ ছবি তুলছেন, কেউ সঙ্গিনীর সঙ্গে মশগুল গল্পে। উপর থেকে এখানের সব-কিছু দ্রষ্টব্যগুলিকে বার বার লক্ষ্য করলাম। কিছুক্ষণ পরেই সকলে নামতে সুরু করেছে। কোন একসময় আমরাও নামতে উদ্যোগ করেছি। সিঁড়ির বুকে পা দিয়ে আমার স্ত্রী বললেন, 'সবাই নেমে যাচ্ছে তাতে কি? চল না, আমরা আরও খানিকক্ষণ দাঁড়াই ওখানে।'

কি ভেবে আমিও ফিরলাম। কুতুবমিনারের নীচে, ব্যালকনিতেই এক সুন্দর প্রেমের দৃশ্য অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সামান্য একটু এগিয়েছি। কুতুবমিনারের দ্বিতলে আর কেউ নেই। শুধু সেই যুবক ও তরুণী। মিনারের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। বড় বড় চোখে মিষ্টি হাসি। আর ছেলেটি সামনে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে দেখছে ওকে। তর্জনী আর বৃদ্ধ অঙ্গুলির সাহায্যে মেয়েটির চিবুকটি তুলে ধরেছে সে। টকটকে লাল মেয়ের ঠোঁটটি। ওর গালের রং আরও গোলাপী। মেয়েটি কেমন অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে

দূর আকাশের দিকে। আমার মনে হ'ল ছেলেটি যেন এখনই ওর কানে কানে গান শোনাবে—'ও আমার গোলাপবালা গো, একটি চুম্বন মাগি।'

কুতুবমিনারের প্রথম তলার গায়ে কোণ আর বাঁশীর নক্শা। দ্বিতীয় তলাতে বাঁশী। তৃতীয় তলাতে শুধু কোণের ছড়াছড়ি। অপর দু'টি তল সাদামাটা। সেখানে এখন আর কোন নকশা নেই। একদল ছিল কি না কে জানে! মিনারে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা অনেকখানি শক্ত। ইমারতের সঙ্গে এখানেই পার্থক্য। কুতুবমিনার একটা আঙ্গুলের ডগায় দাঁড় করান সার্কাসবাজির লাঠির মত। সেখানে কলা-প্রচেষ্টা ফুটিয়ে তোলা এবং তাকে সার্থক করে তোলা দুরূহ প্রয়াস। কিন্তু কুতুব যাঁরা গড়েছিলেন, সেই মানুষগুলি এ প্রয়াসে সম্পূর্ণ সার্থক।

কুতুবমিনার সেরা মিনার। হয়ত কুতুবউদ্দীন আইবেকের নামেই এর নাম হয়েছে কুতুবমিনার। কিংবা কুতুব শব্দের অর্থানুসারে এর কুতুবমিনার (Kutb—pole of the earth) নাম করা হয়েছে। উচ্চতায় মিনারটি প্রায় ২৩৮ ফিটের মত উঁচু। প্রথম তলাটি কয়েক ফিট কম একশত ফিটের মত। সম্ভবত তিনশত ছিয়াত্তরটি ধাপ সিঁড়ি আছে এতে। এই বিশাল মিনারটি গড়তে অর্থ ছাড়াও পরিশ্রম প্রভূত ব্যয়িত হয়েছে। যে লাল বেলেপাথর এর অঙ্গে রয়েছে, তাকে আনতে হয়েছে সুদূর আগ্রা থেকে। মার্বেলের যেটুকু কাজ এতে শোভা পাচ্ছে তাকে আনয়ন করা হয়েছে সুদূর মাক্রানা (Makran) থেকে। কাজেই কুতুবমিনার গড়তে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মিনার গড়তে চেয়েছিলেন আলাউদ্দীন খিলজী। এই দুঃসাহসী সুলতানের পক্ষেই এ কাজ সম্ভব ছিল। কুতুবমিনারের কাছেই অসমাপ্ত আলাইমিনার সকলের চোখে পড়বে।

আলাইমিনারের কঙ্কালটি আমরাও দেখলাম। পরিধিতে বা বেড়ে এই মিনারটিকে কুতুবের দ্বিগুণ গড়তে চেয়েছিলেন সুলতান। আকৃতিতে সেই কুতুবমিনারের গড়ন। তবে বাহির থেকে বত্রিশটি দিক। প্রতিটি আট ফুটের মত লম্বা। অসমাপ্ত অংশটুকুর পরিধি দু'শত বাহান্ন ফুটের মত। সম্পূর্ণ তৈরী হ'লে বাঁশী আর কোণের সুন্দর নক্শা-জড়িত এই বিশাল মিনারটিকে কি চমৎকারই না দেখতে লাগত।

কিন্তু যে সুন্দর স্বপ্ন সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী দেখেছিলেন তা আর পাথরে, রঙে, নানা বিচিত্র আঁকিবুকিতে সম্পূর্ণতা পায় নি। মিনার শেষ হবার আগেই হানাহানি কাটাকাটি ভরা এই জীবনকে শেষ করে ফেলেছিলেন সুলতান। তার পরবর্তী কেউ আর একে সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন মনে করে নি।

আলাইমিনারের ভূমিদেশে আজ ফুটেছে নানা বিচিত্র বর্ণ সীজন ফ্লাওয়ার। অসমাপ্ত মিনারটিকে তারা করেছে আরও শ্রীমণ্ডিত।...এ দৃশ্য সকলেরই ভাল লাগবে।

নিজের জীবনে কোন কিছুর কাছেই হার মানেন নি সুলতান আলাউদ্দীন। তাঁর দুর্মদ বাসনা, দুর্বার গতিতে গ্রাস করেছে সব কিছু। কিন্তু কুতুবমিনারের কাছে মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে তার। পাল্লা দিতে সুরু করেও কুতুবকে অতিক্রম করতে পারলেন না আলাউদ্দীন। নতুন মিনার শেষ হবার বহু আগেই অন্য এক দেশের পরোয়ানা পেলেন তিনি। কুতুবমিনার অজেয়ই থেকে গেল।

ক্রমশঃ

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

(চব্বিশ)

দু'তিনদিন রামকিঙ্কর দোকানে বসল না। অথচ খাওয়া-শোওয়া ওখানেই চালাতে লাগল। প্রতিদিন ভাবে, দরখাস্তের নোটিশটা আজ আসবে। কিন্তু আসে না।

সেও একটা অস্বস্তি। জনৈক তাঁতির ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। কিন্তু ফাঁসি আর হয় না। একদিন রেগে-মেগে জেলারকে বললে, মশাই, ফাঁসি দেবেন ত দিন। নইলে তাঁত কামাই যাচ্ছে!

রামকিঙ্করের সেই অবস্থা। তার চাকরিও যাচ্ছে না, নতুন চাকরি খোঁজার চেষ্টাও জাগছে না।

একদিন সকালে বাইরে বেরুবার জন্যে জামা পড়ছে, এমন সময় হরেকৃষ্ণ এসে উপস্থিত।

—বেরুচ্ছ?

তার দিকে না চেয়েই রামকিঙ্কর বললে, হুঁ।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হরেকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলে, কি ঠিক করলে?

—কিসের?

—কাজের। তুমি কি এখানে কাজ করবে না?

এবার রামকিঙ্কর স্থির দৃষ্টিতে হরেকৃষ্ণের দিকে চাইলে। বললে, সেই কথা আমি আপনাকেই জিগ্যেস করব ভাবছিলাম। আমার চাকরি কি আছে?

হরেকৃষ্ণ হাসলে: না থাকলে কি তুমি জানতে পারতে না?

—জানতে পারছি না বলেই ত অস্বস্তি।

—অস্বস্তি আমরাও কিছু কম ভোগ করছি না।

—কেন?

—তুমি যেমন বুঝতে পারছ না, তোমার চাকরী আছে কি নেই, আমরাও তেমনি বুঝতে পারছি না, তুমি এখানে চাকরি করবে কি না।

—চাকরি থাকলে করব না কেন?

—বি. এ. পাস করেছ, এ চাকরিতে কি মন ভরে?

রামকিঙ্কর হাসলে। কোন জবাব দিলে না।

একটু অপেক্ষা করে হরেকৃষ্ণ বললে, করবে যদি ত দোকানে বসছ না কেন?

—আপনি বললেই বসতে পারি।

—আমার বলাবলির কি আছে? আমি ত তোমাকে ছাড়াই নি। দোকানে বসতে নিষেধও করি নি।

—বেশ, আজ থেকেই বসব।

অস্বস্তি যে শুধু রামকিঙ্কর আর হরেকৃষ্ণই বোধ করছিল, তাই নয়। দোকানের অন্যান্য কর্মচারীরাও সমান অস্বস্তি বোধ করছিল। সেটা বোঝা গেল, রামকিঙ্কর দোকানে এসে বসতে সুবল যখন চুপিচুপি বললে, বাঁচলাম।

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, বাঁচলে কেন?

—তুমি দোকানে এসে বসার জন্যে।

বললে, জান, তোমার জন্যে আমাদের কারও কাজে মন বসছিল না। এ ক'দিন দোকানে কাজ হয় নি বললেই হয়।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। সমস্ত দিন সবাই চুপচাপ। গল্প-গুজব পর্যন্ত বন্ধ।

সেটা রামকিঙ্করও অনুমান করতে পেরেছিল। দোকান ত নয়, হরি ঘোষের গোয়াল। সেই গোয়াল নিস্তব্ধ ছিল।

সুবল বললে, শুধু আমরাই নয়, তোমার বন্ধু হরেকেষ্ট পর্যন্ত চুপচাপ।

রামকিঙ্কর বললে, হরেকেষ্ট চুপচাপ কেন? সে ত সব জানে, কি হয়েছে, না হয়েছে।

—জেনেই হয়ত চুপচাপ আছে। বুঝেছে, সুবিধা হল না। মনটা তাই ভাল নেই। চুপচাপ আছে।

একটু চুপ করে থেকে রামকিঙ্কর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, কিন্তু এমন করেই বা ক'দিন চলবে, সুবল? রোজ একটা করে খোঁচা আমি কতদিন সহ্য করতে পারব?

সুবল বললে, চাকরি করতে গেলে সব জায়গাতেই খোঁচা সহ্য করতে হবে। ওসব তুমি গেরাহ্যি ক'রো না।

রামকিঙ্কর বললে, গোয়ার্তুমি ত করি না। ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টাই ত করি। কিন্তু এক এক সময় মাথায় যেন আগুন জ্বলে ওঠে। তখন আর পারি না।

বললে, হরেকেষ্টও ঘাগী লোক। বোঝে, কখন খোঁচা দিলে কাজ হয়। দেয়ও তাই। কিন্তু আমি ভাবছি, এবার হরেকেষ্ট সুবিধা করতে পারলে না কেন।

উৎসাহের সঙ্গে সুবল বললে, পারবে কি করে হে? যতক্ষণ গিন্নীমা তোমার দিকে, ততক্ষণ হরেকেষ্ট ত হরেকেষ্ট, স্বয়ং বাবুও পারবে না।

—না হে, এবারে ব্যাপারটা তা নয়।

—কেন?

—গিন্নীমা এখন আর আমার ওপর খুশী নন।

সুবল চমকে উঠল: বল কি হে!

—হ্যাঁ। কাজেই এবারে ওর সুবিধা করা উচিত ছিল।

—তবে পারলে না কেন?

—তাই ত ভাবছি।

রামকিঙ্কর অন্যমনস্ক হ'ল।

হরেকৃষ্ণ রামকিঙ্করকে ডাকলে। বললে, ক'জায়গায় তাগাদায় যাবার দরকার ছিল। কিন্তু আজ থাক, পরে গেলেই চলবে। আজ বরং,

রামকিঙ্কর ওর উদারতায় বিমূঢ়ের মত ওর দিকে চেয়ে থাকে।

হরেকৃষ্ণ বলতে লাগল, কলওয়ালাদের কাছ থেকে ক'খানা চিঠি এসে পড়ে আছে। সেইগুলোর জবাব দাও বরং।

বাইরে প্রচণ্ড রোদ। দুপুরে রাস্তা তেতে আগুন হয়। হাওয়ায় উঠবে আগুনের হল্কা। রাস্তায় গরু-মোষের গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। এমন সুন্দর কাঠফাটা রোদে রামকিঙ্করকে তাগাদায় পাঠানোর লোভ হরেকৃষ্ণ কি করে সম্বরণ করলে, ভেবে দোকানের সমস্ত কর্মচারী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল।

রামকিঙ্কর বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, চিঠিগুলো কই?

তার বিনীত কণ্ঠস্বরে মুহূর্তের জন্যে হরেকৃষ্ণের মুখে বিদ্যুৎ-চমকের মত একটা হাসির রেখা খেলে গেল। সে একখানা একখানা করে চিঠি দিতে লাগল আর বলতে লাগল, কি লিখতে হবে। বলে আর একখানা একখানা করে চিঠি রামকিঙ্করের কাছে ফেলে দেয়।

হরেকৃষ্ণ সকলের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলতে লাগল, এবারে আমাদের একখানা টাইপরাইটার কিনতে হবে।

সকলে বিস্মিতভাবে হরেকৃষ্ণের দিকে চাইলে।

হরেকৃষ্ণ বললে, রাম বি. এ. পাস করেছে। এখন থেকে আমরা সবাইকে ইংরেজীতে চিঠি দিতে পারব। ভাবছ কি, দোকান আমাদের ক'মাসের মধ্যে আপিস হয়ে যাবে!

হরেকৃষ্ণ হা হা করে হাসতে লাগল। কিন্তু সেটা ব্যঙ্গের, না আনন্দের, বোঝা গেল না।

সমস্ত দিন রামকিঙ্কর চিন্তিতভাবে কাটালে। হরেকৃষ্ণকে তার কেমন-কেমন বোধ হচ্ছে। তার হাসি আর মিষ্ট কথা যেন ব্যাপারটা আরও ঘোরালো করে তুলেছে। সমস্তই ধোঁয়া। ঠিক ব্যাপারটাকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। সারদার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার। সে ছাড়া আর কেউ এই ধোঁয়া পরিষ্কার করতে পারবে না।

কিন্তু সন্ধ্যার সময় সারদার ঘরে গিয়ে সে অবাক্।

সারদা একখানা মূল্যবান জমকালো শাড়ী পড়েছে। মুখ রঙ করা। মাথায় পরিপাটি খোঁপাতে বেলফুলের মালা জড়ানো। চোখ দু'টি তার এমনিতেই সুন্দর। কাজল দিয়ে আরও সুন্দর করা হয়েছে।

রামকিঙ্কর দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল: কি ব্যাপার? আমি কি ভুল সময়ে এসে পড়লাম?

রামকিঙ্করের বিস্ময়ের কারণ অনুমান করে সারদা লজ্জিতভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল। বললে, না, না। ঠিক সময়েই এসেছেন। আসুন, বসুন।

রামকিঙ্কর তথাপি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল। এদের কথা রামকিঙ্কর কিছু কিছু শুনেছে।

বললে, কারও কি আসবার কথা ছিল, সারদা? আমি যাই তা হ'লে।

ব্যস্তভাবে সারদা বললে, না, না। যাবেন কেন? বসুন। যার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, তিনিই এসেছেন।

ধোপদুরস্ত বিছানায় বসে রামকিঙ্কর হাসিমুখে বললে,

ওটা তোমার বাজে কথা, সারদা। আমার ত আসবার কথা ছিল না।

পানের ডিবেটা খুলে সারদা ওর সামনে ধরল।

বললে, কথা কি সব সময় থাকে? তবু আমার মন বলছিল, আপনি আসবেন। তার প্রমাণ, আপনার জন্যে পান তৈরী করে রাখা।

—ওটা তোমার বাজে কথা, সারদা। পান অন্যের জন্যে তৈরী করে রাখা।

সারদা মুখ নামিয়ে হাসলে। বললে, জানি। আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। অথচ মাঝে মাঝে আমরা সত্যি কথাও বলি।

তারপরেই পরিহাসের মোড় ঘুরিয়ে বললে, আপনার খবর কি বলুন?

রামকিঙ্কর বললে, কি যে খবর, তাই জানবার জন্যেই তোমার কাছে আসা।

আমার কাছে! আপনাদের দোকানের খবর আমি কি জানি?

রামকিঙ্কর বললে, আমার চাকরিটা এখনও যায় নি, জান ত।

সারদা হেসে বললে, জানি। যাবে না তাও জানি।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, তবে দোকানের খবর জান না বলছ কেন?

—ওটা কি দোকানের খবর? ওটা আপনার খবর, তাই জানি। বৌরাণী বলছিলেন, আপনার ব্যাপারটা নিয়ে গিন্নীমার সঙ্গে তাঁর নাকি কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে।

এই খবরটা জানবার জন্যেই রামকিঙ্করের এখানে আসা।

জিগ্যেস করলে, কি রকম?

সারদা বললে, রকম-সকম জানি না। যেটুকু শুনেছি, তাই বললাম।

রামকিঙ্কর বললে, এবারটা না হয় বৌরাণী বাঁচালেন। কিন্তু কতবার বাঁচাতে পারবেন? সময় থাকতে অন্য কোথাও চাকরির চেষ্টা করে সরে পড়াই বোধহয় ভাল।

সারদা বললে, বৌরাণীর বোধহয় তা ইচ্ছা নয়।

—কি করে জানলে?

সারদা মুচকি হেসে বললে, বৌরাণী জানেন, অন্ততঃ অনুমান করেন, আপনার সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে দেখা হয়। তাই একদিন বললেন, রামবাবুকে বলিস, রাগের মাথায় তিনি যেন চাকরি ছেড়ে না যান। তাঁকে আমার দরকার হবে। আমি থাকতে তাঁর চাকরি যাবার ভয় নেই।

রামকিঙ্কর বুঝলে, এই কথাটা বোধহয় হরেকৃষ্ণও বুঝেছে। তার ব্যবহার তাই পাল্টে গেছে।

রামকিঙ্কর বললে, আমি সামান্য একজন কর্মচারী, আমাকে তাঁর কি দরকার হ'তে পারে, সারদা?

সারদা হেসে বললে, আমিও ত সামান্য লোক, আমিই বা তা কি করে জানব? বৌরাণী যা বলেছেন, বোধহয় আপনাকে বলবার জন্যে, তাই আপনাকে বললাম।

বলেই বললে, ইদানীং একটা কি লক্ষ্য করছি জানেন?

—কি?

—গিন্নীমা যেন বৌরাণীকে সমীহ করতে আরম্ভ করেছেন।

—তাই নাকি?

—তাই ত মনে হয়।

—আর বাবু?

—বাবুর ব্যাপার ঠিক বোঝা যায় না।

—কেন?

—কখনও দেখি, বৌরাণীকে আদরে ভাসিয়ে দিচ্ছেন, আবার কখনও চাবুকও চালাচ্ছেন।

—চাবুক বন্ধ হয়েছে, বলছিলে না?

—বন্ধই হয়েছে। কিন্তু একেবারে নয়। যেদিন মদের মাত্রা একটু বেশী হয়ে যায়, অবশ্য কচিৎ-কখনও, সেদিন চাবুক চলে।

—বাবু কি এখনও বাইরে বেরোন?

—না। যা করেন বাড়ীর ভেতরেই করেন। বৌরাণী নিজের হাতে মদ ঢেলে দেন।

—তবে মাত্রা বাড়ে কেন?

—কি জানি।—সারদা মুচকি হেসে বললে, মনে হয় ইচ্ছে করেই বাড়ান।

রামকিঙ্কর চমকে উঠল: ইচ্ছে করেই বাড়ান? মার খাবার জন্যে?

—আমার তাই মনে হয়। সারদার চোখে একটা রহস্যজনক হাসি।

রামকিঙ্কর জিগ্যেস করলে, পরীক্ষার জন্যে বৌরাণী খাটছেন?

সারদা হেসে ফেললে, বললে, পরীক্ষা দিচ্ছেন না। বই-খাতাপত্র শিকেয় উঠেছে। আমরা দু'জনে মিলে এখন কাঁথা তৈরী করি।

রামকিঙ্করও হেসে ফেললে: যে আসছে তার জন্যে?

—হ্যাঁ।

—তারও ত দেরি নেই।

—না। বাবুরও উৎসাহ কম নয়। এরি মধ্যে কত রকমের খেলনায় ঘর ভরে গেছে।

—আর গিন্নীমা?

—উৎসাহ তাঁরও নিশ্চয় কম নয়। কিন্তু বাইরে সেটা বোঝা যায় না।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে সারদা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বললে, এবার আমাকে ফিরতে হবে। যাই হোক, ভয় পাবেন না। আপনার চাকরি কেউ খেতে পারবে না।

আলো নিভিয়ে ঘর তালাবন্ধ করে দু'জনে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

হঠাৎ একসময় সারদা ফিক করে হেসে বললে, এখন বুঝলেন ত, আর কারও জন্যে পান তৈরী করি নি।

—কি করে বুঝব?

—তা হ'লে তাকে দেখতে পেতেন না?

রামকিঙ্কর গম্ভীরভাবে বললে, আমি চলে গেলে তুমি যে আবার ফিরে আসবে না, তা কি করে জানব?

সারদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল: উঃ, কি সাংঘাতিক লোক আপনি!

অনেকদিন পরে রামকিঙ্করের মনটা আবার ভাল হ'ল। চাকরি যাবার ভয়ে নয়, সে কি রকম অসহায় বোধ করছিল। ভাল লাগছিল না, হরেকৃষ্ণর কাছে হার হচ্ছিল বলে। রাগ হচ্ছিল, শুধু হরেকৃষ্ণের ওপর নয়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ওপর। অথবা আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, ঠিক কার ওপর রাগ হচ্ছিল, তা সে নিজেও জানে না। একটা অন্ধ, বোবা আক্রোশ সমস্তক্ষণ তার ভিতরে জ্বলছিল। এতক্ষণে সেইটে নিভে গেল।

তার মনে হ'ল, তারও সুহৃদ আছে। সে একা নয়। নিজের ক্ষয়-ক্ষতি, ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসানের অংশ নেবার লোক আছে। গিন্নীমার ওপর ভরসা যদি শেষ হ'ল, বৌরাণী আছেন। সারদা আছে। দোকানের বন্ধুদেরও বাদ দেওয়া যায় না।

বৌরাণীর সঙ্গে দেখা করবার লোভ হচ্ছিল। মোড়ের মাথায় সারদা যখন ডানদিকে বেরিয়ে গেল আর সে বাঁদিকে, তখন একবার তার মনে হ'ল, ছুটে গিয়ে সারদাকে সে ধরে, তার পিছু পিছু গিয়ে বৌরাণীর সঙ্গে দেখা [illegible]রে আসে।

কিন্তু সেটা সম্ভব নয়।

তার নিজের পক্ষেও নয়, বৌরাণীর পক্ষেও নয়। বৌরাণী যেখানে থাকেন, সেখানে কথায় কথায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করা যায় না। কত ঊর্দ্ধে বৌরাণী, আর কত নিচে সে।

মনে করল, চাঁদ আর চকোরের উপমাটা। কোথায় চাঁদ আর কোথায় চকোর! দু'জনের মধ্যে কি দুস্তর ব্যবধান!

অথচ কবি-মনের কাছে ব্যবধানটা যেন কিছুই নয়। দুস্তর আকাশ-পারাবার একটি অপূর্ব কাব্যরসে মধুর। সেই মাধুর্য দুস্তর দূরত্বকে যেন নৈকট্যের চেয়েও মনোহর করে রেখেছে।

রামকিঙ্করের মনে হ'ল, সেই মাধুর্য যেন আজ তারও মনে তরঙ্গিত হচ্ছে।

হন হন করে চলতে চলতে রামকিঙ্কর থমকে দাঁড়াল।

দোকানে নয়, অন্য কোথাও। যেখানে বন্ধু-হৃদয় আছে। বিশ্বনাথের ওখানে গেলে হয়। অনেকদিন যায় নি সেখানে। বিশ্বনাথ এম. এ-তে ভর্তি হয়েছে নিশ্চয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস কেমন লাগছে, জানতে পারবে। চন্দ্রনাথবাবুর শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। কেমন আছেন, দেখে আসা দরকার। সবিতা বিয়ে করতে রাজী হয়েছে? তার খবরটাও নেওয়া দরকার। সকলের চেয়ে বেশি টান তার সুলোচনার ওপর। তাঁকে তার খুব আশ্চর্য লাগে। কাঁধের ওপর কত বোঝা। দুই হাতে কত কাজ। অথচ সকল সময়েই ঠোঁটে শান্ত হাসি।

রামকিঙ্করের মন আজ সকলের ওপর সহানুভূতিতে পূর্ণ।

বিশ্বনাথের বাড়ীর দরজায় গিয়ে সে কড়া নাড়লে।

একটু পরে সবিতা এসে দরজা খুলে দিলে।

রামকিঙ্কর সহাস্যে জিগ্যেস করলে, তুমি কি পড়া করছিলে?

সবিতা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললে, না, না। আমি রান্নাঘরে মাকে রুটি বেলে দিচ্ছিলাম।

—বিশু কোথায়?

—দাদা পড়াতে গেছে।

—পড়াতে! সে কি মাষ্টারী করছে নাকি?

—জান না, দাদা ট্যুইশনি করছে? নিজের পড়ার খরচটা ত চলে যায়।

—ভাল। বাবা কেমন আছেন? মা?

সবিতা উত্তর দেবার আগেই রান্নাঘর থেকে প্রশ্ন এল: কে রে, সবিতা? কার সঙ্গে কথা বলছিস?

ততক্ষণে ওরা রান্নাঘরের দোরগোড়ায়।

সুলোচনা জিগ্যেস করলেন, এতদিন আসিস নি যে, রাম? শরীর ভাল ছিল ত?

হাত বাড়িয়ে সুলোচনার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে রামকিঙ্কর বললেন, একটা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ছিলাম।

—কি আবার ঝঞ্ঝাট?

—চাকরিটা যেতে বসেছিল।

—তারপর?

—তারপর রয়ে গেল।

সুলোচনা হরেকৃষ্ণর কথা জানত। বললেন, সেই হরেকেষ্ট ত?

আশ্চর্য, এই মুহূর্তে রামকিঙ্করের হরেকৃষ্ণর ওপরও কোন রাগ নেই।

বললে, সে উপলক্ষ্য মাত্র। যা হচ্ছে আর যা হচ্ছে না, সবই আমার অদৃষ্টের জন্ত। বিশু পড়াতে গেছে?

—তার কাণ্ড দেখ দেখি! ওঁরও মত ছিল না আমারও মত ছিল না। নিজের জেদে ট্যুইশনটা নিলে।

—ভালই ত, মা। বাপ-মায়ের বোঝা যতটুকু হাল্কা করতে পারা যায়, সে ত মন্দ নয়। ফিরবে কখন?

সবিতা বললে, ফেরবার সময় হয়েছে।

বলতে বলতেই বিশ্বনাথ এল। রাম যে! কতক্ষণ? আয়, ও ঘরে যাই।

পাশের ঘরে গিয়ে রামকিঙ্কর জিগ্যেস করলে, একটা ট্যুইশন নিয়েছিস?

—নিলাম। বাবার শরীর ভাল নেই। অবসর নেবার সময়ও হয়ে এল। একটা ট্যুইশনি হাতের কাছে এসে গেল, নিয়ে নিলাম। যতটুকু তাঁর সাহায্য করা যায়। নিজের পড়ার খরচ ত হয়ে যাচ্ছে।

—ভাল করেছিস। কেমন ক্লাস হচ্ছে? কি রকম লাগছে?

—একটু নতুনতর। কিন্তু সে আর কতদিন থাকবে? দু'দিন পরে আবার থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড় মনে হবে।

বিশ্বনাথ হাসতে লাগল।

রামকিঙ্কর জিগ্যেস করলে, বাবার শরীর কেমন?

বিশ্বনাথ বললে, শরীর বাবা-মা'র কারও ভাল নেই। কিন্তু সেটা ওঁরা কেউই স্বীকার করবেন না এবং চিকিৎসাও করাবেন না।

—সবিতা বিয়েতে রাজী হ'ল?

—না। বি. এ. পাশ করার আগে ও বিয়ে করবেই না। বাবা-মা যদি ততদিন না থাকেন, তানে কোন ক্ষতি নেই। বলছে, ওর বিয়ের খরচের জন্যে আমাকে ভাবতে হবে না।

—ত কে ভাববে?

বিশ্বনাথ হেসে বললে, ও নিজেই ভাববে বোধ হয়। এখনকার মেয়েগুলো কি রকম খাপছাড়া হয়ে গেছে। আমারও ত ভয় হয়।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত দুই বন্ধুতে অনেক গল্প হ'ল। অতীতের কথা, বর্তমানের কথা, এমন কি কিছু কিছু ভবিষ্যতের কথাও। সেখান থেকে রামকিঙ্কর যখন ফিরল, তখন তার শরীরের যেন ওজন নেই। মন হাল্কা। মুখে হাসি।

পঁচিশ

বৌরাণীর সন্তান হবে, সে একটা সমারোহ ব্যাপার। লেডী ডাক্তারের যাওয়া-আসা গত কয়েকমাস ধরে ক্রমাগত চলেছে। তার সঙ্গে চলেছে ঝি-চাকরের দৌড়-ঝাঁপ।

বিশেষ করে সারদার। তার ত নাইবার খাবার সময় ছিল না।

যেদিন মালতীর শরীরটা খারাপ করত, সেদিন ত কথাই নেই। সকলকে সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত করে তুলতেন বৃন্দাবনচন্দ্র স্বয়ং, হাঁক-ডাক করে। এমনিতে বৃন্দাবনচন্দ্রের সাড়া বড় একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু মানুষটি এমনি দুর্বল প্রকৃতির যে, কিছু একটা ঘটলে বাড়ী মাথায় তুলতেন।

ব্যস্ততার লক্ষণ ছিল না কেবল গিন্নীমার।

কোন কিছু ঘটলে তিনি শান্তভাবে ঠাকুরদালানে গিয়ে বসতেন। মনে মনে কি করতেন তিনিই জানেন, কিন্তু মুখে একটা কথাও বলতেন না। নিঃশব্দে বসে থাকতেন।

দু'দিন গেল শুধু আঁতুর-ঘর বীজাণুমুক্ত করতে। নতুন খাট-বিছানা এবং টেবিল এল। সহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তার এল প্রসব করাবার জন্যে। সঙ্গে একজন মিড-ওয়াইফ এবং দু'জন নার্স।

সূতিকাগারে যাওয়ার আগে মালতী তার নিজের শোবার ঘরে খাটে শুয়ে ছিল। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন। কিন্তু ঠোঁটের কোণে ভোরের চাঁদের মত বিবর্ণ হাসি।

সারদা কাছে এসে দাঁড়াল।

বাইরে বৃন্দাবনচন্দ্রের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে।

মালতী বললে, হাঁক-ডাক শুনছিস?

সারদা বললে, কদিন ধরেই ত বাবুর এই চলছে। রাত্রে ঘুমোন ত?

—কি জানি।

—সকাল থেকে অন্ততঃ বিশবার এঘরে এসেছেন আর ফিরে গেছেন।

—জানি। ইচ্ছে করে চোখ বন্ধ করে পড়েছিলাম। সাড়া দিই নি।

—কেন?

—ভাল লাগে না।

—যাই বলুন, বাবু কিন্তু আপনাকে ভালবাসেন। এবারে তা বোঝা গেল।

একটা দমকা যন্ত্রণায় মালতী মুখ বিকৃত করলে। সামলে নিয়ে বললে, কি জানি। মানুষটাকে ঠিক বুঝতে পারলাম না। তিনদিন আগেও নিষ্ঠুরভাবে বেত মেরেছে।

একটু পরে বললে, তোরা পাঁচজনে মিলে ব্যাপারটা যা দাঁড় করিয়েছিস, মনে হচ্ছে, আমি যেন দিগ্বিজয়ে যাচ্ছি। কষ্ট হচ্ছে, হাসিও পাচ্ছে। গেরস্তঘরের মেয়ে, এমন রাজকীয় সমারোহের সঙ্গে পরিচয় নেই। এতে আমার ভয় বাড়ছে বৈ কমছে না। কিন্তু থামাই কাকে বল? বাড়িসুদ্ধ সবাই যেন গাজনে মেতেছে।

সারদা ওর মাথার চুল বিন্যস্ত করতে করতে বললে, আমাদের দোষ কি বৌরাণী? কত বড় একটা ব্যাপার। এত বড় মহামানী বংশে প্রথম ছেলে আসছে। গাজনের এখন কি দেখছেন? ছেলে হওয়ার পরে 'দখবেন, শাঁখের আওয়াজে কানে তালা ধরে যাবে।

মালতী হাসলে: সে বেশ বুঝতে পারছে। কিন্তু ছেলে না হয়ে যদি মেয়ে হয়?

—ধুমধামের তাতেও কিছু কসুর হবে না। কিন্তু বাবু হয়ত একটু ক্ষুণ্ণ হবেন। গিন্নীমাও।

মালতী চুপ করে রইল।

তারপরে চার চাকার একটা ঠেলাগাড়ি করে মালতীকে সূতিকাগারে নিয়ে যাওয়া হ'ল। যাওয়ার সময় অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও মালতী চারদিকে একবার চাইল। দূরে একটা থামের কাছে বৃন্দাবনচন্দ্র পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে। পাশে পাশে চলেছে সারদা। গিন্নীমাকে কোথাও দেখা গেল না। বোধহয় তিনি ঠাকুরদালানে।

সারদা ফিসফিস করে জিগ্যেস করলে, কাকে খুঁজছেন বৌরাণী?

মালতী সাড়া দিলে না। ঠিক কাকে খুঁজছে, তা বোধহয় সে নিজেও জানে না।

সারদা জিগ্যেস করলে, বাবুকে কাছে ডাকব?

মালতী ঘাড় নাড়লে: না।

বাইরে কাতার দিয়ে ঝি-চাকর দাঁড়িয়ে। আর বন্ধ দ্বারের আড়ালে যন্ত্রণায় মালতী ছটফট করছে। মুখ রক্তহীন। দুই হাতের মুঠো শক্ত। দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ হচ্ছে। চোখ বন্ধ।

সৃষ্টির সুরু থেকেই জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর ধ্বস্তাধ্বস্তি চলে আসছে। কখনও জীবন জিতছে, কখনও বা মৃত্যু। মালতী দিগ্বিজয়ের কথা মিথ্যা বলে নি। দিগ্বিজয়ই বটে। জীবনের রথ চলেছে দিগ্বিজয়ে।

ঘণ্টা দুই চলল ধ্বস্তাধ্বস্তি।

ঘণ্টা দুই বললে ভুল হবে। সর্বক্ষেত্রে সময়কে ঘণ্টার মাপে মাপা যায় না। জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে নয়ই। কালের ধারা-প্রবাহ এক এক সময় অনন্তের মধ্যে হারিয়ে যায়। তখন আর তাকে ঘণ্টা মিনিটের মাপে মাপা যায় না।

বন্ধ দ্বারের অন্তরালে যখন অনন্তকালের লীলা চলছিল, বাইরে খণ্ডকালের মাপে তখন সময়টা ওই রকমই হবে।

বারান্দার দেওয়াল-ঘড়িটা রেডিওর সঙ্গে মিল করে নেওয়া হয়েছে। বৃন্দাবনচন্দ্রের হাতের ঘড়িটাও। সন্তানের জন্মের সময় কি, নিখুঁতভাবে জানা দরকার। দৈবজ্ঞ তাই দিয়ে জাতকের জন্মকোষ্ঠী তৈরি করবে। তাহ থেকে তার ভবিষ্যৎ জানা যাবে।

অপেক্ষমান জনতা উৎকণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে। মাছি নড়ে ত তারা নড়ে না।

নীড়ের নিস্তব্ধতা।

বন্ধ দ্বার ভেদ করে মাঝে মাঝে প্রসূতির শীর্ণ আর্তনাদ কানে আসছে। পর পর কয়েকবার। ও কার চিৎকার? জীবনের, না মৃত্যুর?

আবার একটা দীর্ঘতর আর্তনাদ।

তারপরেই সুগভীর স্তব্ধতা।

গভীর উৎকণ্ঠায় সবাই স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে।

একটু পরেই সূতিকাগারের দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত হ'ল। আর তার ফাঁক দিয়ে নার্সের মুখ বেরিয়ে এল:

ছেলে।

সঙ্গে সঙ্গে শিশুর কান্না।

জীবনের জয়শঙ্খ।

বিমূঢ় জনতা চকিতে সচেতন হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনিতে সমস্ত গৃহ মুখরিত হয়ে উঠল।

শঙ্খধ্বনি যেন থামতে চায় না।

বৃন্দাবনচন্দ্র তাঁর শোবার ঘরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের বোধহয় উৎকণ্ঠায় গলা শুকিয়ে এসেছিল। একটু ভিজিয়ে নেওয়া দরকার।

এতক্ষণ পরে গিন্নীমা এলেন।

ঝি-চাকরেরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল: আমাদের বকশিস গিন্নীমা, আমাদের বকশিস!

গিন্নীমার ঠোঁটে মৃদু হাসি।

বললেন, পাবি। ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? তোদের পাওনা কে মারে? ষষ্ঠী পুজোটা হয়ে যাক, দাঁড়া।

একটু পরে বেরিয়ে এলেন বড় ডাক্তার। ফি-এর টাকা পকেটে পুরে চলে গেলেন।

আরও খানিক পরে মিড-ওয়াইফ।

নার্সেরা রইল।

জ্ঞান হয়ে চোখ মেলে মালতীর প্রথম প্রশ্ন: কি হয়েছে?

নার্সেরা সমস্বরে বলে উঠল:' ছেলে। ছেলে। ছেলে। চমৎকার ছেলে হয়েছে। সুন্দর ছেলে হয়েছে। দেখবেন?

ছেলেকে পরিষ্কার করানো হয়ে গিয়েছিল। একটি নার্স তাকে কোলে করে নিয়ে এসে দেখালে।

মালতী দুই চোখে সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে শিশুটিকে দেখলে। তারপর ক্লান্তিতে তার চোখ বন্ধ হয়ে এল। শুধু ক্লান্তি। নইলে মুখ প্রশান্তিতে ভরে থাকত।

তার ছেলে হয়েছে। বংশধর ছেলে। এই বংশের ধারা সে রক্ষা করবে।

মুখে কাউকে কিছু বলে নি, কিন্তু মনে মনে গত কয়েক মাস সে পুত্র-সন্তান কামনা করে এসেছিল। তার কামনা পূর্ণ হয়েছে। মনে গভীর প্রশান্তি।

আর ভয় নেই। এখন সে এ বাড়ীর বংশধরের জননী। যেমন গিন্নীমা তার স্বামীর জননী। যে কারণে তাঁর এত দুর্দান্ত প্রতাপ। এতদিনে সত্য সত্য সে গিন্নীমার স্থলাভিষিক্ত হ'ল। আর সে কাউকে ভয় করবে না। শাশুড়ীকে না, স্বামীকেও না।

মালতীর শরীর ক্লান্ত, মন অবসন্ন। কিন্তু এই কথাটা ভাবতেই সে একটা প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করলে।

ফীডিং বটলে করে সারদা দুধ নিয়ে এল। নার্স তার হাত থেকে দুধ সরিয়ে নিয়ে তাতে একটু ভাইনাম গ্যালিসাই দিয়ে একটু একটু করে মালতীকে খাইয়ে দিলে।

দুধটুকু খেয়ে মালতী সারদার দিকে চেয়ে হাসলে।

সারদা জিগ্যেস করলে, এখন একটু সুস্থ বোধ করছেন, বৌরাণী?

জবাব না দিয়ে মালতী শুধু একটু হাসলে! তার ঠোঁট রক্তহীন। সেজন্যে হাসিটা রহস্যময় বোধ হচ্ছিল।

সারদা সহাস্যে বললে, দেখলেন বৌরাণী, আমি বলেছিলাম, ছেলে হবে।

সারদা কবে বলেছিল এবং আদৌ বলেছিল কি না মালতী তা স্মরণ করবার প্রয়োজন বোধ করলে না। শুধু হাসলে।

জোরে কথা বলতে মালতীর কষ্ট হচ্ছিল। চোখের ইশারায় সারদাকে কাছে ডাকলে। অস্ফুটকণ্ঠে জিগ্যেস করলে, মা জানেন?

সারদা খিল খিল করে হেসে উঠল: তা আর জানবেন না? শাঁখের শব্দে পাড়াসুদ্ধ লোক টের পেয়ে গেছে। বলি নি, গাজন সুরু হবে। গাজনই সুরু হয়েছিল। শব্দের বহর দেখে গিন্নীমা উৎসাহের সঙ্গে ঠাকুরদালান থেকে উঠে এসেছিলেন। বলতে হয় নি, ছেলে না মেয়ে।

তার পর গলা নামিয়ে বললে, আর বাবু একটু দাঁড়িয়ে থেকেই ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

কেন, তা মালতীকে বলবার দরকার ছিল না। মালতী জানে, সুখের সময় বৃন্দাবনচন্দ্রের মদের প্রয়োজন হয়, দুঃখের সময়ও। অর্থাৎ কি সুখের, কি দুঃখের কোন একটা উপলক্ষ্য ঘটলেই বৃন্দাবনচন্দ্রকে মদ্যপান করতে হয়। অন্ততঃ সেটাকে তিনি অতিরিক্ত মদ্যপানের কৈফিয়ৎ হিসাবে ব্যবহার করেন।

শুনে মালতী হাসলে। সেই হাসির মধ্যে যেন একটু-খানি কৌতুক প্রচ্ছন্ন ছিল।

যাক, তার পুত্র-সন্তান হওয়ায় বাড়ীর সকলেই খুশী। তাতে অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নেই। মেয়ে হ'লেও যে সবাই দুঃখিত হ'তেন, তা নয়। প্রথম সন্তান যা হয়, তাই ভাল।

ক্রমশঃ

বিদেশের কথা

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

গাম্বিয়া:

পশ্চিম আফ্রিকায় ব্রিটেনের শেষ উপনিবেশ গাম্বিয়া ১২২ বছর বাদে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডে ব্রিটেনের চোদ্দটি উপ-নিবেশ ছিল, গাম্বিয়া স্বাধীন হওয়ার পর শুধু রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত বেচুয়ানাল্যাণ্ড, বাসুতো-ল্যাণ্ড ও সোয়াজিল্যাণ্ডের স্বাধীনতা বাকি রইল। ঐ দেশগুলির সঙ্গেও ব্রিটিশ সরকারের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চলছে এবং এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, অদূরবর্তীকালেই তারা স্বাধীন রাষ্ট্রসমাজের সম্মানিত সদস্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করবে এবং তার পরেই আফ্রিকায় ৪৭ লক্ষ বর্গমাইল আয়তনের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অতীতের ইতিহাসে পরিণত হবে। অবশ্য আফ্রিকার অন্যান্য প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশের মত গাম্বিয়াও কমন-ওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শুধু তাই নয়, গাম্বিয়া ব্রিটেনের রাষ্ট্রপ্রধানকে তার নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানরূপে গ্রহণ করেছে। গাম্বিয়া হবে আফ্রিকার ৩৬তম স্বাধীন রাষ্ট্র ও কমনওয়েলথের ২১তম সদস্য।

গাম্বিয়া অতি ক্ষুদ্র দেশ। মাত্র চার হাজার বর্গমাইল আয়তনের ঐ দেশটির লোকসংখ্যা তিন লক্ষ যোল হাজার, এবং শুধুমাত্র বাদামের উপরেই তার জাতীয় অর্থনীতির সম্পূর্ণ নির্ভর। কিন্তু দারিদ্র্যের চেয়েও গাম্বিয়ার বড় ভয় তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র সেনেগল। পশ্চিম আফ্রিকার মানচিত্রের দিকে তাকালেই দেখা যাবে সিংহের মুখের ভিতর একটি আঙুলের মত সেনে-গলের অভ্যন্তরে কোন রকমে শঙ্কিত অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রেখেছে গাম্বিয়া। দেশটির একমাত্র পশ্চিম উপকূল উন্মুক্ত, আর সকল দিকে তাকে ঘিরে রেখেছে সেনেগল।

গাম্বিয়া নদীর উভয় তীরে অবস্থিত দেশটির প্রস্থ মাত্র ১৫ থেকে ৩০ মাইল ও দৈর্ঘ ২০০ মাইল। সেনেগল বরাবরই গাম্বিয়ার উপর দাবি জানিয়ে এসেছে এবং সে দাবি সরাসরি উপেক্ষিত হয়নি কোনদিন। বলা হয়েছে, স্বাধীনতার পর গাম্বিয়া তার ভবিষ্যৎ স্থির করবে। এ-ব্যাপারে প্রধান বাধা দু'টি; গাম্বিয়া ব্রিটিশ উপনিবেশ, এ-কারণে তার ভাষা ইংরেজী, আর সেনেগল প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ বলে তার ভাষা ফরাসী। সুতরাং ভাষা-বৈষম্য ঐক্যের পথে একটি বড় বাধা। দ্বিতীয় বাধা আরও গুরুত্বপূর্ণ। স্বাতন্ত্র্যসচেতন গাম্বিয়ার তিন-লক্ষ অধিবাসী সেনেগলের বত্রিশ লক্ষ লোকের মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলতে চায় না।

সেনেগলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট লিওপোল্ড সেংহোর যতদিন ক্ষমতাসীন থাকবেন ততদিন হয়ত গাম্বিয়ার স্বাধীনতা হারানোর সম্ভাবনা নেই। কারণ সেংহোর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শ্রদ্ধাভাজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতি ও আদর্শে আস্থাশীল উদারপন্থী নেতা। কিন্তু ভবিষ্যতে যে কোনদিন সেনেগল-প্ররোচিত সামরিক অভ্যুত্থান গাম্বিয়ার বর্তমান শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে এই আশঙ্কা গাম্বিয়াবাসীদের আছে। এইজন্যই গাম্বিয়ার প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল নিজেদের বিভেদ ভুলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডেভিড কুয়েসি জওয়ারার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। জওয়ারা উদারপন্থী রাজনীতিক এবং গাম্বিয়াবাসীদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন। তিনি বলেন, গাম্বিয়ার প্রতিটি শ্বশুর সঙ্গে পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। জওয়ারার নেতৃত্বে গাম্বিয়া ধীরে ধীরে অনন্যনির্ভর রাষ্ট্ররূপে, গড়ে উঠবে গাম্বিয়াবাসী সকল নরনারী এবিষয়ে নিঃসন্দেহ।

কেনিয়ায় হত্যাকাণ্ড :

পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলিতে ভারতীয়-বিরোধী মনোভাব ক্রমে কি সাংঘাতিক হয়ে উঠছে কেনিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে কেনিয়াই ভারতীয়দের প্রতি সর্বাধিক সহানুভূতিশীল এবং প্রেসিডেন্ট কেনিয়াট্টা, টম এমবয়া প্রমুখ কেনিয়ার বিশিষ্ট জন-নায়করা বারবার একথা বলেছেন যে, কেনিয়াবাসী ভারতীয়রা নিজেদের ভারতীয় না ভেবে কেনিয়ার নাগরিক ভাবলেই কোন সমস্যা থাকবে না। কিন্তু কেনিয়া পার্লামেন্টের সদস্য পিও পিন্টোর হত্যায় কেনিয়াবাসী ভারতীয়দের রীতিমত বিচলিত করেছে। পিন্টো গোয়ার অধিবাসী হ'লেও তাঁর জন্ম নাইরবিতে এবং কর্মক্ষেত্রও ছিল কেনিয়া। শুধু তাই নয়, কেনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার অভিযোগে ঐ রাষ্ট্রের প্রাক্তন ব্রিটিশ শাসকরা তাঁকে দীর্ঘকাল বন্দী করে রাখেন। কিন্তু কেনিয়ার এমন একজন অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী আফ্রিকান আততায়ীদের গুলীতে নিহত হয়েছেন। মিঃ পিন্টোর মত লোককেও যদি আফ্রিকানরা তাদের আপনজন বলে গ্রহণ করতে না পারে তবে অন্য ভারতীয়রা যে তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হবে, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। প্রেসিডেন্ট কেনিয়াট্টা অবশ্য পিন্টোর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং আততায়ীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি-বিধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু কেনিয়া সরকার যদি ভারতীয়দের জীবন সম্পদ্ ও মর্যাদা রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে না পারেন তবে তার ফলভোগ শেষ পর্যন্ত ভারতকেই করতে হবে। পূর্ব-আফ্রিকার কেনিয়া, উগাণ্ডা, তানজানিয়া, মালশ্বি, জাম্বিয়া প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে ভারত সরকারের অনতিবিলম্বে এসম্বন্ধে বিস্তৃত ও ফলপ্রসূ আলোচনা হওয়া উচিত।

ব্রিটেনে শ্রমিক শাসন :

দীর্ঘ তের বছর ও চারটি সাধারণ নির্বাচনের পর মাত্র চার ভোটের সংখ্যাধিক্যে শ্রমিক দল গত অক্টোবর মাসে ব্রিটেনের শাসনাধিকার লাভ করেন। কিন্তু স্বভাব-রক্ষণশীল ব্রিটিশ জাতি এই ক্ষণিকের বিচ্যুতিটুকুকে কিছুতেই যেন মানিয়ে নিতে পারছেন না-বলে মনে হয়। ইতিমধ্যে ব্রিটেনে পাঁচটি উপনির্বাচন হয়ে গেছে এবং তার মধ্যে চারটিতে রক্ষণশীল দল জয়ী হয়েছেন। শ্রমিক দল একটিতে কোন রকমে জয়ী হয়েছেন এবং আর একটি মর্যাদার লড়াইয়ে পরাস্ত হয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে অনিশ্চিত করে ফেলেছেন। অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দলের বিশিষ্ট নেতা প্যাট্রিক গর্ডন-ওয়াকার স্মেথিক নির্বাচন কেন্দ্রে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন তাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং পার্লামেন্টে জোর গলায় ঘোষণা করেন যে, রক্ষণশীলপ্রার্থী ঘৃণ্য বর্ণবিদ্বেষী নীতি অনুসরণ করে মিঃ গর্ডনওয়াকারকে পরাস্ত করেন। স্মেথিকের ভোটদাতারা বিভ্রান্ত না হ'লে তাঁর জয় অনিবার্য হ'ত, তারপরেই গর্ডনওয়াকারকে হাউস অফ কমন্সের সদস্য করার জন্য বিশিষ্ট শ্রমিক-নেতা সোরেনসেন লর্ডস হাউসের সদস্যপদ গ্রহণ করেন ও তাঁর নির্বাচন কেন্দ্র লেটনে গর্ডনওয়াকার পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু

আশ্চর্যের বিষয় যে, যে লেটন কেন্দ্র গত সাতাশ বছর ধরে শ্রমিক দলপ্রার্থীদের ক্রমান্বয়ে নির্বাচিত করেছে ও গত অক্টোবরেও মিঃ সোরেনসেন সেখান থেকে সাত হাজার ভোট বেশী পেয়ে জয়ী হন, সেখানেও মিঃ গর্ডন ওয়াকার পুনরায় ২০৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। ফলে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং শ্রমিক দলের সংখ্যাধিক্য মাত্র তিনে এসে দাঁড়ায়। সংখ্যাধিক্য একটু বেশী রাখার জন্য শ্রমিক দল রক্ষণশীল দলের একজনকে স্পীকার করেছেন। কিন্তু মাত্র চার ভোটের জোরে কোন মন্ত্রিসভাই দীর্ঘদিন স্থায়ী হ'তে পারে না। সুতরাং শ্রমিকদলকে হয়ত এই বছরের শেষেই নতুন নির্বাচনের জন্য আহ্বান জানাতে হবে। তারপর পুনরায় শ্রমিক দল জয়ী হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারবেন এমন আশা শ্রমিক দলের অতি বড় সমর্থকের মনেও আছে বলে মনে হয় না।

বন-কায়রো বিরোধ:

বন সরকারের দাবি, সারা জার্মানীকে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার শুধু তাঁদেরই আছে; সুতরাং অকম্যুনিষ্ট কোন দেশ যদি পূর্ব জার্মান সরকারকে স্বীকৃতি জানায় তবে পশ্চিম জার্মানী সেদেশের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে। পশ্চিম জার্মানীর এই দাবি মেনে নিয়ে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র এতদিন পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে নি। কিন্তু পশ্চিম জার্মানী হঠাৎ আরব জগতের এক নম্বর শত্রু ইস্রায়েলকে ব্যাপক সামরিক সাহায্য দিতে সুরু করায় সংযুক্ত আরব সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নাসের অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং পশ্চিম জার্মানীকে একটু শিক্ষা দিতে পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিষ্ট-নায়ক ওয়াল্টার উলব্রিখটকে কায়রো সফরে আমন্ত্রণ জানান। প্রেসিডেন্ট নাসের একথাও বন সরকারকে জানিয়ে দেন যে, অবিলম্বে পশ্চিম জার্মানী ইস্রায়েলকে অস্ত্র সাহায্য বন্ধ না করলে তাঁর দেশ পূর্ব জার্মানীকে স্বীকৃতি জানাবে। পশ্চিম জার্মানী থেকেও তখন কায়রো সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, কায়রোর বন-বিরোধী নীতি পরিবর্তিত না হ'লে সব রকমের বৈষয়িক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে; গত কয়েক বছরে প্রায় সাড়ে চার শ' কোটি টাকার সাহায্য পশ্চিম জার্মানী মিশরকে দিয়েছে। কিন্তু সাহায্য বন্ধের হুমকিতেও প্রেসিডেন্ট নাসের বিচলিত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানীকেই কিছুটা নরম হ'তে হয়েছে। কারণ মিশর তথা সমগ্র আরব জগতে ব্যবসার বাজার বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা আছে পশ্চিম জার্মানীর। বন সরকার শেষ পর্যন্ত ইস্রায়েলে অস্ত্র পাঠান বন্ধ করতে সম্মত হন এবং কায়রো সরকারও স্বীকার করেন যে, পূর্ব জার্মানীকে আপাতত তাঁরা কোন স্বীকৃতি জানাবেন না। কিন্তু এতেই বন-কায়রো মনোমালিন্যের অবসান ঘটবে বলে মনে হয় না। কারণ, পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিষ্ট নায়ককে যেভাবে কায়রোতে রাজকীয় সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে সেটা বন সরকারের পক্ষে সহজভাবে নেওয়া সম্ভব হবে না। তবে কায়রোর প্রতি অতিমাত্রায় বিরূপ হ'লে আরব জগতকে যে আরও কম্যুনিষ্ট পক্ষে ঠেলে দেওয়া হবে একথাটা কায়রো সম্বন্ধে নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বন বা পশ্চিমী দুনিয়াকে অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে।

ভিয়েৎনাম:

ভিয়েৎনাম পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল ও দুর্যোগপূর্ণ হয়ে উঠছে। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আত্মকলহে বিপর্যস্ত দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কোন সরকারই স্থায়ী হ'তে পারছে না, আর তার ফলে ঐ খণ্ডিত উপদ্বীপটিতে কম্যুনিষ্ট গেরিলা ভিয়েৎ কঙদের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতিমধ্যে উত্তর ভিয়েৎনাম ও কম্যুনিষ্ট অধিকৃত লাওসের মধ্য দিয়ে ভিয়েৎ কঙদের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে, যার ফলে চীন ও উত্তর ভিয়েৎনামের কাছ থেকে ব্যাপক সামরিক সাহায্য পেতে তাদের কোনই অসুবিধা হচ্ছে না। মার্কিন সাহায্য ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সামান্যতম শক্তিও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ক্ষণভঙ্গুর সরকারের নেই। আজ যদি দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে মার্কিন সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র প্রত্যাহৃত হয় তবে এক সপ্তাহের মধ্যেই সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েৎনাম কম্যুনিষ্টদের দখলে চলে যাবে। এই নিষ্ঠুর সত্যটা বোধহয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, কারণ এ পর্যন্ত দু'হাজার কোটি টাকা যুক্ত-রাষ্ট্র ব্যয় করেছে সেখানে। তা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, সমগ্র ভিয়েৎনাম কম্যুনিষ্ট-কবলিত হ'লে লাওসেও দক্ষিণপন্থী বা নিরপেক্ষদের অস্তিত্ব থাকবে না, এবং এইভাবে সমগ্র ইন্দোচীন কম্যুনিষ্ট অধিকারে চলে যাবে। এই সকল কারণে ভিয়েৎনামে মার্কিন সামরিক তৎপরতা দিনে দিনে সাংঘাতিক রূপ নিচ্ছে, যেটা যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের কাছেও ভাল লাগছে না। ঐ দেশের বিভিন্ন কাগজে এখন সরকারের ভিয়েৎনাম

নীতির তীব্র সমালোচনা হচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক বিশ্বের বিভিন্ন মহলে অবিলম্বে ভিয়েৎনাম ত্যাগের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে দাবি জানান হচ্ছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইজ্জতের প্রশ্নটা খুব বড় হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। সুতরাং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা বিস্তারে দৃঢ়সঙ্কল্প জঙ্গী চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের একটা বড় রকমের সংঘর্ষ হয়ত শেষ পর্যন্ত অনিবার্য হয়ে পড়বে।

ভিয়েৎনামে যুক্তরাষ্ট্রের জঙ্গী জেহাদ কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার বিশেষ উপকার করেছে। আদর্শ ও নীতির ব্যাপারে মতবৈষম্য কম্যুনিষ্ট দেশও দলগুলিকে দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে বিভক্ত করে দিয়েছিল। এখন তাদের বিরোধ বহু পরিমাণে দূর হয়েছে এবং এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মার্কিন সরকারের নীতি যত মার-মুখী হবে—কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার ঐক্য ততই দৃঢ় ও উগ্র হয়ে উঠবে।

নেপালে খ্রীষ্টান মিশনারী

জুল্‌ফিকার

ক্যাথলিক মিশনারীরা বহুদিন ধরে নেপালে তাঁদের কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আদৌ সফল হতে পারেন নি। নেপালে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত এবং রাণারা ছিলেন তাঁদের অনুগত। এই ব্রাহ্মণ যাজকদের বিরোধিতায় পাদ্রীরা কিছুই সুবিধা করে উঠতে পারেন নি। ভস্মাচ্ছন্ন কৌপীনধারী সাধুর বেশে তাঁদের চলাফেরা করতে হয়েছে—বিশেষ যাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করে তিব্বতে যেতেন।

তিব্বত ও নেপালে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের ক্রিয়াকলাপের ধারাবাহিক বিবরণী সম্প্রতি রোমের Italian Institute for the Middle and Far East নামক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে Luciano Petech-এর সম্পাদনায় প্রকাশ হচ্ছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নিষিদ্ধ দেশ—নেপাল ও তিব্বতে ইউরোপীয় মিশনারীদের পায়ের ধুলো পড়ে। অনেকেরই কিন্তু ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, প্রথম ইউরোপীয় হিসাবে নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন জন কোম্পানীর (East India Company) জনৈক সামরিক কর্মচারী।

আসলে সর্বপ্রথম ইউরোপীয় যিনি নেপালে এসেছিলেন তিনি হচ্ছেন পর্তুগীজ পরিব্রাজক পাদ্রী কাব্রাল (Joao Cabral)। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা প্রতাপমল্লের সময় তিনি নেপালে যান, তিব্বতের শিগাৎসী থেকে বাংলায় ফেরার পথে। তখনকার দিনে গোয়ার পর্তুগীজ ধর্মযাজকদের নেপালের চেয়ে তিব্বতের উপরেই লক্ষ্য ছিল বেশী। অষ্ট্রিয়ান জেস্যুইট গ্রুবার (Gruber) এবং বেলজিয়ান দ্যোরভিল (d'Orville) দক্ষিণ সমুদ্রের বিস্তৃত অঞ্চল-ব্যাপী তৎকালীন প্রবলপ্রতাপ ডাচদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়িয়ে, হাটাপথে চীন ও ভারতের মধ্যে কোন সরাসরি বাণিজ্যের যোগাযোগ সম্ভব কি না—সে-বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে চীন থেকে পদব্রজে হিমালয় পর্বতের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে, নেপালের গহন অরণ্য ও বন্ধুর পথ বাহিয়া, অতিকষ্টে আগ্রায় এসে উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁর এই সুদীর্ঘ, ক্লেশকর ও দুঃসাহসিক ভ্রমণের কোন বিবরণ রচনা করে যান নি।

মোগল সম্রাটদের আমলে জেস্যুইট পাদ্রীরা নেপালে তাঁদের একটা মিশন কেন্দ্র স্থাপন করতে মনস্থ করেছিলেন। জেস্যুইট সম্প্রদায়ের জনৈক আর্মানী বণিক চীন দেশ থেকে, নেপাল পার হয়ে ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় এসে পৌছান। তাঁরই মুখে জেস্যুইট পাদরীরা খবর পেলেন যে নেপালের রাজা খ্রীষ্টধর্মের অনুরাগী এবং চেষ্টা করলে তাঁকে ধর্মান্তরিত করা সম্ভব। এই সুসমাচার পেয়ে ইটালীয়ান জেস্যুইট পাদ্রী মার্ক আন্তনিও সানতুচ্চি (Santucci) নেপালে রওনা দিলেন। আর্মানী ভদ্রলোকের কথায় বিশ্বাস করে নেপালে গিয়ে তাঁর কষ্ট ও

হয়রানির একশেষ। অবশেষে কয়েক মাস বহুপ্রকার ক্লেশ ভোগ করে সানতুচ্চি ভগ্নমনোরথ ও অসুস্থ হয়ে পাটনায় ফিরে এলেন। এর পর বেশ কয়েক বছর মিশনারীরা নেপাল নিয়ে আর মাথা ঘামান নি।

জেসুইটদের পর নেপালে অভিযান চালালেন কাপুচিন (Capuchin) মিশনের পাদ্রীরা। তাঁদেরও দৃষ্টি নিবদ্ধ তিব্বতের দিকে। সেকালের মুসলমান বণিকদের মুখে প্রায়ই একটা গুজব শোনা যেত যে তিব্বতে নাকি বহু প্রাচীন একদল খ্রীষ্টানের বাস আছে। এই কিংবদন্তীর পিছনে আসলে কোন সত্য ছিল না। হয়ত, রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে কোন বিশেষ মঠের লামাদের ভজন পদ্ধতির খানিকটা মিল থাকায়, এই রকম জনরবের সৃষ্টি হয়েছিল (ক্যাথলিকেরা ধূপ-দীপ দিয়ে মেরী-মাতার অর্চ্চনা করে)।

কাপুচিন মিশন থেকে প্রেরিত হয়ে যারা প্রথম তিব্বতে যান, তাঁরা হচ্ছেন জুসেপ্পে দা এ্যাসকোলি (Guiseppe da Ascoli) ও ফ্রান্সেস্কো মারিয়া দা তুরস্ (Fransesco Maria da Tours)। এঁরা ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা থেকে রওনা হয়ে, সানকুশী উপত্যকা অতিক্রম করে কাঠমাণ্ডুতে এসে পৌছান। ছদ্মবেশে নেপাল রাজ্য পার হয়ে তিব্বতে প্রবেশ করতে গিয়ে তাঁরা ব্যর্থকাম হ'লেন। যা হোক, শেষ পর্য্যন্ত শুল্ক হিসাবে তিব্বত সরকারকে বহু অর্থ দিয়ে, তাঁরা লাসায় এসে উপস্থিত হলেন। এখানে এসে তাঁদের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সেস্কো ভারতে ফিরবার পথে কাঠমাণ্ডুতে আটকা পড়লেন। তখন তিনি কপর্দ্দকশূন্য। নেপাল সরকার তাঁর কাছে তাদের প্রাপ্য টোল দাবি করে বসল। পাদ্রী তা দিতে সম্পূর্ণ অপারগ হওয়ায়, সরকারী হুকুমে তাঁকে বন্দী করা হ'ল। ১৭০৭ সালে ৮ই মার্চ্চ পাদ্রী জুসেপ্পে কাঠমাণ্ডু থেকে তাঁর যে প্রথম পত্র পাঠিয়েছিলেন, সেটা পড়ে বেশ বোঝা যায় যে, আর্থিক সমস্যাটাই তাঁদের কাছে সর্ব্বাধিক প্রকট হয়ে উঠেছিল। এই সুদীর্ঘ চিঠিখানায় নেপালে সভ্যতার নানাবিধ নিদর্শন দেখে তাঁরা যে বেশ আনন্দলাভই করেছিলেন সেটা স্পষ্টই বলা হয়েছে। জুসেপ্পের এই চিঠিতে চান্দু নারায়ণ, বোধনাথ ও প্রসিদ্ধ পশুপতিনাথের মন্দিরগুলির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। পুণ্য-সলিলা বাগমতী নদী ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা প্রতাপমল্ল কর্ত্তৃক পুত্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য তৈরী কৃত্রিম হ্রদ (রাণী পোখরী) এবং তার মধ্যস্থিত পাথরের হস্তিমূর্ত্তির কথাও উল্লেখ আছে (উনবিংশ শতাব্দীতে হ্রদের চারপাশ পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে)।

১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে জুসেপ্পে যখন লাসায় ও ফ্রান্সেস্কো কাঠমাণ্ডুতে তাঁদের দুঃখের দিন গুনছেন, তখন আরও দুইজন মিশনারী ফাদার ডোমিনিকো দ্য ফানো ও ব্রাদার মিকেলেঞ্জেলো দ্য বরগোনা (Borgogna) বাংলা দেশের চন্দননগর থেকে নেপালের পানে রওনা দিলেন। তাঁরা দু'জনেই চলেছেন সন্ন্যাসীর বেশে সজ্জিত হয়ে, সারা অঙ্গে ভস্ম লেপে। কাঠমাণ্ডুতে যখন ফ্রান্সেস্কোর সঙ্গে তাঁদের দেখা, তখন তাঁদের চিনতে পেরে ফ্রান্সেস্কো এমন সাদর সম্ভাষণ জানালেন, যে আশেপাশে লোকদের মনে সন্দেহের উদয় হ'ল। ফলে শেষ পর্য্যন্ত তারা সরকারী লোকদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন।

সঙ্গে তাঁদের যা-কিছু সম্বল ছিল, সবই তুলে দিতে হ'ল রাণার লোকদের হাতে—রাজ সরকারের প্রাপ্য টোল, আর ফ্রান্সেস্কোর বকেয়া পাওনা শোধ করবার জন্য।

দ্বিতীয় অভিযানও এই ভাবে ব্যর্থ হ'ল।

বছর পাঁচেক বাদ ফের আবার তিব্বতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য একটা মিশন গঠিত হ'ল। স্থির হ'ল নেপালেও একই সঙ্গে কাজ চলবে। ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচজন তিব্বতযাত্রী পাদ্রী এসে পৌছুলেন নেপাল উপত্যকায়, শেষ পর্য্যন্ত কাঠমাণ্ডুতে থেকে গেলেন দু'জন। বাকী তিনজন পাড়ি দিলেন লাসার উদ্দেশে। নেপালে রইলেন ফেলিস দা মোরো ও জিওভ্যানি ফ্রান্সেস্কো। এঁদের ভাগ্য অনেকটা সুপ্রসন্ন ছিল। এঁরা দু'জনেই ছিলেন চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী। অল্পদিনের মধ্যেই জনসাধারণের কাছে সুচিকিৎসক হিসাবে তাঁদের বেশ নাম হ'ল এবং পসারও জমে উঠল। রাজা জগৎ মল্ল ওঁদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এবং বাস করবার জন্য একটা বাড়ীও দিয়েছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য ভাতগাঁওয়ের রাজা ভূপতীন্দ্রের সঙ্গেও এই পাদ্রী দু'জনার বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।... ম্লেচ্ছ খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে রাজার মাখামাখিটা দেশের লোকে, বিশেষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আদৌ সুনজরে দেখলেন না। এই নিয়ে লোকদের মধ্যে বিরুদ্ধ সমালোচনা সুরু হ'ল। অনেকেরই ধারণা হ'ল রাজা জগৎ মল্ল বোধ হয় গোপনে ওদের ধনরত্ন দিচ্ছেন। তাদের ভয়ও হ'ল পাছে রাজা খ্রীষ্টান হয়ে না যান। যা হোক যখন সবাই বুঝতে পারল রাজা বিদেশী ধর্ম্মপ্রচারকদের কোনরূপ অর্থসাহায্য করছেন না এবং স্বধর্ম্মের উপর তাঁর আস্থা বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নি, তখন তারা নিশ্চিন্ত হ'ল। এর পর রাজা কি একটা অজ্ঞাত কারণে পাদ্রী দু'জনাকে কাঠমাণ্ডু ত্যাগ করবার নির্দ্দেশ দিলেন। তাঁরাও রাজার আদেশে কাঠমাণ্ডু পরিত্যাগ করে ভাতগাঁওয়ে রাজা ভূপতীন্দ্রের আশ্রয়ে চলে এলেন কিন্তু অর্থাভাবে শেষ পর্য্যন্ত মিশন বন্ধ করে তাদের ভারতবর্ষে ফিরে আসতে হ'ল (১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে)।

এরই কিছুদিন পরে মেক্সিকোর স্প্যানিশ ঔপনিবেশিক-দের অর্থসাহায্যপুষ্ট কাপুচিন মিশনের পাদ্রীরা ভাতগাঁওয়ে

এসে উপস্থিত হ'লেন। এই দলের অধিনায়ক ছিলেন ফাদার ট্রানকুইলো দ্য এপেচ্চিও (Tranquillo d'Apechhio)। রাজা ভূপতীন্দ্র তখন গত হয়েছেন, নতুন রাজা রণজিৎ মল্ল মিশনারীদের উপর মোটেই বিরূপ ছিলেন না। অনেক সময় তিনি তাঁদের ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনায়ও যোগ দিতেন।

খ্রীষ্টান মিশনারীদের উপর মহারাজের সদয় ব্যবহারের কথা মহামান্য পোপের (Pope Benedotte XIV) কানে পৌঁছলে তিনি মহারাজা রাণা রণজিৎ মল্লের কাছে একখানা পত্র দেন। এর প্রত্যুত্তরে রণজিৎ মল্ল পোপকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা রোমের Holy Congregation for the Propagation of Faith নামক সমিতির দপ্তরে রক্ষিত আছে। নিজের অনুরূপ মর্য্যাদা দেবার জন্য তিনি পোপের নামের পূর্ব্বে দুটো 'শ্রী' যোগ করেছিলেন। চিঠিখানি সংস্কৃত-ঘেঁষা নেপালীতে লেখা। পোপের নিকট লিখিত এই চিঠিখানির মর্ম্মানুবাদ নীচে দেওয়া হ'ল:

শ্রীশ্রী জয় রণজিৎ মল্ল মহারাজার কাছ থেকে
শ্রীশ্রী চতুর্দ্দশ বেনেদেত্তো পায়াহায়া (রাজা)
সমীপে—

আপনার কুশল জানাবেন।

আপনার কুশল সমাচার জানলে খুসী হব। আপনার পত্র যথাসময়ে হস্তগত হয়েছে। ধর্ম্মের বিষয়ে যা জানতে চেয়েছেন (অর্থাৎ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে) বর্তমানে সে ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব হবে না। আমার প্রজাদের সম্বন্ধে কি যে বলব ভেবে পাচ্ছি নে। পাদ্রী মহাশয়দের ডেকে বলে দিয়েছি—তাঁরা যেন তাঁদের প্রাপ্ত নির্দেশ অনুযায়ী কাজ যথারীতি চালিয়ে যান। ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য তাঁরা তাঁদের পুরাতন কেন্দ্রই যেন বেছে নেন। স্বেচ্ছায় যদি কেউ আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করে তবে সে ব্যক্তির কোন ক্ষতিই আমি করব না- অন্ততঃ এটুকু আশ্বাস আমি আপনাকে দিতে পারি।

ইউরোপ-জাত কোন শিল্পদ্রব্য আমাদের দেশে এর আগে আসে নি। আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনার অনুগ্রহে কিছু ইউরোপে তৈরী জিনিষ পেয়েছি আর পেয়েছি পাদ্রী মহোদয়দের। যেহেতু তাঁরা আমার প্রজাদের সুখবিধান করছেন (চিকিৎসা দ্বারা রোগ নিরাময় করে), তাঁরা যাতে কষ্ট না পান সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখব।

আপনাদের দেশে দুর্লভ এমন কোন জিনিষ চেয়ে পাঠালে আমি নিশ্চয়ই তা এদেশ থেকে পাঠিয়ে দেব। বিনিময়ে আশা করি আপনিও ও দেশ থেকে এমন কিছু পাঠাবেন না এখানে মেলা ভার। এখনকার ব্যাপারে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমাকে আপনাদের বন্ধু বলেই মনে করবেন। আমি আপনাদের জন্য যথাসাধ্য করব।

এখানে ভাল চিকিৎসক নেই। ওখান থেকে আমার জন্য একজন দক্ষ চিকিৎসক ও একজন নিপুণ শিল্পী পাঠাবেন।

—ভাদ্র মাস, শুক্ল প্রতিপদ
৮৬৭ সন (১৭৪৪ খ্রীঃ, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর)

যে সময়ের কথা বলছি তখন নেপাল কোন এক সার্ব্বভৌম নৃপতির অধীনে ছিল না। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ভাতগাঁ ও কাঠমাণ্ডুতে পৃথক্ পৃথক্ রাজা ছিলেন। রাজাদের মধ্যে বেশ রেষারেষি ছিল। ভাতগাওয়ের রাজার দেখাদেখি এবং তাঁর উপর টেক্কা দিতে কাঠমাণ্ডুর রাজা জয়প্রকাশ মল্ল মিশনারীদের তাঁর ওখানে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।······

১৭৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে লাসা থেকে প্রত্যাগত মিশনারীরা যখন কাঠমাণ্ডুতে এসে পৌঁছলেন, তখন রাজা জয়প্রকাশ ওদের বাসের জন্য একটা গৃহ দান করেছিলেন। এই বাড়ীর দানপত্রটি এখনও আছে। এই দলিলে রাজার নামের সঙ্গে যে সমস্ত জমকালো উপাধি ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল, সবই আছে।

দানপত্রটির বাংলা তর্জ্জমা নীচে দেওয়া হ'ল:

নমঃ

—যার কেশদাম শ্রীপশুপতির পাদপদ্মের ধূলিরেণু রঞ্জিত (শ্রীমৎ পশুপতি-চরণ কমল-ধূলি ধূসরিত-শিরোরুহ), যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী মানেশ্বরীর কৃপায় উচ্চপদাধিষ্ঠিত, যিনি রঘুবংশজাত সূর্য্যকুলালঙ্কার, মহাবীর হনুমান যার ধ্বজায় অঙ্কিত, যিনি রাজাধিরাজ, রাজন্যবর্গের রক্ষক ও প্রভু, দেবাদিদেবের কৃপাকটাক্ষ যার উপরে নিয়ত নিবদ্ধ, যিনি হস্তী অধ্যুষিত তরাই অঞ্চল বিজয়ী গজেন্দ্র, সম্রাটশ্রেষ্ঠ যুধাজিৎ শ্রীশ্রীজয়প্রকাশ মল্লদেব সেক্রেড কনগ্রিগেশনের কাপুচিনদের ওয়নটু টোলের তুলসী গালি গৃহখানি দান করছেন।

চৌহদ্দী

জয়ধর্ম্ম সিংহের বাড়ীর পূর্ব্বে ধনচু সূর্য্যধন ও পূর্ণেশ্বরের বাড়ীর দক্ষিণে, রাজপথের পূর্ব্বে ও উত্তরে।···

রাজা জয়প্রকাশের গৌরব ও মর্য্যাদাসূচক উপাধি তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করতে পারে নি। গোর্খা-রাজ পৃথ্বী-নারায়ণের সৈন্যদের হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। রাজা জয়প্রকাশ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মকরূপে আহত হ'লে, অনুচরেরা তাঁকে পশুপতিনাথের মন্দিরে নিয়ে যায়। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গোর্খারা যখন সমগ্র নেপালে তাদের আধিপত্য বিস্তার

সুরু করল, সেই গোর্খা অভিযানের সময় মিশনারীরা গোর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণকে বহু প্রকারে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন। এই পাশ্চাত্য ধর্ম্মপ্রচারকদের চিকিৎসা-নিপুণতায় সপ্রশংস হ'লেও পৃথ্বীনারায়ণ তাঁদের বিশেষ আমল দেন নি। হিন্দু ধর্ম্মে তাঁর গভীর আস্থা ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মের উপর জনসাধারণের ঘোর অনাস্থা দূর করতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত মিশনারীরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে কাঠমাণ্ডু ছেড়ে চলে এলেন। সাগৌলির পশ্চিমে বেতিয়া বলে একটা জায়গায় স্থানীয় নেপালী খ্রীষ্টানদের একটা উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই কলোনীর লোকদের সঙ্গে নিয়ে মিশনারীরা নীচে নেমে এলেন।

এই মিশনারীদের একজন ফাদার জুসেপ্পো দা রোভাটা সমসাময়িক নেপাল সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করেন—প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। বইখানি ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে স্যর জন শোরের (পরবর্ত্তীকালে ভারতের গভর্ণর) দ্বারা প্রকাশিত হয়।

এই বই থেকে জানা যায় যে নেপালের কোন কোন স্থানে ভূগর্ভে প্রচুর গুপ্তধন সঞ্চিত আছে। এগুলো হচ্ছে মন্দিরের প্রণামী-বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ও অলঙ্কার। কোন মন্দিরে যখন প্রচুর ধনরত্ন জমে উঠত, তখন সেটা ভেঙে ফেলে, তার সঞ্চিত সমুদয় সম্পদ ভূগর্ভের অন্তরালে—একটার নীচে আর একটা—এইরূপ কয়েক সারি গুপ্ত প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করে, তার মধ্যে রেখে দেওয়া হ'ত। টলু হচ্ছে এইরূপ একটা জায়গা। এই সব ধনরত্নে রাজা ব্যতীত অন্য কারও অধিকার ছিল না। নেহাৎ দায়ে না পড়লে রাজারও এই অর্থে হাত দেওয়া বারণ ছিল।

দা রোভাটা লিখছেন যে তিনি যখন নেপালে, তখন কাঠমাণ্ডুর রাজা জ্ঞানপ্রকাশ (Gainprejas) গোর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধে নামবার ঠিক আগেই নিতান্ত অর্থসঙ্কটে পড়েছিলেন। রাজকোষ তখন অর্থশূন্য অথচ সৈন্যদের অনেক বেতন বাকী। রাজা জ্ঞানপ্রকাশ টলুতে অভিযান চালালেন গুপ্তধন সন্ধানের। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে প্রথম যে গুপ্তকক্ষ (Vault) পাওয়া গেল, তা থেকে প্রায় লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা তুলে নিলেন।

আগেই বলেছি পৃথ্বীনারায়ণ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। মিশনারীরা যাতে তাঁদের ধর্ম্ম বিস্তার না করতে পারেন সে বিষয়ে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। অবিশ্যি তাঁদের তিনি রাজ্য থেকে একদম বহিষ্কৃতও করেন নি।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পৃথ্বীনারায়ণের লোকান্তরিত হলে হলে তাঁর পুত্র প্রতাপ সিং শাহ রাজা হলেন। ইনি মিশনারীদের প্রতি বেশ সদয়-ভাবাপন্ন ছিলেন।

প্রতাপ সিং রাজা হয়ে মিশনারীদের রাজধানীতে ফিরে আসতে আমন্ত্রণ জানালেন। পশ্চিমদিকের পার্ব্বত্য রাজ্য কাসকি (Kaski) বা পাল্পা রাজ্য থেকে তাদের ডাক এল। কিন্তু এই সব রাজন্যবর্গের কাছ থেকে পৃষ্ঠপোষকতার আশ্বাস পাওয়া সত্ত্বেও, মিশনারীদের কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হ'ল না। স্থানীয় লোকদের বিরুদ্ধাচরণ এর জন্য আদৌ দায়ী নয়। আসলে মিশনারীদের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় নিষ্ঠা ও উৎসাহ ছিল না।

প্রতাপ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা রাণী ও তাঁর ভাই বাহাদুর শার মধ্যে সিংহাসন নিয়ে কলহ দেখা দিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রাণীই সিংহাসন পেলেন। বাহাদুর শা কাঠমাণ্ডু ছেড়ে বেতিয়ায় চলে গেলেন। সেখানকার মিশনারীরা তাঁকে একটা কঠিন ব্যাধি থেকে নিরাময় করেছিলেন।

এর পর রাণীর মৃত্যু হ'লে, বাহাদুর কাঠমাণ্ডুতে ফিরে গিয়ে রাজা হয়ে বসলেন। মিশনের লোকেরা স্বতঃই মনে ভেবেছিল, নতুন রাজার কাছ থেকে তাঁদের ডাক আসবে। ডাক শেষ পর্য্যন্ত এসেও ছিল। কিন্তু যে পাদ্রীপুঙ্গবকে কাঠমাণ্ডুতে প্রচারকার্য্যের জন্য পাঠানো হ'ল, তার পরবর্ত্তী জীবন যেরূপ কালিমাময় হয়ে উঠেছিল, তাতে মিশনের লোকেরা তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত একঘরে করতে বাধ্য হয়। ইনি তহবিল তছরুপ, নরহত্যা, গর্ভপাত প্রভৃতি অপকর্ম্মে জড়িত হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে ভারতীয় কারাগারে কয়েদী জীবন যাপন করতে হয়।

নেপালের প্রথম ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন নক্স (Knox) তাঁর স্মৃতি-কথায় নেপালে সমসাময়িক খ্রীষ্টীয় মিশন সম্বন্ধে লিখছেন:

On our arrival we found the Church reduced to an Italian padre and a native Portuguese who had been inveigled from Patna by large promises which were not made good and who would have been permitted to leave the country.

বর্ত্তমানে নেপালে যে মিশনারীরা আছেন, তাঁরা হচ্ছেন জেস্যুইট সম্প্রদায়ের। আবার আড়াই শো বছরের পর তাঁরা নেপালের কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরে এসেছেন। এবার নিছক ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশে আসেন নি। এসেছেন শিক্ষার অগ্রদূত হিসাবে। জেস্যুইট মিশন নেপালে দুটো বোর্ডিং স্কুল খুলেছেন। পাটানের উপকণ্ঠে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট জাভেয়ার্স স্কুলটি (কেম্ব্রিজ ওভারসী স্কুল সার্টিফিকেট প্রিপেয়ারেটরী স্কুল) সত্যিই একটি আদর্শ বিদ্যায়তন।

আর্থিক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন বাজেট

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পার্লামেণ্টে আগামী ১৯৬৫-৬৬ সনের যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে গত কয়েক বৎসরের যে ধারা অনুযায়ী বাজেট রচনা হয়ে আসছিল তার থেকে একটা মূল পরিবর্ত্তনের আভাস লক্ষ্য করা যায়। বর্ত্তমান অর্থমন্ত্রীর প্রথম দফার মন্ত্রীত্বের কাল থেকে সুরু করে কেন্দ্রীয় সরকারের ট্যাক্স নীতি, 'সহজতম উপায়ে প্রভূততম আমদানীর' (easiest methods of bringing in the maximum revenue receipts) পথ ধরে অগ্রসর হ'তে সুরু করেছিল। কৃষ্ণমাচারীর পর যখন মোরারজী দেশাই কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি এই নীতির অধিকতম সুযোগ গ্রহণ করতে সুরু করেন, অবশ্য এর প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন কৃষ্ণমাচারী স্বয়ং। এদেশে প্রত্যক্ষ ট্যাক্সের মাত্র দ্বিবিধ উপায় ছিল; ব্যক্তিগত আয়কর এবং কর্পোরেশন ট্যাক্স। উভয় ক্ষেত্রেই যথাসম্ভব করভার অবশ্যই চাপান হয়েছিল, ফলে দেশে পুঁজি সৃষ্টির গতি ক্রমেই মন্দীভূত হয়ে আসছিল বলে দেশের ব্যবসায়ী মহল আশঙ্কা করেন। কোন একটি বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্পপতি সম্প্রতি একটি ভাষণে অভিযোগ করেন যে, এই করভার গত কয়েক বৎসরে এমন চাপ সৃষ্টি করেছে যে, মানুষের সঞ্চয় ও লগ্নীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রভূত পরিমাণে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন যে, আয়কারীর আমদানীর প্রতি টাকায় সরকার যদি চৌদ্দ আনা বাজেয়াপ্ত করে নেন, এবং ব্যবসায়ের মুনাফারও যদি তার চেয়েও অধিকতর অংশ কেড়ে নেন তবে সে কেন বেশী আয় করতে বা ব্যবসায় প্রসার করতে চাইবে?

প্রত্যক্ষ-করের সীমা

কিন্তু এতটা করেও প্রত্যক্ষ কর থেকে সরকারের নিয়ত বর্দ্ধমান চাহিদার সামান্য মাত্র অংশও মেটান সম্ভব হচ্ছিল না। এদেশে ব্যক্তিগত আয়কর দেবার মতন রোজগার করে থাকেন মাত্র ১৫ লক্ষ লোকেরও কম এবং তাঁদের মধ্যেও বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা বা তন্নিম্ন আয়কারীর সংখ্যাই সমধিক। সরকারের শাসন সংগঠনের ব্যয় প্রতি বৎসরই বেড়ে চলেছে। ১৯৬০-৬১ সনের তুলনায় ১৯৬৪-৬৫ সন পর্য্যন্ত অতিরিক্ত ৭৮০ কোটি টাকার মত ব্যয়বরাদ্দ করতে হয়েছে। তার ওপর উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ত আছেই। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই খাতে বরাদ্দের মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ৮,০০০ কোটি টাকা। পরিকল্পনার খসড়ায় ৭৫০০ কোটি টাকার সংস্থান করা হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, অন্ততঃ আরও ৫০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে। এছাড়া আছে প্রতিরক্ষা বরাদ্দ। ১৯৬২ সনের অক্টোবর মাসে চীনা হামলা সুরু হবার পর থেকে এই খাতে ব্যয়-বরাদ্দের প্রয়োজন সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। নানা দিক থেকে সরকারী ব্যয়ের চাপ যতটা সম্ভব প্রত্যক্ষ করের আমদানী থেকে মেটাবার প্রয়াসে ব্যয়কর (expenditure tax), সম্পদ-কর (wealth tax), পুঁজিবৃদ্ধি কর (capital gains tax), ইত্যাদি অন্যান্য ধরনের প্রত্যক্ষ ট্যাক্স বিধি রচনা ও প্রয়োগ করা হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে ব্যয়করের অন্যতম উদ্দেশ্যও ছিল, ভোগ-সঙ্কোচের দ্বারা চাহিদা বৃদ্ধি সংযত করা। অন্যপক্ষে সম্পদ্-কর, উত্তরাধিকার কর (inheritance tax), পুঁজিবৃদ্ধি কর ইত্যাদির পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত অধিকারে প্রভূত পরিমাণ সম্পদ্ ও আর্থিক শক্তির ঘনতা (concentration of wealth and economic power) সংযত করা।

কিন্তু এ সকলের সমবেত আমদানীর দ্বারা প্রসারমান সরকারী ব্যয়ের সমান্য অংশ মাত্র পূরণ করা সম্ভব ছিল। অতএব বিভিন্ন ধরনের পরোক্ষ করের প্রয়োগের দ্বারা সরকারী চাহিদা মেটাবার আয়োজন ক্রমে বেড়েই চলেছিল। প্রথম পরিকল্পনাকালে ভূতপূর্ব্ব কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ কতকগুলি রপ্তানী মালের উপরে প্রভূত পরিমাণে অতিরিক্ত রপ্তানী কর ধার্য করে একটা মোটা রকমের আমদানীর প্রয়াস করেছিলেন। যথা, কতকগুলি পাটজাত শিল্পদ্রব্যের উপরে তিনি একটা মোটা রকমের

অতিরিক্ত রপ্তানী কর ধার্য্য করেছিলেন। সে সময়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভারত থেকে প্রভূত পরিমাণে চট, চটের থলে ইত্যাদি আমদানী করছিলেন। অভ্র, সাধারণ মানের চা ইত্যাদির রপ্তানীও খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সকল দ্রব্যের উপরেই অতিরিক্ত রপ্তানী কর প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু এর ফলে এ সকল মালের আমদানীকারী দেশে পৌছান পর্য্যন্ত মূল্যমান এত অসম্ভব রকম বেড়ে যায় যে, ক্রমে এসকল ভারতীয় রপ্তানীর চাহিদা দ্রুত কমে যেতে থাকে। বস্তুতঃ এই অবস্থার সুযোগে অন্যান্য প্রতিযোগী রপ্তানীকারী দেশগুলি ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের একটা মোটা অংশ অধিকার করে নিতে সক্ষম হন। পাকিস্তান ত এই সুযোগে নারায়ণগঞ্জে একটি বিরাট্ নূতন চটকল প্রতিষ্ঠা করে ফেল্‌লেন। ফলে ভারতে চটশিল্পে একটা সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সরকার অতিরিক্ত রপ্তানী করটি মোটামুটি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। তথাপি চটশিল্পের পূর্ব্ব অবস্থা সম্পূর্ণভাবে আজ পর্য্যন্ত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। চায়ের ক্ষেত্রে সাধারণ মানের চায়ের রপ্তানী বাজারের বেশ একটা মোটা অংশ সিংহল এবং পূর্ব্ব আফ্রিকা এবং অংশতঃ সোভিয়েত রাশিয়া মনে হয় চিরকালের জন্য এখন দখল করে নিয়েছেন। অভ্রের ক্ষেত্রে ভারতের বিদেশী বাজারের একটা অংশ এখন কায়েমী ভাবে ব্রেজিলের দখলে চলে গিয়েছে।

পরোক্ষ কর

অতএব ক্রমেই বেশী করে পরোক্ষ করের উপরে নির্ভর করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। পরোক্ষ করের মধ্যে সবচেয়ে সহজে প্রয়োগসাধ্য হয় ভোগ্যবস্তুর উপরে আবগারী কর। স্বাধীনতার অনেক আগে গভর্ণর জেনারেলের প্রশাসনিক কাউন্সিলের তদানীন্তন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার জর্জ্জ শুষ্টার এককালে চিনির উপরে আবগারী শুল্ক ধার্য্য করেন। এই বিষয়টি নিয়ে সেকালে তীব্র সমালোচনার সৃষ্টি হয়। ভারতীয় শর্করাশিল্পের বয়স খুব বেশী নয়; প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে এই শিল্পটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেকালের ভারতের চিনির বাজারটি একপ্রকার যবদ্বীপের একক অধিকারভুক্ত ছিল বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। ভারতীয় নিজস্ব শর্করাশিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত করবার মানসে এবং যবদ্বীপের প্রতিযোগিতা থেকে এটিকে রক্ষা করবার জন্য একটা উঁচু আমদানীকরের দেওয়াল খাড়া করে এই নূতন শিল্পটিকে প্রাথমিক সংরক্ষণ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আয়োজন করে দেওয়া হয়। অল্পদিনের মধ্যেই শিল্পটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং প্রভূত মুনাফা করতে সুরু করে। স্যার জর্জ্জ এই সুযোগে চিনির উপর প্রতি টনে একটি আবগারী শুল্ক ধার্য্য করে এই মুনাফার কিয়দংশ সরকারী তহবিলে শুষে নেবার ব্যবস্থা করেন। স্বাধীনতার পূর্ব্বেই এই আবগারী শুল্কের হার আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং স্বাধীনতার পরও এর হার আরও অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। সেই সময়ে এই শুল্কের বিরুদ্ধে সাধারণ্যে, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট শিল্পপতিদের তরফ থেকে তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হয়। স্যার জর্জ্জ শুষ্টারের মূল উদ্দেশ্য যদি এই সংরক্ষিত শিল্পের বর্দ্ধমান মুনাফার অঙ্কটি সঙ্কুচিত করা মাত্র হ'ত তা হ'লে তার প্রকৃষ্টতর উপায় ছিল শর্করাশিল্পের সংরক্ষণকল্পে যে উঁচু আমদানীকরের দেওয়াল খাড়া করা ছিল সেটিকে কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করে দেওয়া। কিন্তু তিনি একাধারে মুনাফা সঙ্কোচন এবং সরকারী আমদানীবৃদ্ধি সাধন করবার জন্য এই আবগারী শুল্কটি প্রয়োগ করেন। কিন্তু প্রথমোক্ত উদ্দেশ্যটি যে অজুহাত মাত্র ছিল তার প্রমাণ অচিরেই পাওয়া গিয়েছিল; আবগারী শুল্কটির অনুরূপ অনুপাতে চিনির দর বৃদ্ধিতে। এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক, সেজন্য সাধারণতঃ ভোগ্যবস্তুর উপরে আবগারী শুল্ক প্রয়োগ-করা ট্যাক্সনীতির (taxation policy) দিক থেকে একটা কাম্য ব্যবস্থা মনে করা হয় না। এর ব্যতিক্রম সাধারণতঃ কেবল সে সকল ক্ষেত্রেই উচিত ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হয়, যে-স্থলে কোন বিশেষ ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ও ভোগ সঙ্কোচন ন্যায়সঙ্গত সামাজিক নীতি বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। এইরূপ ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টান্ত হিসাবে মাদক দ্রব্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের দেশের সংবিধানে অবশ্য মাদক বর্জ্জনের নীতি রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি বলে গৃহীত ও প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু যে-সকল দেশে মাদক-ভোগকে সামাজিক দৃষ্টিতে নিন্দনীয় বা গর্হিত বলে গণ্য করা হয় না, সে-সকল দেশেও এ সকল দ্রব্যের সংযমহীন ভোগ বা ব্যবহার সুস্থ সামাজিক অবস্থা সূচিত করে না বলে স্বীকৃত হয়। সেই কারণে ভোগ্য-মাদক দ্রব্যাদির উপরে সকল দেশেই আবগারী শুল্ক প্রয়োগের ব্যবস্থা চালু আছে। এই আবগারী শুল্ক প্রয়োগের দ্বারা এ সকল দেশেও মাদক উৎপাদন ও ভোগ একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমিত করে রাখবার প্রয়াস করা হয়।

কিন্তু এ সকল বিশেষ বিশেষ পণ্য ব্যতীত অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের উপরে আবগারী শুল্কের প্রয়োগ সাধারণতঃ একটা সুস্থ শুল্কনীতির পরিচায়ক বলে স্বীকৃত হয় না। বিশেষ করে অবশ্যভোগ্যের ক্ষেত্রে এরূপ প্রয়োগকে

রীতিমত অবিধেয় বলেই মনে করা হয়। অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলছেন :—

"পরোক্ষ শুল্কের ভূমিকা দ্বিবিধ : সরকারী আয়ের সংস্থানের প্রয়োজন সাধন করা, এবং মূল্যনীতি-নির্দ্ধারক আয়োজন হিসাবে এর প্রয়োগ। যে-সকল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই পরোক্ষ শুল্ক সরকারী আয় সাধনে প্রয়োগ করা সম্ভব, সেইগুলির বিষয়ে একই সঙ্গে দেশের নাগরিকদের ব্যক্তিগত ব্যয় বাজেটের উপরে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথাও বিবেচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।"

বস্তুতঃ ভোগ্যপণ্যের উপরে আবগারী শুল্কের প্রয়োগ মূল্যমানের অস্থিরতায় প্রতিফলিত হয়ে বিষময় ফল প্রসব করার আশঙ্কা সর্ব্বদাই বিদ্যমান। সরবরাহের স্বাভাবিক অবস্থায় যখন চাহিদার সঙ্গে তার একটা সামঞ্জস্য থাকে তখন শুল্কের অর্থ আনুপাতিক মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা ক্রেতার নিকট থেকেই অবশ্য আদায় হয়। সেক্ষেত্রে আবগারী শুল্ক প্রয়োগের দ্বারা শিল্পপতির অতিরিক্ত মুনাফা থেকে সেটুকু সাধারণতঃ আদায় করা সম্ভব হয় না; মুনাফা পুরোপুরিই তার ভাগে যেমন ছিল তেমনি থেকে যায়, শুল্কের অনুপাতে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে—এটিকে ক্রেতার পকেট থেকে বার করে নেওয়া হয়। কিন্তু চাহিদার তুলনায় যখন সরবরাহে ঘাটতি সুরু হয়, যার ফলে 'বিক্রেতা অধ্যুষিত বাজারের' (Sellers' market) সৃষ্টি হয়,—যেমন দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত চলে আসছে, তখন এই ধরনের ভোগ্যপণ্যের ওপরে আবগারী শুল্ক ব্যবসায়ীর অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ সৃষ্টি করে ক্রেতাকে বিপন্ন করে তোলে। অর্থাৎ, শুল্কটির বহুগুণ বেশী মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে একদিকে যেমন মূল্যমানের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে, তেমনি অন্যদিকে 'হিসাব-বহির্ভূত' কালোবাজারী মুনাফার সৃষ্টি করে বাজার চাহিদার আয়তনটি আরও ফাঁপিয়ে তোলে। অবশ্যভোগ্যের ক্ষেত্রে এর চাপ অন্যান্য পণ্যের তুলনায় আরও বেশী হয়ে থাকে। পাঠকের স্মরণ থাকবার কথা যে, শ্রীকৃষ্ণমাচারীর প্রথম দফা অর্থমন্ত্রীত্বের আমলে যখন তিনি সর্ষের তেলের ওপর মণপ্রতি ৷৷৹ আনা (বর্ত্তমানের হিসাবে ৫০ পয়সা) আবগারী শুল্ক ধার্য্য করেন, সেটি সঙ্গে সঙ্গে খুচরা বাজারে সর্ষের তেলের সের-প্রতি ৷৹ আনা (২৫ পয়সা) মূল্যবৃদ্ধিতে প্রতিফলন লাভ করে। অর্থাৎ ক্রেতাকে সরকারী শুল্কের ২০ গুণ দাম যেমন বেশী দিতে হয়, তেমনি ব্যবসায়ীর মুনাফা মণপ্রতি প্রায় ৯৷৷৹ টাকা বেড়ে যায়। কিন্তু এই অতিরিক্ত মুনাফাটি সরকারী হিসাবের আয়ত্তে আনা সম্ভব হয় না এবং এই ভাবেই 'হিসাব-বহির্ভূত' অর্থের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

মোরারজি দেশাইয়ের অর্থমন্ত্রীত্বের কয় বৎসরে দেশের ওপরে পরোক্ষ করভার সমধিক বৃদ্ধি পায়। একটা পুরাণো হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৫০-৫১ সনে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রয়োগের সময়ে দেশের মোট করভারের শতকরা মাত্র ৭ ভাগ পরোক্ষ কর থেকে আমদানী হ'ত। এই অনুপাতটি ক্রমে বৃদ্ধি পেতে পেতে ১৯৬৩-৬৪ সনের তাঁর শেষ বাজেটে এটি মোট করভারের শতকরা ৭০ ভাগে বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে বিবেচ্য যে ১৯৫০-৫১ সনে কেন্দ্রীয় শুল্কের মাথাপিছু পরিমাণ ছিল মাত্র ৮৲ টাকা; ১৯৬৩-৬৪ সনে এর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় মাথাপিছু ৪৬৲ টাকা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরও বিশেষ করে প্রণিধানযোগ্য এই যে, এদেশের দ্রুতবর্দ্ধমান পরোক্ষ শুল্কের আয়তনের একটা মোটা অংশ অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির ওপর আবগারী প্রয়োগের দ্বারা আদায় করা হয়ে থাকে। বর্তমানে চিনি, ঔষধাদি, বস্ত্র, সাইকেল টায়ার ও টিউব, কেরোসিন, কতকগুলি খাদ্যপণ্য ইত্যাদি একটা বিস্তৃত ভোগ্যপণ্যের উপরে আবগারী শুল্ক প্রয়োগ করা রয়েছে। অন্যান্য নানাবিধ কারণ ব্যতীত গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মূল্যমানের ওপরে ক্রমবর্দ্ধমান চাপের এটাও যে একটা অন্যতম কারণ সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী অন্যূন দেড় বৎসর পূর্ব্বে পুনর্ব্বার অর্থ দপ্তরের ভার গ্রহণ করবার অব্যবহিত পরেই একটি প্রসঙ্গে বর্ত্তমানের প্রচণ্ড পরোক্ষ করভার লাঘব করবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা স্বয়ং স্বীকার করেন। কিন্তু গত বৎসরের বাজেটে তিনি এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। তার বাধা অনেক ছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সে-সকল বাধা সত্ত্বেও তিনি যদি এ বিষয়ে উপযুক্ত প্রয়োগ সুরু করতে পারতেন তবে গত এক বছরে দেশের আর্থিক পরিস্থিতিতে যে অতিরিক্ত অবনতি ঘটেছে, তার খানিকটা অন্ততঃ বাঁচাতে পারা যেত বলে মনে হয়। এই অবনতির ফলে তৃতীয় পরিকল্পনার রূপায়ণে পুনরায় যে বাধা সৃষ্টি হ'তে সুরু করেছিল সে স্বীকৃতি তাঁর বর্ত্তমান বাজেট বক্তৃতাতেই দেখতে পাওয়া যায়। তাঁহারই জবানিতে জানা যায় যে তৃতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে শিল্পজ উৎপাদন প্রায় শতকরা ৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরের (তৃতীয় পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসর) প্রথমার্দ্ধে উৎপাদন গতি আবার মন্দীভূত হয়ে পড়ে। তিনি আশা করেন যে, বর্ত্তমান বৎসরের দ্বিতীয়ার্দ্ধে শিল্পোৎপাদন আবার বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ বৎসরে মোটামুটি শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধিসাধন সম্ভব হবে।

আলোচ্য বাজেটে অর্থমন্ত্রী এই পরোক্ষ কর কিছুটা লাঘব করে দেবার যে প্রস্তাব পেশ করেছেন সেটা সুখের বিষয় সন্দেহ নেই। এতে সাহস ও দূরদৃষ্টির যে প্রয়োজন ছিল এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। তবে গত দুই বৎসরের অতিরিক্ত সরকারী আয় সাধন এবং কিছুটা পরিমাণ ব্যয়সঙ্কোচ করা সম্ভব হবার ফলে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ যে খানিকটা পরিমাণে সহজ হয়েছিল সে কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন। অর্থমন্ত্রী বলেন:

"পরোক্ষ কর লাঘব সম্পর্কে বর্তমানে কেবলমাত্র কতকগুলি আবগারী শুল্ক সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব সীমিত রাখা হয়েছে। জুতো, সাইকেল পার্টস্ এবং তার টায়ার-টিউব, দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ছাপবার ও লেখবার কাগজ, এই সকল পণ্যের ওপরে বর্তমান আবগারী শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হবে। মূল্যনির্দ্ধারিত কোরা এবং অন্যান্য মোটা এবং মাঝারী মানের কাপড়ের ওপর বর্তমান শুল্কটি অর্দ্ধেক কম করা হবে, বনস্পতির ওপর শুল্ক অর্দ্ধেক কমবে এবং সস্তা মানের ছাপবার, লেখবার ও টাইপ করবার কাগজের ওপর শুল্ক শতকরা ৩০ ভাগ কমান হবে।...এই শুল্ক লাঘবের ফলে ১৯৬৫-৬৬ সনে সরকারী আয় ২৯.৫ কোটি টাকা কমে যাবে।"

তিনি আরও বলেন যে, তিনি আশা করেন যে, যে-সকল পণ্যাদির ওপর এভাবে আবগারী শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করবার বা আংশিক ভাবে কমিয়ে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে, সেটার সবটাই আনুপাতিক ভাবে মূল্যমানে প্রতিফলিত হয়ে ক্রেতার ভোগে বর্তাবে। তা না হ'লে পুনরায় পূর্ব্ব হারে এই শুল্কগুলি পুনঃপ্রয়োগ করা প্রয়োজন হবে। এই কারণে তিনি বর্তমান বাজেট সংশ্লিষ্ট অর্থ বিলে (Finance Bill) বিধিবদ্ধ করে এই সকল শুল্ক প্রত্যাহার বা কমিয়ে দেবার প্রস্তাব করেন নি; সরকারী অতিরিক্ত ক্ষমতার বলে প্রচারিত একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধনের আয়োজন করা হয়েছে, যাতে করে প্রয়োজন হ'লে পরবর্তী সংশোধনী বিজ্ঞপ্তির দ্বারা পূর্ব্বাবস্থায় ফিরে যেতে পারা যাবে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান বাজেটে আবগারী শুল্ক-খাতে অর্থমন্ত্রী সাধারণের উপর করভারের চাপ যে খানিকটা কম করবার প্রস্তাব করেছেন, তার পরিমাণ খুব একটা বেশী নয়। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বাজেটের হিসাব অনুযায়ী এর ফলে আগামী বৎসরে মাত্র আন্দাজ ২৯৷৹ কোটি টাকা আমদানী কমবার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান বৎসরের বাজেটে আগামী বৎসরের মোট রাজস্বের পরিমাণ হিসাব ধরা হয়েছে ১৮২৩.৬ কোটি টাকা; অন্যান্য আমদানী মিলে সরকারী মোট আয় হবে ২৩৪৬.৭ কোটি টাকা। বর্তমান বাজেটে প্রস্তাবিত রদবদলগুলি না হ'লে মোট রাজস্বের পরিমাণ হ'ত ১,৮৩০ কোটি টাকা এবং মোট আয় ২,৩১৮ কোটি টাকা। পূর্ব্ব দুই বৎসরে যথাক্রমে রাজস্ব ও মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ১৯৬৩-৬৪ সনে ১,৫১০ কোটি এবং ২,০০৫ কোটি টাকা এবং ১৯৬৪-৬৫ সনে ১,৫৭৯ কোটি এবং ২,১২৪ কোটি টাকা (১৯৬৪-৬৫ সনের 'রিভাইজড' হিসাবে এর পরিমাণ দেখা যায় যথাক্রমে ১,৬৮১ কোটি এবং ২,২২৮ কোটি টাকা)। মোট রাজস্বের তুলনায় পরোক্ষ শুল্কের চাপের পরিমাণ নীচের হিসাব থেকে স্পষ্ট দেখা যাবে:

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

উপরোক্ত হিসাব থেকে দুটো জিনিষ স্পষ্ট করে বোঝা যাবে। প্রথমতঃ, নূতন বাজেট প্রস্তাবের ফলে আবগারী শুল্কে যে পরিমাণ রদবদল করা হ'ল, তার ফলে মোট রাজস্বের শতাংশ হিসাবে আগারী শুল্ক থেকে আয় পূর্ব্ব বৎসরের রিভাইজড হিসাবের তুলনায় আংশিক ভাবে ১.৯% কম হবে এবং অনুরূপ ভাবে কাষ্টমস্ শুল্ক এবং আবগারী শুল্কের মিলিত আয় মোট রাজস্বের শতাংশ হিসাবে পূর্ব্ব বৎসরের রিভাইজড হিসাবের তুলনায় ১% কম হবে। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্ব বৎসরের রিভাইজড হিসাবের তুলনায় আবগারী শুল্ক থেকে এবং কাষ্টমস্ শুল্ক থেকে বর্তমান নূতন বাজেট বৎসরে আমদানীর পরিমাণ যথাক্রমে ৫.৯% এবং ৯.০% বৃদ্ধি পাবে।

আপাতদৃষ্টিতে এর ফলে আগের তুলনায় খুব যে বেশী একটা তফাৎ হবে তা মনে হয় না। কিন্তু বর্তমান প্রস্তাবে বাজেট রচনার কৌশলে একটা মূল পরিবর্তনের ধারা যে প্রবর্তিত হবার আশা আছে সে কথাটি নিঃসন্দেহে স্বীকার করা চলে। এর ফলে সাধারণ মূল্যমানের (general price index) ওপরে কোন আকাঙ্ক্ষণীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা একথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে সংশ্লিষ্ট ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে মূল্যমানে আনুপাতিক নিম্ন চাপ (downward pressure) সৃষ্টি হবার আশা অর্থমন্ত্রী স্বয়ং ব্যক্ত করেছেন এবং অন্যথায় তিনি কি করবেন তার কথাও তিনি স্পষ্ট করেই প্রকাশ করেছেন। বর্তমান বাজেট যদি ভবিষ্যৎ পরিণতির সূচক বলে ধরে নেওয়া যায় তবে একথা আশা করা যেতে পারে যে, রাজস্বের কাঠামোটি গত কয়েক বৎসরে যে ভাবে গড়ে উঠছিল তার ফলে তারই মধ্যে অন্তর্নিহিত যে মূল্যচাপ বৃদ্ধির উপাদান

শুল্কের বিবরণ	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫ (বাজেট)	১৯৬৪-৬৫ (রিভাইজড)	১৯৬৫-৬৬ (বাজেট প্রস্তাব)	(কোটি টাকায়)
কাষ্টম্‌স্‌ শুল্ক	৩৩৫	৩৩৬	৩৮৫	৪০৫	
পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কাষ্টম্‌স্‌ শুল্কের				+১৪·৫*	
আমদানীতে ক্ষতি (—) বা বৃদ্ধি (+)	—	+·২৯%	+১৪·৬%	+৯·০%	
আবগারী শুল্ক (কেন্দ্রীয়)	৭৩০	৭৭৯	৭৭৩	৮২৭	
পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আবগারী শুল্কের				—৮*	
আমদানীতে ক্ষতি (—) বা বৃদ্ধি (+)	—	+৫·৫%	+৫·৯%	+৫·৯%	
কর্পোরেশন ট্যাক্স	২৭৫	২৯৭	৩৪২	৩১৬	
পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কর্পোরেশন ট্যাক্স				—১৪*	
আমদানীতে ক্ষতি (—) বা বৃদ্ধি (+)	—	+৮%	+১৫%	+৮.৯%	
ব্যক্তিগত আয়কর	১৩৯	১৪০	১৪৪	১৭১	
পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ব্যক্তিগত আয়করের আমদানীতে ক্ষতি (—) বা বৃদ্ধি (+)	—	+·৭১%	+১·৮%	+১৮·৭%	
মোট রাজস্ব	১,৫১০	১,৫৭৯	১,৬৮১	১,৮১০	
পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় মোট রাজস্ব				—৬*	
আয়ে ক্ষতি (—) বা বৃদ্ধি (+)	—	+৪·৬%	+৬·৪%	+৮·৫%	
মোট রাজস্বের শতাংশ হিসাবে আবগারী শুল্কের আয়	৪৮·৩	৪৮·৭	৪৬·০	৪৪·৯	
মোট রাজস্বের শতাংশ হিসাবে আবগারী ও কাষ্টমস্‌ শুল্কের মিলিত আয়	৭০·১	৭০·০	৬৮·০	৬৭·০	

* নূতন বাজেট প্রস্তাবের ফল

গড়ে উঠেছিল (inflationary potential of the taxation structure). সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান অর্থমন্ত্রী এখন সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং তার ফলে ভবিষ্যতে অন্ততঃ দেশের রাজস্বের কাঠামোটিকে ধীরে ধীরে মূল্য-চাপমুক্ত করে নেবার প্রয়াস করা হবে সেটুকু আশা করা যেতে পারে।

হিসাব-বহির্ভূত অর্থ (Unaccounted Money)

এই প্রসঙ্গে যাকে হিসাব বহির্ভূত অর্থ আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং দেশের মূল্য কাঠামোতে (Price struture) এই বস্তুটি কি ভাবে এবং কি পরিমাণে চাপ সৃষ্টি করে চলেছে তার যতটা সম্ভব বিশ্লেষণ করতে পারলে মোটামুটি অবস্থাটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। হিসাবে ধরা-ছোঁয়া যায় না এই অর্থের অবস্থানের পরিমাণ সঠিক কতটা জানা নেই; কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং তাঁদের উপদেষ্টা গোষ্ঠীর আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী বর্ত্তমানে রাষ্ট্রকে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে রাখা একমাত্র আয়করের পরিমাণই ১,০০০ হাজার থেকে ১৫ ০ হাজার কোটি টাকা বলে আন্দাজ করা হয়েছে। এই আন্দাজটিকে যদি বাস্তব বলে ধরে নেওয়া যায় এবং ফাঁকি দেওয়া আয়করের বিভিন্ন স্তরের মোটামুটি দায় যদি আয়ের ৫০ শতাং বলেও ধরে নেওয়া যয়, তবে এভাবে ২,০০০ থেকে ৩,০০০ কোটি টাকা বাজারে চালু আছে বলে ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ দেশে চালু হিসাবে ধরা যায় মোট অর্থের তুলনায় এই অর্থের পরিমাণ প্রায় সমান

সমান। এই প্রচণ্ড পুঁজিটি বাজারে কি ভাবে ক্রিয়া করছে নানা ভাবে তার আভাস পাওয়া গেছে। গত বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর একটি বিবৃতি অনুযায়ী এ রাজ্যে ঐ বৎসরে বাজার থেকে সরিয়ে-ফেলা চাউলের পরিমাণ ছিল তাঁর খাদ্য দপ্তরের হিসাব মতন আন্দাজ ২০ লক্ষ টন। এই পরিমাণ চাউল সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্যেও মজুদ রাখতে হ'লে অন্ততঃ প্রায় ১৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন হয়। অন্যান্য খাদ্যশস্য, খাদ্য-তৈল, বস্ত্র এবং নানাবিধ অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের বেলায়ও যে সরবরাহে ঘাটতি গত দুই বৎসর ধরে চলে আসছে সেটাও যে এরূপ মুনাফার লোভে মজুদদারী থেকে অন্ততঃ অংশতঃ ঘটেছে এ কথাও সকল সরকারী মুখপাত্র স্বীকার করেছেন। এ সকলই বাজার থেকে সরিয়ে মজুত করতে হ'লে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ হিসাবে ধরা যায় এমন কোন স্থান থেকে সংগৃহীত হ'লে এই মজুতদারীও সহজেই সংযত করা সম্ভব হ'ত। তা ছাড়া বে-আইনী সোনার মজুতে কতটা পরিমাণ অর্থ লগ্নী করা হয়েছে সেটা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব না হ'লেও তার পরিমাণও যে অবশ্যই প্রচুর, এ কথাও অনুমান করা অসম্ভব নয়। অন্যান্য কারণ ব্যতীত এই হিসাব-বহির্ভূত অর্থের ক্রিয়াও যে বর্ত্তমানের ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যমানের অন্যতম প্রধান কারণ সেকথা স্পষ্ট ও অনস্বীকার্য্য।

এই অর্থের পরিমাণ যাতে সঠিক ভাবে আবিষ্কৃত হিসাবের আয়ত্তে আনা যায় সেই প্রয়াসে সরকারী তরফ থেকে নানা আয়োজন করা হয়েছে কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি। অথচ এটি যে দেশের জনসাধারণের জীবনে প্রভূত পরিমাণ অশান্তির (mischief) সৃষ্টি করছে এ কথা খুবই স্পষ্ট। নূতন বাজেটে অর্থমন্ত্রী এই বস্তুটিকে খানিকটা সংযম ও হিসাবের আয়ত্তে আনবার জন্য নূতন প্রয়োগ উদ্ভাবন করেছেন। প্রস্তাবটি এই যে, যাঁরা হিসাব-না-দেওয়া রোজগারের সম্পূর্ণ হিসাব এখন দাখিলক রবেন এবং স্বয়ং নিজে থেকে এই আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ অর্থ নগদ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা দেবেন, তাঁরা তাঁদের আয়কর হিসাব দাখিল করবার সময় বাকী ৪০ ভাগ অর্থের হিসাব তাতে দেখাতে পারবেন। এই বাকী ৪০ ভাগ অর্থ সম্বন্ধে আয়কর দাবি করা হবে না এবং হিসাব দাখিলকারী ব্যক্তিদের পরিচয় সাধারণ্যে প্রচার করা হবে না। এই সুযোগটি তিনমাস পর্য্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং যাঁরা মার্চ্চ মাসের মধ্যে এই হিসাব দাখিল করবেন তাঁদের দেয় শতকরা ৬০ ভাগ অর্থ থেকে ৩ ভাগ মকুব পাবেন, অর্থাৎ তাঁদের আয়ের মাত্র শতকরা ৫৭ ভাগ দিতে হবে। যাঁদের আয়করের হার ৫৭% কিংবা ৬০%-এর কম হবে বলে তাঁরা মনে করেন তাঁরা স্বাভাবিক প্রথায় তাঁদের আয়ের হিসাব দাখিল করতে পারবেন এবং সেই অনুযায়ী তাঁদের ওপর আয়কর ধার্য্য করা হবে। অর্থমন্ত্রীর এ সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা বর্ত্তমান বৎসরের অর্থ বিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তিনি যাতে করে আইনের সকল শক্তি প্রয়োগের দ্বারা এই বিষয়টির সমাধান করবার চেষ্টা হতে পারে সেই প্রতিশ্রুতি দেন।

ট্যাক্স ফাঁকি, সোনার চোরাকারবার, কালোবাজারী মুনাফা, এ সকল সমাজবিরোধী বিষয় সম্পর্কে সরকারের তরফ থেকে বারে বারে নূতন নূতন প্রয়োগ করবার আয়োজন করা হয়েছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ফল বিশেষ কিছু হয় নি। তার প্রধান কারণ সম্ভবতঃ সরকার পক্ষ থেকে এ সকল বিষয়ে খানিকটা সাহসের অভাব এবং খানিকটা হয়ত ঔদাসীন্য। খাদ্যশস্য সম্বন্ধে গত কয়েক মাস ধরে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির তরফ থেকে বারে বারে নীতি ও প্রয়োগ বদল হয়েই চলেছে, কিন্তু খাদ্যশস্যের মূল্যে সরকার-অধ্যুষিত সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বাইরে কালোবাজারী কমে নাই, বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। অর্থমন্ত্রী তাঁর কয়েক দিন পূর্ব্বের পার্লামেণ্টে পেশ করা দেশের ১৯৬৪-৬৫ সনের আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণে স্বীকার করেছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরের প্রভূত উৎপাদন-উন্নতি সত্ত্বেও নূতন ফসলের সময় সাধারণতঃ খাদ্যশস্যের দর যতটা কমে থাকে এবার তা ঘটে নাই, বরং জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ থেকেই খোলা বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি পেতে সুরু করে। এর কারণ অবশ্য একটা এই যে, মূল্যবৃদ্ধি-সহায়ক আর্থিক অবস্থার সমাধান সহসা করা সম্ভব নয়। সোজা কথায় উৎপাদনের তুলনায় অর্থের সরবরাহ নানা কারণে—যথা উন্নয়ন-লগ্নী, প্রতিরক্ষা ব্যয়, সরকারী প্রশাসনিক খরচা বৃদ্ধি, ইত্যাদি কারণে—গত কয়েক বৎসরে অসম্ভব পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অর্থশাস্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় এই সকল কারণে অনবরত মূল্যবৃদ্ধি হয়েই চলেছে। হিসাব-বহির্ভূত অর্থ এই অর্থের সরবরাহের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করে মূল্যমানে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে এও একটা কারণ যে, বর্ত্তমান কালের ন্যায় অবশ্যভোগ্যাদির সরবরাহের পরিমাণ যখন অপ্রতুল হয়ে পড়ে, তখন সরকারী প্রশাসনিক আয়োজনের দ্বারা খানিকটা মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করা যায়। যথা, যুদ্ধ ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সঙ্কটকালে অবশ্যভোগ্যাদির সাধারণতঃ সরকারী প্রয়োগে বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং তার ফলে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশে গত বিশ্বমহাযুদ্ধ এবং তৎপরবর্ত্তীকালে দেখা গিয়েছে

যে, সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিকবিভাগগুলির কর্ম্মকুশলতার এবং অনেক ক্ষেত্রে সততারও অভাবের ফলে বণ্টননিয়ন্ত্রণের কালেও বিস্তৃত কালোবাজারী কারবার ও মুনাফাবাজী চলেছে। এই দুষ্টচক্র ভঙ্গ করতে নিষ্ফলকাম হয়ে অবশেষে ভূতপূর্ব্ব কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী স্বর্গগত রফি আহমদ কিদোওয়াই বণ্টন-নিয়ন্ত্রণ তথা সর্ব্বপ্রকার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। বর্ত্তমানে কলিকাতায় সর্ব্বাত্মক এবং অন্যান্য কোন কোন সহরাঞ্চলে আংশিক বণ্টন নিয়ন্ত্রণ প্রবর্ত্তিত হয়েছে কিন্তু এ সকল নির্দ্দিষ্ট এবং ক্ষুদ্র এলাকার বাইরে দেশের লোককে নিয়ন্ত্রণহীন খোলা বাজারের উপরেই নির্ভর করতে হয়। মোট কথা আইন বা প্রশাসনিক প্রয়োগের দ্বারা এই অবস্থার সংশোধন করা সম্ভব হয় নাই। অর্থমন্ত্রী এই সাপক্ষে কতকগুলি আর্থিক প্রয়োগেরও ব্যবস্থা পূর্ব্ব থেকেই করেছিলেন—যথা, গত পাঁচ মাসের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণের ওপর সুদের হার দু'-দু'বার বাড়িয়ে বর্ত্তমানে শতকরা ৬%য়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাতে ফল দর্শায় নি। বাজারে চালু অর্থের পরিমাণ এত প্রচুর এবং পণ্য সরবরাহ এত কম যে, এই অবস্থা কেবলমাত্র যে মূল্যমানের ক্রমাগত বৃদ্ধিতে অনবরত প্রতিফলিত হচ্ছে শুধু তাই নয়, বর্ত্তমানে দেশের পুঁজির বাজারে যে অধিকতর এবং অস্বাভাবিক রক্তশূন্যতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে তারও এ একটা অন্যতম প্রধান কারণ। ব্যাঙ্ক রেট বাড়িয়ে বর্ত্তমানে এই অবস্থার সমাধান হবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

হিসাব-বহির্ভূত অর্থ জব্দ করতে হ'লে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে যাঁরা এই অন্যায় পুঁজি সংগ্রহ করেছেন তাঁদের সঙ্গে আপোষ রফায় সেটি হবার সম্ভাবনা যে আদৌ নাই সেটা হয়ত অর্থমন্ত্রী নিজেও আজ পর্য্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন নি। এবং এরা যে সরকারী হুমকিতে বিন্দুমাত্র ভয় পায় না সে প্রমাণ বারে বারে পাওয়া গিয়েছে। অতএব এদের বিরুদ্ধে এমন প্রয়োগ অবলম্বন করা প্রয়োজন, যাতে এদের সদিচ্ছার ওপরে তার সাফল্য নির্ভর না করে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে, বর্ত্তমানে প্রস্তাবিত প্রয়োগের ফলে এই সম্পর্কে সুফল যদি না পাওয়া যায় তবে তাঁকে অন্য ব্যবস্থার আয়োজন করতে হবে। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি লুকানো অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির এবং বিশেষ করে খাদ্যশস্যাদির মজুত আবিষ্কার ও জব্দ করা ভিন্ন এই বিষয়ে অন্য কি সার্থক প্রয়োগ হ'তে পারে তা কল্পনা করা যায় না। প্রশাসনিক সততা ও শক্তি নিতান্ত ভেঙে না পড়লে এই ব্যবস্থাটি অসম্ভব হওয়া উচিত নয়। তবে একটা প্রচণ্ড বাধা থাকবার আশঙ্কা রয়েছে। এই মুনাফাবাজ কালোবাজারী গোষ্ঠীদের অনেকেই সরকারী মহলের উচ্চতম অধিকারীদের নিকটতম প্রিয়পাত্র বলে সাধারণের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। এদের স্বার্থে আঘাত পড়তে পারে এমন প্রয়োগ করবার শক্তি বা সাহস কি সরকারের আছে? (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের ইংরেজী অনুবাদের তালিকা

শ্রীসুধাময়ী মুখোপাধ্যায়

(১৯৩১) পরিশেষ—র র ১৫

প্রশ্ন—ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ—Collected poems and plays p. 450—The Evilday—Age after age has Thou O Lord sent

বিস্ময়—আবার জাগিনু আমি। রাত্রি হল ক্ষয়—Poems 92—Once again I wake up

মৃত্যুঞ্জয়—দূর হতে ভেবেছিনু মনে—Poems 93—You seemed from afar titanic in your mysterious majesty

—V.B.Q. Aug.—Oct. 1943—A Translation by Kshitish Ray

শ্রীবিজয়লক্ষ্মী—তোমায় আমায় মিল হয়েছে—V.B.Q. Oct. 1927—To Java ; Also published in *Modern Review*, Oct. 1927

বোরোবুদুর—সে দিন প্রভাতে সূর্য্য এই মতো—V.B.Q. Oct. 1927—Boro Budur—The Sun Shone on a far away morning (451)

সিয়াম—(প্রথম দর্শনে) ত্রিশরণ মহামন্ত্র—V.B.Q. Oct. 1927—To Siam—Reprinted in the *Modern Review.* Nov. 1927—Included in Buddhadeva publication

সিয়াম (বিদায়কালে) কোন্ সে সুদূর মৈত্রী—V.B.Q. Oct, 1927—Farewell to Siam—Reprinted in *Modern Review*, Feb. 1928

বুদ্ধদেবের প্রতি—ওই নামে একদিন ধন্য হল—Mahabodhi Nov.-Dec. 1931—To Gautama Buddha—Tr. by the Author

—Written on the occasion of the opening of the Mulagandha Kuti Bihar of Saranath —Reprinted in poems 91—Bring to this country

—*Hindusthan Standard* Daily 16.9.56—To Lord Buddha—Tr. by H. P. Chattopadhyaya

(১৯৩২)—পুনশ্চ— র র ১৬

কোপাই - পদ্মা কোথায় চলেছে- V.B.Q.—May-July, 1935—The Kopai—Reprinted in —Poems 94 - -Idly my mind follows the Sinuous sweep of the Padma

পত্র—তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা এক বই-ভরা কবিতা—Poems No. 1—Here I send you my Poems densely packed

শেষ দান—ছেলেদের খেলার প্রাঙ্গণ। শুকনো ধুলো—V.B.Q. Nov. 1938—The Kanchan Tree—Tr. by Kshitish Ray

একজন লোক---আধবুড়ো হিন্দুস্থানী রোগা লম্বা মানুষ—Poems 95—An Oldish Upcountry man tall and lean

প্রেমের সোনা—রবিদাস চামার ঝাঁট দেয় ধুলো—*Harijan*, May. 20. 1933—Raid as, the sweeper sat stilll lost in the solitude of his soul—Tr by the Poet (454)

স্নান সমাপন—গুরু রামানন্দ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে—Poems 98—At the dusk of the early dawn Ramananda, the Brahmin Teacher stood

প্রথম পূজা—ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির—*Hindusthan Standard*, Ann. 1954—The First Puja—Tr. by S. Moitra

ছুটির আয়োজন—কাছে এল পূজার ছুটি—*Hindusthan Standard*, Ann. 1938, 1949 Preparing for the Puja Holidays. Tr. by K. Roy

মানব পুত্র—মৃত্যুর পাত্রে খ্রীষ্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন—The Son of Man—From his eternal Sea (453)

*একদিন যারা মেরে ছিল তারে গিয়ে— ১৯৩৯ খ্রীষ্টোৎসবে—*Modern Review*, Jan. 1940—Christmas, 1939—The Indwelling Divinity—Tr. by Amiya Chakravarty —Poems 112—Those who struck Him once

নাটক—(১৯ ২০ পৃষ্ঠায় এই কবিতার শেষের দিকে) গদ্য এল অনেক পরে—Prose came long after —The Later Poems of Tagore page 33

নূতনকাল—৪র্থ স্তবকে—তাই ফিরে আসতে হল (২২-২৩পৃষ্ঠা)—I had to return once more—Later Poems p. 34

বাসা—শেষ স্তবক-এই পর্য্যন্ত—এ বাসা আমার হয় নি বাঁধা ৪৪ পৃঃ—Thus Far—This house of mine has neverbeen built—Later Poems p. 38

বাঁশি—মাঝে মাঝে সুর জেগে ওঠে পৃঃ ১১৮-১৯—There are moments when a tune awakens—L.P. p. 39

পুকুর ধারে—চেয়ে দেখি আর মনে হয় পৃঃ ৩২—As I look at these things........L.P. p. 43

---

* পাদটীকা—শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় The Leter poems of Tagore গ্রন্থে কবির শেষের দিকে রচিত কয়েকটি কবিতার বইএর উপর তাঁর মন্তব্য প্রকাশ প্রসঙ্গে ঐ বইগুলির কয়েকটি কবিতার মাঝে মাঝে অনুবাদ করেছেন। যেখান থেকে অনুবাদ করেছেন তার নিশানা দিয়েছেন ঐ সব বইএর পৃষ্ঠা সংখ্যা দিয়ে। আমরা সেজন্য ঐ বইগুলির থেকে কবিতার নাম ও অনূদিত অংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা দিয়ে Later poemsএর অনুবাদের পৃষ্ঠা সংখ্যা দিলাম।

স্মৃতি—পশ্চিমে শহর পৃঃ ৫৬-৫৭ —It is a town in the West—L.P. p. 45-46

অপরাধী—প্রথম স্তবক ও শেষ—

—তুমি বল তিনু প্রশ্রয় পায় পৃঃ ৩৩-৩৬—You complain that I indulge Tinu—L.P. p. 47

ছেলেটা—শেষ স্তবকঅম্বিকে মাষ্টার আমার কাছে দুঃখ করে গেল

পৃঃ ৬৩ ৬৪ —Ambikababu war telling me—L.P. p. 48

বালক—শেষ ৩ লাইন আর সেদিনকার আমারি মতো

অনেক ছেলে ঘরে ঘরে পৃঃ ৮১ --Inside the many houses there are countless children—p. 49

শেষ চিঠি—৪র্থ স্তবক—শুনেছি ডুবে মরবার সময় পৃঃ ৭৩ —It is said that before drowning p. 49

শেষ স্তবক– যাক সে সব কথা পৃঃ ৭৫ —Oh, let these thoughts be—p. 50

সাধারণ মেয়ে—মাঝে —তাকে নাম দিয়ো মালতী পৃঃ ১০২ —Call her Malati p. 51 শেষ পৃষ্ঠা ১০৪—এইখানে জনান্তিকে বলে রাখি —Let me here put in an aside

ফাঁক—৩য় স্তবক বেলা দুপুর, আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে পৃঃ৬৮—It is midday, the sky blazes hot ...... L.P. p. 53

বিশ্বশোক—দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি পৃঃ ৬৯ ৭১ —In the days of my sorrow—p. 54

প্রভেদ—তোমাতে আমাতে আছে ত প্রভেদ —Poems 96—Though I know, my friend, that we are different

বিদায়—তোমার আমার মাঝে হাজার বৎসর —Poems 97—A veil of a thousand years dropped between you and me

পাঞ্চশস্য

ভারতে পরমাণু শক্তির বিকাশ

ভারত এটম বোমা তৈরি করবে কি করবে না সে হ'ল অন্য বিবেচনা, সম্প্রতি এ নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে এবং মনে হয় ভবিষ্যতে আরও হবে। এ সমস্ত বাক-বিতণ্ডার মধ্যে একটা প্রশ্ন কিন্তু ইতিপূর্বেই মীমাংসিত: ভারত পরমাণুর নূতন শক্তিকে শান্তির কাজে লাগাতে যাচ্ছে, বিশেষত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে। কয়লা, জলস্রোত এবং খনিজ তেল বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রথাগত উৎস। ভারতে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস খুবই পরিমিত। দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের—বর্তমানে ৮২'৩ লক্ষ কিলোওয়াট—মাত্র সামান্য অংশ (৩ লক্ষ কিলোওয়াট) এ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রধানত কয়লা-নির্ভর। কয়লা দহন শক্তি থেকে বর্তমানে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু কয়লা সম্বন্ধে প্রধান আপত্তির ব্যাপার এই যে, তার পরিমাণ খুবই সীমিত। নূতন সমীক্ষায় জানা গেছে, ভারতে কয়লার সঞ্চয় আনুমানিক ৬০০০ কোটি টন। বর্তমানে যে হারে বিদ্যুতের ব্যবহার ৮ থেকে ৯ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে তাতে ১০০ কি ১৫০ বছর পরে যাদুঘরের বাইরে কয়লার টুকরা বলতে কিছু থাকে কি না সন্দেহ আছে। এমন অবস্থায় দূর ভবিষ্যতের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবস্থা কয়লার উপর বেশি ভরসা রাখতে পারে না। নদনদীবহুল ভারতে জল-বিদ্যুৎ—অর্থাৎ জলের প্রবাহ-শক্তি থেকে আহরিত বিদ্যুৎ খুবই সম্ভাবনাময়। কেন্দ্রীয় জল ও শক্তি কমিশন এ বিষয়ে বিস্তৃত সমীক্ষা নিয়ে দেখেছেন জলপ্রবাহ থেকে আমরা অন্তত ৪০০ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি পেতে পারি। দুঃখের বিষয় তার অতি সামান্য ভাগই এ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে। জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশেষত্ব এই যে, তার যন্ত্র-স্থাপনার প্রাথমিক ব্যয়ভার খুবই অধিক, চলতি ব্যয় সামান্য মাত্র। পরমাণু-জাত বিদ্যুতেও উৎপাদনের এই বিশেষত্ব।

সম্প্রতি ভারত এই পরমাণুর পথে অগ্রসর হয়েছে। এর কারণ, প্রাথমিক ব্যয়ভারের প্রশ্ন থাকলেও অন্যান্য এমন কতকগুলি সুযোগ সুবিধা রয়েছে যার ফলে সবদিক বিবেচনায় তৌলদণ্ড পরমাণুর দিকেই ভারী হয়ে ওঠে। কয়লার পরিমাণ সীমিত। ভারতে কয়লার খনিগুলি দেশের পূর্বাঞ্চলে বিহার ও পশ্চিম বাংলায় কেন্দ্রীভূত। এত বড় দেশের অন্যান্য প্রান্তে কয়লা-নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন তাই পরিবহনের দিক দিয়ে খুবই জটিল প্রশ্ন। উৎপাদনী ব্যয়ও তাই এ সব অঞ্চলে বেশি হবে। পরমাণু শক্তির মূল উপাদান—ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম ধাতু, ভারতে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। সহজে পরিশোধনীয় অবস্থায় তা যথাক্রমে ১৫,০০০ ও ১৫০,০০০ টনের কম হবে না। শক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম পরিমাণেও অনেক কম লাগে, এদিকে কয়লার সঙ্গে কোন তুলনাই চলে না। বর্তমানের উৎপাদনী ব্যবস্থায় এক টন ইউরেনিয়াম প্রায় চল্লিশ হাজার টন কয়লার কাজ করতে পারে। অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে কারিগরি কৌশল উন্নত হ'লে আরও অল্প পরিমাণ ইউরেনিয়াম আরও অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে সমর্থ হবে।

ভারত বর্তমানে দেশের পশ্চিম-মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে পরমাণু-শক্তিজাত বিদ্যুৎ-উৎপাদনী যন্ত্র বসানো মনস্থ করেছে। বোম্বের অদূরবর্তী তারাপুরে ইতিমধ্যেই কাজ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক যোজনাকালের মধ্যেই (১৯৬৭-৬৮) এখানকার পরমাণু শক্তি কেন্দ্র থেকে ৩'৮ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ মানুষের বশে আসবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরমাণু বিদ্যুৎ যন্ত্র স্থাপনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে রাজস্থানের রাণাপ্রতাপ সাগর এবং মাদ্রাজের কল্পকম্-এ। উৎপাদনী ক্ষমতা যথাক্রমে ২ এবং ৪ লক্ষ কিলোওয়াট।

পরমাণু আধুনিক বিজ্ঞানের এক নূতন শক্তি। বহু হাজার বছরের ধ্যান-ধারণায় আজ তা মানুষের আয়ত্তে এসেছে। মানুষ কিন্তু এতদিন তার ধ্বংসের রূপটাই শুধু জেনেছিল। পরমাণু প্রথম প্রকাশে বোমা হিসাবেই দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ধ্বংসই তার একমাত্র রূপ নয়। পরমাণুর অফুরন্ত শক্তিকে মানুষ শান্তির কাজেও লাগাতে পারে। ভারত এ পথেই অগ্রসর হয়েছে। শান্তির কাজে পরমাণুর ব্যবহার মানুষের সামনে অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। ভারত তা কাজে লাগাতে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরমাণু তারই একটা প্রধান উপায়। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ শক্তির বিকাশে পরমাণু স্থান করে নিচ্ছে।

ভাটনগর পুরস্কার

সম্প্রতি ভারত সরকার দেশের বিজ্ঞানীদের জন্য শান্তিস্বরূপ

ভাটনগর স্মৃতি পুরস্কার প্রবর্তন করেছেন। পুরস্কারের নগদ মূল্য দশ হাজার টাকা, গত ১৩ই জানুয়ারী নয়া দিল্লীর এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বারোজন বিজ্ঞানীকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। বছরে চারজন ক'রে ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিন বছরের পুরস্কার একসঙ্গে ঘোষণা করা হ'ল।

পুরস্কার দানের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষকমন্ত্রী শ্রী এম. সি. চাগলা বলেন যে, দেশে বৈজ্ঞানিক সমাজ গড়ে তুলতে হ'লে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি জানাতে হবে। ডঃ ভাটনগরের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত এই পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীরা তরুণ বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করবেন এবং নোবেল পুরস্কার অধিকারীদের মতই সারা বিশ্বে সম্মানের অধিকারী হবে – শ্রীচাগলা এই আশা পোষণ করেন।

১৯৫৫ সালে ডঃ ভাটনগরের আকস্মিক মৃত্যুতে নেহরুজী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক সভায় বলেছিলেন, "আমি সব সময়েই নানা ক্ষেত্রে বিখ্যাত লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করে থাকি, কিন্তু ডঃ ভাটনগর তাঁদের মধ্যেই ব্যতিক্রম, কাজ করার অদম্য ইচ্ছা তাকে বিশেষত্ব দান করেছিল। এর ফলে তিনি যা অবদান রেখে গেলেন তা সত্যই উল্লেখযোগ্য। আমি যথার্থ বলছি, ডঃ ভাটনগর না থাকলে আপনারা আজকের এই জাতীয় গবেষণা কেন্দ্রগুলি দেখতে পেতেন না।"

নেহরুজীর এই অকুণ্ঠ প্রশংসাবাণী সকলেই অনুধাবন করবেন। দেশের জাতীয় গবেষণাগুলি কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের কর্মসচিব হিসাবে ডঃ ভাটনগরের প্রেরণা ও নির্দেশে গড়ে উঠেছিল। ভারত সরকার সেই অসামান্য অবদানের কথা বিবেচনা করেই বর্তমানে জাতীয় বিজ্ঞান পুরস্কার তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করলেন। তবে আরও অতীত ঐতিহ্যবাহী কোন নাম, যে নামের সঙ্গে তরুণ বিজ্ঞানীদের সাধ এবং স্বপ্ন জড়ানো-মেশানো, তা যদি এর সঙ্গে জড়িত হ'ত তবে পুরস্কারদানের মূল উদ্দেশ্য বোধহয় আরও অধিক পরিমাণে সফল বা সার্থক হ'ত। তা ছাড়া, ডঃ ভাটনগরের আগেও অনেক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার সুযোগ-সুবিধা আনার জন্য জাতীয় গবেষণা কেন্দ্র প্রবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ডঃ মেঘনাদ সাহার নাম এ প্রসঙ্গে খুবই উল্লেখযোগ্য।

ভোল্ট! সাবধান!—হিন্দী প্রসঙ্গে

প্রতিটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের গায়ে বিপদ-জ্ঞাপক নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়ার একটা বিধি আছে। বিদ্যুৎ যেহেতু যন্ত্রের মতই মারাত্মক প্রাণহারক, এমন একটা নিয়ম প্রবর্তনের অবশ্যই যৌক্তিকতা রয়েছে, যাতে জনসাধারণ বিপদের সম্ভাবনা বুঝে আগে থেকেই সাবধান হ'তে পারে। ভারতীয় মানক সংস্থা—ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইনষ্টিটিউশন—শিল্পজাত বা শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষের ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা মান নির্ধারণ করেন। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ঐ সাবধানবাণী কি ভাবে লেখা হবে, কত বড় ক'রে লেখা হবে, ইত্যাদি খুঁটিনাটি এরা বিস্তারিতভাবে ঠিক করেছেন, সারা ভারতে যা কি না প্রবর্তিত হচ্ছে, হবে। আমরা তাদের পরিকল্পিত একটা নোটিশ-এর প্রতিলিপি এখানে ছাপিয়ে দিচ্ছি, মড়ার খুলি এবং দু'টি হাড় বিপদের কথা সহজেই বুঝিয়ে দেয়। দুনিয়ার সর্বত্র এই ছবির প্রতীকে বিদ্যুৎ-ঘটিত বিপদের সম্ভাবনার কথা জানান হয়ে থাকে। কিন্তু এ ছবিটিই সব নয়, কি বিপদ, কি থেকে বিপদ, সাধারণের কাছে তা আরও স্পষ্ট হওয়া চাই। ভাষায় সেটা লিখে দেওয়া হয়। ২৩১ ভোল্ট, কি ৪৪০ ভোল্ট কিংবা ১১,০০০ ভোল্ট। আশ্চর্যের কথা এই যে, আমাদের জাতীয় মানক সংস্থা সাধারণকে বোঝানর জন্য যে নোটিশের নক্সাটি অনুমোদন করলেন তা থেকে এই পশ্চিম বাংলায় পশ্চিম বাংলার লোকদের জন্যই টাঙান নোটিশ-লিপিটি থেকে কোন মর্মউদ্ধার করা সম্ভব হবে কি না সন্দেহ আছে, যদি কেউ ইংরাজী জানলেও হিন্দী না জানেন। নোটিশের প্রধান অংশ হিন্দী ভাষাই দখল ক'রে নিয়েছে, ইংরাজীতে ভোল্ট কথাটি পর্যন্ত লেখা নেই, জেলার প্রচলিত ভাষায় অবশ্য বিপদের কথা লিখে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু তাতে দার্জিলিং-এর মত জেলার অবস্থা কি দাঁড়াবে। সেখানে জেলার ভাষা দু'টি, বাংলা ও নেপালী, বাংলা লিপি কি নেপালী লিপি। জায়গা নেই, তাই একটাকে বেছে নিলে আর একটাকে বাদ দিতে হবে। ফল দু' ক্ষেত্রেই সমান। এক ভাষায় লিখলে আর এক ভাষাগোষ্ঠী মানুষের কাছে বিপদের বার্তাটাই অজানা থেকে যাবে। হিন্দীর অনাবশ্যক বিস্তার এভাবে বিপদের গণ্ডিকে স্পর্শ করেছে।

এ. কে. ডি

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭.২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

ষষ্ঠ সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৭১

বিবিধ প্রসঙ্গ

বর্ণবিদ্বেষ রাষ্ট্রনীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ

আমাদের দেশে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে সঙ্গতির পরিমাপ অনুযায়ী, দুইটি শ্রেণীতে জনসাধারণকে বিভক্ত করা হয়। অতি অল্পসংখ্যককে বলা হয় "পাইয়াছে" দলের লোক এবং বিরাট্ সংখ্যক লোককে বলা হয় তাহারা 'পায় নাই" দলভুক্ত। অবশ্য এইরূপ শ্রেণী বিভাগ অন্য দেশেও আছে তবে সভ্য জগতের উন্নততর দেশগুলিতে ঐরূপ শ্রেণীবিভাগ কিছুমাত্রায় অর্থহীন হইয়া পড়িতেছে। কেননা সেখানে যাহারা "পায় নাই" শ্রেণীতে ছিল এখন কালের গতিতে তাহাদের অভাব-অনটন এমন কিছু নয় যাহাতে তাহাদের বা তাহাদের সন্তান-সন্ততির জীবন-যাত্রাপথ কঠিন বা বাধাপূর্ণ হইতে পারে। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি মানুষের জীবনে অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য যে সকল বস্তু, ঐ সকল দেশে প্রায় সকল কর্ম্মঠ লোকেই তাহা পায় এবং যাহারা বার্দ্ধক্য বা দৈহিক কর্ম্মশক্তির অভাব দরুন উপার্জ্জনে অক্ষম তাহাদেরও অধিকাংশ তাহা পায়। সুতরাং সে-সকল দেশে ঐ জাতীয় শ্রেণীবিভাগ ঠিক চলে না। কেননা সেখানে "পায় নাই" অর্থে বুঝায় "যথেষ্ট পায় নাই" বা তুলনামুলকভাবে "অত বেশী পায় নাই" সেখানে ঐরূপ বিভাগ করা অর্থহীন।

তবে সে-সকল দেশে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ঐ জাতীয় শ্রেণীবিভাগ অনেক সময় সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়—বিশেষ যে সকল দেশে বর্ণবিদ্বেষ আছে। এবং যেখানে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লোকে বসবাস করে সেইরূপ দেশ অর্থনীতির পরিমাপে উন্নত হইলেও নীতিগত মূল্যায়নে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। দক্ষিণ আফ্রিকা, পোর্ত্তুগিজ আফ্রিকার নানা অঞ্চল ইত্যাদিতে এইরূপ বর্ণবিদ্বেষ শুধু যে "কালা আদমী"-কেই অবনত করিয়া রাখিয়াছে তাহা নয়, 'ধলা"-দেরও অনেক ক্ষেত্রে পশুর অধম করিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়ার জাতি সভ্যতার পরিমাপেও নিকৃষ্ট সুতরাং বর্ণবিদ্বেষ যে তাহাদের নৈতিক মানকে খর্ব করিবে তাহা আর আশ্চর্য কি? কিন্তু সম্প্রতি ব্রিটেনে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যাহা দেখা গিয়াছে তাহা বিস্ময়কর। ব্রিটেনে বহু সংখ্যক ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপের লোক এবং ভারতীয় ও পাকিস্তানি লোকও শ্রমিক হিসাবে যাওয়ায় সেখানকার স্থানীয় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ জাগিয়া উঠিয়াছে। সেই অসন্তোষের সুযোগে কতকগুলি শ্বেতকায় পশু নিরীহ পথচারী "কালা আদমী"কে প্রহার দিয়া ও নানাভাবে অপমান করিয়া নিজেদের বীরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু ব্রিটিশ জজের ন্যায় অন্যায় জ্ঞান লুপ্ত না হওয়ায় এই সকল যুবক শ্রেণীর দুর্ব্বৃত্তরা অতি কঠোর সাজা পাইতে থাকে। সেই সাজা—

চার-পাঁচ বৎসর কঠোর পরিশ্রমসমেত জেলবাস—ইহাদের চেতনা দেওয়ায় ঐরূপ অত্যাচার করা ক্রমে বিরল হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সেই বিদ্বেষের অন্য এক রূপ দেখা দিয়াছে রাজনীতির ক্ষেত্রে। সম্প্রতি ব্রিটেনে কয়টি উপনির্ব্বাচনে এই বর্ণবিদ্বেষকে কেন্দ্র করিয়াই রক্ষণশীল দল সমাজতন্ত্রী প্রার্থীকে হারাইয়া দেয়। সাধারণ নির্ব্বাচনেও রক্ষণশীল দল বহু প্রাদেশিক শহরে, যেখানের কলকারখানায় বহু "বর্ণযুক্ত" (coloured) শ্রমিক কাজ করে, এই বর্ণবিদ্বেষেরই প্রভাবে জয়যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। ফলে ব্রিটেনের সমাজতন্ত্রী সরকার এই "বর্ণযুক্ত" লোকের ব্রিটেনে আগমন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অবশ্য এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুরাণো রক্ষণশীল গভর্ণমেন্টই আরম্ভ করিয়া যায়। যাহাই হউক ব্রিটিশ লেবার পার্টি এ বিষয়ে এখনও দোমনা রহিয়াছে মনে হয়, কেননা এইরূপ নিয়ন্ত্রণে যে সমাজতন্ত্রী আদর্শবাদ ক্ষুণ্ণ হইবে এবং বর্ণবিদ্বেষ-জনিত নৈতিক অবনতি আসিবে ইহা তাঁহারা নিশ্চিত জানেন।

আরও ভয়ানক বর্ণবিদ্বেষ ও নৈতিক অবনতির পরাকাষ্ঠা সম্প্রতি দেখা গিয়াছে আমেরিকার "মার্কিন" যুক্তরাষ্ট্রে। যে অঞ্চলগুলিকে "দক্ষিণ-দেশ" বলে তাহার প্রায় সর্ব্বত্রই মার্কিনী নিগ্রোদের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে, যদিও মার্কিন নিগ্রো আইনত যে-কোন মার্কিন নাগরিকদের সহিত সমান অধিকার পাইতে পারে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণ-বৈষম্য অবশ্য আরো বহু অঞ্চলে আছে, তবে সেটা ঐ দক্ষিণ অঞ্চলের ন্যায় প্রখর ও হিংস্র নয়।

কিছুদিন যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো-অভ্যুত্থানের প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। এবং সেই প্রচেষ্টাকে গান্ধীবাদের অহিংসরূপ দিয়া আরও শক্তিশালী করিয়াছেন নিগ্রো ধর্ম্মযাজক ডাক্তার মার্টিন লুথার কিং। ইঁহাকে সম্প্রতি শান্তি প্রচেষ্টার জন্য নোবেল পুরস্কারও দেওয়া হইয়াছে। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহে যেভাবে আন্দোলনকারীরা মিছিল বাঁধিয়া প্রকাশ্যে রাজপথে চলিত বা বিশেষ কোনও প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিত ঠিক সেইভাবেই মার্কিন দেশেও নিগ্রো অভিযান চালিত হইতেছিল। এবং যেভাবে এখানে পুলিশ ও সৈন্যদল মারপিট ও ধরপাকড় করিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করে ঠিক সেইভাবে ঐ "দক্ষিণ" অঞ্চলের মার্কিন পুলিশ ও প্রাদেশিক সৈন্যদল ঐ সকল অহিংস আন্দোলনকারীদের বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছে। তবে আরও অকথ্য অত্যাচার হইয়াছে এবং আশ্চর্য্য এই যে, যে-সকল শ্বেতাঙ্গ ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন তাঁহাদের খুন-জখম করিতেও ঐ সকল নররূপী পশুর দল ইতস্ততঃ করে নাই। একজন পাদরীকে (শ্বেতাঙ্গ) ঐ ভাবে প্রকাশ্যে ঠেঙ্গাইয়া খুন করায় সারা মার্কিন দেশে চেতনা আসিয়াছে। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জনসন ঐরূপ বিরাট্ শোভাযাত্রাকে সৈন্যদল দিয়া রক্ষণা-বেক্ষণ করিয়াছেন ও নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া এইভাবে নিগ্রোকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বঞ্চিত করা নিরোধ করিতেছেন।

"দ্বিধাগ্রস্ত" সরকার

কিছুদিন যাবৎ লোকসভায় তীব্র তর্ক-বিতর্ক ও অভিযোগ-অনুযোগ চলিতেছে। এতদিন সে-সকল কথাই আসিতেছিল বিভিন্ন বিপক্ষ দলের মুখপাত্রদের মারফৎ। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে যে, কংগ্রেস দলেরই মুখপাত্র হিসাবে যাঁহারা পরিচিত, এরকম কয়জন প্রকাশ্যভাবে লোকসভায় কংগ্রেস সরকারকেই সমালোচনা করিতেছেন। অবশ্য এইরূপ সমালোচনা—দলগত নিষেধ না থাকিলে—রীতি-বিরুদ্ধ নয়, নীতিবিগর্হিতও নয়। কিন্তু সেই সমালোচনার প্রকৃতি হওয়া উচিত গঠনমূলক ও রাষ্ট্রচালন-সহায়ক, যখন নিজ দলেরই কার্য্যক্রমের আলোচনা দলেরই বিশিষ্ট লোকে করেন।

সেই দিক হইতে আমরা বলিতে বাধ্য যে, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও শ্রীকৃষ্ণমেননের বাজেট বিতর্কের মধ্যে বক্তৃতায় আমরা খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাই নাই। দু'জনেরই দীর্ঘদিনের সংযোগ ছিল কংগ্রেসী সরকারের সঙ্গে। দুজনেরই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আছে সরকারী কাজের ও সরকারী অধিকারিত্বের। সুতরাং ইঁহাদের সমালোচনায় আরও বেশী সারবস্তু থাকিবে আমরা আশা করিতে পারি। কিন্তু বস্তুতঃ দু জনেরই ভাষণে কোনও পদার্থ খুঁজিয়া পাইলাম না, পাঁচখানি দৈনিকের বিবৃতি দেখার পর। অবশ্য দু'জনেরই সমালোচনায় ধার আছে এবং কয়েকটি বিষয়ে "খোঁচা"ও প্রখর হইয়াছে কিন্তু যাচাই করিয়া

দেখিলে বোঝা যায় যে, কোনটাতেই শোধনের দিকে পথনির্দেশ নাই।

শ্রীমতী পণ্ডিতের ভাষণে আমরা পাই নানা কথা। তার মধ্যে তিনি সকলের চাইতে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থার। "আমরা এই দ্বিধা-দোটানায় বন্দী হয়ে আছি," এই তাঁহার দোষারোপের প্রধান বস্তু। তাঁহার বক্তৃতার রিপোর্টে আমরা আরও পাই (আনন্দবাজার):—

"শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত লোকসভায় বলেন, ইহা দুঃখের কথা যে, কেরল থেকে কাশ্মীর এবং শেখ আবদুল্লা থেকে ভিয়েৎনাম, কোন গুরুতর ব্যাপারেই সরকার কোন দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন নি।

অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারীর সমালোচনা করে তিনি বলেন, অসদুপায়ে অর্জিত অর্থের মালিকরা কর ফাঁকি দেবার জন্য তাঁদের সম্পদের পরিমাণ ঘোষণা করেন নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্থমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা করছেন। তিনি কর ফাঁকিদারদের ঘুষ দিতে চেয়েছেন। কোন অবস্থাতেই ঐ ধরনের কোন কিছু মেনে নেওয়া উচিত নয়। অসদুপায়ে অর্জিত টাকা যেখানেই থাক, তা বের করার জন্য সরকারের সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত।

লোকসভায় বাজেট বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী ও তাঁর সহকর্মীদের কোন নীতি বিসর্জন না দিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বিরাট কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হ'তে বলেন।

তিনি বলেন, ঐ ভাবে অগ্রসর হ'লেই ভারতের নবরূপায়ণ সূচিত হবে। আমরা সকলেই ঐ ব্যাপারে যথাশক্তি সাহায্য করব।

গত ক'মাস দৃঢ়হস্তে রাষ্ট্রতরণীর হাল ধারণ করার জন্য শ্রীমতী পণ্ডিত বক্তৃতার প্রারম্ভে শ্রীশাস্ত্রী ও তাঁর সহকর্মীদের অভিনন্দন জানান।

এই প্রথম লোকসভায় বক্তৃতা দিতে উঠে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী বলেন, বর্তমান নেতৃবৃন্দ সমাজতন্ত্রের প্রতি যে আনুগত্য দেখাচ্ছেন, তা মৌখিক। সমাজতন্ত্র আজ মাত্র একটি আওয়াজে পরিণত হয়েছে। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে টাকার পাহাড় জমে উঠছে। সমাজে নৈতিক সঙ্কট ঘনিয়ে উঠেছে। এটাই দেশের বহু সমস্যার মূল কারণ।

আমরা দুর্নীতির মধ্যে বাস করতে শিখেছি। যে-মূল্যবোধ আমরা হারিয়েছি, কেউ যদি তা আমাদের ফিরিয়ে দিতে পারত, তা হলে হয়ত আমাদের এতটা দুর্গতি ঘটত না। খাদ্যসংকটের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, অপেক্ষা কর, খাদ্য পাওয়া যাবে, এই আশ্বাস আজ আর যথেষ্ট নয়। জনসাধারণ বেশ কিছুদিন ধরে অপেক্ষা করে আছেন, কিন্তু তাতে কিছুই লাভ হয় নি। বর্তমান বৈষম্য দূর করার জন্য যদি অন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, তাহলে জনসাধারণ নিজেরাই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অগ্রসর হবেন।

দিল্লীর ভোজসভার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের যখন বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করতে হচ্ছে, তখন ভোজসভায় এত প্রাচুর্য্য কেন?"

এই জাতীয় বক্তৃতা আমরা মনুমেন্টের নীচে শুনিলে বলিতাম যে যথাযথ হইয়াছে। শ্রীমতী পণ্ডিত দীর্ঘদিন বিদেশে ভারত-প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রূপে কাটাইয়াছেন। এদেশেও সরকারী ও বেসরকারী রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারীরূপেও তাঁহার অভিজ্ঞতা কমদিনের নয়। সুতরাং তাঁহার ভাষণে নিন্দাবাদ ও "খুঁত ধরার" সঙ্গে কিছু বাস্তবমুখী নির্দেশ বা সিদ্ধান্তমূলক প্রস্তাব থাকিবে ইহা আমরা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখা গেল, যে সে পথেই তিনি চলিলেন না। এবং আরও আশ্চর্য্য কথা, এই ভাষণের গোড়ায় শ্রীশাস্ত্রী ও তাঁহার সহকর্মীদের "দৃঢ় হস্তে হাল ধারণ করার" জন্য প্রশংসাবাদ করিয়া পরে তাঁহাদেরই পদ্ধতিকে 'দোটানা-দোমনা' এবং প্রায় হাল ছাড়ার সামিল বলিয়া নিন্দাবাদও করিতে তিনি ছাড়েন নাই। আমরা বুঝিলাম না শ্রীমতী পণ্ডিত বর্তমানের "দ্বিধাগ্রস্ত" নীতির পরিবর্তে কি চাহেন। এখন জগতের যে পরিস্থিতি তাহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হঠকারিতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। উপরন্তু বিগত ১৭ বৎসরের রাষ্ট্রচালনায়, অনভিজ্ঞতা ও অন্ধ-বিশ্বাসের কুফল স্বরূপে, এতই ভ্রম-প্রমাদ ও বিপরীত বুদ্ধির আবর্জনা শাসনতন্ত্রে ও রাষ্ট্রচালন যন্ত্রে জমিয়াছে যে, সেখানে লম্ফ প্রদান করিয়া অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা বাতুলতামাত্র।

শ্রীমতী সমাজে নৈতিক সঙ্কটের কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু তিনি এতদিন কোথায় ছিলেন? তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ত প্রায় একচ্ছত্র অধিকারীরূপেই রাষ্ট্র-

চালনা করিয়া গিয়াছেন স্বাধীনতা লাভের পর হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত। তিনি রাষ্ট্র ও জাতিকে যেমন একদিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন সভ্যজগতে ও মানব সমাজে, অন্যদিকে এই রাষ্ট্রে দুর্নীতি প্রসারিত হইয়াছে তাঁহারই চাটুকাররূপে যে সকল ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষমতা ও অধিকার পাইয়াছে দেশে ও বিদেশে, প্রধানতঃ তাঁহাদেরই চক্রান্তে ও কারচুপিতে। শ্রীমতী পণ্ডিত কি সে কথা জানিতেন না? যদি জানিতেন তবে তিনি তাঁহার স্নেহশীল জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সে-সবের প্রতিকার করিতে বলেন নাই কেন? যদি না জানিতেন তবে এখন তাঁর জানা প্রয়োজন যে, ভারত রাষ্ট্রের বর্ত্তমান দুরবস্থা ১৭ বৎসরের জঞ্জাল জমিবারই ফল। আমরা শ্রীমতী পণ্ডিতের ভাষণকে খুব বিশেষ মূল্যবান মনে করিতে অক্ষম।

অন্য কংগ্রেসীদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমেনন ও শ্রীকেশব দেও মালব্য এই বাজেট বিতর্কে বাজেটের প্রতিকূল সমালোচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণমেনন ও শ্রীমালব্য, দু'জনেরই বক্তব্যের মধ্যে ছিল বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের ফলে ভারত বিদেশীর পদানত হওয়ার আশঙ্কা আছে। শ্রীকৃষ্ণমেনন ইহা ছাড়া অন্যদিকে কংগ্রেসী সরকার কিভাবে সমাজতন্ত্রের পথ হইতে সরিয়া যাইতেছে সেই বিষয় লইয়াও নানা কথা বলেন, কথা এই বর্ত্তমান বাজেট "ধনীর সহায়ক বাজেট", শিল্প ও অন্য উদ্যোগের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের (পাবলিক সেক্টর) সংকোচন ইত্যাদি।

অর্থমন্ত্রী এইসকল সমালোচনার জবাবও সমান তালে দিয়াছিলেন। এবং সেই জবাবে শ্রীকৃষ্ণমেননকে স্বতন্ত্র-দলের মিঃ মাসানির সঙ্গে সমপর্য্যায়ে ফেলেন, কেননা (শ্রীকৃষ্ণমাচারীর মতে) দুজনেই নেতী ভাবে প্রভাবিত এবং দু'জনের উপরেই বিদেশী রীতিনীতির প্রভাব যথেষ্ট। শ্রীকৃষ্ণমেনন অর্থমন্ত্রীর খোঁচায় চটিয়া গিয়া বলেন যে, তাঁহাকে ও তাঁহার কথাগুলিকে ভুল ভাবে দেখানো হইতেছে। জবাবে অর্থমন্ত্রী শ্রীমেননকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, ভুল অর্থ করা বা ভুল বোঝান কোনও একজন সদস্যের একচেটিয়া অধিকার নয়। শ্রীকৃষ্ণমাচারী প্রবীণ লোক এবং ১৯৩৭ সন হইতে সংসদীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ ও অভ্যস্ত। তাঁহার জবাব সমানে সমানে যায়। জবাবের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট এইরূপ (আনন্দবাজার):—

শ্রীকৃষ্ণমাচারী তাঁহার বক্তৃতার অধিকাংশ সময়ই স্বতন্ত্র দলের সদস্যদের সমালোচনার জবাব দিতে ব্যয় করেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়া দেন যে, সরকার চতুর্থ যোজনার আকার আর হ্রাস করিবেন না অথবা 'ব্যবসা-বাণিজ্যে অবাধ নীতি'তে ফিরিয়া যাইবেন না।

আজ বিতর্ক কালে যাঁহারা অর্থমন্ত্রীর সমালোচনা করেন, ভূতপূর্ব্ব প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমেনন তাঁহাদের অন্যতম। তিনি সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দাবি জানান। বৈদেশিক মূলধন আকর্ষণের জন্য যে পথ অর্থমন্ত্রী গ্রহণ করিয়াছেন, উহার সাফল্য সম্পর্কে তিনি সংশয় প্রকাশ করেন।

অর্থমন্ত্রীর জবাব লোকসভায় বেশ সমর্থন পায়। তাঁহার সরস বক্তৃতা সকলেই উপভোগ করেন।

কালো টাকার কথা ঘোষণা করার জন্য যে সুবিধা তিনি দিয়াছেন, তাহা কার্য্যকর হইবে কি না, সে বিষয়ে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সংশয় প্রকাশ করেন। সরল প্রাণে তিনিও এক সময় তাহা স্বীকার করিয়া ফেলেন, তবে ইহাও বলেন, অর্থমন্ত্রীর যে টাকার দরকার, তাহা ভুলিলেও চলিবে না, ঐভাবে কিছু টাকা পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া তিনি আশা করেন।

বর্ত্তমান বাজেট সমাজবাদের পথ পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া যে সমালোচনা করা হইয়াছে, তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে তাহা অস্বীকার করেন। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নীতি সমর্থন করিয়া যাইবেন। আমরা নেহেরুর সফল উত্তরসাধক। আমি এইমাত্রই বলিতে পারি যে, এই সভার অপর দিকের কেহ যদি সূর্য্যের দিকে ধূলি নিক্ষেপ করে, তবে সে ধূলি তাঁহাদের চোখেই পড়িবে।

শ্রীমতী পণ্ডিতের অভিযোগের জবাব দিতে গিয়া অর্থ-মন্ত্রী বলেন, আমরা অস্থির-সঙ্কল্প নই। সরকার সিদ্ধান্ত-বিমুখ নয়। তবে আমরা মানুষ, ভুল আমাদেরও হইতে পারে।

ভারতে আরও বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের ফলে দেশ পদানত হইবে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণমেনন ও শ্রী কে. ডি. মালব্য যে শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিহীন বলিয়া

তিনি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আরও বৈদেশিক মূলধন আহ্বানের পশ্চাতে আমার কোন স্বার্থ নাই। ভারতের স্বাধীনতা বিকাইয়া দিবার জন্য আমি আসি নাই। আমি কাহারও নিকট নতি স্বীকার করি না। শ্রীমেনন ও শ্রীমালব্য বৈদেশিক মূলধনের প্রশ্নটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন। ভারত যে সর্ত্ত দিবে, সেই সর্ত্তেই বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ করিতে দিব এবং যে-শিল্প ভারত গড়িয়া তুলিতে পারিবে না, কেবল সেই শিল্পেই উহা লগ্নী করা হইবে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, আমি যে সমাজবাদে বিশ্বাসী, বাজেট বক্তৃতার সুরুতে একটি সঙ্কল্প-বাক্য পাঠ করিয়া তাহা ঘোষণার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। কয়েকটি কর-ব্যবস্থাই প্রমাণ করিবে যে, বাজেটটি সমাজবাদের আদর্শভিত্তিক।

পরিশেষে আমাদের মন্তব্য এই যে বাজেট আলোচনার ব্যাপারে লোকসভায় যে বিতর্ক চলিয়া গেল তাহা সেই প্রাচীন কথিকায় সাত অন্ধের হস্তী দর্শনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দুই পক্ষের সকল ভাষণ-মন্তব্য ইত্যাদির যোগফল যা হয় তাহা সাধারণ নাগরিকের বোধগম্য নয়। শ্রীকৃষ্ণমাচারীর বাজেট অতি বুদ্ধিমান লোকের কাজ। সুতরাং উহার দরুন লাভ ও ক্ষতির পূর্ণ পরিচয় এত সহজে পাওয়া যাইবে না। দেশের সাধারণজন ইহার প্রকৃত পরিচয় পাইবেন আরও পরে। আমরা উল্লাস বা হা-হুতাশ কোনটারই সমর্থন করিতে এখনও প্রস্তুত হই নাই।

সীমান্তে পাকিস্তানী উৎপাত

পাকিস্তানের জন্মই হিংসা হইতে একথা আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ যদি মনে রাখেন তবে তাঁহারা পাকিস্তানী হামলা বা গুলীগোলা চালনায় বিচলিত নাও হইতে পারেন। কাশ্মীরের এলাকায় ত হামলা ও গুলী-গোলা চালনা প্রায় সেদিন থেকেই চলিতেছে যেদিন পণ্ডিত নেহরুর বুদ্ধি-বিভ্রমের ফলে কাশ্মীরের মামলা জাতিসঙ্ঘের সম্মুখে যায় ও জাতিসঙ্ঘের হুকুমে পাকদখলীকৃত কাশ্মীর ও পাকহামলা-মুক্ত কাশ্মীরের মধ্যে একটা কৃত্রিম সীমান্তরেখা টানা হয়।

তারপর জন্মদাতা রক্ষণশীল ইংরাজ ও "মুরুব্বি" মার্কিন এই দুই খুঁটির জোরে পাকিস্তান ঐ জাতিসঙ্ঘেরই আদালতে ফরিয়াদি ভারতকে আসামীর কাঠগড়ায় ঢোকাইবার জন্য কত খেলাই খেলিয়াছে। উপরন্তু দুই অতি অজ্ঞ মার্কিনি পররাষ্ট্র নীতি-বিশারদ কম্যুনিষ্ট জগতের চতুষ্পার্শ্বে অবরোধ-প্রাচীর নির্ম্মাণের চেষ্টায় প্রথমে তুর্কী ও পরে পাকিস্তানে জলের স্রোতের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্র সম্ভার এবং নগদ টাকা ঢালিতে থাকে। আজ সেই দুই বুদ্ধিমানের মধ্যে একজন মৃত ও অন্যজন রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র হইতে একরকম বিতাড়িত। কিন্তু ইহাদের কীর্ত্তি-চিহ্ন রূপে পাকিস্তানে অস্ত্র সাহায্য ও অর্থ সাহায্য দুই চলিতেছে—যদিও যাহার সহিত বিরোধ করার জন্য মার্কিন রাষ্ট্র এত খরচ করিল পাকিস্তানের জন্য সেই কম্যুনিষ্ট চীনই এখন পাকিস্তানের নয়া নাগর। এবং সেই বিনা মূল্যে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র গুলীগোলা এখন সমানে খরচ হইতেছে ভারতের সঙ্গে বৈর সাধনায়। সুতরাং এক হিসাবে পাকিস্তানের এই সকল উৎপাতের আরম্ভ মার্কিন অর্থ-সাহায্য।

কাশ্মীরের "গুলী চালন বন্ধ" রেখায়, অর্থাৎ পাক-অধিকৃত ও স্বাধীন কাশ্মীরের সীমান্ত রেখায় গুলী-গোলা হামলা এত ধারাবাহিক ভাবেই চলিতেছে। তারপর চলে আসাম সীমান্তে লাটি-টিলা ও অন্য দুই-এক স্থলে। সম্প্রতি কিছুদিন যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অঞ্চলে কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি এলাকায় একদিকে পাকিস্তানী দল চুরি-ডাকাইতি রাহাজানি—অর্থাৎ তাহাদের বংশগত পেশা—চালাইতেছে, পিছনে সশস্ত্র আনসার ও পূর্ব্বপাকিস্তান রাইফলস্ লইয়া, আবার সেই সব চেষ্টা ব্যর্থ হইলে সমানে গুলী ও মর্টারের (খর্ব্বাকৃতি কামান) গোলা চালাইতেছে। এবং সেই সঙ্গে শোনা যায় সৌরাষ্ট্রে ও যোধপুরে সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া পাকিস্তানী হামলাকারিগণ উৎপাত করিতেছে। অবশ্য সেখানে অন্য তিনটি অঞ্চলের মত উৎপাতের বহর ও ব্যাপ্তি এত বেশি নয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে পাকিস্তানের নিকট ভারত এক অস্ত্র-সংবরণের প্রস্তাব করে। পাকিস্তান ঐ প্রস্তাবে সম্মতও হইয়াছিল। সেই প্রস্তাবে ছিল যে প্রথমে দুই পক্ষই অস্ত্র সংবরণ করিবে এবং তারপর সমস্ত বিরোধের বিষয় আলোচনা করা হইবে। অবশ্য প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার

কোনও নজীর পাকিস্তানের ১৭ বৎসরের ইতিহাসে নাই। কিন্তু আমাদের কর্তৃপক্ষ বহুবার প্রতারিত হইবার পরও এই আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই যে, একদিন পাকিস্তানে শুভবুদ্ধির উদয় হইবে। উপরন্তু গোলাগুলী ও অস্ত্রশস্ত্র যদিও মার্কিন দেশের কৃপায় জোটে, মিথ্যার বান পাকিস্তানে প্রচুর তৈয়ারী হয়, কেননা পাকিস্তানের বড় বড় মুখপাত্রেরা এক একজন মিথ্যার কারখানাস্বরূপ। সুতরাং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে—কখনও বা চীনের দৃষ্টান্ত মত পূর্ব্বাহ্ণেই মিথ্যা দোষারোপ করিয়া ভারতকেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য দায়ী করা আরম্ভ হয়। এইবারের অস্ত্র-সংবরণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বেলায়ও সেই অপকার্যক্রম বাঁধাধরা পাকিস্তানী দস্তুর-মুতাবিকই হইয়াছে। লিখিবার সময় দুইটি সংবাদ একসঙ্গে আসে—একটি কোচবিহার-রংপুর সীমান্ত হইতে, অন্যটি আসে ঢাকা হইতে এবং দুইটিই শনিবার ২৭শে মার্চ্চের ঘটনা সংবাদের প্রথমটি আনন্দ-বাজারের ও দ্বিতীয়টি এক সংবাদ প্রতিষ্ঠানের।

"পাকিস্তান শনিবার সতীরপুরের নতুন এলাকায় হামলা সুরু করে। এদিন তিনবিঘা, খরখরিয়া, ঝিকাবাড়িতেও তারা প্রবল আক্রমণ চালায়। কোচবিহার-রংপুর সীমান্তের প্রায় নয় মাইল জায়গা জুড়ে পাক মর্টার রাইফেল ও মেশিনগান এখন তীব্র গোলাগুলী বর্ষণ করছে।

গোলার বিরাট্‌ আকার দেখে অনুমান করা হচ্ছে যে, এগুলো ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলা। এ গোলাগুলী অস্ত্রশস্ত্র, বিদেশের তৈরী বলেই মনে করা হচ্ছে! যে নিপুণ কৌশলে অবিরাম গোলাগুলী ছোঁড়া হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের সন্দেহ, সেটা পাক সীমান্ত পুলিশের কাজ নয়, সেনা-বাহিনীর পাকা হাতের মার। সীমান্তের ভারতীয় এলাকায় অনেক বাড়ী পাক গুলীগোলার আঘাতে ঝাঁঝরা।

ভারতীয় ছিটের অবস্থা

কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি, শালবাড়ি, কাজলদীঘি, কোতভাজিনী প্রভৃতি বড় বড় ভারতীয় ছিট তালুক দীর্ঘ-কাল যাবৎ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন। গত জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে শালবাড়ি ও কাজলদীঘি ছিট দুটো থেকে প্রায় তিন হাজার রাজবংশী সাঁওতাল ঘরবাড়ী ছেড়ে ভারতে পালিয়ে আসে। ভারতভূমি থেকেই তারা নতুন করে উদ্বাস্তু হয়। কিন্তু আজও সেই ভারতীয় ছিটে ফিরে যাবার পথ পায় নি। এই ছিট দুটো মাত্র দু'বিঘা পাক অঞ্চল দিয়ে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন। অথচ পাকিস্তান ভারতভূমি তিনবিঘার ওপর দিয়ে দাহাগ্রাম পাক ছিটে যাবার অধিকার দাবি করছে। তিনবিঘার ওপর অবিরাম হামলা চালাচ্ছে।"

"ঢাকা, ২৭শে মার্চ্চ—ডাহাগ্রাম পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ব পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারীদের মধ্যে এক বৈঠকের যে প্রস্তাব ভারতের পক্ষ হইতে করা হয়েছে পাকিস্তানের তার প্রতি সমর্থন আছে। গতকাল এই কথা বলে পূর্ব্ব পাকিস্তানের গভর্ণর শ্রীমোনিম খাঁ বলেন, "স্থিতাবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তিত" হ'লেই এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে।

ভারতবিরোধী প্রচারকার্য্য চালু রাখার জন্য গভর্ণর কিন্তু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ডাহাগ্রাম এলাকায় ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগের উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, ভারত এখনও পাকিস্তানী অফিসারদের কোচবিহার জেলার দহগ্রাম ছিটমহল পরিদর্শনের পারমিট না দিয়ে "স্থিতাবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তনে ব্যর্থ হয়েছে'।"

এইভাবে উৎপাতের প্রসারণ ও সুচিন্তিত নক্সা অনুযায়ী হইতেছে সন্দেহ নাই এবং ইহার পিছনে চীনা সলা-পরামর্শ রহিয়াছে তাহাও নিশ্চিত। যেভাবে কাজ চলিতেছে তাহাতে এদিক হইতে নরম হইলেই পাকিস্তানী ফন্দি পুরাপুরি সফল হইবে। আশা করা যায় নয়াদিল্লীর দল সেটা বুঝিতে সক্ষম। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মহল এখন এ বিষয়ে স্থির সংকল্প আছেন শোনা যায়। তাঁহাদের মতে অস্ত্র সংবরণ সম্পর্কে নূতন প্রস্তাব বা কথাবার্ত্তা এখন পাকিস্তানের তরফ হইতেই আসা উচিত। এদিক হইতে সে প্রকার কোনও সাড়াশব্দ দেওয়া অত্যন্ত ভুল হইবে। সুতরাং এখন কঠোর প্রতিরোধ ব্যবস্থা খাড়া করা ও বহাল রাখাই একমাত্র পন্থা।

নয়াদিল্লীর পররাষ্ট্রবিদগণ যাহাই ভাবুন, জগতের অন্য সকলেই পাকিস্তানের ভাবগতিক সঠিক ভাবেই বুঝিয়া লইয়াছে এবং সেই মত নিজ নিজ বিচার অনুযায়ী, পাকিস্তান ও ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিতেছে। চীন ভারতের পরম শত্রু এবং চীন বহুপূর্ব্বেই বুঝিয়া

লইয়াছে যে, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির মূল সূত্রই ভারতের অনিষ্ট সাধন। এবং সেই সূত্রেরই ভিত্তিতে চীন পাকিস্তানের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে ভারতের সর্ব্বনাশ করার উদ্দেশ্যে।

এখন আমাদের সম্মুখে দুইটি প্রশ্ন রহিয়াছে। প্রথমটি হইল নয়াদিল্লীকে বুঝান যে, চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে অন্যদিকে যে প্রভেদই থাকুক, ভারতের প্রতি বৈরাচরণ বিষয়ে দুইই সমান। উপরন্তু পাকিস্তান মার্কিনী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এক অপরূপ সম্পর্ক রাখিয়াছে, যাহারদরুন একদিকে মার্কিন সরকারকে "বোকা বুঝাইয়া" বিনা পয়সায় অস্ত্রশস্ত্র ও বিরাট্ পরিমাণে আর্থিক সাহায্য আদায় চলে ও অন্যদিকে ভারতকে কোনপ্রকার সাহায্য দিলে মান-অভিমান ও চক্ষু রক্তবর্ণ করাও চলে—যদিও ভারত কোনকিছুই বিনামূল্যে চাহে না ও লয় নাই। সুতরাং পাকিস্তান সম্পর্কে আমাদের সতর্কতা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঠিক চীনের দরুন যে ভাবে হইতেছে সেই ভাবেই হওয়া প্রয়োজন। এবং সেই ব্যবস্থা যত দ্রুত অগ্রসর হয় ততই ভাল।

কেননা পাকিস্তান যেভাবে ক্রমেই হামলা, গুলী-গোলা চালনা, সশস্ত্র পাকিস্তানী সেনা বা আনসারের সমর্থনে ভারতীয় এলাকায় হানাদার দুর্বৃত্তদের আক্রমণ ও লুঠপাট, ইত্যাদি বর্দ্ধিত ও প্রসারিত করিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে গুপ্ত চুক্তি হইয়াছে ভারতের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার। উপরন্তু পাকিস্তান ও চীন তাহাদের মিথ্যা প্রচারের বলে জগতের সামনে ভারতকেই ঐ যুদ্ধের জন্য দায়ী করিতে চাহে। এবং এ বিষয়ে তাহাদের সহায়ক ও পঞ্চম বাহিনীরূপে যাহারা এ দেশের ভিতরে রহিয়াছে তাহাদের মারফৎ এদেশের মধ্যেও অপপ্রচার চালাইবার এবং বিধ্বংসী কার্য্যক্রমের অনুশীলন ব্যবস্থাও তাহারা দ্রুত করিবার আয়োজন করিতেছে মনে হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তরকে বিদেশে পাকিস্তান সম্পর্কে প্রচার—অন্ততঃ পাকিস্তানী অপপ্রচার খণ্ডন—ব্যবস্থা সক্রিয় ভাবে চালু করার প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত করা যায় কি উপায়ে। এতাবৎ পাকিস্তান আমাদের উপর ক্রমাগত দোষারোপই করিয়া গিয়াছে এবং আমরা শুধু নাকিসুরে "অহো! কি দুর্ভাগ্য আমাদের যে পাকিস্তান আমাদের ভুল বুঝিল" এই জাতীয় বিলাপ গাহিয়াছে। এইরূপ মূর্খ আচরণের ফলেই আজ জগতে আমাদের আসন ক্রমেই নীচে নামিতেছে।

হিন্দী ও অহিন্দী ভাষীর সমস্যা

নয়াদিল্লীর কর্ত্তাব্যক্তিদের মধ্যে এখনও সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে কোনও সমস্যা দেখার প্রয়োজন খুব অল্প লোকেই বুঝিয়াছেন। অবশ্য আমরা বুঝি যে, জবাহরলাল নেহরুর বিরাট ব্যক্তিত্ব বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার কাহারও কাছে আশা করা বাতুলতা। কিন্তু পণ্ডিতজী যে দীর্ঘদিন তাঁহার সহকর্ম্মীদের চোখের সম্মুখে প্রাদেশিকত্ব বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ স্থাপনার আদর্শ ধরিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহার সেই আদর্শবাদ কি তাঁহার সহকারীদের মনে আঁচও কাটিতে পারে নাই? ব্যক্তিত্ব সম্প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হয় মনের প্রসার বা সঙ্কোচনের কারণেই। এবং মনের প্রসার তখনই সম্ভব যখন মানসচক্ষু মোহাচ্ছন্ন নয় এবং চিত্ত নিষ্কাম—অন্ততঃ ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত কামনালুব্ধ নয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার কর্ত্তাব্যক্তিদের এটুকু জ্ঞানেরও কি অভাব রহিয়া গিয়াছে?

নয়াদিল্লীতে বিগত ২৭শে মার্চ্চ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মহিলা আহ্বায়কদের তিনদিনব্যাপী এক সম্মেলন হয়। সেখানে উদ্বোধনকালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তাঁহার পিতার আদর্শবাদের প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ঐদিনই ঐ সভায় যে বক্তৃতা করেন তাহা দ্ব্যর্থযুক্ত এবং বুঝা যায় যে, তিনি নিজ মাতৃভাষাকে "রাজভাষা"রূপে প্রতিষ্ঠিত করার লোভ পরিত্যাগ করিতে এখনও পারেন নাই। দুইজনের বক্তৃতার রিপোর্ট এইরূপ—

"নয়াদিল্লী, ২৭শে মার্চ্চ—কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ বলেন যে, ঘরোয়াভাবে ভাষা সমস্যা সমাধানের জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করা উচিত।

শ্রীমতী গান্ধী প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মহিলা আহ্বায়কদের তিনদিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, ভাষা সমস্যা সমাধানে আমাদের অতি

সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দীর গতি ত্বরান্বিত করিতে গেলে সমস্যার সৃষ্টি হইবে।

দক্ষিণ ভারতে সাম্প্রতিক ভাষাবিদ্রোহ সম্পর্কে তিনি বলেন, হিন্দীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কিছু সংখ্যক হিন্দীভাষী যেরূপ অধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহারই ফলে দক্ষিণ ভারতে বিশেষভাবে মাদ্রাজে অহিন্দীভাষীদের মনে ক্রোধ ও আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, মাদ্রাজ হাঙ্গামার অব্যবহিত পরে আমি মাদ্রাজ গিয়াছিলাম। আমি দেখিয়াছি, অধিবাসীরা হিন্দীবিরোধী নয়, কিন্তু কেহ তাহাদের উপর হিন্দী চাপাইয়া দিবে, ইহা তাহারা চায় না।"

"নয়াদিল্লী ২৭শে মার্চ্চ—ভাষা সমস্যা সম্পর্কে হিন্দী ও অহিন্দী ভাষী রাজ্যগুলির তুষ্টির জন্য "কোন একটি মধ্যপন্থা" উদ্ভাবন করিতে হইবে। আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নারী আহ্বায়িকা সম্মেলনে বক্তৃতাকালে পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন—ভাষা সমস্যা খুবই জটিল। এ ভাষায় কোন কর্ম্মসূচী রূপায়ণে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন বন্ধু ইংরাজীকে সহযোগী ভাষা হিসাবে চালু রাখার জন্য বিশেষ প্রতিশ্রুতি চান। আর্য্যাবর্ত্তবাসীরা কিন্তু মনে করেন যে, পণ্ডিতজীর আশ্বাসই যথেষ্ট। কাজেই এ অবস্থায় উভয় শ্রেণীর মনস্তুষ্টির জন্য একটা মধ্যপন্থা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

সংবিধান সংশোধনের জন্য রাজাজীর প্রস্তাবে তিনি সায় দিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, হিন্দী সরকারী ভাষারূপে ব্যবহারের সময় ইংরাজী বা অন্য যে কোন উপযুক্ত প্রতিশব্দ প্রয়োজন হইলেই ব্যবহার করা চলিবে। তবে সংযোগ-রক্ষাকারী ভাষারূপে হিন্দীর ভূমিকা যেন সব সময় গঠনমূলকই হয়।"

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী "আর্য্যাবর্ত্তবাসী" বলিতে কাহাদের কথা বলিয়াছেন জানি না। কিন্তু কথার ধরন দেখিয়া মনে হয় যে, "আর্য্যাবর্ত্ত" বলিতে প্রাচীনদের সংজ্ঞার্থ তিনি মানিয়া চলেন নাই। কৃষ্ণসার মৃগের বিচরণভূমির বদলে তিনি হিন্দীভাষীদের রাজ্যগুলিকেই আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়াছেন—এবং সেখানেও তিনি মত জানাইয়াছেন সংসদের কংগ্রেসী হিন্দীভাষীদের মাত্র। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এইভাবে উড়ো কথা বলা কি তাঁহার উচিত হইয়াছে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি এখনও বিষয়টি "শিকায় তুলিয়া" কার্য্যসিদ্ধির' কথা ভাবিতেছেন!

পরলোকে কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় গত ২৪শে মার্চ্চ পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এখনও জীবিত রহিয়াছেন। তিনি 'ইউরোমিয়া' রোগে ভুগিতেছিলেন। অস্ত্রোপচারের পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৩০১ সনে নদীয়া জেলার লোকনাথপুর গ্রামে সাবিত্রী-প্রসন্নের জন্ম হয়। ছাত্রজীবন তাঁহার বহরমপুরে কাটে। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর স্নেহচ্ছায়ায় তিনি মানুষ হইয়া-ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র নন্দীর তিনি সহপাঠী ছিলেন। ছাত্রা-বস্থাতেই দেশের কাজের জন্য তিনি কারাবরণ করেন। সেইজন্য এম. এ. পড়া আর তাঁহার হইয়া উঠে নাই। তাঁহার প্রতিটি রচনার মধ্যেই দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সত্যিকার কবি ছিলেন। তাঁহার প্রথম কবিতার বই 'পল্লী ব্যথা।' অন্যান্য কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে 'জলন্ত-তলোয়ার', 'অনুরাধা', 'অতসী', 'মনোমুকুর', বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করে। 'উপাসনা' সাহিত্য-পত্রের তিনি সম্পাদক ছিলেন। ছোটদের জন্যও তিনি কয়েকখানি বই লিখিয়া গিয়াছেন। উহাদের মধ্যে 'কুঁড়ের বাদশা', 'বেঁটে বক্রেশ্বর' উল্লেখযোগ্য।

সাবিত্রীপ্রসন্ন হিন্দুস্থান লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানীতে প্রচার ও জনসংযোগ অফিসার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে বীমা কোম্পানীর রাষ্ট্রীয়করণের পর তিনি জীবন বীমা কর্পোরেশনে সিনিয়ার অফিসারের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু অবসর গ্রহণ করিলেও, তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগের পত্র-পত্রিকাগুলি গৃহে বসিয়া সম্পাদনা করিতেন। তিনি রাজ্য সরকারের পাবলিকেশন রিভিউ বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি গদ্যগ্রন্থও ছিল। বিশেষ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাসবিহারী বসুর দানের প্রসঙ্গ লইয়া তিনি যে একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন সদালাপী ও বন্ধুবৎসল। তাঁহার মৃত্যুতে দেশবাসী একজন সত্যিকারের কবিকে হারাইল।

সত্যের বিরোধ ও সামঞ্জস্য

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কোনও বিষয়ে একটি মন্তব্য প্রকাশ করিলাম, একটি প্রবন্ধ রচনা করিলাম। সত্য নির্ণয় ও সত্য প্রকাশ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। পরে ভাবিয়া দেখি, সত্য বলিয়াছি বটে, কিন্তু আংশিক সত্যমাত্র বলিয়াছি।

সত্যকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিয়া সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য, হয়ত অসাধ্য। মানুষ স্মরণাতীত কাল হইতে সত্যের সন্ধানে ফিরিতেছে; পাইতেছে, আরও পাইতেছে, কিন্তু সমস্তটা পাইতেছে না।

বিশ্ব এক, কিন্তু নানা বিপরীতকে লইয়া এক। একটি চক্রাকার পথের এক জায়গা হইতে যদি একজন পূর্ব্বমুখে চলিতে আরম্ভ করে, এবং আর একজন তাহার ঠিক বিপরীত স্থান হইতে পশ্চিম মুখে চলে, তাহা হইলে মনে হইবে বটে যে, তাহারা পরস্পর উল্টা দিকে যাইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহারা এক দিকেই যাইতেছে। কারণ, প্রথম ব্যক্তি যে-স্থান হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই স্থানে পৌঁছিলে দেখা যাইবে যে, সেখানে প্রথম ব্যক্তির মুখ যে-দিকে ছিল, দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখ সেই দিকেই রহিয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে জাপান দিয়া আমেরিকা যাওয়া যায়, আবার পশ্চিমাভিমুখে ইংলণ্ড হইয়াও আমেরিকা যাওয়া যায়।

বিপরীতের একত্র সমাবেশে ও সামঞ্জস্যে জগৎ চলিতেছে। বিশ্বে আগুনও আছে, জলও আছে। জল আগুন নিবাইয়া দেয়, আগুন জলকে বাষ্পে পরিণত করিয়া উড়াইয়া দেয়। অথচ এই জল ও আগুনের সহযোগে রেলগাড়ী, ষ্টীমার ও নানা কলকারখানা চলিতেছে।

শুধু তাপেও বিশ্ব চলে না, শুধু শৈত্যেও চলে না; আবার খুব কম তাপেরই নাম শৈত্য। কেবল-মাত্র তাপের বা শৈত্যের বিরুদ্ধে বা অনুকূলে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলে তাহা সত্য হইবে না।

বিশ্বে জন্মও আছে, মৃত্যুও আছে। বীজ মরিয়া গাছ হয়। তবে কি মৃত্যু জন্ম ও জীবনের কারণ? না মৃত্যু জন্ম-জীবনের রূপান্তর মাত্র? বীজের যে দশা আমাদেরও কি তাই? আমাদের এই পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে মৃত্যু অপর কোনও স্থানে অন্য কোনও জীবের আকারে জন্মের পূর্ব্বাবস্থা, নামান্তর বা রূপান্তর হইতে পারে না কি? তাহা হইলে অমুক মরিয়াছে বলিলে সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না; সঙ্গে সঙ্গে বলিতে হয়, অমুক জন্মিয়াছে। কিন্তু কোথায় কি আকারে, কে জানে?

বিশ্বে আলো ও আঁধার আছে। আলোর পরিমাণ যত কম হয়, আঁধার তত নিবিড় হয়। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন নিরেট আঁধার বলিয়া কিছু আছে কি? বাস্তবিক আঁধার আলোর শৈশবমাত্র। তাহা হইলে আলো-আঁধারের বৈপরীত্য কি সত্য!

জগতে স্থাবর জঙ্গম দুই আছে, গতি ও নিশ্চেষ্টতা আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ স্থির ও স্থাবর কিছু আছে কি? গতি ভিন্ন স্থিতির জ্ঞানই জন্মিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান হয়। আলোক, শব্দ প্রভৃতি এক-এক প্রকারের তরঙ্গ; আর তরঙ্গও এক রকমের গতি। কে চলিতেছে, কে দাঁড়াইয়া আছে, কে কর্ম্মিষ্ঠ, কে নিষ্ক্রিয় বলা কঠিন। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সাক্ষ্য অনুসারে পৃথিবীর মত নিশ্চল ত কেহ নাই; কিন্তু জ্যোতিষী বলিতেছেন, যে, পৃথিবী অতি ভীষণ বেগে সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছেন। আমরা কোন একটা ঘটনার সত্যতার চূড়ান্ত প্রমাণ এই দি যে, উহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের

সাক্ষ্য কি সব সময়ে প্রামাণিক? অথচ ইন্দ্রিয়কে অবিশ্বাস করিলেই বা চলে কেমন করিয়া? সত্য নির্ণয় বড়ই কঠিন।

একটি আম পাড়িয়া হাঁড়ির ভিতর রাখিয়া দিলাম। আমি তাহার সম্বন্ধে তার পর আর কিছু করিলাম না, সেও নড়িল চড়িল না; কিন্তু ক্রমশঃ পাকিল, পচিয়া গেল। সুতরাং উহা স্থির নিশ্চল ছিল বটে, কিন্তু উহার ভিতরে ক্রিয়া চলিতেছিল।

চেতনের রাজ্যে কে অলস কে কর্ম্মিষ্ঠ, সহজে বলা যায় না। যে বুদ্ধদেব বৎসরের পর বৎসর বৃক্ষতলে নিশ্চলভাবে বসিয়া ছিলেন, তিনি কি অলস ছিলেন? তাঁহার ভিতরে যে শক্তি কাজ করিতেছিল, তাহা এমন ধর্ম্মচক্র ঘুরাইয়াছে যে, তাহার প্রভাবে ছোট বড় হইয়াছে, বড় ছোট হইয়াছে, সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে, কত জাতি সুসভ্য হইয়াছে, এখনও কত কোটি লোক জীবনে পথ দেখিতে পাইতেছে, বল, সাহস, সান্ত্বনা ও শান্তি পাইতেছে। এই অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষকে নিষ্কর্ম্মা বলা চলে না।

যে বাষ্পীয় কল (ষ্টীম এঞ্জিন) পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাহাও একদিন নিশ্চলভাবে চিন্তামগ্ন এক স্কচ্ কারিগরের চিন্তামাত্র ছিল।

চঞ্চলতা বা গতিশীলতাই কর্ম্মিষ্ঠতা নয়, নিশ্চলতাও নিষ্ক্রিয়তা নহে।

শক্তি সঞ্চয়, শক্তি প্রয়োগের উপায় নির্দ্ধারণ, নিশ্চলতা নীরবতা নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘটে।

চৈতন্য নিদ্রা সংজ্ঞাহীনতা সব অবস্থাই আমরা প্রত্যক্ষ করি। পূর্ণ সতর্ক সজাগ অবস্থা ও অন্যমনস্কতা, পাতলা ঘুম ও গাঢ়নিদ্রা, গাঢ়নিদ্রা এবং সংজ্ঞাহীনতা, এ সকলের মধ্যে প্রভেদ কি? নিদ্রার সময়ে আমাদের চৈতন্য কি লুপ্ত হয়, না কোন অজ্ঞাতভাবে থাকে? স্বপ্ন কি রকমের চৈতন্য? স্বপ্নে কেহ কেহ যে শক্ত অঙ্ক কষিয়া ফেলে, উহা কিরূপ চৈতন্যের ক্রিয়া? মৃত্যুকে আমরা যে চিরনিদ্রা বলি, ওটা কি একটা অলঙ্কারমাত্র, না বাস্তবিকই ইহলোকের চিরনিদ্রা লোকান্তরের জাগরণে পরিণত হয়? তাহা হইলে মৃত্যুও কেবল চিরনিদ্রা নয়, জাগরণেরই নামান্তর।

বাস্তবিক জগতে একান্তভাবে কাহাকে ধরিব, একান্তভাবে কাহাকে ছাড়িব, বুঝিতে পারি না। ধ্যানের নিস্তব্ধতার মধ্যে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায়; কিন্তু প্রমত্ত কীর্ত্তনের মধ্যেও ভক্তির ধারা অবতীর্ণ হয় না কি? প্রেমের মহিমা অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু যাহা অমঙ্গল অশুচি, তাহার সম্বন্ধে প্রতিকূল ভাব পোষণ না করিলে শ্রেয়ের প্রতি প্রেম পুষ্ট হয় কি? প্রেমের কাজ আছে। হিংসাদ্বেষের কি কোন কাজ নাই? আলোকের অভাব বা ন্যূনতা যেমন আঁধার, প্রেমের অভাব বা ন্যূনতা তেমনই দ্বেষ, তাহা ত বলা যায় না; তাহাকে বরং ঔদাসীন্য বলা যায়। দ্বেষের সত্তা প্রেমেরই মত প্রবলভাবে অনুভূত হয়। প্রেম দ্বারা অপ্রেমকে পরাজিত কর, এই সদুপদেশ বুদ্ধদেব ও তাঁহার পরে আরও অনেকে দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা অপ্রেমকে পরাজিত করিতেই বলিয়াছেন; অপ্রেমকে প্রেম করিতে, ভালবাসিতে বলেন নাই। বিশ্বের বিধানেও দেখিতেছি, তাহার মধ্যে অমঙ্গলের প্রতি হিংসা অর্থাৎ তাহাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা, এবং তদুপযোগী বন্দোবস্ত রহিয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, বিশ্বে মঙ্গল অমঙ্গল দুই কেন আছে, অমঙ্গল কি, কে তাহার সৃষ্টি করিল, দেশকাল-পাত্রভেদে মঙ্গল অমঙ্গলের এবং অমঙ্গল মঙ্গলের স্বরূপ প্রাপ্ত হয় কেন? এ-সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য আছে, তাহাও দুই এক কথায় সারিয়া দেওয়া যায় না। যে সকল সহজ বিষয় আপাততঃ বিপরীতধর্ম্মী মনে হয়, সেইরূপ আরও কয়েকটি বিষয়েরই আলোচনা করি। (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২১ হইতে)

অভাজনের সত্যাগ্রহ

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

অপরাধীর প্রাণদণ্ড হবে। ঘাতক চণ্ডালকে আহ্বান করা হ'ল। কিন্তু চণ্ডাল হত্যাকার্যে সম্মত হ'ল না। এমন ঘটনা পূর্বে কখনও ঘটে নাই। এ অপূর্ব, অত্যাশ্চর্য। ঘাতকদের প্রভু ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে বললেন, "রাজাজ্ঞা অমান্য কর, এমন তোমার দুঃসাহস।"

চণ্ডাল শান্তভাবে বললে, "হত্যা পাপ—এ কথা যখন জানতে পেরেছি, তখন তা করব না। প্রাণ দেব, তবু প্রাণ নেব না।'

"রাজ-অন্নে পুষ্ট দেহ মোর
এর পরে তাঁর অধিকার।
মারুন কাটুন এরে রাজা
করুন যা মনোবাঞ্ছা তাঁর।

"আর এক আছে দিব্যদেহ
সর্ব সদ্‌গুণের আধার।
উজলে যা মনের আঁধার
তারে কি মারিতে পারে কেহ?"

ঘাতকাধিপতি সেই চণ্ডালকে রাজসমীপে উপস্থাপিত ক'রে নিবেদন করলেন: "মহারাজ! এই চণ্ডাল রাজাজ্ঞা অমান্য করছে!"

রাজা চণ্ডালকে প্রশ্ন করলেন, "কেন তুমি রাজাজ্ঞা অমান্য করছ?"

চণ্ডাল বিনীতভাবে উত্তর দিলে:

"করুণার সিন্ধু যিনি, দীনবন্ধু যিনি
মোরও পরে বর্ষে তাঁর করুণার ধারা।
যতেক কলুষ মোর ধৌত তার দ্বারা।
সত্যেরে দেখেছি আমি মৃত্যুভয় জিনি।
পিপীলিকা, তারও লাগি ব্যথা জাগে মনে
প্রাণীশ্রেষ্ঠ মানুষেরে বধিব কেমনে?"

রাজা বললেন—"অন্যের জীবন যদি নিতে না চাও, তবে তোমার জীবন দিতে প্রস্তুত হও।"

সত্যদ্রষ্টা, দিব্য বলে বলীয়ান, চণ্ডাল মৃত্যুভয় জয় করেছে। সে নির্ভীকভাবে বললে—

"এ দেহের মালিক রাজা। একে নিয়ে তিনি যা-খুশি তাই করতে পারেন। কিন্তু আমার এ দৃঢ় সংকল্প! দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশেও আমি এই লোকটিকে হত্যা করব না।"

চণ্ডালের এই উদ্ধত উত্তর শুনে রাজা ক্রোধে জলে উঠলেন। তিনি তখন সেই চণ্ডালের ভ্রাতৃগণকে আদেশ দিলেন—অপরাধীকে হত্যা করতে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই তাঁর আদেশ পালন করলে না।

রাজাজ্ঞায় একে একে পাঁচ ভাইকে হত্যা করা হ'ল। অতঃপর সম্রাট তাদের ষষ্ঠ ভ্রাতাকে আদেশ দিলেন—ঐ অপরাধীর শিরশ্ছেদ করতে। সেও যখন আদেশ অমান্য করলে, তখন তাকেও হত্যা করা হল।

চক্ষের উপর এমন ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড দর্শন করেও, সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজাজ্ঞা পালনে অসম্মতি জানালো।

রাজা যখন সেই সপ্তম ভ্রাতারও প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন, তখন চণ্ডালদের বৃদ্ধা মাতা রাজসমীপে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন—"প্রভু, এর প্রাণরক্ষা করুন।"

রাজা প্রশ্ন করলেন—"যাদের এইমাত্র বধ করা হ'ল—তারা কি তোমার সন্তান নয়?"

"তারা সকলেই আমার সন্তান"—বৃদ্ধা উত্তর দিলে।

তা হ'লে পূর্বে তাদের প্রাণরক্ষার প্রার্থনা না করে কেবলমাত্র সপ্তম সন্তানের জন্যে প্রার্থনা করছ কেন?"

বৃদ্ধা উত্তর দিলেন:

"তারা ছিল মহাসত্ত্ব, শুদ্ধ দেবোপম।
সর্ববাধা-বন্ধ হ'তে মুক্ত ছিল তারা।
জন্ম মৃত্যু একাকার দেখেছিল যারা—
তাহাদের তরে চিন্তা ছিল না ত মম।

"অশক্ত এখনো মোর সপ্তম সন্তান
এখনও সে লভে নাই অমৃতের স্বাদ,
ঘাতকের অসি যবে নিতে যাবে প্রাণ—
পাপেতে মজাবে এরে বাঁচিবার সাধ।

"সেই ভয়ে নতজানু যাচি আমি আজ
সন্তানের প্রাণ ভিক্ষা দাও মহারাজ!"

যারপরনাই আশ্চর্যান্বিত রাজা বলে উঠলেন: "চণ্ডালের মুখে এমন আশ্চর্য কথা জীবনে শুনি নাই। আলোকবর্তিকার ন্যায় এই বৃদ্ধা আমার হৃদয় আলোকিত করল। যে-পল্লী এমন সাধু ব্যক্তিদের জন্ম দেয়—তাকে চণ্ডালপল্লী বলি কেমন করে?"

"আত্মীয়স্বজনের প্রতি এদের কোন আগ্রহ, কোন আসক্তিই নাই। যত আসক্তি, যত আগ্রহ—সত্যের প্রতি! সত্যকে অনুসরণ করতে এরা প্রাণদান করে:

"অভিজাত উচ্চবংশে জন্ম হ'ল যার
তার কেন হেন হীন নৃশংস আচার?
চণ্ডাল সে—চণ্ডতারে যে করে ভজন
রাজকুলে জন্মালেও চণ্ডাল সে জন।

"করুণায় পরিপূর্ণ যাঁদের হৃদয়,
সকল প্রাণীর প্রতি যাঁহাদের প্রীতি,
লোভ, ক্রোধ, ভয় যাঁরা করেছেন জয়,
তাঁদের চণ্ডাল বলি—এ কেমন রীতি?

"সেইরূপ প্রেমময়, দয়াময় নরে
প্রেম প্রীতি ক্ষমা দয়া করিয়া বর্জন
হত্যা করে ক্রোধে অন্ধ চণ্ড যেইজন
চণ্ডাল সে! চণ্ডাল সে—বিশ্বচরাচরে!"

চণ্ডালরূপী এই মহামানবগণের শবযাত্রায় সম্রাট সপরিবারে যোগদান করলেন। শ্মশানে তাঁদের চিতানলের নিকট কৃতাঞ্জলি হয়ে রাজা এই গাথা উচ্চারণ করলেন:

"নরদেহ মধ্যে ছিল অমরার জ্যোতি,
সুকোমল প্রাণে ছিল বজ্রাধিক বল।
ভস্মে আচ্ছাদিত যথা বিরাজে অনল!
নরলোকে ছিল যারা অভাজন অতি
পরলোকে তাহাদেরই হবে পরাগতি।"*

---

* অধুনালুপ্ত সংস্কৃত সূত্রালংকার গ্রন্থের চীনা অনুবাদ হতে রচিত।

ফেরার (এ প্রাইস অন হিজ হেড)

শ্রীমতী আনা সেঘার্স

অনুবাদিকা—শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়

প্রবাসীর আগামী সংখ্যা থেকে বিখ্যাত জার্মান লেখিকা শ্রীমতী আনা সেঘার্স-এর একখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের অনুবাদ সুরু হবে। বইখানির নাম "এ প্রাইস অন হিজ হেড" (সেভেন সিজ পাবলিকেশন)। বাংলা অনুবাদের নাম হয়েছে "ফেরার"।

আলোচ্য উপন্যাসখানি হিটলারের অভ্যুত্থানের মুহূর্ত্তটিতে জার্মানীর গ্রামের পটভূমিকায় লেখা। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট কঠোর পেষণে বিপর্যস্ত করে ফেলল যুদ্ধক্ষত জার্মানীকে, বিহ্বল ক'রে তুলল তার কৃষকসমাজকে। ১৯৩২ সালের সেই বিহ্বলতার সাহিত্যরূপ শ্রীমতী সেঘার্সের এই সার্থক উপন্যাস।

গ্রামের পরিবেশে এসে পড়ল শহরের ছেলে ভিনদেশী জোহান, মাথার উপর তার খড়্গ ঝুলছে। তার সেই সংক্ষিপ্ত ফেরারী জীবনের পটভূমিকায় লেখিকা চিত্রিত করেছেন তৎকালীন জার্মানীর গ্রামের মানুষের দুর্বলতা আর মানবতায় মেশা এক বিচিত্র কাহিনীকে। সুযোগ-সন্ধানী যে লোকগুলো নাৎসী-বাদের পথ সুগম করেছিল তাদের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতিটা কেমন ক'রে এই বীভৎস পথে টানা হয়ে গেল তারও একটা আভাস এ উপন্যাসে পাওয়া যায়। আবার যে মুষ্টিমেয় মানুষ দূরদর্শনের দ্বারা একে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল উচ্ছ্বাস অত্যুক্তি ছাড়া তাদের শান্ত বাস্তব বীরত্বও এ কাহিনীতে স্থান পেয়েছে।

ফেরারী জোহানের হৃদয়াবেগ, তার মানবতাবোধ, তার অনভিজ্ঞ অধীরতা, তার হঠাৎ-পাওয়া প্রেম পাঠক-মনকে আকৃষ্ট করবে। অপরাপর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যও পাঠককে বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ দেবে। সর্বোপরি ফেরারীর জন্য সদা বিরাজমান উৎকণ্ঠা রহস্যকাহিনীর মত পাঠকমনকে উৎসুক রাখবে।

শ্রীমতী সেঘার্স হিটলারের আমলে বহুদিন ইংলণ্ডে শরণার্থী হয়ে ছিলেন। তৎকালে তাঁর যে সব বিখ্যাত উপন্যাস বেরিয়েছিল তার মধ্যে ছায়াছবিতে রূপান্তরিত "সাইন অব দি ক্রশ" পৃথিবীকে বিস্মিত করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি স্বদেশে স্বস্থানে ফিরে আসেন, যে জার্মানীতে হিটলারের আমলে তাঁর উপন্যাসের বহ্ন্যুৎসব হয়েছিল সেখানেই আবার তিনি জার্মান লেখক-সঙ্ঘের সভানেত্রী নির্বাচিত হন এবং আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার পান। দু'বার তিনি সাহিত্যের জন্য জার্মান জাতীয় পুরস্কার পান।

অনুবাদটি "ফেরার" নামে প্রকাশিত হবে আগামী মাস থেকে। অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়। এঁর অনূদিত "অমৃতের পুত্র" (ক্রণো আপিৎস্-এর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উপন্যাস "নেকেড্ অ্যামঙ্ উলভস্"-এর বাংলা) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। কিছুকাল জার্মানীতে অতিবাহিত করার দরুণ বাস্তব পটভূমিকা সম্পর্কেও তাঁর ধারণা আছে।

আশা করা যায় "ফেরার" উপন্যাস পাঠক-পাঠিকাদের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখবে। আগামী বছর বৈশাখ থেকে ক্রমশঃ হিসাবে উপন্যাসখানি প্রবাসীতে প্রকাশিত হবে।

রায়বাড়ী

গিরিবালা দেবী

ঠাকুমা একবুলি মুখে আজ শয্যাত্যাগ করেছেন, "ও রাজেশ্বরী, জয়ের ওখানে কয়েকটা ট্যাঁপের মোয়া বের ক'রে দিয়ে আয়। পেসাদ আমার ট্যাঁপ বড় ভালবাসে। লুচি ত কলকাতায় পায়, ট্যাঁপের মোয়া কে তারে দেবে? 'যার লেগে যার পরাণ কাঁদে, অন্য লোকে লাঠি ফাঁদে।' তোরা ধান নিয়েই মত্ত, ট্যাঁপের দিকে নজর দিলি না। ধানের খই-এর চেয়ে ট্যাঁপের খই যে কত উপকারী রোগে-ভোগে, তা ত জানিস নে? এক বছরের ট্যাঁপ আরও চারটে জোগাড় ক'রে রাখতে হ'ত।"

কামিনীর মা ঘর ঝাড় দিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, "এক জালা ভরি ট্যাঁপ জাত করি তুলি থুইছি। আর কত নাগবে তোমাগো। যখন চাকররা নাও নিইয়া খালে-বিলে সাঁফলার ফল তুলিতে গেইছিল, তহন আরও কাঁড়িখানিক তোলাইয়া রাখিলা না ক্যানে? যা আনি দিইছেল, তা ঝাড়ি-বাছি রোদ্দুরে ভাজা ভাজা করি গোলাঘরে তুলি থুইচি। কত শত দেব্য বলে জয়ের থনে গড়াগড়ি যাইচে তা থুইয়া দা বাবু দাঁতে কাটিবে ট্যাঁপের মোয়া? আপনি কইলা আমি কয়েকডা বার করি দিইয়া আসি।"

তরু চোখ মুছিতে মুছিতে জয়ের ঘরে যাইতেছিল, তাহার কোলে সাহেব। ঠাকুমা তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন, "শোনছিস তরু, পুকুরের চালার জামগাছে কুটুম পাখী ডাকছে, ঐ শোন 'কুটুম আয় কুটুম আয়' ডাকছে। কুটুম আর কে আসবে, মণিরামরা আজ যদি আসে।"

"মণিরাম ঠাকুররা তোমাদের চাকর নফর, তারা আবার কুটুম হ'ল কিসের? কাল তোমার বাঁ চোখ নেচেছিল দাদা এল, তা যেন বুঝলাম। মণিরাম-ফণিরাম আমাদের কুটুম, ছিঃ।"

তরু আর দাঁড়াইল না।

ঠাকুমা এবার বিনুকে কাছে পাইলেন। বিনু মুখ ধুইয়া বাসি কাপড় ছাড়িয়া যাইতেছে শাশুড়ীর কাছে।

ঠাকুমা হাত তুলিয়া ইশারা করিয়া তাহাকে নিকটস্থ হইবার ইঙ্গিত করিলেন। বিনু আগাইয়া আসিতেই চুপে চুপে কহিলেন, "পেসাদ কখন উঠে বার মহলে গেল লো? আমি তারে যেতে দেখলাম না; ভেবেছিলাম, 'প্রভাতে উঠিয়া সে মুখ দেখিব দিন যাবে ভাল ভাল'।" বিনু একথার কি উত্তর দিবে, শুধু একটুখানি হাসিল।

বধূর সুমিষ্ট হাসিতে ঠাকুমা প্রীত হইয়া তেমনি নিম্নস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কাল তোদের ঘরে ঝাড়ের বাতি বুঝি সারারাত জ্বলেছিল? আমি শেষরাতে জানালা খুলে দেখলাম উঠোনে আলোর ফটিক ফুটেছে। নবনে যে তোর সিঁড়ির দুই দিকে সার দিয়া গাঁদা ফুলের গাছ লাগিয়ে দিয়েছে, কি ফুলটাই ফুটেছে। সেই ফুলের ওপরে পড়েছিল বাতির আলো। তোরা দেখেছিলি ত?"

বিনু নীরব।

ঠাকুমা সে নীরবতার ধার না ধারিয়া আপনার আনন্দে আপনি অধীর—"দেখ মণিমালা, এবারের যাত্রাগান তুই শুনেছিলি ত? ঐ যে কিসের পালা যেন, সখীরা নেচে নেচে গান গেয়েছিল, তোর মনে নেই? তোরা একালের মেয়ে, ঐ সব শিখে রাখতে হয়। পেসাদ আমার সোনার ছেলে কিন্তু বয়েসটা ডবকা। থাকে বিদেশে, তাকে কাছে পেলে তন্তর-মন্তর দিয়ে বশ করে নিতে হয়। কাল তোকে শিখিয়ে দিতে পারি নি, এখন শিখিয়ে দিচ্ছি সখীদের সেই গান—রাতে ঝাড় জ্বালিয়ে সাজগোজ করে পেসাদকে বলিস—

'রহিয়া রহিয়া কেন এই মুখ মনে পড়ে,
এ চাঁদের সুধা বিনা চকোর যে প্রাণে মরে'।"

বিনু আর হিতোপদেশ শুনিতে পারিল না, ত্বরিত পদে পলায়ন করিল।

মনোরমা ব্যাকুল হইলেন ছেলেকে পিঠা খাওয়াইতে। পৌষপার্ব্বণে সে থাকিবে না, দোলে সে আসিতে পারিবে না, তাহাকে এখনই পিঠা-পায়েস তৈরি করিয়া দিতে হইবে।

প্রসাদ চালের গুঁড়ার টিপি টিপি পিঠা ভালবাসে না। তাহার পছন্দ ক্ষীর-সর-ছানা।

মনোরমা স্নানান্তে বিনুর উপরে মাছের ঘরের ভার দিয়া ছোট ভোগশালায় ঢুকিলেন।

মাছ কম আসে নাই। বিনু পুলকিত হৃদয়ে মাছ রন্ধন করিতেছে, তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে "তোমাকে দ্রৌপদী বলে ডাকতাম।"

কামিনীর মা হাজির, "বৌমা, কইমৌরি রাঁধতে পারবে? চিতল মাছের কোড়মা হবে। পাবদা মাছের হলুদ চচ্চড়ি, আমি কি দেখিয়ে দেব?"

বিনুর কানের পিপুল পাতা দোলে, "না মাসী, আমি নিজেই পারব, শিখে নিয়েছি। তুমি আমাকে মিহি ক'রে মৌরি বেঁটে দাও। কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে দাও।"

দেবতার ভোগের মতন অখণ্ড মনোযোগে বিনু থালায় থালায় রান্না করিয়া নামায়।

ভোগশালায় ভোগ প্রস্তুত। এখন সকলে ভোজনে বসিলেই হয়।

এমন সময় মণিরাম ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইল। ফণিরাম এখন কিছুকাল দেশে থাকিবে। তাহার পরিবর্তে মণিরাম তাহাদের মাতুল কচিরামকে আনিয়াছে। আধ বুড়া একটা মণ্ডা-গুণ্ডা লোকের কচিরাম নাম শুনিয়া দাস-দাসীর মহলে হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল। মণিরাম পুরাতন লোক, কাণে জল ঢুকিলে সে জল বাহির করিবার রীতি জল দিয়া। মণিরাম অজস্র পায়, "দেয়ও কিছু কিঞ্চিৎ না করে বঞ্চিত" এ নীতি বাক্য উড়িয়ার ছেলের অবিদিত নাই। মণিরাম বড় দুই দাদাবাবুর নিমিত্ত ঝিনুকের ধূপদানি আনিয়াছে। তরু-স্মুর ঝিনুকের কাকাতুয়া পাখী। আর সকলের কাঠির গায়ে কারুকার্য্য-করা পাখা। বেতের বাক্স ভরা মহাপ্রসাদ, বোতল ভরা চুয়া। এক-রাশি ঝিনুক।

মণিরামের আগমনে রায়বাড়ীতে নিশ্চিন্ততার বাতাস বহিয়া গেল। সকলেই খুসী, কিন্তু বিনু তেমন খুসী হইতে পারিল না। সে নূতন ব্রতী হইয়াছে, তাহার উৎসাহ অপরিমিত। সে আশা করিয়াছিল, প্রসাদ যে কয়দিন থাকিবে সেই রান্না করিয়া পতি-ভোজনের অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন করিবে। সাধে কি বিনু আশা করে তাহার হৃদয়বীণায় রহিয়া রহিয়া বাজে "দ্রৌপদী ব'লে ডাকতাম।"

সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়াছে। মণিরাম কচিরাম রন্ধন-শালার ভার লইয়াছে। বিনু ফিরিয়া আসিয়াছে যথা-স্থানে, বিরাট দুধের কড়ার সামনে।

ঠাকুমাকে লইয়া প্রসাদ বসিয়াছে তাহার শয়ন-গৃহের ঢাকা বারান্দায়। কনকনে শীতের রাত্রে খোলা হাতীর মাথায় ঠাকুমাকে দেখিলে সকলে রাগ করে।

সিঁড়ির দুই পাশে সারি সারি গাঁদা গাছে ফুল ফুটিয়া অঙ্গন আলো হইয়াছে। এ ফুল সরস্বতী পুজায় দিতে দেয় না। কুকুর-বিড়াল ছুঁইয়া দিতেছে, মালীবৌ গাছের গোড়ায় ঝাঁটা বুলাইতেছে।

ফুলের অপচয় হয় না দেখিয়া বিনু বড় আনন্দিত। যে বিশ্বশিল্পীর এমন অপূর্ব্ব রচনা, তাঁহার উদ্দেশ্যে তাঁহার রূপের ভাণ্ডার উজাড় করিতে বিনু ভালবাসে না। সে সময় সময় সন্তর্পণে ফুলগুলিকে স্পর্শ করিয়া আদর করে। নিশির শিশির-মণ্ডিত ফুলে ফুলে সে মুক্তা নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে।

নাতিকে লইয়া ঠাকুমা সুখ-দুঃখের কাহিনী সবে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এমন সময় একদল কৃষক বালক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া জিগির দিতে লাগিল, 'জয় সোনা রায়ের জয়।' তাহাদের কাহারও হাতে ধামা, মাটির হাঁড়ি, তেলের বোতল, একজনার হস্তে বড় একটা টিনের কুপি মাটির সরায় বসানো, দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে।

প্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল, "তোরা কোন্ পাড়া থেকে এসেছিস?"

"এঁজ্ঞে দাবাবু, মালদা পাড়ায় থাকি, সোনা রায়ের ভিক মাগিতে আইছি।"

পৌষপার্ব্বণের পূর্ব্ব হইতে এ-পাড়া সে-পাড়া হইতে চাষী বালকের দল সোনা রায়ের গান গাহিয়া পাড়ায় পাড়ায় চাল ও গুড় সংগ্রহ করিয়া থাকে। পৌষপার্ব্বণে বিলের কিংবা নদীর ধারে গাছের ছায়ায় নূতন মাটির পাত্রে পায়েস রাঁধিয়া তাহাদের বনের দেবতা সোনা রায়কে ভোগ দিয়া নিজেরা সারি সারি কলার পাতা পাতিয়া প্রসাদ খায়। বৎসরান্তে চাষী রাখালদের এই পৌষপরব।

ঠাকুমা বলিলেন, "ভিক মাগতে এসে গান গাইছিস না যে?"

ছেলের দল ধামা হাঁড়ি প্রদীপ নামাইয়া নাচিয়া নাচিয়া হাততালি দিতে দিতে গান ধরিল—

'আইলাম রে অরণে সোনা রায়ের চরণে।
সোনার ঠাকুর দিল বর ধান চালে ঘর ভর।'

সোনার ঠাকুর বিয়া কর্‌য়া ব্যাভার পালে কি?
থাল পাছি ঝারি পাছি, আর পামু কি?
আটপৌরা ধুতি একখান ব্যাভার পায়াছি।

যায়রে যায় সোনার ঠাকুর শ্বশুরবাড়ী যায়,
তালের ছাতি মাথায় দিয়া সোনার নূপুর পায়।
হলদে বরণ চাদর সোনার ধুতির বরণ নীল,
বগলা ঘোড়ায় পাড়ি দেয় সিরণি গাঁয়ের বিল।

পাখ পাখালি সাথে চলে গায়ান গায় কোঁ,
ছামাদ পায়্যা শাউরী নাচে ডঙ্কা বাজায় ভোঁ।
সোনার ঠাকুর দিল বর ধান চালে ঘর ভর॥

গীত শেষ করিয়া রাখাল বালকেরা হাঁকিল, 'মাঠান, সোনা রায়ের খাওন দ্যাও।"

রাখালদের মেঠো স্বরে আকৃষ্ট হইয়া ক্ষিতি তরু সুমুরা দাস-দাসীর সহিত আঙ্গিনায় ছুটিয়া আসিয়াছিল। বিহুর দুধ-পর্ব্ব মিটিয়া গিয়াছিল, সেও আশ্রয় লইয়াছিল দ্বার-প্রান্তে। কোঁর সহিত 'ভোঁ'র মিলে সকলে হাসিয়া অস্থির।

মনোরমা কাঠা ভরিয়া চাল ধামায় ঢালিয়া দিলেন, বাটি ভরিয়া খেজুর গুড়।

ছেলেরা বলে, "ত্যাল দিলা না মাঠান, চ্যারাগের ত্যাল?"

মাঠান ছোট্ট মাটির ভাঁড়ের খানিকটা তেল ঢালিয়া দিলেন বোতলে।

বালকের দল সোনা রায়ের গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল অন্য বাড়ীতে।

প্রসাদ ঠাকুমার শীর্ণ বাহু ধরিয়া তাগিদ দেয়, 'চল ঠাকুমা, তোমাকে তোমার ঘরে শুইয়ে লেপ চাপা দেইগে। বড় ঠাণ্ডা পড়েছে, বাইরে গরম কাপড় ছাড়া বসে থাকলে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।"

ঠাকুমা শীতে গরম কাপড় গায়ে দিতে পারেন না, তাঁহার গা কুট কুট করে। ছেলের বকুনিতে মোটা একটা বিছানার চাদর গায়ে জড়াইয়াছেন।

ঠাকুমা হাসেন মিটিমিটি, " 'মরণ যাবে ডভয়ে, তারে তারে এড়ায়ে।' আমার আবার শীত, আমার আবার ঠাণ্ডা। দেখ পেসাদ, তোর লেখন-পড়ন শেষ হ'তে আর কত দেরি রে? তাড়াতাড়ি সেরে-তেরে বাড়ীতে এসে বস, বৌ যে দিনে দিনে সেয়ানা হচ্ছে। তুই কাছে থাকিস না জন্মে মনমরা হয়ে থাকে।"

"খুব সুখবর দিলে ঠাকুমা, আমি ত কোন লক্ষণ দেখছি না? তুমি আমার জন্যে এত ভেব না। এবার পরীক্ষা হয়ে গেলেই আমি তোমার আঁচলের নীচে এসে বসে থাকব। কোথায়ও যাব না, কিছু করব না, শুধু খাওয়া আর বসা। তা হ'লে ত খুশী হবে তুমি?"

ঠাকুমা নাতির কথায় গেলেন না। বিগলিত হইলেন মণিমালাকে লইয়া—"দেখ পেসাদ, তোরে চুপে চুপে কই—মণিমালা বড় ভাল মেয়ে। তোদের রায়-গোষ্ঠীর রক্ত গরম, চঞ্চল; তুই ওরে হেনেস্তা করিস নে কখনও, আমারে কথা দে। বাইরের রূপ দেখে পাগল হোস না, মনে রাখিস, ঘরে বইছে তোর অমৃত ভাণ্ড।"

প্রসাদের অমৃত ভাণ্ড মধু ভাণ্ড, লইয়া আলোচনা করিবার সময় হইল না।

রান্না প্রস্তুত, খাবার ডাক আসিল।

প্রসাদ উঠিয়া কহিল, "চল ঠাকুমা, তোমাকে ঘরে রেখে আমি খেতে যাই। শীতের রাতে বসে থাকতে লোকজনদের খুব কষ্ট হয়।"

ঠাকুমা নাতির হাত ধরিয়া চলিলেন শয়ন করিতে। যাইবার সময় হুল ফুটাইয়া গেলেন, "পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ।"

"সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চুড়ামণি"
বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, "কহ, হে দেবি অমৃত ভাষিণি
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃ কুলনিধি
রাঘবারি?"

নিস্তব্ধ গভীর রজনী। চরাচর মহাসুপ্তিতে মগ্ন। কূজনহীন কানন ভূমিতে হিমেল হাওয়া শন্ শন্ শব্দে পত্রহারা তরুর বিলাপধ্বনির মতন বহিয়া যাইতেছে। কুয়াশার ঘন আবরণে আকাশ ও ধরিত্রী আবৃত হইয়া রহিয়াছে।

পালঙ্কের পাশের বাতায়ন রুদ্ধ, গৃহের অপর গবাক্ষ উন্মুক্ত। সেই পথে ঝাড়ের আলোর রশ্মি পিছনের বন-বনান্তরে সামনের গাঁদাফুলের স্তবকে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

রজনীর প্রথম যামে বিহুর পাঠ্যপুস্তক ও খাতার লেখার পরীক্ষা-নিরীক্ষা লইয়া খানিকটা সময় অতিবাহিত হইয়াছে।

বিহু তাহার হাতের লেখার খাতায় শুধু স্বরচিত

ছড়া পাঁচালি দিয়াই ভরাইয়া রাখে নাই। মাঝে মাঝে তাহার চিত্র-বিদ্যারও পরিচয় দিয়াছে। কোন পাতায় হাঁস, কোথায়ও বক-টিয়া পাখী ইত্যাকার। প্রসাদ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "তোমার কি ছবি আঁকতে ইচ্ছা করে? তা হ'লে ছবি আঁকার সরঞ্জাম এনে দিতে পারি।"

শোন কথা, "গোদা পায়ে বিষ ফোঁড়া" যেন, এক বিদ্যাশিক্ষায় বিনুর অন্তরাত্মা ত্রাহি মধুসূদন ডাকিতেছে, ইহার উপরে আবার চিত্র বিদ্যা! মেয়েদের মেয়েলী ব্রত অনুষ্ঠান আল্পনার সহিত যে পুরুষ-প্রবরের পরিচয় নাই তাহাকে নিরস্ত করিতে বিনুর বেগ পাইতে হইল না। সে কাণের ঝুমকা দোলাইয়া কপালের কাঁচ-পোকার টিপে ঝিলিক দিয়া স্বামীকে বুঝাইল, "এর নাম ছবি নয়। এটা প্রত্যেক ভারত মহিলার করণীয় ব্যাপার। সুবচনী পুজোয় হাঁস না আঁকলে যে পুজো হয় না। লক্ষ্মীর আরাধনায় ধানের শীষ, লক্ষ্মীর পা, পেঁচা চাই। নাগপঞ্চমীতে সারি সারি নাগ। আসন্ন পৌষপার্ব্বণে উঠোন-জোড়া হাতীর শুভাগমনে হাতীর শুঁড়ের সম্মুখে আলপনায় অঙ্কিত করতে হবে বিশাল জলাশয়। জলে বিরাজ করবে জলচর জীব মাছ শঙ্খ ঝিনুক কুমীর কচ্ছপ মকর পোকা-মাকড়। জলাশয়ের পাড়ে কলাগাছ লতা-পাতা, তার ফাঁকে ফাঁকে বক। যদি পৌষপার্ব্বণে কেউ বিনুকে আলপনা দিতে বলে সেই কারণে সে খাতায় বলাকাশ্রেণী অঙ্কন অভ্যাস করিয়াছে।"

ব্যস্, একেবারে ঠাণ্ডা—'রমণীর চাতুরিতে রমাপতি হারে।'

চেয়ারে পা ঝুলাইয়া হিমবর্ষী নিশীথে বিনু কাব্য শ্রবণ করিতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কাজেই বাধ্য হইয়া প্রসাদকে বিছানায় আসন লইতে হইয়াছে।

প্রসাদের গায়ে গরম জামার উপরে শাল, পতিপরায়ণা সতী স্বামীর কোমর অবধি ঢাকিয়া দিয়াছে সাটিনের লেপে।

নিজের বিছানায় শয়ন করিয়া গলা পর্য্যন্ত লেপে আবৃত করিয়া কাব্য শুনিতেছে। প্রসাদের আশঙ্কা ছিল, আরামে শয্যাসীনা হইয়া তাহার শ্রোতা বোধহয় নিদ্রিতা হইবে। না, প্রসাদ নিরর্থক 'বেনাবনে মুক্ত ছড়াইতেছে' না। বিনু শুনিতেছে উৎকর্ণ হইয়া।

প্রসাদের কণ্ঠস্বর গম্ভীর শঙ্খের মত দিকপ্রসারী, অথচ কোমল মধুর।

প্রসাদ এক এক অংশ অধ্যয়ন করিয়া তাহার ভাবার্থ সরল ভাষায় স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিতেছিল। কিন্তু স্ত্রী যে তখন তাহাতে নাই। "কনক আসনে বসি, দশানন বলি"— সেইখানে চলিয়া গিয়াছে, সেই স্বর্ণ-মুক্তা-প্রবালের রাজ্যে।

"এই, তুমি যে ঘুমিয়ে পড়লে? আমি রেখে দিলাম বই।"

বিনু লেপের তলা হইতে হাত বাড়াইয়া স্বামীর বাহু চাপিয়া ধরে—"না না, রেখে দিও না। আমি ঘুমুইনি শুনছি, এত আলোতে কখনও আমার ঘুম আসে না। তোমার মত কি আমার অজগরের চোখ নয়, হাতীর মতন কুতকুতে চোখ, নীচের দিকে তাকালে বোজা লাগে।"

"তা হ'লে আমাকে পদ্মপলাশ লোচন বলতে চাও?"

"তা পদ্মপলাশ বলা যায়, আবার পটোলচেরাও বলা যায়। থাকুক চোখের কথা, তুমি পড়। প্রমীলা সাজ করে চলেছে, তারপরে কি হ'ল?"

"তার পরের কথা কাল শুন, ঢের রাত হয়ে গেছে, এখন রেখে দেই।"

"রাত আবার কোথায়, মোটে দুটো, আর একটুখানিকটা পড়ে রাখ। কি সুন্দর, খালি শুনতে ইচ্ছা করছে।"

শুনিতে ইচ্ছা করিবে না? কে কবে জ্ঞান-হীনা মূর্খ বিনুকে, মেঘনাদ বধ মহাকাব্য পড়িয়া শোনাইয়াছিল? কে তাহার বাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল। অপার অনন্ত রসের সন্ধান কোনদিন বিনু জীবনে উপনীত হইবার সুযোগ পায় নাই।

স্বামীর প্রতি এই প্রথম বিনুর হৃদয় চিত্ত অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। কি ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, কত রসের প্রস্রবণ বহিয়া যাইতেছে। কেহ যদি তার আস্বাদন বিনুকে দিতে উদ্যত হয় তাহাতে তাহার বিরাগ কেন?

প্রথম কাব্য শোনাইয়া প্রসাদও উপলব্ধি করিতে পারিল শিক্ষার চলতি পথে তাহার চঞ্চলমতি স্ত্রী অগ্রসর হইতে পারিবে না। তাহাকে উন্নত করিতে হবে কাব্যে কবিতায় গল্পে উপন্যাসে।

সুউচ্চ বৃক্ষশিরে শীতের সুমিষ্ট রৌদ্র সবে আবীর মাখাইতে সুরু করিয়াছে।

তরু রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিল, "দাদা ও দাদা, বৌদি, শিগ্‌গির উঠে খেজুরের জিরেনকাটা রস খেয়ে যাও। ভজা গাছি ভাঁড় ভরে নিয়ে এসেছে।"

প্রসাদ জাগিয়া বিনুকে জাগাইয়া তুলিয়া দিল। প্রসাদের চিরকালের অভ্যাসের আজ ব্যতিক্রম হইয়াছে। যে যত রাত্রেই শয়ন করুক না কেন ভোর পাঁচটা জাগিবে কি জাগিবে। আজ ছয়টা বাজিয়াছে। রাত তিনটার পরে তাহাদের ঝাড় নিবিয়াছিল। বিনুর অনুরোধে সে বই বন্ধ করিতে পারে নাই।

প্রসাদ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া দরজা খুলিয়া তরুর সহিত বাহির হইয়া গেল।

বিনু তাহার পিঠে ভাঙ্গিয়া-পড়া শিথিল কবরী বাঁধিয়া বারান্দার বালতি হইতে অঞ্জলি অঞ্জলি জলে জাগরণ-ক্লিষ্ট মুখ ধুইয়া রন্ধনশালার পেছনের পথ ধরিয়া চলিয়া গেল শাশুড়ীর কাছে। এত বেলায় সামনের উঠানে কাহারও সম্মুখীন হইবার ভয়ে বিনু সদরে পদক্ষেপ করিল না।

শীতের প্রভাতের উপভোগ্য পানীয় সদ্য-কাটা খেজুরের রস।

কাঁচের গেলাসে সফেন টাটকা রস লইয়া ক্ষিতি তরু সুমু কলরব করিতেছে। প্রসাদের রসের গেলাস হরি লইয়া গিয়াছে গোল বারান্দায়।

রূপার থালায় নানাবিধ মিষ্টান্ন ও গরম চা গৃহিণী গোছাইয়া দিতেছেন।

তরু ঠাণ্ডা রসে চুমুক দিয়া গায়ে শিহরণ তুলিয়া বলে, "বৌদি, তুমি এক্ষুনি এক গেলাস খেয়ে নাও। ফেনা মরে গেলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।" বিনু চুপে চুপে বলে, "আমি খেজুরের রস খেতে পারি না। আমার গন্ধ লাগে।"

সকলে হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে, "মাগো, একি কাণ্ড! এমন ভাল জিনিসে তোমার গন্ধ লাগে? তুমি কি?"

মনোরমা বলেন, 'আপন রুচিতে খাওয়া পরের রুচিতে পরা।' তা নিয়ে তোদের হাসির কি হ'ল রে? বৌমা, তুমি যখন রস খেলে না, তখন এক বাটি চা খেয়ে নাও। শীতকালে চা খেলে শরীর ঝরঝরে হয়।"

বিনু চা খাইয়া তরুকে দিয়া মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করে, "কি আজ রান্না হইবে? কি তরকারি কুটিবে সে?"

"আমার এদিকে মিটে গেল, চল আমিও যাই। দেখি কি কোটা-কাটা। আজ একাদশী, বিধবাদের খাওয়া নেই। নারায়ণের ভোগের সামান্য কিছু রেঁধে দিলেই হবে।"

তরু বলে, "মা, বৌদি বলছে সে আজ ঠাকুরভোগ রাঁধবে।"

মনোরমা প্রীত হইলেন, "গৃহ প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ, তাঁর সেবা ত করতেই হয়। বিধবা তোমার হাতে খায় না, আজ তাদের খাওয়া নেই, বেশ ত তুমিই ভোগ রান্না করো। বড়ি ভাজা, একটা তরকারি করো, আর যা হয়। ভোগে তিন পদ রান্না দিতে হয়।"

মনোরমা চলিয়া গেলেন নিয়মের ঘরের দিকে। বিনু তাঁহার পিছনে। হাতীর সিঁড়িতে ঠাকুমা একগলা ঘোমটা দিয়া বসিয়া আছেন। বিনু তাঁহার পাশে গিয়া অনুচ্চ স্বরে বলে, "ঠাকুমা, আজ একাদশীর উপবাস, রাতে আমার খেয়াল হয়নি আপনি শোবার আগে জল খেলেন না কেন? উনি ত দুধ-মিষ্টি পাঠিয়েছিলেন তা ফেরৎ দিলেন।"

"সেই যে সব না মাখামাখি, তাতে ভয় লাগে। তাই খাই না। তবু আমার খাওয়া হইচে তুই যে আমারে তোর বাগের নাড়ু পাক, কুমড়ার মোরব্বা তুলো তুলো করে বোঁদে ভেজে দিইছিলি শেষ রাতে তোদের ঘরের যখন ঝাড়ের বাতি নিবলো তখন তার এক খাবলা বাতাসা দিয়ে খেয়ে এক ঘটি জল খেয়ে নিয়েছি পরাণ ভরে ঢক ঢক করে। ওতেই আমার হয়েছে মিষ্টি খাওয়ার কাজ।"

বিনু তরকারির ঝুড়ি লইয়া বসিল। গৃহিণী কি দিয়া কি হইবে নির্দেশ দিতে লাগিলেন।

বাগানের মা উঠানের কোণায় উনুন ধরাইয়াছে। খেজুর গুড়ের গন্ধে সারা বাড়ী মম করিতেছে। দাস-দাসীদের মধ্যে আজ বড় ব্যস্ততা দেখা দিয়াছে। পৌষ-পার্বণের বেশী দেরী নাই। এতবড় বাড়ীর প্রত্যেক ঘর ঝাড়িতে হইবে, মুছিতে হইবে। কোথাও ধুলা বালি আবর্জনা থাকা চলিবে না। পূর্ব হইতে শুরু না করিলে কাজ সমাধা করা সম্ভব নহে।

সকলের গৃহেই পৌষপার্বণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দীনতম দরিদ্র যে তাহারাও মাটির ভাঙ্গা ডোয়া বাঁধিতেছে, মাটির দেয়াল লেপিয়া তকতকে করিতেছে। ছেঁড়া কাঁথা ছাতা ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া কাচিতেছে। আস্তাকুঁড় পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছে।

নিরক্ষর হিন্দুর সম্পর্কে আসিয়া মুসলমান সমাজের স্ত্রীলোকেরা পৌষপার্বণ পালন করিতে শিখিয়াছে। তাহাদের গৃহেও নূতন চাল কোটার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা ব্যয়সাপেক্ষ রকমারি পিঠা করিতে জানে না। জানিলেও সাধ্যে কুলায় না। তাহারা করে ধামা ধামা সরাপিঠে। রাঙ্গা আলু সিদ্ধ করিয়া পুলি পিঠার মধ্যে পুর দিয়া গুড় সংযোগে সিদ্ধ করিয়া খায়। তাহারা

গরীব, নারিকেল কিনিবার পয়সা নাই। তবু তাহারাও পিঠা করে। ঘরদ্বার পরিষ্কার করে। ছেঁড়া কাপড় সাজিমাটি দিয়া পরিষ্কার করে। লক্ষ্মীমাস, মা লক্ষ্মী সকল জাতিরই দেবতা। তিনি বিমুখ হইলে অনাহারে প্রাণ দিতে হইবে। ভক্তিতে না হোক ভয় সকলেরই আছে। ভয়ের জন্যেই সকলে পৌষপার্ব্বণ না মানিয়া থাকিতে পারে না।

বিন্দুর তরকারি কোটা হইয়াছে। রান্নাঘরের তরকারি [illegible] বারান্দায় কুটিয়া স্তূপ করিয়াছে।

বিন্দু এবার স্নান করিয়া নারায়ণের ভোগ রাঁধিতে যাইবে [illegible]।

সরস্বতী [illegible] বাহির হইয়া মা'র প্রতি ঝাল ঝাড়িতে লাগিল, "শুনলে মা, কি কাণ্ড! বাবা আমাকে ডেকে বললেন, '[illegible] তোমরা নিমের কাছে [illegible] দাও। তোমাদের নারকেলের কাজ, দুধের খাবার তৈরি করতে বড় পরিশ্রম হয়। লোকটা কাজে-কর্ম্মে ভাল, ওকে শিখে নাও'।"

মা মেয়ের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

মেয়ে [illegible] বিন্দুকে দেখাইয়া পুনরপি বলিতে লাগিল, "বাবার কথার মানে ত বুঝলে মা? আমাদের কারোর জন্যে নয়। [illegible] হচ্ছে তাতেই বাবা অস্থির হয়েছেন। কোথাকার কে কচিরাম বামুন কি শূদ্দুর সেই ঢুকবে নিমের কাছে। বুড়ো একটা মদ্দ, সেই আমাদের গায়ে গায়ে বসে হাতে হাতে কাজ করবে। পরাণ যে আমি মরে যাব মা। তোমাদের ইচ্ছা হ'লে তোমরা করাও, আমি এর মধ্যে নেই। ছোট ভোগের ঘরে আমাকে বাসা করে আস্তানা পাততে হবে। এতকাল যা হয় নি তাই হবে এখন। 'এতকাল দেখি নি পিসী মাসী, সম্পদ কালে জোটে আসি।' তোমাদের আর কি, যত মরণ আমার।"

সরস্বতীর চোখ জলে ভরিয়া গেল।

মা বলিলেন, "উনি আমাদের সুবিধার জন্যেই বলেছেন, কাজ করানো না করানো আমাদের হাতে। তোকে ছোট ভোগের ঘরে আস্তানা নিতে হবে কেন? আমাদের যেমন কাজ চলছে তেমনি চলবে।"

বিন্দু তেল মাখিতে চলিল তাহার শয়ন-গৃহে।

নবীন বিছানা ঝাড়িয়া বৃন্দাবনী চাদরে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। ঘরের মেঝে হইতে যাবতীয় আসবাব ঝাড়িয়া-মুছিয়া ঝক-ঝকে করিয়া রাখিয়াছে। সাজান পরিচ্ছন্ন গৃহ বিন্দুর বড় ভাল লাগে।

টেবিলের একপাশে রহিয়াছে মেঘনাদ বধ কাব্য-খানা। বিন্দু তৃষাতুর নয়নে তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

ইচ্ছা হইতেছিল খানিকটা পড়ে। কিন্তু দেয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল এখন তাহার আর পড়িবার সময় নাই। আজ যে তাহাকে নারায়ণের ভোগ রাঁধিতে হইবে। তাহা ভিন্ন কাব্যের মাধুর্য্য নষ্ট করিতে তাহার মন সরিল না। মনে পড়িতে লাগিল স্বামীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর। শঙ্খের মত গম্ভীর অথচ মধুর। সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ। প্রতি শব্দ সহজ-সরল করিয়া বুঝাইবার কত প্রয়াস। বিন্দুর হৃদয়-তন্ত্রীতে এখনও যেন বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছে সেই ধ্বনি, বাঁশরী ঝঙ্কার। ইহার পরে শত-সহস্রবার এই বই পাঠ করিলেও ইহার সবটা সে প্রসাদের নিকটেই শুনিবে। নীরব নিশীথের প্রতীক্ষায় বিন্দু কাজে মগ্ন হইয়া থাকিবে। কাটিয়া যাইবে সুদীর্ঘ দিবা, হিম-সিক্ত সন্ধ্যা। তাহার পরে—

অদ্য রাত্রি আড়াইটায় ঝাড়ের বাতি নির্ব্বাপিত হইল। লঙ্কার পঙ্কজ রবি অস্তাচলে গমন করিয়াছে।

বিন্দুর চোখ অশ্রুসিক্ত।

প্রসাদ বই রাখিয়া বলে, "এই, বই শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? তোমার ভয় হয়েছিল সাত রাতেও আমি বই শেষ করতে পারব না। এখন ত সাঙ্গ হ'ল? এবার ঘোমানোর পালা। কথা বলছ না কেন?"

বিন্দুর কণ্ঠস্বর অশ্রুজলে বাষ্পারুদ্ধ, সে ধরা গলায় ধীরে জবাব দেয়, "বড় কষ্ট লাগছে আমার, মেঘনাদের জন্যে। ওকে না মেরে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখলে ভাল হ'ত।"

"সেটা যে অসম্ভব। বড় বড় বীররা না মরলে ত সীতাদেবী উদ্ধার হয়ে রামের কাছে আসতে পারেন না। তুমি সীতার দুঃখে দুঃখিত, অথচ কারোর মরণ সইতে পার না। সে হয় না। এক পক্ষকে আর এক পক্ষ না মারলে উপায় নেই। এখন ভাল করে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাক। আর রাত জাগলে তোমার অসুখ করবে।"

"না, অসুখ ক'রবে কেন? তোমারও ত অসুখ হ'তে পারে? তুমিও ঘুমিয়ে থাক। কাল আবার কি বই পড়বে?"

"কাল তুমি পড়বে আমি শুনব। না ঘুমুলে

আমার অসুখ করে না। আমি বুড়ো, তুমি ছেলেমানুষ, ঘুম তোমাদেরই দরকার। আজ ঘুমিয়ে নাও কাল রবীন্দ্র কবিতা শুনিয়ো।"

বিনু কথা বলে না।

ক্ষণকাল পরে প্রসাদ টের পায় বিনু না ঘুমাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

এ-আবার কি? গভীর রজনীতে প্রসাদ ইহা প্রত্যাশা করে নাই। সে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সস্নেহে স্ত্রীর মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কান্নার কি হ'ল বিনু? আমি ত তোমাকে এমন কিছু বলি নি, যার জন্যে তুমি কান্না সুরু করলে? কি হ'ল বল?"

তবু বিনু কথা বলে না। বাহিরে শীতের বাতাস শন্ শন্ করে বহিয়া যায়। গৃহের পশ্চাৎ ভাগের উপবন হইতে শাখাচ্যুত স্খলিত পত্র ঝরিয়া পড়ে ঝর ঝর করিয়া।

দেওয়ালের ঘড়ি টিক টিক শব্দ করিতে করিতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজে।

প্রসাদ বলে, "এই, কি হ'ল তোমার? আজও তিনটে বেজে গেল, তুমি যদি এমনি করতে থাক; তা হ'লে তোমার কাছে ছোট ঠাকুমাকে ডেকে দিয়ে আমি বাইরে গিয়ে শুইগে।"

বিনু সভয়ে বলিল "না, আমার দুঃখ হ'ল আমি লেখাপড়া জানি না বলে, তুমি আমাকে কাল বই পড়ে শোনাতে বললে কেন? যে যা জানে না, তাকে তাই নিয়ে ঠাট্টা করতে কষ্ট হয় না?"

প্রসাদ কৌতুকের হাসি হাসে, "ও হরি, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। তুমি লেখাপড়া কম জান বলে আমি তোমাকে ছোট ভাবি না। সুযোগ হয় নি, শিখতে পার নি, তাতে কি হয়েছে? এর পরে শিখে নেবে। বার-তের বছরের মেয়ে আর কত শিখবে? তুমি আমার স্ত্রী রত্ন। কি সুন্দর আমাকে রান্না করে খেতে দিয়েছ। আজও চমৎকার ঠাকুরভোগ রান্না করেছিলে, কি সুন্দর আমাকে পশমের গোলাপ বুনে দিয়েছ। তার ভেতরে তুলো ভরে আতর দিতেও ভোল নি। কাল তুমি যে বই পড়তে বলবে আমি পড়ে শোনাব। পরের বারে তোমার পড়া রইল তোলা, হ'ল ত?"

বিনু শান্ত হইল।

ভোর হইতে-না-হইতে দাসী মহলে কিসের যেন একটা চাপা গুঞ্জন চলিতেছিল।

বিনু মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়ার পরে ক্রমে শুনিল, মথুর দত্তের দ্বিতীয়া পত্নী ললিতা বৌ সন্ধ্যায় পলায়ন করিয়াছে। বন্দরে এক খেমটার দল গান গাহিতে আসিয়াছিল তাহাদের সহিত। তাহারা দুইদিন গান গাহিয়াছিল। ললিতা দুই দিনই তাহার ননদ ও ভাগ্নেদের সহিত গান শুনিতে গিয়াছিল। বন্দরে মথুর দত্তের ঘর আছে, বেনেতি মশলার দোকান আছে। লোকে মানে, চেনে, মান্য করে।

সন্ধ্যাবেলা খেমটার নৌকা নদীতে ভাসার পরে যাহারা ললিতাকে যাইতে দেখিয়াছিল তাহারা আসিয়া মথুর দত্তকে খবর দেয়।

তাহার পরে চলে তুমুল কোলাহল। দুই-তিন খানা জেলে নৌকা সারারাত নদীর জল আলোড়িত করিয়া খেমটাওয়ালার নৌকার সন্ধান পায় না। 'চোর পালাইলে বুদ্ধি বাড়ে।' কাহারও খেয়াল ছিল না সেই খেমটার দল কোথা হইতে আসিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

বন্দরবাসীরা সকলেই খেমটার সখীদের নাচে-গানে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিল। "তারা আপনি নাচে আপনি গায়, আপনি করে হায় হায়।" গলির ওপারে দত্তবাড়ীতে কান্নার রোল উঠিয়াছে। বৃদ্ধ মথুরা দত্ত শোকে দুঃখে লজ্জায় শয্যা লইয়াছে। মা বুড়ী ইনাইয়া-বিনাইয়া বিলাপ করিতেছে—"ও জাতনাশী কুলনাশী, তোর মনে এই ছিল লো? তুই আমাগো বংশের মুখে চুণকালি দিইয়া কনে গেলি লো?"

পসারীর সহিত বিনু একবার পুকুরে গিয়া বৃদ্ধার কান্না শুনিয়া আসিল। পশ্চিমের ছোট বাঁধানো ঘাটের দিকে তাকাইয়া ললিতার জন্যে তাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল। ঐ ঘাটে ললিতা আর নাহিতে আসিবে না। তিতপোল্লার খোসায় সাবান মাখিয়া শরীর মাজিবে না। ছোট কলসীতে জল ভরিয়া সোপানে ভেজা পায়ের পদচিহ্ন আঁকিয়া মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে নামিয়া যাইবে না গলির পথে। বার বার বিনুর হৃদয়ে প্রশ্ন জাগিতেছিল, কিসের দুঃখে ললিতা চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল। মথুর দত্ত বিত্তবান্, তরুণী ভার্য্যার সর্ব্বাঙ্গ সোনার গহনায় মুড়িয়া দিয়াছিল। কত চটকদার শাড়ী তাহাকে পরিতে দিত। স্বামীর ভয়ে বড় বৌ কখনও সতীনকে সংসারের কুটোটা ভাঙ্গিতে বলে নাই। শাশুড়ী মনের আক্রোশে মনে মনে ফুলিলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ করিতে পারিত না। এত সুখভোগ ফেলিয়া ললিতা কেন যে চলিয়া গেল বিনু তাহা ভাবিয়া পায় না। তাহার সুকুমার হৃদয়ে অতি সহজে রেখাপাত

করে। কোথাকার কে ললিতা পুকুর ঘাটে ক'দিনই বা তাহার সহিত সাক্ষাৎ, তাহার চলিয়া যাওয়ার সহিত বিনুর কি'ের সম্পর্ক, তবু বিনুকে বিষণ্ণ করিয়া তুলিল।

বাড়ীতে পৌষপার্ব্বণের আয়োজন চলিতেছে। গোলাঘর হইতে এক ঝাঁকা নারিকেল চাকর বাহিরে লইয়া গেল ছাড়াইতে। তাহা দেখিয়াও বিনু আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল না। সে শুনিয়াছিল ছানা ক্ষীর নারিকেলের সহিত সংযোগ হইবে। যাহা হইবার হোক, তাহাতে তাহার কি?

দুই স্বামী-স্ত্রী মিলিত হইল রাত্রে। ঝাড় লণ্ঠন জ্বলিতেছে, দিবাভ্রম হয়। প্রসাদের হস্তে 'কড়ি ও কোমল'। বিনু সারা দিনের পরে প্রথমেই স্বামী সম্ভাষণ করিল, "শুনেছ, এক কাণ্ড হয়েছে। ললিতা খেমটা দলের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে।"

প্রসাদ সবিস্ময়ে স্ত্রীর দিকে তাকায়, "ললিতা, ললিতা কে?"

"ঐ যে গলির ওপরে তোমাদের প্রজা মথুরা দত্ত, তার ছোট বৌ, যাকে সকলে ললিতা সখী বলে ডাকে, সেই।"

"হ্যাঁ, মথুরা দত্তকে জানি, সেই বুড়োর আবার ছোট বৌ ছিল নাকি? বুড়োর ছোট বৌ থাকলে সে পালিয়েই যায়, তাতে তোমারই বা কি? আমারই বা কি?"

বিনু অপ্রতিভ হইয়া বলে, "না, এমনিই বলছিলাম। ঘাটে নাইতে আসত রোজ, তাই দেখেছিলাম। তুমি ত জান না, এবার কার্ত্তিক পূজোর দিনে কারা যেন দুষ্টমি ক'রে ওদের বাড়ীতে জোড়া কার্ত্তিক ঠাকুর রেখে গিয়েছিল, যাতে দুই বৌয়ের ছেলে হয়। খুব ঘটা হয়েছিল পুজোয়। এ বাড়ীতে ঘরভরা মিঠাই-মোণ্ডা পাঠিয়েছিল।"

"তা হ'লে তোমাদের লাভ মন্দ হয় নি? এখন শুনবে নাকি কড়ি ও কোমল? আজ কিন্তু রাত বারটার বেশি তোমার ঝাড়ের আলো জ্বলবে না।"

"কেন?"

"মোম পুড়ে শেষ হ'ল প্রায়। আর দু'রাতের জন্যে বাতি বসবে না ঝাড়ে। আর যা বই তা তুমি নিজেই পড়ে বুঝতে চেষ্টা ক'রো। আমার পরীক্ষার পরে যখন এসে অনেক দিন থাকব তখন আবার ঝাড় লণ্ঠন জ্বলবে। পড়া হবে অনেক বই।"

বিনু ক্ষুণ্ণস্বরে বলে, "তুমি রটন্তী পূজোয় না এস, কিন্তু দোলের সময় না এলে ঠাকুমা অনর্থ করবেন। নাতি নাতি ক'রে উনি দিনরাত সারা হয়ে যান। সকলের ওপরে ওঁর বড় নাতি।"

প্রসাদ হাসিল. "টাকার চেয়ে যে সুদের মমতা বেশি তা কি জান না? তোমার যখন নাতি হবে তখন ঠাকুমার অবস্থা বুঝতে পারবে? ও কি, মুখ ফিরিয়ে বসলে কেন? লজ্জা হ'ল বুঝি? মানুষের জীবনের পরিণতির কথায় লজ্জা কিসের? ঠাকুমাকে আনন্দ দিতে পরীক্ষা ফেলে কি দোল খেলা চলে? তোমরা দোলে খুব হুল্লোড় করে আবীর খেল। আমাদের বাড়ীতে এই তোমার প্রথম দোল। বন্ধু-বান্ধবীদের জন্যে তোমার খুব মন খারাপ লাগবে। এখানে রং আবীর পিচকারি নিয়ে মাতামাতি করবে কার সঙ্গে?"

"সেখানেও ঠাকুমা আমাকে ওসব করতে দেন নি। আমরা বড়দের পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করেছি। তাঁরা আমাদের কপালে আবীরের টিপ পরিয়ে দিয়েছেন। কেউ কেউ মুখে-মাথায় আবীর দিয়ে রাঙ্গা ক'রে দিতেন। হুল্লোড় করত পাড়ার ছেলেরা মিলে। বাবা, সে কি কাণ্ড! বালতি বালতি রং গুলে পিচকারি নিয়ে সবাই ভূত সাজত। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি চলত তাদের হোলি খেল। পরের দিন মেঠে হোলির সং সেজে সকলে কি কাণ্ড করত!"

"তুমি যেতে না তাদের দলে?"

"মাগো, বলে কি? পুরুষ মানুষের সঙ্গে মেয়েরা হোলি খেলবে নাকি? আমার ঠাকুমা ওসব পছন্দ করেন না। ছেলেদের দেখাদেখি যদি ইচ্ছা হয় মেয়েয় মেয়েয় খেলবে। পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের রং খেলা লজ্জার।"

"ভাগ্যে আমার পরীক্ষা দোলের সময়, নইলে আমি তোমাকে আবীর দিলে সেটা হ'ত তোমার লজ্জার?"

বিনু এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। স্বামী যে স্ত্রীর নিকটে অপর পুরুষের পর্য্যায়ে পড়ে না এ খেয়াল তাহার হইল না।

পৌষপার্ব্বণের ধুমাধুমির মধ্যে প্রসাদের বিদায় লগ্ন উপস্থিত হইল। সেই রান্নার তাড়া, স্নানের তাড়া। ঠাকুমার মধুর বচন। গোযানের সাজন। লালজি-কালজির অগ্রগামী হওয়া। সেই ষ্টীমারের ভোঃ ভোঃ, বিদায় জ্ঞাপন।

মকর সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিন পাবনা জেলায় 'গোবর আলপনা' নামে খ্যাত। কয়েক দিন হইতেই নিত্য আঙ্গিনা ও আনাচ কানাচ লেপিয়া রাখা হইতেছে।

শেষ রাতে সেই লেপার উপরে মালীবৌ আর একবার পালিশ লেপা দিয়া গিয়াছে।

স্নানান্তে সংক্ষেপে জপ-তপ সারিয়া সরস্বতী বড় একটা কাঁসার জামবাটিতে চালবাটা গুলিয়া উঠানে হাতী দিতে বসিয়াছে। শুভক্ষণ করিয়া হাতী প্রথম বেলাতেই আঁকিতে হইবে। আজ আবার শনিবার, প্রথম বেলায় হাতীর আকার দিয়া তাহার কপালে সিঁদুর, ধান-দুর্ব্বা ও সরিষার ফুল দিতে হইবে। নহিলে বারবেলা পড়িবে।

এ বিষয়ে ঠাকুমা সচেতন হইয়া মুখে তুবড়ি ছুটাইতেছেন। গোবর আলপনায় সরস্বতী বরাবর আলপনা দিয়া থাকে। তাহার আলপনার হাত চমৎকার। কত লোক তাহার হাতী দেখিতে আসিবে। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইবে।

পৌষপার্ব্বণে পল্লীর অঙ্গনে অঙ্গনে হাতীর শুভাগমন অনিবার্য্য। অনেকে চালের গোলায় পুঁইডাঁটার রস মিশাইয়া সূতাকার রেখায় হাতীর পত্তন করিয়া থাকেন। রায়বাড়ীতে পুঁইডাঁটার রস ব্যবহার হয় না।

রৌদ্রে আঙিনা ভরিয়া গিয়াছে। সরস্বতী ছাতা মাথায় দিয়া আলপনা দিতেছে।

হাতীর মুখের দিকের অংশটা আগে সমাপ্ত করিতে হইবে। কারণ, সেইখানেই প্রথম শুভক্ষণ।

হাতীর মস্তকের ভাগ দেখিতে দেখিতে হইয়া গেল। ললাটে চন্দ্র-সূর্য্য বিরাজ করিতে লাগিল। চন্দ্র-সূর্য্যের মাঝখানে দেওয়া হইল বৃহৎ একটা সিন্দুরের ফোঁটা ও ধান দুর্ব্বা সরষের ফুল একমুঠি। ঠাকুমা নিশ্চিন্ত হইয়া উলু দিলেন। না, সময় মতই হইয়াছে। শনিবারের বার-বেলার এখনও অনেক দেরি।

বিহুর গৃহের সিঁড়িতে বসিয়া ঠাকুমা নাতনীকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন, "ও সরি, দিব্যি হয়েছে তোর হাতী, এবার হাতীর পিঠে হাওদায় রাজা দে। গলায় ঘণ্টা দিয়ে পোস-পোষানী আঁক, তাদের কপালে সিঁদুর ধান দুর্ব্বো সরষে ফুল দিয়ে শুভক্ষণ কর। হাতীর সারা গায়ে লতা-পাতা, পিঠে টাকা-মোহর দিয়ে এখন ভরতে দে না তপ্তি আর মণিমালাকে। আসল যা তা, তোর হাত দিয়েই বেরিয়েছে। এখন নকল আঁকি-বুঁকি দিয়ে ভরে দিক ওরা। নইলে আলপনা শেষ করতে তোর যে রাত দুপুর বেজে যাবে।"

সরস্বতী ঠাকুমাকে প্রচণ্ডবেগে ধমক দেয়, "তুমি থাম বাপু, যে ঘোড়া কেনে তার চাবুক জুটে যায়। আমার এত পরিশ্রমের জিনিস আনাড়ির হাতে দিয়ে নষ্ট করতে পারব না। রাত দুপুর হয় হবে, তার জন্মে ব্যস্ত হ'তে হবে না তোমাকে।"

ঠাকুমা ক্ষুণ্ণ মনে উঠিয়া যান ছোট ভোগের ঘরের দিকে। সেখানে আজ ছোট ঠাকুমা একলা নাই। মনোরমা বসিয়া গিয়াছে উনুনের পাড়ে। আজ হইতে পৌষপার্ব্বণের সূচনা।

গোবর আলপনার দিন নূতন মাটির সরায় সরাপিঠা করিতে হয়। তাহাকে সরা পোড়ানো বলে। যত পিঠাই হোক না কেন, সকলের আদি অকৃত্রিম হইল সরাপিঠা।

সন্ধ্যায় সরা পোড়ানোর নিয়ম হইলেও দ্বিপ্রহরেই সরাপিঠা করিতে হয় নারায়ণের ভোগ ও বিধবাদের জন্য। পিঠা পায়েস অন্ন-তুল্য। অন্নের সহিত গ্রহণ করিতে হয়, দিনে না হবে একবার মাত্র।

রাত্রে থামলা থামলা পিঠাপুলি রান্নাঘরে করিয়া রাখিতে হইবে নহিলে আগামীকালের পিঠার সমারোহ নির্ব্বাহ দেওয়া কঠিন।

কাল পৌষপার্ব্বণে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে। তাহা ভিন্ন কামার কুমার ছুতার ভূঁইমালী ইত্যাদির আদি-অন্ত থাকিবে না। পৌষপার্ব্বণের পরের দিন গ্রামের কৃষকের ছোট ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট ধামা কাঁখে প্রভাতে পিঠা ভিক্ষা করিতে আসিবে। কাজেই তৈরি করিতে হইবে পিষ্টকের পাহাড়।

ঠাকুমার সহিত মনোরমার বাক্যালাপ বন্ধ। অথচ প্রাণের কথা ব্যক্ত না করিলে বুক ফাটিয়া যায়।

ঠাকুমা বাহিরে দাঁড়াইয়া হাঁক দিলেন, "ও ছোট বৌ, তোরা সরা পুড়িয়ে খুঁনি রাখছিস? তা প্রথম পিঠা-খানা কাঁসার কাঠি বিঁধিয়ে উনুনের মুখে রেখেছিস ত? আর চারখানা পিঠা পাতায় ক'রে শেয়ালদের জন্মে রাখতে হবে। সন্ধ্যার পরে পুকুরের চাতালে দিয়ে এলেই শেয়ালরা এসে খাবে। মা ভগবতী শিবা রূপে ভোগ নিয়েছিলেন। সেই জন্মে শুভপর্ব্বে শিবাভোগ দেওয়া ভাল।"

ছোট ঠাকুমা পুলিপিঠা গড়িতে গড়িতে বলেন, "সব ঠিক মতন হচ্ছে দিদি, তুমি ব্যস্ত না হয়ে ছায়ায় গিয়ে বসে থাক গে। কড়া রোদ উঠেছে, রোদে ঘুরলে তোমার আবার ঘুরণী উঠে পড়বে।"

ঠাকুমা সেখান হইতে ছায়া খুঁজিতে খুঁজিতে উপনীত হইলেন পুকুর পাড়ের পশ্চিমের ছোট ঘাটে বাতাবী লেবু গাছের সুশীতল ছায়ায়।

ঘাটে নাইতে নামিয়াছে এ বাড়ীর ভূতপূর্ব্বা ধান-

ভাদুনী সোনা মিয়ার মা ও তাহার নাতনী খাতুন। সোনা মিয়ার মা এখন স্থবিরা বুড়ি, নাতনী হাত ধরিয়া জলে নামাইয়াছে।

ঠাকুমা বলেন, "সোনার মা, ভাল আছিস ত? নাতনী তোর বুড়া কালে স্যাবা-স্বাবা করে নাকি? সোনার দিব্যি মেয়ে হয়েছে, এবার সাদী দিবি না?"

"হ মাঠান, সাদীর কথা হইচে। ম্যাথাড়া ভাল হইচে, আমাগো কত কবন ক'র খায়। ওই ত হাতে ধরি নয়া আইসে নাওনের লাগি। এহন বড়ন ঢঙের আর সাদ্যি নাই মাঠান।"

"কতকাল আর সাদ্যি থাকে মানুষের? যে দুঃখ ধান্দায় সোনারে মানুষ করেছিল তা আমরা জানি। দিনরাত তোর কেটে গিয়েছিল ঢেঁকির ওপরে। চিরকাল কি লোকের সমান যায়—'কখনও বনে বনে কখনও সিংহাসনে।' ছেলে নাতিরা লায়েক হয়েছে—নাতনী স্যাবা করছে, এখন দিন কতক সুখ ভোগ কর। নাতনী তোর ভাত রান্না শিখেছে ত?"

"হ, মাঠান, ভাত রাঁধন, শাগ ভাজন শিখছে। আমাগো ভাত-জল খাতুনই দেয়।"

খাতুন ফিক ফিক করিয়া হাসে। হাসিতে হাসিতে সোনার মা বুড়ীর কানে কানে বলে, "কালী, তুই যে খাটা রাঁধন শিখ'চ তা কইলা না?"

"হ, মাঠান, নাতিন খাটা রাঁধতে জানে। ভাত শাগ খাটা বেবাক দেয়।" কহিতে কহিতে বুড়ি স্নানান্তে খাতুনের বাহু ধারণ করিয়া সোপান বাহিয়া প্রস্থান করে।

ঠাকুমা উদাস নয়নে তাকাইয়া থাকেন মথুর দত্তের বাড়ীর দিকে। গলির দিকে মুখ করিয়া টিনের নূতন চালা বাঁধা হইয়াছিল কার্ত্তিক পূজার জন্য। পূজার পরেও যুগল কার্ত্তিক বিরাজিত ছিল নূতন চৌকির ওপরে। মথুরের বড় বৌ প্রত্যহ নাইয়া-ধুইয়া শুচিবাসে শুটিকত বাতাসা জল ও ফুল নিবেদন করিয়া দিত যুগ্ম দেবতাকে। আবার সন্ধ্যায় ধুপ দীপ জ্বালাইয়া প্রণাম করিত।

ললিতা বৌ-এর পলায়নের পরে মথুর দত্ত জোড়া কার্ত্তিক বিসর্জ্জন দিয়াছে দুর্গাদহে। ঝাঁপ-মুক্ত চালা, শূন্য চৌকি খাঁ খাঁ করিতেছে। অপমানে লজ্জায় মথুর শয্যাগত। বড় বৌ ও মা'র মুখে রা নাই। গৃহে নিদারুণ নিরাশার স্তব্ধ নীরবতা নামিয়া আসিয়াছে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূল্য নাই। তাহারা তিলে তিলে যাহা গঠন করে অলক্ষ্য হইতে বিধাতা নিমেষে তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দেন। তবু মোহগ্রস্ত মানব আশার জাল বুনিতে বিরত হয় না।

ভোর হইবার সূচনায় আবার রায়বাড়ী কল-কোলাহলে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। রাত জাগিয়া প্রদীপ লইয়া সরস্বতী তাহার আলপনা শেষ করিয়া রাখিয়াছিল। সে কি আলপনা—না-শুভ্র বর্ণের একখানা অপূর্ব্ব গালিচা প্রাঙ্গণে বিছান হইয়াছে। পাড়ার লোক দলে দলে সরস্বতীর শিল্পকলা নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য ধন্য করিতেছিল। এই আনন্দটুকুই ভাগ্যবিড়ম্বিতা সরস্বতীর সম্বল। যে কাজটা লইয়া মেয়েরা ভুলিয়া থাকিতে চায়, সে কারুকার্য্যই হোক, আচার-নিষ্ঠা রেষারেষিই হোক মা তাহাকে সহজে বাধা দেন না। যেরূপেই হোক উহার সময় কাটিয়া যাইলেই হইল।

মকর সংক্রান্তিতে খাল খন্দ নালা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গঙ্গাসাগরে পরিণত হইয়া যায়, এই বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া গোটা রায়বাড়ী ভোরের শীতে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পুকুরে স্নান সারিয়া অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে।

কেবল ঠাকুমাকে ও মনোরমাকে প্রচণ্ড শীতে তেমন কাহিল করিতে পারে নাই, কারণ তাঁহারা উভয়ে বসিয়া গিয়াছেন দুই উনুন জ্বালাইয়া রকমারি রসের পিঠা প্রস্তুত করিতে।

রুচিরাম পাণ্ডা এতকাল ভোজনবিলাসী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সূপকার হইয়া তাঁহার বাহান্ন বার ভোগের কত উপকরণ বানাইয়া দিয়াছে। পিঠাপুলি গজা দইবড়া লাড্ডু তাহার হস্তে চমৎকার উতরায়। সে বসিয়াছে রন্ধনশালার বারান্দার উনুনে পিঠা-পর্ব্বে। মণিরাম ভোজের রান্না করিতেছে।

বিন্দু ফরমাইস খাটিতে মহা ব্যস্ত। ছুটাছুটিতে তাহার শীত সভয়ে পলায়ন করিয়াছে। সরস্বতী গায়ে পশমের মোটা আলোয়ান জড়াইয়া বিগ্রহের পূজার আয়োজন করিতেছিল। বিশেষ দিনে নারায়ণের বিশেষ পূজা ভোগের অনুষ্ঠান করা হয়। আজ মকর সংক্রান্তি, নারায়ণ স্নান করিবেন। দধি দুগ্ধে ঘৃতে মধুতে। জলপানি খাইবেন ক্ষীর সর ছানা মাখন মিছরি, ফল-মূল ইত্যাদি। তাহার পরে ভোগ হইবে সারি সারি পাত্রে পিঠা-পায়েস দিয়া।

ঠাকুমার মহা অশান্তি, দুই দণ্ড স্থির হইয়া রৌদ্রে

বসিয়া রোদ পোহাইতে পারিতেছেন না। তাঁহার মন পড়িয়া রহিয়াছে বাহির মহলের গোশালায়। আজ গরু-বাছুরদের উত্তম রূপে স্নান করাইয়া তাহাদের পায়ের চারি ক্ষুরে ও শিংএ সরিষার তেল মাখাইয়া এক গামলা চালের গুঁড়া ঘন করিয়া গোলাইয়া মাটির নূতন কলিকায় গরু-বাছুরের সারা গায়ে ছাপ দিয়া তাহাদিগকে সযত্নে কলার পাতায় সরা-পিঠা খাইতে দিতে হইবে। কপালে সিঁদুর দিতে হইবে।

ঠাকুমার কি কম সমস্যা, তা শত্তুরের মুখে ছাই দিয়া যাটের গরু-বাছুরের সংখ্যা রায়বাড়ীতে কম নহে। এক গোয়াল-ভরা গরু-বাছুর, ভৃত্য সম্প্রদায় ঠিক মতন নিয়মরক্ষা করিতে যদি না পারে সেই আশঙ্কায় ঠাকুমা চঞ্চল হইয়াছেন।

উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় রাত্রে তাঁহার ভাল ঘুম হয় নাই।

প্রথম রাতের শিবাভোজন তিনি সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, পাচক মণিরাম কলার পাতায় খানকতক পিঠা পুকুরের চাতালে রাখিয়া আসিয়াছিল। কতক্ষণ পরে ঠাকুমা অনুভব করিলেন, একপাল শৃগাল নিঃশব্দে পিঠা খাইতে আসিয়াছে। কিন্তু খাওয়া তাহাদের শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রখর শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন লালজি কালজি গোঁ গোঁ করিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঠাকুমা বিলক্ষণ রূপে অবগত আছেন শিবারা খাদ্য ফেলিয়া পলাইবার পাত্র নহে। তাহারা চাতালে বসিয়া পিঠা না খাইলেও বাঁশবনে লইয়া খাইয়াছে। ঠাকুমার অতি সাধের শিবাভোগ হইয়াছে।

এদিকে ঠাকুমার যেমন অস্থিরতা ওদিকে তেমনি তরুর। সকলের অলক্ষ্যে বিনু যোগ দিয়াছে তরুর সঙ্গে।

রাতেই সকল তরকারি কুটিয়া রাখা হইয়াছিল। রসের পিঠার রস তৈরি করিয়া রাখা হইয়াছিল। নিয়মের ঘরের কাজ ছিল অনেকটা হালকা।

গরু-বাছুরের গায়ে কলিকার ছাপ দিয়া পিঠা খাওয়া হইবে। অথচ তরুর দুগ্ধপোষ্যগুলি কি এমনি সকলের লাথি-ঝাঁটা খাইয়া আস্তাকুঁড়ে পড়িয়া থাকিবে? তাহারা কি বানের জলে ভাসিয়া আসিয়াছে? তাহাদের কল্যাণ নাই, শুভক্ষণ নাই?

হারাণীকে দিয়া তরু এক বালতি জল গরম করাইয়া লইয়া গিয়াছে কাঠের ঘরের পিছনে। একদিকে ঘরের আড়াল আর একদিকে প্রাচীর, স্থানটা ভারী নিরিবিলি, কাহারও চোখে পড়ে না।

মায়ের আস্ত একখানা চন্দন সাবান গরম জল সংযোগে শাবক চারটির গায়ে মাখাইয়া ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছে। বিনু কাজের ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া তরুর সহযোগিতা করিতেছে। অবাধ্য অবোধ জীবগুলিকে কিছুতেই শাসনে রাখা যাইতেছিল না। বিনুই বুদ্ধি করিয়া চায়ের দুধ হইতে একঘটি দুধ অঞ্চলের আড়ালে আনিয়া চারিটা বাটিতে তাহাদের মুখের সামনে ধরিয়া দিয়াছে। বিনু আরও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে প্রসাধনের নানা সামগ্রী। চালের গুঁড়া গোলা জলে নূতন কলিকা। একবাটি চুন হলুদ, আলপনার মাটির খুড়িতে গোলা তেল সিন্দুর।

গত রাত্রে ঠাণ্ডা লাগিয়া তরুর চোখ কড় কড় করিয়াছিল। বিনুই তাহাকে মনসা পাতার কাজল করিয়া দিয়াছিল চোখে দিতে। সেই কাজলের দলিত পাতা কয়েকটাও সে আনিয়া রাখিয়াছে। এক টুকরা শাড়ীর পাড় আনিতেও বিনুর ভুল হয় নাই।

চালের উপর দিয়া তেরছা হইয়া রৌদ্র আসিয়া পড়িল বাচ্চাদের গায়ে। গা শুকাইতে বিলম্ব হইল না।

কুকুর-বিড়ালের সর্ব্বাঙ্গে ছাপ দেওয়া হইল কলিকার। শাড়ীর মোটা পাড়ে হলুদ-চুনে ডোরাকাটা হইল লেজে, চোখে মনসা পাতার কাজল, কপালে তেল সিন্দুরের বৃহৎ টিপে বাচ্চাগুলা সাজিল অভিনব বেশে।

তরু তাহাদিগকে আদর করিয়া বুঝাইতে লাগিল, "চল, এখন তোদের বাইরে নিয়ে রেখে আসি। গরু-বাছুরের গায়ে পিঠে দেওয়া হচ্ছে দেখ গে। খবরদার—উঠোনের আলপনায় পা ছোঁয়াবি না। তা হ'লে বছর-কার দিনে শুনতে হবে মধুর বচন 'আপদ' 'বালাই' 'দুর দুর ছাই ছাই'

তরু পাকা গিন্নী, বাচ্চাদিগকে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হয় না, বিনুকে বলে, "বৌদি, তুমি এবার হাত-পা ধুয়ে কাপড়-সেমিজ বদলে তোমার যজ্ঞশালায় যাও। তোমাকে না দেখলে ওদিকে আবার বকুনি সুরু হবে। রুচিরাম বলে, 'মুই পাতকী হমু না।' কি জানি কুকুর-ছোঁয়া কাপড়ে আমাদের কি পাতক হবে কে জানে। তাই কাপড় ছাড়তে বলছি।"

তরু তাহার সাঙ্গ-পাঙ্গ লইয়া বাহির মহলে চলিয়া গেল।

যথাসময়ে নারায়ণের ভোগ সরিল। ব্রাহ্মণ ভোজন হইল। বড় আঙ্গিনা আলপনায় চিত্রিত। ছোট ছোট আঙ্গিনায় কামার-কুমারের দল বসিয়া গেল আহারে।

যেমন তাহাদের পিঠা-পায়েস খাইবার বহর, তেমনি পায়েস বাড়িয়া লইবার আগ্রহ।

শুভ্র জ্যোৎস্না অবারিত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে শুভ্র আলিপনায়। চারিদিকে হাসিতেছে প্রফুল্ল চন্দ্র-কিরণে।

জেলে পাড়ায় খোল-করতাল সংযোগে কীর্ত্তন হইতেছে—

"শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়,
হরিনামের বানে
হরিনামের গানে
কে আছিস পাপী তাপী, আয় ছুটে আয়।"

সারাদিন পৌসপার্ব্বণের উৎসবে শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যার পরে সকলে শয়ন করিয়াছে। বিনু গৃহে খিল আঁটিয়া আলোর সামনে বসিয়াছে বোনা লইয়া। কাজের ফাঁকে এবং রাত জাগিয়া সে ক্ষিতির মোজা বুনিয়া দিয়াছে। ক্ষিতি মোজা পায়ে দিয়া বন্ধু মহলে দেখাইয়া বেড়াইতেছে। বিনু ভাবিয়া পায় না ইহারা এত অল্পে খুসী হয় কিরূপে? ইহাদের চরিত্রের এদিকটা উদার বলিতে হইবে। এদিকে একরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, এখন বিনুর আসল দিকের ব্যাপার বাকী রহিয়াছে। বিনু আঙ্গুলে মাপিয়া স্বামীর পায়ের মাপ রাখিয়াছে। প্রথমেই "দেহি পদপল্লব মুদারম।" বিনু স্বামীর পায়ের মোজা বোনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এবার শীতে স্ত্রীর স্বহস্তে রচিত মোজার আস্বাদ প্রসাদ পাইবে না। কিন্তু না পাক "এক মাঘেই ত শীত পালায় না।" স্বামীর জন্ত কিছু করিতে বিনুর হৃদয়-মন উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। সে এ-অবধি তাহাকে কিছুই দিতে পারে নাই। কেবলই গ্রহণ করিয়াছে তাহার অজস্র দান দুই করপুট ভরিয়া।

গৃহে সারারাত্রি কেরোসিনের আলো জ্বলে বলিয়া খাটের অপর অংশের দুইটি জানালা খোলা রাখা হয়। সেই মুক্ত বাতায়ন-পথে হিমবর্ষী বাতাস আসিয়া ঝাড়ে দোলা দিতেছিল, কাঁচের বাঁশী বাজিতেছিল ঠুং ঠাং। বিনু সেইদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে পড়িতে লাগিল বিগত রজনীর কথা।

সুদূর দেশ হইতে আবার কবে মধুর যামিনী ফিরিয়া আসিবে তাহার জীবনে? প্রসাদ উদাত্ত মধুর স্বরে আবার তাহাকে কাব্য পড়িয়া শোনাইবে? সে আশা দিয়া গিয়াছে ফিরিয়া আসিয়া মেঘদূত পড়িয়া শোনাইবে। মেঘদূতের বিষয় বিনু যে একটু-আধটু না জানে তাহা নহে। তাহার পিত্রালয়ের সকলে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। তাঁহাদের পাঠ-পঠন আলোচনার মধ্য দিয়া বিনুর হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছে মেঘদূতের অঙ্কুর। সেই বিরহী যক্ষ যাহার আকুল বিলাপ বিশ্বে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে, বিনু এবার শ্রবণ করিবে সেই করুণ কোমল আমূল কাহিনী। তখন ত শীত থাকিবে না, কিন্তু বসন্তও কি চলিয়া যাইবে? বিনুর বারান্দার নীচের গাঁদার ঝাড় শুখাইয়া যাইবে। গাঁদা শুখাইলে কুরচি ফুলে ভরিয়া যাইবে তাহার বাতায়ন-তল। তরু বলিয়াছে গাঁদার পালা শেষ হইলে সে এখানে রোপণ করাইবে বেল ও রজনীগন্ধার ঝাড়।

বিনু বুনিতে বুনিতে মানস নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল বেল ও রজনীগন্ধার কুঁড়ি। তাহারা ফোটো ফোটো হইয়াছে কিন্তু সম্পূর্ণ ফুটিতে পারিতেছে না। আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর পুনরাবৃত্তি না হইলে ফুল ফুটিবে না, কোকিল গাহিবে না। পবন কুরচিবাস বিতরণ করিতে বিরত থাকিবে।

ছোট ঠাকুমা একঘুমের পরে জাগিয়া চমকিত হইলেন, "ও কি বৌ,এই দুরন্ত শীতে এখনও তুমি বাতির সামনে বসে রয়েছ। একালের কি ঢং হয়েছে সোয়ামীর কাছে পত্তর লেখন। এদিকে ঘুমে ঢলে পড়ে, ওদিকে ঘুম যায় কোথা?"

বিনু ঘড়ির দিকে চোখ তুলিল, রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে। আজ সকলে শয়ন করিয়াছিল নয়টায়। তখনও জেলে পাড়ার কীর্ত্তন থামে নাই। পুণ্যদিনে প্রাণ ভরিয়া সবাই ভগবানের নাম করিতেছে।

বিনু বোনাটা টেবিলের টানার মধ্যে সযত্নে রাখিয়া দিল। লণ্ঠনের শিখা কমাইয়া রাখিয়া আসিল আলমারির পেছনে খোলা জানালার পাশে। ছোট ঠাকুমা আলো সহিতে পারেন না।

বিনু লেপের নীচে শয়ন করিয়া কহিল, "আমি ত আজ চিঠি লিখতে বসি নি ছোট ঠাকুমা? একটু বুনতে নিয়েছিলাম।"

"আবার কিসের বোনা? জনা-জাত ত বুনি-টুনি জামা জোড়া, মুজা-টুজা দিলি। আবার কার লেগে তোর হাত সুর সুর করছে? আজ দিনমান খাটা হাঁটা গেচে, আজ রাত জাগতে হয় না, শুয়ে ঘুম দিতে হয়। দেখ বৌ, পেসাদ এবার এসে তোকে রাত জাগা শিখিয়ে গেচে। চিরকাল আমি তোকে নিয়ে শুচ্চি-

তোর ঘুমের বহর আমার অজানা নাই। আজ দুপুরে ভোগের রাঁধা-বাড়া কেমন খেয়েছিলি?"

ছোট ঠাকুমা যেমন রাঁধিতে ভালবাসেন, ততোধিক ভালবাসেন নিজের রান্নার সুখ্যাতি শুনিতে। সারা দিনের পিঠা-পর্ব্বে কাহারও মুখে সেটা শোনা হয় নাই। এখন বড় আশায় বিনুকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

বিনু বলে, "খুব সুন্দর রান্না হয়েছিল ছোট ঠাকুমা, মণিরাম-কচিরামের সাধ্যি নাই আপনার মতন নিরামিষ তরকারি রাঁধে।"

"চাপুড় ঘণ্ট, মটর শাকের তিল-পেটালি, পটোলের ঝাল, ছানার ডালনা—এর ভেতরে কোনটা তোর বেশি ভাল লেগেছিল বৌ?"

বৌটি নীরব, তাহার আঁখি-পল্লবে নিদ্‌পরী সোনার কাঠির পরশ দিয়াছে। ছোট ঠাকুমার ভুল ধারণা প্রসাদ বধূকে নিশি জাগরণ শিক্ষা দিতে পারে নাই।

পরের দিন এত বেলাতেও রৌদ্রের দেখা নাই। নিবিড় কুহেলিকায় ভুবন ভরিয়া গিয়াছে। বনতল কুয়াশার চাদরে আবৃত।

ঠাকুমা সিদ্ধান্ত করেন এবার আম্র পল্লবে পল্লবে আমের মুকুল ভরিয়া যাইবার কুজ্ঝটিকা, এ তাহারই পূর্ব্বাভাস।

ক্রমে বেলা হয়, ধীরে ধীরে উড়িয়া যায় কুয়াশার আবরণ। কৃষক বালক বালিকারা আসে কলাইকরা সানকী থালা ও ছোট ছোট বেতের ধামা লইয়া পিঠা ভিক্ষা করিতে।

গৃহিণী বধূকে আদেশ দিলেন সবাইকে সমভাবে পিঠা বিতরণ করিতে। পাত্রে পাত্রে পড়িয়া আছে অপরিযাপ্ত সিদ্ধপুলি, সরা-পিঠা ও পাটিসাপটা। এগুলি কাল কচিরাম সারাদিনব্যাপী প্রস্তুত করিয়াছিল। ভাল ভাল রসের পিঠা প্রায় নিঃশেষ।

বিনু লোককে দিতে বড় ভালবাসে। সেখানে পৌষপার্ব্বণের পরের দিন ঠাকুমা তাহাকে ডাকিয়া বলিতেন, 'রাই, আমি যা চাই,' যা বিনু পিঠে বিলি করগে। সমান ভাগে দিস, একজনা বেশী পেল, আর-জনারা পেল না, সেটা দেখিস।"

সেখানকার সেই বিনু আজ রায়বাড়ীর পিঠা বিতরণের ভারপ্রাপ্ত হইয়া মহা পুলকিত।

কেহ বলে, "বৌমা, আমাগো ছোট ভাইডার নাগি দুইডা পিঠা দেও। সে ম্যালেরি জ্বরে ক্যাঁতা মুড়ি দিইয়া কাঁদন করিচে। মাতা তুলিতে পারিল না। একটু পরে জ্বর ছাড়ি যাইবে, তহন পিঠা খাইবে।"

কেহ অনুনয় করে, "ও বৌমা, মায়ের নাগি ভাজা-ডেরা একডা পিঠা দেও। মা গিইছেল মিরগী বিলে কাদা হাতায়ে মাছ ধরিতে, জিয়াল মাছে পায়ে কাঁটা বিঁধাইয়া দিইচে। পা ফুলি ঢোল, নড়িতে পারে না।"

জনে জনের নানারূপ অনুযোগ-অভিযোগ শুনিয়া বিনু পিঠা দেয়। পাত্র প্রায় শূন্য হইয়া আসিতেছে। প্রার্থীর সংখ্যাও বিরল হইতেছে।

আজ বিনু এদিকে আবদ্ধ। গৃহিণী কচিরামের উপরে ভার অর্পণ করিয়াছেন তরকারি কোটার। সে বসিয়া গিয়াছে যজ্ঞশালার বারান্দায় বঁটি পাতিয়া। মেয়েলী কাজে কচিরাম ওস্তাদ। তাহার কর্ম্মকুশলতায় সরস্বতীও সদয় হইয়াছে।

পিঠার ঘরে দরজায় শিকল দিয়া বিনু গিয়া তাহার বিছানার উপরে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। হাতে তাহার "চোখের বালি"। ইতিপূর্ব্বেই তাহার স্বামী প্রদত্ত সমস্ত গ্রন্থের গল্পাংশ পাঠ করা হইয়াছে। তাহাকে পাঠ বলা চলে না, গোগ্রাসে গেলা। বিনু এবার স্বামীর ব্যবহারে তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রীত। সে খাতায় লেখার জোর দেয় নাই, অখাদ্য অপাঠ্য কতক-গুলো বই তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া তাহা মুখস্থ করিতে হুকুম করে নাই। শুধু আদেশ দিয়াছে একখানা পুস্তকের গল্প একবার পড়িয়া সে যেন তাহা রাখিয়া না দেয়। বার বার পড়িয়া সে যেন প্রতি শব্দের অর্থ বোধ করিতে চেষ্টা করে। সেই কারণে দুইবার পড়া চোখের বালি বিনুর হস্তে। বিনু প্রতি লাইনে চোখ বুলাইতে বুলাইতে ভাবে, আশার সহিত তাহার যেন কোথায় সাদৃশ্য রহিয়াছে। ভাগ্যে এখানে বিনোদিনীর আবির্ভাব ঘটে নাই, তাহা হইলে বিনু কি করিত? এমন সময় আঁচলের তলায় হাত লুকাইয়া তরু গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকে, "বৌদি, শুয়ে রয়েছ কেন? অসুখ করল নাকি?"

বিনু বই রাখিয়া উঠিয়া বসে, "না না, অসুখ করবে কেন? এমনি একটু গড়িয়ে নিলাম। এখন নাইতে যাব, বেলা দুপুর হ'ল; বড় হবিষ্যি ঘরে মুন্ডুকের কাজ পড়ে আছে। আর দেরি করলে ওঁরা রাগ করবেন।"

"রেখে দাও ওঁদের রাগ। তুমি কি এতক্ষণ ব'সে ছিলে, কাঁড়ি কাঁড়ি পিঠের বিলি-ব্যবস্থা সেটা কি কাজ নয়? তোমার ভয় নেই, মা কচিরামকে ঢুকিয়েছেন

মেজদির ভাঁবে। ও তোমার চেয়ে ভাল কাজ করছে দেখে মেজদি খুশীতে ডগমগ। এই দেখ কি এনেছি, পিঠে খেতে খেতে মুখ বিচ্ছিরি হয়ে গেছে, নাও, মুখে দাও।" বলিতে বলিতে তরু আঁচলের তলা হইতে বাহির করিল একটা পাথরের বাটি। বাটিতে রাঙ্গা রাঙ্গা এক বস্তু শালুপ পাতায় মাখা।

বিনু সাগ্রহে প্রশ্ন করে, "এ আবার কি মেখে এনেছ? এত লাল কেন?"

"চুকারী কি লাল না হয়ে সাদা হবে? গোয়ালের পেছনে আমাদের যে চুকারী গাছ আছে, তুমি ত তা দেখ নি, বৌমানুষ বাইরে গোয়ালের পেছনে যাবে কি? চুকারী শিলে ছেঁচে শালুপ পাতা দিয়ে মেখেছি। শীতের ঠ্যালায় একটা কামরাঙ্গাও পাকে নি। গাছভরা কুল, কষা। আমের মুকুল কত খুঁজলাম, সবে পাতার ভেতর থেকে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে।"

বিনু হাত বাড়াইয়া সেই পরম উপাদেয় সামগ্রী মুখে দিল। মুখে চুক চুক শব্দ করিয়া প্রশংসায় মুখর হইল, "কি সুন্দর মেখেছিস তরু, খেতে চমৎকার হয়েছে। কখনও এমন খাই নি। পিঠে খেতে খেতে আমার মুখটাও যেন কেমন হয়ে রয়েছে। তোর চুকারী খেয়ে বাঁচলাম। আর ক'দিন পরেই কুল হবে, আমের মুকুলে ভরে যাবে গাছ। কুল আমের মুকুল দিয়ে মাখলে কি সুন্দর হয়?"

তরুর সহিত নিবিড় সখ্যতায় বিনুর 'তোমার' পরিবর্ত্তে 'তুই' যে কখন হইয়াছে বিনু তাহা টের পায় নাই।

ঠাকুমা পাকা সন্ধানী, এতক্ষণ সন্ধানে সন্ধানেই ঘুরিতেছিলেন। বিনুর গৃহে ঢুকিয়া গালে হাত দিলেন, "ওমা, তোরা এখানে, আমি কই, গেল কনে ওরা? কি খাচ্চিস লো, ঘর-ভরা পিঠে-পায়েস থুয়ে তোরা কি খেতে বসেছিস? চুকারী কি কাঁচা খাওয়া যায়?"

তরু বলে, "আমরা যে এঁটো ক'রে ফেলেছি, নইলে তোমাকে একটু চেখে দেখতে দিতাম কাঁচা খাওয়া যায় কি না? তোমার বাড়ীতে মিষ্টি খেতে খেতে জিবের স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে। আর ভাল লাগে না।"

"অমর্ত্তে অরুচি হইছে তোদের। তা এমাস ভরা চলবে এমনি ধারা খাওয়া-দাওয়া। আজ মাঘ মাস পড়ল। পরশু তোদের বাস্তু পূজো। বাস্তু পূজোর দিন রায়বাড়ীতে আবার পাঁঠা দিয়ে বাজারের জয়দুর্গার পূজো দিতে হবে। পাঁঠা বলি দিয়ে বাড়ীতে আনে। পুরোহিত খায় দুইজনা, বাস্তু পূজোর একজনা, জয়দুর্গা পূজোয় একজনা। আমার মহেশের রাজার সংসার, দুইজনা কইলেই কি দুইজনা হয়। কত লোক আসবে যাবে খাবে নেবে তার ঠিক-ঠিকানা নাই। এত খাবার দেব্যজাত দেখে আমার পরাণটা কেঁদে ককিয়ে মরে পেসাদের জন্তে। 'ব্রজভূমি করি আঁধার কোথায় গেছে গোপাল আমার'।"

ঠাকুমার গোপাল উল্লেখে তরু খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। প্রিয়বিচ্ছেদকাতরা বৃদ্ধার খেদোক্তিতে বিনু আজ তরুর হাসিতে যোগ দিতে পারিল না।

বাস্তু পূজা হইতেছে উঠানে। গোবর-জলে লেপা জায়গায় আলপনা দেওয়া হইয়াছে। বাস্তু পূজার জলপানি সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে ছোট ছোট কলার পাতায়। দেবতা কি কম, ইন্দ্রাদি পঞ্চ দেবতা ছাড়া অগ্নির দাহন হইতে গৃহকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্নি দেবতা। ঝটিকা হইতে রক্ষার নিমিত্ত পবন। জল-প্লাবনের দেবতা বরুণ। মেঘ-বৃষ্টির কর্ত্তা মেঘবাহন। লক্ষ্মীনারায়ণ শিবদুর্গা। সর্ব্বসিদ্ধি গণেশ সূর্য্য দেবতা-সর্ব্বোপরি মা বসুমতী, তিনিই যে সাক্ষাৎ বাস্তু দেবী।

ছোট ঠাকুমা পরমান্ন চড়াইয়া দিয়াছেন। পায়েস দিয়া সর্ব্ব দেবতার ভোগ দিতে হইবে।

প্রভাতে ছেলে-বুড়া স্নান সারিয়া লইয়াছে। পূজার স্থানে গোল হইয়া বসিয়াছে গৃহবাসীরা। গৃহকর্ত্তা পুরোহিতের পাশে কুশাসনে সমাসীন। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসার ঝাঁজ বাজা মাত্র ঠাকুমা উলু দিলেন। ধূপ-দীপ জ্বলিল। ঘণ্টা দুই ধরিয়া চলিল বাস্তু পূজা।

ইহার পরে ভোগ দিবার সময় আসিল। ফের ধোয়া-মোছা কলার পাতা সাজান হইল আঙ্গিনায়। প্রত্যেক কলার পাতায় দেওয়া হইল পানের খিলি দই মিষ্টি।

মনোরমা মস্ত একটা পিতলের কড়ায় দুই কান ধরিয়া উঠানে আনিয়া নামাইলেন। কড়া ভরা পায়েস, দেবতার প্রীতির জন্য তাহাতে মিলিত করা হইয়াছে ঘৃত মধু কর্পূর।

হাতা কাটিয়া কাটিয়া কলার পাতায় পায়েস দেওয়া হইল। দিনটা মেঘম্লান হইলেও মধ্যাহ্নে রৌদ্রের তেজ মন্দ ছিল না। বাহির হইতে আসিল অনেকগুলি ছাতা। কচিরাম ব্রাহ্মণ, এসব কাজে তাহার অধিকার আছে। সে ছাতা মেলিয়া ধরিল পুরোহিত ও কর্ত্তার মাথায়।

অন্য সকলে ছাতা মুড়ি দিয়া বসিয়া বসিয়া লোলুপ দৃষ্টিতে প্রসাদের দিকে তাকাইতে লাগিল।

অবশেষে ভোগ হইয়া গেল। পুরোহিত কুশের ডাঁটায় শান্তিজল সকলের গায়ে ছিটাইয়া দিলেন।

সকলে বসিয়া গেল প্রসাদের পাতা লইয়া। বাস্তু পূজার প্রসাদ উঠানে বসিয়াই খাইতে হয়।

কর্ত্তা বসুমতীর প্রসাদের পাতা লইয়া চলিলেন বাড়ীর প্রধান গৃহের ঈশান কোণে পুঁতিতে।

পুরোহিত পায়েস প্রসাদ বাদে জলযোগ সারিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। পায়েস অন্নতুল্য। এক সূর্য্যে একবারের বেশি দিনে ব্রাহ্মণরা অন্ন গ্রহণ করতেন না।

সারি সারি পাতা লইয়া সরকাররা ও দাসদাসীর দল খানিকটা দূরে বসিয়া গেল। ঠাকুমা প্রসাদ প্রণাম করিয়া মুখে দিলেন।

তরু তারস্বরে চিৎকার করে, "ওবৌদি, এস না বাপু, তোমার প্রসাদে এর পরে ধুলো-বালি উড়ে পড়বে। এত লোকের ভেতরে খাবে কেমন করে? এই যে আমি ছাতার আড়াল করে দিয়েছি। ছোট ঠাকুমা মা প্রসাদ মুখে দিয়ে গেছেন, ওঁরাও পায়েস খাবেন না। মেজদির উঠোনের প্রসাদ অচল। উনি যে ঠাকুর দেবতার ওপরে বড় দেবতা।"

মনোরমা বলিলেন "যাও বৌমা, তুমি ছাতার আড়ালে ব'সে প্রসাদ মুখে দিয়ে এস। এক্ষুনি জয়দুর্গার বলির পাঁঠা এসে যাবে। মাংস রান্না হ'লে তবে না সকলের খাওয়া। খেতে খেতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। তুমি দু'খানা পায়েসের পাতা নিও।"

বিনু ছাতার আড়ালে তরুর পাশে প্রসাদ লইয়া বসিল। ইতিমধ্যে তরু চারখানা পায়েসের পাতা সরাইয়া রাখিয়াছে এক পাশে। বিনু সেদিকে চোখ মেলিতেই তরু চুপে চুপে কহিল, "ওদের জন্যে সরিয়ে রেখেছি বৌদি। উঠোনে পুজো, ওরা ছুঁয়ে দেবার ভয়ে আমি কাঠের ঘরে শেকল দিয়ে রেখেছি। তোমার খাওয়া হ'লে চল ওদের খাইয়ে-দাইয়ে ছেড়ে দেইগে।"

বিনু ও তরু নিজেরা প্রসাদ খাইয়া সকলের অগোচরে চলিয়া গেল কুকুর-বিড়াল বাচ্চাদের ভোগ সরাইতে।

জয়দুর্গার বাড়ীতে বলি হইয়া আসিল পূজার ফল-মূল মিষ্টান্ন প্রসাদ ও বলির শিংওয়ালা প্রকাণ্ড একটা পাঁঠা। জয়দুর্গা বারোয়ারী পূজার মতন। তাঁহার অন্নভোগ নাই। বাজারের দোকানদারদের অনুরোধে ও পাড়ার নিম্নশ্রেণী লোকদের আগ্রহে রায়কর্ত্তা নিজের এলাকায় নিজে যাবতীয় ব্যয় বহন করিয়া জয়দুর্গার আটচালা টিনের মণ্ডপ করিয়া দিয়াছিলেন। মণ্ডপের দেয়াল ও মেঝে পাকা। বৈশাখী অমাবস্যায় জয়দুর্গার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। সেই কারণে একবছর কাল দেবী-প্রতিমা মণ্ডপে বিরাজিত থাকেন। ফের বৈশাখে পুরাতন প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া নূতন প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হয়। ইতর সাধারণরা বারমাস ভক্তিভরে প্রভাতে তাঁহার গৃহ মার্জ্জনা করিয়া ফুল দেয়। সন্ধ্যায় প্রদীপ ও ধূপ প্রজ্জলিত করে। রোগে-ভোগে মানত করে, রোগমুক্ত হইলে পুরোহিত ডাকাইয়া পূজা দেয়, বলি দিয়া মহানন্দে বলির মাংস ভোজন করে।

পল্লীগ্রামে কসাইখানা নাই। অনেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বৃথা মাংস স্পর্শ করেন না। মায়ের নামে পাঁঠা উৎসর্গ করিলেই তাহা মহাপ্রসাদে পরিণত হইয়া থাকে। সেই জন্য জয়দুর্গার অঙ্গনে বলির অভাব হয় না।

দুই পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় পাচকের হাতে খাইবেন না। তাঁহাদের নিমিত্ত মনোরমা পৃথক মাছ রান্না করিয়া মাংস চড়াইয়া দিলেন। ডাল তরকারি ভাজা অম্বল ভোগশালাতেই হইয়াছে।

রায়বাড়ীর ভূরিভোজন মিটিতে অপরাহ্ণ গড়াইয়া গেল। সকলে পরিতৃপ্ত হইল বাস্তু পূজার সমাপ্তিতে। সুতায় গাঁথা হইয়া যেন রহিয়াছে—এক একটি পর্ব্ব। সুতা হইতে ফুলের মালার মত এক একটা খসিয়া গেলে কাজের লোকেরা আরাম বোধ করে।

ঠাকুমা আজ বড় উৎকণ্ঠিত, কামিনীর মা'র জন্য। কামিনীর মা গিয়াছে আজ তিন দিন হইল নাকালিয়ার বন্দরে তাহার অসুস্থ কাকাকে দেখিতে। বেচারার স্বজন বলিতে বিশেষ কেহ নাই। থাকিবার মধ্যে ব্রজেশ্বরী ভগিনী আর কাকা ও কাকিমা।

রায়বাড়ীর ব্যূহ ভেদ করিয়া কামিনীর মা সচরাচর বাহির হইতে পারে না। বালিকা বয়সে সে তিন মাসের কন্যা কামিনীকে লইয়া বিধবা হইয়াছিল। সে কামিনীও এক বছরের বেশি জীবিত ছিল না। কিন্তু নামটুকু রাখিয়া গিয়াছে। তাহার পরে ঠাকুরদার আমলে ভরা যৌবনে কামিনীর মা এখানে আসে। সর্ব্ব বিষয়ে সুনামের সহিত জীবন প্রায় কাটাইয়া আসিয়াছে। ঠাকুমা এতদিন যে তরুণীটিকে স্নেহে করুণায় সৎপথে পরিচালিত করিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন সে এখন আর দাসী পর্য্যায়ে পড়ে না। রায়-পরিবারের একজনা হইয়া গিয়াছে।

কথা ছিল আজ ভোরে কামিনীর মা আসিয়া পৌঁছিবে। তাহার ব্যতিক্রমে ঠাকুমা পথের পানে চাহিয়া আছেন। বিন্তুকে শতবার প্রশ্ন করিয়াছেন, "দেখ লো মণিমালা, রাজেশ্বরীর জন্মে বাস্তু পুজোর পেসাদ রেখে দিয়েছিস ত? সে কথার নড়-চড় করবার লোক নয়। কাহিল কাতরের বাড়ী, ঠেকে পড়ে বের হ'তে পারে নি।"

বিন্তু বলে, "ভোগের দুই পাতা পায়েস আর সব জিনিষ তার জন্মে ঢাকা দিয়া রাখা হয়েছে ঠাকুমা; ওবেলা আসতে পারে নি, এবেলা নিশ্চয় আসবে।"

বিন্তুর আশ্বাসে ঠাকুমা আশ্বস্ত হন। "তাই কি মণিমালা, তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। রাজেশ্বরী না থাকলে একবেলায় রায়বাড়ী অচল। একটা না মিটতেই আর একটা এসে উপস্থিত হয়। বাস্তু পুজো হ'ল, আসছে রটন্তী পুজো। সে হেলা-ফেলার দেবতা নয়, কাঁচা খেকো কালী। এখন থেকেই তার সাটর সুরু হবে। রাজেশ্বরী না হ'লে কারও সাধ্যি নেই তালে তাল দেওয়া।"

ঠাকুমার আকুলতায় দাসী মহলে পরস্পর পরস্পরের গায়ে ঠেলা দিয়া মুখ টিপিয়া হাসে বিদ্রূপের হাসি।

ক্রমশঃ

অঙ্কুরে বিনাশ

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতে দ্রুতবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিবিধ ব্যবস্থাবলম্বনের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। সম্প্রতি সংসদে এই প্রসঙ্গ আলোচনাকালে সদস্যদের প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সুশীলা নায়ার বলেন, জন্ম-নিরোধক বিভিন্ন ওষুধ বা প্রক্রিয়া শতকরা শতভাগ সুনিশ্চিত নয় বলে গর্ভবিনষ্টি বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাবও সরকারের বিবেচনাধীন আছে। বিহারের তথ্য ও পরি-কল্পনা মন্ত্রী শ্রীমতী সুমিত্রা দেবীও গর্ভবিনষ্টির প্রস্তাব সমর্থন করে বলেছেন, তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকলে তিনি গর্ভ-বিনষ্টি আইনসিদ্ধ করতেন।

মায়ের স্বাস্থ্য জীবন ও রক্ষার জন্য গর্ভবিনষ্টি অবশ্য এখনই আইনসঙ্গত। কোন চিকিৎসক যদি মনে করেন, গর্ভসঞ্চারের ফলে কোন নারীর জীবন বিপন্ন হয়েছে বা গর্ভজাতভ্রূণের কোন কারণে মৃত্যু হওয়ায় মায়ের জীবন সঙ্কট দেখা দিয়েছে তবে মাকে রক্ষার জন্য তিনি গর্ভস্থ ভ্রূণ বিনাশ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু এখন নারীর জীবনের সঙ্গে সমগ্র দেশ ও সমাজের নিরাপত্তার প্রশ্নও পৃথিবীর সকল দেশে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। অগণিত অনাগতের অবাঞ্ছিত আবির্ভাব এখন সারা বিশ্বের সমস্যা। তাই গর্ভবিনষ্টি আইনসিদ্ধ করার জন্য পৃথিবীর দেশে দেশে জোরালো আন্দোলন গড়ে উঠেছে। সমস্যাটি এখন আর শুধু চিকিৎসকের বিচার্য বিষয় নয়, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজচিন্তা।

অবাঞ্ছিত সন্তানের আগমন প্রতিরোধের জন্য গর্ভ-বিনষ্টি একটি দীর্ঘাচরিত প্রথা। প্রাগৈতিহাসিক সমাজেও এর প্রচলন ছিল। খাদ্যের সন্ধানে যেদিন মানুষকে দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়াতে হ'ত ও বাঁচার জন্য বনের পশুর সঙ্গে অহর্নিশ সংগ্রাম করতে হ'ত, সেদিন সন্তান খুব কমজনেরই কাম্য ছিল। প্রিয়জনের সঙ্গে হারানোর ভয়ে বা চলার পথে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে থাকার আশঙ্কায় অনেক নারীই সেদিন নির্দ্বিধায় আত্মজের ভ্রূণাবস্থায় অবলুপ্তি ঘটাত।

পরবর্তীকালে কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করে মানুষ যখন স্থায়ী জনপদ ও ক্ষেত খামার গড়ে তোলে তখন সহ-কারীর প্রয়োজনে সন্তানের সমাদর বাড়ে এবং স্বাভা-বিকভাবেই ভ্রূণবিনষ্টি হ্রাস পায়। কিন্তু সভ্যতার জটিল অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এমন সব অবাঞ্ছিত কুসংস্কার ও কুপ্রথা সমাজে প্রবেশ করতে থাকে যার ফলে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে আবার গর্ভবিনষ্টির ব্যাপক চল শুরু হয়। বহু বিবাহ ও বালবৈধব্যের এই দেশে কত কোটি জীবনের সম্ভাবনা যে জঠরের অন্ধকারেই বিলুপ্ত হয়েছে তার হিসাব, কোন মতেই হওয়া সম্ভব নয়। প্রাচ্যের বহু রাজপরিবারে ও অভিজাত বংশে সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য মেয়ের বিয়ে দেওয়ার রীতি ছিল না। এখনও হায়দ্রাবাদের নিজাম পরিবারে মেয়েদের বিবাহ নিষিদ্ধ। যুদ্ধ বা রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে যখন কোন দেশে বহু যুবকের মৃত্যু হয় বা অর্থনৈতিক কারণে বিবাহ কঠিন হয়ে পড়ে তখনও অগণিত নারীকে নিঃসঙ্গ থাকতে হয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মনুষ্য-সৃষ্ট এই সব বাধা যে অনিবার্য ভাবে সংখ্যাতীত বিপর্যয় ঘটিয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা ও সেই সঙ্গে অবাধ মেলামেশা পাশ্চাত্য সমাজে গর্ভবিনষ্টিকে প্রায় প্রতি পরিবারের স্বাভাবিক ঘটনা করে তুলেছে।

প্রাচীন কাল থেকে এই প্রথা প্রচলিত বলে প্রাচীন কাল থেকেই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসম্বন্ধে বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করে আসছেন। প্রাচীন রোম ও গ্রীসের অভি-জাত পরিবারগুলিতে গর্ভবিনষ্টির ব্যাপক প্রচলন ছিল। ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রগুলিতে জনসংখ্যা একদিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, এ কারণে প্লেটো ও এরিষ্টটল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য গর্ভবিনষ্টি সমর্থন করেন। কিন্তু খ্রীষ্ট-পূর্ব-যুগের প্রখ্যাত রোমান চিন্তানায়ক ও রাষ্ট্রনেতা সিসারো গর্ভবিনষ্টির বিরোধী ছিলেন। তিনি ভ্রূণহত্যাকারিণী নারীর মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করে বলেন—যে নারী তার সন্তানের পিতাকে সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতিরক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে, একটি পরিবারের ভবিষ্যৎ ভরসাকে নিশ্চিহ্ন করে ও রাষ্ট্রের নাগরিক সংখ্যা বৃদ্ধির পথে অন্তরায় হয় মৃত্যুই তার একমাত্র শাস্তি। সম্রাট নিরোর পরামর্শদাতা অপর রোমান চিন্তানায়ক সেনেকা গর্ভবিনষ্টিকে নীতিবিগর্হিত কাজ বলে মনে করতেন। কিন্তু আইন করে তা বন্ধ করা যাবে না বলে তিনি গর্ভবিনষ্টি আইনত নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। জাষ্টিনিয়ান কোড়ে গর্ভবিনষ্টি নিষিদ্ধ। চিকিৎসক

জগতের গুরু হিপক্রেটিসও ছিলেন গর্ভবিনষ্টির বিরোধী। চিকিৎসকদের জন্ম তিনি যে অঙ্গীকার পত্র রচনা করেন এবং যা আজ বিশ্বের সকল দেশের, সকল চিকিৎসকের আচরণ-বিধিরূপে স্বীকৃত, তাতে লিখিত আছে—I will not aid a woman to procure abortion.

খ্রীষ্টধর্মের বিধানে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা গর্ভবিনষ্টি নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রোটেষ্টাণ্টরা অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে অন্তত জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে মনোভাব পরিবর্তন করেছেন ; ক্যাথলিকরা এব্যাপারে এখনও অবিচল। ফলে বিশ্বের ক্যাথলিকধর্মী রাষ্ট্রগুলিতে অবাঞ্ছিত জন্ম এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। লাতিন আমেরিকায় এমন দেশও আছে যার জনসংখ্যার প্রায় সত্তর শতাংশ অবৈধ। সেখানে খুব কম নারীর জীবনেই যৌবন বসন্তের বার্তা বহন করে আনে। আর্থিক অনটনের জন্য স্বামীর সংসার করার সুযোগ তাদের অল্প জনের হয়, কিন্তু সন্তান ধারণ তাদের সকলের জীবনের অনিবার্য অধ্যায়। দশ-বারোটি সন্তানের জন্ম না দিয়ে অব্যাহতি পেয়েছে এমন নারী অল্পই আছে লাতিন আমেরিকায়, এমনকি কুড়িটি সন্তানের জন্মদানও সে মহাদেশে স্বাভাবিক ঘটনা। বারো-তেরো বছরে সন্তানের জন্মদান আরম্ভ করে 'বত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে কুড়িটি সন্তানের জননী হয়েছেন এমন বহু হতভাগিনীর সন্ধান পাওয়া যাবে লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে। জন্মনিয়ন্ত্রণের বা প্রয়োজনে গর্ভবিনষ্টির সুযোগ না থাকলে একটি সমাজের অবস্থা কি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে লাতিন আমেরিকার দিকে তাকালেই তা বুঝতে পারা যায়।

কিন্তু লাতিন আমেরিকা দরিদ্র মহাদেশ। ইচ্ছা থাকলেও চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়ার সুযোগ সেখানে সীমিত। চিকিৎসকের সাহায্য সহজলভ্য হ'লে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কি ব্যাপক হারে গর্ভবিনষ্টি চলে দেশে, তা সম্প্রতি জানিয়েছেন নিউ ইয়র্কের তিন হাজার চিকিৎসকের সংস্থা 'নিউ ইয়র্ক একাডেমী অফ মেডিসিন'। তাঁদের মতে, এখন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর অন্তত দশলক্ষ গর্ভবিনষ্টির ঘটনা ঘটে, যার মধ্যে প্রায় ৯৯ শতাংশই বে-আইনী। হাসপাতালে প্রকাশ্যে যে আট হাজার নারীকে অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় তার মধ্যে আইনসম্মত ঘটনা মাত্র কয়েকটি। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশটি রাজ্যেই মায়ের জীবনরক্ষার অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া সকল কারণে গর্ভবিনষ্টি নিষিদ্ধ। কিন্তু কোন কোন হাসপাতালের ডাক্তার বিপন্ন ও অসহায় নারীর আবেদনে সহজেই সাড়া দেন, বিশেষ করে সে নারী যদি আত্মহত্যার ভয় দেখায় বা কুমারী ধর্ষিতা হয়।

একাডেমী অফ মেডিসিন বলেছেন, আইন থাকা সত্ত্বেও যদি এমন ব্যাপকভাবে গর্ভবিনষ্টি চলে দেশে, তবে সে আইন অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন। কোন কোন চিকিৎসক এমন অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে, জন-স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করেই সরকারের অবিলম্বে গর্ভবিনষ্টি আইনসম্মত করা উচিত। কারণ, আইনের ভয়ে বহু চিকিৎসক ওসব কাজ করেন না, ফলে অনেককেই হাতুড়েদের হাতে প্রাণ দিতে হয়। তারপর গোপনে তাড়াতাড়িতে এসব কাজ শেষ করতে হয় বলে অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসা শাস্ত্রসম্মত ভাবে তা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। অনেক চিকিৎসকও বিপন্নাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে জুলুম করে বেশী টাকা আদায় করেন। সুতরাং, গর্ভবিনষ্টি না ক'রে উপায় নেই যাদের, তারা যাতে সহজপথে অল্পায়াসে ও অল্পব্যয়ে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পায় সরকারের অবিলম্বে তার ব্যবস্থা করা উচিত।

একাডেমী তাই নিম্নলিখিত মর্মে প্রচলিত আইনের সংশোধনী প্রস্তাব করেছেন : যে মাতৃত্ব নারীর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ হবে, এবং যেক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ শিশুর দেহ ও মনের উপর তার জন্মের কারণ গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, সেক্ষেত্রে মাতৃত্ব অবাঞ্ছিত বিবেচিত হ'তে পারে এবং আইনের পথেই তার অবসান ঘটানো যাবে।

দুর্নীতির প্রতিবেধকরূপে একাডেমী শুধু প্রস্তাব করেছেন, বিধিসম্মত হওয়ার জন্য প্রত্যেকটি গর্ভবিনষ্টি হাসপাতালের চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটির অনুমোদন-সাপেক্ষ হ'তে হবে এবং একমাত্র লাইসেন্স-প্রাপ্ত চিকিৎসকদের দিয়েই ঐ কাজ করানো হবে। নিরাপত্তার প্রয়োজনেও এই ব্যবস্থা দু'টি বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত বলে একাডেমী মনে করেন।

ব্রিটেনে ১৯৪৮ সালে যে 'ইউজেনিক প্রটেকশন অ্যাক্ট' পাশ হয় তার অভাপাঃ লক্ষ্য সন্তানবতীর স্বাস্থ্য হ'লেও তার দ্বারা সকল কারণে গর্ভবিনষ্টি কার্যত আইনসিদ্ধ হয়। ঐ আইন পাশ হওয়ার পর থেকে ব্রিটেনে প্রতি-বছর আইনসম্মত ভাবেই কুড়ি লক্ষ গর্ভবিনষ্টি হচ্ছে। চিকিৎসকদের অনুমান, ফ্রান্সে প্রতি বছর ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ গর্ভের বেআইনী বিনষ্টিতে পরিসমাপ্তি ঘটে। ডেনমার্কে যত শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, গর্ভবিনষ্টি হয় তার দ্বিগুণ।

সোভিয়েট ইউনিয়নে বিপ্লবের পরেই গর্ভ-বিনষ্টি আইনসঙ্গত করা হয়। পরে, ১৯২০ সালে, ঐ আইনের কিছুটা সংশোধন করে বলা হয়, হাসপাতালের বাইরে গর্ভবিনষ্টি আইনসঙ্গত হবে না। এখন যে কোন নারী ইচ্ছা করলে ঐ আইনের সুযোগ নিতে পারেন। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের মতে গর্ভবিনষ্টি আইনসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায় নি। ইউরোপের অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতেও গর্ভবিনষ্টি আইনসিদ্ধ। হাঙ্গেরীর এক বছরের হিসাবে দেখা যায় সেখানে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে ত্রিশ হাজার, আর গর্ভ-বিনষ্টি হয়েছে পঞ্চাশ হাজার। কিন্তু এটাকে স্বাভাবিক ঘটনা বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। আধুনিক দম্পতির কাছে বেবী খুবই প্রিয় কিন্তু 'বেবীকার' তার চেয়ে কম প্রিয় নয়। একটি-দু'টি সন্তান সকলেরই আছে এবং সেইটিকেই তারা মনের মত করে মানুষ করতে চায়। জাপানে গর্ভবিনষ্টি আইনসিদ্ধ হওয়ায় ঐ দেশের অশেষ কল্যাণ হয়েছে। সেখানে এখন প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ নারীকে অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাতে শুধু যে জাপানের লোকবৃদ্ধি সমস্যার সমাধান হয়েছে তাই নয়, তার ফলে ঐ দেশের প্রত্যেকটি মানুষ সুস্থ-সুখী জীবন যাপনের সুযোগ পেয়েছে, সকল দিক থেকে আধুনিক জগতের উপযোগী হয়ে জাপান গড়ে উঠতে পেরেছে।

গর্ভবিনষ্টি আইনসঙ্গত করার বিরুদ্ধে বহু ধর্মীয় ও নৈতিক যুক্তির অবতারণা করা যায়, কিন্তু তাতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না যে, আগামী চল্লিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বর্তমানের দ্বিগুণ হ'লে তার পরিণতি কি হবে। লোকতত্ত্ববিদ্‌রা হিসাব করে বলেছেন, পৃথিবীর লোকসংখ্যা তিনশ' কোটি হ'তে আট লক্ষ বছর সময় লাগলেও ছ'শ কোটি হ'তে আর মাত্র চল্লিশ বছর সময় লাগবে। ভারতে এখনই চরম খাদ্যাভাব, কিন্তু যে-হারে এদেশের লোক বাড়ছে তা যদি অব্যাহত থাকে তবে ১৯৭০ সালে ভারতের লোকসংখ্যা পঞ্চাশ কোটি অতিক্রম করে যাবে, এবং ১৯৮০ সালে হবে ছাপ্পান্ন কোটি। আমরা কি আগামী পনের বছরের মধ্যে বর্তমান লোকসংখ্যার খাদ্যসমস্যার সমাধান ঘটিয়ে আরও বারো কোটি নতুন লোকের খাদ্যের ব্যবস্থা করে উঠতে পারব? এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, তখন বর্তমানের উদ্বৃত্ত দেশগুলির পক্ষেও আর খাদ্য যোগানো সম্ভব হবে না। কারণ, তাদের লোকসংখ্যাও সেদিন অনেক হয়ে যাবে। উপায় থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা আসন্ন বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বন না করি তবে কঠিন মূল্য দিয়েই আমাদের সে আহাম্মকির খেসারত দিতে হবে।

তা ছাড়া ভ্রূণকে জীব বলে ভাবাটাই ভুল। জীব অনন্যনির্ভর, ভ্রূণ যা নয়। শুধুমাত্র এই কারণেই ভ্রূণ বিনাশ জীব হত্যা নয়। জন্মনিরোধক যেসব ওষুধ ও সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয় তা প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ জীবকোষ বিনষ্ট করে, ঐ জীবকোষের সঙ্গে ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থার পার্থক্য অতি সামান্য। সুতরাং জন্মনিরোধ যদি নির্দোষ হয় তবে ভ্রূণবিলোপও দোষের নয়। ক্যাথলিকরা প্রতিটি শুক্রকীটকেও প্রাণ বলে মনে করেন এবং এই কারণেই তাঁরা জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধী। কিন্তু বাস্তব অবস্থার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারলে ঐসব সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা অর্থহীন ও ক্ষতিকর বলে মনে হবে।

লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মুহূর্তের ভুলে, প্রলোভনে পড়ে অনেক সময় অনেক মেয়ে যে বিপদে পড়ে তারও একটা আইন-সঙ্গত প্রতিকারের পথ থাকা দরকার। অনেক সময় অনেক হতভাগিনী ধর্ষিতা হয়েও চরম বিপদে পড়ে। আর ঐসব বিপন্ন অবস্থার সুযোগ নেয় অর্থলোলুপ চিকিৎসক ও অজ্ঞ হাতুড়ের দল। তা ছাড়া, যেকথা নিউ ইয়র্কের চিকিৎসকরা বলেছেন, গোপনে অতি দ্রুত ঐসব বেআইনী কাজ নিষ্পন্ন হয় বলে আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থার সুযোগ সবক্ষেত্রে নেওয়া সম্ভব হয় না। তার জন্য অনেক নারীর জীবনান্ত হয়, অনেককে সারা জীবন নানা রোগে ভুগতে হয়।

আইনকারদের এটা বোঝা দরকার যে, মাতৃত্ব যেক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নারীর অভিভাবকরা যেমন করে হোক তার অবসান ঘটান। তার জন্য তাঁরা হাজার হাজার টাকা ব্যয় করেন, জেলখাটার ঝুঁকি নেন, এবং বহুক্ষেত্রে অসহায় মেয়েটির মৃত্যুর কারণও হন। একমাত্র গর্ভবিনষ্টি আইনসিদ্ধ করেই এই অবাঞ্ছিত অবস্থার অবসান ঘটানো যায়। এতে ব্যভিচার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক, গর্ভবিনষ্টি আইন সঙ্গত হ'লেও অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব লজ্জার বিষয়ই থেকে যাবে।

আইওয়ান ব্লচ গর্ভবিনষ্টির সমর্থনে বলেছেন, বর্তমান রাষ্ট্র শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে তার জীবনকে পবিত্র জ্ঞান করে এবং কেউ তার আগমন প্রতিরোধে তৎপর

হ'লে তাকে শাস্তি দেয়। অথচ সেই শিশুই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সারাজীবন ধরে শোনে যে, সে জারজ, অসম্মানিত জীব। পিতার সম্পদ, এমনকি পদবীর উপরেও তা'র অধিকা'র রাষ্ট্র স্বীকার করে না। এই অসঙ্গতি হৃদয়হীন, অমার্জনীয়। যে প্রস্ফুটন অবাঞ্ছিত, অঙ্কুরে বিনাশই তার সঙ্গত পরিসমাপ্তি।

—•—

'নূতন জেলা-শহর বারাসত নূতন নয়'

শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল

বারাসত নূতন জেলার নূতন প্রধান শহর হচ্ছে। হালে জংশন ষ্টেশন হয়েছে। রেলগাড়ির বৈদ্যুতিকরণও হয়ে গিয়েছে। সরকারী প্রথম শ্রেণীর কলেজ, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, সিনেমা, ছেলেমেয়েদের অনেকগুলো স্কুল, ঘরে ঘরে, রাস্তায় ঘাটে বৈদ্যুতিক আলো, প্রতি পাঁচ মিনিটে কলিকাতাগামী বাস, আবার বসিরহাট, বনগাঁ, বারাকপুর, কল্যাণী প্রভৃতি স্থানে যাবার পীচের রাস্তা আর ঘন ঘন বাস। —তাই আমরা দেখতে পাই প্রতিদিন অগণিত পুরুষ ও মহিলারা ভিড় করছেন প্রতিটি বাড়ীতে। সকলের মুখে এক কথা—"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই—"

আজ শুনছি, বারাসতে আকর্ষণীয় জায়গাগুলোতে পাঁচ হাজারেও এক কাঠা জমি পাওয়া শক্ত হয়েছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বেও কিন্তু এই বারাসতে পাঁচ হাজারে এক বিঘা জমি কিনতেও মানুষ ইতস্ততঃ করেছে। তখন অবিশ্যি বৈদ্যুতিক আলো ছিল না—পীচের রাস্তাও ছিল না, আর ছিল না রাস্তার দু'ধারে সারি সারি দোকানে আলোর ঝলমলানি। রাস্তায় চলতে কনুই-এ কনুই-এ গুঁতোগুঁতিও হ'ত না। এমন কি, আজ যেটা শহরের কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ কোর্ট-কাছারি পাড়া, সন্ধ্যার পূর্ব্ব থেকেই সেখানে শেয়াল ডাকত। বিশেষ করে শীতের আ'র বর্ষার সন্ধ্যার পরে তখনকার জনবিরল রাস্তায় চলতে অনেকেরই গা ছম্ ছম্ করত। তখন বারাসত ছিল গ্রামীণ শোভায় সমুজ্জ্বল। তবু বলব, বারাসত নূতন শহর নয়। বারাসত প্রাচীন শহর—প্রাচীন তার মিউনিসিপ্যালিটি। এই অতীত দিনের বারাসত পরিক্রমায় আনন্দ আছে বই কি!

একজন পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী গল্প করছিলেন। বেশীদিনের কথা নয়—হয়ত বিশ বছরও হয় নি। বসিরহাট থেকে ফিরতি পথে বন্ধু বারাসতের মহকুমা শাসকের বাংলোয় ঢুঁ মেরে এক কাপ চা খেয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে যাবেন। দেগঙ্গায় এসে সূর্য্য ডুবেছে—সেখান থেকে মার্টিন কোম্পানীর রেলগাড়িতে এক ঘণ্টার পথ। বারাসত ষ্টেশনে নেমেছেন। যান-বাহনের বালাই নাই। খানিকটা রাত হয়েছে, টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে—অল্প অল্প ঝোড়ো হাওয়া। রাত্রির অন্ধকারে কে চিনিয়ে দেবে মহকুমা-শাসকের বাড়ী? চাঁপাডালীর মোড়ের খানিকটা আগে বাঁ দিকে রাস্তা শুনেছিলেন ভদ্রলোক। কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নেই। ঐ বাঁ দিকের ছোট রাস্তাটার দিকে থেকে থেকে শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে টর্চ্চও নেই। ঝাউ গাছের শোঁ শোঁ শব্দ —সামনে দিয়ে কি যেন একটা জানোয়ার ছুটে গেল—কর্কশ কণ্ঠে কি একটা পাখী ডেকে উঠল। ভদ্রলোক না পারেন এগুতে, না পারেন পিছুতে। দেশলাই-এর বাক্সটা প্রায় শেষ হ'ল। কিন্তু কয়েক গজ মাত্র এগিয়ে আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না—শুধু সরু একটা কাঁচাপাকা রাস্তা—দুই পাশে ঘন কালো বন। গলা ভিজাতে এসে, ভয়ে না হলেও, ভরসার অভাবে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন কেশে উঠ্ল। ভদ্রলোক চম্‌কে উঠলেন! অন্ধকারে দেখা যা'য় না এমন একটা লোক, পরনে একটা কালো হাফপ্যাণ্ট—হাতে দিশী একটি লণ্ঠন। লণ্ঠনটির দুই দিকে কাঁচের বালাই নেই—খবরের কাগজ লাগানো, আর দুই দিকে কাঁচ আছে, তবে তার অর্দ্ধেকটার বেশী কালি মাখান—ভিতরে মিট্ মিট্ ক'রে একটি কেরোসিনের লম্প জ্বলছে। হাকিমের মতন পোশাক দেখেই লোকটি বিনীতভাবে

একটি সেলাম ঠুকে নিজের পরিচয় দিল। সে সাহেবের বাড়ীর জমাদার—নাম হরি।

পা টিপে টিপে খানিকটা এগুতেই মস্ত বড় লম্বা কালোমত যে বস্তুটি রাস্তার এক পাশ থেকে অপর পাশে তির্য্যক গতিতে চ'লে গেল, তা দেখে মনে সন্দেহ রইল না যে, হরি দয়াময়—নতুবা হরি এল কেন সেখানে লণ্ঠন নিয়ে।

বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ী। নীচের তলা নির্জ্জন—শুধু একটি কোণের ঘরের বাসিন্দা হরি আর তার স্ত্রীর ভাই মতি।

ছোটবেলার স্কুলের বন্ধু, সুতরাং রাত্রিতে ছাড়া পেলেন না। ছাড়া না পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচে গেলেন—বাব্বা, আবার ঐ অন্ধকারে!

বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছে, পঞ্চমীর চাঁদ ঢলে পড়েছে। বিরাট্ বাড়ী, দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘেরা প্রশস্ত বারান্দায় মস্ত মস্ত নবাব-বাদশাদের বাড়ীর মতন পিলার। পিলারের কার্ণিসে পায়রা-দম্পতীদের পাখার ঝট-পটানি। যেখানে দুশো লোকের শয্যা রচনা চলে সেখানে একপাশে একটি ক্যাম্প-খাটের উপর তিনি শুয়েছেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। হাঁা, হঠাৎই বই কি। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে নাচের শব্দ! অনেকক্ষণ কান পেতে রইলেন তিনি। বাইরে আধ-আলো, আধ-ছায়ায় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণচূড়া, মেহগিনি, মহুয়া, ঝাউ গাছের সারি—যেন দত্যিরা সব দাঁড়িয়ে আছে। ভদ্রলোকটি পায়ের কাছে পড়ে-থাকা চাদরখানাকে ভাল ক'রে টেনে নিলেন।

পরদিন বন্ধু-পত্নীর কাছে তিনি এ-বাড়ীর পুরণো ইতিহাস শুনলেন। তিনি বললেন—

তখন প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ-ভারতের প্রথম গভর্ণর-জেনারেল স্যার ওয়ারেন হেষ্টিংস। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাতের কোঠায় একবার বিলেত থেকে ভারতে ফেরবার পথে জাহাজে তিনি জ্বরে পড়লেন। মিসেস মরিয়ম আসছিলেন একই জাহাজে তাঁর স্বামীর সঙ্গে। স্বামী সুস্থ ছিলেন—সেবার প্রয়োজন ছিল কম। পথে-পাওয়া আকাশচুম্বী বিরাট্ মর্য্যাদাসম্পন্ন বন্ধু লাট-বাহাদুর হ'লেন শয্যাশায়ী। বড়লোকের কাণ্ডই আলাদা, কোন কিছুতেই অল্পে সন্তুষ্ট হন না। ভুগলেন বেশ কিছুদিন। মহিলা-বন্ধুর কাছ থেকে সেবাও পেলেন প্রচুর। সেবার ত্রুটি ছিল না—সুতরাং কৃতজ্ঞতারও ত্রুটি হ'ল না। ভারতে ফিরে এসে বন্ধুত্ব হ'ল গভীর ভারত মহাসাগরের মত। স্বামী বেচারি একা ফিরে গেলেন দেশে।

বিশ্রাম নিতে এসে জায়গাটি তাঁর ভাল লাগল। রাজধানীর অদূরে—মাত্র সাত ক্রোশ দূর, পছন্দ হ'ল এই বারাসত। বারাসত কথাটি উর্দ্দু শব্দ। অর্থ হচ্ছে প্রশস্ত পথ। বারাসতের উপর দিয়ে—অতি প্রাচীন আমল থেকেই ছিল যশোহর আর বসিরহাট, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে যাবার প্রশস্ত রাস্তা। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিশাল বিটপী-শ্রেণী। এই রাজপথের সমৃদ্ধি থেকেই এই শহরটি নাম পেয়েছিল বারাসত।

এই বারাসতে নেওয়া হ'ল দেড়শত বিঘা জমি। খনন করা হ'ল সাত-সাতটি সরোবর। আর নির্ম্মিত হ'ল বিরাট্ এক প্রাসাদ। সব ঘরের মেঝে পাকা হ'লেও, নাচ-ঘরের মেঝে হ'ল কাঠের। চল্লিশ ইঞ্চি পুরু দেয়াল, দশফুট উঁচু দরজা—কি কাঠের তৈরি জানা নেই। কিন্তু দুশো বছর পরে আজও মনে হয় যেন সাদা পাথরের তৈরি—যেমন ভারী তেমনি মজবুত।

মরিয়ম বিবি এখানেই রয়ে গেলেন। প্রতীক্ষারতা মরিয়ম—লাটবাহাদুর আর তাঁর বন্ধুরা আসতেন প্রকাণ্ড জুড়ি গাড়ি ক'রে লটবহর নিয়ে সপ্তাহ-শেষের ছুটির দিন উপভোগ করতে। কত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা 'রাজা বাহাদুর' খেতাব লাভ করেছেন, আর পরগণার পর পরগণার' মালিক হয়েছেন—এই সপ্তাহ-শেষের মধুর দিনগুলোর খুশির খোরাক জুগিয়ে। সাগর পারে বার্ক সাহেবের বিখ্যাত অভিযোগে এই সব কত কিছু কীর্ত্তি-কলাপ ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। কিংবদন্তী আছে, এই ঐতিহাসিক স্বপ্নপুরী থেকে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসীর হুকুম দিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন যে জজসাহেব, সেই স্যার ইলাইজা ইম্পের বাড়ী এরই সন্নিকটে—যেখানে বর্ত্তমানে মহকুমা শাসকের আদালত। এই বাড়ী পর্য্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ পথ ছিল বিবি-সাহেবাদের নাচের পোষাকে যাতায়াতের জন্য।

কেবল বন্ধু-পত্নী নয়, অনেকের মুখ থেকেই শোনা গল্প। ইতিহাস ব'লে কেউ ভুল করবেন না।

অনেকে বলে থাকেন, মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুমের পরে মহারাজকে নির্জ্জন বাসে রাখা হয়েছিল এই মহকুমা-শাসকের বাড়ীর নীচের তলায় একটি ঘরে—যেখানে আজ ইলেকৃশন অফিস। আবার একথাও প্রচলিত আছে যে, টিপু সুলতানের ছেলেকেও নাকি ঐ ঘরেই রাখা হয়েছিল। প্রাচীনরা বলেন, আজও নিশুতি-রাতে ঐ ঘর থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায়।

সেদিন কি ছিল, আজ কি হয়েছে বলতে গেলেই অনেক কথা এসে পড়ে। লাট বাহাদুরের সখ ছিল।

আজ যেখানে নেতাজী পার্ক হয়েছে—সেই হাতী পুকুরের মাঝখানে আছে ছোট একটি দ্বীপ—পারের সঙ্গে সেতু দিয়ে যুক্ত। সেই দ্বীপটির চূড়ায় একটি নিভৃত কুঞ্জ আছে। লাটসাহেব এখানে বিশ্রম্ভালাপ করতেন।

হেষ্টিংস সাহেবের অবসরবিনোদের এই প্রশস্ত বারান্দা দেখে, আজ মনে করতে ভাল লাগছে—একদা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র এই প্রশস্ত বারান্দায় আলবোলা হাতে আরাম-কেদারায় বসে বই লিখে গিয়েছেন। কি বই লিখেছিলেন জানি না, কিন্তু এই বারাসতে তিনি হাকিম হয়ে এসেছিলেন দু'বার। একবার ১৮৭৪ সালে, আর বার ১৮৮১ সালে। লিখবার মত জায়গা বটে! চতুর্দিকে সবুজের সমারোহ, কত রকমের গাছ, কত বিচিত্র বর্ণের পাখী—একটা ভাব-গম্ভীর নিস্তব্ধতা!

বারাসতের আর একখানা কোম্পানী আমলের বাড়ী—বারাসতের জেলখানা। এ বাড়ীখানা ছিল বড়লাট বাহাদুরের কাউন্সিলর ভ্যান্‌সিটার্ট সাহেবের সপ্তাহ-শেষের দিনে অবসর উপভোগের আসর। একেই বলে বিধাতার পরিহাস! যে প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল রাজধানীতে হাঁপিয়ে-ওঠা অবরুদ্ধ-মনের অর্গলমুক্ত স্বাধীন বিচরণের জন্য, আজ সেই প্রাসাদই পরিণত হয়েছে শতাধিক মানুষকে তাদের দেহ-মন শুদ্ধ আবদ্ধ ক'রে রাখার প্রাচীর-ঘেরা পিঞ্জরে। লৌহ কপাটের অন্তরালে গুমরে মরছে অপরাধের ছাপমারা সব মানুষ। মস্তবড় তেতালা বাড়ী, আর তার চারদিকে বিস্তীর্ণ জমি—এই বারাসতের জেলের অধিবাসীদের তৈরি সব শাকসব্জী গাড়ি বোঝাই হয়ে যাচ্ছে দমদম আর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে।

জেলখানার উল্টোদিকে বারাসত সরকারী উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় আর রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়। মহাবিদ্যালয়টি হাল আমলের, কিন্তু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টি বহু পুরাতন। প্রতি জেলা শহরে একটি সরকারী জেলা স্কুল ছিল। বারাসত সরকারী স্কুলটি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

বারাসত শহর যে নূতন জেলার শহর হচ্ছে তা নয়। ১৮৬০ সাল পর্য্যন্ত বারাসত জেলার প্রধান শহর ছিল, এবং সাতক্ষীরা মহকুমা—যা আজ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত, যেখানে বিনা ছাড়পত্রে গেলে আজ অপরাধ হয়। সেই সাতক্ষীরাও ছিল বারাসত জেলার অন্তর্ভুক্ত।

১৮৪৬ সাল। যাদের চুল পেকেছে এবং তাদের অনেকের বাবাদের কাছেও সুপরিচিত প্যারীচরণের ফার্ষ্ট বুক। সেই প্যারীচরণ সরকার ছিলেন তখন বারাসত সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ঐ সময়ে কালীকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি চিরস্মরণীয় যে সব মনীষীরা বারাসতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন—প্যারীচরণ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এই বালিকা বিদ্যালয়টি প্রথম আরম্ভ হয়েছিল মাত্র তিনটি বালিকা নিয়ে। যে তিনটি বালিকার অভিভাবকরা তাদের মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়েছিলেন, তখনকার গোঁড়া সমাজপতিরা সাহেবিয়ানার অপরাধে তাদের নিপীড়নের ত্রুটি করেন নি। আজ সেই বারাসতে তিন তিনটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আর ডজন খানেক বুনিয়াদি আর প্রাথমিক বিদ্যালয় বারাসত শহরের কয়েক সহস্র মেয়েদের স্থান দিয়েও বহু মেয়েকে বিমুখ করতে বাধ্য হচ্ছে।

বারাসতবাসী গৌরবের সঙ্গে দাবী করবে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে বারাসতের প্রাচীনত্ব। বাংলার রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর বিখ্যাত বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জন-ড্রিঙ্ক-ওয়াটার বেথুন সাহেব উক্ত স্কুলের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে তদানীন্তন বড়লাট বাহাদুরের নিকট যে পত্র দিয়েছিলেন, সেই পত্রে উল্লেখ আছে বারাসত মহকুমার তিনটি বালিকা বিদ্যালয়ের—যথা বারাসত বালিকা বিদ্যালয়, নিবাধই (দত্তপুকুর) বালিকা বিদ্যালয় এবং ছোট-জাগুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং বেথুন সাহেব বারাসত এসে দেখে গিয়েছিলেন বারাসতের বালিকা বিদ্যালয়। বেথুন স্কুলের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত বারাসতে স্ত্রী-শিক্ষার উদ্যোক্তাগণকে জানাই আজ প্রণাম।

কোম্পানীর আমলে এবং তারপরে বারাসত বহু বিষয়ে যে প্রাধান্য লাভ করেছিল তা যে কোন মফঃস্বল শহরের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। কোম্পানীর আমলে যে-সব ইংরাজ যুবক সৈন্য বিভাগে যোগ দেবার জন্য আসত, তাদের শিক্ষার কেন্দ্র ছিল এই বারাসত—এক কথায় বলা চলে যে, বারাসত ছিল তখনকার স্যাণ্ডহার্ষ্ট।

বারাসতের চৌধুরীপাড়া আর দক্ষিণ পাড়ায় ছিল জমিদার আর সব বনিয়াদী পরিবারের বাস। বহু পুরাণো বাড়ীর পুরাণো আমলের পাতলা ইট তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। শহরের উত্তর-পূর্ব্বাংশে কাজীপাড়ায় ছিল বহু খানদানী মুসলমান-পরিবারের বাড়ী। কাজীপাড়ার পীরসাহেবের দরগা বহু পুরাতন। পীরসাহেবের এখানে শুভাগমন ও সমাধির ইতিহাস আছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্মানভাজন ছিলেন পীর একদিল শাহ্ সাহেব। প্রতি বৎসর পীরসাহেবের মেলা তার সাক্ষ্য বহন ক'রে চলেছে। দাদুরা তাঁদের নাতি-নাত্‌নীদের হাত ধরে মেলায় ঘুরে বেড়ান, খেলনা

কিনে দেন আর তার ফাঁকে ফাঁকে বলে চলেন পীর-সাহেবের পুণ্য কাহিনী।

আর আছে রথতলায় রথের মেলা। কতদিনের এই রথের মেলা—কতকাল ধ'রে চ'লে আসছে এই রথের মেলায় বন-মহোৎসবের মহড়া, তার হিসেব কেউ জানে না।

শহরের মাঝখানে শেঠ পুকুরটি কোন্ শেঠজী করেছিলেন জানি না। তবু শেঠ পুকুর আজও এক অজানা শেঠজীর স্মৃতির ভার বহন করছে। যেখানে স্নান ক'রে আজ কত নর-নারী প্রতিদিন পাশের রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ মন্দিরে প্রণাম জানাচ্ছে।

যেখানে আমরা মনোরম রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম দেখতে পাচ্ছি, আজ থেকে এক শতাব্দী পূর্ব্বে ঐখানটায় ছিল পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণির জমিদারীর কাছারি বাড়ী। ঐ কাছারি বাড়ীতেই বাস করতেন সপরিবারে রাণী রাসমণির আম-মোক্তার রামকানাই ঘোষাল মহাশয়। সাধক রামকানাই-এর পুত্র তারকনাথ আমাদের বারাসতের গৌরব, ভগবান পরমহংসদেবের অন্যতম পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ—যাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'মহাপুরুষ মহারাজ'। এই মহাপুরুষ মহারাজের জন্মধন্য বারাসতের ধূলিকণা আজ মহানগরীর প্রাসাদ-বাসীদেরও টেনে আনছে বারাসতে আশ্রমের আঙিনায়।

কলা-শিক্ষাবিষয়ক পত্রাবলী

অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

(Introductory Note)

বহু বৎসর পূর্ব্বে, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার কিছু পরেই, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ে, ভারতীয় কলা-শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য "কলা-ভবন" প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ৺অসিতকুমার হালদার। তাঁহার পরে, অনেক বৎসর অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন ডাঃ নন্দলাল বসু। "কলাভবনে" নন্দলালকে সাহায্য করিয়াছেন একাধিক প্রতিভাধর অধ্যাপক। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন কুমার ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা। কলাভবনে ভারতীয় কলার মূল সূত্রের শিক্ষালাভ করিয়া, ডিপ্লোমা বা মানপত্র লইয়া দেশ বিদেশে অনেক শিল্পী নিজস্ব সাধনার পথে যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য হইলেন, শ্রীযুক্ত ভি. এস. মাশোজী, শ্রীরামকিঙ্কর বৈজ, শ্রীকৃপাল সিং, ৺রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীইন্দুভূষণ রক্ষিত প্রভৃতি। কলাভবনের শিক্ষা-পদ্ধতি অত্যন্ত কার্য্যকরী প্রশংসনীয় পদ্ধতি। যাহার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভারতীয় কলার ভিত্তিগত বৈশিষ্ট্যে, শিক্ষার্থী বিশেষ শিক্ষালাভ করেন অথচ শিক্ষার্থী তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারান না। মধ্যে মধ্যে কলাভবনের শিক্ষার্থীরা অভিনব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। তাহার কিছু পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত পত্রাবলীতে পাওয়া যাইবে।

কুমার ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ
'কলাভবন', 'বিশ্বভারতী'
শান্তিনিকেতন

বৃহস্পতিবার
১১।২।৬৫

স্নেহাস্পদেষু,

সম্প্রতি শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্র একজন জাপানী শিল্পী, নাম মিৎসুক হিরাণো কলিকাতায় তাঁহার ছবির প্রদর্শনী করিয়া গেলেন। তিনি আমায় বলিলেন, তিনি Tokyo Art School-এ শিক্ষিত এবং কলাভবনের তিন জন আর্টের অধ্যাপকের নিকট ভারতীয় চিত্রকলা শিক্ষা করিতেছেন—এই তিন জন অধ্যাপক কে কে? তুমি, ও আর তিন জন কলাভবনের অধ্যাপক কি তাঁহার কলিকাতায় প্রদর্শিত চিত্রগুলি দেখিয়াছেন? যদি না দেখিয়া থাকেন তবে অবিলম্বে সেগুলি দেখা উচিত। চিত্রগুলি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই চিত্রগুলি দেখিয়া তোমার মন্তব্য ও মতামত শীঘ্র আমাকে লিখিয়া পাঠাইবে। আমার "আত্মজীবনী" বাংলা সাপ্তাহিক "অমৃতে" ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে, পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

ভবদীয়
শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন
পশ্চিম বাংলা
১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বহুদিন পরে আপনার ১১ই ফেব্রুয়ারী লিখিত পত্র যথাসময়ে পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। জাপানী শিল্পী ও কলাভবনের ছাত্র মিৎসুক হিরাণোর ছবির প্রদর্শনী দেখেছেন বলে মনে হচ্ছে। হিরাণোর ছবির বিষয়ে আপনি আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। ভেবেছিলাম আপনার বিজ্ঞ অভিমত চিঠিতে জানতে পারব, কিন্তু আপনি এ বিষয়ে কিছুই উচ্চবাচ্চ করেন নাই। হিরাণোর যে ছবিগুলি প্রদর্শিত হল তার সম্বন্ধে আপনাদের সে কি বলেছে জানি না, তবে এ বিষয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। কলাভবনে সে যে ছবি আঁকা শেখে তার সঙ্গে এই ছবিগুলির কোন সম্বন্ধ নেই। অবসর সময়ে তার নিজের রুমে বসে বসে এই চিত্রগুলি সে এঁকেছে, এইগুলি তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবনার রূপ। হিরাণোর প্রদর্শনীর বিষয়ে Statesman-এ ও দেশ পত্রিকায় সমালোচনা দেখলাম।

চিত্রে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে সৃষ্টির কাজ যেখানে চলছে সেখানে নূতনের প্রতি, বৈচিত্রের প্রতি একটা স্বাভাবিক ঝোঁক রয়েছে, যদি এ না থাকতো তার সৃষ্টির কাজ হত না কিন্তু কেবল পুনরাবৃত্তি হত। নূতনের সন্ধানই হচ্ছে সৃষ্টির উৎস। শিল্পের ইতিহাস তাই প্রমাণ করছে। আমরা যদি শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করি তবে দেখতে পাব বর্ত্তমান যুগের শিল্প হচ্ছে অত্যন্ত Individual Art. একজন শিল্পীর কাজের মধ্যে শিল্পীর নিজস্ব রূপটির রঙ থাকা চাই অথবা এই ভাবেও বলতে পারি তার শিল্পের যে subject সেটা প্রধান নয়, সেটা অবলম্বন মাত্র কিন্তু শিল্পীর যথার্থ রূপটিই প্রকাশ পাওয়া চাই। আমি কতকগুলি আর্টকে সাধারণত Illustrative Art বলি, সেখানে সর্ব্বদা subjectকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। Early Christian Art—সেখানে মেডোনা, খ্রীষ্ট প্রধান কিন্তু শিল্পী তাঁর skill কম-বেশী দেখাবার সুযোগ পেয়েছে এক একজন শিল্পী তাঁদের প্রতিভার তারতম্যে। শিল্পীর যথার্থ রূপটি সেখানে প্রধান নয়। রেণাসাঁস্ যুগেও তাই, তার পর ধীরে ধীরে বহু প্রকার ইজমের কোঠা পার হয়ে এসে এখন শিল্পীরা যেন বলছে এত দিন ত ধর্ম্ম, সম্রাট, যুদ্ধ, বীরের বা অন্যান্য প্রধান ব্যক্তি বা ঘটনাকেই রূপ দিলাম, কিন্তু আমার ভেতরে যে রূপটি কেবলমাত্র আমারই তাকে কিন্তু ফোটান হল না। ভারতীয় শিল্পেও তাই অজন্তার—বুদ্ধ, রাজপুত চিত্রে - কৃষ্ণরাধা, মানুষের প্রেম ইত্যাদি, মুঘলে—সম্রাট বেগম এই সব চিত্রই Illustrative motive নিয়ে আঁকা। বর্ত্তমান শিল্পে বলছে পূর্ব্বে যে অবলম্বনকে আশ্রয় করে (subject) চিত্র আঁকা হয়েছে, তা আর নয়; এখন শিল্পীর ভাবনা, নিজের রূপটির পরিচয় দিতে হবে। প্রকৃতিকে দেখছি কিন্তু সে যখন canvas-এ প্রকাশ পাবে তখন শিল্পীর নিজস্ব রূপের সংস্পর্শে Abstraction আকার পাবে। সেখানেই শিল্পীর রঙের ছোঁয়া পেল। ভাল রাঁধুনি যখন আলু, কপি, বেগুন সবকে একত্রে রেঁধে পাতে পরিবেশন করল তখন স্বাদে বুঝা যায় কোন্‌টি আলু, কোন্‌টি কপি বলে অথচ তাদের পরিচয় রান্নার ধরনে—যেমন ডালনা, কারি ইত্যাদিরূপে। এই যে তরকারির অর্থাৎ আলু-কপির নিজস্ব রূপের খানিকটা বিলোপ, এই বিলোপই হয় শিল্পীর রঙের (colour বা রূপের) সংস্পর্শে। তবে এই Abstraction-এর সীমা কতদূর যাবে এটাই প্রশ্ন। হিরাণোর চিত্রে কতগুলি রঙ ক্যানভাসে ছড়ান, এতে চিত্র বলা চলে কি না জানি না। একটি পিয়ানোতে যেখান-সেখান থেকে সুরের কতগুলি আঘাত করলাম, এতে সঙ্গীত হয় কি না জানি না। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করব। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করবেন। ইতি—

বিনীত
ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ

পুনঃ হিরাণোর চিত্র দেখে আপনার মনে যে চিন্তার (Reaction) উদয় হয়েছে তা আমাকে জানাবেন। আমি পরে ভাল ভাবে আমার মতামত জানাব। ইতি—
ধীরেন

কুমার ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা
অধ্যাপক: কলাভবন শুক্রবার ১৯।২।৬৫

পরম স্নেহাস্পদেষু
কুমার বাহাদুর,

তোমার ১৭ই ফেব্রুয়ারীর পত্র পড়িয়া অত্যন্ত সুখী ও আনন্দিত হইয়াছি।

মিৎসুকু হিরাণো আমাকে বলেছিলেন যে তিনি কলাভবনের তিনজন অধ্যাপকের নিকট ভারতীয় চিত্র-শিল্প শিক্ষা করেছেন। আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে—তিনি যে চিত্রগুলি কলিকাতার প্রদর্শনীতে দেখিয়ে গেলেন, সেগুলি তাঁহার কলাভবনের অধ্যাপকদের কি দেখিয়েছিলেন? এখানে সেগুলি দেখাবার আগে, বিশ্বভারতীতে প্রদর্শনী করে, দেখান নাই কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেলে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

তিনি যে ছবিগুলি কলিকাতায় দেখিয়ে গেলেন—তাহার মধ্যে কি জাপানী, কি ভারতীয় চিত্র-রীতির কোনও আদর্শ বা সূত্রের (element) বা ধারার (tradition) কোনও চিহ্নই বিদ্যমান নাই। অর্থাৎ, তিনি এই দুই রীতির কলা-শিল্পকেই পদদলিত করে এক নূতন রীতির উদ্ভাবন করেছেন। ইহা খুবই আনন্দের ও গর্ব্বের কথা। কারণ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর শিক্ষা-পদ্ধতি কোনও শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তার বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং, আমি আশা করিয়াছিলাম যে হিরাণোর চিত্রাবলীতে একটি নূতন স্বাধীন রীতির পরিচয় পাইব।

ইহার দৃষ্টান্ত আছে আকবর বাদশাহার চিত্রশালায় নূতন রীতির উদ্ভাবনে। বাদশাহ ২।৩ জন পারসীক

ওস্তাদদের এদেশে এনে, প্রায় ১২০জন ভারতীয় চিত্রশিল্পীকে শিক্ষায় ও সাধনায় নিযুক্ত করেছিলেন। বাদশাহার দরবারী চিত্রকরগণ যে রীতির উদ্ভাবন করিলেন—তাহা পারসীক রীতির পুনরুক্তি নহে, ভারতীয় রীতিরও পুনরুক্তি নহে,—পরন্তু এক নূতন রীতির সৃষ্টি, যাহার নাম "মুঘল-রীতি"।

হিরাণোর চিত্র সমীক্ষণ করিয়া দেখিলাম—তিনি স্বাধীনতার পথে, কোনও নূতন রীতির উদ্ভাবনা করিতে পারেন নাই,—তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা য়ুরোপের Ism-বাদী কলাশিল্পের অন্ধ অনুকরণ। কলা-সৃষ্টির পথে তিনি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অনেক চিত্রই "চিত্র" নামের যোগ্য নহে। তুমিই লিখিয়াছ যে, "হিরাণোর চিত্রে কতকগুলি রঙ ক্যান্‌ভাসে ছড়ান—একে ছবি বলা যায় কি না জানি না।" তোমার এই মন্তব্যেই হিরাণোর চিত্র-সৃষ্টির সঠিক মূল্যায়ন ও বিচার হইয়া গিয়াছে।

আর একটা বক্তব্য এই—অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার নূতন সৃষ্টিতে ভারতীয় চিত্র-রীতিকে অস্বীকার বা অবমাননা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য-রচনায় প্রাচীন বাংলা ভাষাকে বর্জ্জন করিয়া ফরাসী বা জার্ম্মান ভাষায় কাব্য রচনা করেন নাই। বাংলা দেশের বোধগম্য ভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন।

হিরাণো—জাপানী চিত্রের ভাষা এবং ভারতীয় চিত্রের ভাষা—এই দুই ভাষাকেই অস্বীকার করিয়া, অপমান করিয়া, য়ুরোপের ফরাসী ও জার্ম্মানীর অতি আধুনিকদের ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন। কোনও নূতন ভাষা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই এই আমার অভিমত।

আর একটা কথা হইল,—চিত্রকলার ভাষা ভাব-বিনিময়ের ভাষা, ভাব-প্রকাশের ভাষা, এই ভাষা অন্ততঃ অভিজ্ঞ রূপ-রসিকদের বোধগম্য হওয়া উচিত। একটা কথা আছে—Art is communication. হিরাণোর চিত্রাবলীতে কোনও communication নাই। তথাকথিত স্বাধীনতার উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খলতা।

কলাভবনের শিক্ষার ফলে, যদি এই রীতির উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়—তাহা হইলে, কলাভবনের শিক্ষা-পদ্ধতি ঠিক পথে চলিতেছে কি না তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। হয় কলাভবনের শিক্ষা এখন ভুল পথে চলিতেছে, কিংবা নূতন শিক্ষার্থীরা কলাভবনের শিক্ষার অবমাননা করিতেছেন। তোমার কাছে এই পত্রের উত্তর পাইলে আমি মাননীয় উপাচার্য্য মহাশয়ের নিকটে এই বিষয়ে আমার আবেদন জানাইব। একটা কথা আছে—A tree is known by its fruits—গাছের ফল দেখিয়াই গাছের উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার করিতে হয়।

জাপানের ঋষি ও সুবিখ্যাত শিল্প-গুরু কাকাসু ওকাকুরার সাবধান বাণী আমি স্মরণ করিতেছি—"Victory from within, or Mighty death from without !"

আশা করি তুমি আমার মন্তব্য স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া, আমার যদি ভুল হইয়া থাকে তাহা দেখাইয়া দিয়া, শীঘ্র এই পত্রের উত্তর দিবে।

তোমার গুণমুগ্ধ
শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন
পশ্চিম বাংলা,
২১।২।৬৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ১৯শে ফেব্রুয়ারীর চিঠিখানি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। আপনার বিস্তারিত বক্তব্যে উপলব্ধি করতে পারছি যে, হিরাণোর চিত্র দর্শনে আপনাকে একটু চিন্তিত করেছে। তার প্রধান কারণ সে জাপান থেকে এসেছে বলে—যে জাপান আমাদের নিকট পরিচিত স্বর্গীয় ওকাকুরা, তাইকানসান, আড়াইসানের মাধ্যমে। জাপানের কৃষ্টি আমাদের মনে বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে একটি স্থান দখল করে আছে। ওকাকুরার The Book of Tea, লরেন্স বেনিয়নের The Flight of Dragone ইত্যাদি এবং গুরুদেবের মুখে জাপানের বহু সুখ্যাতি শুনে ঐ দেশের প্রতি বিশেষ একটি উচ্চ ধারণা মনে পোষণ করি। দ্বিতীয় যুদ্ধে জাপান পরাজিত হ'লে younger generation-দের মনে একটা Inferior Complex দেখা

দিয়েছে। এই নবীনের দল জাপানের মহান্ আত্মার উপলব্ধির চেয়ে পশ্চিম, বিশেষ করে আমেরিকার, হাল-ফ্যাশান নকল করবার উৎসাহী। ১৯৫৪ সনে জাপানে গিয়ে আমার এই ধারণা হয়েছে। হিরাণো এই নবীনেরই একজন। জাপানের কৃষ্টি বিষয়ে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করি তখন উত্তরে প্রায়ই বলে, জানি না। সেই কারণে হিরাণোর কাজে আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি না। পূর্ব্ব পত্রে আমি লিখেছি যে, কলাভবনে ও যা শেখে তার সঙ্গে প্রদর্শিত চিত্রগুলির কোন সম্বন্ধ নেই, সে ঘরে বসে বসে নিজেই এঁকেছে। আমি তাকে অনেকবার বলেছি কলকাতায় প্রদর্শনী করার পূর্ব্বে কলাভবনে প্রদর্শনী করে আমাদের সকলকে দেখাতে। কিন্তু সে রাজি হয় নি। এতে আমার মনে হয় তার মনে কোনপ্রকার দ্বিধা আছে। হয়ত বা এই শিল্প-সৃষ্টিতে সে sincere নয়, শুধু ফ্যাশানের আবেগে এইগুলি এঁকেছে। Sincere হ'লে সাহসী হ'ত। শিল্পের সৃষ্টিতে জাপানীজ বা ভারতীয় দুই হবে না কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতির সৃষ্টি হবে তার দ্বারা। এটা ওর নিকট আশা করা বৃথা। কারণ সে এখনও ছাত্র, বহু চিত্র তাকে আঁকতে হবে, এবং একটি পদ্ধতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকতে হবে বা বিশ্বাসী হ'তে হবে। যে-কোন পদ্ধতির প্রতি গভীর বিশ্বাসী প্রথমে হওয়া এটাও একটা সাধনা। যে লোক এক পদ্ধতির প্রতি বিশ্বাসী তার পক্ষেই অন্য পদ্ধতির প্রতি যদি আকৃষ্ট হয় তবে তার প্রতি শ্রদ্ধাবান ও বিশ্বাসী হ'তে পারে। কিন্তু যে অবিশ্বাসী সে কি করে যে-কোন পদ্ধতির প্রতি বিশ্বাসী হবে। হাল ফ্যাশানকে নকল করা সহজ। আপনি লিখেছেন হিরাণো কলা-ভবনের শিক্ষাকে অবমাননা করেছে। এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার এক মত। কে হিসাব নেবে যে ভারতীয় অর্থে সে ভারতীয় চিত্র-শিক্ষা করতে এসে কতদূর ভারতীয় অঙ্কনপদ্ধতি আয়ত্ত করল। আপনি আরও যে সব মন্তব্য করেছেন তার সঙ্গে আমার দ্বিমত নেই। আমি শুধু কতগুলি কথা ভাবি এই বিদেশী scholar দের সম্বন্ধে। তারা কি কি গুণে এই সব বৃত্তি লাভের অধিকারী হয়? কে তাদের নির্ব্বাচন করে? আরও কি ভাল মেধাবী ছাত্র পাওয়া যেত না? এই ধরনের বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতের কাজ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে তারা যে-সব Art School বা College-এ শিক্ষালাভ করবে তাদের কর্তৃপক্ষদের দেখিয়ে একটা মতামত গ্রহণ করা উচিত নয় কি? বৃত্তিধারী যে course-এ ভর্ত্তি হ'ল সে course complete না করে চলে যেতে পারে কি না? গেলে গবর্ণমেণ্ট কি করতে পারেন এই বৃত্তিধারীকে নিয়ে? এই সব সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কতদূর thorough তা জানি না।

আমার পূর্ব্ব পত্রে লিখেছিলাম Modern Art-এর এখন একটি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে অঙ্কন-বিষয়কে Abstraction পরিণত করা। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পী, এমন কি Folk Artist রাও এই রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। আহ্লাদী-পুতুল Abstraction-এর একটি প্রতীক। হেনরি মুরও Figure কে Abstraction করেছেন। প্রথমটির Abstraction হ'ল feeling-এর থেকে, দ্বিতীয় Abstraction হ'ল intellectual থেকে। আলপনাও একটি অপূর্ব্ব Abstraction.

অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি। আশা করি শারীরিক কুশলে আছেন। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করবেন। ইতি—

বিনীত
ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্ম্মা

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালীর সম্মান—

একটি বিশেষ সমাবর্ত্তনে নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ এবং ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে সম্মানিত করা হইয়াছে—এই সংবাদে সুখী হইলাম। সংস্কৃত কলেজে অনুষ্ঠিত এই সমাবর্ত্তনে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ উপস্থিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি কথা মনে হইতেছে যে—এই অনুষ্ঠানে বাঙ্গলার একজন সর্ব্বোচ্চ মনীষী সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়কে উপেক্ষা করা হইয়াছে। ইহা শোভন হয় নাই। আধুনিককালে সংস্কৃত, পালি ও তিব্বতী ভাষায় এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্রে সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় পণ্ডিত বিরল। বিহার তাঁহাকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধাররূপে সমাদরের সহিত লইয়া গিয়াছিল। রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত যে সম্মান তিনি লাভ করিয়াছেন তাহার জন্য বিহার সরকার অনুরোধ করিয়াছিল, বাঙ্গলা সরকার নহে। তিনি এখন অবসর গ্রহণ করিয়া বীরভূমে স্বগ্রামে বাস করিতেছেন। রেল ষ্টেশন হইতে আট মাইল দূরে তাঁর বাড়ীতে সিংহল এবং জাপান হইতে বহু গবেষক ছাত্র আসিতেছে। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশও ছাত্র পাঠাইতেছে। বাঙ্গলা সরকার এ বিষয়ে উদাসীন থাকা স্বাভাবিক, কারণ তাঁহাদের মধ্যে পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবার মত লোকের একান্ত অভাব। আধুনিক বাঙ্গালী জ্ঞান তপস্যা ছাড়িয়াছে। জ্ঞান তপস্যার মর্য্যাদাবোধও হারাইয়াছে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ গৌরীনাথ শাস্ত্রী ইহা এবার প্রমাণ করিয়া দিলেন।—

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে—বাঙ্গলা-রাজ্য-সরকারকে এই বিষয়ে নিন্দা না করাই ভাল। কারণ এই রাজ্য সরকারের কর্ণধার যাঁহারা তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবার মত সময় নাই। দরিদ্র প্রজাবৃন্দের কল্যাণ চিন্তাতেই ইঁহারা অতি বিব্রত এবং ইহার উপরেও আছে দুর্গাপুরের মহা উৎসব, মায়াপুরে মায়ার-খেলা প্রভৃতি বিষম জনকল্যাণমূলক অনুষ্ঠানাদি। তাহা ছাড়া অন্ধের নিকট হইতে আলোর মর্য্যাদা স্বীকার আশা করাটাই একান্ত বুদ্ধিহীনের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

হিন্দীর জয়যাত্রা—

অহিন্দী এলাকায় হিন্দীর বিরুদ্ধে প্রবল জনমত থাকা সত্ত্বেও দিল্লীর নব-বাদশারা বিবিধ প্রকারে এবং কৌশলে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালাইবার সুখ-স্বপ্নে বিভোর রহিয়াছেন। হঠাৎ আমাদের চোখে এমন একটি বিষম মনোহর বস্তু পড়িয়াছে—যাহাতে বুঝিতে আর কষ্ট হইতেছে না যে, সত্যই হিন্দীর রাজ-ভাষা হইবার যোগ্যতা অর্জ্জিত হইয়াছে এবং সে-বিকট যোগ্যতার ঠেলা বেচারা ভগবানও অনুভব করিতে বাধ্য হইয়াছেন!

'হিন্দী-পাঠমালা'—পঞ্চম শ্রেণীর একটি পাঠ্য-পুস্তক। এই পাঠ্য-পুস্তকে বিশ্ববিখ্যাত হিন্দী কবির 'ঈশ্বর' নামক একটি কবিতা আছে। কবিতার পঞ্চম স্তবকটি দেখুন!

হে ঈশ্বর! তু ক্যায়সা হোগা!
লাড্ডু য্যায়সা পীলা হোগা,
বরফোঁ সা চমকিলা হোগা।
খরবুজে সা মোটা হোগা।
রসগুল্লে সে ছোটা হোগা?
হে ঈশ্বর! তু ক্যায়সা হোগা?

'হিন্দী পাঠমালা' নামক শিশুপাঠ্য পুস্তকে এই প্রকার ভক্তিমূলক কবিতা অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। এই 'ঈশ্বর' নামক হিন্দী কবিতাটিকে কেহ যেন ঈশ্বরকে ভ্যাংচান বলিয়া মনে করিবেন না। কারণ লেখক কবি এবং একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভগবান-ভক্ত! তবে কবিতাটি রচনার কালে—

—কবি বোধ হয় কয়েকটি যথোপযুক্ত এবং সম্ভাব্য

উপমা অনেক গবেষণা করিয়াই বাহির করিয়া আবিষ্কারের আনন্দে হইয়াছেন আত্মহারা! সুতরাং তাঁর আনন্দের ভাগীদার সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের না করিলে চলিবে কি করিয়া? 'লাড্ডুর' বৈশিষ্ট্য 'মিঠা' নহে—'পীলা'; 'বরফো' ঠাণ্ডা নহে—'চমকিলা'; 'খরবুজা' সরস নহে,—'মোটা'! আর 'রসগুল্লে'? কি আর বলিব? ইহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য 'ছোটা'! দুর্ভাগ্য! 'একটা নতুন কিছু করার' উন্মাদনায় লেখক যথাসম্ভব ও যথা অসম্ভব কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন, কিন্তু সে সব 'উৎপাদন' পঞ্চম শ্রেণীর বালক-বালিকাদের যে সব সময়ে হজম হয় না তার প্রমাণ ঐ 'ঈশ্বর' কবিতাটি। এ যেন 'ঈশ্বর' বিষয়ে কোন কবিতার প্যারোডি। কবিকে অভিনন্দন জানাইয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করি—

"হে ভগবান, কবিকে পুরস্কৃত এবং সুকুমারমতি শিশু পাঠকদের রক্ষা কর"—জয় হিন্দী! হায় বাঙ্গলা!!

হিন্দী-ভাষী বিচারপতির মুখে আশার বাণী

এলাহাবাদের একটি কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি এস্‌এস্ ধাবন (যাঁর মাতৃভাষা হিন্দী) স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন যে:

"যদি আমি প্রজাতন্ত্রকে ভিতরে ভিতরে শক্তিশালী করিতে পারি—আমি সানন্দে হিন্দীকে গ্রহণ করিব। কিন্তু যদি দেখি—কেবলমাত্র হিন্দীকে বাদ দিলেই প্রজাতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব—মনে আঘাত পাইলেও আমি প্রজাতন্ত্রের জন্য হিন্দীকে ছাড়িব।"

ভাষা প্রকাশের মাধ্যম—পূজার্চ্চনার বস্তু নয়।

জনসাধারণ বিশেষ কোন একটি ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানে ইচ্ছুক না হইলে সেই ভাষা তাহাদের ভাষা হইয়া উঠিতে পারে না। আজ যদি বাঙ্গলা, মাদ্রাজ ও কেরলের জনগণ উত্তরপ্রদেশের জনগণের সঙ্গে হিন্দীভাষায় ভাবের আদান-প্রদানে অসম্মত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দীর মূল্য অন্তর্হিত হইবে।...

দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু সংখ্যক হিন্দীর ধ্বজাধারী এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সরস্বতী, দুর্গা, কালীর মত হিন্দীকেও যেন কোন একটি দেবী হিসাবে পূজা করিতে হইবে এবং অহিন্দীভাষী জনগণের উপর ঐ পূজা চাপাইয়া দিতে হইবে।... ...

কোন জটিল সমস্যাকে ভাবাবেগের দৃষ্টিতে দেখিলে এইরূপ হয়। অথচ এই সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিদের দৃষ্টি হইতে দেখাই সমীচীন। হিন্দীর সমর্থকরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন না যে তাঁহারা যদি মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অহিন্দীভাষীদের উপর হিন্দী চাপাইয়া দেন তাহা হইলে উহাতে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত লাগিবে এবং জাতীয় ঐক্য বিপন্ন হইবে।

'সমস্যাটিকে' এই ভ্রান্তদৃষ্টিতে দেখার ফলে আমরা যাহা করিতে চাহিতেছি তাহার বিপরীত ফল হইতেছে। ইহা জাতীয় ভাষা না হইয়া ইহার পক্ষে একটি আঞ্চলিক ভাষায় পরিণত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। একটি আধিপত্যশীল অঞ্চল বলপূর্ব্বক তাহার ভাষাকে অন্যান্য অঞ্চলের উপর চাপাইয়া দিতেছে এবং অন্যান্য অঞ্চল তাহার প্রতিরোধ করিতেছে। সুতরাং ইহা একটি সংহতিনাশক শক্তি হিসাবে গণ্য হইবে।'...

"হিন্দী মনোনীত সরকারী ভাষা ছাড়াও একটি আঞ্চলিক ভাষা হওয়ায় সমস্যা আরও জটিল হইয়াছে। অহিন্দীভাষী অঞ্চলের জনগণ সন্দেহ ও আশঙ্কা করেন যে, অন্যান্য ভাষার ক্ষতি করিয়া হিন্দীভাষী লোকেরা হিন্দীভাষার উন্নতি করিতেছে। তাহার চেয়েও নিকৃষ্ট কথা এই যে, জাতীয়তাবাদের ধ্বনির আড়ালে তাহারা নিজেদের ছাত্রসমাজ, লেখক, সংবাদ-পত্র এবং প্রকাশ ভবনগুলির উন্নতি করিতেছে। অহিন্দী ভাষীদের মন হইতে এই আশঙ্কা দূর করা হিন্দী-ভাষীদেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু এই আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তাহাদের উপর চাপাইয়া দিলে তাহা সংহতিনাশী শক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।"

শ্রীধাবন আরও বলেন যে, দুর্ভাগ্যের বিষয় এই রাজ্যে হিন্দীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিবার পরেও হিন্দীভাষায় বিদেশী পুস্তকাদি ও সাময়িকপত্র অনুবাদের কাজ সামান্যই অগ্রসর হইয়াছে। অবশ্য ব্যাপকভাবে হিন্দীভাষায় বিদেশী পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদি প্রকাশ করিয়া সেইগুলি সুলভ মূল্যে ছাত্র ও পণ্ডিতদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া এক বিরাট্ ব্যাপার এবং প্রতি বৎসর উহার জন্য কয়েক কোটি টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু হিন্দীকে ভাব প্রকাশের ভাষা হিসাবে গণ্য করিতে হইলে তাহার মূল্য দিতে হইবে। (কে দিবে?)

শ্রীধাবন অতঃপর বলেন যে, রাজ্য শুধু হিন্দী প্রবর্ত্তন করিবে অথচ বিশ্বের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও মননশীলতার সঙ্গে তাহার কোন সংযোগ থাকিবে না ইহা সঙ্গত নহে। তিনি বলেন যে, ইহার ফলেই এই অভিযোগ আসে যে **হিন্দীকে দেবী হিসাবে পূজা**

করাই ইহাদের অভিপ্রায়, ইহাকে গভীর ভাব ও প্রগতিশীল চিন্তার প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে গড়িয়া তুলিবার কোন ইচ্ছা ইহাদের নাই।

“হিন্দী”—আর এক দিক!

পার্লামেণ্ট সদস্য ও হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম সভাপতি শেঠ গোবিন্দ দাস জাতীয় ভাষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কেন্দ্রে হিন্দীর পৃথক মন্ত্রী দপ্তর স্থাপনের দাবি জানাইয়াছেন।

সর্বভারতীয় বিশেষ হিন্দী সম্মেলনে শেঠ গোবিন্দ দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে, এপর্য্যন্ত বিভিন্ন মন্ত্রী দপ্তর যেসব পরিকল্পনা তদারক করিতেছিল, অতঃপর হিন্দী দপ্তরই সেগুলির দায়িত্ব লইবে। কারিগরি শব্দ-সম্বলিত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পুস্তকাদি হিন্দীতে রচিত হইবে, এবং অন্যান্য মন্ত্রী দপ্তরে হিন্দীর সর্বাধিক ব্যবস্থার প্রচলন করিতে হইবে।

দক্ষিণে হিন্দী-বিরোধী আন্দোলনের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য আহূত ৪ দিনব্যাপী এই সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হইয়াছেন। শেঠ গোবিন্দ দাস ভাষা সমস্যার সমাধানের জন্য তিন দফা পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন, এবং এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে ভাষা সমস্যার সমাধানের জন্য আচার্য্য বিনোবা ভাবেকে তাঁহার প্রভাব প্রয়োগ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

৩ দফা পরিকল্পনা:—(১) হিন্দীভাষী রাজ্যগুলির উপর ইংরেজী চাপান না হইলে কেন্দ্রকে সর্বপ্রথম হিন্দী-ভাষী রাজ্যগুলির সহিত শুধু হিন্দীতে কাজ চালাইতে হইবে। (২) ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির জন্য হিন্দীতেও পরীক্ষা দেওয়া চলিবে। তবে ইহা প্রার্থীদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। (৩) হিন্দীভাষী অঞ্চলের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ইংরেজী চাপান হইবে না।

অতি উত্তম প্রস্তাব সন্দেহ নাই। কিন্তু:—

“হিন্দীপ্রেমীরা হয়ত ভাবিতেছেন যত অনর্থ বাধাইয়াছে ইংরাজী ভাষা—তাহাকে যদি ছলে-বলে-কৌশলে দেশ হইতে বিদায় দেওয়া যায় তবে তাহার শূন্য সিংহাসনে হিন্দী জাঁকিয়া বসিবে। ইহাও তাঁহাদের বুদ্ধিভ্রংশের পরিচয়। নাই-মামার চেয়ে কানা মামা ভাল এ কথা লোকে কখনও কখনও মনে করে বটে কিন্তু সময় বিশেষে নাই-মামাকেই তাহারা পছন্দ করে। ইংরাজী যদিই বা যায় তাহার স্থান লইবে হিন্দী নয়—বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা। তখন বেশী কড়াকড়ি করিতে গেলে হিন্দীর মান বাঁচিবে না, থাকিবে না জাতির সংহতি। হিন্দীকে তাহার ন্যায্য পাওনার বেশী যাঁহারা দিতে চাহিতেছেন তাঁহারা দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন এই নির্মম সত্য তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন বিচারপতি ধাবন। বিচক্ষণ বিচারকের এই সতর্কবাণী যদি হিন্দীর উগ্র সমর্থকেরা অগ্রাহ্য করেন তবে তাঁহারা সারা দেশের বিপদ ডাকিয়া আনিবেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অতি-প্রিয় হিন্দীরও।” —

একথা স্বীকার করিব যে

—বিচারকের যে স্বচ্ছ দৃষ্টি ও গভীর ধীশক্তি থাকে সাধারণ লোকের তাহা থাকিবার কথা নয়। যাঁহারা রাজনীতির চর্চা করেন বিচারকের মননশীলতা তাঁহাদের নিকট হইতে কেহ আশা করে না। তাই বলিয়া বাস্তব বুদ্ধি তাঁহাদের কি কিছুই থাকিতে নাই? কাণ্ডজ্ঞান কি তাঁহাদের একেবারেই লোপ পায়? অন্তত এ দেশের রাজনীতির দিকপালদের আচরণ দেখিয়া সেই আশঙ্কাই হইতেছে। দক্ষিণে অশান্তির আগুন এখনও নেভে নাই, পশ্চিমবঙ্গে অসন্তোষ এখনও ক্ষোভে ফাটিয়া না পড়িলেও যথেষ্ট তীব্র। তবুও দেখি পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক সম্মেলনে তাঁহারা ধ্বনি তুলিয়াছেন হিন্দীকে সরকারী ভাষা শুধু নয় জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে হইবে। মন্দের ভাল, এটুকু শিক্ষা তাঁহাদের হইয়াছে যে, কাজটা তাড়াহুড়া করিয়া করিলে অনর্থ বাধিবে। শনৈঃ পর্বত-লঙ্ঘনম্ এ যে বুদ্ধিমানের কাজ সেটা তাঁহারা বুঝিয়াছেন। অতএব রাতারাতি হিন্দীর কপালে রাজ-টীকা আঁকিয়া দিতে তাঁহারা আর ব্যাকুল নন।

কিন্তু লক্ষ্য তাঁহাদের ঠিকই আছে। এত কাণ্ডের পরও সেটা একচুলও বদলায় নাই। বরঞ্চ দেখিতেছি সেটা আরও ব্যাপক হইয়াছে। এখন তাঁহারা হিন্দীকে শুধু কেন্দ্রের সহিত সংযোগের ভাষার সম্মান দিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করেন না, তাহাকে একেবারে মর্য্যাদার তুঙ্গশৃঙ্গে তুলিয়া দিতে চাহিতেছেন তাহাকে ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষার পোশাক পরাইয়া। যে-দেশে লোকেরা একটি মাত্র ভাষায় কথা বলে না সে-দেশে এ দাবি শুধু যে উৎকট আবদার নয় সংহতির মৃত্যুবাণ, এ খেয়াল তাঁহাদের নাই কিংবা থাকিলেও হিন্দীপ্রেমে

মশগুল হইয়া সেটাকে তাঁহারা আমল দিতেছেন না। বোধ করি ধরিয়া লইয়াছেন একবার যদি কাগজেকলমে হিন্দীকে সরকারী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া যায় তাহা হইলে প্রথম প্রথম কিঞ্চিৎ গণ্ডগোল হইলেও লোকে হিন্দীর তাঁবেদারি স্বীকার করিয়া লইবে। সে আশা যে দুরাশাও নয়, মনের ছলনা মাত্র—এ কথা কি তাঁহারা কিছুতেই বুঝিবেন না পণ করিয়াছেন?—

এ-বিষয়ে সকলেই হয়ত একমত যে—

—হিন্দীকে যদি সকলে খুশীমনে গ্রহণ করিত তাহা হইলে এই রক্তপাত হইত না। ভাষা যখন রক্ত লইয়াছে তখনই বোঝা উচিত যে, এবার দ্বিতীয় চিন্তার সময়। এলাহাবাদের বিচারপতি শ্রী এস এস ধাবন হিন্দীভাষীদের সেই দ্বিতীয় চিন্তার আবেদন জানাইয়াছেন। তিনি মনে করাইয়া দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ ইউরোপের ফ্রান্সের মত একভাষী দেশ নয়। এদেশে চৌদ্দটি প্রধান ভাষা। এই ভাষাগুলিকে দাবাইয়া হিন্দী যদি এককভাবে ক্ষমতার গদিতে বসিতে চাহে তাহা হইলে বিরোধ অনিবার্য্য। তাহা ছাড়া সরকারী ভাষার প্রয়োজন রাষ্ট্রের জন্য। ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের ঐক্যের প্রয়োজন যদি হিন্দীর দ্বারা মিটিত তাহা হইলে প্রত্যেক ভারতবাসীই বলিতেন যে, হিন্দী থাকুক। হিন্দীভাষীরাই একমাত্র স্বদেশী, অন্যান্যরা রাতারাতি ইংরেজিয়ানায় রপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এমন মনে করার কোন কারণ নাই। আসলে হিন্দীকে সরকারী ভাষা করিয়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষার প্রতি সরকার উপেক্ষা দেখাইতেছেন এবং সরকারী ভাষার সোপান অবলম্বন করিয়া হিন্দী এলাকার অধিবাসীরা উচ্চতর আসনে গিয়া বসিতে চাহিতেছেন। এই আশঙ্কা হইতেই ভাষা বিরোধের সৃষ্টি এবং নয়াদিল্লীর অস্পষ্ট মনোভাবের জন্য এই বিরোধ কিছুতেই মিটিতেছে না। বিচারপতি শ্রীধাবন যথার্থই বলিয়াছেন, "যদি হিন্দীর দ্বারা সাধারণতন্ত্র শক্তিশালী হয় তাহা হইলে আমি সানন্দে হিন্দী গ্রহণ করিব। কিন্তু যদি দেখি যে হিন্দীকে বাদ দিলেই সাধারণতন্ত্রের ঐক্য রক্ষা সম্ভব তাহা হইলে, মনে আঘাত পাইলেও আমি সাধারণতন্ত্রের জন্য হিন্দীকে ত্যাগ করিতে বলিব।" শ্রীধাবন হিন্দী এলাকার হাইকোর্টের বিচারপতি এবং হিন্দী ভাষাতেই তিনি হিন্দীভাষীদের সামনে এই বক্তব্য পেশ করিয়াছেন। হিন্দীপ্রেমীদের কাছে হিন্দী একটা ধর্মীয় সত্তার মত হইয়া উঠিয়াছে। বিপদ ঘটিয়াছে এই সংস্কারের জন্যই। ১৯৪৮ সালে গণপরিষদের বিতর্কেও হিন্দী পূজার প্রধান মোহান্ত শেঠ গোবিন্দ দাস এই সংস্কারাচ্ছন্ন উগ্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন। আজও সেই সংস্কারই ভাষামত্ততাকে এতদূর ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের সামনে একটিই প্রশ্ন—হিন্দী রাখিব, না ভারতের সাধারণতন্ত্রকে বাঁচাইব?

বিচারপতি শ্রীধাবন সংস্কারমুক্ত উদারদৃষ্টিতে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইয়াছেন। হিন্দীর প্রতি বিদ্বেষের জন্য নয়, ভারতীয় ঐক্যের প্রতি আনুগত্যের জন্যই আজ হিন্দী লইয়া বাড়াবাড়ি আমরা হইতে দিতে পারি না। দিব না।

পশ্চিমবঙ্গে বেকারীর চিত্র ঃ

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত? এ প্রশ্নের উত্তর সঠিক সংখ্যায় দেওয়া হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত দ্রুত হারে যে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার সাক্ষ্য এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের খাতার হিসাব। এখানে প্রতি পরিবারে একজন (পুরুষ অথবা মহিলা) শিক্ষিত বেকারকে ঘরে বসিয়া থাকিতে হইতেছে। নিজের যৌবন শক্তির অপচয় করিয়া। ইহার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু বেকার ব্যক্তিরা দায়ী নহেন। দায়ী আমাদের সমাজ।

একটি তুলনামূলক হিসাবে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির হারের দু'টি ছবি ধরা যাইতে পারে। ১৯৬১ সালের ৩০শে জুন তারিখের হিসাবে ৪৪,৩৩৭ জন ম্যাট্রিক বেকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বছরটি ছিল তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বছর। এই পরিকল্পনা শেস হওয়ার ঠিক ১৫ মাস আগে অর্থাৎ ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৬,৯১৭-তে। একই যোগ্যতাসম্পন্না মহিলা চাকুরি-প্রার্থীদের সংখ্যা ঐ সময়ের ব্যবধানে ২,৭৯৬ থেকে দাঁড়ায় ৯,০০১-তে।

ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করা অথবা সমস্তরের বেকার সংখ্যার গত ডিসেম্বরের হিসাব ছিল ৮৩,২৩৬ জন। কিন্তু পরিকল্পনা সুরুর বছরে এই সংখ্যা ছিল ১৬,১৫০। ইহাদের মধ্যে মহিলা বেকারদের সংখ্যা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ১,১৭৬ হইতে ৮,১২২।

১৯৬৪ সালের শেষ দিনের যে হিসাব পাওয়া যায় তাহাতে বিভিন্ন বিষয়ক ১৮,২৪১ জন বেকার স্নাতকের উল্লেখ আছে। ১৯৬১ সালের ৩০শে জুন এই সংখ্যা ছিল ৭,৫৬৪।

শিক্ষার আগ্রহ অব্যাহত

যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা বা চাকুরি না পাওয়া সত্ত্বেও বাংলার যুবক-যুবতীদের মধ্যে শিক্ষা লাভের আগ্রহে কিন্তু কিছু মাত্র ভাটা পড়ে নাই, বাড়িয়াই চলিয়াছে। তিন বছর আগে যন্ত্রবিজ্ঞানে ৯৩ জন, চিকিৎসাবিজ্ঞানে ১০৩ জন এবং অন্যান্য বিষয়ে ৭,৩৬৮ জন স্নাতক চাকুরিপ্রার্থীদের খাতায় নাম দিয়াছিলেন। এবারে ঐ সংখ্যা হইয়াছে যথাক্রমে ৫৬৬, ১০৩ এবং ১৭,৫৭২। তিন বছরে মহিলা স্নাতকদের সংখ্যা ৪৭৮ থেকে ২,০০৩ হইয়াছে।

কর্মসংস্থান কেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গে আছে ৩টি আঞ্চলিক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, ৭টি উপ-আঞ্চলিক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, ১৩টি জেলা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, কয়লা খনিসমূহের জন্য ২টি বিশেষ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, প্রকল্পসমূহের জন্য ২টি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ। বরখাস্ত এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত সরকারী কর্মচারীদের জন্য ১টি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাসিসট্যেন্স অ্যাণ্ড গাইডেন্স ব্যুরো' এবং অপূর্ণাঙ্গদের জন্য একটি বিশেষ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আছে।

২০,৯১৯ জন মহিলা এবং ৩,৮৩,৪০৩ জন পুরুষ কর্মপ্রার্থী ১৯৬৪ সালে বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অবশ্য অনেকে নাম পুনর্নবীকরণ করিয়াছেন। কিন্তু সারা বছরে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ মোট মাত্র ৫০,৬৭৮ জনকে চাকুরি দিতে সমর্থ হইয়াছেন।

তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের সমস্যা আরও জটিল, ন্যাশনাল এমপ্লয়মেণ্ট সার্ভিস কর্তৃপক্ষের মতে। কর্মদাতারা সহজে এদের চাকুরি দিতে চাহেন না। যে কারণে বছরের পর বছর এদের আবেদনে কোন সাড়া আসে না।

মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বে ঐ শিক্ষিত মহিলারা শিক্ষিকার কাজেই বেশী উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে ইঁহাদের মধ্যে অফিসে চাকুরির ঝোঁক বিশেষভাবে দেখা যাইতেছে।

এ-রাজ্যের বেকারী সমস্যা লইয়া পত্র-পত্রিকায় বহুবার বহু আলোচনা হইয়াছে। রাজ্য সরকারও তাহাদের সাধ্যমত বেকারদের কাজে নিযুক্ত করিতে প্রয়াস করিতেছেন—কিন্তু ফল আশামত হইতেছে না।

সমস্যা সমাধান কিছু পরিমাণে হয়—যদি অবাঙ্গালী মালিকদের কল-কারখানা এবং বাণিজ্য সংস্থাগুলিতে বাঙালী নিযুক্ত করা খানিকটা বাধ্যতামূলক করা হয়। আইন না করিয়াও ইহা সম্ভব—যেমন বিহার, উড়িষ্যা, আসাম করিয়াছে।

বাঙ্গালী শ্রমিক সংখ্যা কমতি মুখে

কয়েকদিন পূর্ব্বে একটি সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে যে :—

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান-ব্যবসায় সংগঠন ও শিল্পে বাঙ্গালী শ্রমিক কর্মচারীর হার আর একদফা কমিয়াছে।

১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায় সংগঠনগুলিতে বাঙ্গালী শ্রমিক কর্মচারীর গড়পড়তা হার ছিল মোট কর্মচারীদের শতকরা ৫১·৭২ ভাগ। ১৯৬৩ সালে ইহা কমিয়া দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৪৮·৪১ ভাগ। বাঙ্গালী শ্রমিক হ্রাস পাওয়ার ফলে যে কতটুকু হইয়াছে, সেটুকু পূরণ করিয়াছে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরের রাজ্য হইতে আগত শ্রমিকেরা। ১৯৬২ সালে বহিরাগত শ্রমিকদের গড় হার ছিল শতকরা ৪৮·২৮ ভাগ। ১৯৬৩ সালে তাহা বাড়িয়া শতকরা ৫১·৫৯ ভাগে দাঁড়াইয়াছে।

এই রাজ্যে ম্যানেজিং এজেন্সী, আমদানী-রপ্তানীর পাইকারি ব্যবসায়, প্রস্তুতকারি শিল্প, জাহাজ ও অন্তর্দ্দেশীয় নৌ-চলাচল, পরিবহণ ও পথ-পরিবহণ, ছাপাখানা, কাঁচ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও শিল্পে ১৯৬৩ সালের সর্ব্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে বাঙ্গালী শ্রমিক কমিয়াছে ও তাহার বদলে বহিরাগত রাজ্যের শ্রমিক অধিক-সংখ্যায় নিয়োগ করা হইয়াছে।

যে দুইটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে এক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী শ্রমিক হ্রাসের হার শোচনীয়—সেই দুইটি প্রতিষ্ঠান হইল পথ-পরিবহণ আর উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ। পথ-পরিবহণ শিল্পে ১৯৬২ সালে বাঙ্গালী শ্রমিক ছিল ৫১·২৪ ভাগ। ১৯৬৩ সালে তাহা হ্রাস পাইয়া দাঁড়ায় শতকরা ৪২·৩০ ভাগ। অবাঙ্গালী শ্রমিক নিয়োগের হার ৪৮·৭৬ হইতে বাড়িয়া দাঁড়ায় ৫৭·৭০ ভাগ। পথ-পরিবহণে বাঙ্গালী শ্রমিক শতকরা ৫০ হইতে হ্রাস পাইয়া ৩৩·৩৩-এ দাঁড়াইয়াছে। অবাঙ্গালী শ্রমিক এই সময়ের মধ্যে ৫০ হইতে ৬৬·৬৭ ভাগে পরিণত হইয়াছে।

ইহার কারণ কি তাহা অনুসন্ধান করা অবশ্যই প্রয়োজন। আমাদের মনে হয় এ রাজ্যের ট্রেড-ইউনিয়ন সংস্থাগুলি বাঙ্গালী শ্রমিক সংখ্যা বছরের পর বছর কমতি মুখে যাইবার একটি প্রধান কারণ। গত কয়েক বছর ধরিয়া দেখা যাইতেছে কারণে-অকারণে, সামান্য যে-কোন অজুহাতে কলকারখানা, ব্যবসায় সংস্থা (বিশেষ করিয়া কলিকাতার ট্রামওয়েতে) হঠাৎ ধর্ম্মঘট! সর্ব্বসাধারণের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি শ্রমিক ইউনিয়নগুলির কোন দৃষ্টি নাই, ইহার কোন প্রয়োজনও তাহারা বোধ করে না। গোষ্ঠীস্বার্থই আজ প্রধান হইয়াছে। 'আমার দল বা গোষ্ঠীর লাভে যে অন্যের বিষম ক্ষতি হইতে পারে'—একথা কে বিবেচনা করে?

বাঙ্গালী ব্যবসায় এবং অন্যান্য বেসরকারী সংস্থায় আজ কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালী পিওন-বেয়ারা নিয়োগে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালী অল্প এবং অশিক্ষিত পিওন-বেয়ারা এই কাজ লইতে প্রথমে আপত্তি করে না—কিন্তু পিওন-বেয়ারার চাকরি পাইবার পরই তাহারা বাবু-শ্রেণীতে পরিণত হয়। বহু ক্ষেত্রে কথাবার্ত্তায়, ব্যবহারে ইহারা দুর্ব্বিনীত এবং সহবতবর্জ্জিত। কারণ ইহারা জানে একবার চাকরিতে পাকা হইলে, তাহাদের চাকরি হইতে তাড়ায় কে!

কলকারখানার অবস্থাও প্রায় একই প্রকার। সাধারণ বাঙ্গালী শ্রমিকের দাবি (ইউনিয়নের প্ররোচনাতে) হইয়াছে আকাশ-প্রমাণ—কিন্তু নিয়োগ-কর্ত্তার কোন দাবি ইহাদের নিকট কিছুই দাবি করিবার নাই। বাঙ্গালী-শ্রমিক নিয়োগে স্বভাবতই মালিক-শ্রেণী ভয় পাইতেছেন। কেন?

'কালো-টাকায়'—গ্রামের জমি?

—ঘরে বা ব্যাঙ্কে কোথায়ও যখন কালো টাকা লুকাইবার ভরসা নাই তখন গ্রামাঞ্চলের জমি মাটিতেই কালো টাকা বিনিয়োগের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলের বহু মুসলমান পরিবার জোত জমি ভিটামাটি বিক্রয় করিয়া পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছেন—কালো টাকার দৌলতে মোটা ভারতীয় টাকা তাঁহারা জমি-মাটির বিনিময়ে পাইতেছেন। বারাসত সাব রেজেষ্টারী অফিসে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ টাকার জমি সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইতেছে। এই স্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, জমি সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রকৃত দামের বহু কম মূল্য উল্লেখ করিয়া রেজেষ্টারী দলিলের ষ্ট্যাম্প ফাঁকি দেওয়া হইতেছে। পাকিস্তানে সংখ্যা-লঘুদের সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যেরূপ বাধানিষেধ আছে, ভারতে উহার কিছুই নাই। এই সুযোগে পাকিস্তান গমন অভিলাষী মুসলমান পরিবার মোটা টাকায় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ভারতীয় কারেন্সী নোট পাকিস্তানে পাচার করিতেছে। কালো টাকার দৌলতে সাধারণ যে-কোন জমির দাম অবিশ্বাস্য হারে উঠিয়াছে। জমি খরিদকারীদের উপর সরকারের বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নাই। এই সুযোগ কালো টাকার অধিপতিরা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে। জমি খরিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সুবিধা হইতেছে বেনামীতে জমি কেনা যায়। সরকারের ইনকাম ট্যাক্স বিভাগ অথবা গোয়েন্দা বিভাগ যদি অনুসন্ধানের উপযুক্ত একটি নমুনা দেখিতে চাহেন তবে আমরা বারাসাত সাব রেজেষ্টারী অফিসের গত ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের দলিল রেজেষ্টারীর দলিলগুলি অনুসন্ধানের আহ্বান জানাইতেছি। এইদিন অফিসের শেষ সময়ের পরে পঁচিশখানির উপর দলিল জমা পড়ে। যে সাব রেজেষ্টারী অফিস অফিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক মিনিট বিলম্বে দলিল গ্রহণ করে না সেই সাব রেজেষ্টারী অফিস টাইমের শেষে এতগুলি দলিল গ্রহণ করিল এবং রাত দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত দলিল রেজেষ্টারীর কার্য্য চলিল। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলার গ্রামাঞ্চলের জমির হাত-বিনিময় যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে—ইহা দেখিয়া মনে ভয় হয় অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত জমি কলিকাতার কালো টাকার অধিপতিদের খপ্পরে চলিয়া যাইবে। কলিকাতা করপোরেশন এলাকার জমি-বাড়ী খরিদের মধ্যে যেরূপ ঝামেলা আছে কলিকাতার বাহিরে তাহা নাই। কলিকাতা হইতে যশোহর রোড, টাকী রোড, কাঁচরা-পাড়া রোডের পার্শ্ববর্ত্তী জমির দাম যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা কদাচ কৃষক পরিবারের উপযোগী নহে। মাত্র কয়েক বিঘা জমি লক্ষ লক্ষ টাকায় হাত বিনিময় হইতেছে। সরকারের অদূরদর্শিতা এবং অব্যবস্থার ফলেই কালো টাকা জমিতে লগ্নী হইতেছে, দেশত্যাগী মুসলমান পরিবার ভারতীয় কারেন্সী নোট পাকিস্তানে পাচার করিতেছে, কোটি কোটি টাকার জমি বিক্রয়ের ষ্ট্যাম্প ফাঁকি পড়িতেছে এবং জাতীয় স্বার্থের বিরোধী জমি সম্পত্তি পুঁজিবাদী। কালোবাজারীদের দখলে চলিয়া যাইতেছে।

'বারাসত' (৮ই ফেব্রুয়ারী) হইতে উপরি উক্ত তথ্য

পরিবেশিত হইল। কলিকাতায় বর্ত্তমানে সাধারণ বাঙ্গালীর বাড়ীঘর নির্ম্মাণের আশা নাই। কিছু আশা ছিল কাছাকাছি গ্রামাঞ্চলে—কিন্তু কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের 'সোসালিষ্টিক প্যাটার্ণে গড়া' রাষ্ট্রে 'সাম্যবাদ' সকলের ভোগের বস্তু নহে—এখানেও জাতি-ভেদ প্রকট! বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গবাসী প্রফুল্ল-বদনে ইহাই দেখিতেছে!

'মাথা' (?) ঠাণ্ডা রাখা চাই-ই!

সমস্যা-জড়িত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনা করা বিষম ব্যাপার সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন এবং ইহা করিতে হইলে মন্ত্রী মহোদয় এবং উচ্চ পদাধিকারী অফিসারদের মাথা (যদি থাকে) ঠাণ্ডা রাখা একান্ত প্রয়োজন এবং এই 'অতি-অবশ্য' কার্য্যে "মাথা" ঠাণ্ডা রাখার খরচ—বছরে বছরে বৃদ্ধি মুখেই চলিতেছে। বিধান সভায় এক প্রশ্নের জবাবে পূর্ত্তমন্ত্রী বলেন:—

> ১৯৬৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত বাড়ীর সংখ্যা ছিল ৯৩। এই বাড়ীগুলি বাবদ সরকারের ১৯৬০-৬১ সালে ২১ হাজার টাকা, ১৯৬১-৬২ সালে ৬৬ হাজার ৭৭ টাকা, ১৯৬২-৬৩ সালে ১ লক্ষ ২২ হাজার ১ টাকা এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৫ শত ৭২ টাকা খরচ হইয়াছে।

আমরা অনেকেই বোধ হয় জানি না যে, পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান মন্ত্রীদের প্রায় সকলেই মন্ত্রিত্ব লাভের পূর্ব্ব জীবনে জন্মাবধি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত প্রাসাদেই বসবাস করিয়াছেন, কাজেই দেশ এবং দশের কল্যাণে অর্পিত মন্ত্রী-জীবনে তাঁহারা হঠাৎ চিরকালের অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য-পালনে বিফলতা অর্জ্জন করিতে পারেন না। ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহারা দেশের জন্যই ইহা করিতে বাধ্য হইতেছেন! বিশেষ করিয়া টাকাটা যখন গরীব প্রজারা প্রফুল্ল-চিত্তে বহন করিতেছে।

'মাথা-ঠাণ্ডী' খরচ ছাড়া মন্ত্রীবর্গ আরও কিছু সামান্য টাকা ভাতা হিসাবে দয়া করিয়া, প্রজার দান হিসাবে গ্রহণ করেন। যেমন:

> ১৯৬৪ সালে অন্যান্য এক-একজন পূর্ণমন্ত্রী মাসিক ৩৫০ টাকা বাড়ীভাড়া ভাতা হিসাবে ৪ হাজার ২ শত টাকা করিয়া এবং এক-একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী মাসিক ৩ শত টাকা হিসাবে ৩ হাজার ৬ শত টাকা করিয়া পাইয়াছেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র এবং শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজভবনের মন্ত্রী-বাবদ ঐ আবাসে থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের বাড়ীভাড়া টাকা দিয়া আবার সরকারই কাটিয়া লইয়াছেন। অবশ্য প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ৩১শে মে পর্য্যন্ত হিসাবে ১ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা এবং নূতন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ ১১ই জুন হইতে হিসাবমত ২ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা পাইয়াছেন।

এই হিসাবে প্রজাপালন এবং দেশশাসন কার্য্যে প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টা টেলিফোন বাবদ মাসে কত টাকা মন্ত্রী-মাথাপিছু খরচ হয়—এবার সে-তথ্য প্রকাশ করা হয় নাই, যেমন হয় নাই মন্ত্রীদের কাজে-অকাজে, ব্যক্তিগত-কাজে রেল-মোটর-হেলিকপ্টার বিলাস ভ্রমণের খরচ!

আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, উপরি উক্ত খাতে খরচ প্রদত্ত হিসাবের দশ বা বিশ গুণ হয় নাই!

পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের দায় কাহার?

কয়েকদিন পূর্ব্বে বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন 'ক্ষুব্ধ কণ্ঠে' বলেন যে, বারবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে রাজী হয়েন নাই। সীমান্ত দিয়া চীনা ও পাকিস্তানী মালের চোরাই কারবার বন্ধের জন্য যথোচিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে কয়েকবার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন—কিন্তু

কেন্দ্রীয় সরকার কোন প্রকার ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নাই!

উপরি উক্ত সংবাদ পাঠে কেহ যদি ভাবে যে—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রক্ষার কোন দায়িত্বই যখন কেন্দ্রীয় সরকারের নাই, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গকে "স্বাধীন" বলিয়া মনে করিলে—কাহারও কোন আপত্তি হইতে পারে না। এবং এ-রাজ্য যদি স্বাধীন বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে দেশ, বিশেষ করিয়া সীমান্ত রক্ষার কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাধীন ভাবে সৈন্য-বাহিনী গঠন করিতে অবশ্যই পারে। এই বাহিনীকে "পশ্চিমবঙ্গ" সৈন্যবাহিনী রূপে অভিহিত করিয়া স্থল-জল এবং আকাশ বাহিনী গঠনও ক্রমে ক্রমে করা যাইতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকার সামান্য একটি 'বেঙ্গলী-রেজিমেণ্ট' গঠনেও গররাজী। ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে—এই ভাবে কোন রাজ্যের নামে বিশেষ বাহিনী-গঠন দেশের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক! কিন্তু "মহারাষ্ট্র", "পাঞ্জাব" প্রভৃতি রেজিমেণ্ট অবশ্যই থাকিতে পারে—কারণ, ইহা দেশের সংহতি রক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়! সর্ব্ব-বিষয়েই পশ্চিমবঙ্গ এবং বাঙ্গালীর প্রতি কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের বিষম-বিরুদ্ধ-বিজাতীয় প্রেমের প্রকাশ প্রায়ই প্রকট হইতে দেখা যাইতেছে—। বাঙ্গালার অপরাধ—সে তাহার বুকের রক্ত, হাজার হাজার প্রাণ বলি এবং শেষ পর্য্যন্ত নিজের দেশের দুই-তৃতীয়াংশ বিসর্জ্জন দিয়া ভারতের এই তথাকথিত স্বাধীনতা অর্জ্জনে সাহায্য করিয়াছে! ভাগ্যের পরিহাস—স্বাধীনতার পূর্ব্বে এবং স্বাধীনতা অর্জ্জনের পরেও বাঙ্গালীকে সমভাবে সর্ব্ববিষয় বিষম মূল্যের সঙ্গে অপমান নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইতেছে!

দুঃখ হয় যখন দেখি কেন্দ্রের যে দু-একজন বাঙ্গালী মন্ত্রী আছেন, তাঁহারা বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর দুঃখ অবসানের জন্য কিছু করিবার এমন কি মৌখিক প্রতিবাদ জানাইবারও প্রয়োজন বোধ করেন না! এমন প্রভুভক্ত "মন্ত্রী" নামক ভৃত্য বাঙ্গালী ছাড়া আর কে হইতে পারে?

গুরুদেব

শ্রীশৈবাল চক্রবর্ত্তী

পিসিমার গুরুদেব আবার এসে উপস্থিত হ'লেন। এইরকম হঠাৎই তিনি এসে হাজির হন। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ একদিন সদর দরজায় 'মা সুবাসিনী' গম্ভীর গলায় তাঁর এই ডাক শোনা যায়। দরজা খুলতেই চোখে পড়ে তাঁর বিভীষণ মূর্ত্তি, গলায় ত্রিপুণ্ডক, জটাজুট পরনে গেরুয়া। দাড়ি-গোঁফে মুখটাকে প্রায় সুন্দরবনের মত করে রেখেছেন গুরুদেব। তাঁকে দেখেই পিসিমা, 'বাবা এতদিনে দয়া হ'ল!' ব'লে পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। যত বারই আসেন গুরুদেব তত বারই পিসিমা ওই একই কথা বলে, একই ভাবে তাঁর পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়েন।

তার পর সুরু হয় আদরের ঘটা। তখনই বাজারে লোক ছোটে সরু চাল আর পাকা কলা আনতে, ভাল ঘি খানিকটা জোগাড় হয়। পর পর তিন গ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ খান তিনি। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছেন তাই এতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। যতদূর থেকেই তাঁকে আসতে হোক তিনি হেঁটেই আসবেন। গুরুদেব ট্রামে-বাসে চড়েন না, তাঁর দু'টি পা-ই ভরসা। এখন তাঁর সমস্ত শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে, মুখখানা টকটকে লাল। পিসিমা পাখা নিয়ে তাঁর পাশে এসে বসলেন। সেবারে তিনি এলেন সোজা আহিরীটোলার এক শিষ্যবাড়ী থেকে। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নি। আমাদের বাড়ীতে ফল-মিষ্টি খেয়ে তবে ঠাণ্ডা হ'লেন।

আমরা সবাই গুরুদেবকে খুব ভয়ে ভয়ে দেখতাম! তাঁর ঐ বিরাট্ চেহারা, ঘন কালো দাড়ি বুকের মাঝখান পর্য্যন্ত নেমে এসেছে, মাথার চুল বড় হয়ে জটার আকার ধারণ করেছে। চোখগুলি বড় বড়, বড়রা রাগ করলে যে রকম হয় সব সময় তেমনি লাল হয়ে থাকত। পরনের কাপড়ও লাল। আর অত্যন্ত গম্ভীর গলার আওয়াজ, ঠিক যেন মেঘ ডাকছে। প্রায়ই সংস্কৃত বলতেন, আমাদের দিকে তাকাতেন খুব কম। বাড়ীর সবাই তাঁকে নিয়ে তটস্থ থাকত। বাবা জোড়হস্তে কাছে বসে থাকতেন, পিসিমা পা দু'টি জল দিয়ে ধুয়ে নিজের চুলের গোছা দিয়ে মুছিয়ে দিতেন। আমরা হাঁ করে এই সব দেখতাম। মা ফল কেটে পাথরের থালায় ফল, মিষ্টি সাজিয়ে রাখতেন। গুরুদেবের কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না এসব দিকে। তিনি সে-সময় হয়ত ঝোলা থেকে কোন পুঁথি বার করে তার পাতা ওলটাচ্ছেন, আর নয়ত দেয়ালে টাঙানো কালীর পটের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছেন। কখনও বা ভুলে আমাদের ওপরও চোখ পড়ে যেত।

পিসিমাকে প্রশ্ন করতেন, 'এটি বুঝি বাসুর ছোটটি?' পিসিমা বলতেন, হ্যাঁ। আমাকে বলতেন, প্রণাম কর। আমি হাত বাড়াতেই গুরুদেব বলতেন, 'থাক থাক। ক'টায় ওঠ?' হঠাৎ প্রশ্ন করতেন তিনি। ভয়ে হাত-পা কাঁপত আমার। কোন রকমে ঢোক গিলে বলতাম, 'সাতটায়। সীতুদা আরও পরে ওঠে।' হা হা করে হেসে উঠতেন এ কথা শুনে। আমি বুঝতাম না এতে হাসির কি আছে। হাসি থামলে উনি বলতেন, 'সীতুদার খোঁজ ত আমি চাই নি।' আমার হাতে একটা সন্দেশ তুলে দিয়ে বলতেন, 'আরও ভোরে উঠবে—কেমন? ছাতে বেড়াবে ভোরবেলা, ভোরবেলা সূর্য্যের আলো খুব ভাল।' ব্যস, ওই পর্য্যন্ত! এবার তিনি খেতে খেতে অন্য সবার খোঁজ নিতেন পিসিমার কাছ থেকে। জয়নগরের ঠাকুমা কেমন আছেন, বেঁচির রাখাল দাদার শরীর কেমন এই রকম খোঁজ-খবর নেওয়া চলত। আমার ওদিকে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ত। যতক্ষণ তাঁর রক্তাভ চোখ দু'টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তিনি ততক্ষণ আমার বুক গুড়গুড় করত। বাবার চেয়ে লম্বা, আর অসুরের মত শক্তিমান গুরুদেব যতক্ষণ বাড়ীতে থাকতেন ততক্ষণ কোথাও কোন আওয়াজ পাওয়া যেত না। শুধু পিসিমা-মা'র ফিসফিশ কথাবার্ত্তা আর গুরুদেবের গম্ভীর গলার গমক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। যেই তিনি চলে যেতেন তখনই আবার

সহজ হাওয়া বইত—কাকাতুয়াটাও ডাক ছাড়ত আগের মতন।

গুরুদেব আসতেন খুব কম এবং বরাবরই তাঁর আবির্ভাব ছিল আকস্মিক। কোন বারই তিনি খবর দিয়ে আসতেন না—হয়ত অন্য কোন শিষ্যবাড়ী যেতে যেতে খেয়াল হ'ল চলে এলেন, ঘণ্টাখানেক থেকে ফের রওনা দিলেন। মনে আছে একদিন ভারী হন্তদন্ত হয়ে এসেছিলেন। সদর দরজায় ঢুমঢুম্ করে ঘুঁষির আওয়াজ। ঝি ঘুমোচ্ছিল। ধড়মড় করে উঠে বসেছিল সে। কানে এসেছিল গুরুদেব বাবাকে জিগ্যেস করছেন, 'কার, অসুখ করেছে?' আচমকা এই প্রশ্ন শুনে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন, 'অসুখ!' 'হ্যাঁ হ্যাঁ অসুখ', মনে হচ্ছিল গুরুদেব যেন ছুটে এসেছেন, তাঁর গলা কাঁপছিল। 'ছোটদের মধ্যে কে বিছানায় পড়েছে? আজ ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখলাম যন্ত্রণায় কে যেন ছটফট করছে। মুখটাকে ভাল করে দেখতে পারি নি। গায়ে যেন দাগ দেখলাম কিসের···?'

বাবা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে জোড়হস্তে উঠে দাঁড়িয়েছেন একটু অবাকও হয়ে গেছেন। মহাপুরুষের মনে আগামী দিনের ঘটনা ছায়াপাত করে যায় এ কথা শুনেছিলেন কিন্তু এখন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে নির্ব্বাক হয়ে গেছেন। গুরুদেবকে সাদরে অভ্যর্থনা করে ওপরে নিয়ে এলেন তিনি। গুরুদেব এসে বসলেন মিনুর বিছানার পাশে। মাঝ রাত্তিরে জ্বর এসেছে তার, জ্বরের তাড়সে এপাশ-ওপাশ করছে। বিকালের দিকে গায়ে গুটি দেখা গেল। রাত্রে জ্বর বাড়তে গুরুদেবের কাছে লোক ছুটল। তিনি প্রসাদী ফুল ও নির্ম্মাল্য পাঠিয়ে দিলেন। একমাস পরে মিনু উঠে দাঁড়াল। বাবা সেবার একটা শাল কিনে গুরুদেবকে পরতে দিয়েছিলেন।

কি করে যে গুরুদেবের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটেছিল তা আমরা জানতাম না। সীতুদা বলত, 'জানিস, গুরুদেব শাপ দিলে তুই এখনি ভস্ম হয়ে যাবি!' বললাম, 'তাই নাকি?' সীতুদা চোখ পাকিয়ে বলত, 'তবে! হিমালয়ে দশমাস থাকেন, মহাদেবের সঙ্গে কি আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় না? ভীষণ শক্তি আছে ওঁদের। যার ওপর একবার চটবেন তার দফাগয়া।' সীতুদা বয়সে আমাদের চেয়ে বছর দু'য়েকের বড় ছিল, সকালে আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে ইংরেজী খবরের কাগজ এ-পাতা থেকে ও-পাতা পর্য্যন্ত পড়ে ফেলত—সুতরাং তার কথা না মেনে উপায় কি? গুরুদেব যখন কমণ্ডলু থেকে জল ছিটিয়ে পুজো করতেন, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মন্ত্র পড়তেন গম্ভীর স্বরে তখন তাঁর চোখ-মুখ হয়ে উঠত ভীষণ—আমি জানলার খড়খড়ির ফাঁক থেকে তাই দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে যেতাম আর ভাবতাম ঠিক কথাই বলেছে সীতুদা।

আমাদের বাড়ীতে এসে ফল, সন্দেশ, কোরা ধুতি ইত্যাদি সব জিনিষের সঙ্গে তিনি যে কিছু কিছু নগদ টাকাও নিতেন এটা আমাদের নজর এড়াত না। ঠং ঠং করে রূপোর টাকার আওয়াজ হ'লেই আমরা এ-ওর মুখের দিকে তাকাতাম। গুরুদেব নাকি রূপোর টাকা ছাড়া অন্য টাকা গ্রহণ করেন না। এর নাম ছিল গুরুদক্ষিণা। বাবারা বলতেন, গুরুদক্ষিণা না দিলে নাকি গুরুভক্তি সম্পূর্ণ হয় না। এসব কথা বুঝতাম না বটে, তবে দেখতাম গুরুদেব টাকাগুলি গুণে তাঁর ট্যাঁকে গুঁজছেন। বয়স বুদ্ধি সব কম হ'লেও টাকা নেওয়ার এই ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুব ভাল লাগত না। সাধারণতঃ তিনি না চাইতেই বাবা পিসিমা তাঁর সামনে টাকার থাক সাজিয়ে দিতেন। কিন্তু মনে আছে একবার তিনি যেচে টাকা চেয়েছিলেন। তাঁর এক ভাইঝির বিয়ে, তিনি দরিদ্র, শিষ্যরা তাঁকে সাহায্য না করলে এই দায় থেকে উদ্ধার পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না এই কথাই তিনি বলেছিলেন। সব শিষ্যই তাঁকে কিছু কিছু সাহায্য করেছে। বাবা পিসিমা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। বাইরে এসে ফিসফিস পরামর্শ হ'ল। বাবা বোধ হয় সামান্য কিছু দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। ইতিপূর্ব্বেও পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে গুরুদেবকে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করতে হয়েছে। সেইজন্যে বাবা আর এই প্রস্তাবকে তেমন প্রসন্নতার সঙ্গে নিতে পারছেন না। তা ছাড়া আগরপাড়ার ওই জমিটা কিনতে গিয়ে তাঁর হাতও এখন খালি। পিসিমার ভক্তি-বিশ্বাস তখন এমনই অটল যে, তিনি পারলে তাঁর সর্ব্বস্ব উজাড় করে দিতে পারলেই খুশী হন। কিন্তু তিনি গরীব; তাঁর তোরঙ্গে বিধবার শেষ সম্বল যা ছিল তাই তিনি থমথমে মুখে বার করে আনলেন। বাবাও কিছু দিলেন। সব মিলিয়ে শ'তিনেক হ'ল। আমাদের তথনকার অবস্থায়

সে-টাকার দাম অনেক! বাবার দোকান তখন এতটা ফুলে-ফেঁপে ওঠে নি। গুরুদেব কিন্তু টাকার পরিমাণ দেখে যে খুব একটা খুশী হ'লেন তা মনে হ'ল না।

কিন্তু আস্তে আস্তে তাঁর সেই প্রচণ্ড মহিমার জ্যোতি যেন নিষ্প্রভ হয়ে যেতে লাগল। তাঁর রংয়ের জেল্লা যেমন কমল, তেমনি নিভল তাঁর দোর্দ্দণ্ড দাপট। এর কারণ নিয়ে মায়েদের মধ্যে আলোচনা থেকে যা বুঝতাম তা হ'ল গুরুদেবের আর্থিক অবস্থা এখন সুবিধের নয়। মেয়েগুলি বড় হয়েছে, বড় ছেলেটি কোথায় একটা কাজে ঢুকেছে কিন্তু আয়পত্তর যৎসামান্য। শিষ্যদের ভক্তি এখন কমে গিয়েছে, সবাই যে যার জ্বালায় জ্বলছে, পিতৃ-পিতামহের গুরুদেবকে ভক্তিশ্রদ্ধা জানাবার আগ্রহ-উৎসাহে এখন ভাঁটা পড়ে গিয়েছে। এই সব কারণে গুরুদেবের দিন চলা হয়ে উঠেছে কঠিন। এখনকার লোকে ঠাকুরদেবতার চেয়ে কাজকর্ম্ম, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে বেশী ঝুঁকেছে, মন্দিরে না গিয়ে, যাচ্ছে আপিস-কাছারিতে, যেখানে দুটো পয়সার সংস্থান হ'তে পারে। কালের হাওয়া বদলাচ্ছে, বাপ যেখানে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ত পায়ে, ছেলে সেখানে কষ্টে-সৃষ্টে কাষ্ঠ হাসি হেসে হাত তুলে নমস্কার করছে।

সীতুদাকে বললাম, 'কি গো গুরুদেব ত শাপ দিয়ে ভস্ম করতে পারেন আর নিজের দরকারে ফুসমন্তরে কতকগুলো নোট তৈরি করতে পারছেন না? মাটি খুঁড়ে একটা সোনার খনি খুঁজে নিলেই ত পারেন।' সীতুদা চোখ-মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'যা যা, মেলা বকিস নি। ওঁরা হ'লেন ত্যাগী মহাপুরুষ, নিজের জন্যে কিছু করেন না। তাই যদি হ'ত একদিন গাড়ি হাঁকিয়ে আসতেন আমাদের বাড়ী। অমন ধুলো পায়ে রুক্ষু জটা নিয়ে হাজির হতেন না। আসলে ওঁদের প্রাণ কাঁদে অন্যের জন্যে। তবে এটুকু জানিস' —সীতুদা চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলত, 'ওই কমণ্ডলুর জল যদি কারুর গায়ে ছিটিয়ে দেয় না ব্যস্, আর দেখতে হচ্ছে না— অমনি সব ফরসা! ভুস্ করে সব তলিয়ে যাবে।' সীতুদা বলত, আমরা সব হাঁ করে শুনতাম কিন্তু একটু যেন অবিশ্বাসের ছোঁয়া থাকত তার মধ্যে। সত্যিই যদি ওঁর এত ক্ষমতা, তা হ'লে নিজের জন্যে কিছু করতে এত দ্বিধা কেন? এই কষ্টভোগ, অন্যের কাছে নিজেকে হেঁট করার চাইতে নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেওয়া কি কম গৌরবের নয়? আবার ভাবতাম হবেও বা, ওঁর মধ্যে এমন এক শক্তিময়তা আছে যা কি না এই সাংসারিক কষ্টের কাঁটা-গুলিকে ম্লান করে দিয়ে হাসতে থাকে। বাইরে যা দেখি সেটাই হয়ত সব নয় কিংবা আমরা যাকে উপবাসের কষ্ট বলে মনে করি আসলে তা হয়ত বৈরাগ্যের রুক্ষতা।

অল্প দিনের মধ্যেই দেখলাম তাঁর অবস্থা আরও খানিকটা নীচে গড়িয়ে গেল। চোখের কোল গভীর হ'ল, জটায় আরও পাক ধরল। মা'র মুখে শুনলাম তিনি দেনা করে মেজ মেয়েটির বিয়ে দিয়েছেন। এখন সেই চড়া সুদের টাকা গুনতে ওঁর প্রাণান্ত হচ্ছে। এদিকে অন্য দু'টি মেয়েও মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠছে। তাদের বিয়ের কথাও ভাবতে হচ্ছে এখন থেকে। এখনও গুরুদেব এলে তাঁর সামনে যথারীতি মিষ্টান্নের থালা ও তাঁর প্রাপ্য দক্ষিণার ক'টি রৌপ্য মুদ্রা তাঁর সামনে সাজিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর সেই একনিষ্ঠ অটল ব্যক্তিত্ব, সেই একনিষ্ঠ মন্ত্রোচ্চারণ আর তেমন করে মনকে মুগ্ধ করে না। কেমন একটা ধোঁয়াটে আচ্ছন্নতা, সব কিছুর মধ্যে তাঁর সেই টাকাগুলো গুনে ট্যাকে পোরার দৃশ্যটাই প্রবল হয়ে চোখে পড়ে। আমাদের সঙ্গে দু'টি-একটি কথা বলেন। একদিন আমার মাথায় হাতও রেখেছিলেন, 'ক'টায় উঠছিস আজকাল?' 'আজ-কাল ও খুব ভোরে ওঠে,' পিসিমা আহ্লাদ করে বলে-ছিলেন। 'ভাল, খুব ভাল। ভোরে উঠতে হবে, শরীরটাকে গড়তে হবে মজবুত করে। জীবনে দুঃখু আছে অনেক'— বলেই সঙ্গে সঙ্গে আনমনা হয়ে গেলেন, জানলা দিয়ে কোন দূর লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন উদাস চোখে।

কিন্তু এর পর এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্যে আমরা কেউ-ই প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা আমাদের সেই বয়স থেকেই বুঝতে শিখেছিলাম যে, বাস্তব জীবনের ঘটনা মাঝে মাঝে কল্পনাশক্তিকেও তাক লাগিয়ে দেয়। সীতুদা যে চিরকালই আমাদের মধ্যে সবজান্তা সেজে বেড়ায় সে-ও পর্য্যন্ত হাঁ হয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা দেখে।

সেটা ছিল একটা শীতকালের সন্ধ্যে। আমরা সব রেলের মাঠে ফুটবল পিটে বাড়ী ফিরেছি। নিয়ম ছিল, অন্ধকার হবার আগে বই খুলে বসতে হবে টেবিলে। সেই রকম ভাবে বই নিয়ে আমরা সব বসে আছি, এমন সময় দরজা দিয়ে কে একজন বাড়ীতে ঢুকল। এমন ভাবে ঢুকল

যেন এ বাড়ী তার বিশেষ চেনা কিন্তু আমরা আগন্তুককে দেখে ঠিক চিনতে পারলাম না। অবশ্য সদরের আলোটা জ্বালা না থাকায় মুখটাও ঠিক দেখা যাচ্ছিল না। লোকটি দরজার কাছে এসে দাঁড়াতে আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ কারও মুখে কথা নেই। হঠাৎ সীতুদা সবাইকে ডিঙ্গিয়ে এক লাফে তাঁর পায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। তখন আমরা যেন চমকে জেগে উঠলাম ঘুম থেকে। আরে, এ যে গুরুদেব!

কিন্তু একি চেহারা হয়েছে তাঁর! সেই বিশাল জটা-দাড়ি সব অন্তর্হিত! ছাঁটা চুল, গায়ে খদ্দরের জামা, পরনে ধুতি। কে তাঁর সেই রক্তাম্বর ছিনিয়ে নিল! মুখে শান্ত হাসি, সেই রুদ্রতাকে এমন ভদ্র করে ছোট করে আনল কে?

গুরুদেব ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন, আগে তিনি সোজা হনহন করে ওপরে চলে যেতেন, কোনদিকে দৃকপাত করতেন না। আজ কিন্তু কুণ্ঠিত পদক্ষেপে ভেতরে ঢুকে একটি চেয়ারে বসে পড়লেন। চিন্তামগ্ন, ঈষৎ কৃশ গম্ভীর মুখ তাঁর। কার মুখে খবর পেয়ে পিসিমা তড়িঘড়ি নেমে এলেন। কিন্তু গুরুদেবের এই নতুন চেহারা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন দরজার কাছে। গুরুদেবের মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল। নিজেকে সামলে কাছে এগিয়ে এসে পিসিমা বললেন, 'একি বাবা, আপনি!'

গুরুদেবের হাসিটা তেমনি জেগে রইল। আস্তে নীচু গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, এই একবার এলাম। আমার এই জামা-কাপড়…খুব অবাক হয়েছ না?' বলে মাথা নীচু করে হাসতে লাগলেন।

লক্ষ্য করলাম তখনও পিসিমা ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়েন নি তাঁর পায়ের ওপর। 'একটা কাজ পেয়ে গেলাম,' গুরুদেব মাটির দিকে তাকিয়ে লজ্জা-লজ্জা মুখে বললেন, 'অশ্বিনী, আমার সেই বাগবাজারের শিষ্যই ঢুকিয়ে দিল…। তা কাজে-কর্মে পোষাকটাও ত তেমনি হওয়া দরকার।' 'বাবা!' পিসিমা হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন। কাটা মাছের মত ছটফট করে উঠে বললেন, 'আপনি শেষে—!' এতক্ষণে পায়ের ধুলো নিলেন তিনি হেঁট হয়ে। ছোকা আমার কানে কানে বলল, 'আবার টাকা নিতে এসেছে। বাবা বলেছে এবার টাকা চাইলে বার করে দেবে ঘাড় ধরে।' সীতুদার দিকে তাকালাম। সেও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের বাইরে এসে চোখ মুছতে মুছতে পিসিমা বললেন, 'হাজার হোক গুরুদেব, বংশের ধারা ত রক্ষা করতে হবে।' ওপরে উঠে গেলেন তিনি। সমস্ত বাড়ীতে একটা থমথমে ভাব। বাবা রাগ-রাগ মুখে বললেন, 'ভাল আপদ হ'ল দেখছি। বছরে দশ বার করে আসবে। আর মুঠো মুঠো টাকা নিয়ে যাবে। একি বাপের জমিদারী নাকি!' পিসিমাকে বললেন, 'ত্থাখ্ একটা বুদ্ধি খাটাই। আমি আর সামনে যাব না, তা হ'লেই আবার কাঁদুনি গাইবে।' পিসিমা ঘাড় নেড়ে চলে এলেন ভাঁড়ারে। জলখাবারের থালা সাজাতে সাজাতে তিনি সহস্রবার ধিক্কার দিলেন নিজের ভাগ্যকে। মা সব শুনে গালে হাত দিয়ে বললেন, 'এমন কাণ্ড আমরা জীবনে শুনি নি!' পিসিমা ধরা গলায় বললেন, 'সে যাই হোক, এসেছেন যখন তখন ত চাইবেনই কিছু। তুমি দেখ ত শেতলাপুজোর জন্যে যে টাকাগুলো তোলা আছে, তা থেকে…।' পিসিমা খাবারের থালা নিয়ে নীচে নামতে লাগলেন। আমরাও তার পিছু পিছু দুড়দাড় করে নেমে এলাম। এ যেন বেশ একটা মজা হচ্ছে, ভালুক নাচের মত অনেকটা!

আমাদের দেখে তাঁর মুখ একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, এই যে, পড়াশুনো করছিস ত? বেশ। এখন ক'টায় উঠছ তোমরা সব?'

'আমি এখন খুব ভোরে উঠছি,' সীতুদা বলল। কিন্তু ছোকা ঠোঁট ফুলিয়ে বসে রইল ও-কোণে। সে আটটার আগে লেপ ছাড়ে না কোনদিন। তা শুনে গুরুদেব হাসলেন, বললেন, 'তা হ'লে ওর সঙ্গে আমার আড়ি। যারা ভোরে ওঠে, শরীর শক্ত করে, তারা আমার বন্ধু। শোন, জীবনে অনেক দুঃখু পাবি, কিন্তু ডরবি না।'

এমন সময় ফল-মিষ্টির থালা এসে গেল। টেবিলের ওপরটা হাত দিয়ে মুছে থালাটা সেখানে রাখলেন পিসিমা। গুরুদেব বললেন, 'আবার এসব কেন? দাও, এদের সব ভাগ করে দাও।' বলে আমাদের দেখিয়ে দিলেন। 'আমি ক্যান্টিনে খেয়ে বেরিয়েছি।' এই বলে তিনি নিজে আমাদের হাতে ফল-মিষ্টি সব তুলে দিলেন। আমি পেলাম মুগের নাড়ুটা, সীতুদা ক্ষীরের বরফি, ছোকা পেল দুটো দানাদার। 'ওকি, আপনি যে কিছুই খেলেন না!' পিসিমা

বললেন। 'এই যে আমি খাচ্ছি,' বলে তিনি শশার টুকরোটা মুখে ফেলে দিয়ে চিবুতে লাগলেন। আর আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। দাড়ি-গোঁফ ছাড়া তাঁকে একেবারে অন্য মানুষ, অনেক সহজ আর শিশুর মত লাগছিল। বাবা ইতিমধ্যে পেছনের দরজা দিয়ে দোকানে চলে গিয়েছিলেন। 'দাদা বাড়ী নেই,' অন্ধকার মুখে আঁচলের গেরো খুলতে খুলতে পিসিমা বললেন, 'আর আমাদেরও খুবই টানাটানি যাচ্ছে। বেশ কষ্টের সঙ্গেই বললেন পিসিমা। 'না না, একি!' গুরুদেব হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন, তাঁর মুখে সেই পুরণো দীপ্তির ছোঁয়া দেখলাম। হাত নেড়ে ম্লান হেসে বললেন, 'এ সবের আর দরকার নেই। না না, সত্যি বলছি, আমি শুধু ওদের একটু দেখতে এসেছিলাম।' এই বলে আমাদের সবাইকে ঘরে রেখে গুরুদেব বেরিয়ে গেলেন।

সীতুদা বলল, 'দেখলি সবাইকে কি রকম বোকা বানিয়ে গেল! বলেছিলাম না, ওদের ক্ষমতা অনেক!'

আগামী বৈশাখ হইতে

নিয়মিত বিভাগ

'বিশ্ব-সাহিত্য'

কাংড়া—বজ্রেশ্বরী মন্দির

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

টাইম টেবলে দেখেছিলাম—জ্বালামুখী রোড স্টেশন থেকে কাংড়া মাত্র দশ মাইল। বড় জোর এক ঘণ্টার পথ। ঠিক করেছিলাম বাসেই যাব ওটুকু পথ। কিন্তু বাসের টিকিট কিনে হিসাবের ভুলটা ধরা পড়ল। জ্বালামুখী রোড থেকে মন্দিরের বাস ভাড়া নিয়েছিল পনেরো আনা—দূরত্ব তের মাইল। কিন্তু মন্দির থেকে কাংড়ার ভাড়া লাগল এক টাকা এগারো আনা। দশ মাইল নয়, তেইশ মাইলের ভাড়া। এ মন্দির থেকে ও মন্দির—রেল লাইনের বুড়ী না ছুঁয়ে যাওয়ার উপায় নাই। পাঠানকোট থেকে যোগিন্দর নগর পর্যন্ত রেললাইন আর বাস-পথ পাল্লা দিয়ে ছুটেছে। ঠিক পাশাপাশি নয়—কখনও ডান ধারে, কখনও বামে, কখনও নীচেয়, কখনও বা উপরে মাঝে মাঝে হারিয়ে গেছে—আবার আচম্বিতে সামনে এসে পড়েছে। দৌড়ের পাল্লায় দু'টি পথের লুকোচুরি খেলাটা বেশ জমেছে। এই খেলাতে আবার যোগ দিয়েছে নদী। সে এঁকে-বেঁকে বড় বড় পাথর-নুড়ি টপকে সকলের নীচে দিয়ে ছুটেছে। নামবার সময় এরা তিন সঙ্গীতে একমুখী, ঊর্দ্ধারোহণে নদী বিপরীতগামিনী। কাংড়ার নদীর নাম বনের। নামটা বলেছিলেন বৈজনাথ ধরমশালার পণ্ডিতজী। ইতিহাস খুঁজলে এর ভদ্রগোছ একটা নাম হয়ত মিলবে, কিন্তু বনের নামটিই বনঝোপ-ভরা পাহাড়ী নদীর পক্ষে মানানসই। এখন বর্ষাকাল নয়, নদীর জলধারা অত্যন্ত ক্ষীণ-অদৃশ্যপ্রায়। এর সর্বদেহে প্রস্তর-পঞ্জরাস্থি সুপ্রকট—রূপলাবণ্যহারা নদী। বর্ষাকালে এর সর্বনাশী রূপের সঙ্কেত দু'চারশো ফুট নীচেকার প্রস্তর-আকীর্ণ কায়াতে এখনও বিদ্যমান।

আমাদের বাসটা ফিরে আসছে—তের মাইলের মত সেই পুরাতন পথ ধরে জ্বালামুখী রোড স্টেশনে। গন্তব্যস্থান ধরমপুর। মাঝখানে কাংড়া শহর। জ্বালামুখী রোডের সেই চায়ের দোকানের সামনে বাস থামল। যে মজুরটি মন্দিরে যাবার দিন আমাদের মালপত্র বাসের মাথায় তুলে দিয়েছিল—তার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই সে পরম আত্মীয়ের মত ঘাড় কাত করে হাসলে। কত সামান্য—অথচ কি অনির্বচনীয় এই ভাব-প্রকাশ। কতকগুলি দুর্লভ মুহূর্ত বুঝি জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গে প্রীতির সুতো দিয়ে এমনি করে বাঁধা থাকে। না হ'লে এক দেশের মানুষের দৃষ্টি অপর দেশের মানুষের মনে খুশির ঢেউ তোলে কেন।

মিনিট দশ থেমে বাস ছুটল নূতন পথে। এ বাস সরকারী নয়, কিন্তু সঠিক সময় ধরে চলে। কন্‌ডক্টার-ড্রাইভার অধিকতর নির্ভরযোগ্য। বাস মজবুত, সুন্দর—আরামদায়ক গদিমোড়া আসনগুলি। প্রত্যেক আসনে নম্বর দেওয়া। সমস্ত আসন ভর্তি হয়ে গেলে বাড়তি লোক নেয় না। বাসের মাথায় চাপান থাকে মালপত্র—এর জন্য আলাদা ভাড়া লাগে না। তবে পণ্যদ্রব্যের মাশুল দিতে হয়।

আমার পাশেই বসেছিলেন এই দেশের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী। ভদ্র বেশবাস মার্জিত রুচির মানুষ। দেবদ্বিজে ভক্তিমান, কিছু কিছু তীর্থ ভ্রমণও করেছেন। উনি ধরমপুরে চলেছিলেন। ধরমপুরে দর্শনীয় কি আছে জিজ্ঞাসা করায় জানালেন ওখানে কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী দপ্তর আছে। জল হাওয়া ভাল। স্বাস্থ্যের জন্য অনেকে হাওয়া বদলাতে যান।

আমরা কাংড়া যাচ্ছি দেবী-দর্শনে শুনে প্রীত হ'লেন। বললেন, আমি কলকাতায় গিয়ে কালী-ঘাটে দেবী-পীঠ দর্শন করেছি। ইচ্ছা আছে কামরূপে যাব।

কামরূপে যাবার রাস্তা ও ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। পথটা মোটামুটি বাৎলে দিলাম, ভাড়ার কথা আন্দাজ মতও বলা সম্ভব হ'ল না। ভাড়া ত দফায় দফায় বাড়ছে। সামনে পয়লা জুলাই (১৯৬২) থেকে আর এক দফা বাড়বে।

অতঃপর কাংড়ায় কোথায় উঠব জিজ্ঞাসা করাতে উনি বললেন, আপনি যখন তীর্থযাত্রী, মন্দিরের কাছাকাছি থাকবেন।

স্টেশন থেকে মন্দির কতদূর?

উনি বললেন, যদি কাংড়া শহরের বড় স্টেশনে নামেন মন্দির দূর পড়বে। দু'মাইলটাক হবে। আপনি মন্দিরের কাছেই যে স্টেশন আছে সেইখানে নামবেন। মন্দিরের গায়েই পাবেন ধর্মশালা।

বললাম, কাংড়া তা হ'লে ত বেশ বড় শহর?

উনি উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, হবে না—এটা যে জেলা শহর! এখানে পুরণো কেল্লা আছে, স্কুল-কলেজ আছে, আদালত আছে ফরেস্ট আপিস আছে—সরকারের আরও অনেক দপ্তর আছে। রেল-স্টেশনও আছে দুটো, একটা কাংড়া আর একটা কাংড়া মন্দির। অনেকখানি চওড়া সমতল জায়গা, মনে হবে পাঞ্জাবের কোন বড় শহরে রয়েছেন।

বললাম, কিন্তু এখানে পাঞ্জাবীদের খুব কমই দেখছি।

হ্যাঁ, এ দেশে বেশীর ভাগ মানুষই রাজপুত। পাঞ্জাবীদের সঙ্গে এদের মিল কম। এই দেখুন না, আপনাদের বাঙালী মেয়েদের মত এদেশের মেয়েরাও হাতে লোহা পরে, মাথায় সিঁদুর দেয়। এদের পোষাক-পরিচ্ছদও পাঞ্জাবীদের থেকে আলাদা। খাওয়ার ধরনও এক নয়।

এরা কি রাজপুতানা থেকে এসেছিল?

উনি বললেন, শুনি ত—আরও উত্তর থেকে এসেছিল। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে হটে গিয়ে এদিকে এসেছিল। সে অনেককাল আগেকার কথা।

ইতিহাসের তথ্য উনি জানতেন না—প্রসঙ্গটা আর ওদিকে টানলেন না। বললেন, এ-শহরে মানুষজন বড় কম নয়, বাড়ী-ঘর-দুয়ারও প্রচুর।

বললাম, এখন কিন্তু এই পথ দিয়ে যেতে যেতে তা মনে হচ্ছে না। একধারে খাড়াই পাহাড় অন্যধারে গভীর খাদ। মাঝে মাঝে অবশ্য ক্ষেত-খামার দেখছি। আমবন, বাঁশবন, চাষ-আবাদ—সমতল জায়গার মতই মনে হচ্ছে, বাড়ীঘর তেমন দেখছি না।

উঁচু নীচু জায়গা ত, সবটা একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি এখনও শহরের বাইরে রয়েছে। শহরে এলে দেখবেন—দু'ধারে কত বাড়ী-ঘর, কত লোকজন।

প্রাসাদ অট্টালিকা দেখার কৌতূহল ছিল না। এই নূতন ধরনের পথই মনকে টেনে রেখেছে। বাঁকা-চোরা উঁচু-নীচু পথে দোলা দিতে দিতে চলেছে বাস—যেন নাগরদোলায় চেপে দোল খেতে খেতে চলেছি। এক একটা বাঁক ঘুরে নূতন এক একটি দৃশ্যের মধ্যে আসছে বাস। বাঁকের মুখে জমি কখনও সঙ্কীর্ণ হচ্ছে, কঠিন উদ্ধত পাহাড় বাসের বুক চেপে এগিয়ে আসছে, ভয়াল ভ্রূকুটি ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে নদীর খাদ—পরক্ষণেই বাঁক ঘুরে অতি-বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের উদার অভয় হাসি আশ্বস্ত করছে যাত্রীদলকে। আবার দু'একটি আমগাছ, কখনও ঘন বাঁশঝাড়, কখনও বা চিড় গাছের সুপরিচ্ছন্ন বিন্যাস আর বুনো ফুলের রূপসৃষ্টি দৃষ্টিকে মুগ্ধ করছে। মাঠের বুক চিরে পায়ে-চলা গ্রামের পথ চলে গেছে কতদূরে—পাহাড়ের ভূগু-স্থানে ছাগল চরছে নির্ভয়ে—গরুর পাল তৃণ-সন্ধানে ভূমিলগ্ন মুখ...কাংড়া উপত্যকায় বাংলা দেশের ছায়া ভাসছে মাঝে মাঝে। আর একটি আশ্চর্য দৃশ্য—এক রকম ফুলের প্রাচুর্য এই উপত্যকায় যত এগিয়ে যাচ্ছি—ততই দু'ধারে চোখে পড়ছে। গাছগুলি বড় বড়, লম্বা লম্বা পাতার ফাঁকে নীলাভ, ফুল, ঢোল-কলমীর বৃহৎ সংস্করণ। সবুজের সঙ্গে নীলের মিশ্রণ ভারি চমৎকার লাগছে। ফুলের নাম শুনেছিলাম বৈজনাথে পণ্ডিতজীর মুখে—গাশেলা।

বাসের দোলা কিন্তু সকলের পক্ষে সুখপ্রদ নয়। একজন যাত্রী ত অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন দেখছি। একটু এগেই মেয়েটি বমি করতে সুরু করল। পাশের যাত্রীরা অসুবিধায় পড়লেন। কিন্তু বিরক্তিসূচক মন্তব্য করলেন না কেউ। পাহাড়ী পথে বাসের মধ্যে এসব যেন নিত্যদিনের ঘটনা। একে বলে 'চক্কর' লাগা।

বাসে বসেই কাংড়ার পুরণো কেল্লা দেখলাম। এখানে বেশ কিছুক্ষণ থামল গাড়ি। কিছু যাত্রী নেমে গেল।

বহু পুরাতন দুর্গ—পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় পুরণো ধাঁচে তৈরী। সেকালের নিয়ম অনুযায়ী যতখানি দুর্ভেদ্য করা সম্ভব—তা করা হয়েছিল। হাজার ফুট নীচের নদীগর্ভ থেকে খাড়াই উঠে গেছে দুর্গ-প্রাচীর, চারিধারে লুপ্ত পরিখার চিহ্ন, দুর্ভেদ্য পাথরের অতি চওড়া দেওয়াল। সেকালে গোলাবারুদের চলন ছিল না, উন্নততর রণ-প্রণালী ছিল অজ্ঞাত—সেইকালে, প্রায় হাজার বছর আগে এমনি একটি সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে নিরাপদ করতে চেয়েছিলেন শাহী বংশের হিন্দু রাজা আনন্দ পাল। এই শাহী বংশ ছিল ভারত সীমান্তের সজাগ প্রহরী। এই বংশের কীর্তিমান রাজা জয় পাল সবুক্তগিনের সময় থেকে তুর্কী আক্রমণ প্রতিরোধ করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তুর্কীর উন্নততর রণপ্রণালী ও ক্ষিপ্রগতির জন্য তাঁকে বারবার পরাজয় বরণ করতে হয়। সবুক্তগিনের মৃত্যুর পর সুলতান মামুদও বারবার ভারত লুণ্ঠন করেছিলেন শাহী রাজধানীর মাঝখান দিয়ে। সেই পথ শাহী রাজারা সর্বস্ব বিনিময়ে রোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। শাহী বংশ ধ্বংস হয়েছিল সেই সংঘর্ষে। তবু নতি

স্বীকার করেন নি। জয় পালের পুত্র আনন্দ পালের সঙ্গে কয়েকবার সংঘর্ষ বেধেছিল সুলতান মামুদের। শেষ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আনন্দ পাল আশ্রয় নিয়েছিলেন কাংড়া দুর্গে। তাঁকে অনুসরণ করে মামুদ এসেছিলেন কাংড়ায় এবং তাঁর হাতে এই জনপদ লুণ্ঠিত হয়েছিল নির্মমভাবে। এর পর এই দুর্গের গুরুত্ব তেমন ছিল না।

এই দুর্গের পর মাইল খানিক ঘন বসতিপূর্ণ রাস্তা দিয়ে বাস চলল। সমতল-লভ্য একটি পূর্ণাঙ্গ চেহারার শহরকে দেখলাম। এই শহরের মাঝখানেই আবার বাস থামল। বেশ বড় মত জমকালো স্টেশন—রেলওয়ে স্টেশনের মতই সুব্যবস্থা। এটি মণ্ডি-কুলু ট্রানস্‌পোর্ট কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠান। বেশ বড় প্রতিষ্ঠান, গাড়িগুলি চমৎকার, নিয়মানুবর্তিতা প্রশংসনীয়। চালক ও কণ্ডাক্টরদের দক্ষ চালনায় ও সৌজন্যে যাত্রীদল প্রীত।

বাস থামলে সহযাত্রী ভদ্রলোক হাঁকাহাঁকি করে একটি মজুর ঠিক করে দিলেন। তাকে বুঝিয়ে বললেন, ইনি বিদেশী মানুষ, আমাদের অতিথি, এঁকে একটা ভাল ধর্মশালায় পৌঁছে দেবে।

আমার দিকে ফিরে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, নমস্তে।

প্রকাণ্ড একটা ময়দান আড়া-আড়ি পার হয়ে এলাম। এদিকের রাস্তাটা ঈষৎ উঁচু হয়ে উপরে উঠেছে—সামান্যমত একটা চড়াই। পথের ধারে জলের কলে ভিড় জমেছে মন্দ নয়। জল চলে যাবার সময়ই হয়ত হয়েছে।

তেমাথায় এসে মজুর একটি পুরাতন বাড়ীর সদর-দরজার রোয়াকে মোট নামাল। বলল, মালিকানকে বলে একটা ঘর নিয়ে নিন।

মাত্র চার-পাঁচখানি ঘর নিয়ে একটা ইমারত, চেহারা অত্যন্ত পুরাতন। সঙ্কীর্ণ উঠোন নোংরা আবর্জনায় ভর্তি। ঘরের ছাদ আর বারান্দা পাথরের টালি দিয়ে ছাওয়া—আকাশের আলোও সেই ছাউনির ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারছে। জলের ব্যবস্থা দেখলাম না, শৌচাগারের কথা না বলাই ভাল। এটা আদৌ ধর্মশালা কি না কে জানে!

পছন্দ হ'ল না। মজুরকে বললাম, দোসরা ধর্মশালায় চল।

মজুর মাথা নেড়ে বলল, মন্দিরের কাছে ধর্মশালা এই একটি।

এমন বড় শহরে—ধর্মশালা এই একটি—আর তার এমন দুর্দশা! এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি রাস্তায় মানুষজন চলছেই না—দু'ধারে দোকান-পাট বন্ধ। আজ রবিবার, দোকান-কর্মচারীদের ছুটি। কাকে যে জিজ্ঞাসা করি ভাল একটি আশ্রয়স্থানের কথা। মজুরের মেজাজটিও খুব মোলায়েম বলে বোধ হ'ল না। সারা কাংড়া ও কুলুতে দু'টি মাত্র মজুর দেখেছিলাম, যারা উচিত পারিশ্রমিক নিয়েও খুঁতখুঁত করেছিল এবং বিদেশীর জন্য কষ্ট স্বীকারে পরাঙ্মুখ ছিল। এ কিন্তু পারিশ্রমিক নিয়ে গোলমাল করে নি, আমাদের একটি ভাল আশ্রয়ে স্থিত করার পরিশ্রমটুকু স্বীকার করতে চায় নি।

গত্যন্তর ছিল না—প্রাপ্য নিয়ে মজুর চলে গেল—আমরা ধর্মশালাতেই রয়ে গেলাম।

ধর্মশালার মালিকান এখানেই ছিলেন। নীচের একটা ঘরে ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকেন তিনি। বিধবা, রোগে কিছু কাতর। মনে হ'ল বাত-জাতীয় কোন রোগে ভুগছেন। তারই ব্যথায় এক একবার কাতরোক্তি করছিলেন।

তাঁকে জলের কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

ধর্মশালার বার-উঠানে প্রকাণ্ড একটা ইঁদারা দেখিয়ে দিলেন। বহুকালের অব্যবহার্য পুরনো ইঁদারা—সে জল পান করা ত দূরের কথা চোখে-মুখে দেওয়াও চলবে না। তা ছাড়া জল তোলবার সাজসরঞ্জাম কই! দড়া বা বালতি কিছুই দেখলাম না। শুধু ইঁদারা দেখে ত জলের অভাব মিটবে না।

উনি বললেন, জলের কল রয়েছে কাছে—তাই কেউ ইঁদারার জল তোলে না। না হ'লে এমন ইঁদারা এ তল্লাটে—

সে গুণ-কীর্তন শোনার ধৈর্য ছিল না—বললাম, এখন জলের কি ব্যবস্থা হবে?

উনি বললেন, তোমাদের দু' কলসী জল দিচ্ছি, রান্না খাওয়া কর। আর বেলা একটার সময় কলে জল আসবে, সেই সময় জল ভরে নিও।

বললাম, পথে আসবার সময় ত দেখলাম কলে জল রয়েছে।

বললেন, ওটা নীচু জায়গা বলে জল রয়েছে। এ পথটা যে অনেকখানি চড়াই, বেলা দশটার পর চার-

পাঁচ ঘণ্টা জল পাওয়া যায় না। তা এখন নীচের থেকে জল আনতে পারবে কি?

ছুটো জলের কলসী উনি এগিয়ে দিলেন।

জায়গাটা ভাল করে দেখবার জন্য খিড়কি দুয়োরটা খুলে ফেললাম। ঐখানেই ইঁদারাটা রয়েছে। অব্যবহার্য ইঁদারার পাড় ও উঠোন আবর্জনায় ভর্তি। সেই আবর্জনাস্তূপে কয়েকটা মুরগী উড়ে বেড়াচ্ছে— উঁচু ঢিবিটায় উঠে ছুটো ছাগল গলা বাড়িয়ে একটা কলাগাছের পাতা ধরে টানাটানি করছে। একটু পরে দেখি দু'জন লোক ইঁদারার পাশ দিয়ে ওধারের বসতির মধ্যে চলে গেল। ইঁদারাটা মনে হ'ল সরকারী সম্পত্তি। জলের কল না হওয়া পর্যন্ত এর কদর ছিল। এর ধার ঘেঁষে কাঁচা গলিপথটা ওধারে একটা দুর্দশা-গ্রস্ত পল্লী পর্যন্ত চলে গেছে। পাড়াটাও খুব ভাল বলে বোধ হ'ল না।

অপ্রসন্ন চিত্তে আকাশের পানে চাইলাম আঁর বলতে কি, তৎক্ষণাৎ সমস্ত ক্ষোভ গ্লানি অসন্তোষ ধুয়ে-মুছে নিঃশেষ হয়ে গেল। মাটির পরিবেশ যত নোংরাই হোক—আকাশ-পটভূমিটির তুলনা নাই! সে আকাশ সূর্যকিরণে নীলকান্ত মণির মত উজ্জ্বল বললে নয়—তার কোলে মহান হিমবন্তের অপরূপ বিন্যাস আমার সব অশান্তিকে মুহূর্তে দূরে ঠেলে দিলে। উত্তরের দিক-মণ্ডলে হিমালয়—স্তরে স্তরে শিখরের তরঙ্গ তুলে আকাশের কোলে মাথা তুলেছে বিশাল একটা সমুদ্রের মত। ধূসর শৈলের ঊর্দ্ধদেশে শ্বেত উত্তরীয়— শিরোদেশে শুভ্র তুষার কিরীট। উত্তর দিকের সবটাই চিত্রলেখাবৎ। জ্বালামুখীতে এমন ধবল শৃঙ্গ-ভূষিত গিরিমালা চোখে পড়ে নি, কাংড়া মন্দিরের পাদদেশে এসে এই ছবি দেখলাম। পরে শুনেছিলাম, এইটিই ধবলাধার গিরিশ্রেণী। অস্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ আর রইল না। কবি করুণানিধানের দু'টি অমর ছত্র মুখর হয়ে উঠল :

নীল আকাশে বুলিয়ে তুলি—
তুষার শাদা শেখরগুলি
কে আঁকিল মেঘ-সাগরের গায়।

ধর্মশালায় দ্বিতীয় কোন প্রাণী ছিল না। পথের ধারের সব দোকানই বন্ধ ছিল। কেমন নিঃঝুম ভাব চারিদিকে। একটু পরে ধর্মশালার অধিস্বামিনীও ঘরে তালা লাগিয়ে বাইরে যাবার উদ্যোগ করল। যাবার আগে আমাদের বলল, আমরা মেলা দেখতে যাচ্ছি, ফিরতে সন্ধ্যে হবে। তোমরা বিকেলে ঠাকুর দেখে এস।

ধর্মশালায় দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই—পথ জনমানবশূন্য, সামান্য একটি তালার উপর ভরসা ক'রে কোন্ সাহসে দেবী-দর্শনে যাব! সন্দেহটা ব্যক্ত করতেই উনি হেসে উঠলেন।

আরে—ডরো মৎ। এখানে কোন ভয় নেই, কেওয়ার খোলা থাকলেও কেউ ঘরে ঢুকবে না। আমরা দুয়োর খোলা রেখে রাতে ঘুমুই।

হাসতে হাসতে ওরা নিশ্চিন্তমনে মেলা দেখতে গেল।

আমার কিন্তু একটা কথা মনে পড়ল। জ্বালামুখীর সেই বাঙালী সাধুটি একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, খবরদার এদেশের কাউকে বিশ্বাস করবেন না। বিশ্বাস করেছেন কি দুর্ভোগ।

কথাটা শুনেছিলাম, মনের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি নি। জানি না ব্রহ্মচারীর কোন তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল কি না (কৌপীনবন্ত সন্ন্যাসীর কি বস্তুই বা খোয়া যাওয়া সম্ভবপর!)। আমরা উপদেশটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার দায়িত্ব গ্রহণ করি নি। কথায় আছে বটে অজ্ঞাত কুলশীলস্য...বিদেশ-বিভুঁয়ে মানুষকে বিশ্বাস না করতে পারার অস্বস্তিও ত কম নয়! সন্দেহ-কণ্টক যে সবক্ষণই ভ্রমণ-আনন্দের গায়ে খোঁচা মারতে থাকে।

ব্রহ্মচারীর কথাটা মুহূর্তমাত্র মনে উঠে মিলিয়ে গেল। বেলা পাঁচটা বাজতে-না-বাজতে আমরাও দুয়োরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ইচ্ছে করছিল, শহরটার চারধার ঘুরে দেখে আসি। সন্ধ্যার সময় মন্দিরে গিয়ে দেবী-দর্শন করব। মন্দির ত ধর্মশালার কাছেই।

মন্দিরের পথটা ধর্মশালার গা থেকেই উপরে উঠেছে। কাংড়ার দুর্গ যেমন পাহাড়ের উঁচুতে—মন্দিরও তেমনি উঁচু টিলার মাথায়। এই মন্দিরের কোন একটি জায়গায় উঠে দাঁড়ালে সারা কাংড়ার ছবি স্পষ্ট হবে। পায়ের তলায় চারধারে ঢালু পথ নেমেছে—এক একটি পথের সঙ্গে বাড়ীঘর মাঠ প্রান্তর আপিস উদ্যান, বাস স্টেশন, রেললাইন, বনভূমি, পুরাতন কেল্লা, দূর বিসর্প ক্যানভাসে ছবির পর ছবি জমে শহরটাকে পূর্ণাঙ্গ দেখায়।

বন? হ্যাঁ, রীতিমত বন আছে কাংড়ায়। বুনো বরাহ মহিষ থেকে চিতা, ভালুক এবং নানা জাতের পাখীতে পরিপূর্ণ এর অরণ্যভূমি। শিকারীদের এটা

স্বর্গ ভূমিই। আমাদের প্রিয় বাসভূমির কথাও মনে পড়িয়ে দেয়। আমগাছের ডালে দেহ ঢেকে 'বউ কথা কও' বলে সকাতর মিনতি শুনেছি—কোকিল সাধা গলায় পঞ্চমে তান ধরেছে। জুন মাসের কোকিল—চ্যুতফলরসে ভেজা গলায় সুরটা ঈষৎ কর্কশ হয়েছে তবু বাংলার পল্লী অঞ্চলের বসন্ত-সৌন্দর্য সেই সুধাক্ষরা সুরে ধরা পড়ছে। এই উপত্যকা যেখানে বহুলাংশে সমতল, যেখানে হালে বলদ জুড়ে লাঙলের ফলার সাহায্যে চাষী ভূমি-লক্ষ্মীর প্রসাধন করছে, যেখানে বনভূমি নিবিড় শ্যামল রূপে উদ্ভাসিত, আকাশ ঘন নীল এবং স্নিগ্ধ-ছায়া আমের শাখায় কোকিল এবং 'বউ কথা কও' এরা ডাক দিচ্ছে—বাংলার রূপ আর স্বপ্ন ত সেই রঙে সুরে কল্পনায়···বাঁধা পড়ে গেছে। বাংলাও আমাদের পাছু পাছু এসেছে হিমাচল সন্দর্শনে।

আমরা প্রথমে এলাম বাস স্টেশনে সন্ধান নিতে সকালের বাস কখন ছাড়বে। স্থির ছিল—বাসে চেপে বড় স্টেশনে গিয়ে ট্রেণ ধরব। বাস আপিসে যা জানালে—তাতে সকালের ট্রেণ ধরার আশা কম। সময় তালিকা অনুযায়ী বাস ছাড়ে বটে—এটা ত কাংড়া-কুলু ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর বাস নয়—ব্যতিক্রমও মাঝে মাঝে ঘটে। দশ পনেরো বিশ মিনিটের এদিক-ওদিক হয়ই—। অতএব এর ভরসা না রেখে ছোট রেল স্টেশনটা কোন্ দিকে সেইটি জেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হ'ল। সেই সন্ধান নিতে গিয়ে একটি নিম্নমুখী পথের জনস্রোতে মিশে গেলাম। যত নেমে আসি জনস্রোত ততই উত্তাল হয়ে ওঠে। পরে মনে হ'ল, ধর্মশালার কর্ত্রী বলেছিল—আমরা মেলা দেখতে যাচ্ছি—এ হয়ত তারই চেহারা। একটু লক্ষ্য করে বুঝলাম অনুমান সত্য। উৎসবের সাজসজ্জা, হাসি-গল্প বেলুন বাঁশী, গৃহস্থালীর জিনিষপত্র আর পথের দু'ধারে নানাবিধ খাবারের দোকান ক্রমশঃই মেলার রূপটিকে সজীব করে তুলছে। এমনি করে প্রায় মাইলটাক পথ পেরিয়ে বিস্তীর্ণ একটি মাঠ পেয়ে গেলাম। মাঠের একধারে ছোট একটি শিবমন্দির—আর সর্বত্র দোকানপসার, নাগরদোলা আর মাটির হাঁড়ি কলসী ভাঁড়ে ভর্তি। সমস্ত মাঠটাই নরসমুদ্রের রূপ নিয়েছে। নাগরদোলা দু'টো আর হাড়ি কলসীর গোটা তিনেক পাহাড়—মজ্জমান জাহাজের মাস্তুলের মত দেখাচ্ছে। আর মিলিত কণ্ঠের কোলাহল সমুদ্রগর্জনবৎ মনে হচ্ছে। মাটির জিনিষগুলি নকসা-কাটা, কোনটা বা রঙের প্রলেপে নজর-ধরা। গড়নটা বিচিত্র। এক ধরনের ভাঁড়ের উপরই যাত্রীদের আকর্ষণ বেশী দেখছি—প্রায় সকলকার হাতেই একটা-না-একটা রয়েছে। মেয়েদের সাজ-পোষাকে পাঞ্জাবী এবং রাজপুতানা দুয়ের সংমিশ্রণ। কুর্তা কামিজ চোলি ওড়না পায়জামা শাড়ীর ধরনই যে কত রকম! আর অলঙ্কার-বৈচিত্র্য ত চেয়ে দেখবার মত। এগুলি সর্ব অঙ্গেই সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করে চরণ-যুগল ও নাসাদেশ থেকে এখনও তার নির্বাসন ঘটে নি। যে নথ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে অধিকাংশ বঙ্গ-ললনার মুখচন্দ্রের শোভাবর্দ্ধনকারী হয়ে নাসাদেশে দোদুল্যমান থাকত,—অধুনা পুরাতত্ত্বের বিষয়ীভূত, কাংড়ায় তারই বৃহত্তর সংস্করণ প্রায় প্রতিটি মুখচন্দ্রিমাতে সগৌরবে বিরাজমান। পায়ে পাঁয়জোড় বা মলের চলনও মন্দ নয়। এর গুরুত্বও অসাধারণ। তেমনি গুরুভার হাতের রৌপ্যকঙ্কণ। এগুলি একাধারে অলঙ্কার ও আয়ুধ।

আমরা কয়েকটি পাড়ার ভিতর দিয়ে মেলার মাঠে এসেছিলাম। পথের প্রথমভাগে ছিল একটি সম্ভ্রান্ত পাড়া, আইনজীবীরা এখানে থাকেন। বাড়ীর গেটে নামের ফলকে ওঁদের পরিচয়টা স্পষ্ট। তারপরে সাধারণ গৃহস্থদের বসতখানা—স্লেট পাথরের ছাদ আর বাখারিতে পুরণো টিন বেঁধে উঠোনটাকে বেআব্রু থেকে বাঁচানোর চেষ্টা। সব শেষে অতি সাধারণদের আস্তানা। এখানে ঘরের ছাউনিটাই পর্য্যাপ্ত নয়—তার আব্রু বাঁচানোর প্রশ্ন! সর্বত্রই নিরাবরণ সহজ ভাব—পথে আর বনঝোপে গলাগলি মিতালী। সেই সব বাড়ার ছেলেমেয়েরা উদোম গায়ে ধুলোবালি মেখে গৃহপালিত কুকুর ছাগলের গলা জড়িয়ে খেলা করছে—পুরুষরা দড়ির চারপাইয়ে বসে হুঁকোয় তামাক টানছে ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দে—মেয়েরা গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম করছে সরবে। এই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তবে মেলার হাওয়াটা সকলকারই গায়ে লেগেছে। সবাই চঞ্চল, খুশি-খুশি ভাব। সংসার-সংগ্রামের ক্লেশ ক্লান্তি দুশ্চিন্তার ছায়া আপাতত কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

আমরা ঘুরে ঘুরে মেলায় দোকানপসার দেখছিলাম। (এ ছাড়া মেলায় দেখবার কিই বা আছে!) দোকানপসারের চেহারা দেখছিলাম—যারা সজীব করেছে মেলা, তাদের হাবভাব লক্ষ্য করছিলাম। আসমুদ্র হিমাচল, সব দেশেই মেলার গোত্র এক—মানুষের মনোভিলাষের স্বাদবর্ণ এক। সেই সংসার, সঞ্চয়; ক্ষণিকের জন্য মুক্তির ক্ষেত্রে এসে একটুখানি বৈচিত্র্য উপভোগ।

আত্মীয় বন্ধু পরিচিতজনের সঙ্গে সাংসারিক সুখ-দুঃখের বার্তা-বিনিময়। আশ্চর্য, এমন একটি জিনিস দেখছি না যা কাংড়াতে আছে—বাংলাতে, উত্তর প্রদেশে নাই।

তবে একটি আশ্চর্য জিনিষের সাক্ষাৎ পেয়ে গেলাম। একটি পানের দোকান দেখলাম। বাংলা বা অন্য প্রদেশের বাসিন্দারা ভাববেন—এ আর এমন আশ্চর্য্য কি। পান ত সারা ভারতবাসীর নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ—সর্ব শুভকর্মের প্রতীক। পান-সুপারি দিয়ে নিমন্ত্রণ করার প্রথাটা এক সময়ে সর্বত্র চালু ছিল—অতিথি সৎকারের এটি একটি অপরিহার্য অঙ্গ। পূজা-পার্বণ, মাঙ্গলিক কর্ম বার ব্রত, কোন্‌টিতে না তাম্বুল গুবাকের প্রচলন রয়েছে! ভারতবর্ষের সর্বত্র এর অপ্রতিহত প্রভাব দেখেছি—শুধু পাঞ্জাবে এসে মনে হচ্ছে,এটি দুর্লভ দর্শন বস্তু! অমৃতসরে চা সরবত সিগারেটের দোকান দেখেছি অজস্র অথচ পানের দোকান কদাচিত চোখে পড়েছে। জ্বালামুখীতে বোধ করি—দু'টি দোকান দেখেছিলাম, কাংড়াতে একটিও নয় —এই মেলাতে প্রথম চোখে প'ড়ল। দাম শুনে চমৎকৃত হ'লাম—একটি আস্ত পানের দাম ছ নয়া পয়সা! অথচ এই বর্ষার প্রারম্ভে বাংলা দেশে পানের অসচ্ছলতা নিয়ে একটা গ্রাম্য প্রবাদই চলে আসছে মুখে মুখে!

বেশ খানিকক্ষণ মেলায় ঘুরে আমরা ধর্মশালায় ফিরলাম।

এসে দেখি ধর্মশালার কর্ত্রী মেলা থেকে ফিরে একটি খাটিয়া আশ্রয় করেছেন। কোমরের টাটানিটা তাঁর বেড়েছে—এক একবার অস্ফুট কাতরোক্তিতে বুঝতে পারছি। কিন্তু মেলার গল্পে মেতে তিনি সেটা গ্রাহের মধ্যেই আনছেন না। আমাদের দেখে খুশি হয়ে বললেন, বজ্রেশ্বরী মায়ীকে দর্শন করে এলে?

না,—আমরা মেলায় গিয়েছিলাম।

এই উত্তরে উনি আরও খুশি হয়ে উঠলেন। দেখলো মেলা! ভারি আজব, নয়? এমন মেলা—এ-তল্লাটে—

নিজের নিজের দেশের উৎসব-পার্বণ নিয়ে অল্পবিস্তর গৌরববোধ সকলকারই থাকে। উনি অনর্গল বলে গেলেন সে কাহিনী।

আমি বললাম, এইবার তা হ'লে মন্দির থেকে ঘুরে আসি।

ওর আঠারো বছরের ছেলেটি খাতা কলম নিয়ে এগিয়ে এল। বলল, আপনাদের নাম-ধামগুলো লিখিয়ে দিন। কোথা থেকে আসছেন, কোথায় যাবেন—

এতক্ষণে মনের ক্ষীণ সন্দেহটি দূর হ'ল। এটা তবে ধর্মশালাই। যদিও ধর্মশালার ঘোষণা এই ইমারতের কোথাও ছিল না।

আমাদের নাম-ধাম লেখা শেষ হ'লে বলল, ধর্মশালায় কিছু চার্জ দিতে হবে। আলো, খাটিয়া, চাকর-বাকরের জন্য বকশিস—

নড়বড়ে সুইচে আঁটা একটা তার যেন দেখেছিলাম ঘরের দেওয়ালে—একটা বালবও ঝুলছিল কড়িকাঠে কিন্তু চেষ্টা করেও সুইচটাকে কায়দা করতে পারি নি, আলো জ্বলে নি। খাটিয়াও একখানা ছিল ঘরের মধ্যে! এতই ঢিলে তার দড়ির বাঁধনগুলো যে, তাতে শোবামাত্রই বিছানা-সমেত মানুষ তালগোল পাকিয়ে যাবে বলে মনে হয়েছিল। হোল্ডঅলটা শুধু তার উপর রেখেছিলাম। আর ঝি চাকরের নামগন্ধও ত এসে অবধি দেখছি না! জঞ্জাল-ভর্তি উঠোনটার পানে চেয়ে বললাম, চাকর! তা হ'লে এগুলো এখনও এখানে কেন?

ছেলেটি বলল, চাকরাণীটা মেলায় গেছে, ফিরলেই উঠোন সাফ্ করিয়ে দেব।

আলোর কথা বলাতে—উঠে এসে সুইচটাকে দেওয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে জ্বালিয়ে দিলে। খাটিয়াটার প্রসঙ্গ উঠতে বলল, খাটিয়া যখন ঘরে দেওয়া আছে, ওর ভাড়াটা—

বুঝলাম—কাজে আসুক চাই না আসুক নিয়মটা চালু রাখা চাই। নিয়মের আর একটি অর্থ, এই দুর্দশাগ্রস্ত আশ্রয়স্থলটি দেখে অনুমান করে নিয়েছিলাম। একথা ঠিকই—একদা দাতার সদিচ্ছার দৌলতে এই ধর্মশালার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কালচক্রের আবর্তনে সুখঃদুঃখের আসা-যাওয়ার ধ্রুব নিয়মে দাতা তাঁর ভূমিকা বদল করেছেন। ঝি জমাদার আলো খাটিয়া ইত্যাদির মাশুল চাপিয়ে পাওনার অঙ্কটিকে না ফাঁপাতে পারলে দিন-গুজরাণের সমস্যা সমাধান হয় কি করে!

সুতরাং সব হিসাব করেই মাশুল দিয়েছিলাম—মালিক তবু খুশি হয় নি। আমরাও প্রসন্ন হ'তে পারি নি। এর চেয়ে ধর্মশালায় কানুন না দেখিয়ে সোজাসুজি ঘর ভাড়া বলে কিছু চাইলে আমরা খুশি হ'তে পারতাম। যোগিন্দর নগরে, অমৃতসরে, কুলুতে ধর্মশালা বা মন্দিরে থেকেও যেমন এর ভাড়া শুনেও মন প্রসন্ন হয় নি।

জানি ধর্মশালা পুরোপুরি নিষ্কর অর্থে খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যায়। আগেকার দিনে এটা হয়তো বর্ণে বর্ণে সত্য ছিল? এখনও সরাসরি এর ভাড়া বলে কিছু নেয় না বটে—আলো খাটিয়া ঝাড়ুদার জমাদার

প্রভৃতির হিসাবের মধ্যে ওটা প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এসব না থাকল ত সনাতন ধর্ম সংস্কার জন্য একটা চাঁদা অন্ততঃ চেয়ে নেওয়া হয়। কোন কোন বড় শহরে ধর্মশালা একটি সুবিধাজনক আয়ের পন্থা। সেখানে প্রতিটি ঘরের জন্য দৈনিক যে হারে ভাড়া আদায় করার ব্যবস্থা আছে,—তা পুরোবাড়ীটার মাসিক ভাড়ার তিন-চার গুণ বেশী। এ ছাড়া ধর্মশালার বহির্ভাগে দোকান ঘরগুলির ভাড়া ত ফাউ-স্বরূপ।

কাংড়া উপত্যকায় আমরা দু'টি মাত্র ধর্মশালা দেখেছিলাম—যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় ও সুব্যবস্থায় যে-কোন প্রথম শ্রেণীর হোটেলের সমতুল্য। আক্ষরিক অর্থে নিষ্কর। যতক্ষণ খুশি আলো জ্বালিয়ে—যে-কখানা খাটিয়া প্রয়োজন মত দখল করেও—এক পয়সা ভাড়া দিতে হয় নি। জ্বালামুখী আর বৈজনাথের ধর্মশালা দু'টির কথা বলছি।

সন্ধ্যার মুখে আমরা বজ্রেশ্বরী মন্দিরে এলাম।

ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে যে চৌমাথা রাস্তাটা পড়ে—তার ডান ধার ঘেঁষে—পাথরের রাস্তাটা বেশ খানিকটা উপরে উঠে গেছে। পথের একধারে মন্দির-সীমানায় দেওয়াল—যেন একটা দুর্গের সীমানা ঘিরে রেখেছে। যেমন উঁচু—তেমনি মজবুত। লম্বায় সে দেওয়াল প্রায় এক ফার্লং। মন্দিরের সামনে কয়েকটা বাতাসা ও ফুলের দোকান; কিন্তু ভিখারী আর সাধু-সন্ন্যাসী আস্তানা নিয়েছে। যাত্রীর ভিড় বিশেষ নাই। সিং দরজা বেশ উঁচু—রাত্রিতে সেটা বন্ধ করার ব্যবস্থা আছে। আর সেই দরজার সামনেই একটা পাথরে খোদাই করা আছে—ভক্ত বদান্য-দাতাদের নাম ও পদবী পরিচয়। এঁদেরই দানে মন্দির সুসংস্কৃত হয়ে বর্তমান কলেবর প্রাপ্ত হয়েছে।

অতি বিস্তীর্ণ সেই মন্দির-প্রাঙ্গণ। জনপদ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে একটি মুক্তির ক্ষেত্রকে। পুরাতনের মালিন্য কোথাও নাই—সবটাই সদ্য-সমাপ্তির ঔজ্জ্বল্যে ঝক্ ঝক্ করছে।

খোলামেলা নাট মন্দির—খোলামেলা মন্দির—আলোয় আলো করা ভুবন।···সিং দরজার পাশে বসে আছে ঢাকী আর শানাইদার।···প্রহরে প্রহরে ঢাক বাজছে, শানাই সুর আলাপ তুলছে। মন্দির-পরিবেশ সৃষ্টি করার আরও কিছু আয়োজন দেখা যায়; দেবীর বাহন একটি বাঘ, ত্রিশূল, একটি বেলগাছ। দেবী ঘটে এবং মূর্তিতে বিরাজমানা। একজন সেবক সর্বক্ষণই হাজির রয়েছেন। দেবীকে বাতাসা ফলমূল নিবেদন করে প্রসাদ এনে দিচ্ছেন তিনি। ···যে শুধু প্রণাম করে হাত পাতছে—তাকেও উনি মুঠো-ভরে বাতাসা প্রসাদ দিচ্ছেন। ···আইনের কোন কড়াকড়ি নাই—দেবীর কাছে এসে যতক্ষণ খুশি বসে থাকার বাধা নাই। ছুঁৎ-মার্গটা অদৃশ্য বললেই হয়।

নাটমন্দিরের চাতালে বসে আমরা দেবীর বাহনটিকে দেখছিলাম। ওটি আমাদের পাশেই চাতালের উপর রয়েছে। ···মূর্তিটা সম্ভবতঃ মাটির—আসল রয়াল বেঙ্গল টাইগার। জ্বালামুখীতেও দেবীর বাহন দেখেছিলাম একটি চিতাবাঘ। আমাদের দেশে হিমালয় দুহিতা কিন্তু সিংহবাহিনী। আসল হিমালয়ে সিংহ নাই বলে বুঝি এই বিকল্প ব্যবস্থা?

জ্বালামুখীর সাধু বলেছিলেন—কাংড়া হ'ল একান্ন পীঠের একটি পীঠ, এখানে দেবীর বাম স্তন পড়েছিল। এই তথ্য তর্কসাপেক্ষ বলে মনে হয়। পীঠস্থান মাহাত্ম্যে উল্লেখ আছে দেবীর বাম স্তন পড়েছিল জলন্ধরে (জ্বালামুখীতে), দেবী ওখানে ত্রিপুরমালিনী। এখানে দেবী বজ্রেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা। ···পুরাণ কথা যাই বলুক, দেবী বজ্রেশ্বরীর শ্রদ্ধা-ভক্তির আসনখানি পাতা রয়েছে সারা পাঞ্জাব জুড়ে। এই প্রমাণ মন্দিরের প্রস্তর-ফলকে লিপিবদ্ধ দেখেছি।

অনেকক্ষণ বসে ছিলাম নাটমন্দিরে। সারাদিনের অস্বস্তিকর পরিবেশটুকু না থাকাতে সুস্থ বোধ করছিলাম। রাত্রিটা খোলামেলা নাটমন্দিরে কাটিয়ে দিতে পারলে আরও সুখী হ'তাম। কিন্তু সে উপায় ছিল না। রাত্রিতে মন্দিরের এলাকায় কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না। শয়ন আরতির পর সিং দরজার ফটক বন্ধ হয়ে যায়।

শয়ন আরতি বসবে রাত ন'টা সাড়ে ন'টায়—ঘণ্টাখানেক লাগবে আরতি শেষ হ'তে। আমরা চলে আসছিলাম।

একজন সেবক বললেন, একটু বসে যাও—খানিক পরেই শয়ন আরতি হবে—দেখে যাও।

নাটমন্দিরের পাথরের মেঝেতে বসলাম। সিং-দরজায় বাঁশী বাজছিল, শানাই-এর মত তার সুরটি মিষ্ট। মাঝে মাঝে ঘণ্টা বাজছিল। মন্দিরে আসা-যাওয়ার কালে যাত্রীরা বাজাচ্ছিল। নিজের প্রার্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে দেবীকে অবহিত করা, না প্রণাম-প্রার্থনার আদি-অন্তে দেবীকে বাদ্যধ্বনির দ্বারা পরিতুষ্ট করা? এই রীতির মধ্যেই কি চঞ্চল বৃত্তিগুলিকে একটি কেন্দ্রে সু-সংহত করার প্রয়াস, অথবা মানস-তন্দ্রা ভাঙ্গানোর ঘোষণা এটি? শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে, অসুর-সংহারের নিমিত্ত দেবী যুদ্ধ-

ক্ষেত্রে ঘণ্টাধ্বনি করেছিলেন। ঘণ্টার গম্ভীর নির্ঘোষে বহু অসুর মোহগ্রস্ত মূর্চ্ছিত হয়েছিল,—বহু অসুর মৃত্যু-বরণ করেছিল। এর ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে গভীর অর্থব্যঞ্জক সন্দেহ নাই, কিন্তু একটি গম্ভীর মধুর শব্দে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত উচ্চকিত মন যে সংকর্ষিত হয়ে একটি কেন্দ্রে লগ্ন হবার সুযোগ পায়, এই সত্য মনো-বিদ্‌রা অস্বীকার করেন না।

আমরা পাথরের মেঝেতে বসেছিলাম—একটু পরে পুরোহিত এলেন। পরনে রক্তাম্বর, গায়ে রক্ত অঙ্গা-বরণী, তার উপরে রক্ত উত্তরীয়, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, কণ্ঠে ও বাহুমূলে রুদ্রাক্ষ মালা, সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় পুরো-হিত পূজার আসনে বসলেন। আরম্ভ হ'ল শয়নকালীন ভোগ-পূজা আরতির পর্ব। পর্বটি দীর্ঘ—নানা বিধি-নিয়মে সুশৃঙ্খলিত। দেবীর স্নান-অঙ্গরাগ অর্চনা পূজা স্তব ও প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ ভোগ নিবেদন আরতি, সর্ব-শেষে পরিপাটি করে শয্যা রচনা। সেই সুখরম্য শয্যায় দেবীকে শয়ন করিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গে অলঙ্কার সমাবেশ ও চামর ব্যজন। পরে একখানি বহুমূল্য উত্তরীয়ে নিদ্রামগ্ন দেবীর অঙ্গ আচ্ছাদন করে একটি দিনের সেবা-কর্মসূচীর সমাপন।

ইতিপূর্বে স্নানের সময় দেবীর সামনে একখানা পরদা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আজ মন্দিরে যাত্রী কম ছিল বলে হয়ত সেবকরা আমাদের বললেন, গর্ভ মন্দিরে পরদার ভিতরে গিয়ে বসতে। ভিতরে বসে দেবী-সেবার বিধিগুলি দেখতে লাগলাম। সংসারী মানুষের আচার-নিয়মগুলিকে দেবী প্রকৃতিতে আরোপ করে অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হ'তে লাগল। তার সঙ্গে আমরা একাত্ম হয়ে গেলাম। এ যেন প্রতিদিনে এবং প্রতিটি রাত্রিতে ঘুমের আগে পর্যন্ত আমাদেরই কর্ম ও বিশ্রামের নিয়মগুলি একটির পর একটি অনুবর্তিত হচ্ছে।

ক্রমশঃ রাত বাড়ছে দেখে আমরা ভোগ ও আরতি দেখে উঠবার উদ্যোগ করলাম।

একজন সেবক আমাদের হাতে প্রসাদ দিয়ে বললেন, আর একটু বস—দেবীর শয়ন দেখে যাও।

তবুও আমরা ইতস্ততঃ করছি দেখে বললেন, আরে, বসই না, এত দূর দেশে আর ত কোনদিনই আসবে না—শয়ান দেখে যাও।

কথাটা সত্য—আর কোনদিনই কি আসব এখানে! জীবনের ত অপরাহ্ণ বেলা—আয়ু-সূর্য এখন অস্তাচল চূড়াবলম্বী। দেবীর নিদ্রাটা দেখেই যাই। সঙ্গে সঙ্গে এই চিন্তাও ছায়াপাত করল—দেবীর আবার নিদ্রা-

বজ্রেশ্বরী মন্দির (কাংড়া)

জাগরণ আছে না কি? আমাদেরই চৈতন্যের উপর উনি চৈতন্যময়ী—প্রাক্-চৈতন্যে সুপ্তিমগ্না। আমাদের নিত্য অভ্যাস-লব্ধ কর্ম আচরণের প্রতিবিম্ব ফেলে এঁকে জানাই—ওঁকে ঘুম পাড়াই। ওঁর সেবা পূজা ধ্যান আরাধনা সমস্তই ত আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা।

কৌতূহল ভরেই দেখছিলাম অনুষ্ঠানটি, শেষে একটু ছন্দপতন হ'ল।

দর্শকদের মধ্যে একজন দক্ষিণ ভারতীয় সন্ন্যাসী ছিলেন। দেবীর ভোগে উৎসর্গীকৃত ঘৃতসিক্ত পুরীর লোভনীয় আকৃতিতে তিনি হয়ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁকে ছোলাসিদ্ধ প্রসাদ দিতে এলে তিনি দেবীর উৎসৃষ্ট প্রসাদের অংশ চাইলেন। সেই প্রসাদের বণ্টন-ব্যবস্থা হয়ত পূর্ব ব্যবস্থা মত ঠিক হয়ে থাকবে—সেবায়েৎ তাঁকে সবিনয়ে সেই কথাটি জানালেন। সেবায়েতের কথা উনি বুঝতে পারলেন না—উচ্চকণ্ঠে নিজের ক্ষুধার দাবি জানালেন। সেবায়েত তাঁর ভাষা বুঝতে পারলেন না, তবে ভঙ্গিতে বিষয়টি অনুমান করে নিয়ে বললেন, এই বরাদ্দমত ভোগ অন্যকে দেওয়া যাবে না। আপনি বরং মন্দিরের বাইরে যে-সব সাধু-সন্ন্যাসী বসে আছেন, তাঁদের সদাব্রতে চলে যান, ওইখানে প্রসাদ মিলবে অবশ্যই।

দক্ষিণী সন্ন্যাসী এই উপদেশে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে গেলেন। নাটমন্দিরে একজন সেবক প্রসাদ বিতরণ করছিলেন। ছোলাসিদ্ধ প্রসাদ। ঘটনাটা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর কাছে এগিয়ে

গিয়ে আরও কয়েক মুঠো ছোলা তাঁকে দিয়ে সদাব্রতের কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন।

দক্ষিণী সন্ন্যাসী চলে গেলেন।

আমাদের মনে হ'ল—মাত্র একজন বিদেশী অথিতিই ত ছিলেন প্রসাদের দাবিদার—বরাদ্দের অংশ থেকে সামান্য কিছু দান করলে বরাদ্দের অধিকারী কি ক্ষুণ্ণ হ'তেন? যেখানে ভিখারীকে ডেকে মুঠোভরে বাতাসা প্রসাদ দেওয়ার উদারতা দেখলাম—সেইখানে নিরাশ্রয় অভুক্ত অতিথি যাচ্ঞা করে প্রসাদাংশ পেলেন না—এ কেমন যেন অস্বস্তিকর ব্যাপার! অস্বস্তি বেশী করে বোধ হ'তে লাগল যখন মন্দিরের বাইরে এসে দেখলাম দোকান-পাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। সেই সদাব্রতের সন্ন্যাসীরা আহারের পাট সেরে দোকানঘরের কাঠের পাটাতনে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন—কোথাও জেগে নেই জনপ্রাণী; চারিদিকে নিশুতি নিরালোক! দক্ষিণী সন্ন্যাসীর চিহ্ন দেখলাম না কোথাও।

হাতে টর্চটা জেলে ব্যথাভরা চিত্তে পাথর-বিছানো ঢালু পথ দিয়ে আমরা নামতে লাগলাম।

খালি মনে হচ্ছিল—প্রদীপের শিখাটুকু যদি শেষ পর্যন্ত উজ্জ্বল থাকত!

আগামী বৈশাখ হইতে

নিয়মিত বিভাগ

'এরাও মানুষ ছিল'

দুর্গেশনন্দিনীর শতবার্ষিকীর আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীমণি বাগচী

"৯৯৮ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে জাহানাবাদের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি যদি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবেক প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশ গগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।"

পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না যে, ইহা কোন্ স্মরণীয় উপন্যাসের আরম্ভ, অথবা সেই উপন্যাসের লেখক কে? এই উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'; আর এই ঔপন্যাসিক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইবার ঠিক একশত বৎসর পূর্ণ হইল (প্রথম প্রকাশ ১৮৬৫, এপ্রিল); বাংলা সাহিত্যে ইহা যে একটি স্মরণীয় ঘটনা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ "বাংলা গদ্য-সাহিত্যের দিগন্ত-সংস্থিত ঘোরতর অন্ধকারে স্বীয় প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে" সেদিন যিনি একাকী পথ চলিয়াছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালে সাহিত্য-সম্রাটরূপে ও বাঙালীর ভাব-জীবনের স্রষ্টারূপে এবং উনিশ শতকের বাংলার অন্যতম রূপকার হিসাবে স্বীকৃত ও সম্পূজিত হইয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণে বঙ্কিম-প্রতিভার আবির্ভাব এবং পরবর্তী ত্রিশ বৎসর কালের মধ্যে তিনি তাঁহার স্বজাতিকে যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহাকে আশ্রয় করিয়াই ত বাংলা সাহিত্য তাহার ইতিহাস-অভিপ্রেত পরিণতি লাভ করিতে পারিয়াছে। নিঃসন্দেহে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভার যুগাবতার।

কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীর কথাই প্রথমে আলোচনা করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীকার শচীশচন্দ্র জানাইয়াছেন যে, তাঁহার পিতৃব্য যখন খুলনার হাকিম তখন তিনি দুর্গেশনন্দিনী লিখিতে আরম্ভ করেন (ইহা ১৮৬২-৬৩ সালের কথা; বঙ্কিমের বয়স তখন মাত্র চব্বিশ বৎসর) এবং বারুইপুরে বদলী হইয়া আসিবার পর তিনি ঐ অসমাপ্ত রচনা শেষ করেন। এই প্রসঙ্গে কালীনাথ দত্ত লিখিয়াছেন: "বঙ্কিমবাবু যখন বারুইপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মহকুমা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সেই সময় তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়। তখন ইংরেজী ১৮৬৪ সাল।...বঙ্কিমবাবু এজলাসে আসিতেন, বসিতেন, মামলার বিবরণ শুনিতেন, কিন্তু এই সময়ে তাঁহাকে সর্বদা অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমন কি সাক্ষীর এজেহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন, এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া, গৃহাভ্যন্তরে তাঁহার study-room-এ প্রস্থান করিতেন, চিন্তিত বিষয়টি লিপিবদ্ধ না করিয়া এজলাসে ফিরিতেন না।" (প্রদীপ, আষাঢ়, ১৩০৬)

এই কালীনাথ দত্ত ছিলেন বারুইপুর সাবডিভিশনের রেজিষ্ট্রেশন অফিসের হেড ক্লার্ক (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২২ গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত ইঁহাকে "বঙ্কিমচন্দ্রের সহকর্মী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা ঠিক নয়) ছিলেন। তিনি আরও একটি কথা বলিয়াছেন। "দুর্গেশনন্দিনী লেখা শেষ হওয়ার সময় কিংবা উহা মুদ্রিত হওয়ার সময় আমি বঙ্কিমবাবুর পাঠকক্ষে কয়েক ভল্যুম স্কটের ওয়েভার্লি নভেলস্ দেখিয়াছিলাম। আমার অনুমান, ঐ বই লেখার পর পাণ্ডুলিপি অবস্থায় হয়ত তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে বলিয়া থাকিবেন যে, স্কটের আইভ্যান হো'র সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। কতখানি সাদৃশ্য তাহা মিলাইয়া দেখার জন্যই বঙ্কিমবাবু স্কটের গ্রন্থাবলী কলিকাতা হইতে কিনিয়া আনিয়াছিলেন, কেননা তাঁহার নিজের মুখে তিনি শতবার বলিয়াছেন যে, দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার পূর্বে তিনি আইভ্যান হো পাঠ করেন নাই। বঙ্কিমবাবুর সততা ছিল unimpeachable, তাঁহার কথাই সকলে মানিয়া লইয়াছিলেন।"

মানিয়া লইলেও দুর্গেশনন্দিনীর আইভ্যান হো-সম্পর্কীয় অপবাদটি বরাবর রহিয়া গিয়াছে। বঙ্কিম-সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' পুস্তকে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, স্কটের উপন্যাসের সহিত দুর্গেশনন্দিনীর সাদৃশ্য থাকিলেও, ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। এই উপন্যাসের প্রকাশ কালে প্রতিকূল ও অনুকূল দুই রকম সমালোচনাই হইয়াছিল, তথাপি ইহা সত্য যে, "সে যুগের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীরা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গেশ-নন্দিনীর প্রকাশেই বাংলা-সাহিত্যের নূতন বিপুল সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন।" ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন দুইজন—রমেশচন্দ্র দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ। রমেশচন্দ্র লিখিয়া-ছেন: যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল ...বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। একটি নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে।" আর রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন: "বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন। আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল।" আমাদের বলিবার কথা এই যে, স্কটের অনুকরণে যদি দুর্গেশনন্দিনী লিখিত হইত, তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যে এই যুগান্তর কখনই আসিত না, বাঙালীর মানসলোক কখনই এমন ভাবে উদ্দীপ্ত হইত না। আরও একটি কথা। বঙ্কিমের প্রতিভা স্কটের প্রতিভা অপেক্ষা বহু-গুণে শ্রেষ্ঠ। প্রতিভার দিক দিয়া বিচার করিলে, ইংরেজী সাহিত্যের একমাত্র সেক্সপীয়র ভিন্ন আর কেহই বঙ্কিমের সহিত তুলনীয় নন।

কথিত আছে, দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র উভয়েই উহা প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করেন। বঙ্কিম-জীবনীকার শচীশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে আর একজনের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি বঙ্কিম-সুহৃদ ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য। তখনকার দিনে ইনি একজন প্রসিদ্ধ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং একজন সাহিত্য-রসিক ব্যক্তি ছিলেন। দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পাঠ করিবার প্রথম সৌভাগ্য ইঁহারই হইয়াছিল এবং ইনিই বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "নবেল লিখিয়াছ ভালই, নবেলিষ্ট হিসাবে তোমার প্রতিষ্ঠা অবধারিত তবে ইহা এখনই ছাপাইবার জন্য ব্যগ্র হইও না।" ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র কিঞ্চিত ক্ষুণ্ণ হন এবং সাময়িকভাবে বন্ধুবিচ্ছেদও ঘটিয়াছিল। কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যে তখন একটি মহালগ্ন আসিয়া গিয়াছে, যেমন আসিয়াছিল চার বছর আগে মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হইবার সময়; তাই ঘরে-বাহিরে এই রকম বিরূপ মন্তব্য সত্ত্বেও ১৮৬৫ সালের এপ্রিল মাসে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই দুইটি বৎসরই চিরকালের মত চিহ্নিত হইয়া থাকিবে।

ক্ষেত্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নাই, দুর্গেশনন্দিনীর পরবর্তী উপন্যাসগুলি একে একে রচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রমাণ করিলেন যে, বাংলা-সাহিত্যে তিনি সত্যই নূতন বিপুল সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। আজ দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার শতবর্ষ পরে এবং বঙ্কিমের তিরোধানের সত্তর বৎসর পরে আমরা বঙ্কিম-মানস সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া শিল্পী বঙ্কিম সম্পর্কে নূতন মূল্যায়ন করিতে পারি। আজও তিনি শিক্ষিত বাঙালীর প্রিয়তম নবেলিষ্ট, বর্তমান কালের বুদ্ধিজীবী পাঠক আজও তাঁহার উপন্যাস পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করেন। তিনি যে কাল-জয়ী সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন এবং সে সাহিত্য যে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সমমর্যাদায় স্থান পাইবার যোগ্য, ইহা আজ আর আমাদের আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। ইংরেজীতে একটি কথা আছে—"To know Plato is to know Europe." বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেও এই উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য। তাঁহাকে জানা মানেই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাকে জানা। জাতির ভাবজীবনের স্রষ্টাও তিনিই। বঙ্কিমচন্দ্র আজ আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার ও আমাদের মধ্যে এখন প্রায় একটি শতাব্দীর ব্যবধান। এই দুস্তর ব্যবধান বা অন্তরালকে অতিক্রমপূর্বক তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিলেই বঙ্কিম-মানসকে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব।

আজ প্রয়োজন বঙ্কিমের ধ্যান-ধারণার পুনরুজ্জীবন। তাঁহার রচনা বৃহৎ এবং বিচিত্র। তাঁহার সমগ্র রচনার কেন্দ্রস্থলে একটি অমূর্ত ভাবশরীরী বঙ্কিমকে পাওয়া যায়, যেখান থেকে তাঁহার জীবনের সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস বিরাগ অনুরাগ বিশ্বাস অভিজ্ঞতা সহজ জ্যোতির মত চারি-

দিকে বিচিত্র শিখায় বিবিধ বর্ণে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে। শেক্সপীয়রের মতই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে একটি উচ্চ দর্শন-শিখর আছে যেথান হইতে মানব প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা ব্যাপক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। বঙ্কিম-প্রতিভা বুঝিতে হইলে সর্বাগ্রে সেই দর্শন-শিখরের সন্ধান লইতে হয়।

প্রাচীন সংসার আর নবীন ভাবাদর্শের সংঘর্ষের অভি-ব্যক্তিই বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহার মধ্যে আমরা পাই নূতন পথ সন্ধানের বহুমুখী প্রয়াস। বঙ্কিম-মনীষার বিশ্লেষণে রবীন্দ্র-নাথের একটি উক্তি বিশেষ ভাবে স্মর্তব্য। তিনি বলিয়াছেন —"রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিটস্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন।" উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় দশক হইতে বঙ্কিমের সাহিত্যজীবনের প্রকৃত আরম্ভ এবং তখন হইতে ত্রিশ বৎসরকাল তিনি বাংলা সাহিত্যের ধ্যানে এবং কর্মে নিজেকে অতন্দ্রভাবে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। সাহিত্যের এই কর্মযোগীর স্বরূপটি রবীন্দ্র-নাথের অনুপম বিশ্লেষণ এই ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে:

"তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেথানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কি ধর্মতত্ত্ব—যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।"

এই আদর্শ-সৃষ্টি বঙ্কিম-প্রতিভার একটি বড় লক্ষণ—এ কথা বিশিষ্ট বঙ্কিম-সমালোচকমাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার সমকালীন ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করে যে, বাংলা সাহিত্যের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে তখন কোন উচ্চ আদর্শ ছিল না— আদর্শবোধও ছিল না। আজ যখন আমরা বঙ্কিম-প্রতিভার এই সংশয়াতীত মহত্ত্বের কথা স্মরণ করি, তখন বুঝিতে পারি কেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধির স্থান দিয়াছেন। এ গৌরব সর্বাংশেই তাঁহার প্রাপ্য। রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্র— প্রকৃতপক্ষে এই দুইজনই আমাদের নূতন মনোভাব ও নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তক। জাতির জীবনে যে যুগান্তরের সমস্যা সেদিন বিরাট হইয়া দেখা দিয়াছিল, তাহারই সন্ধানে বঙ্কিমচন্দ্রের সারা চিত্ত যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। জাতির জাতিত্ব বজায় রাখিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহার একমাত্র সাধনা। বঙ্কিম-সাহিত্যে সেই লোকোত্তর সাধনার সমুজ্জ্বল স্বাক্ষর বিদ্যমান।

বঙ্কিম-প্রতিভা প্রতিভা মাত্র নয়, ইহা তেজস্বী প্রতিভা। বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে এমন প্রতিভা দুই-চারিটির বেশি আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। এই প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ইহার বাণীর মধ্যে। মোহিতলাল যথার্থই লিখিয়াছেন, "তাঁহার বাণী একটা বড়ো চরিত্রের মতোই—যেমন সবল, তেমনি বলিষ্ঠ, যেমন সুবলয়িত তেমনই অসন্দিগ্ধ। বাণীর এমন দৃঢ়তা ও সুস্পষ্টতা আমাদের সাহিত্যে আর কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না।" এ জিনিষ তিনি কোথায় পাইয়াছিলেন? তাঁহার সাহিত্য-সাধনার প্রেরণা জোগাইয়াছিল প্রত্যক্ষভাবে স্বজাতি, স্বদেশ ও স্ব-সমাজ এবং পরোক্ষভাবে—মানুষের অদৃষ্ট ও মনুষ্যত্বের আদর্শ সন্ধান। "জাতির সমষ্টিগত আত্মরক্ষার উদ্যম যেন সেই একটি মানুষের মধ্যে পূর্ণশক্তি ধারণ করিয়াছিল—তাই বঙ্কিম-প্রতিভাকে দৈবী শক্তির স্ফুরণ বলিতে বাধা নাই। তাঁহার যতকিছু চিন্তা, তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান ও কর্ম—একমাত্র স্বজাতির কল্যাণ-চিন্তাতেই সার্থক হইয়াছে। আত্মভাব বা আত্মচিন্তার প্রচার-চেষ্টা তাঁহার মধ্যে অনুবাহিত। স্বজাতি, স্ব-সমাজ ও স্বদেশ—এই তিনে এক বা একে তিন ভিন্ন তাঁহার যেন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই ছিল না।" যে দৃষ্টি-কোণ হইতে মোহিতলাল এই কথা বলিয়াছেন, আমার বিবেচনায়, বঙ্কিম-প্রতিভা বিচারের ইহাই একমাত্র মানদণ্ড হওয়া উচিত। বঙ্কিম-প্রতিভা সাধারণ প্রতিভা নয়— ইহা একটি জাতির মর্মকথা ও সাধনার ইতিহাস। অরণ্যকে জানিলে যেমন আর এক-একটি বৃক্ষের কথা জানিবার প্রয়োজন হয় না, তেমনি কোন দেশের একজন লোকোত্তর প্রতিভাকে জানিলে আর কিছুই জানিবার থাকে না। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সংক্ষিপ্তসার (epitome) বঙ্কিমচন্দ্র, আজ দুর্গেশনন্দিনীর শতবার্ষিকীর প্রাক্কালে এই কথাটি আমরা যেন বিশেষভাবে মনে রাখি।

কিন্তু এহ বাহ্য। বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে যেমনভাবে

দেশপ্রেম শিখাইয়াছেন, এমনটি আর কেহ পারেন নাই—তাঁহার পূর্বেও নয়, তাঁহার পরেও নয়। পরানুকরণ জাতীয় আত্মসম্মানের বিরোধী—তাঁহার পূর্বে এমন স্পষ্টভাবে এই কথা আর কেহ বলেন নাই। সমগ্র দেশে সে যুগে অন্ধ অনুকরণের ফলে যে অবনতি দেখা দিয়াছিল, সেই অবনতি ও আত্মাবমাননার সম্বন্ধে তীব্র কশাঘাতে স্বজাতিকে সর্বপ্রথম সচেতন করেন বঙ্কিমচন্দ্র। নিজের দেশের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু অনুকরণীয় সেই দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ধার-করা বেশ-ভূষার চরম অপমান সম্বন্ধে দেশবাসী তখন সজাগ ছিল না। জাতীয়তাবোধের সেই নবীন উষায় বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম তাঁহার তীব্র খরসন্ধানী আলোর ছটায় আত্মবিস্মৃতির অন্ধতমঃ দূর করিয়াছিলেন বলিলে কোন অত্যুক্তি করা হইবে না। স্বদেশপ্রেমকে তিনি ধর্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন—"সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।"—কালের প্রান্তর অতিক্রম করিয়া ঋষি বঙ্কিমের এই মহাবাক্য আজও কি আমাদের কানে প্রতিধ্বনিত হয় না?

যদি হইত, যদি তাঁহার এই উক্তিটি আমাদের সমস্ত অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে স্বাধীন ভারতবর্ষে বর্তমানে দুর্নীতির যে প্লাবন সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে বহিয়া চলিয়াছে, তাহা বোধ হয় রোধ করা যাইতে পারত। দেশকে তিনি স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন এবং এই কথাই তিনি তাঁহার সমগ্র রচনার মাধ্যমে তাঁহার দেশবাসীকে সারাজীবন ধরিয়া বুঝাইয়া গিয়াছেন। ইহাই তাঁহার স্বজাতিকে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দান। বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল ঐতিহাসিক মন ও অনুসন্ধিৎসা—তাই ত তিনি তাঁহার ধ্যানের মধ্যে দেশকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং দেশবাৎসল্য পরমধর্ম—এই সত্য বুঝিয়াছিলেন এবং আমাদেরও বুঝাইয়াছিলেন। মনীষাগত ধারণা নয়, কিংবা ভৌগোলিক সত্তা নয়, বঙ্কিমচন্দ্র সত্য সত্যই দেশভূমিকে মাতৃভূমিরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনিই আত্মবিস্মৃত জাতিকে বলিতে শিখাইলেন—"আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই মা।" জাতির জন্য ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। পরবর্তীকালের দেশব্যাপী রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন ও তাহার পরিণতি ইহার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করিতেছে। বাংলার একপ্রান্তে বাংলা ভাষায় রচিত একটি মন্ত্র—'বন্দেমাতরম'—কেমন করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের মাতৃবন্দনার উদাত্ত সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করিয়াছে—শুধু সেই ইতিহাসটাই স্মরণে রাখিলে বঙ্কিম-প্রতিভার মহত্ত্ব সম্পর্কে আর কোন সংশয় থাকে না। রামমোহনকে বাদ দিয়ে যেমন আধুনিক ভারতবর্ষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তেমনি বাংলার প্রাণপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দিয়ে বাংলার রেণেসাঁসের কথা চিন্তা করা যায় না। যাঁহার চিন্তায় ও চেতনায় বাঙালীর জীবন-সত্য একথা অসংশয়িত বাণীতে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, আজ তাঁহারই উদ্দেশে, কবির কথায় বলি :

"Bankim! thou should'st be living at this hour Bengal has need of Thee :"

উনবিংশ শতাব্দীর বাবুয়ানা ও বাংলা প্রহসন

ডক্টর জয়ন্ত গোস্বামী

আমাদের সমাজে একটি প্রসিদ্ধ ছড়া আছে—"ধনীর মধ্যে অগ্রগণ্য রামদুলাল সরকার। বাবুর মধ্যে অগ্রগণ্য প্রাণকৃষ্ণ হালদার। (বাংলা প্রবাদ—সুশীল দে) প্রাণকৃষ্ণ হালদারের পরিবর্তে অনেক সময় নীলমণি হালদারের নামও করা হয়ে থাকে, অন্ততঃ এ ধরনের ছড়াও মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। গত শতাব্দীতে প্রকাশিত "সমাজ-কুচিত্র" পুস্তকে "নিশাচর" বাবুর তালিকা দিতে গিয়ে বলেছেন, "যথার্থ বাবু দোয়ারকানাথ ঠাকুর, নীলমণি হালদার, ছাতুবাবু, কালী সাণ্ডেল, ছাতু সিঙ্গী, জয় মিত্তির ফেলা যায় না।" (পৃঃ ৫৭)। বস্তুতঃ এই সব বাবুদের আদর্শ করে একটি বিরাট্ বাবু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি উনবিংশ শতাব্দীর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

মধ্যযুগের সামন্ত ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে বিলাসিতা থাকলেও সাধারণের মধ্যে তা অতটা বিস্তার পায় নি। সঞ্চিত ধন মধ্যযুগে কম ছিল না। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মধ্যযুগের শেষের দিককার ভারতবর্ষের সঞ্চিত ধনের কথা বল্‌তে গিয়ে বলেছেন,—

"17th Century India was the richest country in the world—the agricultural mother of Asia and the Industrial Workshop of Civilization."

বিদেশী Commercial Capitalist-দের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণে আমাদের দেশের আর্থিক দুরবস্থা ঘটলেও দেখা যাবে যে, আমাদের সাধারণের জীবনে সামগ্রীর চাহিদা ক্রমেই বেড়ে গেছে। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ এবং জন ম্যালকমের সুপরিচিত মন্তব্য দু'টির মূলে Industrial Capitalist-দের বিরুদ্ধে স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন যতই থাকুক না কেন, তখনকার সাধারণ মানুষের মধ্যে, বর্তমান বাবুয়ানার সামগ্রী বলতে যা বুঝি—তার চাহিদা ছিল না। হেষ্টিংস লিখেছিলেন,—

"The supplies of trade are for the wants and luxuries of a people; the poor in India may be said to have no wants. Their wants are confined to their dwellings, to their food, and to a scanty portion of clothing, all of which they can have from the said that they tread upon. (*Minutes of Evidence & C. on the affairs of the East India Company*, 1813, p. 3; (*cf. Indian Trade, Manufacturers and Finance*—R. C. Dutt, P. 39).

জন ম্যালকম তখন ছিলেন বোম্বাইয়ের গভর্ণর। তিনি লিখেছিলেন—

"The Hindoo inhabitants are a race of man, generally speaking, not more distinguished by their lofty stature—than they are for some finest qualities of the mind; they are brave, generous, and humane, and their truth is as remarkable as their courage. They are not likely to become consumers of European articles, because they do not posses the means to purchase them, even if, from their simple habits of life and attire, they required them." (*Ibid*—Pp. 54 and 57).

এই মন্তব্য দু'টির মধ্যে এদেশের সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের কথা যতই থাকুক, সাধারণ বাবুয়ানার উপযোগী দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদাও যে ছিল না, এটা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের জীবনমানের এই পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে,—"ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অভ্যুদয়ে চারিদিকে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার হইতেছে—রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ চালিত হইতেছে—বাণিজ্য স্রোত বহিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোকের মন পরিবর্তিত হইতেছে, উচ্চ আশা জাগরিত হইতেছে—জীবনের নূতন আদর্শ মনের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে—সামাজিক পরিবর্তন হইতেছে—অভাব বাড়িতেছে। আমরা ৫০ বর্ষ পূর্বে যেরূপ সহজে জীবন ধারণ করিতে পারিতাম, এক্ষণে তাহা অসম্ভব, কারণ পূর্বাপেক্ষা আমাদের জীবন ধারণোপযোগী নানা অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। যদিও সমাজ-মধ্যে পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে অর্থের ব্যাপ্তি হইতেছে—অর্জনের নানা পথ ক্রমে উন্মুক্ত হইতেছে কিন্তু তথাপি অভাব, দারিদ্র্য, চারিদিকে বিকটবেশে বিচরণ করিতেছে। (অপচয় ও উন্নতি—বিষ্ণুচরণ মৈত্র। ১৮৯০ খ্রীঃ। পৃঃ ২২৬)। অতএব আজকাল যাকে ঠিক 'বাবুয়ানা' বুঝি, তা আমাদের সমাজে আগে ছিল না। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যয়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের সঞ্চিত ধন নির্গমনের ব্যবস্থা ছিল!

"বাবু" শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে এক-একজন এক এক রকম কথা বলেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে একটি মন্তব্যে বলা

হয়েছে—"স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, মুসলমানদিগের নিকট হইতেই এই রত্নটি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। কালে সংবাদ-পত্রের বহুল প্রচলন ও রাজপুরুষগণ কর্তৃক প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হওন প্রযুক্ত দেশসুদ্ধ বাবু হইয়া উঠিলেন।" (মধ্যস্থ—চৈত্র, ১২৮০)। রাজশেখর বসু 'চলন্তিকা'য়, শব্দটির কোনো বুৎপত্তি দেখান নি। (৮ম সংস্করণ; পৃঃ ৩৯৫) অনেকে এটাকে দেশজ শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। (বিশ্বকোষ—দ্বাদশ খণ্ড) শেষোক্ত মন্তব্যটিই আমার কাছে ঠিক বলে মনে হয়। প্রাগার্য বাংলা দেশের স্থানীয় ভাষার শব্দ ভাণ্ডারের অন্তর্গত সিনোটিবেটীয় গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে। তিব্বতীয় ভাষায় 'বাবু' শব্দের অর্থ—'অলস ব্যক্তি'। নিন্দাসূচক এই মূল অর্থটিই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পরে সম্মানসূচক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের সমাজে বাবুয়ানা নব্য-সংস্কৃতিনির্ভর। তাই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত দিক থেকে বাবুয়ানার বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হ'লেও আর্থিক অপব্যয়ের কারণ হিসেবেও দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে। পূর্বে উল্লিখিত উনবিংশ শতাব্দীর পুস্তকটিতে বলা হয়েছে, "এ সম্বন্ধে একটি গুরুতর নিয়ম এই যে সর্বদা অবস্থানুযায়ী অবস্থান করিবে, এবং আয় অপেক্ষা কদাচ অধিক ব্যয় করিবে না। অনেক সময়ে মানসম্ভ্রম রক্ষা জন্য, বাহ্যিক দৃশ্য রক্ষা জন্য—লোকে ঋণ করিয়া থাকে। ভ্রান্ত মানব! তুমি ঋণ করিয়াই বস্তুতঃ মানসম্ভ্রম নাশের সূত্রপাত করিলে। অবস্থা অনুযায়ী অবস্থানই প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচায়ক, ইহাতে যাহারা তোমার প্রতি দোষারোপ করিবে, তাহারা অদূরদর্শী—অন্ধ।" অপচয় ও উন্নতি—বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র। ১৮৯০ খ্রীঃ। পৃঃ ২৪০, ২৪২)। সমসাময়িককালে রচিত একটি পদ্যেও বলা হয়েছে—

"ফকির হইব তবু কি ছাড়িব,
ভিক্ষাতেও বাবুগিরি চালাইব।
যশের পাতাকা তুলিয়া ধরিব,
উড়িবে বাতাসে শন শন শন।।

(বাঙ্গালীর বাবুগিরি (১২৯৫ সন); —বৈতালিক রচিত)।

উনবিংশ শতাব্দীতে 'A Hindustani' রচিত 'The Babu 'নামে একটি প্রবন্ধ Bengali Magazine-এ প্রকাশিত হয়। (Bengali Magazine—April, 1878) তাতে বাবুর আটটি বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলো নীচে দেওয়া হ'ল।

(1) "The Babu has been represented, and justly represented as weak in body, timid in heart and imaginative in intellect." (2) "The Babu is said to be the very type of superficial, not solid education." (3) "This system again explains that other defects of the Babu's intellect so frequently pointed out and lashed, *viz.*, its want of creative energy." (4) "The Babu is described as entirely denationalized by an out landish education which has merely sharpened the imitative faculties of the soul. leaving its noble elements asleep in the background." (5) "The Babu is represen'ed as having lost the sedateness and suavity of the national disposition as having become ill-tempered and ill-natured rude in his manners and proud and presumptuous in his tone." (6) "The Babu's predilection of English. and his consequent neglect of vernacular, have been the stock themes of ridicule. bitter sacasm and even ribaldry with a class of writers." (7) "The Babu's antogonism to the ruling class has provoked much righteous indignation. and his supposed ingratitude has been again and again censured in the bitterest terms conceivable." (8) "And. lastly, the Babu is stigmatized as a grumbled and an agitator, one not will affected towards British rule, and ready in consequence to give vent to his spite in newspaper firades and inflammatory speeches."

অনুরূপভাবে মধ্যস্থ পত্রিকাতেও কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (মধ্যস্থ—চৈত্র, ১২৮০ সাল। পৃঃ ৭৫৩)। বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করলে দু'টি বক্তব্যের মধ্যে অনেকখানি মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

"(১) ইংরাজী স্কুল বা ইংরাজী প্রণালীর বাংলা বিদ্যালয়ে পড়িতে হইবে। কত কাল বা কতদূর পড়া—তাহার নিশ্চয়তা নাই। দিনকতক বা পাতকতক পড়িলেই যথেষ্ট। (২) ইংরাজী বুলি কতকগুলি পাকা ধরনে, বাঁকা টোনে ও একেলে উচ্চারণে (অশুদ্ধ বাঙ্গালার সহিত ভাঁজাল দেওনার্থ) অভ্যাস করা চাই। (৩) তোমার বিষয় আশয় যেমন তেমন হউক, ইংরাজী জুতা, পীরান, চিনা কোট, ফিরানো চুল, পায় হাফ মোজা, হাতে ছিক্ একটা ত চাইই চাই, আর যদি উচ্চ ধরনের সাহেববাবু হইতে সাধ থাকে, তবে জ্যাকেট পেণ্টুলেন, চেনঘড়ি, নাকে চশমা, চাপ দাড়ী, চুরোট, শীশ, কুকুর, ড্যাম হট্ ইত্যাদি কয়েকটি প্রকরণের প্রয়োজন। (৪) ঘাড় নাড়িয়া সম্ভাষণ, সেক হ্যাণ্ড, নমস্কার, প্রণামে ঘৃণা,

বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পরোক্ষ বা সমক্ষেও উপহাস, ভিক্ষুককে অনাদর, খবরের কাগজে আদর, রাজ্যের আগ্রহ, সভাটভার নামে রোমাঞ্চ, দলাদলির নামে খড়্গহস্ত, কথায় কথায় স্বাস্থ্য রক্ষার উল্লেখ, সর্বদাই অস্বাস্থ্যের অভিযোগ, আহারের দিন দিন স্বল্পতা, পদব্রজে গমনের ক্লেশ জ্ঞাপন—এসব নইলে নয়। (৫) পুরোহিতের পুত্র হও তো পূজা ত্যাগ, অধ্যাপকের হও তো সংস্কৃত পড়া ত্যাগ, কায়স্থ হও তো ঘরে রাঁধুনী রাখা বা সঙ্গতি অভাবে মা বোনকে দিয়ে সে কাজ সারা—তাঁকে হাঁড়ি ছুঁতে না দেওয়া, দোকানীর পুত্র হও তো দোকানের ত্রিসীমানায় লজ্জায় না যাওয়া, ময়রার হও তো তাড়ু ছাড়া, নাপিতের হও তো ভাঁড় জলে ফেলা, কলুর হও তো ধানগাছ পুঁতে ফেলা, চাষার হও তো হাল গরু বিলিয়ে দেওয়া—দেনা থাকলে বেচে ফেলা! এসব বাদে সকলকেই কতকগুলি পশম কিনে ঘরে কারপেটের কাজ কর্তে দিতে হবে।*

বাবুদেব মধ্যে 'ফুলবাবু,' 'প্রগ্রেসিভবা', 'স্বাধীনবাবু' ইত্যাদির চালচলন প্রবন্ধকার সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন।

"যে যত বাপের মনে দুঃখ দিতে পারিবে, সে তত 'প্রগ্রেসিভ' বাবু হইবে। যে যত সমাজের বিপরীত আচরণ করিবে, সে তত সাহেবপ্রিয় বাবু হইতে পারিবে। যে যত পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত প্রভৃতির প্রতি ভক্তি স্নেহ কাটাইতে, তাহাদিগের হইতে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিতে এবং বাবার পরিবার বাবা পুষুন, আমার পরিবার আমি পুষি, এই বিলাতী পোলিটিক্যাল ইকনমিমূলক লোকযাত্রা বিধান তত্ত্বের অনুগামী হইতে পারিবে, সে তত স্বাধীনবাবু বুক ফুলাইয়া বেড়াইবে। সেই সকল বাবু ইংরাজী পড়িয়া এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া স্বাধীনতা নামা অমূল্য পদার্থের ঘোর ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, এমন কি স্বাধীন না হইলে তাহাদিগের অন্ন পরিপাক হওয়া, কি জীবন ধারণ করাও ভার। কিন্তু রাজকীয় স্বাধীনতা পাইবার উপায় নাই—কেন না ইংরাজের মত এদেশে পার্লামেণ্ট স্থাপনের প্রস্তাব করিতে গেলেই "কিকিং" বই আর কিছুই লাভ হইবে না! —সংবাদপত্রে কিম্বা পুস্তকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন অভিপ্রায় প্রকাশের যো নাই। কেন না এখনি ছোটকর্তা শ্রীঘরে পাঠাইতে পারেন! তবেই হইল, উচ্চ অঙ্গের কোনো স্বাধীনতার মুখ দেখিবার কোনো প্রত্যাশা নাই, অথচ স্বাধীনতা ব্যতীতও প্রাণ হাঁপায়! এ অবস্থায় কি করেন —আর কোথায় সে সাধ মিটাইবেন? ঘরে বুড়ো বাপ মা আছেন, তাঁহারা আপনারা না খাইয়া আপনাদের সকল সুখ নষ্ট করিয়াও—এতকাল খাওয়াইয়া পরাইয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন, যাহাতে সন্তানের সুখ হয় তাহাই করিয়াছেন, সকল আব্দার সহিয়াছেন, সকল সাধ পুরাইয়াছেন, এমন স্বাধীনতার সাধ পুরাইবার ভার তাঁহাদের বই আর কাহার স্কন্ধে চাপাইতে পারেন? তাহার পর নির্দোষা যোষা সহধর্মিণীদের মনে যে যত দুঃখ দিতে সমর্থ হয়, সে তত ফুলবাবু শিরোমণি হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর বাবুদের অগম্যাগমন ও অপেয় পান, এই দুটিই প্রধান গুণ। অধুনা এদেশে এ-শ্রেণীর বাবু যত, অন্য কোনো শ্রেণীর বাবু তত দেখা যায় না। এই বাবুরা একদিগে এবং প্রগ্রেসিভ বাবুরা একদিগে এবং স্বাধীনবাবুরা মধ্যস্থলে, এইরূপ অর্ধচক্রব্যূহ সাজাইয়া সামাজিকতার সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সূক্ষ্মদর্শী নিরপেক্ষ দর্শকের মতে ঐ তিনদল কদাচ জয়ী হইবে না—অথচ পূর্ব সামাজিকতাও যে অবিকল পূর্বাবস্থায় থাকিবে, তাহাও বোধ হয় না। অবশ্যই কিছুকালে একটা রক্ষা হইয়া উভয় অন্তিম সীমার মধ্যবর্তী কোনো একটা বন্দোবস্ত হইতে পারিবে।"

মন্তব্য দীর্ঘ হ'লেও আকর্ষণীয় বলেই উপস্থাপন করা হ'ল। এর মধ্যে সমাজের সাংস্কৃতিক চিত্রটি বড় হ'লেও এর সঙ্গে আর্থিক দিকটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। আর দুয়েকটি উদ্ধৃতি টেনে প্রসঙ্গান্তরে যেতে হবে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত (বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন, ১২৭৯, পৃঃ ৫১০—১২) বঙ্কিমচন্দ্রের "বাবু" প্রবন্ধটি অত্যন্ত সুপরিচিত থাকায় তার উদ্ধৃতি দেবার আবশ্যক নেই। তবে বান্ধব পত্রিকায় (বান্ধব—আশ্বিন, কার্তিক, ১২৮১, পৃঃ ৯৫) 'ব্যুৎপত্তিবাদ' নামে একটি প্রবন্ধে হাস্যরস সৃষ্টির জন্যে ভ্রমাত্মক ব্যুৎপত্তি বিচার করা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়েও বাবুর স্বরূপ জানা যাবে। "বাবু—বব চাঞ্চল্যে, বৃথাভিমানে, পরানুকরণে, ধৃষ্ট ব্যবহারে চ। ঔনাদিক দুঃ প্রত্যয়ঃ। ণ ইৎ যায়, উ থাকে, আকারে বৃদ্ধি। যাহাদিগের স্বভাব চঞ্চল, অভিমান গগনস্পর্শী, চিত্ত পরানুকরণরত এবং ব্যবহার ধৃষ্ট, তাহারা বাবু। বাবু চাঞ্চল্যে ভ্রমর-সদৃশ, চিন্তাশক্তি কিছুতেই বহুক্ষণ অবস্থান করিতে পারে না, অভিমানে শরতের মেঘ, গর্জে কিন্তু বর্ষে না, অথবা বর্ষার ভেক, নিয়ত শব্দ করে, কিন্তু নিকটে আসিতে সাহস পায় না, পরদেশীয় ছন্দানুবর্তনে সর্বথা নিগারদিগের সমান, একবার আসবাব ও পোশাকের দিকে দৃষ্টিপাত কর, এবং ধৃষ্টতায় প্রুশিয়ান-

দিগের প্রপিতামহ, কথায় বোধ হয়, একলম্ফে সপ্তসাগর উল্লঙ্ঘন করাও বিচিত্র নহে।"

বিভিন্ন প্রহসনেও বাবুর লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে। প্রিয়নাথ পালিতের 'টাইটেল-দর্পণ' প্রহসনে (১৮৮৫ খ্রীঃ) আছে,—

"শুধু বাবু হয় নাই, আটটি লক্ষণ চাই,
তবে নাম জানিবে সকলে!
বেশ্যাবাড়ী ছড়ি ঘড়ি, বিকেলে ফিটনগাড়ি
দিবানিশি ভাস লাল জলে।
গান বাদ্য কর সার, মাছ ধর রবিবার,
চুল কাট অ্যালবার্ট ফ্যাসনে।
বড়লোক বলি তবে. ঘুষিবে সুখ্যাতি সবে,
মার কথা দীনবন্ধু ভণে।"

অমৃতলাল বসুর 'বাবু' নাটকেও (১৮৯৪ খ্রীঃ) বৈষ্ণবীদের কীর্তনে বাবু সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে, তা বেশ আকর্ষণীয়।

নব্য বাবুয়ানা ছিল নব্য সংস্কৃতিনির্ভর এবং তার মূলে ছিল Industrial Capitalist-দের বাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। বাবুয়ানার দ্রব্য-সামগ্রী লক্ষ্য করলে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। দেশীয় জিনিষে বাঙ্গালীর অরুচি ধরিয়ে তারা তাদের কাজ সিদ্ধ করেছে। দুর্গাদাস দে-র লেখা "ল বাবু" প্রহসনে (১৮৯৮ খ্রীঃ) তাঁতিনী বলেছে,—"দেখুন, যে বাঙ্গালীরা ছেলেমেয়ের অসুখ হলে আর খই বাতাসা খাওয়ায় না, যে বাঙ্গালীরা আফিস থেকে আসবার সময় এক পয়সার তামাক বাদে পনের আনা তিন পাইএর বিলাতী জিনিষ কিনে আনে, যে বাঙ্গালীর মেয়েরা ফ্যান্সী পোষাকের জন্য স্বামী বেচারিকে ঋণগ্রস্ত করতে ক্রটি করে না, যে বাঙ্গালীরা ছেলেমেয়েকে বিলাতী দাইএর দ্বারা লালন-পালন করায়, সেই বাঙ্গালীরা কি আবার দেশী কাপড় কিনে পড়বে আশা করেন?" দেবতাদের মধ্যে বাবু হচ্ছেন কার্তিক। কার্তিককে প্রতিভূ করে তাঁর বাবুয়ানার জন্যে ক্রেতব্য জিনিষের একটা তালিকা পাওয়া যায় অহিভূষণ ভট্টাচার্যের "বোধনে বিসর্জন" (১৮৯৬ খ্রীঃ) প্রহসনে। জিনিষগুলো এই—"তোয়ালে এক ডজন, বর্ডারদার সিল্কের রুমাল এক ডজন, পিওর সোপ এক বাক্স, ফ্লোরিডা ওয়াটার, ল্যাভেণ্ডার, অডিকোলন, পমেটম, রোজ এ্যাটো আতর, আয়না, ক্রস, বার্ডসাই চুরুট, হোয়াইট টু লডিজ কোম্পানী পাম্প সুজ, মাছ ধরার যন্ত্রপাতি, হুইল মুগো সুতো ইত্যাদি।" দীনবন্ধু মিত্রের "সাধবার একাদশী"তে (১৮৬৬ খ্রীঃ) মুক্তেশ্বরের জামাইয়ের চেহারার বর্ণনা নিমচাঁদের ভাষায়, "তুমি বাবু যে বাহার দিয়ে এসেচ মাতার মাঝখানে সিতে, গায় নিনুর হাফ চাপকান, গলায় বিলাতী ঢাকাই চাদর, বিদ্যাসাগর পেড়ে ধুতি পরা, গরমিকালে হোলমোজা পায়, তাতে আবার ফুলকাটা গারটার, জুতো জোড়াটি বোধহয় পথে আসতে কিনেচো, ফিতের বদলে রূপার বগলস, হাতে হাড়ের হ্যাণ্ডেল বেতের ছড়ি, আঙ্গুলে দুটি আংটি।" চুনিলাল দেবের "ফটিকচাঁদ" প্রহসনে (১৮৯৮ খ্রীঃ) বাবুর আত্মকথার মধ্যে দিয়ে বাবুয়ানার দ্রব্য-সামগ্রীর নমুনা পাই। ফটিকের ছেলে দুটি গান ধরেছে,—

"চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে যাব সঙ্গেতে ইয়ার,
কালাপেড়ে ইউনিফরম ফেট্টা চাদর চুনটদার।
বেলদার জামা গায়ে, বল সু দিয়ে পায়ে
ফুল তোলা সিল্ক্ মোজা, সিল্কের গার্টার,
হীরে পান্নার আংটি হাতে, বুকে চেনের কি বাহার।
যুঁয়ের গোড়ে গলায় দিয়ে, এসেন্স্ মাখা রুমাল নিয়ে,
ফ্রেঞ্চকট্ টেরী মাথায়, ঢালবো ল্যাভেণ্ডার
চলবে বুলি মজাদারী, উড়বে খালি রোজ লিকার॥"

রাজকৃষ্ণ রায়ের "খোকাবাবু" প্রহসনে (১৮৯০ খ্রীঃ) বিবিয়ানার সমগ্রীর বর্ণনা আছে। দয়াল-গিন্নী ঝি-কে বলে,—"যা শিগ্‌গির পিয়ারের সাবানখানা গোলাপ-জলে ডুবিয়ে নিয়ে আয়। রেশমী রুমালখানা গসনেলের ফ্লোরিডা ওয়াটারে ভিজিয়ে নিয়ে আয়। ল্যাভেণ্ডারে বড় তোয়ালেখানা ডুবিয়ে আন। সিন্দুরে একটু বেলার আতর মিশিয়ে আন।" বিবিয়ানার বিরুদ্ধেও আর্থিক দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে, তবে এ বিষয়ে আলোচনার অবকাশ সৃষ্টির কোন প্রয়োজন নেই।

বস্তুতঃ বাবুদের এই উন্নত মানের জন্যে গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। শ্যামাচরণ ঘোষালের "বারইয়ারী পূজা" প্রহসনে (১৮৭৮ খ্রীঃ) গ্রামের চাল-কাপড়ের দোকানদার বৈদ্যনাথকে বলে,—"আর কারবার! সে রামও নেই, আর সে অযোধ্যাও নেই, তবে কিনা বসে না থেকে ব্যাগার খাটি, দেখ এই রামবাবু আর নবীনবাবুর বাড়ী কাপড় দিয়েই বিলক্ষণ দশটাকা লাভ হতো, এখন আর তাঁরা এখানে কেউ নেই, প্রায় সকলেই কলকাতায়, কাজে কাজেই লাভের দফা হয়ে গেছে।" শুধুমাত্র বিদেশী দ্রব্য-সামগ্রীর জন্যে নয়, নব্য সংস্কৃতিনির্ভর বাবুয়ানার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল এমন কতকগুলো আচার যা রক্ষণশীলের কাছে অনাচার বলে বোধ হয়েছে। গ্রামে তার অনুষ্ঠান সুবিধাজনক ছিলো না। বাবুদের নগরপ্রীতির মূলে এটাও একটা কারণ।

সংস্কৃতি ও অর্থনীতির দিক থেকে বাবুদের তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (ক) ফোতো বাবু (খ) হঠাৎ বাবু এবং (গ) কাপ্তেন বাবু।

ফোতো বাবু—বাবুয়ানার বাহ্য আকর্ষণ অর্থহীন ব্যক্তিকেও অপব্যয়ে প্ররোচিত করেছে। বৃথা মান ও প্রতিষ্ঠার জন্যে অর্থহীন ব্যক্তি একই সঙ্গে সকলকে এবং নিজেকে প্রতারিত করবার চেষ্টা করেছে। 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় (মধ্যস্থ—চৈত্র, ১২৮০ সাল) ফোতো বাবুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—"বাইরে বাবু নাম, ঘরে বাঙ্গারাম। অর্থাৎ বাস্তবিক ধনী নয়, অথচ ধনীর ন্যায় বাহ্য ভড়ং করিয়া চলিত, তাহাকে লোকে ফোতোবাবু বলিত।" প্রিয়নাথ পালিতের "টাইটেল দর্পণ" (১৮৮৫ খ্রীঃ) প্রহসনে দীনবন্ধু ছড়া কেটেছে,—

"মনে করি গাড়ি চড়ি বগি উল্টে পড়ে যাই।
মন ত সকের বটে হাতে কিন্তু পয়সা নাই।

হরিহর নন্দীর "ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম" প্রহসনেও (১৮৭৭ খ্রীঃ) এ ধরনের ছড়া আছে,

"জাগা নাই জমিন নাই, গল্প করে ভারি।
আগে পাছে লণ্ঠন, টাকার নামে ঠন্ঠন্
সদাই দৌড়ান গাড়ী।
কানে কলম গুঁজে ফিরে, ছেঁড়া কাঁথা গায় ওড়ে
বাত্তি জ্বালায় লেম্প
ইংরেজি বকেন সদা, ডেম্ ডেম্ মা ডেম্ ডেম্।"

এ ধরনের ফোতো নবাবী সমাজে অবাস্তব ছিল না। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "বিধবার দাঁতে মিশি"(১৮৭৪ খ্রীঃ) প্রহসনে আছে,—প্রেমানন্দ দাস তাঁর বরানগর বাড়ীতে ১৩ই ডিসেম্বর শনিবার একটা আমোদ দলে যোগ দিতে বরদা ও সাঙ্গোপাঙ্গকে নিমন্ত্রণ করেছেন। বিধু ও গোরা প্রেমানন্দ সম্পর্কে আলোচনা করে। সে পোশাক-আশাকে খুব বিলাসী, তার দুটো মোসায়েব আছে—ভূপাল ঘোষ ও রমেশ সেন। প্রেমানন্দ বড় বড় বাৎ মারে, কিন্তু এদিকে হাঁড়ি ঠন্ ঠন্। গোরা মন্তব্য করে—"কলকেতার একচোকো বাবুর জামাই চটকদাসও ঐ দলের লোক।" এই ব্যক্তিগত আক্রমণ প্রতিষ্ঠাস্পৃহার স্বাক্ষর বহন করলেও বাস্তবতার স্বাক্ষরও বহন করে।

বাবুয়ানার সঙ্গে মিশেছিল ফোতো সাহেবীয়ানা। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের "কাজের খতম" প্রহসনে (১৮৯৯ খ্রীঃ) মতি গণেশ ডাক্তারের সাংসারিক অনটনের কথা বলতে গিয়ে বলে—" পোশাকেরই চটক বাবা! ঘরে হাঁড়ি ঢন্ ঢন্। যেমনি তুমি, তোমার সহধর্মিণীও তদুপযুক্ত। গাউনের জন্যে আর ফাউলের জন্যে বাপান্ত না করছে এমন দিনই নাই। ভাগ্যিস রমাকান্ত বাবুর Family Doctor হতে পেরেছিলে! তাই যা হোক করে চেয়ার বদলে কেরোসিনের বাক্সোয় বস, আর টেবিলের বদলে কলুঙ্গিতে খাচ্ছ, আর দুএকটা মর্তমান রম্ভা বদনে দিতে পাচ্ছ।" "গণেশের স্ত্রী রঙ্গিনী গণেশকে বলেছে—"ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোসাঞি। অমন ফতো সাহেবের মুখে মারি জুতোর বাড়ী!! জজেদের মেয়ের মত খেতে পরতে দিবি, আর একশো টাকা করে মাসোহারা দিবি! এইলোভে জাত খুইয়ে বে করেছিলুম!"

ব্যক্তিগত চুক্তিমূলক আয়ে বাবুয়ানা সম্ভবপর হয় না। তাই এই সব ফতোবাবুদের আয় হয়ে গেছে দৌর্নীতিক। বাড়ীর টাকা গহনা ইত্যাদি চুরি বা প্রতারণা দ্বারা সংগ্রহ ক'রে তারা বাবুয়ানার খরচ চালিয়েছে। হরিশচন্দ্র মিত্রের লেখা "ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে" প্রহসনে (১৮৬৩ খ্রীঃ) প্রমীলা ফোতোবাবুদের কথা বলতে গিয়ে বলে, "এরা ১০৲ টাকা মাইনে পায় ২৫৲ টাকার মেয়ে রাখে।" যামিনী জিজ্ঞেস করে—"উপরি রাখে বুঝি?" প্রমীলা বলে—"উপরি রোজগার বাড়ীর মাথায় হাত বুলিয়ে।" দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী" প্রহসনেও (১১৭২ খ্রীঃ) আছে,—ফোতোবাবু পরেশের স্বগতোক্তি—"আজ শনিবার প্রাণটা উড় উড় কচ্চে, মজাটজা করতে হবে। এমন মধুবারটা যে বুকের উপর দে কেটে যাবে, সেটা প্রাণে সইবে না। হাতে টাকা-কড়ি নেই, তা কি করব, মাগের একখানা গয়না বেচতে হবে, তা নইলে কি এমন মজা ছেড়ে দেব? যতদিন বাঁচব ইয়ারকি হদ্দমুদ্দ দেবো।" এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শনিবার হচ্ছে গত শতাব্দীর বাবুদের দুষ্কর্মের পর্বদিন। চন্দ্রকান্ত শিকদার এ সম্পর্কে "কি মজার শনিবার" (১২৭৭ সাল) নামে একটা ছড়ার বই লিখেছিলেন।

প্রহসনে এই সব ফোতোবাবুদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে এবং নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের অশ্রদ্ধা প্রকাশের মাধ্যমে এই বাবুয়ানা ও ফোতো সম্মানের অসারতা প্রচার করা হয়েছে। 'বৈকুণ্ঠ' (=ব্যয়কুণ্ঠ)-বাবুকে উদ্দেশ করে একটি বেশ্যার ছড়া উনবিংশ শতাব্দীতে সুপ্রচলিত ছিল,—

"পয়সা কড়ী নেই নাগরের
শুধুই বলে টপ্পা গা।

বোসে যদি থাকতে লারিস,
ঘুম লাগে তো দরকে যা।"

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "বুঝলে কিনা" প্রহসনে (১৮৬৬ খ্রীঃ) ফতোবাবু অটল সম্পর্কে কোচোয়ান মন্তব্য করেছে,—

"খানে মে বড়া মকৃবুদ, যৈসে ওয়লর ঘোড়া,
লেকেন পয়সা দেনে মে বড়া আড়িয়ল হোতা।

বস্তুতঃ ফোতো বাবুয়ানা প্রতারণামূলক হওয়ায় এই ধরনের বাবুয়ানার দৃষ্টান্তে সমাজসঙ্ঘের সাধারণ আয় ব্যয়ের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়ে।

হঠাৎ বাবু—অর্থসম্পন্ন অথচ 'সাংস্কৃতিক' দিক থেকে ঐতিহ্যহীন বাবুরা এই গোত্রে পড়েন। এদেশের গ্রাম্য জমিদাররা যখন নব্য Industrial Capitalist-দের শিল্পের জন্য কাঁচামালের যোগানদার হলেন, তখন এই "a race incorigible"-কে ইংরেজদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট সম্মানের ব্যবস্থা করা হ'ল এবং অর্থ ও গ্রামীণ সংস্কৃতির দিক থেকে জমিদাররা হয়ে উঠলেন প্রতিপত্তিশালী। ইংরেজদের আনুকূল্যে অতি সহজে এঁরা নগরাশ্রয়ী নতুন সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকলেন। তাই এঁদের মধ্যে অনেকে গ্রাম ত্যাগ করে শহরে এসে 'হঠাৎবাবু' হ'লেন। জমিদারদের এ ধরনের অপব্যয়ে ইংরেজদের সমর্থন ছিল। এদেশের মূলধন যাতে লগ্নী কম হয়, সেদিকে ইংরেজদের দৃষ্টি ছিল। ইংলণ্ডের Capitalistরা অনুভব করেছিলেন যে, তাঁদের মূলধন ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ থাকলে Law of Diminishing Return"-এর সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন খরচা বাড়বে এবং মুনাফায় আঘাত পড়বে। তখন Capital রপ্তানীর প্রয়োজন দেখা দিল। Holt Mackanzie তখন পরামর্শ দিলেন, ভারত থেকে যে অর্থ ওদেশে পাচার হয়, তার থেকেই Capital গড়ে নেওয়া যেতে পারে এবং ভারতের মোটা মাইনের সাহেবরা তাদের উদ্বৃত্ত অর্থকে লগ্নী করতে পারবে। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে বিদেশী মূলধন অক্টোপাশের মত সর্বত্র লগ্নী হবার সুযোগ খুঁজছিল। বিত্তবান জমিদারদের মূলধন লগ্নীর সুবিধা ছিল। কিন্তু তারা ইংরেজদের চক্রান্তে একাধারে বাবুয়ানার দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে বিদেশী শিল্পের বাজার দৃঢ় করেছে, অন্যদিকে তেমনি মূলধনের উপযোগী অর্থ অনর্থক অপব্যয় করেছে।

হঠাৎবাবুদের বাবুয়ানার মূলে এই অর্থনীতিক চক্রান্তের ইতিহাসটির প্রাসঙ্গিকতা আছে। এই হঠাৎ বাবুরা অর্থনীতিক সংস্কৃতিতে দু-নৌকায় পা দিয়ে চলেছে। তাই রক্ষণশীল অর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ এবং প্রগতিশীল অর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ উভয় পক্ষ থেকেই বিদ্রূপের পাত্র হয়েছে। নব্য পরিবেশে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অভাবে কেমন করে হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে পৌঁছায়, অনেক প্রহসনে তার বর্ণনা আছে। সাধারণ ভাবে হঠাৎবাবুদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত দৃষ্টিকোণই সংগঠিত হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্ষণশীল আর্থিক দৃষ্টিকোণও তার সঙ্গে জড়িত। আমাদের সমাজে ফোতোবাবু এবং হঠাৎবাবুর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ধরা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে কাপ্তেনবাবুকেও হঠাৎবাবু বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। লেখক যে দিকটি লক্ষ্য করে হঠাৎবাবুদের পৃথক গোত্রে ফেলেছেন, উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সন্দর্শক প্রহসনকাররা সর্বদা সেই অর্থে ফেলেন নি। হরিহর নন্দীর লেখা 'হঠাৎবাবু' (১৮৭৮ খ্রীঃ) প্রহসনটির বিষয়বস্তু পূর্বোক্ত বক্তব্যের প্রমাণ বহন করে।

কাপ্তেনবাবু—"সমাজ সংস্কার" নামে একটি গ্রন্থে অবতারচন্দ্র লাহা লেখেন—"আমি দেখিতেছি 'বাবু' শব্দের পশ্চাতে কেবলমাত্র একটি করিয়া 'ঘোর' যুড়িয়া দিলেও বাবুদ্বয়ের প্রকৃতিগত ভাবার্থ তত স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না। সুতরাং বিস্তর গভীর গবেষণার পর এই স্থির করিলাম যে 'ঘোর' শব্দের পরে ও 'বাবু' শব্দের পূর্বে অর্থাৎ দুয়ের মধ্যস্থলে আরও একটি করিয়া বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করিলে ভাল হয়। শব্দটি কিন্তু জাহাজী, তা করি কি—অর্থাৎ—'বাবু'—'ঘোরবাবু' —'ঘোর কাপ্তেনবাবু।' (পৃঃ ২)। লেখকের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝাচ্ছে, যে কাপ্তেনবাবু বাবুর কোন জাত নয়, বাবুয়ানার মাত্রা-মাত্র। শরৎচন্দ্রের ভাষায় "ভয়ঙ্কর বাবু"। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পরবর্তীকালে কাপ্তেনবাবু বলতে বুঝিয়েছে ধনীর বয়ে-যাওয়া নাবালক পুত্র। ফোতোবাবুর ওপর মোসাহেবদের আকর্ষণ নেই। কিন্তু হঠাৎবাবু এবং কাপ্তেনবাবুদের ওপর মোসায়েবদের আকর্ষণ তীব্র। উল্লিখিত "সমাজ সংস্কার" গ্রন্থে অবতারচন্দ্র লাহা লিখছেন—"যেমন প্রফুল্ল সরোবরে পদ্ম ফুটলে ভ্রমর-গুলো এসে গুণ গুণ করে, মধুর কলসি ভেঙ্গে গেলে মাছিগুলো এসে ভ্যান্ ভ্যান্ করে, বসন্তের উদয় হলে কোকিলগুলো এসে কুহু কুহু করে—আফিস অঞ্চলে একটা চাকরি খালি হলে, চারিদিক থেকে উমেদার এসে ভেড়ে, আর গো-ভাগাড়ে গরু পড়লে যেমন শকুনির টনক নড়ে, তেমনি বাজারে একটা কাপ্তেন বেরুলে মোসাহেবগুলো যেন কোথা থেকে হামড়ে এসে পড়ে—অমনি মারে মারা,

বাপে খ্যাদান হাড় হাবাতে উন পাঁজুরে, বরাখুরে প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় মোসাহেব মহোদয়গণ চারিদিক থেকে এসে ধাঁ করে বাবুকে ঘিরে বসলো—ওহো! সে দৃশ্য কি মহা শোচনীয়। যেন জয়দ্রথ প্রভৃতি সপ্ত মহারথী ষড়যন্ত্র করে ব্যূহ বন্ধনপূর্বক অর্জুননন্দন অভিমন্যুর প্রাণ সংহারে সমুদ্যত! সে ব্যূহ ভেদ করে বালকের প্রাণরক্ষা করে, কাহার সাধ্য?" (পৃ: ৫)। কাপ্তেন-বাবুর অর্থব্যয়ের উপায় করে দেয় এই সব মোসাহেব। অনেক ক্ষেত্রে অর্থব্যয়ে বাবুর অনিচ্ছা থাকলেও মোসাহেবের তোষামোদে লোকের চোখে ঠুনকো সম্মান বজায় রাখবার জন্যে বাবু খরচে প্রবৃত্ত হন। এমন কি নাবালক অবস্থায় অর্থের অসুবিধায় এরা হ্যাণ্ডনোটে টাকা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করে—তাতে মহাজনের সঙ্গে মোসাহেবদেরও বখরা থাকে। চুক্তি হয়, সাবালক অবস্থায় কাপ্তেনবাবু সে টাকা শোধ করবেন। মহাজনরা সাধারণত: নিশ্চিন্ত, কারণ একদিন কাপ্তেনবাবু বিষয়-আশয় পাবেন। অনেক সময় অনেক মোসাহেব নিজের বেনামী টাকা কাপ্তেনবাবুকে ধার দিয়ে পরে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। তা ছাড়া কাপ্তেনবাবুর ঘড়ি বোতাম আংটি ইত্যাদি উদ্যোগী হয়ে বিক্রী করে এবং ভাল মুনাফা পেয়ে থাকে। এদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় একটি পুস্তকে (আপনার মুখ আপনি দেখ—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ১৮৬৩ খ্রী:। পৃ:৩) লিখেছেন—"ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে নিঃস্ব করিতে কিম্বা বিপদে ফেলিতে এই জানোয়ারেরাই মূল কারণ। কত কত ধনাঢ্য ব্যক্তি যে তাহারদিগের বুদ্ধি বশতঃ মনুষ্য নামের অযোগ্য হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা স্মরণ করিলেই জানিতে পারিবেন। দুগ্ধকলা দিয়া কালসর্প পুষিলে যেমন ফললাভ হয়, তাহাদিগকে প্রতিপালন করাও সেইরূপ জানিবে। এমত অনেক দেখা গিয়াছে যে এই অন্নদাস জানোয়ারে অনেকের অন্ন ধ্বংস কোরে শেষে অন্নদাতার এমত অনিষ্ট সাধন করিয়াছে যে তাঁহার প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে।"

বিভিন্ন প্রহসনে কাপ্তেনবাবুর এই সমস্ত অপব্যয় দর্শনে সঞ্চয়ের ওপরেই একটা বিতৃষ্ণা ব্যক্ত হয়েছে। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা" প্রহসনে (১৮৫৮ খ্রী:) রামকৃষ্ণ বলেছে—"এই যারা পেটে না খেয়ে...টাকা জমায় আর সেই টাকা তারি ছেলেপিলেকে মজাবার উপায় করিয়া দেয়, সেই প্রকার টাকা জমান অতি মন্দ।" "কাপ্তেন শিকারীদের সম্পর্কেও প্রহসনকারের দৃষ্টিকোণ অতি স্পষ্ট। কালীচরণ মিত্রের "কাপ্তেনবাবু" প্রহসনে (১৮৯৭ খ্রী:) রামকৃষ্ণ ভড় একজন কাপ্তেন শিকারী মহাজন। তার সম্বন্ধে অমৃতলাল পাইন বলে—"ব্যাটা কত ছেলের এমনি করে সর্বনাশ করেছে। একগুণ দিয়ে চারগুণ আদায় করে।" একই প্রহসনে প্রহসনকার এই সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রহসনের শেষে জজ সংবাদপত্রে এই কথা ছাপাতে বলেন—'অদ্য হইতে যদি কোন মহাজন নাবালককে না বুঝিয়া টাকা ধার দেন, তাহা হইলে তিনি টাকা পাইবার পরিবর্তে আইনানুসারে দণ্ড ভোগ করিবেন'।"

এই ধরনের বকাটে ছেলে কাপ্তেনবাবুর দল ক্রমেই ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী" প্রহসনে (১৮৭২ খ্রী:) প্রিয়নাথ এক জায়গায় বলেছে—"পেনটিতে ভাল পুষ্যিপুত্র দেখাও তো।" জগচ্চন্দ্র উত্তর দেয়—"ও গুলি-খোরের দেশ, ওখানে আর পোষ্যপুত্র ভাল হবার যো আছে? যদি একজনের বাপ কতকগুলি বিষয় রেখে মরে যায় আর তার ছেলে যদি ছোট হয় তা হ'লে পাঁচ বেটা বওয়াটে এসে সেই ছেলেটির মোসায়েব হয়ে গাঁজা গুলি চরস চণ্ডু ও মদ খাইয়ে অবশেষে পথের ভিখারি করে।" তখন প্রিয়নাথ মন্তব্য করে—"শুধু ঐ দেশটি কেন? আজকাল ঐরূপ সব দেশ হয়েছে।"

বস্তুতঃ বাবুয়ানা আমাদের সমাজে অনর্থক অর্থব্যয়ের নামান্তর ছিল। আমাদের সমাজে বিদেশীদের আর্থনীতিক শোষণে আমরা যে হীন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছি, সে অবস্থায় সঞ্চিত সামান্য অর্থ লগ্নীতে ব্যবহার না করে বাবুয়ানায় অপব্যয় করার অর্থ প্রকারান্তরে শিল্পপতি ইংরেজদের শিল্পের চাহিদা সৃষ্টি করা। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের "কিছু কিছু বুঝি" (১৮৬৭ খ্রী:) গোড়াতে নট বলছে—"কিছু কিছু বুঝি ঐ বুঝলে কিনারই আদর্শ মত সুরাদোষ ইন্দ্রিয়দোষ যদেচ্ছাহার ও অনর্থক অর্থব্যয় প্রভৃতি দেশাচার সংশোধক বিষয়েই লিখিত হয়েছে। মদ্যপানও বাবুয়ানার অঙ্গ হিসেবে এবং সাধারণ প্রবৃত্তিতেও সমাজে "অনর্থক অপব্যয়ের" দৃষ্টান্ত এনেছে। লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের "মোহন্তের এই কি কাজ" (১ম খণ্ড) নাটকে (১৮৭৩ খ্রী:) এক জায়গায় এই মাত্রাতীত ব্যয়ের প্রসঙ্গ আছে।—

"মাধব। তোমার এই ২০ টাকা মাইনাতে কি করে সব হয়, তাও ত কই পুরা মাইনা একবারও পাও না?"

কানাই। আরে বোকা ছেলে! যা পাই যেখানে,

তার অর্ধেক আগেই মায়ের হাতে, না হয় গিন্নির হাতে দি, আর বাদ বাকি মামাদের দি।

মাধব॥ মামা কারা?

ডি সুজা॥ শুঁড়ীরা, যারা মদ বেচে।"

অতুলকৃষ্ণ মিত্রের "ভাগের মা গঙ্গা পায় না" প্রহসনে (১৮৮৯ খ্রী:) মদ্যপানের অর্থঘটিত দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। ভয়ানকচন্দ্রের মাতাল পুত্র বেঁড়ে "শালা" বাবার কাছে টাকা চাইতে আসে। সে মদ খেয়ে মাতলামো করায় হাকিম তার ২৫৲ টাকা ফাইন করেছে। বাইরে সিপাই অপেক্ষা করছে। মাতলামো করবার জন্যে তার মাকেও পাহারাওয়ালা আটক রেখেছে। ভয়ানকচন্দ্র রেগে গিয়ে বলে, প্রাইভেট ইস্কুলের মাষ্টারদের মাইনে মেরে একশো টাকা তার মায়ের হাতে দিয়েছে, সব খরচ করে আবার এই! তখন বেঁড়ে ভয়ানকের গলার কলার চেপে ধ'রে বলে,—"শালা নিদেন হামার পাঁচ টাকা দিবি কিনা বল? নইলে এক সেলারি blow-তে তোর বদন বিগড়ে দেবো।" ভয়ানক ভয়ে ভয়ে তাকে চেন ঘড়ি দিয়ে দেয়—বলে এটা বাঁধা দিয়ে সে টাকা সংগ্রহ করুক।

বাবুয়ানার অঙ্গ মদ্যপানের বিরুদ্ধে যে আর্থিক দৃষ্টিকোণ সংগঠন হয়েছে, তার মূলেও একটা বড় পরিকল্পনা থেকেছে। অমৃতলাল বসুর "বাবু" প্রহসনে (১৮৯৪ খ্রী:) তিতুরামের বক্তব্যটি এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। তিতুরাম সমসাময়িক কালের ওপিয়ম কমিশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছে,—"ওপিয়ম কমিসন অর্থ ইংরেজদের নিজেদেরই লাভ, আফিমে দেশ সর্বনাশে যাচ্ছে বলে কমিসন বসে নি। মদ্যে আরও সর্বনাশ হচ্ছে। ইংরেজদের সর্বত্রই লাভের প্রশ্ন। তাদের নিজেদের আত্মীয়দের মদের ব্যবসায় আছে। তাইসেই ব্যবসায়ের লাভের জন্যই আফিম বন্ধ করছে। আফিমখোর আফিমের অভাবে মদ খাবেই। তাতে ইংরেজেরই লাভ।" মদ্যপান ও অপব্যয় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় (সুলভ সমাচার পত্রিকা—১০ই ফাল্গুন, ১২৭৭ সাল) 'অপরিমিত ব্যয়' নামে একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছিল—"চালে খড় নাই চুলে পোমেটম, জামার পকেটে একটি আধলা পয়সাও খুঁজিলে পাওয়া যায় না, অথচ আস্তিনে রৌপ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ চারটা দু'আনি, মা ছেড়া কাপড় পরে ঘর গোবর দেন, নিজের বুট, পেনেটলুন, চাপকান, জোব্বা এবং টাসল দেওয়া টুপি, বাড়ীতে ভাতে ভাত, আপিসে রোজ দুই আনা রকম টিফিন চলে না। অন্ন হউক না হউক মদ খাওয়াটি চাই এমন বাবুও অনেক দেখা যায়। তাহাদের যে কি কষ্ট তাহা তাঁহারাই বিলক্ষণ জানেন। তাঁহাদের বিষয় আমরা যাহা কিছু জানি তাহা কেবল দেখে শুনে তাহারা ভুক্তভোগী।

"আয় বুঝে ব্যয় কর হবে না অভাব,
আয় ছাড়া ব্যয় করা মূঢ়ের স্বভাব।"

বাবুয়ানার বিরুদ্ধে আমাদের সমাজে আর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ ব্যাপক সমর্থনে পুষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে বাবুয়ানার সঙ্গে নব্য সংস্কৃতি জড়িয়ে থাকায় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত দিক থেকেও বাবুয়ানার বিরুদ্ধ দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে। নব্য সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা, সমাজ-সংস্কার, দেশোদ্ধার, ব্রাহ্মধর্ম ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে প্রচুর প্রহসন লেখা হয়েছে এবং সেখানে বাবুয়ানার প্রসঙ্গে সমাজদর্শনের নতুন নতুন ক্ষেত্রেরও অবকাশ আছে। তবে এক্ষেত্রে তার অবতারণায় কোন প্রয়োজন নেই।

—•—

আচার্য কৃষ্ণকুমার মিত্র

শ্রীগজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ঊনবিংশ শতকে বিভিন্ন দিক উদ্ভাসিত করে ভারতভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন কয়েক জন মহামানব। প্রত্যেকেই ছিলেন অসামান্য শক্তির অধিকারী। তাঁদের অবদানে দেশ হয়েছে সমৃদ্ধ। সে ঋকৃথের উত্তরাধিকার পেয়ে আমরা ঐশ্বর্যবান্। জগৎ সভায় আমাদের আসন আজ আভিজাত্যমণ্ডিত। তাঁদের স্মৃতিতে আসে হৃদয়ে প্রেরণা, কর্মে উৎসাহ। আমরা তাই হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই তাঁদের উদ্দেশ্যে। মহা সমারোহে উদ্‌যাপন করি তাঁদের জন্মশতবার্ষিকী।

কিন্তু এমন একজন মহাপুরুষের কথা আমরা বিস্মৃত হ'তে চলেছি যিনি ছিলেন সর্বগুণাকর। আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সেই পুণ্যাত্মা তেজস্বী পুরুষসিংহ আচার্য কৃষ্ণকুমার মিত্রের নাম। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর সংস্পর্শ লাভের। দেখেছি তাঁর নীরব কর্মসাধনা। অগণিত মহৎ কাজ তিনি করেছেন নাম-যশের অপেক্ষা না করে। কি মহান্ হৃদয় নিয়ে যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর প্রতিটি কর্মধারায়।

১৮৫২ সালে ময়মনসিংহ জেলার বাঘিল নামে এক অখ্যাত পল্লীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অতি সাধারণ পরিবেশে উদ্ভূত হয়েও তিনি পেয়েছিলেন অসম সাহসিকতা ও বলিষ্ঠ সংস্কার-মুক্ত মন। পাঠ্যাবস্থায় ব্রাহ্ম ধর্মের উদারতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি ঐ ধর্মে দীক্ষিত হন। এ জন্য তিনি হিন্দু সমাজচ্যুত হয়ে আত্মীয়-স্বজনের বিরাগভাজন হন। এমন কি সর্বপ্রকার সাহায্যে বঞ্চিত হয়ে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হন। কিন্তু বজ্র-কঠোর কৃষ্ণকুমার আপন সঙ্কল্পে অটল রইলেন।

তিনি একক যাত্রা করলেন সংসার-পথে। সসম্মানে স্নাতকোত্তীর্ণ হ'লেন। প্রভূত অর্থোপার্জন-মানসে 'ল' কলেজে ভর্তি হ'লেন। কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে মিথ্যা ভাষণ ব্যতীত ওকালতিতে সাফল্য লাভ করা যায় না। সত্যের পূজারী কৃষ্ণকুমার তৎক্ষণাৎ সে পথ পরিত্যাগ করলেন। সে-যুগে গ্রাজুয়েটের সরকারী উচ্চপদ দুর্লভ ছিল না। কিন্তু বিদেশীর পদলেহন করে বিলাস-বৈভব ভোগ করা অপেক্ষা দারিদ্র্যবরণ শ্রেয় মনে করলেন। সামান্য বেতনে সিটি স্কুলে শিক্ষাব্রতীর কর্ম গ্রহণ করলেন।

আর্থিক অসাচ্ছল্য তিনি ভোগ করেছেন কিন্তু অর্থের লালসায় কখনও অসৎ পন্থা গ্রহণ করেন নি। অন্যায় যত সঙ্গোপনেই আসুক তাকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নি।

একটি ঘটনা স্মরণ করে আজও আমার মনে বিস্ময় জাগে। হয়ত এ ঘটনার আমিই একক সাক্ষী। প্রকাশ না করলে তাঁর জীবনেতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমি তখন মাত্র কৈশোর অতিক্রম করেছি। আমাকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। প্রায়ই যেতাম তাঁর বাসায় কলেজ স্কোয়ারে। একদিন গিয়ে দেখি ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট কোন এক রায়বাহাদুর তাঁর সঙ্গে আলোচনায় রত। আমি গৃহকোণে অদূরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। হয়ত আমার উপস্থিতির গুরুত্ব কেহ দেন নি। তাঁদের কথোপকথন শুনতে পেলাম। মাঘোৎসবের সময় তখন আনন্দ মেলা বসত। রায়বাহাদুর তাঁকে অনুরোধ করলেন সেই মেলায় জুয়া খেলার অনুমতি দিতে। তিনি জানালেন যে, এজন্য ছয় হাজার টাকা সেলামী পাওয়া যাবে। এই টাকাটার অর্ধেক রায়বাহাদুর নিজে নেবেন এবং বাকী অর্ধেক তাঁকে দেবেন। তিনি আরও বললেন যে এজন্য কোন বেগ পেতে হবে না বা অন্য কেহ জানতেও পারবে না। শুধু তাঁর অনুমতি পেলেই টাকাটা অনায়াসে আদায় করা যায়। কিন্তু এই অযাচিত অর্থ তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, "অন্যায় কাজের প্রশ্রয় আমরা দিতে পারি না। তা যেমনই হোক।" অন্তরে বাহিরে এমন করে অন্যায় বর্জন ক'জনে করতে পারে? যেখানে অর্থলোভে লোক বিবেকশূন্য হয়, নানা প্রকার ছল চাতুর্যের আশ্রয় গ্রহণ করে সেখানে নীতিরক্ষার জন্য এরূপ লোভ জয় করা যে কত কঠিন তা সহজেই অনুমেয়। এমনি আরও অনেক ঘটনা আছে যা তাঁর সুমহান্ চরিত্রেরই উপযোগী।

তাঁর ব্যক্তিত্বের মহিমায় তিনি ছিলেন দেশবরেণ্য। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে পাওয়া যায় তাঁর দেশপ্রেমের

একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে বিভক্ত করে। এই বঙ্গভঙ্গ রদ করতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দেশব্যাপী এক বিরাট্‌ আন্দোলন সুরু হয়। ১৯০৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতারা বরিশালে মিলিত হন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সভাসমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিও নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু আয়োজন অসমাপ্ত রাখা হ'ল না। সভার কাজ আরম্ভ হ'ল। এমন সময় একদল মিলিটারী উপস্থিত হ'ল সভা পণ্ড করতে। গুলী চলল। অনন্যোপায় হয়ে নেতারা সভাভঙ্গ করে চলে যাওয়াই স্থির করলেন। একে একে সকলে সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করতে লাগলেন। কিন্তু নির্ভীক কৃষ্ণকুমার একাকী বেদীতে দাঁড়িয়ে সিংহ গর্জনে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে দিক প্রকম্পিত করতে লাগলেন। তাঁর পণ, গুলীবিদ্ধ হয়ে প্রাণ-বিসর্জন করবেন তথাপি এ অন্যায় আদেশ প্রতিপালন করবেন না। উন্নত শির, অকুতোভয়, অটল, অকম্পিত। সে এক মৃত্যুভয়লেশহীন তেজোময় হিমাচল মূর্তি। ক্ষণেকের তরে সৈনিকের হস্তও স্তব্ধ হয়ে রইল। কিন্তু সে নিমেষ মাত্র। মুহূর্ত পরেই বুঝি সব শেষ হয়ে যাবে। একটি মহামূল্য প্রাণের স্পন্দন চিরতরে লুপ্ত হবে। সুরেন্দ্রনাথ আর স্থির থাকতে পারলেন না। ছুটে গিয়ে ভলাণ্টিয়ারদের সাহায্যে জোর করে তাঁকে টেনে নিয়ে এলেন। সেই দৃপ্তমূর্তি কল্পনা করলে আজও প্রাণে উন্মাদনা জাগে।

সাধারণ একটি কুলীর দুঃখেও তিনি প্রাণে ব্যথা অনুভব করতেন। তখন চা-বাগানে শ্বেতাঙ্গ মালিকেরা কুলীদের উপর ভীষণ অত্যাচার করত। তিনি 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় তাদের এই নির্লজ্জ বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালিয়ে তা বন্ধ করেন।

সমাজের দুর্নীতি এবং পঙ্কিলতা দূর করতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। সমাজে একটি সৎ আবহাওয়া প্রবাহিত হোক্‌ এই ছিল তাঁর কাম্য। চরিত্রবান্‌কে তিনি অশেষ শ্রদ্ধা ও সমাদর করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সর্বপ্রকার উন্নতির মূলে রয়েছে চারিত্রিক শুচিতার প্রভাব। শেষ জীবনে তিনি ধর্ম-প্রচারের জন্য দেশ পরিক্রমার উদ্যোগ করেছিলেন। কিন্তু বার্ধক্য পীড়িত হয়ে সে কাজ আর সম্পন্ন করতে পারেন নি।

নিপীড়িতা নারীদের রক্ষার জন্য তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করতেন। এজন্য তিনি নারী রক্ষা সমিতি স্থাপন করেছিলেন। বহু অসহায়া নারীকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। একবার বিপন্না দু'জন মহিলাকে উদ্ধার করতে গিয়ে তিনি মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন। কলেজ স্কোয়ারের সম্মুখে গুণ্ডার হাত থেকে পরিত্রাণের আশায় দু'জন মহিলা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। দুর্ধর্ষ গুণ্ডাদের বাধা দেবার মত সেখানে তখন কেহ ছিল না। ভীতার্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে তিনি সেখানে ছুটে গেলেন। অসম সাহসী কৃষ্ণকুমার গুণ্ডাদের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে উহাদের কবলমুক্ত করে মহিলা দু'টিকে নিজের বাসায় আনতে সক্ষম হন। এ সময় গুণ্ডাদের আক্রমণে তাঁর পাঁজরে ভীষণ আঘাত লাগে এবং তিনি দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকেন।

১৯৩৭ সালে ৮৫ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

তিনি ছিলেন ঋষিতুল্য, সত্যের পূজারী। সমাজসংস্কারক ও দেশপ্রেমিক। সেই সুদীর্ঘ বপু, আজানুলম্বিত বাহু, প্রশস্ত বক্ষ, সমুন্নত শির, শ্বেতশ্মশ্রুশোভিত সৌম্যমূর্তি এখনও যেন নয়নে ভাসছে। তাঁর স্মরণে আজও কর্মে আনে উৎসাহ, মনে জাগায় সাহস ও দেহে সঞ্চার করে নবশক্তি। তাঁকে যেন আমরা বিস্মৃত না হই। বন্দে মাতরম্‌।

উপচ্ছায়া

শ্রীপঙ্কজভূষণ সেন

"তার পর—?"

"তারপর রাবণ রাক্ষস ভিখিরীর বেশ ধরে এসে দণ্ডকারণ্য থেকে সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেল লঙ্কাপুরী—রাম জানতেও পারল না—" একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস পরম নৈপুণ্যের সঙ্গে আত্মসাৎ করে ফেলল বুলা দেবী।

"আচ্ছা মা, রাম একটুও জানতে পারল না?"

"না শুমি, রাম একটুকুও জানতে পারল না—যারা সত্যিকার রাম তারা অন্তর্যামী হয়েও কোন দিনও এসব জানতে পারে না, সেদিন অভাগিনী সীতার বেলায়ও রাম জানতে পারে নি—" বুলা ভারি গলায় উত্তর দিল।

"জানতে পারলে কি হ'ত—?"

"জানলে—খুব সম্ভব গোটা রামায়ণ পর্ব ঐ দণ্ডকারণ্যেই শেষ হয়ে যেত।"

"রাবণকে মেরে ফেলত?"

"নিশ্চয়।"

"বেশ হ'ত! সীতাকে তা হ'লে আর বনবাসে যেতে হ'ত না।"

"সীতার বনবাস তবুও আর হ'ত কি না বলা মুস্কিল—ওটা মহাকবি বাল্মীকিই বলতে পারেন, তিনি ভুল করেছিলেন কি না! সে যাই হোক, তুই ঘুমোবি, না সারা-রাত্রি বকবক করবি?"

"দাঁড়াও না, ঘুমোচ্ছি! রাবণ রাক্ষস সীতাকে লঙ্কাপুরী নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলল না কেন মা?"

কেন যে খেয়ে ফেলল না—রাবণ রাক্ষসই জানে শুমি! খেয়ে ফেললেই বরং ভাল হোত—! কিন্তু যা ভাল রাক্ষসরা তা কখনই করে না। সে যুগেও যা এ যুগেও তাই।"

"যুগ কি মা?"

"যুগ মানে অভিধানে কত কি লেখা আছে—সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি। বড় হয়ে এসব ভাল করে জানতে পারবি। জানিস শুমি, ছেলেবেলায় আমার বাবা প্রত্যহ রামায়ণখানা পড়াতেন কিন্তু হ'ল না কিছুই—" এক মুহূর্তের জন্য বুলার মুখের ওপর নেমে এল কালো ছায়া কিন্তু পরক্ষণেই যা কে তাই—"হ'ল নাই বা কেন—ম্যাট্রিক পাশ করলাম, কলেজে ভর্তি করে দিলেন বাবা, স্কটিশচার্চে—স্বাধীন-ভাবে ট্রাম-বাসে একাই যাতায়াত করবার যুগ মেয়েদের তখন এসে গিয়েছে। বাবা কিন্তু একাল-সেকাল দুটোই মানতেন বলেই হয়ত অফিস যাবার সময় কলেজে নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে আর ফিরবার সময় আমি কিন্তু ফিরতাম একাই! শুমি—ঘুমোলি?"

"না, বল না—তারপর—"

আশ্বিনের শেষ, সুতীর চাদরখানা শুমির গায়ে ভাল করে ঢেকে দিল বুলা মজুমদার। শুমিকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘণ্টা খানেক গল্প করতেই হয়।

"কই, বল না—" গল্পের জন্য তাগিদ করল শুমি।

হ্যাঁ—কি বলছিলাম যেন?"

"কলেজে যখন পড়তে—তোমার বাবা নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে—"

"কলেজের গল্প আর একদিন না হয় বলব, রাক্ষসের গল্পটাই বলি। বুঝলি শুমি—রাক্ষস পুরাকালে ত ছিলই, একালেও আছে?"

"আছে? একদিন দেখিও না মা।"

"দেখাব। কিন্তু তুই চিনতে পারবি ত? মানুষের মতই ওদের হাত-পা চোখ-মুখ! মানুষের মতই অবিকল এক—কিন্তু তবু ওরা রাক্ষস! মানুষের মধ্যেই ওরা ঘোরে-ফেরে কিন্তু শুমি, ওরা মোটেই মানুষ নয়—চিনে ওঠা কঠিন!"

"তুমি চিনতে পার?"

"পারি! কিন্তু যত দুঃখ ঐ চেনার পরে—আগে নয়! সীতারও তাই—লক্ষ্মণের গণ্ডি পেরিয়েই সীতা চিনল রাবণকে। যতদিন গণ্ডির মধ্যে ততদিন ওদের চিনবার যো নেই—গণ্ডি পেরুলেই ব্যস, রাক্ষস!"

"তা সীতা গণ্ডিটা পার হ'তে গেল কেন? লক্ষ্মণ ত নিষেধই করেছিল পই পই করে। আচ্ছা মা, তুমি হ'লে গণ্ডিটা পেরুতে?" শুমি মাকে প্রশ্ন করল পরম আগ্রহে।

"আমি—? আমার কথা ছেড়ে দে! আমি ত সীতা নই শুমি! আমি কৃষ্ণপ্রিয়া—"

"কি বললে মা? কৃষ্ণপ্রিয়া তোমার নাম?"

"আমার বাবার দেওয়া নাম—কিন্তু ও-নামটা রাক্ষসে খেয়ে ফেলল একদিন।"

খিল খিল করে হেসে ফেলল শুমি—"নাম আবার রাক্ষসে খায় নাকি"?

"সে-যুগের রাক্ষসে খেলে রক্ত-মাংসটাই খেত, এযুগে ওরা আগে খায় নাম—যাক্ এইবার ঘুমো দেখি।"

"খালি ঘুমো—ঘুমো দেখি! আমি যদি না ঘুমোই—?"

"বেশ—বেশ, ঘুমিও না! আমার আর কি—কাল সকালে তোমার দিদিমণি পড়াতে এসে দেখবেন, শুমি নাক ডাকাচ্ছে পড়ে পড়ে—"

"তুমি কি মা? কাল রবিবার না?"

ঠিক। বুলা চুপ করে গেল। বুলার শুমি খুব বুদ্ধিমতী—হবে নাই বা কেন! মহাপণ্ডিতের—

এক ঝলক রক্ত উঠে এল বুলার গালে কপালে। পণ্ডিত? দেবাশীষবাবু হয়ত তাই—দেশজোড়া নাম! গণিত শাস্ত্রে কি একটা নতুন আলোকপাত করেছেন, শুধু আলোকপাত করেন নি নিজের পরমাসুন্দরী গৃহিণীর দিকে। জীবনের সূর্যালোকের দিকে গাছপালাও নিজেকে সাজিয়ে ধরে। একটু প্রতিবাদ, একটু নিষেধও তিনি করতে পারতেন। গণ্ডিছাড়া সীতাকে উদ্ধার না করেই দিয়েছিলেন বনবাস—এযুগের রাম উদ্ধার-পর্বে আর এগুলেন না—

খিল খিল করে হেসে উঠল শুমি।

"হাসছিস যে?" বুলার মনের চিন্তাটা ধরে ফেলল নাকি শুমি?

"হাসছি—তুমি খালি বলব বলবই করছ কিন্তু কিছুই ত বলছ না—কলেজে পড়তে, তারপর?"

"তারপর পরীক্ষা এসে গেল—কি ভীষণ পরীক্ষা! এ পরীক্ষা যে মেয়ে দেয় সেই জানে, এ পরীক্ষার নাম—"

"সীতার অগ্নি পরীক্ষা—"

"ঠিক বলেছিস—সীতার অগ্নি পরীক্ষাই বটে! শুমি, তুই যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতিস—"

"তা হলে কি হ'ত?"

"কত মেডেল, কত সার্টিফিকেট পেতিস তোর বুদ্ধির জন্য, হয়ত এক নতুন আলোকপাত করতিস গণিত—" বুলা মজুমদার চুপ করে গেল সহসাই!

"মেয়েরা বুঝি পারে না?"

"হয়ত পারে। কিন্তু ঐ যে বললাম রাক্ষসের দৌরাত্ম্যিতে ওদের জীবন কখন যে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যায়—কখন যে ভুল করে পার হয় লক্ষ্মণের নিষেধ গণ্ডি! দেখলি না, সীতার কি হ'ল। লক্ষ্মণ সেদিন যে গণ্ডির দাগ দিয়েছিল—সে দাগ শুধু যে একা সীতার জন্যই দিয়েছিলেন তা নয়—সেই নিষেধের গণ্ডি এখনও সীতাদের জন্য আছে। যারা সে দাগ পার হয় রাবণ রাক্ষস কিন্তু আজও তেমনি ওঁৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে নিরীহ ভিখিরীর বেশ ধরে!"

"রাক্ষসরা ছেলেদের ধরে না কেন মা?"

"ওদের হাড় খুব কঠিন। তা ছাড়া লক্ষ্মণ ত ছেলেদের জন্য কোন নিষেধের গণ্ডি দেয় নি। অবশ্য রাক্ষসী যে নেই তা নয়—ছেলেধরা রাক্ষসীও আছে। ভাল ছেলে পেলেই ওরাও ঘাড় মটকায় কিন্তু বুঝলি শুমি, ছেলেদের নিরাপদের জন্যও গণ্ডি একটা আছে—সে-গণ্ডি লক্ষ্মণের দেওয়া রামায়ণের গণ্ডি নাই বা হ'ল, সে গণ্ডি বাপমায়ের বুকে-আঁকা আশঙ্কার গণ্ডি—"

শুমি হাই তুলে বলল—"তোমার গল্প মোটেই ভাল নয়, কি যে বকে চলেছ, তুমিই জান—"

"না শুমি, আমি বাজে কথা একটুকুও বলি নি—আচ্ছা শুমি, রামচন্দ্র যদি চিঠি লিখে সীতাকে জানাত যে, লবকুশকে নিয়ে যেতে চায় রাজপ্রাসাদে, কারণ রাজার ছেলে রাজপ্রাসাদেই বাপের কাছে থাকবে, মানুষ হবে শিক্ষায়, দীক্ষায়। তা ছাড়া ছেলে-মেয়ে ত বাপের, মায়ের কেউই নয়! তা হ'লে লবকুশ কি মাকে ছেড়ে যেতে চাইত? না সীতা ছেড়ে দিত? আজ যদি কেউ লিখে পাঠায়, শুমিকে দিয়ে দিতে তার কাছে পাঠিয়ে,তা হ'লে তুই যাবি?

শুমি মুখে কিছু বলল না, শক্ত করে জড়িয়ে ধরল মায়ের গলাটা। ঝর ঝর করে ক'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল বুলার গাল বেয়ে—

"মা, তুমি কাঁদছ?"

"না। আমি একদিকে বুলা মজুমদার, অন্যদিকে শুমির মা! যত দুঃখই হোক বুলা কোনদিন চোখের জল ফেলে নি, যে চোখের জল ফেলে সে শুমির মা!

কিন্তু সে যাই হোক একদিন না একদিন শুমিকে দিয়ে দিতে হবে ওর বাপের কাছে—না দিলে আইন আছে। দিন তিনেক আগে দেবাশীষবাবু উকীলের নোটিস দিয়েছেন। আজ মনে হচ্ছে, সেদিন যার মেয়ে সেই দেবাশীষবাবুকে দিয়ে এলেই ভাল হ'ত। শাড়ি গয়না ঘর-দো'র সেদিন সবই যখন ছেড়ে এসেছিল তখন পরের দেওয়া মায়ার পুতুলটা আর সঙ্গে করে না নিয়ে এলেই ভাল করত বুলা মজুমদার—

"শুমি, ঘুমোলি—?"

আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না, পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে শুমি। এখানে যতদিন আছে ঘুমোক এমনি করে। তারপর—?

বুলা বিছানা থেকে নেমে পাশের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল বড় টেবিল আয়নাটার সমানে। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

দেখল—চোখ মুখ বুক কাঁধ কোমর। একটু যেন ভারিক্কী দেখাচ্ছে নিজেকে। শুমির বয়স এখন সাত, বুলার ছাব্বিশ —আর কি! টুলে বসে একটু চিরুণী বুলিয়ে নিল চুলে। ক'টা বাজল? রাত্রি ন'টা দশ।

"দিদিমণি খাবার দিয়েচি—" পরিচারিকা দরজার ওদিক থেকে জানিয়ে দিল।

"এর মধ্যে?"

"ন'টা ত বাজল—"

"এক কাজ কর সাবি, তুই খেয়ে নে, আমি আজ আর খাব না, মোটেই খিদে নেই।"

"কাল রাত্রিতে খেলেন না, আজও খাবেন না—রেঁধে-বেড়ে সবই ফেলা যাচ্ছে রোজ রোজ।"

"ভয় নেই সাবি। আমি খাই বা না খাই তুই মাইনে পেয়ে যাবি ঠিকই।"

আর এক মিনিট দাঁড়াল না সাবি। রান্নাঘরে তালাটা বন্ধ করেই চাবিটা দেবার জন্য আবার এসে দাঁড়াল বুলার প্রসাধন-ঘরের সামনে—"এই নিন চাবিটা।"

"তুই খেলি না?"

"না।"

"চ—চ, আমি খাচ্ছি।"

"থাক, জোর করে আপনার খেয়ে কাজ নাই।"

খিল খিল করে হেসে উঠল বুলা—ঐ আর এক অশান্তি! দুনিয়ার সবাই যেন একসঙ্গে জট পাকিয়ে রাগ করতে সুরু করেছে বুলার ওপরে—এমন কি সাবিটা পর্যন্ত!

দু'জনেই চলে গেল রান্নাঘরে, খাওয়ার চেয়ে গল্প হ'ল বেশী।

সাবির বয়স যে কত সাবিই জানে—শরীরটা যে চামড়ার পাকান দড়ি। দুঃখ-মেহনতের অদৃশ্য মোচড়ানিতে শরীরটা এমন এক অবস্থায় এসেছে যে, ওর যৌবন আছে কি নেই সে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার যে সাবিকে দেখে একমাত্র তারই।

"তোর স্বামী কি জন্ম থেকেই অন্ধ?"

"না, দিদিমণি। বিয়ের দু'বছর পরে অন্ধ হয়েছিল —কালীপুজোর দিন রাত্রিতে, তুবড়িতে আগুন দিতে-না-দিতেই তুবড়িটা ফেটে যায়। বারুদের আঁচে চোখ দুটো ঝলসে গিয়েছিল। বাঁচবারই কথা ছিল না, বেঁচে গিয়েছিল শুধু আমার কপাল থেকে আর সেদিন আগুনটা ও ত তুবড়িতে দেয় নি, দিয়েছিল আমার কপালে!"

"তা ঠিক সাবি—ছেলেপুলে?"

"না দিদিমণি, ওসব বেড়িবন্ধন আমার নাইকো—"

"আচ্ছা সাবি—" বুলা ইতস্ততঃ করে থেমে গেল, ঔচিত্যবোধে বাধছে কিন্তু জিজ্ঞেস করেই ফেলল—"স্বামী তোকে বিশ্বাস করে? আমি তোকে ভালবাসি বলেই জিজ্ঞেস করলাম—"

"বিশ্বাস করা-না-করা ওদের চোখের ধর্মের চাইতে মনের ধর্মই বেশী দিদিমণি। মন যার অবিশ্বাসী, তার চোখ থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি!"

"ঠিক! তুই ত বেশ কথা বলতে জানিস লেখা-পড়া-জানা মেয়েদের মত—ধর, আজ রাত্রিতে বাড়ী না গিয়ে যদি আমার কাছে থাকিস তা হ'লে কি স্বামী রাগ করবে?"

"রাগ হয়ত করবে না কিন্তু ভাববে খুব। আপনি কি আজ এখানে থাকতে বলছেন আমাকে?"

"না—এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।"

"থাকতে হয়ত বলুন—খবরটা দিয়েই ফিরে আসব আধ ঘণ্টার মধ্যে।"

"তাই আয় সাবি—"

সাবি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এল বুলার কাছে—ওর শোবার ব্যবস্থা বুলা নিজের ঘরেই করে দিল। সাবিত্রীর একটা কথাতেই বুলার কাছে ওর মূল্য অনেক বেড়ে গিয়েছে —স্বামীর বিশ্বাস, অবিশ্বাস? সেটা ওদের চোখের ধর্মের চাইতে মনের ধর্মই বেশী! খুবই খাঁটি কথা! চোখ থাকতেই কতজন অন্ধ, আবার যে অন্ধ সে স্ত্রীর সবটায় যেন দেখতে পায় চক্ষুষ্মানের মতই। সোজা কথায়, এমন অনেক জিনিষ আছে যেটা মন দিয়েই দেখতে হয়, চোখ দিয়ে নয়! এ তথ্য যে স্ত্রীলোক আবিষ্কার করতে পারে তাকে আর ছোট করে দেখা যায় না, তা সে যতই ছোট হোক।

"সাবি, তোর ঘুমের খুব অসুবিধে হ'ল আজ," বুলা কুণ্ঠিত ভাবেই বলল।

অসুবিধে? কি যে বলছেন—দিদিমণি! আমাদের শোবার ঘর যদি দেখেন—এইটুকু ছোট্ট!

"ঘর যত বড় হয় ঘুমও তত বেশী হয়—এই বুঝি তোর ধারণা? কিন্তু মোটেই তা নয় সাবি! তাই যদি হ'ত তা হ'লে বিপ্রদাস ষ্ট্রীটের অতবড় হল ঘড়ে শুয়েও কতদিন যে চোখের পাতা বুজি নি—"

সাবি আজ তিন-চার বছর হ'ল বুলার কাছে চাকরি করছে—বুলার ইতিহাস সবটা না হোক কিছুটা অবশ্য পরোক্ষভাবে শুনেছে এবং বিপ্রদাস ষ্ট্রীটে যে ওর শ্বশুরবাড়ী তাও সাবিত্রী জানে—

"দিদিমণি আপনি অন্যায় করেছেন বলতে ত পারি না কিন্তু ভুল করেছেন—"

"কেন? ভুলটা কি করলাম?"

"মনের চাইতে বেশী বিশ্বাস করেছেন নিজের চোখ

দুটোকে—চোখে যা ভাল লেগেছে তাই ভেবেছেন মনের ভাল লাগা। আপনি ত জানেন, চোখ বন্ধ করলেও দেখা যায়, আপনি সেই দেখা দেখুন চোখ বুজে—একদিকে দেবাশীষবাবু, অন্যদিকে শ্রীধরবাবু। মনকে ছেড়ে দিন খুঁজে নিতে, মন বলে দিক না তার দাবি কোন্‌টায় ?”

অবাক্ হ'ল বুলা মজুমদার সাবির কথা শুনে—কথাগুলো যুক্তি-তর্কের আগুনে ফেলে দিলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, না ইস্পাতের ডলার মত রাঙা হয়ে উঠবে বুলা জানে না কিন্তু সে যাই হোক, ওর প্রত্যয়ের যে একটা গভীর নিষ্ঠা আছে, একথা বুলাকে মনে মনে স্বীকার করতেই হ'ল।

"আচ্ছা দিদিমনি—বিয়ে ভাঙ্গার মামলাটা দুতিন বছর হ'ল চলছে, ধরুন বিয়েটা যদি ভেঙ্গেই যায়, কষ্ট হবে না আপনার ?"

বুলা হাসল। "কষ্ট ? কষ্ট কেন হবে ? মাটির একটা কলসিতে রাখা জলটা যদি অন্য কলসিতে রাখা হয় জলটার কি অসুবিধে হবে অন্য কলসিতে খাপ খাইয়ে থাকতে ?"

"তা হবে না। কিন্তু মেয়েদের মন জল নয়, মেয়েদের মন গলা মোম—মেয়েদের যে পাত্রে ঢেলে দেয় সেখানেই জমে কাঠ, আজাড় করে দিলেও আর বেরুবে না দিদিমনি—"

"না তোকে আর পেরে উঠব না সাবি ! এইবার ঘুমো রাত্রি হ'ল অনেকটা।"

পাঁচ দশ পনের মিনিটেই সাবি ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম নেই বুলার—মাথার বালিসটা গরম হয়ে উঠছে বারে বারে, উল্টে নিল বার কয়েক ! নানা চিন্তার অদৃশ্য ঘর্ষণে মাথার খুলিটাও গরম হয়ে উঠেছে।

বিপ্রদাস ষ্ট্রীটের প্রকাণ্ড নতুন বাড়ী—দেবাশীষ বাবু আর শ্রীধরবাবু—

বিয়ের মাস ছয়েক পরে একদিন তার স্বামী তার এক বন্ধুকে সাদরে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিল—"এই আমার কলেজ-জীবনের বন্ধু শ্রীধর সর্বাধিকারী—অঙ্কে ওর চেয়ে বেশী নম্বর পেতে আমাকে রীতিমত বেগ পেতে হ'ত ! ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরি ইচ্ছে করেই নেয় নি—এখন মস্ত কণ্ট্রাক্টার—বিয়ে-টিয়ে করে নাই, কি যে ওর মতলব ঐ জানে। রাজ্যের লোকের বাড়ী তৈরী করে বেড়াচ্ছে, শুধু বাড়ী করল না নিজের জন্য। এই যে বাড়ী দেখছ, এটা ওরই প্লান, ওরই তদারকে তৈরি, আমি মাঝে মাঝে একখানা করে চেক কেটে দিয়েই খালাস হয়েছি।"

'নমস্কার—আপনার কথা এই বাড়ীতে আসা-অব্দি শুনছি ও'র কাছে, কি ভাগ্যি ! আজ সাক্ষাৎ পরিচয় হ'ল আপনার সঙ্গে—'

শ্রীধরবাবু বুলার কোন কথা শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হ'ল না—বিমুগ্ধ মানুষ যখন বিশেষ এক দৃষ্টি দিয়ে অন্য কাউকে দেখে তখন কান দুটো যেন হিংসা করেই অসহযোগিতা করে—বুলার কোন কথাই শুনতে পেল না শ্রীধরবাবু—

. বাহ্যিক পরিস্থিতিটা অবশ্য একটু অবাঞ্ছিত কিন্তু বুলার মনটা খুসিতে ভরে উঠল। যে পুরুষ নারীর রূপে মুগ্ধ হয়েও মুগ্ধ না হওয়ার ভান করে কিংবা ঔদাসীন্য দেখায় তাদের জন্য ছাপার অক্ষরে যতই প্রশংসা-প্রশস্তি লেখা থাক না কেন, কোন রূপসীর কাছে সেটা মোটেই ভাল লাগে না।

'জান বুলা, বাড়ীখানা করতে আমার সাঁইত্রিশ হাজার মত খরচ হয়েছিল। একদিন শ্রীধর বলছিল—দে না বাড়ীখানা, বাহান্ন হাজারে নিতে রাজি আছি—তাই না শ্রীধর ?'

"মাপ কর ভাই—এখন বিনা পয়সাতেও আর নেব না। অপরের বাড়ী তৈরি করে দেওয়াই আমার ব্যবসা—সুখের নীড় ভেঙে দেওয়া নয় !" হো হো করে হেসে উঠলেন শ্রীধরবাবু, তার পর বললেন—'কই ভাই, বললে না ত মিসেস মজুমদারের নাম কি।"

"নাম ? ওটা তোমাদের পুরাণো স্থাপত্য ভেঙেচুরে নতুন করে গড়ার মতই রেখেছি—"বুলা"

"বুলা—বুলা ! চমৎকার ! কিন্তু তোমার মধ্যে এত কাব্য ছিল কই জানতাম না ত !"

"চমৎকার না ছাই ! ওর চেয়ে আমার আগের নামটাই ছিল ভাল—" বুলা উত্তর দিল হেসে।

"কি নাম ছিল আগে—?"

"যাক আর শুনতে হবে না ?"

"তা হ'লে বোঝ কি রকম নাম ছিল আগে—"

ঘণ্টা দুয়েক বেশ কেটে গেল হাসি গল্পে তার পর রাত্রির আহার সেরে বিদায় নিলেন শ্রীধরবাবু।

কিন্তু শ্রীধরবাবু বিদায় নিলেও শ্রীধরবাবুর অনেক কিছুই যেন থেকে গেল বুলার কাছে। এমনি হয়ত হয়, ধুনচি সরিয়ে নিলেও ধূপের গন্ধ এমনি করেই ঘরে থেকে যায় অনেকক্ষণ।

"মা জল খাব—" শুমি ঘুম ভেঙে জল চাইল।

শুমিকে জল খাইয়ে নিজেও খেয়ে নিল এক গেলাস। ঘুমের আর চিহ্ন নাই। ওদিকে কি গভীর ভাবে ঘুমোচ্ছে সাবি। পাশের ঘরে গিয়ে বুলা একবার দাঁড়াল। রাত

দুপুরে কাদের বাড়ীর কচি ছেলে কাঁদছে—মা-টা হয়ত ঘুম মারছে কুম্ভকর্ণের ঘুম।

বিছানায় গিয়ে আবার গড়িয়ে পড়ল।

শ্রীধরবাবু প্রায়ই আসতে লাগলেন বন্ধুর বাড়ী। প্রথম প্রথম আসতেন স্বামীর উপস্থিতকালে, তার পর সময়-অসময়েই—স্বামী বাড়ীতে থাকা-না-থাকার প্রশ্নটা আর মোটেই ছিল না। বন্ধু এসে যদি বন্ধু-পত্নীর সঙ্গে দু'দণ্ড গল্প করে যায় তার মধ্যে বেয়াদপির কি আছে? আপত্তিও করেন নি দেবাশীষবাবু।

গাছপালাও নিজেকে সাজিয়ে ধরে সূর্যের দিকে—বুলার কি দোষ?

চাঁদোয়া-ঘেরা উঠোনটা দু'একদিন ভাল হয়ত লাগতে পারে কিন্তু চিরদিন ভাল লাগে না। বুলার জীবন জুড়ে এতদিন যে বিরাট্ চাঁদোয়া খাটান ছিল শ্রীধরবাবুর আবির্ভাবে সেটা যেন সরে গেল—আলোয় রৌদ্রে ভরে উঠল বুলার জীবনপ্রাঙ্গণ।

দেবাশীষবাবু—খান দা'ন বেরিয়ে যান কলেজে—কি যে ভাবেন পার্কের একধারে বসে। ওদিকে বুলা ভাবে অখণ্ড অবসরের নির্জনতায়—দেবাশীষ—? শ্রীধর—?

বিয়ের তৃতীয় বছরে এল শুমি—নামটা বুলা নিজে রেখেছিল। শ্রীধরবাবুও একটা নাম প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু বুলাই নাকচ করে দিয়েছিল। যতই হোক বাইরের লোকের দেওয়া নাম আর বাইরের লোকের দেওয়া পোষাক—একই কথা, দাবির চাইতে দাতাকেই বড় দেখায়।

একটা এরোপ্লেন সগর্জনে এত নিচু দিয়ে উড়ে গেল বুলার বাড়ীর ওপর দিয়ে যে, বাড়ীটা যেন থর থর করে কেঁপে উঠল—

—"শিগ্‌গির বুলা—। আর দেরি করলে চলবে না—" শ্রীধরবাবু তাড়া দিয়ে বললেন, হাতে একটা স্যুটকেস, গায়ে একটা মোটা ওভার কোট, মাথায় পশ্চিমা টুপি—

"শিগ্‌গির! সে কি—?" বুলা অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করল।

"আঃ, এখনও প্রস্তুত হ'তে পার নি? অথচ তখন বললে যে, আর পারি না! প্রস্তুত হয়ে থাকব! প্রস্তুতেরই বা কি আছে? তুমি যা পর তাতেই তুমি সুন্দর—তাতেই তুমি অপূর্ব! চল—চল—" বিশেষ তাড়া দিল শ্রীধর, বাইরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে।

"কোথায়—?"

"বাঃ, তুমিই ত বলেছিলে—যেখানে খুসি!"

"কিন্তু তুমিও ত বলেছিলে—পরের বাড়ী তৈরি করাই তোমার ব্যবসা, কারও সুখের নীড় ভেঙ্গে দেওয়া তোমার কাজ নয়—"

"সত্যি কি তোমার সুখের নীড় বুলা?"

কে জানে! একটু দ্বিধা এল মনে কিন্তু তবু বুলা বেরিয়ে গেল শ্রীধরবাবুর পিছু পিছু—পড়ে থাকল লক্ষ্মণের নিষেধ গণ্ডি!

আর দু'মিনিট দেরি হ'লে প্লেনটা আর ধরা যেত না। একই সিটে পাশাপাশি বসল বুলা আর শ্রীধরবাবু। বুলা জানলার দিকে, শ্রীধরবাবু ভিতর দিকে।

"আচ্ছা শ্রীধরবাবু, আকাশ থেকে আমাদের বিপ্রদাস ষ্ট্রীটের বাড়ীটা দেখা যাবে?" বুলা জিজ্ঞেস করল।

"আকাশে উড়লে ফেলে-আসা বাড়ী আর কেউ কি কোন দিন চিনতে পারে বুলা দেবী?"

কিন্তু আশ্চর্য! প্লেন থেকে স্পষ্টভাবে দেখা গেল বুলা মজুমদারের বাড়ীটা—লাল টুকটুকে রং! শুধু বাড়ী? দেবাশীষবাবু তোয়ালেতে জড়িয়ে শুমিকে নিয়ে আদর করছে ঝুল বারান্দায়—শুমিটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কি চেঁচাচ্ছে মায়ের জন্য। সবই দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে—

তাই ত! বুলা আঁতকে উঠল—তাড়াতাড়িতে শুমিকে বাড়ীতে ফেলেই চলে এসেছে শ্রীধরবাবুর সঙ্গে! বুকটা অব্যক্ত ব্যথায় মুচড়ে উঠল, বুলার কচি মেয়েটা পড়ে থাকল কলকাতায়—"না না, শ্রীধরবাবু, আমি যাব না—"

"বস! লোকে কি ভাববে!" শ্রীধরবাবু চাপা গলায় ধমক দিয়ে বুলার হাত ধরে আবার বসিয়ে দিল সিটে।

"তার মানে?"

"তার মানে খুবই সোজা—তোমাকে নিয়ে চলেছি দূরে, কলম্বো হয়ে কন্টিনেণ্টে—চলেছি পাশ্চাত্ত্য প্রগতির হাতছানিতে—

"কলম্বো? মানে লঙ্কায়?' বুলা কাঁদ কাঁদ হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ, লঙ্কায়! যে লঙ্কায় সীতাকে একদিন নিয়ে গিয়েছিল রাবণ আর কলিযুগে বুলাদেবীকে নিয়ে যাচ্ছে শ্রীধর সর্বাধিকারী। কিন্তু বুলা, একটু তফাৎও আছে—সে-যুগের রাম নিজের জীবন তুচ্ছ করে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব ছেড়ে দিয়ে সীতাকে উদ্ধার করতে গিয়েছিল লঙ্কায় কিন্তু এ যুগের রাম ওধার দিয়েও যাবে না—" হা হাঃ করে হেসে উঠলেন শ্রীধরবাবু। তারপর আবার আরম্ভ করলেন—অবিশ্যি আরও একটু তফাৎ আছে—সে-যুগের সীতাকে যেতে হয়েছিল নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিন্তু এখন যে যাচ্ছে, সে যাচ্ছে স্বেচ্ছায়! কি বুলাদেবী, আমি কি মিথ্যা বলছি?" ভ্রুকুটি করে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীধরবাবু।

গলা থেকে স্বর বেরুচ্ছে না বুলার—না শ্রীধরবাবুর কথা ত মিথ্যা নয়। এই রকম একটা কল্পনা যে মনের নিভৃতিতে ছিল, বুলা শ্রীধরবাবুর কাছে কোনদিন প্রকাশ না করলেও, শ্রীধরবাবু ত মানুষ—জানতে বাকী ছিল না ওঁর! কিন্তু সে যাই হোক—শুমিকে ছেড়ে বুলা অন্য কোথাও যাবে না—"শুমি—!" বুলা আকুলভাবে চেঁচিয়ে উঠল—প্লেনের জানলা থেকে।

সাবি ট্রেতে দু'কাপ চা নিয়ে হাজির দেবাশীষবাবুর কাছে ঝুল বারান্দায়—এক কাপ ওঁকে দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল বুলার খোঁজে—

"তোমার দিদিমণিকে খুঁজছো?—ঐ দেখ প্লেনে—" দেবাশীষবাবুর প্লেনের দিকে আঙুল বাড়ালেন।

"দিদিমণি চা—" সাবি গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে—

সত্যি সাবি বুলার জন্য চা এনে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে।

ধড়মড় করে উঠে বসল বুলা—ওঃ, বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। শুমি কই? বুলা ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে দেখল শুমির বিছানার দিকে—"সাবি, শুমি কই?"

সাবি একগাল হেসে বলল, "ওর বাবার সঙ্গে গল্প করছে আপনার ঐ পাশের ঘরে। হেই দিদিমণি, দাদাবাবু নিজের থেকে এসেছেন—ঝগড়া মিটিয়ে ফেলুন, আর কেন!"

একঝলক রক্ত উঠে বুলার কান কপাল রাঙা করে দিল।

বৈশাখ সংখ্যায়

গল্প লিখছেন

কুমারলাল দাশগুপ্ত

ইতিহাস কথা কয়

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

(২০)

বাংলা দেশের একটি চলতি প্রবাদের কথা মনে পড়ল। বড় সরস প্রবাদটি। স্ত্রীর পিতাকে নিয়ে রচনা। এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, সত্যি রঙ্গভরা।

কথায় বলেছে, 'ডালের মধ্যে মুসুর আর মানুষের মধ্যে শ্বশুর।' অর্থাৎ ডাল যদি খেতে চাও, তবে মুসুরের আগে কারও স্থান হবে না। আর মানুষজনের মধ্যে সবচেয়ে শাঁসালো শ্বশুরমশায় নামক ব্যক্তিটি। মুরুব্বীর জোর বলে কথাটা আজ হাটে-ঘাটে ছড়ান। শ্বশুর মুরুব্বী থাকলে আর ত কথাই ওঠে না। জয় অনিবার্য। পেলেও নয়, নিশ্চয়ই পাবেন বঞ্চিত রতন।

শাজাহানের কথা ভাবছিলাম। বিখ্যাত সম্রাট্ শাজাহান। মোগল স্থাপত্য যার সময়ে উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল, আগ্রার তাজমহল, দিল্লীর লালকেল্লা বহু যুগ ধরে সগৌরবে যার নামকে স্মরণ করে চলেছে।

সেই শাজাহানের হয়ত সম্রাট হওয়াই হয়ে উঠত না। যদি-না কৌশলের অভেদ্য জাল পাততেন শ্বশুর-মশায় আসফ খান। মমতাজের বাবা, এদিকে নুরমহলের ভাই। আসফ খান ততদিনে উজীরের পদ পেয়ে স্থায়ী হয়েছেন।

কিন্তু সে গল্পের আগে আরও একটা কাহিনী বলি। যে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর বাবর স্থাপন করেছিলেন বহু কষ্ট, বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করে, তারই ছোট্ট এক ঘটনা।......

রাজ্যস্থাপন করে আগ্রাকেই রাজধানী করেছিলেন বাবর। মাত্র কয়েক বৎসরের রাজত্বকাল। তারও অধিকাংশ সময়ই যুদ্ধ-বিগ্রহে ভরা। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে ভীষণ এক যুদ্ধের সম্মুখীন হ'লেন বাবর। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী রাজপুত বীর রাণা সঙ্গ। প্রথম দিকে রাণা ভেবেছিলেন, লুঠেরার দলের মত বাবরও লুঠপাট করেই ফিরে যাবেন। তাই ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় তিনি মনে মনে কামনা করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভুল ভেঙে গেল রাণার। ফলে বাবরের ওপর মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠলেন তিনি।

বিরক্তির পিছনে আসে ক্রোধ। ক্রোধের পিছু পিছু জিঘাংসা। লোদী পরিবারের এক রাজপুত্রের সঙ্গে সখ্যতায় আবদ্ধ হ'লেন রাণা সঙ্গ। তিনি মাহমুদ লোদী, প্রস্তুতি শেষ হলে রাণা সঙ্গ চললেন এগিয়ে। বাবরের সম্মুখীন হ'তে।

তখনও ফতেপুর সিক্রী গড়ে ওঠে নি। হয়ত বন-জঙ্গলে-ঢাকা ছোট্ট এক গ্রাম ছিল সিক্রী। বাবরের এক সৈন্যদল কাছাকাছিই কুচকাওয়াজ করত। সীমান্তের প্রহরীর কাজ করত তারা। প্রথম আক্রমণেই রাণা সঙ্গ তাঁদের হারিয়ে দিলেন। উল্লাসে অধীর হয়ে উঠল রাজপুত ও লোদী সৈন্যদল।

বাবর সামান্য ধাক্কা পেলেন মনে। তাঁর সৈন্যদলে ছড়াল চাপা নৈরাশ্য ও হতাশার বেদনা। তাতে ইন্ধন জোগালেন মহম্মদ শরীফ নামে কাবুল হ'তে আগত এক ভবিষ্যদ্বক্তা। তিনি বাবরের সামনে অকাতরে ঘোষণা করলেন যে, মোগলবাহিনীর পরাজয় অনিবার্য। মঙ্গল গ্রহ এখন পশ্চিমে। কাজেই বিপরীত দিক হ'তে যে-কেউ আসুক না, তার পক্ষে জয়লাভ করা প্রায় অসম্ভব।

কিন্তু বাবর কান দিলেন না সে-কথায়। মনে মনে দৃঢ় হয়ে রইলেন তিনি। সৈন্যদলে উৎসাহ সঞ্চারের জন্য তিনি অনেকগুলি কাজ করলেন পর পর। মদ্যপান বড় প্রিয় ছিল সম্রাটের। সেই মুহূর্তে মদ্যপান পরিত্যাগ করা তিনি ঘোষণা করলেন। পানপাত্র চূর্ণ করা হ'ল মাটিতে। কাবুল আর গজনী থেকে বহু কষ্টে বয়ে-আনা উত্তেজক পানীয়গুলি মৃত্তিকাকে সিঞ্চিত করে তুলল। দাড়ি রাখবেন বলে স্থির করলেন কারখানার এই সাহসী মানুষটি। সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতা করলেন বাদশাহ্। অপমানের কালিমা ললাটে পরার চেয়ে মরণও শ্রেয়।

সৈন্যবাহিনী নতুন শক্তি পেল। হারানো সাহস ফিরে এল মনে। তুমুল যুদ্ধের পর বাবরই হ'লেন জয়ী, অসামান্য বীরত্ব ও শক্তির পরিচয় দিয়ে সেই জ্যোতিষীকে নিয়ে আসা হ'ল সম্রাটের সামনে। মহম্মদ শরীফ তখন প্রায় আধমরা। তবু ম্লান হাসি দিয়ে সম্রাটকে তিনি

জানালেন অভিনন্দন। বাবর তাঁকে পরিত্যাগ করলেন সেই দিনই। কিছু মুদ্রা উপহার দিলেন শেষ জীবনের সম্বল হিসেবে। মহম্মদ শরীফ বিদায় নিলেন দুঃখ-ভারাক্রান্ত চিত্তে। মোগলবাহিনীর ভবিষ্যৎ উচ্চারণ করে নিজের ভবিষ্যতের পথে অন্ধকারের কালিমাকে লেপে দিলেন তিনি।

এত দুঃখে-কষ্টে যে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, অতি অল্পদিনেই তার কি দুঃখজনক পরিণতি। হিংসা বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা-প্রতিশোধ, শত্রুনাশ, যে কোন কৌশলে রাজ্য পাওয়া সবকিছুই এসে জুটল একসাথে। বয়সের শেষ দিকে আকবরও তা বুঝতে পেরেছিলেন। হয়ত এই সম্রাটের মনে এসেছিল বার্ধক্য ও জরা।

হস্তীর যুদ্ধ ছিল আকবরের বড় প্রিয়। অবসরে, আনন্দ দিনে সম্রাট খুশী হ'তেন হস্তীদ্বয়ের সমর দেখে। একদা জাহাঙ্গীরের (তখন সেলিম) প্রিয় হস্তী গিরণবরের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার আয়োজন হ'ল খসরুর হাতী আবরূপের। অসংখ্য দর্শক। মধ্যস্থলে সম্রাট আকবর নিজে। অল্পসময়ের মধ্যেই ভীষণ যুদ্ধ হ'ল সুরু। আবরূপ প্রাণপণে লড়ে চলল। কিন্তু গিরণবর যেন অজেয়। কোন দেবতার বরে সে যেন প্রতিপক্ষের শত আঘাতেও অজেয় অটল। খসরুর হস্তীকে পিছু হটতে হ'ল, কিন্তু গিরণবর মারমুখো। পিছু পিছু ধাওয়া ক'রে আবরূপকে সে নানাভাবে প্রহার করতে লাগল। হস্তী লড়াইয়ের নিয়মানুসারে একটি তৃতীয় হাতীকে রাখা হ'ত প্রস্তুত। একজন যদি হারে, প্রতিপক্ষের হাতে মার খায়, তখন তার সাহায্যার্থে পাঠান হয় সেই তৃতীয় হস্তীটিকে। যথাসময়ে পরাজিত আবরূপের সাহায্যার্থে পাঠান হ'ল অন্য হাতীটিকে। কিন্তু জাহাঙ্গীরের প্রিয় অনুচরেরা নতুন হাতীটিকে লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে চলল ঢিল আর ইটের টুকরো। তাদের আশঙ্কা হ'ল হয়ত নতুন হাতীটির সাহায্য পেয়ে আবরূপ গিরণবরকে পরাস্ত করবে। নিয়মের লঙ্ঘন বাদশাহ আকবরের মনে সঞ্চার করল ক্রোধ। তিনি সেলিমের কাছে পাঠালেন নাতি খুরমকে। হস্তী-যুদ্ধের নিয়ম-কানুন কেন মানছে না তার অনুচরেরা, সেলিম এ বিষয়ে কৈফিয়ৎ দিক।

জাহাঙ্গীর কৌশলে পাশ কাটালেন। তিনি বললেন যে, এ ব্যাপারে তার কোন হাত নেই। অনুচরেরা যা করেছে তাতে সেলিমের কোন আদেশ ছিল না। আকবর খুব একটা খুশী হ'লেন না উত্তর শুনে। তবু গুম্ হয়ে বসে রইলেন তিনি। সাধ্যমত চেষ্টা করলেন ক্রোধ দমন করতে।

কিন্তু খসরু পারল না নিজেকে সংবরণ করতে। বাপের ওপর সে হয়ে উঠল অগ্নিশর্মা। কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিল খসরু। জাহাঙ্গীর খুব একটা প্রতিবাদ করতে পারলেন না।

দৃশ্য দেখে আকবরের চোখে ঘনিয়ে এল ব্যথার ছায়া। এমন যে হবে কোনদিন কল্পনাও করেন নি বাদশাহ। ছেলে বিশ্রী ভাষায় গালাগালি দেবে বাপকে। এ যদি অকল্পনীয় না হয় তবে কল্পনার বাইরে আর কি থাকবে? .....

মনের অশান্তি দেহেও ছড়িয়ে পড়ে। উৎসাহের অভাব বয়ে আনে অবসন্নতা। দিনে দিনে বাদশাহ হ'লেন অসুস্থ। পীড়িত আকবরের চোখের সামনে এগিয়ে আসতে লাগল শেষ বিচারের সেই ভয়ঙ্কর দিনটি। মোগল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত ভেবে বড় আশাহত হয়ে পড়েছিলেন এই সফলকাম পুরুষটি। বাদশাহ যেন বুঝতে পারছিলেন, আর বেশীদিন নয়। সূর্য এবার মাঝগগন অতিক্রম করেছে। তার ঢলে পড়তে দেরি নেই বেশী।

কিন্তু খসরুর ভাগ্য তার হাতী আবরূপের চেয়েও খারাপ ছিল। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন খসরু। পরাজিত হয়ে অন্ধত্ব বরণ করতে হয়েছিল তাঁকে। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় পুত্র পরভেজ (Parwej) পিতার সঙ্গে খসরুকে আবার দিয়েছিলেন মিলিত করে। বৃদ্ধ বয়সে জাহাঙ্গীরেরও মনে মায়া জন্মাল। শত হ'লেও আপন সন্তান। কুপুত্র যদ্যপি হয়, পিতা কি কখনও চিরকাল বিমুখ থাকতে পারেন?

কিন্তু খসরুর জন্মলগ্নে সুগ্রহের দৃষ্টি ছিল না। অল্প-দিনের মধ্যেই তার জীবনের শেষদিনগুলি কাছাকাছি এল। দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করার আগে খুরম এসে পিতার কাছে নিবেদন করলেন,—খসরুকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবে। পিতা যেন এতে আর অমত না করেন। অন্ধ সন্তান চোখের সামনে থাকলে পিতার মনে ব্যথা আরও বাড়ে। তাই খুরম (পরবর্তীকালে শাজাহান) পিতার দুঃখ লাঘব করার জন্য এই প্রস্তাব করেছেন।

খুরমের মনে প্রচ্ছন্ন দুরভিসন্ধি ছিল। জাহাঙ্গীর তা ধরতে পারলেন না। বৃদ্ধ বয়সে অশক্ত বাদশাহ অন্ধ খসরুকে পাঠালেন খুরমের সঙ্গে সুদূর দাক্ষিণাত্যে। মনে ভাবলেন কিছুদিন পরেই ঘুরে আসবে খসরু।

দাক্ষিণাত্যের জলহাওয়ায় ওর ভাঙ্গা মন চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

কিন্তু খসরুকে আর ফিরতে হ'ল না। ঋণের শেষ আর শত্রুর শেষ কখনও রাখতে নেই। খুরম মনে মনে সেটি বহুপূর্বে গ্রহণ করেছিলেন। খসরু দাদা হ'তে পারে, কিন্তু সিংহাসনের পথে দাদা আর ভাইরাই ত আসল বাধা। আর অন্ধত্ব কোন কথা নয়। এদেশে ত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বহুদিন রাজত্ব করে গেছেন। গোপনে খসরুকে শেষ করলেন খুরম। দিল্লীর মসনদের একটি দাবিদারের জীবনদীপ নির্বাপিত হ'ল।

জাহাঙ্গীর মারা গেলেন। শাজাহান তখন সুদূর দাক্ষিণাত্যে। শুধু তাঁর শ্বশুরমশায় আসফ খান দিল্লীতে রয়েছেন। বাদশাহের মৃত্যুর পর আসফ খান খসরুর জ্যেষ্ঠপুত্র দেওয়ার বক্সকে (ডাক নাম বোলাকী) সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। দিল্লীর ওমরাহ এবং অমাত্যের দল মনে মনে খসরুর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তা ছাড়া অমন নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর খসরুর প্রতি দুর্বলতা জন্মানো এই পৃথিবীতে খুবই স্বাভাবিক। সেই হিসাবে আসফ খান ঠিকই করেছিলেন। সরাসরি খুরমকে সাহায্য করলে ওমরাহ আর অমাত্যের দল ভীষণ চটে যাবে। তাই আসফ খানকে বাঁকা রাজনীতির পথ মেনে নিতে হ'ল।

বোলাকী সম্রাট হ'লেন। আসফ খান তার উজীর। ধীরে ধীরে দরবারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের নিজের দিকে টেনে নিতে চেষ্টা করলেন তিনি। কাউকে দেখালেন লোভ, কাউকে দিলেন স্তুতি। যে তোষামোদ ঘৃণা করেন, তাঁকে সেই গুণের কথা মধুনামের মত বার বার শুনিয়ে বশ করে ফেললেন। বেশ খানিকটা সফল হ'লেন আসফ খান। সামরিক বাহিনীর ওপরও অতি অল্পদিনে তাঁর প্রভাব জন্মাল। আসফ খানের গুটি সাজানো প্রায় শেষ। শুধু দান ফেলার অপেক্ষা।

ওদিকে লাহোরে শাহরিয়র নিজেকে সম্রাট ব'লে ঘোষণা করেছেন। বোলাকীকে নিয়ে আসফ খান তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে ছুটে চললেন। শাহরীয়র পরাজিত ও বন্দী হ'লেন দিল্লীর সৈন্যদলের হাতে। কঠিন শাস্তি দেওয়া হ'ল শাহরিয়রকে। যে দু'টি চোখ মেলে তিনি হ'তে চেয়েছিলেন এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, সেই চোখ দু'টি তার নষ্ট ক'রে দেওয়া হ'ল। সারা-জীবন অন্ধত্ব মেনে নিতে হ'ল দুর্ভাগা শাহরিয়রকে।

বোলাকীকে নিয়ে আগ্রায় এলেন আসফ খান। রাজধানীতে রাজকার্য পরিচালনা শুরু করলেন বোলাকী। আসফ খান সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। অকস্মাৎ একদিন তিনি ঘোষণা করলেন যে, খুরম গুরুতর-ভাবে পীড়িত এবং তার পরদিনই সম্রাটের কর্ণগোচর করলেন যে, তার জামাতা মারা গিয়েছেন। সংবাদ শুনে বোলাকী মনে মনে উল্লসিত হ'লেন। মসনদে কায়েম হয়ে বসবার পথের শেষ কাঁটাটি কেমন নির্বিঘ্নে সরে গেল। আসফ খান মনে মনে হাসলেন। কিন্তু করুণ মুখ করে বাদশাহের কাছে এক আর্জি পেশ করলেন তিনি। খুরমের মনে শেষ ইচ্ছা ছিল যে সেকেন্দ্রার এক কোণে তার শেষ শয্যা রচিত হবে। বাদশাহ্ তাতে সম্মতি দিন।

বোলাকী তথাস্তু করতে দ্বিধা করলেন না। আগ্রা থেকে সেকেন্দ্রার পথে শবযাত্রা হ'ল শুরু। মৌন শান্ত মিছিল ধীর পদে এগিয়ে চলল। আসফ খান বুদ্ধি ক'রে বোলাকীকে বললেন,—শবানুগমন করা বাদশাহের উচিত। মৃত ব্যক্তি তার খুল্লতাত। শিষ্টাচার অনুসারে বাদশাহেরও মিছিলে যোগ দেওয়া কর্তব্য।

কি ভেবে বোলাকীও রাজী হ'লেন। সাধারণের মত বাদশাহ্ চললেন শবানুগমন ক'রে। মস্ত এক কাঠের বাক্সে খুরম রয়েছেন শুয়ে। কায়দা ক'রে কফিনের মধ্যে একটা ফুটো তৈরী ছিল। তার সাহায্যে বাইরের বায়ু ভিতরে এসে ঢুকল।

পথিমধ্যে আসফ খান এক তাঁবু খাটিয়ে রেখেছিলেন। কফিনকে এখানে নামান হ'ল। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এবং সামরিক বাহিনীর প্রধানদের ডাকলেন আসফ খান। তাঁবুর মধ্যে তারা সবাই এসে দাঁড়াল।

তখন লগ্ন সমাগত। আসফ খানের আদেশে কফিনের ঢাকা খুলে দেওয়া হ'ল। উপস্থিত কর্মচারীরা এবং সামরিক প্রধানরা আগেই আসফ খানের কাছে আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। কফিনের মধ্য থেকে শাজাহান যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন সকলে তাঁকে জানাল কুর্নিশ। আসফ খান শাজাহানকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন।

বোলাকী পথে ছিলেন দাঁড়িয়ে। তাঁর অনুচরেরা তাঁকে করেছে পরিত্যাগ, সেনাপতির দল নিয়েছে আসফ খানের আনুগত্য। বেগতিক দেখে বোলাকী আর থাকতে সাহস পেলেন না। কোন আমিরই তাঁর সাহায্যে হাত বাড়াল না তেমন করে। কেউ তাঁকে দিল না আশ্বাস, কেউ তাঁর জন্য জানাল না এক ফোঁটা সহানুভূতি। পালিয়ে বাঁচলেন বোলাকী। আগ্রা থেকে সুদূর লাহোরে গেলেন চলে।

শাজাহান সম্রাট হয়ে ফিরে এলেন আগ্রায়। জয়ভেরী সগৌরবে নিনাদিত হ'ল। আমির ও ওমরাহের দল তাঁকে জানাল সম্ভ্রমপূর্ণ কুর্নিশ। সৈন্যবাহিনী সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে গ্রহণ করল নতুন সম্রাটকে। শাজাহান শাহাবুদ্দীন মহম্মদ নাম নিয়ে মসনদে আসীন হ'লেন।

কিন্তু মসনদে বসেও নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ সম্রাটের ভাগ্যে জোটে নি। দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুরু হ'ল। বিদ্রোহীকে দমন করতে গিয়ে এক নিদারুণ আঘাতে নিজেকেই ক্ষত-বিক্ষত ক'রে ফেললেন সম্রাট। একান্ত আদরের বেগম অর্জুমন্দ বানু চলে গেলেন তাঁকে ছেড়ে। দাক্ষিণাত্যের রণক্লান্ত সম্রাট আগ্রায় ফিরলেন বিরহীর শূন্য হৃদয় সম্বল ক'রে।

মোগল রাজকোষে তখন প্রচুর অর্থ, প্রচুর সম্পদ, প্রচুর জহরত, প্রাচুর্যের জোয়ার। হীরা মণি মাণিক্যের ছটায় মোগল রাজসিংহাসন আপনাতে আপনি উজ্জ্বল। বিদেশীরা কি চোখে মোগল বাদশাদের দেখেছে তার ছোট্ট একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

জাহাঙ্গীরের কাছে সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকে স্যর টমাস রো এসেছিলেন রাজা প্রথম জেমসের দূত হয়ে। সুরাটে নেমেছিলেন স্যর টমাস রো। তখন জাহাঙ্গীর থাকতেন আজমীরে। টমাস রো আজমীরে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ইংল্যাণ্ড থেকে আনীত সামান্য কিছু উপহার ছিল। উপহারের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র, ছুরি, সূচীকার্য করা শাল, তরবারি এবং একটি বিলিতী কোচ ছিল। বাদশাহের কাছে সসম্মানে এগুলি নামিয়ে রাখলেন স্যর টমাস। এক ইংরেজ বাদ্যকর বাদশাহকে বাজনা শোনাল। সম্রাট উপহার পেয়ে খুশী হ'লেন। কোচটি নূরমহলকে দিলেন জাহাঙ্গীর। তারপর টমাস রোকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন—ইংরেজরা কি তাঁর জন্য মূল্যবান মণিরত্ন উপহার এনেছে? দোভাষী স্যর টমাসকে তর্জমা ক'রে বোঝাল। বাদশাহের কথা টমাস সাহেব বুঝতে পেরে লজ্জার হাসি হাসলেন। কিন্তু স্থানবিশেষে ইংরেজও তেল ঢালে। কুর্নিশ জানিয়ে স্যর টমাস বললেন—সম্রাটের জন্য মণিরত্ন নিয়ে আসার স্পর্দ্ধা তাদের নেই। মণিরত্নের দেশ হ'ল ভারতবর্ষ, স্বয়ং জাহাঙ্গীর সে দেশের রাজা। তাঁকে মণিরত্ন তাঁরা কি করে দিতে পারেন?

সে উত্তরে জাহাঙ্গীর নিশ্চয়ই দ্রব হয়েছিলেন। কিন্তু সব কিছু বাদ দিয়েও টমাস রো সাহেবের উক্তি প্রতিপন্ন ক'রে মোগল বাদশাহদের রাজকোষে হীরে জহরত মণি মুক্তার কি ছড়াছড়িই না ছিল।

লালকেল্লা দেখতে বাকী ছিল। না হ'লে দিল্লী দেখা প্রায় শেষ ক'রে ফেলেছি। এই ক'দিনে কালী-বাড়ীতে ক' ঘণ্টা সময়ই বা থেকেছি। সকালে উঠেই মুখ-হাত ধুয়ে সামান্য কিছু প্রাতরাশ গলাধঃকরণ ক'রে হঠাৎ উধাও। ক'মিনিট বা লেগেছে? তড়-বড় ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নামলেই প্রশস্ত রাজপথ। সকালের ম্লান রোদ পীচের গায়ে পিছলে যাচ্ছে। কলকাতার মত ভিড় নেই, হৈ চৈ নেই লেগে। প্রথম ফাল্গুনের সতেজ সমীরণ বসন্তের ধ্বনি বয়ে আনছে তার মৃদুমর্মরে। আর পাঁজি-পুঁথি অনুসারে ত বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। কারণ, মাত্র দু'তিন দিন আগেই হোলি খেলা হয়েছে সাঙ্গ। এখনও পথে-ঘাটে আবীর আর অন্য রঙের ছোপ পাওয়া যায় খুঁজে। আর হোলীর দিনে সমস্ত মানুষজন যে রং মেখে হয়ে উঠেছিল উল্লসিত, এখন তা নিশ্চয়ই সাবানের ফেনায় ধুয়ে-মুছে গেছে। কিন্তু রং ত শুধু দেহেই লাগে না, লাগে মনের কোণেও। দেহের ওপর রঙের যে ছোপ তা সহজে ধুয়ে-মুছে যেতে পারে কিন্তু মনের রং কি অত শীঘ্র মিলায়?

বাংলা দেশে হোলী খেলার দিনটি আসতে এখনও দেরি আছে। সে তারিখটি আমরা সযত্নে মনে রেখেছি। কলকাতায় বসন্ত কখন আসে, কখন যায় কিছুতেই ধরা যায় না। এই শীত-শীত ভাব, দুপুরে সামান্য গরম, সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা। তারপরই হঠাৎ যেন গ্রীষ্মের দহন জ্বালা এল ধেয়ে। বসন্ত কবে কোন সরুগলির পথ বেয়ে পালিয়ে গেছে তা জানতেই পারি না। কলকাতায় বসন্তকে উপলব্ধি করি শুধু হোলী খেলার দিনটি দিয়ে। আবীর আর রং দেখলেই মনে হয়—আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। সত্যি, কলকাতায় হোলী খেলা যদি কোন অনিবার্য কারণে বন্ধ হয়ে যায় তবে সে বছরে বসন্তের আবির্ভাবই যাবে না বোঝা। কারণ, কলকাতায় বসন্ত ত বসন্তের (মহামারী) মধ্যেই সীমিত। মহানগরীতে তার আগমন বড় স্বল্প। 'সে কেবল দৃষ্টি এড়ায়, পালিয়ে বেড়ায়,—ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।'

দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এসে শাজাহান স্থাপত্যে মন দিলেন। জাহাঙ্গীর বেশী কিছু করে যান নি। সেকেন্দ্রার অসমাপ্ত কাজটুকু, আগ্রা কেল্লার জাহাঙ্গীর-ঈ-মহল, অপরূপ ইৎমাতুদ্দৌল্লা এবং জাহাঙ্গীরের প্রধান খোজা বুলান্দ খানের নামে সুন্দর বাগান ও সৌধের রচনাই তার প্রধান কীর্তি। কিন্তু শাজাহান কীর্তিতে

সকলকে ছাড়িয়ে গেলেন। স্থাপত্য তার প্রচেষ্টায় শতদল হয়ে বিকশিত হয়ে উঠল। শুধু আগ্রা শহরেই তাঁর প্রধান কীর্তিগুলি দেখে কোন বিদেশী পর্যটকই মুগ্ধ না হয়ে ফিরে যান নি। কেল্লার শীষ মহল, মোতি মসজিদ, যমুনার তীরের মর্মর তাজ—প্রত্যেকটিই অতুলনীয়।

পর্যটকের দল শাজাহানকে আরও একটু বড় করে গেছেন। ওয়াণ্ডেলসোলো, ফ্রান্সিস বার্নিয়ার, এলফিনষ্টোন সকলেই আগ্রা নগরীর সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যের সমান প্রশংসা ক'রে গেছেন। এ বিষয়ে তাভার্নিয়ে আরও একটু অগ্রসর। তাঁর মতে শাজাহানের রাজধর্ম পিতার দৃষ্টিসুলভ ছিল। প্রজাদের ওপর রাজশক্তি তিনি প্রয়োগ করেন নি। পিতার সহাস্য দৃষ্টি দিয়ে প্রজাদের মনোরঞ্জন ক'রে গেছেন।

কিন্তু পিতৃসুলভ রাজধর্মের দাবি ভারতের ইতিহাসে একজন সম্রাট করতে পারেন। তিনি সম্রাট অশোক। সাম্রাজ্য-শাসনে রাজার স্থান কোথায়, সে সম্বন্ধে তার প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য সুন্দর করে লিখে গেছেন।......

'In the happiness of his subjects lies his happiness, in their welfare his welfare, whatever pleases himself he shall not consider as good but whatever pleases his subjects, he shall consider as good?

যে কোন মোগল সম্রাটই রাজধর্মের এই সংজ্ঞা থেকে বহুদূরে। তবে শাজাহানের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের জাঁকজমক আর আড়ম্বরের অন্ত ছিল না, বরং এ বিষয়ে এলফিনষ্টোন আরও স্পষ্ট। বিখ্যাত গ্রন্থ 'রোমান সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতনের' পাতায় গিবন সম্রাট সিভেরাসের কথা লিখেছেন। বাদশাহ শাজাহান এই রোমান সম্রাটের সঙ্গে তুলনীয়।

কিন্তু কথায় কথায় কি কথা এসে পড়ল। আগ্রা থেকে দিল্লী, স্থাপত্য ও সামান্য ইতিহাস থেকে রাজশক্তি রাজধর্ম—কতদূর না আমরা চলে যাচ্ছি। কাজেই আর এগিয়ে কাজ নেই। আবার ফিরে আসি লালকেল্লায়। প্রথম দিল্লী গিয়ে যা দেখতে সকলেই ছুটে যান। সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শাজাহানাবাদের কেল্লা।

দিল্লীতে নতুন এক নগরী গড়তে চেয়েছিলেন শাজাহান। ক্রমানুসারে দিল্লীর সপ্তম নগরী। আকবরের নামে আগ্রার নাম দিয়েছিলেন আকবরাবাদ। নিজের নামে নতুন নগরীর নাম দিলেন শাজাহানাবাদ।

১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগেই সুরু হ'ল কেল্লার রচনা। দিল্লীর সুবেদার মৈরাট খান দেখাশোনা করলেন প্রাথমিক কার্য। তারপর আল্লা ভের্দী খান এবং মাক্রামৎ খান যথাক্রমে এর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। নয় বৎসরেরও কিছু বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছিল এটি সম্পূর্ণ করে তুলতে। তখন আসফ খান মন্ত্রী নন। সাদউল্লা খান উজীর হয়েছেন। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে লালকেল্লায় শাজাহান প্রবেশ করেন।

সমস্ত স্থানটি এক অসম অষ্টভুজের আকৃতি। পূবে ও পশ্চিমে বড় দু'টি বাহু—বাকী ছ'টি বাহু উত্তরে ও দক্ষিণে। পূবদিকের বাহুর উপরের সৌধগুলি থেকে নদীবক্ষ সুন্দর দৃষ্ট হয়। নদী আর প্রাসাদের মধ্যে বালির খানিকটা অংশ। একদা প্রাসাদে দাঁড়িয়ে এই বালুকাময় অংশের ওপর অনুষ্ঠিত হাতীর লড়াই লক্ষ্য করতেন সম্রাট ও অন্যান্য পরিজনেরা। পর্যটক বার্নিয়ার একবার এই বালুভূমির উপর এক ক্ষিপ্ত হস্তীর হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পান।

ছোটখাটো প্রবেশদ্বারগুলির কথা বাদ দিলে লালকেল্লায় প্রধান প্রবেশদ্বার দু'টি। প্রথমটি লাহোর গেট—দ্বিতীয়টি দিল্লী গেট। শাজাহান দুর্গকে বড় সুন্দর ক'রে নির্মাণ করিয়েছিলেন। আজ তার বহু কিছু বিনষ্ট। নদীর দিকটা বাদ দিয়ে, দুর্গের বেষ্টনী প্রাচীরের চতুর্দিকে গভীর পরিখা রচিত হয়েছিল। সর্বদাই জলে পরিপূর্ণ থাকত খাদটি। আর অসংখ্য মীন মহাসুখে তাতে জলক্রীড়া করত। পরিখার পাশেই একদা শোভা পেত নয়নমুগ্ধকর সুচারু উদ্যান। সবুজের শ্যামলিমা নানা প্রস্ফুটিত কুসুমের শোভায় দ্বিগুণ সৌন্দর্য্য বিকশিত করে ইট-পাথরের বিশাল প্রাচীরের রুক্ষতা বহুলাংশে দূর করত।

লাহোর গেটই সচরাচর ব্যবহৃত প্রবেশপথ। আওরঙ্গজেব প্রবেশ-পথের মুখে স্থাপন করেছিলেন একটি প্রহরী মন্দির। গেটের দরজা খোলা হ'লেই প্রাসাদের একটা অংশ বাইরের লোকের চোখের সামনে উঠত ভেসে। এই প্রহরী মন্দির বা উপদুর্গ রচনা করে আওরঙ্গজেব সাধারণের দৃষ্টিতে প্রাসাদের কোন অংশ যাতে না পড়ে তারই ব্যবস্থা করলেন। পরিখার ওপর প্রবেশ-পথের মুখে শাজাহান তৈরী করিয়েছিলেন কাঠের টানা সেতু। যে সেতু ইচ্ছেমত টেনে আনা বা পিছিয়ে দেওয়া চলে। দ্বিতীয় আকবরের আমলে কাঠের সেতুর বদলে পাথরের ব্রিজ তৈরী করা হয়।

লাহোর গেটের মধ্যে একটি আবৃত খিলান দ্বারা আচ্ছাদিত পথ। পথের দু'পাশে ঘর। এক সময় নানাবিধ সামগ্রী কেনা-বেচা হ'ত এই ঘরগুলি থেকে। ক্রেতা ও বিক্রেতার কলরোলে ভরে উঠত খিলান দ্বারা আচ্ছাদিত এই পথটি।

মাঝখানে আটকোণা খোলা চত্বর। একে ছত্র চক ব'লে অভিহিত করা হ'ত। এখান থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে লাহোর গেটের মাথায়।

লাহোর গেট বাজারের মধ্যে দিয়ে সেদিন মানুষ এসে পৌঁছত প্রায় বর্গাকৃতি একটি স্থানে। এক সময় এই ক্ষেত্রটির পাশে পাশে ছোট ছোট বাড়ীঘর হয়েছিল নির্মিত। কোন কোন ঘরে অফিসের কাজকর্ম নির্বাহ হ'ত। কোন কোন ঘর প্রহরীদের বাসস্থান রূপে হয়েছে ব্যবহৃত। একদা সুন্দর একটি পুষ্করিণী স্থানটির মধ্যখানে শোভা পেত। একটি খাল ক্ষেত্রটিকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করে কেল্লার একদিক হ'তে অন্যদিকে গিয়েছে চলে। খালের পাশেই সুন্দর রাস্তা ছিল তৈরী। পুষ্করিণীর অতি সন্নিকটে পাথরের রেলিঙের মধ্যে একটি দোতলা সুন্দর বাড়ী শাজাহানের নকরখানা বা বাদ্যঘর রূপে ব্যবহার হয়েছিল। দিনে পাঁচবার সরকারী বাজনা উঠত বেজে। রবিবারে এবং সম্রাটের জন্মদিনে সঙ্গীতের সুর প্রায় সব সময়ই বাজত। নতুন যাঁরা আসতেন এদেশে, তারা নাকাড়ার নিনাদ এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ঘোষণায় প্রথমটা খুবই অসহ্য বোধ করতেন। পরে অবশ্য ঐটাই গা-সহা হয়ে যেত। অনেকটা আজকের শহরে মানুষের কানে শোনা মাইকের আর্তনাদের মত। শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে যেতে হয়। নাহলে প্রথম-দিকে ত কান ঝালাপালা হয়ে যায়।

আজকের দিনে অবশ্য, পুষ্করিণী, খাল, চারপাশের বাড়ী-ঘর কিছুই দেখা যাবে না। সবকিছু সরিয়ে দিয়ে জমিকে সমান করে দেওয়া হয়েছে। নকরখানার চত্বরে ওমরাহ এবং অন্যান্যদের হাতী বা ঘোড়ার পিঠ হ'তে নেমে আসতে হ'ত। সম্রাটকে সম্মান প্রদর্শনের জন্যই তাঁরা পায়ে হেঁটে গিয়ে পৌঁছতেন পরের চত্বরটিতে। আসলে নকরখানাই এক হিসাবে একটি প্রবেশদ্বারের মত ছিল। এই প্রবেশদ্বারের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে না যাওয়ার জন্য দিল্লীর এক ইংরেজ রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে কঠিন অভিযোগে এনেছিলেন শেষ দিকের এক মোগল সম্রাট।

লাহোর গেট ছাড়া অন্য প্রধান গেটটি দিল্লী গেট নামে অভিহিত। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের এই প্রবেশ-দ্বারটির দু'পাশে একসময় দু'টি বিশাল হাতী থাকত দাঁড়িয়ে। পাথরের নির্মিত এই হাতী দু'টি স্থপতির হাতের সবটুকু কারিগরিকে নিংড়ে নিয়ে রূপ পেয়েছিল। হাতীর পিঠে মাহুত ছাড়াও এক সুদেহী পুরুষের মূর্তি বসানো ছিল। মূর্তি দুটি রাজপুত বীর জয়মল্ল ও পাট্টার প্রতিকৃতি। হাতী দু'টির অবস্থান নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কারও মতে হাতী দু'টি ছিল লাহোর গেটেরই সামনে। অন্যরা মনে করেন, হাতী দু'টি নকরখানার তোরণের মুখে দু'দিকে বসানো ছিল। নকরখানার আর একটা নাম 'হাতীপোল' বলে জানা গিয়েছে। এই নামের কারণের সঙ্গে অন্য কোন বিষয়কেই যুক্ত করা যায় না। এমনও অসম্ভব নয় যে, একসময় হাতী দু'টি দুর্গের বাইরে লাহোর গেট বা দিল্লী গেটের সামনেই শোভা পেত। পরে কোন সময় সম্রাটের অভিরুচি অনুযায়ী এগুলিকে ভিতরে এনে নকরখানার তোরণের মুখে স্থাপন করা হয়।

জয়মল্ল ও পাট্টার ছোট্ট কাহিনী এই প্রসঙ্গে অবান্তর মনে হয় না। চিতোর দুর্গ আক্রমণ করেছিলেন আকবর। তখন চিতোরের রাণা উদয় সিংহ। রাণা সঙ্গের বংশধর। চিতোর দুর্গের ভার গ্রহণ করেছিলেন বিখ্যাত রাজপুত বীর জয়মল্ল ও তাঁর অনুচরেরা। রাজ-পুতদের বীরত্বে ও শৌর্যে আকবর মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। একসময় তাঁর মনে হয়েছিল যে, চিতোর জয় করা হয়ত সম্ভব হবে না। কিন্তু বিধি আকবরের অনুকূলে। তাই একদিন রাত্রে আকবর লক্ষ্য করলেন যে, দুর্গের বাইরে একদল রাজপুত পরিখার চারিপাশ পর্যবেক্ষণ করছেন। আগামী দিনের সমরের জন্য কি কি মেরামতী করা যায়, তাই তাঁরা আলোচনায় রত। সকলের আগে আগে এক সুপুরুষ দীর্ঘদেহী রাজপুত বীর। মশালের আলোয় সেই মানুষটির মুখের এক অংশ রক্তাভ দেখাচ্ছিল। কি খেয়াল হ'ল আকবরের। পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর দেহরক্ষী অনুচর। তার কাছে নিজের প্রিয় অস্ত্র সংগ্রাম নামের বন্দুকটি চাইলেন বাদশাহ। তারপর লক্ষ্যবস্তুকে একটু নিরীক্ষণ করে ক্ষেপণ করলেন গুলী।

আকবর বুঝতে পেরেছিলেন যে, লক্ষ্যবস্তুকে তিনি আঘাত করেছেন। রাজা ভগবান দাসকে সে কথা তিনি জানিয়েছিলেন। কিন্তু কে ঐ রাজপুত বীর? সেটুকু বাদশাহের তখনও অজানা ছিল।

জয়মল্ল মারা গিয়েছিলেন। গুলী তাঁর মস্তকে বিদ্ধ হয়েছিল। হয়ত মস্তকে নয়—গুলী লেগেছিল সমস্ত

রাজপুত বীরত্ব ও শৌর্যের মধ্যস্থলে। কারণ জয়মল্লের মৃত্যু বয়ে এনেছিল মরণের চেয়েও শীতলতর হতাশা। আকবর পরবর্তী আক্রমণেই চিতোর দখল করতে সফলকাম হয়েছিলেন।

বিজয়ী বাদশাহ জয়মল্ল এবং পাট্টার বীরত্বের স্মৃতিকে মনে ক'রে তৈরী করিয়েছিলেন দু'টি পাথরের হাতী। হাতীর পিঠে জয়মল্ল ও পাট্টার বীরমূর্তি স্থাপন করেছিলেন। হাতী দু'টি আগ্রার কেল্লার একটি প্রবেশ-পথের মুখে প্রহরীর মত রক্ষিত ছিল। অভিমত এই যে, শাজাহান আগ্রা থেকে দিল্লীতে নিয়ে আসেন এ দু'টিকে। নতুন কেল্লায় যথাস্থানে তাদের রাখা হয়। কারও মতে শাজাহান হাতী দু'টিকে গোয়ালিয়র থেকে নিয়ে আসেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে বাদশাহ ঔরঙ্গজীব এগুলিকে স্থানান্তরিত করা এবং ধ্বংসের আদেশ দেন। বহু বৎসর পরে এগুলির একটিকে জীর্ণ ও ভগ্ন অবস্থায় বহুদিনের জঞ্জাল ও ধুলোবালি ইত্যাদির মধ্য থেকে বের করা হয়। অন্য মত এই যে, শাজাহানের একটি ক্ষিপ্ত হাতী শুঁড়ের আঘাতে একটি হাতীকে ভেঙে ফেলে। তখন ঔরঙ্গজীব অন্যটিকে স্থানান্তরিত করার আদেশ দেন। সম্ভবত অন্য কোন মোগল সম্রাট এগুলির অনুলিপি পুনরায় নির্মাণের আদেশ দেন।

এক সময় দেওয়ানী আম দরবার গৃহের সামনে সুপরিসর একটি চত্বর ছিল। চত্বরের চারপাশে দেওয়াল বা প্রাচীর। প্রাচীরের গায়ে খিলানবিশিষ্ট ছোট ছোট ঘরের মত তৈয়ারী করা হয়। এগুলি ওমরাহ এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। দরবারের সময় এই খিলান-বিশিষ্ট ঘরগুলি এক নতুন সাজে উঠত সেজে। থামের গায়ে মূল্যবান ব্রোকেড শোভা পেত। খিলানের গায়ে ঝুলত সিল্ক এবং ভেলভেটের বুটিদার কাপড়। চত্বরটিকে আম-খাস নামে অভিহিত করা হ'ত।

দরবার-গৃহের ডানদিকে চত্বরের পূবদিকের দেওয়ালে এককালে ছিল এক খিলান-বিশিষ্ট প্রবেশদ্বার। এর মধ্য দিয়ে গেলেই দেওয়ান খাসের চত্বরে পৌঁছান যেত। একদা একটি লাল পর্দা এই গমনদ্বারের সামনে ঝোলান থাকত। পর্দার নামে দ্বারের নাম হয়েছিল লাল পর্দা গেট।

দেওয়ানী আম, দরবার গৃহ। বেশ বড় গোছের হল মতন বাড়ী। তিন দিকে খোলা, শুধু একদিকে দেওয়াল। হলের মধ্যে সারি সারি থাম। থামগুলির দ্বারা সমস্ত হলঘরটি ছোট ছোট কক্ষের মতন অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। পূর্ণ সৌভাগ্যের দিনে, এই থামগুলির গায়ে সুন্দর কাজ ও সোনালী জলের প্রলেপ শোভা পেত। খোলা তিনদিকেই সিঁড়ি আছে। এর ওপর দিয়ে দেওয়ানী আমে উঠে আসা যায়। পিছনের দেওয়ালের মধ্যখানে সুন্দর চিত্রণের কাজ দেওয়ানী আমকে সুদৃশ্য করে তুলেছিল। মূল্যবান পাথরের সাহায্যে মোজেইকের কাজের দ্বারা দেওয়াল-গাত্রে অঙ্কিত হয়েছিল হিন্দুস্থানের নানা পশুপক্ষী, মনোরম পুষ্প ও বিভিন্ন ফলের ছবি। এ সবই অষ্টিন দ্য বুর্দর শিল্প-নৈপুণ্য। সুদূর ইউরোপ থেকে অষ্টিন দ্য বুর্দর এসেছিলেন। তখনকার দিনের বিখ্যাত শিল্পী। ইউরোপে সুবিধে করতে পারেন নি অষ্টিন। এক রকমের নকল পাথর অসাধারণ নৈপুণ্যে তিনি তৈরী করতে সক্ষম
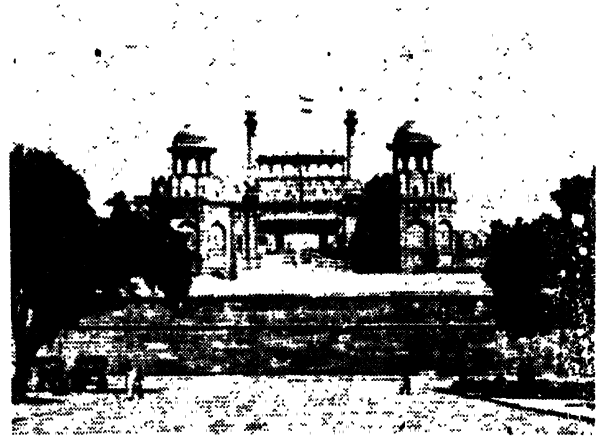
লালকেল্লা, দিল্লী

হয়েছিলেন। ইউরোপের বহু রাজপরিবারকে এই নকল পাথর দিয়ে ধোঁকা দিয়েছিলেন অষ্টিন দ্য বুর্দ। শেষ দিকে শাজাহানের কাছে নিয়েছিলেন আশ্রয়। বাদশাহের নকল পাথরের কোন প্রয়োজন ছিল না। মোগল রাজকোষে ধনরত্ন শুধু প্রচুর নয়, ছিল রাশি রাশি। কাজেই অষ্টিন সাহেবকে এখানে কোন ঝামেলায় জড়িত হ'তে হয় নি। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক চিত্র এঁকেছিলেন তিনি। দেওয়ালের ঠিক মধ্যখানে, সম্রাটের সিংহাসনের পিছনে এক অনন্যসাধারণ চিত্রে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন অষ্টিন দ্য 'বুর্দ'। সোনালী চুলের এক যুবকের মূর্তি। অর্ফিউস—গাছের নীচে এক

পাথরের ওপর বসে ভায়োলিন বাজাচ্ছেন। সুর শুনে তাঁর পায়ের কাছে মুগ্ধ হয়ে বসে আছে সিংহ, চিতাবাঘ ও ভীরু শশক। পরবর্তী সময়ে ইংরেজরা এটিকে স্বদেশে নিয়ে যায় এবং সেখানকার ভারতীয় মিউজিয়ামে এটিকে রাখা হয়।

বাদশাহ বসতেন সিংহাসনে। শ্বেত মার্বেলের এই সিংহাসনের মাথায় মার্বেল পাথরের চাঁদোয়া। নানা মূল্যবান পাথর-খচিত সিংহাসনের বিভিন্ন অংশে ফুল আর লতাপাতার চিত্র শোভিত। কাছাকাছি আর একটি মার্বেলের বেদী মতন আসন। এর ওপর বসতেন উজীর সমস্ত ঘরের মেজেতে থাকত সিল্ক আর কার্পেট। থামের গায়ে ঝুলত বহুমূল্য ব্রোকেড। মাথার ওপর শোভা পেত ব্রোকেডের চাঁদোয়া।

সমস্ত আবেদনপত্র উজির তুলে দিতেন বাদশাহের হাতে ঘর নিস্তব্ধ শুধু প্রহরীরা, বাদশাহের গায়ে যাতে মাছি না বসতে পারে তার জন্য ময়ূর পালকের সুদৃশ্য পাখা জোরে ব্যজন ক'রে চলেছে। পাখার হাওয়ায় বাদশাহ ক্লান্তি অপনোদন করছেন। নক্করখানা হ'তে মৃদু সঙ্গীতের সুর আসছে ভেসে। দরবার-গৃহের কাজ এক এক ক'রে সাঙ্গ হয়ে আসছে দিনের সঙ্গে।

কখনও বাদশাহ বসতেন প্রধান কাজীর আসনে। লিপিবদ্ধ আইন না থাকলেও শাস্তি ছিল কঠোর। তবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা ছিল সম্রাটের স্বয়ং। সে মৃত্যুও অদ্ভুত ভাবে। কখনও হাতীর পায়ের তলায় নিষ্পিষ্ট ক'রে মারার আদেশ, কখনও কেউটের কামড়ে প্রাণ দিতে হ'ত হতভাগ্যকে। সম্রাট আকবর এক অদ্ভুত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন বহু অবাঞ্ছিত জনকে। তার সঙ্গে থাকত সুন্দর ডিবেতে মশলা-দেওয়া সুগন্ধী পান। কোন কোন পানের মধ্যে থাকত বিষবটিকা। বাদশাহ অনুরোধ ক'রে খেতে দিলে কেউ অমান্য করতে সাহস পেত না। কিন্তু সম্রাট স্বয়ং যাকে চাইতেন না, তার হাতেই তুলে দিতেন সেই বিষবটিকা-মিশ্রিত তাম্বুল। মৃত্যু এসে অবাঞ্ছিত হতভাগ্যের মরদেহের সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে দিত।

শাজাহানের রাজত্বকালের সঙ্গে ময়ূর সিংহাসনের নাম অমর হয়ে আছে। সিংহাসনের পেছনে দু'টি পেখম-তোলা ময়ূরের মূর্তির জন্যই এর নাম ময়ূর সিংহাসন দেওয়া হয়। ফরাসী শিল্পী অষ্টিন দ্য বুর্দই ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করেন। কারও মতে বেবাদল খান নামক একজন স্বর্ণশিল্পী অষ্টিন দ্য বুর্দর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন। কি ছিল ময়ূর সিংহাসনে? রাশি রাশি তোলা সোনা আর পৃথিবীর দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান হীরে-জহরৎ-মণিমুক্তা। প্রায় সাত বৎসরের মত সময় লেগেছিল ময়ূর সিংহাসন গড়ে তুলতে। এক লক্ষ তোলা সোনা লেগেছিল এর নির্মাণ-কার্য্যে। আর অগুনতি মরকত মণি, চুণী, ও হীরা-মুক্তা বার্নিয়ার বলেছিলেন, এর দাম চার কোটি টাকার কম নয়। অন্যরা প্রায় কাছাকাছি এর মূল্য নিরূপণ করেন।

দু'টি মোটাসোটা পায়ের ওপর ময়ূর সিংহাসন দাঁড়িয়ে। মাথার ওপর চাঁদোয়া—বারটি সোনার থাম এটিকে ধারণ ক'রে ছিল। থামের গায়ে চুণী বসানো। ময়ূরের পেখমে আর দেহে মরকত মণি, চুণী, নীলকান্ত মণি ইত্যাদি নানা মূল্যবান পাথরের সুদৃশ্য সংযোজন। চাঁদোয়ার সীমানার গায়ে সারি সারি মুক্তা সাজানো। সব মিলিয়ে বস্তুটি যে কি ছিল তার কাছে কল্পনাও হার মানে। পারস্যের শাহ আব্বাস জাহাঙ্গীরের কাছে একটি বহুমূল্য চুণী উপহার পাঠিয়েছিলেন। পাথরটির ওপর নানা জনের নাম খোদাই করা ছিল। ময়ূর সিংহাসনে এটিও বসিয়েছিলেন অষ্টিন সাহেব। দাম তখনই এক লক্ষ টাকার মত।

কিন্তু পারস্যের উপহারকে এদেশে ধরে রাখতে পারেন নি পরবর্তী মোগল বাদশাহেরা। সুদূর পারস্য থেকে নাদির শাহ এসে নিয়ে গেলেন সেই চুণী-খচিত সমস্ত ময়ূর সিংহাসনটিকে।

বসন্ত উৎসবের দিন ময়ূর সিংহাসনে আরোহণ করতেন মোগল বাদশাহেরা। তবে সেটা সর্বসাধারণের সামনে—দেওয়ানী আমে। এ ছাড়া ময়ূর সিংহাসন সম্ভবত থাকত দেওয়ানী খাসে,—একটি মার্বেলের বেদীর ওপর। বর্গাকৃতি মার্বেলের বেদী হয়ত এখনও ময়ূর সিংহাসনের জন্য নীরব দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

ঐতিহাসিক এবং পর্য্যটকরা বলেছেন যে, এত সাধের ময়ূর সিংহাসনে শাজাহানের আর আরোহণ করা হয়ে ওঠে নি। ঔরঙ্গজীবই প্রথম এটিতে আরোহণ করেন।

নদীতীর ঘেঁসে শাজাহান অনেকগুলি সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করিয়েছিলেন। এদের মধ্যে সৌন্দর্যে না হ'লেও অলঙ্করণে দেওয়ানী খাস শ্রেষ্ঠ। ফার্গুসনের বক্তব্য।......'If not the most beautiful, certainly the most highly ornamented of all Shabjahan's building'

দেওয়ানী খাস ত পৃথিবী নয়, পৃথিবীর স্বর্গ। শাজাহানের মন্ত্রী সাদউল্লা খানের তা মনে হয়েছিল।

তাই তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ এক শিল্পীকে দিয়ে দেওয়ানী খাস গৃহের কার্নিশের নীচে এক লিপি তিনি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। কবিতার মত সুন্দর রচনা—

—'আগর ফারদোস্ বা রুয়ে জমিন অস্ত্

হামিন অস্ত্ ও, হামিন অস্ত্ ও, হামিন অস্ত্'—

অর্থাৎ,—

'স্বর্গ যদি থাকে এ ধরায়—

তবে সে হেথায়, সে হেথায়, সে হেথায়।'—

আর স্বর্গ নয়ই বা কেন? শাজাহানের রাজত্বকালের জাঁকজমক ও আড়ম্বর ত শুধু ঘটনা নয়, ঘটনার চেয়েও বিস্ময়কর রোমান্সের গন্ধভরা গল্পের মতই চিত্তাকর্ষক।··· সম্রাটের জন্য বরফ আসত সুদূর কাশ্মীর হ'তে।··· মোগলাই খানার গন্ধে দিল্লী কেল্লার বাতাস 'ম' 'ম' করত এক সময়। যৌবনবতী মোগল রমণীরা অঙ্গে নিতেন বহুমূল্য ঢাকাই মসলিন। হ্যাঁ, বিশেষ বিশেষ নাম ছিল বস্ত্রের। আজকের দিনের মতই। কোনটি 'সাঁঝের শিশির', কোনটি 'বোনা বাতাস' কিংবা অন্য কোন নাম। একটা কাপড়ের ওজন দু'তিন আউন্সের মত। মূল্য তখনকার দিনেই প্রায় অর্ধশত রৌপ্যমুদ্রা।

দেওয়ানী খাস শ্বেত মার্বেলে গঠিত এক সুদৃশ্য অট্টালিকা। চার ফুটের মত উঁচু একটি মার্বেলের বেদীর ওপর অট্টালিকাটি তৈরী হয়েছে। মাঝখানের একটি হল মতন ঘর বারোটি থামের ওপর দাঁড়িয়ে। চারপাশ বেষ্টন ক'রে বারান্দার মত খানিকটা স্থান—কুড়িটি স্তম্ভের ওপর ভার ন্যস্ত করে আছে। সাকুল্যে বত্রিশটি স্তম্ভ। স্তম্ভগুলির মধ্যে খিলানের মত প্রবেশ-পথ।

দেওয়ানী খাসে অপূর্ব অলঙ্করণ করিয়েছিলেন সম্রাট। স্তম্ভ ও খিলানের গায়ে পুষ্প, বৃক্ষ ও লতা-পাতার এক আশ্চর্য সমন্বয় সংঘটিত হয়েছিল। নানা মূল্যবান পাথরের সাহায্যে এই অলঙ্করণ—নীল, লাল আর নীল লোহিত বর্ণের porphyry, কর্ণেলিয়ান, লাপিস লাজুলী, ইত্যাদি। তার সঙ্গে সোনার জলের কাজ। দেওয়ানী খাস গৃহের ছাদের চারকোণে চারিটি রথের আকৃতি-বিশিষ্ট আচ্ছাদন নির্মিত হয়েছিল। গৃহ অভ্যন্তরের শীর্ষে এক সময় রূপোলা পাতের আবরণ শোভা পেত। মারাঠারা সেগুলি লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে যায়। অভ্যন্তরের ছাদের এই রৌপ্য পত্রাবরণটি (স্থানে স্থানে সোনার কাজও ছিল) প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে তৈরী হয় এবং মারাঠাদের ট্যাকশালে এটি গলিয়ে মোটামুটি আঠাশ লক্ষ টাকার মুদ্রা প্রস্তুত হয়েছিল।

দেওয়ানী খাসে 'প্রবেশ নিষেধ' জানাতে কোন ভয়ংকর মোগল-প্রহরী আজ তরবারি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। পুরাণো স্মৃতির ধারক ছাড়া এই গৃহটি আজ আর কিছু নয়। ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে এলোমেলো সেই কথাগুলিই বার বার মনে পড়ল। কত বিদেশী ট্যুরিষ্ট ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে আমাদের সঙ্গে ঘুরছেন। গাইডের কথা কান পেতে শুনে পুরাণো কাসুন্দির গন্ধ পেতে চাইছেন সতৃষ্ণ কৌতুহল ব্যক্ত করে। এই হল গৃহেই একদিন সেই বিষণ্ণ সভা বসেছিল। কিঞ্চিদধিক দু'শত বৎসর আগে বাদশাহ মহম্মদ শাহ বিদায় সভা ডেকেছিলেন এখানেই। নাদির শাহকে এত শীঘ্র ছেড়ে দিতে সমস্ত হিন্দুস্থান (দিল্লীর সাম্রাজ্য) এবং সম্রাট স্বয়ং বিষণ্ণ বোধ করছেন, এই ক্লান্তিকর কথাগুলি এখানেই আবৃত্তি করেছেন। সুচতুর নাদির এই দেওয়ানী খাসেই বদল করেছিলেন মস্তকের পরিধান—লাভ করেছিলেন কোহিনুর হীরক।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় দেওয়ানী খাসে একবার সমবেত হয়েছিলেন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন দেশীয় কর্মচারীরা। নামমাত্র মোগল সম্রাট শাহ আলমের বংশধরকে ভারতের সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দেবার শপথ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

দেওয়ানী খাসের উত্তরে বাদশাহ আর বেগমদের স্নানাগার। একে হাম্'ম নামে অভিহিত করা হয়েছিল। মোগলাই খানার মতই মোগলদের স্নানাগারও উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে। দেওয়ানী ও খাস হা'ামের মধ্যে ছোট্ট একটি চত্বর। মার্বেল পাথরে মোড়া। ঢুকবার মুখে ছোট্ট একটি স্নানাগার সম্ভবত ছেলেদের জন্য ব্যবহৃত হ'ত। এক সময় এই ঘরের মাথায় দেওয়ালের বুকে জীবজন্তুর নানা চিত্র অংকিত হয়। বাদশাহ বেগমদের জন্য তিনটি সুন্দর ছোট ছোট কক্ষ স্নানাগার হিসেবে ব্যবহার করা হ'ত। এই কক্ষগুলির মেঝে শুভ্র মার্বেল পাথরে বাঁধান। চারপাশের দেওয়ালের কোমর-প্রমাণ অংশ, জলাধার এবং মার্বেল ফলকের ওপর একদা মূল্যবান পাথরের কাজ করা ছিল। কক্ষ তিনটির মধ্যে একটিতে তিনটি জলাধার। নদী-ধারের এই ঘরটির একদিকের দেওয়ালের সঙ্গে একটি ছোট্ট মার্বেল পাথরের ব্যালকনি লাগান। দুপাশেই দেওয়ালের বুকে মার্বেলের জাফরী-কাটা পর্দাজাতীয় কাজ। অন্য কক্ষ দুটির একটিতে জলাধারের সংখ্যা একটিই।

কাছাকাছি একটি মার্বেলের কৌচে স্নানের পর বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তামাক কিংবা কোন

পানীয় এখানে বসেই গ্রহণ করতেন সম্রাট এবং অন্যান্যেরা।

জল গরম করবার জন্য সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। মোতি মসজিদের দিকে একটি গর্তের মধ্যে জ্বালানী কাষ্ঠ দেওয়া হ'ত ভ'রে। উত্তাপে গরম ঘরের জল উঠত তপ্ত হয়ে। তখন প্রয়োজন মত বিভিন্ন কক্ষে জলকে পাঠান হ'ত নির্দিষ্ট প্রণালীর ওপর দিয়ে। কথিত যে, বেশ কয়েক টন কাঠের প্রয়োজন হ'ত জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য।

লালকেল্লায় মোতি মসজিদ সম্ভবত আওরঙ্গজেবের একমাত্র সৃষ্টি। স্থাপত্য আওরঙ্গজেবের হস্তক্ষেপ কম। বিবি কা মকবুরা (ঔরঙ্গাবাদ) আর মোতি মসজিদ ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কোন অবদানই নেই। মোতি মসজিদ ১৬৫৮—৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। দেড় লক্ষ টাকারও বেশী ব্যয় হয় তখনকার দিনে। মোতি মসজিদ শুধু শ্বেত মার্বেলের তৈরী। এমন চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্যের বুঝি দোসর মেলা ভার। চেয়ে চেয়ে আঁখি আর ফেরে না। হারেমের বেগম, শাহজাদা-শাহজাদী ও নিজের জন্য এই ছোট্ট মসজিদের সৃষ্টি আওরঙ্গজেবের প্রয়োজন মনে হয়েছিল। জুতো বাইরে রেখে আমরা মসজিদে ঢুকলাম। আজ সেখানে নিবিড় শান্তি। একটি পিনের পতনও বোঝা যাবে। ভিতরের প্রাঙ্গণের মধ্যখানে ছোট্ট একটা জলাধার। একসময় হায়াৎবক্স উদ্যানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত খালের জল এটিকে সর্বদাই পরিপূর্ণ রাখত।

ঘুরতে ঘুরতে উদ্যানের মধ্যে গেলাম আমরা। হায়াৎ বক্স উদ্যান, জাহাঙ্গীর উদ্যান আজ সব একাকার। নদীধারের মোতিমহল আর নেই। বাহাদুর শাহ যে হীরামহল সৃষ্টি করেছিলেন গাইড কই তাও আমাদের দেখাল না। উদ্যানে ঘুরে বেড়িয়েছি কতক্ষণ। কি ফুলই না ফুটেছে লালকেল্লার মধ্যে। নয়াদিল্লীর সর্বত্রই ত সেই ফুলবাহার দেখছি।

হায়াৎ বক্স উদ্যান মোতিমহলের পিছনে তৈরী হয়। ব্যয় কম নয়। কিছু কম ত্রিশ লক্ষ টাকার মত। ঘুরে ঘুরে শাওন আর ভাদো গৃহ দু'টি দেখলাম। এই দু'টি আচ্ছাদনবিশিষ্ট গৃহের মধ্যে জল পড়ার এমন বিশিষ্ট কৌশল করা হয় যে, বারিপতন 'শাওন' আর 'ভাদো' মাসের প্রতীক হিসেবে বিরাজ করত।

আবার একসময় আমরা এসে পৌঁছলাম দেওয়ানী খাসের দক্ষিণে। এবার দেখলাম খাসমহল, মুসম্মন বুরুজ আর রংমহল। শ্বেত মার্বেলে নির্মিত খাসমহল বাদশাহের নিজস্ব আবাস ছিল। মুসম্মন বুরুজ একটি আটকোনা স্তম্ভের মত। এখানে দাঁড়িয়ে সম্রাট নিয়ে অপেক্ষমান জনতাকে দর্শন দিতেন। ইতিহাস বলে যে, পঞ্চম জর্জ ও ইংলণ্ডের রাণী এখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। উনিশ শ এগারো খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর কৌতূহলী জনতা এখানেই তাঁদের দর্শন পায়।

আর রংমহল? পুরাণো দিনের সে এক বিষণ্ণ স্মৃতি মাত্র। রঙে-রসে একদিন যে মহল হয়ে উঠত উজ্জ্বল উচ্ছল, আজ সেখানে ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। রংমহলের সম্মুখের ঘরের মধ্যখানে প্রস্ফুটিত পদ্মের যে রূপ মার্বেল দেওয়া হয়েছিল, সেই পদ্ম-পাপড়ির ওপর দিয়ে একদা জল সুমিষ্ট শব্দে নিচের আধারে গিয়ে পড়ত। এই আধারটি মার্বেল পাথরের, এর মধ্যে গোলাপ আর ফোটা যুঁই ও মল্লিকার ছবি নানা রঙের পাথরের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়। জলপড়ার সঙ্গে মনে হ'ত যেন ছবিগুলি ঘুরছে।

একসময় রংমহলের শীর্ষদেশ রূপার পত্রাবরণে আচ্ছাদিত ছিল। ফারুকশিয়রের সময় রূপার বদলে তামা ব্যবহার করা হয়। অবার দ্বিতীয় আকবর একটি চিত্রিত কাঠের আচ্ছাদন রংমহলের শীর্ষে ব্যবহার করেছিলেন।

পরবর্তী কালে রংমহল সৈন্যবাহিনীর পদস্থ কর্মচারীদের বাসস্থান রূপে ব্যবহৃত হ'তে থাকে। কিন্তু একসময় নির্মম কঠোর সৈন্যরা ভারী বুটের শব্দ তুলে রংমহলে প্রবেশ করতে কখনই সাহসী হয় নি। সুন্দরী মোগল রমণীর চরণ নূপুরের মিষ্ট মধুর ধ্বনিতে রংমহলের কক্ষগুলি উঠত ভরে। তাদের হাসির খিলখিল শব্দে রংমহলের ভারী ভারী পাথরগুলিও যেন জেগে উঠতে চাইত। মোগল সুন্দরীর সুর্মা-আঁকা চোখের কামনা-মদির দৃষ্টি ভেসে উঠত অলক্ষ্যে চকচকে মার্বেল পাথরের বুকে।

লালকেল্লায় ছিল অনেক কিছু। আজ বহু কিছু বিনষ্ট। বহু অংশ ব্যবহৃত হচ্ছে অন্য প্রয়োজন মেটাতে। নইলে দরিয়ামহল, খুর্দ জাহান, ছোট রংমহল, আরও কত কি দেখা যেত।

আমরা ত সামান্য দর্শক মাত্র। এত সাধের লালকেল্লা শেষ জীবনে শাজাহান আর একটি বার দেখতে পান নি। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে বন্দী সম্রাট পুত্র আওরঙ্গজেবের কাছে মনোভিলাষ ব্যক্ত করলেন। আর কিছু নয়। আগ্রা থেকে দিল্লী গিয়ে শেষবারের মত দু'চোখ ভরে লালকেল্লা আর শাজাহানাবাদকে দেখে আসবেন।

আওরঙ্গজেব চিন্তিত হ'লেন। অন্য কথা হ'লে, না বলা সহজ ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে। এই শেষ ইচ্ছা কি করে খণ্ডন করা যায়।

অনেক ভেবে আওরঙ্গজেব মত দিলেন। তবে স্থলপথে হাতীর পিঠে চড়ে যাওয়া চলবে না। শাজাহানকে যেতে হবে জলপথে, যমুনার বক্ষ দিয়ে। আসতেও হবে সেই পথে। স্থলপথে বন্দী সম্রাটকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। সেনাপতি ও সম্ভ্রান্ত ওমরাহদের বিদ্রোহী হ'তে কতক্ষণ?

কিন্তু শাজাহান রাজী হলেন না। এই অপমান তার বুকে তীরের মত বিঁধল। কি নিষ্ঠুর পরিহাস বিধাতার। তার সৃষ্টি শাজাহানাবাদ দেখার জন্য তাকেই এতখানি অবমাননা সইতে হবে। এতখানি পরাধীনতা?

দিল্লী যাওয়া বাতিল করলেন বন্দী সম্রাট। চোখ মেলে আর দেখা হ'ল না। চোখ বুঁজেই সম্রাট ভাবতে সুরু করলেন লালকেল্লাকে। সব ভেসে উঠল এক এক করে চোখের সামনে,...দেওয়ানী আম,...দেওয়ানী খাস, ...রংমহল...সব কিছু।

শুধু চোখ খুললেই—কই সে দৃশ্য? বন্দী সম্রাট আগ্রা কেল্লায় বসে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

শাজাহানের নানা কীর্তি দেখে শুধু একটা কথা মনে পড়বে। রাজকোষে প্রচুর অর্থ থাকলেই কি এত সুন্দর সুন্দর সৌধ রচনা করতে মন যায়। প্রচুর অর্থ, প্রচুর ধনরত্ন, প্রচুর ঐশ্বর্য ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর বহু দেশেই বহু নরপতি আয়ত্ত করেছেন। কিন্তু এমন অপরূপ তাজমহল, দেওয়ানী খাস, দেওয়ানী আম, এবং আগ্রা কেল্লার বহু সৌধ কোন নরপতি করে যান নি। সম্রাট শাজাহানের একটা অদ্ভুত অনুরাগ ছিল স্থাপত্যের ওপর। অনুরাগ না থাকলে শুধু ঐশ্বর্যবানের পক্ষে এমন সৃষ্টি কোনদিনই সম্ভব নয়।

পাশ্চাত্ত্য দেশের সঙ্গীতের কথা বলতে গিয়ে নেহরুজী লিখেছেন—

'As you know, Germans are the leaders in European music. Some of their great names appear even in the seventeenth century.......Two great names stand out in the eighteenth century—Mozart and Beethoven. They were both infant prodigies,—both composers of genius. Beethoven perhaps the greatest musical composer of the west, became strange to say quite deaf and so the wonderful music he created for others, he could not hear himself. But his heart must have sung to him before he captured that music.'

নিজের রচিত অপরূপ সোনাটা বিঠোভেন নিজের কানে শুনে যেতে পারেন নি। কিন্তু সুর কি শুধু কানে শোনারই বস্তু? হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে বহু পূর্বে সে মর্মে গিয়ে করাঘাত করে। সে সুর হৃদয়ে না করাঘাত করলে বিঠোভেন কি পারতেন অমন সুরবাহার সোনাটা রচনা করতে?

শুধু অর্থ ছিল বলেই শাজাহান সৃষ্টি করে যান নি এই সুরম্য সৌধমালা। স্থপতির হাতে রূপ পাবার বহু পূর্বে সম্রাট স্বপ্ন দেখেছিলেন এই সুদর্শন অট্টালিকাগুলির। স্বপ্নলোকের সেই পরীরাজ্যের মত মোহময় ছবিগুলি তিনি বাস্তবে এনেছিলেন নিপুণ শিল্পী আর কৃতী স্থপতির সাহায্যে।

(২১)

দিল্লী থেকে এবার ফিরতে হবে।

রিজার্ভেশন পাওয়া গেছে। তবে তুফানে নয়, দিল্লী এক্সপ্রেসে। শুনে কিঞ্চিৎ খারাপ হয়ে গেল মনটা। তুফানে গেলে বেশ হ'ত। যমুনার ওপর দিয়ে যেতে যেতে আর একবার দেখা যেত তাজমহল। আর একবার দেখতে চেষ্টা করতাম শ্বেত মার্বেলের ইৎমাতুদৌল্লা। সেকেন্দ্রার গম্বুজ বহুদূর থেকে নিশ্চয়ই পড়ত চোখে।

শেষ দিনে ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে পড়লাম যন্তর-মন্তর দেখতে। পরদেশী এসেছি হেথা বলতে হ'ল না। ভিতরে ঢুকতেই পাহারাদার গোছের একটা লোক এসে পাকড়াও করল। ভিনদেশীকে সে ঠিক চিনেছে। যন্তর মন্তর ঘুরিয়ে দেখাবে। বুঝিয়ে দেবে সবকিছু। এই বলে মস্ত এক সেলাম দিল।

যন্তর-মন্তর ঘুরে দেখলাম। মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে এর সৃষ্টি। অম্বরের রাজা জয়সিংহ এগুলি নির্মাণ করান। সম্ভবত ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে। তখন এর নাম ছিল সম্রাট যন্তর, পরে লোকের মুখে মুখে এর নাম হয়ে যায় যন্তর-মন্তর। সেই পাহারাদারটি আমাকে বোঝাল যে যন্তর মানে ইনষ্ট্রুমেণ্ট আর মন্তর মানে কৌশল। পরীক্ষা করে সময় কত লোকটি আমাদের বুঝিয়ে দিল। আমার ঘড়ির সঙ্গে ঠিক এক। একটুও ফারাক নেই। আশ্চর্য রকমের বড় সূর্যঘড়ি। হুগলীর ইমামবাড়াতেও একটা আছে, কিন্তু সে নেহাতই ছোট।

বড় যন্তর বা সূর্যঘড়ির দুই পাশে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকৃতির আরও দু'টি ছায়াঘড়ি। এই তিনটি একটি দেওয়ালের দ্বারা যুক্ত। এর ওপরই নির্মিত একটি খোদিত অর্ধবৃত্তের সাহায্যে যে-কোন বস্তুর পূর্বে বা পশ্চিমের অবস্থান নিরূপণ করা যায়।

দক্ষিণদিকে একই আকৃতির দু'টি গৃহের সৃষ্টি। গঠন অনেকটা গোলাকার। এর সাহায্যে নক্ষত্রের অবস্থান এবং উচ্চতা দেখা যায়। দু'টি গৃহের প্রয়োজন হয়েছিল সম্ভবত এই জন্য যে, একই ফল একটিতে আহরণ করে অন্যটির সাহায্যে মিলিয়ে সার্থকতা পরীক্ষা করা যায়। এই দু'টরই ওপর দিকটা ফাঁকা। কেন্দ্রে স্তম্ভ মত একটি বস্তু। এই স্তম্ভটির একটি অংশ থেকে ভূমির ওপর সমান্তরাল হয়ে ত্রিশটি পাথরে নির্মিত ব্যাসার্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। সমস্ত বস্তুটি জ্যোতির্বিদ্যার যে-কোন ছাত্রের কাছেই একটি দর্শনীয় বস্তু বলে মনে হবে।

আমরা অরসিকের দল, তাই যন্তর-মন্তরে শুধু ঘুরেই বেড়ালাম। উদ্যানে কি সুন্দর ফুলই না ফুটিয়েছে এরা। পাহারাদারকে মিনতি জানিয়ে আমার স্ত্রী কতকগুলি ফুল সংগ্রহ করলেন।

আমি হেসে বলি—'আবার ফুল সংগ্রহ করলে কেন? তোমার সঙ্গে একটি ত রয়েছেই।'

—'আমার সঙ্গে ফুল কই? তিনি চোখের দিকে চেয়ে হাসলেন।

—'ফুল নেই? তবে তোমরা স্ত্রীরা স্বামীদের যে হাঁদারাম বল। তার মানে কি fool নয়?'

আমরা দু'জনেই হাসলাম

দিল্লী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কালীবাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখলাম। এই চাঁদ কলকাতায় এমনি হাসছে। তিন-চারশ' বৎসর আগেও এমনি করে হাসত। হয়ত শত শত বৎসর পরেও এমনি করেই শান্তমধুর হাসির আলোয় পৃথিবীকে ভরিয়ে দেবে।

উত্তর ভারতে একটি প্রবাদ ছিল। দরিয়া, বাদল আর বাদশাহ—এই তিন একত্র হ'লেই নগরী গড়ে ওঠে। দরিয়া অর্থাৎ নদী, নদীর তীরে গড়ে উঠবে নগরী। বাদল অর্থাৎ বৃষ্টিদায়িনী মেঘ, ঝরঝর জলে ঢেলে জনপদ গড়ে উঠতে সহায়তা করবে। আর বাদশা থাকবেন ছড়ি ঘোরাতে। ছড়ি ঘুরিয়ে শাসন করবেন। এখন আর ও প্রবাদ খাটে না। এখন নগরী গড়ে ওঠে সম্পূর্ণ অন্য প্রয়োজনে। দুর্গাপুর, ভিলাই,...বোখারো এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

টাঙ্গা এসেছে। ইচ্ছে করেই ট্যাক্সি ডাকি নি। এখনও অনেক সময় হাতে। দিল্লী এক্সপ্রেস ছাড়ে দিল্লী ষ্টেশন থেকে—চার-পাঁচ মাইলের মত পথ। অনেক আগেই পৌঁছে যাব।

টাঙ্গা ছুটল। আকাশে মেটে জ্যোৎস্না। প্রশস্ত রাজপথের দু'পাশে সারি সারি আলো। লোকজনে কি একটা জায়গা যেন জমজমাট। একটি সিনেমা হলের সামনে কি প্রচণ্ড ভিড়।

দিল্লী এক্সপ্রেস গতি নিল। যমুনার পুলে উঠেছে গাড়ি। ঝমা ঝম্ ঝম্ ঝমা ঝম্ শব্দ। কে একজন ভদ্রলোক দু'হাতে প্রণাম জানাচ্ছেন।

ঘুমোতে ঘুমোতে ষ্টেশনগুলোর নাম শুনছি। গাজিয়াবাদ, আলিগড়,...তারপর কানপুর। বনমালাদির ওখানে আর যাওয়া হ'ল না। হাতে সময় কই? বিধবা হয়ে প্রফেসর স্বামীকে যেন নতুন করে ভালবাসছেন বনমালাদি। তাঁর নামে স্কুল গড়ছেন উত্তর প্রদেশের কোন এক আধা-শহরে। কিন্তু কত তাড়াতাড়ি দিন কাটছে। মনে হ'ল মফঃস্বল শহরে কবে যেন চাঁদা চাইতে গেলাম বনমালাদির বাড়ী। চোখ বুজে ভাবলেই মনে হয়, এই ত সেদিন। জীবন কি আশ্চর্য! কি ক্ষণস্থায়ী সময়—

দুপুরের দিকে একটা ছোট্ট ষ্টেশনে গাড়ি থামল। ...বিন্ধ্যাচল। শান্ত জনবিরল ষ্টেশনটি। অনেকদিন মনে থাকবে ওর নাম। জীবনে কলকোলাহলের চেয়ে স্তব্ধ অলস মুহূর্তগুলি অনেক বেশী মনে থাকে। বড় বড় বহু ষ্টেশনের নাম ভুলে যেতে পারি। কিন্তু কোন নির্জন দুপুরে পুরাণো দিনের ঝাঁপি খুললেই বিন্ধ্যাচল ষ্টেশনে গাড়ি দাঁড়ানোর কথা সবচেয়ে আগে ভেসে উঠবে মনে।

বিকেলের দিকে এল দিলদারনগর,...আরো। অনেক রাতে কখন যেন পেরিয়ে গেছি ঝাঁঝা, শিমুলতলা আর মধুপুর—। গাড়ী হাওড়া পৌঁছল পরদিন সকালে।

ঘরমুখো ট্যাক্সি ছুটেছে। দেহ ক্লান্ত, কিন্তু মন আরও অবসন্ন।

ট্যাক্সি থেকে নামতেই ছেলে ছুটে এসে বলল,—বাবা, দিল্লী থেকে কি এনেছ?'

ওকে কোলে নিয়ে হাসলাম শুধু। চার বছরের শিশু, এই ক'টা দিন মাকে ছেড়ে মনে মনে কত কি না ভেবেছে।

জিনিষপত্র ঘরে এল। ট্যাক্সি চলে গেছে। —রান্না-ঘরের সামনে থমকে দাঁড়িয়েছেন ভদ্রমহিলা। অগোছালো ঘর, বিলি-বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই পছন্দ হচ্ছে না। তবে নিশ্চুপ কেন?

আসলে তা নয়। এই ক'টা দিনের মধুর স্মৃতিকে মন থেকে মুছে ফেলে আবার রান্নাঘরে নিজেকে নিয়োগ করতে হবে ভাবলে প্রথমটা ত কষ্ট হবেই। তাই বিষণ্ণ হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। নিজেরা ফিরে এসেছি। মালপত্র, তল্পিতল্পা সব আমাদের সঙ্গেই হাজির। শুধু আসে নি তারা। সেই ক'টা দিন। দিল্লী আর আগ্রার পথে পথে যে মুহূর্তগুলি এক এক করে ঝরে পড়েছে। ভরিয়ে তুলেছে মন এক অনাস্বাদিত আনন্দে। কিন্তু তবু একটা সান্ত্বনা আছে। ঘরে না এলেও, মনে তাদের অবারিত দ্বার। নিত্য আনাগোনা। সুষমামণ্ডিত তাজ, ইৎমাতুদ্দৌল্লার ছবি, সেকেন্দ্রার গম্ভীর শান্ত রূপ আর লালকেল্লার নানা সুরম্য সৌধমালা।

দিন পেরিয়ে মাস। মাস জুড়ে জুড়ে বছর। সময়ের চাকায় বছরের আয়ু নিঃশেষ হয়। যৌবন ক্ষয়ে গিয়ে নেমে আসে বার্ধক্য—চাঞ্চল্যের স্থান কেটে নেয় শীতল স্থবিরতা। রোমাঞ্চ আর জাগে না প্রাণে,—অবসন্ন মন থেকে শুধু ধ্বনিত হয় যৌবনকে আবার ফিরে পাবার জন্য যযাতির করুণ প্রার্থনা।

সেই বার্ধক্যের দিনে আন্যান্য নানা সঞ্চিত স্মৃতির সঙ্গে এই পথের স্মৃতিগুলিও প্রতিফলিত হবে মনে। শীতলতা দূর করে সামান্য উত্তাপ তারা সঞ্চার করবে প্রাণে। চোখ বুজে ভাব, আগ্রার তাজ, যমুনাতীরের ইৎমাতুদ্দৌল্লা;.. লালকেল্লার দেওয়ানী খাস,…আগ্রার সেই বুড়ো টাঙ্গাওলা,…ট্রেণে আলাপ-হওয়া অধ্যাপক শর্মার গল্পগুলি।

…আবার নতুন করে ভালবাসব সেই দিনগুলিকে।… ভালবাসব পৃথিবীকে,…ভালবাসব নানা ধরনের মুহূর্তের মালা দিয়ে গড়া এই আশ্চর্য জীবনকে। আর সেই ভালবাসাই ত আসলে ভগবানকে ভালবাসা।

করুণাময়ের প্রতি হৃদয়ের অঞ্জলি।

কারণ, সেই দিনগুলি, এই পৃথিবী, জীবন-মৃত্যু সবই ত পরম কারুণিক ঈশ্বরেরই সৃষ্টি।

সমাপ্ত

মাষ্টারমশাই

সন্তোষকুমার অধিকারী

এক কিলো চাল দিতে পারো?
বৃদ্ধ মাষ্টার মশাই
ম্লান প্রার্থনায় এসে দাঁড়ালেন দুয়োরে সহসা।
কুণ্ঠিত, আজানুনত, দগ্ধ যেন শীর্ণ তালতরু;
সেই রূঢ় কণ্ঠ নেই; ভস্ম অবশেষ অঙ্গারের।
চকিত বিস্ময়ে শুধু স্তব্ধ হয়ে চেয়ে দেখলাম:
মাষ্টারমশাই প্রার্থী! শৈশবজীবনে জ্যোতিষ্মান
প্রদীপ্ত সূর্যকে জেনে আমি আজও দীপ্ত মনে মনে।
প্রবাল পাথরে সেই অবিচল তেজের স্মরণে
হৃদয়ে গোপন এক মণিকোঠা তুলেছি শ্রদ্ধায়।
আমি আজ ছাত্র নই, আমার পুত্রও নয়, দেহ
ভারগ্রস্ত ক্রমান্বয়ে। অন্যায়ে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে
চেতনা যন্ত্রণাম্লান। চারিদিকে পুঞ্জীভূত ক্লেদ
সহস্র বিচ্যুতি; তবু অম্লান দীপের একটি শিখা
জ্বালা ছিল এতদিন—সেই শিখা মাষ্টারমশাই।

দেখেছি দারিদ্র্য তাঁকে কোনদিন করেনি বিনত,
সত্যার্থী প্রতিজ্ঞাদৃঢ়, দীণতায় ক্ষমাহীন ঘৃণা
কঠোর কর্কশভাষী, প্রজ্জলন্ত, আজন্ম একক,—
ভস্মশেষ সেই অগ্নি, ভূমিলগ্ন বিন্ধ্যগিরিশির!
মনে পড়ে, একবার বিদ্যালয়ে জেলাশাসকের
পুত্র এল; অঙ্কে তার কোনদিন বুদ্ধিই খোলেনি।
শাসকসাহেব যিনি প্রেসিডেণ্ট স্কুলের—হঠাৎ
মাষ্টারমশায়ে ডেকে জানালেন—ছেলেটিকে তাঁর
অঙ্কে ফেল করানো চলবে না। সেদিন সোচ্চার কণ্ঠে
মাষ্টারমশাই শুধু বললেন—আমাকে বরং
এবার বিদায় দিন। মনে পড়ে—সেই দীর্ঘ দেহে
শক্তির দৃঢ়তা ছিল, দারিদ্র্যের দৃপ্ত অহঙ্কার;
বহুশ্রমে পারিনিক' তাঁর ঘরে কোন উপহার
কোন অর্থমূল্য দিতে; কে পারে সূর্যকে ঋণ দিতে?

অথচ এখন সেই বেদনার স্মৃতিবহ দিন
আর নেই। জাগ্রত স্বাধীন দেশে গুণী স্মরণের
নবলব্ধ প্রেরণায় আমরা মুখর। স্মরণীয়
নাম দিয়ে সাজিয়েছি সম্মানের রাজসিংহাসন
তবু ম্লান অন্ধকারে ভস্ম আচ্ছাদিত অগ্নিশিখা
শুধু আত্মদাহ আজ; প্রার্থনায় মৃত্যুর বিনয়
মাষ্টারমশাই নয়, এ'যন্ত্রণা বিক্ষত যুগের।

ঝরা পাতার সাথে

কৃতান্তনাথ বাগচী

একটি পাতা খসে গেল কোথায় কোন বনে
রাখবে কে বা মনে !
অরণ্য যে ডালে ডালে
বরণ ডালার প্রদীপ জ্বালে,
বসন্তে আজ ব্যাকুল বেণু
দখিন সমীরণে।

আমি যে ঐ নামহারানো ঝরা পাতার সাথে
যাব নিশীথ রাতে।
ভোরের আলো আসবে ছুটে,
বিচিত্র প্রাণ উঠবে ফুটে,
মোর পরিচয় মুছে যাবে
নীরব অজানাতে !

তবু আমার রইল শুধু একটি অভিমান
গেয়ে গেলাম গান।
জমিয়ে পাড়ি কলরবে
যখন তোমার সময় হবে
শুনবে আপন গভীর বুকে
পাতবে যখন কান।

"যা পেলেম—।"

হাসিরাশি দেবী

আমার এ দুঃসাহস এতকাল পেয়েছে প্রশ্রয়
তোমার হৃদয়-রাজ্যে,—অন্তরের স্নেহান্ধকারে,—
যেখানে নিদ্রিত চিত্ত লভেছে অকুণ্ঠ বরাভয়,—
লজ্জাহীন-দৃষ্টি মোর—সঙ্কোচবিহীন বারে বারে !

আমার স্পর্দ্ধিত মনে—মাটির শ্যামল দুর্ব্বাদল
দু'পায়ে দলন ক'রে—আকাশেরে চেয়েছে দু'হাতে,—
ঈশানের পুঞ্জ মেঘে ফিরে গেছে যেই অশ্রুজল,—
বিদ্যুতে দেখেছি তারে,—বর্ণহীন আর এক নিশাতে।

আমার এ দুরাকাঙ্ক্ষা লঙ্ঘন করেছে বারবার
তোমার প্রেমের গণ্ডি—ক্ষুদ্র আর তুচ্ছতর ভেবে,
দম্ভের রোষাক্ত দৃষ্টি আগুনে ক'রেছে ছারখার,—
তুমি ফিরে চ'লে গেছ অন্তরের বেদনারে চেপে।

আজ ভাবি—যাবে যদি, ক'রে গেলে কেন অসহায়,
যেখানে নিঃসঙ্গ মন—কঠিন পাথরে আছড়ায় !

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

কেন্দ্রীয় বাজেট—১৯৬৫-৬৬

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আয়কর এবং কর্পোরেশন ট্যাক্স

আমাদের দেশের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় কতকগুলি পরস্পরবিরোধী উপাদান দেখতে পাওয়া যায়। যথা, এক-দিকে ব্যক্তিগত আয়কর এবং কর্পোরেশনে ট্যাক্স বর্ত্তমানে এদেশে অত্যন্ত উঁচু, এমন কি ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রমুখ অনেক উন্নত দেশের তুলনায়ও বেশী। দেশের ব্যবসায়ী মহলের নেতৃগোষ্ঠী অভিযোগ করেন যে, এই কারণে মানুষের সঞ্চয় প্রবৃত্তি এবং নূতন ব্যবসায় বা শিল্প প্রযোজনায় লগ্নীর উৎসাহ দমিত হচ্ছে। অন্যদিকে এই উঁচু প্রত্যক্ষ করভার সত্ত্বেও দেশের বাজারে মূল্যমান ক্রমাগতই বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলেছে। সাধারণতঃ অতিরিক্ত অর্থবাহী বাজারে তার মূল্যমানের উপরে চাপ হাল্কা করবার অন্যতম উপায় হিসাবে ট্যাক্সের আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়া নিম্ন-মানের আয়কারীদের উপরে মূল্যবৃদ্ধি তাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিপন্ন করে তুলেছে। এই অবস্থায় এই মানের আয়কারীদের নীট ভোগ্য আয় কিছুটা না বাড়লে জীবনধারণ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। উচ্চতর মানের আয়কারীরাই সাধারণতঃ সঞ্চয় ও পুঁজি সৃষ্টিতে সহায়তা করে থাকেন। ট্যাক্সের প্রচণ্ড চাপে তাঁদের সঞ্চয় প্রবৃত্তি ব্যাহত হচ্ছে এ কথা অর্থমন্ত্রী নিজেও স্বীকার করেছেন। অথচ বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে পুঁজি সৃষ্টি ও লগ্নীর জন্য ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধির প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে সঞ্চয় প্রবৃত্তির উন্নতির ফলে ভোগচাহিদার আনুপাতিক সংযম ঘটানোও সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় এবং তার ফলে মূল্যমানের ওপরে ক্রমাগত যে অধিকতর চাপ সৃষ্টি হয়ে চলেছে সেটাও খানিকটা পরিমাণে এভাবে সংযত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। বস্তুতঃ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিদেশী ট্যাক্সবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কল্‌ডার সুপারিশ করেছিলেন যে, আয়করের হার প্রভূত পরিমাণে কমিয়ে দিয়ে ব্যয়কর প্রবর্ত্তন করে রাজস্বের প্রয়োজন মেটাবার আয়োজন করলে একদিকে উচ্চতর হারে সঞ্চয় তথা পুঁজি সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারে এবং অন্যদিকে আনুপাতিক পরিমাণে ভোগসঙ্কোচের দ্বারা মূল্যস্থিরতা সম্পাদিত হবার আশা করা যায়। অধ্যাপক কল্‌ডারের সুপারিশ পুরোপুরি গ্রহণ করা এখনই হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু এই দিকে রাজস্বের কাঠামো রচনায় একটি নূতন ধারার প্রবর্ত্তন সুরু হ'লে সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে উন্নয়নগতি মূল্যচাপের দ্বারা ব্যাহত হবে না এমনটি আশা করবার কারণ আছে।

নূতন বাজেটে অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী এরূপ একটি নূতন ধারা প্রবর্ত্তনের প্রয়াস করেছেন বলে দেখা যায়। ব্যক্তি-গত আয়করের ক্ষেত্রে তিনি করভোগ্য (taxable) সকল স্তরের আয়ের ওপরই করভার লাঘব করবার আয়োজন করেছেন। এর ধারা এবং পরিমাণ নিম্নোক্ত হিসাব থেকে বোঝা যাবে ; (বিবাহিত : ২টি নির্ভরশীল সন্তানসহ) :--

বার্ষিক আয়ের হার	এন্যুইটি ডিপোজিটের হার	সম্পূর্ণ অর্জ্জিত আয়ের (wholly earnd income) ওপর ট্যাক্সের পরিমাণ		সম্পূর্ণ অনার্জ্জিত আয়ের (wholly unearned income) ওপর ট্যাক্সের পরিমাণ	
		১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬	১০৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬
টাকা	টাকা পয়সা	টাকা পয়সা	টাকা পয়সা	টাকা পয়সা	টাকা পয়সা
৪,৫০০·০০		৩০·০০	১০·০০	৩০·০০	১০·০০
৫,০০০·০০		৬০·০০	৩৫·০০	৬০·০০	৩৫·০০
৭,০০০·০০		৩১০·০০	২৮৫·০০	৩১০·০০	২৮৫·০০
১০,০০০·০০		৬৮৫·০০	৫৩৫·০০	৬৮৫·০০	৫৩৫·০০
১২,৫০০·০০		১,০৬০·০০	৯১০·০০	১,১৯২·০০	৯১০·০০
১৫,০০০·০০		১,৫৬০·০০	১,২৮৫·০০	১,৭৫৫·০০	১,২৮৫·০০
২০,০০০·০০	১,০০·০০	২,৩৬০·০০	২,০৮৫·০০	২,৬৫৫·০০	২,২৪৫·০০
২৫,০০০·০০	১,৮৮০·০০	৩,৮৩২·০০	৩,২২১·০০	৪,৩১১·০০	৩,৬০৮·২০
৪০,০০০·০০	৩,০০০·০০	১০,৩৪০·০০	৯,২৮৫·০০	১১,৮৯১·০০	১০,৮৮৫·০০
৭০,০০০·০০	৭,০০০·০০	২৬,৫৯০·০০	২৩,৫৮৫·০০	৩০,৫৭৮·৫০	২৮,৪৩৫·০০
১,০০,০০০·০০	১২,৫০০·০০	৪৪,৬১৫·০০	৩৯,১৬০·০০	৫২,৪২২·৬২	৪৭,৯০৩·৭৫
২,০০,০০০·০০	২৫,০০০·০০	১,১৫,৮৬৫·০০	৯৮,৪৭২·৫০	১,২৯,৫৩২·০০	১,১৮,৯৯৭·৫০

উপরোক্ত হিসাব থেকে দেখা যাবে যে, প্রথমতঃ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় অর্জ্জিত ও অনার্জ্জিত আয়ের ট্যাক্স সমতার পরিধি এবার আরও দুটি ধাপ বাড়িয়ে দিয়ে বার্ষিক ১৫,০০০ হাজার টাকা আয় পর্য্যন্ত সমান করে দেওয়া হয়েছে। এর পরের স্তরগুলিতে অর্জ্জিত আয়ের তুলনায় অনার্জ্জিত আয়ের ওপর ট্যাক্সের হার গত বছর যথাক্রমে ছিল—বার্ষিক ২০,০০০৲ হাজার টাকা আয়ের ওপর ১১·১% বেশী; ৪০,০০০৲ হাজার ও ৭০,০০০৲ হাজার টাকা আয়ের ওপর ১৩% বেশী; ১,০০,০০০৲ লক্ষ টাকা আয়ের ওপর ১৪·৯% বেশী এবং ২,০০,০০০৲ লক্ষ ও তদুর্দ্ধ আয়ের ওপর ১০·৫% বেশী। বর্ত্তমানে এই তারতম্যের হার হ'ল যথাক্রমে ৭·১%, ১০·৭%, ১৬·৯%, ১৮·২% এবং ১৭·১% বেশী। মূলনীতির দিক থেকে বর্ত্তমান হারটি বেশী সমীচীন হয়েছে একথা উল্লেখ করা বাহুল্য।

বর্ত্তমান বাজেটে ব্যক্তিগত আয়করের ধারায় আর একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করা হয়েছে। প্রথমতঃ এ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত আয়করের প্রয়োগটি গভীর জটিলতাদোষ দুষ্ট ছিল। অর্থমন্ত্রী এর কাঠামোটিকে এবার যথাসম্ভব সহজ ও সরল করে দেবার প্রয়াস করেছেন। এর ফলে রাজস্বের পরিমাণ এই খাতে অল্পদিনের জন্য খানিকটা খর্ব্ব হবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু এর প্রয়োগ অনেক বেশী বাধাহীন হবে বলে মনে করা যায়। তা ছাড়া বর্ত্তমানের ট্যাক্স মকুবের প্রাথমিক পরিমাণটিকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করে প্রতি করদাতার ব্যক্তিগত ভাতা হিসাবে বার্ষিক ২,০০০ হাজার টাকা, বিবাহিত হ'লে স্ত্রীর জন্য অতিরিক্ত ১,৫০০ টাকা এবং দুইটি নির্ভরশীল (dependent) সন্তান পর্য্যন্ত প্রতি সন্তানের জন্য বার্ষিক ৪০০ টাকা ট্যাক্স থেকে মাপ পাবে। এর ফলে দুইটি কাজ হবে; একদিকে অবিবাহিত কিন্তু উপার্জ্জনশীল স্ত্রী-পুরুষের উপর যে অন্যায় ট্যাক্স প্রয়োগ চলছিল সেটি বন্ধ হবে। এর ফলটি নিম্নলিখিত রূপ দাঁড়াবে:

১। অবিবাহিত ব্যক্তির আয় অনুযায়ী যত ট্যাক্স দেয় হবে তার থেকে তাঁরা মোট ১০০ টাকা মাপ পাবেন।

২। সন্তানহীন বিবাহিত ব্যক্তির আয় অনুযায়ী

যতটা মোট ট্যাক্স দেয় হবে, তার থেকে তাঁরা মোট ১৭৫ টাকা মাপ পাবেন।

৩। একটি নির্ভরশীল সন্তানসহ বিবাহিত ব্যক্তিরা আয় অনুযায়ী মোট ট্যাক্স থেকে ১৯৫ টাকা মাপ পাবেন।

৪। দুই বা তদুর্দ্ধ সংখ্যার নির্ভরশীল সন্তানসহ বিবাহিত ব্যক্তিরা আয় অনুযায়ী দেয় ট্যাক্স থেকে মোট ২১৫ টাকা মাপ পাবেন।

এই পরিবর্তনটির ফলে বর্ত্তমান বৎসরে অনুমিত আয়কর রাজস্ব থেকেআন্দাজ ৩·৬৩ কোটি টাকা কমে যাবে বলে হিসাব করা হয়েছে।

আর একটি বিশেষ পরিবর্ত্তনও সঙ্গে সঙ্গে সাধন করা হয়েছে। জীবনবীমার চাঁদা, প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের দেয়, নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বার্ষিক সঞ্চয় (cumulative time deposit) ইত্যাদি যে-সকল দায়ের উপর আয়কর থেকে মাপ পাবার ব্যবস্থা ছিল তার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ এবার বার্ষিক ১০,০০০ হাজার টাকা থেকে ১২,৫০০ টাকায় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তা'ছাড়া এই মাপের পরিমাণের হিসাব সরল করবার উদ্দেশ্যে এই সকল খাতে দেয় অর্থের অর্দ্ধেক পরিমাণ আয়কারীর আয় থেকে বাদ দিয়ে ট্যাক্সের হিসাব করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিবন্ধক (handicapped) নির্ভরশীলদের প্রতিষ্ঠানমূলক (institutional) যত্নের প্রয়োজনে বার্ষিক ২,৪০০ টাকা পর্য্যন্ত এবং অন্যভাবে যত্নের আয়োজন হ'লে ৬০০ টাকা পর্য্যন্ত আয় ট্যাক্স থেকে মাপ পাবে।

দেখা যাচ্ছে যে, মূল ট্যাক্সের হারের উচ্চতম স্তর বার্ষিক ৭০,০০০ হাজার থেকে ১,০০,০০০ লক্ষ টাকা আয়ে পৌছাবে। এই স্তরে গড়পড়তা ট্যাক্সের হার (অনার্জ্জিত আয়ের ওপরে) দাঁড়াবে আয়ের ৬৫% মতন। তা ছাড়া অর্জ্জিত আয়ের ওপর সারচার্জ্জ ১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকার আয়ে পরিবর্ত্তন করে ৫% ধার্য্য করা হয়েছে ; ২ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ পর্য্যন্ত ১০% এবং ৩ লক্ষ টাকার ওপরে আয়ে ১৫% ধার্য্য করা হয়েছে। অনার্জ্জিত আয়ের ওপর সারচার্জ্জ ১৫,০০০ থেকে ৫০,০০০ হাজার টাকা আয়ে ২০% এবং ৫০,০০০ হাজার টাকার বেশী আয়ের ওপরে ২৫% ধার্য্য করা হয়েছে। অন্যদিকে ১৫,০০০ হাজার টাকা আয় পর্য্যন্ত অনার্জ্জিত আয়ের ওপরে সারচার্জ্জ তুলে দেওয়া হয়েছে।

আয়কর কাঠামোর বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের ফলে অনার্জ্জিত আয়ের ওপর সর্ব্বোচ্চ ট্যাক্সের হার পূর্ব্বের ৮৮·১২৫% থেকে কমে ৮১·২৫% দাঁড়াবে এবং অর্জ্জিত আয়ের ওপর এর হার পূর্ব্বের ৮২·৫% থেকে কমে দাঁড়াবে ৭৪·৭৫%।

উপরোক্ত রদবদলের ফলে ব্যক্তিগত আয়করের পরিমাণ বেশ খানিকটা কম হওয়া সত্ত্বেও এখনও এদেশে এইটি অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় উচ্চতরই থেকে যাবে। কিন্তু উদ্ধতর আয়ের ক্ষেত্রে একই আয়-স্তরে উন্নত দেশসমূহের তুলনায় এদেশে যে আপেক্ষিক আর্থিক সঙ্গতি ও শক্তি সূচীত করে তা সে সকল দেশের তুলনায় অনেক পরিমাণে বেশী। যথা, এদেশে বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা আয় মানে ইংলণ্ডে বর্ত্তমান বিনিময় হারে দাঁড়ায় মোটামুটি ৭০০০ পাউণ্ড। ঐ দেশের এটাই সাধারণ উচ্চ-মধ্যবিত্তের আয়ের মোটামুটি স্তর কিন্তু তুলনায় এদেশে বার্ষিক ১৫,০০০ হাজার থেকে ২০,০০০ হাজার টাকাই সাধারণ উচ্চ-মধ্যবিত্তের আয়ের মান, বার্ষিক ১০০,০০০ লক্ষ টাকা আয়ের অধিকারীদের ধনী বলে এবং অসীম আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করা হয়। অতএব উন্নত দেশসমূহের তুলনায় একটা নির্দ্দিষ্ট স্তরের সম্পর্কে আয়ের ওপর অধিকতর পরিমাণে ট্যাক্সের চাপ অন্যায় বলে গণ্য করা চলে না। মোটামুটি বর্ত্তমান বাজেট প্রস্তাবগুলি এ সম্পর্কে কল্যাণসূচক বলেই গণ্য করা চলে।

কর্পোরেট ট্যাক্স

ব্যবসায়ী মহলে গত কয়েক বৎসর ধরেই কর্পোরেট ট্যাক্স সম্বন্ধে আন্দোলন চলে আসছে। তাঁরা অভিযোগ করেন যে, এই প্রচণ্ড ট্যাক্সের ফলে বেসরকারী এলাকায় নূতন শিল্পসৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, পুঁজি সৃষ্টির ধারা মন্দীভূত হয়ে আসছে এবং এদেশের শিল্পে বিদেশী পুঁজি-লগ্নী ব্যাহত হচ্ছে। বর্ত্তমান বাজেটে এই সকল অভিযোগ নিরসন করবার প্রয়াসে কতকগুলি আয়োজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী মনে করেন এই ক্ষেত্রে ট্যাক্স কাঠামোটি মূলতঃ সুস্থ ও বলিষ্ঠ, কিন্তু কোন কোন দিকে খানিকটা রদবদলের আবশ্যক আছে। যথা, মুনাফাকর (Divident Tax) নিয়ে বিস্তৃত আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু তিনি মনে করেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় মুনাফা বণ্টন সংযত করবার প্রয়োজন আছে। অনুরূপ কারণে সার-

ট্যাক্স তুলে দিতেও তিনি রাজী নন। কিন্তু সাধারণতঃ কর্পোরেট ট্যাক্সের ক্ষেত্রে তিনি খানিকটা পরিবর্ত্তন সাধন করেছেন।

প্রথমতঃ, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পণ্য-উৎপাদক শিল্পগুলিকে যে ট্যাক্স মাপ করবার নীতি গৃহীত ছিল সেটিকে আরও বিস্তৃত করে আরও কতকগুলি নূতন পণ্যকে এই সুবিধার অধিকারী হবে বলে ঘোষণা করা হবে। তা ছাড়া যে-সকল কোম্পানীগুলি খনিজ উৎপাদন, বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি শিল্পে নিযুক্ত এবং যাঁদের বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার অধিক নয়, তাঁদের উপরে আয়ের প্রথম ২লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ৫০% হারে ট্যাক্স ধার্য্য করা হ'ত। বর্ত্তমানে বিদেশী সংগঠন ব্যতীত এ সকল শিল্পে নিযুক্ত সকল কোম্পানীর ওপরে আয়ের প্রথম ১০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ৫০% হিসাবে ট্যাক্স ধার্য্য করা হবে। এই ধরনের আরও কতকগুলি পরিবর্ত্তন নূতন বাজেটে প্রস্তাবিত হয়েছে।

যে-সকল কোম্পানী ভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত শিল্প সংগঠন প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তাঁদের জমী বা বাড়ী বিক্রয়ের মুনাফার টাকা লগ্নী করবেন তাঁদের ওপর অতিরিক্ত পুঁজি ট্যাক্স (Capital Gains Tax) মাপ করা হবে; সংগঠনের কর্ম্মীদের জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণের টাকাও এই সুবিধা পাবে।

ডেভেলপম্যান্ট রিবেটের কিছু রদবদল প্রস্তাবিত হয়েছে। এর বর্ত্তমান সাধারণ হার ২০% কিন্তু কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে (আয়কর আইনের একটি নূতন ৫ম সিডিউলে এসকল শিল্পগুলি নথীভুক্ত করা হবে) সেটি কমিয়ে ১৫% করা হবে কিন্তু কয়লাখনির যন্ত্রাদি উৎপাদকদের এবং জাহাজ-নির্ম্মাতাদের ক্ষেত্রে এর হার পূর্ব্ববৎই যথাক্রমে ৩৫% এবং ৪০% থাকবে। কিন্তু যে সকল পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত শিল্প বর্ত্তমান ২০% হারে ডেভেলপমেণ্ট রিবেট পাচ্ছিল, তাদের ক্ষেত্রে এই বর্ত্তমান হারই ১৯৬৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকবে।

কোম্পানীর আয়করের ক্ষেত্রে করের হার সর্ব্বোচ্চ স্তরে ৭০%-এ বেঁধে দেওয়া হ'ল। উৎপাদন বৃদ্ধি-কল্পে কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্কের দায় অতিরিক্ত উৎপাদনের ওপর ২৫% পর্য্যন্ত মাপ করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অতিরিক্ত উৎপাদনজনিত ট্যাক্স ও সারট্যাক্স বৃদ্ধির পরিমাণের ২০% পর্য্যন্ত মাপ করা হবে। এ-সকল মাপ-করা অর্থের নির্দ্দেশক অঙ্কের ট্যাক্স ক্রেডিট সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট শিল্প সংস্থাগুলিকে দেওয়া হবে। এর দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যয় সঙ্কুলান, দেনা শোধ ইত্যাদি করতে পারবেন। এ ছাড়া আরও কতকগুলি ক্ষেত্রেও সুবিধা দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিদেশী কুশলী

বিদেশী কুশলীদের এদেশের শিল্পে নিযুক্ত করলে (অবশ্য সরকারী অনুমোদন নিয়ে), তাদের ক্ষেত্রে আয়কর থেকে কিছুটা অব্যাহতি দেবার পূর্ব্ব থেকেই বিধি ছিল। প্রথম তিন বৎসরের জন্য এই অব্যাহতি দেবার বিধি আছে এবং পরে আরও দুই বৎসরের জন্য এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘতর কালের জন্য এসকল কুশলীদের সহায়তা প্রয়োজন হয়, সেই কারণে দুই বৎসরের বর্দ্ধিত দ্বিতীয় দফার মেয়াদের পরও আবার সরকারী অনুমোদন নিয়ে এর মেয়াদ আরও অতিরিক্ত তিন বৎসরের জন্য বাড়াতে পারা যাবে।

এই অতিরিক্ত সুবিধাটি সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রশ্ন আছে। সেটি এই যে, বিদেশী কুশলী নামধারী যে সকল ব্যক্তিরা ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত আছেন, তাঁরা সত্যকার কুশলী কি না সে-বিষয়ে একটা বিশেষ অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে দেশী বা বিদেশী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করবার স্বাধীনতা শিল্প-মালিকের, তাতে হয়ত সরকারী হস্তক্ষেপের অবকাশ নাই। কিন্তু ট্যাক্স মকুব পাওয়া বা এদেশে রোজগার-করা অর্থ দেশের বাহিরে প্রেরণ করবার যে-সকল সর্ত্ত এঁরা ভোগ করে থাকেন সে-সম্বন্ধে সরকারী দায়িত্ব স্পষ্ট ও অনস্বীকরণীয়। এ সকল সুবিধা পেতে গেলে কতকগুলি সর্ত্ত নিতান্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ, দেশে পাওয়া সম্ভব নয় শুধু এমন সব বিদেশী শিল্পকৌশল বিশেষজ্ঞরাই এ-সকল সুবিধার অধিকার দাবি করতে পারবেন বলে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, এও একটি জরুরী সর্ত্ত হওয়া দরকার যে, বিদেশ থেকে আমদানী-করা কুশলীদের তাঁদের নিজ নিজ বিশিষ্ট কৌশলের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন কাজে তাঁদের নিযুক্ত করা হবে না। আমরা অনেক উদাহরণ জানি যে সকল ক্ষেত্রে কোন একটি বিশেষ কাজের জন্য লোক আমদানী

করে পরে তাঁদের অন্য কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে, যে-সব কাজে এঁদের কোন বিশেষ বিশেষজ্ঞ-কৌশল বা অভিজ্ঞতার অধিকার ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা বিদেশী কোন কর্ম্মচারীকে এদেশের সরকারী বা বেসরকারী শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির সাধারণ পরিচালনার দায়িত্ব দেবার কোনই সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। সরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলিতে যাতে এ ধরনের কাজে বিদেশী কর্ম্মচারী নিযুক্ত না করা হয় এরূপ নীতি অবিলম্বে অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন। বেসরকারী মালিকানায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে এরূপ নীতি সরাসরি প্রবর্ত্তন করা হয়ত মালিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংবিধানগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে এবং সেই কারণে সেটা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সে-সকল ক্ষেত্রে আয়কর থেকে অব্যাহতি পাওয়া এবং এদেশে অর্জ্জিত অর্থের নির্দ্দিষ্ট অংশ বিদেশে প্রেরণ করবার যে-সকল সুবিধাগুলি বিদেশী কুশলীদের দেওয়া হয়, সেগুলি থেকে এঁদের বঞ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি।

বস্তুতঃ এদেশে লগ্নীর জন্য বিদেশী পুঁজি আকৃষ্ট করবার তাগিদে এ সকল বিষয়ে সরকার পক্ষে একটা গভীর ঔদাসীন্যের লক্ষণ দেখা যায়। সেই কারণেই হয়ত বিদেশী কুশলীদের সম্পর্কে যে-সকল সুবিধাদানের বিধি প্রচলিত রয়েছে, সেগুলি এদেশে নিযুক্ত কুশলী বা অকুশলী সকল বিদেশীদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে কোন সঙ্গত বাধাদানের চেষ্টা ত হয়ই নাই; বরং প্রশ্নটি এতাবৎ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই চলা হয়েছে। এর ফলে এদেশে বিদেশী পুঁজি লগ্নীর পরিমাণ যে কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে কিংবা তার লক্ষণ দেখা গেছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে কুশলী নামধারী বিদেশ থেকে আমদানী-করা অসংখ্য ব্যক্তি ভারতের সরকারী ও বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের উচ্চতর স্থানগুলিতে এমন মৌরসী পাট্টা নিয়ে বসে গেছেন যে, দেশের সত্যকার কুশলী ও দক্ষ ব্যক্তিরা তুলনায় অবহেলিত ও অপমানিত বোধ করছেন। কিছুকাল আগে সঙ্কলিত একটি সরকারী হিসাবে অনুমান করা হয়েছে যে,ন্যূনাধিক অন্ততঃ দশ হাজার ভারতীয় কুশলী বিদেশের নানা শিল্পক্ষেত্রে নানারকম দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত আছেন। এঁদের স্বদেশে ফিরিয়ে এনে দেশের শিল্প-সৃষ্টির কাজে লাগানোর একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা সরকার পক্ষ থেকেও বারংবার স্বীকৃত হয়েছে কিন্তু সেই সম্পর্কে গত কয়েক বৎসরে কোন বিশেষ উন্নতি যে সাধিত হয়েছে এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বস্তুতঃ এ-সকল ভারতীয় শিল্পকুশলীরা দেশে ফিরে আসবার জন্য কোন ব্যগ্রতা দেখান ত নাই-ই; বরং প্রতি বৎসর দেশ থেকে আরও নূতন নূতন লোক বিদেশে কর্ম্মসংস্থানের চেষ্টা অনবরতই করে চলেছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এর একটা প্রধান কারণ যে এঁরা এদেশের তুলনায় বিদেশে উন্নত প্রণালীর আধুনিক জীবনযাত্রায় একবার অভ্যস্ত হয়ে পড়ে আর স্বদেশের অপেক্ষাকৃত মধ্যযুগীয় জীবনপ্রণালীর মধ্যে ফিরে আসতে দ্বিধা বোধ করছেন। একথা হয়ত খানিকটা সত্য হ'তেও পারে। কিন্তু আসল কারণ সেটি যে নয় তার অনেক প্রমাণ আমরা জানি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এঁরা জানেন যে, দেশে ফিরে এলে সরকারের বিশেষ অনুগ্রহপুষ্ট কিন্তু সত্যকার অনেক নিকৃষ্ট মানের বিদেশী কুশলী বা তথাকথিত কুশলীদের আজ্ঞাধীন হয়ে এঁদের চলতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে এমনও ঘটেছে যে, ভারতীয় কুশলী বিদেশে তাঁরই নিজের আজ্ঞাধীন বিদেশী কর্ম্মচারীর অধীনে স্বদেশে ফিরে এসে চাকরি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। স্বভাবতঃই এসকল ভারতীয়েরা পুনর্ব্বার বিদেশে ফিরে যাবার সুযোগ খুঁজে আবার দেশ থেকে পলায়ন করে থাকেন।

আমরা মনে করি এ বিষয়ে একটা বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন। যে-সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভারতীয় কুশলীর অভাব রয়েছে, শুধু সে-সকল ক্ষেত্রেই—যত মূল্যই দিতে হউক না কেন তা স্বীকার করে—নির্দ্দিষ্ট কিন্তু পরিমিত সময়ের জন্য বিদেশী কুশলী আমদানী করা উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে, যে বিশিষ্ট কৌশলের অভাব পূরণের জন্য এঁদের আমদানী করা হচ্ছে সে-বিষয়ে এঁদের সত্যকার জ্ঞান ও প্রয়োগ কৌশলের অভিজ্ঞতা আছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের জানা একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন একটি বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাঁদের কাঁচামালের খনিগুলির একটিতে যন্ত্রীকরণের (mechanization) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁদের অধিকারভুক্ত বিভিন্ন খনির কোনটিতে এইরূপ যন্ত্রীকরণের উপযুক্ত পরিমাণ মাল ভূগর্ভে মজুত ছিল

তার একটা হিসাব করবার জন্য কয়েকটি বিদেশী আমদানী করা হয়। বৎসরাধিক কাল ধরে এদেশে মোটা বেতন ও অন্যান্য সুবিধা উপভোগ করবার পর দেখা যায় যে, উদ্দিষ্ট কাজের কিছুই এঁরা সম্পন্ন করতে পারেন নাই। তখন জানা গেল যে, এই কাজের জন্য উপযুক্ত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা কোনটাই এঁদের নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে এঁরা যে কেবল মোটা বেতন ও আনুষঙ্গিক সুবিধা উপভোগ করেছেন তাই নয়, দেশের রাজস্বও কিছুটা পরিমাণে বঞ্চিত হয়েছে এবং খানিকটা পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাও এঁদের জন্য বিদেশে চলে গিয়েছে। এরকম ঘটনা যে আরও ঘটে নাই বা এখনও ঘটছে না সেরূপ মনে করবার মত নিশ্চিত তথ্য জানা নেই। বরং আমাদের জানা আরও উদাহরণ আছে, যে সকল ক্ষেত্রে ঠিক উপরোক্ত ঘটনার মতন এতটা না হ'লেও প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থা অন্যান্য ক্ষেত্রে আজও চলে আসছে। আমরা মনে করি বিদেশী কুশলী আমদানী করবার সময় প্রতিটি ক্ষেত্রে গুণাগুণ, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা এবং নির্দ্দিষ্ট শিল্পে এঁদের কৌশলের সহায়তা কতটা এবং কতদিনের জন্য প্রয়োজন এ-সকল বিশদভাবে বিচার করে তবেই ট্যাক্সঅব্যাহতি বা বিদেশে অর্থপ্রেরণের সুবিধাগুলির সর্ত্ত স্বীকার করা উচিত। এবং প্রতিক্ষেত্রেই উপযুক্ত ভারতীয় কুশলী পাওয়া গেলে এ-সকল সর্ত্ত সরাসরি অস্বীকার করা প্রয়োজন। এবিষয়ে সরকারের এবং বিশেষ করে অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি অবিলম্বে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

ব্যবসায়ী মহলে বাজেটের প্রতিক্রিয়া

ব্যবসায়ী মহলে এ বৎসরের নূতন বাজেটের প্রতিক্রিয়া আশানুরূপ উৎসাহের সৃষ্টি যে করে নাই সেটি খুবই স্পষ্ট। ব্যবসায়ীগোষ্ঠী মনে করেন যে, যেটুকু সুবিধা ট্যাক্স সম্বন্ধে তাঁদের দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে তার ফলে পুঁজির বাজারে উপযুক্ত পরিমাণ ভরসা (Confidence) বা শক্তি সঞ্চার করা সম্ভব হবে না। ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে ট্যাক্স মকুবের পরিমাণ খানিকটা বেশী অবশ্যই হয়েছে কিন্তু তার ফলে যতটুকু সঞ্চয়বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা ছিল তার অনেকটাই এন্যুইটি ডিপোজিটের ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ চালু থাকবার ফলে অংশতঃ সঙ্কুচিত হয়ে যাবে এবং বাকীটা মূল্যবৃদ্ধিতে খেয়ে যাবে। ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে সরকার বৎসরে ৫৫-৬০ কোটি টাকার মতন বাজেয়াপ্ত করে নিচ্ছেন। এই সঞ্চয় থেকেই সাধারণতঃ বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে লগ্নীর পুঁজি সংগৃহীত হ'ত। এন্যুইটি ডিপোজিটের অর্থ যখন কিস্তি হিসাবে সরকার প্রত্যর্পণ করবেন তখন অবশ্য সেটুকু লগ্নীতে নিয়োজিত করা সম্ভব কিন্তু আগামী এক বৎসরের মধ্যে এই খাতে কোন অর্থ পাবার সম্ভাবনা নাই। তা ছাড়া কিস্তির টাকার খানিকটা অন্ততঃ যে ভোগব্যয়ে খরচ হয়ে যাবে সে-বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই।

অর্থমন্ত্রী—ব্যবসায়ীগোষ্ঠীরা বলেন—একদিকে স্বীকার করছেন যে, সঞ্চয় ও লগ্নীর উৎসাহ বৃদ্ধি করা এবং ব্যবসায় সংগঠনগুলির যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়া উন্নয়নের জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং অন্যদিকে মুনাফাকর চালু রেখে এই উৎসাহ সঞ্চার দমন করবার আয়োজন করেছেন। অন্যদিকে ব্যাঙ্ক রেট ৬%-এ বাড়িয়ে দিয়ে ব্যাঙ্ক আমানতের সুদের হার আনুপাতিক পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছেন। কোম্পানীর প্রেফারেন্স শেয়ারে লগ্নী করলে ৭% থেকে ৮% মুনাফা পাওয়া যায়, ডিবেঞ্চারে ৬—৭%। ব্যাঙ্কে আমানতী সুদের হার এখন ৭% থেকে ৯%-এ উঠেছে। এই অবস্থায় লগ্নীকারক কেন কোম্পানীর শেয়ারে তার অর্থ লগ্নী করবার ঝুঁকি নিতে চাইবে? প্রেফারেন্স শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের উপর কোন কর ধার্য্য করা নেই, কিন্তু নূতন কোম্পানী ব্যতীত সাধারণ শেয়ারের উপর ৬% মুনাফা লাভ হ'লেই মুনাফাকর দিতে হয়। এই করটি মকুব করে দিলে তার ফলে মূল্যবৃদ্ধিতে সহায়তা করবে অর্থমন্ত্রীর এরূপ মনে করবারও কোন সঙ্গত কারণ নেই। মুনাফাকরটি তুলে দিলে এর দরুন রাজস্ব ঘাটতি আন্দাজ বার্ষিক ১০ কোটি টাকার মতন হবার কথা। এই যৎসামান্য অর্থের দ্বারা মূল্যমানের ওপর চাপ সৃষ্টির আশঙ্কা অমূলক। অন্য পক্ষে এই করটি প্রত্যাহার করলে পুঁজি বাজারে একটা যে আগ্রহের সৃষ্টি হ'ত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বরং লগ্নীর স্বপক্ষে এই নূতন আগ্রহ মূল্যমানে খানিকটা পরিমাণে সংযম প্রভাবিত করিবার আশাই ছিল বেশী। বর্ত্তমান অবস্থায়, ব্যবসায়ী মহল মনে করেন, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি বেশী করে প্রেফারেন্স শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের দ্বারা তাঁদের

পুঁজির প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করবেন বলে আশঙ্কা করা যায়। বর্ত্তমানের চড়া সুদের বাজারে কমপক্ষে ১০% মুনাফার প্রতিশ্রুতি না দিলে প্রেফারেন্স শেয়ার দিয়ে পুঁজি সংগ্রহ সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এত উচ্চহারে মুনাফা দেবার প্রতিশ্রুতির বোঝা শিল্পব্যবসায়ের ওপর বড়ই ভারী হয়ে পড়বে। তা ছাড়া একুইটি শেয়ার-ক্রেতাদের প্রতি এর দ্বারা অবিচার করা হবে। অন্য পক্ষে প্রেফারেন্স মুনাফা (dividend) ব্যবসায়ের মুনাফা থেকে রাজস্বের দায় মিটিয়ে তবে দিতে হয়। ডিবেঞ্চারের ওপর সুদ বা ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য অর্থপ্রতিষ্ঠান থেকে ধার-করা পুঁজির ওপর সুদ ব্যবসায়ের মুনাফা থেকে বাদ দিয়ে তবে ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়। এ অবস্থায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি যে অধিকতর পরিমাণে ডিবেঞ্চার ও অন্য ঋণের দ্বারা তাঁদের পুঁজির প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করবেন এ বিষয়ে সন্দেহ কি? এ ভাবে একদিকে যেমন একুইটি পুঁজির ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান-গুলির ওপর সংযমের প্রভাব নষ্ট হবার আশঙ্কা, অন্যদিকে দক্ষতা ও উচ্চহারে উৎপাদনশীলতাও ব্যাহত হবার আশঙ্কা অমূলক নয়। তা ছাড়া এইরূপ ছক অনুসরণ করে যদি দেশের শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রসার লাভ করতে থাকে তবে একটা সক্রিয় (dynamic) গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা (democratic society) গড়ে ওঠবার পথেও অলঙ্ঘনীয় বাধা সৃষ্টি হবে। কেননা এই ভাবে মুষ্টিমেয় সংখ্যক পুঁজিপতিদের হাতে আরও বেশী করে আর্থিক শক্তি সংহতি সহজ হয়ে উঠবে।

এই ভাবেই পুঁজিবৃদ্ধি (capital gains) ট্যাক্স ও বোনাস শেয়ারের উপর ট্যাক্স উন্নয়নবিরোধী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে চলেছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, বর্ত্তমান চড়া সুদের বাজারের অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া হিসাবেই বর্তমানে একুইটি শেয়ারের বাজার এতটা মন্দা হয়ে পড়েছে। তাঁরা মনে করেন যে, বর্ত্তমানের উঁচু ব্যাঙ্ক রেট এবং তজ্জনিত উঁচু সুদের হারের ফলে একুইটির বাজারে মন্দাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই কারণে তাঁরা প্রস্তাব করেন যে, বর্ত্তমান অর্থনীতির (monetary policy) অবিলম্বে সংশোধন সাধন প্রয়োজন। সঞ্চয়বৃদ্ধি এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় প্রতিরোধে উচ্চ অর্থমূল্যের যথার্থ ভূমিকা সম্বন্ধে এঁরা যথেষ্ট সচেতন নন বলে আশঙ্কা হয়। উচ্চ অর্থমূল্যনীতির (dear money policy) পরিপূরক হিসাবে একুইটি শেয়ারের মুনাফাবৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজনীয়তার কোন সঙ্গত কারণ নেই। অন্যান্য দেশে উচ্চ অর্থমূল্য অবস্থা সত্ত্বেও এবং একুইটি শেয়ারের মুনাফা অনুপাতে বৃদ্ধি না পাওয়া সত্ত্বেও সে সব শেয়ারগুলির বাজার মূল্যে মন্দা ঘটে নি দেখা গেছে। জাপান, ইংলণ্ড, পশ্চিম জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশী বার এবং অনেক উচ্চতর ব্যাঙ্ক রেট প্রবর্ত্তিত হয়েছে, কিন্তু তার ফলে আমাদের দেশের মতন একুইটি শেয়ারের মূল্যে মন্দা ঘটে নি। অনেক ক্ষেত্রেই উঁচু হারের সুদ ও নিম্নহারে একুইটি শেয়ারের ডিভিডেণ্ডের সহাবস্থান সহজ ও স্বাভাবিক দেখা গেছে। এর প্রধান কারণ সম্ভবতঃ ঐ সকল দেশে ব্যবসায়ের উপর রাজস্বের চাপ আমাদের দেশের তুলনায় অনেক হাল্কা। তা ছাড়া ঐ সব দেশের অর্থনীতি একুইটি মূল্যের পরিপন্থী নয়। লগ্নীকারকরা সাধারণতঃ নির্দিষ্ট মুনাফায় লগ্নীর চেয়ে একুইটিই বেশী পছন্দ করেন ভবিষ্যতে উচ্চতর মুনাফা ও পুঁজিবৃদ্ধির আশায়। কিন্তু এই আশা যদি নষ্ট করে দেওয়া হয় তবে একুইটির প্রতি টানও অনুপাতে কমে যায়। আমাদের দেশে একইটি শেয়ারের ডিভিডেণ্ড নির্দিষ্ট হারের চেয়ে বেশী হ'লে তার উপর ট্যাক্স দিতে হয়; যখন মুনাফার একটা অংশ সঞ্চয় করে পুঁজির সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তখন সেই অতিরিক্ত পুঁজির উপরেও ট্যাক্স দিতে হয়। তা ছাড়া যে-সকল অংশীদাররা এর ফলে বোনাস শেয়ার পেয়ে থাকেন তখন এই পুঁজিবৃদ্ধির উপরও তাঁদের আবার ট্যাক্স দিতে হয়, যদিও এই পুঁজিবৃদ্ধি আক্ষরিক মাত্র, নগদ তাঁদের হাতে পৌঁছায় না। এই ভাবে বারংবার (multiple) ট্যাক্সের চাপের দরুনই একুইটির বাজার আজ এত বেশী মন্দা হয়ে পড়েছে; উঁচু ব্যাঙ্ক রেটের দরুন এটি ঘটে নি।

নূতন প্রস্তাবিত এবং জটিল ট্যাক্স ক্রেডিট ব্যবস্থার দ্বারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে খানিকটা ট্যাক্স থেকে রেহাই দেবার আয়োজন করা হয়েছে এটিও একুইটির বাজারে আরও মন্দা ঘটাবে আশঙ্কা হয়। কেননা এই ক্রেডিটের দ্বারা কেবলমাত্র ঋণ পরিশোধ বা ডিবেঞ্চারের ধার শোধ করা মাত্র চলবে। ডিভিডেণ্ডের হার বৃদ্ধি করবার জন্য এই ক্রেডিট ব্যবহার করা চলবে না। এর ফলে কোম্পানী-গুলি অধিকতর পরিমাণে ঋণের দ্বারা তাঁদের পুঁজির

প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করবেন বলে আশঙ্কা হয়; কেননা যে-সব কোম্পানীর কোন ঋণ নেই তাঁরা এই ক্রেডিটের কোন সুযোগ পাবেন না। তর্কের খাতিরে অবশ্য বলা যেতে পারে যে, কোম্পানীর ঋণ কমলে অনুপাতে একুইটি শেয়ারের মূল্যও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু একুইটি শেয়ারের আয়ক্ষমতা যতক্ষণ নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হবে, ততক্ষণ স্বভাবতঃই এর মূল্যও মন্দা চলতেই থাকবে।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য ব্যবসায়ী মহল মনে করেন যে, বর্ত্তমান বাজেটে ব্যবসায়ের ওপর ট্যাক্স মকুব করবার যে-সকল প্রস্তাবগুলি করা হয়েছে সেগুলি বাস্তবিক পক্ষে বর্ত্তমানের প্রচণ্ড করভার কিছুমাত্র লাঘব করতে সক্ষম হবে না। দেশের ভবিষ্যৎ আর্থিক প্রগতি ও বৃদ্ধির কল্যাণে তাঁরা মনে করেন ব্যবসায়ের প্রতি আরও সুবিচার হওয়া প্রয়োজন ছিল। একুইটি শেয়ারের বাজারে নূতন আগ্রহ সৃষ্টি হ'লে সঞ্চয় বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হ'ত এবং তা হ'লে একদিকে যেমন পুঁজি সৃষ্টি দ্রুত ও বর্দ্ধিত পরিমাণে হ'ত তেমনি অন্যদিকে ভোগসঙ্কোচ অনিবার্য্যভাবে ঘটত এবং তার ফলে খানিকটা মূল্যবৃদ্ধির গতি ব্যাহত হওয়া সম্ভব হ'ত।

বস্তুতঃ দেশের ব্যবসায়ী মহল মোটামুটি গত বারো বৎসরের পরিকল্পনানুযায়ী আর্থিক উন্নয়নের সবচেয়ে মোটা অংশ আজ পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করেছেন। উন্নয়ন প্রয়োগ করলে দেশে সম্পদ্ ও আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের যেটুকু তথ্যানুকূল প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে তা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যে অভিযোগ করেছেন যে দেশের বৃহত্তর কল্যাণের প্রয়োজনে তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা আশানুরূপ পরিমাণে পাওয়া যায় নাই, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। অবশ্য সরকারী নীতির জটিলতা, তার প্রয়োগের দক্ষতার অভাব এবং আর্থিক নীতির (fiscal and monetary policies) অসার্থকতাও যে সমধিক পরিমাণে বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য বহুলাংশে দায়ী, সে কথাও অস্বীকার করা চলে না। বর্ত্তমান বাজেটে এই নীতির সংশোধনের একটা প্রচেষ্টার আভাস দেখতে পাওয়া গেছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ব্যবসায়ী মহল অবশ্য খুসী হন নি; না হবার কারণও যে নেই একথা অস্বীকার করা চলে না। তবে সবাই সমভাবে খুসী হ'তে পারে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তেমন একটি বাজেট রচনা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, সে-কথা স্পষ্ট করে বোঝা দরকার। দেশের কল্যাণে সর্ব্বপ্রথম এবং আশু প্রয়োজন এখন মূল্যবৃদ্ধির ধারাটিকে সংযত করবার প্রয়াস করা। এই বস্তুটি যে কেবলমাত্র সাধারণ্যের জীবনধারণ দুঃসহ করে তুলেছে তাই নয়, দেশের সামগ্রিক আর্থিক উন্নয়নও এর কারণে ব্যাহত হয়ে চলেছে। অতএব রাজস্বের কাঠামো থেকে সুরু করে যা-কিছু মূল্যবৃদ্ধির সহায়ক ছিল সব কিছু সম্বন্ধেই অচিরে সার্থক প্রয়োগ যে একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

নূতন বাজেটের আশা

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, যদিও উচ্চ হারে রাজস্বের চাপ সাধারণতঃ মূল্যবৃদ্ধি নিবারক বলে মানা হয়ে থাকে, কিন্তু এই উচ্চ হারের রাজস্বের কাঠামোটি যদি প্রধানতঃ পরোক্ষ ট্যাক্স দ্বারা সমধিক পরিমাণে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে তবে এই প্রচণ্ড ট্যাক্সের চাপও মূল্যবৃদ্ধির সহায়ক হয়ে পড়ে। এর চিকিৎসা সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়ে থাকে—এক-দিকে পরোক্ষ ট্যাক্সের তুলনায় প্রত্যক্ষ ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়ান, অন্যদিকে সরকারী ও বেসরকারী অপ্রয়োজনীয় ও উন্নয়ন নিরপেক্ষ (non-developmental) ব্যয়সঙ্কোচ করা। সরকারী ব্যয়সঙ্কোচের খানিকটা প্রয়াস গত বৎসর থেকেই সুরু হয়েছে। তবে তার একটা সীমা আছে। উন্নয়ন ব্যয় বর্ত্তমান অবস্থায় সঙ্কোচ করা সম্ভব নয়। সরকারী ভোগব্যয়ের মধ্যেও প্রতিরক্ষা ব্যয়বৃদ্ধি আপাততঃ সঙ্কোচ করা একেবারেই অসম্ভব। এই দুই দিক বাদে অন্যদিকে ব্যয়সঙ্কোচের চেষ্টা খানিকটা সুরু হয়েছে। আশা করা যায় বর্ত্তমান বাজেট বৎসরে এদিকে অধিকতর নজর দেওয়া হবে। ব্যক্তিগত ভোগব্যয় সঙ্কোচ করা একমাত্র মূল্যবৃদ্ধি সংযত করতে পারলেই সম্ভব। বর্ত্তমান বাজেটের প্রস্তাবগুলির দ্বারা এদিকে খানিকটা সুফল পাওয়া যেতে সুরু হবে আশা করা যায়।

তা হ'লেই সঞ্চয়ও বৃদ্ধি পাবে এবং পুঁজি-সৃষ্টির গতিও দ্রুততর হবে। দেশের রাজস্বের বর্ত্তমান কাঠামোর পরিধির মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেট ব্যবসায় ক্ষেত্রে রাজস্বের চাপ হাল্কা করা সম্ভব নয়। তবু অর্থমন্ত্রী উৎপাদন-সহায়ক কতকগুলি ক্ষেত্রে এই ভার খানিকটা লাঘব করবার আয়োজন করেছেন। এর বেশী যে আপাততঃ করা সম্ভব নয় সেটা বোঝা প্রয়োজন। মোটামুটি একথা স্বীকার করা যায় যে, বর্ত্তমান বাজেটে অর্থমন্ত্রী একটা নূতন ও বলিষ্ঠ চিন্তার পরিচয় দিতে সুরু করেছেন। অনিবার্য্য কারণে কতকগুলি ক্ষেত্রে—যেমন আবগারী শুল্কের ক্ষেত্রে—যতটা অগ্রসর হবার প্রয়োজন আছে এখনই ততটা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তার জন্য তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী করা চলে না। দেশের অর্থক্ষেত্রে যে-সকল গভীর লক্ষণ আজ প্রকট হয়ে উঠেছে, সেগুলির অধিকাংশই উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর স্কন্ধে এসে চেপেছে। রোগের মূল চিকিৎসা সুরু করবার পূর্ব্বে তার বিকারের লক্ষণগুলিকে সামলিয়ে নিয়ে আপাততঃ প্রাণরক্ষার তাগিদ অনেক বেশী জরুরী হয়ে পড়েছে। বর্ত্তমান বাজেটে তিনি সেই চেষ্টাই করেছেন বলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে এবং আপাতঃ-সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারলে মূল মূল রোগের চিকিৎসার আয়োজন সুরু করা সম্ভব হবে। বর্ত্তমান বৎসরের বাজেট সেই আশারই সূচনা করে বলে মনে হয়।

(সমাপ্ত)

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

দ্বাত্রিংশ অধিবেশন—কলিকাতা—১৯১৭

[এক]

গত বৎসর লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস কংগ্রেস-লীগ স্কীম গৃহীত হওয়ার ফলে ১৯১৭ সালে ভারতের সর্বত্র উক্ত স্কীম অনুসারে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন সুরু হয়। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না অক্লান্তকর্মী শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তের নেতৃত্বে হোমরুল আন্দোলন খুব জোরদার হয়ে ওঠে। সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপও বৃদ্ধি পেতে লাগল। ১৯১৭ সালের প্রারম্ভেই লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা রুজু হয় এবং এর ফলে বহু দেশকর্মীর সাজা হয়। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা আইন পাশ করে স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠনের ব্যবস্থা করলেন। ভারতরক্ষা আইনের বিরুদ্ধে শ্রীমতী বেশান্ত প্রবল আন্দোলন গড়ে তুললেন এবং তাঁর সম্পাদিত, নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লেখনী পরিচালনা করতে লাগলেন। ফলে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট "নিউ ইণ্ডিয়ার" জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করল। এই সময়েই আবার বেহারের চাম্পারন জেলায় গান্ধীজীর নেতৃত্বে নীলচাষীদের আন্দোলন সুরু হ'ল। পাঞ্জাবে হোমরুল আন্দোলন যাতে প্রসার লাভ করতে না পারে তজ্জন্য ওখানকার ছোটলাট স্যর মাইকেল ওডোয়ার শ্রীযুক্ত লোকমান্য তিলক ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র মহাশয়দ্বয়ের উপর পাঞ্জাব প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। বাংলা দেশে শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সক্রিয়ভাবে হোমরুল আন্দোলনে যোগ দিলেন। গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, হোমরুল আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ শ্রীমতী বেশান্তকে যদি তাঁর কর্মক্ষেত্র হ'তে অপসারিত করা হয় তা হ'লে এই আন্দোলনের কণ্ঠ রোধ হবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে গভর্ণমেণ্ট শ্রীমতী বেশান্তকে অন্তরীণ করতে মনস্থ করল। অন্তরীণ হবেন বুঝতে পেরে শ্রীমতী বেশান্ত জুন মাসে একটি বাণী দ্বারা দেশবাসীকে আন্দোলন চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করলেন। এর কিছুদিন পরেই মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড পেণ্টল্যাণ্ডের আদেশে শ্রীমতী বেশান্তকে তাঁর সহকর্মী শ্রীযুক্ত আরেনডেল ও শ্রীযুক্ত ওয়াডিয়া সহ অন্তরীণ করা হ'ল। গভর্ণমেণ্ট আশা করেছিল যে, এর ফলে হোমরুল আন্দোলন নিস্তেজ হবে কিন্তু ফল অন্যরূপ হ'ল।

ভারতবর্ষের সর্বত্র হোমরুল আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে দেশের লোক হোমরুল লীগের সভ্য হ'তে লাগল এবং সর্বত্র সভাসমিতি আহ্বান ক'রে হোমরুলের দাবি জানাতে লাগল। পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট এই সকল সভার বিবরণ সংবাদপত্রে ছাপা নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বন্ধ ক'রে দিল, ফলে দেশের সর্বত্র অশান্তির সৃষ্টি হ'ল।

দেশের প্রবল জনমত উপেক্ষা করতে না পেরে গত লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের আবেদনানুসারে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট আগষ্ট মাসে একটি ঘোষণা দ্বারা ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এবং জানাল যে ক্রমে ক্রমে দেশে স্বায়ত্ত-শাসন চালু করা হবে এবং এ সম্বন্ধে ভারতের জনমত জানার জন্য ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেব ভারতবর্ষে আগমন করলেন।

এ বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন কলিকাতায় হবে। অন্তরীণ অ্যানি বেশান্ত সমগ্র জাতির হৃদয়ে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। দেশবাসী সকলের প্রবল ইচ্ছা যে, এবারকার কংগ্রেসের সভানেত্রী—অ্যানি বেশান্ত নির্বাচিত হন। তখনকার দিনে প্রাদেশিক কমিটিসমূহের সুপারিশ বিবেচনা ক'রে অভ্যর্থনা সমিতি চূড়ান্তভাবে সভাপতি নির্বাচন করত। অধিকাংশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি শ্রীমতী বেশান্তের নাম সভানেত্রী পদে সুপারিশ করে, কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি শ্রীমতী বেশান্তকে কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচন সমীচীন মনে করল না। উক্ত কংগ্রেস কমিটির কর্ণধার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথের মতে ইহাতে গভর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হ'তে হবে এবং তাতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হবে। কেউ কেউ বললেন যে অন্তরীণ ব্যক্তিকে সভাপতি নির্বাচন করার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই, কারণ তিনি ত সভার কার্য পরিচালনা করতে পারবেন না।

কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় তার সভাপতি নির্বাচিত হন বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকিল রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর। যেদিন কংগ্রেসের সভাপতি চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সভা আহূত হয়, তার পূর্বদিন সুরেন্দ্রনাথের বিরোধী পক্ষ বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য ক'রে নেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভায় এই সকল নূতন সভ্যগণের বৈধতা সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত হয়ে উভয় পক্ষ-মধ্যে প্রবল বাদ-বিতণ্ডা আরম্ভ হয়। এর ফলে সভায় কার্য পরিচালনা করা অসম্ভব হওয়ায় বৈকুণ্ঠবাবু সভার কার্য স্থগিত রাখলেন এবং সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ মডারেট নেতাগণ সভা-গৃহ পরিত্যাগ করলেন। এতে হতোদ্যম না হয়ে অধিকাংশ সভ্য অমৃতবাজার পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক ও দেশসেবক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষকে সভাপতির পদে বরণ ক'রে সভার কার্য পরিচালনা করলেন। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হ'লেন এবং রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরের স্থলে কবি-সম্রাট স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হলেন। এর ফলে উভয় দলের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ চরমে উঠল। নিরপেক্ষ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি উভয় দলের মধ্যে একটা আপোষের চেষ্টা করতে লাগলেন। এতে কোন ফল না হওয়ায় কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় (ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে সর্বপ্রথম ভারতীয় অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। তখনকার ভারতবর্ষের কোন হাইকোর্টে স্থায়ী প্রধান বিচারপতির পদে কোন ভারতীয়কে নিযুক্ত করা হ'ত না। একমাত্র ব্যতিক্রম লাহোর হাইকোর্টে স্যর সাদিলালের নিয়োগ।) মফঃস্বলের নেতাদের আহ্বান ক'রে তাঁর বাড়ীতে একটি সভার আয়োজন করলেন। স্থির হ'ল যে, উভয় পক্ষই মফঃস্বলের নেতাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। ফলে একটা আপোষ হ'ল। বৈকুণ্ঠবাবু ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন, পরে সর্বসম্মতিক্রমে বৈকুণ্ঠবাবুকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নিযুক্ত করা হ'ল এবং সম্মিলিত অভ্যর্থনা সমিতির সভায় শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত কংগ্রেসের সভা-নেত্রী নির্বাচিত হ'লেন।

ইতিমধ্যে দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীমতী বেশান্ত তাঁর সহকর্মী আরেনডেল ও ওয়াডিয়া মহাশয়দ্বয়সহ মুক্তিলাভ করলেন।

এই রকম পরিস্থিতিতে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল।

আমি রাজসাহী জেলার পক্ষ হ'তে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও নাটোরের মহারাজকুমার সহ অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হই এবং রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে যোগদান করি।

অধিবেশনের পূর্বদিন ২৫শে ডিসেম্বর সভানেত্রী মহোদয়া তাঁর সহকর্মীগণ ও মাদ্রাজের অন্যান্য প্রতিনিধিগণ সহ কলিকাতায় পৌঁছলেন। তাঁকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করে মহাসমারোহে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বাসা সার্কুলার রোডস্থিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সুরম্য ভবনে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

[দুই]

পরদিন ২৬শে ডিসেম্বর বেলা ২ টার সময় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হ'ল।

ঋগ্বেদের একটি শ্লোকের আবৃত্তি দ্বারা কার্য সুরু হ'ল। এর পর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের ভগ্নী কিন্নরকণ্ঠী শ্রীমতী অমলা দাশের পরিচালনায় শুভ্র বসনপরিহিতা একদল মহিলা কর্তৃক "বন্দে মাতরম" সঙ্গীত গীত হ'ল।

তৎপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হ'তে প্রাপ্ত শুভেচ্ছা-সূচক টেলিগ্রাম পাঠ করলেন।

এর পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে তাঁর উদ্বোধনী প্রার্থনা করতে আহ্বান করলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রার্থনা করতে দণ্ডায়মান হ'লেন তখন সমবেত দর্শকমণ্ডলী তাঁর অভ্যর্থনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কবি যখন সুমধুর কণ্ঠে ইংরাজিতে লিখিত প্রার্থনামূলক কবিতা পাঠ করলেন তখন সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁর আবৃত্তি শুনল (১)

কবির আসন গ্রহণের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় তাঁর অভিভাষণ পাঠ করলেন। তিনি দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণার কথা উল্লেখ ক'রে বললেন যে, আমাদের স্বরাজের স্বপ্ন সফল হ'তে চলেছে। তিনি আশা করেন যে, ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু, বড় লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ড ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও অন্যান্য সদস্যের সাহায্যে স্বায়ত্ত-শাসনের এমন একটা পরিকল্পনা করবেন যাতে আমরা সকলেই সন্তুষ্ট হব। পরিশেষে তিনি বাংলার পক্ষ থেকে প্রতিনিধিবর্গকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আহ্বান করলেন সভানেত্রী নির্বাচনের প্রস্তাব উপস্থিত করতে। বিপুল হর্ষধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থিত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীমতী বেশান্তের বিশ্বব্যাপী নাম ও খ্যাতির উল্লেখ ক'রে তিনি যে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা তার উল্লেখ করলেন এবং তাঁর হোমরুলীগের আন্দোলন দ্বারা তিনি যে দেশে স্বায়ত্ত-শাসনের পথ প্রশস্ত করেছেন তা বলে তাঁকে এই কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচনের প্রস্তাব করলেন।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল দেওয়ান বাহাদুর গোবিন্দরাঘব আইয়ার, বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত এস্. আর. বোমানজী (প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী), পাঞ্জাবের লালা হরকিষণ লাল (এঁকে তৎকালে 'Wizard of finance' বলা হ'ত), বেহারের শ্রীযুক্ত হাসান ইমাম (ব্যারিষ্টার, কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ছিলেন, পরে পাটনা হাইকোর্ট স্থাপিত হ'লে জজিয়তি পদ ত্যাগ করে পাটনা আইন ব্যবসা সুরু করেন। ইনি এবং এঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর স্যর আলি ইমাম তৎকালে বিশিষ্ট প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন) ও লক্ষ্ণৌয়ের এডভোকেট মাননীয় শ্রীযুক্ত সমিউল্লা বোগ সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

সভানেত্রী নির্বাচিত হয়ে শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত

---

(১) Thou hast given us to live,
Let us uphold this honour with all our strength and will
For Thy glory rests upon the glory that we see.
Therefore in Thy name we oppose the power that would plant its banner upon our soul
Let us know that Thy light grows dim in the heart that bears its insult of bondage,
That the life. when it becomes feeble, timidly yields thy throne to untruth,
For weaknessa is the traitor whi betrays our soul,
Let this be our prayer to Thee—
Give us power to resist pleasure where it enslaves us,,
To lift our sorrow up to Thee as the summer holds its midday Sun.
Make us strong that our worship may flower in love and bear fruit in work.
Make us strong that we may not insult the weak and the fallen,
That we may hold our love high where all things around us are wooing the dust.
They fight and kill for self-love, giving it Thy name,
They fght for hunger that thrives on brother flesh,
They fight against thine anger and die.

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মহীয়সী মহিলা যিনি তাঁর পাণ্ডিত্যে বাগ্মিতায় ও লিপি-কুশলতায় বিশ্ব-বিশ্রুত হয়েছিলেন, তিনি ভারতবর্ষকেই তাঁর মাতৃভূমি জ্ঞানে আমরণ এই দেশের সেবা করে গেছেন। তাঁর সৌম্য ধীর গম্ভীর মূর্তি যাঁরা দেখেছেন এবং তাঁর অনবদ্য বক্তৃতা যাঁরা শুনেছেন তাঁরা কখনই তাঁকে ভুলতে পারবেন না।

নির্বাচনের পর সভানেত্রী মহোদয়া তাঁর সুচিন্তিত ও সুলিখিত দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করলেন। তাঁর অভিভাষণে তিনি যুদ্ধ ও সামরিক ব্যয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীর প্রয়োজনে ভারতীয় সৈন্যগণের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ, এশিয়ার নব জাগরণ, ভারতবর্ষের হোমরুলের দাবি প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক'রে বললেন যে, ভারতবর্ষের নিকট ১৯১৭ সাল একটি স্মরণীয় বৎসর, কারণ এই বৎসর ২০শে আগষ্ট তারিখে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট একটি ঘোষণা দ্বারা মূলতঃ গত বৎসরের কংগ্রেসের দাবি (কংগ্রেস-লীগ স্কীম) মেনে নিয়েছেন এবং ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু ইংলণ্ডের কতিপয় নেতা-সহ এখানকার বিভিন্ন দলের মত জানতে এসেছেন। তিনি বর্তমান গভর্ণমেণ্টের আমলা-তান্ত্রিক (bureaucratic) শাসন-নীতির বিরুদ্ধবাদীগণকেও, যথা, তাঁকে (সভানেত্রীকে) লোকমান্য তিলক ও মহাত্মা গান্ধীকে পৃথক পৃথক ভাবে তাঁদের মত প্রকাশ করতে সুযোগ দিয়েছেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রধান ব্যক্তিগণের মতও তিনি শুনেছেন। সভানেত্রী মহাশয়া বিলাতে একটি প্রতিনিধির দল (deputation) প্রেরণ সম্বন্ধে বললেন। পরিশেষে তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় ভারতমাতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে ভবিষ্যৎ আশার বাণী দিলেন।(২)

অতঃপর সমবেত কণ্ঠে একটি স্বদেশী সঙ্গীত গীত হওয়ার পর সভা সেদিনের মত শেষ হ'ল। সভানেত্রী মহোদয়ার নির্দেশে পরদিন ২৭শে ডিসেম্বর অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ও বিষয় নির্বাচনী সভার অধিবেশনের এবং ২৮শে ডিসেম্বর বেলা ১২টার সময় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের ব্যবস্থা হ'ল।

[তিন]

২৮শে ডিসেম্বর সভার প্রাক্কালে অন্তরীত আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের (শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলি ও শ্রীযুক্ত সৌকত আলি) মাতা শ্রীযুক্তা বাহু বেগম সমভিব্যাহারে সভা-নেত্রী মহোদয়া কংগ্রেস প্যাণ্ডালে উপস্থিত হ'লেন। বিপুল হর্ষধ্বনি ও ঘন ঘন "বন্দে মাতরম্" উচ্চারণের মধ্যে এঁদেরকে মাল্য ভূষিত করা হ'ল। বেগমসাহেবা

---

* Let us think of the Mother.

To see her free, to see her hold up her head among the Nations, to see her sons and daughters respected everywhere to see her worthy of her migghty Past, engaged in building a yet mightor Future—is not this work working for, worth suffering for, worth living and worth dying for? Is there any other land which evokes such love for her spirituality, such admiration for her literature, such homage for her valour, as this grlorious Mother of Nations, from whose womb went forth the races that now in Europe and America, are leading the world? And has any land suffered as our India has suffered since her sword was broken at Kurukshetra, and the peoples of Europe and Asia sweft across her borders, laid waste her cities, and discrowned her Kings. They came to conquer, but they remained to be absorbed. At last, out of those mingled peoples, the Divine Artificier has wedded for a Nation, compact not only of her own virtues, but also of those her foes and brought to her and gradually eliminating the vices which they had also brought.

After a history of millennia strtching far back out of the ken mortal eyes; having lived with, but not died with, the mighty civilisations of the Past; having seen them rise, and flourish and decay, until only their remaiped, deep burried in earth's crust; having wrought, and triumphed, and suffend, and having survived all changes unbroken; India, who has been verily the crucified among Nations, now stands on this her Resurrection morning, the Immortal, the Glorious, the Ever-Young; and India shall soon be seen, proud and self-reliant, strong and free, the radiant splendour of Asia, as the Light and the Blessing of the World.

বোরখা দ্বারা মুখ আবৃত করেন নি। বর্ষীয়সী মহিলা, অতিশয় সুশ্রী ও সৌম্যদর্শন ছিলেন।

এদিনের সভার প্রারম্ভে শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণীর (প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবিকা, সুপ্রসিদ্ধা ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী ও পাঞ্জাবের খ্যাতনামা নেতা শ্রীযুক্ত রামভুজ দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী) নেতৃত্বে সমবেত কণ্ঠে একটি স্বদেশী সঙ্গীত গীত হ'ল।

সঙ্গীতের পর সভার কার্য আরম্ভ হ'ল। প্রথমেই জনৈক মুসলমান প্রতিনিধি উর্দুতে ভারতমাতা সম্বন্ধে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন।

তৎপর সভানেত্রী মহাশয়া দুইটি প্রস্তাব দ্বারা দাদাভাই নৌরজী ও আবদুল রসুলের পরলোক গমন জন্য শোক প্রকাশ করলেন।

তৃতীয় প্রস্তাব দ্বারা তদানীন্তন প্রথানুসারে ভারত-সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হ'ল এবং চতুর্থ প্রস্তাবে রাইট অনারেবল্ ই. এফ. মণ্টেগুকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হ'ল।

পঞ্চম প্রস্তাব ছিল, আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্তরীণ হ'তে মুক্তির দাবি সম্বন্ধে। এই প্রস্তাব উপস্থিত করার পূর্বে সভানেত্রী বললেন যে, এই সভায় আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের জননী উপস্থিত আছেন। তিনি জানাচ্ছেন যে, তিনি মুসলিম লীগের অধিবেশনেও নিমন্ত্রিত হয়েছেন কিন্তু তিনি পূর্বে কংগ্রেসে না এসে ওখানে যেতে পারেন না, কারণ যদিও মুসলমানগণ ধর্মমতে তাঁর ভাই কিন্তু সমগ্র ভারতবাসীই তাঁর ভাই। সভানেত্রী মহোদয়া সকলকে দণ্ডায়মান হয়ে এই বীর জননীকে সম্মান প্রদর্শন করবার জন্য আহ্বান করলেন। সমবেত জনতা দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান দেখালেন।

(এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গত কয়েক বৎসর ধরে জিন্না প্রভৃতি মুসলমান নেতাগণের চেষ্টায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশন একই স্থানে, একই সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।)

প্রস্তাব পেশ করতে শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়কে আহ্বান ক'রে সভানেত্রী মহাশয়া বললেন যে, তিলক মহাশয় দেশের জন্য ৭ বৎসর কারাবরণ করেছেন এই কারণে বিশেষ ক'রে তাঁকে প্রস্তাবক নির্বাচিত করা হয়েছে।

আলি ভ্রাতৃদ্বয় গত ১৯১৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা জেলায় ভারতরক্ষা আইনানুসারে অন্তরীত আছেন। তাঁদের অন্তরীণের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করে লোকমান্য তিলক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন এবং তাঁদের মুক্তি দাবি করে প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

প্রস্তাব সমর্থন করলেন বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সুদর্শন যুবক শ্রীযুক্ত যমনাদাস দ্বারকাদাস, মাদ্রাজের তরুণ বক্তা শ্রীযুক্ত এস্. সত্যমূর্তি ও আরও কয়েকজন প্রতিনিধি। বাংলার তরফ থেকে শ্রীযুক্ত এ. সি. ব্যানার্জি সমর্থন করার পর প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত জে. এন. রায় মহাশয়। এই প্রস্তাবে অধিক পরিমাণে ভারতবাসীদের সামরিক শিক্ষা প্রদানের দাবি করা হয় এবং সৈন্য বিভাগে অফিসার নিয়োগ সম্বন্ধে জাতিগত বৈষম্য দূর করে যে ৯ জন ভারতবাসীকে অফিসার পদে (Commissioned ranks of the army) নিয়োগ করা হয়েছে তজ্জন্য সন্তোষ প্রকাশ করে অধিক সংখ্যক ভারতবাসীকে অফিসার পদে নিয়োগের দাবি করা হয়।

এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন অন্ধ্রের শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটাপতি রাজু, পাঞ্জাবের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বরকত আলি, যশোহরের উকিল রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর প্রভৃতি প্রতিনিধিগণ, এই অধিবেশনে প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর সুবিশাল-বপু প্রফেসর রামমূর্তি উপস্থিত ছিলেন। তিনি হিন্দীতে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

এর পরবর্তী প্রস্তাবটি ছিল ১৯১০ সালের সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন প্রত্যাহার সম্বন্ধে।

বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ নির্ভীক সাংবাদিক ভারত-বন্ধু ইংরাজ মিঃ বি. জি. হরনিম্যান এই প্রস্তাব উপস্থিত করে তথ্যপূর্ণ সুচিন্তিত অভিভাষণ দিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল সুবক্তা শ্রীযুক্ত এ. কে. ফজলুল হক্ (পরবর্তীকালে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী—শের-এ-বাংলা), কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু, কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ডি. সি. ঘোষ, পাঞ্জাবের শ্রীযুক্ত সৈফুদ্দিন কিচলু (পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ ডাঃ কিচলু), কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এটর্নি শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান, মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত টি. এম. কৃষ্ণস্বামী পণ্ডিত কাশীরাম তেওয়ারী প্রস্তাব সমর্থন করলেন। এঁদের মধ্যে কিচলু সাহেব উর্দুতে এবং তেওয়ারী মহাশয় হিন্দীতে বক্তৃতা দেন।

পরবর্তী প্রস্তাবে বাংলার তথাকথিত বিপ্লবী ষড়যন্ত্র দমন করতে গভর্ণমেণ্টকে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান জন্য গত ১০ই ডিসেম্বর যে কমিটি নিযুক্ত হয়েছে তার নিন্দা এবং ভারতরক্ষা আইন ও ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনের (যার বলে বিনা বিচারে অন্তরীণের ব্যবস্থা আছে) যথেচ্ছ ব্যবহারের প্রতিবাদ করা হয়।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাব উপস্থিত করে যুক্তিপূর্ণ অভিভাষণ দেন। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সুবক্তা শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাংলায় ও লক্ষ্ণৌয়ের পণ্ডিত গোকরণ মিশ্র মহাশয় হিন্দীতে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এই সময় মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত ভি. সি. যোষাচারী মহাশয় দাঁড়িয়ে বললেন যে, দক্ষিণ ভারতের ভীষ্ম স্যর সুব্রহ্মণ্য আইয়ার মহাশয়ের একটি বাণী কংগ্রেসের জন্য এনেছেন। এই বাণী আনন্দের বাণী, আশার বাণী এবং অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ সাফল্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের বাণী। সমবেত দর্শক ও প্রতিনিধি মণ্ডলী স্যর সুব্রহ্মণ্য আইয়ারের নামে জয়ধ্বনি দিল।

দিল্লীর শ্রীযুক্ত এম. খাজা প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে বললেন যে, তিনি শাসকগণের ভাষা ব্যবহার না করে আগামী দিনের আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষায় বক্তৃতা দিবেন। এই বলে তিনি উর্দুতে তাঁর মত প্রকাশ করলেন। তারপর বাংলার অনন্যসাধারণ বক্তা কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ও খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠলেন। তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় বাংলার অন্তরীত যুবকদের অবস্থা সম্বন্ধে মর্মন্তুদ বিবরণ শোনালেন। অন্যান্য দৃষ্টান্তের মধ্যে রংপুরের শ্রীশচীন্দ্র-নাথ দাশগুপ্ত সম্বন্ধে ঘটনা তিনি বিবৃত করলেন। শচীন্দ্রনাথ অন্তরীণ হ'তে মুক্তিলাভ করেন সুতরাং ধরে নিতে হবে যে, তিনি নির্দোষ ছিলেন কিন্তু মুক্তির পর পুলিশ তাঁকে এমন ভাবে নির্যাতন সুরু করল এবং সর্বদা তাঁর পিছনে তাড়াহুড়া করতে লাগল যে, শচীন্দ্রনাথকে এই অত্যাচারের হাত থেকে আত্মহত্যা করে নিষ্কৃতিলাভ করতে হ'ল। এই ভাবে একটি কর্মবীরের জীবন অবসান হ'ল। এই ঘটনা তখন বাংলা দেশে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। জিতেন্দ্রলালের মত এমন অনর্গল চোস্ত ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা দিতে খুব কম লোককেই দেখেছি; শব্দস্রোত যেন জলস্রোতের ন্যায় তাঁর কণ্ঠ হ'তে নির্গত হ'ত।

জিতেন্দ্রলালের পর মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত খাড়ে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্তরীণ-সংক্রান্ত অনেক কথা বলে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এর পর বিহারের শ্রীযুক্ত অরিকসন সিং এবং ঢাকায় শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে হিন্দী ও বাংলায় সমর্থন করার পর প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

অপর একটি প্রস্তাব দ্বারা কংগ্রেসের সংবিধানের কিছু সংশোধন করা হ'ল।

সর্বশেষে সভানেত্রী কর্তৃক কতকগুলি মামুলি প্রস্তাব (omnibus resolution) উত্থাপিত হয়ে গৃহীত হ'ল।

এর পর সেদিনের মত অধিবেশন শেষ হ'ল। সভানেত্রী মহাশয়া জানালেন যে, পরদিন বেলা ১১-৩০ মিঃ সময় কংগ্রেসের শেষ দিনের অধিবেশন হবে।

[চার]

২৯শে ডিসেম্বর বেলা ১১ ৩০ মিনিটের সময় কংগ্রেসের তৃতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হ'ল।

প্রথমেই সভানেত্রী মহাশয়া কারাগারে আবদ্ধ শ্রীযুক্ত অর্জুনলাল শেঠী নামক জনৈক ভদ্রলোকের অনশন-জনিত মৃত্যুর হাত থেকে তাঁর প্রাণ রক্ষা করার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করতে আবেদন জানালেন। এই প্রস্তাব প্রসঙ্গে সভানেত্রী জানালেন যে, উক্ত ভদ্রলোককে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট পাকড়াও করে জয়পুর ষ্টেটের হস্তে সমর্পণ করে। সেখানে তাঁকে কারাবরণ করতে হ'ল কিন্তু সেখানে তাঁকে তাঁর ঠাকুরের মূর্তিপূজার ব্যবস্থা জয়পুর সরকার করে দেন। তারপর অকস্মাৎ তাঁকে মাদ্রাজে ভেলোর জেলে স্থানান্তরিত করা হয় কিন্তু সেখানে তাঁকে ঠাকুরের পূজা করার অনুমতি দেওয়া হ'ল না। ঐ ধার্মিক জৈন ঠাকুর পূজা না করে জলগ্রহণ করেন না, ফলে ৩৫ দিন তিনি অনাহারে থেকে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করছেন। সরকারের চাপে আবেদন-নিবেদন নিষ্ফল হওয়ায় তাঁর বন্ধুগণ কংগ্রেসের শরণাপন্ন হয়েছেন। প্রস্তাবটি সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল।

তারপর এবারকার কংগ্রেসের সর্বপ্রধান প্রস্তাব— স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হ'ল। প্রস্তাবটি প্রথমে সভানেত্রী মহোদয়া পাঠ করলেন। প্রস্তাবে প্রথমতঃ ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা করা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য বলে ভারত-সচিব যে ঘোষণা করেছেন তজ্জন্য সকৃতজ্ঞ আনন্দ জ্ঞাপন করা

হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আইন অবিলম্বে পার্লেমেণ্টে বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হয় এবং বলা হয় যেন উক্ত আইনেই অনতিবিলম্বে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন প্রাপ্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত থাকে এবং শেষে বলা হয় যে, প্রথম পদক্ষেপ-স্বরূপ কংগ্রেস-লীগ স্কীম অবিলম্বে প্রবর্তন করা হয়।(৩)

এই প্রস্তাব উপস্থিত করলেন যথারীতি অনারেবল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি বললেন, কংগ্রেসের স্বায়ত্ত-শাসনের স্বপ্ন আজ সফল হ'তে চলল। তিনি স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে গৃহীত কংগ্রেস লীগ স্কীম সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বললেন।

শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলি জিন্না প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে অন্যান্য কথার পর বললেন যে, ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু বর্তমানে ভারতে এসেছেন। বিলাতে প্রত্যাবর্তনের অনতিকাল মধ্যে তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশ করবেন। খুব সম্ভব আগামী এপ্রিল মাসে তাঁর প্রস্তাব বিলাতে ও ভারতে আলোচনার জন্য প্রকাশিত হবে। জিন্না সাহেব অভিমত প্রকাশ করলেন যে, প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার পর অনতিবিলম্বে সেটি বিবেচনার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশন হওয়া প্রয়োজন। তখন গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব আলোচনা ক'রে আমরা যেন আমাদের দাবি সম্বন্ধে চূড়ান্ত মত প্রকাশ করি।

জিন্না সাহেবের পর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীযুক্ত সি. পি. রামস্বামী আইয়ার, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত হাসান ইমাম, শ্রীযুক্ত আনসারী, শ্রীযুক্ত এস্. আর. বোমানজী ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রস্তাব সমর্থন করলেন, এঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত আনসারী উর্দ্দুতে বক্তৃতা দিলেন।

বিখ্যাত নেতাগণের ভাষণের পর সভানেত্রী বললেন যে, খ্রীষ্টান শাস্ত্রমতে সর্বোৎকৃষ্ট মদ ভোজের সর্বশেষে পরিবেশন করতে হয়। বাগ্মিতার এই মহাভোজ সভায় আমাদের এমনি একটি পাত্র পান করতে হবে। এই মন্তব্য ক'রে তিনি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে প্রস্তাব সমর্থন করতে আহ্বান করলেন।

পণ্ডিতজী দাঁড়াতেই কয়েকজন প্রতিনিধি তাঁকে হিন্দীতে ভাষণ দিতে অনুরোধ করল। পণ্ডিতজী বললেন যে, তাঁর মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিতে ইচ্ছা থাকলেও দুঃখের বিষয় যে, অন্যান্য প্রদেশের বহু প্রতিনিধি উপস্থিত আছেন তাঁরা কেহই হিন্দী বা উর্দ্দু ভাষা জানেন না। তাঁদের উপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। মালব্যজী তাঁর সুদীর্ঘ অভিভাষণে স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করলেন।

মালব্যজী আসন গ্রহণ করলে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়িয়ে বললেন যে, তিনি বক্তৃতা দিতে ওঠেন নি। তিনি একজন নমঃশূদ্র প্রতিনিধিকে সভায় পরিচিত করে বললেন যে, এই ভদ্রলোক নমঃশূদ্র সমাজের প্রতিনিধি ও নেতা। যে ডজনখানেক নমঃশূদ্র অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সাহায্যে জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করছে তাদের সেই কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানাতে তিনি কংগ্রেসে উপস্থিত হয়েছেন।

অতঃপর নমঃশূদ্র নেতা শ্রীযুক্ত ভেগাই হালদার বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল।

পরবর্তী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মহাশয়। (তখন পর্যন্ত গান্ধীজীর "মহাত্মা" উপাধি খুব বেশী প্রসিদ্ধিলাভ করে নি। কেবলমাত্র সভানেত্রী মহোদয়া তাঁর অভিভাষণে গান্ধীজীকে "মহাত্মা গান্ধী" রূপে উল্লেখ করেছেন।) মহাত্মা গান্ধী হিন্দীতে উপনিবেশসমূহে ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে তার প্রতিকার দাবি করলেন।

প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে শ্রীযুক্ত পলটনওয়ালা পূর্ব আফ্রিকায় ভারতবাসীদের প্রতি অবিচার ও অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে গভর্ণমেণ্টের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ করলেন।

প্রস্তাবটি আরও কয়েকজন প্রতিনিধি কর্তৃক সমর্থিত হওয়ার পর গৃহীত হ'ল।

এর পর কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত শশাঙ্কজীবন রায় চুক্তিবদ্ধ মজদুর সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

অনুন্নত শ্রেণীর সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন মাদ্রাজের "ইণ্ডিয়ান রিভিউ" পত্রিকার প্রসিদ্ধ সম্পাদক —শ্রীযুক্ত জি. এ. নটেশন। গুজরাটের শ্রী বি. জে. দেশাই, মালবারের শ্রীযুক্ত রামা আইয়ার এবং দিল্লীর ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত আসফ আলি (পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলনে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন এবং দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর উড়িষ্যার গভর্ণর নিযুক্ত হন।) প্রস্তাবটি সমর্থন করায় ইহা গৃহীত হ'ল।

পরবর্তী প্রস্তাব দ্বারা যে সকল দমনমূলক আইনগুলি

ও ভারতরক্ষা আইনের বলে জনসাধারণের মতামত প্রকাশ, লেখনী পরিচালনা ও সভা-সমিতি করার স্বাধীনতা সঙ্কোচ করা হয়েছে তার যথেচ্ছ ব্যবহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য একটি পার্লামেন্টের কমিটি নিযুক্ত করতে ভারতসচিব মারফৎ পার্লামেন্টকে অনুরোধ করা হয় এবং বড়লাটের যোগে এই প্রস্তাব ভারত-সচিবের নিকট পেশ করতে সভানেত্রীকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এর পরের প্রস্তাবে প্রয়োজন হ'লে ইংলণ্ডে একটি ডেপুটেশন প্রেরণের ক্ষমতা অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিকে দেওয়া হ'ল।

শেষের প্রস্তাবগুলি সভানেত্রী মহাশয়া উপস্থিত করলেন। একটি প্রস্তাব দ্বারা শ্রীযুক্ত যোসেফ ব্যাপ্টিষ্ট, (বোম্বাই হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও লোকমান্য তিলকের অনুগামী কংগ্রেস কর্মী) ও শ্রীযুক্ত এইচ. এস. এল. পোলক (ইংরাজ ইহুদী, মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সহকর্মী ও ভারত-বন্ধু) মহাশয়-দ্বয়কে অনুরোধ করা হয় যেন তাঁরা ইংলণ্ডে যে লেবার পার্টি পার্লামেন্টে ভারতের স্বায়ত্তশাসন আইন গ্রহণে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—সেই লেবার পার্টির বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে উক্ত পার্টিকে ভারতের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দুইটি প্রস্তাবের দ্বারা কংগ্রেস সংবিধানের কিছু পরিবর্তন করা হ'ল। অন্য একটি প্রস্তাবে কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির সভাপতি স্যর উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় এবং ব্রিটিশ কমিটি সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আগামী বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত কেশব পিলাই, শ্রীযুক্ত সি. পি. রামস্বামী আইয়ার ও মাননীয় শ্রীযুক্ত ভুরগুড়িকে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হ'ল।

এর পর রায়বাহাদুর সুলতান সিং দিল্লীতে, আগামী বৎসরের অধিবেশন জন্য কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ করলেন। সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

সভার কার্য সমাপ্ত হওয়ার পর কলিকাতা হাই-কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয় যথাযোগ্য ভাষায় সভানেত্রীকে ধন্যবাদ দিলেন।

এর পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় প্রতিনিধিবর্গকে, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে এবং কর্মীবৃন্দকে কংগ্রেসের অধিবেশনের সাফল্য সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ দিলেন। তিনি বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু (আলিপুর কোর্টের উকিল) শ্রীযুক্ত, ইন্দুভূষণ সেন (কলিকাতা হাই-কোর্টের ব্যারিষ্টার), শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস (শিক্ষা-ব্রতী) ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (শিক্ষাব্রতী) ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী (কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার) মহাশয়গণের নাম উল্লেখ করলেন।

বৈকুণ্ঠবাবুর ভাষণের পর সভানেত্রী মহোদয়া তাঁর অনবদ্য ভাষায় প্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে, ধন্যবাদ দিলেন। রাজা গোপাল সিং নামক জনৈক রাজপুত রাজাকে অন্তরীণ আইন ভঙ্গের অপরাধে জেলে প্রেরণ এবং তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে শ্রীমতী বেশান্ত তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন যে, এই রাজাকে সাধারণ কয়েদীর মত রাখা হয়েছে এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের ফলে তাঁর পুত্র অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হয়েছে। অতঃপর বাংলার অন্তরীত অগণিত যুবকদের প্রতি পুলিসের অবর্ণনীয় অত্যাচার ও তাদের দুঃসহ কষ্টের কথা মর্মন্তুদ ভাষায় বর্ণনা করলেন। জিন্না সাহেব 'রিফর্ম বিল' প্রস্তুত হওয়ার পর কংগ্রেস ও লীগের বিশেষ অধিবেশনের যে সুপারিশ করেছেন তা তিনি সমর্থন করলেন এবং আশা করলেন যে, অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ও মুসলীম লীগের কাউন্সিল এই সুপারিশ অনুসারে কাজ করবে। তার পর তিনি উল্লেখ করেন যে, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও গান্ধীজীর উপদেশানু-সারে একটি কংগ্রেস দিবস পালনের ব্যবস্থা করা হ'ল। অদ্যকার এই কংগ্রেস দিবসে শ্রীযুক্ত তিলক মহাশয়ের কথামত সভাপতির বাণী ইংরাজিতে (২০,০০০ কপি) ও ভারতের প্রধান প্রধান ভাষায় তা অনুবাদ করে তিনি হোমরুল লীগের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি এই কংগ্রেস দিবস পালনের ব্যবস্থা বজায় রাখতে বললেন (পরবর্তীকালে কংগ্রেস দিবস পালন হয়েছে বলে আমি জানি না)। সর্বশেষে তিনি বললেন যে, একমাত্র ভগবানের নিকট থেকেই স্বাধীনতার দান আসে। কোন জাতি অন্য কোন জাতিকে স্বাধীনতা দিতে পারে না। পরিশেষে তিনি ভারতমাতার প্রতি অপূর্ব ভাষায় ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করে আসন পরিগ্রহণ করলেন।

কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হ'ল।

পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও অল-ইণ্ডিয়া মোসলেম লীগ কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণকে তাঁদের সভায় উপস্থিত হতে নিমন্ত্রণ করে। অন্যান্য প্রতিনিধির সঙ্গে আমিও মুসলীম লীগের অধিবেশনে দর্শকরূপে যোগদান করি।

বিদেশের কথা

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

মস্কো-পিকিং কথা

ক্রুশ্চভের বিদায়ের পর কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার দুই প্রধান, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের মতবৈষম্য ও মনোমালিন্য দূর হওয়ার যে ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা ইতিমধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। মীমাংসার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হয় নি, কিন্তু চীনের কম্যুনিষ্ট নেতারা এটা প্রায় স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিরোধের নিষ্পত্তি শুধু তাঁদের সর্তেই হ'তে পারে। তাঁরা যে মারমুখী নীতি অনুসরণ করে চলেছেন তাকে তাঁরা অভ্রান্ত বিপ্লবী নীতি বলে মনে করেন, সে-কারণে ও-ব্যাপারে কোন আপোষ, সংশোধন বা উপদেশ তাঁরা মানতে রাজী নন। যদি কোন কম্যুনিষ্ট দেশ বা দল তাঁদের সঙ্গে একমত হ'তে না পারে, তবে চীনের অতিবিপ্লবী নেতারা তৎক্ষণাৎ সেই দেশ বা দলকে ভীরু, প্রতিক্রিয়াশীল, শোধনবাদী ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে বর্জন করবেন। এই রকম বেপরোয়া মনোভাবের সঙ্গে আপোষ করা বা মানিয়ে চলা কোন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন দেশের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এই কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের বিরোধ ও ব্যবধান দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি মস্কো-পিকিং বিরোধ দল বা আদর্শের গণ্ডি অতিক্রম করে কূটনৈতিক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক তৎপরতার প্রতিবাদ জানাতে কিছুদিন আগে মস্কোয় পাঠরত চীনা ও উত্তর ভিয়েৎনামী ছাত্ররা মস্কোস্থ মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে সাংঘাতিক বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভকারীরা এমন মারমুখী হয়ে ওঠে যে, মার্কিন দূতাবাসের সম্মুখে প্রহরারত নিরস্ত্র সোভিয়েট পুলিসের পক্ষে তাদের সহজে সংযত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে নিরুপায় হয়েই সোভিয়েট পুলিসকে শেষ পর্যন্ত একটু কঠিন হ'তে হয় এবং জোর করেই বিক্ষোভকারীদের অপসারিত করা হয়।

কূটনৈতিক সৌজন্যের তাগিদে সোভিয়েট পুলিসের ঐ আচরণ কম্যুনিষ্ট চীনকে দারুণ উত্তেজিত করেছে। চীনা সরকারের মতে সোভিয়েট সরকার যা করেছেন সেটা সৌজন্যবশত নয়, মার্কিন সরকারের ভয়ে। সেই "ভীরুতার" প্রতিবাদ জানাতে চীনা সরকারের প্ররোচনায় পিকিংস্থ সোভিয়েট দূতাবাসের সম্মুখে চীনা ছাত্ররা প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখায় এবং চীন সরকার সোভিয়েট সরকারের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার দাবি জানিয়ে এক কড়া নোট পাঠান। কম্যুনিষ্ট দুনিয়ায় দলাদলির ফলে ইতিপূর্বে বহু উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এক কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের দূতাবাসের সম্মুখে আর এক কম্যুনিষ্ট দেশের "গণ-বিক্ষোভ" বা ক্ষমা প্রার্থনার দাবি জানিয়ে কড়া নোট পাঠানো সম্পূর্ণ অভিনব ঘটনা। সোভিয়েট সরকার অবশ্য এবারও সংযম হারান নি এবং অত্যন্ত দৃঢ় ভাষায় চীন সরকারের নোটের উত্তর দিলেও এমন কোন কথা বলেন নি যা কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার ভাঙন অনিবার্য করে তোলে। ১লা মার্চ মস্কোয় যে কম্যুনিষ্ট ঐক্য সম্মেলন আহূত হয় এবং পৃথিবীর উনিশটি কম্যুনিষ্ট দেশ ও দলের প্রতিনিধিরা যাতে যোগ দেন তাতেও শেষ পর্যন্ত সব বিরোধের নিষ্পত্তির আশায় এমন কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় নি যা কম্যুনিষ্ট চীন বা তার অনুগত কম্যুনিষ্ট দেশ ও দলগুলিকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। কিন্তু এ ভাবে জোড়াতালি দিয়ে কতদিন চলতে পারে, এবং চলে কিছু লাভ হচ্ছে কি না—এ প্রশ্ন আজ সব কম্যুনিষ্ট মহলে উঠেছে।

বস্তুতপক্ষে চীন এখন যে নীতি অনুসরণ করে চলেছে তা জঙ্গী জাতীয়তাবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়, তার সঙ্গে কম্যুনিজমের কোন সম্পর্ক নেই। সৈন্যবলে, অস্ত্রবলে পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হওয়ার জন্য চীন মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিজোটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খাদ্যে পরনির্ভর ও অস্ত্রশক্তিতে হীন চীনের পক্ষে যে এই উচ্চাভিলাষ পূরণ সম্ভব নয় তা চীনা নেতারা ভাল ভাবেই জানেন। তাই তাঁদের এখন একমাত্র মতলব হ'ল যে-কোন উপায়ে সোভিয়েট ইউনিয়নকে তাদের পক্ষ হয়ে পশ্চিমী শক্তিজোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানো। চীনের জনবল ও সোভিয়েট অস্ত্রবল এক হ'লে সাম্রাজ্যবাদ নিশ্চিহ্ন হবে বিশ্ব থেকে, এই কথাটাই চীনা নেতারা এখন কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার মনে গেঁথে দিতে চান। কম্যুনিষ্ট দুনিয়া যদি চীনের এই প্রচারে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় তা হ'লে কম্যুনিষ্ট শিবিরে নেতৃত্ব হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন শেষ পর্যন্ত চীনের সঙ্গী হয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে

যুদ্ধে নামতে বাধ্য হবে। আর তাতে যে শেষ পর্যন্ত চীনেরই লাভ হবে সবচেয়ে বেশী, এ বিষয়েও চীনা-নেতারা নিঃসন্দেহ। তাঁরা জানেন, প্রবল প্রতিপক্ষ আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চীনের কয়েক কোটি লোকের প্রাণহানি ছাড়া আর কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আমেরিকা উভয়েই যাবে ধ্বংস হয়ে। তখন চীনের গতিরোধ করার মত কোন শক্তি পৃথিবীতে থাকবে না। চীনের এই সর্বনাশা অভিসন্ধির বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল শিবিরের জনমত অবশ্যই সতর্ক ও সচেতন হওয়া দরকার।

মধ্যপ্রাচ্যে সঙ্কট :

পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের কিছুদিন আগে যে মনোমালিন্য ঘটে এখনও পর্যন্ত কোন মীমাংসা হয় নি। বরঞ্চ অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। পশ্চিম জার্মানী ইস্রায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করতে কিছুতেই সম্মত নয়। আবার সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র বা তার অনুগত দেশগুলিও তাদের এক নম্বর শত্রুকে ঐ ভাবে অস্ত্রসমৃদ্ধ হ'তে দিতে চায় না। কারণ ইস্রায়েল-বিরোধী আরবরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত হবেই। এ-কারণে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করেছে যে, পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিষ্ট সরকারকেও তারা স্বতন্ত্র স্বীকৃতি জানাবে। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের এই ঘোষণার সঙ্গে সব ক'টি আরব দেশ কিন্তু একমত হয় নি। মরক্কো, তিউনেশিয়া, আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশ জানিয়েছে যে, পশ্চিম জার্মানীর ইস্রায়েল নীতি তারা সমর্থন না করলেও তার পাল্টা হিসাবে পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিষ্ট সরকারকে তারা স্বতন্ত্র স্বীকৃতি জানাবে না। কারণ তা হ'লে জার্মানীর বিভাগকে মেনে নেওয়া হবে, যেটা তাদের কাম্য নয়। জার্মানীকে তারা ঐক্যবদ্ধই দেখতে চায়। তা ছাড়া এই ভাবে বিরোধ বাড়ানো হ'লে মধ্যপ্রাচ্যে অকারণে নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করা হবে যাতে আরব দেশগুলিরই ক্ষতি হবে সবচেয়ে বেশী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর মনকষাকষি আরব ঐক্যেও ফাটল ধরিয়েছে। প্রেসিডেন্ট নাসেরের কথা আরব দুনিয়ার শেষ কথা এ অবস্থাটা এখন আর নেই বললেই হয়।

যুদ্ধাপরাধীর বিচার :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গত বিশ বছরে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে মিত্রপক্ষের আদালতে প্রায় পাঁচ হাজার নাজীর বিচার হয়। এ ছাড়া পশ্চিম জার্মানীর নিজস্ব আদালতে বিচার হয় আরও প্রায় ছয় হাজার জনের। এখনও তের হাজার নাজীর বিচার চলেছে পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন আদালতে। কিন্তু জার্মানীর রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে (জার্মান কোড—১৮৭১) কোন ব্যক্তির অপরাধের বিচার যদি বিশ বছরের মধ্যে না হয় এবং ঐ সময়ের মধ্যে একই অপরাধ যদি সেই ব্যক্তি আর না করে তবে তার বিরুদ্ধে আর অভিযোগ আনা চলে না। সেই হিসাবে আগামী ৮ই মের মধ্যে যেসব যুদ্ধাপরাধী ধরা পড়বে না তাদের আর বর্তমান আইনানুসারে গ্রেপ্তার বা বিচার করা চলবে না। এ কারণে জার্মানীর ভেতরে ও বাইরে অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে, ৮ই মে অতিক্রান্ত হওয়ার পর এতদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকা হিটলারের বহু সঙ্গী বেরিয়ে আসবেন, এমন কি স্বয়ং হিটলারই বেরিয়ে আসতে পারেন কোন এক কল্পনাতীত স্থান থেকে, যদিও এ বিষয়ে কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, হিটলার বিশ বছর আগেই আত্মঘাতী হয়েছেন। বিভিন্ন মহলে যখন ৮ই মের পরেও নাজী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চালিয়ে যাওয়ার দাবি ওঠে তখন পশ্চিম জার্মানীর আইনমন্ত্রী বলেন, জার্মানীর সংবিধান সংশোধন না করে সেটা করা সম্ভব নয় এবং মন্ত্রিসভাও আইনমন্ত্রীর যুক্তি মেনে নেন। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নাজী-বিরোধী মহলে সাংঘাতিক বিক্ষোভ জাগিয়ে তোলে এবং পশ্চিম জার্মানীর পার্লামেন্ট মন্ত্রিসভাকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বলেন। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভা মত পরিবর্তন করেছেন এবং ঠিক হয়েছে ৮ই মের পরেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চালিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন পরিবর্তিত না করে কি ভাবে বিচার চালানো হবে তা এখনও ঠিক হয় নি।

হয়েল-নারলিকারের তত্ত্ব

অধ্যাপক ফ্রেড হয়েল এবং ডঃ জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকারের প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে (প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৭১) পঞ্চশস্যের পাতায় সূত্রপাত করেছিলাম। অধ্যাপক হয়েল গত বছর জুন মাসে তাঁদের নূতন তত্ত্বটির প্রকাশ করেন, বিজ্ঞানের দুনিয়ায় সেই থেকে মস্ত সোরগোল সুরু হ'ল। প্রথম প্রকাশের এক মাসের মধ্যে লেখা সে প্রবন্ধটিতে আমরা হয়েল-নারলিকারের মূল তত্ত্বটির মধ্যে প্রবেশ করতে পারি নি, পরবর্তী আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলাম মাত্র। আসল কথা, তাঁদের যা মূল বক্তব্য সে সম্বন্ধেই আমরা পূর্ণাঙ্গ কোন বিবরণ তখনও জোগাড় করতে পারি নি। সে-কথা স্বীকার করে আমরা মন্তব্য করেছিলাম—"বিজ্ঞানের এই উন্নতির যুগে মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার কত উন্নতি হয়েছে, মহাসমুদ্রের দু' পাড়ের দেশগুলিতে নিমেষের মধ্যে লক্ষ লক্ষ শব্দ সংবাদ বহন করে চলেছে, অথচ কি আশ্চর্য দেখুন—যে-তত্ত্ব সমস্ত বিশ্ব-সৃষ্টি সম্বন্ধেই নূতন কথা বলতে চায় তার সম্বন্ধে খবর এখনও পর্যন্ত অবিশ্বাস্য রকমে অসম্পূর্ণ।"

এই আট কি ন'মাসের মধ্যে অবস্থার যে খুব কোন পরিবর্তন হয়েছে তা নয়। নারলিকার আমাদেরই মত ভারতীয়। তাঁর সাধনায় ভারতীয় বিজ্ঞানের ঐতিহ্য আরও বেগবান হ'ল। কিন্তু খবর কাগজে তার নানা ভঙ্গির ছবি এবং কলম-জোড়া সাংবাদিক বিবরণের মধ্যে তাঁর বৈজ্ঞানিক বক্তব্যের মূল কথাটুকুই বাদ গেছে। নারলিকার সম্প্রতি ভারতে এলেন, কলকাতাও তিনি ঘুরে গেছেন। এ উপলক্ষে আমরা হয়েল-নারলিকারের যুগ্ম ধারণা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি।

হয়েল-নারলিকারের তত্ত্ব মহাবিশ্বের মধ্যে নূতন নূতন বস্তু সৃষ্টির সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়েছে। এ কথা আজ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই বিশ্ব তার সমস্ত জ্যোতিষ্ক নীহারিকা ছায়াপথ নিয়ে এক অসম্ভব গতিতে একে অপরের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। তুলনামূলক ভাবে এক বিস্ফোরণরত তুবড়ির কথা চিন্তা করা যেতে পারে। তুবড়ির স্ফুলিঙ্গগুলি যেমন একে অপর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়ে, এই মহাবিশ্বও সে রকম ভাবে সম্প্রসারণশীল। দু'টি জ্যোতিষ্কের মধ্যে দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মধ্যবর্তী শূন্যতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। হয়েল-নারলিকার বলেন, এই ক্রমবর্ধমান শূন্যতার মধ্যে নূতন নূতন বস্তু সৃষ্টি সম্ভব। তাঁদের এই অভিনব ধারণা বিজ্ঞানের বহুদিনকার গৃহীত তত্ত্বকে অস্বীকার করে গড়ে উঠেছে, যে-তত্ত্ব গ্যালিলিও ও নিউটনের বিজ্ঞান সাধনার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল। নিউটন সূর্যকে প্রদক্ষিণ রত গ্রহ-উপগ্রহগুলির মধ্যে বিশেষ এক শক্তির খোঁজ পেয়েছিলেন, এই শক্তিই মহাকর্ষ। শক্তি দূরত্ব ডিঙ্গিয়েও কাজ করতে পারে। সূর্য এত দূরে রয়েছে, তবু তার আকর্ষণ ন'টি গ্রহ এবং তাদের পার্ষদ উপগ্রহগুলির মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। শক্তি সম্বন্ধে নিউটনের এই মৌলিক ধারণা বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথকে প্রশস্ত করেছে। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি, আলোক ও তড়িৎ চুম্বকত্ব সম্বন্ধে এ কথা বিশেষ ভাবে খাটে। চুম্বকের চারপাশে লোহার গুঁড়ো বিশেষ ভাবে সাজানো থাকে, অর্থাৎ কি না চুম্বকের প্রভাব আশেপাশের জমিতে সঞ্চারিত হচ্ছে। এ থেকে এলো ফিল্ডের ধারণা। এই ফিল্ডের প্রকৃতিকে স্বীকার করে আইনষ্টাইন তাঁর অভিনব তত্ত্বগুলি ব্যক্ত করলেন। মহাকর্ষকে তিনি শক্তি হিসাবে চিন্তা না করে ফিল্ড হিসাবে কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে, মহাকর্ষ দেশ-কালেরই স্বধর্ম, এই দেশ-কাল দেশ অর্থাৎ জমি এবং সময়ের "বুননে" গড়া। বস্তুর প্রভাবে দেশ-কাল প্রভাবিত পরিবর্তিত হচ্ছে, দেশ-কাল বেঁকে যাচ্ছে, সূর্যের মত একটা বিরাট্ আয়তন বস্তুর চাল বেয়ে গ্রহ-উপগ্রহগুলি ঘুরপাক খাচ্ছে। অন্য ভাবে বলতে গেলে, নিউটনের ধারণায় যেখানে শক্তি দূরত্ব ডিঙ্গিয়েও সরাসরি কার্যকরী, আইনষ্টাইনের মতে সেখানে পারিপার্শ্বিক দেশ-কালে পরিবর্তন এনে ফিল্ডের মাধ্যমে কাজ হচ্ছে।

হয়েল-নারলিকারের বৈজ্ঞানিক ধারণা প্রধানত নিউটনীয় মতাশ্রয়কে গ্রহণ করে গড়ে উঠেছে। আইনষ্টাইন মহাকর্ষকে দেশ-কালের ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বস্তুর বস্তুত্ব, জলের সিক্ততা বা আগুনের দাহগুণের মত বস্তুরই স্বধর্ম বলে মেনে নিয়েছেন। হয়েল-নারলিকার কিন্তু সে কথায় সায় দেন নি। নিউটন বা আইনষ্টাইনের ধারণার সঙ্গে এখানে তাঁদের মস্ত তফাৎ। এ বিষয়ে হয়েল এবং নারলিকারের যা মত—অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভাষায় বলতে গেলে, "যে কোন বস্তুর ভর (অর্থাৎ বস্তুর বস্তুত্ব বা পরিমাণ) সারা জগতের বস্তুত্বের সঙ্গে গ্রথিত—তার অন্য-নিরপেক্ষ নিজস্ব গুণ নয়। জগৎ যদি ভিন্নভাবে গঠিত হ'ত, বস্তুকণার ভরও ভিন্ন সংখ্যা দিয়ে ব্যক্ত করতে হ'ত।

"এঁদের মতে, প্রত্যেক বস্তু বা আমাদের চিন্ময়জগতে প্রতীয়মান বা আমরা প্রত্যেকেই জগতের সামগ্রিক গঠনের উপর নির্ভর করে আছি। তাই প্রতিপদেই জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ডের কথা এসে পড়বে। এই নূতন মত সত্যই বস্তু-স্বরূপ ঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পেরেছে বা এটি গণিতকের সমাবেশ মাত্র। এ-বিষয়ে এত শীঘ্র কিছুই বলা যায় না।"

আসল কথা, এই অভিনব তত্ত্বটি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করার মত উপযুক্ত কোন উপায় এখনও পর্যন্ত ভেবে পাওয়া যায় নি। 'প্রবাসীর আগামী সংখ্যায় হয়েল-নারলিকারের তত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রকাশ পাবে।

চুলের থেকে সরু

ছুঁচের মুখ দিয়ে তার যাবে এতে আশ্চর্য্য কি। আশ্চর্য হ'ত—যীশুখ্রীষ্ট যা বলেছিলেন, ছুঁচের মুখে যদি উট যেত। কিন্তু তার যে কত সরু হ'তে পারে তা সত্যই এক আশ্চর্য কথা। চুলের থেকে সরু। সরু সুতোর থেকেও সরু তার আজ তৈরি সম্ভব হচ্ছে। ছবিতে ছুঁচের

চুলের থেকেও সরু তার (ছবিটি বহুগুণ বর্দ্ধিত)

ছিদ্র দিয়ে একটা সরু সুতা আর এক টুকরো তার দেখানো হয়েছে। ছবিটি বড় করে তোলা হয়েছে। সরু সুতো তাই দড়ির মত মোটা দেখাচ্ছে। তারটি তবু চুলের মতই সরু। আসলে তা চুলের থেকে অনেক সরু ছোট ছোট যন্ত্র তৈরিতে এত সরু তারেরও আজ দরকার হয়ে পড়েছে।

আশুতোষ ও বিজ্ঞান সাধনা

বিজ্ঞানের সাধনায় ভারতীয় ধারাটি বেশি পুরাণো না হ'লেও ইতিমধ্যে বেশ বেগবান হয়ে উঠেছে। গত শতাব্দীর মধ্য-ভাগ থেকে আমাদের দেশে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুরু। কার সাধনায় তা প্রথমে রূপ নিয়ে উঠল—এ প্রশ্নটি খুব স্বাভাবিক। অধ্যাপক মহাদেব দত্ত "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার মার্চ ১৯৬৫ সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

"যতদূর জানা যায়, প্রথম ভারতীয় মৌলিক গবেষক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। আশুতোষের বিজ্ঞান গবেষণা অতি স্বল্পস্থায়ী, মাত্র ৩.৪ বছরের মত। অধ্যাপক গণেশপ্রসাদের মতে, আশুতোষের বিজ্ঞানের প্রবন্ধগুলি প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করলেও ইউরোপে এই বিষয়ে কি কি গবেষণা হয়েছে, তা জানা না থাকায় আশুতোষের গবেষণা প্রায়শঃ ইউরোপে কুড়ি বা পঁচিশ বছর পূর্বে যে গবেষণা হয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি। ৩।৪ বছরের মধ্যেই আশুতোষ আইন ব্যবসায়ে তাঁর সব শক্তি ও সময় নিয়োগ করায় বিজ্ঞান গবেষণার প্রথম ধারাটি প্রায় উৎস মুখেই হারিয়ে যায়, কিন্তু এখানেই সারা হয়ে যায় নি। প্রায় কুড়ি বছর পরে গবেষক আশুতোষকে দেখা যায় গবেষণা-সংগঠক হিসাবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা গণিত সমিতি, ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।" (—"ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার ধারা" নামক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত)।

রাত্রির অলংকার

আলো রাত্রিকে সাজিয়ে তোলে। কালোর বুকে তা ছবি আঁকে, আলপনা আঁকে। জ্যোৎস্নাহীন রাতে উপরে আকাশের দিকে তাকালে এ কথাই মনে হয়। বিজলী বাতির যুগে আকাশের সেই আশ্চর্য তারা-

রাত্রির অলংকার
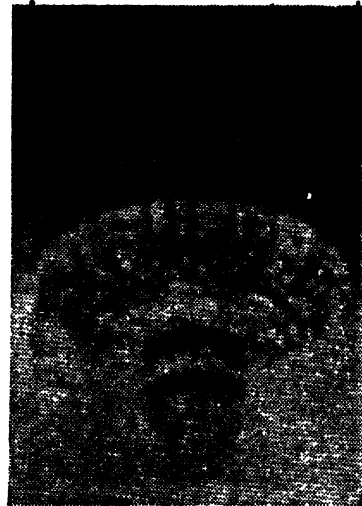
গুলিই যেন আজ মাটিতে নেমে এসেছে। অন্ধকার আজ নানা ভাবে অলঙ্কৃত হচ্ছে। ছবিতে যে অপরূপ কারুকার্যময় জিনিষটি দেখছেন তা কোন ইতিহাস-প্রসিদ্ধা রূপসী নারীর কর্ণাভরণ নয়, তা কালো রাত্রিরই অলংকরণ, তা একটি বিজলী বাতি, ইতালীর আলোক-বিশেষজ্ঞরা এটি রূপায়ণ করেছেন।

এ. কে. ডি.

মণিকণা

দেশস্থ সাধারণের বিজ্ঞতাকাঙ্ক্ষী হইলে প্রচলিত ভাষার অবলম্বন ব্যতিরেকে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে না, এই হেতু এতৎ পাঠশালায় ছাত্রদিগকে গৌড়ীয় ভাষা দ্বারা বিদ্যোপার্জন করা যাইবেক। অর্থাৎ, যে ভাষা তাহারা মাতৃক্রোড়াবধি লালন-পালন দ্বারা অভ্যাস করিয়া তদ্দ্বারা জ্ঞাত পদার্থে সংস্কারপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। অতএব ইহাতে তাহাদের অভ্রান্ত সংস্কার যে ভাষান্তর বদভ্যাসের শ্রমনিবৃত্তি হওয়াতে অনায়াসে প্রয়োজনোপযোগী বিদ্যা অভ্যাস করিবেন।

(—অধ্যাপক পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ)
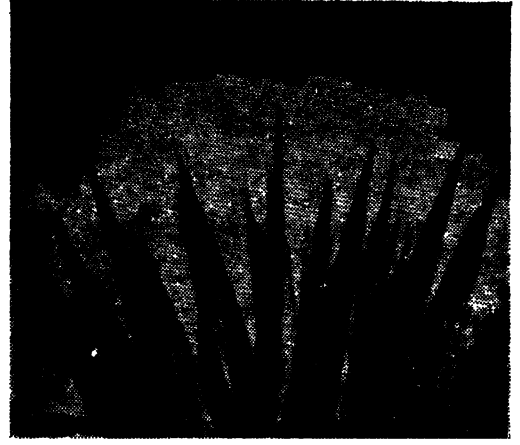
সিসেল গাছ
এ গাছ থেকে এক জাতীয় তন্তু তৈরী হয়

মুক্তধারা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকের সংস্কৃত অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী সাহিত্য শাস্ত্রী। শ্রীউষাদেবী চক্রবর্তী, ১৩২।৫ শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, কলিকাতা-৩১ হইতে প্রকাশিত।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ৩৮।সি, বিধান সরণি। কলিকাতা-৬। পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংস্কৃত অনুবাদের প্রয়োজন আছে কি না এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। ক্লাসিকাল বা প্রাচীন ভাষায় রচিত সাহিত্যের আধুনিক কালের ভাষায় রূপান্তর সর্বথা কাম্য, কিন্তু আধুনিক কালের ভাষায় রচিত সাহিত্যকে সংস্কৃতে অনুবাদ করার সার্থকতা আছে কি? এর উত্তরে বলা যায় সংস্কৃত ভাষা ভারতে 'মৃত ভাষা' বা dead language নয়। ভারতবর্ষে এ ভাষা জীবিত, এ ভাষায় রচিত গ্রন্থ শিক্ষিত সমাজের বিরাট্ অংশের বোধগম্য। কাজেই সংস্কৃতে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থের অনুবাদ অপ্রাথিত নয়। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের অনুবাদ যদি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় হয়ে থাকে, তা হ'লে বাংলা ভাষার মাতামহী যে সমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষা, সে-ভাষায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের অনুবাদ হওয়া সঙ্গত। অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে সে অনুবাদের ভাষা যেন মূলানুগ হয়, যেন দুরূহ বা দুরুচ্চার্য না হয়। শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীর 'মুক্তধারা' অনুবাদ পড়ে আমি দেখেছি তাঁর রচনা মূলানুগ ও বেশ ঝরঝরে হয়েছে। কোথাও কোন দুরূহতা নেই যে রসগ্রহণে বাধা পড়বে। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি রাজা, সেনাপতি, প্রজা, অমাত্য প্রভৃতি ভূমিকা-সমাকীর্ণ হওয়ায় এগুলির মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের ছাপ স্পষ্টতঃই ফুটে ওঠে। সেদিক থেকে সংস্কৃত অনুবাদের একটি বিশেষ সুবিধা রয়েছে, কেননা প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত নাটকের কথা ঐ সূত্রে স্মরণ হয়। ধ্যানেশ-বাবুর এই অনুবাদ সর্বজনবোধ্য হওয়ায় সারা ভারতে যাঁরা সংস্কৃত জানেন তাঁদের কাছে 'মুক্তধারা' নাটকের রস পরিবেষণ সহজতর হবে। যেমন :

"পথিক :—যন্ত্রেণ কিং প্রয়োজনম্ ?

নাগরিক :- মুক্তধারাখ্যা নির্ঝরিণী হেনৈব নিরুদ্ধা।

পথিক :—অহো, অসুরস্য মুণ্ডমিব তৎ দৃশ্যতে, নাস্তি মাংসম্, আনতশ্চাস্য হনুদেশঃ। যুষ্মাকম্ উত্তরকূটস্য শীর্ষোপান্তে ইত্থং মুখব্যাদানং কৃত্বা দণ্ডায়মানং তিষ্ঠতি। অহর্নিশং তু বিলোক্য যুষ্মাকং প্রাণপুরুষো বিশুষ্কং কাষ্ঠমিব সংজনিষ্যতে।"

এই অনুবাদ সামান্য সংস্কৃত-জানা শ্রোতা-দর্শকের পক্ষেও কঠিন হয় নি। অনুবাদক সংস্কৃত নাটকের আদর্শে "নান্দী", "প্রস্তাবনা" বসিয়েছেন। ফলে নাটকে ক্লাসিকাল রীতি রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের আদর্শ রাখতে গেলে অন্যদিকে 'সাধারণ' পাত্র-পাত্রীর মুখে, মাগধী প্রাকৃত বসাতে হয়। কিন্তু সেই গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে উচিত কাজ করেছেন। তা হ'লে গীতগুলিতে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত বা শৌরসেনী অপভ্রংশ দিতে হয়। কিন্তু দিলে তার ফলে এই নাটকের রসগ্রহণে বাধা ঘটত। 'শঙ্কর বন্দনা' সংস্কৃত অনুবাদে সুন্দর খাপ খেয়ে গেছে। কিন্তু ধনঞ্জয় বৈরাগীর গানগুলি সম্পর্কে সে-কথা বলা যায় না। বাউলধর্মী গানগুলিকে সংস্কৃত শব্দে ছন্দে অনুবাদ করা অসম্ভব। তবে অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের রচিত ঐ গানগুলির বক্তব্য গ্রহণে কোন বাধা হয় নি।

ধ্যানেশবাবু পূর্বে রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর" নাটকের "বার্তাগৃহম্" অনুবাদ করেছেন। সে নাটকের অভিনয় আমি দেখেছি, কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় নি। 'মুক্তধারা'র অনুবাদেও তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। আমি আশা রাখি এই গ্রন্থ বিদ্বৎসমাজে আদৃত হবে।

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য্য

বহুমুখী—সাহিত্য সংকলন, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, মূল্য ১'২৫ পয়সা

সাহিত্য সংকলন হিসাবে একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর বই। অনেক খ্যাতনামা লেখকই ইহাতে লিখিয়াছেন। রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। লেখা নির্বাচনে কৃতিত্ব আছে। মফঃস্বল হইতে এরূপ একখানি রুচিসম্মত সংকলন বাহির করা যে কত কঠিন কাজ তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। এজন্য সম্পাদক গৌরীপ্রসাদ সেন প্রশংসার দাবি করিতে পারেন। তবে ভয় হয়, এই 'টেম্পো' শেষ পর্যন্ত বজায় রাখিতে পারিবেন কিনা।

সুরভি—এম্প্রইজ্ কালচারাল্ সোসাইটি কর্তৃক আর একটি সাহিত্য সংকলন। ইহাও প্রশংসার দাবি রাখে। রচনাগুলির মধ্যে অধিকাংশই গল্প। গল্পগুলি ভাল। প্রতিষ্ঠানের এরূপ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

'প্রবাসী' মাসিক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকার ও [illegible]
শেষ তারিখের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য :—

ফরম্ নং ৪

(রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১।	প্রকাশিত হওয়ার স্থান—	কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)
২।	কিভাবে প্রকাশিত হয়—	প্রতি মাসে একবার
৩।	মুদ্রাকরের নাম—	শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত
	জাতি	ভারতীয়
	ঠিকানা	৭৭।২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
৪।	প্রকাশকের নাম	ঐ
	জাতি	ঐ
	ঠিকানা	ঐ
৫।	সম্পাদকের নাম	শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
	জাতি	ভারতীয়
	ঠিকানা	৭৭.২.১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
৬।	(ক) পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর নাম	প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
	ঠিকানা	৭৭.২.১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩
	এবং	
	(খ) সর্বমোট মূলধনের শতকরা এক টাকার অধিক অংশের অধিকারীদের নাম-ঠিকানা—	১। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৭৭।২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ২। শ্রীমতী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়, ৭৭।২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ৩। শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায়, ৭৭।২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ ৪। শ্রীমতী সুনন্দা দাস, ৭৭.২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ৫। শ্রীমতী ইশিতা দত্ত, ৭৭.২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ ৬। শ্রীমতী নন্দিতা সেন, ৭৭.২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ৭। শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, ৭৭।২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ৮। শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়, ৭৭ ২ ১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ৯। শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায়, ৭৭।২.১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ১০। শ্রীমতী অলকানন্দা মিত্র, ৭৭.২.১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ১১। শ্রীমতী লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়, ৭৭।২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

আমি, প্রবাসী মাসিক সংবাদপত্রের প্রকাশক, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-লিখিত সব বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ—১৫।৩।১৯৬৫ ইং

প্রকাশকের সহি—স্বাঃ শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত